ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ; আষাঢ় ১৩৭৪—অগ্রহায়ণ—১৩৭৪

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্বক ১০ই মাঘের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৭·৫০ সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভিঃ পিঃ খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক'

মধুলোভী ফটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আষাঢ়—১৩৭৪

প্রথম খণ্ড	পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

হিন্দুজাতক

শ্রীরমাপ্রসাদ গোস্বামী, পঞ্চতীর্থ

সংসারে বিধিবশে জীব জন্মগ্রহণ করে। জন্মাদি ষড়ভাবও বিধিবশেই পাইয়া থাকে। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের বশীভূত হইয়া মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হয়। সাধারণ জীব জগতের এই গতি। মানুষ প্রধান জীব হইলেও সাধারণ ধর্মে ইতর প্রাণী হইতে কোন পার্থক্য তাহার নাই। ধর্মই তাহাকে বড় করিয়াছে। নীতিশাস্ত্র বলিয়াছে "ধর্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ" কথাটা চিরসত্য। প্রাচীনকালেও এক শ্রেণীর দার্শনিক মানুষকে পশুজীবন যাপনের উপদেশই দিয়াছে। যে আত্মতত্ত্ব বা জন্মান্তরবাদ ধর্মাচরণের হেতু সেই তত্ত্বকেই অস্বীকার করা হইয়াছে। ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন হয় না। সুতরাং যতদিন বাঁচিয়া আছ সুখে বাঁচিবে, তাহা যে কোন পায়েই হোক। বর্তমান সময়ে এই মতেরই জগদ্ব্যাপী প্রাবল্য। ন্যায়-নীতি সত্য সহিষ্ণুতা ক্ষমা প্রভৃতি গুণাবলী জগৎ হইতে প্রায় প্রস্থান করিয়াছে তৎসহ ধর্মও। অহিন্দুধর্ম শাস্ত্রে মানবের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া কিছু নিরূপিত হয় নাই। কোনও শাস্ত্রে হইলেও তাহা উপভোগার্থ মাত্র, না করিলেও ক্ষতি নাই।

কিন্তু ঋষি নিয়ন্ত্রিত শাস্ত্রে ইহার বৈপরীত্যই দেখা যায়।

বর্ণাশ্রমী হিন্দুজাতক জন্মের সঙ্গে অবশ্য পরিশোধ্য তিনটি ঋণের দায়িত্ব পাইয়া থাকে। (১) দেবঋণ (২) পিতৃঋণ (৩) ঋষিঋণ। দেবতার আনুকূল্যেই জীব বাঁচিয়া থাকে ও সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ওষধি সকলের উৎপত্তি, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি-শূন্যতা দেবানুগ্রহে হইয়া থাকে প্রকৃতি দত্ত ওষধ্যাদি। আমরা কৃষি-কার্যের দ্বারা ধান্যাদি উৎপাদন করিয়া থাকি। উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থায় উন্নত ধরণের চাষে যথেষ্ট ফললাভ হয়, এখানে দেবতার কোন কথা নাই। এ প্রসঙ্গ অজ্ঞান বিজৃম্ভন মাত্র। হিন্দুশাস্ত্রে বলে মানুষ দেবতাকে দিবে, আর দেবতা মানুষকে দিবে। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ো পরমবাপ্স্যথ: ইতি গীতা। ধান্যাদির উৎপত্তি সম্বন্ধেও শাস্ত্রে একটি কথা আছে।

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।

অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি দিলে সূর্য পূর্ণ তেজে উদিত হইয়া থাকেন। ঐ আদিত্য হইতে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে ও ঐ সুবৃষ্টির ফলে অন্নাদি উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে প্রজা রক্ষিত হয়।

গীতায় দেখা যায় মানুষ উর্ধ্ববর্তী এবং দেবতা অধোবর্তী। ব্যষ্টি জীবনেও দেখা যায় দেবানুগ্রহ ভিন্ন মানুষ বাঁচিতে পারে না বা তাহার আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের প্রতিবিধান হয় না। অর্বাচীন ধর্মমতে একেশ্বরবাদের কথা থাকিলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐশ্বরীয় শক্তির বিবরণ নাই। সনাতনশাস্ত্রে বিশেষ বিবেচনা ও অনুভূতি দ্বারা সূর্য সোম অগ্নি প্রভৃতি লোকপালের কথা ও অন্য দেবতাদের কথা বলা হইয়াছে। যেমন ধনের ঈশ্বরী লক্ষ্মী, বিদ্যার সরস্বতী, আরোগ্যে সূর্য ইত্যাদি। বিশেষতঃ সংসূচিত অনিষ্ট নিবারণ জন্য শান্তি কর্ম ও অশুভ নিবারণ পূর্বক শুভ আনয়ন রূপ স্বস্ত্যয়ন কর্মও দেবযজন দ্বারা হইয়া থাকে। এই দুইটি ক্রিয়াও মানুষের অতীব প্রয়োজন।

পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য পিতৃ পিতামহাদির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও কুলধর্ম রক্ষার্থ সৎ পুত্রোৎপাদন কর্তব্য। জীবিতাবস্থায় পিতামাতার আজ্ঞা পালন ও শুশ্রূষা দ্বারা পূজা করা কর্তব্য। স্বর্গত পিতা পিতামহাদির সেই পূজা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা করণীয়। শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্নাদি তাঁহাদের তৃপ্তির কারণ, এবং তাঁহারা উহা আকাঙ্ক্ষাও করেন। মৃত ব্যক্তির জন্য ঐ ক্রিয়ার কি প্রয়োজন এই প্রকার নাস্তিক্য বুদ্ধি আশ্রয় করা ঠিক নহে। লোকান্তরিত পূর্ব-পুরুষ যেখানে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করুন বংশধরের প্রদত্ত অন্নাদি তাঁহারা ভোগ করিতে পারেন। সেই অবস্থায় তাঁহাদের ভোগ্যবস্তু সকল অনায়াস লভ্য হয়। এইজন্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দানের কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ দাহানন্তর দশ পিণ্ডদান হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত ক্রিয়া প্রেতত্ব পরিহারের জন্য। সপিণ্ডীকরণের পর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ও পার্বণ শ্রাদ্ধাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রীত করা কর্তব্য। বিবাহাদিতে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ তাঁহাদের কৃপা প্রাপ্তির জন্য। অভ্যুদয় হয় বলিয়া "আভ্যুদয়িক" বলা হইয়া থাকে। যদি এই পিতৃযজ্ঞ করা না হয় তবে পিতৃঋণ শোধ হয় না। এই প্রকার পিতৃ পূজা ও কুলধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ধর্মপত্নীতে সৎ পুত্র উৎপাদন প্রয়োজন। যদি বংশলোপের সম্ভাবনা হয় তবে পিতৃ-পুরুষ ক্ষুণ্ণ হন।

পিতৃ ও দেবঋণ পরিশোধের জন্য যে সকল কর্মের কথা বলা হইল তাহাতে অধিকারলাভের জন্য হিন্দুজাতকের শুচিতা প্রয়োজন। ঐ শুচিতা দেহ মন ও আত্মার। দেহের শুচিতা স্নান ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা হয়। মনের শুচিতা কুচিন্তা ত্যাগ করিয়া করিতে হয়। আত্মার শুচিতা শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম না করা। মহাপাতক অতিপাতক জনক অশাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠানের পর তাহা নষ্ট হইলেও ঐ কর্মের ফল আত্মসমবেত গুণরূপে কর্তাকে পাপভোগ করিতে বাধ্য করে। এইজন্য কুষ্ঠাদি রোগ সংসূচিত জন্মান্তর কৃত মহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তি দৈব পৈত্র্য কর্মে অধিকারী হয় না। এ কারণে হিন্দুজাতক নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান হইতে স্বভাবতঃ বিরত থাকে।

অধুনা নাস্তিক্য ভাবের প্রাবল্যে ও পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতায় বিভ্রান্তবুদ্ধি মানুষ হিন্দুধর্মের নিন্দা করেন ও, উপেক্ষা করিয়া থাকেন দৈব পৈত্র্য কর্ম সকল। সুতরাং

তাহাদের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন নাই। পাপজনিত দুঃখ ভোগের কথাও তাহারা বিবেচনা করিতে পারে না। তাই আজ দলবদ্ধ দুর্নীতি পরায়ণ সমাজ বিরোধীদের কার্য-কলাপ দেখিয়া রাষ্ট্রনায়করা বিচলিত হইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত দুর্নীতি দমন বিভাগ খুলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাতেই বা কি হইবে? সত্য কথা বলিবে বলিলেই লোকে সত্য বলিবে না। অসত্য উক্তির জন্য মন্দ ফলে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকে তবেই মানুষ সত্য বলিবে। কিন্তু সম্প্রতি নাস্তিক্যবাদে সেই বিশ্বাস সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। দেহাত্মবাদে মানুষ বিমূঢ়। ইহা অজ্ঞান বিজৃম্ভিত হিন্দুধর্ম বিগর্হণ বিষবৃক্ষের ফল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা প্রগতির পরিপন্থী। এখানে বলিবার কথা এই যে সুপরীক্ষিত যে সকল নীতি স্মরণাতীত কাল হইতে মানবহিতার্থে প্রচলিত আজ তাহা ত্যাগ করিয়া নূতন অপরীক্ষিত নীতি কি শুভঙ্করী হইয়াছে? সহৃদয় ব্যক্তি চিন্তা করুন।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি (৩৩)
বাদরায়ণ অর্থে এখানে বেদব্যাসেরে কয়
তাঁহার মতেতে মধু বিদ্যা যে দেবতারো তরে হয়
অসম্ভবও সম্ভব হয়
তাই দেবতারা পাবে নিশ্চয়
বৈদিক কাজে ব্রাহ্মণদের অধিকার জেন নেই
রাজসূয় এই যজ্ঞ জানিও ক্ষত্রিয়তরে তাই।
তবু সূর্যের অধিষ্ঠাতা যে সে চৈতন্যময়
দেবতারা যবে ইচ্ছানুরূপ দেহধারী যবে হয়
তখন তাহারা সবে অধিকারী
বেদব্যাস যে দেখেন বিচারী
দেবতাগণের সাথেতে তাঁহার কথোপকথন হয়
অসম্ভব যে সম্ভব হয় এতে প্রমাণিত রয়।
রামানুজ কন মধু বিদ্যাতে দেবগণ অধিকারী
সূর্য হৃদয় স্থিত ব্রহ্ম যে সূর্য পূজারী তাঁরি
পূজার ফলেতে বসু তবে হয়
ব্রহ্মতে শেষে হইবেন লয়
পরকল্পেতে বসুরূপ ধরি অন্তে ব্রহ্ম পায়
মধু বিদ্যায় এই অধিকার অধিকারী সবে তায়।
শুচস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ
সূচ্যতে হি (৩৪)
অনাদর কথা শোনা যায় বলি শোক হেথা বোঝা যায়
শোকেতে ব্যাকুল হইয়া গমন হয়েছিল জেনো তায়
হংসের রূপ ধরিয়া তখন
জানশ্রুতিরে কহেন বচন
শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যা লভিলে দুঃখ হইবে নাশ
শাস্ত্রেতে কয় বেদ পাঠে তার হয় যে সর্বনাশ।
সকল লোকের সমষ্টি ধরি শাস্ত্র গঠন হয়
শুধু উপবীত ধারণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই নয়।
আচারে ব্যাভারে যেই ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণ নামে সার্থক হন
তবু সবাকার শৃঙ্খলাতরে শাস্ত্র বাচা হয়
অন্যথা এর ঘটেছে যেখানে তাও সম্ভব হয়।
ঈশ্বর কৃপা অহেতুক প্রেম জীবে যথা ভালোবেসে
সেইরূপ জেন অঘটন ঘটে ব্রহ্ম ইচ্ছা এসে।
ক্ষত্রিয়ত্ব গতেশ্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন
লিঙ্গাৎ (৩৫)
জানশ্রুতি যে ক্ষত্রিয় তাহা এই থেকে বুঝা যায়
চৈত্ররথের সাথে উল্লেখে ইহা প্রমাণিত হয়
জানশ্রুতি সে পকান্নদান
জনপদ অধিপতি মতিমান
সারথি যে ছিল ইহাতে বুঝায় ধনবান সেই হয়
হংস রূপেতে বাক্যে এসব কথোপকথন হয়।
ছাতে শুয়ে রাজা জানশ্রুতি সে আকাশে হংস দেখে
হংসের কথা শুনিলেন তিনি সেইখানে শুয়ে থেকে
কহে ভল্লাক্ষ দেখো না কি তুমি
জানশ্রুতির তেজেরে বাখানি
স্বর্গ ব্যাপ্ত সেই তেজে দেখো হয়ত বা পুড়ে যায়
হংস কহেন শকট যুক্ত রৈক্কর মত নয়
এই কথা শুনি রৈক্কর কাছে ব্রহ্ম বিদ্যা লভি
জানশ্রুতি সে উজলিয়া উঠে যেন নবোদিত রবি।

প্রশ্ন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমাকে কি যেতে হবে
শেষ বয়সে গ্রাম ছেড়ে ?
শুচিতা, সুখ, শান্তি যে তার
দিনে দিনে কম্‌ছে রে।
তুলছে মাথা দস্যু ডাকাত
উৎকণ্ঠাতে কাটছে যে রাত।
গ্রামবাসীরা দৈন্যে দুখে
ধাপে ধাপে নামছে রে।

২

দেখছে নিতুই বিভীষিকা
পদে পদে পাচ্ছে ভয়।
কোথায় তুমি মা অভয়া
এ দুর্দিনে দাও অভয়।
অনটন যে বাড়ছে দিনই
খেলছে ভাগ্য ছিনিমিনি
যাহার মা আনন্দময়ী
সে কি নিরানন্দে রয় ?

৩

এত আপদ এত বিপদ
নিত্য 'বোমার' শব্দ রে,
সকল আশা সকল ভাবা
দিচ্ছে করে স্তব্ধ রে।
চিরদিনের বন্ধুজনে,
ভাবছি ছেড়ে যাই কেমনে ?
মাকে নিয়েই থাকবো হেথায়
পুণ্যে যাহা লব্ধ রে।

৪

সরে না মন কোথাও যেতে
গ্রামকে রেখে বিপন্ন,
নিত্য-নূতন বিপদ ভীতি
পাঠাচ্ছ মা কিজন্য ?
তোমার অভয় মূর্তি ধরো
সকল বিপদ আপদ হরো।
শব-সাধনার সিদ্ধি এনে
কর সকল সুধন্য।

সহমরণ

শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত

(১)

পঙ্ক সঞ্চারে রুদ্ধ বুক তার,
জলের ভাণ্ডার হ'ল যে নিঃশেষ।
তৃণের সজ্জায় ঢেকেছে চারধার,
সোপান পঞ্জরে ধ্বংস নির্দেশ।

স্থবির মন্থর—বৃদ্ধ অশ্ব,
স্খলিত চরণে ঘাসের বনেতে ;
ঘুরছে দিশাহারা,
দারুণ গ্রীষ্ম।
ফড়িং ঘোরে তার—মাথার চারিধার,
চটুল পরিহাস করে যে বারেবার ;
মূর্ত দাম্ভিক আজিকে নিঃস্ব।

(২)

সেদিন সোপানের, আয়ত চত্বরে
এলায়ে কুন্তল, বকুল সৌরভে ;
ঘিরেছে দেহ তার—সুষমা সম্ভার।
অথৈ কালো জলে চাঁদ যে বন্দী,
গভীর চিত্তে সে স্বপ্ন-সন্ধী।

গাছেতে ঘোড়াটা বাঁধা যে লাগামে,
আকুলি ওঠে তার গ্রীবার ছন্দ।
পেশীতে ঝঞ্ঝা চোখেতে বিদ্যুৎ,
বেগ ও বন্ধনে দারুণ দ্বন্দ্ব !

বেগ ও গভীরতা—সহজ মিত্রতা,
গ্রন্থিবন্ধন হল যে তুলনায়।
ক্ষোভ ও লজ্জায়, মৃত্যু শয্যায়।

উঁচু সে পাড়েতে বটের ছায়াতে—
পলিত প্রাসাদের, ভগ্ন স্তম্ভ।
নীরব সাক্ষী তাদের মিলনের,
কাঁপিছে ব্যথা যেন, ঘোলাটে দৃষ্টিতে
নিরাবলম্ব।

(৩)

কালের প্রেতিনী খুঁজিছে বাহু মেলি,
বেপথু শিকারের ব্যর্থ কান্না।
একদা যাহারা ছিল গো মহীয়ান্।
গর্বে উদ্ধত প্রাণের বিত্তে।
এখন অসহায় করুণা-ভিখারী,
মরণ সৈকতে—কাঁপিছে নিরুপায়
অজানা রাত্রের হিমের স্পর্শে।

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রমন্যাস)

তিন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ট্রেনে এই জাতের হাজারো চিন্তা ও সংশয়ের জটলার মধ্যে পড়ে ওর রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি।

পরদিন ও কাশীতে নেমে অশান্ত মনেই গিয়ে পৌছল মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে। প্রথমেই চমকে গেল বিলাসভিলার দেখে। এত চমৎকার বাড়ী ও বেশি দেখে নি—শুধু কাশীতে নয়, কলকাতায়ও দু চারটির বেশি চোখে পড়ে নি—বিশেষ, গঙ্গাতীরে। ও আশৈশব গঙ্গাকে ভালোবেসে এসেছে, তাই আরো মুগ্ধ হয়ে গেল। মনের অশান্ত হিজিবিজি চিন্তাও এল থিতিয়ে।

তারপরেই চমকে উঠল শান্তি মাকে গঙ্গায় ডুব দিতে দেখে।

এ কী চেহারা? কোথায় সেই dame de salon—যাঁকে দেখে সাহেবরাও তারিফ করত, বাঙালীদের মধ্যে কেউ নিন্দা, কেউ ঈর্ষা!

মাথা মুড়োনো! স্থূল কায়া ঝরে প্রায় আধখানা হয়ে গেছে! স্নান সেরে যখন তিনি তিলক কেটে মালা পরে তাঁর ঠাকুর ঘরে এসে বসলেন তখন অসিত বাগানে বেড়াচ্ছিল। ঠাকুর ঘরের একটি খোলা জানালার দিকে তাকাতেই চোখ পড়ল বৃদ্ধা পূজারিণীর পরে। তাঁর স্নিগ্ধ মধুর কান্তি দেখে ও শুধু মুগ্ধ নয়, অভিভূত হয়ে পড়ল।

এ কী ব্যাপার! মনের, প্রাণের রূপান্তরের ছবি যেন প্রতি অঙ্গে জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠেছে। মুখে স্নো-পাঁউডার নেই বটে, কিন্তু কী নিরুপম শান্তি! চোখের সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন গলে অনুকম্পা হয়ে ফুটেছে। হাসিতেও কী অপূর্ব সুষমা! সুন্দরীদের হাসিতে মঞ্জুশ্রী দেখে ও গভীর তৃপ্তি পেয়েছে তো কতবারই। কিন্তু এ-হাসি সে-জাতেরই নয়। এ যেন—কী নাম কিসের আশ্বাসে ভরা?—প্রাপ্তির কি? হবে। বলা কঠিন তার পক্ষে যার কৃষ্ণ লাভ হয় নি। তবে এটুকু নির্ভয়েই বলা চলে যে, এ হাসির মধ্যে কোথাও এতটুকু আড়ম্বর নেই, অথচ আত্মসমাহিত, আত্মরতি। শাস্ত্রে পড়েছিল অন্তর্জ্যোতির কথা। এ-হাসিতে যেন সে-জ্যোতিরও ছোপ লেগেছে!

ও চেয়ে চেয়ে যেন মুগ্ধ হয়ে দেখছে এমন সময় ললিতা এসে ডাকল: "মা ডাকছেন, দাদু!"

চার

অসিত শান্তি মা-কে ভক্তিভরে প্রণাম করল মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। মা ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন: "বোসো বাবা।" তাঁর দুপাশে দুটি আসন—একটিতে ললিতা বসল, অন্যটিতে ও বসতে যাবে এমন সময় মা বললেন: "ওদের সবাইকে ডাক দে।"

ললিতা: ওরা সবাই গঙ্গায়।

মা: সবাই?

ললিতা : হ্যাঁ, কেবল প্রণবদা ছাড়া।

মা : সে কী করছে ?

ললিতা : কী আর ? মোক্ষম ধ্যান—যা ও সময় পেলেই করে।

মা : ওকে দেখে শেখ রে মেয়ে, শেখ—কাকে বলে নিষ্ঠা।

ললিতা : নিষ্ঠা না হাতী! প্রণবদার কেবল এক চিন্তা—একবার আমাদের দেখিয়ে দেবে ও কেমন ধ্যানে পোক্ত। ও নিজেকে ভাবে বিবেকানন্দের বিলিতি সংস্করণ।

মা (হেসে) : দেখলে বাবা ? spoilt child কাকে বলে ?

ললিতা : বৈ কি! বাপীর পাশে ?

মা : চু-প। গুরু নয় ?

ললিতা : তুমি আমাকে ধম্‌কাবার কে মা ? আমি ওর সঙ্গে লড়াই করলে ও খুশীই হয়, ধমকায় না ভুলেও।

মা : (অসিতকে) দেখলে তো ?

অসিত : প্রণব বুঝি স্বভাবে ধ্যানী ?

মা : হ্যাঁ বাবা। ছেলেবেলা থেকেই ও ধ্যানে আলো-টালো দেখে। তাই দুলালকেও চায় ওর পথে টানতে।

অসিত : (হেসে) পারে না বুঝি ?

মা : দুলালের সঙ্গে পেরে ওঠা কি চাট্টিখানি কথা বাবা ? বৃন্দাবনে কি ও ধরে নি নিজমূর্তি ?

অসিত : (আশ্চর্য) নিজমূর্তি ?

মা : একেবারে—কী বলব—প্রতিপদেই নিজের পথ নিজের হাতে পায়ে কেটে চলবে। যদি না পারে তবে টুঁ মারতেও রাজী—কিন্তু beaten track মাড়াবে না কিছুতেই। প্রণবের মতন সব ছেড়ে ধ্যান-এ ও নেই।

অসিত : কিসে ও আছে ?

মা : কিসে নেই তাই বলো না! পড়বে যখন তখন পড়ায়ই ডুবে যাবে। হাসবে যখন তখন সবাইকেই ভুলিয়ে দেবে যে কান্না বলে কিছু আছে এ জগতে। তারপর জপে যখন বসবে তাতেই ডুবে যাবে। ধ্যানেও তাই। তারপর নামকীর্তন যখন করবে বাড়ী ফাটিয়ে দিবে ওর উর্ধ্ববাহু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" গর্জনে। তারপর ভজন যখন শুনবে—দেখ নি ওকে !

অসিত : দেখেছি মা, খুব তন্ময় হয়ে শোনে।

মা : (সগর্বে) জানো, ওর ভাবসমাধি মতন হয় !

ললিতা : ভাবসমাধি নয় মা—তবে কাছাকাছি বটে।

মা : তুই তো সবজান্তা—কেবল আমার কথা কাটবি।

ললিতা : কথা কাটা! ভাবসমাধি কী আমি জানি না বুঝি ? তোমাকে দেখি নি ?

মা : (মুস্কিলে পড়ে) যেতে দে। তোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে করেই তো আমার—মানে—

ললিতা : পায়ে বাত হল !—ছি-ছি-ছি।

মা : যাঃ—পোড়ামুখী! ডেকে আন প্রণবকে।

ললিতা : ওর ধ্যান ভাঙিয়ে ?

মা : ফে—র! হ্যাঁ, আমার দরকার আছে।

ললিতা : আচ্ছা মা। কিন্তু সাধুর ধ্যানভঙ্গ করায় প্রত্যবায় আছে—তোমার মুখেই শুনেছি।

মা : যাঃ! সে অপ্সরাদের পক্ষে। তুই তো আর অপ্সরা নোস।

ললিতা : ঈ—শ! ঢের অপ্সরা দেখেছি। বৃন্দাবনে একজন এসেছিলেন পরমাসুন্দরী, তার ওপর এম. এ. পাশ। বাপী তাকে কী বলল জানো ? আমি মস্ত আধার।

মা : (হেসে ওর গালে ঠোনা মেরে) যা বলছি।

ললিতা : হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।

মা : তোমাকেও নিশ্চয় জ্বালাত এমনি—রাতদিন ?

অসিত : না মা। ও কেবল আনন্দই দিত সবাইকে। ওর নাম হওয়া উচিত ছিল আনন্দময়ী।

মা : ঠিক বলেছ। তবে ওর নাম আমি ললিতা দিয়েছিলাম কেন জানো ? ওর জন্মানোর ঠিক দশ মাস আগে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখি।

অসিত : বৃন্দাবনে ?

মা: হ্যাঁ সেই ললিতা—শ্রীরাধার অষ্টসখীর একজন। তাই তো দুলাল ওকে দুটি উপাধি দিয়েছে: অমলা আর সরলা।

অসিত: জানি মা। প্রেমল সেই এম. এ. পাশ অপ্সরাটিকে ঠিক এই কথাই বলেছিল।

মা: তাই তো ওকে পাঠালাম প্রণবকে ডাকতে। আর কেউ হলে প্রণব সইত না—মানে ওর ধ্যানভঙ্গ। তবে ললিতার সাত খুন মাপ।

অসিত: (একটু চুপ করে থেকে) প্রণব শুনেছি বিলেত থেকে এসেছিল প্রেমলেরই টানে।

মা: হ্যাঁ। দুলাল ওর যাকে বলে hero—ওরা স্কুল থেকে একসঙ্গে পড়েছে। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়। দুলাল কেম্ব্রিজ যায়—প্রণব লণ্ডনে ডাক্তারি পড়া স্থরু করে। পাঁচ বৎসর বাদে এফ আর সি এস হয়ে ও বহু চেষ্টা করে লক্ষ্ণৌ হাসপাতালের সার্জন হয়ে আসে—শুধু প্রেমল লক্ষ্ণৌয়ের প্রফেসর হয়ে এসেছিল বলে।

অসিত: তারপর?

মা: পর পর সে অনেক টানাছেঁড়া। বলে নি দুলাল?

অসিত: কিছু বলেছে। তবে ও বলত—আপনার কাছেই সব শুনতে।

মা: ওকে আমি বলি হীরের টুকরো ছেলে। অবিশ্যি দুলালের মতন নয়। কিন্তু খুব শুদ্ধ আধার। নৈলে কি যৌবনেই বৈরাগ্য আসে বাবা? বহুভাগ্যে তবে মানুষ বৈরাগী হতে পারে—বিশেষ করে যৌবনে—সংসারে ঢুকবার আগে। দুলাল প্রায়ই আওড়ায় জানো তো—বৈরাগ্যমেবাভয়ম্?*

অসিত: ললিতার মুখে শুনেছি—প্রণব হিন্দু হত না যদি প্রেমল হিন্দু না হত।

মা: সেকথা ঠিক। ললিতা ওকে ঠাট্টা করে প্রায়ই আওড়ায় মিলটনের:

"He for God only she for God in him." বলে দুয়ো প্রণবদা, তুমি কি না শেষটা sheদের দলে পড়লে?

অসিত: হ্যাঁ, ললিতা একদিন একথা বলেছিল বটে। তাতে প্রেমল প্রণবের হয়ে বলেছিল: কিন্তু বৃন্দাবনে এ অপবাদ নয় ললিতা, শিরোপা। কারণ ব্রজের ঠাকুরটির সর্ব বাঁকা—পুরুষকেও গোপী হতে হবে যদি তাঁর রাসলীলায় পাশপোর্ট পেতে চায়।

অসিত: কিন্তু মা, একথা কি সত্যি? আমরা পুরুষ হয়ে জন্মে মেয়ে হতে যাব কেন? গীতায় বিভূতিবাদে ঠাকুর কি 'পৌরুষং নৃণাং' বলে পৌরুষের তারিফ করেন নি?

মা: বৃন্দাবনের লীলার অন্দর-মহলে না ঢুকলে ঠিক বুঝতে পারা যায় না বাবা, গোপী ছাডা কেন সাধক গোপীনাথের মধুর ভাবের রস পেতে পারে না। কিন্তু এ-ও খতিয়ে ঐ অধিকার তোদেরই কথা বাবা, তুমি মুখ ভার করবে, তাই থাকুক এখন এ আলোচনা। সবকিছুরই একটা লগ্ন আছে। ঠাকুর এখন তোমাকে টানছেন তাঁর ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে। পরে যখন ডাকবেন তাঁর মাধুর্যের রংমহলে তখন এ-তত্ত্ব বুঝতে তোমাকে কারুর কাছে ধর্ণা দিতে হবে না, তোমার প্রেমই বুঝিয়ে দেবে।

অসিত (ঈষৎ ক্ষুণ্ণ): আমার কি সে অবস্থা কোনদিন হবে মা? আমার সংশয় যেরকম প্রবল—

মা: বাবা, এ যুগের মানুষের মন সংশয়কে লালন করতে চায় যে। কিন্তু কিছুই অকারণে ঘটে না। সংশয়েরও দরকার আছে।

অসিত: কী দরকার মা?

ললিতা (প্রণবের সঙ্গে ঢুকে): একটু দেরি হল মা, কারণ ও ধ্যানে এমন মশগুল হয়েছিল যে মায়া করল ধ্যান ভাঙতে।

প্রণব (মাকে প্রণাম করে—অসিতকে): তোমার কথা অনেক শুনেছি মার কাছে।

---

* ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ ভয়ম্।
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ম্।
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।
(ভর্তৃহরি—বৈরাগ্যশতক)

ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, বৈভবে ভয় মহারাজের,
মানে—দৈন্যের, বলে—শত্রুর, রূপে ভয়—
মোহিনীর মোহের।
পণ্ডিত ভয় বাদে পণ্ডিতে, গুণী—খলে, দেহী যমে ডরে,
সকলেই ভয়ে সারা ভবে, শুধু বৈরাগ্যই ভয় হরে।

অসিত (আশ্চর্য): মার কাছে? প্রেমলের বা ললিতার কাছে বলো?

মা (হেসে): না বাবা। ওদের চেয়ে আমি তোমার বেশি খবর রাখি বলেই এইমাত্র বলছিলাম যে গোপী হলতে কি বোঝায় সময় হলে ঠাকুরই তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন। দেবেনই দেবেন—তুমি মিলিয়ে নিও, আর তখন আমি ওপার থেকে "টু" করে হেসে বলব কেমন? বলিনি?

ললিতা: কী যে বলো মা? তোমার কী হয়েছে শুনি যে, অষ্টপ্রহর এমন কুডাক ডাকো?

মা: সে কেবল ছলাল জানে। আর ওপারে যাওয়ার কথায় এমন তড়পে উঠিস কেন? এ দেহটা তো শুধু খাঁচা রে! (অসিতকে) সত্যি বলছি বাবা—এ দেহটা যে খাঁচা এ আমি চাক্ষুষ করেছি। দেখেছি—আমাদের প্রাণপাখী আলাদা আর বাইরের এ খাঁচা আলাদা। তবু এমনিই ঠাকুরের মায়া বাবা, যে, মানুষ খাঁচাটাকেই পাখী বলে ভুল করে অষ্টপ্রহর।

অসিত: তাহলে কি বলবেন মা, যে, খাঁচাটা ভেঙে ফেলাই ভালো—পাখীকে মুক্তি দিতে?

মা: বাবা, যতক্ষণ সে ফর ফর করে এদিক-ওদিক উড়ে খাঁচার মধ্যেই দিব্যি খুসিতে থাকে ততক্ষণ খাঁচা ভাঙবার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া খাঁচা গড়েন যিনি ভাঙতে হলেও তাঁকে চাই। খাঁচা ভাঙব বললেই কি কেউ ভাঙতে পারে? কিন্তু মরুক গে, এ হল আসলে ছুয়ো মায়াবাদের তর্ক—কেন মায়েশকে জানলে তবেই মায়াকে ছুয়ো দেওয়া যায়—কী সে শ্লোকটা প্রণব?

প্রণব: দৈবী হ্যেষা গুণময়ী—তারপর (লাজুক হেসে) ভুলে গেছি মা।

অসিত (পাদপূরণ করে): মম মায়া দুরত্যয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্ তরন্তি তে।

মা: হ্যাঁ বাবা। আমাদের জন্মও ঐ জন্যেই। তাঁর এ মায়ার জগতে এসে মিথ্যে মায়াকে পেরিয়ে লীলার কোঠায় পৌঁছতে। কারণ এ না পারলে খাঁচার শিকে কেবল পাখার ঝাপটা মেরে মুক্তি পাওয়া যায় না।

প্রণব: মা, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এ খাঁচাটা থেকে মুক্তি পাওয়াই যদি জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে, তবে আমাদের এ খাঁচার মধ্যে তিনি পাঠালেনই কেন? আমরা তো তাঁর কোলে দিব্যি আনন্দে ছিলাম খাঁচাকে বরণ করবার আগে। কিসের লো[ভে] খাঁচার ডাকে সাড়া দিলাম? এসে দুঃখ পেয়ে খাঁচা[র] শিকে ঝাপটা মেরে রক্তাক্ত হয়ে মড়াকান্না কাঁদতে?

মা: না বাবা। এ সংসারটা বাঁধে এ হল [এ]কটা দিক। কিন্তু বাঁধে কতদিন? না, যতদিন তা[র] খাঁচাটা খাসা নিরাপদ—আকাশে ওড়ার বিপদ আছে এরই নাম মোহ। এ-মোহ থেকে মুক্তি পাই আম[রা] শুধু ভক্তিতে—তাঁকে ভালো বাসলে। সেই প্রেমে[র] সাধনা করতেই আমাদের বন্ধনের মধ্যে, খাঁচার মধ্যে পাঠান তিনি—বন্ধনের মধ্যে থেকে আরো গভীর সুরে তাঁকে ভক্তিদাতা প্রেমের ঠাকুর বলে চিনে বরণ করতে যে-মুহূর্তে চিনি সে-মুহূর্তে খাঁচা আর খাঁচা থাকে না হয়ে ওঠে অখণ্ড শান্তির নীড়। আর সে যে কী শান্তি বাবা—কী বলব? তন্ত্রে একটি শ্লোক আছে গণয়া[মি] যদিদং—(প্রণবকে) তারপরে কী রে?

প্রণব: বন্দনমাত্রং—তারপরের লাইনে—

অসিত (পাদপূরণ করে) পশ্চাদ্রক্ষ্যামি মোচনদাত্রম্

ললিতা: (চোখ বড় বড় করে) দাদা তুমি তে[া] সামান্যি ভণ্ড নও! কথায় কথায় বাপীর কাছে মাথ[া] নিচু করো কী দুঃখে? তুমি নিজেও তো দেখছি ক[ম] বিদ্বান নও?

প্রণব: কী করো ললিতা—যা মুখে আসে—

অসিত: (হেসে) না না, ওর কথা আমার ব[ড়] মিষ্টি লাগে। আর ও কি শুধু আমাকেই ভণ্ড বলে প্রেমলের সঙ্গেও কী ঝুটোপুটি লড়াই না করে রাতদিন!

ললিতা: করি কি সাধে দাদা? প্রাণে বাঁচতে হবে তো? self preservation—

মা: তুই ভারি নেমকহারাম। যে কর্তা তোকে বাঁচালো তাকে দুষলি হর্তা নাম দিয়ে?

ললিতা: তুমি বলো কি মা? কর্তা আমার কী হাল করেছিলেন ইচ্ছে করেই লিখিনি তোমায়—শুনলে তোমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেত বলে। আ[র] তুমিও কম যাও না মা। "যা—গাছতলায় থাক গি[য়ে] গুরুর সেবাদাসী হয়ে" বলে আমাকে পাঠিয়ে দি[লে]

আলমোয়ায় শান্তির মধ্যে রইলে খাঁচাকে আনন্দ-নীড় বলে চিনে। কিন্তু সুভদ্রা মেয়ের কী দশা হল বলো তো? রইল কোথায়? না, একটা গোয়াল ঘরে—যার দোর ভেঙে গেছে। সেখানে রান্নাবাড়া করে গুরুসেবা করি কপাল চাপড়ে—কিন্তু রান্নাও শেষ হল কান্নায় ঘরের মধ্যে বান ডেকে যেতে। মেজের এক বিঘৎ জল। খাটিয়ায় বসে আপ্রাণ জপ করছি।

হরে কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ রক্ষা কৃষ্ণ যদি কৃষ্ণ,
করতে কৃষ্ণ পারো কৃষ্ণ তবেই বুঝব তুমি কৃষ্ণ।
গুরুর পাল্লায় লেডীর কৃষ্ণ কী হাল হল দেখ কৃষ্ণ!
আর দেরি না করে কৃষ্ণ, তার হাত থেকে বাঁচাও কৃষ্ণ!

এমন সময়ে মা, তাঁর উদ্ধব হয়ে এলেন এই দাদুদেব— সশরীরে, রাখে কৃষ্ণ-র দূত হয়ে। তাই না মারে কৃষ্ণর প্রহার থেকে বেঁচে গেলাম। তবু বলবে গুরু আমার কর্তা কৃষ্ণ ভর্তা? দুলাল তোমার কাছে গোপালকৃষ্ণ হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে করাল কৃষ্ণ মনে রেখো।

মা: (হেসে গড়িয়ে পড়ে) কী মেয়ে রে তুই—এ যে ব্লাসফেমি। বিলেত হলে তোকে পুড়িয়ে মারত পোপ আর বিশপে মিলে।

ললিতা: ঈ—শ। সত্যি কি? আমি দাদাকে ডাক দিতাম হাহাকার করে (সুর করে): গান গেয়ে দাও দেখা দাদা, উঠল আগুন জ্বলে। নেভাও শিখা বর্ষা ডেকে মল্লারহিন্দোলে।

অসিত: (পিট পিট সুর করে ছড়া কেটে পাদপূরণ করে) আঁচলে যে বাঁধল দাদায় ডরায় সে কী বলে? অগ্নি পরীক্ষায় হবে পাশ গোলে হরিবোলে।

মা: (একগাল হেসে) টিট ফর ট্যাট, ঠিক হয়েছে বাবা! এ না হলে দাদা! কিন্তু আমি তো কই জানতাম না—ওরা গোয়াল ঘরে ছিল?

প্রণব: প্রেমল আমাকে লিখেছিল কিন্তু আপনাকে বলতে বারণ করেছিল পাছে আপনি ভাবেন।

মা: না বাবা। আমি ভাবব কেন? আমি যে চাক্ষুষ করেছি তাঁর লীলা—মুখের কথা না কল্পনা তো নয়। দিনের পর দিন যে প্রত্যক্ষ দেখেছি—ঠাকুর আমাদের ধরে আছেন। (অসিতকে) বিশ্বাস কোরো বাবা, এ পুঁথির বুলি নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—যে, যিনি ওদের গোয়াল-ঘরে বান ডাকিয়েছিলেন তিনিই আবার তোমাকে ওদের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ললিতা: কেমন করে মা? দাদার সঙ্গে বাণীর দেখা হয়েছিল মথুরার বিশ্রাম ঘাটে একেবারে দৈবাৎ—accident যাকে বলে।

মা: ওরে মেয়ে! কতবার তোকে বলেছি বল তো, যে দৈবাৎ কিছুই ঘটে না তাঁর লীলায়? আমরা ভুগি কখন যখন নিজেকেই কর্তা মনে করি। কিন্তু যাকে একবার তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিই কর্তা—আমরা তাঁর হুকুমেই উঠছি বসছি হাসছি কাঁদছি—সে প্রতি ওঠাপড়ার মধ্যেই দেখে শুধু তাঁর বরাভয়, একহাতে বর, অন্যহাতে অভয়। লক্ষ্ণৌয়ে অতুল সেন একটি গান গাইতেন আমার কী যে ভালো লাগত বলতে পারি না।

আমারে কে আঁধারে এমন করে চালায় কে গো।
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি বুঝতে নারি
কিছুই যে গো!

এ-গানটি তিনি তাঁর জীবনের এক কঠিন পরীক্ষার সময় বেঁধেছিলেন বাবা, আমাকে বলেছিলেন।

অসিত: জানি। আমাকেও বলেছিলেন তিনি যে, আরও একটি গান—

"কি আর চাইব বলো হে মোর প্রিয়
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও"

তিনি বেঁধেছিলেন যখন চারদিক আঁধার হয়ে এসেছিল। তাই আমাকে গান দুটি শেখাবার সময়ে তিনি বলেছিলেন: এ দুটি গান যার তার কাছে যেখানে সেখানে গেও না। গেও শুধু ভক্তের সংসদে—যারা বিশ্বাস করে, প্রতি কথায় তর্ক তোলে না—এমন কেন হল অমন না হয়ে।

মা: ঠিক বলেছিলেন তিনি। আর কেন বলেছিলেন বলব? কারণ তিনি স্বভাবে শুধু কবিই ছিলেন না, ছিলেন ভক্ত—আর আগে ভক্ত, তারপরে কবি—ঠিক তোমারই মতন।

ললিতা: দাদু একথা মানে না। সে ঘড়ি ঘড়ি বলে যে, সে আগে কবি গায়ক, তারপর আস্তিক ভক্ত!

মা: ভুল বলে মা, ভুল বলে। (অসিতকে)

বাবা তুমি এখনো নিজেকে চিনতে পারোনি—এ শুধু দুলালের কথা নয়—সে আমাকে দু তিনটে চিঠিতে লিখেছিল—আমিও টের পেয়েছিলাম প্রথমেই তোমার গান শুনে—প্রথম দিনই সেই পণ্ডিত ভাতখণ্ডের লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সে। মনে আছে তোমার কী গান গেয়েছিলে—দুটি ভজন ?

অসিত : আছে মা : মীরাবাইয়ের "সুণি মৈঁ হরি আব্‌নকী আবাজ" আর সুরদাস-এর "ইত্‌না তো করো হে স্বামী যব প্রাণ তন্‌সে নিকলে।"

মা : হ্যাঁ বাবা, এই দুটি গান যে তুমি কী দরদ দিয়ে গেয়েছিলে আজও ভুলতে পারিনি আমি। আর শুধু আমিই নই, (ললিতাকে) তোর বাবাও শুনে মুগ্ধ হয়ে ফিরবার সময় পথে আমাকে কী বলেছিলেন জানিস ? বলেছিলেন : "ও মিথ্যে ওস্তাদি গান ওস্তাদি গান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর স্বধর্ম কালোয়াতি নয়—ভজনই ওর প্রাণের প্রণামী। ও যা খুঁজছে তাকে পাবে এই ভজন কীর্তনের মধ্যে দিয়েই।" বুঝলি ?

ললিতা : আমি তো বুঝেছি মা, তোমার আদরের দুলালও বুঝেছেন—কেবল অশান্ত দাদুকে বোঝাতে গিয়েই আমাদের যা প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। ও কিছুতেই মানবে না—সেকথা তুমি এইমাত্র বললে—যে ও সব আগে ভক্ত সাধক তারপর কবি, গায়ক, লেখক, pillar of society !

মা : তোর সব তাতেই কেবল ঠেশ দিয়ে কথা। তোকে নিয়েও বাছা আমাদের কিছু কম প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়নি মনে রাখিস। হ্যাঁ !

অসিত : মা, একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই খোলাখুলি। উত্তর দেবেন ?

মা : জানি বাবা, তোমার প্রশ্ন ; তুমি কোনো দিন দুলালের মতন একাকী হয়ে সব ছেড়ে শুধু ভগবানকে ডাকতে পারবে কি না, এই না ?

অসিত : (আশ্চর্য) আপনি কি মনের কথা পড়তে পারেন না কি মা ?

প্রণব : (হেসে) মা যে কী পারেন না পারেন তার পুরো খবর আমরা কেউ পাই নি তাই। কেবল এইটুকু বলতে পারি—তুমি যতই দেখবে ততই অবাক হয়ে যাবে।

মা : থাম্ থাম্। অন্ততঃ মা একটি পারে না যা ও পারে—গান গেয়ে ঠাকুরের ভাব সকলের মনে চারিয়ে দিতে। গাও তো বাবা একটি গান। কথা তো অনেক হল। এবার গান হোক।

অসিত : না মা, গাইছি আমি, কিন্তু আগে আর একটু শুনতে চাই। (প্রণবকে) কী দেখো তুমি বলে তো ? মানে, স্বচক্ষে।

প্রণব : কী দেখেছি ? (মা-কে) বলব মা ?

মা : বলো। কিন্তু যতটুকু ও বিশ্বাস করতে পারে তার বেশি না। যে যতটা সইতে পারে তাকে তার বেশি বইতে দিলে ফল ভালো হয় না—হয় সে শিরপা তোলে, নয় ভেঙে পড়ে।

ললিতা : (অসিতকে) দেখলে দাদু ? বাপী ঠিক এই কথাই বলে। মা-ও বলছেন। তবু তুমি যে কী ! কেবলই বলবে সত্য যা তা সকলের কাছেই সত্য।

প্রণব : না অসিত, তা নয়। আমরা যত দেখি বুঝি চিনি চাখি ততই বদলে যাই আর আর অন্তরের সেই পরিবর্তনের অনুপাতে সত্যের রূপও বদলে যায় বহুরূপীর মতন। এ শুধু মা বা প্রেমলের কথা নয়, আমিও দেখেছি পদে পদে। শোনো বলি একটা অঘটনের কথা—তাহলেই বুঝবে কী ভাবে আমার মন বদলে গেল। (মা-কে) বলি মা—চরণামৃতের কথা ?

মা : না। অসিত চরণামৃতে বিশ্বাস করে না হয়ত উলটো উৎপত্তি হবে আবার। ও হয়ত ভাবে তুমি ওকে convert করতে চাইছ। প্রপাগাণ্ডা কনভার্শনে আমার আস্থা নেই, জানোই তো।

অসিত : মা, আমি অনেক কিছু বিশ্বাস করতে পারি না কারণ দেখেছি আমাদের দেশে অতি বিশ্বাসের কুফল। হাঁচি টিকটিকি পঞ্জিকা টোটকা তেত্রিশ ভূত প্রেত দৈত্য দানা—আমরা উদার সর্বভুক্, সবতাতেই নিরপেক্ষভাবে সমান বিশ্বাস করি। আমি চাই কিনা নির্ভরযোগ্য তথ্য পেয়ে তবে বিশ্বাস করতে—কিনা চোখ খুলে।

মা: (প্রণবকে) ওকে বলো না তুমি কী ভাবে তোমার এ-মতের বদল হয়েছিল। তুমিও তো ঠিক এই রকমই ভাবতে এক সময়ে।

প্রণব: কিন্তু আপনার চরণামৃতের অঘটন না বললে আমি কী করে বোঝাব মা আমার a priori ধারণা কেমন করে ঘা খেয়েছিল।

মা: (একটু ভেবে) আচ্ছা বলো। কে জানে হয়ত তোমার এজাহারে ওর বিশ্বাস আসতেও পারে।

ললিতা: শুধু প্রণবদার এজাহার বলছ কেন মা? বাণী আমি—আর সবার উপর তুমি—এই ত্রিমূর্তির এজাহারও চাপাব—corroboration evidence with a vengeance, যাকে বলে। তাতেও যদি ও না বোঝে তো ফরাসীদের ঢঙে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলব—tant pie pour দাদু!*

অসিত: (হেসে) অত তোড়জোড় বাঁধতে হবে না দিদি। Rabelais-র Gargantua-র একটি কথা মনে পড়ে: "L' appetit vient en mangeant"† প্রণবের কথা শুনতে শুনতে আমার আরো শুনতে ইচ্ছে হয়েছে সত্যিই। তার উপর মা যখন সামনে বসে—আর চরণামৃতও তাঁর নিজের—তখন আমাকে শুধু সংশয়ী নয় পাষণ্ডী বলতে হবে যদি তবু আমি অবিশ্বাসকেই আঁকড়ে থাকি।

প্রণব: (নরম সুরে) না, তা নয় ভাই। আমি কি জানি না—অঘটনে বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে কী কী কারণে? তুমি তো ভুলও বলো নি যে, মানুষ প্রায়ই কান পাৎলা হয়ে যা শোনে তাই বেদবাক্য মনে করে বসে—শুধু তোমাদের দেশেই নয় আমাদের দেশেও। বলতে কি, বুদ্ধিবাদী ও বিজ্ঞানবাদীদের প্রতিষ্ঠা হু হু করে বেড়ে উঠেছে—মিডীভ্যল যুগে আমরা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বভুক্ হয়ে উঠেছিলাম বলেই তো। তাছাড়া বুদ্ধিবাদ ও বিজ্ঞানবাদের বাজারে নগদ বিদায় মেলে হাতে হাতে। ফলে মানুষ ভাবে যে-বিশ্বাসের ফল তখনি তখনি প্রত্যক্ষ না হয় সে নামঞ্জুর। অন্ততঃ আমি এই কথাই ভাবতাম যখন প্রেমলের টানে এদেশে আসি।

মা: কিছু সংক্ষেপে বলো। বেশি ফলাও করার দরকার নেই। আলোচনা ঢের হয়েছে আমি এখন ওর গান শুনতে চাই। (ললিতাকে) তুই ওর হার্মোনিয়মটা এনে ওর সামনে রাখ। প্রণব তাহলে সাবধান হবে।

প্রণব: (হেসে) গঞ্জনা শিরোধার্য মা। আমি সত্যিই বলতে বলতে উজিয়ে উঠি—জানি হাড়ে হাড়ে। প্রেমলও আমাকে কতবারই যে ধমকেছে।

মা: (সান্ত্বনার সুরে) না বাবা, যা দেখে আমাদের মন অভিভূত হয় তাতে আমাদের উজিয়ে ওঠা স্বাভাবিক। আচ্ছা, তুমি বলো, আমি আর টুকব না।

প্রণব: (একটু ভেবে) কোথেকে সুরু করব?—হ্যাঁ, প্রথম দিকের কথাটা বাদ দিয়ে যাই যখন বিলেতে প্রেমলের সঙ্গে লড়তাম। ও বলত—বিশ্বাস খানিকটা স্বভাবেই অন্ধ, আমি বলতাম—না, বিশ্বাস চক্ষুষ্মান্ও হতে পারে।

ললিতা: পারে কি মা? আমার তো মনে হয় বাণীর কথাই ঠিক।

মা: বিশ্বাস অনেক সময় গজায় দেখার ফলে একথা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু যারা স্বভাবে বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস দেখার অপেক্ষা রাখে না। আর, এ সম্পর্কে আর একটা কথা মনে রাখা ভালো: যে, দেখার ফলে সে বিশ্বাস আসে অনেক সময়ে সে উল্টো দেখার ফলে উঠেও যেতে পারে। যেমন ধরো, কোনো সাধুর ছোঁওয়ায় দেখলাম অমুকের অসুখ সেরে গেল। অমনি দৈবীশক্তিতে বিশ্বাস এল দমসকরে। কিন্তু তার পরে সে সাধু বা অন্য কোনো সাধুর ছোঁওয়ায় কিছুই হল না, কোনো রুগী মারা গেল। অমনি ফের ঝাঁ করে সমান জোয়ালো অবিশ্বাস এসে গেল। সাধুসন্ত মুনি ঋষিরা যে বিশ্বাসের কথা বলেছেন সে যখন আসে আপনি আসে—বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে দাঁড় করানো যায় না, গেলেও তক্ষনি টলে পড়ে। ধর্মের ক্ষেত্রে এই বালাই—তাই মানে খুঁইয়েও 'বিশ্বাসেরই

---

* তাহলে দাদুই দুর্ভাগা বলতে হবে।

† খেতে খেতে ক্ষুধা বাড়ে।

দাম বেশি। গয়ায় মহাপ্রভুর বিশ্বাস এসেছিল এমনি হঠাৎ আচমকায়—পাথরে বিষ্ণুপাদপদ্মের ছাপ দেখে। কারুর বিশ্বাস আসে শোক তাপে, আবার কারুর দুঃখে পড়লেই বিশ্বাস উবে যায়। এই অসিতকেই দেখ না কেন। প্রেমল আমাকে লিখেছে যে ও স্বভাবে সংশয়ী বলে ভড়ং করে কিন্তু দশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণে বিশ্বাস এসে গিয়েছিল কেন, ও কি ভাবে ও ভেবে পায় নি। শুধু কৃষ্ণে না, আরো কঠিন গঙ্গাকে তো পতিতপাবনী বলে বিশ্বাস করতে পারা। অথচ (অসিতকে) যে তুমি ঘড়ি ঘড়ি সংশয়কে আমল দিয়ে কষ্ট পাও বাবা সে-তুমি কি গঙ্গাকে সাক্ষাৎ মা বলে ডাকতে আনন্দ পাও নি?

অসিত: পেয়েছি বৈ কি মা। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় যে, আমি গঙ্গাকে দেবী বলে আন্তরিক বিশ্বাস করি? ঠিক বুঝতে পারি না মা কোথেকে খাঁটি বিশ্বাসের সুরু হয়—আনন্দ থেকে, কোনো অনামী ঝোঁক থেকে, না কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা experience থেকে। (প্রণবকে) তুমি চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস বলতে ঠিক কী বুঝায় আমাকে বলতে পারো? আমার সত্যি ধাঁধা লাগে বলেই জিজ্ঞাসা করছি, তর্ক করতে নয়।

প্রণব: ধাঁধা আমারও লাগত—আরো প্রেমলকে দেখে। বলি শোনো—অন্ততঃ বলতে চেষ্টা করি গুছিয়ে। (একটু থেমে)—

প্রেমল যখন মা-কে গুরু করে তখন আমি বিলেতে। ওকে লিখলাম আপত্তি করে। ও বলল: তুমি দেখ নি মাকে তাই তোমার আপত্তি নামঞ্জুর। ব্যস। আর কিচ্ছু না। আমি ঘা খেলাম, কিন্তু কৌতূহলও হল বৈকি। কারণ প্রেমলের অসামান্য বুদ্ধি ও ধীশক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমীহের অন্ত ছিল না। অনেক চেষ্টা করে লক্ষ্ণৌয়ে একটা সার্জেনের কাজ জোগাড় করে এলাম।

এসে প্রেমলকে দেখে প্রথমটায় একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ যে অভাবনীয়! শুধু ওর মালা-তিলক গেরুয়া ভস্মই নয়—ওর কথাবার্তা হাসি ঠাট্টা চাল চলন সব কিছুই আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল।

তারপর দেখলাম মা-কে। কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাই প্রেমলকে দণ্ডবৎ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে দেখে আরো ঘা খেলাম।

তারপর নানা ওঠা পড়া আগুপাছু—সব বলা এখন সময় নেই—তাছাড়া মাও বলেছেন সংক্ষে করতে। তাই বলি—অনেক পোড় খেয়ে শেষটা ঠিক করলাম প্রেমল যখন মা-কে গুরু করেছে তখন নিশ্চয় কিছু দেখেছে তাঁর মধ্যে যা আমি দেখতে পাই নি বলেই আমার মন বাগ মানছে না।

এমনি সময়ে হঠাৎ মহেন্দ্রবাবুর অসুখ করল। হা অ্যাটাক। থ্রম্বোসিস। আমি গিয়ে দেখলাম অবস্থ সঙিন। কিন্তু মা অটল অচল। বললেন: ওষু ইনজেকশনে কাজ হবে না। তিনি শুনেছেন (কা কাছে বললেন না) যে, শুধু নাম জপ করতে হবে তাঁ শিয়রে।

মা নাওয়া খাওয়া ছেড়ে কেবল জপ করে চললেন আমার মনে হল মিডীকাল—ননসেন্স। এইস কুসংস্কারের ফেরেই মহেন্দ্রবাবু মারা যাবেন। প্রেমলবে বললাম যে, মহেন্দ্রবাবুকে নার্সিংহোমে নিয়ে না গেলে নয়—আমি ডাক্তার, জানি তো থ্রম্বোসিস কী ব্যাপার বললাম He is sinking!

প্রেমল আমাকে ধমকে বলল: "মা যখন বলেছে তখন তোমার আর কিছু বলার দরকার দেখছি না তুমি যাও নিজের চরকায় তেল দাও গে।

মনে খুবই কষ্ট হল। যার জন্যে আমি বিলেত থেবে এতদূর এসেছি কাজ নিয়ে সেই কিনা আমাকে অর্ধচ দিল এমন রূঢ় ভাষায়! বললাম মনে মনে: সাজা হবে যখন রুগীর নাভিশ্বাস হবে—আর হল বলে।

কিন্তু পরদিন গিয়ে দেখি—অবাক কাণ্ড! নাড়ী ফিরে এসেছে, জ্ঞানও হয়েছে। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার কেবল দুর্বলতা ছাড়া আর কোনো উপসর্গ ই নেই!

এ কী মিরাক্ল!! স্বচক্ষে দেখে আর না মেনে করি কি? কিন্তু তবুও বিশ্বাস হল না যে, মহেন্দ্রবাবু মা নাম জপের প্রসাদেই সেরে উঠেছেন। প্রেমল বলল ব্যঙ্গ হেসে: কী সবজান্তা সায়েন্টিষ্ট? যা দেখছি আমরা সব চোখের ভুল—না অটোসাজেসসনে?

আমি মুখে বললাম বটে: "chance!" কিন্তু মনে

বিষম ধাক্কা লাগল। তবে কি মা সত্যিই ভগবানের কাছ থেকে বাণী পান? সব ছেলে ভোলানো রূপকথা নয়?"

প্রেমল বলল আমাকে একটু ঠেশ দিয়েই যে, এসব ব্যাপারের মর্ম গুরুকরণ না হলে বোঝা যায় না। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলল মাকে গুরুবরণ করতে। আমার মন আরো বেঁকে বসল। মাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম আন্তরিক। কিন্তু জানোই তো আমরা স্বভাবে একটু স্বাবলম্বী। তাই গুরুর কাছে নত হওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম না।

এরপরে মনে কী সে তোলপাড়, ওঠাপড়, আগুপিছু। আমি এসেছিলাম প্রেমলের সঙ্গে দর্শন টর্শন পড়ে ধর্মজীবনে ফুটে উঠতে। কিন্তু প্রেমল এক রকম আমাকে খেদিয়েই দিল। যাকে চিরদিন আমার আদর্শ বলে বরণ করে এসেছি—যার জন্যে সাত সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি এ দুঃসহ গরমে ভাজা হতে—সে কিনা মুখ ফিরালো। ভাবলাম আর না—ফিরে যাব লণ্ডনে।

কিন্তু চাকরি ছেড়ে দেব দেব ভাবছি এমন সময় প্রেমলের পায়ে কী একটা পোকা কামড়ানোর ফলে ওর সমস্ত পা বিষিয়ে উঠল। ঠিক সে সময়ে মা গিয়েছিলেন ললিতাকে নিয়ে বদরীনারায়ণ। প্রেমল তখন লক্ষ্ণৌয়ের প্রফেসর।

মহেন্দ্রবাবু আমাকে ডেকে বললেন: রক্ত বিষিয়ে উঠেছে—ইঞ্জেকশনে কাজ হচ্ছে না। প্রেমল যন্ত্রণায় দারুণ কষ্ট পেলেও একটি কথাও বলত না। কিন্তু শেষে ওর অবস্থা সঙিন হয়ে দাঁড়াতে যখন আমরা স্থির করলাম অবিলম্বে অপারেশন করা ছাড়া গতি নেই তখন ও বলল: "মার অনুমতি চাই।"

আমি বিরক্ত হলেও উদ্বিগ্ন হয়ে তার করলাম মা কে। জোর দিয়েই লিখলাম: "এক্ষুনি অপারেশন না করলে প্রেমলকে বাঁচানো যাবে না।"

মা তার করলেন: "অপারেশন কোর না, কোনো ওষুধও দিও না, আমি যাচ্ছি।"

মা ফিরে এলেন ঠিক দুদিন বাদে। ইতিমধ্যে প্রেমলের শুধু পা নয় উরুও ফুলে উঠেছিল বিষের তাড়নে। অথচ ও অপারেশন করতেও দেবে না। বলল: "মা যখন বলেছেন, তখন তার উপর কথা চলে না।" আমি বললাম: "কিন্তু আর দেরি করলে হয়ত—"ও আমাকে থামিয়ে বলল: "যাই হোক না কেন, আমি জানব ঠাকুরের ইচ্ছা। কারণ গুরুর ইচ্ছার মধ্যে দিয়েই তাঁর ইচ্ছা প্রকট হয়।"

আমি একেবারে চমকে উঠলাম। এ তো rank bigotry! হাল ছেড়ে দিলাম। কেবল মনের মধ্যে সে কী আকুলি বিকুলি। এহেন বুদ্ধিমানেরও এমন মতিচ্ছন্নতা হয় ধর্মের কুসংস্কারে!

একদিকে মা এসে ব্যবস্থা করলেন—প্রতি ঘণ্টায় শুধু দুচামচ করে চরণামৃত। ব্যস আর কিছু নয়।

তিনদিনের দিন পা ফুলো কমে গেল। মহেন্দ্রবাবু বললেন: বিপদ কেটে গেছে।

তারপর দিন আমি চোখের জলে মা-র কাছে দীক্ষা নিলাম।

ললিতা: (অসিতকে) প্রণবদা খুবই সংক্ষেপে বলল দাদু। সে অসুখের দৃশ্য চোখে দেখতেও কষ্ট হত। ঐ সহিষ্ণু মানুষ বিছানায় কেবল এপাশ ওপাশ। দিল্লী থেকে এক স্পেশালিষ্টকে ডেকেছিল প্রণবদা কাউকে না বলে। তিনিও এসে বলে গেলেন: "I give him two or three days at the outside" শেষে আক্ষেপ করে বললেন: "সময়ে অপারেশন করলে রোগীকে বাঁচানো যেত।"

প্রণবদা তখন বলল: "রোগীর গুরু বলেছেন চরণামৃতে সারবে—মানে holy water." দিল্লীর ডাকসাইটে ডাক্তার মুচকে হেসে গুড্‌বাই বলে প্রস্থান।

প্রণব: আমার সত্যিই মনে হয়েছিল যে প্রেমলকে মার্ডার করা হল ধর্মের নামে। চোখের জলে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম শুধু একটি কথা: তিনি কি সত্যি শুনেছিলেন কোনো স্বর, না যাকে আমরা বলি ইনটুইশন—the still small voice.

মা: (হেসে) হ্যাঁ বাবা। ওর সংশয় দেখে সঙ্কট সময়েও আমার হাসি এসেছিল। মানুষ ইচ্ছা করে ঠাকুরের কৃপাকে দূরে ঠেলে রাখে বলেই দেখেও দেখতে পায় না। আর এইজন্যেই মহাভারতে বলেছে:

"অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচনী"—মরুক গে বাবা, সংশয়ের বিতণ্ডা তো যথেষ্ট হল এবার গানের শান্তিবারি ঝরাও—গাও তোমার সেই স্বরচিত গানটি—যেটি প্রেমল লিখে পাঠিয়েছিল। লিখেছিল এ-গানটি তোমার মুখে শুনে শুধু সে নয়, স্বয়ং দেবানন্দ মহারাজ আর মাধববাবাও চোখ মুছছিলেন—ললিতা ও তারার তো কথাই নেই। এই যে বলতে বলতে ওরা এসেছে—(তারাকে) এসো মা, তুমি অনেকদিন বাঁচবে, এসো মাধববাবা। তোমাদের নাম করতে করতেই এলে। আর প্রেমল, বোস। এত দেরি?

তারা: (প্রণাম করে) সাঁতার দিচ্ছিলেন মা!

ডাক্তারবাবু: হ্যাঁ। উঃ কী কাণ্ড! এই বর্ষার গঙ্গা! (প্রণাম)

মা: ও অমনি রোখালো। অবাধ্য। সাধে কি ওর শিষ্যা জুটেছে ললিতা? শোধ বোধ। (ডাক্তারবাবুকে) বিশ্বাসের কথা হচ্ছিল বাবা। তাই আমি বলছিলাম কারুর কারুর বিশ্বাস এমনিই আত্ম—সংস্কারেই বলব—যেমন গঙ্গাকে পাপহারিণী দেবী বলে বিশ্বাস।

তারা: দাদা যে কী সুন্দর গঙ্গাস্তব গান।

মা: হাঁ, আমি ওকে সেই গানটিই গাইতে বলছিলাম—:প্রেমল আমাকে লিখেছে। ললিতা পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে—যেমন সুর তেমনি গান—একেবারে খাঁটি বাংলা কীর্তন। (তারাকে) তোমাদের সঙ্গে কথা হবে মা পরে। আগে গান শুনি একটু। অবিশ্বাসের জেরায় তর্কে যখন মন শুকিয়ে আসে তখন কেবল গানের স্নিগ্ধ ধারায়ই সব তাপ জুড়িয়ে যায়। আহা, গাও তো বাবা, গাও। (প্রণবকে) তোর কথা পরে বলিস। ভালোই হল ওরাও শুনবে। বলি না—ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যে? ঠিক কথা। এ-তর্কাতর্কি না হলে তো ওরা কেউ শুনতে পেত না।

তারা: (সকৌতূহলে) কী কথা মা?

ললিতা: চরণামৃতের। (ঠোঁটে হাত দিয়ে) কিন্তু এখন একেবারে চুপ। সে কথা আসছে। এখন গানের পালা।

অসিত হারমোনিয়ম বাজিয়ে গায়:

এসো পতিতপাবনী, তৃষাহরণী,
কোলে তুলে নিতে গেয়ে গান।
এসো ধূসর ধরায় নীল করুণায়—দিতে মা,
তোমার বরদান।

কত মিছে কাজে পড়ি বাঁধা হায়!
তাই শুনি না তোমার "আয় আয়"!
যায় বেলা, তবু মায়াদীপ জেলে চাই ছায়ার
আলোর সন্ধান।
এসো ধূসর ধরায় নীল করুণায়—দিতে মা,
তোমার বরদান।

গেয়ে আলো কীর্তন হরিনাম
প্রেম শঙ্খ বাজাও অবিরাম,
ওগো তারিণী, বেদনাহারিণী, আমরা পাতি না
সে সুরে আজো কান।
এসো ধূসর ধরায় নীল করুণায়—দিতে মা,
তোমার বরদান।

ফিরে তোমার পায়ে মা এসেছি,
যাকে শৈশবে ভালোবেসেছি,
বেজে ওঠে সেই হারা রাগমালা শুনি তোমার
প্রেমের কলতান।
এসো ধূসর ধরায় নীল করুণায়—দিতে মা,
তোমার বরদান।

আর থেকো না মা ভুলে পাছে
দাও শান্তি উদাসী ক্লান্তে,
করো একান্ত তব চরণে, চায় না ভ্রান্তিবিলাস
আর প্রাণ।
এসো ধূসর ধরায় নীল করুণায়—দিতে মা,
তোমার বরদান।

গাইতে গাইতে অসিতের দৃষ্টি পড়ে সামনের নীলাকলা গঙ্গার পানে। তীর্থের তীর্থ বারাণসী, নদীর নদী গঙ্গা—সবার উপর শ্রোতা—ভক্ত ও ভক্তিমতী, যাদের মুকুটমণি—কৃষ্ণপ্রাণা বৈরাগিনী! ওর মনে আবেশ ছেয়ে এল দেখতে দেখতে। মাথুরের সুর

সাধন্ন তানের পর তান কে যেন ওকে জুগিয়ে দেয় যা চাইতেই। এরই তো নাম প্রেরণা যার আভাষ পেয়েছে অগুন্তি সন্ধানী কিন্তু হদিশ পায় নি কেউই—কোথেকে সে আসে, কোন পথ বেয়ে—যখন আসে তখন বিদ্যুৎঝলকের মতন যুগের আঁধারকেও লুপ্ত করে দেয় মুহূর্তে, কিন্তু না এলে হাজার সাধ্য সাধনা করলেও মেলে না তার প্রসাদ…

গাইতে গাইতে ওর চোখে জল আসে, কণ্ঠে জেগে ওঠে এক নবস্পন্দ যেন আলো হয়ে। এক একবার চোখ পড়ে প্রেমল ও মা-র মুখে। একজন শান্ত স্থির, অন্যজন জলভরা চোখে হাতজোড় করে মা গঙ্গার দিকে চেয়ে। এমন শ্রোতা পাবার ভাগ্য মানুষের জীবনে তো বেশি আসে না। সত্যিই ভাগ্যবান্ ও। তবু কেন সংশয় বার বার হানা দিয়ে ওর মনের সব আলোকে নিভিয়ে দেয়? কেন ও বিশ্বাসকে বিশ্বাস করতে এত বেগ পায়? কই, গানের সময় তো অবিশ্বাসের লেশও থাকে না—সত্যিই যেন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে সেই দৈবী কৃপাকে—যার ঢল নেমেছে গঙ্গার পাবনী ধারায়! এ আর এক আশ্চর্য—গানের সময়ে ওর মনের মধ্যে কোথায় যেন আলো জলে ওঠে, কিন্তু তখনও আর একটা অংশ যেন চেয়ে চেয়ে দেখে সে আলো—অবাক হয়, সময়ে সময়ে অভিভূতও হয়, কিন্তু থাকে বিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা হয়ে। একই মানুষের মধ্যে পাশাপাশি থাকে দুই দ্রষ্টা বা চেতনা যা-ই নাম দেওয়া হোক না কেন—নাম নিয়ে তো কথা নয়। আবার গানের পরেই—ঐ ঘোর মেঘ ছেয়ে আসে আলো-কে তখন মনে হয় আবছা স্মৃতিমাত্র! তখন কথা কয় যে মানুষ সে গায়ক সে গান গাইছিল যে মানুষ মানুষটিকে সনাক্ত করতে পারে কি অসিদ্ধ বলে? এক কথায় কোনটা অসল অসিত? যে বিশ্বাস করবে শুধু যে চায় তাই নয়, বিশ্বাস করেই নিজেকে ধন্য মনে করে না, যে বুদ্ধির ঝাঁঝালো অভিমানে বিশ্বাসীর নানা সিদ্ধান্তকে নামঞ্জুর করে ছেলেমানুষী বলে? ক্রমশঃ

কথা বলি, কাজ নাহি করি

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

বেশে শুধু বাবুয়ানা
পকেটে মাত্র তিন আনা
ক্ষুধা তীব্র জঠর দহন,
যেতে হবে বাসে তাই
রেখেছিনু কয় পাই।
বৃথা তায় করিনু বহন।
প্ল্যাটফর্মে রুটি চা
খাব এতে হবে যা
রুটিখণ্ড মুখে দিই তুলে।
ভিখারীরা চারি ছয়
চারিপাশে শুধু কয়
'মোরে দাও' লাজলজ্জা ভুলে।

কুকুর যেমন আমি
রুটি গিলি নাহি থামি
অন্য সব কুকুরে না দিয়ে,
ছবি উঠে কেমেরায়
দূরদেশে তাহা যায়
দেখে সবে কৌতুহল নিয়ে।
ভিক্ষা অন্ন আসে বুঝি
আমাদের স্বপ্ন রুচি
কথা বলি কাজ নাহি করি,
ফেলে এসে জমি জমা
পরি টেরিলিন জামা
নেই খান ভিখ মেগে মরি।

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়—প্রথম বল্লী

নচিকেতার পরলোক সাধন

ভূমিকা—আরম্ভে কঠোপনিষদের বক্তব্য সম্বন্ধে মাত্র গোড়ার কথাটি নিবেদিত হইবে। কঠোপনিষদ ও তাহারই মত জনপ্রিয় ঈশোপনিষদ যজুর্বেদীয় উপনিষদ। যজুর্বেদীয় উপনিষদ দিবসে দ্বিপ্রহরে পালনীয় ও ইহা কর্ম বা যজ্ঞ সম্বন্ধীয়। ঈশোপনিষদে কর্মকে অনুশীলন করিয়া সেই সঙ্গে কি করিয়া জ্ঞান ও ক্রমশঃ অমৃত লাভ করা যায় তাহা বলা হইয়াছে। অপরদিকে কঠোপনিষদে দান যজ্ঞ শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং তাহা কি প্রকারে অমৃতের পথে লইয়া যাইতে পারে তাহা বলা হইয়াছে।

দান কি ভাবে মানুষ করিতে পারিবে? যাঁহারা বিত্তশীল তাঁহারা নিজ বিষয় সম্পত্তি দান করিতে পারেন। যাঁহাদের অর্থ নাই অথচ সাধু ও বিদ্বান, তাঁহাদের নিকট উপযোগী সামগ্রী দানের বিধি সেকালে ছিল। ইহাই দ্রব্যযজ্ঞ, বিশ্বজিৎযজ্ঞ প্রভৃতি বলিয়া আখ্যাত ছিল। গাভী সেকালে টাকার মত ব্যবহার হইত, পণ্য দ্রব্য খরিদ ও বিক্রয়ের জন্য। সেইজন্য তাহা দানের বিশেষরূপ যোগ্য সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত। (যথা বৃহদারণ্যক উপ, ২।।১)

কিন্তু এ প্রকার দান কঠোপনিষদে প্রথমেই গৌণ বলিয়া ধার্য হইল। এসব বাহ্যিক অনুষ্ঠান, ইহার দ্বারা অন্তরলোকে তেমন গভীরভাবে রেখাপাত হয় না। ইহার দ্বারা অন্তরে "প্রতিবোধ" (কেন উপ, ১।২।৪) অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ অল্পই পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া পার্থিব যাহা দান করা যায় তাহা সমস্তই জাগতিক। ঈশ্বরের জিনিষ বলিয়া গণ্য হইলেও তাহা দান করিলে নিজকে ত তখনও পৃথক করিয়া রাখা হয়। অথচ আত্মদান শ্রেষ্ঠদান। নচিকেতার জীবনে এই তাৎপর্য কঠোপনিষদে ফুটিয়া উঠিল। বিষয়দান করা হয় বিষয়ীর হস্তে, বিষয়ী ব্যক্তি বিষয় দান করেন, উভয়েই বিষয়ের মূল্য বুঝিতে লালায়িত। বিষয় যিনি দান করেন, যিনি গ্রহণ করেন ও বিষয় সমস্তই নশ্বর। তাই এ সমস্ত যমের অধীন। যমের অধীন থাকিলে কি প্রকারে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমৃত হওয়া যায়? অথচ অবিদ্যা (কর্ম) দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, বিদ্যা (জ্ঞান) দ্বারা অমৃতের সন্ধান পাওয়া ঈশোপনিষদে বিধান রহিয়াছে (১১ মন্ত্র)। অতএব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইলে অর্থাৎ ছাড়াইয়া যাইতে হইলে, যমের শিক্ষালয়ে ভর্তি হইয়া, তাহাকে গুরু করিয়া, কি ভাবে নশ্বরতা অতিক্রম করা হয় তাহার বিধান লইয়া, সেইমত সাধন করিয়া, তবেই অমৃত পাওয়া যায়। ইহাই তখন প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই ব্রহ্মবিদ্যা অনুযায়ী যে অধ্যাত্মযোগ সম্ভব হইবে তাহাই প্রকৃত আত্মদান, তাহা যে শুধু শ্রেয় তাহা নহে, তাহাই অন্য সকল প্রকার দান যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাই কঠোপনিষদে স্পষ্ট করা হইয়াছে। বালক নচিকেতা যাহাকে কোন প্রকার নশ্বরতা এখনও বিভ্রান্ত বা বিমোহিত করিতে পারে নাই, তিনিই ইহার যথার্থ শিক্ষার্থী হইতে পারেন। এবং যম যিনি মৃত্যুর অধীশ্বর, তিনিই হবেন আচার্য। মানব সমাজ ইহাতে উপকৃত হইবে। কঠোপনিষদ জগতে পরলোক সম্বন্ধে আদি ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক এবং আমাদের ধারণা জগতের সকল ধর্ম বিধানেই পরলোকতত্ত্ব বিচারে ইহার প্রভাব অল্প বিস্তর পৌঁছিয়াছে। ইহা সেই হিসাবে সনাতন ও মানবের চির সহায়।

ঈশোপনিষদ শুক্ল যজুর্বেদীয়। তখন দিবসে উজ্জ্বলতর সময় বলিয়া সকলের পক্ষে হাসিমুখে নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করিয়া অমৃত অর্জন করার সাধ হওয়া স্বাভাবিক। কঠোপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়।

সে সময় কৃষ্ণপক্ষ রাত্রের ন্যায়, দিনের কর্মেও অনেক সংশয় ও সন্দেহ আসিয়া পড়ে ও মন কাজ করিতে শঙ্কিত হয়। অমৃত পাওয়া যাইবে কিনা, সে সম্বন্ধে মন সন্দিহান হয়। তখন কর্ম করিয়া অর্জনের পথ ছাড়িয়া, যাহা উপার্জন করিয়াছি তাহা কোন মতে দান করিয়া, যদি অমৃতত্ব লাভ করা যায়, তাহার জন্য মানুষ অধীর হয়। সে অবস্থায় গরীব ব্রাহ্মণকে গাভী প্রভৃতি দান, বিদ্যালয়ে ধন ধান্য দান, ধর্মসংস্থাতে সাহায্য দান, নানাভাবে মানুষকে অমৃতের সন্ধানে প্রলুব্ধ করে। কর্মের দ্বারা পুণ্য অর্জন নিশ্চয়ই শুভ, তাহার চেয়ে নিজ সর্বস্ব দান নিশ্চয়ই শুভতর, কিন্তু সকলের চেয়ে শুভতম নিজকে অধ্যাত্মভাবে দান। এইবার কঠোপনিষদের উপাখ্যান লওয়া যাউক। কাহিনীর অংশ কঠশ্রুতির প্রথম অধ্যায়ের প্রথমবল্লী। তাহারই জন্য এই ভূমিকা।

প্রথম মন্ত্র (১।১।১)।

মন্ত্র—ওঁ উশন হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥

অর্থ—বাজশ্রবার পুত্র (যাঁহার নাম "উদ্দালক" ১১ মন্ত্রে জানা যাইবে) "সর্ববেদস" অর্থাৎ বিষয় সম্পত্তি হইতে তাহাদের সম্যক জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া, স্বর্গরূপ ফলের কামনায়, যজ্ঞ করিতে বসিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামে পুত্র ছিল।

ব্যাখ্যা—যিনি অন্ন (বাজ) অর্জন করিয়া যশ (শ্রব) বা সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন তাঁহাকে বাজশ্রবা বলা হয়। বৈদিকযুগে মানুষের শ্রেণী বা বর্ণ, অন্ন (material goods) হিসাবে ধার্য হইত। যাঁহার গৃহে অন্ন নাই ও সেই কারণে তিনি অন্নের কাঙাল, তাঁহাকে "শূদ্র" বলা হইত। যাঁহার গৃহে অন্ন আছে, তবুও তিনি আরও অন্নের কাঙাল, তিনি "বৈশ্য" বলিয়া বিবেচিত হইতেন। যাঁহার ভাণ্ডারে অন্নের প্রাচুর্য ও সেই কারণে অন্নের কাঙাল হওয়া দূরে থাকুক, তিনি অন্ন যোগ্যপাত্রে বিতরণ করেন, তাঁহাকে "ক্ষত্রিয়" বলিয়া সম্মান দেওয়া হইত। যাঁহার অন্নের সংস্থান "ব্রাহ্মণ"। তাঁহার আকাশবৃত্তি চলিত অর্থাৎ তাঁহার "যোগক্ষেম" স্বয়ং ভগবান বহন করিতেন। (গীতা, ৯। দ্রষ্টব্য)।

এখানে বাজশ্রবা কোন বর্ণের বলিয়া পরিগণিত হইবেন? তিনি অন্ন সংগ্রহ করিয়া বৈশ্যভাবেই জীবনযাপন করিলেন। তাঁহার পুত্র উদ্দালক সে পথ ছাড়িয়া দিয়া অন্ন বিতরণ ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইলেন। পরে দেখা যাইবে, উদ্দালকের পুত্র নচিকেতা যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া যমালয়ে গণ্য হন।

উদ্দালককে রাজা বলা চলে। তিনি "সর্ববেদস" হন। "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" (গীতা, ২।৪৫) অর্থাৎ তিন গুণ হইতে যে সংসার উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বেদ প্রকাশ করেন। সেই অভিজ্ঞতা যিনি হৃদয়ে ধারণ করেন তিনিই জানিতে পারেন যে বিষয় সম্পত্তি মূলতঃ তিন গুণের ফল এবং এই জ্ঞান অন্তরে যতই বৃদ্ধিলাভ করে ততই তিনি ত্যাগশীল হন অর্থাৎ বিষয় তাঁহাকে ত্যাগী হইবার সুবিধা প্রদান করে। তখন বিষয়ের কাজ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সকল সম্পত্তি দান করিতে তিনি উন্মুখ হন।

উদ্দালকের পিতা বাজশ্রবা অর্থ উপার্জন করিয়া সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া বলা যায়, তিনি বিশ্ব জয় করিয়াছিলেন। ইহা কর্মের পরাকাষ্ঠা। তাঁহার পুত্রের আর কিছুই এ সংসারে জয় করিবার রহিল না অথবা জয় করিবার প্রবৃত্তি রহিল না, বলা যাইতে পারে। কাজেই সেই পুত্র উদ্দালক তখন পিতা কর্তৃক ইহলোক জয় হইয়াছে বুঝিয়া, পরলোক বা স্বর্গ জয় করিবার জন্য বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই যজ্ঞে, যাহা কিছু পূর্বে লাভ হইয়াছে, সমস্ত ধন সম্পদ দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণকে বিতরিত হইত ও তবেই স্বর্গ জয় হইতে পারিত বলিয়া তিনি তাহাই নিষ্পন্ন করিতে বসিলেন। নচিকেতা ভাবিলেন, ঠাকুরদাদা ও পিতার কৃতকর্ম অনুযায়ী ইহলোক ও পরলোক সবই জয় করা হইল। কিন্তু সব যে জয় হইয়া গেল তাহা নচিকেতা মনে করিলেন না।

নিঃশেষ হইলে পর আত্মদান হইয়া যায়। তিনি আরও দেখিলেন যে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ যাহা করিয়াছেন তাহা সমস্তই আত্মদানের পন্থার নির্দেশক এবং তাহাই সব চেয়ে গরীয়সী। নচিকেতার এইরূপ মর্মের ভাব দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রকাশ পাইবে।

("বাজশ্রবা" নামের অর্থ নির্ণয় হইয়াছে। "উদ্দালক" ও "নচিকেতা" সেইভাবে বুঝিতে হয়। উদ্দালক বলিতে "ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করিয়া, যিনি দান করিয়া সর্বস্ব লয় করেন" তাঁহাকে বুঝায়। নচিকেতা শব্দ "নচিকেতস্" হইতে নিষ্পন্ন হয়। নচিকেতা নামের অর্থ যিনি "নঃ" অর্থাৎ "আপনার বলিতে যাহা কিছু সমস্তই" অর্চনা (যজ্ঞ) দ্বারা নিবেদন করিয়া অনিকেত হন, তাঁহাকে জ্ঞাপন করে। নিজের মনে যেমন বুঝিয়াছি তাহাই অকুণ্ঠিতচিত্তে জানাইলাম। এইভাবে নামগুলির অর্থের মধ্যেই তিনজন মহাপুরুষের জীবনের লক্ষ্য ও ধর্ম খুঁজিয়া পাওয়া যায়।) [ক্রমশঃ]

প্রীতি-ডোর

(১)

পথের পাশের সরাইখানায়
তুমি আমি কথা কই ;
যুগল প্রাণের সুধা-সার যত
যুগলে যে চেখে লই ;
সময় কাবার হ'লেই আবার
পথের পথিক হই।

(২)

এ ভাবে মিলন হয় শতবার
বরষায় শীতে পথে ;
তা'র স্মৃতি-বাস কভু কি জীবনে
ভোলা যায় কোন মতে ?
তাই মোরা পাই প্রাণে যে প্রেরণা
মাতিতে চলারই ব্রতে।

(৩)

পথই ভালো জানি, ভালো নয় ঘর,
ঘরে প্রীতি হবে ফিকে ;
যাবে না যে চেনা পথে না নামিলে
চির-ধ্রুব-তারাটিকে।
চলিতে চলিতে সচল মন্ত্র
এ ভাবেই লই শিখে।

(৪)

পথে দেখা হ'লে সরাইখানায়
বসিবো যে মুখোমুখী ;
দুজনে দোঁহার দুখে পাবো দুখ,
সুখে হবো দোঁহে সুখী
পথের প্রবাহে মিলন-মাধুরী
পুনরায় যাবে চুকি'।

(৫)

এমনি করিয়া এ জীবন শুধু
পান্থ-নিবাসে—পথে
যেন কেটে যায়, চলার ধারায়
মিলেমিশে কোন মতে ;
প্রীতির আরতি যেন নিয়োজিত
রাখে জীবনের ব্রতে।

(৬)

তুমি আর আমি—পথ আর চটি
বাঁধা যে প্রীতির ডোরে ;
চন্দ্র—সূর্য আমাদেরই সাথে
চলিছে গতির তোড়ে ;
নিরবধি-লীলা মাতাল করিয়া
রাখে যে তোমারে মোরে।
বিশ্ব-ভুবন মোদের ঘিরিয়া
প্রেমাবেশে বুঝি ঘোরে !
পথে আর ঘরে প্রীতি-ফুল যত
ফোটে আর যায় ঝ'রে।
কী মজা ! কী মজা পথে—চটিতে
জীবন কাটাতে ওরে !

কয়েদ

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছে সুন্দর। তিন রাত তিন দিন। থাকবার সায় পায় নি মনের কাছ থেকে একবারের জন্তেও। যার জন্তে থাকা তপোবন গ্রামে, তাকে হারিয়ে থাকাটা অসম্ভব তার পক্ষে।

ডালপালাসার রোদে পোড়া জামগাছটার দিকে ফিরে তাকাল। দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো গোমরানো ব্যথার তলা থেকে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে বুকের ভিতর। কুঁড়ে ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। নির্বিকার। ভিতরের যে মানুষটা তিনদিন আগে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে ওই ঘরেরই মাটির মেঝেয়, তার জন্ত কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সযত্নে ওই মেঝে নিকাতো রোজ নির্মলা। একনাগাড়ে প্রায় বিশ বছরের বাসিন্দা ছিল ওই ঘরেরই সে।

চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে সুন্দরের। নির্মলার জন্তেই শুধু এ-গ্রামে এসেছিল। থেকে গিয়েছিল। তার কথা শুনলে এভাবে অকালে মরতে হত না হয়তো নির্মলাকে। অন্ত গ্রামে চলে যেতে বলেছিল। অনুরোধ করেছিল। বুঝিয়েছিল, দেশে আকাল এসেছে। খরাগ্রামে আগুন জ্বলছে বাতাসে, মাটিতে, জলেতে। সে-তাপে লোকের পেট জ্বলছে, বুক জ্বলছে। পাতকুয়ো পুকুর নদীর জল শুকিয়ে চৌচির হয়ে মাটি ফাটছে। তেষ্টায় লোকের ছাতি ফাটছে। জলের জন্তে গ্রামের লোকদের সঙ্গে নিয়ে নদীর তলায় আরো আট ফিট গর্ত খুঁড়ে জল বার করেছে সে। তবুও সকলের তেষ্টা মেটাতে ও-জল যথেষ্ট নয়।

গ্রামের অনেকেই তার কথা শুনে, বাঁচবার জন্তে অন্ত গ্রামে চলে গিয়েছে। যারা আছে, পিতৃভিটে শ্বশুরভিটে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। জীবনের শেষ দিনটিতে পূর্বপুরুষদের মাটির বুকেই নিজেদের নিঃশেষ করতে চায়। এ-সবের বালাই নেই নির্মলার। তবুও স্থান ত্যাগ করতে চায়নি সে। স্থান ত্যাগের বাধা অবিশ্যি ছিল। বিশেষ ধরণের বাধা সেটা। সেইজন্তই একটা মর্মান্তিক মরণের জিদ পেয়ে বসেছিল বুঝি তাকে।

এ-গ্রামে আসার আগে অন্ত একটা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল প্রথমে নির্মলা। সহর থেকে দূরে—অনেক দূরে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। কম লোকের বাস। নির্জনে নিজেকে আত্মগোপন করে রাখবার সুবিধে হবে। আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জনের চোখের আড়ালে মনের আড়ালে থাকবে, যে কটা দিন বাঁচে। কেউ যেন কোনো দিন কোনো সন্ধান না পায় তার।

নির্মলার খোঁজ কেউ পায় নি। আসলে তার খোঁজ করতে কেউ হয়তো চেষ্টা করে নি কখনো। তবে কারণও ছিল। নির্মলা ইজ্জতদার বড়ঘরের মেয়ে। বড়ঘরের বৌ। যা কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে, তাতে নির্মলাকে আপনজন বলে পরিচয় দেওয়া কোনো সম্মানী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবও ছিল না। এসবের মূল কারণ ছিল সুন্দর।

একদিন মনে প্রাণে চেয়েছিল সুন্দর, নির্মলা দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্তে চলে যাক। অনেক নির্যাতন মুখ বুঁজে সয়েছে নির্মলা। অনেকবার তার কাছে এসে সজলনয়নে আবেদন নিবেদন করেছে তার স্বামীকে বাঁচাতে। আবেদন শুনে, আরও ধ্বংসের গহ্বরে টেনে ফেলে দিতে ইচ্ছে করেছে তার স্বামীকে। ইচ্ছে পূরণ করেছেও সুন্দর।

এরপর আর দেখা পায় নি নির্মলার সুন্দর। ভুলে

গিয়েছিল সে নির্মলাকে। ভুলে গিয়েছিল তার স্বামীকে। অবিশ্যি চারদিকে তাদের স্মৃতির মাঝখানে বসে থেকে ভুলতে চেষ্টা করার অভ্যাস করতে হয়েছিল দিনের পর দিন।

নির্দয় ধাতুতে গড়া সুন্দরের মন সবকিছু কিছু-দিনের মধ্যেই ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ভুলতে পেরেছিল কি তাকে নির্মলার সরলপ্রাণ স্বামী হরনাথ? ভোলে নি বোধ হয়। কিংবা ভবিতব্যের বন্ধনের জন্যেই দশ বছর পরেও দেখা হল আবার হরনাথের সঙ্গে।

যে পরিস্থিতিতে যে পরিবেশে যে মূর্তিতে দেখেছিল সুন্দর, বাস্তবকে ভুলতে বসেছিল। সবই অসম্ভব মনে হয়েছিল। তার শিয়রে দাঁড়িয়ে হরনাথ। তবু বিশ্বাস করতে পারে নি। চোখ মুছে বার বার তাকিয়ে দেখেছিল। স্বপ্ন দেখছিল বুঝি! চোখকে অবিশ্বাস করছিল। তার কণ্ঠস্বর শুনেও কানকে অবিশ্বাস হচ্ছিল। ঠিক দেখছে তো? ঠিক শুনছে তো?

কাছে বসে, হাতে হাত বুলাতে স্বপ্নের ঘোর কাটল। স্নেহের স্পর্শ ঢেলে দিচ্ছে।

মুখ দিয়ে কথা সরতে সময় লাগছে সুন্দরের। বিস্ময়ের ঘোর ধীরে ধীরে কাটছে। বুকের ভিতর একটা বোবা-কান্না মাথা কুটে মরছে। মাথার মধ্যে দুটো কথা কেবল হাতুড়িপেটা করছে। কি করেছিলাম আমি হরনাথের! কি করল হরনাথ আমার!

অনুতাপে অনুশোচনায় ভিতরের জমাট ব্যথা গলছে। চোখের কোণ টন টন করে উঠছে সুন্দরের। ব্যথাগলা চোখের জল দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়ল।

একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল হরনাথ। অস্বস্তি বোধ করছে। শশব্যস্তে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে রুমাল বার করল। চোখ মুখ মুছিয়ে দিতে লাগল সন্তর্পণে।

দুদিন আগের নৃশংস রাতের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল সুন্দরের। শিউরে উঠল। সেই ভয়াবহ দৃশ্য যেন পেয়ে বসেছে। সুন্দর আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভুলতে। পারছে না। থেকে থেকে গলাটেপা ত্রাসটা দম বন্ধ করে দিতে এগিয়ে আসছে। তাই মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। শিউরে উঠছে।

ডাক্তার-নার্স—সকলেই মনকে অন্য চিন্তায় ঘুরিয়ে রাখতে বলছেন। মন কিন্তু কিছুতেই ঘুরতে চাইছে না। ঘোরাবার চেষ্টা করলে আরো বেশী করে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ছে আবার।

ব্যবসার খাতিরে পুণায় যাচ্ছে সুন্দর। ট্রেন চলছে। যাত্রীদের সর্ব শরীর দুলছে। কামরার হাসি মস্করা কথার গুঞ্জন থেমে গিয়েছে। ঘুম নামছে সবার চোখে। গভীর রাত। হঠাৎ নারী-পুরুষ-শিশু কণ্ঠের করুণ আর্তনাদে চোখের ঘুম পালাল। বুক কেঁপে উঠল। যাত্রীরা দুর্ধর্ষ ডাকাতদের সম্পূর্ণ কবলে।

যাত্রীর ছদ্মবেশে পাশাপাশি বসেছিল ডাকাতেরাও। সুযোগ সুবিধে বুঝে এক একজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক একজনের ওপর। কারো নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। ইস্পাত-কঠিন দেহ সুন্দরের। কিন্তু সে-দেহও ধস্তা-ধস্তিতে কাবু হয়ে যেতে লাগল। দুর্বল হয়ে পড়ছে। পা দুটো অবশ হয়ে আসছে। টলে পড়বে বুঝি সে। টলে পড়বার আগেই শেষ চেষ্টা তাকে করতেই হবে। চেনের দিকে হাত বাড়িয়েছে, আচমকা পিছন থেকে মাথায় আঘাত হানল যেন কে সজোরে। মুহূর্তে ঢলে পড়ল সুন্দর। অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে সে।

জ্ঞান যখন হল, তখন বুঝতে পারল হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। চতুর্দিকে ঘিরে আছে নার্স ডাক্তার। পরে অ্যাটেন্‌ডেন্ট নার্সের কাছে শুনেছিল সব। মাথায় সেলাই হয়েছে। প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে। মরণের পথ থেকে এ-যাত্রা ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে হরনাথেরই দয়ায়। তার রক্ত দেওয়ার জন্যে। বরাত ক্রমে আশ্রমের কাছাকাছি জায়গায় ডাকাতিটা হয়েছিল তাই রক্ষে। তাই হরনাথকে পাওয়া গিয়েছে। যাত্রীদের মরণকান্নার আওয়াজ শুনে ছুটে চলে আসে হরনাথ। সহরের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আহতদের।

নার্সের কাছে হরনাথ নামটা শোনে নি সুন্দর। শুনেছিল, জ্ঞানানন্দ মহারাজই তাকে বাঁচিয়েছেন। মনে মনে না দেখা জ্ঞানানন্দ মহারাজের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। নার্স জ্ঞানানন্দ মহারাজের কাহিনী শুনিয়েছে। মহারাজ গরীবের

মা-বাপ। অমায়িক মিষ্টভাষী। প্রায় গাঁয়ের রুগী আতুরদের হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তাদের ফল দেন, মিষ্টি দেন, ওষুধ দেন। দরকার হলে নিজের গায়ের রক্ত দিয়ে বাঁচাতে চেষ্টা করেন। উনি নররূপী দেবতা।

সত্যিই দেবতা হরনাথ। তার বাল্যবন্ধু হরনাথ। তার কাছে প্রবঞ্চিত হরনাথ। হরনাথের মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখে দেখেছে। দেখছে দেখছে আর দেখছে।

রাগ-দ্বেষ-প্রতিহিংসার লেশ মাত্র মুখে চোখে নেই। সৌম্য সুন্দর শান্ত মুখে অপূর্ব জ্যোতি। হাসছে হরনাথ। বলছে চিন্তার কিছু নেই তোমার। শীগগির ভালো হয়ে উঠে বাড়ী ফিরে যাবে। ডাকাতেরা তো সব লুটেপুটে নিয়েছে। খাবার ব্যবস্থার ভার আমার ওপর। দুদিন একদিন ছাড়া আসবো।

চলে গেল হরনাথ।

অনেক কথা কইতে চেয়েছে সুন্দর। পারে নি। গলা দিয়ে স্বর বেরোয় নি একটুও। তার কি করল হরনাথ! সে কি করেছিল হরনাথের! এইসব কথাই মনের ভিতর তোলপাড় করছিল কেবল।

সুন্দর হরনাথকে জেলে পর্যন্ত পাঠিয়েছিল।

সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ব্যবসায় নামিয়েছিল। ব্যবসার মালিক হরনাথের চার পাঁচ বছরের মধ্যেই ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়। ব্যবসার দেখা শোনা—সমস্ত ভারই ছিল সুন্দরের ওপর। সাদা কাগজেও সই করিয়ে নিয়েছিল সুন্দর। কখন কি দরকার লাগে হরনাথের অনুপস্থিতিতে। একটায় সই চাইলে, হাসতে হাসতে দু তিনখানা কাগজে সই করে দিত নিজে হতে হরনাথ। বলত, বাইরে থেকে ফিরতে যদি বেশী দেরী হয়ে যায়।

হ'ক না। আমার জমিটা বন্ধক রেখে না হয় চালিয়ে নেব।

হাসত হরনাথ। পিঠ চাপড়ে বলত, আমি বেঁচে থাকতে তা কোনো দিনই হতে দেব না।

সেই হরনাথের গাড়ী বাড়ী—সব কিছু বন্ধক রাখার দায়ে বিক্রি হয়ে গেল। সাদা কাগজের সইকে হাতিয়ার করেই সুন্দর সব করা'ল। হরনাথের সমস্ত সম্পত্তি হাত-ছাড়া হয়ে গেলেও পাওনাদারদের হাত থেকে রেহাই পেল না। তাদের ঋণ শোধ হয় নি সম্পূর্ণ। বাকি ঋণের টাকা শোধ করতে না পারায় জেলে যেতে হল শেষ অবধি হরনাথকে।

হরনাথকে বাঁচাবার জন্যে, জেল হওয়া বন্ধ করবার জন্যে সুন্দরের কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল নির্মলা। ওকে বাঁচান বাচ্চাটার মুখ চেয়ে। বড় হয়ে কি পরিচয় দেবে বাচ্চা ওর বাপের? জেল ফেরৎ আসামী?

জোরে হেসে উঠেছিল সুন্দর। জ্বলছে নির্মলা। তার জ্বালা জুড়াবে। এই মেয়ের রূপের আগুন তাকে জ্ঞানহারা করেছিল একদিন। বিয়ে করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। অবস্থা খারাপের জন্যে ঘরে আনতে পারল না ওকে। ওর বাপও বিয়ে দিতে রাজী হল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে কোনো উপায়ে অবস্থা ফেরাতেই হবে। ওকে ঘরে আনবেই সে একদিন না একদিন।

কিন্তু বিধি বাধ সাধল। তার অবস্থা ফেরার আগেই নির্মলা চলে গেল হরনাথের ঘরে। সব রাগ ঝাঁপিয়ে পড়ল হরনাথের ওপরেই তার। হরনাথ সব জেনে শুনে একাজ করে বসল কেন? বাল্যবন্ধুর কি এই কাজ!

বাপের অনুরোধ এড়াতে চেষ্টা করেও পারে নি হরনাথ। হরনাথের একথা মেনে নিতে পারে নি সুন্দর। মনে হয়েছিল, শয়তানের আত্মরক্ষা করার ছল এটা! প্রতিহিংসার আগুন মাথায় বুকে দাউ দাউ করে জ্বলতে সুরু করেছিল। সুযোগ খুঁজছিল সুন্দর হরনাথকে বিপদে ফেলবার।

বিপদে পড়ল হরনাথ বাপের মৃত্যুর পর। সুন্দরের মতলবে ব্যবসার ফাঁদে পা দিয়ে।

সুন্দরের ব্যবহারে কোনো দিন টের পায় নি হরনাথ—সুন্দর একটা প্রতিহিংসায় বাঘকে গোপনে মনের কোণে পুষে চলেছে ধীরে ধীরে। টের পেতে দেয় নি সুন্দর নিজে। এটা তারই কৃতিত্ব।

হরনাথকে সর্বস্বান্ত করেছে সুন্দর। আনন্দে ভরে উঠেছে মন। বেশী আনন্দ হচ্ছে নির্মলার অসহায়

অবস্থা দেখে। বিপাকে পড়ে আসতে হয়েছে নির্মলাকে তার কাছে।

অপলক চোখে তাকিয়ে আছে নির্মলার দিকে সুন্দর। নির্মলা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে উত্তরের প্রতীক্ষায়।

বলল সুন্দর, হরনাথের জেল কেউ রুখতে পারবে না। স্বয়ং ভগবান এলেও না। অন্যায়ের সাজা পেতে হবেই ওকে। পাওয়াও উচিত। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ভাবনা কি? রাণীর মতো এখানে থাকবে বাচ্চাকে নিয়ে।

দুকানে হাত চেপে সুন্দরের বাড়ী থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল নির্মলা।

তারপর বছর দশেক ধরে ওদের সম্পত্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করেও, ওদের ভুলে থেকেছে। ভুলে থেকেছে নির্মলাকে সুন্দর। ভুলে থেকেছে হরনাথকে। হরনাথের সঙ্গে দেখা হবে কোনো দিন ভাবতেও পারে নি। যে রকম আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান হরনাথের—জেল খালাসের পর নির্ঘাৎ আত্মঘাতী হবেই ও।

কিন্তু দেখা হল অবার হরনাথের সঙ্গে সুন্দরের। সেই আগেকার মানুষটাকেই দেখল নতুন করে সুন্দর। এ-মানুষটা তাকে ক্ষমা করে ক্ষমা চাইতে দিলে না একবারো।

ক্ষমা চাইবারও যোগ্য নয়। মনে হল সুন্দরের নিজের।

যে ক'দিন হাসপাতালে ছিল, এসেছে হরনাথ। তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিল। দু একদিন ছাড়াই এসেছিল।

সে এপথে এলো কি করে জানতে চেয়েছিল সুন্দর। কোনো কথা বলতে চায় নি হরনাথ। আসার কারণ বলেছিলেন অসীমানন্দ মহারাজ। হরনাথের সন্ন্যাস জীবনের পথ প্রদর্শক।

ভালো হয়ে আশ্রমে গিয়েছিল সুন্দর। অনেক পীড়াপীড়ির পর বলতে বাধ্য হয়েছিলেন অসীমানন্দ মহারাজ। হরনাথের প্রথম গুরু তিনিই যে ভদ্রলোক জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন ওকে। ওর জেল না হলে, জেল থেকে বেরুবার পর আত্মঘাতী হতে যেত না তপোবন গ্রামের রাক্ষুসী নদী মালতীর মায়া-ছড়ানো জলে। এ জলের ওপর শান্ত। কিন্তু পড়লে কেউ ওঠে না। বড় সাঁতারু হলেও না। নীচের দিকে কে যেন টানে। নীচে—আরো নীচে।

কিনারা থেকে অদূরে অশ্বত্থগাছটার নীচে দাঁড়িয়েছিলেন অসীমানন্দ মহারাজ। একটা লোককে নদীর তীর দিয়ে হন হন করে যেতে দেখে মনে কেমন সন্দেহ জেগে ওঠে। দৌড়ে এসে ধরে ফেলেন লোকটাকে। হরনাথকে। হরনাথ তার বুকের ওপরই জ্ঞান হারায় কিছুক্ষণের জন্যে।

পরে অনেক বুঝিয়েছিলেন সংসারে ফিরে যেতে হরনাথকে অসীমানন্দ মহারাজ। ফিরে যেতে চায়নি আর হরনাথ। হরনাথের স্ত্রীকেও খুঁজে বার করেছিলেন অসীমানন্দ। একটা গ্রামের পাঠশালায় ছেলেমেয়ে পড়াচ্ছে নির্মলা।

নির্মলা তখন একমাত্র পুত্র বাচ্চাকে হারিয়েছে। বাচ্চা ওষুধ-পথ্যের অভাবে কালাজ্বরে ভুগে ভুগে কালের কোলে বরাবরের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছে!

স্বামীর আত্মঘাতী হতে যাওয়ার কথা শুনে বলেছিল নির্মলা। ওকে রক্ষে করুন মহারাজ। আমি সর্বান্তঃকরণে মত দিচ্ছি। সবার মঙ্গলের জন্যে ওর জীবন গড়ে উঠুক। আমার জন্যে সংসারে ফিরে আসতে হবে না।

হরনাথের নতুন পথের সন্ধান পাওয়ার জায়গাটা নিজের তীর্থক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে সেই থেকে নির্মলা। তপোবন গ্রামে মালতী নদী থেকে খানিক দূরে জামগাছটার তলায় কুঁড়ে বেঁধে বাস করছে তপস্বিনী নির্মলা।

বাড়ী ফিরে তপোবন গ্রামে এসেছে সুন্দর। নির্মলার সঙ্গে দেখা করেছে। অসীমানন্দ আর হরনাথের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কথাও জানিয়েছে। ওদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। এ রকম অসহনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে আর হবে না। এভাবে তিল তিল করে মরণের পথে এগিয়ে যেতে দিতে পারে না সুন্দর।

সম্পত্তি ফেরৎ দিতে চেয়েছিল হরনাথকেও। রাজী হয়নি। সন্ন্যাসীর জীবনে পূর্বাশ্রমের কোনো কিছু

সম্পর্ক থাকে না। অসীমানন্দই পাঠিয়েছেন নির্মলার কাছে। সম্পত্তি ফেরৎ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে। তিনি কথাচ্ছলে হরনাথকে সুন্দরের প্রথম গুরু বলে যে কশাঘাত করেছেন তাতে তার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে। জগৎ কি, প্রবৃত্তির তাড়না মানুষকে কত নীচে নামায় জেনেছে ভালোরকমে।

খানিক চুপ করে থেকেছে নির্মলা। সুন্দরের আপাদমস্তক দেখেছে একদৃষ্টে। মানুষটার দেহের পরিবর্তন হয়নি বিশেষ। মাথার পিছন দিকটায় একটা দাগ হয়ে গেছে শুধু। সত্যি, মনের পরিবর্তন হলে অনেক কিছু হতে পারে। অনেক কিছু করতে পারে এই লোক।

সাহসে ভর করে যাচাই করতে চেয়েছে। বলেছে, বিষয় আমার ছিল না। বিষয় স্বামীর। ওঁর নামে গ্রামে স্কুল করে দিলে কেমন হয়? সে একটাই হ'ক বা দুটোই হ'ক ওঁর টাকায়?

নির্মলার কথামত কাজ করেছিল সুন্দর। তপোবন গ্রাম সুন্দরের কাছেও তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু তপোবন গ্রাম নয়—পাশের পর পর দুটি গ্রামেও হরনাথের নামে স্কুল করে দিয়েছিল।

যখুনি কোনো সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছে সুন্দর, তখুনি বিফল হয়ে ফিরে এসেছে নির্মলার কাছ থেকে। নির্মলার কোনো বিষয়ে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। গাঁয়ের সকলেই তার অভাব অভিযোগ দূর করে দেয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। ওদের সাহায্য করলেই নির্মলাকে করা হবে।

আর কথা চলে না। নির্মলার কথায় দেবীর আদেশ শুনত যেন সুন্দর।

তপোবন গ্রামে বাস করতে সুরু করে দিল সুন্দর। সঙ্কল্প করল, নিজের সব সঞ্চয় বিলিয়ে দিবে এদের সকলকে। সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতেও লাগল। গ্রামবাসীর কাছে তপোবন-পিতা আখ্যাও পেল সুন্দর। সুন্দর এদের সুখ-দুঃখের সাথী।

জল নেই, জল নেই, জল নেই। নদীর তলা ফুঁড়ে জল বার করে দিয়েছে সুন্দর। তেষ্টার উপশম হচ্ছে অনেকের। কিন্তু নির্মলার কি হচ্ছে? নির্মলা উপোস করে রয়েছে ক'দিন ধরে। জল ছোঁবে না। একটুও না। এক আঁচলা জল নিয়ে এসেছিল সুন্দর নির্মলার কাছে।

গলায় শুকনো তাপটা ভিজিয়ে নিলে কেমন হয়।

পাশের ছেলেটা জিব দিয়ে ঠোঁট চাটছে। ওর মুখে ঢেলে দিন। আমার লাগবে না।

এই দুর্বল দেহে উপোস। জল স্পর্শ করছে না একেবারে। মারা পড়বে যে!

মৃদু হেসেছে নির্মলা। বলেছে, আমি তো এখনো মরমর হইনি। যারা মরছে তাদের আগে দেখুন!

নির্মলার কথা রেখেছে সুন্দর। প্রত্যেকবারের মতো এবারেও। কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি নির্মলাকে।

নির্মলা চলে গেল।

চিতা জ্বলছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে সুন্দর। দেবী কোনো কিছু স্পর্শ করল না তার। চিতা নেবাবারও জল নেই। দু'চোখ জলে ভরে এসেছে সুন্দরের। তার চোখের জলে কি চিতা নিববে? না। এগুতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছে। জীবনে যে কিছু নিল না—মরবার পর তার চিতার ওপর চোখের জল ছিটিয়ে দেবার তার কোনো অধিকার নেই।

নির্মলা নেই। কিন্তু তিন দিন ধরে ভেবেছে শুধু সুন্দর। এখন কি করবে? একদিন নির্মলার আরজি অগ্রাহ্য করে যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল সুন্দর তার জীবনে, সে বিপর্যয়ের ক্ষতি, চেষ্টা করেও কোনো পূরণ করতে পারেনি। এতদিন একটা শান্তি ছিল দেবীর আদেশ পালনে হয়তো তার অন্যায়ের দিকটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিধাতার বিধানে সে শান্তিটুকুও থাকল না আর।

স্থির করল সুন্দর চলে যাবে। গ্রাম ছেড়ে যেখানে দুচোখ যায়—অনির্দিষ্ট পথে পাড়ি দেবে।

চলেছে সুন্দর। পা চলছে না। চলতে চাইছে না। জোর করে টেনে টেনে চলছে তবুও। আকাশে কালো মেঘ আসছে। আসছে আর যাচ্ছে। মেঘের এই রহস্য চলছে নির্মলা মরবার দিন থেকে। গ্রামের সীমান্ত বরাবর এসে দাঁড়িয়েছে সুন্দর। জামগাছের তলায় কুঁড়ে ঘরটা এখনো চোখে পড়ছে।

গ্রামের পিতাকে যেতে দিতে চাইছে না ছেলেমেয়েরা

দল। সুন্দরের পিছু পিছু তারাও চলেছে। চোখের জলে ফিরে আসতে অনুরোধ করছে ওরা বার বার। সুন্দরের শুনলে চলবে না। সুন্দর বধির হয়ে গেছে যেন। কেন এসেছিল এ-গ্রামে? কেন চলে যাচ্ছে? এসব কথা কোনো দিন কাউকে জানাতে পারবে না সুন্দর। মুখ ফুটে বলতে পারবে না। সুন্দর এসেছিল প্রায়শ্চিত্ত করতে। প্রায়শ্চিত্ত করা হল না। তাই চলে যাচ্ছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। জমাট অন্ধকার। পাশের মানুষ দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি নামছে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে। থামল ঝড়। মাটি আঁকড়ে শুয়ে আছে সুন্দর। শুয়ে আছে ছেলেমেয়েরা। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। সুন্দর উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠেছে সকলে। বৃষ্টিতে ভিজে শরীরের উত্তাপ জুড়াচ্ছে। চামড়া দিয়ে, রক্ত দিয়ে মজ্জা হাড় শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে দেবতার দান শুষে নিচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দেখছে সুন্দর নির্মলার চিতাভস্মে জল ঢালছে যেন দেবতারা।

ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরে দাঁড়িয়েছে সুন্দরকে। আনন্দে নাচছে, গাইছে তারা। গ্রাম-পিতাকে যেতে দেবে না কিছুতেই আর। তাদের সুদিন এসেছে আবার।

বিদ্যুতের আলোয় দেখছে সুন্দর। কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে নির্মলা। নির্মলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে বৃষ্টি-ভেজা বাতাসে। স্পষ্ট শুনছে সুন্দর। ওদের সাহায্য করলেই নির্মলাকে সাহায্য করা হবে।

বৃষ্টি পড়ছে।

সুন্দরের দুচোখ উপচে জল ঝরছে। ছেলেমেয়ের দল গোল করে ঘিরে ধরেছে সুন্দরকে। কোনো দিক দিয়ে যাতে পালাতে না পারে। সুন্দরকে নিয়ে আসছে ওরা। আসছে সুন্দর।

সুন্দর দেখছে। এখনো দাওয়ায় দাঁড়িয়ে নির্মলা। নির্মলার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে।

অনেক দিনের অনেক কথা

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

অনেক দিনের অনেক কথা
        ভেবেছিলাম বলবো,
আসবে যখন আমার দ্বারে
        হয়তো নাহি ছলবো।
ভুলতে আমি চাইব যতই
        ততই ভালোবাসবে,
কপট-ক্রোধে না হয় খানিক
        মুখটি ফিরে হাসবে।
আবার যখন অবাক চোখে
        দেখবো তোমার সজ্জা,
পলাশ-নয়ন মুদবে তুমি
        হয়তো পেয়েই লজ্জা।

তোমার কাজল দু' চোখ ঘিরে
        আমার ছবি ভাসছে,
প্রেমের আলোয় মনের কালো
        ক্রমেই যেন নাশছে!
বকুল ফুলের অনেক মালা
        যতন ক'রে গাঁথলে,
অবুঝ আমার এ মনটাকে
        হৃদয় দিয়ে বাঁধলে।
হারিয়ে গেলাম তোমার মাঝে
        হারিয়ে গেলাম আমি,
আমার ভুবন ভরিয়ে দিও—
        আমার দিবস-যামী।

খাদ্য সমস্যার সমাধানে একটি প্রস্তাব

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল

আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ, তাহার পূর্ব এবং পশ্চিমের কিয়দংশ খণ্ডিত করিয়া স্বাধীনতা লাভের পর, বিংশ বৎসর অতিক্রম করিতেছে। কিন্তু, ভারতবাসীগণের পরম দুর্ভাগ্য এ পর্যন্ত, মানবজীবনের সর্বপ্রথম প্রয়োজন যে খাদ্য, তাহার কোন সমাধান সম্ভব হয় নাই। বরং খাদ্য সমস্যা ক্রমশঃ জটিলতর রূপ ধারণ করিতেছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যা নানা কারণে জটিল। তন্মধ্যে প্রধান কারণ (১) বঙ্গ বিভাগ। স্বাধীনতা—পূর্ববঙ্গদেশের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দ্বিতৃতীয়াংশ জমি একটি ধর্মান্ধরাষ্ট্র সৃজনে উপহার প্রদানে বাধ্য হইয়া মাত্র একতৃতীয়াংশ জমি গ্রহণে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ, পৃথিবীর একটি জনবহুল প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর পররাষ্ট্রগত দ্বিতৃতীয়াংশ জমির উদ্বাস্তু জনগণের চাপ বিংশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে এবং কতদিনে ইহার শেষ হইবে তাহাও অজ্ঞাত! (২) পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রধান অঞ্চলের শিল্পপতিগণ প্রায় সকলেই অবাঙ্গালী। তাহাদের শ্রমিক ও কর্মচারীর একটি বৃহত্তম অংশ অবাঙ্গালী। এজন্যও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ চলিতেছে এবং চলিবে। (৩) পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। তাহারা প্রায় সকলেই চাকুরী বা কৃষিনির্ভর। শতকরা নব্বইজনের সঞ্চয় বলিয়া কোন কিছু নাই। জীবন রক্ষা করিতে তাহাদের জীবনান্ত হইতেছে। একমাত্র যৌনসঙ্গম ভিন্ন তাহাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দলাভের সম্ভাবনা নাই। এজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি অপ্রতিহত গতিতে চলিতেছে এবং চলিবে। (৪) পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষর জনগণের হার গড়ে ২৯৷২৭ হইলেও, কৃষক শ্রেণী এবং কায়িক শ্রমজীবিগণের শতকরা পঁচানব্বই জন নিরক্ষর। নিরক্ষরতা মানবকে সন্দিগ্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল করে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষক শ্রেণী উন্নততর চাষের প্রয়োজনে যে তাহারা স্বেচ্ছায় সঙ্ঘবদ্ধ হইবে সেই আশা একরূপ দুরাশা। (৫) পশ্চিমবঙ্গের একটি বৃহত্তম অংশে পাট চাষ হয়। (৬) পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জমি এক ফসলী তাহার উপর জলাভাব। এজন্য অধিকাংশ জমি বৎসরের প্রায় ছয় মাস নিষ্ফলা শুষ্ক রুক্ষ অবস্থায় আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। (৭) পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিবার সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে ইহার উদ্ভব। ইহারা বুদ্ধিজীবী, ইহারা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রদূত। বর্তমানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপে ইহারা বেকারী। খাদ্যসমস্যা সমাধানে ইহাদের নিয়োগ ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। কারণ বঙ্গদেশে শিল্প ও বাণিজ্য অবাঙ্গালীর একচেটিয়া সম্পত্তি।

বর্তমান পৃথিবীতে জড় বিজ্ঞানের জয় যাত্রার দিনেও, ভারতের তথা বঙ্গের কৃষককুল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, দীন, দরিদ্র, অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে মান্ধাতা আমলের প্রণালীতে অস্থিচর্মসার গাভী ও বলদ যোগে চাষে নিযুক্ত। অধিকাংশ প্রকৃত চাষীর লাঙ্গল বা গরু নাই। অপরের অনুগ্রহে যেন তেন প্রকারেণ চাষের কার্য সমাধা করে। অন্যান্য সভ্যদেশে যে পরিমাণ জমিতে যে পরিমাণ পরিশ্রমে যে ফসল উৎপাদিত হয়, ভারতে সেই পরিমাণ জমিতে তদপেক্ষা তিন গুণ শ্রমে একতৃতীয়াংশ অপেক্ষা কম ফসল উৎপাদিত হয়। সুতরাং উপযুক্ত পন্থা অবলম্বনে জমিতে দ্বিগুণিত বা ত্রিগুণিত ফসল উৎপাদনসম্ভব।

মানব জীবন রক্ষার্থে নিম্নতম প্রয়োজন—(১) খাদ্য (২) বস্ত্র (৩) আশ্রয় (৪) শিক্ষা (৫) চিকিৎসা।

এই নিম্নতম প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার না দিয়া, পশ্চিমী শিল্পপ্রধান দেশের আদর্শে জীবন মান বৃদ্ধির চেষ্টায় ভোগ্যপণ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়া গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতের শতকরা আশি জনকে সুখের মুখ দেখাইতে পারে নাই। পরন্তু ভারতবর্ষ আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত হইয়াছে এবং প্রধানতম প্রয়োজন খাদ্য সমস্যার সমাধানেও ঋণের আশ্রয় এবং কৃপার আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এজন্য জীবন রক্ষার্থে নিম্নতম প্রয়োজন অপর চারিটিও দুর্জয় সমস্যারূপে দুর্ভাগ্যপীড়িত ভারতবাসীকে প্রতিনিয়ত ক্লিষ্ট করিতেছে। ভারতের গত তিনটি পরিকল্পনা যে শতকরা পনর কি কুড়ি জনকে সুখের মুখ দেখাইয়াছে তাহাদের একাংশ আজ মুনাফাখোরী, মজুতদারী, চোরাকারবারী কর ফাঁকিবাজীরূপে প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা দুষ্প্রাপ্যতা সংঘটন করিয়া দীন দরিদ্র ভারতবাসীগণের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া মৃত্যুর দিকে লইয়া চলিয়াছে। খাদ্য সমস্যার সমাধান ভিন্ন ইহার প্রতিকার অসম্ভব। খাদ্য সমস্যার সমাধান একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির পথেই সম্ভব।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দ্বাদশবর্ষের ঊর্দ্ধ্বকাল সমস্ত প্রকার মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু কি ফল লাভ হইয়াছে? পূর্বে জমিদারগণ বা মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ যেরূপ খাজনাদি আদায় করিতেন বর্তমান রাজ্যসরকার তদপেক্ষা বহুগুণ অর্থব্যয়ে সেই খাজনাদি আদায় করিতেছেন। চাষের উন্নতি হয় নাই। শিক্ষার উন্নতি যে সামান্য হইয়াছে তাহার ফলে আজন্ম কৃষকের পুত্র কৃষিকার্যে বীতস্পৃহ হইয়া সহরে সহরে চাকরীর সন্ধানে ঘুরিতেছেন। পল্লী অঞ্চলের দুর্দশা বাড়িয়াছে। পল্লীবাসী নিরক্ষর নর-নারী বর্তমানে রাজনৈতিক ঘূর্ণিবায়ুর আক্রমণে বিভ্রান্ত হইতেছেন। ছাত্রসমাজ বিশৃঙ্খলতা উচ্ছৃঙ্খলতার রথে আরোহণ করিয়া টেবিল চেয়ার ভাঙ্গিতেছেন। অভিভাবক এবং শিক্ষকবর্গ ভীত ত্রস্ত। ইহার মূলেও ঐ খাদ্য সমস্যা ও সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক অবনতিজনিত হতাশা।

বর্তমান সময়ে খাদ্য সমস্যার সমাধানে মনীষীগণ একমাত্র সমবায় প্রথায় যান্ত্রিক সাহায্যে চাষ এবং সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অসম্ভাব্য যে সকল উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা আছে তাহার অপসারণ করিবার কথা বলিয়াছেন। সমবায় প্রথায় চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন ভিন্ন অন্য কোন পথের নির্দেশকে দান করিতে পারেন নাই।

বর্তমান ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা—(১) সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা (২) সার ও কীটঘ্ন বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা (৩) উত্তম বীজের অভাব (৪) উত্তমভাবে চাষের অভাব (৫) চাষীগণের সন্দিগ্ধচিত্ততা (৬) রাজনৈতিক অপপ্রচার (৭) স্বার্থবাদীগণের প্রতিক্রিয়াশীলতা (৮) সর্বোপরি আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা।

ঐ সকল বাধা অপসারণ জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকগণকে ব্যক্তিগতভাবে ঋণদান দিবাদ্বিপ্রহরে আতপতপ্ত মরুভূমিতে জলসিঞ্চনে শীতল করার চেষ্টার মত পণ্ডশ্রম। বর্তমান অবস্থায় কৃষকগণ সকলে সমবায় সমিতি সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চাষে ব্রতী হইবেন, ইহাও একটি অবাস্তব চিন্তা। সুতরাং রাজ্য সরকারের স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইয়া কোন কোন স্থানে অথবা প্রতি থানা অঞ্চলে একটি করিয়া আদর্শ সমবায় সমিতি আইনানুগ পন্থায় স্থাপন ভিন্ন, সমবায় চাষের পরিকল্পনাকে রূপ দানের চেষ্টা আকাশকুসুম মাত্র।

এই লেখক যে সমবায় চাষের পরিকল্পনা দিতেছেন তাহাতে কোন চাষীর মালিকানা স্বত্বের বিলোপসাধিত হইবে না। তাহার জমির স্বত্ব সেই জমির মূল্যানুযায়ী সেয়ারে বা অংশে রূপান্তরিত হইবে। এই সেয়ার, জমির বিক্রয় বন্ধক প্রভৃতির মত, হস্তান্তর-যোগ্য থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে আইন প্রস্তুত করিতে হইবে। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ভিন্ন বর্তমান অবস্থায় শুধু উপদেশ বা অনুরোধে খাদ্যসমস্যার সমাধান হইতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার খাদ্যসমস্যার সমাধানে রেশন ও কণ্ট্রোলকে হাতিয়ার করিয়া প্রধানতঃ তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন। ফলে চোরাকারবারীতে প্রদেশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে তাহার রেশ চলিতেছে। সুতরাং আইনের সাহায্যে সমবায় প্রথায় চাষ-এর প্রবর্তন করিয়া কয়েকটি আদর্শ সমবায় সমিতি

স্থাপন ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। আদর্শ সমবায় সমিতি স্থাপন জন্য কিরূপ আইন আবশ্যক তাহা রাজ্যসরকার স্থির করিবেন।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে আদর্শ সমবায় কৃষি সমিতি গঠিত হইতে পারে—

১। রাজ্যসরকার স্বয়ং প্রতি থানা অঞ্চলে কম বেশী ৫০০ পাঁচশত একর জমি আইনমতে গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে একটি আদর্শ সমবায় কৃষি সমিতি স্থাপন করিবেন। বর্তমান বাজারদর অনুসারে গৃহীত জমির মূল্য ধার্য হইবে। ঐ সকল জমির মালিকগণ জমির মূল্য নগদ টাকায় পাইবেন না। ঐস্থানে যে সমবায় কৃষি সমিতি গঠিত হইবে সেই সমিতির সেয়ারে (অংশে) ঐ মূল্য রূপান্তরিত হইবে। প্রতি সেয়ার (অংশ) মূল্য ৫৲ (পাঁচ) কি ১০৲ (দশ) টাকা হইবে। প্রতি মালিকের গৃহীত জমির মূল্য যাহা হইবে তাহাকে প্রতি অংশমূল্য দ্বারা ভাগ করিলে যে অংক হইবে জমির মালিক ততগুলি সেয়ার বা অংশ পাইবেন। অংশমূল্য দ্বারা ভাগ করিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা মালিকগণ নগদে পাইতে পারিবেন অথবা একটি পূর্ণ অংশ খরিদ জন্য বাকী টাকা দিতে পারিবেন। ঐ সকল সেয়ার হস্তান্তর যোগ্য এবং পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ যোগ্য থাকিবে। রাজ্যসরকার সমিতি পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবেন।

২। উক্ত আদর্শ কৃষি সমবায় সমিতির মালিকগণের অংশমূল্য যাহা হইবে রাজ্যসরকার অন্ততঃ সেই পরিমাণ অংশ ক্রয় করিবেন। রাজ্যসরকার প্রদত্ত অংশমূল্য নিকটবর্তী ট্রেজারী বা পোষ্টাফিসে জমা থাকিবে। ঐ অর্থ হইতে প্রারম্ভিক ব্যয়াদি নির্বাহ হইবে এবং পরবর্তী চাষের খরচ ও অন্যান্য সমস্ত খরচ চলিবে।

৩। সমিতির কার্য নির্বাহ জন্য একটি কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হইবে। উহার অর্দ্ধেক সভ্য অংশীদার (জমির মালিকগণ) দ্বারা নির্বাচিত হইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক সভ্য রাজ্যসরকার মনোনীত করিবেন। সমিতির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ও একাউণ্ট্যাণ্ট (হিসাব রক্ষক) নির্বাচিত হইবেন। সভাপতিবাদে সকল কর্মচারী বেতনভোগী হইবেন। শ্রমিকগণ মজুরী দৈনিক হিসাবে পাইবেন।

৪। সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য যে সকল কর্মচারী বা শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে তাহা স্থানীয় অধিবাসীগণ (সম্ভব হইলে অংশীদারগণের) দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। উহা অসম্ভব হইলে অস্থায়ীভাবে বহিরাগতদের দ্বারা পূরণ যোগ্য থাকিবে।

৫। যে সকল জমির মালিক স্বহস্তে চাষ করেন না তাহাদের জমির মূল্যের শতকরা ১০ (দশ) অংশ ভাগচাষী বা মজুরগণ অংশমূল্যে পাইবেন। বাকী ৯০ (নব্বই অংশ) অ-চাষী মালিকগণ অংশমূল্যে পাইবেন।

৬। সমবায় সমিতির অডিটরগণ সপ্তাহে বা মাসে অন্ততঃ দুইবার হিসাব পরীক্ষা করিবেন এবং ফলাফল উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন। মাসে অন্ততঃ দুইবার সমিতির বৈঠক হইবে।

৭। রাজ্যসরকারের কৃষিদপ্তর যথাসময়ে উত্তম বীজ, সার ও কীটঘ্ন দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিবেন। রাজ্যসরকারের মনোনীত সদস্যগণ যথা সময়ে যাহাতে চাষ হয়, বীজবপন, সার প্রয়োগ প্রভৃতি যথাযথভাবে হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। উপযুক্ত সময়ে সেচ ব্যবস্থার দিকেও লক্ষ্য রাখিবেন। স্থানীয় কালেক্টর সাহেব বা মহকুমাশাসক বা বি, ডি, ও নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করিবেন এবং তাহার ফলাফল পরিদর্শন পুস্তকে লিখিবেন।

৮। সমিতির সেয়ার হস্তান্তর যোগ্য হইলেও উক্ত সেয়ার ক্রয়ের অগ্র অধিকার সমিতির সভ্যগণের থাকিবে। সমিতির কোন অংশীদার (রাজ্যসরকার বাদে) এক নামে পাঁচ কি দশ হাজারের বেশী অংশ রাখিতে পারিবেন না।

৯। ফসল প্রস্তুত হইলে (অর্থাৎ ফসল কাটাই, ঝাড়াই, মাড়াই প্রভৃতি শেষ হইলে) উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ সমিতির অংশীদারগণ তাহাদের অংশ মত পাইবেন। বাকী অর্ধাংশ সমিতির খাজনাদি পরিশোধ জন্য এবং সংরক্ষিত তহবিল জন্য থাকিবে।

১০। কোন স্থানের জমির মালিকগণের অন্ততঃ অর্ধাংশ বে-সরকারীভাবে সমবায় কৃষি সমিতি গঠনের

জন্য আবেদন করিলে রাজ্যসরকার ঐ স্থানের সমস্ত কৃষিজমি গ্রহণ করিয়া জমির মূল্য অংশ মত সেয়ারে রূপান্তরিত করিবেন। অন্যান্য কার্যের জন্য আবশ্যক অর্থের জন্য অতিরিক্ত সেয়ার বিক্রয় করিবেন। সর্বোচ্চ সেয়ার সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকিবে। আবশ্যক মতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। রাজ্যসরকারের কৃষি দপ্তর তাহাদিগকে যথাসময়ে সেচ, সার, উত্তম বীজ প্রভৃতি সরবরাহ জন্য দায়িত্বশীল থাকিবেন। কর্মচারী ও শ্রমিক অংশীদারগণ হইতে (এবং তাহা সম্ভব না হইলে অস্থায়ীভাবে অন্যত্র হইতে) গ্রহণ করিবেন।

১১। যে স্থানে ঐরূপভাবে একাধিক কৃষি সমিতি গঠিত হইবে সেই স্থানে সেচের ব্যবস্থা না থাকিলে পুকুর বা নলকূপ দ্বারা সেচের ব্যবস্থা করণীয় হইবে। শুধু অর্থের অপচয় না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১২। পল্লীগ্রামে গোময়সার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জ্বালানি জন্য গোময় ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইবে। সার হিসাবে গোময়ের মূল্য ধার্য হইলে জ্বালানি হিসাবে গোময় বিক্রী সহজেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

১৩। প্রতি থানা অঞ্চলে উপযুক্ত স্থানে ওয়ার্কসপ (যন্ত্রাদি প্রস্তুত বা মেরামতের কর্মশালা) ওয়ার হাউজ (শস্য সঞ্চয় জন্য গুদাম) ঢেঁকিশালা, তাঁতশালা, ঘানি প্রভৃতি স্থাপনের সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। সমিতির সভ্যগণের ও তাহাদের পরিবারবর্গের অবসর সময়ে কার্যের জন্য কুটীর শিল্প ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্থানীয় চাষীগণের বাস্তুভিটা দশ কাঠা পর্যন্ত নিষ্কর পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগযোগ্য কিন্তু হস্তান্তরের অযোগ্য থাকিবে।

১৪। প্রতি থানা অঞ্চলে নিরক্ষর বয়স্ক কৃষকগণের জন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। কৃষি বিষয়ক শিক্ষাকে অগ্র অধিকার দিতে হইবে। যে সকল শিল্প পল্লীগ্রামে নিত্য প্রয়োজনীয় তাহার সম্বন্ধেও শিক্ষা দিতে হইবে। সরকারী বে-সরকারী উভয়বিধ চেষ্টায় ও সহযোগিতায় শিক্ষার প্রবর্তন স্থায়ীভাবে করণীয় হইবে। কৃষকবর্গের নিরক্ষরতা দূরীকরণ জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করিতে হইবে।

১৫। রাজ্যসরকারের প্রচারবিভাগকে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দদানের উপযোগী ছায়া ছবি প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৬। খাদ্যকে স্বয়ংভর করিবার মূল লক্ষ্যে পল্লীবাসী যুবকগণকে পল্লীমুখী করিয়া বেকার সমস্যার সমাধানে অন্যান্য যাহা যাহা করণীয় তাহা করিতে হইবে। পল্লীবাসী নিরক্ষর নর-নারীগণ রাজনৈতিক অপপ্রচার ও ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইয়া যাহাতে মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিকের মত মরীচিকা লক্ষ্যে ধাবমান না হন তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই ব্যবস্থার সুফল

১। উল্লিখিত ব্যবস্থায় জমির মালিকগণের মালিকানা স্বত্বের বিলোপ হইবে না। ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরগণের স্বার্থও নষ্ট হইবে না। বরং সকল প্রকার স্বার্থ উন্নততর অবস্থায় আসিবে।

২। শিক্ষিত পল্লীবাসীগণ পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন। যাহারা সহরমুখী হইয়া বৃথা ছুটাছুটি করিতেছেন বা সামান্য কর্মসংস্থানে ক্লিষ্ট হইতেছেন তাঁহারা পল্লীমুখী হইয়া স্ব স্ব পল্লীর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

৩। জমির স্বত্ব ও বণ্টনাদি লইয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী নানাবিধ মোকদ্দমার অবসান হইবে। প্রতিক্রিয়াশীল ও মামলাবাজ (টাউট শ্রেণী) ব্যক্তিগণ পল্লীর উন্নতি কল্পে বহুবিধ কর্মের সংস্থান করিতে সক্ষম হইবেন।

৪। রাজ্য সরকারের খাজনাদি আদায় এবং ফসল সংগ্রহ ত্বরান্বিত হইবে। স্থানীয় তহশীলদারগণ বা অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সময় পাইবেন।

৫। চাষীগণ রাক্ষসতুল্য মহাজন শ্রেণীর শোষণ ও পোষণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। অবসর সময়ে কুটীর শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন।

৬। খাদ্য সম্বন্ধে উৎপাদক ও ভক্ষক এই উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী নানাপ্রকারের অসৎ ব্যবসায়ীবর্গের বিলোপ সাধিত হইবে। খাদ্য সংগ্রহ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

সরলভাবে সম্পাদিত হইবে এবং নিত্য নৈমিত্তিক দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি রুদ্ধ হইবে।

৭। স্থানীয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণ-এর মধ্যে এবং রাজ্যসরকারের উচ্চ নীচ কর্মচারীগণের সঙ্গে সাধারণ পল্লীবাসী জনগণের আন্তরিক সংযোগ সম্ভব হইবে। সকল প্রকার কর্মচারী ও সাধারণ জনগণ সকলেই দায়িত্বশীল হইতে বাধ্য হইবেন।

৮। ভারতবর্ষের মত জনবহুল একটি উপ-মহাদেশ-তুল্য দেশে যান্ত্রিক শিল্প উন্নয়নে বেকার সমস্যার বৃদ্ধি ভিন্ন সমাধান সম্ভব নয় এই সত্য স্বীকারে নানাবিধ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় পল্লীগ্রামে, পল্লীবাসীগণের নিত্য প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্যের উৎপাদন জন্য কুটীর শিল্পের ও যান্ত্রিক শিল্পের সহযোগী নানাবিধ কর্মের দ্বার যত উন্মুক্ত হইবে তত বেকার সমস্যার সমাধান হইবে।

৯। রাজ্যসরকারের অর্থের অপচয় বন্ধ হইবে। দুর্নীতি বহুলাংশে নষ্ট হইবে। স্বাধীনতা লাভের পর সুদীর্ঘ বিশ বৎসর খাদ্যের জন্য ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভগ্ন হয় নাই। শুধু সদিচ্ছায় বা উপদেশামৃত দানে কোনদিন কোন স্থানে কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় নাই। ভারতের দীন দরিদ্র জনগণের দরদী ধর্মগুরু অমিয় নিমাইএর মত "আপনি আচরি ধর্ম পরকে" শিখাইতে হইবে। বর্তমান ভারতে যে প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা বর্তমান, সেই অবস্থাকে বর্তমান রাখিয়া নানাবিধ অর্থের প্রয়োগ অর্থের অপচয় মাত্র। ঐ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার উন্নতি সাধনে খাদ্য স্বয়ংভর হইবার প্রচেষ্টা খঞ্জের নৃত্যকুশলতা লাভের জন্য প্রয়াসের মত ব্যর্থ চেষ্টা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় চাষের উন্নতির চেষ্টা সীমিত। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিকে বৃহদায়তন করিয়া যান্ত্রিক প্রথায় চাষ, সেচ ব্যবস্থা, সারের প্রয়োগ প্রভৃতি করিতে যেরূপ অর্থের প্রয়োজন তদ্রূপ উপযুক্ত কর্মীর প্রয়োজন। খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় রাজ্যসরকারকে বর্তমানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে অন্যথায় সেই রাজ্য বিশেষত জনবহুল ও জনবৃদ্ধি সমস্যায় পতিত পশ্চিমবঙ্গ কোনদিন খাদ্যে স্বয়ংভর হইতে পারিবে না ইহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। আশা করি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের কৃপাদৃষ্টি এই প্রবন্ধের উপর পতিত হইবে।

হে জনগণমন ভাগ্য বিধাতা! যে সকল রাজ্য বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংভর নয় তাহাদিগকে সুবুদ্ধি দাও। সেই সকল রাজ্যের সুবুদ্ধি জাগ্রত হউক। সেই সকল রাজ্যের জনগণের কল্যাণ হউক। ভারতবর্ষের কল্যাণ হউক। তাহার মর্যাদা সমস্ত বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

'ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু!'

সূর্য আমার বন্ধু

মানবেন্দ্র বসু

বন্ধু আমার কেই বা আছে বলো?
সূর্য তোমায় বন্ধু চেয়েছি আমি;
তোমার আলোয় উজ্জ্বল ঝলোমলো
বন্ধু আসুক নীলাকাশ থেকে নামি;

নীল দিগন্ত ভরে থাকে যেই রোদ
যারে মাখামাখি শ্বেত পায়রারা ওড়ে—
আমার হৃদয়ে এনে দাও সেই বোধ
প্রেমের মতোই মুক্ত ঝিনুকে ভরে;

রোদ্দুর থাকে মরু-প্রান্তর জড়িয়ে,
সাগরের ঢেউ রোদের আগুন-মাখা,
পিচের পথেও মুঠো মুঠো রোদ ছড়িয়ে—
বেবাক পৃথিবী রোদের শরীরে ঢাকা;

∴ রোদ্দুর, তুমিই আমার একক বন্ধু হ'বে,
রোদ্দুরে মন মেলে দিই আজ ভবে॥

নবাবিষ্কৃত প্রাচীন বাংলা সাহিত্য

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি বিশ্বভারতী একটি মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির নাম গোপালবিজয়। ইহা চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে রচিত সুবৃহৎ কৃষ্ণায়ণ গাথা কাব্য; সেই যুগের সাহিত্যিক ভাব তথা বাংলা ভাষার সুস্পষ্ট নিদর্শন গ্রন্থটিতে বিদ্যমান। যে সামান্য আত্মপরিচয় গ্রন্থে আছে তাতে জানা যায়, কবির নাম দৈবকীনন্দন সিংহ; পিতা-মাতা যথাক্রমে চতুর্ভুজ ও হীরাবতী; বাসস্থানের কথা উল্লেখ না থাকলেও মনে হয়, কবি রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী; অধুনা অপ্রচলিত ঐ অঞ্চলের অনেক ভাষা তার সাক্ষ্য দেয় গ্রন্থখানিতে।

গোপালবিজয় রচনার পূর্বে কবি গোপালচরিত, কীর্তনামৃত ও গোপীনাথবিজয় নামে তিনখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন; শেষোক্ত গ্রন্থটি নাটক। কবিখ্যাতি স্বরূপ তিনি কবিশেখর উপাধি পেয়েছিলেন জনগণের কাছ থেকে। বাংলা দেশের উপর দিয়ে তুর্কির যে ধ্বংসলীলা চলেছিল তাতে বাংলাদেশ অগণিত সম্পদ হারিয়েছে। দৈবকীনন্দন সিংহের উক্ত তিনখানি গ্রন্থ বোধ হয় সেই কারণে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি। কবির সর্বশেষ রচিত 'গোপালবিজয়' কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল বলে আজ সেই পুরণো দিনের একটি সম্পদ আমরা ফিরে পেয়েছি।

গোপালবিজয় লেখা হয়েছে গীতা-ভাগবতের ছায়া অবলম্বনে। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' পার্থসারথির এই অমূল্য উপদেশ গোপালবিজয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে; গ্রন্থে বর্ণিত কংসবধে কৃষ্ণের যে অমিত বিক্রমের পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশেষ শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তস্থল তদানীন্তন হৃতবল বাঙালী সমাজের; আবার ভাগবতোক্ত রাস পঞ্চাধ্যায়ের অনুসরণে গ্রন্থে যে মধুর রসের পরিবেশন করা হয়েছে তাতে গ্রন্থকর্তার অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ ঐক্য হারায় তার ধর্মে গোড়ামির জন্য। শৈব-শাক্তের দ্বন্দ্ব যে কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে। এইরকম ধর্মদ্বন্দ্বে বাঙালীর যেমন মনোবল ভেঙ্গে যায়, তেমনই জাতি হারিয়ে ফেলে শ্রী, সম্পদ ও শক্তি। গোপালবিজয়কার ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। তাই তাঁর সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে একতার ডাক। গ্রন্থারম্ভে বন্দনায় ঐক্যের মাহাত্ম্যগান করেছেন তিনি নানাভাবে—

> একে একে দেবতার কতো লব নাম।
> নারায়ণ চরণে আমার পরণাম॥
> এক সুবর্ন্নে জেন নানা অলংকারে।
> তেন নারায়ণ সব-দেব-অবতারে॥
> প্রসঙ্গে কহিএ বেদপুরাণের সারে।
> পণ্ডিত মুরুখে সব বুঝিহ বিচারে॥
> ব্রহ্মা-আদি তৃণ অন্ত জত কিছু দেখ।
> নারায়ণময় সব জেন পরতেখ॥
> জেন সব নদ নদী সমুদ্রকে জাএ।
> তেন সব দেব-পূজা নারায়ণে পাএ॥
> আচারে বিচারে বেদ বেদান্তে না পাই।
> অনুভবে ভাবিতে আছএ সব ঠাঞি॥
> সেই নারায়ণ চিদানন্দ নন্দসুতে।
> শুনিতে শুনিতে মনে বাসি অদভুতে॥

গ্রন্থটি অপরিমেয় কবিত্বরসে ভরপুর। নানা উপমা উৎপ্রেক্ষায় এবং শব্দঝঙ্কারে বর্ণনীয় বিষয় অনবদ্য হয়ে উঠেছে। জাতশিশু কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় তার একটি সাক্ষ্য পাওয়া যায়,—

> ইন্দ্রনীল মণি জিনি সুন্দর শরীরে।
> নানামণি-খচিত মুকুট শোভে শিরে॥

নীল কুটিল মৃদু দীঘল কবরে।
সন্তান কুসুমদাম আতি মনোহরে॥
আষ্টমীর চান্দ জিনি ললাট-ফলকে।
গগনের চান্দ-সম চন্দন তিলকে॥
তুলিএ তুলিল জেন ভ্রূহি-নিরমাণে।
কুটিল কমলদল ললিত নয়নে॥
মকরকুণ্ডল-রুচি রুচির কপোলে।
সুরতরু-স্তবক সুন্দর শ্রুতিমূলে॥
উন্নত মধুর নাসা তিলফুল-তুলে।
ত্রিভুবনে দিতে নাঞি নাসাপুট-মূলে॥
সিন্দুরবিম্বিত মণি সুন্দর বদনে।
দাড়িম্বকুসুম-সম দশন শোভনে॥
সিংহ অধিক গ্রীবা কম্বুকণ্ঠ ধরে।
নানা মণিমালা উরে ঝলমল করে॥
তারাগণ হেন জ্বলে মুকুতার ঝারা।
আজানুলম্বিত মনোহর বনমালা॥
হৃদএ কৌস্তুভমণি করে পরকাশে।
সূর্যমণ্ডল জেন উইল আকাশে॥
বন্ধুর উদর-মাঝে শোভে লোমমালা।
গভীর আবর্তনাভি সরোরুহ লীলা॥
ভুজযুগ ভুজগকরভ সমতুলে।
করতল জেন রাগ উতপলফুলে॥
নখমণি দেখিএ সুন্দর সুকুমারে।
নখাঙ্কুর দেখি জেন অঙ্কুশ পরকারে॥

গোপালবিজয়ের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা এইরূপ কবিত্ব সম্পদে সমৃদ্ধ। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে কৃষ্ণায়ণ কাব্যে এরূপ মনোহর বর্ণনা আর কখনও দেখা যায় নি। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই দুটি গ্রন্থ চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে রচিত হলেও ভাব সম্পদ উন্নত স্তরে পৌছায় নি। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবানুবাদ মাত্র। দশম স্কন্ধ ভাগবতের একটি বিরাট অংশ। বাংলা ভাষায় এর বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে গ্রন্থকর্তা কবিত্ব প্রকাশের একেবারেই সুযোগ পান নাই; একাদশ স্কন্ধের বর্ণনার মধ্যে তাত্ত্বিক ভাব এসে গেছে। অন্যতম গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন নিতান্ত গ্রাম্য রচনা। এতে রাধাকৃষ্ণের বিলাসলীলা এমন নগ্নভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তাতে মনে হয়, কৃষ্ণ একজন চতুর নাগর, আর রাধা অসহায় গ্রাম্য বালিকা। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লোক প্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। তার অন্যতম মুখ্য প্রমাণ একটি মাত্র পুঁথি প্রাপ্তিতে। পক্ষান্তরে, গোপালবিজয়ের বহু পুঁথি বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে। গ্রন্থের জনপ্রিয়তাই এর কারণ।

সেকালে উপনিবেশ স্থাপনের এক মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায় গোপালবিজয়ে। কংস গোকুলে অত্যাচার আরম্ভ করলে গোকুলবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। একদিন অপরাহ্ণে নন্দরাজ গোকুলের মুখ্য মুখ্য গোপদের ডেকে সভায় বললেন যে গোকুলে কংসের অত্যাচার বেড়েই চলেছে। কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কংস কর্তৃক প্রেরিত পুতনা, তৃণাবর্ত ইত্যাদি অসুরের উল্লেখ করে নন্দরাজ বললেন যে গোকুলে এখন বাস করা অসম্ভব। রাজার সঙ্গে বিবাদ করে নিরাপদে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং এ বিষয়ে কি করণীয় তা নন্দরাজ সকলকে জিজ্ঞাসা করলে সভামুখ্যরা বললেন যে গোকুলে এ অবস্থায় আর এক দণ্ডও থাকা সমীচীন নয়; কিন্তু আয়ান বীর বললেন যে সর্বত্রই তো কংসের রাজ্য। তার নাগালের বাইরে যাওয়া কল্পনা করতে পারা যায় না; সুতরাং, তার শরণাপন্ন হয়েই থাকতে হবে। তবে যদি কোথাও ভাল বন পাওয়া যায় এবং সেখানে ধেনু-বৎসরা সুখে চরতে পারে তবে সেই রকম কোনো বনভূমি আশ্রয় করা যেতে পারে। আয়ানের এই প্রস্তাবে বৃন্দাবনের নামোল্লেখ হলে সকলে সন্তুষ্টচিত্তে ইহা অনুমোদন করল। সভায় স্থির হল, কালবিলম্ব না করে সেদিন রাত্রি শেষে সকলে গোকুলের বাস তুলে বৃন্দাবনে যাত্রা করবে। তদনুসারে যাত্রার আয়োজন হতে লাগল,—

ধর্ম ধর্ম করিঞা গোঙাইল রাত্রিকাল।
রাতিশেষে গোকুলে উঠিল কোলাহল॥
কেহো কেহো নাম ধরি চিয়াএ.ঝরাএ।
কেহো গালি দেই যে মুখে বাহিয়াএ॥

কেহো শিকা বাহক কেহো শকট সজ্জ করে,
কেহো ভারিজনকে ডাকে উচ্চস্বরে ॥
কেহো ত ঘরের সজ্জ সাজাএ বান্ধিঞা।
কেহো ত কোলের শিশু ভুঞ্জাএ বান্ধিঞা ॥
কেহো পিঠে শিশু নিল কাপড়ে বান্ধিঞা।
কেহো কেহো আশু সজ্জা দিল পাঠাইঞা ॥
কেহো ত রন্ধন করে শিকাতে তোলে ভাতে।
কেহো কেহো কোলের শিশু লইল তুরিতে ॥
কেহো কেহো শিশু লইল কাপড়ে জড়িঞা।
কেহো শিশু লঞা জাএ আঙ্গুল ধরিঞা ॥
কারো কারো নিজ নারী আগুসরি জাএ।
তার বাপা ঝাপী লঞা পশ্চাতে গোড়াএ ॥
কারো কারো নারী জাএ শকটে চড়িঞা।
আশে পাশে শুধি করে অঙ্গুলি দেখাইঞা ॥
কারো নারী পুত্র জাএ বলদে চড়িঞা।
কথো নারীগণ জাএ এক মেলি হঞা ॥

কেহো কেহো পিছে জাএ গোধন চালাঞা।
উভনড়ি নাম ধরি ডাকিঞা ডাকিঞা ॥
গরু-হম্বারব শুনি হেন গুণি মনে।
পুনরপি করে কেবা পয়োধিমথনে ॥
গোকুলের কোলাহলে ভরিল জগতে।
আকাল প্রলয় মেঘ ডাকে আচম্বিতে ॥
আতি রাজপরিচ্ছেদে গোকুলের ঠাটে।
রঙ্গে ঢঙ্গে উত্তরিলা বৃন্দাবন বাটে ॥

এইরূপ বাস্তব বর্ণনা গোপালবিজয়ে অনেক দেখা যায়। সেকালে বাঙালী সমাজের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্রত-পূজা-পার্বণ ইত্যাদি বিষয়ে নানা নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গলে ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র যেমন বাস্তব, গোপালবিজয়ে তেমনই কংসের অত্যাচারের রূপকে সেকালে উৎপীড়িত বাংলা দেশের একটি করুণ দৃশ্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের বাংলা দেশের ইতিহাস রচনার নানা উপাদান এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যাবে। সেইদিক থেকেও গ্রন্থটির মূল্য অসাধারণ।

ব্যাকরণ বন্দনা

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

তোমার বন্দনা-গীতি গাহি আমি সর্বশাস্ত্র সার
'ব্যাকরণ'! সর্ব বিদ্যা ভারতীর কণ্ঠ মালিকার
দ্যুতিমান মধ্যমণি! সারস্বত-তীর্থ পথে তুমি
নির্ভীক সুজন সাথী। জ্ঞানার্থীর জ্ঞান-কেন্দ্রভূমি!
তুমি গুরু, পুরোহিত, পূর্ণহিত করিয়াছি লাভ
তোমারি পরশে এসে। অব্যাহত তোমার প্রভাব
সর্বার্থ সাধন-রণে চিরজয়ী করেছ আমারে
নমস্কার, তব পদে নমস্কার করি বারে বারে।
বিশ্ববিদ্যালয় তীর্থে অবগাহি কোন "উপাধ্যায়"
কিংবা কোন "রত্ন" "নিধি" "তীর্থ" হওয়া আমার বিদ্যায়
সম্ভব হয়নি কভু। আমি নিত্য সাহিত্য বিমুখ;
বিজ্ঞান আমারে লয়ে করিয়াছে নিষ্ঠুর কৌতুক
জড়ায়ে জড়ত্বজালে। অঙ্ক সেও বহু সংখ্যা দিয়া
একক বিশ্বাসী মোরে ছেড়ে গেছে আঘাত হানিয়া।
ভূগোল ফেলেছে গোলে। কেহ মোরে ভালবাসে নাই
মন ঢালা প্রাণ ঢালা স্নেহরস আমি শুধু পাই
তোমার সকাশে এসে। ভাষারণ্যে মূক পশুসম
ঘুরিতে ছিলাম যবে, তুমি মোরে নিত্য নিরুপম
'অক্ষর' 'প্রকৃতি' 'পদ' বাক্য' দানে করেছ মুখর!
করেছ "সুক্রিয়া"ন্বিত "ত্রিকালজ্ঞ" ওগো বন্ধুবর,
আমারে করেছ ধন্য কৃত কৃত্য "পঞ্চবর্গ" দিয়া।
প্রতিবেশীসহ আমি পরিবার "বিভক্তি" ভুলিয়া
হইয়াছি একপদী ভাবে নিত্যযুক্ত চিরকাল
ভাষার উষর উষ্ণ বক্ষ হতে ঘুচাতে জঞ্জাল!
সমস্ত "ক্রিয়া"রে মোর করিয়াছি কর্তানুগামিনী
"সকর্মক" "সমাপিকা"; বিশেষ্যকে সবিশেষ চিনি,
তোমারি প্রসাদে শুধু। আজি আমি যথার্থ মানুষ।
পুরুষের মধ্যে মোরে সর্বশ্রেষ্ঠ "উত্তম-পুরুষ"
বলিয়া এ বিশ্বমাঝে তুমিই তো করেছ প্রচার।
"বহুব্রীহি" দিয়ে মোর সর্ব দৈন্য করে ছারখার
নাশিয়া "অব্যয়ীভাব" তোষিয়াছ সকল সময়,
নিত্য "তৎপুরুষেতে" দ্বন্দ্বহীন সুস্থির প্রত্যয়
জাগ্রত করেছ তুমি। তোমারি তো দেওয়া "বিশেষণে"
কিংবা "সর্বনামে" তারে ডেকে ডেকে আশা পাই মনে
বাঞ্ছিত "সন্ধি"র। ওগো অযাচিত তোমারি "আদেশ"
"ইৎ" "গুণ" "বৃদ্ধি" আর "আগমাদি" ঘুচায়েছে ক্লেশ
সংকট সময়ে মোর। উপাধির আধি ব্যাধি ভার
উপসর্গ সহ কেড়ে নিয়ে গেছ! যেহেতু ধরার
নগণ্য চাহিদা উহা। যুগশিক্ষা গণ্ডীর বাহিরে
"ব্যাকরণ তীর্থ" মাত্র—মূল্য যার কিছুই নাহিরে।
না থাক আমার তাহে দুঃখ নাই কোন দুঃখ নাই
আমি শুধু কায়মনোবাক্য দিয়ে তোমারেই চাই।
তোমারি সোহাগ সুধা পান করে বাকী ক'টা দিন
কাটাইয়া দিতে চাই, পুরাতন, হে চির নবীন।

বাসুকির বিষ
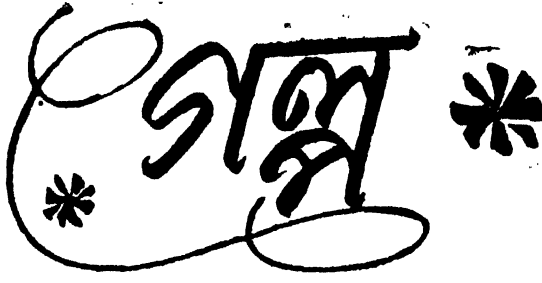
সমীর চট্টোপাধ্যায়

—আমাকে তুমি ক্ষমা করো মানসী! আমার দ্বারা সে'কাজ আর কোনদিন সম্ভব হবে না! আমি নিরুপায়! হাঁ, তোমাকে আমি বলব মানসী, আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়! ফিরে আসার পথ আমার আর নেই! আমি অসহায়, আমি……!

আপিসের ছুটির পর ক্লান্ত পদক্ষেপে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামতে নামতে আপন মনে কথাগুলি বলল অনিমেষ। রাস্তায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল সে, ভাবল, নিত্যকার মত আজও মানসী তার জন্য অপেক্ষা করবে লালদীঘির পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে। নিয়মিতভাবে আজও অনিমেষ যাবে সেখানে। তারপর দুজনে ডালহৌসী পেরিয়ে উপস্থিত হবে এসপ্লানেডে। সেখানে কোন রেস্তোরাঁয় বসে কিছু জলযোগ করবে কিম্বা এককাপ করে চা নিয়ে বসবে মুখোমুখি। নানা কথার মধ্যে মানসী যা বলবে, তা জানে অনিমেষ। এই একবছরে তাকে আর অনিমেষকে কেন্দ্র করে যে সুখ-সৌধটি গড়ে চলেছে, তার উপর আর একধাপ পলেস্তারা চাপাবে। কিন্তু মানসীর হাজার স্বপ্নবাণীর মধ্যে একটা কথাও বলবে না অনিমেষ,—কিছুই সে বলতে পারবে না কেবলমাত্র দু'একটি অব্যক্ত শব্দ প্রয়োগ ছাড়া। অথচ বলতে চেষ্টা করবে অনিমেষ। মানসীর কথার ওপর সে বলতে চাইবে, না এ তোমার মিথ্যে কল্পনা মানসী! আমাকে নিয়ে তুমি তোমার জীবনকে বাঁধতে পার না। শুধু তুমি কেন জগতের কোন মেয়েই তা পারবে না। তুমি আমাকে ভুলে যাও! কি করব! আমি বড়ই নিরুপায়। আমি অসহায়, আমি……!

ক্লান্ত পা দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল অনিমেষ। আপিসগুলির ছুটি হয়েছে। রাজপথ জনাকীর্ণ। হাত-ঘড়িটা একবার দেখল অনিমেষ। পাঁচটা বেজে দশ মিনিট। মানসীরও ছুটি হয় ঠিক পাঁচটায়। আপিস থেকে পথটুকু আসতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগে। এতক্ষণ নিশ্চয় সে এসে গেছে। অপেক্ষা করছে অনিমেষের জন্য।

একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল অনিমেষ। দাঁড়িয়ে আবার ভাবল। নিজেকে প্রস্তুত করল:— না, এভাবে চলা ঠিক হচ্ছে না। এ সম্ভব নয়,— ভাবতে ভাবতে একসময় দোকানীর উদ্দেশে বলল সে,—একটা চারমিনার দাওত ভাই। তার গলার স্বরটা কেমন যেন বেসুরো হয়ে শোনাল, কিছু অস্পষ্ট, দোকানী জিজ্ঞাসা করল, কি চাইলেন বাবু?

দোকানীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অনিমেষ। অন্যমনস্কের মত তাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে দোকানী আবার জিজ্ঞেস করল—কি চাইলেন বাবু?

এবারে অনিমেষ যেন কিছু লজ্জা পেল। সে ভাবল, দোকানী কি কিছু মনে করল? সে বলল, একটা চারমিনার দাও। খুচরো নেই, একটা এক-টাকার নোট বাড়িয়ে দিল অনিমেষ। দোকানীর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে [illegible] এগিয়ে গেল সে। পেছনে দোকানী ডাকল, বাবু, আপনার বাকি পয়সা নিলেন না,—

আবার ভুল! থমকে দাঁড়াল অনিমেষ। ফিরে এসে পয়সা নিল সে দোকানীর কাছ থেকে।

তারপর বোকার মত বলল,—ধন্যবাদ!

কথাটা বলে আবার দোকানীর দিকে তাকাল সে। দেখল, দোকানী যেন অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে দেখছে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত রাস্তাটুকু পার হয়ে গেল অনিমেষ।

লালদীঘির কাছে এসে দেখল অনিমেষ দূরে মানসী পায়চারী করছে এদিক ওদিক। মাঝে মাঝে চারদিকে দেখছে। অগণিত পথচারীর মাঝে অনিমেষকে খোঁজার চেষ্টা করছে।

সিগারেটের কথা এতক্ষণ মনে ছিল না। হাতে

আগুনের তাপ লাগতে খেয়াল হল অনিমেষের।—ইস্! সিগারেটটায় একটা টান মেরে বাকি অংশটুকু ফেলে দিল অনিমেষ, তারপর মানসীর পুতুলের মত নড়াচড়া দেহটার দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের পথটুকু আরও একটু দীর্ঘ করল। কারণ সে জানে মানসীর কাছে সে কোনদিন পৌঁছাতে পারবে না। এ তার মিথ্যে পথ-পরিক্রমা। সারা জীবন ধরে হাঁটলেও সে তার নাগাল পাবে না। কেবল তার দেহের আশে-পাশে ঘুরে মরবে। যেমনভাবে সে ঘুরছে আজ একবছর ধরে। অথচ মানসী ক্রমেই নিজেকে সহজ করে তুলছে অনিমেষের কাছে। নিজেকে বিকশিত করছে। কথাগুলি ভাবল অনিমেষ, সেইসঙ্গে লালদীঘির পার্কের মধ্যে মানসীর সুসজ্জিত দেহটাকে যেন একটা প্রস্ফুটিত ফুল বলে মনে হল তার।

নিজেকে মনে করল ক্লান্ত, ভ্রান্ত একটা ভ্রমর বলে, সে ক্রমাগত একটা ফুলের চারদিকে পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরে মরছে আজ এক বছর ধরে।

একজন সুবেশ ভদ্রলোক। তাঁর দুহাত আঁকড়ে আছে দুটি ফুলের মত ফুটফুটে শিশু। পার্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তারা, বোধ হয় ট্রামের অপেক্ষায়। বাচ্চা দুটি বড় সুন্দর! দুটিই হয়ত ছেলে, কিম্বা মেয়ে। ঠিক বোঝা যায় না। বাচ্চাদের ঠিক বোঝা যায় না। ওদের দেহের গঠন আসতে এখনও অনেক দেরি আছে। তাই ওদের দেখতে এখন সমান লাগে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসবে কত সমস্যা, কত জটিলতা, কত যন্ত্রণার ব্যাধি জন্ম নেবে ওদের দেহে মনে।

ট্রাম এসে গেছে, সুবেশ ভদ্রলোক বাচ্চা দুটির হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন গাড়ীতে ওঠার জন্য। ভদ্রলোক নিশ্চয় ওদের বাবা। বাড়ীতে ওনার স্ত্রী আছেন—নিশ্চয় আছেন, সবাই তো আর আমার মত হতভাগ্য নয়! কথাটা ভাবল অনিমেষ। স্বামী আর ছেলে-মেয়েরা বাড়ী ফিরলে ভদ্রলোকের স্ত্রী পরিপাটি করে তাদের খেতে দেবেন। তারপর বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে নিজেরা বসবেন দাম্পত্য আলাপে। ভদ্রলোক নিশ্চয় তাঁর স্ত্রীকে খুব ভালবাসে। নিশ্চয় ভদ্রলোক আর তাঁর সুন্দর বাচ্চাগুলিকে দেখে তাই মনে হল অনিমেষের। সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান সন্তান সুখী পরিবারের প্রতীক। কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে আনে নি কেন? হয়ত বাড়ীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তাছাড়া সংসারের কাজ কর্ম আছে। রাঁধা-বাড়া করতে হয় তাঁকে। কথাগুলি ভাবল অনিমেষ আর তার মনে পড়ল, তার নিজের দুটি ছেলে-মেয়ের কথা। মাতৃহারা দুটি হতভাগ্য শিশু। তারা সারাদিন একা একা থাকে বাড়ীতে। একজন পরিচারিকার দায়িত্বে থাকে তারা। এমন কোন নিকট আত্মীয় নেই অনিমেষের যাকে বাড়ীতে এনে রাখে সে। তাছাড়া নিজের ঘর-সংসার ফেলে কেই বা চিরদিন অন্য জায়গায় কাটাতে রাজি হবে? মাঝে মাঝে বাচ্চা দুটোকে তাদের মামার বাড়ীতে রেখে মানুষ করার কথাও চিন্তা করেছে অনিমেষ, কিন্তু ওদের চোখের আড়াল করে রাখতে মন সায় দেয় না।

ট্রাম লাইন পার হতে গিয়ে আর একটু হলেই একটা ট্রামের গায়ে ধাক্কা খেত অনিমেষ! অল্পের জন্য বেঁচে গেছে সে! একেবারে গা ঘেঁসে চলে গেল ট্রামটা। ড্রাইভার অনিমেষের উদ্দেশে কয়েকটা কটু মন্তব্য করল। ঐ ট্রামেই উঠেছেন ভদ্রলোক তার বাচ্চা দুটি নিয়ে। হয়ত কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিংবা কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে, এখন বাড়ী ফিরছেন। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দেবেন বাচ্চা দুটিকে। নানাপ্রকারের সুখাদ্য রান্না করে পথ চেয়ে বসে আছেন ভদ্রলোকের গৃহিণী। আর অনিমেষ সকাল সন্ধ্যা নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করছে এই একটা বছর ধরে। দুটি মাতৃহারা শিশু নিয়ে সে আজ অসহায়—একান্ত অসহায়। কিন্তু কোন উপায় নেই, কোন পথ নেই ফিরে যাওয়ার! মানসী, তোমাকে আজ আমি সব কথা বলব। অথচ তুমি আমাকে পথের হদিস দিতে এগিয়ে এসেছ কিন্তু তুমি জাননা যে, সে পথ আমার কাছে রুদ্ধ—চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে!

পায়চারী থামিয়ে এবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে মানসী। অনিমেষকে দেখতে পেয়েছে।

একটা বেঞ্চে বসল অনিমেষ। ক্লান্ত, ভারবাহী জানোয়ারের মত মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

মানসী কাছে এগিয়ে এল। সে বলল,—কি ব্যাপার? শরীর খারাপ হল নাকি? আজ এত দেরি করলে যে অনিমেষ?

নিজের সমস্ত যন্ত্রণার জমাট বাঁধা পিণ্ডটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাইল অনিমেষ। এতক্ষণের চিন্তা করা কথাগুলি প্রকাশ করে নিজেকে হাল্‌কা করতে চাইল। অবশেষে অতিকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে ধীর স্বরে সে যা বলল, তাহল,—আজ আপিস থেকে বেরুতে একটু দেরি হয়ে গেল, তাই—

—যাক বাবা, বাঁচলাম। আমি ভেবেছিলাম বুঝি তোমার শরীর খারাপ হল!

উত্তরে অনিমেষ বলতে চাইল, আমার শরীরের জন্য তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন মানসী? আমার জন্য তোমার এই উদ্বেগ প্রকাশ, এই ব্যাকুলতা যে কত মিথ্যা,—

কিন্তু এই কথাগুলি বলতে চাইলেও ঠিক বলতে পারল না সে, পরিবর্তে সে অত্যন্ত একটা বেমানান কথা বলল,—হ্যাঁ আজ একটু দেরি হল, তুমি আমার জন্য অনেকক্ষণ থেকে—

মানসী বলল,—চল, এবার যাওয়া যাক।

—কোথায়? অন্যমনস্কের মত জিজ্ঞাসা করল অনিমেষ।

—বারে! আজ যেন নতুন—নতুন হয়ে যাচ্ছ তুমি! কিছু খাবে না? চা-টা—।

নিজের যন্ত্রণাজর্জর দেহটাকে হিঁচড়ে টেনে তুলল অনিমেষ। মানসীকে অনুসরণ করল। এবার পাশা-পাশি হাটছে দুজনে।

—আমার শাড়ীটা আজ কেমন লাগছে অনিমেষ? কাল কিনেছি। রংটা কেমন, পছন্দ হয় তোমার?

এখানে অনিমেষের যা বলার কথা, তা সে বলতে পারল না। কারণ সে আজ এক বছর ধরে মানসীর আশে পাশে থেকেও নিজেকে তফাতে রেখেছে। মানসীকে একটা ছবি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি। ছবির মধ্যে যেমন সব কিছু থাকে একটা মানুষের অবয়বের, থাকে না রক্ত মাংসের মানুষটা। তাই যৌবন-পুষ্ট দেহ, উন্নত বক্ষ ক্ষীণ কটি আর সুপুষ্ট নিতম্বের অধিকারিণী মানসীকে দেখতে গিয়ে কেবলই নিজের অক্ষমতার কথা চিন্তা করেছে অনিমেষ। সে ভেবেছে, এ মানসী তার কাছে একটা ছবি মাত্র। রক্ত মাংসের গড়া আসল মানসীর নাগাল সে কোনদিনই পাবে না। তাই মানসীর সৌন্দর্যের সঙ্গে তার শাড়ীকে জড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হতে পারল না সে। পারল না কোন ভালবাসার কথা বলতে। অথচ অনিমেষ জানে, মানসী চায় তার কাছ থেকে দু একটা প্রেমালাপ বা ভালবাসার কথা শুনতে। আর কিছুদিন পরে যাকে সে পাবে একান্ত আপনার করে, তার কাছ থেকে তেমন ধরণের দু একটি বাক্যসুধা। কিন্তু সুধা কোথায়? মনে মনে ভাবল অনিমেষ। যে কথা সে মানসীকে বলবে বলে নিজেকে প্রস্তুত করছে, তা মানসীর কাছে তীব্র গরল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সে কথা শুনলে ছিটকে সরে যাবে শত হাত দূরে।

হয়ত যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠবে।

—কই, কিছু বললে না ত? কাপড়টা তোমার কেমন লাগছে? অনিমেষকে নীরব দেখে জিজ্ঞেস করল মানসী আবার।

কেন, বেশত—দুর্লভ্য বস্তুর যেমন করে প্রশংসা করে মানুষ, ঠিক তেমনিভাবে কথাগুলি বলল, উচ্চারণ করল অনিমেষ, আর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার জন্য একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করল,—আজ এত সেজেছ, কোথাও নিমন্ত্রণ আছে নাকি?

অনিমেষের কথা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল মানসী। সে বলল,—আজ তুমি নতুন নতুন এমন সব কথা বলছ যে,—মানসীর হাসির সঙ্গে তার সারাদেহে যে হিল্লোল জাগল, সেটুকু নির্নিমেষে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে ভাবল অনিমেষ,—এই ত সবে শুরু, আরও কত নতুন কথা, কত অদ্ভুত কথা তোমাকে শুনতে হবে, যা তুমি কোনদিন ভাবতেও পার নি। আমার সম্পর্কে কতটুকু তুমি জানো মানসী! আমার ব্যথা! আমার হতাশা!—আমার জীবনের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা……।

এস্‌প্লানেডের মোড়ে এসে দাঁড়াল দুজন। লাল আলোর নিশানা হয়েছে। সারি সারি দাঁড়িয়ে গেছে

গাড়ীগুলি। অনিমেষ আর মানসীও দাঁড়িয়েছে। অনিমেষের মনে হল যেন ঐ লাল আলো তাকেও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আর এগিও না অনিমেষ, থেমে যাও, মানসীর সঙ্গে তোমার এই খেলা এবার বন্ধ কর।

—আর বেশী দেরি করতে পারব না মানসী, এবার ফেরা যাক। বাড়ীতে বাচ্চা দুটো একা থাকে। আমি দেরিতে ফিরলে ওদের বড় কষ্ট হয়! যেন কত অনুনয়ের সুরে কথাগুলি বেরিয়ে এল অনিমেষের মুখ থেকে।

—আহা বেচারা! তোমার বড় কষ্ট অনিমেষ! আমি বুঝতে পারছি, তুমি কত অসহায়। অনিমেষের কথায় দুঃখ প্রকাশ করে বলল মানসী। অনিমেষ ভাবল, এই সুযোগে নিজের চরম দুর্ভাগ্যের কথাটা মানসীর কাছে প্রকাশ করতে পারে সে। এখন তার দুঃখে মানসীর মন নরম হয়ে আছে। হয়ত সব কথা শুনে তাকে ক্ষমা করতে পারবে মানসী।

অনিমেষ বলতে চেষ্টা করল,—মানসী! আমি—

—বুঝেছি অনিমেষ! কিন্তু এভাবে আর কতদিন চালাবে তুমি?

—মানসী, ধরো যদি আমি,—মানে, যদি আমার আর—

কিন্তু অনিমেষের কথা শেষ না হতেই মানসী একটা প্রস্তাব করে বলল,—চল, আজ তোমার বাড়ী যাব অনিমেষ।

বাচ্চা দুটিকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

—কিন্তু—, কি যেন বলতে চাইল অনিমেষ।

মানসী বাধা দিয়ে বলল,—কোন কথা নয়, এখানে দাঁড়াও একটু, আমি আসছি। এই বলে রাস্তা পার হয়ে একটা দোকানে ঢুকল মানসী। তারপর এক বাক্স টফি হাতে করে অনিমেষের কাছে ফিরে এসে বলল,—চল, এবার যাওয়া যাক।

যন্ত্রচালিতের মত মানসীর সঙ্গে এগিয়ে চলল অনিমেষ। সামনে একটা বাস এসে থামল। বাসে উঠে পড়ল মানসী। তাকে অনুসরণ করল অনিমেষ নেশাচ্ছন্ন মানুষের মত।

একটা সীটে বসে পাশের ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে মানসী বলল,—এখানে বস অনিমেষ।

মানসীর পাশে বসতে বসতে অনিমেষ ভাবল, তাকে এত আপনজন বলে কেন ভাবছে মানসী। অথচ সেই নিদারুণ কথাটা যখন সে শুনবে, তখন—, তাই সেই চরম মুহূর্তটির কথা চিন্তা করে মানসীর পাশে বসতে গিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব গুটিয়ে রাখল অনিমেষ।

মানসী বলল,—আমি বুঝতে পারছি অনিমেষ, তুমি হয়ত ভাবছ; তোমার বাড়ী গেলে আমার যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন হবে কিনা? কিন্তু তা নাই বা হল, সেজন্য আমি কিছুই মনে করব না তা তুমি স্থির জেনো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে মুখ ঘোরাল অনিমেষ। খুব জোরে ছুটছে বাস। বাইরের বাতাস এসে ঝাপট মারছে জানলার গায়ে। হা-হা করে একটা শব্দ হচ্ছে বাতাসের। অনিমেষের কানে বাজছে যেন হাহাকার ধ্বনির মত। কাতর বিলাপের মত। আর সেই বিলাপটুকুর উৎস খুঁজতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল। তার নিজের মধ্যে থেকেই সেটা উঠে আসছে। নিজের সেই বিলাপোচ্ছ্বাসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে অনিমেষ। (সেই বিলাপের অংশগুলি হল, আমার সঙ্গে নিজেকে এমন করে কেন জড়াচ্ছ মানসী? তুমি যা আশা করছ তা আমি পূর্ণ করতে পারব না, অন্ততঃ আমাকে দিয়ে তা হতে পারবে না। যে সুখ-সৌধ তুমি রচনা করছ, তা একদিন নিশ্চয় ধ্বসে পড়বে তা আমি জানি। কারণ তোমাদের মত মেয়েদের যা একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যা তোমাদের জীবনের কাম্য, তা দেবার শক্তি আমার নেই! কিন্তু সেই কমনাকে বাদ দিয়ে তোমাদের জীবন সম্পূর্ণ হয় না,—হতে পারে না তা আমি জানি। তাই তোমাকে পেতে চাওয়ার কল্পনা আমার মত পঙ্গুর পর্বত লঙ্ঘনের মত অলীক চিন্তা ভিন্ন আর কিছু নয়।)

বাস থেকে নামল দুজনে। এখান থেকে মিনিট দশেক হেঁটে যেতে হবে অনিমেষের বাড়ী। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। অনিমেষ ভাবল, এখনও অন্ততঃ এক ঘণ্টা মানসীর সান্নিধ্যে থাকতে হবে তাকে। সেই সময়টুকুর মধ্যে মানসীকে সব কথা বলতে হবে। আর গোপন রাখবে না সে।

বাড়ীর দরজায় এসে নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়াল

অনিমেষ। মানসীকে বলতে পারল না, এস মানসী, ভেতরে এস। বরং মানসীই যেন জোর করে ঠেলে, ঢুকিয়ে দিল অনিমেষকে। যেন মানসীরই বাড়ী, সেই অভ্যর্থনা করল অনিমেষকে। কিন্তু এই বাড়ীটাকে এত আপনার করে কেন ভাবছে মানসী? সে কি মনে করছে যে, দুদিন পরে যেখানে সে আসবে গৃহিণীরূপে, আজ থেকেই সেখানে নিজেকে সহজ করে নেওয়া উচিত? দরজায় ঢুকতে ঢুকতে কথাটা মনে করল অনিমেষ।

কিন্তু এই বাড়ীর এক গোপন-রন্ধ্রে আছে একটা বিষাক্ত সাপ। সেটা যে কখন একসময় মানসীর দেহে ছোবল দেবে, সে কথা জানে অনিমেষ। তার তীব্র বিষে জর্জরিত হয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠবে মানসী, তারপর ছুটে চলে যাবে এ বাড়ী ছেড়ে। নিশ্চয় সে চলে যাবে, কারণ তারপর মানসীর মত কোন মেয়েই আর এখানে থাকতে পারে না। সেই সাপটাকে এখনও জোর করে গর্তের মধ্যে আটকে রেখেছে অনিমেষ, আর প্রতি মুহূর্তে নিজে গ্রহণ করছে তার দংশন। সেই দংশনের জ্বালায় জর্জরিত হচ্ছে অনিমেষ।

বাচ্চা দুটি ছুটে এল, বাবা, বলে জড়িয়ে ধরল অনিমেষকে। অবাক চোখে দেখতে লাগল তারা মানসীর দিকে। আদর করে অনিমেষের ছেলে-মেয়ে দুটিকে কাছে টেনে নিল মানসী। তাদের হাতে টফির বাক্সটা দিল।

দূরে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মত দেখতে লাগল অনিমেষ। একটা নাটকের কোন এক মিলনাত্মক দৃশ্য। সেই সঙ্গে সে ভাবল, এরপরে আসবে যে দৃশ্যটা সেটা কত ট্র্যাজিক!

খাওয়া দাওয়া করে বাচ্চা দুটি ঘুমিয়েছে। মানসী নিজে দু' কাপ চা তৈরী ক'রে নিজে খেয়েছে আর অনিমেষকে খাইয়েছে। ছোট্ট বাড়ী, তবু ঘুরে ফিরে দেখছে মানসী। মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান গাইছে। এক সময় সে আবিষ্কার করল ছাদের সিঁড়িটা। বাঃ! চলো অনিমেষ, ছাদে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াই—

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল মানসী। অনিমেষ তাকে অনুসরণ করল। সে ভাবল, সেই ভাল, ছাদের এক অন্ধকারময় নিভৃত স্থানে সে মুক্ত করে দেবে সেই সাপটাকে। তারপর নিজেকে হাল্‌কা করবে সে।

সিড়িতে উঠতে গিয়ে পা দুটো থর থরিয়ে কাঁপছে অনিমেষের। নিশ্বাস ভারী হয়ে আসছে।

আলসের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মানসী বলল—বাবাঃ! কি বিদঘুটে অন্ধকার আজকের রাতটা। তারপর মানসী খুঁজল ঝিরঝিরে বাতাস শুভ্র জ্যোৎস্না, আর মিষ্টি ফুলের সুবাস। আর একটু দূরে অন্ধকারে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ভাবল অনিমেষ, এর থেকে জমাট, আরও জমাট অন্ধকার রাত কি হয় না?

—আচ্ছা অনিমেষ—এগিয়ে এল মানসী.—তোমার স্ত্রী মারা গেছেন, এই ঠিক এক বছর হল না?

—হ্যাঁ। আড়ষ্টস্বরে বলল অনিমেষ।

—মাত্র দুটি ছেলে-মেয়ে রেখে। আহা বেচারা। একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল মানসী।

- স্ত্রী বেঁচে থাকলেও তার আর কোন সন্তান হত না, সে পথ বন্ধ হয়ে গেছল! আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়ান অপরাধীর জবানবন্দীর মত শোনাল অনিমেষের কথাগুলি।

—কেন অনিমেষ? তোমার স্ত্রীর কি—

হঠাৎ মানসীর দুটো হাত আঁকড়ে ধরে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল অনিমেষ।—না মানসী! আমি নিজেই সে পথ বন্ধ করেছিলাম। আমার সংসারকে সুখ, শান্তি আর স্বচ্ছলতায় ভরিয়ে তুলে নিজেকে সুখী করতে আমি আমার দেহে এক নির্মম আঘাত করেছিলাম। আমার সংসারকে অমৃতময় করতে নিজেকে নিষ্পেষিত করেছিলাম। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর ছমাস আগে আমি নিজের ওপর অস্ত্রোপচার করে নিজেকে অক্ষম করে দিয়েছিলাম। কিন্তু মানসী যে অমৃতলাভের আশা করে আমি ঐ কাজ করেছিলাম, তা আমি পেলাম না! পরিবর্তে শুধু আমি পেয়েছি বিষটুকু।—মানসী, মানসী,—তুমি কি পার না আমাকে সেই বিষের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে!—মানসী.........!

অনিমেষের হাতের বাঁধন থেকে নিজের হাত দুটো মুক্ত করে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল মানসী সিঁড়ির দিকে। অন্ধকারে, ছাদের এক কোণে কুঁকড়ে পড়ে থাকা অনিমেষের দেহটা এঁকে বেঁকে সাপের মত হয়ে ভেঙে চুরে যেতে লাগল।

বিশ্ব পরিক্রমা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

(৪)

হনলুলু

সিডনী থেকে বিদায় :

সিডনীর পরিদর্শন পর্বের শেষে আমায় বিমান কোম্পানীর অফিসে বৈকাল সাড়ে চারটার মধ্যে পৌছবার কথা। হাতে মাত্র আধ ঘণ্টা। এরমধ্যে আমার আস্তানা থেকে জামা কাপড়ের ব্যাগটি তুলে ও 'ক্যাল্টেক্স্ হাউসে' গিয়ে ভারতীয় বাণিজ্য দূতের কাছ থেকে আমার পাসপোর্টে 'মেক্সিকো' যাবার অনুমোদনের ছাপ নিয়েও এলাম। একাজে মাত্র পনেরো মিনিট লাগলো। ক'লকাতা হ'লে কঘণ্টা যে লাগতো জানিনা। তারপর কোয়াণ্টাস অফিসে এসে আমার সহযাত্রীকে বিদায় ও ধন্যবাদ জানিয়ে করমর্দন করলাম। বিনিময়ে তিনিও তার শুভবার্তা জানালেন। বিমান কোম্পানীর লেমোসিনে বিমান বন্দরে যাবার আগে ওখানে বসে দুখানা চিঠি লিখে অষ্ট্রেলিয়া মুদ্রায় টিকিট কিনে মেরে একখানি বাড়ীর অন্যখানা আনন্দবাজার পত্রিকার অশোক সরকারের ঠিকানায় পাঠালাম। বিমান অফিস থেকে বন্দরে নেবার ভাড়া মাত্র পাঁচ শিলিং নিলো। দিল্লী, বম্বে, কলকাতা, করাচীর মত বিমান প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ে বিমান বন্দর থেকে সহরে পৌছে দেবার ব্যবস্থা নেই। আমেরিকায় কোথাও নেই। বিমান বন্দরে পাসপোর্ট ছাপ মারিয়ে পৌনে সাতটা নাগাদ বিমানে চড়লাম। এটিও বিরাট ধূম্রপুচ্ছ বিমান।

কোমরে' বেল্ট বাঁধা ও লাইফ জ্যাকেটের মহড়া দেখতে দেখতে দেখি বিমান উঠতে লেগেছে। আমার সময়ে দেখেছিলাম ভোরের সিডনী। আজ বিদায় বেলায় পেলাম আলোঝলমলে রাতের সিডনী। সিডনীর রাস্তাগুলো উঁচু নীচু ও কিছু আঁকাবাঁকা। রাতের বেলায় রাস্তার আলোর সারি দেখে মনে হ'ল যেন কোন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলোর ভুজঙ্গম জলের ধারে শুয়ে তার মাথার মাণিক খুঁজছে। মনে হয় সারা সমুদ্রের গা যেন আলোর চুম্‌কিতে ভরা।

বিমান এবার সমুদ্রের পথ ধরল। ভোঁ ভোঁ করে উঠে এল প্রায়—৩৭,০০০ ফীট উঁচুতে। নিজে আমি মাপিনি; বিমানে কাপ্তেনের ঘোষণায় জানা গেল আকাশের কতো উর্দ্ধে আমাদের অবস্থান। আমার পাশেই এক তরুণ অষ্ট্রেলিয়ান চলেছেন টরেণ্টোতে কাজের সন্ধানে। স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শী সে। সিডনীতে স্থপতির কাজ না থাকায় ভাগ্যের সন্ধানে সে কানাডায় চলেছে। তারজন্যে আমার বন্ধু 'কেন্ সার্প'কে টেরেণ্টোয় একখানি পরিচয়পত্র দিলাম যদি সে এই তরুণ বন্ধুটিকে কোন সাহায্য করতে পারে। এর একটা পায়ের খানিকটা নকল পা। তার অংগ-হানি দেখে অন্তরে করুণা হ'ল। তাকে পরিচিত বন্ধু বলেই চালিয়ে দিলাম। সে অজস্র ধন্যবাদ দিল। আমাদের দেশের ছেলে হ'লে 'কাজ নেই বলে বিদেশে চলেছে' একথা বিদেশীর কাছে বলতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠাবোধ করতেন।

রাত নটায় ডিনার দিয়ে গেল। আধঘণ্টার মধ্যেই সকলের আহারপর্ব শেষ হ'য়ে গেল। অত উঁচুতে ওড়ার জন্য বিমান সমুদ্রে জাহাজের মত দোলে না। মাঝে মাঝে বায়ু আবর্তে প'ড়ে সামান্য একটু কাঁপে। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখি, আকাশে চাঁদ উঠেছে।

এত উজ্জল ও স্বচ্ছ চাঁদ এর আগে দেখিনি। তলায় চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত মেঘের ধবল উত্তরীয় যেন বিছানো রয়েছে। তারাগুলো স্পষ্ট আকাশে হীরের মত ঝক্ ঝক্ করছে। বিমানের ভেতরের বৈদ্যুতিক আলো এসে আমার লেখার খাতাটির ওপর কেন্দ্রীভূত হ'য়ে পড়েছে। খুব আরামেই লেখা যায়—কোন নড়চড় বা হেলদোল নেই। বাইরে গোঁ গোঁ শব্দ। অত উর্ধ্বে লঘু হাওয়া—কিন্তু বিমানের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া চাপে পাঠানোর সুব্যবস্থা রয়েছে। মাথার ওপর হাওয়ায় উপুড় করা ছোট্ট ঘটি থেকে কম বেশী নানা দিকে ঘুরিয়ে হাওয়া নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কোয়ান্টাস্ বিমানের ভেতরের রেক্সিনের গায়ে অষ্ট্রেলিয়ার গাছপালা জীবজন্তু ও ফুলফলের যেন এক চিত্রশালা। মনে হয় ভেতরে একটি নার্শারী স্কুল খোলা হ'য়েছে। হাত ঘড়িতে যখন এগারোটা তখন আমাদের ধূম্রপুচ্ছ বিমানটি ফিজি দ্বীপের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নামবার জন্য এগিয়ে চলেছে। এই বার্তা লাউডস্পিকার মারফৎ রটে গেল। আমরাও ব্যস্ত হ'লাম কোমরে বেল্ট বাঁধতে ও জানলার ফাঁক দিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রশান্ত-মহাসাগরের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দ্বীপটি দেখার চেষ্টা করতে।

ফিজির কথা :

আজ রাত্রে তারিখ নিয়ে হিসেবের মহা গণ্ডগোল। যত পূবের দিকে যাবো ঘড়ি ততই এগিয়ে দিতে হবে। বিমানে বসে ঘড়ির কাঁটা ঠিক মতো এগিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যখন ফিজি দ্বীপের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর 'নন্দী' বা 'নাড়ী'তে গিয়ে নামলাম বিশ্রামাগারের ঘড়িতে দেখি পৌনে একটা। স্থানীয় সময় দুঘণ্টা গিয়েছে। বিমান বন্দরের পরিদর্শকের খাতায় ৩০শে প্রিল বলেই সই করিয়ে নিল। অষ্ট্রেলিয়ায় ৩০শে প্রিল সন্ধ্যায় ছেড়ে ফিজিতে ৩০শে এপ্রিলের সুরুতে পৌঁছলাম। যাত্রীদের সামান্য সরবৎ পানের জন্য বিমান কর্মীরা আহ্বান জানালো।

বিমান বন্দরে ঢুকেই দেখি—হারাণ লাহিড়ী বা মধিরাম কোলের মত ছেলেরা সাদা সরকারী পোষাক বাংলায় কথা বলতে যাবো আর কি, মনে হল আমি ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে। আসলে একসময় এঁদের পূর্বপুরুষেরা ভারতীয় ছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বৃটিশ রাজত্বের সময়ে এঁদের পূর্বপুরুষদের 'আখেরে রাজা' ক'রে দেবার প্রতিশ্রুতিতে আখ ও আনারসের চাষ করাতে জাহাজে ক'রে এখানে নিয়ে আসে। আর ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। তাই এরা বাসের জন্য ভারতীয় স্থাপত্যের কুটীর বেঁধেছে। আচার ব্যবহারে ধরণ ধারণে এরা পূর্ণ ভারতীয়। মেয়েরা এখানে পরে শাড়ী, পুরুষেরা অনেকে আজও মাথায় পাগড়ী বাঁধে। অনেকে দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছেন, ব্যবসাসূত্রে কাচ্ছি ও গুজরাতিরাই দোকান পাতি খুলেছে। অফিসে যারা কাজ করে তারা কোট সার্ট প্যান্ট প'রে থাকে। এখানে দুটি ভাষা ইংরাজী ও হিন্দুস্থানী দুইটি সমানভাবে চলে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে উদ্ভূত তিনশো দ্বীপের সমাহার সাত হাজারের বেশী বর্গমাইল বিস্তৃত ভূভাগ নিয়ে এই ফিজি দ্বীপপুঞ্জ। এখানে British Crown Colony of Fiji ব'লে শাসন চলে। এখানে দুটি বিমান বন্দর,—'নন্দী' ও 'শুভা'। নামের মধ্যে ভারতীয়তা পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট। শুভা আবার ফিজি দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। সারা দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা কলকাতার দশ ভাগের একভাগ। শুভার জনসংখ্যা মাত্র চল্লিশ হাজার। ফিজির আদিম অধিবাসী ও উপনিবেশী ভারতীয়েরা বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন পাড়ায় শান্তিপূর্ণভাবে বাস করে। এখানে সারা বছরই বৃষ্টি হয়। গড়পড়তা তাপমাত্রা ৭৪° ফারেনহিট থেকে ৮০° ফারেনহিট। তার অর্থ এই—নেই শীত বা গ্রীষ্মের প্রকোপ—শুধু বর্ষা ও বসন্ত। এখানে এক আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে আড়াই ফিজি পাউণ্ড পাওয়া যায়।

ছবিতে দেখলাম অপূর্ব এর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কয়েকটি ছবি খরিদ করলাম। যদিও এটি শুল্কমুক্ত বিমান বন্দর, তবু বহু লোভনীয়—সস্তায়—জিনিস কেনার বাসনা, অর্থাভাবে ও বইবার অক্ষমতায় সংবরণ করতে হ'ল। একদিকে যেমন ঘন জংগল, অন্যদিকে ঢেউ-খেলানো

প্রচুর পাওয়া যায়। এখানে এরা চিংড়িমাছের মালাই-কারী তৈরী করে। জলে চিংড়ি আর গাছে নারকেল। মাছ এল জল থেকে, নারকেল এল শূন্য থেকে। রন্ধন শালায় দোঁহার মহামিলনে রসনাতৃপ্তিকারী উপাদেয় মালাইকারী তৈরী হ'ল। এই দ্বীপপুঞ্জের ভিটিলেভু দ্বীপের উত্তরে 'বাভুকোলা' সোনার খনির জন্য বিখ্যাত। এখানে ভারতীয় বিমান কর্মচারীদের সংগে ইংরেজীতেই আলাপ হ'ল, তাদের সামাজিক জাতীয় ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে। অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেলথের অধ্যাপক নিত্যানন্দ মজুমদার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা থেকে উপদেষ্টা হিসেবে শীগগির আসবার কথা ছিল ও পরে আলোচনাচক্রে যোগ দেন।

এখানে ঘণ্টাখানেক থেকে বিমান হনলুলুর দিকে চললো। হাতঘড়িতে যখন রাত পৌনে তিনটে তখন পুবের আকাশ লাল হতে সুরু হ'য়েছে। সওয়া তিনটের মধ্যে দিবাকরের জবাকুসুমসংকাশং ভাব শেষ হয়ে মেঘের উপরে উঠে এসেছেন। রাত যে কোথা দিয়ে গেল, ঘুমই বা কতটুকু হ'ল, টের পাওয়া গেল না। কখন বিমান মেঘের মধ্যে পড়ায় একটু নড়াচড়া দিচ্ছিল। অত উঁচু দিয়ে বিমান চলায় গতির অনুভূতি মেলেনা। তবুও এ সামান্য ঝাঁকুনীর জন্য ক্যাপ্টেন লাউডস্পীকারে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বোঝা গেল ৩১,০০০ ফীট ঊর্ধ্বে ঝড়ো বাতাস বইছে। মেঘ শুধু দু' এক মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তবে বিমান ঠিক সময়েই হনলুলু বিমান বন্দরে পৌছে গেল। আমার ঘড়িতে সাড়ে তিনটে কিন্তু স্থানীয় সময় সাড়ে সাতটা। প্রাতরাশ বিমানেই দিয়ে গেছে। তবে এদের খাওয়া দাওয়া বিশেষ আকর্ষণীয় নয়। এদের পুরুষে পরিবেশন করে—এটা বিমান পরিবেশে বিশেষ দৃষ্টিকটু।

হনলুলুতেই সরকারীভাবে যুক্তরাষ্ট্র সুরু। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা কিছুই দেখলো না। বাইরে আসতেই এক ভদ্রলোকের সংগে দেখা হল। তিনি এয়ার ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি মিঃ ডি, সিল্‌ভা। আমায় কিছু সাহায্য করতে পারেন কিনা জানতে চাইলেন।

—নিশ্চয়ই। বলুন তো এখানে ওয়াই, এম, সি, এ কোথায়? আর সেখানে আজ ও কাল রাতের বাস মিলবে কিনা?

—'আচ্ছা খবর নিয়ে দেখি' বলে টেলিফোনে খবর নিয়ে জানলেন 'ঘর পাওয়া যাবে।' ডি, সিলভা আরও বললেন 'একটু যদি অপেক্ষা করেন আপনাকে ওয়াই, এম, সি, এতে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি। আমার বন্ধু দম্পতির জন্য অপেক্ষা করছি তাঁরা এলেন বলে। গাড়ীতে জায়গার অসুবিধে হবে না।

—ঠিক আছে, নিশ্চয়ই অপেক্ষা করব। আমার আর কাজ কি? আচ্ছা Air Indiaর প্লেন তো হনলুলু আসে না তবে এখানে Air Indiaর অফিস কেন?

—ভবিষ্যতে যাতে আসতে পারে তারই একটা সমীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ও প্রস্তুতি পর্ব চলেছে। উপরন্তু Air Indiaর যাঁরা টিকিট কিনেছেন বা কিনবেন তাঁরা হনলুলু এলে তাঁদের সাহায্য করাই বর্তমানে মূল উদ্দেশ্য।

—দূরদর্শিতা ভারতীয় বিমান কোম্পানীর আছে বলতে হবে। এরজন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

—কিছু যাত্রী এখনই বিমান থেকে নামলো। দেখি তাঁরা এলেন কিনা। আমার যাত্রী দুজন হলেন পর্তুগীজ। তাঁদের সংগে করে নিয়ে যেতে হবে।

—আমার কোন ব্যস্ততা নেই। আমি বরং কোয়ান্টাস এর অফিস থেকে খবর নিয়ে আসি, আমার ১লা মে রবিবারে লস এঞ্জেলিসে যাবার বুকিংটা ঠিক আছে কিনা ও বিমান কখন ছাড়বে।

—ওদের অফিস টার্মিনাল বিল্ডিং-এর ওপাশে। আপনি ঘুরে আসুন।

সেখানে আমার টিকিট দেখাতে তাঁরা রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় বিমানবন্দরে হাজির হতে বললেন।

আমার টিকিটে ছাপ মারিয়ে, প্রাতঃকৃত্য সেরে ফিরে এসে দেখি পর্তুগীজ ভদ্রলোকেরা তখনও আসেন নি। জাপান থেকে তাঁরা আসছেন। পাশাপাশি দুটি খালি চেয়ারের একটিতে বসেছি, এমন সময় হঠাৎ

হাসি মুখে, "এখানে বসতে পারি কি ?" বলে পাশের চেয়ার দেখিয়ে অনুমতি চাইলেন—ভুরু আঁকা লোহিত অধরা ফিলিপিনো বিমান প্রতিষ্ঠানের বিমান সেবিকা।

—নিশ্চয়ই, অতি আনন্দের সংগে। জনান্তিকে বিশেষ ক'রে যেখানে তরুণী বসছে।

—ধন্যবাদ আপনি কতদিন আছেন এখানে ?

—এখনও একঘণ্টা হয়নি।

—তাই নাকি ? কতদিন থাকবেন ?

—মনে করছি মাত্র দুদিন। তোমাদের ওখানেও এক সপ্তাহ ছিলাম ম্যানিলায়।

—কেমন দেখলেন আমাদের দেশ ?

—তোমাদের ওখানে দেখলাম এশিয়ায় মার্কিনি সংস্কৃতির বৈজয়ন্তী রূপ। আমেরিকার অর্থনৈতিক অভিযান মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপে দ্বীপে এশিয়ার বৃহৎ ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে। হাওয়াইকে তো ওরা মার্কিন দেশের একটি রাজ্য বলে গ্রহণ করেছে।

—ঠিক বলেছেন, আমাদের নেতারা আমেরিকার দাস।

—ডি সিলভা এক ফাঁকে আমার ব্যাগটি তাঁর গাড়ীর পেছনে রেখে এসেছিলেন। এদিকে পর্তুগীজ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এসে গেছেন। আমায় মেয়েটির অনুমতি নিয়ে উঠতে হল। যাত্রীদ্বয় পর্তুগীজ নামে মাত্র। পর্তুগালের কোন গন্ধই নেই গায়ে। না আছে রং ফর্সা বা লালচে, না সোনালী দাড়ি না পাইরেটের মত গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারা। আছে শুধু পাসপোর্টে পর্তুগীজ নাগরিক বলে লেখা। গোয়া যখন ভারতে অন্তর্ভুক্ত হল তখন তথাকথিত ভারতীয় পর্তুগীজ বীতরাগ হয়ে গোয়া ছেড়ে আফ্রিকার পর্তুগীজ অধিকৃত মোজাম্বিকে চলে যায়। চেহারায় কড়েয়ার ইলিয়ট স্ট্রীটের ট্যাঁস ফিরিঙ্গীদের মতই। চালচলনও তথৈবচ। এখানে কয়েকদিন থেকে যাবেন মার্কিন মুলুকে। শুভ বিনিময় ও পরিচয়ের পর ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন—

—কতদিন থাকবেন এখানে ?

—দুদিন মাত্র। পরশু যে চলে যাবো লস্ এঞ্জলিসে।

—তো যাচ্ছি তোমরা যে লস এঞ্জলিসে।

—হয়তো সেখানে আবার দেখা হবে। পৃথিবী তো ছোট হ'য়ে গেছে।

ডি সিলভার সংগে ওদের খুব কথাবার্তা চলেছে। আলাপে জানা গেল ভদ্র মহিলা ডি সিলভার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। গোয়াতে ডি সিলভিয়ার আদি নিবাস। আমরা ওয়াই, এম, সি, এ-তে চলে এলাম। আমায় নামিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল। অফিসের ঠিকানাও দিয়ে গেল যাতে অপরাহ্ণে ওদের অফিসে যাই। কল লাগানো ঘরও পাওয়া গেল মাত্র শয্যাভাড়া দুদিনে সাড়ে সাত ডলার। খাওয়া দাওয়া নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক বিক্রয়কেন্দ্র—হনলুলু

ঘরে এসে ময়লা গেঞ্জী জামা কেচে নিয়ে ভাল ক'রে শাওয়ারে স্নান সেরে নিলাম। সিডনীর কেনা একটি আপেল খেয়ে নিলাম। দুপুরে আর খেতে বেরুলাম না। ঘুম না হওয়ায় শরীর অতি ক্লান্ত। তাই শুয়ে পড়লাম। দীর্ঘ দিবা নিদ্রার পর উঠে দেখি বেলা তিনটে। মুখ হাত ঘরের ভেতরে বেসিন-লাগানো কলে ধুয়ে চারটে নাগাদ হাতে হনলুলুর একটা নক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ওয়াই, এম, সি, এর অতি নিকটেই বিশপ স্ট্রীটে Air ইণ্ডিয়ার International-এর অফিস। গাড়ীতে আসবার পথে ডি, সিলভিয়া তার অফিসের 'ডাকের পাঠান' বলে একটি মেয়ের কথা বলেছিল। অতি

ভাল মেয়ে সে। এয়ার ইণ্ডিয়া অফিসে ঢুকতেই সেই ভাল মেয়েটি আমার চোখে পড়ল। চোখ যেন তার আপ্যায়ন করার জন্য স্বতই উদ্গ্রীব। শ্রীমতী তাহের হেসে হেসে কত গল্পই যে করছেন। এক পেয়ালা কফি প্রত্যেকের জন্য এল। আজ শ্রীমতী তাহের হাওয়াইয়ান মেয়েদের মত ঢলঢলে রঙিন চিত্র বিচিত্র আঁকা সেমিজ পরেছেন। তাকে এই নিয়ে উগ্র তামাসা করা গেল।

—চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, নৃত্যসঙ্গীর অপেক্ষায় হাওয়াইয়ান মেয়েদের মত দণ্ডায়মান। বাঁহাতে দরজা ধরে রাস্তার ধারে দাঁড়ালে অপূর্ব মানাতো। মনে হত যেন অভিসারিকা বাসক সজ্জা করে প্রস্তুত হচ্ছেন।

তাহের বলে—এখানে সব মেয়েদের প্রতি শুক্রবার এই রকম গাউন পরার কথা ও গলায় মালা পরারও কথা। তবু মালা আমি পরিনি।

—সত্যিই গলায় একটা মালা থাকলে মালাবদল সহজ হতো।

—জানিনা কেন এটা এখানে একটা সামাজিক রীতিতে দাঁড়িয়েছে।

এখানে মালা অধিকাংশ গুলঞ্চ ও কলকে ফুলের। যুঁই ও বেলফুলের মালা আছে। তবে গন্ধ পুষ্প বলে দামও হয়ত বেশী।

পাঁচটা প্রায় বাজে বাজে। ডি সিলভা তাহেরকে অফিসে অপেক্ষা করতে বলে আমাদের নিয়ে জরুরী চিঠি পোষ্টাফিসে টিকিট মেরে ফেলে তার নতুন গাড়ীতে বেড়িয়ে আনার জন্য বার হল। অফিসের কাছে পুরানো 'আওলানী' রাজপ্রাসাদ। সেখানে গিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে সব দেখিয়ে আনলো। কত তৈলচিত্র, কত রকমের ফরাসী ঝাড় লণ্ঠন, বেলজিয়াম কাচের আয়না প্রভৃতি। প্রাঙ্গণে বিরাট এক বটগাছ বহু ঝুরি নামিয়েছে চারদিকে।

সেখান থেকে 'পালি' রোড ধরে নুয়ানুপালি লুক আউট (Look-out)-এ গেলাম। বেজায় জোরে জোরে বাতাস বয়ে আসছে। জংগলের মধ্য দিয়ে রাস্তা, গুলঞ্চের গাছ ভরা ফুল। আর ফুটেছে হিবিস্কাস। সামনে দূরে দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আর কয়েকটি দ্বীপ। সেখানে উন্নয়ন পর্ব চলেছে রাস্তাঘাট বাড়ী নির্মাণের প্রচেষ্টায়। প্রবাদ আছে নুয়ানুপালির পাহাড় থেকে নীচে কোন হালকা জিনিস বা রুমাল ফেলে দিলে আবার সেটা ফিরে আসে। এরকম কিংবদন্তী মহারাষ্ট্রের প্রতাপগড়ের কাছে 'আর্থার পয়েন্ট' সম্বন্ধেও আছে। আবার বলা হয়—এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলেও নাকি আত্মঘাতীকে উপরে নিয়ে এসে তুলে দেয়। নিশ্চয়ই এসব একটু বাড়াবাড়ি জনশ্রুতি। সেখান থেকে গাড়ীর মোড় ঘুরিয়ে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে "আলা পেয়ানায়" এলাম। এই বৃহৎ 'নগর কেন্দ্রটি' (City Centre) পৃথিবীর অন্যতম। বিশেষ ক'রে একই ছাদের তলায় এতবড় প্রসার পৃথিবীতে বিরল। এর মূল বিশেষত্ব হল এর বহুতল বাড়ীতে কয়েক হাজার মোটর রাখার জায়গা। গাড়ী রাখলেই ঘণ্টা হিসেবে পয়সা দিতে হয়। প্রধান রাস্তার নামও 'আলামোয়ানা'। আলামোয়ানা সেণ্টারের সামনে 'আলামোয়ানা পার্ক'। পার্ক পার হলেই সমুদ্র। এখানে বিরাট সুপার মার্কেট (কলকাতা-হাওড়ায় যা সুরু হচ্ছে) করার ফলে দূরের ছোট ছোট দোকানপাট ও হাট-বাজার প্রায় কানা হতে চলেছে। একই জায়গায় কাঁচা শাক সবজি, আনাজপতি, মাছ মাংস, মনিহারী, কাপড় চোপড়, ওষুধ, খাদ্য, লোহা লক্কড় সব কিছুই এই সুপার মার্কেটে পাওয়া যায়। 'আলোহা টাওয়ারে'র বহুতল বাড়ীর চূড়ায় কাচের দেওয়াল দেওয়া রেস্তোরাঁ। সেটি বহুদূর থেকে দেখা যায়। এই 'টাওয়ার' থেকে নগর ও সমুদ্রের শোভা অতি রমণীয়।

নানা জায়গা ঘুরিয়ে ডি, সিলভা আমাদের 'ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসে' নামিয়ে দিয়ে গেল। আর বলল, এখানে হাওয়াই নৃত্যাদি বিনামূল্যে রাত সাতটায় দেখানো হবে। তখন ছটা বেজে গেছে। নানা দর্শনীয় জিনিসপত্র দেখলাম এ-দোকান থেকে ও-দোকানে ঘুরে ঘুরে। এখানে এসে পুরুষেরা সবাই রঙিন ছাপা হাওয়াই সার্ট ও মেয়েরা তেমনি টকটকে রঙিন গাউন পরে। মার্কিন পর্যটকরা ঐ রকম জামা পরে ও গলায় মালা ঝুলিয়ে (কালিঘাটের পাণ্ডার

কলকে ফুলের মালার মত) আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমোদ আহ্লাদ আর নিশ্চিন্ত অবসর বিনোদনে এই অপূর্ব সুন্দর দ্বীপের পরিপ্রেক্ষিতে যেন নতুন জীবন পাচ্ছে। 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ'।

গাড়ী করে আসার সময় ভারতীয় ধনী 'ওয়াটুমল'-এর-কথা ডি, সিলভা বলল। ওয়াটুমলের অনেকগুলি দোকান আছে এখানে। প্রধান কটির নাম হল— Downtown, Alamoana Center, Hawaian Village Hotel, Princess Katalani Hotel, Surf Rider Hotel, Illikai Hotel প্রভৃতি।

ইনি তাঁর অর্থের যাতে সৎব্যয় হয় তারজন্যে 'ওয়াটুমল ফাউণ্ডেশন' স্থাপন করেছেন। শ্রীমতী ওয়াটুমল একজন মার্কিনী মহিলা।

আমরা দোকানপাতি দেখে সাতটা নাগাদ যখন নাচের জায়গায় এলাম দেখি যে খানিকটা জায়গায় সারি সারি বেঞ্চি পাতা। সামনেই একটু উঁচু চাতাল। সেটি হল মঞ্চ। বহু মার্কিন ও বিদেশী নরনারী হাওয়াইয়ান্ রঙিন জামা পরে কেউবা গলায় মালা দিয়ে বেঞ্চিগুলো দখল করে বসে আছেন। আমরাও তিনজন একটা বেঞ্চিতে বসলাম। এখনই নাচ গান দেখানো সুরু হবে। বিজলী জ্বেলে মঞ্চের পাদপ্রদীপ ঠিক করা হল ও আজ রাতের প্রোগ্রাম ঘোষণা করা হল মাইক্রোফোনে। আজ দেখানো হবে চার রকমের নাচ—১। হাওয়াই ২। তাহিতী ৩। সামোয়া ও ৪। মাউরী। নানা সাজে নানা পোষাকে আসছে মেয়েরা। কোমরে নতুন ঘাসের ঘাগরা পরা, বুকে ক্ষীণ কাঁচুলি, খোঁপায় গোড়ের মোটা শুভ্র পাগ। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা যন্ত্র সংগীতের সহযোগে গান করে যাচ্ছেন আর মেয়েরা উদ্দাম নেচে চলেছে, সুরের তালে তালে গান, ছন্দে ছন্দে। কোমরের নীচের সবুজ ঘাসের ঘাগরার উতল্ উত্তোলনে যৌন আবেদন আনার একটা প্রবল প্রচেষ্টা রয়েছে। কোন নাচেই কোমরের ওপরের অংশের কোন গতি বা উচ্ছলতা নেই। তবে হাতে নানা মুদ্রা করে হাত হেলিয়ে দুলিয়ে আঙুল ঘুরিয়ে নেচে চলেছে। ঠোঁটে রক্তিম হাসিটি লেগেই আছে। যেন উল্লাসে উতরো এই হাওয়াই কন্যারা গেয়ে চলেছে :—

······গীনই মীনই তেলে······

অর্থাৎ আমরা মাছের মত খেলে বেড়াই।

'তাহিতী' নাচে নর্তকীর অধমাঙ্গে সামান্য ক[illegible] নাই (নাভি) পর্যন্ত বের করা। দামামার তাল[illegible] সঙ্গে 'ঝকমক' আওয়াজের সাথে সাথে কোমর [illegible] নিতম্ব এত দ্রুত দুলছে ও ঘুরছে যেন মনে হয় দু[illegible] flexible joint দিয়ে বাঁধা। কাঁধ দিয়ে রঙি[illegible] পাতার বাহার ঝুলছে। নানা রকমের কামোদ্রেকীতা[illegible] নৃত্যকলার পরিবেশনা চলেছে। প্রায় খালি গা হ[illegible] কি হয়, নৃত্যলীলার মেহনতে সারা অঙ্গ দিয়ে ঘা[illegible] ঝরছে দরদর করে।

তারপর 'হুলা নৃত্য'। তার সহযোগী সংগীত চলেছে তার প্রথম গানের কলি—'হাসু হাসু, হাসুরে······ আমার মন থেকে আজও মুছে যায়নি সেই সুরের রেশ[illegible]

সামোয়া নৃত্য হল, রণনৃত্য। দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রি[illegible] শব্দে দামামা বেজে উঠল। পুজোর বাড়ী ভোর[illegible] বেলা যেমন ঢাকেতে কাঠি পড়ে, তখনি পাদপী[illegible] গলায় বেঁকানো হাড়ের মালা, কাণে কলকে ফু[illegible] পাথর কোঁদা নগ্নগায়ে সাঁওতালী এক ছেলের ম[illegible] বেরিয়ে এল 'তরুণ নাটুয়া'। ছেলেটির পরিচয় করি[illegible] দিল মাইকে—জন্ম তার ভারতবর্ষে, শিক্ষা তার বিলে[illegible] কাজ শিখেছে মার্কিন মুল্লুকে। সার্কাসের নানা কঠি[illegible] খেলা সে নাচের ভেতর দিয়ে দেখাতে লাগলে। খো[illegible] দুই তলোয়ার নিয়ে দ্রুত খেলা চলেছে, দ্রুততালে চলে[illegible] 'তাহাই' সঙ্গীত। জ্বলন্ত আগুনের মশাল নি[illegible] লোফালুফি। দর্শকদের মধ্যে থেকে ডেকে নিয়ে গি[illegible] দ্বৈত তাহাই সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য। মুখে সব সময়[illegible] হাসি আর আমেরিকান বুলি। সহজেই এরা আপন ক[illegible] নেয় পরকে, এদের ঝুটো আভিজাত্য বোধ নে[illegible] বিশেষ করে মার্কিন নাগরিক হয়েছি বলে। প্রাচী[illegible] কালে ইংরেজ এনেছিল এখানে চীনা শ্রমিক খে[illegible] খামারে কাজ করতে। তারা পলিনেশীয় মেয়েদে[illegible] বিয়ে করে কাজ ছেড়ে দিল—যেমন কামাখ্যা[illegible] প্রাচীনকালে ওখানের মেয়েরা পুরুষদের ভেড়া বানি[illegible]

রাখতো, দেশে ফিরতে দিত না। হয়তো সেখানে ছিল পুরুষের দুর্ভিক্ষ। এই প্রমীলা রাজ্যে মেয়েরা কাজ করতে লাগলো; মরদেরা আরাম করতে লাগলো। তখন আনা হল জাপানী শ্রমিক। পরে দেখা গেল এরাও পালিয়ে যেতে চায়। তখন জাপান থেকে তাদের স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনদের আনানো হল। তারা তখন আর পালালো না। শ্রমিকদের তদারকী করতে এল সুপারভাইজার। এল কেউ পর্তুগাল থেকে, জার্মানী, ইতালী, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি থেকে। তারাও পলিনেশীয় রক্তের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলতে লাগলো। অদ্ভুত এক রক্তের এখানে মহামিলন। এখানে কারুর হিটলারী চিন্তাধারায় খাঁটি আর্যরক্তের গৌরবের কোন গন্ধও নেই, গর্বও নেই।

পরের দিন ঠিক করলাম যে দিনের বেলা Circle Island Tour নেবো। বেলা ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। মোটর কোচে এর টিকিট হল আট ডলার। 'ওয়াই কিকি' থেকে কোচের বদলে এল লিমোসীন; ন'টার বদলে ছাড়ল সাড়ে ন'টায়। আমাদের সাথী ওকল্যাণ্ড ও নিউ অর্লিনসের মার্কিন দম্পতিদ্বয়। প্রথমেই এল প্রথম দর্শনীয় 'নুয়ানুপালি'। 'নুয়ানুপালি' থেকে সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে সমুদ্রতটের পাশ দিয়ে পেঁপে, তরমুজ, কলা ও আনারসের বাগানের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি। এই দ্বীপে নেই বিশেষ হিংস্র জীবজন্তু বা প্রচুর গৃহপালিত পশু। এখানে দুধ ও মাংস আসে মূল ভূখণ্ড বা ওদের কথায় (Main land) থেকে অর্থাৎ মার্কিন দেশ থেকে। মাঝে মাঝে গাড়ী থেমে প্রকৃতির রূপসজ্জার উপভোগ করতে করতে চলেছি সমুদ্রের গা ঘেঁসে রাস্তা দিয়ে। মাঝে এক জায়গায় আহারের জন্ত থামলাম। আহারাদি উচ্চাঙ্গেরই হল। ফলের 'শালাদ' আনলো, আধখানা আনারসের খোলার মধ্যে ভর্তি করে। আনারসের শাঁস কুরে নিয়ে ভাঙা বাদামের খোলার মত চেহারার মধ্যে পেঁপে, আম, নেসপাতি জাতীয় জিনিষ ঘন দুধে মিশিয়ে 'ফলের শালাদ' তৈরী করেছে। 'লাইবে' তটের ধারে 'মরমণ' সম্প্রদায়ের মন্দির। এরা খ্রীষ্টান বটে তবে গোঁড়া খ্রীষ্টান থেকে একটু তফাৎ। চবেই সবুজ ভেলভেটের মত সযত্নে রাখা প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখি ফোয়ারা ও দূরে মন্দির। ওদের মিলন মন্দিরে এনে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় 'মারমন' মন্দিরের রঙিন ছবি দেখানো হল। আল্‌সেতে গড়ে তোলা নানা মারমন অবতার ও অবতারণীদের মূর্তি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন ওখানের যাজক মশাই।

এই সম্প্রদায়ের বহু জমি ও খেতখামার। যেমন ভারতে মঠ ও আশ্রমের বহু জমি থাকে ও তার আয়ে ভক্তদের সেবা ও সাধনা চলে, তেমনি এখানেও সেই রকম ব্যবস্থা রয়েছে। 'মারমন' মন্দির দর্শনপর্ব সেরে আমরা আবার চললাম সমুদ্র সৈকত, কলা বাগান, পেঁপে খেতের পাশ দিয়ে। বেলাভূমিতে বিদেশীরা স্নান, সাঁতার ও সার্ফ চালাচ্ছে। হিবিস্কাসে ভরে গেছে এর উপবন। 'সানসেট' সৈকত পার হয়ে 'হেলাইওয়া' সহর থেকে বাঁয়ে বেঁকে দ্বীপ ভেদ করে চলে এলাম পার্ল হারবারের দিকে। পার্ল হারবারের ধার দিয়ে 'পার্ল সিটি' পিছনে রেখে 'নিমিৎস্ রাজপথ' ধরে আলামোনা পার্ক হয়ে 'ওয়াইকিকি' নগরকেন্দ্রে ফিরে এলাম। পার্ল হারবার যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সর্ববৃহৎ নৌবহরের কেন্দ্র। সারা পথটা ড্রাইভার বলে চলেছে নানা দর্শনীয় স্থানের বহু কাহিনী। সেই সঙ্গে নানা প্রশ্নোত্তরে সে নিজের যে আত্মকাহিনী বলে গেল তার সারমর্ম হল সে নিজে জার্মাণ—জাপানী ও পলিনেশীয় রক্তের সমন্বয়ে গঠিত। তারা পাঁচ ভাই, দুই বোন। তারাও এ রকম দু তিন দেশের রক্তের ফেরের লোকদের বিয়ে করেছে ও করছে। তার বাবা জার্মান পলিনেশীয় ও তার মা জাপানী পলিনেশীয়।

'হনলুলু' বলতে মনে হয় এটি 'হাওয়াই' দ্বীপের রাজধানী। এটি 'হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে'র রাজধানী সত্য কিন্তু এটি 'হাওয়াই' দ্বীপে অবস্থিত নয়। এটির অবস্থিতি 'ওহায়ু' দ্বীপে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিস্তৃতি ৬,৪৩০ বর্গমাইল। মুখ্য আটটি দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত যেমন হাওয়াই, ওহায়ু, মোলোকাই, কাউয়াই, লানাই, কাহলাউয়ে, মাউয়াই, নীহাউ। হাওয়াই (৪০০০ বর্গমাইল) দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা সাড়ে ছ'লক্ষ অর্থাৎ হাওড়ার জনসংখ্যার প্রায় সমান। এই দ্বী...

১৯° থেকে ২৩° দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত ও কলকাতার অক্ষাংশের সমান। আয়তনে হাওয়াই সবচেয়ে বড় দ্বীপ কিন্তু লোক সংখ্যায় বড় 'ওহায়ু'"। বছরে দশ লক্ষেরও বেশী লোক এখানে জল ও আকাশ পথে বেড়াতে আসে। এখানের সরকারের মূল আয় ভ্রাম্যমানদের যাতায়াত থেকে ও আখ ও আনারসের চাষ থেকে।

হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশতম রাজ্য। হনলুলুর 'চীনে সহর' এক অদ্ভুত জায়গা। সেখানে নানারকম রঙিন পাথরের দোকান, ফুলের দোকান, খাবারের দোকান। বাজারের এক অঞ্চলে বহু মালাকারদের দোকান, যেখানে নানারকম ফুল দিয়ে অজস্র রকমের মালা তৈরী হচ্ছে—কে যে কার গলায় পরাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কেউ চায়—

"দাও মালা দাও গলে
মোর বিরহ নাও মিলন ছলে।"

বৃষ্টি পড়লে যখন জল নীচে নামে তখন প্রবল বাতাসের বেগে মনে হয় জল যেন ওপরে উঠছে। সেই জলপ্রপাতকে বলা হয় Upside Down Falls. এর ওপর দিয়ে তলায় কাচ দেওয়া বোট যখন চলে তখন নীচের প্রবাল ও জলজ জীবজন্তু স্বচ্ছ জলে চকচক্ করে উঠে। মাঝে মাঝে ক্ষণস্থায়ী শরৎকালের মত বৃষ্টি হয় কিন্তু ঋতুর নেই এখানে হেলদোল—যেন চিরবসন্ত বিরাজমান। কিশোরকালের কাজি নজরুলের একটি প্রসিদ্ধ গানের কলি আজও আমার কানে লেগে আছে—

"ফুল ফুটছে হাওয়াই দ্বীপে।"

কাজি নিশ্চয়ই কোনদিন কলকে-গুলঞ্চ-হিবিস্কাস্ ফুল ফোটা দেখতে যাননি। মনে হয় রঙিন ছবি দেখে মনের মাধুরী দিয়ে এ রচনা করেছিলেন।

সেদিন প্রেমেন মিত্র তাঁর 'নীলকণ্ঠ' কবিতায় বললেন—হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সমুদ্রের কোন দ্বীপপুঞ্জে তবু চিনি ঘাসের ঘাগরা পরা ছায়াবরণ তার সুন্দরীদের

* * * * *

মেয়েদের চোখ আজ চকচকে ধারালো
নেচে নেচে ঢেউ তোলা নাচের নেশায় ভোলা
মিশকালো অঙ্গে কি চেকনাই।
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই।
হেইডি, হাইডি, হাই।

ওদের নাচ দেখে ও নাচ দেখানোর গূঢ় উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে, যৌবন বিনিময়ে বেঁচে থাকার প্রয়াস অবলোকনে অন্তরে করুণা ও সহানুভূতির সঞ্চার হয়। এরা মার্কিন মাতঙ্গদের মাদকতার চাট জোগাতে নেমেছে কোথায়? কোথায় এ কামনা-বহ্নির নির্বাপণের পন্থা? কে এদের পথের কথা বলে দেবে?

হনলুলু থেকে বিদায়:

পরের দিন সকালে আটটা নাগাদ বেরিয়ে চলে এলাম হনলুলুর বিমান বন্দরে। টিকিটে ছাপ মারিয়ে মাল ওজন করিয়ে চড়লাম বিমানে। এখানে শুল্ক বিভাগের অন্তরায় নেই এবং আগামী কিছুদিনও থাকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না নিউ ইয়র্কের বিমান বন্দর ছাড়ছি। এবার 'ইউনাইটেড এয়ার লাইনসে'র বিমানে একটানা লস-এঞ্জেলিস্। মাঝখানে কোথাও থামা নেই—দীর্ঘ আড়াই হাজার মাইলের পাড়ি, সময় লাগবে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। সাড়ে ন'টায় বিমান ছাড়ায় বিমান কোম্পানীর খরচে প্রাতরাশ পাওয়া গেল না। বিমানে উঠতেই অক্সিজেন মাস্ক ও জীবন রক্ষার ছাতা খোলার মহড়া চলল। একটু পরেই ওডিকলনে ভেজানো ছোট ছোট গরম তোয়ালে চিমটে দিয়ে তুলে প্রত্যেককে দিয়ে গেল সেবিকারা, যাতে হাত মুখ মুছে নিতে পারি। তারপর ষ্টেথিস্কোপের মত হেডফোন প্রত্যেককে দিয়ে গেল। সীটের পেছনে ফুটো আছে তাতে পরিয়ে অনেকগুলো ষ্টেশনের গান ও সবাক ছবির কথোপকথন শোনা যাবে। সিনেমায় পরদা টাঙিয়ে সিনেমা সুরু হয়ে গেল লাঞ্চের সময় পর্যন্ত। শুনতে যদি ক্লান্তি আসে কানের ফুটো থেকে নল বের করে বাইরে রাখা যাবে। চশমা দিয়ে দীর্ঘ সময় দেখার ক্লান্তি দূর করার জন্য চশমা চোখ থেকে না খুলে কপালে রাখা যায়, তেমনি হেডফোনের ডাঁটি কানের ফুটো থেকে খুলে রগে তুলে রাখা যায়। নীচে কেবল মেঘ আর সমুদ্রের নীল জল। [ক্রমশঃ

গণ-গল্প

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মধ্য যুগে বিচার কার্যের ভার ব্রাহ্মণের এবং কাজীদের উপর ছিল। ব্রাহ্মণ বিচারকরা বংশপরম্পরায় বিচারক হতেন না। এজন্য বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা এ কার্যে নিযুক্ত হতেন। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে উহা বংশগত না হওয়ায় ঐ পদেতে উপযুক্ত ব্যক্তির বাছাবাছির সুযোগ ছিল। কিন্তু মোসলেম কাজীগণ বংশগত রূপে বিচারক হতেন। এতে ফল ভালো ও মন্দ দুই হতো। এঁদের তদন্ত ও বিচার কার্য ও শাস্তি প্রদান একত্রে সমাধা হতো। বংশগত প্রথাতে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র বিচারক হতেন। এজন্য প্রায়ই অনুপযুক্ত বিচারকের সৃষ্টি হতো।

কাজীদের বিচারকে উপহাস ও তারিফ করে বহু গণ-গল্পের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে তাদের তারিফ করে সৃষ্ট একটি গণ-গল্পের উল্লেখ নিম্নে করা হলো। কেউ কেউ মনে করেন এই গল্পগুলির মধ্যে সত্য আছে। কিন্তু—অন্যদের মতে এগুলি মুখে মুখে রচিত গল্প মাত্র।

(১) জনৈক জাহাজী নাবিক যুবক যখন তখন কার্যব্যপদেশে সমুদ্র যাত্রা করতো। তার অবর্তমানে জনৈক প্রতিবেশী যুবক গভীর রাত্রে তার গৃহে ঢুকে তার বিবির সাথে মিলিত হয়েছে ও অবৈধ প্রেম করেছে। ঐ স্ত্রীলোকের স্বামীর একত্রে চারিজন পড়শী যুবকের প্রতি সন্দেহ হয়। কিন্তু আসল অবৈধ প্রণয়ী যে কে তা ঐ হতভাগ্য স্বামী বুঝতে পারে না। অনুযোগ করলে তার বিবি ঐ সব বিষয়ে অস্বীকার করে ও ক্রুদ্ধ হয়ে গাল পাড়ে। হতভাগ্য স্বামী নাচার হয়ে কাজী সাহেবের শরণাপন্ন হলো।

'হাঁ। এইসেন বাত', কাজী সাহেব সব শুনে দাড়ীতে হাত বুলিয়ে বললে, আচ্ছা। তাহলে—লিয়ে আয় তোর স্ত্রীকে। এখানে দরবারে ধরে নিয়ে আয় তাকে। ওর চেহারা দেখলেই আমি সত্য মিথ্যা বুঝতে পারবো। কিন্তু ঠিক ঠিক বিচার পেতে হলে তোকেও কিছুটা দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে। হাঁ—

চুরি হচ্ছে সে বুঝতে পারে। কিন্তু চোরকে সে ধরতে পারে না—হতভাগা স্বামীর ছিল সে এক মহা মানসিক যন্ত্রণা। মহানন্দে সে তার বোরখাবৃত স্ত্রীকে বিচারকের সম্মুখে হাজির করলো। কাজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে তাকালেন। তাঁর সম্ভাব্য প্রেমিক ক'জনের নাম ধাম খাতাতে লিখলেন ও তারপর একটা বিরাট হুঙ্কার ছাড়লেন—তার যা কিছু রোষ সেই হতভাগ্য স্বামীর ওপর। কিন্তু তাঁর চক্ষে নিষ্পাপ জন্য সেই স্ত্রীর প্রতি তাঁর অসীম করুণা।

কম কখত! বুড়বাক কাঁহাকো। ঝুটমুট তুই নালিশ আনো! কাজী সাহেব ধমক দিয়ে হতভাগ্য স্বামীকে বললে, আমার কি চোখ নেই না কি? ঝুটমুট খানদানী জেনানাকে দরবারে আনছ। এ মেইয়্যা পুরিসে সতীলক্ষ্মী আছে। তোমরা তিন রোজ কয়েদ। আউর তুহর জেনানা খালাস। হামারা রায় মোতাবেক তুহর জেনানা বিলকুল বে-কসুর আদমী আছে।

দৌবারিকরা স্বামী বেচারাকে কয়েদ ঘরে নিয়ে গেলে তার বিবি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটু মুচকী হাসলেন ও মুখ হতে বোরখা কিছুটা খুলে কাজী সাহেবকে গড় করলেন। কিন্তু এইখানেই কাজী সাহেব তাঁর সকল কর্তব্য শেষ করেন নি। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে তাকালেন। এক

[চ]েহারায় কিছু দেখলেন ও বুঝলেন। তারপর তিনি তার [গ]দীর পাশে রাখা একটা বাক্সো খুলে বসরা থেকে আনা [ম]হা মূল্যবান একটা আতরের শিশি বার করলেন। ঐ [ম]হিলাকে দরবারে এনে বে-ইজ্জত করার জন্যে অনুতপ্ত হাকিম সাহেব তাকে ক্ষতিপূরণ দেবেন।

আরে বেটি, হামি তুহকে এখানে অনলো। লেকেন, লেকেন এ তো হামার বহুৎ অন্যায় হলো, কাজী সাহেব খুশ মেজাজে তরুণীটিকে বললে, আচ্ছা! এহী বহুৎ মূল্যবান এক চিজ তুহকো হামি দিচ্ছে। লেকেন এঠো তুহ আপনা ব্যবহার করবে। এঠো দুসরো কহীকো তু কভি নেহী দেবে। যাও। সেই সাথে কাজী সাহেব এও বলে দিলেন যে ঐ আতর চোখের কোণে ও ভ্রূ যুগলে মাখতে হয়।

মূল্যবান খোসবাই আতরের শিশি মাথা নুইয়ে গ্রহণ করে কুর্নিশ জানিয়ে বিবি সাহেবা গৃহে ফিরলেন। আনন্দের আর তার সীমা নেই। স্বামী কয়েদখানাতে বন্দী। একথা তার নাগর নিশ্চয়ই শুনেছে। এই রাত্রে সে নিশ্চয়ই সংগোপনে আসবে। সে অধীর আগ্রহে মধ্যযামিনীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু এইখানেই তার কাল হলো।

ঘটনাপঞ্জীর তারিখ বদলালো। ভোর হলো ও বেলা পড়লো। হঠাৎ হৈ হৈ করে কাজীর লোকজন পাড়ায় আসে। তার প্রতিবেশী সব ক'জন যুবককে [কা]জী সাহেব তলব দিয়েছেন। বহু পড়শী যুবকদের [স]াথে অপরাধিনীর নাগরকেও যেতে হলো। দরবারে [পা]ড়ার সকল সমর্থ যুবককে ধরে আনা হয়েছে।

কাজী সাহেব একে একে প্রতিটি যুবকের মুখটা [দে]খলেন। ওদের একজনের ভ্রূ-যুগল, কেশরাজী ও [ঠোঁ]টের কোণ হতে ভুর ভুর করে বাদশাহী আতরের [খো]সবাই বার হচ্ছিল। আসলে যা হবার তাই [হ]য়েছিল। কাজী সাহেবের অনুমান মিথ্যে হয়নি। [ঐ]ই রাত্রেই অপরাধিনী তার প্রেমাস্পদকে ঐ আতর [দি]য়ে আপ্যায়িত করেছে। আগে নাগরকে না মাখিয়ে নিজে তা মাখে কি করে। তার আগেতে কয়েদীকে [ঘ]রে ডেকে এনে উনি তার পাশে বসিয়ে রেখেছেন।

স্বামী বেচারা কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন।

পাকড়াও, পাকড়াও হারামী। কমবখৎ, কাজী সাহেব চীৎকার করে তাকে ক'ঘা পাদুকা প্রহার করে বললেন, দোসরা কো জানানাকে পাশ তুম যাও। আভি একরার করো। নেহী তো কোতোল হও। তুম সমঝে মে লোক বুড়বাক আছে? •

কাজীরা তড়ীৎ ঘড়ীৎ বিচার প্রদান করতেন। তারা অভিযোগ পাওয়া মাত্র ঘটনা স্থলে যেতেন। সাক্ষীসাবুৎ গ্রহণান্তে সেইখানেই বিচার করতেন। সম্ভবমত সর্ব সমক্ষে তাকে বেত্রাঘাত করতেন। এমন কি ঘটনাস্থলে অঙ্গচ্ছেদ বা ফাঁসীতে লটকানোর ঘটনাও বিরল নয়। তাঁরা গোয়েন্দার কার্য ও গোপন তদন্তও নিজেরা করতেন। এজন্য সাধু ও দরবেশ এবং ভিখারীর বেশও তাঁরা ধারণ করতেন। বিচার কার্যের জন্য বহু বংশগত কলা-কৌশলও তাদের আয়ত্ত ছিল। কিন্তু— তা সত্ত্বেও জনসাধারণ কাজীর বিচারকে উপহাস করে গণ-গল্পের সৃষ্টি করেছে। এর কারণ তাঁরা ঠিক আইনানুসরণ করে কার্য করতেন না। এজন্যে বিচারে বহুক্ষেত্রে তাঁদের মারাত্মক ভুল হতো। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র-সম্মত আইনানুযায়ী বিচার করতেন। এজন্যে এঁদের বিচারে দোষীরাও প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেতো। ঐ যুগের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আইনের মারপ্যাচের সুযোগ নিতেন। এইজন্য কাজীর বিচার তাদের অপছন্দ হতো। সাহিত্য রচনাতে সক্ষম ঐ সকল মুখর [Vocal] ব্যক্তিরা কাজীর বিচারে সমালোচক হন ও বহু হাস্যকর গণ-গল্প সৃষ্টি করেন। কাজীরা এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতেন যে তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা অধিক থাকতো। এই পদ্ধতিকে অপছন্দ করে গণ-গল্পগুলির সৃষ্টি হয়। এইরূপ অপর এক গণ-গল্প নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

(২) গৃহস্থ বাড়ীতে একটি বড়ো চুরি হয়। এই চুরিতে দশ জন ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হলো। এখন এই দশ জনের মধ্যে কোন জন অপরাধী, এইটি বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ঘটনা পরম্পরায় ঐ দশ ব্যক্তির প্রত্যেককে সন্দেহ করা যেতে

পারে। বিচারক কাজী সাহেব তাদেরকে আদালতে ডেকে পাঠালেন। কাজী সাহেব বুঝলেন যে—ঐ সব-ক'জন গ্রাম্য ব্যক্তি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভূত প্রেত ও মন্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাসী। কাজী এবার দশটি কাঠি তার বাক্সো থেকে বার করলেন ও তাতে মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন। অপরাধীরা তা দেখলো বুঝলো ও ভাবলো—বাবা! সামান্য গরীব সাপুড়ে ও ভূতের ওঝাদের কীর্তিকলাপ তারা দেখেছে। কিন্তু সেগুলো যে হাত সাফাই বা ফাঁকি তা তাদের ধারণার বাইরে। এখন কাজী সাহেবের মত মহাশক্তিধর ব্যক্তির মন্ত্র ওদের চাইতে জোরালো হবে। এইটুকু বিশ্বাস করে তারা ঠক ঠক করে কাঁপে কিন্তু অপরাধ স্বীকার করে অঙ্গহানি হতে তারা চায় না। অন্যদিকে কিন্তু এই লোকগুলো দারুণ বুদ্ধিমান ছিল।

হুম্, অপরাধ অস্বীকার করে আমার কাছে পার নেই; কাজী সাহেব এক একটি কাঠি একজনের হাতে দিয়ে বললেন, এগুলির দৈর্ঘ্য একরূপ আছে। তোমরা এই কাঠি নিজের নিজের বাড়ী নিয়ে যাও। যে চোর তার কাঠি রাত্রের মধ্যে এক ইঞ্চি বেড়ে যাবে, আমি তাহলে বুঝতে পারবো তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি চোর। ব্যাস্—

সন্দেহমান ব্যক্তিরা এক একজন এক একটি কাঠি হাতে বার হয়ে গেল। পালানোর পর ধরা পড়লে গর্দান যাবে। তাই প্রত্যেকে স্ব স্ব কাঠিসহ পরদিন সকালে দরবারে আসতে বাধ্য। কিন্তু চোরেরা একটু বেশী চালাক হয়ে থাকে। তাই আসলে যে চোর সে এই বিপদ হতে মুক্তি পেতে চালাকীর আশ্রয় নেয়। বড় ছোট যা হবে তা রাত্রে হবে। অতএব দিনে সে তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা করে। এখন সে আনন্দে নিশ্চিন্ত। তন্ত্র-মন্ত্রকে সে ফাঁকি দিলে।

পরদিন সকালে ওরা প্রত্যেকে আদালতে এসে স্ব স্ব গৃহীত কাঠি পেশ করলে দেখা গেল যে ওদের একজনের কাঠি দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি কম। চালাক চোর তার ঐ কাঠি কেটে আগে ভাগে কমিয়ে রেখেছে। তার ধারণা মন্ত্রপুত কাঠি এক ইঞ্চি বাড়বে। তাই সে সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

বহু কাজী আইনানুযায়ী বিচারে অভ্যস্ত ছিলেন। এখানে আইনের অসহায়তাকে উপহাস করে গল্প-গাথার সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে ঐরূপ একটি গল্প উদ্ধৃত করা হলো।

এক ব্যক্তির উপর জঘন্য অপরাধ সঙ্ঘটিত হয়। সেই ব্যক্তি কাজীর কাছে বিচারপ্রার্থী হলেন। সকল কথা শুনে কাজী বললেন—

তোমার সাক্ষী নেই। আমি কি করবো। তুমি শুধু বললে হবে না। তোমাকে সমর্থনে সাক্ষী দিতে হবে। এর পর অনেক ব্যক্তির পরামর্শে ফরিয়াদী সেই আদালতে ফিরে এলো ও বললো—হুজুর! সাক্ষী আছে। কিন্তু আপনার কানে কানে তার নাম বলবো। অনুমতি পেয়ে কাজীর কানে কানে বহু কথা বললো। কিন্তু উপস্থিত অন্য ব্যক্তির কেউ তা শুনতে পায়নি। কাজী সাহেব ফরিয়াদীর কথাতে ক্ষেপে উঠে বললে—ক্যা মে কো গালি বকতা। হামকে চোর বদমাস গাধা বোলতা। হামরা বাপকো ভী গালি দেয়তা! এই ফরিয়াদী সত্যই হাকিমকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে। কিন্তু এই দারুণ অপরাধ প্রমাণে কোনও সাক্ষী নেই। অন্য কাজীর আদালতে উনি এজন্য মামলা দায়ের করলেন বটে কিন্তু তা প্রমাণ করার জন্য কোনো সাক্ষী দিতে পারেন নি। এতো বড়ো কাণ্ড ঘটে গেলো, কিন্তু দরবারে উপস্থিত অতোগুলো লোক শুনলো না। এসব কাজী সাহেবের বিরুদ্ধে যায় কাজী সাহেব তখন তার ভুল বুঝে সাবেকী কায়দাতে তদন্ত ও বিচার করে ফরিয়াদীর উপকার করলেন।

বর্তমান কালীন বহু সুবিচারকদের সম্বন্ধে বহু গল্প-গল্প সৃষ্টি হয়, বলাবাহুল্য এগুলির অধিকাংশ অলীক। তারিফ করে এগুলি সৃষ্ট হয়। পরে তার নামের সাথে এগুলো ওরা জুড়ে দেয়। এগুলি বিশ্বাস-যোগ্য করবার জন্যে ইহা করা হয়, কেউ কেউ বলেন যে গুণের স্বীকৃতি স্বরূপ ওদের নামে জনতা এগুলি সৃষ্টি করে ও সাগ্রহে গ্রামে গ্রামে তা প্রচার করে। অবশ্য ওদের কতকগুলিতে সত্যও থাকে।

রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [সাহিত্য-সম্রাট] মহোদয় একজন সুবিচারক ছিলেন। তাঁর

নামে প্রচারিত ওরূপ বহু বিচার কাহিনী শুনা গিয়েছে। উহাদের মধ্য হতে একটি নিয়ে উল্লিখিত হলো।

"পঞ্চাশ বৎসর আগেও অতিথি গৃহস্থদের নিকট দেবতা ছিল। ঐ সময় রাত্রে এক অতিথি এক গৃহস্থের দ্বারে এলেন। সে সময় ঐ গ্রামে সিঁদেল চুরির হিড়িক পড়ে গিয়েছে। গৃহস্থ এই অপরিচিত অতিথিকে গৃহে স্থান দিতে ইতস্তত: করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণকে তিনি ফিরাতে পারেন নি। তাকে চোষ্যচোষ্য-পেয় দ্বারা আপ্যায়িত করে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে শুতে দিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে ব্রাহ্মণ একটা শব্দ শুনে জেগে উঠে দেখলেন যে নীল কোর্তা পরা এক ব্যক্তি একটা বাক্স মাথায় করে পাচিল টপকে বাইরে এলো। এই অতিথি ব্রাহ্মণ এক মহা সমস্যায় পড়লেন। প্রত্যূষে উঠে গৃহস্থ তাকে চোরের গোয়েন্দারূপে সন্দেহ করবেন। তাঁকে চৌর্য্য অপরাধ মাথায় করে হেনস্তা হতে হবে। তিনি তখুনি উঠে সেই চোরকে ঝাপটে ধরলেন।

আরে, ঠাকুর মশায়! কী করছেন? সেই চোর সেই ব্রাহ্মণকে অনুযোগ করে বললো: চৌর্যদ্রব্য ভাগা-ভাগী করবো। বড় হিস্যা আপনাকে দেবো। কিন্তু—একটুও চেঁচাবেন না, আমি থানার একজন সিপাহী। এখানে পাহারা দিই ও মোওকা মত চুরি করি। আমি পাল্টা অভিযোগ তুলবো। তখন লোকে আমাকে বিশ্বাস করবে। আর আপনাকে তারা চোর মনে করবে।

ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের এই প্রস্তাবে সায় নেই। এর কথাকে তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি একা পরিত্রাহি-ভাবে চোর চোর বলে চেঁচিয়ে উঠেন। সেই চোরও তখন ব্রাহ্মণকে ঝাপটে ধরে 'চোর চোর' রবে চেঁচাতে লাগলো। গৃহস্থ ও পড়শীরা উঠে ঘটনাস্থলে এসে দেখে উভয়ে উভয়কে ধরে টানাটানি করছে। ব্রাহ্মণের ভাগ্যদোষে সেই চোর স্থানীয় থানার জনৈক সিপাহী। ক'দিন ধরে সে গ্রাম পাহারা দিতেছে কিন্তু এতদিন একজন চোরও ধরতে পারেনি। কিন্তু আজ সে সেই চোরকে ধরতে পেরেছে। গ্রামের লোক সিপাইকে বিশ্বাস করে তাকে থানাতে পাঠালো।

এই মামলা হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে উঠেছে। হাকিম বাহাদুর উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনলেন ও হাসলেন। তিনি পরদিন উভয়কে পুনর্বার আদালতে হাজির হতে বললেন। পরদিন দারোগাবাবু তাঁর হুকুম মত উভয়কে আদালতে হাজির করলেন।

উহু। আজ নয়। কালকে বিচার হবে, হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্তির ভঙ্গিমাতে বললেন, 'তোমরা দু'জনাই লোক সুবিধের নয়। 'আচ্ছা, তোমরা এক কাজ করো। আদালতে একটা ময়না তদন্তের মড়া এসেছে। যাও, তোমরা দুজনে খাট সুদ্ধ তুলে ওটাকে দু' ক্রোশ দূরে ময়নাতে রেখে এসো বাপু। এ হুকুম তোমাদেরকে এখুনি তামিল করতে হবে।

আদালতের অলিন্দাতে হাকিমের খাস কামরার সামনে একটা খাটীয়াতে আপাদমস্তক চাদর মোড়া একটি মৃতদেহ শায়িত ছিল। হাকিমের হুকুম মত একদিকে ব্রাহ্মণ ও অন্যদিকে সেই সিপাই খাটিয়া মাথাতে তুললেন। তারপরে হাকিমের নির্দেশমত কাটফাটা রৌদ্রে মাঠের নির্জন পথ ধরে ময়না ঘরেতে চললেন।

'হায়, হায়, বামুনের ছেলে হয়ে একি দুর্ভোগ' নিরপরাধ ব্রাহ্মণ আক্ষেপ করে সিপাইকে বললেন, দুর্বৃত্ত! তোর নরকেও স্থান নেই। তুই নিজে চোর। আবার—আমাকে মিথ্যে মামলাতে জড়ালি। এটা কোন নীচ জাতের মড়া হবে। তবু একে আমাকে স্পর্শ করতে হলো'।

'ঠাকুর। এ শাস্তি তোমার প্রাপ্য। ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করে চোর-সিপাই বললে, 'আমি তো বলেছিলাম। ঠাকুর, আমাকে ছেড়ে দাও। চোরাই মাল দু'জনে ভাগ করি। এখন ঠেলা সামলাও। পুলিশে সামান্য দু'টাকা মাইনের চাকুরী। চুরি ও ঘুষ ভিন্ন অন্য গতি নেই। ভুলের মাশুল এখন দাও। বেশী ধার্মিকতার ফল কি হয় তা দেখো।

পরদিন আদালতে লোকে লোকারণ্য। আজকে এক ব্রাহ্মণের সেখানে বিচার হবে। অতিথি ঐ ব্রাহ্মণ

সেজে এই ব্যক্তি গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় নেয় ও গভীর রাত্রে চুরি করে। সিপাহীর পক্ষে বহু সাক্ষী। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে কেউ নেই। হাকিম একটু হাসলেন, ও বললেন এই ব্রাহ্মণের সাক্ষী আছে। এই বলে উনি একটি যুবককে ডাকলেন ও বললেন—'এই যুবক ওদিন মড়া সেজেছিল। সে খাটে শুয়ে ওদের সব কথা শুনেছে। পুলিশ এর সাক্ষ্য নিক ও মামলার পুনঃ তদন্ত করুক। হাকিমের এই হুকুমের পর তার বক্তব্য শুনে আদালতশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করে উঠলো।

ধর্মাধিকরণ সম্পর্কিত গণ-গল্প সমূহ প্রাচীনকালেও জনতা কর্তৃক রচিত হতো। দুইটি নারী একটি সন্তানের দখলী স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হন। উভয়েই ঐ শিশুর মাতা বলে দাবী করেছিলেন। ওদিকে সাক্ষী সাবুদের অভাব। বিচারক করাত দিয়ে কেটে ঐ শিশুকে দুভাগ করে বিবাদীদের তা গ্রহণ করতে বললেন। প্রকৃত মমতাময়ী জননী এতে রাজী হননি। তিনি শিশুর জীবন রক্ষার্থে সন্তানের উপর দাবী পরিত্যাগ করেন। কিন্তু জাল-মা' এই বিভক্তির প্রস্তাব সানন্দে মেনে নেন। এদের এই পরস্পর বিরোধী অভিব্যক্তি [কনডাক্ট] হতে প্রকৃত মাতা কে তা মহাধর্মাধিকরণ বুঝে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এভাবে বিচার বিভ্রাট গণ-গল্প প্রাচীনকাল হতে সুরু হয়েছে।

ব্রিটিশ পিরিয়ডে ব্রিটিশ আইনে কোনও শোনা কথা আদালতে সাক্ষ্যরূপে অগ্রাহ্য। দেশীয় ব্যক্তিদের প্রথম প্রথম এই ব্যবস্থা ভালো লাগেনি। গ্রামের মোড়ল বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে সত্য মিথ্যা বুঝে আদালতে তা বললে। কিন্তু ভারতীয় এভিডেন্স এ্যাক্ট মতে তা অগ্রাহ্য হতে থাকলো। এক্ষেত্রে বিরূপ হয়ে ভারতীয়রা গণ-গল্পের সাথে বহু প্রতিবাদমূলক প্রবচনও সৃষ্টি করে। যথা—'মা বলেছেন—উনি আমার বাবা। মশাই, এই শোনা কথা আমরা বিশ্বাস করি না।' মশাই, এই শোনা কথারও রকমফের আছে বৈকি। এইসব বিলাতী আইনকে ঠাট্টা তামাসা করে এরূপ বহু গণ-গল্প ও প্রবচন সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশাসনিক ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে ও প্রশাসকদের দাম্ভিকতা মূর্খামি ও অসভ্যকে উপহাস করে বহু গণ-গল্প সৃষ্টি হয়। গবুচন্দ্র ও হবুচন্দ্র রাজা ও মন্ত্রী পুরাণো কাহিনী। কিন্তু এযুগেও ওরূপ বহু গল্প দানা বাঁধতে সুরু করেছে। গভর্ণমেন্টের কয়টি চাকুরী ভর্তি হয়ে গেলে নাগরিকদের সওদাগর অফিসে ধর্না দিতে হয়। এখন সওদাগর অফিসগুলিতে ইংরেজের বদলে দেশীয়দের প্রাধান্য। এদের কারও ব্যবসায়ে বাইরে মাথা কম খুলে। মস্তকে ও ভুঁড়ীতে ষ্টেথিস্কোপ যন্ত্র রেখে ডাক্তারী পরীক্ষা আজ জনপ্রবাদ। এদের দাম্ভিকতা প্রসূত অজ্ঞতা উপলক্ষ্য করে বহু গণ-গল্প মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছে। এইরূপ দুইটি গল্প নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো। এই গল্পদ্বয় কিন্তু আমার জ্ঞানতঃ সত্য। আমার জানা এই গল্প দুটি বহুজনের মুখে শুনে অবাক হই। জনতা মনের বেদনা জানাতে এই গল্পটি উপযুক্ত মনে করেছে ও প্রচার করেছে। মনোমত সত্য গল্প পেলে লুফে নিয়ে তারা প্রচার করে। এইভাবে বহু সত্য গল্পও গণ-গল্পের রূপ নিয়ে প্রচারিত হয়।

(১) আমি একজন নন-ম্যাট্রিক টাইপিষ্ট। অমুক ধনী সওদাগর অফিসে কাজ করি। একদিন কোম্পানির ল [Law] অফিসার একট পত্র ড্রাফট করেন ও মালিক তাতে এপ্রুভড্ [মঞ্জুর] লিখে সই করেন। আমি ঐ পত্রটি টাইপ করেছি। কিন্তু তাতে মারাত্মক ভুল থাকাতে বিপক্ষ পক্ষ ওটা কাজে লাগালো। মালিক ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে ডেকে বললে—তুম কাহে নেহী দেখ নিলে। 'বাবু সাব। আমি কৈফিয়তে বললাম, 'আমি কি আইন জানি। আমি কি করে দেখে নেবো। এতো শক্ত ল [Law]-এর ব্যাপার। 'আরে', কোটিপতি মালিক খেঁকিয়ে উঠে বললে, ল [Law] কুছ হাতি ঘোঁড়া আছে। শিখ লেও। বুঝলাম, দানাপানি এখানে আমার আর বেশী দিন নেই।

(২) অমুক প্রতিষ্ঠানের বহু মজদুর অন্যত্র কাজে চলে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও কেউ তাদের পূর্বস্থান ঝাপড়াগুলো ছাড়েনি। ফ্যাক্টরীর কম্পাউণ্ডে ঢুঁড়েতে তারা বাস করছে। মালিক ম্যানেজারকে ডেকে বললেন—আরে। কাঁহে উন্‌লোক উঠলো না। ম্যানেজার সাহেব সপ্রতিভভাবে উত্তর দিলেন—'বাবুজী, আব

রাতসে ঝাপড়া যে লোক জালিয়া দেবে। আজ রাত যো বাজে সব কুছ কভম কর দেজে। ঐ সময় আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। মালিকবাবু চলে গেলে আমি ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম—'সে কি মশায়, আপনি ঘর জালিয়ে দেবেন।' আজ্ঞে, পাগোল, ম্যানেজারবাবু বললেন, তাও কি হয় নাকি? "কিন্তু কাল জিজ্ঞাসা করলে ওকে কি বলবেন" আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম। 'হাঁ হাঁ', ম্যানেজারবাবু উত্তর দিলেন, 'কাল উনি পুছ করবেন বৈকি? কিন্তু ওর প্রশ্ন ও আমার উত্তর ঠিক করা আছে। আমি ওকে তখন বুঝিয়ে বলবো বাবু সাব। আমরা তৈরী হয়ে ওদের ঘর জালাতে গিছলাম। লেকেন ওরা গোড় পাকড়ালো, আউর বললো দশরোজ টাইম মিললে উলোক উঠে যাবে। হামাদের তো উঠানোই কাম। তাই দশ রোজ টাইম দিয়ে দিলাম। এর পর উনি আর ও বিষয় পারসিউ [Pursu] করবেন না। এমন কি কাকে কি বলে ছিলেন তাও ওদের মনে থাকবে না। হঠাৎ মনে পড়লে যদি জিজ্ঞাসা করে বসেন, তাহলে তার উত্তরও আমার ভাবা আছে। আমি তখন সেরেফ তাঁকে বলে দেবো। 'বাবুজী ও হুকুম তো আমাকে দেননি।' কিংবা যার উপর আমার খেলাপ [শত্রুতা] আছে তার নামে দোষ দিয়ে বলবো, 'বাবুজী! আপনি উনকো বলেছিলেন, এইভাবে এদের কাছে আমাদের চাকুরী করতে হয়ে থাকে।

এদের খামখেয়ালী ও দাম্ভিকতা পূর্বতন জমিদার ও রাজাদের স্বভাবকেও হার মানায়। এরা দেশেতে নূতন ধরণের জমিদার। এদের অবিচার ও অত্যাচারে জমিদাররা লজ্জা পাবে। উপরোক্ত গণ-গল্পের প্রসার উহার এক মৌন প্রতিবাদ।

সরকারী অফিসে চারটি বাক্য দ্বারা বড়কর্তারা কাজ চালান। বাকি কাজটুকু অধীন কর্মীরা করে দেন। ওদের শুধু ফাইলে লিখতে হয় চারটি শব্দ। যথা, 'এ্যাস্ প্রপোসড্, আই এগ্রি, নো অবজেকসন, ফাইলড্'। অনুরূপভাবে সওদাগরী অফিসেতেও চারটি বাক্য দ্বারা কাজ চলে। যথা, 'কোঈ বাত নেহী।' 'নথী কর দেও'। 'হিসাব লে লেও'। 'ছুটি'।

উপরের বিষয়গুলির উপরও কর্মকর্তাদের উপহাস করে বহু প্রতিবাদমূলক গণ-গল্প সৃষ্ট হয়েছে। বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অধুনা ইংরাজী অনভিজ্ঞ একাউন্টেন্ট নিযুক্ত আছে। তারা দেশীয় ভাষাতে হিসাব রক্ষা করে। আয়কর অফিসারদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রাচীন [মাড়বারী] হরফের এরা সাহায্য নেয়। এরা স্বভাবতঃ অন্যের পক্ষে অসুবিধাকর।

নেহী বাবুজী। হাম রূপেয়া না দেবে। খাতাঞ্চিবাবু ডাক্তারবাবুকে হাঁকিয়ে দিয়ে বললে, হামাকে চিন্তা করতে সময় দিতে হোবে। ডাক্তার ভদ্রলোক নাচার হয়ে ম্যানেজারের সই সহ হুকুম এনে বললে—নাও। ব্লাডী ফুল। টেক্ ইট্। ক্যা বোলে। বাবু সাব? খাতাঞ্চিবাবু এবার সপ্রতিভ ভাবে বললেন, এবাত্, আপ পয়েলা কাহে নেহী বোলা। এ বাত পহেলাহী বোলতা তো হাম জরুর রূপেয়া দে দেতা।

আমার নিজের জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছিল। এই গল্পটি আমি কয়জনকে বলেছিলাম। গণ-গল্প সংগ্রহকালে ওটি আমারই কাছে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে ওটি গণ-গল্পাকারে চালু হয়ে গিয়েছে। কারণ—ঐ কাহিনীটির মধ্যে প্রতিবাদের সুর ছিল।

"এক ব্যক্তি রাত্রে একটি হাতঘড়ীসহ ধরা পড়ে। ঘড়ীটাকে আমরা চোরাই দ্রব্য বলে সন্দেহ করি। ঐ আসামীকে তার গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা ঘড়ীটি ক্রীত হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ দোকানীর রসীদ দাবী করি। রসীদের অভাবে ওটি চোরাই মাল বলে গণ্য হবার কথা। অপরাধীর চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা নীরবে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। হঠাৎ সে আমার পকেট হতে আমার পুরাণো কলমটি তুলে নিয়ে বলে উঠলো—এটার রসিদ আপনার আছে? কলমটি পঠদ্দশায় আমি কিনেছিলাম। এতোদিন রসিদ রাখা সম্ভব নয়। এমন কি কতো দামে ও কবে এবং কোন দোকান হতে ওটা কেনা এই তথ্যগুলিও আমার মনে পড়লো না। সেই বালিকার অভিযোগে আমাকে নিরুত্তর থাকতে হয়েছিল।

খোসামদ [চাটুকারিতা] সম্বন্ধে বহু গণ-গল্প চালু আছে। খোসামদপ্রিয় ব্যক্তি বহু অসুবিধার সৃষ্টি করে। জনতার উহা পছন্দ নয়। তারা বহু গণ-গল্প দ্বারা উহার প্রতিবাদ করে। খোসামদের মধ্যে ছেদ পড়লে পূর্ব খোসামদ পচে যায়। অথচ—অব্যাহত ভাবে খোসামদ করা চাই। কিন্তু ইহা সম্ভব নয়। তাই কার্য উদ্ধারের কিছু পূর্ব হতে খোসামদ করার রীতি। খোসামদপ্রিয় মানুষ তা বুঝে না। খোসামদকে খোসামদ বুঝেও তার তৃপ্তি। জনতা এই প্রথাকে ক্ষতিকর প্রথা মনে করে।

(১) আরে! তুমি এতো বড় ইলিশমাছ এনেছো? অমুক জ্ঞানী গুণী ও ধনী লোক বললেন, এটা আবার এতো পয়সা খরচ করে কিনলে। না না। এ বাবু তোমার বড়ো অন্যায় হলো।

না স্যার। এটা আমি কিনিনি। স্তাবক ভদ্রলোক বললেন, ওটা আমাদের পুকুরের ইলিশমাছ, জাল ফেলে ধরেছি। আপনার জন্যে নিয়ে এলাম।

বটে! তাই নাকি? অমুক গুণী, জ্ঞানী ও ধনী লোক প্রত্যুত্তরে বললেন, বেশ বেশ। তুমি বাপু আমার বাপের কাজ করলে। আমার বাপও কখনো আমাকে পুকুরের ইলিশ খাওয়াতে পারেনি। ভালো ভালো। আচ্ছা! তাহ'লে ওটা অন্দরে দিয়ে এসো হে।

(২) আজ্ঞে! আপনার উপদেশ মত অমুক জ্ঞানী, গুণী, ধনী ও মানী ব্যক্তির কাছে চাকুরীর উমেদারী করতে গিছলাম। ওখানে গিয়ে দেখি উনি কলেজের শুধু প্রিন্‌সিপ্যাল নন। স্তাবক ও শিষ্য পরিবৃত উনি যেন একজন মহন্ত। যাই হোক, আপনার উপদেশ মত তাঁর পদধূলি গ্রহণেও প্রস্তুত হই। কিন্তু তখন কি জানি যে ঐ পদযুগলের দিকে অন্য এক ব্যক্তিও তাক করে আছে। একই সাথে দুজনা সেইদিকে দৌড়েছি। ব্যাস। মাঝ পথে উভয়ের মাথা ঠোকাঠোকি। এই দেখুন কপালটা কিরূপ ফুলেছে। মশাই, আর ওদিকে মরে গেলেও যাবো না।

দেশবরেণ্য নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পরিবার সম্বন্ধেও বহু গণ-গল্প মুখে মুখে প্রচলিত হয়েছে। এখনও জনতা বিশ্বাস ক'রে আনন্দ পায় যে তাঁদের পোষাক খাস বিলাত হতে কাচিয়ে আসে। তৎপুত্র মহান নেতা—শ্রীজহরলাল নেহরু প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের সহপাঠী। উনি ভারত ভ্রমণে এসে প্রথমে বন্ধু জহরলালজীর সাথে দেখা করতে চান। কিন্তু প্রিয় জহর জেলে শুনে তিনি রেগে টঙ্। এই প্রচারের বিরুদ্ধে নেহেরু পরিবার হতে বারে বারে প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু সেই গণ-গল্প এখন দেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়ে চলেছে। কিন্তু আমি জানি যে এই গল্প সর্ব প্রথম ভবানীপুর মিত্র ইনিষ্টিটিউশনের আমার সহপাঠী বিভাষ রায় ১৯১৮ সনে সৃষ্টি করেন। পরে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে ইহা আজ সর্ব ভারতের অতি প্রিয় গণ-গল্প।

উপরের কাহিনী থেকে একটি বিষয় সুপ্রমাণিত হয়। রাজা ত্যাগী হলে জনতা তাকে সর্বাগ্রে গ্রহণ করে। বুদ্ধদেবের কাল হতে এদেশে জন-গণ-মন চিত্ত এইরূপে গঠিত। টাকীর লাঠি ও সাতক্ষীরের মাটি—এই জন প্রবাদটিও ওই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই জমিদারদ্বয়ের স্ব স্ব প্রজারা তাদেরকে শক্তিমান ও বিত্তমান বুঝে গর্বানুভব করতেন। পণ্ডিত জহওলাল নেহেরু সম্বন্ধে আরও একটি গণ-গল্প প্রচলিত আছে। এই কাহিনীটি কিন্তু একটি সত্য ঘটনা।

কয়জন বাঙ্গালী যুবক সাইকেলে ভারতের শীতপ্রধান পশ্চিমপ্রান্তে এক [হরিপুরা] কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে বার হন। সাইকেল আরোহী সাতজন যুবক পথেতে এলাহাবাদে জহরলালজীর সাথে দেখা করেন। জহরলাল তাদের শুধু স্নানাহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন নি। তিনি তাদেরকে তারিফ করে বলেছিলেন—'আরে! এই পোষাকে কোথায় যাও। ওখানকার দারুণ শীতে তোমরা মারা যাবে। পশ্চিমের শীত সম্বন্ধে তোমাদের কোনও ধারণা নেই। এই বলে তিনি তাদেরকে গাড়ী করে দোকানে নিয়ে সাতটি গরম ওভারকোটের অর্ডার দেন। পথের বিভিন্ন স্থানের তাঁর পরিচিতদের নামে ওদের হাতে তিনি কয়েকটি পত্রও দেন। ঐসব পত্রে তিনি জাগীর দিয়ে তাদেরকে লিখেছিলেন—সাতজন জহরলাল

আপনার ওখানে যাচ্ছেন, ওদের স্নানাহারের ও আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি যেন না হয়, বুঝবেন। এরা প্রত্যেকে আমার মত একজন জহরলাল।'

জহরলালজীর গুণমুগ্ধ সাইক্লিষ্ট যুবকরা ফিরে এসে এই গল্প সর্বত্র প্রচার করেন। তাদের একজনের মুখে এটা আমি শুনেছিলাম। এই অলিখিত কাহিনীটি বাংলার জনসমাজের আজ একটি অতি প্রিয় গল্প। তাঁর সহিত অন্য নেতার তুলনা বুঝাতে এই গল্পটি ব্যবহার করা হয়। এইরূপ ব্যবহার জনসমাজ প্রত্যেক নেতার কাছে আশা করে। কিন্তু তা না পেয়ে এই গল্প বেশী করে প্রচার করে তারা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ জানায়।

য়ুরোপেও এইরূপ বহু আশাভঙ্গ ব্যঞ্জক গণ-গল্পের প্রচলন আছে। এইক্ষেত্রে ফ্রান্সের গণ-বিদ্রোহের কালে মুখে মুখে রচিত একটি কাহিনীর কথা বলা যেতে পারে। ফ্রান্সের রাণী জনতার কোলাহল শুনে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ওরা চেঁচায় কেন, ওরা কি চায়? তাঁর সুবিজ্ঞ মন্ত্রী তাঁর প্রশ্নের জবাবে বললেন—'মহারাণী! ওরা রুটি চায়। কিন্তু রুটি নেই। ওদের দেবো কি।' এর উত্তরে সাম্রাজ্ঞী মন্ত্রীপ্রবরকে বলেছিলেন—তবে কেক দাও না কেন? বলা বাহুল্য এই গল্পের মধ্যে কোনও সত্য থাকতে পারে না। এগুলি জনতা কর্তৃক রচিত উপহাসকারী গণ-গল্প মাত্র। 'রোম পুড়ছে। কিন্তু নীরো তখন বাঁশী বাজাচ্ছেন'—এটিও নিছক গণ-গল্প। কিন্তু তাহলেও ঐটেই তাঁর সম্পর্কে জনতার মনের কথা। (ক্রমশঃ)

কবি

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

কবি আমি, চির ব্যথার ব্যথী গো,
 সবার চেয়ে যে দুখী ;—
সবার বেদনা চিত্তকে মোর
 করেছে মর্ম্মমুখী।
বনস্পতির পতনের দুখ
 যেমন বেদনা হানে—
 আমার বিধুর প্রাণে,—
তেমনি কুঁড়িরও প্রকাশের ব্যথা
 করে মোরে উৎসুকী।

অগ্নি-জ্বালায় জ্বলিয়া দীর্ণ
 গিরির পাষাণ হৃদি ;
অগাধ সিন্ধু আছাড়িছে কূলে
 হারায়ে বুকের নিধি।
রিক্ততা নিয়ে একা একা শুধু
 কাঁদিছে বিশাল মরু—
 নাই ফুল, ফল তরু ;—
সবার ব্যথায় আতুর আমি যে ;
 তোমরা দেখিছ সুখী!

আর্ত্ত-ভুবন ডাকে চারিদিকে—
 পেতে এ হিয়ার সাড়া।
বেদনা-শল্যে বিদ্ধ হৃদয়ে
 ঝরে যে রক্তধারা।
তৃণ-অঙ্কুরে শিশির-অশ্রু
 ঝরে নিতি নিরালায় ;
 তারারাও নিরুপায়
ছলো ছলো চোখে তাকায় এ মুখে
 নভ-বুকে দিয়ে উঁকি।

ক্রৌঞ্চীর শোকে বেদনা-ব্যথিত
 রচেছি প্রথম শ্লোক,—
(জানি না সে বাণী সৃজিল কখন
 রসের অমৃতলোক)।
আজি বেদনার সেই সে প্রবাহ
 নিঃসাড়ে তলে তলে
 নিয়ত বহিয়া চলে।
আজো নিখিলের বেদনা আমাকে
 করে তাই উন্মুখ-ই।

মনের অসুখে ভুগি আমি, তাই
 হিয়া মোর জরোজরো।
ব্যথার আঘাত সহিবার তরে
 কার প্রাণ এত বড়ো?
দুঃখ-বিষের বেদনারে একা
 গোপনে বহিয়া প্রাণে—
 মাধুরীর সুধা দানে
বিমুখী চিত্ত করি যে নিত্য
 আনন্দ-কৌতুকী।

সত্যের সন্ধান

শ্রীগোপাল দাস কাব্যভারতী

সংসার ছাড়িয়া মহা সত্যের সন্ধানে,
গৌতম চ'লেছে ব্রতী মানব কল্যাণে।
বৈশালী ছাড়িয়া চলে ভরিল না মন,
বহু বহু শাস্ত্র পাঠে না হলো সাধন।
কত যোগী মুনি ঋষি হেরিলেন যাঁরে,
শুধালেন সত্য জ্ঞানে পেয়েছ কি তাঁরে?
দেহের পীড়ন করি কঠোর সাধনে,
যোগ সিদ্ধি নহে সত্য পরম রতনে।
অকারণে দেহ যন্ত্র ক্ষীণ হীনবল,
অস্থি চর্ম সার করি সাধনা নিষ্ফল।
কোথা পাবো পূর্ণ জ্ঞানে আলোর সন্ধান,
ছাড়িলাম পত্নীপুত্র রাজত্ব সম্মান।
রোগে শোকে জরাগ্রস্ত মনুষ্যজীবন,
কোথা সত্য জ্ঞান লভি মুক্তি সঞ্জীবন।
ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত বহু উর্ধ্বে ধায়,
কেমনে হইবে সত্য মুক্তির উপায়।
কত বন জনপদ অতিক্রম করি,
মগধের পথে চলে সত্যের পূজারী।
হেরিলেন ধুলা উড়াইয়া আসে ঝড়,
আকাশেতে মেঘ নাই এ কি কলস্বর।
ক্ষণ পরে কেটে গেল সকল সংশয়,
ঝড় নহে মেষপাল হইল প্রত্যয়।
এত মেষ ছাগলের বিপুল উদ্যম,
কোথায় চলেছে এরা শুধায় গৌতম।
রাখালের দল বলে-'রাজা বিম্বিসার,
মহাযজ্ঞ করিছেন মহিমা অপার।

সেই যজ্ঞে নিশি রাত্রে বলি আয়োজন,
হাজার হাজার মেষ তাহে প্রয়োজন।
অবাক! শুনিয়া কথা, একি অঘটন?
গৌতমের মনে ওঠে ব্যথার গুঞ্জন।
দেবদত্ত এক হংস শর বিদ্ধ করি,
কত ব্যথা দিয়েছিলো আহা মরি মরি।
সে ব্যথা বুঝি বা আজ লক্ষগুণ ধরি,
গৌতমের মনে ওঠে গুমরি গুমরি।
দেবতা পূজার নামে এতগুলি প্রাণ,
হরণ করিবে রাজা কেমন বিধান?
এত ভাবি গৌতমের সংশয় জাগিল,
রাখালের সাথে রাজভবনে চলিল।
শোণ নদী তীরে রাজপুরী সুবিশাল,
গৌতম আসিল অগ্রে পিছনে রাখাল।
নবীন সন্ন্যাসী দেখি দিব্য কান্তি দেহ,
দ্বার ছাড়ি দিল সবে শুধিল না কেহ।
পুরীতে প্রবেশ করে নবীন সন্ন্যাসী,
সু-গম্ভীর বেদ মন্ত্র কর্ণে পশে আসি।
যজ্ঞকুণ্ডে হবি দানি ব্রাহ্মণ মণ্ডলী,
সমস্বরে বেদ স্তোত্র গাহে কুতুহলী।
পার্শ্বে রাজা বিম্বিসার যুক্ত করে স্থিত,
পুণ্য কর্ম সম্পাদনে আনন্দিত চিত।
সম্মুখেতে যূপ কাষ্ঠ সিন্দূরে চর্চিত,
পার্শ্বে সারি সারি মেষ ছাগল সজ্জিত।

বলি মন্ত্র উচ্চারণ করিল ব্রাহ্মণ,
'যূপকাষ্ঠে' ছাগ বন্দী করে যে 'যবন'।*
খড়্গ উত্তোলন করি ঘাতক প্রস্তুত,
অকস্মাৎ বজ্রপাত শ্রবণে অদ্ভুত।
'তিষ্ঠ' বলি সম্মুখেতে নবীন সন্ন্যাসী,
কান্তিময় দেহ জ্যোতি লাবণ্য প্রকাশি।
বিস্ময়েতে হতবাক রাজা বিম্বিসার,
ক্রোধে ব্রাহ্মণের চক্ষু জলন্ত অঙ্গার।
স্মিত হাস্যে কহিলেন নবীন সন্ন্যাসী,
'জয় হোক' মহারাজ ভিক্ষাতরে আসি।
শান্তস্বরে কহিলেন মগধ রাজন,
কি প্রার্থনা আজ্ঞা করো দিব সে রতন।
ধনরত্ন নহে রাজা, ছাগ শিশু প্রাণ,
ভিক্ষা আমি চাহি রাজা তব সন্নিধান।
অদ্ভুত প্রলাপ উক্তি কহে সর্বজন,
'অসম্ভব' বলি গর্জি উঠিল ব্রাহ্মণ।
পুণ্য কর্মে বাধা দেয় মূঢ় অর্বাচীন,
দিন মহারাজ শীঘ্র শাস্তি এরে দিন।
অসমাপ্ত যজ্ঞ হলে ব্যর্থ পুণ্য কর্ম,
প্রার্থীরে বিমুখ করা হইবে অধর্ম।
সন্ন্যাসীরে কহে রাজা শাস্ত্রে ব্যাখ্যা দাও
দেবতা পূজায় বিঘ্ন সুযুক্তি দেখাও।
নবীন সন্ন্যাসী কহে করো অবধান,
জীবসৃষ্টি বিধাতার অমোঘবিধান।
বাঁচিবার অধিকার আছে সকলের,
ক্ষুদ্র কীট হ'তে সভ্য জ্ঞানী মানুষের।
তুমি রাজা বুদ্ধিমান আছে তব জ্ঞান,
ক্ষীণ অশক্ত জীবের লইবে পরাণ।
নিরীহ ছাগ শিশু মূক ওদের ভাষা,
অপকার করিবার নাহি যে দুরাশা।

দুগ্ধ দান করি সেবা করিছে নরের,
সেই দুগ্ধে পুষ্ট মোরা হানিব তাদের?
প্রাণ দানে শক্তি নাই হননেতে মগ্ন,
জীব হত্যা করি রাজা কি লভিবে পুণ্য?
নিরীহ প্রাণী হত্যায় স্পর্শিবে যে পাপ,
শত যজ্ঞে না মুছিবে সেই মনস্তাপ।
ধান, যব, ফল, ফুল ধরণীর দান,
তাই দিয়ে দেব পূজা সু-যুক্তি বিধান।
হৃদয়ের ভক্তি দিয়ে কর উপাসনা,
তুষ্ট হবে ভগবান পুরিবে বাসনা।

নত মুখে ব্রাহ্মণেরা শুনিয়া ভাষণ,
রাজা ভাবে সন্ন্যাসী এ জ্ঞানী মহাজন,
'বলি বন্ধ' করি রাজা ছাড়ি দিল ছাগ
মুছে গেল অন্তরের তমোময় দাগ।

জ্ঞান চক্ষু ফুটাইল নবীন সন্ন্যাসী;
পরিচয় শুধাইল রাজা মৃদু হাসি।

গৌতম কহিল আমি রাজার কুমার,
শাক্যবংশে শুদ্ধোদন পিতা যে আমার।

সুখ নাই, শান্তি নাই মনুষ্য জীবনে,
তাই রাজ্য ছাড়িলাম সত্যের সন্ধানে।

রোগ শোক মৃত্যু ভয়ে ভয়াতুর প্রাণী,
মুক্তির উপায় চাই সত্য জ্ঞান আনি।

তাই রাজা চলিয়াছি জ্ঞান অন্বেষণে,
ব্যাধি শোক জরা মৃত্যু রোধের কারণে।

শুনি রাজা পাইলেন নূতন সন্ধান,
অপূর্ব সত্যের নিষ্ঠা মহা জ্ঞানবান।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাও কহিল রাজন্,
'সম্বুদ্ধ' লভিয়া পুনঃ দিবে দরশন।

মহাপ্রতীক্ষায় আমি রব অনুক্ষণ,
সেই দিন 'বুদ্ধ' তব লইব শরণ।

* যবন—অসদাচারী)

অশুচি

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সাউ

(১)

উচ্ছল ছল যমুনার জল নাচে তরঙ্গ তুলি।
যৌবন মদে মাতিয়া রঙ্গে—
করে কত ক্রীড়া সুরভি সঙ্গে
স্বভাবের চির বাঞ্ছিত প্রিয়
কলতানে কল্লোলি।
উচ্ছল ছল যমুনার জল নাচে তরঙ্গ তুলি।

(২)

তটিনীর এই গোপন বিহার নিরখিয়া এক মুনি।
বসিলা সেথায় বনের আড়ালে,
মনে কুতুহলী হাসিলা বিরলে
প্রণমিলা বলি 'জয় জগদীশ'
শিরে জুড়ি দুই পাণি।

(৩)

দেখিতে দেখিতে নামিল সন্ধ্যা সমাধি মগন ঋষি—
গাছের ছায়ায় ঝোপের আড়ালে
চণ্ডাল এক আসি হেনকালে
কাচিতে ছিল সে আপন বসন
এক মনে হ'য়ে খুসী।

(৪)

পবন তাড়িত জলের ছিটা সে পড়িল মুনির 'পরে
মৌনী তাপস মেলিল নয়ন
থামাও থামাও ডাকে ঘন ঘন
কর্মনিরত চণ্ডাল তবু—
চাহে না বারেক ফিরে।

(৫)

আসন ছাড়িলা মহান তাপস সমাধি হইল পণ্ড—
ধক্ ধক্ করি জলে হুতাশন
কম্পিত তনু রক্ত লোচন,
পড়িল সবেগে চণ্ডাল শিরে
সাধুর বিশাল দণ্ড।

(৬)

চণ্ডাল উঠি জানাইল নিজ অজ্ঞানকৃত দোষ।
ক্ষম অপরাধ যা কিছু আমার
নাহি জানি প্রভু, করি দুরাচার
চাহে চণ্ডাল কাতর নেত্রে—
থেমে গেল সাধু রোষ।

(৭)

নামে যোগীবর যমুনার-জলে বৈধ সিনান্ তরে,
বিভূতি লেপিত গৌর দেহ সে,
হয়েছে অশুচি চাঁড়াল পরশে
ধুয়ে যাবে পাপ যত পরিতাপ
চণ্ডালও নামে নীরে।

(৮)

সুধাইলা সাধু চণ্ডাল প্রতি 'তুমি কেন অবগাহ' ?
কেন নাও শিরে যমুনার বারি
কেন মুখে তুমি বল হরি হরি
কেন স্নান কর ? আমার পরশে
তুমিত অশুচি নহ"

(৯)

চণ্ডাল কহে বিনয় বচনে জোড় করি দুই পাণি,
ওগো প্রভু! তব দেহের ভিতর
উগ্রচণ্ড আছে বেঁধে ঘর—
আমা হ'তে সে যে অনেক অশুচি
তাহা ভালমতে জানি।

(১০)

ছুঁয়েছিল মোরে ওগো যোগীবর! তোমার হস্ত দিয়া,
তাই স্নান করি যমুনার জলে শুদ্ধ করি যে হিয়া॥

ঋষিপ্রজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞান

শ্রীজগদীশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম, ধৃ ধাতু মন্; তাহার অর্থ যাহা ধারণ করিয়া বস্তুপুঞ্জ তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখে, অথবা যাহা সব কিছু ধরিয়া রাখে। জলের ধর্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম দাহিকা শক্তি, ইহাকে বলা হয় সেই সেই বস্তুর স্বধর্ম। তবে মহামানব হিসাবে মানবের স্বধর্ম কি? পাশ্চাত্ত্য দর্শন হয়ত বলিবে rationality, আমাদের ভাষায় এক কথায় বলিতে গেলে মানবতা। মানবতা যে কি তাহার সংজ্ঞা করা কষ্টকর; আবার হয়ত বিভিন্ন মানবের মনে পৃথক পৃথক সংজ্ঞার উদয় হইবে।

মানব ধরাপৃষ্ঠস্থ একটি জীব, আকৃতির দিক দিয়া অনেকের তুলনায় ক্ষুদ্র ও দুর্বল, কিন্তু ধীশক্তিবলে সর্বোন্নত উচ্চতম। যার উঁচুতে আর নরসৃষ্টি যাইতে পারে নাই এখন পর্যন্ত। দৈহিক ক্ষুদ্রতা ও দৌর্বল্য অদ্ভুত মস্তিষ্ক ও মনন শক্তি বলে খর্বতা লাভ করিয়া আজ মানব উচ্চতম, সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাহার তুলনা শুধু; সেই নরজগতের অন্য কিছু বা অন্য কেহ নহে। সুঠাম স্বচ্ছন্দ সুন্দর অবয়ব; খর বুদ্ধিবলে কৃত্রিম জগৎ সৃষ্টি করিয়া পার্থিব সব কিছু হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোনও স্থানে এরূপ আকৃতি বিশিষ্ট অথবা এমন মনীষা সম্পন্ন জীব আছে কিনা তাহা অবশ্য এখনও সঠিক করিয়া কেহ বা কোনও সম্প্রদায় বলিতে পারে নাই, যদি থাকেও তথাপি ধরিত্রীসন্তান মানবকুলকে অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য দেখাইতে জড় কিম্বা অজড় নর কিম্বা অমর ত দূরের কথা শ্রীভগবানেরও সাহস নাই। কর্মে সে অতি নিপুণ, বুদ্ধিবলে বিশ্বজয় করিতে উদ্যত, মনন ধ্যানদ্বারা শ্রীভগবান-কেও আকৃষ্ট করিয়া এই ধরাধামে আনয়ন করিতে সক্ষম। হয়ত বা সোঽহং বলিয়া ভগবানের স্বারূপ্যও পাইতে চায় বা পায়। কি আশ্চর্য! সদা চঞ্চল অসীম অতল সৃষ্টি সমুদ্রের কতিপয় নগণ্য বুদ্‌বুদ মাত্র এই মানব তাহাদের সর্বতোমুখী কত ক্ষমতা, বিস্ময়ের বিষয়ই বটে। ক্ষমতা? কোথা হইতে আসিল এই ক্ষমতা? তার সন্ধানই বোধ হয় মানবতার প্রকৃষ্ট সন্ধান।

ভগবান আছেন কি নাই—এই নিয়া অবশ্যই মহা-মানব জাতির মধ্যে মতভেদ বর্তমান, আবার—আছেন যাহারা বলে তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে ইহাও স্বীকৃত। সুতরাং মানবতার সন্ধানে যে ভগবানকে চাই-ই একথা বলিতে পারি না বা বলিব না, তবে মতবাদের বিচারে হয়ত বা মানবতার হদিশ মিলিতে পারে তাই মতবাদ লক্ষ্য করিয়া কিছুটা অগ্রসর হইব।

বিখ্যাত জারমান্ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ত বিস্মিত-চিত্তে বলিয়াছিলেন—আমি দুইটি জিনিসে অত্যন্ত বিস্ময় ও ভয় বোধ করি। তার একটি Starry heaven নক্ষত্র খচিত নীলাকাশ দেখিয়া ভাবি—কি অসীম অনন্ত বিশাল। এর নিয়ন্তা বা কত শক্তিমান, এর মধ্যে আমি কতটুকু। অন্যটি হইল—যখনই কোনও অন্যায় কাজ করিতে উদ্যত হই তখনই আমার ভিতর হইতে কে যেন আমাকে শাসনের সুরে নিষেধ করে। তখন ভাবি—ওঃ বাবা, এ আবার কে? আমার মধ্যে বাস করে অথচ আমার চেয়ে বড়, আমার চেয়ে বুদ্ধিমান?

আমাকে শাসন করিবার ধৃষ্টতা রাখে। আবার তখনই মনে হয়, অনুমান হয় এই দুইটি জিনিসের মধ্যে যেন পুরো মিল আছে, যোগাযোগ আছে।

কান্তের কথা সেদিনের, হয়ত বা নিম্নলিখিত ভারতীয় তত্ত্বধারা অনুপ্রাণিত। হিন্দুদের ব্রহ্মগায়ত্রী, ঋগ্‌বেদের একটি ঋক্ সুপ্রাচীনকালে লিখিত বা অপৌরুষেয়। তারই প্রতিধ্বনি আধুনিক কান্তের বাণী। ব্রহ্মগায়ত্রী বলে—ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ প্রভৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (বরেণ্যং ভর্গঃ) যে জ্যোতি যে শক্তি দ্বারা পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত সেই (ধিয়ঃ) শক্তি আমাদের অন্তরে বর্তমান তাহাই আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। তফাৎ এই কান্তের ইহা অনুমান মাত্র কিন্তু ঋষিদের ইহা দর্শন, অনুভূতি, উপলব্ধি।

উক্ত শক্তিকে যাহার যেমন ইচ্ছা নামকরণ করিতে পারে কিন্তু সেই শক্তিকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করিবার কাহারও উপায় নাই।

বৈজ্ঞানিকের দেওয়া নাম energy, হিন্দুরা বলিবে সচ্চিদানন্দ এবং অন্যান্য ধর্মীয় বা অধর্মীয় সম্প্রদায় তৎতৎ উপযুক্ত নামে উহাকে অভিহিত করিবে। কিন্তু আছে আছে আছে—এ বিষয়ে সবাই একমত। সমস্বর সমচিন্তা।

উপনিষদ্ বলে—'তস্য ভাসা সর্বমেতদ্ বিভাতি; তাহার জ্যোতি দ্বারাই দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত জগৎ উদ্‌ভাসিত, "এতচ্চিদাত্মকং" তিনিই চৈতন্য, তাঁহার প্রেরণাই আমাদের বুদ্ধির প্রেরণা, "এষঃ অধ্যাত্মদীপঃ" সেই জ্ঞানদীপ, তাহা দ্বারাই আমাদের মোহান্ধকার দূরীভূত হয়, তাই বৈদিক ঋষি করজোড়ে প্রার্থনা করেন "তমসো মা জ্যোতির্গময়"।

এ প্রার্থনার কারণ সুস্পষ্ট। সেই শক্তি অখণ্ড, পূর্ণ, অনাদি অনন্ত অসীম কিন্তু সৃষ্টি খণ্ড বিভক্ত অপূর্ণ সান্ত, সাদি সসীম পূর্ণতা তার প্রার্থনা কামনা। আবার সেই চিৎশক্তির প্রকাশ সর্বত্র সর্ববস্তু মধ্যে সমানও নহে। এই শক্তি নিঃসন্দেহে সবকিছু ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহা দ্বারাই বিরাট বিশ্বের সৃষ্ট বস্তুতে চেতনা, সেই অখণ্ড শক্তিই ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণুতে পর্যন্ত ওতপ্রোত-ভাবে ব্যাপিয়া থাকিয়া বিশ্বনিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পন্ন করে, সাধারণ দৃষ্টিতে অঘটন ঘটায়, চলমান স্বভাব তার করে নিয়ত রক্ষা। তাহা হইলে চেতন অচেতন, জীব ও জড়ে স্থাবর ও জঙ্গমে বিভাগ কিরূপে সম্ভব হয়? অথচ এই বিভাগও সুস্পষ্ট সত্য, এত কাহারও অস্বীকার করার জো নাই। হাঁ তা সত্য বটে, তবে প্রাতিভাসিক, বাস্তবিক নয় (apparent not real) যদিও ব্যাহৃতঃ organic সাঙ্গ সেন্দ্রিক, inorganic নিরিন্দ্রিয় animal kingdom, vegetable kingdom ও meneral kingdom প্রভৃতি প্রভেদ বিদ্যমান।

এর স্পষ্ট মীমাংসা করিতে গেলে প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতের আলোচনা প্রয়োজন। গত শতাব্দীতে বিখ্যাত জীব-তত্ত্ববিদ্ ডার্বিন সাহেবের Descent of Man নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ও বিবর্তনবাদ বা ক্রম-বিকাশবাদ (evolution theory) প্রচারিত হয়। এই মতে আদিজলে ভাসমান সংকোচন বিকোচনমাত্র শক্তি-সম্পন্ন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জন্তু বিশেষ হইতে মানবের উৎপত্তি এবং বানর তাহার নিকটতম পূর্বপুরুষ। ইহাতে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের মধ্যে ভীষণ গোলযোগ আলোড়ন উদ্‌ভূত হয়; কারণ ইহা Bible এর সৃষ্টিতত্ত্বের বিপরীত, বিরোধী, তথাপি এই মত সমস্ত বাধা বিরোধ সহ্য করিয়া টিকিয়া গিয়াছে, যেহেতু সত্যের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত ডার্বিন মতের পুরোপুরি মিল আছে। তাহাই এখন দেখাইতে সযত্ন হইব।

সুপ্রাচীন মহাজ্ঞানী কপিল মুনির সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত প্রকৃতি পরিণাম বাদ ও অত্যাধুনিক ক্রমবিকাশবাদ মূলতঃ একই বটে, যদিও কোথায় কোথাও সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতে পারে। উভয়েই নিরীশ্বর, ঈশ্বরকে বাদ দিয়াই সৃষ্টির আলোচনা করিয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় আধুনিক বিজ্ঞান ও ভারতীয় ঋষিপ্রজ্ঞান কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহারই আলোচনা এখন প্রয়োজন।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রকাশ করে আদিকালে সকলই অব্যক্ত অব্যাকৃত অবিশেষ ও একবস্তু সার (Homo-geneous) ছিল। বিবর্তন ফলে ব্যক্ত, ব্যাকৃত,

বিশেষ, বহুবস্তু সম্বলিত (hetro-geneonus) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় প্রজ্ঞানও ঠিক এই কথাই প্রকাশ করিয়াছে বহুপূর্বে। "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" সাংখ্যসূত্র, গীতা বলে অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ" বৃহৎসংহিতা বলে" তদ্বীদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ।" বিজ্ঞান ইহাকে Protyle, uniform space of ether বলে। যাহা হউক, আদির অবিশেষ পদার্থকে আজ সকলেই মানিয়া লইয়াছে। ইহাই পুরাণের কারণার্ণব, সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি, তবে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা বৈজ্ঞানিকদের protyle হইতে সূক্ষ্মতর, বিজ্ঞানে স্থূল জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা ও ভারতীয় ঋষি প্রজ্ঞানে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় সম্বন্ধেই আলোচনা আছে। সূক্ষ্মজগতের গভীরে সূক্ষ্মতম কারণ জগৎও তাঁহারা দর্শন করিয়াছেন। "প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রম্" প্রকৃতি-নামধেয় সেই শক্তিই মূল কারণ। তাঁদের মতে আবার সৃষ্টি শব্দের অর্থ creation নহে, ক্রমবিকাশ।

আদিকালের কোনও শুভ মুহূর্তে অনন্ত অসীম ইথারসমুদ্রে বুদ্বুদ দেখা দিল। বৈজ্ঞানিকের নামে উহা তড়িতাণু, উহা দুই প্রকার—Proton (positive) পুং, Electron (negative) স্ত্রী। এই তড়িতাণু বিবিধ পরমাণুর সৃষ্টি করে। এইভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি নব্বইটি মূল পদার্থের উদ্ভব হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে (chemical combination) উহারা অনেক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এইরূপে স্থাবর জগতের উৎপত্তি।

জঙ্গম সৃষ্টির মূলে কিন্তু পরমাণু নহে, কোষাণু (cell) ইহার মধ্যে অপূর্ব শক্তির খেলা। উহাই life জীবন, উহারা জীব।

কিন্তু জড় হইতে প্রাণের উদ্ভব হয় কিরূপে? এ প্রশ্নের মীমাংসা অত্যুন্নত আধুনিক বিজ্ঞান এখনও ভালভাবে করিতে পারে নাই। কিন্তু ঋষিপ্রজ্ঞান সুপ্রাচীনকালেই ইহার মীমাংসা করিয়াছে। তাঁহাদের মতে জড়ে জীবে, চেতন অচেতনে মূলত কোনও প্রভেদ নাই। আধারভেদে ও উপাধিভেদে এ পার্থক্য চিন্ময় বা চিৎশক্তির খেলা, কোথাও সে শক্তি কাশিত অর্থাৎ পরিস্ফুট নহে, কোথাও অল্প প্রকাশিত, কোথাও বা সুপ্রকাশিত। তড়িতাণু হইতে পরমাণু, কোষাণু তাহা হইতেই জড় ও জীবের আবির্ভাব। জড়ে চিৎশক্তি অপরিস্ফুট, উদ্ভিজ্জে কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট, নীচ প্রাণীতে আর একটু পরিস্ফুট, উর্ধ্বতন জীবে পরিস্ফুট ও মানবে সুপরিস্ফুট। ঐতরেয় আরণ্যকে ও উহার সায়ণভাষ্যে ইহার চমৎকার আলোচনা রহিয়াছে, তাহা বাংলা ভাষায় সংক্ষেপে অনুবাদ করিলে এরূপ হয়। সচ্চিদানন্দ সব কিছুতেই অনুপ্রবিষ্ট আছে, আধার ও উপাধিভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উহা শুধু প্রকাশের পার্থক্য, মৃত্তিকা পাষাণাদিতে তাহার সত্তামাত্র আবির্ভূত "মৃৎপাষণাদিষু সত্তামাত্রমাবির্ভবতি।" বৃক্ষ লতাদি স্থাবর হইলেও জীব, উহাতে তাহা অধিক আবির্ভূত। গরু অশ্ব প্রভৃতিতে আরও বেশী, সর্বাধিক মনুষ্যে, তাই সে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, পুরোপুরি সচেতন, জড়ে প্রাণস্পন্দন নাই, উদ্ভিদে ইন্দ্রিয়াদির অভাব, কীট পতঙ্গাদিতে চিদণুর সামান্য উন্মেষ দেখা যায়। মনুষ্যেতর অন্য জীবে চিৎশক্তির প্রকৃষ্ট উন্মেষ হয় নাই, কিন্তু মানবে উহার সর্বাধিক উন্মেষ সাধিত হইয়াছে। তাহা হইলে ভারতীয় ক্রমবিকাশবাদ নিম্নোদ্ধৃতরূপ—সচ্চিদানন্দ (energy) ক্রমশঃ তড়িতাণু বা চিদণু, কোষাণু, জড় জীব মনুষ্যকে প্রকাশ করিয়াছে. উদ্ভিদও জীব, জড়ের মধ্যে প্রাণ-স্পন্দন নাই, কারণ তথায় চিদণু নিরুদ্ধ। তবে মোটে নাই একথা বলা চলে না, না থাকলে আকর্ষণ, বিকর্ষণ গতি, মত্ততা, ক্রিয়াশীলতা কিরূপে সম্ভবে? জড় হইতেই বিবর্তন, ফলে অজড়ের উৎপত্তি। আচার্য জগদীশ ভারতীয় প্রজ্ঞানের যোগ্য বংশধর, তিনি তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানেও সর্বতঃ এই বিভূতির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—দেমতে জড়েও কয়েকটি শক্তির খেলা দেখা যায় যথা :—গতি (motion) তাপ (heat) আলোক (light) তড়িৎ (electricity) চুম্বক (magnetism) ও রসায়নশক্তি (cheminu)। জীবে দুইটি শক্তি (vital force) প্রাণশক্তি ও জীবশক্তি (phychic force)। স্পেনসার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মতে বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে অজ্ঞেয় অমেয় অচিন্ত্যশক্তি (power not force) ক্রীড়া করিতেছে। ভাগবত বা গীতার ভাষায় বলিতে গেলে লীলা করিতেছে। তাহার উৎপত্তি

নাই। বিনাশ নাই, কেবল সে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র। গীতায়ও এই কথাই চমৎকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্ত বলে পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে। সেই পরম পুরুষের ইহা বিবিধশক্তি, বিবিধ রূপ, তবে এ মহাশক্তি জড় নহে, চেতন, চিন্ময়। এই শক্তিই আবার মাধ্যাকর্ষণ বলে সকল বস্তু অবস্তু পৃথিবী পৃষ্ঠে টানিতেছে। গীতায় ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে "ধামাবিশ্য চ ভূতানি ধরয়াম্যহমোজসা"। ধরিত্রীর কেন্দ্রে অবস্থিত যে শক্তি সকলকে ধরিয়া রাখে সে শক্তিও আমি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর চিন্ময়।

জড়ের মধ্যে চিৎশক্তির খেলা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এখন বুঝিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

Hackel এর কথায়

"Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repultion must be common to all atoms; for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only attributing to them— sensation and will."

সুতরাং দেখা যায় আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও ইহা চিন্ময় হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

এখন উভয় মতেই বিবর্তনধারা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

বিজ্ঞানের মতে (Amoeba) অ্যামিবা নামক ক্ষুদ্র জলজীব হইতে মৎস্য, ক্ষুদ্র সরীসৃপ, পক্ষী, পশু বানর ও সর্বশেষ বিবর্তনে মানুষ। তাঁহাদের গণনায় ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার যোনি বা জন্ম অতিক্রম করিয়া মানুষের উৎপত্তি, অবস্থাবিশেষে অনেক বেশীও হইতে পারে, ভারতীয় প্রজ্ঞানও বলে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করিতে হয়। সে মতেও জলজ জীব প্রথম, বানর মানবের পূর্ব পুরুষ। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে লিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলেই কথাটি পরিষ্কার হইবে।

"স্থাবরং বিংশতির্লক্ষং জলজং নব লক্ষকম্।
কূর্মাশ্চ নব লক্ষঞ্চ দশ লক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ॥

দেখা যায় ৮৪ লক্ষ বিবর্তনক্রম এইরূপ, স্থাবর জন্ম বিশ লক্ষ, জলচর নয় লক্ষ, কূর্ম নয় লক্ষ, পক্ষী দশ লক্ষ, পশুজন্ম ত্রিশ লক্ষ, বানর চার লক্ষ, তারপরে মানুষ, মানুষের আলোচ্যস্থানে পৌছাইতে ২ লক্ষ। ইহা পড়িয়া স্বতঃই মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক যে বৈজ্ঞানিক বোধ হয় এ সকল পাইয়াই গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিল কারণ উভয়ে সম্পূর্ণ মিল আছে। বৈজ্ঞানিকের হিসাবে ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার, আবার বলা হইয়াছে অবস্থা বিশেষে অনেক বেশীও হইতে পারে। এছাড়া জড়ের বিশ লক্ষ তাঁদের হিসাবে বাদ পড়িয়াছে। ক্রমেও দেখা যায় পুরোপুরি সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সাধু ভারতীয় প্রজ্ঞা মতে জলচরের পর উভচর কূর্ম। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরও অগ্রসর হইলে হয়ত এ ভুল ভাঙিবে। নতুবা জল হইতে অতবড় লাফ দিয়া গাছে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। জলের পরে যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের জল স্থল উভয়েই বিচরণ করা যুক্তিযুক্ত, জলের অভ্যস্থতা অত শীঘ্র ছাড়া ও মধ্যবর্তী মৃত্তিকাও বাদ দিয়া গাছে উঠা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় অবতারক্রমও এই বার্তাই প্রাচীনকাল হইতে প্রচার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত আরও পার্থক্য আছে। বৈজ্ঞানিক শুধু দেহ সম্বন্ধীয় বিবর্তনাদির চিন্তা করিয়াছে। দেহীর কথা ভাবে নাই। যে ভূমা চিচ্ছক্তি সকলে অনুপ্রবিষ্ট তাহারও ক্রমবিবর্তন ঘটে সে কথা চিন্তা করে নাই। সেই শক্তির বিকাশের ফলেই মননশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এখন আবার অনেক বৈজ্ঞানিক আত্মশক্তি স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক (Bergson) বার্গশ'র মতে জীবের মধ্যে যে অখণ্ড প্রাণশক্তি আছে (life or Elan vital) তাহার প্রেরণায়ই ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃতিক আবেষ্টনী তাহার সহায়তা করে মাত্র, এই শক্তিই

আত্মশক্তি বা ঋষিপ্রজ্ঞানের আত্মা, গীতায় "সর্বভূতস্থমাত্মানম্" এই শক্তিই বটে।

তাহা হইলে দেখিতে পাই এক অখণ্ড শক্তি, এক বিরাট নয়নাগোচর অনুভূতি উপলব্ধি সাপেক্ষ মূর্তি আত্মা, আমি তার অণু অংশ বা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ। আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে, অন্য সকলেও আছে। এক কথায় আমার মধ্যে সকল আছে, আমিও সকলের মধ্যে আছি, ইহাই আত্মানুভূতি, ইহাই বিশ্বানুভূতি। এই তত্ত্ব যে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে গীতার ভাষায় সে যোগযুক্তাত্মা। "সর্বভূতস্থমাত্মানম্ সর্বভূতানি চাত্মনি" এই যে উপলব্ধি করে সেই প্রজ্ঞাবান সেই যোগী, তাঁহার ত "সর্বভূতাহিতায়" গীতার বাণী না মানিয়া উপায় নাই। সর্বভূতহিত, সর্বজীবহিত সর্বমানবহিতই মানবতা। ঋগ্‌বেদ বলে "কেবলাদো ভবতি কেবলাদী" যে ব্যক্তি ভোজ্যদ্রব্য অন্যকে না দিয়া শুধু নিজে ভক্ষণ করে সে শুধু পাপ সঞ্চয় করে। গীতা বলে—"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ" যে পাপিষ্ঠ শুধু নিজের উদর পূরণ করে সে পাপরাশি ভোজন করে। সঞ্চয়ী অপরাধী, পাপী, তোমার যেটুকু প্রয়োজন সেই টুকুতেই তোমার অধিকার, সঞ্চয় করিলেই তুমি অন্যকে বঞ্চনা করিতেছ, অন্যের ভোজ্য কাড়িয়া লইতেছ, তুমি তখন পরস্বাপহারী নীচ, ঘৃণ্য, চোর দস্যুর অন্তর্ভুক্ত। শুধু নিজেকে নিয়া চলা, স্বার্থানুসন্ধানে কার্য করা, মানবতা বিরোধী। পরের জন্য ভাবিতে হইবে অন্যের কুশল সাধনেও নিজেকে নিয়োজিত করিতে হইবে, এমন কাজ করিতে হইবে যাহাতে আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হয়, ইহাই মানবতা, ইহাই বিশ্বমানবের ধর্ম, ইহাই উন্মার্গগামী মানবের নিকট ভারতের শাশ্বতবাণী। এই বাণী চিচ্ছক্তির মতই অমর অব্যয়, উহাই পথ, উহাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মত। মানব আজ উচ্ছৃঙ্খল, ধরার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা, সান্ত্বনার স্থান নাই, কুশলের পথ অবিদিত বা অবজ্ঞাত, বিজ্ঞানের উজ্জ্বলনে প্রলয়ঙ্করী মহারাক্ষসীর আবির্ভাব হইয়াছে। জীবকুল থরহরি কম্পমান, বিপথগামী মানবের কার্যকলাপের জন্যই ধ্বংসবিলাস সংহারমূর্তি জীবের দুয়ারে মুহুর্মুহু নিষ্ঠুর আঘাত হানিতেছে। সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি রব। ত্রাণকর্তা একমাত্র গীতার ধর্ম, বিশ্বমানবের ধর্ম, "সর্বভূতহিতরতাঃ' হওয়া, নান্যঃ পন্থা অয়নায়, আর বিকল্প পথ নাই। অন্য পথে রক্ষা নাই, ধ্বংস অনিবার্য। মানব—মানব দরদী, জীব দরদী হউক এই শুধু প্রার্থনা, নীচস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সর্বনাশের কিনারা হইতে সে সুদৃঢ়ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইবে, মানবকে রক্ষা করিবে, ধরার জীব জগৎকে রক্ষা করিবে। মানবের শুভবুদ্ধির উদয় হউক, সর্বভূতের হিতে নিজেকে নিয়োজিত করুক এই কামনায় আমরা সর্বদর্শী বৈদিক ঋষির ভাষায় আবার প্রার্থনা করি—

"অসতো মা সদ্‌গময়।"
তমসো মা জ্যোতির্গময়।

কীর্তিনাশা নাশিতে না পারে

শ্রীলীলাময় দে

কত শতাব্দী কালের অতলে
গিয়াছে জোয়ারে এই ধরাতলে
কত না কীর্তি, দম্ভ-নীতি
ফুৎকারে গেছে নিভে,

কালের চক্রে অমোঘ বিধানে
কত দাম্ভিক, কেবা নাহি জানে
চূর্ণি ধূলিতে গিয়াছে মিশায়ে
স্বদেশে অন্তরীপে।

কত না স্তম্ভ, প্রাসাদ সৌধ
কীর্তিনাশায় ভগ্ন, ধৌত
কালের পেষণে হয়ে গেছে গত
চিহ্ন নাহিকো তার

গর্বিত জ্ঞান, কত বিজ্ঞান
প্রকৃতি আঘাতে হয়ে খান খান
বিলীন হয়েছে বুদ্বুদ সম
অনন্তে অনিবার।

শুধু ভাঙে নাই, আজও চেয়ে দেখি
সত্য যা কিছু, নহে খাদ, মেকী
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে উছলি
আগামী যুগের পথে

নিত্য নূতন শৌর্যে সুহাসে
কৃষ্টি, সাধনা আলোকে বিভাসে
মন-মন্দিরে, জগত সৌধে
অটুট বিজয় রথে।

চঞ্চলা সে ত, চির চঞ্চল
সত্য লুকায়ে শান্তি সকল
বরণ করিয়া যে জন নিয়েছে
জ্ঞানের স্থিরতা পুরে

তারি মাঝে যেনো লক্ষ্মী বিরাজে
মহালক্ষ্মীর অপরূপ সাজে
ভুবন ভরিয়া দীপ্তি উছলে
যশ গাথা পৃথী জুড়ে।

নহে ক্ষণিকের ক্ষণ ভংগুর
ধ্বনিছে ধ্বনিবে বহু বহু দূর
আজি ও আগামী সর্ব যুগেতে
সকল মহতী গানে

মানব সমাজে জগত সভায়
উজলি উঠি দীপ্ত বিভায়
অমর রূপেতে নির্ভাবনায়
সকল সজীব প্রাণে।

সত্যে জীবিত সুন্দর কভু
সহিতে নারে যে দাম্ভিক প্রভু
সমূলে বিনাশে সর্ব লালসা
কীর্তিনাশার কূলে

ক্ষুব্ধ বেদনা বিলাস বাসনা
অসহায় যত চিত্ত যাতনা
সফেন ঊর্মি মুখর সলিলে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে ফুলে।

চল ফিরে যাই, অতীত পাতায়
প্রেমের কীর্তি বিরাজে যেথায়
যমুনার-কূলে অসহ-ব্যথায়
প্রেমের নিদর্শনে—

কী দেখিলে বল পরাণ মেলিয়া
মমতাজ ভরা সাজাহান হিয়া
শ্রাবণ নিশীথে গুমরি গুমরি
কাঁদিছে প্রকৃতি সনে।

পুনঃ চেয়ে দেখ জ্যোৎস্না শোভিত
চাঁদের হাসিতে প্রেম-পুলকিত
কতনা গোপন, মধু গুঞ্জন
ধ্বনিছে মর্ম কানে

বেদনার দান পূত সুমহান
সম্রাটরূপে নহে সাজাহান
অমর কীর্তি, পৃথিবীব্যাপ্তি
প্রেমিকের মহাদানে।

রাণা কুম্ভের কোথা মীরা বাঈ
প্রেমিক পরাণে নেছে চির ঠাঁই
কৃষ্ণ প্রেমেতে পাগলিনী রাণী
ভজনের গানে গানে

কালের চক্র কভু নাহি পারে
যুগের কৃষ্টি কভু হরিবারে
ব্যথায় সৃষ্ট সত্য বেদীতে
কৃষ্টি প্রতিষ্ঠানে।

আঁধার মিথ্যা নাশিতে আলোকে
অতীতের পাতে নতি যে ভূলোকে
বিত্তাপতি ও চণ্ডীদাসের
পূত লেখনীর যোতি

কবি কালিদাস বাল্মীকি ব্যাস
সত্য-সাধন কীর্তির বাস
ভুবনে ভুবনে জ্যোতির্মালায়
নিত্য দানিছে জ্যোতি।

যুগের কবির রবি কর-দ্যুতি
উজ্জ্বলি তুলি বিশ্ব মুকুতি
জীব-জগতেরে দানিছে মহতী
মহান পবিত্রতা ;

যত জঞ্জাল ক্লেদ কদর্যে
জ্ঞানের দীপ্ত অমোঘ শৌর্যে
পুড়ায়ে ভস্মে করিতে বিনাশ
জাগেন মহাশ্বেতা।

যুগে যুগে আজও জনমে জনমে
রাজে মানবের মরমে মরমে
শৌর্যে, বীর্যে, সদা সম্ভ্রমে
জ্ঞানালোক দীপ-শিখা

অতীব সুদূর ভবিষ্যতের
পৃষ্ঠাতে নাহি হবে হেরফের
দিব্য-প্রভায় আরো উজলিবে
শতেক যুগের লিখা।

উপনিষদ নির্মাল্য " নৈবেদ্য " অর্ঘ্য " অঞ্জলি	শ্রীপুষ্প দেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী।

বিদুষী শাস্ত্রজ্ঞা শ্রীযুক্তা পুষ্প দেবী সরস্বতীর অনুবাদ গ্রন্থ সকল শাস্ত্র-রস পিপাসু বিদ্যার্থী সমাজে ইতি মধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ "উপনিষদ নির্মাল্য" ঈশ, কেন ও কঠোপনিষদের সরল ভাবানুবাদে মনীষীদের প্রশংসা অর্জন করেছে। ১৩৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লীলা পুরস্কার দানে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। তাঁর "উপনিষদ্ নৈবেদ্য"তে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরিয়, ঐতরেয়োপনিষদের; "উপনিষদ্ অর্ঘ্য"-তে শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্যের; আর "উপনিষদ্ অঞ্জলি"তে বৃহদারণ্যক উপনিষদের সরল পদ্যময়ী ব্যাখ্যা নিবদ্ধ হয়েছে।

লেখিকার সংস্কৃত শাস্ত্রে অপার পাণ্ডিত্য রয়েছে—অন্তরে সর্ব্বদা জাগ্রত রয়েছে ব্রহ্মবোধ ও ব্রহ্ম চেতনা এবং সেই চেতনার গভীর-রসেই অভিষিঞ্চিত হয়েছে তাঁর লেখনীপ্রসূত পদ্যাবলী, যার সুর চিরন্তন, ধ্বনি সুমধুর, ছন্দ অচঞ্চল।

এ সকল কাব্যানুবাদ শাস্ত্র-রসিক পাঠক-পাঠিকা সকলের হৃদয় জয় করবে, এ সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত।

[প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২]

মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল : শ্রীদিলীপকুমার রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৩৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে শ্রীদিলীপকুমার রায় তিনটি ভাষণ দান করেন "দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি" বক্তৃতামালার প্রথম অধ্যাপক-রূপে। সঙ্গীত-সহযোগে প্রদত্ত এ-ভাষণগুলি যে কত উপভোগ্য হয়েছিল তা যাঁরা দ্বারভাঙ্গা ভবনে উপস্থিত থেকে শুনেছিলেন, তাঁরাই জানেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাষণগুলি একত্র প্রকাশ ক'রে [illegible] ।

দিলীপকুমার প্রথম ভাষণে রসিক : ভাবুক : মানুষ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের অন্যতম দ্বিজেন্দ্রলালের এই রূপগুলির পরিচয় দিতে তাঁর সুযোগ্য পুত্রের চেয়ে বেশি সমর্থ আর কেউ নেই। এইসব দিক দিয়ে কবি-পরিচিতি দিলীপ কুমার অত্যন্ত উপভোগ্য ভাষায় দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ভাষণে আদর্শবাদী : দেশভক্ত : নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালকে দিলীপকুমার যে-দৃষ্টিতে দেখেছেন তা সংশ্লেষণী দৃষ্টি—মামুলি অধ্যাপক-সুলভ বিশ্লেষণের অনুবীক্ষণ দিয়ে তিনি মহাপ্রাণ নাট্যকারকে দেখার ও দেখানোর চেষ্টা করেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের আস্তিক্যবুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে দিলীপকুমার যে রসবিগলিত আলোচনার অবতারণা করেছেন তা শ্রেষ্ঠ সমালোচনা সাহিত্যের গুণোপেত নিঃসংশয়ে। এ-বইকে শ্রেষ্ঠ জীবনী-সাহিত্যের পর্যায়-ভুক্তও করা চলে অন্তরঙ্গভাবে।

তৃতীয় ভাষণে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বোত্তম অভিব্যক্তি-গুলির মনোজ্ঞ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুরকার-ছন্দকার : কবি-গীতিকার : প্রেমিক-ভক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের এই রূপমালার প্রতিটি কুসুমই নিপুণ শিল্পের হাতে চয়ন করা হয়েছে। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে এ-বইটি অমরতা লাভ করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত গ্রন্থের মুদ্রণ পরিপাট্য সন্তোষজনক। কিন্তু শুবার্ট-এর গানটিতে ছাপার ভুলে schmerz-এর পরিবর্তে semerz হয়েছে। দ্বিজেন্দ্র-গীতি প্রসঙ্গে গানটির আলোচনা খুব দরকারি নয়। "আমার জন্মভূমি"-র কথাংশে একটি ইতালীয় গানের প্রভাব থাকলেও জার্ম্মান গানের নেই।

এই পুস্তক পাঠে মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলালকেই শুধু জানা যাবে না, দিলীপকুমারের অপরূপ মননশক্তিরও কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

[প্রকাশক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য পাঁচ টাকা।]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

মোহমুক্তি

শ্রীযমুনা ঘোষ

সেদিন অফিসের পোষাক পরিধানে অফিস টাইমে ট্রামের জন্য ষ্টপেজে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছি। ক্রমে ক্রমে সকল অফিস যাত্রীই আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। কেহ বা প্রশ্ন করিতেছেন, কি, কতক্ষণ ?'

অপর জন উত্তর দেন,—"তা প্রায় আধঘণ্টা হলো, ট্রামের তো দেখাই নেই।"

তৃতীয় ব্যক্তি পান চিবাইতে চিবাইতে খানিকটা পিচ্ ফেলিয়া একটু চুন অঙ্গুলি হইতে রসনাগ্রে লাগাইয়া দিয়া কহিল, "না মশাই এ ট্রাম কোম্পানী না গেলে আর নিস্তার নেই। রোজ রোজ কাঁহাতক অফিসের দেরী করা যায় বলুন তো—! নিত্য এদের ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে।

আমি উত্তর দিলাম,—"কি আর করবেন! সহ্য আপনাদের করতেই হবে। আর তা যদি না পারেন, তবে শোভাযাত্রা করে চলতে হবে—"

—বলেন কি মশাই,—এই শ্যামবাজার হতে ডালহৌসী হাঁটা কি মুখের কথা নাকি—?

এমন সময় বহু মেয়ে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছে। কলেজের ছুটী হইয়া গিয়াছে। আবার কেহ বা বই, খাতা ব্যাগ হাতে চলায়মান আছে। এদৃশ্যে নিত্য অভ্যস্ত। অফিস টাইমে সে দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর থাকে না। আজও ছিল না। হঠাৎ দেখি আমার সামনে একটি ক্ষুদ্র লবঙ্গলতার দল হাসিয়া হেলিয়া দুলিয়া একেবারে নিকটে উপস্থিত হইল। আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া পিছু হটিয়া গেলাম। আমার দিকে চাহিয়া তাহারা খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া আরো নিকটস্থ হইল। ইহাদের মধ্যে একটী অতিশয় কৃশ, দীর্ঘাঙ্গী এবং বর্ণোজ্জ্বলতায় কাঁচা হরিদ্রাকেও হার মানিতে হয়। সেই তন্বী নম্রা লবঙ্গলতাটী আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "কি হলো—? সরে যাচ্ছেন কেন?' চিন্‌তে পাচ্ছেন না অলকদা? এরিমধ্যে ভুলে গেছেন?

আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলাম,—"না! চিনতে পারছি না—।

মেয়েটী জোরে হাসিয়া উঠিল। তারপর কহিল "বেশ লোক তো আপনি!" কুহেলিকে এরি মধ্যে ভুলে গেছেন? আমি তার বোন চৈতালী—

আমার সঙ্গে যাহারা সে স্থানে উপস্থিত ছিল তাহারাও কথাগুলি শুনিতেছিল। 'কুহেলি' নামটা বলিতেই অন্ধকার ঘরে হঠাৎ দেশলাইএর কাঠি জ্বালার মত দপ্ করে কুহেলির দীর্ঘ দিনের বিস্মৃত মুখখানি আমার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু চিন্তার অবসর মিলিল না। পিছন হতে আমার পাঞ্জাবীতে একটা হেঁচ্‌কা টান পড়িল। কিরে—এখনও—

একটা ইংগিত। চমকে উঠলুম। কিন্তু বলার সুযোগ না দিয়েই বন্ধু বলে উঠল, যাস্! যাস্! আমার বাড়ীতে এনগেজ সাতটায়—

কোন জিজ্ঞাসার সুযোগ মিলিল না।

ট্রাম আসিয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িতেই সে অদৃশ্য পথে যাত্রা করিল। দূর হইতে দেখিলাম, মেয়েটি বিমর্ষ মুখে চুপ করিয়া আমার দিকেই চাহিয়া আছে।

সারা পথটা মেয়েটির মুখখানি আমার দৃষ্টিপথে কেবলই ভাসিয়া উঠিতেছিল। এবং শ্রবণে পশিতেছিল, কুহেলিকে এরি মধ্যে ভুলে গেলেন—

ইতিমধ্যে কখন যে ট্রাম গন্তব্যস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ দেখি সকলেই নামিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া আমিও তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া নামিয়া যাইলাম।

অফিসে গিয়া সেদিন আর কোন কাজেই মন বসিতেছিল না। ঘণ্টাখানেক পর শরীরটা অসুস্থ বলিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু ভূতের বোঝার মত আমার মনের মধ্যে একটি কথাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, "এরি মধ্যে ভুলে গেলেন কুহেলিকে"—

সে! সে তো বহুদিন পূর্ব্বের কথা! 'এরিমধ্যে' কি করে হলো ওর কাছে—

* * *

দীর্ঘকাল পরে দুই বন্ধু মুখোমুখি বসেছি—

সামনে কয়েকখানা খোলা কাগজ—সিগারেট টানছি দু'জনেই—কাপে চা ঠাণ্ডা হচ্ছে—

বন্ধু বল্লে, এমনি হয় রে এমনি হয়। ওকালতি করে চুল পাকাচ্ছি—কত দেখছি—

কিন্তু এমন কি হয়?

নিশ্চয় হয়, আলবৎ হয়—কত কুহেলি দিনরাত মরচে জানিস কি তার—আমাদের মন টলে না। একটা কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্তা আরোগ্য নিকেতনে আশ্রিতা একটি মেয়ে, কোথা সেই রূপের দেয়ালী সহস্র পতঙ্গ যেখানে পুড়ে মরেছে—

চমকে উঠলুম। 'কুহেলি'—

রাত্রে আহারে ডাগিদ আসিল, বলিয়া দিলাম. শরীর খারাপ—

বার্ত্তা পাইয়া পত্নী আসিয়া একেবারে আমার পাশে উপস্থিত হইল। কহিল, কি হলো? খাবে না কেন? জিজ্ঞাসা করিয়াই আমার কপালে, গায়ে হাত দিয়া কহিল, কই, জর তো আসেনি—তবে খেলে না কেন?

উত্তর দিলাম, না জর নয়। মাথাটা ধরেছে শরীরটাও ভাল নেই—

রোষের সুরেই উত্তর আসিল, শরীর খারাপ হবে না।· তার অপরাধ কি? একটু কি বিশ্রাম আছে, একদিন যদি ছুটি পাও, অমনি কোথায় ক্লাব, কোথায় বন্ধু, সভা সমিতি করে বেড়াও—বাড়ীতে কি মন বসে; না আমি একটা মানুষ আছি তা ভাব! কোথাও যাবার নাম যদি করি, অমনি লম্বা কাজের ফিরিস্তি দাখিল কর। মেয়েটা আজ ক'দিন সিনেমা যাবার কথা বলছে বললুম, কাল ছুটী আছে যাব—আর অমনি হিংসে করে আজ অসুখ বাধালে—

আমি জানব কি করে তোমরা কাল সিনেমা যাবে—

বলবার সময় কি দিলে! রাত্রে খাবার সময় বলব মনে করেছিলুম। খবর গেল, অসুখ করেছে—

না গো না! আমার কোন অসুখ করেনি। তোমরা সিনেমা যেতে পার—কিছু হয়নি—

যদি কিছু হয় নি, তবে খেলে না কেন?

আঃ! কি বিপদ? একরাত্রি যদি না খাই, তবে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে—না অসুখ করবে না বলে কি মাথাটাও একটু ধরবে না—

আচ্ছা! বাবা আচ্ছা! তোমার কিছু হয়নি? কার ধ্যানে, কার চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছ সে তুমিই জান। কে যে এসে মাথা ধরেছে তা তো জানি না, সেই শোকে ক্ষুধা তৃষ্ণা সব হরণ হয়ে গেছে, উকুনের শোকে বকা কাতর হয়েছে—

—আচ্ছা বেশ! তোমার বলে যদি সুখ, শান্তি হয়, তাই বলো! বলিয়া পাশবালিশটা ভাল করিয়া পায়ে জড়াইয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

* * *

আকস্মিক একটি ঘটনা অপর একটি ঘটনার সহিত মিলিয়া যাইলে আমরা প্রবচন করি, কাকতালীয়।

তা পত্নীর কথাটিও তাই আমার পক্ষে কাকতালীয় হইয়াই ফলিয়া গিয়াছে। মুখে তাহার নিকট অস্বীকার করিলেও অন্তরটা কিন্তু আজ কুহেলির জন্য সত্যসত্যই বড় কাতর হইয়া উঠিয়াছে। বহু-বহুদিন তো তাকে আমি ভুলিয়াই ছিলাম। হঠাৎ আজ ধূমকেতুর মত কোথা হইতে তাহার কনিষ্ঠা আসিয়া পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিলই বা কেন?

তখন আমার থার্ড ইয়ার। প্রেসিডেন্সিতে পড়ি। বায়লজিতে অনার্স। আমাদের ক্লাসে তখন ছেলের সংখ্যাই বেশী, মেয়ে কম। পরস্পরের মেলামেশাটাও ছিল অত্যধিক। কিন্তু কুহেলির চোখ ঝলসান রূপের মোহে অনেক ছেলেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। আমি কিন্তু ছিলাম সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহা লইয়া কিছু টীকা-টিপ্পনী বা তীক্ষ্ণবাণও আমাকে হজম করিতে হইত। আমি ছিলাম সেদিকে বধির। কুহেলির ইচ্ছা আমার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা করে, এবং আচরণে অনেক সময় সেটা প্রকাশও করিত।

সেদিন সকালে আমি বিছানায় বসে চা খাচ্ছি, আর কাগজ পড়ছি, এমন সময় কুহেলি এসে হাজির। বল্লে, কি হচ্ছে? কাগজ পড়া—

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। তাহার পর কহিলাম, হাঁ—

সে আসিয়াছিল একখানি বই চাইতে—আমি বুঝিলাম, বইটা হলো তাহার ছল। আসলে সে চায় আমার সঙ্গে আলাপ করতে—

আমার মনটাও তখন কুহেলির প্রতি কেমন দুলে উঠল। সেই সুবর্ণ সুযোগটা আর ত্যাগ করতে না পেরে আলাপটা বেশ ভাল করেই জমিয়ে নিলুম।

কথায় কথায় কুহেলি বল্লে,—জানো অলক, আমি মার কাছে তোমার কথা গল্প করি—তোমার নামে কত যে সুখ্যাতি করি তা তুমি জানো না—তাই শুনে মা তোমাকে একদিন দেখতে চেয়েছেন। তুমি আমাদের বাড়ীতে কবে যাবে বলো?

আমি একটু হাসলুম। তারপর বল্লুম,—সুখ্যাতির কি আছে—এমন কিছু একটা অপূর্ব্ব নই আমি—অনেক ছেলেই তো ক্লাসে আছে—বন্ধুও তোমার অনেক—

কুহেলি উত্তর দেয়,—কস্তুরী মৃগ তার গন্ধ কি ঢাকতে পারে—তুমি হলে তাই—একটি কস্তুরী মৃগ—আমি তোমাকে অনুকরণ করবার কত চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই পারি না। তোমার পড়ার ছন্দ, কথা বলার ভঙ্গী, গলার সুরে আমাকে যেন মোহিত করে দেয়। বলিয়াই সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসিয়া উত্তর দি—অনুকরণ করা মানে কি জানো তো—'কথামালার' সেই গল্প।

কুহেলি উত্তর দেয়,—"দাঁড়কাক আর ময়ূরপুচ্ছ"। আহা! মোটেই তাই নয়—আর আমাকে তো আর সে রকম দেখতে নয়—

ইহার পর হইতেই আমাদের বন্ধুত্বটা বেশ নিবিড় হইয়াই জমিয়া উঠিয়াছিল। আমি কুহেলি বিহীন আর এক দণ্ডও থাকিতে পারিতাম না। আমার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে কুহেলি এসে আমার ঘরে কত উৎপাত করে যেত, সেগুলি আমার মধুরই লাগত। তখন আমি ভাব-রাজ্যে একটা ভেসে থাকতুম। মাঝে মাঝে দু'জনে কলেজ পালিয়ে সিনেমা যেতুম। শনিবার-হলেই মেট্রোতে যাওয়া কেমন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুহেলির বাবা-মাকে মাসিমা মেসোমশাই সম্ভাষণে অভিহিত করতুম। তাঁরা আমাকে স্নেহও করতেন প্রচুর। ক্রমে আমি যেন তাদের নয়নের মণি হয়ে দাঁড়ালুম। সন্ধ্যায় চা'এর আসরে আমার অনুপস্থিত হবার উপায় ছিল না। পিতার নিকট কৈফিয়ৎ, মাতার কাছে স্নেহ ভর্ৎসনা। ফলে হলো কি পড়াশোনায় ক্রমশঃ ঢিলা পড়তে লাগল। আমি ছিলাম ক্লাসে একজন ভাল স্টুডেণ্ট নামে পরিচিত। আমার অবস্থা দেখে আমার একান্ত সুহৃদয় বন্ধু চিত্ত সাবধান করে দিত। আমিও তার কাছে কোন গোপন কথা লুকাতে পারতাম না। একদিন বল্লুম,—কি করি ভাই—বলতো চিত্ত? আমি যে আর পারছি না, কুহেলিকে ত্যাগ করতে, ওকে কোন মতেই পারব না ছাড়তে—কুহেলিকে আমার পাওয়া চাই—তুই জানিস না চিত্ত, আমি ওকে কত ভালবাসি—ওকে না পেলে চিত্ত, জীবনটা আমার যে ব্যর্থ হয়ে যাবে! কুহেলি—কুহেলি আমার কাছ হতে যদি সরে যায়, তাহলে তুই জানিস, আমি তোকে বলে রাখছি, আমি নিশ্চয়ই সুইসাইড করব। জীবনের উপর কিসের মায়া? কিসের মমতা? আমি কিছুই চাই না—বাবা-মা, ভাই বোন, আত্মীয়-স্বজন, মান-ইজ্জত প্রতিপত্তি আমার কিছুর প্রয়োজন নেই—আমি কেবল চাই কুহেলি, কুহেলি অন্তপ্রাণ—আমার কুহেলির কাছে আমার কেউ বড় নয়, কেউ শ্রেষ্ঠ আসন পাবে না, সে যে আমার হৃদয়খানা জুড়ে বসে আছে—আমি চাই—আমি তাকে চাই চিত্ত—তুই যে বলিয়া বন্ধুর হাতটা চাপিয়া ধরিলাম।

চিত্ত উত্তর দিত,—অলক, তুই পাগল হলি নাকি? এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? মাথা ঠাণ্ডা কর অত উতলা হসনি—

—নারে ভাই, আমি পাগল হব না। উতলা আমি এতটুকুও হইনি—মাথা আমার বেশ ঠাণ্ডাই আছে।

উভয়েই নীরব।

কিছুক্ষণ পর পকেট হইতে দুইটি সিগারেট বাহির করিয়া একটি বন্ধুর হাতে দিয়া অপরটি চিত্ত নিজের মুখে লাগাইল। এবং দেশলাইর কাঠি জ্বালাইয়া আপনার মুখে

ধরাইয়া বন্ধুর মুখের কাছে ধরিল। উত্তরেই কিছুক্ষণ ধূম্রজাল বিস্তারের পর গবাক্ষ পথে দৃষ্টি রাখিয়া চিত্ত কহিল সব তো শুনলুম তোর কথা এবং বুঝলুম অনেক কিন্তু তোর বাবা?

অলক উত্তর দেয়,—আমারও তো সেইখানে ভাবনা! কেমন করে জানাব?

চিত্ত বলে,—দেখ অলক, তুই এখনি কিছু করিসনি—আমি বলি কি. কোনরকম বাঁধাধরার মধ্যে এখন তুই যাসনি—সামনে পরীক্ষা—সেটা আগে হয়ে যাক তারপর দেখা যাবে কতখানি কি করতে পারা যায়—

—কিন্তু ভাই, আমি বলছি, আমি কুহেলিকে ছাড়তে পারব না—তাতে আমার যা হবার হবে—

* * *

ইহার কিছুদিন পর কুহেলিকে নিয়ে একদিন সিনেমা গেছি, কি একটা ভাল বই ছিল। "শো" শেষ হবার পর কুহেলি বল্লে, চলো অলক, মাঠে একটু বেড়িয়ে যাই বড্ড গরম আজ—

তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে উভয়েই মাঠে গেলাম। নিরালায় একটা বেঞ্চিতে দুজনে পাশাপাশি বসে গল্প করছি। এক সময় কুহেলি আমার হাতটা চেপে ধরে বল্লে, অলক তুমি আমায় বিয়ে কর—আমরা আর এভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করে থাকতে চাই না।

আমি তার কোমল করপল্লবের উপর একটু মৃদু চাপ দিয়া বল্লুম,—হেলি, বিয়ে তো আমাদের হবেই—তবে পরীক্ষাটা হয়ে যাক—

আমার হাতটা চেপে ধরে আব্দারের সুরে সে উত্তর দেয়, না অলক, সে অনেক দেরী হবে—আমি অত দেরী করতে পারব না। তুমি কবে আমায় বিয়ে করবে বলো?

আমি উত্তর দিই,—অনেক দেরী আর কোথায়? এই তো দু'টো মাস মাত্র আছে, আর তা না হলে বাবাও যে মত দেবেন না। পরীক্ষা অবধি আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

কুহেলি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কি ঠিক বলছ পরীক্ষা হয়ে গেলেই আমাদের বিয়ে হবে?

তাহার সুগৌর মুখের 'পরে দৃষ্টি যেন জলজলিয়া উঠিল। সেই রক্তরাঙা গোলাপ গণ্ডে একটি স্নেহচুম্বন দেগিয়া দিয়া কহিলাম,—সার্টেনলি! নিশ্চয়ই আমি তোমায় বিয়ে করতে বাধ্য এবং করবও তা—তা না হলে আমি যে বাঁচতেই পারব না। তোমার কাছে আমায় কেউ নয় বলিয়া আর একটু আদর করিয়া ছাড়িয়া দিলাম।

পরীক্ষা আমাদের সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফলাফলও বাহির হইয়াছে। আমি পাশ করিয়াছি বটে তবে অনার্স পাই নাই। আর কুহেলি ফেল করিয়াছে। বাবা দিলেন খরচ বন্ধ করে। জানালেন, আদায় এক পয়সা'ও হয়নি, সংসারের অচল অবস্থা অতএব আমি আর তোমার ব্যয়-ভার বহন করিতে পারিব না। এই সংবাদে আমার যেন অন্ধকূপে নিমজ্জমান হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। বাজারে এত দেনা! কি করিব! কোথায় টাকা পাইব? কুহেলিকেই বা কেমন করিয়া সকল কথা জানাইব? টাকা কোথায়! বিবাহই বা কেমন করিয়া হইবে। এই সকল চিন্তা ট্রেনের থার্ড ক্লাসের যাত্রীর ন্যায় আমার মগজের মধ্যে ভীড় করিয়া আসিয়া জমিতে থাকিল। আবার অধিক চিন্তাই রুদ্ধ দুয়ারের অর্গল মুক্ত করিয়া প্রবেশ পথ দেখাইয়া দেয়। হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল, সুশান্ত তাহার কনিষ্ঠাকে পড়াইবার প্রস্তাব আনিয়া ছিল, আমি কিন্তু তখন সম্মত হইনি। আজ তাহা স্মরণে আসিতেই ছুটিলাম তাহার বাড়ী এবং ভাগ্যে সেটা মিলিয়াও গেল। কিন্তু মাসিক পঞ্চাশটা টাকায় আমার চলে না। বেরুলুম উমেদারীর সন্ধানে। ভাগ্য বিরূপ। কিন্তু টাকা যে আমার চাই—গেলুম রেসকোর্সে! কুহেলি কিন্তু আমার এ সকল খবর কিছুই জানে না। তাকে যে আমার চাই—অতবড় সুন্দরী বড় একটা চোখে পড়ে না। তার হরিণনয়না আঁখির 'পরে যখন ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলগুচ্ছ বায়ু সমীরণে উড়িয়া সুবর্ণ রঞ্জিত আননে আসিয়া পড়ে তখন কি শোভাই না বর্দ্ধন করে! আহা! কি অপূর্ব্ব সেই রূপমাধুরী—তাকে কি আমার ত্যাগ করা চলে—আমি যে তার সেই মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতাম না। কেবলই মনে হ'ত, না না! কুহেলি—কুহেলি তোমায় আমি ছাড়তে পারব না। এদিকে নীড় বাঁধিবার প্রয়াসে কুহেলির নিকট হতে ঘনঘন

জাগিয়া আসিয়েছে। কতদিন আর নীলিমাতলে বিচরণ হবে ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিত্ত আমার অকৃত্রিম বন্ধু। তাই তার কাছে চিত্তের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিতে আমার কিছুই বাকী রহিল না। অবশেষে আমি জানালুম, তাকে আমাদের বিবাহের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইতে হইবে।

সে আমার সকল কথাই নিবিষ্টচিত্তে হৃদয়ঙ্গম করিল। একটুকু বাধা কোথাও দিবার চেষ্টাও করিল না। আমার কথা সমাপ্ত হতে সে বললে,—অলক, তোর কিছু ভাবনা নেই। চিন্তা তুই কিছু করিসনি বুঝলি, আমি তোর সব ব্যবস্থা করে দেব। তবে হাঁ, তোমায় কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার একটি মাস সময় দিতে হবে ভাই—

তাহার কথায় আমার ঘাড় হইতে যেন একটি বোঝা নামিয়া যাইল। আমি একটু আশ্বস্ত হইলাম।

এদিকে কিন্তু কুহেলির পিতামাতাও কন্যার বিবাহ প্রস্তাবে আমাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আর কবে তুমি হেলিকে বিয়ে করবে অলক ?

তখন আমি একদিন বল্লুম,—দেখুন বাবার মতটা একবার নিলে ভাল হয় না—?

কুহেলিও সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার কথা শুনিয়া ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া উত্তর দিল, "কি ? তোমার বাবার মত নিতে হবে ! কি বলছ তুমি অলক—? তোমার বাবা একজন অশিক্ষিত পল্লীগ্রামের লোক, সে আমাদের কলকাতার এডুকেটদের কি বোঝে—? আর জানাবেই বা কি—? কেন, তার মত নিতে হবে—কেন ! তুমি কি এখনো নাবালক আছ, যে তোমার বাবার মতামতের উপর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে—

উত্তর দিলুম,—"না, নাবালক নই ! তবে কি না, বাবাকে একটু জানালে ভাল হতো না—

মাসিমা বল্লেন,—দেখ অলক, আমি বলি কি—বিয়ে যখন তুমি করবেই, তার সম্পত্তির মালিকও যখন তুমি তখন তোমার বাবার অনুমতির জন্যে কোন যায় আসে না। হেলি আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে—ও ঠিক কথাই বলেছে—

আমি মাসীমার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিলুম, কিন্তু বাবা তো এখন বিষয় আমার নামে লিখে দেন নি—

মাসীমা বল্লেন,—"তুমি তোমার বাবাকে প্রেস্ কর, যাতে তোমার নামে লিখে দেন—দেবে যাব না বলে ভয় দেখাও—বলো, যে আমি এখন লেখাপড়া শিখেছি মানুষ হয়েছি, আমার নামে সব লিখে দিতেই হবে। তা না হলে চলবে না—

ওর বাবা বল্লে,—'না অলক, বিয়ে তোমরা এই মাসেই কর, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমার, কোন চিন্তা নেই, তারপর সম্পত্তি যা কিছু আছে সব আপনিই তোমার কাছে চলে আসবে, তোমার বাবার কোন অনুমতির প্রয়োজনও হবে না। কারণ আদিগাতি বিদ্যায় পারদর্শিতা তাঁহার ভাল মতই ছিল। এবং এবিষয়ে তাঁহার খ্যাতিও ছিল প্রচুর—।

অলক এই সকল কথায় কোন উত্তরই প্রদান না করিয়া সেদিনের কাগজ খানা পাঠ করিতে মনোযোগী হইয়া পড়িল।

কুহেলি চেয়ার হইতে উঠিয়া আলকের হাত হইতে কাগজখানা টানিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল, "চলো অলক, একটু বেড়িয়ে আসি বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিল।

* * * *

সেদিন মেট্রো হইতে ফিরিয়া হেলীকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া সবে মাত্র মেসে আসিয়া নিজের ঘরে বিছানাটির উপর শুইয়াছি এমন সময় টেলিগ্রাম আসিল, আমার নামে। নামটা শ্রবণে পশিতেই তাড়াতাড়ি উঠে ঘর হতে বার হয়ে একটা সই করে টেলিগ্রামটি হাতে করে ঘরে ফিরে এলাম। তারপর সেটাকে খুলিয়া দেখি বাবার কাছ হইতে আসিয়াছে, বাবা লিখিয়াছেন,—অলক, তুমি যেমন অবস্থায় আছ সেই তেমনি অবস্থাতেই এখনি চলে এসো তোমার মার অন্তিমশয্যা। তিনি অত্যন্ত উতলা হইয়াছেন তোমার জন্য।

টেলিগ্রামটী হাতে করিয়া কিছুক্ষণ বিছানার উপর বসিয়া রহিলাম। আমার মাএর মুখখানি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। উঃ! মা আমার! কত যে ভালবাসতেন আমাকে—। কতদিন মাথা কোল অস্পষ্ট।

আমি মা'এর কাছে না শুইলে তাঁহার ঘুমই হতো না। প্রথম আমি পাশ করতেই মা'এর কি সুগভীর আনন্দ! সে কথা আমার আজও মনে আছে। তারপর কলকাতার কলেজে ভর্ত্তি হলুম। বাবা বল্লেন,—মেসে থাকবে। সেখান হতে লেখাপড়া করবে। ছুটীতে বাড়ী আসবে। তারপর যেদিন আমি স্নেহময়ী জননীর কাছ হতে চলে এলুম সেদিন আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কি অশ্রুপাত। আমিও তখন তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বালকের মত খুব কাঁদিয়া ছিলাম। আজ সেই বিগত দিনের সকল কথাই মনে পড়ে। আসিবার মুহূর্ত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতেই আমার চিবুকটি তিনটি অঙ্গুলিস্পর্শে নিজের মুখে ঠেকাইয়া কহিয়াছিলেন—"বাবা যত দূরেই থাক, আর যেখানেই থাক, আমার মৃত্যু সংবাদে তুমি এসে সামনে, দাঁড়িও। তা না হলে আমার মৃত্যু হবে না। আর একটি কথা তোমায় বলি, তুমি ছেলেমানুষ, লেখাপড়া শিখতে কলকাতায় যাচ্ছ, মানুষ হতে যাচ্ছ, কিন্তু খুব সাবধানে সেখানে বাস করো। শুনেছি কলকাতা নাকি ছেলেধরার জায়গা—সেই জননী আজ আমার মরণপথের যাত্রী। আমাকে এখনই যাইতে হইবে। ত্রস্তে উঠিয়া টেবিল হইতে টাইম টেবিলটি লইয়া ট্রেনের সময়টা দেখিয়া লইলাম রাত্রি চারিটাতে একটা গাড়ী আছে বটে পলাশপুর যাইবার। অলক সেই ট্রেনখানা ধরিবার মানসে তাহার সকল কিছু জিনিসই গুছাইয়া লইল। কিন্তু এত রাত্রে কুহেলির নিকট সংবাদটা পৌঁছাইবার কি ব্যবস্থা সে করিবে। জননী একটু সুস্থ হইলেই সে চলিয়া আসিবে। সকল কাজের মাঝে তাহার এই চিন্তাটাই মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে কোন উপায় না পাইয়া ঠিক করিল, একখানি পত্র লিখিয়া যাইবার পথে তাহাদের লেটার বক্সে সেখানি ফেলিয়া দিয়া যাইবে। এবং দেশে গিয়া বিস্তারিত বিবরণ দিয়া পত্র দিবে।

গৃহে পৌঁছাইয়াই প্রথম সাক্ষাৎ হইল, দাদার মেয়ে অম্বিকার সহিত। আমাকে সে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই সউল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, কাকামণি এসেছে—কাকামণি এসেছে—

অম্বিকার বয়স বেশী নহে। মাত্র আট বৎসর। আমি তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁরে অম্বি, ঠাকুমা কেমন আছেরে?

অম্বি উত্তর দিল, ঠাকুমা! ঠাকুমা তো পুকুরে নাইতে গেছে—

আমি অবাক হইয়া গেলাম। বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঠাকুমা পুকুরে গেছে কিরে—ঠাকুমার যে অসুখ করেছে!

সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল, ঠাকুমার অসুখ! কই না তো, অসুখ করেনি তো—

তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিলাম, তুই কিছু জানিস না, বোকা কোথাকার—চল্, ভেতরে চল্—ঠাকুমার কাছে যাই বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

ভিতরে যাইবার পথেই পড়িলেন আমার পরম পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয়। তিনি পুত্রকে দেখিতে পাইয়াই বল্লেন, এই যে অলক, তুমি এসে গেছ। তোমার মার কাছে যাও—আজ রাত্রে তোমার আশীর্ব্বাদ—

আমি হতভম্বের মত বাবার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। তাঁহাকে যে একটা প্রণাম করিতে হইবে তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। বাবার মুখের উপর কথা বলিবার সাহস ছিল না। মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বুঝিলাম ইহার মধ্যে একটি অজ্ঞাত রহস্য বাস করিতেছে। তখন আমি ধীর পদক্ষেপে মাতৃসন্নিধানে চলিয়া গেলাম।

মা ভাঁড়ার ঘরে ছিলেন। আমার সাড়া পাইয়াই তিনি মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, অলক তুই এসেছিস? আমার কত ভাবনা যে হয়েছিল। ভয়ে ভেবে মরি—আমি কেবল ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, তাঁকে জানাচ্ছি—

কেন, আমার কি ব্যাধি ধরেছে, যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছ? টেলিগ্রাম পেলাম বাবার, তোমার নাকি অন্তিমশয্যা, অতএব মেসের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া এখনি চলে এসো—কিন্তু আমার বিয়ে বলে তো তোমরা একটুও জানাওনি, এ রকম করে টেলিগ্রাম করবার মানে কি?

শান্তস্বরে নিরীহের মত জননী উত্তর দিলেন, কি

জানি বাপু—কেন যে আমার অসুখ বলে তোমায় টেলিগ্রাম করেছেন—

তা জানবে কেন? তোমাদের সমস্ত পরামর্শ—বিয়ে বল্লে যদি আমি না আসি—

তুমি অত রাগ করছ কেন অলক? উনি যে একেবারে মিথ্যে টেলিগ্রাম করেছেন, তা তো নয়—অসুখ আমার এই কয়েকদিন আগে একবার করেছিল। তাই বোধ হয় ভয় পেয়ে উনি তোমায় জানিয়েছেন—

ইহার কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধকণ্ঠে অলক কহিল, তোমরা যে আমার বিয়ের ঠিক করলে, আজই আশীর্ব্বাদ, তা কি তোমারও একবার আমায় জানান উচিত ছিল না?

আমি কি করে জানব? তোমার বাবা সব ঠিক্‌ঠাক করেছেন। কালকেই বিয়ে—তাঁকে তোমরা জান তো, যে কথা, সেই কাজ—মেয়ে পছন্দ হলে কিছুতেই আটকাবে না—জননী উত্তর দিলেন।

পুত্র কহিল, বেশ তো! তাই বলে আমাকে একবার তোমরা জানাবে না? আমারও তো একটা মতামত আছে—

পুত্রের কথায় কোন উত্তর না দিয়াই তিনি রাত্রের অভ্যাগতদের আহারের জন্য কুটনা কুটিতে বসিলেন।

এমন সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া আসিয়া সদ্য আগন্তুক দেবরের হাতে এককাপ চা দিল, এবং তাহার বহুদিনে অ-দর্শিত ঠাকুরপোর সহিত কিছু রহস্যালাপের বাসনাও ছিল। কিন্তু আষাঢ়ের মেঘের ন্যায় তাহার মসীলিপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া আর সাহস কুলাইল না, কেবল অলক্ষ্যে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, ফুলের মালা কি আনা হইয়াছে—

শাশুড়ী উত্তর দিলেন—আনিতে লোক গিয়াছে। তুমি পানগুলি সাজিয়া লও—

আচ্ছা বলিয়া বধূ সে স্থান ত্যাগ করিল।

চায়ের কাপটী হাতে করিয়া অলক কহিল—আমি এ বিয়ে করতে পারব না—মা, তোমায় বলে দিচ্ছি—

—কেন? কি হলো যে এ মেয়ে তুমি বিয়ে করতে পারবে না?

নীরব থাকিয়া পরে কহিল,—আমি কল-কাতায় একটি মেয়েকে পছন্দ করেছি—মেয়েটীও অপূর্ব্ব সুন্দরী—এবং কথাও দিয়েছি বিয়ে আমি তাকেই করব—তোমাদের বলতে আসব মনে করেছি, এমন সময় বাবার টেলিগ্রাম পেলুম—

—ভাল কথা! কর্ত্তাকে গিয়ে বলো তোমার কথা—আজ যেন তিনি আশীর্ব্বাদ বন্ধ করে দেন। আমার কথা তো কিছু চল্‌বে না, কারণ মেয়ে তিনিই পছন্দ করেছেন—

দেখ মা,—তোমরা যদি আমাকে জোর করে এখানে বিয়ে দাও, তাহলে জানবে আমি পালিয়ে যাব—তোমার একটা ছেলে জানবে মরে গেছে—হয় তুমি আমার বিয়ে বন্ধ করে দাও—নয় তো আমি পালাব—

—বেশ তো। তোমার এখনি পালাবার প্রয়োজন কি? কর্ত্তাকে গিয়ে সব কথা খুলে বলো—তিনি তো কাছারী বাড়ীতে লোকজনদের সঙ্গে কথা বলছেন।

জানি না। আমার কথাগুলি কেমন করিয়া পিতৃদেবের কর্ণগোচর হইল। আমাকে তিনি তলব করিয়া পাঠাইলেন আসামী হইল উপস্থিত।

বর্শার ফলার মত একটা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া তিনি কহিলেন, শুনলুম, তুমি নাকি এ মেয়েকে বিবাহ করবে না?

আমি নীরব।

—চুপ করে আছ কেন? উত্তর দাও, কেন তুমি বিবাহ করতে নারাজ হচ্ছ?

তথাপি আমি নির্ব্বাক। তখন আমার বুকের ভিতর যেন সহস্র হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে। কানের মধ্য দিয়া আগুনের হল্‌কা বাহির হইতেছে।

বাবা কহিলেন, বলো অলক। উত্তর দাও, কেন কি জন্যে তোমার আপত্তি আছে? আমি নিজে গিয়ে মেয়ে দেখে এসেছি—দেখতে শুনতে ভাল রং ফর্সা লেখাপড়াও কিছু কিছু জানে। সব ঠিক হয়ে গেছে আজ রাত্রে তারা আসবে তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে একান্তই যদি তোমার আপত্তি থাকে, আমার পছন্দ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে বলো, আমি বারণ করে পাঠাই।

আমি কি তখন জানি যে বাবার ধীর শান্ত প্রকৃতি

[illegible]

ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলুম, আমি একটি মেয়ের কাছে বাকদত্ত হয়ে আছি।

বাবা কহিলেন, কি বল্লে তুমি?

আমি আবার কথাটির পুনরুল্লেখ করিলাম।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাকদত্ত? একটি মেয়ের কাছে তুমি বাকদত্ত হয়ে আছ? এই না? তা বাকদত্ত মানে কি? তার মানে, তুমি সেই মেয়েটিকে কথা দিয়েছ, তাকে তুমি বিবাহ করবে—এই তো কেমন—এবং আমার পছন্দ করা মেয়ে যদি তুমি বিবাহ কর, তাহলে তার কাছে তোমার কথার খেলাপ হবে। এই কথা তুমি বলতে চাইছ? আর সেই বান্ধবীকে যদি বিবাহ না কর, তবে বন্ধুসমাজে তুমি অপমানিত হবে। মুখ দেখাতে পারবে না? কিন্তু আমি যে এই ভদ্রলোকদের কথা দিয়েছি, বিবাহের আয়োজন করেছি, আজ রাত্রে আসবে তারা—কাল বিয়ে হবে, আর এখন যদি তাদের বলে পাঠাই, মশাই আমরা আপনার কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে অক্ষম, পাত্রের অমত—আপনারা অন্যত্র পাত্রের সন্ধান করুন, সেটা কি আমার অপমান হবে না? কি বলো তুমি? বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা খপ্ করিয়া জলিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হারামজাদা। তুমি বিয়ে করবে না? তুমি বাকদত্ত হয়ে আছ? তুমি অপমানিত হবে। উল্লুক। গাধা। পাজি। নচ্ছার কোথাকার। আজ ঘোচাচ্ছি তোমার অপমানিত হওয়া। হারামজাদা, আজ তোকে খুন করব। খুন করে ফাঁসি যাব সেও আচ্ছা। তবু তোর মত অকালকুষ্মাণ্ড কু-পুত্র থাকার চাইতে নির্ব্বংশ হওয়া ভাল। বেটাছেলে বংশের কুলাঙ্গার। আজ তোকে খুন করব বেটাছেলে আমার পয়সায় কলকাতায় বসে রেস খেলবে, মদ খাবে, আর মাগী নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, আমার মুখ পোড়াবে, মান-ইজ্জত সব খোয়াবে, বংশের মুখে চুণকালি দেবে—তোকে খুন করে তবে জলগ্রহণ করব—বলিয়াই লাফাইয়া উঠিয়া একেবারে আমার সামনে আসিয়াছেন। বাবার চীৎকার শুনিয়া মা, দাদারা, বাড়ীর সব লোকজন যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিয়াছে। দাদা তাড়াতাড়ি বাবার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। কহিলেন, কি হয়েছে? বসো, বসো ঠাণ্ডা হও—

বাবা দেখি হাঁফাইতে হাঁফাইতে বসিয়া কহিলেন, হারামজাদা, উল্লুকটা বলে কিনা বিয়ে করবে না। কলকাতায় একটা মাগীর কাছে নাকি হারামজাদা বাকদত্ত হয়ে আছেন। আজ ওকে হওয়াচ্ছি বাকদত্ত—ওর একদিন, কি আমার একদিন—আজ ওকে আমি শেষ করব—বলিয়া তিনি পুনরায় লাফাইয়া উঠিতেই দাদা বলিলেন, আঃ। কি করছ। বসো তুমি, একটু ঠাণ্ডা হও—ছেলেমানুষ কি একটা বলে ফেলেছে তাই নিয়ে কি মাথা গরম করলে চলে—ওকে আমি দেখছি—

আমি তখন শোণিত লেশহীন নিস্পন্দের মত চুপ করিয়া বসিয়া আছি। চারিদিক অন্ধকার। মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করছে। এমন সময় দাদা আসিয়া আমার হাতটা ধরিলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, একি! তোর হাতটা এত ঠাণ্ডা কেন অলক? ওঠ। চল্। আমার ঘরে। আয় আমার সঙ্গে বলিয়া আমার হাতে একটা টান দিলেন—

আমি? আমি মন্ত্রচালিতের মত দাদার পিছন পিছন তাঁহার ঘরে আসিয়া শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিলাম। তাহার বিছানার উপর আমাকে বসাইয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অলক, তুই চা খেয়েছিস বলিয়াই দাদা ডাক দিলেন, এই অম্বি, তোর মাকে বল, কাকামণিকে আগে চা দিয়ে যেতে—

অমি তখন নিজের ক্ষুদ্র সংসারের রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহা ফেলিয়া পিতৃ আদেশ পালনে অনিচ্ছুক। তাই সেই স্থান হইতেই উত্তর দিল—কাকামণি তো চা খেয়েছে, ঠাকুমার ঘরে—

দাদা বলিলেন তোকে অত ডেপমি করতে হবে না। যা বলছি তাই কর—তোর মাকে চা করে দিতে বল—

বাধ্য হইয়াই অম্বিকাকে পিতৃ আদেশ পালন করিতে হইল। সংসারের রন্ধনকার্য্য ফেলিয়া তাহাকে ছুটিতে হইল মাতৃ সন্ধানে চাএর নিমিত্ত।

তারপর আমার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দাদা কহিলেন—দেখ, তোকে একটা কথা বলি অলক, শোন রাগ করিসনি—লক্ষ্মী ভাইটি আমার তুই এখন বড় হয়েছিস। লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছিস। একবার চিন্তা করে দেখ—আজ যদি তুই বিয়ে ভেঙে দিস, তাহলে বাবার

বুকে কত ব্যথা লাগবে। তিনি নিজে পছন্দ করে কনে দেখে এসেছেন। আর সেই ধাক্কা তুই সামলাতে পারবি। তুই কি এক সঙ্গে পিতৃ-মাতৃ হন্তারক হবি? তুই যে বাবাকে কতখানা ভালবাসিস তা কি জানি না—কথা দেওয়াও যা, জীবন দেওয়াও তা, একই সমান—কথায় বলে, "হাতী কা দাঁত, মরদ কা বাত" আজ যদি তুই আশীর্বাদ বন্ধ করে দিস, চারিদিকে সকলেই জানবে—কত বড় অপমান গ্রামের মধ্যে হবে আমাদের সেট একবার তুই ভেবে দেখ—আমরা হলুম পলাশপুরের জমিদার গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক—সকলেই জেনেছে, জমিদার বাড়ীর ছোট ছেলের বিয়ে—চারিদিক নেমন্তন্ন হয়ে গেছে তোর পক্ষে এটা করা কি উচিত হবে? বিয়ে করে তুই এখানেই সংসারী হ' কলকাতায় আর যেতে হবে না। সেখানে না গেলে তো আর কিছু হবে না—ওরে তুই সেখানে একটা চক্রে পড়েছিস। ওদের মোহিনীশক্তির প্রবল প্রভাবে মা-বাপের কোল হতে সন্তানকে ছিন্ন করে নেয়। কত দুঃখ-কষ্ট করে একটা সন্তান মানুষ করে, লেখাপড়া শেখায়—কেন না ভবিষ্যতে তাদের মুখ গৌরবোজ্জল হবে বলে, সংসারের দুঃখ মোচন হবে বলে, আর সেই ছেলে যখন চলে যায়, মা বাপকে ভুলে যায়, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব পরিত্যাগ করে তখন কি তাদের বুকে ব্যথা বাজে না? তুই যখন চলে এসেছিস, তখন তাদের সঙ্গ ভুলে যা—বদ্ সঙ্গে পড়ে কতখানি তুই নেমে গেছিস তা কি জানিস না? যেখানে তুই একটা ভাল ষ্টুডেণ্ট বলে নাম ছিল, সমস্ত পরীক্ষাতে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হতিস, সেখানে তুই অর্নাস পেলি না, এটা কি বুঝতে পারিস না? তুই কোথায়, কতখানি নেমে গেছিস একবার চিন্তা করে দেখদিকিনী? কোথায় তুই আজ অর্নাস পেয়ে এম-এসসি পড়তে যাবি, সেটাও তুই পেলিনি। জীবনের কত অবনতি ঘটেছে তোর তা বল—যাক, যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন বিয়ে কর, সংসারী হ'—জীবনের উন্নতি কর, বাবার সঙ্গে জমিদারী দেখাশোনা কর—কলকাতা এখন আর যাওয়া হবে না—

* * *

পুরাণ দিনের স্মৃতিগুলি স্বর্ণাক্ষরে লেখার ন্যায় জল-জ্বলিয়া উঠিয়া সারারাত্রি মাথার মধ্যে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি তাহা আমি জানিতেও পারি নাই।

পত্নীর আহ্বানে ঘুমটা আমার ভাঙিয়া গেল। চক্ষু উন্মীলন করিতেই তাহার মুখখানি আমার প্রথম দৃষ্টিতে পড়িল। চাহিয়া দেখিলাম, তিনি প্রভাতী ক্রিয়া সমাপনান্তে একখানি লালপাড় গরদ পরিয়া আমার মাথা ধরিয়া ডাক দিতেছেন—এতখানি বেলা হয়ে গেছে, কখন ঘুম থেকে উঠবে?

তাহার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া আমি কহিলাম—সুপ্রভাত। সুপ্রভাত। সুপ্রভাত হোক। বলিয়া কহিলাম—কাল সারারাত একটুও ঘুম হয়নি—তুমি তো পাশে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছিলে—

—কেন ডাকাব না? তোমার মত আমি তো আর নিশাচর নই—সারারাত উঠছি, বসছি, আর সিগারেট খাচ্ছি—

পালঙ্ক হইতে নামিতে নামিতে অলক উত্তর দিল—বাঃ। সিগারেট খাব না !এইটাই হলো আমার সকলের চাইতে আপনার—বলিয়া মাথার বালিশের পাশ হইতে সে সিগারেটের বাক্স ও দেশলাইটা হাতের মুঠার মধ্যে তুলিয়া লইল।

পত্নী কহিল—বেশ আপনার লোককে রেখে এখন তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এসো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—

বিস্ময়ান্বিত হইয়া অলক কহিল,—এর মধ্যে তোমার পূজা হয়ে গেছে?

—হবে না। বেলাটার দিকে একবার চেয়ে দেখ, কতটা হয়েছে—

—বেশ, তুমি চা তৈরী কর। আমি এখনি মুখ ধুয়ে আসছি—বলিয়া অলক কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাণিনিকে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী বা অন্তত প্রাক্-গৌতম যুগের লোক ব'লে গ্রহণ করার পর দেখা যায়, মহাভারত তাঁর আগের কালের রচনা; মহাভারতের রচনা-কাল কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কিছুদিন পরে। সুতরাং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কিম্বা মহাভারত-রচনার কাল নির্ধারণ করতে পারলে ভারতে আর্যবিস্তারের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সিংহলীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং হেমচন্দ্র রায়চৌধুরির মতে, খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকে ঐ দুটি ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে এবং ৯০০ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দ নাগাদ পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাভারত আমরা এখন যে-আকারে পাই, তার সমস্তটা রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের পর সেই বিবরণ সমেত রচিত। কিন্তু সেই সৌত মহাভারত পরে লিখিত হলেও মূল কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কাহিনী বা বৈয়াসিকী মহাভারত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনতিকাল পরে রচিত হয়। আরো কিছু দিন পরে পরীক্ষিতের মৃত্যুবৃত্তান্ত তাতে সংযুক্ত হয়। সর্পযজ্ঞ ও অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর বৈশম্পায়নের মুখে জন্মেজয় প্রথম মহাভারত-পাঠ শ্রবণ করেন। সে-মহাভারত বৈয়াসিকী মহাভারত; সৌত ও বৈয়াসিকী মহাভারতের রচনাকালের ব্যবধান এক শতাব্দীরও কম।

পরীক্ষিতের জন্ম একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। নানাভাবে বিশেষত গোটা পাঁচেক পুরাণ থেকে তার সময় নির্দেশ করা যায়। পার্জিটার, যোগেশচন্দ্র, গিরীন্দ্রশেখর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরো বহু এদেশি-বিদেশি মনীষী পরীক্ষিতের জন্ম পুরাণবর্ণিত সময়ে ব'লে মেনে নিয়েছেন। সে-সময়টা কখন, তার পাঠভেদ নিয়ে একটু গোলমাল হলেও সময়টা মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী। এই শতাব্দীতেই পরীক্ষিতের জন্ম ও রাজ্যাভিষেক, মহাভারতের রচনা, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্তৃক বেদ সমূহের চূড়ান্ত সঙ্কলন, কৃষ্ণের জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটে। এই উল্লেখযোগ্য খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দী থেকে ভারতের ইতিহাস স্বচ্ছন্দে খুঁজে পাওয়া যায়।

সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালকে প্রাক্-গৌতম ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে প্রধান দিগ্দর্শনরূপে অনায়াসে গণ্য করা যায়। সিংহল ও ভারতের জনমন যুগ যুগ ধ'রে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী সত্য কাহিনীরূপে ভাবতে এমন অভ্যস্ত যে, তারা রামায়ণ ও মহাভারতকে ধর্মগ্রন্থরূপে এবং ঐ দুই মহাকাব্যে উল্লিখিত চরিত্রগুলির কতকগুলিকে ভগবানের অংশ বা অবতার বা দেবসন্তানরূপে গণ্য করলেও কাহিনী দুটির ইতিবৃত্তগত সত্যতা সম্বন্ধে তাদের মনে কোনদিন সংশয় উপস্থিত হয় নি। পাশ্চাত্য অজ্ঞ পণ্ডিতদের ঈর্ষ্যামিশ্রিত বিদ্বেষের জন্যে নিজেদের প্রকৃত ইতিহাসকে উপেক্ষা ক'রে চলা মূঢ়তা ও দুর্বুদ্ধির পরিচয়। রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ মন দিয়ে পড়লে রাম-লক্ষ্মণের সময় থেকে কর্ণার্জুন ও কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরের কালের মধ্যে দিয়ে গৌতম বুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত সময়ের ইতিহাস অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রিকরা ভারতের ইতিহাসের লেখক হয়ে ওঠার আগেই বুদ্ধ, পাণিনি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, রামচন্দ্রের আবির্ভাব প্রভৃতি উজ্জ্বল ঐতিহাসিক দিগ্দর্শন একের পর এক পাওয়া যায়। কাজেই ভারতের বিশেষ ক'রে ভারতীয় আর্যদের ইতিহাস অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করতে কুণ্ঠার কোন কারণ নেই।

বিভিন্ন মনীষী লক্ষ্য করেছেন যে, মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক থেকে পরীক্ষিতের জন্ম পর্যন্ত সময়ের একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ পাওয়া যাচ্ছে। অনেকদিন আগের কথা। বিভিন্ন মনীষীর আলোচনা ও অনুসন্ধান পদ্ধতির মধ্যেও তারতম্য আছে। সেই জন্যে দুচার বছরের এদিক-ওদিক

হলেও মোটের ওপর প্রায় সব মনীষীই এ-বিষয়ে একমত যে, পরীক্ষিতের জন্ম প্রভৃতি ঘটনা পঞ্চদশ প্রাক্ খ্রীষ্ট শতাব্দীর। এই কালগত ব্যবধান পাঠভেদের জন্যে সব পণ্ডিত একরকম মনে করেন না ব'লেই নানা বিতর্কের সৃষ্টি।

পরীক্ষিতের জন্ম থেকে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক পর্যন্ত সময় হচ্ছে বিভিন্ন মতে এক হাজার বছরের সামান্য কিছু বেশি। মহাপদ্ম নন্দ রাজ্যাভিষেক লাভ করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রায় এক শতাব্দী আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। সুতরাং পরীক্ষিতের জন্ম পঞ্চদশ শতক খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। পরীক্ষিতের জন্মকাল জানতে পারলে মহাভারত ও ভাগবত অবলম্বনে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, কৃষ্ণের আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল অনায়াসে জানা যায়।

পরীক্ষিতের জন্ম সাল থেকে মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক-বৎসর পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান এক হাজার বছরের কত বেশি, এই প্রশ্নেই সামান্য মতভেদ পুরাণগ্রন্থগুলির পাঠভেদ অবলম্বনে গ'ড়ে উঠেছে। পনেরো, পঞ্চাশ, এক শো পঞ্চাশ অথবা পাঁচশো—নানা মাপের বর্ষকাল পাওয়া যাচ্ছে। পাঁচশো সংখ্যাটি নিতান্ত লিপিকার প্রমাদ ব'লে অগ্রাহ্য করলে অন্য কাল-পরিমাপগুলি নিয়ে কোন গুরুতর মতভেদ হয় না। ১০৫০ বছরের অথবা ১০১৫ বছরের ব্যবধানটাই গ্রাহ্য ব'লে মনে হয়। তা হলে কোন্ মনীষীর মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন্ সাল গ্রাহ্য, তা দেখা যাক। পঞ্চদশ শতাব্দী অবশ্যই খ্রীষ্ট জন্মের আগের হিসেবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে অতি বিস্তৃত আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ১৪৬৫-৩০ সালে হয়। পার্জিটার চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যের অভিষেক-কাল ৩২১ সাল, অতএব মহাপদ্মের অভিষেক-লাভের বৎসর ঠিক এক শতাব্দী আগে ৪২১ সাল এবং পরীক্ষিতের জন্ম আরো ১০৫০ বছর আগে ১৪৭১ সালে ধরেছেন। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে, ১৪৫২ সালে পরীক্ষিতের জন্ম। গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে, ১৪৪১ সালে অভিমন্যু-পুত্র উত্তরা-তনয় জন্মেজয় পিতা পরীক্ষিতের জন্ম। জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে ঐ মতই গ্রাহ্য। গিরীন্দ্রশেখর ৪২৬ সালে মহাপদ্ম নন্দের অভিষেক ধরেছেন। তাঁর মতে, পরীক্ষিতের জন্ম থেকে ঐ অভিষেক বৎসরের ব্যবধান ১০১৫ বৎসর। ১৪৪১ সাল থেকে পৌরাণিক যুগ সুরু হয়, এই রকম সিদ্ধান্ত ক'রে সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গিরীন্দ্রশেখর তাঁর পুরাণ প্রবেশ গ্রন্থে করেছেন। বিদ্যানিধির পৌরাণিক উপাখ্যান বইটিও দ্রষ্টব্য।

উদ্ধৃত মতগুলির সামঞ্জস্যসূত্র হচ্ছে খ্রীষ্ট জন্মের আগে পঞ্চদশ শতাব্দী। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে পার্জিটার পর্যন্ত সকলের কাল সম্পর্কিত হিসেবের সীমা হচ্ছে মাত্র ১৪৭১—১৪৩০ =৪১ বছরের ব্যবধান। সুতরাং আমরা ধ'রে নিতে পারি যে, বুদ্ধদেবের জন্ম যেমন খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে, পাণিনির দশম শতকে, তেমনি কৃষ্ণের জন্ম, পঞ্চপাণ্ডবের আবির্ভাব কাল, বেদ সঙ্কলন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ইত্যাদির সময় পঞ্চদশ শতকে। এই মতটি গ্রহণ করলে সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হবে। মহাভারতের কাল থেকে পরবর্তী সমগ্র ভারত ইতিহাসের শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা করা সম্ভবপর। সুতরাং প্রাচীন ভারতে আর্যদের বসতি-বিস্তারের ইতিহাসটা এই সময় থেকে অনায়াসে স্পষ্ট করা যেতে পারে। আমাদের সমস্যায় পড়তে হয় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের আগে যেতে হলে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন, এমন কোন কোন সূত্র তার কাল আরো প্রাচীন ব'লে নির্দেশ করতে চান। তার ফলে বহু মতের যে অংশ জাল সৃষ্টি হয়েছে, তার আচ্ছাদনের সুযোগে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকে সমস্ত ব্যাপারটাকে অলীক কবি-কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দিতে উৎসুক। তাঁরা পুরাণের কালনির্ণয়পদ্ধতির রহস্য বুঝতে চান না। সম্ভবত পুরাণকারেরা কোন্ ঘটনা কত খ্রীস্টপূর্বাব্দে ঘটেছে তা লিখে দিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সন্তোষের কারণ হত। দুঃখের বিষয়, খ্রীস্ট বা পাশ্চাত্য সাল গণনার কোন পদ্ধতির সঙ্গেই হিন্দু বা আর্য পুরাণকারেরা পরিচিত ছিলেন না। আমরা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাল সম্পর্কে পঞ্চদশ শতকের আগে যেতে না চাইলেও ভিন্ন মতগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই জন্যে করবো যে, তার ফলে বৈদিক সভ্যতার কাল-নির্ণয় তথা ভারতীয়-আর্যভাষার প্রথম উদ্ভব ও ভারতে বিস্তারসম্পর্কিত রহস্য সহজে ব্যাখ্যাত হবে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির যুগবিভাগের কথা সর্বজনবিদিত। যাঁরা ঐ যুগবিভাগ মেনে নেন, তাঁরা কলি যুগ

যুদ্ধের একটি সময় নির্দেশ ক'রে দেন। তাঁদের মতে কৃষ্ণ ও বুদ্ধ দ্বাপর যুগের অবতার; সুতরাং কৃষ্ণ দ্বাপর যুগের লোক ছিলেন অবশ্যই বহু হাজার বছর আগের আবির্ভাব। কিন্তু কৃষ্ণের মৃত্যুর পরেই যে কলি যুগের আরম্ভ, তাও বলা হচ্ছে। আর বুদ্ধ যে দ্বাপর যুগের অবতার নন, সে-বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ নেই। আমরা ঐ চতুর্যুগবিভাগ সরাসরি অগ্রাহ্য করবো।

দ্বিজেন্দ্রলাল পুরাণকর্তা গাঁজা-ভাং খেতেন কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমাদের সে-বিষয়ে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা তাঁদের যথাশক্তি ইতিহাস অনুসরণ করেছেন। কিন্তু মহাভারতের কালের আগে তাঁদের সাল-তারিখের হিসেব অস্পষ্ট এবং নিতান্ত অনুমান-জনিত শোচনীয় ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। আমরা তাঁদের দেওয়া প্রধান ঘটনাবলী এবং রাজবংশের তালিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌বো। এগুলি শ্রুতি ও স্মৃতির পরম্পরায় মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বহুকাল আগের নিখুঁত সালতামামি পাওয়ার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সে-ব্যাপারে আমাদের শুধু পুরাণ অনুসরণ না ক'রে গবেষণার দ্বারা স্বাধীন ভাবে এগোতে হবে।

যাঁরা পৌরাণিক পাঠভেদের সুযোগে নন্দের অভিষেক থেকে পরীক্ষিতের জন্ম পর্যন্ত কাল-পরিমাণ হাজার বছরের উপর আরো পাঁচশো বছর বেশি ধরতে চান, তাঁদের মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের "ভারতবর্ষ" পত্রিকার ৫৮১ পৃষ্ঠাতে ঐ মত সমর্থন করেছেন। সময় নিয়ে পাঠ-ভেদের গোলমালে ৫০০ বছর সময় বাড়িয়ে নেওয়া ছাড়া ঐ মতের আর কোন যৌক্তিকতা নেই। কলি যুগ সুরু হয়ে কত বছর কেটে গেল, এই হিসেব করতে গেলেই গণ্ডগোল হবে। প্রবোধবাবুদেরও তা হয়েছে, পুরাণকার-দের তো কথাই নেই। মনে রাখতে হবে যে, কলি যুগ ব'লে কিছু নেই, সত্য যুগ ব'লে কোন কিছু কোন দিন ছিল না। কলির সাল বা কল্যব্দ ধ'রে বিচার করলে বিষ্ণুপুরাণমতে পরীক্ষিত-কাল হবে ১৯০২ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। বৃহদ্রথ-প্রদ্যোত-শিশুনাগ-নন্দ, চারটি রাজবংশের আয়ুকালের মোট হিসেব অনুসারে প্রবোধবাবু মহাভারতে বর্ণিত ঘটনা-বলীর কাল মোটামুটি খ্রীস্টপূর্ব বিংশশতাব্দী ব'লে ধরেছেন।

একটি অত্যন্ত জোরালো মত হচ্ছে যে, খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চ-বিংশ শতক মহাভারতের যুদ্ধকাল। বিখ্যাত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের এই মত। গুপ্ত রাজবংশের প্রসিদ্ধ নবরত্নের অন্যতম রত্ন বরাহমিহিরের মতে, ২৪৪৯ খ্রীস্টপূর্ব অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলবেরুনি স্বয়ং বরাহমিহিরের ঐ অভিমত পাঠ করেছিলেন। বরাহমিহির অতি শক্তিশালী জ্যোতিষী ও বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদও বটে। তাঁর মত অবহেলা করা কঠিন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-ঐতিহাসিক বলেন, রামায়ণ মহাভারতের পরে লেখা, অন্তত তাঁর চেয়ে বরাহমিহিরের মতের মূল্য বেশি।

কিন্তু বরাহমিহিরেরও যে গুরুতর ভুল হতে পারে, খনার কাহিনী তার প্রমাণ। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের ঐতি-হাসিক মূল্য সবাই স্বীকার করেন। এই বইটির একমাত্র দোষ এই যে, এতে কহ্লন কল্যব্দ ধ'রে হিসেব করেছেন। কহ্লনের মতে, কাশ্মীররাজ গোনর্দ পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সমকালীন। তাঁরা দুজনেই নাকি কল্যব্দ ৬৫৩ সালে রাজা ছিলেন। এখন প্রচলিত মতে কলিযুগারম্ভ-সাল হচ্ছে ৩১০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সুতরাং খ্রীস্টপূর্ব ২৪৪৯ সালে যুধিষ্ঠির ও গোনর্দ রাজা ছিলেন, এই হচ্ছে রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লনের অভিমত। যুধিষ্ঠির ৩৬ বছর আর গোনর্দ ৩৫ বছর রাজত্ব করেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতে অবস্থানকালে আবু রয়হান্ আলবেরুনি যখন সংস্কৃত ভাষা সাত বছর কঠোর পরিশ্রমে শিখ্‌বার পর সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও শাস্ত্রাদির চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন তিনি এটা লক্ষ্য করেন যে, বরাহমিহিরের অভিমতও এক। বিখ্যাত গর্গ মুনিও ঐ অভিমত সমর্থন করেন। গর্গ বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিষী ছিলেন। গর্গ, বরাহ-মিহির, কহ্লন প্রভৃতির মত সহজে উপেক্ষা করা অসম্ভব। কহ্লনের মতের সমর্থনে যুধিষ্ঠিরাব্দ নামে একটি বর্ষগণনা ভারতে বহুকাল থেকে প্রচলিত, সে-কথা উল্লেখ করা হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যুধিষ্ঠিরাব্দ ৬৫৩ কল্যব্দ বা ২৪৪৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকেই গোনা হয়। আর্যভট্টেরও পূর্ববর্তী মনীষী দানবাচার্য গর্গের মতে ঐ ২৪৪৯ সালই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ-কাল। যুধিষ্ঠিরাব্দ নামের কারণ কি এবং তার প্রথম প্রবর্তক কে, তা জানা দরকার।

বরাহমিহির, কহ্লন প্রভৃতি অবশ্যই বলেছেন, স্বয়ং পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বা তাঁদের বংশোদ্ভূত কেউ তার প্রবর্তক এবং যুধিষ্ঠিরের নামেই তার নামকরণ।

কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, যুধিষ্ঠিরের নামে ঐ অব্দের নামকরণ হলেও তার প্রথম প্রচলন অন্য কোন ভাবে অন্য কোন নামে ছিল ; পরবর্তী কালে আগে থেকে প্রচলিত একটি সালগণনার নাম যুধিষ্ঠিরাব্দ ক'রে দেওয়া হয়, যার জন্যে যুধিষ্ঠিরের চেয়ে তাঁর নামে প্রচলিত সাল হাজার বছর বেশি পুরোণো। এমন ব্যাপার পরেও দেখা গেছে। হিজরি চান্দ্রবর্ষ গণনাপদ্ধতির সাল মুগল আমলে বঙ্গীয় সৌরবর্ষ গণনাপদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার সময়ে বঙ্গাব্দ মহম্মদের সময় থেকে গণনা করা হচ্ছে। অথচ ষোড়শ শতক পর্যন্ত চান্দ্র বর্ষ হিসেবে গণনা ক'রে তারপর শকাব্দের মতো সৌর বর্ষরূপে গণনা করার ফলে তথাকথিত বঙ্গাব্দের মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আদ্যোপান্ত চান্দ্র বর্ষরূপে গণনা করা হলে হিজরি সন ও বঙ্গাব্দের পরিমাণ সমান হত। সৌর পদ্ধতিতে গণনা করলে ১৯৬৫ সালে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ হবার কথা। কিন্তু দুটি পদ্ধতির মিশ্রণ হওয়ায় সব এলোমেলো হয়ে আছে। যেমন হিজরি পূর্ব-প্রচলিত সনকে পরে বঙ্গাব্দে রূপান্তরিত করা হয়, তেমনি পূর্বপ্রচলিত কোন সালকে পরে যুধিষ্ঠিরাব্দ নাম দেওয়া হয়েছিল। মুগল বাদশাহদের দ্বারা প্রচলিত বঙ্গাব্দের বয়স যেমন তাঁদের চেয়ে বেশি, তেমনি যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা প্রচলিত যুধিষ্ঠিরাব্দের বয়স তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি। বরাহমিহির প্রভৃতি তাঁদের কালে প্রচলিত যুধিষ্ঠিরাব্দের সনসংখ্যা দেখে ধ'রে নিয়েছিলেন যে, কল্যব্দ ৬৫৩ সালে যুধিষ্ঠির সিংহাসন লাভ করেন ; অতএব, ঐ বছর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁর জয়লাভ হয়েছিল। কিন্তু ২৪৪৯ খ্রীস্টপূর্ব সালকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ-কাল ব'লে ধরলে সমস্ত পুরাণ ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয় এবং বুদ্ধ ও পাণিনির সময় থেকে দীর্ঘ দেড়-দু হাজার বছরের কোন বিবরণ পুরাণে বা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আর্যভট্টও বরাহমিহির প্রভৃতির মতো গুরুতর ভুল করেছিলেন। আধুনিক এঁদের মতো গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষীদের এ-ধরণের প্রমাদ দেখলে বিস্ময়ে হতবাক্ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। নির্ণেয় ঘটনাটির কাল এত দূরবর্তী যে, তা সুনীতিকুমার, সুকুমার প্রভৃতির পক্ষেও যেমন "মান্ধাতার আমল", গর্গ, বরাহমিহির, আর্যভট্ট প্রভৃতির কাছেও তেমনি স্মরণাতীত কাল ব'লে প্রতীয়মান হতে বাধ্য। আর একটি বহু প্রচলিত মত হচ্ছে যে, কলিযুগ আরম্ভের ঠিক আগে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ শেষ হয়। যেহেতু তথাকথিত কলি-যুগ খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০১ সালে আরম্ভ হয়, সেহেতু আর্যভট্টের মতে ঐ সময়ের কাছাকাছি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়। অধিকাংশ ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এই মতে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ শেষ হলে পর বৎসর ৩১০১ সালে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল কলিযুগে সুরু হয়। কিন্তু কৃষ্ণ তা হলে কলি যুগে ৩৬ বৎসর কাল বর্তমান ছিলেন বলতে হয়। সুতরাং যুগবিভাগপন্থীরা প্রথম থেকে ভুল ক'রে ব'সে আছেন। আর্যভট্টের মতও গর্গ প্রভৃতির মতের মতো গ্রহণের অযোগ্য।

অথচ কাকতালীয়বৎ যোগাযোগের জন্যেই হোক, কিম্বা অন্য কোন কারণে হোক, ২৪৪৯ খ্রীষ্টপূর্ব সালের বিশেষ গুরুত্ব আছে। পরে বৈদিক ভাষা ও সভ্যতার কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে ঐ বৎসরটির গুরুত্ব আলোচিত হবে।

মহাভারত পঞ্চদশ শতকের ধ'রে হিসেব করলে আমরা দেখতে পাই যে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেই ভারতীয়-আর্যভাষা ভৌগোলিক ভারতে সিংহল ও নেপালের কথা বাদ দিলে প্রায় ততটাই বিস্তার লাভ করেছিল, সম্রাট্ অশোকের সময়ে যতটা করেছিল। অর্থাৎ পঞ্চদশ থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত প্রায় বারো শো বছরে ভারতীয় আর্যরা আর তেমন বিস্তার লাভ করতে পারেন নি। কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্রশক্তির নিদারুণ বলক্ষয় ও বিনাশ এর কারণ। সম্রাট্ অশোকের কলিঙ্গ-যুদ্ধ প্রমাণ করে যে, ভারতে আর্যবিস্তার বড় সহজে হবার ছিল না। অশোকের পর আজ পর্যন্ত প্রায় বাইশ শো বছরে ভারতীয় আর্যরা সিংহল ও নেপাল অধিকার করা ছাড়া ভৌগোলিক ভারতে আর বেশি কিছু বসতিবিস্তার লাভ

করেন নি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসার চর্চায় ভারতীয় আর্যদের আরো নির্বীর্য হয়ে পড়াই এর কারণ। সম্রাট্ অশোক ও হর্ষবর্ধন তার জন্যে বেশ কিছু দায়ী। তার পর সুদীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতা প্রধান কারণ। মহাভারতে আর্যবিস্তারের বিস্তৃত বর্ণনা মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। অর্জুনাদির দিগ্বিজয়ের বর্ণনা মিলিয়ে পড়লে দুই যুগে প্রায় দুই হাজার বছরের ব্যবধানে ভারতীয় আর্যদের বসতি বিস্তারের ভৌগোলিক আয়তনের তারতম্য খানিকটা ধরা পড়ে।

মহাভারতের পর রামায়ণের কাল নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। রামায়ণের নায়ক শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রবীর ক্ষাত্রশক্তির উপাসক রামচন্দ্র পরশুরামের মতো শাস্ত্রব্যবসায়ী দাম্ভিক ব্রাহ্মণদের দর্প চূর্ণ করেন। তাঁর বংশধর বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ক্ষাত্র তেজের দীপ্ত তারকা সুযোধনের পক্ষ গ্রহণ গ্রহণ করেন ক্ষাত্রশক্তির মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখার আশায়। তিনি রামচন্দ্র থেকে ত্রিশ পুরুষ পরের লোক। গিরীন্দ্রশেখরের মতে, বৃহদ্বল ১৪৪২ খ্রীষ্টপূর্ব সালে কুরুক্ষেত্রে মারা যান। তাঁকে প্রথম পুরুষ ধরলে রাম দ্বাত্রিংশ পুরুষ, অর্থাৎ মধ্যে ৩০ পুরুষের ব্যবধান। গিরীন্দ্রশেখরের মতে, রাম ২২৪২ সালের লোক হতে পারেন। কিন্তু আমরা অন্যান্য সূত্রে সূক্ষ্মতর হিসেব পাই। ত্রিশ পুরুষে আন্দাজ ৬০০ বছর ধরা সঙ্গত। সেদিক থেকে রামচন্দ্র খ্রীষ্টপূর্ব একবিংশ শতকের লোক হন। মহাভারতের কৃষ্ণাদি চরিত্রের মতো রামায়ণের রামাদি চরিত্রেরও নির্দিষ্ট কোষ্ঠী আছে। ঐ সব কোষ্ঠী যে জাল নয় তার প্রমাণ, কোষ্ঠীগুলি থেকে চরিত্রগুলির নিখুঁত বর্ণনা ও রূপ পাওয়া যায় যা মহাকাব্যগুলিতে প্রতিফলিত। ভক্ত বা অবতারবাদীরা জালিয়াতি ক'রে কোষ্ঠী তৈরি করলে আরাধ্য রাম ও কৃষ্ণ চরিত্রদুটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে দেখাত। কিন্তু কোষ্ঠীগুলি দোষে-গুণে মানুষের কোষ্ঠী এবং স্থানে স্থানে দোষগুলি উৎকট রকমের প্রবল। সুতরাং কোষ্ঠীগুলি যে জালিয়াতি, সে-কথা বলা কেবল মূর্খেরই শোভা পায়। আলোচনার সুবিধের জন্যে আমরা রাম ও কৃষ্ণ, দু জনের কোষ্ঠীর জন্যে বা রাশিচক্রের সঙ্গে যুধিষ্ঠির, ভীম, দুর্যোধন বা দুর্যোধন ও অর্জুনের চক্রগুলিও তুলে দিলাম :—

যুধিষ্ঠিরের রাশিচক্র

আমরা অবশ্য এই কুণ্ডলী ১৯৬৭ সাল থেকে ধ'রে ৫১৪০ বছর আগেকার অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৭৩ সালের ব'লে মনে করি না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরের বয়স ৭২ চলছিল, এ-কথা মনে করারও কোন কারণ নেই। তবে কোষ্ঠীগুলি নির্ভুল, এটুকু বলা যায়।

ভীমের রাশিচক্র

দুর্যোধনের রাশিচক্র

অর্জুনের রাশিচক্র

কৃষ্ণের রাশিচক্র

লগ্ন
চন্দ্র ৪
গুরু
বৃহস্পতি
মঙ্গল
রবি
বুধ
শুক্র
শনি
রাহু

কৃষ্ণের জন্ম কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে, বুধবারে। "খমাণিক্য" গ্রন্থের বচন অনুসারে এই কোষ্ঠী পাওয়া যায়।

রামের রাশিচক্র

এল ডি স্বামীকান্নু পিল্লাই (L. D. Swamikannu Pillai)-এর মতে Indian Ephemeris, Vol. I, Part I., ১১৬-২৩ পৃষ্ঠা) এবং জ্যোতি বাচস্পতি-সম্পাদিত ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের বিধিলিপি পত্রিকায় গণপতি সরকার-লিখিত "শ্রীরামচন্দ্রের কোষ্ঠী" প্রবন্ধ অনুসারে যদি সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের পদ্ধতি মেনে গণনা করা হয়, তা হলে রামের জন্ম ২০৫৫ খ্রীষ্টপূর্ব সালের এপ্রিল মাসে হয়। বেণ্ট্‌লি সাহেবের Historical View of Hindu Astronomy রচনা অনুসারে রামের জন্ম ৯৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ৬ই এপ্রিল। ভরতের মীন লগ্ন; লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন বৈশাখ মাসে জাত। রাশিচক্রগুলির দ্বারা সহজেই কালনির্ণয় করা যায়।

জ্যোতিষশাস্ত্র ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে রামের জন্মসময়ের খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে, পুরুবংশে পরীক্ষিৎ থেকে ভরত ২৭ পুরুষ আগের লোক; তিনি আনুমানিক ২০১৫ খ্রীষ্টপূর্ব সালে দ্বাদশ অতিরাত্র যজ্ঞ করেন; জনক সপ্তম অতিরাত্র যজ্ঞ করেন ২০৩৫ সালে; জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র চতুর্থ অতিরাত্র যজ্ঞ করেন ২০৪৭ সালে; বৃহদ্বলের মৃত্যু ১৪৪২ সালে আর পরীক্ষিতের জন্ম ১৪৪১ সালে; সুতরাং

সঙ্গে তুলনায় বৃহদ্বলের ৩০ পুরুষ আগের লোক রামচন্দ্র সামান্য পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক লোক হবার কথা।

সব দিক বিচার ক'রে রামচন্দ্রকে একবিংশ খ্রীষ্টপূর্ব শতকের লোক বলা যুক্তিসঙ্গত। তাঁর জন্মসাল ২০৫৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ হতে পারে।

বাল্মীকির কাল সম্বন্ধে আপাতত কিছু বলা হচ্ছে না। তিনি কারো কারো মতে বড় জোর খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর কবি; স্বয়ং বিদ্যানিধিও এই মত প্রকাশ করেছেন। বেন্ট্‌লি সাহেবের মতও এই ধারণার অনুকূলে। কিন্তু বাল্মীকি যখনকার লোক হোন না কেন, রামায়ণ-কাহিনী যে মহাভারতকাহিনীর পূর্বে ঘটিত ও রচিত, সে-বিষয়ে সন্দেহের একটুও অবকাশ নেই। মহাভারতে বহু জায়গায় রামায়ণের কাহিনী এত বেশি উল্লিখিত ও উদ্ধৃত যে, রামায়ণ যে আগে ও মহাভারত পরে লেখা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রথম রামায়ণ-কাহিনী অন্য কারো লেখা কি না এবং বাল্মীকি তার নবরূপ দিয়েছিলেন কি না, সে-কথা স্বতন্ত্র। শেক্‌স্‌পিয়র ও কালিদাসের মতো বাল্মীকিও অন্যের কাহিনী নবীকৃত ক'রে থাকবেন। কিন্তু যার লেখা হিসেবেই হোক, মহাভারতের যুগে রামায়ণ সুপরিচিত কাহিনী ছিল। তার লিখিত রূপ যে পঠিত ও কথিত হত, মহাভারতে তার প্রমাণ আছে। মহাভারতে বর্ণিত রামায়ণ কাহিনীর বক্তারা নিশ্চয় রামায়ণ পাঠ ক'রেই সে-কাহিনীর কথকতা করতেন, বেদের মতো কেবল শ্রুতিপরম্পরায় রামায়ণ কাহিনী রক্ষিত হত, এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

ভারতের সমস্ত পুরাণ এবং রামায়ণ ও মহাভারতে দেওয়া বংশতালিকাগুলিও এ বিষয়ে একমত যে, রামচন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং পাণ্ডবদের বহু পূর্ববর্তী লোক। এই বিবরণ এত সুবিন্যস্ত এবং লোকপরম্পরায় ঐতিহ্যক্রমে সংস্কাররূপে আগত যে, রামায়ণকাহিনী ও রামচরিত্রের প্রাচীনতরতা নিয়ে বৃথা তর্ক নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দরকার রামায়ণের কাল-নির্ধারণ অর্থাৎ রামচন্দ্রের আবির্ভাব-কাল, রামায়ণের যুদ্ধের সময় নিরূপণ ইত্যাদি, যা থেকে আর্যদের ভাষা ও বসতি বিস্তারের চিত্রটি আর একটু স্পষ্ট হতে পারবে। বাল্মীকি যদি খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকের কবিও হন, তা হলেও তিনি নিশ্চয় পূর্ববর্তী কাহিনীকারের অনুসরণে একবিংশ শতকের মূলানুগ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে বর্ণিত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চিত্র মহাভারতের চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন। ছয় শতাব্দীতে যতটা প্রাচীনতা থাকা উচিত, উভয় কাব্যে বর্ণিত ঘটনাবলী ও সমাজ চিত্রাবলীর মধ্যে তুলনায় রামায়ণের অন্তত ততটা প্রাচীনতা আছে।

বর্তমানে রামায়ণকে যে শুধু কাব্যরূপে নয়, ইতিহাস-রূপেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তার প্রমাণ মাখনলাল রায়-চৌধুরির "রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা" বইটি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে, রামায়ণ কাব্য, মহাভারত ইতিহাস। রামায়ণ শুধু মহাকাব্য বা ইতিহাস নয়, তা ইতিহাসভিত্তিক মহাকাব্য। মহাভারত শুধু ইতিহাস নয়, তা একাধারে মহাকাব্য-ইতিহাস-পুরাণ-বেদ সবই। মহাভারতে নিজেকে সবই বলা আছে। পণ্ডিতদের মতে, কাব্য-ইতিহাস পুরাণ-বেদ উত্তরোত্তর অধিক প্রামাণিক। (ক্রমশঃ)

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় এম-এ

একশো বছরের আগের কলকাতায় গড়ের মাঠ পার হয়ে গোরা সৈন্যের ভয়ে আবদ্ধ এক ছ্যাকড়া গাড়ী চলে গেল ভবানীপুরের দিকে। কালীঘাটে গিয়ে নামলেন এক দম্পতি—আসছেন আহিরীটোলা থেকে। ভদ্রলোকের নাম রসিকলাল চন্দ্র বাড়ী নিমু গোস্বামী লেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ইংরেজীর শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন। বিশ্বনাথ দত্ত, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি তাঁর ছাত্র। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিলেও, প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্রসন্তান বিহারীলাল যখন এণ্ট্রান্স পাশ করে বাইবেল পড়ে মুগ্ধ হয়ে খৃষ্টান হয়ে গেল, বিপত্নীক রসিকলাল তখন গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করতে গেলেন। কি জানি কেন আত্মহত্যা কোন ক্রমে করা হল না। তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন।

পাঁচ পাঁচটি ছেলে হয়ে মারা গেল। তার পরেরটি অবশ্য বেঁচে আছে। কালীঘাটে মার কাছে তাই ধর্মপ্রাণা স্ত্রী প্রার্থনা করলেন এক যোগী সন্তান। তেমন একটি ছেলেও যদি বেঁচে থাকে মাতৃত্ব সার্থক হবে—এই বোধহয় ছিল নয়নতারার বিশ্বাস। দুর্গার নবম্যাদি বোধন আরম্ভের দিন, ১৭ই আশ্বিন ১২৭৩ সাল (ইংরেজী ২রা অক্টোবর ১৮৬৬) পূর্ব্বানক্ষত্রে নয়নতারা একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন। কালীঘাটে মার কাছে প্রার্থনার কথা স্মরণ রেখে নবজাতকের নাম রাখলেন কালীপ্রসাদ। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সর্বাঙ্গে নাড়ী জড়ান দেখে ধাই বলল, "একে যেন কে ধরে বেঁধে পাঠিয়েছে, জন্ম নেবার যেন ইচ্ছে ছিল না।"

ছেলেবেলায় এ গল্প শুনেছেন কালীপ্রসাদ। কিন্তু পরিষ্কার করে বুঝলেন সতের বছর বয়সে যখন যোগ শেখবার জন্য গুরুর সন্ধানে অস্থির হয়ে বহু কষ্টে দক্ষিণেশ্বরে শেখাতে চাইলেন। বললেন, একটুই বাকী ছিল—এই তাঁর শেষ জন্ম।

তখন তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়েন। পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও এই বয়সেই তাঁর হার্বার্ট স্পেন্সরের 'শিক্ষা', মিল এর 'তর্কবিদ্যা', ধর্মপ্রবন্ধ, হার্শেলের 'জ্যোতির্বিজ্ঞান', গ্যানোর 'পদার্থবিদ্যা' লুই-এর 'দর্শনের ইতিহাস,' হ্যামিল-টনের 'দর্শন' প্রভৃতি বইও পড়া হয়ে গেছে। এ ছাড়া সংস্কৃতেও খুব অনুরাগ। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, ভট্টিও পড়া হয়ে গেসলো। বাবা ভয় পান, ছেলে এ বয়সে গীতা পড়লে না জানি কি অঘটন ঘটবে। কিন্তু বন্ধ ঘরে গীতাও পড়া চলে। শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা প্রভৃতিও পড়া। পাতঞ্জল দর্শনটা ভাল করে বোঝা দরকার ভেবে কত না আয়াস! পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়া-মণি তখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বর্তমান 'ভারতবর্ষ' কার্য্যালয় (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স) এর ওপর তলায় ভূধর চট্টোপাধ্যায় মশায়ের অতিথি হয়ে বাস করছেন। তাঁর হিন্দুধর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যাদির ওপর বক্তৃতা শুনে আর 'বঙ্গবাসী'-তে সে-সব বক্তৃতা পড়েই কালীপ্রসাদের ক্রমবিকাশবাদের দিকে নজর গেল। ধীরে ধীরে পাতঞ্জলের ওপর গভীর আকর্ষণ হওয়ায় এই বাড়ীতেই কালীপ্রসাদ এলেন শশধর তর্কচূড়ামণি মশায়ের কাছে তাঁর পাতঞ্জল বোঝবার মানসিক আকূতি নিয়ে। শশধর পাঠিয়েছিলেন তাঁকে কালীবর বেদান্তবাগীশ মশায়ের কাছে। প্রত্যহ তেল মাখার অবসরে কালীবর কালীপ্রসাদকে পাতঞ্জল বোঝাতেন।

এমন ক'জনের ভাগ্যে হয় জানি না। সম্ভাব্য গুরুর প্রথম সান্নিধ্যলাভেই দীক্ষা হয়ে গেল। শুধু দীক্ষা নয়, তৎক্ষণাৎ পরমানন্দের আস্বাদ লাভ। রামকৃষ্ণ বুঝিয়ে

মায়ার সংসারেই বদ্ধ থাকে। সংসার মায়াকে অতিক্রম করতে পারলে ভাল-মন্দ দুই-ই যায়, ভেদবুদ্ধি গিয়ে জন্ম নেয় অভেদজ্ঞান।

"শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।

দুই সতীনে পীরিত হলে তবে শ্যামামাকে পাবি॥"

দীক্ষাকালে কালীপ্রসাদকে রামকৃষ্ণর এই শিক্ষার ভেতরই লুকিয়ে রয়েছে ভবিষ্যতের বিশ্বজয়ী সন্ন্যাসী অভেদানন্দের নামতত্ত্ব।

তারপর বছর দুই নানাভবে গুরুসেবা ও অধ্যাত্মজীবনের বনিয়াদ তৈরির পর দেহান্ত হল রামকৃষ্ণের। ত্যাগী যুবক ভক্তবৃন্দ ফিরতে পারল না চিরাচরিত সংসার পথে। বিদেহী গুরুর নামে আবার জড়ো হল। সারদা দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবন থেকে ঘুরে এসে কালীপ্রসাদ বরাহনগর মঠে কাটালেন কিছুদিন। তাঁর কঠোর তপস্যা তাঁকে 'কালী-তপস্বী' নাম দিল। সাধনার সঙ্গে অসাধারণ পড়াশোনা। রামকৃষ্ণও তাঁকে বলেছিলেন, "তুই-ই তো ছেলেদের মধ্যে বইপড়া চেকোলি!" পরে শুরু হল তাঁর প্রায় দশ বছরের পরিব্রাজক জীবন। তার মধ্যেও কঠোর সাধনার সঙ্গে চললো গভীর অধ্যয়ন। হৃষীকেশে ধনরাজ গিরির কাছে শাঙ্কর বেদান্ত পড়লেন। ইনিই পরে বিবেকানন্দের কাছে অভেদানন্দের "অলৌকিকী প্রজ্ঞা"র কথা বলেছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি দৈনিক কাগজে মারউইন মেরী স্নেল লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ চোখে পড়লো আলমবাজার মঠের আশ্রম-বাসীদের। ক'দিন পরে সকলে জানতে পারলেন স্বামী বিবেকানন্দ আর কেউই নন, তাঁদের গুরুভাই নরেন। বিবেকানন্দের কার্য্যাবলীকে সমর্থন ও তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হল। অভেদানন্দই ছিলেন এ ব্যাপারের প্রধান হোতা। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনের সভাপতিত্বে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর টাউন হলের সভার পর বিবেকানন্দকে যে চিঠি লেখা হল তার শেষে বলা হল, "May god grant you strength aud enrgy to carry on the good work you have begun!"

এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অভেদানন্দ। তাই যেন বিবেকানন্দের আরব্ধ শুভকাজকে চালিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব সব থেকে বেশী করে এসে পড়লো অভেদানন্দেরই ওপর। রামকৃষ্ণও অভেদানন্দকে বলেছিলেন, "ছেলেদের মধ্যে তুইও বুদ্ধিমান, নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি, নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, সে রকম তুইও পারবি।" ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের ডাকে অভেদানন্দ সাগর পাড়ি দিলেন। লণ্ডনের ব্লুমস্‌বেরী স্কোয়ারে খৃষ্টো-থিওসফিক্যাল সোসাইটীর হলে ২১এ অক্টোবর সন্ধ্যায় এক বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী সমবেত হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনবার জন্যে। বিবেকানন্দ উঠে তাঁদের জানালেন, তিনি সে দিন বক্তৃতা করবেন না। ভারত থেকে তাঁর এক সুপণ্ডিত গুরুভাই—স্বামী অভেদানন্দ—এসেছেন, তিনি তাঁদের বেদান্ত বিষয়ে কিছু বলবেন। শুনে তাঁদের খানিক মনোভঙ্গ হল। কিন্তু যখন এক ঘণ্টা পর অভেদানন্দের জনসমক্ষে সর্বপ্রথম বক্তৃতা ("পঞ্চদশী"র ওপর) শেষ হল, তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইল না। বিবেকানন্দও গুরুভাই-এর বিশেষ ভাবে প্রশংসা করে সেদিনকার সমবেত শ্রোতাদের বলেছিলেন, এমন কি তিনি পৃথিবী থেকে চলে গেলেও অভেদানন্দের সুন্দর অধরোষ্ঠে উচ্চারিত হবে তাঁরই বাণী আর সমগ্র জগজন তা শ্রবণ করবে। ঘটেও ছিল তাই। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে অভেদানন্দ আমেরিকায় তথা ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্যে বেদান্তের তথা ভারতের বাণী প্রচার করেন। ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বিশ্বজনমত গঠনেও অভেদানন্দের দানকে বোঝবার সময় এসেছে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই আগষ্ট অভেদানন্দ রওনা হলেন ইংলণ্ড থেকে আমেরিকার উদ্দেশে। নির্বান্ধব দেশে প্রথমে অভ্যর্থনা পেলেও বিবেকানন্দের মত অভেদানন্দকেও কম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় নি। অভেদানন্দ বলতেন, "বিঘ্নবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার চেষ্টার নামই পুরুষকার। পুরুষকার কিনা পুরুষের নিজের প্রযত্ন বা একান্ত চেষ্টা।" কিন্তু আমেরিকায় প্রথম অবস্থায় নিঃসহায় মনে করে অভেদানন্দ বিবেকানন্দকে লিখেছিলেন, তাঁর পরিচিত বন্ধুদের তাঁকে সাহায্য করার কথা লিখতে। বিবেকানন্দ অসহায়

গুরুভ্রাতাকে কিন্তু পথ দেখিয়ে দিলেন এই পুরুষকারের। তিনি লিখলেন, "নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাধা বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করো।" অভেদানন্দ সে সংগ্রামে জয়ী হয়েছিলেন। হোটেলে হোটেলে অভেদানন্দের ট্রাঙ্কে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটী বহুদিন ঘুরেছে। তার পর তার একটা স্থায়ী আবাস যখন স্থাপিত হল, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়ে অভেদানন্দকে বলেছিলেন: "আমি তিনবার নিউ ইয়র্কের দোরে ধাক্কা দিয়েছি, সাড়া পাইনি। এখন খুব আনন্দিত হচ্ছি যে তুমি প্রচারের একটা স্থায়ী প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেছ। এই প্রথম নিউইয়র্কে আমাদের নিজস্ব একটা আস্তানা পেলাম।" তার কিছুদিন পর ভাই বিবেকানন্দ অভেদানন্দকে লিখলেন, "তোমাকে নির্দেশ দেবার আমার কিছুই নেই। আমি এ কাজ সম্পূর্ণভাবেই তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তারপর আমেরিকা মেনে নেয়, "বর্তমান জগতে স্বামী অভেদানন্দই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনের অধিকারী।"

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ দূরপ্রাচ্যের পথে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং পরের বছর কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণে যান। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি (বর্তমান মঠ) ও ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম স্থাপন করেন। কলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠেই এখন ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত মূল তৈল চিত্রটি আছে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় স্বামী অভেদানন্দের মহাসমাধি হয়। সুপণ্ডিত, মহান কর্মী, যুক্তিশীল প্রচারকের এই বিরাট ব্যক্তিত্বে অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি কি অপূর্বভাবেই না মিশেছিল! চিন্তার জগতে তাঁর দান এ যাবৎ প্রকাশিত ত্রিশটিরও বেশী গ্রন্থে সুবিন্যস্ত রয়েছে। তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইংরেজীতে তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলীও দশ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর কর্মময় জীবনের একটা রেখাচিত্র আমরা এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা মাত্র করেছি। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তার কথা বাদ দিলেও তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক জীবন চিত্রটিও পরম রমণীয়। বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় যে সম্ভব তা তাঁকে জানবার চেষ্টা করলে বিশ্বাস হয়। তাঁর দীক্ষার কথাটি শুধু আমরা উল্লেখ করেছি। রামকৃষ্ণের তাঁর সম্বন্ধে যে ভাব সে কথাটি শুধু এখানে বলতে চাই।

হঠাৎ একদিন রামকৃষ্ণ অভেদানন্দকে বললেন, "তোর ভ্রূ দুটি, চোখ ও কপাল দেখে শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা হয়। আমার ভেতর রাধার ভাব জাগে।... তোর ভেতর শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে।" রামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদা দেবীর সম্পর্কের পাশে মাতৃস্নেহধন্য অভেদানন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণের এ পরম সম্বন্ধটির কথা ভাবতে শিহরণ জাগে। অভেদানন্দই বলেছেন,

"তোমার আদেশে এ রহস্য
প্রকাশ আমি করিতে নারি।
It will die with me."
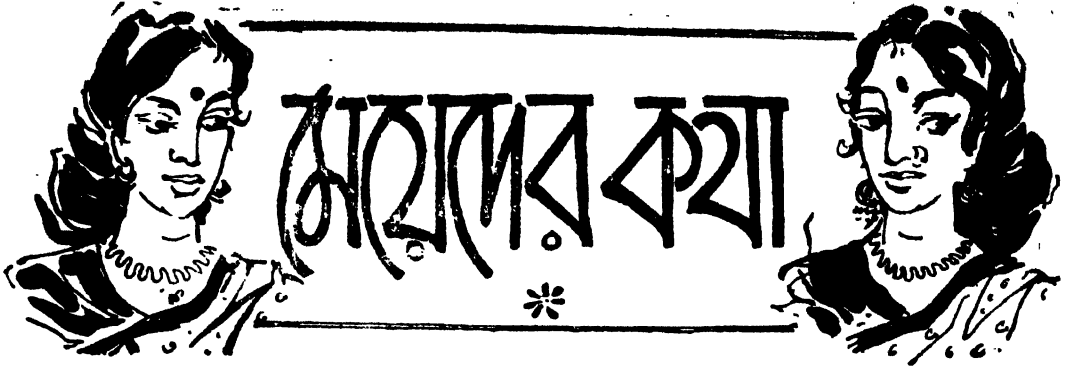
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মেয়েরা গর্বিত হয়ে উঠতে পারে এমন কথা কবি অজস্র বলেছেন। কিন্তু তবু স্ত্রী চরিত্রের দুর্বলতা তার দোষত্রুটিগুলোও কবির অজানা ছিল না। তাই সব জেনেও কবি যে মেয়েদের স্তব করেছেন তাতে মনে হয় স্তুতির যোগ্য মেয়ে কবি নিশ্চয় তার নিজের জীবনে দেখেছিলেন। মেয়েরা যে কবিকে ফাঁকি দিয়ে স্তুতি আদায় করেছে তা মনে হয় না। কবির চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সে যে অনেক গভীরে আপনার দৃষ্টি পাঠিয়ে দিতে পারে, সেখানে আমাদের দৃষ্টি পৌঁছ'য়ই না।

কবির চোখে মেয়েদের দোষগুলো কেমন ক'রে ধরা পড়েছে সে কথা—তাঁর গল্প উপন্যাসে এবং প্রবন্ধ-সাহিত্যে দেখেছি। কবিতা আর গানে তিনি মেয়েদের বন্দনা গানই বেশি ক'রে গেয়েছেন। কবিতা ও গানের মধ্যে ভাবের অনুপ্রেরণা, হৃদয়ের মুগ্ধতা বেশি থাকে, গভীর ভাবে মুগ্ধ না হ'লে সুর ও ছন্দ জাগে না। তাই কবি যখন সুর আর ছন্দে কথা বলেছেন তখন সেখানে বিচার বিশ্লেষণের চেয়ে ভাবের মুগ্ধতাই বেশি দেখা দিয়েছে। নারী কবিকে গানের অনুপ্রেরণা দান করেছে। সেই খানে কবি নারীর কাছে ঋণী। আর মেয়েরা তো ঋণী আছেই কবির কাছে। এ ঋণ পারস্পরিক। কবি তাঁর কাব্যে এই ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন।

স্ত্রীচরিত্রের দোষ বিশ্লেষণ যে সব লেখায় পাই তার মধ্যে আছে এইগুলি :—

"খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" গল্পে খোকার মা, অনুকূলের স্ত্রীর বর্ণনায় কবি দেখিয়েছেন মেয়েদের হৃদয়াবেগ কেমন অন্ধ, আর তার প্রকৃতি সন্দিগ্ধ। রাইচরণ যে খোকাকে চুরি করেছে অনুকূল একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু অনুকূলের স্ত্রী তার নিজের ক্ষতির সামনে সমস্ত বিশ্বাস এক মুহূর্তে হারিয়ে ফেলল। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ প্রকৃতির এই লক্ষণ। যখন তার নিজের ক্ষতি হয়েছে তখন সে সেই ক্ষতিটাকেই—এত বড় ক'রে দেখে যে বিশ্বসংসারে অন্য কারো প্রতি সে তখন আর সুবিচার করতে পারে না। সে মনে করে বিশ্বসংসার তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে যোগ দিয়েছে। তাই সে এক নিমেষে চিরদিনের বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারে সবাইকেই অবিশ্বাস করতে পারে। যারা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ক্ষুদ্র কাজ নিয়ে জীবন কাটায় এই ক্ষুদ্রতা তাদের প্রকৃতিতে প্রবেশ করে। এই জন্যেই সংসার সীমার মধ্যে যার যার বাস সেই মেয়েরা ক্ষতির দিনে যে কোন লোককে সন্দেহ করতে দ্বিধা করে না।

"কাবুলিয়ালা" গল্পেও কবি মেয়ে-প্রকৃতির এই ক্ষুদ্রতা, এই সন্দেহ প্রবণতা দেখিয়েছেন। মিনির বাপ কাবুলিয়ালার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে ব'লে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না, কিন্তু মিনির মা বিনা প্রমাণেই সন্দেহ

ক'রে বলে যে কাবুলীয়ালার মনে মিনিকে চুরি করবার মতলব। এই সন্দেহ প্রবণতা মেয়েদের চরিত্রে কেন আসে এর ব্যাখ্যা কবি এই গল্পেই দিয়েছেন। মিনির মা নিজের সংসারের বাইরে কখনো যায়নি, তাই এই অপরিচিত দুনিয়াটা তার কাছে সব রকম ভয় এবং অবিশ্বাসের স্থান। যার কর্মক্ষেত্র দুনিয়ার মধ্যে প্রসারিত নয়, এই সন্দিগ্ধতা তার চরিত্রের একটা লক্ষণ।

মেয়েদের চরিত্রে অনেক সময় লোভ প্রবল হয়ে ওঠে। "স্বর্ণমৃগ" গল্পে কবি দেখিয়েছেন সোনার লোভে কেমন ক'রে বৈদ্যনাথের স্ত্রী তার স্বাভাবিক নারী প্রকৃতিকে বিসর্জন দিয়েছে। তার সমস্ত মন একাগ্র হ'য়ে কেবল সোনারই-ধ্যান করছে। তার মনের সহজ প্রেম, সেবার সহজ ইচ্ছা, সমস্ত দূর হয়ে গেছে। সে যখন শুনল যে তার স্বামী গুপ্তধনের সন্ধান পায়নি তখন সে সেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, সদ্য বিদেশ থেকে প্রত্যাগত, স্বামীর মুখের সামনে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। সোনার জন্য ব্যর্থ সন্ধানে শ্রান্ত ক্লান্ত বৈদ্যনাথ একটু বিশ্রামের আশায় যেদিন বাড়ী ফিরল সেই রাত্তেই তাকে বাড়ী ছেড়ে আবার পথে বেরুতে হ'ল। লোভী মেয়েমানুষ স্বামীকে চায় না, সোনা চায়, তার কাছে মানুষের প্রাণের মূল্যের চেয়ে সোনার মূল্য বেশি হ'য়ে ওঠে।

"রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা" গল্পে সত্যনিষ্ঠ পুরুষ-প্রকৃতির পাশে কবি লোভী নারীর প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন। স্ত্রীর কথায় রামকানাই যখন সম্পত্তির লোভে মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারল না, সেদিন বাড়ী ফিরে এসে স্ত্রীর হাতে তার লাঞ্ছনার সীমা রইল না। অবশেষে যেদিন সে মারা গেল তখনও মিথ্যাকথা বলতে না পারার অপরাধে স্ত্রী তাকে ক্ষমা করতে পারল না। সে বলল. আরো কিছু দিন আগে গেলেই ভালো হ'ত।

অনেক সময় মেয়েমানুষ মুখে উদারতার কথা বলে, কিন্তু মন তার সংকীর্ণ।

একটি গল্পে কবি এঁকেছেন 'কলিকা' নামে একটি স্ত্রী চরিত্র। কলিকা স্বদেশ প্রেমিক। কোন এক স্বদেশী নেতার কাছে অনেক বড় বড় কথা সে শিখেছে। সে সভায় যাবার সময় খদ্দর পরে। কিন্তু একদিন যখন সে তার স্বামীর সংগে পথে যাচ্ছিল, তখন পথের মধ্যে এক দৃশ্য দেখা গেল। এক বুড়ো মেথরকে সবাই মিলে মারছিল। সে নাকি যেতে যেতে কারো জল ছুঁয়ে দিয়েছে। সে তখন স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরেছিল। তাকে মারের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে কলিকার স্বামী বলল চল ওকে আমাদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাই। কিন্তু এবেলায় কলিকা কিছুতেই রাজি হ'ল না। তার জিদের কাছে নিরুপায় স্বামীকে হার মানতে হ'ল। খদ্দর পরা বা মুখে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়া সহজ কিন্তু ব্যবহারে অস্পৃশ্যকে কাছে ডেকে নেওয়া কঠিন।

অনেক সময় মেয়ে মানুষের প্রকৃতিতে মিথ্যাচারিতা এবং নিষ্ঠুরতা দেখা যায়।

গল্পগুচ্ছের একটি গল্পে কবি এমনি একটি চরিত্র এঁকেছেন। অমিয়া স্বদেশের সেবা করে, অর্থাৎ সভায় গিয়ে বক্তৃতা দেয়। দলের লোক তাকে ভক্তি করে। একজন তার নাম দিয়েছে যুগলক্ষ্মী। অমিয়ার দাদার বাড়ীতে গ্রামের যে অনাথা মেয়েরা আশ্রয় পেয়েছিল, অমিয়ার দৃষ্টি পড়ল তাদের দিকে। অমিয়া বলল ওদের এমন ক'রে পুষে না রেখে ওদের কোন আশ্রমে কাজে ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'ক। আশ্রমে মেয়েদের যে ভাবে রাখা হয় সেই অনাত্মীয় নির্মম নিষ্ঠুরতার মধ্যে মেয়েদের পাঠাতে দাদা রাজি হ'ল না। সে অমিয়াকে বলল—আগে তুমি নিজে ঐভাবে থেকে এস, তারপরে অন্যের কথা বল। ঐ আশ্রিতাদের মধ্যে একদিন একটি মেয়ে এসে বসল অমিয়ার দাদার পায়ের কাছে। তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যদিও কারো কাছ থেকে সেবা নেওয়া ওর অভ্যাস ছিল না, তবু ঐ মেয়েটিকে সে কিছুতে ক্ষুণ্ণ করতে পারল না। এমন সময় অমিয়া ঘরে এসেই মেয়েটিকে বিদায় ক'রে দিল। অমিয়াকে দেখেই সে ভীত, সংকুচিত, অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠেছিল, অমিয়ার কথা শুনে সে ম্লান মুখে উঠে চলে গেল। তার সেই চ'লে যাওয়ার করুণ দৃশ্যটি দাদার মনে বাজল। এর পরে অমিয়া যে তার অধৈর্য্য নিয়ে অনিচ্ছুক হাতে তার পদসেবা করতে গেল, সেই সেবার পীড়ন ওর দাদার কাছে অসহ্য বোধ হ'ল। সেবা করা অমিয়ার প্রকৃতি নয়। সে সভায় গিয়ে বক্তৃতা দিতে পারে। দলের লোককে অভিভূত করবার জন্যে চটকদার

কথা বলা তার কাজ। ঘরে ব'সে মনপ্রাণ ঢেলে ধৈর্যের সংগে সেবা করা তার স্বভাবের মধ্যে নেই। সে যা কিছু করে তা করে বাহবা পাওয়ার জন্যে। যেখানে বাহবা পাওয়ার কথা নেই সেখানে তার কিছুমাত্র মন নেই। আর সত্যিকারের কাজও সে কিছু করে না, শুধু মিথ্যে বক্তৃতা দিয়ে মিথ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে বেড়ায়। অথচ তার এত স্পর্দ্ধা এবং এত নিষ্ঠুরতা যে সে সেবা-পরায়ণা ঘরের মেয়েদের নিজের চেয়ে হীন বলে মনে করে, আর তাদের ওপরে নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। নিজে যে সে শুধুই-অকাজে সময় অপব্যয় করছে এটা সে বোঝে না, তাই ঘরের মেয়েরা যে সেবা করতে পারে, সেটাকে সে মূল্য দেয়না, সে তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা বশতঃ তাদের সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য তাদের আশ্রমের কাজে ভর্তি করে দিতে চায়।

এই গল্প থেকে কবির এই অভিমত ফুটে উঠেছে যে মেয়েদের কাজ সভাসমিতি নিয়ে হৈ চৈ করা নয়। সভা-সমিতি নিয়ে যে মেয়েরা মাতামাতি করে আসল কাজ তারা করে না। সকলের পক্ষেই সত্যিকারের কাজ সভার কাজ নয়, তা ব্যক্তিগত কাজ। যে মেয়েরা দলের পাণ্ডা তারা অনেক সময়েই আপনার আত্মীয় পরিজনদের প্রতি কর্তব্যে বিমুখ। তার চেয়ে যে মেয়েরা সভা বা দলের বাইরে নিভৃতে থাকে তারাই বেশী কর্তব্য পরায়ণা—,সেবা পরায়ণা হয়ে থাকে। দলগত আড়ম্বরে আসল কাজ বেশী হয় না। ব্যক্তিগত নিষ্ঠাতেই বেশী কাজ হয় কবির এই মত।

"ছুটি" গল্পে কবি দেখিয়েছেন নারীর মনের সংকীর্ণতা। নারীর মনের ভালোবাসা অনেক সময়েই তার ছোট গোছানো সংসারটির সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার সেই গুছিয়ে নেওয়া বেড়াঘেরা সংসার সীমানাটুকুর মধ্যে যদি অতিরিক্ত কেউ কখনো এসে পড়ে তাহ'লে মেয়েরা তাকে আপন ব'লে অনেক সময় স্বীকার ক'রে নিতে পারে না। তাকে অনাবশ্যক, অবান্তর, অতিরিক্ত ব'লে অব-হেলা করে। কবি দেখিয়েছেন নারী যখন তার নিজের সন্তানের গণ্ডী ছাড়িয়ে আশ্রিতের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা প্রসারিত করতে পারে না, তখন সে সংসারে অনেক দুঃখ, অনেক মৃত্যু, অনেক ব্যর্থতা নিয়ে আসে। কিশোর ফটিকের মৃত্যুর জন্য কবি দায়ী করেছেন সংকীর্ণ চিত্ত নারীকে আর সমবেদনাহীন শিক্ষাপদ্ধতিকে। কিশোরের পক্ষে নারীর স্নেহ একান্ত দরকার। সেই স্নেহে বঞ্চিত হ'লে সে বাঁচতে পারে না। তার মস্তিষ্ক, তার বুদ্ধি কাজ করতে পারে না। তাই যে ফটিক গ্রামে ছেলেদের সর্দার ছিল, মামীর কাছে গিয়ে সে একেবারে নির্বোধ এবং নির্জীব হ'য়ে গেল। এই গল্পে কবি নারীকেই ধিক্কার দিয়েছেন, আর সেই সংগে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির নির্মমতাকে।

স্ত্রী প্রকৃতির তীব্র ঈর্ষার কথা কবি বলেছেন। এই দুর্দান্ত ঈর্ষার বশে অনেক সময় মেয়েরা প্রাণ দিতেও পারে এবং প্রাণ নিতেও পারে।

"কংকাল" গল্পে কবি দেখিয়েছেন বিলাসিনী নারী যখন দেখ্‌ল যে তার প্রণয়ী-ডাক্তার বিয়ে করতে চলেছে তখন সে তাকে মদের গেলাসে বিষ খাইয়ে দিল এবং নিজেও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। একটা ইংরাজী গল্পে যেন পেয়েছিলাম যে নিজের ছোট বোনের প্রণয়ীকে বড় বোন বিষ খাইয়ে মারল, কারণ সে নিজে তাকে ভালোবাসত। মেয়েদের ভালোবাসা নিষ্কণ্টক নয়। তা ঈর্ষার কাঁটায় ভরা। অনেক সময় এই ঈর্ষার বিষে নারী সংসারে বিপ্লব ঘনিয়ে তোলে। মেয়েদের মধ্যে যে মাতৃ-স্নেহ, যেখানে স্নেহের সব চেয়ে গভীর প্রকাশ, সেখানেও তা ঈর্ষা থেকে মুক্ত নয়। "চোখের বালি" উপন্যাসে কবি দেখিয়েছেন মহেন্দ্রের মায়ের মনের ঈর্ষাই সমস্ত দুর্ঘটনার মূল কারণ। যৌবনের প্রবৃত্তির অসংযম তো আছেই কিন্তু সেই অসংযমকে প্রশ্রয় দিয়েছে মায়ের ঈর্ষা। নববধূর প্রতি ঈর্ষা বশত মহেন্দ্রের মা, বিনোদিনীকে অবলম্বন করলেন। তার গোপন মনের নিজেরও অজ্ঞাত ইচ্ছা এই ছিল যে এক মায়াবিনীর হাত থেকে আরেক মায়া-বিনী এসে তার স্নেহের ধনকে কেড়ে নিয়ে আসুক। মোহ বিস্তারের যে সম্বল তার নিজের হাতে নেই, সেই মোহের সম্বলের জন্যে তিনি হাত পাতলেন বিনোদিনীর দুয়ারে। এই জন্যেই বিনোদিনীর প্রতি নিজের আসক্তির প্রথম সঞ্চার লক্ষ্য করে যখন মহেন্দ্র বিরক্ত হ'য়ে আত্মসংযমের চেষ্টায় তাকে গ্রামে পাঠিয়ে দেবার জন্য মাকে অনুরোধ করল, মা তাতে রাজি হলেন না। মহেন্দ্রের আত্মসংযমের

সমস্ত চেষ্টাকে তার মাই বিফল ক'রে দিয়ে তার জীবনে বিপর্যায় ঘটালেন।

এই জন্যেই কবি নারীচিত্তকে তীব্রস্রোতা নদীর সংগে তুলনা করেছেন। তাতে ক্ষেতে ভরা ফসল ফলেও ওঠে, আবার বন্যায় সে ভরা ফসল ধ্বংসও হ'য়ে যেতে পারে। নারীর মনের স্রোত সব সময় নির্ধারিত পথে চলে না। কূলের বন্ধন সে সর্বদা মানে না। কূলভেঙ্গে দিয়েও সে আপন বেগে আপন পথে তরংগিত হয়ে চ'লে যায়। কবি লিখেছেন এই হ'ল নারীর স্বভাব—

"সে তার সহজ গতি,
ভরা ফসলের মতই করুক ক্ষতি—

"বিসর্জন" নাটকে রানী গুণবতীর চরিত্রে কবি নারী চরিত্রের স্নেহের সংকীর্ণতার কথা বলেছেন। নারী একটি শিশুর প্রাণ আপন প্রাণের মধ্যে অনুভব করবার জন্যে, একটি প্রাণাধিক প্রাণকে বুকে ক'রে লালন করবার কামনায়, শত শত প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত। এখানে নারী ভালোবাসার আনন্দ, প্রাণের মূল্য যে বোঝে সে শুধু আপন সংকীর্ণ সংসার সীমার মধ্যেই বোঝে। উদার-ভাবে প্রাণের মূল্য সে বোঝে না। নিজের শিশুর জন্যে তার মন ব্যাকুল কিন্তু অন্য শিশুকে সে ঈর্ষা করে তাকে হত্যা করতেও তার প্রাণে বাজে না। গুণবতী নক্ষত্র রায়কে বলে ধ্রুবকে যেন তার নামেই দেবীর কাছে নিবেদন করা হয়। যে নারী মা হ'তে চায়, সে পরের শিশুর প্রতি এমনি নির্দয়। স্নেহের এই সংকীর্ণতা নারী প্রকৃতির একটা বিশেষ লক্ষণ।

"নৌকাডুবি" উপন্যাসে কবি নবীনকালীর চিত্র এঁকেছেন। কমলা যখন ঘর ছেড়ে এল তখন পথের মধ্যে নদীর ধারে নবীনকালীর সংগে তার দেখা। নবীনকালী দেখলে যে বিনা মাইনেতে রাঁধুনী পাওয়া যাবে, তাই তিনি আশ্রয়প্রার্থিনী কমলাকে সাগ্রহে সংগে নিয়ে এলেন। স্ত্রী চরিত্রের প্রতারণা পটুতার কথা কবি দেখিয়েছেন এই নবীনকালীর চরিত্রে। কমলার কাছে এমন ভাব দেখাল যেন নিতান্ত দয়া ক'রেই সে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। বাড়ী এসেই নবীনকালী অনেকদিনের পুরানো বামুনকে সামান্য অজুহাতে রাগের বাহানা করে বিনা মাইনের তাড়িয়ে দিল। আর কমলাকে দিয়ে সমস্ত রান্নার কাজ বিনা মাইনেতে করাতে লাগল। একদিকে আশ্রিত পরিজনের প্রতি এমন নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা, আবার সংগে সংগে নিজের ঐশ্বর্য্যের বাড়িয়ে বলা গল্প। স্বার্থপর কৃপণতার সংগে ঐশ্বর্য্যের গর্ব এবং মিথ্যাকথা এই মিলে স্ত্রীচরিত্রের যে ছবি কবি নবীনকালীর মধ্যে দেখিয়েছেন, এও কবির চোখে দেখা। নবীনকালী এবং তাঁর সংস্রবে থেকে তাঁর স্বামী মুকুন্দলাল এমনি নির্বিকার, নিষ্ঠুর স্বার্থপর যে নিজেদের একটুকু ক্ষতির চেয়ে আশ্রিত পরিজনের গুরুতর ক্ষতিও তাঁদের কাম্য। গদা নামে চাকরকে ঘড়ি চুরির অপবাদে জেলে পাঠান হ'ল। নবীন-কালী জানেন চাকরদের প্রতি অকারণে সন্দেহ প্রকাশ করে চুরির জন্য গালাগাল করাতেও লাভ আছে। সর্বদা এরকম সতর্ক থাকলে তারা আর চুরি করতে সাহস পাবে না। বামুন ঠাকুরণকে ঘি চুরি আর রান্নার জিনিষ চুরির অপবাদ দেওয়া,—চাকরকে ঐ চুরির ব্যাপারে সহযোগিতা করার অপবাদ দেওয়া,—এই সব তিনি কিছু চুরি হ'তে না দেখেও সর্বদা গাল দিতে থাকেন। নবীনকালী আপনার স্বার্থে অন্ধ। আশ্রিত পরিজনের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভালোলাগা, মন্দলাগা, কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। পরের নিদারুণ বেদনা তার প্রাণে একটুকু আবেদন জাগায় না। তার নিজের স্বার্থে বা আরামে কোথায় পান থেকে চুণটুকু খসল এই নিয়েই সে সদা সতর্ক। কমলাকে যখন সে জোর করে কাশী থেকে নিয়ে গেল, তখন কমলার যে কতখানি বাজল, সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। সে তার চুণের কৌটো আনা হয়নি ব'লে কমলাকে বকতে লাগল। কমলার বেদনা পীড়িত চিত্তে সে আরো আঘাত করে তাকে একেবারে ভূমিশায়ী করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল যে মীরাটে নিয়ে গিয়ে সে দেখে নেবে যে সেই বা কে আর কমলাই বা কে।

যে কবি মেয়েদের স্নেহ, প্রেম, কোমলতা, সান্ত্বনা, দয়া, করুণা ও সমবেদনা নিয়ে এত অজস্র স্তুতি গেয়েছেন তাঁর হাতের এই ছবি দেখে আমরা এই কথাই বলতে পারি যে কবি যেখানে স্তবগান করেছেন, সেখানেও তা তিনি অন্ধ ভাবালুতা নিয়ে করেন নি। মেয়ে ব'লে এই গর্বই করতে পারি যে কবি তাঁর সত্য দ্রষ্টা, তাঁর সন্ধানী

দিয়েই নিশ্চয় এই মমতা, করুণা ও সমবেদনার ৌন্দর্য্য মেয়েদের মধ্যে দেখেছেন। যে কবি েয়েদের দোষগুলো এমন ক'রে দেখেছেন, তিনি যদি মেয়েদের গুণগান করে থাকেন, তবে তাও নিশ্চয় তাঁর ্তর্দর্শনেরই-ফল। রবীন্দ্রসাহিত্যে নবীনকালীদের সংখ্যা ব কম। নিশ্চয় কবির চোখে সংসারে তারা কমই ল। কবি তাই লিখেছেন—"মোটের উপর জগৎটাতে ালোটারই প্রাধান্য, মন্দ যদি তিনচল্লিশ, ভালোর সংখ্যা াতায়।"

[ক্রমশঃ]

অপরাধ জগতে নারী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

নরক থেকে পালিয়ে

লায়লীর চোখে ছায়া ঢাকা এক দুঃস্বপ্নের রাত নেমে সেছিল। চারদিকে ভরাডুবি অন্ধকার ছেঁড়া ছেঁড়া ণা, একটা নিরুপায় ক্রন্দনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতো। বু, ভাবতে লায়লী, ঐ রাতগুলো কাটবে। দুঃস্বপ্নের াথরা ভেঙে সে পালিয়ে যাবে। পালিয়ে যাবে অনেক, নেক দূরে!

তারপর?

তারপর কি সে ফিরে পাবে—তার ঘর বাড়ী, আর যে লেটাকে ফেলে এসেছিল তাকে? বিজু তার বিচ্ছুনাথ ত বড় হয়েছে এতদিনে? ওর শয়তান বাপ রামরাজা া ওকে এতদিনে মেরে ফেলেনি?

আছে কি সেই ঘরখানা? মাথার আধখানা চাল ভেঙে ড়েছে,—দুরবাণী নদীর মাতাল বাতাস আসতো উড়ে। াঠের চারখুঁটিতে পোঁতা—সেই ভাঙা ঘরখানা যেন ওয়ার কাঁপনে ভয় পেত। তবু, লায়লী বেরিয়ে আসতো সন্ধ্যের ভীরু অন্ধকারে। দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়াতো। নেক দূরের আকাশে ভেসে বেড়ানো—থালার মত কখানা চাঁদকে দেখতো। একটা স্বপ্ন কুয়াসায় ওর ট কাজল কালো চোখ ধুসর হ'য়ে যেত। মনে হোত দিনও, সেদিনও তার পালাতে ইচ্ছে করতো—ওই খানা ছেড়ে—ওই দুরবাণী নদী পার হ'য়ে তার চির চেনা রব গ্রাম ছাড়িয়ে···যেখানে খুশী চলে যেতে।

সহসা বাগানের মধ্যে থেকে পায়ের শব্দটা ভেসে আসতো··। সহসা শিহরিত হোত যেন লায়লী। দুটি পরম নিটোল হাতের—কাঁচের চুড়ি ঝন্ ঝন্ করে উঠতে। ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আসতো—আখেরী-লাল। কি সুন্দর মনে হোত তাকে অন্ধকারে। লায়লী তখন চুপি চুপি সব দিকে তাকাতো। যদিও তার স্বামী রামরাজা ফিরতো অনেক রাতে। ফিরতো, সম্পূর্ণ মাতাল হ'য়ে। যেদিন না ফিরতো, লায়লী সেদিন জানতো—রামরাজা গেছে তার অত্যাচারী জীবনের সন্ধানে। বণিতা গৃহে।

রামরাজার বন্ধু ওই আখেরীলাল। একটা কারখানার মালিক। বলতে গেলে ধনী। রামরাজা ওর কাছে অনেক টাকা নিত—নেশার জন্যে। উড়িয়ে দেবার জন্যে। অনেক দেনা করে ফেলে সে। একদিন আখেরীলাল লোকজন নিয়ে ছুটে এসেছিল—রামরাজাকে ধরবে বলে। টাকা শোধ দেয়না। সুদে খাটানো টাকা—মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, তখন রামরাজাকে খুঁজে পাওয়া যায়না।

ধরতে এসে আখেরীলাল একদিন স্তম্ভিত। রামরাজা ভয়ে ঘরে লুকিয়ে। ওর বউ লায়লী বেরিয়ে এসেছিল মাথায় ওড়না দিয়ে। তবু, মুহূর্তে চোখ ঝলসে উঠেছিল আখেরীলালের। এ-ত রূপ! রামরাজার মত একটা শয়তান কুৎসিত মাতালের বউ—এত রূপসী? আখেরী-লালের বুকেও—কেন জানি, সেই প্রথম দোলা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, শয়তানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় লায়লীকে।

লায়লী মুখের ওড়না সরিয়ে দু'হাত জোর করে করুণস্বরে বলে উঠেছিল—'বাবুজী মাফ কিজিয়ে, ওকে ক্ষমা কর। আমার কেউ নেই—ওই স্বামী ছাড়া। আর যে আসছে—' সহসা চুপ করে গিয়েছিল লায়লী। আর দু'দিন পরেই—'ও' মা হবে—ঐ কথা অপরিচিত লোকটার সামনে বলতে পারলনা। আসলে, যে আসছিল, তার জন্যেই চিন্তা হ'চ্ছিল লায়লীর। তার নিজের জন্য কিছু ছিলনা পৃথিবীতে। ওই শয়তান রামরাজা—একদিন তাকে এক রাজবাড়ী থেকেই লুণ্ঠন করে এনেছিল।

সেই রাজবাড়ীর গাড়ীর ড্রাইভার ছিল। আসলে, লায়লী নামটাও—মিথ্যে। ওই দুরবনটী নতুন

দিয়েছিল—লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে বলে। যাতে আর কেউ কোনদিনও না—নারী অপহরণকারী রামরাজাকে ধরতে পারে। 'রাজবাড়ীর' রাজনন্দিনী মণিমালা, মাঝে মাঝে যেন চমকে উঠতো—পুরোণ অতীতটাকে দেখলে। কি ভাবে ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কিছু আর মনে পড়তোনা মণিমালা ওরফে লায়লীর। সে দিনগুলোই মনে পড়ে, বিহার প্রদেশের ভৈরব গ্রামে এসেছিল, যখন উঠেছিল এক ভাঙা বাড়ীতে। তখন যেন তার—পুরোন পৃথিবীর সংগে চিরদিনের জন্য আড়ি হ'য়ে গেছে।

মাঝে মাঝে কাঁদতো মণিমালা। ইচ্ছে হোত দুরবাণী নদীতে একটা নৌকো ভাসিয়ে সে একাই পালিয়ে যায়—ফেলে আসা রাজবাড়ীতে। কিন্তু উপায় ছিলনা। সতর্ক প্রহরা ছিল চারদিকে। দস্যুর কবল থেকে সত্যি আর পালাতে পারলনা মণিমালা!

কাজেই, সে রামরাজার লায়লী হ'য়ে গেল। সেও যেন কবেকার কথা। ভৈরব গ্রামে সেই ভাঙা ঘরখানা কোন সর্বনাশা ঝড়ে ভেঙে গেছে কিনা, এবং লায়লীর একমাত্র সন্তান বিজুও আজ বেঁচে আছে কিনা—সে খবর নেবার প্রতীক্ষায় তার জীবনের দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেছে।...

হ্যাঁ মনে পড়ে আখেরীলালের কথা। রামরাজাকে ধরলোনা সে লায়লীর চোখের জল দেখে। তারপর, সে রামরাজার বন্ধু সাজলো। আসা যাওয়া করতে লাগলো। অর্থলোভী রামরাজকে টাকার প্রলোভনে ভোলাতে থাকে। তার চুপি চুপি মন ভোলায়—লায়লীর। প্রথমে ভয়, ভাবনা, দ্বিধা, বিরক্তি। কিন্তু তারপর? তারপর লায়লী সত্যি চেয়েছিল অত্যোচারী রামরাজার কবল থেকে বাঁচতে। তার পরও চেয়েছিল,—আখেরীলালকে ভালবাসতে সে।

সে যেন চুপি চুপি ভালবাসার খেলা। আর ভাঙা অন্ধকার ঘরে খেলে বেড়াতো একবছরের শিশু বিজু। সহসা, লায়লীর কেমন মন খারাপ হয়ে যেত। ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে শুধু কাঁদতো। সমস্ত বুকের ভেতর কি একটা যন্ত্রণা হোত। কিন্তু আর সময় ছিলনা, আখেরীলাল হুঁসিয়ার করেছিল—তার দু'দিন পরেই—দুরবানী নদী তারা পেরিয়ে যাবে। [illegible]

গ্রামকে। লায়লী তো তাই চেয়েছিল কিন্তু চায়নি, তার প্রাণের চেয়ে বড় জিনিস বিজুকে ফেলে যেতে।

আখেরীলালকে বলেছিল—'আমার ব্যাটাকেও নিয়ে যাব। আমি যেখানে থাকবো সেখানে আমার বিজুও থাকবে।

আখেরীলাল প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল, রামরাজার ছেলেকে সে চায়না। তার একমাত্র কাম্য সুন্দরী লায়লাকে পাওয়া। তবে? তবে কি হবে, বিজুকে ফেলে পালাতে হবে? আখেরীলাল বিচিত্র সান্ত্বনা দিয়েছিল এক ক্রন্দনরতা মাকে। 'বিজু রামরাজার ছেলে। তোমার হয়ে সে কোনদিন থাকবেনা। ও শয়তান বনে যাবে বাপের মত। শয়তানের ছেলে, শয়তানই হয়। তার জন্যে এত মমতা কিসের? এত ভাবনা কিসের?

আবার ভুলেছিল লায়লী। শুধু ভুল আর ভুল।

আবার ভৈরব গ্রাম ছেড়ে দুরবাণী নদী পার হয়ে যায়। সংগে বিচিত্র প্রেমিক আখেরীলাল। তারা আসে কলকাতায়। একটা বাড়ী ভাড়া করা ছিল আগে থেকেই সেখানেই উঠেছিল তারা।

আজও, আছে তারা। শুধু, আজ বার বার মনে হয়—আজও কেন বেঁচে আছে লায়লী? কেন আবার সে পালাতে পারছে না, আর এক শয়তানের কবল থেকে। ...দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেছে। তবু, শয়তান আখেরীলালের আখড়া ভাঙতে পারল না লায়লী।

সেই দশ বছর আগের বিচিত্র আখেরীলাল তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, লায়লীকে সে রাণী করে রাখবে। সুখে রাখবে চিরদিনের মত। উঃ, কি মিথ্যেবাদী এই শয়তান। দুনিয়া ভোর কি শুধু দুষমনদের বসবাস?

প্রথম প্রথম তাই কিন্তু করেছিল আখেরীলাল। ওকে সত্যি রাণী সাজিয়েছিল। দিয়েছিল অনেক ঘাগরা, ওড়না, গয়নায় সাজিয়ে। সুন্দরী লায়লীকে ভোগ করার চরম দিনে মনে হোল আখেরীলালের—শুধু নিজের ভোগের আনন্দ ছাড়াও লায়লীকে দিয়ে রোজগার করানো যায়। রামরাজা তার অনেক টাকা নিয়েছে। তার বদলী নিতে হবে।

লায়লীকে একদিন বাধ্য করলো আখেরীলাল। দেহ

পাপাগলিনী

মোটা মোটা টাকার খদ্দের। লায়লী সুন্দরীকে পেলে, তারা মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে দেবে, আখেরীলালের আখড়ায়। কাজেই, এই ভাবে আরো ধনপতি হয়ে উঠবে আখেরীলাল। তার নির্মম স্বপ্ন সফল হ'য়ে উঠবে।

লায়লী কাঁদতো। তবু, উপায় ছিল না শয়তানের হাত থেকে বাঁচবার। আর বোধহয় কোনদিনই সে ফিরে যেতে পারবে না—সেই দুরবাণী নদীর পারে ভৈরব গ্রামে। কাজেই, একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত মনে করে—লায়লী আত্মসমর্পণ করেছিল—আখেরীলালের দুরভিসন্ধিতে।

কিন্তু…কিন্তু আর নয়। আর পারছে না লায়লী। আবার সে পালিয়ে যাবে। কিন্তু যাবার আগে এই অভিশপ্ত পুরীর শয়তানদের শেষ করে দিয়ে যাবে।

সন্ধ্যের ছলনা যেন শেষ হ'য়ে গেল। লায়লী বাইজীর নাচ গানে মুখর ছিল যে জলসা ঘর তার সমাপ্তি হোল রাত শেষে। একে একে সবাই চলে গেছে। মখমলের গালিচায়—আর ভেলভেটের তাকিয়ার ওপর পড়ে আছে আখেরীলাল। আজ আখেরীলালের রাত। এ' রাতে লায়লী সুন্দরী তার। সপ্তাহ শেষের একটি রাত।

রাত ফুরোয়। শেষ প্রহরের বাতাস এলো ভেসে। আখেরীলালের সুরার গ্লাস তখন শূন্য। লায়লীর চোখে ঘুম নেই। সুরা ঢেলে দেয় রঙিন গ্লাসে। আখেরীলালের প্রাণ ভরে। সারা ফরাস বিছানায় শুয়ে লুটোয়। নেশায় দু'চোখ বুঁজে থাকে।

সুরা পান করে লায়লীও। নিজেকে বিভোর করে তোলে। আস্তে আস্তে খোলে চটকদারী পোষাক। তারপর, ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়—নেশাক্লান্ত আখেরীলালের কাছে। মানুষটার আর সাড়া নাই। আনন্দে কেঁপে ওঠে লায়লী। ওর জরি জড়ানো খোঁপা থেকে সাজানো ফুল ঝরে যায়। মনে মনে হাসে লায়লী। মনে পড়ে সেই দুরবাণী নদী…নিস্তরঙ্গ সেই জলরাশি। একটা নৌকো শুধু তীরের বেগে ছুটে চলেছে…আখেরীলাল তাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে…কাঁদছে লায়লী…অনেক দূর থেকে কাঁদছিল তার বিজু।

উঃ! দু'হাতে কান চেপে ধরলো লায়লী। রং করা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলো—সামনে ঝকঝকে দাঁত কটা। একটা তীরবিদ্ধ যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলো। মরীয়ার মত শেষ তাকালো, আখেরীলালের দিকে…

তারপর ত্বরিতে বার করে নেয় বুকের ভেতর থেকে চকচকে ছুরিটাকে। জলসা ঘরের আলোয় ঝিকমিক করে উঠলো। দু' চোখ জ্বলে উঠলো লায়লীর। সেও বদলী নেবে। শেষ করে ফেলবে শয়তানকে।…

উঃ কি ভাবে যেন ছুরিটা বসিয়ে দিল সে। আখেরীলালের শেষ কাতরোক্তি শোনা গেল—শেষ রাতের অন্ধকারে। তারপর, সব চুপচাপ! রক্ত ছিটকে এসেছিল—লায়লীর সারা অঙ্গে। সেই নিয়ে সে বেরিয়ে এলো—আখেরীলালের দরবার থেকে।

অন্ধকার পথ দিয়ে একা একা ছুটতে থাকে লায়লী। রাত শেষ। ভোরের আলো ফুটে উঠতে চমকে উঠলো। সারা দেহে আখেরীলালের রক্ত লেগে! শেষ পর্যন্ত একটা পুলিশও ওকে দেখে ফেললো।

লায়লী গিয়েছিল থানায়। বিচার সুরু হয়—একজন খুনীর বিরুদ্ধে। লায়লী অস্বীকার করেনি। বলেছিল, শয়তান খতম করেছে সে। তার জন্যে তার যে কোন দণ্ড হোক তাতেই আনন্দ।

দণ্ড পেল লায়লী। ভৈরব গ্রাম থেকে এসেছিল—খবর পেয়ে রামরাজা। আর তার বিজু। ওদের দেখে দিশাহারা হয়ে যায় লায়লী। আবার দুরবাণী নদী পার হয়ে ভৈরব গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। তার প্রাণের বিজুকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরতে…

কিন্তু লৌহকপাটের রুদ্ধ দ্বার ধীরে ধীরে বন্ধ হ'য়ে গেল। দুরবাণী নদীর বুকে যেন বান ডাকলো। মনে হোল—সেই সর্বনাশা বান—সমস্ত ভৈরব গ্রামটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

নিয়ে গেল যেন তার রামরাজাকে…নিয়ে গেল তার বিজুকে। সব যেন চোখের সামনে থেকে একে একে সরে গেল।

নেমে এলো শুধু কারাগারের অন্ধকার। লায়লী চোখ বুঁজলো।

সুপর্ণা দেবী

নিত্যনিয়মিত দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন, সুরভিত তৈলাদি সহকারে অঙ্গমর্দ্দন, স্নান, গন্ধবারি ও ফেনক সহযোগে গাত্রমার্জ্জনা, কেশবিন্যাস, তিলক-রচনা, চন্দনাদি অনু-লেপন, নেত্রাঞ্জন-কজ্জলী-ধারণ, অলক্তরাগে মুখ, ওষ্ঠ এবং পদরঞ্জন, বিবিধ গন্ধদ্রব্যাদি ও সৌগন্ধপুটিক-সহ সিকৃথ-করণ্ডক ব্যবহার, পুষ্প-মাল্যধারণ প্রভৃতি প্রসাধন-রীতির মতোই সৌখিন-সুন্দর ছাঁদের বস্ত্রালঙ্কারে দেহ-সুশোভিত করার দিকেও প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিলাসী নর-নারীদের নিষ্ঠা ও আগ্রহানুরাগ ছিল অপরিসীম। তখনকার দিনে এগুলি বিলাসীসৌখিন নরনারীদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রসাধনকলার অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হতো। ভারতের প্রাচীন কাব্যসাহিত্য-শাস্ত্র-পুরাণ-ইতিহাসেও তার প্রচুর প্রমাণ মেলে। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে 'অন্তরীয়' (পরিধেয় বস্ত্র) ও 'উত্তরীয়' (উড়ুনী) ছাড়া অন্য কোনো পরিচ্ছদের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ 'অমরকোষে' 'উত্তরীয়ের' কতকগুলি নামান্তর প্রদত্ত হয়েছে। যেমন—'প্রাবার', 'উত্তরাসঙ্গ', 'বৃহতিকা', 'সংব্যান' এবং 'উত্তরীয়'। চাণক্য রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থেও উপরোক্ত 'প্রাবার' শব্দটি 'বারবাণ' নামে সৈন্যদের ব্যবহারোপযোগী পরিচ্ছদের তালিকায় বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। মনীষী বাৎস্যায়ন রচিত 'কামসূত্রেও' 'প্রাবার, (প্রাবরণ) অর্থে সেকালের সুধী-টীকাকারবৃন্দ 'শাল-দোশালা' হিসাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। প্রাচীন ভারতে গ্রীক-অভিযানের সময়ে বিশেষ-ধরণের যে দীর্ঘ পোষাক ব্যবহার করা হতো, সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-রচয়িতা মেগাস্থেনীস প্রমুখ গ্রীক-পর্য্যটকদের বিবরণাদিতে তার সুস্পষ্ট-পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে সৈন্যদের পরিচ্ছদ-বর্ণনা প্রসঙ্গে—'শিরস্ত্রাণ', 'কণ্ঠত্রাণ', 'কূর্পাস' (প্রাচীন 'অমরকোষ' গ্রন্থে 'কূর্পাসক' হিসাবে বর্ণিত), 'কঞ্চুক' (খাটো-ঝুলের পোষাক), বারবাণ' (লম্বা-ঝুলের পোষাক), 'পট্ট' (পটি বা পদত্রাণ), 'নাগোদরিক' (সম্ভবতঃ 'দস্তানা' জাতীয়) প্রভৃতি নানা ধরণের পোষাকআশাকের উল্লেখ নজরে পড়ে। সেকালের এসব পোষাক-পরিচ্ছদগুলি যে বেশ দামী এবং সুন্দর ধরণের হতো—তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ধরণের বহুমূল্য পরিচ্ছদ শুধু যে সৈন্যদের ব্যবহারোপযোগী ছিল তাই নয়, তখনকার আমলের বিলাসী-সৌখিন নাগরিকদের মধ্যেও এ সব পোষাকের রীতিমত রেওয়াজ ছিল...এবং সেই সঙ্গে আরো প্রচলিত নানা রকমের দামী-সুন্দর মণি-রত্নশোভিত অলঙ্কারাদি ব্যবহারের রীতি। এমন কি, তখনকার দিনে বিলাসী-সৌখিন নাগরিকেরা যে সব পাদুকা ব্যবহার করতেন, সেগুলিতেও শোভা পেতো নানা রকমের সুন্দর ও বহুমূল্য মণি-রত্ন। 'পাদুকা' বা 'উপানৎ' (জুতা) ব্যবহারের রীতি সম্বন্ধে প্রাচীন সংহিতা, পুরাণ ও সূত্রগ্রন্থের রচনাবলীতে সবিশেষ উল্লেখ রয়েছে। সেকালের 'অমর-কোষ' গ্রন্থে উল্লিখিত 'অনুদীপনা' শব্দটির অর্থ—সম্ভবতঃ, একালেরই 'মোজা' ধরণের পরিচ্ছদ বলেই অনুমিত হয়।

তবে সেকালের তথ্য-বিবরণাদি থেকে অনুমান করা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে 'কূর্পাস', 'কঞ্চুক' আর 'বারবাণ'—এই তিনটির সমন্বয়েই তখনকার পুরুষ-সম্প্রদায়ের পরিচ্ছদের ব্যবস্থা সুসম্পাদিত হতো। এগুলির মধ্যে 'কূর্পাস' (মহাকবি কালিদাস বর্ণিত কূর্পাংশুক') অবশ্য তখনকার আমলে নারী-অঙ্গাবরণেরও অন্যতম অপরিহার্য্য পরিচ্ছদ ছিল। এছাড়া 'কঞ্চুক' বা 'কঞ্চুলিকা' (কাঁচুলি) নামে নারী-অঙ্গাবরণ পরিচ্ছদটির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল সুপ্রাচীন 'ভাগবত' গ্রন্থ-রচনার কালেরও আগে থেকে। তবে রামায়ণ-মহাভারত কিম্বা বৈদিক-যুগেও ভারতীয় নারী-সমাজে 'উত্তরীয়' ছাড়া অন্য কোনো পরিচ্ছদের উল্লেখ অবশ্য বিশেষ নজরে পড়ে না। অথচ প্রমাণ মেলে যে বৈদিক-যুগের ভারতীয় সমাজে বিচিত্র-

সুন্দর বিবিধ ধরণের নানান্ অলঙ্কার ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ও রীতিমত সমাদর ছিল। তখনকার আমল থেকেই প্রচলিত হয়েছিল অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধনের উপকরণ হিসাবে 'খাদি' অর্থাৎ হাতের ও পায়ের নানা রকম সুদৃশ্য-অভিনব অলঙ্কার এবং 'হার' বা 'মালা'ব্যবহারের সৌখিন-রীতি।

'প্রাচীন সংহিতা' হিসাবে স্বীকৃত বৈদিক-যুগের 'গৌতম-সংহিতায়' দশম অধ্যায়ে অবশ্য 'কূর্প' (কুর্তা বা জামা জাতীয় পোষাক) নামে বিশেষ এক ধরণের পরিচ্ছদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন 'অমরকোষ' গ্রন্থেও 'নিবীত' ও 'প্রাবৃত' নামে যে পরিচ্ছদের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি সম্ভবতঃ, 'উড়ানি' বা 'উত্তরীয়' জাতীয় ছিল বলেই ধারণা হয়। এছাড়া 'অমরকোষ' গ্রন্থে 'প্রচ্ছদপট' নামে যে পরিচ্ছটির বর্ণনা মেলে, সেটি আধুনিক-আমলের 'দোপাট্টা' বা 'পাছুড়ি' জাতীয় অঙ্গাবরণ। 'অমরকোষে' আপাদমস্তক-আচ্ছাদনকারী 'আপ্রপদীন' নামে বিশেষ এক-ধরণের পরিচ্ছদের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটির প্রসঙ্গ সেকালের ভারত-পর্যটনকারী গ্রীক-লেখকবৃন্দের বিবিধ রচনাবলীতেও যে লিপিবদ্ধ আছে—সে কথা ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি।

কিন্তু পরিচ্ছদের প্রকার যেমনই হোক, পরিচ্ছদ-রচনার উপকরণ···অর্থাৎ প্রাচীন 'অমরকোষ' গ্রন্থে যে প্রসঙ্গটিকে 'বস্ত্রযোনি' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেকালে প্রায় দশ রকম উপায়ে সে কাজ সুসম্পাদিত হতো। এ সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় বিশদ-আলোচনা করা যাবে।

(ক্রমশঃ)

এমব্রয়ডারী শিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

গত সংখ্যায় এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের উপযোগী যে সব সৌখিন-সুন্দর সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এবারেও তেমনি ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব কলা-কৌশলের মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি।
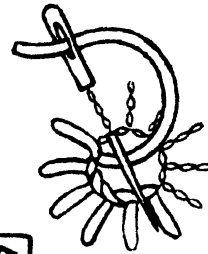
৫

সৌখিন-সুন্দর ছাঁদে নানা রকম এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প সামগ্রী রচনা ও অলঙ্করণের কাজের সময়, উপরে ৫নং চিত্রে দেখানো চক্রাকার নমুনাটির মতো বিচিত্র নক্সা সেলাই করার প্রয়োজন ঘটে। এ ধরণের অভিনব আলঙ্কারিক-নক্সা (Decorative motif) রচনার জন্য কি ধরণের পদ্ধতিতে ছুঁচ সুতোর সাহায্যে পরিপাটি-ছাঁদে সেলাইয়ের ফোঁড় তোলা যায়—উপরের ছবিটি দেখলেই তার সুস্পষ্ট আভাস মিলবে। এ ধরণের সেলাইয়ের পদ্ধতির নাম—'বাটন্ হোল্ হুইল' (Buttonhole wheel)।

উপরোক্ত পদ্ধতিটি ছাড়া আরেকটি উপায়েও এমনি ধরণের সৌখিন-সুন্দর চক্রাকার আলঙ্কারিক-নক্সা রচনা করা চলে—পর পৃষ্ঠার ৬নং চিত্রটিতে সে সম্বন্ধে মোটা-মুটি হদিশ দেওয়া হলো।

সূচীশিল্পে পারদর্শিনী যে কোনো মহিলা সযত্নে সামান্য চেষ্টা করলেই অনায়াসে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রয়োজনানুসারে এমনি ধরণের বিচিত্র আলঙ্কারিক-নক্সায় বিবিধ সামগ্রীকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে পারবেন। এ পদ্ধতিটি অবশ্য উপরোক্ত ৫নং চিত্রে দেখানো সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার কলা-কৌশলেরই রকম ফের মাত্র…এ পদ্ধতির নাম—'অল্টারনেটিভ্ বাট্‌নহোল্ হুইল' (Alternative buttonhole wheel)। সৌখিন-সুন্দর এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পে এ ধরণের নক্সা রচনা ও অলঙ্করণের যে বিশেষ উপযোগিতা আছে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

চক্রাকার-নক্সা রচনার মতোই বিচিত্র-অভিনব আরেক ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার কায়দাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে কায়দাটির নমুনাও নীচের ৭নং চিত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হলো।
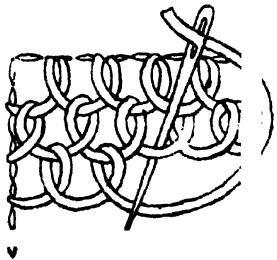
এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের এই কলাকৌশলটির নাম—'সারফেস্ বাটন্‌হোল ফিলিং' (Surface Buttonhole Filling) বা 'বহিঃ-আঙ্গিক বাটন্‌হোল ভরাট করার পদ্ধতি'।

অনুরূপ ছাঁদের সৌখিন-সুন্দর বিচিত্র-আলঙ্কারিক আরেক ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতি হলো—পাশের ৮নং নক্সায় দেখানো 'নটেড বাটন্‌হোল্ ফিলিং' (Knotted Buttonhole Filling) বা 'গিঁট-দেওয়া বাটন্‌হোল ভরাট করার' অভিনব সূচীশিল্পকলা'।

আপাততঃ, এই পর্য্যন্তই জানিয়ে রাখলুম…আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের বিচিত্র-অভিনব সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের বিবিধ সামগ্রীতে যে সব সুন্দর সুন্দর নক্সা রচনা করা যায়, তারই হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

আমার কবিতা

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্নিমিতাকে যত কাছে পাই
ততই জ্বালাই এ ছোট তনু,
জোয়ার ভাঁটার এ জীবন কূলে
সুখ নামে পাখী বাঁধেনা নীড় ;
গরীয়সী সে যে দেনা পাওনার
চিত্ত চকোর রহস্যেতে,—
আবৃত আকাশে নীল রঙ মাখে
সময় থামেনা, ধরায় চীড়।
অচিন্ত্য মনে ভবঘুরে আমি
দূরবীণ হাতে চলছি খালি,
আলোর দৃষ্টি ঝাপসা আজকে
দুর্গ ঘরেতে একক থাকি :
দৈনন্দিন দোটানা পোড়েনে
আরো আলো চেয়ে-হতাশা আসে,
চন্দন আর কুমকুম্ মাখা
মুখের আদল কেবল আঁকি॥

বর্দ্ধমানে সংস্কৃতি সম্মেলন—

গত ১৬ই জুন বর্দ্ধমানে চারদিনব্যাপী সংস্কৃতি সম্মেলন শেষ হইয়াছে। আনন্দের কথা ঐ সম্মেলনে বর্দ্ধমান জেলার বহু কবি ও সাহিত্যিককে সম্মান জ্ঞাপন করা হইয়াছে। উক্ত সভায় কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতিকে মানপত্র দেওয়া হয়। সম্মেলনে অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

জেলায় এইরূপ সম্মেলনের সার্থকতা আছে। যে সকল গুণীব্যক্তি সহরের সহিত সম্পর্ক রাখেন না এই রূপ জেলা-সম্মেলনে তাঁহারাও উপযুক্ত প্রশংসা লাভ করেন। তাহাছাড়া যাত্রা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যে সকল অনুষ্ঠান প্রায় লোপ পাইতেছে সে গুলির অনুষ্ঠানের ফলে শিল্পীরা উৎসাহ লাভ করেন।

অন্ধদিগের পুনর্বাসন—

পূর্ব্বে শুধু কলিকাতায় একটি অন্ধদিগের বিদ্যালয় ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী অর্থ সাহায্য পাইয়া আরও কয়েকটি অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের চেষ্টায় একটি অন্ধ বিদ্যালয়ে দুইশতেরও অধিক অন্ধ বালক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের সচিব ভবতোষ দত্ত নরেন্দ্রপুরে অন্ধ বিদ্যালয়ে অন্ধদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। ডঃ দত্ত প্রবীণ শিক্ষাব্রতী। তিনি এ বিষয়ে নানা জায়গায় ঘুরিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশে অন্ধদিগকে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয়, ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা স্বাবলম্বী হয় ডঃ দত্ত সেই বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক ইহাই আমরা কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাবস্থা—

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম হইতে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কট জনক হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকমাস রেশনে মাথাপিছু ৭৫০ গ্রাম চাল ও ১ কিলো গম দেওয়া হইত। আষাঢ় মাসের প্রথম হইতেই চালের পরিমাণ কমাইয়া ৫০০ গ্রাম ও গমের পরিমাণ বাড়াইয়া ১২০০ গ্রাম করা হইয়াছে। নতুন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া যে ভাবে চাউল সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। খাদ্য মন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নিজে সাধু লোক। সে জন্য তিনি বলপ্রয়োগ না করিয়া সকলের সদিচ্ছার উপর চাল সংগ্রহ ব্যবস্থায় নির্ভর করিয়াছিলেন। ফলে প্রয়োজনীয় চাল সংগৃহীত হয় নাই এবং সাধারণ মানুষের দুর্দ্দশা বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী এখনও আটা খাইতে অভ্যস্ত হয় নাই। কাজেই চালের অভাবে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। কালো-বাজারে এক কিলো চালের দাম চার টাকা হইয়াছে। ভারতের বাহির হইতে এখন অতি অল্প পরিমাণ চাল আমদানি হয়। উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে কিছু বেশী চাল উৎপন্ন হয়। এ বৎসর কেরল ও বিহারে দারুণ খাদ্যাভাব, সেখানে চাল সরবরাহের পর পশ্চিম-বঙ্গের ভাগ্যে কি পরিমাণ চাল জুটিবে তাহা বলা কঠিন। আগামী আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসের অবস্থা যে কি হইবে তা বলা কঠিন।

মন্ত্রী সভা চেষ্টা করিয়াও চাল পাইতেছেন না। বাঙ্গালীর ভাগ্যে কী হইবে তাহা বলা কঠিন। চিনিরও ক্রমে দাম বাড়িতেছে ও রেশনে চিনির পরিমাণও কমিয়া যাইতেছে। অথচ যে চিনি আমরা ভারতে ১ টাকা ৫০ পঃ দরে কিনি তাহা ৩৭ পয়সা কিলোদরে আমেরিকাকে বিক্রয় করা হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গে তেলিগুড়ের দাম বাড়িয়া দু'টাকায় উঠিয়াছে।

একদিকে যেমন উৎপাদন কমিয়াছে অন্য দিকে তেমনি বণ্টনের ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। মানুষ যে কী করিবে তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অথচ অন্য রাজ্য হইতে এখনও পশ্চিমবঙ্গে লোক দলে দলে চলিয়া আসিতেছে। বাঙালা দেশে যে পরিমাণ ডাল উৎপন্ন হয় প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অত্যন্ত কম, সে জন্য গত চার মাসের মধ্যে প্রতি কিলো ডালের দাম এক টাকার স্থলে দুই-টাকা হইয়াছে। খাদ্য মন্ত্রী অন্য রাজ্য হইতে কিছু ছোলা ও ছোলার ডাল আমদানি করিয়াছিলেন। সেগুলি অব্যবস্থার ফলে চোরা কারবারীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে এবং অত্যধিক দামে বিক্রী হইতেছে।

অন্য খাদ্য-দ্রব্যের কথা না বলাই ভাল। তরীতরকারী উপযুক্ত পরিমাণে চাষ হয় না, কাজেই সেগুলির দাম কমে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়, কিন্তু লোভী ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া আলুর দাম কমেনা। সরকারী কর্ত্তারা কেন যে আলুর বিক্রয় ব্যবস্থা ভাল করেন না তাহা বোঝা যায় না।

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে শুধু কৃষি বিভাগের ভার দেওয়া হইলে তাহার দ্বারা খাদ্য উৎপাদন আরও ভাল হইত। তিনি গঠন কর্মী এবং কৃষি বিভাগে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, খাদ্য ও কৃষি দুইটি বিভাগ পাইয়া তাঁহার দ্বারা কোন বিষয়েই অধিক মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হইতেছেনা। দেশবাসীও খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে উদাসীন বলা যায়। ধনীরা যদি খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী হন তবেই খাদ্যবস্থার উন্নতি সম্ভব।

অধিক অর্থব্যয় করিয়া সুন্দরবন অঞ্চলে নারিকেলের চাষ করিলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে। দেশের লোক লোহার কারখানা করিয়া তাড়াতাড়ি বড় লোক হইতে চায়, কেহ চাষ করিয়া ধীরে ধীরে ধনী হইবার ধৈর্য্য রাখেন না। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে পশ্চিমা লোক আম, কাঁঠাল খাইয়া অর্দ্ধেক ক্ষুধা নিবারণ করিত। এ বৎসর পাকা আম দু'টাকা কিলো বিক্রয় হইতেছে। তাহার কারণ কেহ আর নতুন ফলের চাষ করেন না।

এখন বাজারে একটি পাকা কাঁঠাল দশটাকা দামে বিক্রয় হয়। মানুষ কি করিয়া আম কাঁঠাল খাইবে? সরকারী কৃষি বিভাগের ব্যাপক প্রচেষ্টা ছাড়া দেশে ফলের বাগানও হইবে না।

খাদ্যাভাব হইলেই আমরা এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কোন সুফল ফলিতে দেখিনা।

অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অধ্যাপক নূতন বাংলা অভিধান প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী গত ২৩শে জুন নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রথম জীবনে ২৪ পরগণা বসিরহাটের একটি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে পাতিসরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারিতে কাজ করিতে যান।

হরিচরণবাবু বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং পাতিসরে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

প্রথম জীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় সংস্কৃত শিক্ষার কয়েকখানি প্রাথমিক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তাঁহার ভাষাজ্ঞান দেখিয়া ও শব্দশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নূতন ধরণের একখানি প্রামাণ্য বাংলা অভিধান রচনা করিতে প্রেরণা দিয়াছিলেন।

১৯১৯ সালে অধ্যাপক-বন্ধু শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরীর সহিত প্রথম যখন শান্তিনিকতনে গিয়াছিলাম তখন রবীন্দ্রনাথের ঘরে বিকেলের বৈঠকে আচার্য্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতির সহিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রথম দেখিয়াছিলাম। তিনি অধ্যাপনার অবসরে একটি ঘরে পুস্তকের গাদার মধ্যে বসিয়া প্রতিদিন বহুক্ষণ অভিধান রচনার কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিতেন। প্রথম আলাপের পর হইতেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া বহু সময় তাঁহার সহিত পত্র-বিনিময় করিয়াছি এবং যখনই যে সমস্যার কথা জানাইয়াছি তিনি পত্রের উত্তরে সানন্দে তাহার সমাধান করিয়া দিয়াছেন।

স্বল্পভাষী, নিরহঙ্কার, দরিদ্র হরিচরণবাবুকে দেখিলে প্রাচীন যুগের ঋষিদের কথা মনে হইত। তিনি প্রায়

৩৬ বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া অভিধান রচনার কাজ শেষ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে অভিধান ছাপার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আমি আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে অন্তত ২০।২৫ বার শান্তিনিকেতনে গমন করিয়াছি এবং যখনই তথায় গিয়াছি হরিচরণবাবুর সহিত দেখা না করিয়া আসি নাই।

অভিধান প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় শেষের দিকে তাঁহাকে খুবই নিরাশ হইয়া কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিতাম। তবে রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাণী—জীবদ্দশায় কার্য্যসিদ্ধি হইবেই তাঁহাকে আলোর পথ দেখাইয়াছিল। সুখের কথা নানাভাবে উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া তাঁহার জীবিতকালেই ১৫৫ খণ্ডে তাঁহার অভিধান প্রকাশ করিয়া ৯২ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। জীবিতাবস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতি প্রভৃতি তাঁহাকে সম্মান ও অর্থদান করিয়া গুণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বৃত্তিপ্রদানের কথা স্মরণ না করিলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

একজন অতি সাধারণ ও অতি দরিদ্র মানুষ পরিশ্রম ও একাগ্রতার দ্বারা কত বড় ও ভাল কাজ করিতে পারেন হরিচরণবাবুর জীবন তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার কথা দেশবাসীর মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া উচিত এবং তাঁহার অভিধান সাহিত্য একাডেমি হইতে প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

আমরা দীর্ঘকাল হরিচরণবাবু স্নেহ ও কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি এবং আজ তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া এবং তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতেছি।

আইন ও শৃঙ্খলা—

সাধারণ নির্ব্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ায় লোক আশা করিয়াছিল যে, নূতন মন্ত্রীসভা কঠোরতার সহিত দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে গত মার্চ্চ মাস হইতে বাংলাদেশে চুরি, ডাকাতি, লুঠতরাজ অসম্ভব রকমের বাড়িয়া গিয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীকে সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে না পারায় অধিকাংশস্থলে পুলিশ নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল এবং অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষ পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও পায় নাই। রাণাঘাট, শান্তিপুর, ব্যাণ্ডেল, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে সরকারী কর্ম্মচারীরা অনাচার দমন করিতে যাইয়া নিজেরাই লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইয়াছেন।

দমদমের একটি ঘটনায় সাধারণ পুলিশের সহিত রেলপুলিশের মারামারি হয় এবং তাহাতে উভয় পক্ষেরই কয়েকজন করিয়া লোক আহত হইয়াছে। প্রথম দিকে ট্রেন থামাইয়া শুধু চোরাই চাল লুঠ করা হইতেছিল, পরে কয়েকটি স্থানে ট্রেন থামাইয়া যাত্রীদের টাকাকড়ি ও জিনিসপত্তরও লুঠ করা হইয়াছে। ক্যানিং প্রভৃতি স্থানে মাছের ভেড়ীর জন্য রক্ষিত জমি মালিকদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ভূমিহীন কৃষক বলিয়া বর্ণিত একদল মানুষের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং একস্থানে মালিকের ম্যানেজারকে খুন করাও হইয়াছে।

কলিকাতা ও সহরতলীতে কয়েকটি স্থানে চাল ও গম বোঝাই লরী থামাইয়া সেই মাল লুঠ করা হইয়াছে ও পরে তাহা জনসাধারণকে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। নক্সালবাড়ী নামক ভারত সীমান্তে অবস্থিত একটি স্থানে উগ্রপন্থী দল জোর করিয়া লোকের জমি কাড়িয়া লইয়া অপরকে দান করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে কয়েকদিন তথায় সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা আসিয়া পড়ায় ছয়জন মন্ত্রীকে সেখানে যাইয়া হাঙ্গামা থামাইবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। সশস্ত্র পুলিশের পক্ষেও সেস্থানে যাইয়া অবস্থা আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় নাই। তাহা ছাড়া সারা পশ্চিমবঙ্গে একদল মানুষ আইন অমান্য করিয়া ও অপরের উপর অত্যাচার করিয়া বাহাদুরি দেখাইয়া বেড়াইতেছে। ফলে দেশের গুণ্ডা ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের নিজ নিজ ইচ্ছামত অন্যায় কাজ করারও সুযোগ সুবিধা বাড়িয়া গিয়াছে। অরাজকতা বন্ধ না হইলে দেশের লোক শান্তিতে বাস করিতে পারিবে না।

পশ্চিমবঙ্গের একপাশে পাকিস্থান ভারতকে আক্রমণ করিবার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত। অন্য পাশে চীনারা

সুযোগ পাইলেই ভারতে প্রবেশ করিবার জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। নানা কারণে আসাম রাজ্যে সর্বদা নাগা বিদ্রোহ লাগিয়া আছে। একটি পৃথক উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত রাজ্য গঠিত হইলেও আসামের নাগা ও মিজোরা প্রতিটি জাতির জন্য একটি করিয়া পৃথক স্বাধীন রাজ্য পাইবার জন্য দাবী করিতেছে।

আসামের মত পশ্চিমবঙ্গেও যদি সর্বদা অরাজকতা দেখা যায় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার কী করিয়া দেশ রক্ষা করিবেন তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। আমরা শান্তিকামী দেশবাসীকে এই সকল ব্যাপারে তাঁহাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালনে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

কেহই অশান্তির মধ্যে জীবন যাপন করিতে চায় না। এ কথা যদি ভুলিয়া যাই তাহা হইলে দেশের ধ্বংস অনিবার্য্য।

সুবোধকুমার রায় সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৭ই জুন ২৪ পরগণা আড়িয়াদহে [illegible] লাইব্রেরি হলে খ্যাতিমান কবি, নাট্যকার ও সমাজসেবী সুবোধকুমার রায়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তমলুকের জমিদার শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ রায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন।

সুবোধকুমারকে কয়েকটি মানপত্র এবং একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হয়। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিক সুবোধকুমারের নানা গুণের প্রশংসা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন।

সুবোধকুমার আজ কয়েক মাস যাবৎ অসুস্থ হইয়া আছেন। আমরা তাঁহার নিরাময়, সুস্থ, দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সাহিত্যিকের নূতন সম্মান—

যশস্বী সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'গণদেবতা' উপন্যাস লেখার জন্য সম্প্রতি ১৯৬৬ সালের 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ঐ পুরস্কারের মূল্য একলক্ষ টাকা। ভারতের যে কোন ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। বাংলা ভাষার লেখক তারাশঙ্কর বাবু এই পুরস্কার লাভ করায় বাঙ্গালী মাত্রেই বিশেষ আনন্দিত হইবেন। তারাশঙ্করবাবুর বয়স ৭০ বৎসর, তিনি ইহার পূর্ব্বে ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' উপাধি পাইয়াছেন ও বহু স্থানে বহু সম্মান লাভ করিয়াছেন। এ ছাড়া ১৯৪৭ সালে তিনি তাঁহার 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র জন্য শরৎস্মৃতি পুরস্কার, 'আরোগ্য নিকেতনে'র জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং রবীন্দ্র পুরস্কার পাইয়াছেন, তাহা ছাড়া ১৯৫৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছে।

পাকিস্থানের অস্ত্র সংগ্রহ—

পাকিস্তান সর্বত্র পৃথিবীর নানা দেশ হইতে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিছুকাল পূর্বে পাকিস্তানকে যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ারির সরঞ্জাম দিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান তাহাতে সন্তুষ্ট নহে। সে পৃথিবীর অন্যান্য নানা দেশে পত্র লিখিয়া [illegible] সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় পাকিস্তানকে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। ২০ বৎসরেও ভারত পাকিস্থানের সহিত একটা মীমাংসা করিতে পারে নাই। ফল যে কি হইবে তাহা বলা কঠিন।

কলিকাতায় জল সরবরাহ

গত ৬ই মে হইতে কলিকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায়ই বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। ৬ই মে প্রায় ২৪ ঘন্টা কাল বাগবাজারে একটি জলের নল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কলিকাতাবাসী একফোঁটাও কলের জল পায় নাই, গ্রীষ্মকালে পুরা একদিন কলিকাতায় কলের জল বন্ধ থাকায় বিরাট সহরের অসংখ্য অধিবাসী সেদিন জলাভাবে দারুণ কষ্ট পাইয়াছে। তাহার পর ও দুইদিন জলসরবরাহ আংশিক বন্ধ ছিল। বহু নলকূপ থাকা সত্ত্বেও সে জল সহরবাসীর অভাব আদৌ মিটাইতে পারে নাই। ভূগর্ভস্থ জলের পাইপের ভবিষ্যৎ অবস্থার যে রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে তাহাতে সকলেরই শঙ্কার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হওয়া উচিত।

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া—

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় চিরদিনই অল্পবিস্তর জলাভাব দেখা যায়। এ বৎসর ঐ দুইটি জেলায় দারুণ জলাভাবের জন্য চাষবাস হয় নাই। ফলে মানুষের দুঃখকষ্টের সীমা নাই। দুইটি জেলাতেই অধিকাংশ জমি

অনুর্ব্বর এবং সেচের ব্যবস্থা না থাকায় চাষ ভাল হয় না। পার্ব্বত্য এলাকায় শক্ত মাটিতে চাষ করা বহু ব্যয়সাধ্য। উভয় জেলা হইতেই দলে দলে লোক অনাহারে মরিবার ভয়ে মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যাইতেছে। বাঁকুড়ায় একটি সেচের বড় ব্যবস্থার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাহা শেষ হয় নাই। পুরুলিয়ায় পুকুর বা খাল খুবই কম। এ বৎসর অন্নাভাবের সময় যদি সরকার মনোযোগী হইয়া ঐ দুই জেলায় কিছু ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে তথায় লোকের বসতি বাড়িতে পারে। কত লক্ষ লোক যে এই দুইটি জেলায় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে তাহার হিসাব নাই।

ছাত্রের কৃতিত্ব—

সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য

এই বৎসরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মিত্র ইন্সটিটিউসন্-এর ছাত্র শ্রীমান্ সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য ৮৪১ নম্বর পাইয়া বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এত অধিকনম্বর কেহ লাভ করিতে পারে নাই। অন্য সকল বিভাগের পরীক্ষার্থীদিগের অপেক্ষাও তাঁহার নম্বর বেশী থাকায় শ্রীমান্ সব্যসাচীকে সকল বিভাগের পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যেও প্রথম বলিয়া গণ্য করা হইতেছে।

শ্রীমতীপুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী হইতেছেন শ্রীমান সব্যসাচীর মাতামহী। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমানের মাতা পার্ব্বতী দেবীর অকালে মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীমান সব্যসাচীর অগ্রজ শ্রীমান হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্যও বি-টেক্ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং এম-টেক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

আমরা শ্রীমান্ সব্যসাচীর মাতৃবিয়োগে তাঁহাকে সান্ত্বনা জানাই এবং তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য ও উন্নতি কামনা

কলকাতা হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি—

শ্রীনিখিলচন্দ্র তালুকদার

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপরিচিত ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র তালুকদার উক্ত মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী ৺সুরেশচন্দ্র তালুকদার মহাশয়ের পুত্র ও ইন্‌কাম্ ট্যাক্স ল'-এর লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ৺ভূতনাথ কর মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত তালুকদার ছাত্র জীবনে একজন কৃতী সন্তান ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবীরূপে যোগদান করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই আইন বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ বাগ্মিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিচারপতিরূপে যোগদানের অব্যবহিত পূর্বে তিনি হাইকোর্টের আপীল বিভাগে নেতৃস্থানীয় ব্যবহারাজীবীরূপেপরিচিতিলাভ করিয়াছিলেন।

তাঁর কর্মজীবনে হাইকোর্টের আপীল বিভাগে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার; রাজ্য সরকার; কোম্পানী ল' বোর্ড, পূর্ব্বাঞ্চলীয় প্রান্ত; নৌ ও সেনা বিভাগ, পূর্ব্বাঞ্চলীয় প্রান্ত; অফিসিয়াল রিসিভার; কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী; কলিকাতা কর্পোরেশন প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত
শ্রীমতী পুষ্প দেবী ও
কন্যা পার্ব্বতী দেবী

শোক সংবাদ—

ভূতপূর্ব্ব শ্রীনিকেতন সচিব ৺রায়বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্রী পার্ব্বতী দেবী মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীনিকেতনে থাকাকালীন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠ-সঙ্গীতের ও চিত্রাঙ্কনের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। বালিকা পার্ব্বতীকে রবীন্দ্রনাথ "আলো" নামে অভিহিতা করিয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপক শান্তনু মুখোপাধ্যায় ও ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদিকা পুষ্পদেবীর কন্যা। পুষ্পদেবীর সমস্ত "উপনিষদ" পুস্তকগুলির প্রচ্ছদপট ঐ কন্যারই অঙ্কিত। তিনি ডাঃ পতাকীচরণ ভট্টাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পার্ব্বতী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য এইবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সকল বিভাগের পরীক্ষার্থীদিগের হইতে বেশী নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। আমরা এই শোকসন্তপ্ত পরিবারটিকে সান্ত্বনা জানাইতেছি।

মাদক সেবন কি প্রয়োজনীয়?

শ্রীজ্ঞান

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আজকাল এদেশে ছাত্র এবং বিস্ময়ের বিষয় যে কিছু কিছু ছাত্রীও আমাদের দেশে যা চিন্তা করি না, অতিরিক্ত চা ও কফি পান এবং তৎসহ ধূমপান, এমন কি মদ্যপানেও বেশ মত্ত হয়ে উঠেছে! অভিভাবক এবং শিক্ষকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করতে চাই, আর ছাত্রদের সঙ্গেও এসম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক বলে মনে করি।

মদ্যপান করা কি ভাল? ধূমপান করা কি উপকারী? চা বা কফিপান কি স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়?—এ কথা অনেক পরিশ্রমী ছাত্রের মনে জাগে। পড়তে পড়তে মন যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন একটা কিছু উত্তেজক অর্থাৎ "ষ্টিমুলেন্ট" গ্রহণ করার কথা অনেকেই ভাবে, অনেকে গ্রহণ করেও। অনেকে সন্দেহ করেন, এসব গ্রহণ করা উচিত কি না। এ প্রশ্ন অনেক দিন থেকে অনেক চিন্তাশীল ও মানসিক পরিশ্রমক্লান্ত মানুষের মনে জেগেছে; কিন্তু সদুত্তর পাওয়া যায় নি। নানা মুনি নানা মত ছড়িয়ে বিভ্রান্ত করেছে ছাত্রসমাজকে।

এ, আর্থার রীড নামে এক বিলেতের সাহেবের মনেও ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করে প্রচলিত গোলমেলে মতগুলি। তিনি ১৮৮২ সালে পৃথিবীর প্রখ্যাত মনীষীদের কাছে পত্র দিলেন এ-সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত মতবাদ জানাতে। ১২৯ জন মনীষীর কাছ থেকে তিনি উত্তর পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শুধু একজন ছিলেন ভারতবর্ষের। তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

রীড্ সাহেবকে যে-সব মনীষী মতামত ব্যক্ত করে চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র ২৪জন খাবার সময় মদ্যপান করতেন। ৩০ জন একদম মদ্য স্পর্শ করতেন না। ২৪ জন তামাক ব্যবহার করতেন,—তাঁদের মধ্যে ১২জন কাজের মধ্যে ধূমপান করতেন, একজন তামাক চর্বন করতেন, অপর একজন নস্য নিতেন। অপর একজন চা-কফি দুই-ই পান করতেন। তাঁদের কয়েক জনের মত-বাদ নিয়ে দেওয়া যাচ্ছে:—

রেভারেণ্ড ডক্টর এস, এবট লিখেছিলেন: আমার তামাক সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা নেই। আমার সাধারণ মতামত এর ব্যবহারের বিপক্ষে। বলকারক হিসাবে মদ্য একটি বিশেষ ধরণের বিষ—যেমন বেলেডোনা, আর্সেনিক, প্রুসিক এসিড্ যা চিকিৎসকগণ বর্জনও করতে পারছেন না, আর যা চিকিৎসকগণের পরামর্শ ছাড়া স্পর্শ করাও উচিত নয়।

নিউ ইয়র্কের অষ্টিন আলিবোন লিখেছিলেন: আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে মদ্য সকলের পক্ষেই ক্ষতিকর, লেখকরাও সকলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

কবি এবং সমালোচক মেথ্যু আর্ণল্ডের মত ছিল উদার। তিনি লিখলেন: আমি জীবনে ধূমপান করি নি। আর মদ্যের মধ্যে শুধু 'ক্লেরেট' পান করেছি। মদ্য সম্পর্কে আমি শুধু নিজের কথাই বলতে পারি। অতিরিক্ত মদ্যপান যে বিপদ্ ঘটায় সে কথা অবশ্য সত্য। কিন্তু যদি আমরা একটি সুস্থ সংযমী লোকের কথা ভাবি,

তার পক্ষে তার নিজের প্রকৃতিকে মেনে চলাই ভাল। কি সে পান করবে, কতবার সে পান করবে, কতখানি পান করবে সে তার প্রকৃতির উপরই নির্ভর করবে। আমার বিশ্বাস প্রায় সব মানুষই মদ্যপান ব্যতিরেকেই যথেষ্ট কাজ করতে পারে, আবার পান করেও পারে। অত্যধিক মস্তিষ্কের পরিচালনা লোকেদের পিত্তাধিক্য ঘটায়। মদ্যপান করলেও এ হবে না করলেও হবে। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট মাত্রায় মদ্যপান জীবনে স্ফূর্তি আনে। যা স্ফূর্তি আনে তা জীবনের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

ডাঃ আলেকজাণ্ডার বেন ঠিক এর বিপরীত মত পোষণ করতেন। তিনি লিখলেন: মদ্যই বলুন আর চা-ই বলুন এ-সব কিছুই বর্জন করা লেখাপড়ার পক্ষে আমি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। এসকল শুধু একটা মিথ্যা উত্তেজনা সৃষ্টি করে—যা অধ্যয়ন সংক্রান্ত কঠিন সমস্যাসকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন।

রাশিয়ান লেখক আইভান টুরগেনিভ, অ্যামেরিকান লেখক মর্ক প্রভৃতি অনেকেই একবাক্যে মদ্যপানের নিন্দা করেছেন। আর সকলের চেয়ে বেশী তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন ভারতীয় মনীষী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তিনি লিখলেন: "আমার দৃঢ়ধারণা এই যে মাদকদ্রব্য থেকে দেহ কিংবা মন কিছুই উপকৃত হয় না।" তাঁর মতে সমাজে যত দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার বেশীর ভাগই মদ্যপানের কুফল-জাত।

সকল মতামত সমীক্ষা করে রীড্ সাহেব এ সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে মদ্যপান, ধূমপান, চা-কফি সেবন যে কোন সুস্থ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়—ক্ষতিকারকও। তাঁর মতে সবচেয়ে বেশী দরকারী বিশুদ্ধ বায়ু শীতল জল, ভ্রমণ ও মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম।

আমরা পানীয় হিসাবে হরলিক্স্, বোর্ণভিটা, ওভালটিন, ককোমল্টিনের ব্যবহার ছাত্রদের পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে করি। কিন্তু যারা এসব সংগ্রহ করতে পারবে না, তারা ব্রাহ্মীশাকের পাতা শুকিয়ে তার এক চামচে এক কাপ চা তৈরী করে নিত্য সেবন করলে উপকার পাবে বলে আশা করি। তাতে মেধা বাড়বে এবং কণ্ঠস্বর ভাল হবে। আমাদের দেশী গাছগাছড়ার উপকারিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় এসেছে। এ জন্য বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করার জন্য সরকারই শুধু নয়, ব্যক্তিগতভাবে সকলেরই সাহায্য করা উচিত।

বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের দেশী দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ বাড়ান উচিত। আর সর্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত কোনও রকম মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত না হওয়ার। আশা করি সে চেষ্টা তোমরা অবশ্যই করবে।

গ্যাসের আলো

গৌর আদক

ষ্টিম এঞ্জিনের জন্মদাতা জেমস ওয়াটের কারখানায় একজন সাধারণ কর্মচারী উলিয়াম মারডক। তিনি একটু লাজুক প্রকৃতির লোক। কারোর সঙ্গে বেশী কথা বলতেন না; বা আড্ডাও মারতেন না। কারখানার সাধারণ লোকের মতনই তিনি কাজ করতেন।

উলিয়াম মারডক রাত্রে মোমের আলো জ্বেলে কাজ করতেন। কিন্তু এতে তাঁর কাজে বড়ই অসুবিধা হত। তাই তিনি একদিন তাঁর এই অসুবিধার কথা চিন্তা করছিলেন, চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তাঁর মাথায় ডাক্তার ক্রেটনের তামাসার কথাটি মনে পড়ে গেল।

বহু বছর আগে ডাক্তার ক্রেটন নামে এক ভদ্রলোক একটি কেট্‌লিতে কতকগুলি কয়লা পুড়িয়ে তার ধোঁয়াটাকে একটি ব্লাডারের মধ্যে ভর্তি করলেন, এবং পরে তাতে কয়েকটি ছিদ্র করে দিলেন এবং সেই ছিদ্র থেকে সোঁ সোঁ করে গ্যাস বেরোতে লাগলো। তখন তিনি সেই গ্যাসের মুখে একটু আগুন জ্বেলে দিলেন। আগুন জ্বেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ একটু উজ্জ্বল সাদা আলোর সৃষ্টি হলো। তিনি এই ব্যাপারটি তামাসা বলে মনে করে তাঁর বন্ধুদের ডেকে এনে তা দেখালেন। তাঁর এই ব্যাপারটি শুধু তামাসা হয়েই রয়ে গেল। কারণ তিনি ব্যাপারটিকে নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না।

ডাক্তার ক্রেটন যেটিকে তামাসার চোখে দেখেছিলেন, উলিয়াম মারডক কিন্তু সেটি মোটেই তামাসার চোখে দেখেননি। তিনি সেটিকে বাস্তবে ফুটিয়ে তুলে ধরে এক বিরাট অভাবকে দূর করলেন।

উলিয়াম মারডক ডাক্তার ক্রেটনের মতনই পরীক্ষা করেছিলেন। তবে উলিয়াম মারডকের পরীক্ষার যন্ত্রপাতি একটু বড় ধরণের ছিল। কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে যদি তিনি এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হতে পারেন, তাহলে এরদ্বারা তিনি সারা বাড়ীটি আলোকিত করবেন। সত্যি তিনি একদিন তাঁর এই বিরাট পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে এক নূতন জিনিসের আবিষ্কার করলেন পৃথিবীতে।

উলিয়াম মারডকের আবিষ্কৃত গ্যাসের আলো দেখবার জন্য গ্রামের লোক সব ছুটে আসতো তাঁর ঘরে। আস্তে আস্তে তাঁর এই আবিষ্কারের কথাটি গ্রাম থেকে সহরের লোকের কানে গিয়ে পৌছালো। তখন সহর থেকেও লোক ছুটে আসতে লাগলো তাঁর ঘরেগ্যাসের উজ্জ্বল সাদা আলো দেখার জন্য।

ক্রমেই তাঁর এই আবিষ্কারের কথাটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। যেদিন থেকে তাঁর এই আবিষ্কারের কথাটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল, সেই দিন থেকেই তিনি একজন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উলিয়াম মারডক নামে পরিচিত হয়ে উঠলেন।
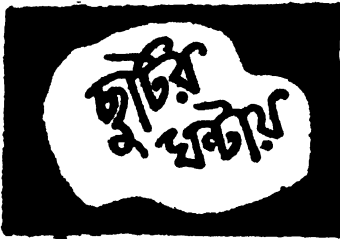
চিত্রগুপ্ত

এবারে বলছি, বিজ্ঞানের আরেকটি আজব-মজার খেলার কথা। এ খেলাটির নাম—'উজ্জ্বল-আভাময় তরল-পদার্থ।' খেলা হলেও, আসলে এটি কিন্তু রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার রহস্যময়-বিচিত্র কারসাজি। এ কারসাজির সহজ-সরল কলা-কৌশল রপ্ত করে, ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের আসরে ঠিকমতো দেখাতে পারলে, তাঁদের যে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দেওয়া যাবে—সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আপাততঃ, শিখে রাখো—আজব-মজার এই 'উজ্জ্বল-আভাময় তরল-পদার্থ' সৃষ্টির কলা-কৌশল-রহস্য। এ কারসাজি রপ্ত করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয় এবং এজন্য সাজ-সরঞ্জাম জোগাড়—খুব একটা ব্যয়বহুল বা হাঙ্গামার ব্যাপার বলেও ধারণা হয় না। সামান্য চেষ্টায় তোমরা সহজেই নিজেদের বাড়ী থেকে ছিপিওয়ালা ছোট একটি কাঁচের শিশি আর সহরের ভালো ডাক্তারখানা থেকে অল্প খানিকটা 'ফস্‌ফরাস্' (Phosphorus) এবং 'লবঙ্গের আরক' (Essence of Cloves)—বিশেষ-ধরণের এই দুটি রাসায়নিক-পদার্থ সংগ্রহ করে বিচিত্র-মজার কারসাজির প্রত্যক্ষ-পরিচয় নিতে পারো। তবে গোড়াতেই বলে রাখি, রহস্যময় এই আজব-কারসাজি হাতে-কলমে পরখ করে দেখবার সময়—খেলার আসরটি যত বেশী অন্ধকার রাখা যায়, ততই ভালো। কারণ, দিনের আলো বা বিজলী-বাতির রোশনিতে খেলার আসর উজ্জ্বল হয়ে থাকলে, রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি-করা কাঁচের শিশির ভিতরের 'তরল-পদার্থের আভার' ঔজ্জ্বল্য তেমন বিশেষ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে না এবং কারসাজির মজাও ব্যাহত হবে অনেকখানি। কাজেই এ কারসাজি দেখানোর সময় আসরটি আগাগোড়াগাঢ়-অন্ধকার রাখাই যে বাঞ্ছনীয়—সে কথা বলাই বাহুল্য।

যাই হোক, এবারে শোনো—খেলার কলা-কৌশল-রীতির কথা।

উপরের ফর্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর আসরে দর্শকদের সামনে আজব-মজার এই 'তরল-আলোর আভা-সৃষ্টির' কারসাজি দেখানোর সময় ছোট্ট ঐ কাঁচের শিশির ভিতরে 'লবঙ্গের আরকটুকু' (Essence of Cloves) ঢেলে, সেই তরল-পদার্থের সঙ্গে 'ফস্‌ফরাস' মিশিয়ে নাও এবং শিশির মুখটি শক্তভাবে কষে ছিপি এঁটে রাখো। সদ্য-মেশানো এই 'তরল রাসায়নিক-পদার্থটিকে' কিছুক্ষণ এমনিভাবে ছিপি-আঁটা কাঁচের শিশির ভিতরে বন্ধ রাখার পর আসরে দর্শকদের চোখের

সুমুখেই পুনরায় কাঁচের শিশির মুখ থেকে ছিপিটি উন্মুক্ত করে নিলেই, তাঁরা অবাক বিস্ময়ে দেখবেন—বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে, কাঁচের শিশির ভিতরকার 'তরল-মিশ্রণটি' গাঢ়-অন্ধকারের মাঝে অপরূপ আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে কাঁচের শিশির মুখে পুনরায় ছিপিটি এঁটে দিলেই শিশির ভিতরকার 'তরল-আলোর' উজ্জ্বল-আভাও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এমনিভাবে যতবারই কাঁচের শিশির মুখের ছিপিটি সরিয়ে নেওয়া হবে, ততবারই শিশির ভিতরকার 'তরল-পদার্থটি' আগের মতোই 'উজ্জ্বল-আভায়' আঁধার-ঘর আলো করে তুলবে এবং শিশির মুখে ছিপি-আঁটার সঙ্গে সঙ্গেই সে-আলোর আভা ম্লান হয়ে মিলিয়ে যাবে।

এই হলো, এবারের মজার খেলাটির আজব-রহস্য। আপাততঃ এই পর্যন্তই...আগামী সংখ্যায় আরেকটি অভিনব-বিচিত্র খেলার কথা বলবো।

মনোহর মৈত্র

১। হিসাবের হেঁয়ালি ঃ

আমাদের সতুবাবু সেদিন তাঁর সদ্য-কেনা মোটর-বাইক চালিয়ে ৬০ মাইল ঘুরে এলেন। এই ৬০ মাইল পথের খানিকটা তিনি গিয়েছিলেন সহরের মধ্য দিয়ে...বাকীটুকু খোলা-মাঠের বুক চিরে যে লম্বা সড়ক বাঁধানো রয়েছে—তারই উপর দিয়ে। মাঠের পথে সতুবাবু বাইক চালিয়েছিলেন ঘণ্টায় ৪০ মাইল রেটে...সহরের পথে ঘণ্টায় ২০ মাইল রেটে। মোটর-বাইকে এ পাড়িতে তাঁর সময় লেগেছিল পৌনে-দু'ঘণ্টা। বলতে পারো সহরের পথে মোট কত মাইল মোটর-বাইক চালিয়ে ছিলেন তিনি ?

রচনা : বৈকুণ্ঠ দেবশর্মা

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

তিন অক্ষরে নাম তার—
সবে ভালবাসে।
মধ্যম ছাড়িলে ফল,
জিভে জল আসে!
প্রথম ছাড়িলে হয়
হিন্দু-অবতার!
বলো দেখি, ভাই তোমরা—
কি নাম তাহার ?

রচনা : শান্তনু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

৩। বলো দেখি, এমন জায়গা কোথায়—

যেখানে সাগর আছে অথচ জল নেই; বন-জঙ্গল আছে, কিন্তু গাছপালা, জীবজন্তু কিছুই নজরে পড়ে না। পাহাড় আছে, অথচ সে পাহাড়ে পাথর নেই; পথ আছে, কিন্তু সে পথে গাড়ী-ঘোড়া লোকজন নেই, রেল-লাইন রয়েছে, অথচ রেলগাড়ীর চিহ্নও চোখে পড়ে না; সহর আছে, গ্রাম আছে, কিন্তু সেখানে কোথাও বাড়ী-ঘর দোকান-পাট, জন-মানব কিছুই নেই!

রচনা : সুলতা দেবী (নবাবগঞ্জ)

গত মাসের 'ধাঁধা ও হেঁয়ালির' উত্তর :

১। ৩৭
২। জলতরঙ্গ
৩। ৩ বার ৩ সেকেণ্ড
অর্থাৎ, ১ বার ১½ সেকেণ্ড
৬ বার ৭½ সেকেণ্ড

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

প্রশান্ত, রাণা, অমৃত, অমিয়, সুনীত, তিনকড়ি, অভী, কৃষ্ণলাল, দিব্যকান্তি, সুধীশ, ভাস্কর, ভুবনমোহন, মাণিক, পিন্টু, শিবাজী, বাপ্পা, অমিতাভ, বরুণকান্তি ও শ্রীপতি (গড়িয়া), হাবলু, টাবলু, পারুল, ঝুমা, সমীর ও কানাইলাল

মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), অরুণ, অশোক, দ্বিজেন, রথীন, মদন, দেবী, উমা ও সেল্টু (কৃষ্ণনগর), পুপু, ভুটিন, ও বাবুই (কলিকাতা), সত্যেন্দ্র, মুরারি, সঞ্জয়, অমিয়, সুনীল, নমিতা, লক্ষ্মী, বুলু ও অজিত (ভিলাই), বুজু ও বিজু আচার্য্য (কলিকাতা), হিমাংশু, হারানচন্দ্র, সুধাংশু, সীতাংশু, সুষমা ও অলকা (সন্তোষপুর), ফণী, রোচনা ও খুকু সাহা (কলিকাতা), মিমি, রবি, খুকু ও পদ্ম মুখোপাধ্যায় (কাইরো), নরনারায়ণ ও সংযুক্তা সেন (পাটনা), ঋষি, শ্যামা ও খুশী (কলিকাতা), মহেন্দ্র, মণীন্দ্র, দেবেন্দ্র, হরেন্দ্র, ও কঙ্কাবতী গঙ্গোপাধ্যায় (আমেদাবাদ)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিজয়েন্দ্র ও বিনয়েন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), বুবু, মিঠু, কল্যাণ, কল্যাণী ও খোকন গুপ্ত (কলিকাতা), আরতি, সুধীন, যশোজিৎ ও শম্পা দেবশর্ম্মা (বোম্বাই), রাণা, বুনা লিপিকা, গৌর, দুর্গা, রেণু, প্রণব, প্রশান্ত, ক্ষেপু ও খুকু (কলিকাতা), অজয়, হরিদাস, কুমুদিনী, সুনন্দা, কাদম্বরী, মহাশ্বেতা ও শর্ব্বরী রায়চৌধুরী (মোগলসরাই) শর্মিলা, শর্মিষ্ঠা, সজ্ঘমিত্রা ও শচীন রায় (কলিকাতা), ইন্দ্র, বিমান, অশোক, ধীরেন, রবি, অরুণ, অনাবিল ও চারু বন্দ্যোপাধ্যায় (জামশেদপুর), অমিত, কবি ও অধীশ হালদার (লক্ষ্ণৌ), পিন্টু, মাণিক, আরতি ও কুমকুম, হাজরা (কলিকাতা), নবজীবন, মনোবীণা, দেবলীনা ও পুরন্দর রায়চৌধুরী (নিউ দিল্লী), শ্যামলী, কাজরী, বাঁশরী, মাধুরী, মোহনলাল, শোভনলাল, রতনলাল ও মৃন্ময়ী বসু (দুর্গাপুর)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), সুধীর, চারু, নরেন্দ্র, পবিত্র, মন্মথ, বিশু, কমলাক্ষ, প্রীতিময়, সুখময়, রজত ও বীরেন্দ্র বসু (বৰ্দ্ধমান), জীমূতবাহন, সুচন্দ্রা, সুভদ্রা, শ্যামলী, কুমুদনাথ ও মোহনদাস গঙ্গোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী), হাসি, ও শৈলেন সেন (কলিকাতা), আশানাথ, রাকানাথ, নিশানাথ ও উমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তমলুক), নীলমণি, পৃথ্বীশ, কালিদাস, আশুতোষ, মনোজ, মনোমোহন নীতীশ, যোগনাথ ও মনোরমা (আসানসোল), গীতাদি, কৃষ্ণাবৌদি, বাদলদা, বাপী, মৌসমী ও দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা), বীণাপাণি, মহালক্ষ্মী, চিন্তাহরণ, মানসমোহন ও দেবাংশু মৈত্র (রৌরকেল্লা), অবিনাশ, ত্রিলোকেশ, চন্দনা, বন্দনা, কপিল ও জ্যোতি বরাট (কলিকাতা), মৃণাল, হৃদয়নাথ, মৌলিনাথ ও রাজলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় (মধ্যমগ্রাম)।

শেষ পর্য্যন্ত

শ্রীপঙ্কজকুমার মিত্র

মেয়েটার বিয়েটা হচ্ছে খুব গোপনে। গত ক'মাস বাপ, মা, মেয়ে লোককে মুখ দেখাতে পারেনি। কাণ্ডটা করে বসেছে বাড়ীর কুল-পুরোহিত। জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে গ্রাম, জেলা, এমনকি প্রদেশের সীমা ছাড়িয়ে ভিন্ন প্রদেশে গিয়ে অতি সংগোপনে বিয়েটা সারা হচ্ছে। ভয়টা এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, বাপ, মা, মেয়ে নাম পর্য্যন্ত পাল্টে ফেলেছে। তাদের সঙ্গে আর কেউ নেই, আছে কেবল বাড়ীর ঐ কুল-পুরোহিত। বাপ আর কুল-পুরোহিত অনেকদিন ধরে অনেক সংগোপনে তন্ন তন্ন করে খুঁজে এমন একটা জায়গা বা'র করেছে যে, যা'র ধারে কাছে কোন চেনা-পরিচিত লোক নেই, যা'তে বিয়েটা হ'বার সময়ে কোন চেনা পরিচিত লোক এসে না পড়ে। মেয়ের মা বুকে হাত দিয়ে ইষ্টদেবতার কাছে চোখের জল ফেলে কামনা করেছে যে, মেয়ের বিয়েটা ঘুণাক্ষরে যাতে কেউ জানতে না পারে বা বিয়ের সময় কেউ এসে না পড়ে। হ্যাঁ, যেখানে বিয়েটা হচ্ছে সেখানে স্বজাতি ও স্বগোত্রভুক্ত একটা পাত্রও যোগাড় করা হয়েছে; সেখানে পাত্রীপক্ষের আর কেউ নেই বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে; আর পাত্রপক্ষকে প্রচুর পয়সা পণ দেওয়া হয়েছে; তারা আর এ বিষয়ে বেশী খোঁজখবর করেনি। মেয়েটার বিয়ের গোপনতা রক্ষে করার জন্যে বাপ-মায়ের চেয়ে কুল-পুরোহিতের আগ্রহটা যেন অনেক, অনেক বেশী। ধারে কাছে কোন চেনা-পরিচিত কেউ নেই—একথা জেনেও সে আপাদ-মস্তক চাপাচুপি দিয়ে বাড়ীর বাইরে বেরোয়, পাছে যদি কেউ দেখে ফেলে—এত ভয়! সারাদিন নাম জপ করে আর ভগবানকে ডাকে, হে ভগবান, বিয়েটা যেন গোপনে-গোপনে সারা যায়, পরিচিত কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।"

মেয়েটা যেন কিরকম হয়ে গেছে, ভয়েতে যেন জড়সড় হ'য়ে আছে, কুঁকড়ে গেছে; এত গোপনতা আর মেয়েটা সহ্য হচ্ছিল না; ভাবছিল, আসল ব্যাপারটা প্রক করে দিলেই হয়; তবুও ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছি না—যদি জানাজানি হয়ে যায়, তাহ'লে কেলেঙ্কারী হ'বে।

এদিকে বাড়ীতে বাপ, মা, মেয়ে আর কুলপুরোহিতে খোঁজ না পেয়ে বাড়ীর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ও পাড়ার লোকেদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেছে; কারণ, ও যে ঠিকানা দিয়ে গেছলো সে ঠিকানায় ওদের খোঁ পাওয়া যায় নি। পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছিল, কি পুলিস আজ পর্য্যন্ত কোন হদিশ্ করতে পারে নি পারবেই বা কেন? নাম পাল্টে অন্য জায়গায় গে খুঁজে বার করা যে খুবই শক্ত ব্যাপার! ক'মাস হ গেল কোন খবর পাওয়া যায় নি; তাই আত্মীয় স্ব ভয়ানক আশঙ্কাগ্রস্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কারণ, ওরা স করে টাকা-পয়সা, সোনার গয়না, কাপড়-চোপড় অনে নিয়ে গেছে; লোকে এত জিনিষ সঙ্গে করে নি যেতে বারণ করেছিল; কিন্তু ওরা কারুর কথা শো নি; শুনবেই বা কেন? আসল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চে গেছে যে;—কাণা মনে মনে জানা। অনেকের ধার নিশ্চয়ই ডাকাতের হাতে পড়েছে; অত টাকা-পয় গয়নার খবর পেয়ে ডাকাতদল আর লোভ সাম্লা পারে নি, তাই মানুষ চারটেকে একেবারে 'সাফ' ক দিয়ে জিনিষপত্তর সাফ্ করে নিয়ে পালিয়েছে। ঘটন যে ঠিকানায় যাবার কথা সেই ঠিকানায়ই হয়ত' ঘটে কারণ সেখানে অনেক লোক যায় আসে, সেখানক লোকেরা কোন সঠিক খবর বলতে পারে নি; ডাকাত হয়ত' মানুষ চারটেকে খুন করে 'লাস' একদম গুম ক দিয়েছে। অথবা, ট্রেনে হয়ত' রাহাজানি হয়েছে সেইখানেই সব কিছু খোয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে মা চারটের প্রাণও; যারা রাহাজানি করেছে তারা হয়ত' মা

চারটের 'লাস' নদীর জলে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু এসব সন্দেহের কোন প্রমাণ মেলে নি; ঐ অঞ্চলে ডাকাতির, অথবা বড় রকমের ট্রেন রাহাজানি, খুন-খারাপির খবর পুলিস দপ্তরের জানা নেই। লোকগুলো কি চিরকালের মত গ্রাম ছেড়ে চলে গেল? কেন গেল? কোথায় গেল? এইসব প্রশ্ন মানুষের মনে আলোড়িত হতে লাগ্‌লো। বদ্‌লোকে এই নিয়ে অনেক গুজব কানাকানি করতে লাগ্‌লো,—বাড়ীর ঠাকুর ঘরের কাজ করার ভার মেয়েটার ওপর ছিল; কুলপুরোহিত রোজ পূজো করতে এলে মেয়েটা নাকি ঠাকুর ঘরে উপস্থিত থাক্‌তো; পরস্পরের মধ্যে খুব গালগল্প হ'ত; পরস্পর ফিস্ ফিস্ করে কিসব কথা কইত; পরস্পর খুব কাছাকাছি বসে থাকতো; শুধু তাই নয়, গল্প করতে করতে হাসতো; আর সে কি এমনি হাসি, যাকে বলে হাসিতে ফেটে পড়া দুজনে সেই হাসিতে ফেটে পড়তো; আর সে কি এমনি ফেটে পড়া, দুজনে দুজনের গায়ে ফেটে পড়তো; ছি! ছি! বাড়ীর কুল-পুরোহিতটা কি! একে কুল-পুরোহিত, তার বাড়ীতে বিয়ে করা বৌ আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, সে কিনা……! আর মেয়েটাই বা কি! আর তার বাপ মা-ই বা কি!

কিছুদিন ধরে মেয়েটা যখন তখন কুল-পুরোহিতের বাড়ী যাতায়াত করতো; কুল-পুরোহিত থাক্‌লে অনেকক্ষণ ধরে গালগল্প করতো; আর সেই ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলা আর হাসিতে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ফেটে পড়া; কুল-পুরোহিতের বৌ-টাই বা কি? এসব জেনে-শুনে, দেখে-শুনে সব সহ্য করে যেত, সব চেপে যেত, তার স্বামীকে ভাল লোক বলে প্রমাণ করবার জন্যে; এখন দেখ, এখন মর, এসব মেয়েমানুষের সর্বনাশ হবে না ত' হবে কার; তা' না হ'লে কি আর কয়েক মাস কেটে গেল তাদের পাত্তাই নেই; এমন করে বলেছিল যে, বিয়ে না দিয়ে……; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গুজবটা ওল্টাতে পাল্টাতে পাঁচ কান পাঁচ মুখ হ'তে হ'তে বিভিন্ন রূপ নিতে নিতে সেটা যখন কুল-পুরোহিতের স্ত্রীর কানে এসে উঠ্‌লো, তখন সেটা এই রূপ নিয়েছে,—এমন কাণ্ড ঘটেছিল—যে বিয়ে না দিয়ে উপায় ছিল না, তাই মেয়েটার সঙ্গে কুল-পুরোহিতের বিয়ে হয়ে গেছে; কুল-পুরোহিত তার দ্বিতীয় পক্ষের নতুন বৌ আর নতুন শ্বশুর-শাশুড়ীরসঙ্গে ঘর-জামাইহয়ে বসবাস করছে; তারা আর এ গ্রামে ফিরে আস্‌বে না;……; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কুলপুরোহিতের স্ত্রী প্রথমে একথা বিশ্বাস করতে চায় নি; কিন্তু পাঁচ মুখে শুনে শুনে, আর তাদের খোঁজ-খবর না পেয়ে শেষে তার বিশ্বাস জন্মে গেল যে, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সত্যি। এই বিশ্বাস জন্মাবার পর কুল-পুরোহিতের স্ত্রী প্রায় পাগলের মত হয়ে গেল; কখনও কাঁদতে লাগ্‌লো, কখনও বা রাগে গরগর করতে করতে চোখ মুখ লাল করে ফেটে পড়লো, কখনও বা কুল-পুরোহিতকে নানারকম গালি-গালাজ করতে লাগলো; রাঁধা-বাড়া প্রায় বন্ধ করে দিলে, ঘর সংসারের জিনিষপত্তরগুলো যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো; ছেলেমেয়েগুলো খেতে না পেয়ে একটা অজানা আশঙ্কায় কান্নাকাটি করতে লাগ্‌লো; ভয়েতে মা-কে কিছু বলতে পারছিল না; দু-একবার মায়ের কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কারণে অকারণে চড়-চাপড় খেয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। শেষে এমন হ'ল যে, জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে গিয়ে বৌ-টা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছিল; ভাগ্যে ছেলেমেয়েগুলো কাছে ছিল, দেখতে পেয়ে চীৎকার করাতে আশেপাশের লোকেরা ছুটে এসে তাড়াতাড়ি বৌ-টাকে অজ্ঞান অবস্থায় নামিয়ে নেয়। এইভাবে এ-যাত্রায় সে বেঁচে গেল।

এদিকে মেয়েটার বাড়ীর লোকেরা বাপ, মা, মেয়ে কুল-পুরোহিতের ছবি খবরের কাগজে ছাপিয়ে ও পুলিসের কাছে পাঠিয়ে তাদের খুঁজে বার করবার শেষ চেষ্টা আরম্ভ করেছে।

ওদিকে বিয়ের দিন এসে গেছে; এতদিন ধরে গোপনে সব ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। স্থির হয়েছে বিয়ের সময়ে পাত্র পক্ষে পাত্রের বাপ, পুরোহিত, নাপিত ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাক্‌তে পারবে না; বিয়েটা বন্ধ ঘরের মধ্যে হবে। যাই হোক্, ব্যবস্থা মত বিয়েও আরম্ভ হ'ল। সন্ধ্যাবেলা বর-বেশী একজন লোককে ও আরও তিনজনকে ওই বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেখে ঐ অঞ্চলের লোকের মনে কৌতুহলের উদ্রেক হয়েছিল

কথাটা কানাকানি হ'তে আরম্ভ করেছিল। তারপর দু-একবার শাঁখ-বাজার শব্দ হ'তেই চারিদিকে লোকের মনে কৌতূহলটা জমাট বেঁধে উঠ্‌লো; একটা দুটো করে করে চারিদিক থেকে বিয়ে বাড়ীর চারিপাশে লোক জড় হ'তে লাগ্‌লো আর ফিস্ ফিস্ করে নানা রকম কথা বলাবলি হ'তে লাগ্‌লো। ধীরে ধীরে ভাসা ভাসা গুজব-গুলো এক হ'তে হ'তে একটা বিশেষ গুজবের রূপ নিলে যে, একটা পাপ-সংক্রান্ত ব্যাপারকে চাপা দেবার জন্যেই এত গোপনে বিয়েটা দেওয়া হচ্ছে; এ গ্রামের লোকেরা এই সব পাপ জেনে শুনে বরদাস্ত করবেনা—এই বলে সকলে চীৎকার আরম্ভ করে দিলে। বাইরে গোলমাল শুনে ভিতরের লোকেরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়েটা শেষ করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। এদিকে বাইরে দরজায় দু একটা ঘুঁসি আর ইট মারার শব্দ হ'তে লাগলো। এই সব শুনে কুলপুরোহিতের হাত কাঁপতে লাগ্‌লো; এত গোপনতা দেখে পাত্রের মনে সন্দেহের উদ্রেক হ'ল; বিয়ের মাঝখানে পাত্র বেঁকে বসলো; বলেই বস্‌লো, "ও নষ্ট মেয়ে, ও-কে আমি বিয়ে করবো না", বলে বিয়ে থেকে উঠে যাচ্ছিল; এ কথা শুনে কনে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেল্‌লে; কুলপুরোহিতের চোখের ইসারায় পাত্রীর বাপ পাত্রের বাপের হাতে পাঁচশো টাকা গুঁজে দিতেই পাত্রের বাপ জোর করে পাত্রকে আবার বিয়েতে বসিয়ে দিলে; সকলেই তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলতে ব্যস্ত; কারণ, বাইরে গোলমাল ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে আর ঘন ঘন দরজায় ঘা পড়ছে আর ইট পড়ছে।

পুলিসের গোয়েন্দা সূত্রে খবর এসেছে যে, যে চারজনের ছবি দেওয়া হয়েছিল তাদের খুঁজে পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের বাড়ীর কয়েকজন ক'জন পুলিসের সঙ্গে সকৌতূহলে আজ সন্ধ্যেরাতের মেল ট্রেনে এ গ্রামে পৌঁছে গেছে; তারা অতি দ্রুত খুঁজতে খুঁজতে এ বাড়ীর সামনে এসে হাজির; গোলমাল দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেছে। গ্রামের কয়েকজন লোক ছবি দেখে সমর্থন জানালে যে, তারাই এই লোক, অতি গোপনে একটা বিয়ে হচ্ছে...। এখন আর কোন কথা ফিস্-ফিসানির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বিয়েটা যে একটা পাপ-কাজকে ঢাকা দেবার জন্যে অতি গোপনে সারা হচ্ছে—এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে; তাই হৈ হল্লোড় আর চীৎকারে [illegible]

আত্মীয়রা বাইরে থেকে চীৎকার করে তাদের আসল না[ম] ধরে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। আসল নাম ধরে ডাক শু[নে] মেয়ের বাপ আর কুলপুরোহিতের মুখ চুন হয়ে গেল— নিশ্চয়ই কোন আত্মীয়স্বজন খোঁজ পেয়ে এসে পড়েছে বিয়েটা শেষ করতে আর সামান্য বাকী আছে: তবু[ও] মেয়ের বাপ ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগ্‌লো, কুল পুরোহিতের হাত কাঁপতে লাগ্‌ল, গলার স্বর বন্ধ হ[য়ে] যেতে লাগ্‌লো, মন্ত্র উচ্চারণে ভুল হ'তে লাগ্‌লো, তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হ'তে লাগ্‌লো; মেয়ের মা ভয়ে জড়সড় হয়ে ভগবানের নাম জপতে লাগ্‌লো। এদিকে বাইরের লোকেরা সদর দরজায় ঘা মারতে মারতে দরজা ভেঙে ফেলেছে; তারা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লো; পুলিস আর মেয়ের উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের বাধা দিতেই তখন ব্যস্ত, তবুও ক্ষিপ্ত জনতাকে কিছুতেই রোখা যাচ্ছে না। তারা সকলে হৈ হৈ করতে করতে যে বন্ধঘরে বিয়ে হচ্ছে তার সাম্‌নে এসে দরজা খোলবার জন্যে দাবী জানাতে লাগ্‌লো আর শাসাতে লাগলো যে, অবিলম্বে দরজা না খুললে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে সকলকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। এদিকে ঘরের মধ্যে বিয়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর সামান্য বাকী আছে মাত্র, বাকীটা খুব দ্রুততার সঙ্গে শেষ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু দরজায় ঘা পড়া ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ঠিক যে মুহূর্ত্তে বিয়েটা শেষ হয়ে বর-কনে বাসর-ঘরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে যাবে, সেই মুহূর্ত্তে দরজা ভেঙে গেল; আর কুল-পুরোহিতও "কেল্লা ফতে" বলে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো; কুল-পুরোহিতের এই কাণ্ড দেখে সকলে হতভম্ব হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর কুল-পুরোহিত উপস্থিত সকলকে কনের কোষ্ঠীর ফল ছক কেটে দেখিয়ে দিলে যে, কনের বাল-বৈধব্যের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বাপ, মা, কুল-পুরোহিত ছাড়া কনে যাদের জানে তাদের কম-পক্ষে তিন মাস মুখ না দেখালে এবং তাদের সম্পূর্ণ অগোচরে ও আড়ালে বিয়েটা হলে বাল-বৈধব্যের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ কেটে যাবে; তাই এই বিয়ের ব্যাপারে এত গোপনতা, এত কাণ্ড।

তারপর তারা নতুন বরকে নিয়ে স্বগ্রামে ফিরে এল; সমস্ত গুজবের অবসান হ'ল; বিবাহোপলক্ষ্যে একটা [illegible]

"ভারতবর্ষ"-র পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি ঃ

সবিনয় নিবেদন,

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আগামী সংখ্যা থেকে একটি নতুন বিভাগ আপনাদের এই পত্রিকায় যোগ করা হচ্ছে। এই বিভাগটিকে পাঠক-পাঠিকাদের নিজস্ব বিভাগ রূপেই নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। কারণ, এই বিভাগটিতে পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের নিজেদের মতামত পত্রাকারে লিখে পাঠাতে পারবেন এবং তা প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হলে এই বিভাগে প্রকাশ করে লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হবে। যে কোনও বিষয়ের ওপরই সমালোচনা বা অভিমত জানান চলবে।

বিভাগটির নামকরণ করা হল—"**পত্রলেখা**"। পত্রাকারে এবং সংক্ষিপ্তাকারে আপনাদের বক্তব্য লিখে এবং পত্রের ওপর "**পত্রলেখা বিভাগ**" কথাটি লিখে সম্পাদকের নামে আমাদের পত্রিকা কার্য্যালয়ে পাঠাতে হবে।

আশা করি "ভারতবর্ষ"-র পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের সুচিন্তিত সমালোচনা ও মন্তব্য পত্রিকার পাতায় প্রকাশ করবার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করবেন না।

—বিনীত

সম্পাদক,

"ভারতবর্ষ"

ক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষ:

ইংল্যাণ্ড: ৫৫০ রান (৪ উইকেটে ডিক্লে:। জিওফ বয়কট নট আউট ২৪৬, বেসিল ডি' ওলিভেরা ১০৯, কেন ব্যারিংটন ৯৩ এবং টম গ্রেভনী ৫৯ রান। চন্দ্রশেখর ১২১ রানে ২ এবং সুব্রত ২৫ রানে ১ উইকেট)।

ও ১২৬ রান (৪ উইকেটে। কেন ব্যারিংটন ৪৬ রান। চন্দ্রশেখর ৫০ রানে ৩ এবং প্রসন্ন ৫৪ রানে ১ উইকেট)।

ভারতবর্ষ: ১৬৪ রান (পাতৌদি ৬৪, ইঞ্জিনিয়ার ৪২ এবং সুব্রত ২২ রান। রে ইলিংওয়ার্থ ৩১ রানে ৩, রবিন হবস ৪৫ রানে ৩ এবং জন স্নো ৩৪ রানে ২ উইকেট) ও ৫১০ রান (পাতৌদি ১৪৮, অজিত ওয়াদেকার ৯১, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ৮৭ এবং হনুমন্ত সিং ৭৩ রান। রে ইলিংওয়ার্থ ১০০ রানে ৪, ব্রায়ান ক্লোজ ৪৮ রানে ২ এবং জন স্নো ১০৮ রানে ২ উইকেট)।

হেডিংলে মাঠে (লিডস) অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষের নবম টেস্ট সিরিজের (১৯৬৭) প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৬ উইকেটে ভারতবর্ষকে পরাজিত করলেও ভারতবর্ষের এ পরাজয় অগৌরবের হয়নি। বিদেশের ক্রিকেট খেলার সমালোচকগণ এবং ক্রিকেট অনুরাগী মহল মুক্তকণ্ঠে ভারতবর্ষের খেলার প্রশংসা করেন। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৫০ রানের প্রত্যুত্তরে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৬৪ রান সংগ্রহ করে যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তাতে ইংল্যাণ্ডের থেকে ৩৮৬ রানের পিছনে পড়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসে যে দাঁড়াতে পারবে এমন বিশ্বাস কারও ছিল না। কি ভারতবর্ষ ফলো-অন ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৫ রান সংগ্রহ করেছিল—বিপুল সংখ্যক ৩৮৬ রানের পি পড়ে ৫০০ রান করার নজির টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দুল ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতৌদির নবাব ছিলেন এ টেস্ট খেলার নায়ক। তাঁর নির্ভীক দর্শনীয় ব্যাটিংয়ে ব্যক্তিগত ১৪৮ রান উঠেছিল এবং তাঁর খেলায় অনুপ্রে লাভ করে অজিত ওয়াদেকার ৯১, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার এবং হনুমন্ত সিং ৭৩ রান করেছিলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালের টেস্ট সি মাইক স্মিথ এবং কলিন্স, কাউড্রের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড যখন 'রাবার' হারায় তখন ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড় নির্বা মণ্ডলী কপাল ঠুকে শেষ পঞ্চম টেস্টে তাঁদের দীর্ঘদি বাতিল করা টেস্ট খেলোয়াড় ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রি দলের অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজকে শুধু দলভুক্তই ক না, তাঁর উপর ইংল্যাণ্ড দল পরিচালনার গুরু দায়িত্ব দিলেন। শেষ পর্যন্ত এই অধিনায়ক বদলে সুফল হ ব্রায়ান ক্লোজের নেতৃত্বেই ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে।

আলোচ্য প্রথম টেস্ট খেলায় তিনজন খেলে তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় হাতে নেন—ভারতবর্ষের সুব্রত গুহ ও রমেশ সাক্সেনা ইংল্যাণ্ডের রবিন হবস।

ইংল্যাণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম দিনের খেলায় উইকেট খুইয়ে ২৮১ রান সংগ্রহ করে। খুব মন্থরগা

রান উঠেছিল। জিওফ বয়কট দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা ব্যাট করে মাত্র ১০৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন—টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর এই তৃতীয় সেঞ্চুরী। দ্বিতীয় দিনে ৫৫০ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। বয়কট ২৪৬ রান, (বাউণ্ডারী ২৯টা এবং ওভার বাউণ্ডারী ১টা) করে অপরাজিত থেকে যান। তাঁর এই রানই ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্টে ইংল্যাণ্ডের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের এই ৫৫০ রান (৪ উইকেটে) ভারতবর্ষের বিপক্ষে লিডস মাঠে ইংল্যাণ্ডের এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮৬ রান সংগ্রহ করেছিল—ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের থেকে ৪৬৪ রান কম।

তৃতীয় দিন লাঞ্চের পর ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস মাত্র দশ মিনিট চলেছিল। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৬৪ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৩৮৬ রানের পিছনে পড়ে ফলো অন করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ২ উইকেটের বিনিময়ে ১৯৮ রান সংগ্রহ করে। ইঞ্জিনিয়ার এবং ওয়াদেকারের দ্বিতীয় উইকেট জুটির ১৬৮ রান—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৪৭৫ (৮ উইকেটে)। অধিনায়ক পাতৌদি ১২৯ রান (বাউণ্ডারী ১৩ এবং ওভার-বাউণ্ডারী ১) করে অপরাজিত থাকেন। ভারতবর্ষ ৮৯ রানে অগ্রগামী হয়। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে হনুমন্ত এবং পাতৌদি দলের ১৩৪ রান তুলেছিলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা পঞ্চাশ মিনিট চলেছিল। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৫১০ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ড খেলার বাকি সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১২৫ রানের জায়গায় ৪ উইকেট খুইয়ে ১২৬ রান তুলে ৬ উইকেটে জয়ী হয়। শেষ দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের দু'ঘণ্টা আগে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। লিডসে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ৫১০ রান—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেষ্টের এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের প্রথম ৫০০ রান। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৫০ রান (৪ উইকেটে ডিক্লে:)—ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ইংল্যাণ্ডের পঞ্চমবার পাঁচশত রান করার নজির।

দ্বিতীয় টেষ্ট :—

ভারতবর্ষ :—১৫২ রান (অজিত ওয়াদেকার ৫৭ রান। ব্রাউন ৬১ রানে৩, স্নো ৪৯ রানে ৩ এবং ডি' ওলিভেরা ৩৮ রানে ২ উইকেট)

ও ১১০ রান (কুন্দরন ৪৭ এবং ওয়াদেকার ১৯ রান। ইলিংওয়ার্থ ২৯ রানে ৬ এবং ক্লোজ ২৮ রানে ২ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড :—৩৮৬ রান (ব্যারিংটন ৯৭ এবং গ্রেভনী ১৫১ রান। চন্দ্রশেখর ১২৭ রানে ৫ এবং বেদী ৬৮ রানে ৩ উইকেট)।

বিশ্ববিশ্রুত লর্ডস ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ১২৪ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে ১৯৬৭ সালের টেষ্ট সিরিজে (ইংল্যাণ্ড—ভারতবর্ষের ৯ম টেষ্ট সিরিজ) 'রাবার' জয়ী হয়েছে। সুতরাং এই সিরিজের শেষ তৃতীয় টেষ্ট খেলার ফলাফল নিয়ে তাদের খুব বেশী মাথা ব্যথা নেই। লিডসের প্রথম টেষ্টে ভারতবর্ষ যেমন দৃঢ়তা এবং অনবদ্য ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছিল লর্ডসের দ্বিতীয় টেষ্টে তেমনি শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এখন ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মহলে পাঁচদিনব্যাপী টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।

ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ লাভ করেও ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। প্রথম দিনের মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টার খেলায় ১৫২ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ড বাকি সময়ের খেলায় দুটো উইকেট খুইয়ে ১০৭ রান সংগ্রহ করে। ইংল্যাণ্ডের উইকেটকিপার জন মারে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে ৬টা 'ক্যাচ' নিলে টেষ্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক ক্যাচ (৬টি) নেওয়ার বিশ্ব রেকর্ডকে ধরে ফেলেন। তাঁর আগে এই বিশ্ব রেকর্ড

করেন অষ্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার ওয়ালী গ্রাউট (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯৫৭-৫৮) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার ডেনিস লিণ্ডসে (বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, জোহানেসবার্গ, ১৯৬৭)।

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির ফলে পুরো সময় খেলা হয়নি। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৫২ (৩ উইকেটে)। তৃতীয় দিনে ৩৮৬ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। বৃষ্টির দরুণ ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামেনি। চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলার সূচনা করে। চা-পা'নের নির্দ্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা আগে মাত্র ১১০ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাং হয়ে যায়।

ফেডারেশন কাপ :—

মহিলাদের দলগত পঞ্চম বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিত ফাইনালে আমেরিকা ৩—০ খেলায় ইংল্যাণ্ডকে পরাজি ক'রে উপর্যুপরি দু'বছর এবং সেই সূত্রে মোট তিন ফেডারেশন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে। প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৬৩ সাল থেকে ফেডারে কাপ জয়ী হয়েছে মাত্র দুটি দেশ—আমেরি ৩ বার (১৯৬৩, ১৯৬৬-৬৭) এবং অষ্ট্রেলিয়া ২ (১৯৬৪-৬৫)।
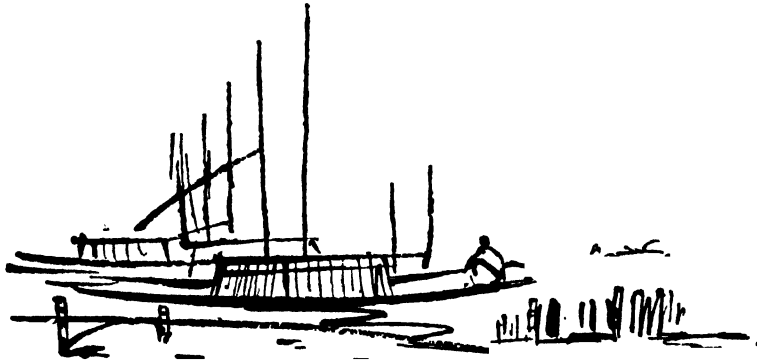
সম্পাদকদ্বয়—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে এসেছে জটিলতা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বেধেছে সংঘাত—শুধু তাই নয়, মানুষের দেহে এবং সজ্ঞান ও নিঃজ্ঞান মনেও তারই স্পর্শ। এই সংঘাতের আলেখ্য—**বিবস্ত্র মানব**।

সভ্যতার কৃত্রিমতার চাপে ঘটেছে সভ্যমানুষের মনোবিকার বিকৃত মন নিয়ে দেখি জগৎ। আপন মনের রঙীন কাঁচে চশমা দিয়ে বিচার করি মানুষকে। এই রঙীন চশমা খুলে নিলে মানুষের যে বিবস্ত্র মন দেখা যায়—সেই মনের সংঘাত-মুখর এই উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যে নিঃজ্ঞান মনস্তত্ত্বের উপর লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নূতন কলেবরে নূতন অঙ্গ-সজ্জায় চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে। দাম—৫'৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

খ্যাতিমান কথাশিল্পী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

সার্থক গল্পের সংকলন

রূপান্তর বলেন ঃ

লেখক ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্যের এমন একটি বলিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছেন যে তাঁর গল্প সেই বলিষ্ঠতার জোরেই বাংলা কথাশিল্পের ক্ষেত্রে আপনার যোগ্য স্থানটি অধিকার করে নিয়েছে।

এমনশক্তিশালী ছোট গল্প লেখকের কাছ থেকে আমরা ঠিক যে জিনিসটি আশা করি তিনি ঠিক সেই জিনিসটিই তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে আমাদের দিয়েছেন। বঞ্চিত নর-নারীর প্রতি তাঁর এই যে মমতা—এ ভঙ্গিমাত্র নয়, এ তাঁর স্বভাবজ ধর্ম এবং এই ধর্মকে তিনি সাহিত্য-ধর্মে রূপায়িত করেছেন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁর গল্পে কোথাও ফাঁকি নেই, কারণ তাঁর দৃষ্টিতে কোথাও ফাঁকি নেই। স্বপ্নমঞ্জরীর প্রত্যেকটি গল্পই তাঁর অন্যান্য গল্পের মতোই ভাল লাগবে। দাম : তিন টাকা।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

এক জীবন অনেক জন্ম

একই জীবনে জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ আনে যে ব্যাপক প্রেম, মৃত্যুর অন্ধকারকে যা' জীবনের দীপ্তিতে রূপান্তরিত করে, তারই মর্মস্পর্শী বিন্যাস। পথের আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রেমাংশুর অকাল প্রয়াণ দীপার জীবন ম্লান, রুক্ষ ও কঠিন ক'রে তুলেছিল—অনেক 'পরে মৃন্ময়ের আবির্ভাব—মৃত্যুর অন্ধকার ছিন্ন-ভিন্ন করে যে অসামান্য আলোয় দীপার জীবন পূর্ণ ও সার্থক ক'রে তুলল, সেই অসামান্য আলোর চিরন্তন প্রেমের অপরূপ কাহিনী।

দাম—৬'৫০

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত

— জ্যোতিষ গ্রন্থরাজি —

পারাশরীয় সুশ্লোক-শতকম্

প্রায় বিশ বছর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ আবার প্রকাশিত হ'ল। জ্যোতি-বাচস্পতি মহাশয়ের টীকাসহ এই সংস্কৃত গ্রন্থখানি বিংশোত্তরীদশা বিচারের অমূল্য সম্পদ। ইহার সহিত "রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটস্" শীর্ষক তুলনামূলক বিচার সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী জহরলাল, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষীর জন্মকুণ্ডলী দেওয়া হয়েছে।

দাম—চার টাকা

— অন্যান্য গ্রন্থ —

কোষ্ঠী-দেখা ৫৲ হাত-দেখা ৪৲

মাসফল ৩৲ হাতের রেখা ৩৲ লগ্নফল ২৲

রাশিফল ৩৲ সরল জ্যোতিষ ৪৲

ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র ৪৲

"নৃত্যের তালে তালে"   শিল্পী : গৌর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

শ্রাবণ—১৩৭৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সন্ন্যাস-ধর্মের বৈদিক উৎস

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সন্ন্যাসধর্ম প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টির অবদান। সিন্ধু সভ্যতার একটি নিদর্শনে পশুপতি ও যোগী হিসেবে শিবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাই কোন পণ্ডিতের ধারণা সিন্ধু উপত্যকায় ইন্দো-আর্যবহির্ভূত সমাজে যোগ সাধনার আকারে তপস্যা বা সন্ন্যাস-ধর্মের প্রথম আবির্ভাব। ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি প্রকৃতির মাঝে আর্যদের সহজ-সরল আনন্দ-উচ্ছল জীবনের প্রতিচ্ছবি, স্তবগুলিতে তাঁদের জীবনের আশার আলোক ফুটে উঠে। তাই জীবনের যে বিষাদ ও নৈরাশ্যের সুর থেকে সন্ন্যাসের জন্ম, তা ঋগ্‌বেদের আমলে অন্তত প্রথম পর্যায়ে আর্যদের জীবনে রেখাপাত করেনি বলে মনে হয়। সূক্ত-গুলিতে তপঃ শব্দের ব্যবহার ক্বচিৎ দেখা যায়। ঋগ্‌বেদের দেবতারা ছিলেন মুক্তহস্ত, তাঁদের খুশি করতে জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হত না। তপস্যার প্রত্যয় আর্যদের জীবনে যে পরে গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মিলে 'তপিষ্ঠেন ইন্মনা (ঋক্ ৭. ৫৯. ৪)-তে। পারিভাষিক অর্থে তপঃ-শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদের শেষের দিকে রচিত ১০ম মণ্ডলে (১০. ৮৩. ২; তপস্বৎ-১০. ১৫৪. ৪ এবং 'তপোজ' ১০. ১৫৪. ৫)। তাই আদিম অধিবাসীদের তপস্যার আদর্শ পরবর্তী

যুগে আর্যদের জীবনে গৃহীত হয়েছিল মনে করলে অন্যায় হবে কি? বৈদিক সভ্যতায় ঋষিদের অবদান কম নয়। এখন প্রশ্ন সন্ন্যাস ধর্ম কিভাবে তাঁদের জীবনে দানা বেঁধে উঠল।

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে পাই ত্রিবর্গের সুরের প্রাধান্য আর শেষের দিকে মোক্ষ সাধনার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যক্তি বিশেষের জীবন ও আচরণকে রূপায়িত করার আদর্শ নিয়ে সন্ন্যাস-ধর্মের প্রসার। ক্রমশঃ দেহের কৃচ্ছ্রসাধন, ধর্মভিত্তিক সংযম এবং সর্বস্বত্যাগ, কামনার বিলোপ ইত্যাদি সন্ন্যাস-ধর্মের মূল সুর হয়ে উঠল। যাগ যজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠান যেমন প্রার্থনায়, সন্ন্যাস ধর্ম ও সংযম তেমনই মানুষের উচ্চ চিন্তার অনুগামী অত্যাবশ্যক সামগ্রী। প্রাক্-উপনিষদ্ সাহিত্যে 'আশ্রম' কথাটি বিরল। তবে ঋগ্বেদের সূক্তে "ব্রহ্মচারী" (১০. ১০৯. ৫), 'গৃহপতি' (৬. ৫৩. ২) এবং 'মুনি' (১০. ১৩৬)-শব্দের প্রয়োগ পাই, এইসব শব্দ পরবর্তী যুগে বিভিন্ন আশ্রমের সূচনা করে। ঋগ্বেদের একটি (১০. ১০৯. ৪) সূক্ত উদ্ধৃত করা যাক—

"দেবা এতস্যামবদন্ত পূর্বে সপ্ত ঋষয়স্তপসে যে নিষেদুঃ।
ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্যোপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্॥

চিরন্তন (আদিত্য) প্রভৃতি দেবতারা ইঁহার (জুহূ) বিষয়ে বললেন—(ইনি পাপরহিতা)। যে সপ্ত ঋষি তপস্যার জন্য উপবেশন করেছিলেন, (তাঁরাও বললেন) (দেবগণ কর্তৃক) ভয়ংকরী স্ত্রী বৃহস্পতির নিকট উপনীত হলেন। (তপস্যার প্রভাব এমন যে) যাহা ধারণ করা শক্ত তাহাকেও উত্তম স্থানে ধারণ করে। (সায়ণভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ)।

এই সূক্তে সাতটি ঋষির পরিচয় মিলে। তাঁরা তপস্যার দ্বারা সত্য দর্শন করেন। তপঃ শব্দে এক-প্রকার তাপ বোঝায়, যা দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ থেকে জন্মে। ঋষিরা অন্তরের কামনাকে দমন করে অদ্ভুত শক্তি সঞ্চয় করতে গিয়ে এই রকম ক্লেশ সহ্য করতেন। আর একটি সূক্তে (১০, ১৩৬) আমরা 'মুনি'দের কথা শুনতে পাই :—

"মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা।
বাতস্যানু ধ্রাজিম্ যন্তি যদ্ দেবাসো অবিক্ষত॥ (২)
উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতাঁ আ তস্থিমা বয়ম্।
শরীরেদস্মাকং যূয়ং মর্তাসো অভিপশ্যথ॥ (৩)

(বাতরশন মুনিগণ কপিলবর্ণ মলিন বসন পরিধান করেন। যখন (তপঃ প্রভাবে) ইঁহারা উজ্জ্বল হয়ে দেবতা স্বরূপে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁরা বায়ুর গতির অনুধাবন করেন। মুনিভাবে উন্মত্ত (বা অতিশয় আনন্দিত) হয়ে আমরা বায়ুতে অবস্থান করছি, হে মনুষ্যগণ, তোমরা আমাদের (কেবল) শরীরটাকেই দেখতে পাচ্ছ। (আমাদিগকে নয়, যেহেতু আমরা বায়ুর সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্ত)। এইসব মুনি ছিলেন 'বাতরশন', হলুদ রংয়ের ময়লা কাপড় পরতেন, তাঁরা চলমান বায়ুর অনুধাবন করতেন, আর দেবতার পদ-মর্যাদা লাভ করতেন। সায়ণাচার্য-এর মতে বাতরশন একটি ঋষির নাম আর এই সূক্তের 'বাতরশনা', বলতে সেই ঋষির পুত্রদিগকে বোঝায়। কিন্তু 'বাতরশনা' : পদটাকে 'মুনয়ঃ' এর বিশেষণ হিসেবে নিলে (বাত অর্থাৎ বাতাস যাঁর রশনা বা কটিবন্ধ) 'নগ্ন'-অর্থ প্রকাশ করে। গতিশীল বায়ুর অনুধাবনকারী বলে বর্ণিত মুনিদের প্রসঙ্গে 'নগ্ন' অর্থটাই আরও সঙ্গত বলে ধরা যেতে পারে। তাছাড়া, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (২. ৭)-ও 'বাতরশন'-শব্দটি এমন স্তরের ঋষিদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যাঁরা ছিলেন শ্রমণ ও ঊর্ধ্বমন্থী। এই আরণ্যকে অন্যত্র (১. ২৩) বাতরশনদের উৎপত্তির বর্ণনা থেকে জানা যায় "প্রজাপতির দেহের মাংস থেকে তিনরকম ঋষি বের হলেন, অরুণ, কেতু আর বাতরশন, আর নখ ও কেশ থেকে যথাক্রমে এলেন বৈখানস ও বালখিল্য। এখানে প্রজাপতির তপস্যা ও তার ফলের পরিচয় পাই। তাই ঋগ্বেদের যুগে নগ্ন বিচরমাণ মুনিদের অর্থে 'বাতরশন' পদটিকে ধরলে কি অন্যায় হবে? সূক্তে উক্ত মুনিদের বর্ণনা প্রসঙ্গে জানা যায় যে তাঁরা উচ্চ পর্যায়ের যে সুখভোগ করতেন (উন্মদতা) তা তপস্যারই ফল (মৌনেয়েন) এবং যখন তাঁরা বায়ুর পদ মর্যাদা পেতেন তাঁরা আকাশে উড়তে পারতেন ('বাতাঁ আ তস্থিমা" এবং অন্তরীক্ষেণ পতভি") এবং সব দেবতারই বন্ধুত্ব লাভ করতেন ("দেবস্য দেবস্য সখা" 'বায়োঃ সখা'—১০. ১৩৬. ৪-৫)। বায়ু

ছিল দেবকল্প ঋষিদের একমাত্র খাদ্য ("বাতস্যাশ্বো", "দেবেষিতো মুনিঃ"—ঐ, ৫)। তাঁদের "কেশী"-ও বলা হয়েছে (ঐ, ৬) খুব সম্ভব লম্বা চুলের জন্য। পরের যুগে সাধু সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব দীর্ঘকেশ আর মলিন পীতবসন। তপঃ প্রভাবে তাঁরা সব কিছু জানতেন ("কেতস্য বিদ্বান্") আর অলৌকিক আনন্দ রসের অধিকারী হতেন ("স্বাদুঃ") যাতে তাঁরা মাধুর্যগুণে সকলের চিত্তে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারতেন (মদিন্তমঃ ঐ ৬)। তপঃ প্রভাবে মুনি পূর্ব ও অপর সমুদ্রে যেতে পারতেন ("উভৌ সমুদ্রাবা ক্ষেতি যশ্চ পূর্বে উতাপরঃ"—ঐ, ৫)। আর একটি ঋক্-ও (১০. ১৩৬. ১) প্রণিধানযোগ্য।—

"কেশ্যাগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী।

কেশী বিশ্বং সদৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে॥" (১)

(কেশী অর্থাৎ রশ্মিযুক্ত সূর্য অগ্নিকে ধারণ করেন, উদক ও দ্যাব্যা পৃথিবীকে ধারণ করেন, সমগ্র জগৎকে দর্শনের জন্য প্রকাশ করেন, এই (মণ্ডলস্থ) জ্যোতিকেই কেশী বলা হয়।) সায়ণাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন—"কেশাঃ কেশস্থানীয়া রশ্ময়ঃ তদ্বন্তঃ কেশিনঃ অগ্নির্বায়ুঃ সূর্যশ্চ এতে ত্রয়ঃ সূয়ন্তে। "কেশী" বলতে তিনি মনে করেন এমন তপস্বী যিনি তপোবলে রশ্মিযুক্ত অগ্নি বায়ু বা সূর্যের সহিত একাত্ম হন। ম্যাক্‌ডোনেল ও কীথ অবশ্য সায়ণের ভাষ্য বাতিল ক'রে 'দীর্ঘকেশযুক্ত "অর্থ সঙ্গত মনে করেন। (Index to Vadic names, under Muni, fn।) আয়েঙ্গার মহোদয়ও একই মত পোষণ করেন। কিন্তু "কেশী বিষস্য পাত্রেণ যৎ রুদ্রেণাপিবৎ সহ" ঋক্‌টির কেশী শব্দে মুনির চেয়ে সূর্যের অর্থ আরও সঙ্গত বলে মনে হয়।

আর 'মৌনেয় উন্মাদ' (১০. ১৩৬. ৩) অংশে যে অলৌকিক আনন্দ ধ্বনিত হয় তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে সেই সব বৈদিক আর্যদের আনন্দধারাকে যখন তাঁরা সোমরস পান করে অমর হতেন এবং দেবতাদের দর্শন পেতেন। আলবার্ট শোইট্‌স্‌জার এই ঋকের তাৎপর্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন—"এই সব সূক্তে এমন মানুষের সন্ধান পাই যাঁরা মনে করতেন ইহ জগতের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েছেন তাঁরা শ্রমণ ও চিকিৎসক (পরে বলা হয় যোগী), তাঁরা অপূর্ব আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন সোমরস পান করে, দেহের কৃচ্ছ্রতা সাধনে এবং স্বয়ংসিদ্ধ কৃত্রিম নিদ্রায়। তাঁরা নিজেদের এমন সত্তা বলে মনে করেন যে দেবতারা যেন তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁরা অতি-প্রাকৃত শক্তির অধিকারী হয়েছেন। ইহ জগতের ঊর্ধ্বে আনন্দ বা রসের অপূর্বলোকে অবস্থিতির চেতনাই ভারতের সন্ন্যাস-ধর্মের মূল উপাদান।" (Indian thought and its development p 22).

তাছাড়া, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (২. ৭) বাতরশনাঃ মুনিদের সংপর্কে 'শ্রমণ' ও উর্ধ্বমন্থিন্' বলা হয়েছে। 'শ্রমণ' শব্দটি শ্রম্-ধাতুজ; সত্যের সন্ধানে কঠোর পরিশ্রমী সাধককে বোঝায় আর 'উর্ধ্বমন্থিন্' বলতে সায়ণ মনে করেন 'উর্ধ্বরেতা', যাঁর বীর্য সর্বদা উর্ধ্বগামী। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রাচীন যুগের মুনিরা যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতেন। কোন সুধী মনে করেন 'উর্ধ্বমন্থিন্'-শব্দের অর্থ যাঁর (পুং) জননেন্দ্রিয় উর্ধ্বস্থিত কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ইন্দ্রিয়দমনের শক্তি অটুট। ডি, আর, ভাণ্ডারকর মহোদয় ঐ রকম জননেন্দ্রিয়যুক্ত পাশুপত সম্প্রদায়ের অধিদেবতা 'লকুলীশ' মূর্তিতে শিবের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (Some aspects of Ancient Indian culture, pp. 43-45).

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (১৭. ৪. ১) কোন কোন ব্রাত্যকে 'শম-নীচামেঢ্র' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁদের জননেন্দ্রিয় জিতেন্দ্রিয়তার বলে সর্বদা নীচু থাকে। এঁরা খুব সম্ভব সাধারণ ইন্দ্রিয়ক্ষুধাকে জয় করতে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করতেন। অবশ্য ব্রাত্যদের কথা প্রথম শুনতে পাই অথর্ববেদে (১৫. ১.)। এরা তপস্যা করতেন, কখন সর্বব্যাপী দেবতার গুণসম্পন্ন অতিপ্রাকৃত সত্তা আবার কখন খাদ্য ও বাসস্থানের সন্ধানে পরিব্রাজক মানুষ। উক্ত মন্ত্রটিতে ব্রাত্যদের মনুষ্যধর্মের পরিচয় মিলে। ব্রাত্য পরিব্রাজক (আসীদীয়মান; ১৫. ১. ১) "স বিশোঽনুব্যচলৎ, তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ সুরা চানুব্যচলন্ (১৫. ১. ৯) অর্থাৎ সে জনগণের কাছে, সভা-সমিতিতে যায়, সেনা ও সুরা তার পিছনে

চলে, যেখানে যায়, সেখানেই সে রাজার সমাদর পায় অগ্নি-উপাসকের আতিথ্য নেয়, কেননা তার অনুমতি নিয়ে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হত (১৫. ১২)। এর থেকে রথ (Roth) মহোদয় (সেন্টপিটার্সবার্গ অভিধান) অনুমান করেছেন যে অথর্ববেদের ব্রাত্য ছিলেন সতত সঞ্চরমাণ পরিব্রাজক। তিনি সারা বছর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন (১৫. ৩. ১), সাতটি প্রাণ, সাতটি অপান এবং সাতটি ব্যান-এর অধিকারী (১৫. ১. ১৫)। ভাণ্ডারকরের যুক্তি এই যে ব্রাত্যরা মোটামুটি দুজাতের: (১) যারা নীচু জননেন্দ্রিয়চিহ্নিত নগ্নদেবতার পূজারী (যেমন গুড়িমল্লম-মূর্তি) আর (২) যারা উপাসনা করেন লকুলীশ-এর মত ঊর্ধ্ব-জননেন্দ্রিয়যুক্ত দেবতার, যার নমুনা পরিলক্ষিত হয় মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত লীল-কবচে। ২. ১৭ সংখ্যক প্লেটে প্রদর্শিত লীলের দেবতা ঐতিহাসিক দেবতা শিবের প্রতিমূর্তি, যেহেতু তাঁর তিনটি মুখ, যোগাসনে আসীন এবং ঊর্ধ্ব-মেঢ্র সুস্পষ্ট দৃশ্যমান। (Some Aspects of Anc. Ind. Cult. p 41) মহাভারতে (১৩. ১৭. ৪৬)-ও শিবকে 'ঊর্ধ্বলিঙ্গ' বলা হয়েছে এবং প্রাচ্যভারতের অনেক মন্দিরে অঙ্কিত আছে এই মূর্তি। তাই ইহা অসম্ভব না হতেও পারে যে 'বাতরশনা' ঋষি বা মুনিরা (ঊর্ধ্বমন্থিন্ ইত্যাদি বলে পূর্বে প্রদর্শিত) যোগ-প্রক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাই তাঁরা জননেন্দ্রিয় উঁচু থাকা সত্ত্বেও কোন উত্তেজনা বোধ করতেন না।

অন্য একটি ঋকে (৭. ৫৬. ৮) দীর্ঘকেশী "মুনি" আগুন, আর্দ্রতা, স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করেন আর জ্যোতিষ্মান্ বলে বর্ণিত হয়েছে। (৮. ৩. ৫ ঋকে ইন্দ্রকে মুনিদের সখা বলা হয়েছে)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬. ৩৩. ৩) ঐতশ মুনির প্রলাপের কথা শুনি। ঐতশ মুনির প্রলাপ অনেকটা ঋগ্‌বেদের মুনিরই প্রতিচ্ছবি, কেননা পূর্বদর্শিত মন্ত্রের ('উন্মদিতা মৌনেয়েন') সায়ণ ভাষ্য করেছেন—"যে মুনি উন্মত্তের মত আচরণ করেন।"

অথর্ববেদে (৭. ৭৪. ১)-ও 'দেব-মুনি'র উল্লেখ আছে। ইনিও তপস্যার দ্বারা অদ্ভুত শক্তির অধিকারী। কীথ বৈদিকযুগের প্রথমদিকের ও শেষদিকের মুনির মধ্যে বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করেন না, উভয়েই এক অদ্ভুত উল্লাস অনুভব করতেন তবে প্রথম অবস্থায় মুনির মধ্যে ঋষির চেয়ে চিকিৎসকের শক্তির বেশী পরিচয় মিলে, আর উপনিষদযুগে মুনির আদর্শে পার্থিব শক্তির হ্রাস হয়েছে বলে মনে হয়। ঋগ্‌বেদে 'মুনি'র উল্লেখ কম থাকায় মনে করা চলে না যে বৈদিকযুগে মুনির সংখ্যা কম ছিল, কেননা এটাও হতে পারে যে যেহেতু মুনিদের সাথে পুরোহিতদের আদর্শগত পার্থক্য ছিল, মুনিরা পুত্রের আকাঙ্ক্ষা, দক্ষিণা ইত্যাদি বিষয় নিস্পৃহ ছিলেন আর পুরোহিতেরা এইসব বেশী করে চাইতেন, তাই পুরোহিতদের সমর্থন থেকে মুনিরা সর্বদা বঞ্চিত হতেন। (Vedic Index, Vol. II, P. 167.)

এবার যতিদের কথা আলোচনা করা যাক। ঋগ্‌বেদের দুটি মন্ত্র উদ্ধৃত করি। "যেনা যতিভ্যো ভৃগবে ধনে হিতে যেন প্রস্কণ্বমাবিথ।" (হে ইন্দ্র সেই সুবীর্য চাই যা যতিদের কাছ থেকে নিয়ে ভৃগুকে দিয়েছ।—৮. ১. ৩. ৯ এবং "যইন্দ্র যতয়স্ত্বা ভৃগবো যে চ তুষ্টুবুঃ। মমেদুগ্র শ্রুধী হবম্" (৮. ২. ৬. ১৮)—(যতিরা ও ভৃগুরা ইন্দ্রের স্তব করেছিলেন, এর থেকে জানা যায় যে ভৃগুদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ একটি প্রাচীন গোষ্ঠীর নাম যতি। এরা বাস্তব জগতের মানুষ বলে মনে হয়। অন্য একটি ঋকে (১০, ৬, ৭২, ৭) বর্ণিত যতিদের কাল্পনিক ধরা যেতে পারে। "যদ্ দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত" মন্ত্রে দেবতাদের মত যতিরা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন বলা হয়েছে। ভাণ্ডারকর মুনি ও যতিদের পার্থক্যের কথা বলেন। মুনিরা ইন্দ্রের সখা। ("ইন্দ্রো মুনীনাং সখা," ৮. ১৭. ১৪) আর যতিরা ইন্দ্রের শত্রু। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬. ২. ৭. ৫)-য় বলা হয়েছে—"ইন্দ্র যতিদের সালাবৃকদের (বুনো শিয়াল) হাতে দান করেন, তাঁদের তাঁরা উচ্চ বেদীতেই খেয়ে ফেলেন।" এবং "তাঁরা তাঁদের শত্রু অসুরদিগকে পরাস্ত করেন।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৭. ২৮. ১) একই কথা "(ইন্দ্রঃ) বৃত্রমহন্ত, যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রাদাৎ"। অথর্ববেদের (২. ৩. হুইটনি-কৃত অনুবাদ, পৃঃ ৪৪) মন্ত্রটির "ইন্দ্রস্তুরাষান্ মিত্রো ন জঘান বৃত্রং যতি র্ন" "যতীন্ ন" ভাবেও পাঠান্তর হতে পারে। সায়ণ "যতি"

সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন—'আসুর্যঃ প্রজাঃ", পরে বলেছেন "পরিব্রাজকাঃ" (যতির্ন, যতয়ো নাম নিয়মশীলা আসুর্যঃ প্রজাঃ তা ইব।...যদ্ বাত্র যতিশব্দেন বেদান্তার্থ-বিচারশূন্যাঃ পরিব্রাজকা বিবক্ষিতাঃ তানিব)। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (১০. ১৪. ৪. ৭) উল্লেখ করে যে 'মুনিমরণ' নামক স্থানে অসুরগণ কর্তৃক নিহত বৈখানসকে ইন্দ্র পুনর্জীবিত করেন। এতে বোঝা যায় যে বৈখানসরা মুনিদের মত ইন্দ্রের মিত্র ছিলেন, তাই তাঁরা অসুরদের অত্যাচার থেকে ইন্দ্র কর্তৃক পরিত্রাত হন। উক্ত ব্রাহ্মণে অন্য জায়গায় (৮. ১. ৪) জানা যায় যে ইন্দ্রের হাতে হত্যা থেকে যে তিনজন যতি রক্ষা পান, বৃহদ্গিরি তাঁদের অন্যতম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের গল্পে (৭. ২৮) লেখা হয়েছে যে ইন্দ্র যতি হত্যার অপরাধে দেবতাদের সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তাঁদের সাথে সোমপানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাই যতিরা কোন কারণে ইন্দ্রের কোপে পড়েন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ডাঃ ভাণ্ডারকরের যুক্তি এই যে "সম্ভবত যতিরা অসুর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইন্দ্রের পূজা করতেন না।" (পৃঃ. ১৮—ঐ)

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রাক্ আর্যযুগে ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে তপস্যা বা যোগের রীতি প্রচলিত ছিল। ইহা সত্য বলে গৃহীত হলে যতিদের উদ্ভব সেখানেই তা সহজে অনুমেয়। মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কানে মহাশয়ও বলেন—"এমনকি ঋগ্বেদের আমলে দারিদ্র্য, ধ্যান-তন্ময়তা ও কৃচ্ছ্রসাধনার জন্য বিখ্যাত এক স্তরের লোক 'মুনি' বলে পরিচিত ও পূজিত হতেন এবং অ-বৈদিক সমাজে সমপর্যায়ের লোকদের সম্ভবত 'যতি' বলা হত। (পৃঃ ৪১৮—১৯).

কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে 'যতি' বলতে কী বোঝায় তা বলা কঠিন। যম্ ধাতুনিষ্পন্ন এই শব্দটি, যম্ ধাতুর অর্থ সংযত করা, তাই ঋগ্বেদের আমলে ইন্দো-আর্য সমাজে এমন কতক তপস্বী বা সন্ন্যাসীকে বুঝাতে এর ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে যারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিরক্ত, স্বাধীন মতাবলম্বী ছিল বলে ইন্দ্রের কোপে পড়েন। অবশ্য কীথের অভিমত এই যে "ভৃগুদের সহিত সংপর্কহেতু যতিদের সহিত ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল।" (Religion and philosophy, II, P. 226). সামবেদেও (২. ৩০৪) উল্লেখ আছে যে যতিরা ভৃগুর সহচর। ব্রাহ্মণে ভৃগু বরুণের পুত্র বলে বর্ণিত। তাই ইহা অসম্ভব না হতেও পারে যে ভৃগু সহচর যতিরা ছিলেন ইন্দো-আর্যগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হর দত্ত শর্মার মন্তব্যটি অনুধাবনযোগ্য—ঋগ্বেদের "বাতরশনরা" পরে আরণ্যকের যুগে "শ্রমণ" উপাধি ধারণ করেন, তাঁরা গোঁড়া বৈদিক ধর্ম থেকে প্রথমে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরাই ইন্দ্র কর্তৃক নিহত যতিদের পর্যায়ে পড়ে।...এই শ্রমণই আবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (৬. ২১) 'অত্যাশ্রমী'।...... খুব সম্ভব বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে প্রাচীন তিনটি আশ্রমকে বাড়িয়ে এইসব ভিন্ন মতাবলম্বীদের স্থান সংকুলানের জন্য চতুর্থ আশ্রমের উদ্ভব হয়, যেহেতু এঁরা বেদ অধ্যয়ন করতেন না, বৈদিক যাগযজ্ঞে বিশ্বাসী ছিলেন না। পরের যুগে এঁদের জীবন আচার-আচরণে নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং আরো পরে এমনকি বৈদিক ক্রিয়াকর্ম তাঁদের উপর চাপান হয়। (History of Brahmanical Asaticism, Har dutta Shorma, Poona Oriental, vol. III, No. 4, Janu. 1939)

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণপর্বে সন্ন্যাসদের উপর্যুক্ত উল্লেখ ছাড়াও বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪. ৩. ২২) এবং পাণিনির ব্যাকরণে (৪, ৩, ১০০) ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের সন্ধান মিলে। যদিও প্রাচীনতম উপনিষদে সন্ন্যাসকে চতুর্থ আশ্রম বলে সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকার করে না, তবু দয়সেন তাঁর "উপনিষদ্" গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেন যে পরবর্তী উপনিষদ্গুলিতে আশ্রমবাদ আত্মপ্রকাশ করে, বিশেষত ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রগুলিতে। ডঃ সুকুমার দত্ত বলেন—"বৈদিক আর্যসমাজে সন্ন্যাসের প্রশ্নই উঠে না, সন্ন্যাসী হতে হলে শিখা ও উপবীত ধারণ, যাগ ও বেদাধ্যায়ন ইত্যাদি আর্যচিহ্ন প্রথমে ত্যাগ করতে হত; তাই আর্য-কৃষ্টির বহির্ভূত কোন পরিবেশে পরিব্রাজকের আবির্ভাব ঘটেছিল।" কিন্তু আর্যচিহ্নত্যাগকে ত্যাগধর্মের অঙ্গ বলে ধরা যেতে পারে, আর ত্যাগের বৃত্তিই ছিল

থাকে না, ভালোবেসে শেখাও ভালোবাসা কাকে বলে··· ঠাকুর···ঠাকুর···ঠাকুর···

(বলতে বলতে মাথা নুয়ে পড়ে··কথা জড়িয়ে আসে) আমি ঠাকুর···তুমি···তু···

(সমাধিতে দেহ স্থির শুধু চোখের কোণে প্রেমাশ্রু) সকলে হাত জোড় করে মাথা নিচু করে। তারা ও ললিতা চোখে আঁচল দেয়। ডাক্তারবাবু দণ্ডবৎ করেন।

ঠিক এই সময়ে মহেন্দ্রবাবু ঘরে ঢুকেই "ও!" বলে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকেন একদৃষ্টে। প্রণব উঠে চেয়ার এগিয়ে দেয় মা-র ঠিক পাশেই। মহেন্দ্রবাবু বসেন। ওরা সবাই একে একে তাঁকে প্রণাম করে।

ছয়

মহেন্দ্রবাবু (অসিতকে মৃদুস্বরে) কখন এলেন ?

অসিত : আমাকে আপনি বলবেন না।

মা আমাকে যেমন তুমি বলেন আপনিও তেমনি তুমিই বলবেন।

মহেন্দ্রবাবু (প্রসন্ন) : আচ্ছা আচ্ছা। পাশের ঘর থেকে শুনেছি তোমার গান।

ললিতা : সে কি বাবা ? এলে না কেন ?

মহেন্দ্রবাবু : ডাক্তার হয়ে হাজার পুণ্য সঞ্চয় করে থাকি না কেন, ভজনের রসভঙ্গ করলে সে পাপের দায়ে সব পুণ্য মজবার ভয় আছে তো ?

প্রণব (হেসে) আপনার মতন মহাযোগীর পাপ ?

কবে শুনব—মা বলছেন তাঁকেও গঙ্গাস্নান করে তবে নির্মল হতে হবে।

মহেন্দ্রবাবু : প্রথম কথা, আমি মহাযোগী—এটা নিছক গুজব। দ্বিতীয় কথা : শঙ্করাচার্যের মতন মহাত্মাকেও গাইতে শোনা গেছে : "রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্"—আমার রোগ শোক পাপ তাপ সব কুমতির বোঝা হাল্কা করো মা! ··

তার উপর (স্বর নামিয়ে) দেখছ তো তোমাদের মার অবস্থা। আমি পাশের ঘর থেকে ওঁর প্রতি কথাটি শুনেছি—আর (অসিতকে) মনে মনে বলেছি —কি ঠিক গোস্বামী পেয়েছ এতদিনে।

অসিত (হেসে) : আপনি কি বলতে চাইছেন—আপনি ঠিক শ্রোতাদের মধ্যে পড়েন না ? বৈষ্ণব বিনয় ?

মহেন্দ্র : না বাবা, আমি বৈষ্ণব নই। তবে বৈষ্ণবদের মানি—মানে, যদি খাঁটি বৈষ্ণব হয়।

ললিতা : খাঁটি বৈষ্ণবের ডেফিনিশন কী বাবা ?

মহেন্দ্র। মা-র চৈতন্যচরিতামৃত পড়া কী শুনলি তবে এতদিন ? মানে (প্রেমলকে দেখিয়ে) ঐ যে দেখছিস না "যাঁহা যাঁহা দেখ পরে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে—" কিনা যাকে দেখবামাত্র কৃষ্ণের কথা আলো হয়ে মনে ঝলকে ওঠে তার নাম বৈষ্ণব।

অসিত (হেসে) : আপনার এক উপাধি শুনেছি ধন্বন্তরি। তিনি কি বৈষ্ণব নন ?

মহেন্দ্র : সাতজন্মেও না বাবা। বাঘে ছুঁয়ে আঠারো ঘা হলে তবেই ধন্বন্তরির ডাক পড়ে—অর্থাৎ যিনি দেহের ব্যাধি দূর করেন—কিনা ডাক্তার। যিনি মনের আধি দূর করে ভক্তি জাগান তিনিই কেবল বৈষ্ণব।

ললিতা : তাহলে তো দাদুও বৈষ্ণব—যে গান গেয়ে বাপীর মতন বৈষ্ণবের মনেও ভক্তি জাগাতে পারে।

মহেন্দ্র : একশো বার। তবে ও এখন গা-ঢাকা হয়ে আছে—অর্থাৎ কিনা গুপ্ত বৈষ্ণব।

প্রণব : যেমন আপনি গুপ্তযোগী ?

মহেন্দ্র : কী জ্বালা! আমাকে ছেড়ে দাও না, আমি বেচারী গঙ্গাতীরে কুটির ক'রে কোনো মতে গঙ্গাস্নানের জোরে তরে যেতে চেষ্টা করছি—আমি যদি গুপ্তযোগী হই তবে ঐ—ঐ বাদুড়টাও গুপ্ত পাখী।

ললিতা (রুষ্ট) : কী যে বলো তুমি বাবা ? তুমি মা-র গুরু নও ?

মহেন্দ্র : সে পূর্বাশ্রমে।

ললিতা (অসিতকে) : দাদু, তোমার সঙ্গে বাবার মিলবে ভালো। তবে আমরা দেখব পাল্লা দিয়ে কে জেতে ?

প্রেমল : কিসের পাল্লা ?

ললিতা : আত্মগোপনের। কম্পিটিশন বিটুইন গুপ্ত বৈষ্ণব ভার্সাস গুপ্তযোগী—ছিপ ছিপ —

মহেন্দ্র : শ্‌—শ্‌—(মাকে দেখিয়ে)

ললিতা (লজ্জিত): ভুলে বাবা, ভুলে! (সুর নামিয়ে) কেবল এজন্যে দায়ী তুমি মনে রেখো।

মহেন্দ্র : আমি দায়ী? কিসে?

ললিতা : কিসে নয় তাই বলো। যে সকলের কাছে মান পেয়ে কথায় কথায় নিজেকে ছোট করে তার উপর রাগ হবে না? শুধু নিজের কথা ভাবলেই হয় না বাবা! আমাদের কথাও একটু ভাবতে হয়। এই এই দেখ না দাদুকে কত পটিয়ে এখানে এনেছি—মাকে আর তোমাকে পাশাপাশি দেখে ধন্য করতে কিন্তু তুমি সব ভেস্তে দিতে চাইছ—ভাঁওতা দিয়ে—যে, তুমি কিছুই নও। যে কিছু নয় তার বুঝি র‍্যাংলার সাহেব শিষ্য হয়? তার বুঝি জুতোর ফিতে বেঁধে দেয় বিশ্ববিখ্যাত মেমসাহেব—

মহেন্দ্র : শ্‌-শ্‌! (অসিতকে) ওর কথায় কান দিও না বাবা। ও born পাগলী—মীরার গান বলছিলে না—তাঁকে গোপাল সৌদাই কৈসা করদিয়া? ও হল সৌদাই—জানো এ-মীরাভজনটি? (অসিত 'জানি' বলে ঘাড় নাড়তেই)

ললিতা : কথা পাল্টাচ্ছ কেন বাবা? আগে নিষ্পত্তি হোক তুমি কে, কী বস্তু।

মহেন্দ্র : চট করে ধরো—এ মেয়ে বড় সর্বনেশে। ধরো ধরো। ঐ দেখ উনিও জেগেছেন। (মা-কে) শোনো গো, অসিত গাইছে ঐ ভজনটিই। আর দেরি নয় বাবা!

অসিত অগত্যা ধরে :

রহ ক্যা দিয়ে সখী কিসী নে, দেখ ক্যা কিয়া!
পাগল হরীনে মুঝকো ভি পাগল বনা দিয়া।
ঘর বার লে সংসার লে মৈ জী হি রহী থী।
কভী জহর কভী সুধা মে কী হি রহী থী।
মেহ কব হুয়া, কহাঁ হুয়া রহ ক্যা কিয়ে দিয়া?
লজ্জা কিনাচে নাচ থি, জলসে বহা দিয়া!
সৌদাই কৈসা কর দিয়া, রহ ক্যা দশা করী!
দেখুঁ জিধর দিখে হরী—হরী—হরী—হরী!
ধরা গগন পবণ রহ বন স ভী দিখে পিয়া।
মীরাকে প্যার ক্যা কিয়া ভলা রহ ক্যা কিয়া!

মা : আহা! কী অবস্থা হয়েছিল মীরার!

মহেন্দ্র (হেসে): তুমি টের পেয়েছ। কী বলো?

মা (ভাবমুখে): দেখ দেখ, নীল রঙে ঘর ভরে গেছে। (মাথার উপর চাপড় দিয়ে) না ঠাকুর, ফের বেহুঁশ কোরো না। আমাকে গান শুনতে দাও। গাও গাও বাবা—ধরো ফের।

অসিত : কী গাইব মা?

প্রণব (মৃদু স্বরে): আমি হিন্দি শিখিনি ভাই। এ গানটির বাংলা আছে?

ললিতা : নেই তো কি? দাদু আমাদের শিখিয়েছিল বৃন্দাবনে। আমাকে আর বকুলকে।

মহেন্দ্র : বকুল?

তারা : আমরা বকুল পাতিয়েছি কাকাবাবু।

মহেন্দ্র : বেশ বেশ। তাহলে গাও না মা এ গানটি তোমরা দু'জনে—মানে বাংলায়। অসিত একটি মীরা ভজনের বাংলা গেয়েছিল লক্ষ্ণৌয়ে, বড় ভালো লেগেছিল আমার : প্রভুজী তুমরে দরশ বিনা অব মৈ তো রহ নহি পাউঁ। বলতে কি, আমার বাংলাটা যেন আরো বেশি ভালো লেগেছিল। যতই হিন্দির গুণগান করি না কেন, মাতৃভাষায় গান—বাংলা গান গাইলে কেমন যেন বুকের তারগুলি সব বেজে ওঠে—(ললিতাকে) গা তো শুনি অসিতের কাছে কেমন শিখেছিস। ওর ঢংটি যদি তুলতে পেরে থাকিস তবেই না।

ললিতা : তুমি কী যে বলো? আমরা কি দাদুর মতন ডাকসাইটে গাইয়ে? আমরা গাই শুধু নিজের মনে গেয়ে খুশী থাকতে বৈ তো নয়।

প্রেমল : না। বলো—ঠাকুরকে শোনাতে। হ্যাঁ—হ্যাঁ। তর্ক কোরো না। ঠাকুরকে শোনাতে হলে ডাকসাইটে গাইয়ে হবার দরকার করে না। গাও। আমার তো খুব ভালো লেগেছিল তোমার আর দিদির মুখে গানটি শুনে।

তারা : সে আমাদের ভালোবাসেন বলে।

প্রেমল (হেসে) গান শোনালে আরো ভালোবাসব। গাও—আর কথা নয়। কথা ঢের হয়েছে—হবেও। ধরো এখন।

তারা ও ললিতা গায় অসিতের হার্মোনিয়ম সঙ্গতে :
কেমন করে হ'ল আমার এমন দশা হায়!
পাগল হরি করল আমায় পাগল লহমায়!
দুঃখে সুখে কাটছিল দিন আমার সংসারে,
আজ সুধা কাল বিষ ক'রে পান আলোয় আঁধারে,
এমন হল কেমন করে নাথ বলো আমায় :
নোঙর কেটে নৌকা আমার চলল এ কোথায়?
এমন পাগল করল আমায় কে সে—মরি রে?
চাই যেদিকেই দেখি হরি—হরি—হরি যে!
আকাশ বাতাস জলে স্থলে দেখি বঁধুয়ায়
মীরার এ কী করলে বলো, বন্ধু ছলনায়!

সাত

বৃন্দাবনে যে আনন্দের ঢেউ উঠেছিল কাশীতে সে আনন্দ হয়ে উঠল উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ। ভোরে উঠেই সবাই মিলে গঙ্গাস্নান। তারপরেই মা-র পূজাঘরে সবাই একসঙ্গে মা-র স্তোত্রপাঠে যোগ দেওয়া। কখনো কখনো মহেন্দ্রবাবুর মুখে ওদেশের নানা সেণ্টের কাহিনী শোনা। তারপর চা-পর্বে প্রেমলই সভাপতি। সময়ে সময়ে অসিতের তর্ক বাধত প্রণবের সঙ্গে, বা প্রণবের ললিতার সঙ্গে। সে-সব তর্কের নিষ্পত্তি হত অনেক সময়েই প্রেমলের সালিশীতে। ডাক্তারবাবু এসব তর্কাতর্কিতে প্রায়ই যোগ দিতে পারতেন না মহেন্দ্রবাবু তাঁকে ডাক দিতেন বলে। কোনো কোনো রুগীকে দেখতে টেনে নিয়ে যেতেন। এ-সূত্রে মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গ পেতেন বলে ডাক্তারবাবু আরো সাগ্রহে তাঁর পিছু নিতেন। ফিরে এসে বলতেন তাঁর নানামুখী বিদ্যার কথা। শান্ত স্নিগ্ধ মানুষটিকে মা নাম দিয়েছিলেন— "গভীর জলের মীন"। প্রেমল বলল : "Still waters run deep"-ললিতা বলত : "বাবা ছোঁওয়া দিয়ে ধরা কেন না নিজের দর বাড়াবার জন্যে।"

তারপর ঘণ্টাখানেক প্রায়ই ওরা গঙ্গায় নৌকাবিহারে বেরুত মহেন্দ্রবাবুর সুন্দর মোটর বোটে। কখনো কখনো প্রেমল অসিতকে নিয়ে বেরুত, দু'একবার প্রণবও ওকে নিয়ে গেছে। প্রণব ওকে নিয়ে যেত শুধু প্রেমলের জীবনের নানা কথা বলতে,—কেবল ওকে পই পই করে মানা করত যেন এসব কথা বাইরে কাউকে না বলে। প্রেমল মোটেই চায় না—ওর বিদ্যাবুদ্ধি নিষ্ঠা তপ সাধনার বিন্দুবিসর্গও লোকে জানে। অসিত ওর কাছে যা যা শুনত প্রেমলের সম্বন্ধে প্রায়ই ওর মোটা ডায়রিতে টুকে রাখত। প্রণব কাউকে বলতে বারণ করেছে—করলই বা! ও তো কথা দেয় নি যে ওর নিষেধ শুনবে। এসব কথা ও শুধু যে বলবে তাই না, না বলে পারবে না, কিন্তু প্রণব বা প্রেমলের কাছে এ-মৎলব ফাঁস নাই করল। মন্ত্রগুপ্তি চাই বৈকি। প্রেমলও তো মন্ত্রগুপ্তিতে বিশ্বাস করে। ঠিক হয়েছে—ও যেমন নিজেকে পর্দানশীল রাখতে চায়, অসিত শোধ তুলবে ওকে বে-আব্রু করে। এ কী অন্যায় আবদার! এমন মানুষকে কাছ থেকে পেয়েও তার অমৃতময় কথা বলবে না পাঁচজনকে? লোকে জানবে না যে জগতে নাস্তিক রাজনৈতিক, বণিক্, কেরাণী, পুলিশ, উকীল, দালালই গিশ্ গিশ্ করে না—স্বপ্নসী আদর্শবাদী যোগীও মাঝে মাঝে জন্মায়। লাখে না মিলয় এক? বাঃ, তাই তো তাদের এত দাম। বলতে কি বিলেত থেকে ফিরে এসে অসিত নানা সাধু-সন্তের খোঁজ করলেও তখনো পর্যন্ত তিন-চারটির বেশী যোগী যতির দেখা পায় নি। মানে কাছ থেকে। সময়ই পায়নি। বেশিরভাগ সময়ই তো কেটেছে গান শিখতে, গায়ক গায়িকার সন্ধানে সারা ভারত চক্র দিয়ে বেড়াতে—ত্রিবন্দ্রম্ থেকে কাশ্মীর। হঠাৎ বৃন্দাবনে প্রেমলের দেখা পেয়ে গেল, তারপরেই যেন অদৃষ্ট ওর হেসে উঠল—একজোটে প্রেমল, ললিতা, মা ও মহেন্দ্রবাবু! ওর নানা জায়গা থেকে গানের নিমন্ত্রণ আসত। কিন্তু ও পণ নিল এ-স্বর্ণ সুযোগ ছাড়বে না। প্রণব প্রায়ই বলত সে মা-র কথা শুনতে অনেক কাজ ছেড়ে আসত—to make hay while the sun shines আর কি। অসিতও ঠিক করল এই-ই পন্থা। যতটা পারে এ-চারটি মানুষের কাছ থেকে আহরণ করে নেবে প্রেরণার পাথেয়। ওর ভাগ্য শুধু ভালো নয়, অদ্ভুত! একটি দুটি নয়—পাঁচ পাঁচটি আশ্চর্য মানুষের দেখা পাওয়া একই পরিবারে! 'এ-স্বর্ণ সুযোগ কি ছাড়া চলে?

[ক্রমশঃ

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

লস্-এন্‌জেলিসে :

ঘণ্টা পাঁচেক ওড়ার পর ধূম্রপুচ্ছ দানব যন্ত্র-পক্ষীটি অবতরণ করলেন লস্-এন্‌জেলিসের বিমান বন্দরে। বিমান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে হয় হেঁটে নয় বাসে বিমান বন্দরের ঘরে যেতে হয় না। টেলিস্কোপিক কায়দায় সঞ্চরণশীল সুড়ঙ্গ পথ এগিয়ে এসে বিমানের দরজায় ভিড়ে যায়। জলে জাহাজের জেটির মত। জেটি জলে ভাসে, ঐটি ছোট ছোট মজবুদ চাকার ওপর চলে। প্রায় দেড়তলা উঁচু সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে তল বেড়ায় এসেই দেখি ডাক্তার হারভে লাডউইগ্, রাসেল্ লাডউইগ, তরুণ বাসু, সুভাস দেবগুপ্ত ও বারটেগু রয়েছেন। 'রাসেল' আমার আধমনী ব্যাগটা ব'য়ে চলল গাড়ীর দিকে, আমার হাত ব্যাগটা ডঃ হারভে।

আমরা তিনজনে চললাম এক গাড়ীতে; আর তরুণ, সুভাস ও বারটাগু আর এক গাড়ীতে। পথে রাসেল তার উকীলের বাড়ীতে নেমে গেল তার বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মোকদ্দমার তদবিরে। কলকাতা থাকার সময় প্রীতির যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, তার প্রকাশের সুযোগ অন্তরের আতিথেয়তা দিয়ে প্রকাশের প্রয়াস তারা ছাড়েনি। বিমান বন্দর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল পথ অতিক্রম করে মূল লস্-এন্‌জেলিস সহর ছাড়িয়ে সহরতলীর এক ছোট সহরে পাহাড়ের ভুরুতে বসানো বিরাট তার প্রাসাদোপম বাড়ীতে এলাম। প্রচুর ঘর এখানে। থাকে শুধু স্বামী-স্ত্রী; মাঝে মাঝে ভাই ও মেয়ে এসে অল্পদিনের জন্য থেকে যায়। রাস্তা থেকে তার কম্পাউণ্ডের গেট ছেড়েও প্রায় তিনশো ফুট উঁচুতে উঠতে হয়। দূর থেকে তার সবুজ রংয়ের বাড়ীটি একটি শান্ত পাখীর নীড় বলে মনে হয়।

গাড়ী বাগানের চাতালে আসতে দেখা গেল বেঁটে-খাটো এক ভদ্রমহিলা গ্যারেজে গাড়ী পরিষ্কারে ব্যস্ত। গাড়ী আসতেই শ্রীমতী হারভের সঙ্গে একটা বিরাট আলশেশিয়ান কুকুর ও কুচকুচে কালো একটা বেড়ালও এসে হাজির। কুকুরটা লেজ নাড়তে সুরু করেছে। বেড়ালটা মিটমিট করে তাকাচ্ছে ও মাঝে মাঝে 'মেউ মেউ' করছে। এই কালো বেড়াল আমাদের দেশে অলক্ষণে, এখানে একটি কাম্য সংগ্রহ ও সুলক্ষণেরই পরিচয়। হারভে পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীমতীর সঙ্গে। করমর্দন ও সামান্য আলাপের পর রাসেলের পাশের ঘরে আমার ঠাঁই হল। দু'ঘরের মাঝখানে স্নানের ঘর ও পায়খানা। সে ও আমি দুজনেই ব্যবহার করতে পারি কেননা দু'দিক দিয়েই ঢোকার দরজা। বাড়ীর মেঝে পাথরের; ছাদ কাঠের। সামনের উঠোনের সঙ্গে লাগানো এক বিরাট গ্যারেজ। এক দিকে পাহাড়ের ঢাল ওপরে উঠে গেছে ও অন্য দিকে নীচে নেমে গেছে। ওদের তিনখানা মোটর গাড়ী প্রত্যেকের একখানা করে। দক্ষিণমুখো বসার বিরাট ঘর। কোচ ও সোফায় ভর্তি। সারা বিশ্বের আকর্ষণীয় সামগ্রীর সমাবেশ হয়েছে বসার ঘরে। ওদের এক মেয়ে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে পড়তে গেছে। আর এক মেয়ে স্যান্‌ফ্রান্‌সিসকোর কাছে ষ্টানফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ে। সে তার মোটরগাড়ী নিয়ে গেছে সেখানে, শুধু রেখে গেছে তার লাল ঘোড়াটাকে মাকে পরিচর্যার ভার দিয়ে। পড়াশোনা ও অশ্বসেবা করার সময় কোথায়? কলেজে অশ্বশালাই বা কই? আর

তার দানা-ভুষিই বা আনবে কে? ওখানে তো চাকর পাওয়া যায় না বা গৃহস্বামীর কাছে দিনরাত দাস্যবৃত্তিও করে না।

বৈঠকখানার সংগ্রহশালায় ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে গেছে তাঞ্জোরের নানান কাজ করা বিরাট পিতলের থালা, বর্মা থেকে কাঠের জালির কাজ, শ্যামদেশ থেকে পিতলের বুদ্ধমূর্তি, মেক্সিকো থেকে কালো কাঠের পুতুল, আরও কত কী! হল ঘরের পূর্বদিকে রান্না ও খাবার ঘর। ঘরের আলমারিতে টিনে টিনে নানা রকমের প্রচুর খাদ্যদ্রব্য বোঝাই। আর একটা আলমারিতে চীনা মাটির বাসনে ঠাসা। ফ্রিজিডিয়ারে মাংস, মাছ, মাখন, ফল প্রভৃতিতে ভর্তি। খাবার ঘরেই টেলিভিশনের সেট; আমার শোবার ঘরেও একটা ছোট সেট রয়েছে। আহারে এখানে একটু সময় লাগে। তাই খেতে খেতেই টেলিভিশন দেখা যায়। আহার শেষ হবার পরও এই দেখাশোনা দীর্ঘায়িত হতে পারে। টি. ভি.-তে সিনেমার ছবি 'পূর্বানুবৃত্তি' নিয়ে চলে। তবে এখানে এদেশের ভারতীয়দের সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের সব সময় লড়াই চলেছে। আর কেবল রেড ইণ্ডিয়ানরা নিহত হচ্ছে। এত রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবন হানি হয়েছে তাতে সমস্ত রেড ইণ্ডিয়ানরা নির্মূল হয়ে যাবার কথা। এ কতকটা যুদ্ধের সময় হিটলারী প্রচার নৈপুণ্যে বৃটেনের বিমানগুলি ভূপাতিত করার সংবাদ প্রচারের মত। হলঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় কম্পাউণ্ডেরই মধ্যে ঘোড়াশাল। দিনের বেলা লাল রংয়ের ঘোড়াটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেটাতে হার্ভের মেয়ে চড়ে। এখন সে ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছে, তাই ঘোড়ার পরিচর্যার ভার এখন শ্রীমতী হার্ভের উপর। এত বিত্তবান এরা, তবুও বাড়ীতে ঝি-চাকর কিছু নেই। 'এলটাডিনা'র বাড়ীটা রাস্তা থেকে অনেক উঁচুতে বলে কি দুধওয়ালা, কি খবরের কাগজওয়ালা বা ডাকপিওন কেউই বাড়ীতে এসে কোনো জিনিষ পৌঁছে দেয় না। ঢুকবার গেটের ধারে পায়রার খোপের মত বাক্স করা আছে, তাতেই কাগজপত্র ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। দুধ-ওয়ালা গেটের ধারে রাখা খালি বোতল নিয়ে ভর্তি বোতল দিয়ে যায়। খালি বোতলের ভিতর দুধের কুপন থাকে।

আমার ঘরে জিনিষপত্র রেখে স্নানাদি সেরে সন্ধ্যায় চা ও জলখাবার খেয়ে আমাদের কলকাতার কথা, সিডনী ও ম্যানিলার কথা, ম্যানিলার ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের আফিসের কথা হোল।

খানিক বাদে রাত্রিবেলা এল বন্ধু দম্পতি ওদের ক্লাবে নিয়ে যেতে। আমায় নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কখন তোমরা ফিরবে?

—রাত প্রায় একটাও হতে পারে।

—তাহলে আজ আমায় মাফ করো, আজ একটু বিশ্রাম নি। পরের দিন দেখা যাবে।

আমরা রাতের আহার সেরে নিলাম। সবাই বেরিয়ে গেল ক্লাবে। আমি একা। পাহাড়ের কোণে সেই নিভৃত নিলয়ে আমি একা। আনন্দমঠের 'ভবানন্দের' কথা আমার মনে হোল সেই একা ভবানন্দ। আমি এই প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাট প্রাসাদে বসে ভাবছি আমার ফেলে-আসা পৃথিবীর অপর গোলার্ধে আপনজনের কথা। আমার এখন রাত, তাদের এখন সকাল। আমার কাজের পর্ব সারা হয়েছে, তাদের কাজের পর্ব সুরু হল। পারিবারিক পত্র লিখে ফেললাম দুটি ও যাদের কাছ থেকে গত ক'দিনে যে উপকার ও সাহায্য পেয়েছি তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে একটা মুসাবিদে করলাম, যেটার মাথায় শুধু নাম বসালেই চলবে। তার প্রতিলিপি হল :—

Dear Mr......

This is to convey my heartfelt thanks and deep sense of gratitude for your many courtesies and help extended to me during my stay in your city.

The discussions we had on the various subjects of my interests were not only illuminating but also most informative and instructive and will be of immense help in future.

I am extending my invitation to visit our country and I shall be looking forward for your arrival.

Yours truly

রাত দুপুরের পর এরা এসেছিলো ফিরে। আমি আধো ঘুমে তার বার্তা পেয়েছিলাম। এত রাত হলে কি হয়, ভোরবেলা উঠেই শ্রীমতী চায়ের জল চাপিয়েছেন ও চায়ের টেবিলে খাবার-দাবার সাজিয়ে রেখেছেন। মোটরে করে এক ফাঁকে নীচে গিয়ে খবরের কাগজ ও দুধ নিয়ে এসেছেন। এই অবকাশে আমরা স্নানাদি পর্ব সেরে জুতো জামা পরে শুধু কোটটা হাতে বয়ে এনে খাবারের টেবিলে এসে বসলাম। আহারের ফাঁকে ফাঁকে পত্র লেখা ও আলাপ-আলোচনাও চলতে লাগলো। আমার আমেরিকা পরিক্রমার কর্মসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব ডাঃ হার্ভে লাডউইগের ওপর দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এতে ব্যাপারটা হয়েছে অতি সহজ, বিশেষ করে সীমিত সময়ে আমার চলাফেরাও।

সকালে খাবারের টেবিলে বসে হার্ভেকে বললাম—তুমি "মায়া-সভ্যতার" দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত তো? এ বিষয়ে প্রস্তুতির জন্য তোমায় কলকাতা থেকেই চিঠি দিয়ে এসেছি।

বলেছো যখন নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে। আমার হয়তো তোমার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু সেখানে তোমার যাতে কোনো অসুবিধে না হয় তার ব্যবস্থা করবো। উপরন্তু জানোই তো আমি একজন ব্যস্ত মানুষ সেখান থেকে ফেরার জন্য আমার ব্যস্ততা হবে বেশী। তাতে তোমার দেখার অবকাশ ও আনন্দ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আমি না গেলেও সেখানে চেনা লোক পাবে।

—তা হলেও হবে। তুমি যেমন বুঝবে ও যেমন করবে তাতেই আমার মত। আমি নিষ্কাম কর্মী (Desireless worker) হয়ে কাজ করছি। তোমাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, ফলের কামনা আমার মনে নেই।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সন্ধ্যে বেলায় তোমার আমেরিকা পরিদর্শনের এক সুবিস্তৃত কর্মসূচীর খসড়া আফিস থেকে প্রস্তুত করে আনবো। তোমার পছন্দ হ'লে বলো।

প্রাতরাশ সেরে আমরা আফিসের দিকে চল্লাম তিনজনে। বাইরে বন্ধুর বাড়ী রাত কাটিয়ে সকালে 'রাসেল' ফিরেছিল। আমাদের আফিস বাড়ী থেকে মাইল বারো হবে। সেখানে ক্যাজমিরের জ্যাক্, জোফিনি, হার্মান, বার্টেও ও অন্যান্য আমার তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হল। বিশেষ পাকা কর্মসূচী সোমবার না থাকায় হার্ভে আমাদের "পামস্প্রিং" পরিদর্শন করে আসতে অনুরোধ জানালো। জানায় ক্ষুধায় মন অত্যন্ত ব্যগ্র। নিয়ে যাবে কোম্পানীর গাড়ীতে আফিসের এক কর্মচারী চালিয়ে। সঙ্গী হবেন আমার দুই তরুণ বন্ধু। সবাই জানে লস্-এন্জেলিস সিনেমার নট-নটীদের নর্ম ও কর্মভূমি কিন্তু এত কর্ম-প্রচেষ্টা ও বিরাট শিক্ষাদীক্ষার এতবড় কেন্দ্র প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে আর নেই।

পামস্প্রিং—পামস্প্রিং কতকটা মিশরের মরুভূমির মত এক জলহীন শুষ্ক মরুঅঞ্চল। সেই দারুণ বালুকাময় ঊষর উত্তপ্ত প্রাঙ্গণে আট হাজার ফুট উঁচু তুহিনশীর্ষ পর্বত। রাজশেখর বাবুর 'গির্দাশ্রম' রসরচনা যেন এখানে মূর্তিমতী। মে মাসে এখানে দারুণ গরম। সমুদ্রতটস্থ অঞ্চলেই শুধু গ্রীষ্মের প্রকোপ কিছু কম। যুট্ হিল বুলিভার্ড থেকে বেরিয়ে স্যান বারনারডিনো ফ্রীওয়ে ধরে ঘণ্টায় ষাট থেকে আশী মাইল বেগে গাড়ী চলতে লাগলো। ফ্রীওয়েতে কোন ছেদ রাস্তা নেই, বেগ বর্ধনের বাধাও নেই। কোথাও থামতে হবে না। ডাইনে বাঁয়ে রাস্তা কোথাও বা ফ্রীওয়ের তলা দিয়ে নয় ওপর দিয়ে হয় সুড়ঙ্গ নয় সেতু করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফ্রীওয়ের ওপরে বিরাট বিরাট সাইনবোর্ড যার ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা কোথায় কোন রাস্তা এসে যুক্ত হচ্ছে বা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়ী এখানে রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলে। যেখানে নতুন ফ্রীওয়ে তৈরি হচ্ছে সেখানে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে রাস্তা নির্মাণ কার্যের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাইনবোর্ড লেখা—'দেখুন আপনাদের পেট্রোলের ট্যাক্স কেমন সুন্দরভাবে কাজে লাগছে।'

আর্কেডিয়া থেকে স্যান বারণাডিনো ফ্রীওয়ে ধরে প্রায় চল্লিশ মাইল যাবার পর স্যান বারণাডিনো কাউন্টীর প্রধান নগরী স্যান বারণাডিনোতে এলাম। পথে পড়ল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর 'ওন্টারিও'। স্যান-বারণাডিনো ফ্রীওয়ে হল আন্তরাজ্যিক ১০নং সড়ক। ঐ রাস্তা

ছেড়ে ৬০নং জাতীয় সড়ক ধরে পূবের দিকে চলায় পথে পড়ল বেমণ্ট ও ব্যানিং। ব্যানিং থেকে জাতীয় সড়ক ছেড়ে আমরা 'পামস্প্রিং এরিয়েল ট্রামওয়ের দিকে এগোতে লাগলাম। 'পামস্প্রিং' পাম মরুভূমির অন্তর্বর্তী অঞ্চল। এর মধ্যেই জেগে উঠেছে এই সু-উচ্চ পর্বত—স্যানজ্যাকিনটো। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১০৮৩১ ফীট। এসব নাম স্প্যানিশদের দেওয়া। এটি স্পেনীয়-প্রধান অঞ্চল। তাই স্থানের নামে এর প্রচুর প্রকাশ।

২½ মাইল
গিরি ষ্টেশন
স্যান জ্যাকিন্টো চূড়া
৫ নং
৪ নং
নং উপত্যকা
ঝোলানো ট্রামের আদিপথ
৩ নং
মধ্যপথ
২ নং
বর্তমান আলোজ্বালিবার বিজলী পথ
দূরত্ব ২½ মাইল
১ নং
পাম স্প্রিং সহর
অধিত্যকা ষ্টেশন

পামস্প্রিং ঝোলাট্রাম
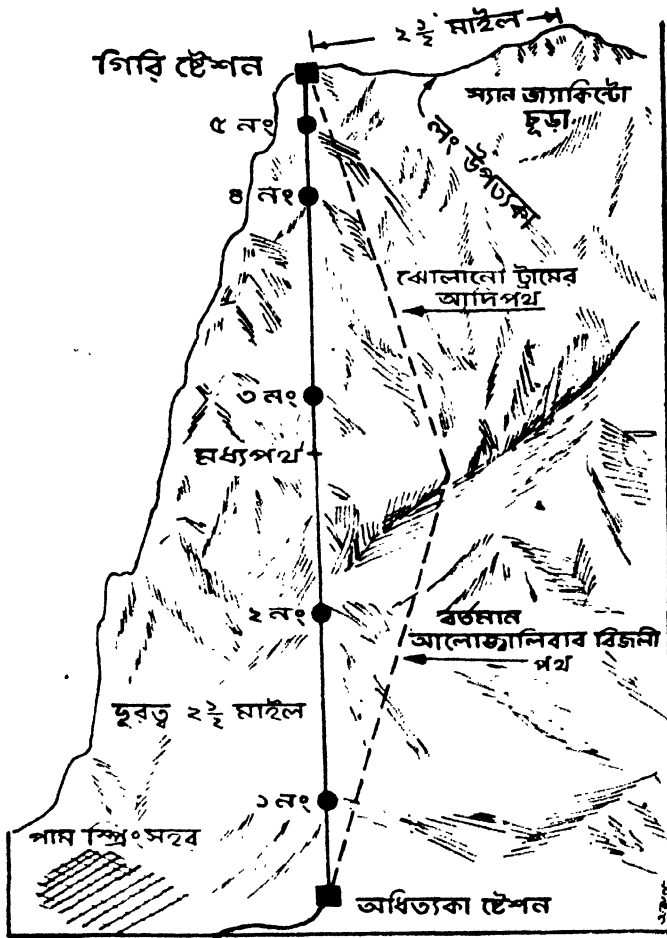
নীচে মরুভূমি, ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ। তলায় উষর বালু, উপরে কঠিন বরফ। এত খর তাপেও বরফ সম্পূর্ণ গলে শেষ হয়ে পাহাড়ের গায়ে আজও বিলীন হয়ে [illegible] এখানের কনকনানো [illegible] মত নদী তৈরি হয় না। এ হচ্ছে সেই নদী, 'যে নদী মরুপথে হারাল ধারা।' এ শুধু পাহাড়ের তৃষিত অঙ্গে অচিরে মিলিয়ে যায়, 'তপ্ত সৈকতে বারিবিন্দুসম।'

'পামস্প্রিং ট্রামওয়ে'র প্রবেশপথ বা উপত্যকা ষ্টেশনটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৬৪৩ ফীট উঁচুতে। আর বহির্গমন পথ অর্থাৎ পার্বত্য ষ্টেশনটি ৮৫১৬ ফীট ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ ট্রাম মোট খাড়াই ৫৮৭৩ ফীট ওঠে আড়াই মাইল তারের পথে। এই তারের পথ তৈরীতে পাঁচটি বিশেষ ইস্পাতের টাওয়ারের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথম টাওয়ারটি ২১৪ ফিট উঁচু, আর সব চেয়ে বেঁটে টাওয়ারটি মাত্র ৬৫ ফিট। দুটি ঝোলানো ট্রাম এক সঙ্গে চলে; একটি যখন ওপরে ওঠে, অপরটি নামে। সুইজারল্যাণ্ডে তৈরি দুটি ট্রাম প্রতিক্ষেপে ৮১ জন যাত্রী নিয়ে চলে। প্রত্যেক ট্রামে একজন ভাষ্যকার আছেন তিনি ঐতিহাসিক ভূতাত্ত্বিক প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক তথ্যের বর্ণনা করে যান—টাওয়ারের ওজন ২৬৩ টন, আড়াই মাইল লম্বা 'কেবল', দিনে ৩২০০ যাত্রীর যাতায়াত, ৪০০ লোকের একসঙ্গে খাবার ব্যবস্থা আছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বছরে ৫৭৫,০০০ যাত্রী হবে, শীতকালে ৭০,০০০ যাত্রী চলাচলের সম্ভাবনা ইত্যাদি নানা তথ্য পরিবেশন ক'রে চলেছেন, ঐ ভাষ্যকার।

টাওয়ার তৈরী করার সময় সমস্ত মাল ও মানুষ হেলিকপটারে করে তুলে নিয়ে যেতে হয়েছিল; কারণ ভারী মাল নিয়ে যাবার উপযুক্ত রাস্তা ছিল না ও এখনও নেই। ওখানে মানুষে মাথায় মাল বয় না। হেলিকপটারে নামার জন্য বিশ ফুট চৌকো একটি নামবার জায়গা বহু ব্যয়ে তৈরি করা হয় ও সেখান থেকে মালপত্র টাওয়ার তৈরির কাজে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রাম দুগাছি ইস্পাতের তারে ঝোলানো ও অপেক্ষাকৃত দুটি সরু তার ওপর নীচে ট্রাম চালনায় [illegible] ব্যবহৃত হয়। ঢালে উঠলে কি হয়, ট্রামের মেঝে

কিন্তু সব সময় সমভূমিক থাকে। এটি চালাতে ৯০০ ঘোড়ার মটর বসানো হয়েছে। মাঝপথে এক জায়গায় ঊর্ধ্ব ও নিম্নগামী যাত্রীর সঙ্গে ক্ষণিক সাক্ষাৎ হয়। এটি নির্মাণে ৭৭ লক্ষ ডলার ব্যয় হয়েছিল। অর্থ উঠেছিল বাজারে শতকরা সাড়ে পাঁচ ডলার সুদের কাগজ বিক্রী করে। এটি পরিচালনার ভার ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যসরকারের আইন বলে Mt San Jacinto Winter Park Authority উপর ন্যস্ত। এই সংস্থার আওতায় সাড়ে কুড়ি বর্গমাইল ভূমি পড়ে। এটি আমেরিকার সর্বোচ্চ ট্রামওয়ে। এই সংস্থার বার্ষিক আয় অনুমান বিশ লক্ষ ডলার। পরিচালনা করতে লাগে প্রায় দু'লক্ষ ডলার।

উষ্ণ মরুভূমি থেকে শীতল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে তুহিনে ঢাকা পর্বত চূড়ায় ওঠার পথে নীচের, দূরের ওপরের কি মনোহারিণী অপূর্ব দৃশ্য। পথে কখন বন্য মেষ ও হরিণ দেখা যায়। এক জায়গায় এত চড়াই যে মনে হয় বুঝিবা পাহাড়ের গায়ে ট্রাম ধাক্কা খেল। একবার যদি ট্রাম তারচ্যুত হয়, তখন কী যে ভাগ্যে আছে স্বয়ং বিধাতাই শুধু জানেন। মনে হয় সুনিশ্চিত মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না।

পর্বতচূড়ায় বিরাট এক দোতলা হোটেল। আমাদের মধ্যাহ্নের আহার এখানেই সার বেঁধে নেওয়া গেল। এখানে একটি নিজস্ব ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন আছে। তারা আমাদের বহু প্রশ্নোত্তর ফিতেভুক্ত করে নিল। ফেরার পথে আমরা 'হেমেট' নামে একটু ছোট অথচ আধুনিক মানের পরিচ্ছন্ন এক জনকল দেখতে নেমেছিলাম।

ক্রমশঃ

খেলা ভাঙার খেলা

শ্রীঅসীমকুমার মাহাতা

বিবিক্ত মনের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে
পৃথ্বীর সত্তায় নিজেকে সমর্পণ,
খেলা ভাঙার খেলায় সাদরে
নিয়োজিত নিত্য ক্ষুব্ধ মন।

অনাবশ্যক নূতন মুখের ছবি ;
প্রাণের পর্দায় জানি শুধুই অমা,
অন্য মুখে শুধু নিজেই খুঁজি
সৌর ভিড়ে কোথায় আত্মা প্রিয়তমা ?

এই খেলাতে হৃদয় বাঁধার পালা
হারিয়ে যাবে অসম্ভবের গানে,
ক্লান্ত রাতে সৃষ্টি গানের মালা
শুকিয়ে যাবে নিজেই নিজের প্রাণে।

লোথাল *

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো বহুপূর্বে আবিষ্কার,
বাঙালী ঐতিহাসিক একদিন, বিংশ শতাব্দীর
দ্বিতীয় দশকে। হোলো তাতে গর্বোন্নত শির
ভারতবাসীর বটে, পঞ্চ মহাদেশের মাঝার।
সম্প্রতি "লোথাল" এবে আবিষ্কৃত হয়েছে আবার ;
বন্দর নগরী এযে, ঢাকা ছিল ভিতরে মাটির
মৃত্তিকা খননে রাস্তা, বহু বাড়ী হয়েছে বাহির,
কবরে পেয়েছে নানা নিদর্শন উচ্চ সভ্যতার।

আর্যেরা আসার পূর্বে ছিল হেথা দ্রাবিড় ধীমান্
অতীব সুসভ্য জাতি সর্বরূপে সমৃদ্ধ তাহারা,
ভাবিলে বিস্ময় জাগে, ইতিহাস ঘোষিছে সম্মান ;
কোথা সে দ্রাবিড় জাতি, নাহি কেনো তাদের চেহারা।
হরপ্পা মহেঞ্জোদারো লোথালের দ্রাবিড় মানব
মিশিয়া আর্যের সাথে ভারতের বাড়ালো গৌরব।

* বোম্বাই রাজ্যে আহেমদাবাদের সন্নিকটে বন্দর-নগরী লোথাল।

কঠোপনিষদের সাধনপথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় মন্ত্র (১।১।২)।

মন্ত্র—তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধা বিবেশ, সোঽমন্যত ॥

অর্থ—নচিকেতা সাধু স্বভাবের কুমার ছিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদানের জন্য যাহা কিছু সেখানে উপস্থিত করা হইল, তাহা দেখিয়া তিনি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন ও চিন্তা করিলেন।

ব্যাখ্যা—নচিকেতা উপযুক্ত বংশের উপযুক্ত সন্তান। তাঁহার পিতা উদ্দালক ক্ষত্রিয় বর্ণের ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রাজা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রাজারাই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিতে পারিতেন। রাজার পুত্র বলিয়া নচিকেতা কুমার ছিলেন এবং তিনি রাজকুমার ছিলেন বলিয়া পরে যম তাঁহাকে বংশোচিত সম্মান দিয়া ভুলাইবার জন্য হস্তী, অশ্ব, ও বিশাল সাম্রাজ্য পর্যন্ত দিতে চাহিলেন (১।১।২৩ দ্রষ্টব্য)।

সে যাহা হউক, নচিকেতা পিতামহ ও পিতার সাধু স্বভাব পাইয়াছিলেন। যতকিছু দক্ষিণার সামগ্রী যজ্ঞ প্রাঙ্গণে একত্র করা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর হইল। তাঁহার নিজ সত্তাস্বরূপ "শ্রদ্ধা" (গীতা, ১৭।৩ দ্রষ্টব্য) তাঁহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল।

এই প্রকার শ্রদ্ধা (Inner urge বা আত্মানুসন্ধান) সাহায্যকারী হইলে তিনি আত্মমগ্ন হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন, এসব দক্ষিণার কি মূল্য হইতে পারে ও ইহা দানের কোন সার্থকতা আছে কি? ইহা হইতে পরলোক বা স্বর্গ জয় হয় কি?

তৃতীয় মন্ত্র (১।১।৩)।

মন্ত্র—পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥

অর্থ—(দানের জন্য একত্রিত গাভীগুলি দেখিয়া নচিকেতা ভাবিলেন :—) যে সকল গাভী জন্মের মত জলপান করিয়াছে, তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, দুগ্ধ দিয়াছে কিংবা যাহারা সন্তান প্রসবে অসমর্থা, সেই গাভীগুলিকে যিনি যজ্ঞে দান করেন, তিনি যে সকল লোক দুঃখময় বলিয়া খ্যাত, সেই সকল লোকেই গমন করেন।

ব্যাখ্যা—যে সকল গাভী যজ্ঞ প্রাঙ্গণে একত্রিত করা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া নচিকেতা ভাবিতেছিলেন। সর্বস্বদানের যজ্ঞে কত প্রকার গাভী উপস্থিত করা হইতে পারে। কিন্তু নচিকেতা তাহাদের স্থূল আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিতে পাইলেন না। তাহাদের সকলের সূক্ষ্ম স্বরূপ তাঁহার অন্তরে ভাসিয়া উঠিল। অন্তরের আবেগ পূর্ণতর হইল। তাহাদের নশ্বরতা তাঁহাকে ব্যাকুল করিল। আর কয়দিনই বা তাহারা জলপান করিবে? দেখিলেই মনে হয়, যেন তাহারা শেষবার জলপান করিয়া আসিয়াছে। আর কয়দিনই বা তৃণ ভোজন করিবে? যেন শেষ গ্রাসটুকুও খাইয়া আসিয়াছে। আর কি তাহারা দুগ্ধ দিতে পারিবে? আর কি তাহাদের বাচ্চা দিবার মত সমর্থ আছে? এই প্রকার গাভী, যাহাদের জীবন হইতে সমৃদ্ধিসাধন ও সম্পদলাভের কোনই ভরসা করা যায় না, তাহাদের দান করিলে, যে দান করে সে ত আনন্দবিহীন লোকে জীবনযাত্রা শেষ করে। নশ্বর সামগ্রীর ব্যবসা করিলে, নশ্বর জগতের নশ্বরতা, মৃত্যুর গভীরতর অন্ধকারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। তখন পথ কোথায়? স্বর্গরাজ্যের জয় সম্ভব কি? তখন ত পুনরাবর্তনই চোখের সামনে নাচিতে থাকে। এইসব ভাবিয়া বালক নচিকেতা তাঁহার পিতাকে যাহা বলিলেন তাহা চতুর্থ মন্ত্রে পাই।

চতুর্থ মন্ত্র (১।১।৪)।

মন্ত্র—স হোবাচ পিতরং, তত: কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং, তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥

অর্থ—নচিকেতা বলিলেন :—"বাবা, তাহা হইলে আপনি আমাকে কাহার হস্তে দান করিতেছেন? দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার যখন তিনি একই প্রশ্ন করিলেন, তখন তাঁহার পিতা বলিলেন, "তোমাকে যমের হস্তে অর্পণ করিলাম।"

ব্যাখ্যা—সেকালে দাস হিসাবে পুত্রকে দান করার প্রথা ছিল। তাই কি নচিকেতা এইরূপ প্রশ্ন করিলেন, যাহার মধ্যে "দাস" শব্দটিও পাওয়া যায়? অথবা তিনি কি বলিতে চান, যাহারা দুহিতার ন্যায় আপনার হস্তে শেষবার জলপান করিয়াছে তাহাদের ত আপনি বিতরণ করিয়া দিলেন, এখন বলুন, যে আপনার তর্পণের অধিকারী তাহাকে কাহার নিকট প্রদান করিতেছেন 'পিতরম্" শব্দটি এইরূপ ইঙ্গিত অনেকের কাছে কেন বহন করে?

সে যাহা হউক, নচিকেতা যে আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিভোর ছিলেন, সেইমত আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া, নিজ জীবনের পথ খুঁজিতে গিয়া, পিতাকে যেমন আসিল, প্রশ্ন করিলেন। ক্রমশ: তাঁহার অন্তরে প্রশ্ন যেমন গভীরতর হইল, সেইরূপ বার বার উক্ত হইল। তখন নচিকেতার পিতা কেন উত্তর দিলেন, "তোমাকে যমের কাছে দিলাম"? কেহ কেহ মনে করেন, ইহাতে নচিকেতার পিতার ক্রোধ প্রকাশ পাইল। কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। তিনি নচিকেতার পিতা, সাধারণ লোকের মত মানুষ নহেন যে রাগ করিয়া, কোন কথা বলিবেন। বরং গভীর চিন্তার পর একথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুত্র নচিকেতার চিন্তারত অবস্থা তাঁহার অন্তরকেও বিদ্ধ করিয়াছিল। তিনি আপন অন্তরে বুঝিয়াছিলেন যে এই জগতে সবই নশ্বর, যাহা কিছু জন্মিয়াছে, তিনিও যাহার জন্মের কারণ হইয়াছেন, তাঁহার সেই পুত্র পর্যন্ত, মৃত্যুমুখেই অগ্রসর হইবে। জন্ম হইলে মরিতে হয়, পিতা পুত্রকে জন্ম দিয়া যতই অবস্থার পর্যালোচনা করেন, এই কথাই অনুভব করেন যে, একজনকে সংসারে আনিলাম তাহাকে মৃত্যুর কবলে উপহার দিবার জন্য। নচিকেতার পিতা সন্তানের চেয়ে কম চিন্তাশীল ছিলেন কি? তাই মানব-পিতার সর্বকালের মনের কথা গোপন না করিয়া, স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, তোকে ত যমের হাতেই দিয়ে রেখেছি বাবা! ইহাতে যদি রোষ প্রকাশ পায়, তাহা ক্রোধ (Anger) নহে, তাহাকে আত্মধিক্কার (Anguish) বা বিক্ষোভ (Indignation) বলা চলে।

পঞ্চম মন্ত্র (১।১.৫)।

মন্ত্র—বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি॥

অর্থ—(এক্ষণে নচিকেতা আবার চিন্তান্বিত হইলেন। চিন্তার বন্যা তাঁহার অন্তরকে এইরূপে প্লাবিত করিল) :—"অনেকের মধ্যে আমি প্রথম হইয়া থাকি। এবং অপর অনেকের মধ্যে মধ্যম হইয়া থাকি। যমের এমন কি প্রয়োজন আছে, যাহা আমার দ্বারা পিতা সাধন করিতে চান?"

ব্যাখ্যা—নচিকেতার চিন্তার কারণ বুঝিতে হইবে। বহু পুত্র বা বহু শিষ্যের মধ্যে তিনি অগ্রণী হইতে পারেন। আর প্রথম যদি না হইতে পারেন, সদাচারের পরীক্ষায় বড় জোর মধ্যম হইবেন। অধম বলিয়া কখনই গণ্য হইবেন না। দ্বিতীয় মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে বর্ধনশীল শ্রদ্ধা বা আত্ম-নির্ভরপরায়ণতা বালকের মনে উদিত হইয়াছে। কাজেই আত্মপরীক্ষায় রত নচিকেতার মুখে এইরূপ স্বগত উক্তি অশোভন নহে। নচিকেতা ভাবিতে লাগিলেন, যমের নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, যাহা তিনি আমার দ্বারা সম্পন্ন করিবেন। গুরুর কার্য সিদ্ধির জন্য শিষ্যের জীবন অতি তুচ্ছ জিনিষ। নচিকেতা রাজার পুত্র হইলেও পিতা যখন তাঁহাকে যমের সদনে যাইতে নির্দেশ দিলেন, পিতার কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে এবং যমের কাছে তাঁহার গমনে নিশ্চয়ই কোন মহৎ ইষ্টের সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে তাঁহার বিমর্ষ হওয়া উচিত নয়। কোন দ্বিরুক্তি করা ঠিক হইবে না। যমই যে তাঁহার প্রকৃত গুরু তাহার আভাস তিনি ত পিতার বাক্য পাইলেন।

পিতার কথা অনুযায়ী, সেইরূপ ভবিষ্যৎ যে পুত্রের পক্ষে বরণীয়, তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন পরবর্তীকালে,

ত্রেতাযুগে ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায়। রামচন্দ্র যদি দশরথের সত্যরক্ষার জন্য অরণ্যে না যাইতেন, রাবণ বধ হইত না, আর্য সভ্যতা ভারতের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ অবধি পৌছাইত না। রাম ইহার নিমিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার চেয়েও গৌরবময় মহিমা তাঁহার পূর্বগামী, পিতার সুপুত্র নচিকেতা অর্জন করিতে পারিবেন নাকি? যদি তিনি পিতার সত্যকথা পালনের জন্য হৃষ্টচিত্তে যমের গৃহে গমন করেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি পরলোক বিজয়ের সাধনপথে সর্বমানবের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবেন। হয়ত, এতকথা উদ্দালক রাজা নিজেও বুঝেন না, কিন্তু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি হঠাৎ যদি কোন ভীষণ উক্তি করিয়া বসেন, তাঁহার সে কথায় অবচেতনা অন্তর হইতে তাহা প্রকাশ করিয়া দেন যাহা বিধাতার অঙ্গুলি সঙ্কেতে লুক্কায়িত থাকে।

(ষষ্ঠ মন্ত্র (১।১।৬)

মন্ত্র—অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাঽপরে।
শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিব জায়তে পুনঃ॥

অর্থ—নচিকেতা পিতাকে বলিতেছেন:—পূর্বকালে আপনার পূর্বপুরুষগণ যেরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহা হইয়াছে, সেইরূপ সত্যনিষ্ঠা বর্তমান সময়েও সাধু-মহাত্মাদের জীবনে দেখা যায়। আপনি সমস্ত অবগত আছেন। (আর সত্যপালনের কাছে মানুষের জীবনের কি মূল্য?) মানুষ শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে এবং শস্যেরই মত পুনরায় জন্মে। (সুতরাং যাহা কর্তব্য, আপনি তাহা করুন)।

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে নচিকেতা যে মনঃস্থির করিয়াছেন ও পিতাকেও সাহস দিতেছেন তাহা স্পষ্ট হয়। অব্যক্তের নির্দেশই যে মানবজীবনে পূর্ণ হয়, তাহা তিনি বলিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা, আপনার পূর্বে যাঁহারা এ সংসারে ছিলেন, তাঁহাদের সত্যবাণী তাঁহারা লঙ্ঘন হইতে দেন নাই, আজও যে সকল ধর্মাত্মা, এ সংসারে জীবিত আছেন, তাঁহাদের মুখ দিয়া যে কথা বাহির হয়, তাহা তাঁহারা অন্তর দিয়া পালন করেন। সত্যের এমনই মহিমা ও স্বরূপ। আপনিও বাবা কম মহাত্মা নহেন। আপনার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইল, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তাহা সত্য হইতে দিন্। ইহা অব্যক্তের নির্দেশ। ইহা পূর্ণ হউক। আপনি দুঃখিত হইবেন না।

এক্ষণে যজ্ঞভূমির পার্শ্ববর্তী শস্যক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নচিকেতা বল পাইয়া সেইমত বলিলেন—বাবা, আপনি ত' জানেন, শস্যের মত মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মায়, আর শস্যের মতই এই সুজলা সুফলা জন্মভূমি ছাড়িয়া তাহার জীবনের শেষ হইয়া থাকে। আবার যে সে শস্যের জন্ম হয়, একথা নচিকেতা কেন বলিলেন? তিনি কি প্রচলিত লোকমত অনুযায়ী আবার এ সংসারে আসিবেন, এই আশা ব্যক্ত করিয়া পিতাকে সান্ত্বনা দিলেন? অথবা ইহা কেবলমাত্র পুনর্জন্মরূপ কালো মেঘের একটুখানিক ব্যঞ্জনামাত্র, যে সন্দেহ ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করাই নচিকেতার জীবনের ব্রত হইবে।

সে যাহা হউক, নচিকেতা পিতাকে বলিতেছেন, সকলের জীবনই যখন এইরূপ, মৃত্যু যখন অবশ্যই ঘটিবে তখন ইহার জন্য শোকান্বিত হইবেন না। আপনার কথা অনুযায়ী আমাকে যমের শিক্ষা-মন্দিরে যাইবার জন্য অনুমতি দিন্।

নচিকেতার এই মিনতিতে তাহার ধর্ম জীবনের লক্ষ্য আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সকল পিতাই ত কার্যতঃ সন্তানকে এ সংসারে আনয়ন করেন, মৃত্যুর কবলে অর্পণ করিবার জন্য। নচিকেতার পিতা না হয় তাহা মুখের কথায় বলিয়া ফেলিয়াছেন। বলিয়া ভালই করিয়াছেন। নচিকেতা তাঁহার জীবনের পরিণাম যাহা স্বাভাবিকরূপে ঘটিবে তাহা জানিলেন ও বুঝিলেন তখন এমনই মুহূর্ত যখন ধর্মপালনের শুভলগ্নে তাঁহার পিতার যজ্ঞানুষ্ঠানের শ্রদ্ধাপূর্ণ বাতাবরণের মধ্যে নচিকেতা নিজ জীবনকে সার্থক করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সেই কারণে পিতৃপিতামহের চরণধূলি মনে মনে অনুসরণ করিয়া নিজের জীবন যে শ্রেষ্ঠদান তাহা নিষ্পন্ন করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। কে জানিত, তাহা দ্বারা তিনি জগৎমণ্ডলে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারিবেন (এই উপনিষদের সর্বশেষ মন্ত্রে তাহা সংযতভাবে জানান হইয়াছে)। যাহা অনুধাবন করিয়া মানুষ মৃত্যুকে, তাঁহারই দেওয়া সাধনার দ্বারা পরাভূত করিয়া, আত্মজয়ী হইয়া অমৃত হইতে পারিবে। কত সামান্য কথা ও ঘটনার ভিতর দিয়া নচিকেতার জীবনে কত মহান্ সত্য ও সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠা হইবার উপায় হইল। [ক্রমশঃ

সৌন্দর্য দর্শনে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ

অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ দুজনেই কবি, সমালোচক ও দার্শনিক। দুজনেই আজীবন সৌন্দর্য সাধনা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ মুখ্যত কাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাট্য ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য দিক এবং সঙ্গীত চিত্রকলা ইত্যাদিতে নতুন কৃষ্টি রেখে গেছেন। শিল্প সৌন্দর্যের মূল্যায়নেও দু'জনেই ব্রতী হয়েছেন ;—রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সাহিত্য সমালোচক, শ্রীঅরবিন্দ সাহিত্য ছাড়াও চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদির বিচারে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অভ্রান্ত বোধের পরিচয় দিয়েছেন। কাজেই সৌন্দর্য সম্পর্কে বলার এঁদের মত অধিকার অল্প লোকেরই আছে।

সৌন্দর্যের তত্ত্ব বিচার আসলে দর্শনের ব্যাপার। সেদিক থেকেও এঁদের অধিকার অবিসংবাদিত। শ্রীঅরবিন্দের সৌন্দর্য দর্শন তাঁর সার্বিক দর্শনের অঙ্গীভূত তার পশ্চাতে রয়েছে অতলস্পর্শ অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও সর্বাবয়ব প্রজ্ঞাদৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের দর্শন মূলে তাঁর সৌন্দর্য ধ্যানেরই ফল। কাব্যানুভূতি, সৌন্দর্য উপলব্ধিই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট মনোভঙ্গির জন্যে দায়ী।[১] দুজনের দর্শন বিভিন্নভাবে গড়ে উঠলেও এদের মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায় একেবারে মৌলিক ব্যাপারে। দুজনেই জগৎকে সচ্চিদানন্দের প্রকাশ বলে মেনেছেন লীলা বলে অঙ্গীকার করেছেন। একই বহু হয়েছেন তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য একটি মৌলিক তত্ত্ব। ব্রহ্ম সত্য মায়াও 'অনির্বাচ্য' নয়, মায়াই ব্রহ্মের প্রকাশ ছন্দ ও শক্তি। মায়ার বলেই অরূপ রূপময় হয়ে উঠছেন, তাতেই আবার রূপের আড়ালে অরূপ গা ঢাকা দিয়ে আছেন—আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটছে। মায়াময় হলেও তাই সংসার মিথ্যা নয়। সংসারের প্রতি ফলে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েরই একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। পরমের এই বিচিত্র লীলার মাধুর্যে উভয়ের শিল্পিদৃষ্টি মুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাই চেয়েছেন সমগ্র সত্তা দিয়ে রূপ রস গন্ধ স্পর্শময় এই সংসারের আনন্দ-লীলায় অংশ গ্রহণ করতে ; শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছেন মায়ার ভ্রান্তিময় আবরণকারী শক্তিকে অপসারিত করে মায়ার প্রকাশশীল সৃজনী শক্তিকে ধরে জগৎকে সচ্চিদানন্দের বিগ্রহরূপে পেতে। তাছাড়া আত্মা, ব্যক্তিত্ব, সমাজ, ব্যষ্টি-সমষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কেও উভয়ের মধ্যে অভিন্নতা না হলেও ঐক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ যেকথা অনেক সময় কাব্যিক-ভাবে বলেছেন সেকথা শ্রীঅরবিন্দ পরিচ্ছিন্ন দার্শনিক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের আলোকে রবীন্দ্র-দর্শন স্পষ্টতর হয়ে উঠে।

সাহিত্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের উক্তি তাঁদের সমস্ত লেখার মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে, তবু বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের কথা পাই তাঁর 'সাহিত্য' 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'পঞ্চভূত', 'Personality', 'Religion of Man' প্রভৃতি গ্রন্থে। শ্রীঅরবিন্দের সৌন্দর্য দর্শনের সাধারণ ভিত্তি তাঁর The Life Devine কিন্তু বিশেষ আলোচনা রয়েছে 'The National Value of Art, Significance of Indian Art, 'The futue poetry' 'Foundations of Indian Culture', 'The Renaissane in India, Letters 3rd Series প্রভৃতি পুস্তকে।

সৌন্দর্য দর্শনের আলোচনাকে কেউ কেউ, যেমন হেগেল ক্রোচে, চারুশিল্পগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ তা করেন নি। তাঁরা প্রকৃতিকেও সৌন্দর্য বিচারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ জীবনের সব কিছুতেই সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা

[১] "Tagore allows his deepest thoughts on metaphysical and ethical questions to be soaked and permeated by hits aesthetic approach and even his specific aesthetic opinions. Aesthetics is thus the very foundation of his philosophy, not its copirg stone"—Indian Literature, Tagore Number P. 146—V.S. Naravane (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক, Rabindranath Tagore A Philosophical Study গ্রন্থের প্রণেতা।)

দিতে চেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন মানুষের সৌন্দর্য সাধনার পরাকাষ্ঠা ঘটবে যখন সমগ্র মনুষ্যসমাজ সুন্দরের মূর্তি গ্রহণ করবে।[২]

সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান বিষয়ে না বিষয়ীতে—সুন্দর বস্তুতে না সুন্দর বলে অনুভব করে যে চেতনা তাতে এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই। এ ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ একমত। তাঁরা বিষয়ে সৌন্দর্যের উপস্থিতি মানেন কেননা সুন্দর দৃশ্য বা শিল্প ছাড়া আমাদের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতীতি আসে না, আবার তা বিষয়ী নির্ভরও বটে, কারণ যার চেতনায় সৌন্দর্য প্রতীতির বিকাশ নেই সে মহৎ শিল্পেও সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পায় না। আসলে যে পরম সুন্দরের প্রকাশ এই জগৎ সে সুন্দরের অবস্থিতি মানুষের অন্তরে যেমন রয়েছে তেমনি আছে প্রকৃতিতে ও শিল্পের মর্মে। সৌন্দর্যবোধ মূলে ঐ অন্তঃসত্তার আত্মসাক্ষাৎকার। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "The soul of beauty in us identifies itself with the soul of beauty in the thing created. (The future poetry); কবির কথায়, "আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা—ইহা হইতেই সৌন্দর্য সৃষ্টি হইল (পঞ্চভূত), আবার "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য সম্ভোগ।" (পঞ্চভূত)।

সকলের মধ্যেই চিন্ময়সত্তা বিদ্যমান, অনন্তের উপলব্ধিতে সকলেরই অধিকার, কিন্তু সব চিত্তই কিছু সে বোধে জাগ্রত নয়। বাসনার দৃষ্টিতে স্বার্থবুদ্ধিতে যখন আমরা চলি ও দেখি তখন নিজেকে যেমন খর্ব ক্ষুদ্র করে রাখি বিশ্বকেও তেমনি তার সহজরূপে দেখতে পাইনে। বিষয়বুদ্ধির অভিভব থেকে যে মুহূর্তে আমরা মুক্ত হতে পারি সে মুহূর্তেই আমাদের সত্তা লাভ করে প্রসারতা নিবিড়তা, দৃষ্টি হয় আনন্দের ভালবাসার, তাতেই জাগে সৌন্দর্যের উপলব্ধি।[৩] সে উপলব্ধি আনন্দের কারণ তা একপ্রকার আত্মোপলব্ধি। এ উপলব্ধির ঘনীভূত অবস্থায় প্রকাশের যে তাগিদ তাকেই বলতে পারি প্রেরণা, প্রেরণা ছাড়া সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়।

প্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'দৈববাণী', এ একটা শক্তি, যে রূপে সেটি প্রকাশ পেতে চায় তার মালমসলা সে অব্যর্থভাবে তৈরী করে নেয় যদি না শিল্পীর বুদ্ধি বেশি পরিমাণে সক্রিয় হয়ে তার সহজ ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। "কবিরা সহজ ক্ষমতাবলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্ধ অচেতনভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব রসদৃশ্য বর্ণধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া পুঞ্জিত করিয়া জীবনে সুগঠনে মণ্ডিত করিয়া খাড়া করিয়া তুলেন", (অখণ্ডতা—পঞ্চভূত)। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "For neither the intelligence, the imagination nor the ear are the true recipients of the poetic delight, even as they are not its true creatorts, they are only its channels and instruments; the true creator the true hearer is the soul." (The Future Poetry P. 13)। কাজেই তাঁদের মতে শিল্পসৃষ্টি যে শুধু প্রেরণাসাপেক্ষ তাই নয় সে প্রেরণার উৎসও হল নিবিড়তর অনুভবগম্য কোন আত্মিক স্তর।

সৌন্দর্য বিচারে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই অধ্যাত্মপন্থী। এদেশের বৈষ্ণব ও শৈব সন্তেরা পরম তত্ত্বকে অভিহিত করেছেন 'ভুবন সুন্দর', নিখিলরসামৃত সিন্ধু', 'অখিল সৌন্দর্যনিধি' প্রভৃতি আখ্যায়, উপনিষদ যাঁকে বলেছেন 'রসো বৈ সঃ।' এ সমস্ত উক্তিতে তাঁদের পূর্ণ সমর্থন। রসের বর্ণনায় আলংকারিকদের 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ' 'লোকোত্তর চমৎকার প্রাণ' প্রভৃতি কথার ব্যবহারেও সাধারণভাবে তাঁদের আপত্তি হবে না। কিন্তু একটি মৌলিক ব্যাপারে আলংকারিকদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য দেখা যায়, আলংকারিকেরা, খুব সম্ভবতঃ শাঙ্কর বেদান্তের প্রভাবে জগৎকে স্বপ্নজরে

---

[২] "A complete and universal appreciation of beauty and the making entirely beautiful our whole life and being must surely be a necessary character of the perfect individual and the perfect society"—The Human [illegible]

[৩] "We are much too busy living and thinking to have leisure to be silent and see". The Future Poetry, P 41.

দেখেননি। কাব্য মানুষকে ব্রহ্মের স্বাদ দিয়ে স্থায়ীভাবে ব্রহ্মলাভে ব্রতী করবে[৪], জগতের অনিত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে মানুষকে বৈরাগ্যমুখী করবে[৫]—এই হল তাঁদের বিচারে কাব্য সাহিত্যের মহত্তম লক্ষ্য। শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করেন যে সৌন্দর্যধ্যানে আমাদের মধ্যেকার আসল সত্তার জাগৃতি ঘটে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির দুয়ার খুলে যায়, কিন্তু তাতে করে জগৎ সম্পর্কে বিরাগের সৃষ্টি হয় একথা তাঁরা আদৌ মানেন না। রসাস্বাদে আমাদের শুধু আত্মোপলব্ধিই (Self consciousne·s) জাগে না, বিশ্বোপলব্ধিও (world consciosness) গভীরতর হয়। শিল্পের কারবার রূপময় জগৎকে নিয়ে, দৃশ্যমান জগতে ও তদন্তরালে যে সৌন্দর্য ও আনন্দ নিহিত আছে তাকে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে শিল্পীরা জগতের প্রতি আমাদের ভালবাসাই জাগান। তাঁদের সাহায্যে জগৎকে আমরা আরও সত্যরূপে ঘনিষ্ঠভাবে পাই। সংসারকে দুঃখের আকর বলে দেখে আমাদের বাহ্যদৃষ্টি আমাদের বাসনাতাড়িত কামনাপীড়িত মনোভঙ্গি—সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে সবই আনন্দের প্রকাশ আনন্দের মূর্তি।[৬] সৌন্দর্য সাধনায় একদিকে ঘটে আত্মসাক্ষাৎকার আর একদিকে বিশ্বানুভূতি। বিশ্বের মধ্যে নিজেকে দেখি, নিজের মধ্যে বিশ্বকে পাই। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "According to our own philosophy the whole world came out of 'ananda' and returns into 'ananda' and the triple term in which ananda may be stated is Joy, Love, Beauty To see divin beauty in the whole world, men, life, nature, and to love that which we have seen and to have pure unallyed bliss in that love and that beauty is the appointed road by which mankind as a race must climb to God". National Value of Art. P. 19. রবীন্দ্রনাথ:—"আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়াতে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয়, সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলে অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা।"—সাহিত্যের পথে পৃ ৪২

অলংকার শাস্ত্রের আর একজন আধুনিক ব্যাখ্যাতা শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখছেন, "কাব্যের কাজ যে সত্যকে সুন্দরের মূর্তি দেওয়া—এটা উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার (কাব্য জিজ্ঞাসা পৃ ৬১)। সত্য বটে আধুনিককালে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা স্থূল বাস্তবের ছবি শিল্প সাহিত্যে অনেকখানি স্থান জুড়ে বসেছে এবং এই বাস্তবতার নিরিখে সাহিত্যের মূল্যায়নের একটি মূঢ় নীতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ পঞ্চমুখে এর প্রতিবাদ করেছেন।[৭] কিন্তু কাব্যে সত্য প্রকাশ পাবে না এ মত (শাঙ্কর মায়াবাদের প্রতিধ্বনি ?) গ্রাহ্য নয়, শান্ত নিরাসক্ত অথচ আনন্দের দৃষ্টিতে দেখলে সংসারে সত্যের সাক্ষাৎ মেলে রূপের আড়ালে অরূপের আনন্দময় উপস্থিতি প্রত্যক্ষগোচর হয়, "সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই সাহিত্যের লক্ষ্য (সাহিত্য পৃ ৪৬)। "The poet's is to seize and embody aspects of Truth in their living relations." (Future Poetry, P. 43)। শিল্পে সত্য ও সুন্দরের এই সমন্বয়তত্ত্ব ভারতীয় সৌন্দর্য দর্শনের চিন্তায় একটি তাৎপর্যময় নবযোজনা।

---

৪ "It is an intimation to him of the possibility of the rising permanently above those imperfections".—M. Hiriyanna—Art Experience P. 28

৫ The experience of beauty makes us progressively conscious of the illusoriness of the empirical world and ego-life, and of the reality of the higher and non-attached spirit within us—P. J. Choudhury—Studies in comparative Aesthetics P. 102

৬ Beauty is the language of the all-pervading delight of existence calling man to itself—A. B. Purani—Advent Nov 1963.

৭ রবীন্দ্রনাথের 'তথ্য ও সত্য' 'বাস্তব' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, শ্রীঅরবিন্দের মতে সত্যিকার সৃষ্টিতে "even the most objective presentation starts from an inner view and subjective process of creation. (F. Poetry P. 47)

সৌন্দর্য দর্শনে আর একটি তর্কের বিষয় হল ভাব ও রূপের (substance and form) সম্পর্ক ও আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে। রূপ থেকে আলাদা করতে গেলে ভাব ভাবান্তর গ্রহণ করে, ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন রূপের কোন তাৎপর্য থাকে না। এ দু'টোকে আলাদা করার চেষ্টা বৃথা। নিখুঁত সৃষ্টিতে ভাবরূপের এরূপ অবিচ্ছেদ্যতা রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই স্বীকার করেন। তবু তাঁরা ভাব ও রূপকে আলাদা করেও ধরার চেষ্টা করেছেন, কারণ তা না করে উপায় থাকে না যখন সৃষ্টির মধ্যে সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার অভাব দেখা যায় এবং সে অভাব প্রায়ই আসে ভাব-রূপের অসার্থক সম্মিলনের ফলে। রবীন্দ্রনাথ ভঙ্গি দিয়ে রূপের চমক দিয়ে ভোলাবার চেষ্টাকে নিন্দা করেছেন; শ্রীঅরবিন্দ artist এবং creator এর মধ্যে পার্থক্য করে লিখেছেন, "fine or telling rhythms without substance (substance of idea, seggestion, feeling) are hardly poetry at all, even if they make good verse." Letters P. II. ভাব বুদ্ধিগ্রাহ্য হতেই হবে এমন কোন কথা নেই, সেটা একটা স্পর্শাতীত সূক্ষ্ম অনুভূতি হতে পারে যা একমাত্র সহৃদয় হৃদয়গ্রাহ্য, কিন্তু একটা কিছু বক্তব্য বা প্রকাশিতব্য থাকা চাই। কিন্তু তাই বলে রূপ বা শিল্পনির্মাতাকে রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীঅরবিন্দ কেউই অগ্রাহ্য করেন নি; শিল্পস্রষ্টা মাত্রেই রূপকার, উপরি উদ্ধৃত চিঠিতেই শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন, "But that is no ground for belittling beauty or excellence of form or ignoring its supreme importance for poetic perfection. Poetry is after all an art…" বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই কাব্য নির্মিতির ব্যাপারে—ছন্দ, শব্দ, অর্থ, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং বিস্তৃত আলোচনা রেখে গেছেন।

শিল্পের মূল্যায়ননীতির দিক দিয়েও দুই কবি-সমালোচকের সিদ্ধান্তের ঐক্য দেখা যায়। কাব্য মূলে হল প্রকাশ, শিল্পস্রষ্টার দৃষ্টিতে অনুভূতিতে যা প্রতিভাত হয়েছে, তাকে প্রকাশ করার আনন্দেই চিত্র কাব্য সঙ্গীত ভাস্কর্য ইত্যাদির সৃষ্টি। কাজেই সে অনুভূতি সে দৃষ্টি ও আনন্দের অংশ গ্রহণই হবে রসিকের লক্ষ্য, এবং এই রসানুভূতি যার তীক্ষ্ণ তিনিই পারেন আর দশজনকে সাহায্য করতে শিল্প সৌন্দর্যের আস্বাদে এবং সেটি সম্ভব হয় যদি সুরসিক সমালোচক তাঁর অন্তরে কাব্যশিল্প সরাসরিভাবে যে ছাপ মুদ্রিত করে দিয়েছে (free and direct impression) তাকেই বিশেষ করে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ শিল্পসমালোচনায় impressionismই উভয়ের মনোগত নীতি। সমালোচনায় আজকাল নানা পদ্ধতির অনুশীলন দেখা যায়—বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি, কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐ সব পদ্ধতির সার্থকতার কম বেশি থাকলেও কোন পদ্ধতির গুণেই সৌন্দর্য বিচার সার্থক হতে পারে না যদি না সুন্দর সমালোচকের মনকে স্পর্শ ক'রে তাঁর চিত্তকে আস্বাদময় করে তোলে।

একদিকে যেমন শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য বিচারে চারু শিল্পগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি, প্রকৃতিকেও তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন তেমনি আর এক দিকে শুধু ব্যক্তিগত জীবন নয় জাতীয় জীবন ও বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থায় সৌন্দর্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করেছেন। সৌন্দর্যের আদর্শকে অবলম্বন করেই একটি জাতি যথার্থ সংহতি সমৃদ্ধি ও শ্রী লাভ করতে পারে, এবং এ আদর্শ জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্থান পেয়েই সঠিক কার্যকর হয়ে উঠতে পারে, শিক্ষার্থীর চিত্তের বিকাশও তাতে সহজ ও ত্বরিত হয়ে থাকে।

এতক্ষণ আমরা সৌন্দর্য দর্শনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের ঐকমত্যের কথাই বলে এসেছি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে পার্থক্য নেই তা নয়। পার্থক্য এসেছে শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের একটি মৌলিক তত্ত্ব আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিবাদকে অবলম্বন করে। অন্তরে সুপ্ত সচ্চিদানন্দকে ফিরে পাবার জন্যেই চলেছে সমস্ত মানুষের আস্পৃহা। অপরিণত আদি মানবের মধ্যেও অজ্ঞাতে এ আস্পৃহা সক্রিয়, তাতেই সৃষ্ট হয়েছে তাদের (অপরিমার্জিত) সঙ্গীত নৃত্য চিত্রকলা ইত্যাদি। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি অনেকখানি মার্জিতি লাভ

করেছে; কিন্তু বুদ্ধি সৌন্দর্যের স্রষ্টা নয়, প্রকাশের মাধ্যমমাত্র। সৃষ্টিপ্রেরণা আসে একটা গূঢ় অনুভব থেকে; সে অনুভব যখন সমস্ত বিমিশ্রতা থেকে মুক্ত হয় এবং তার প্রকাশ হয় নিখুঁত তখনই ঘটে শিল্প-সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা। এভাবে শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ লক্ষ্য করেছেন একটা ক্রমাভিব্যক্তি এবং সর্বোচ্চশ্রেণীর কাব্য যাকে তিনি 'মন্ত্র' বলেছেন তার মধ্যে একদিকে থাকবে যে অনন্তের অভিলাষী শিল্পস্রষ্টামাত্রেই সে অনন্তের ঘনীভূত উপলব্ধি এবং নিখুঁত নির্বিরোধ সুচ্ছন্দ প্রকাশ। শিল্পসাহিত্যের এই স্তরভেদের সাহায্যেই বিচিত্র শিল্প-কর্মের সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ যে এই স্তর পরম্পরা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না তা নয়, তিনি মিষ্টিসুরে কানের তৃপ্তি দেয় যে গান তাকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তুলনায় নিম্নে স্থান দিয়েছেন, লোকশিল্পের একতারার সঙ্গে বিদগ্ধ শিল্পের সপ্ততারের দুস্তর ব্যবধান তিনি মেনেছেন,[৮] এমন কি মানব সভ্যতা যে একটা দিব্য পূর্ণতরতার দিকে যাচ্ছে সেকথাও তিনি আভাসে বলেছেন. ("I believe that there is an ideal hovering over and permeating the earth, ideal of that Paradise which is not the mere outcome of fancy, but the ultimate reality in which all things dwell and move"—The Religion of an Artist প্রবন্ধ Contemporary Indian Philosophy গ্রন্থ পৃ ৪৪); কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য দর্শন বা সাধারণ দর্শনে এই স্তরভেদ বা ক্রমবিকাশ যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। তিনি শিল্পসৃষ্টির নিদান হিসাবে মানুষের মধ্যেকার প্রয়োজনের বাড়া শক্তিকে তুলে ধরেছেন ("Of all living creatures in the world man has his vital and mental energy vastly in excess of his need, which urges him to work in various lines of creation for its own sake ঐ পৃ ৩৪)। কিন্তু এ শক্তির উৎস কি, এই সৃষ্টির পশ্চাতে কোন দূর লক্ষ্যের ইঙ্গিত আছে কিনা সেটা বোধ হয় কবি তলিয়ে দেখেন নি। আমরা আগেই বলেছি কবির দর্শনের মূল তাঁর কবিত্ব বা সৌন্দর্যদৃষ্টি তাতে অনেক জিনিস ধরা দিয়েছে কিন্তু স্পষ্ট দার্শনিক রূপ নেয়নি, শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের আলোকে যেন সেগুলোর তাৎপর্য সম্যকভাবে ফুটে উঠে।

মানুষের মধ্যে সচ্চিদানন্দকে ফিরে পাবার যে আকূতি তা কেবল সৌন্দর্য স্পৃহাকে অবলম্বন করেই অভিব্যক্ত হয়নি; মানুষের ধর্ম, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুর পশ্চাতে একই প্রেরণা বিভিন্নভাবে কাজ করছে:—"In all the higher powers of his life man may be said to be seeking, blindly enough, for God……To get at this as a spiritual presence is the aim of religion, to grow into harmony with its eternal nature of light, love, strength and purity is the aim of ethics to enjoy and mould ourselves into the harmony of its eternal beauty and delight is the aim and consummation of our aesthetic need and nature to know and to be according to its enternal principles of truth is the end of science and philosophy and of all our insistent drive towards knowledge." (The Human Cycle P. 172) কিন্তু প্রত্যেকটিরই ধর্ম স্বতন্ত্র, প্রত্যেকের ক্ষেত্র ও বিকাশধারা বিশিষ্ট। তারা মিলতে পারে একমাত্র তুরীয় ভূমিতে যেখানে সৎ চিৎ ও আনন্দ এক অখণ্ড তত্ত্ব, তার নিম্নে বিকাশোন্মুখ স্তরে সত্য সুন্দর মঙ্গল এসকলের অখণ্ড ঐক্য আশা করা যায় না। উপনিষদের শ্লোকে সত্য সুন্দর অখণ্ড মূর্তি পরিগ্রহ করেছে, তাই বলে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্যে সুন্দরের সাক্ষাৎ অনিবার্য তা বলা যায় না। ভালবাসার চিত্রমাত্রেরই একটা মাধুর্য আছে, তাই বলে সব ছবিতেই কল্যাণাদর্শ মিলবে তা সম্ভব নয়। অবশ্য সত্য শিব সুন্দর পরস্পরকে প্রভাবিত করবে পরস্পরের অনুপূরক হবে এটা খুবই স্বাভাবিক।

ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে রবীন্দ্র-সৌন্দর্য-দর্শনে সত্য মঙ্গল সুন্দর প্রকাশ ইত্যাদি ঐক্য লাভ করেছে। কিন্তু আমার ধারণা

[৮] "এক সময়ে যাহা সাধারণের ছিল, ক্রমেই তাহা সাধকের হইয়া আসে।……সমাজ যতই অগ্রসর হয় ততই অধিকারী এবং অনধিকারী, রসিক এবং অরসিক, এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে থাকে।" পঞ্চভূত, 'প্রাঞ্জলতা' প্রবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য সৃষ্টির একটি আদর্শ অবস্থা ধরে যেকথা বলেছেন তারই সাহায্যে শুধু এরকম একটা ঐক্যে কোন প্রকারে পৌঁছা যেতে পারে। অন্ততঃ নীতিকে যদি মঙ্গলের নিদান বলে গণ্য করা যায় তবে তা যে সৌন্দর্য সৃষ্টির অন্যতম বাধা এমন উক্তি কবিরই আছে: "The immediate consciousness of reality in it purest form, unobserved by the shadow of self-interest, irrestective of moral or utilitarian recommendation, gives no joy as does the self-revealing personality of our own". (Contemporary Indian Philosoply P. 35)। নিম্নরেখ কথাটি লক্ষ্যণীয়। একথাও স্মরণীয় যে সত্যকে প্রকাশ করা শিল্পের আসল কাজ নয়, সত্যের প্রাণবন্ত সুন্দর মধুর রূপকেই তুলে ধরা শিল্পের লক্ষ্য। যাইহোক সত্য শিব সুন্দরের সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক নয়।

আর একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বজোড়া অভিব্যক্তির পশ্চাতে একটি অদৃশ্য হস্ত প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁকে তিনি প্রজ্ঞাপুরুষ বলে অভিহিত করেছেন, 'ইউরোপীয়েরা যাকে বলে থাকে Zeitgeist (জাইটগাইষ্ট) বা কাল-পুরুষ। "শাশ্বত কাল ব্যাপিয়া যিনি সকল জিনিস নির্দোষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধরিয়াছেন তিনিই এই পুরুষ।" তাঁকে আমরা আত্মাশক্তিও বলতে পারি। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনেই মানুষের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ; প্রতিভার শক্তিই প্রধানতঃ বিশ্বের অভিব্যক্তিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মানুষের শিল্পপ্রতিভাও তাই তার ক্রম-পরিণতিশীল সমাজ দেশ ও কালের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, এ খাপছাড়া বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মোটেই নয়। শিল্প অবশ্য সমাজ বা কালের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ নয় কিন্তু কালের সঙ্গে যুক্ত, কালের নিগূঢ় প্রভাব তার মধ্যে থাকতে বাধ্য এবং তার প্রভাব কালের উপর। পশ্চিম দেশের যুগচেতনার একটি গভীর আস্পৃহাকে তৃপ্ত করেছিল বলেই না রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি এমন সাড়া জাগিয়েছিল সেদেশে। সে সাড়া আজ আর নেই তাই বলে গীতাঞ্জলি অবশ্যই হারিয়ে যায়নি, গভীর সত্যমূলক একটি অনুভূতির নিবিড় প্রকাশ হিসাবে সাহিত্যলোকে তার আসন স্থায়ী হয়ে আছে।

এই যুগচেতনার প্রয়োজনকে মেনেছেন বলে শ্রীঅরবিন্দ কোন প্রকার উদ্দেশ্যবাদে শিল্পের স্বধর্মচ্যুতি সমর্থন না করেও নানাপ্রকার উদ্দেশ্যবাদে প্রভাবিত শিল্পসৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অধিক উদারতার সহিত নিতে পেরেছেন। দ্বিতীয়তঃ শিল্পবিচারে 'free and direct impression' লাভের পরেই শিল্পইতিহাসের অভিব্যক্তির আলোকে তাকে দেখার কথা বলেছেন (It is a clear idea of this evolution which may most helffully inform the historical or evolutionary element in our judgement and appreciation of poetry. F. Poetry P. 56)।

শিক্ষায় ও জাতীয় জীবনে সৌন্দর্যের স্থান সম্পর্কে এঁদের অভিমতের কথা বলেছি। এখানেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। শ্রীঅরবিন্দ যেমন করে সত্যতার ক্রমোন্নতিতে বিভিন্ন স্তরে সৌন্দর্যের বিরাট অংশের কথা বলেছেন তেমন করে সমষ্টিগত জীবনে সৌন্দর্যের স্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেননি। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় প্রকৃতিকে যতটা স্থান দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ ততটা দেননি, তিনি দিয়েছেন মনের যে অবস্থা সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম প্রভাবকে গ্রহণ করে তার বিকাশের উপর। সেটির বিকাশে অবশ্য প্রকৃতির স্থান অনেকখানি।

যোগী শ্রীঅরবিন্দের আর একটি বিশিষ্টতা এই যে তিনি প্রেরণাকে ধরে রাখা, দীর্ঘস্থায়ী করা, সংশোধনের জন্যে মূল প্রেরণায় ফিরে যাওয়া, সৃষ্টিক্রিয়ার সমস্ত ব্যাপারটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে রীতিমত একটি সাধনার (Inner discipline) বিধান দিয়েছেন।

যাইহোক সামান্য পার্থক্য ও তারতম্য সত্ত্বেও আধুনিক ভারতের এই দুই সর্বশ্রেষ্ঠ কবিমনীষীর মধ্যে সৌন্দর্য বিচারে যে গভীর ঐক্য দেখা যায় তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী, মনে রাখতে হবে তাঁরা শুধু দু'টি ব্যক্তি নন—দু'টি বিরাট প্রতিষ্ঠান।

গল্প লেখার বিড়ম্বনা

নারায়ণ চক্রবর্তী

নিষ্কাশনপুর সহরটি ছোট। ছোটনাগপুরের পাহাড়গুলি সমতল ভূমিতে নেমে এসে মাটির বুকে মিশে যাবার আগে বুঝি ক্ষণিক বিদ্রোহে তাহাদের শিরদাঁড়াটা একবার বেঁকিয়েছিল, পাথুরে লাল মাটির রুক্ষ টিলাগুলি যেন তারই ছবি ধরে রেখেছে। ধু ধু প্রান্তর ঢেউএর পর ঢেউ সাজিয়ে পঞ্চকোট পাহাড়ের নীলাভ পায়ের কাছে মাথা নীচু করে পড়ে আছে। এরই একটি ছোট্ট উপত্যকায় এশিয়া-বিখ্যাত নিষ্কাশনপুর ষ্টীল ওয়ার্কস্ এর আকাশ-ছোঁয়া চিমনীগুলি অনবরত আকাশের মুখ কালি করে দিচ্ছে।

প্যাটার্নশপ, মেশিনশপ, কাস্টিংশপ, শীটমিল, রোলিং মিল ওপেনহার্থ আর ব্লাষ্ট ফার্নেসের মানুষগুলো যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে, সুপার ভাইজাররা ছুটোছুটি করছে, অফিসাররা এয়ার কণ্ডিশন আপিসে বসে প্রোডাকশন চার্ট দেখছেন, আর আপিসে আপিসে কেরাণীবাবুরা কি করে দু'ঘণ্টা বেশী ওভারটাইম পাওয়া যায় তারই ফন্দী আঁটতে পরামর্শ আর পরচর্চা করছে।

এ সহরের মানুষগুলি লোহা, কয়লা আর ইস্পাত ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমনই পোড় খেয়ে গেছে যে বাইরে থেকে মনে হয় তাদের মন থেকে আদিরস ছাড়া আর সব রসের শেষ বিন্দুটিও যেন শুকিয়ে গেছে।

কিন্তু মনে রস না থাকলেও তাদের রসনায় ধার আছে প্রচুর।

কী করে যে এই শ্রীহীন রুক্ষ প্রান্তরে এসে জুটলাম তা আজ আর আমার মনে নেই। জীবনযুদ্ধে জীবিকার্জনের তাগিদটা যখন প্রচণ্ড হয়ে দেখা দেয় তখন আর বাছবিচার করবার সময় থাকে না। ভীড়ের বাসে ওঠার মতো চাকরীর পাদানীতে পা রাখতেই হয়। আমাকেও তাই করতে হয়েছিল। মনে যতোই ক্ষোভ থাক না কেন মাসান্তে পকেটটা যখন ভরে উঠতো তখন সেই টাকাগুলোকে আর লোহার মতো নীরস বা কয়লার মতো কালো বলে মনে হত না। তাই টিকে গেলাম।

মাস ছয়েক কেটে গেল।

আগে আমার ধারণা ছিল যে ভালো কথা শামুকের মতো হাঁটে, আর মন্দ কথাটি বাতাসের আগে দৌড়ায়। কিন্তু এখানে এসে লক্ষ্য করলাম যে আমি যে একজন সাহিত্যিক যে কথাটি সারা নিষ্কাশনপুরে ছড়িয়ে পড়তে সময় লেগেছিল মাত্র এক ঘণ্টা বাহান্ন মিনিট পঞ্চান্ন সেকেণ্ড।

প্রবাদ বাক্যের অসারতা নিয়ে দুঃখ করতে গিয়েই হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে নিষ্কাশনপুরবাসীদের কাছে একজন সাহিত্যিক শুধু যে কৃপার পাত্র তা-ই নয়, লেখক এবং চোর, বা খুনে, বা ডাকাত একই পর্যায়ভুক্ত। কারখানায় বা সহরে যেখানেই যাই, সহকর্মী বা পরিচিত মহলের মুখে চোখে একটি অতি সূক্ষ্ম বিদ্রূপের হাসি আর চোরা চাহনী লক্ষ্য করি। শুনিয়ে শুনিয়ে বলা দু' একটা তীক্ষ্ণ কথার তীরও মনের ভেতরে গেঁথে যায়, —"ঐ ছাখ, ছাইত্যিক চলেছেন, নিষ্কাশনপুরের রবীন্দ্রনাথ—"

সাহিত্য চর্চা করার "অপরাধে" অফিসের সহকর্মীরা আমাকে এড়িয়ে চলত। হয়তো কোন কথা হচ্ছিল চার পাঁচ জনের মধ্যে, বেশ হাসিঠাট্টা গল্প-তামাশা চলছিল হাল্কা মেজাজে, আমি কাছে যেতেই সব্বাই চুপ, সবার মুখ রাম গড়ুরের ছানা। কখনো একটা ছুতো করে, কখনো বা তা না করেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত সবাই। তাই বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ জীবনের অবসর সময়টুকু ভরে তুলবার জন্য বেশী করে লেখার দিকে ঝুঁকে পড়লাম।

বেশ কড়া গোছের একটি অবদমিত কামনার গল্প

লিখেছিলাম উত্তমপুরুষে। জনপ্রিয় সাপ্তাহিক অভ্রভেদীতে পাঠিয়ে দিলাম। বেশ কিছুদিনের উদ্বেগের পুরস্কার পেলাম, গল্পটি ছাপা হল। সম্পাদক প্রশংসা করে চিঠি দিলেন, আরও গল্প চাইলেন।

খুশী মনে কারখানা থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, কালি-ঝুলি মাখা পোষাক, ক্লান্ত মন্থর পদক্ষেপ, মন একটা নতুন গল্পের প্লট ভাবছিল। হঠাৎ আজাদহিন্দ পার্কের কাছে গোপিকারঞ্জনবাবু চীৎকার করে ডাকলেন "ও মলয়বাবু, এদিকে আসুন তো একবার—"

তাঁর সঙ্গে ছিল টুলু, বুলু, আর লুলু,—ওরা তিন জন দাঁত বার করে আমার দিকে তাকিয়েছিল, গুজগুজ করে হাসছিল।

কাছে যেতেই খপ্ করে আমার একটা হাত ধরে ফেললেন কন্‌স্ট্রাকশনের চার্জম্যান গোপিকারঞ্জন দা, পানের ছোপ লাগা দাঁত বার করে রসালো হাসি হেসে বললেন,—"বেশ দাদা, বেশ ডুবে ডুবে জল খাওয়াটা বেশ রপ্ত করেছেন দেখছি—"

টুলু বলল,—"এ দিকে ভাবখানা দেখান যেন ভিজে বেড়ালটি—"

বুলু বলল, "ভাজা মাছটুকু উল্টে খেতে জানেন না—"

"কেন খাবেন না শুনি (Suni)?" ফোড়ন কাটল লুলু,—"ছাইত্যিক মানুষ না?"

চ্যাংড়াদের উপেক্ষা করে গোপিকারঞ্জনবাবুর খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম,—ডুবে ডুবে জল খাওয়া? তার মানে?"

"আর লুকিয়ে কী হবে দাদা?" দাঁতবার করে পায়োরিয়ার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে টুলু বলল,—"আমাদের জানতে আর কিসসু বাকী নেই—"

লুলু বলে উঠলো—"নিজের হাঁড়ি তো নিজেই ভেঙেছেন শিয়ালডাঙার হাটে—"

লুলুটা বেজায় ফড়ে। গার্লস্ স্কুল ছুটি হবার সময়ে রোজ আপিস থেকে পালায়, মেয়েদের দেখেই ওর সুখ। ওর কথায় বিরক্ত হয়ে বললাম—"কিসের হাঁড়ি? কী সব আবোল তাবোল বকছেন আপনারা?"

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে তিন দিনের না কামানো দাড়ি-ভরতি মুখখানা আমার মুখের খুব কাছে নিয়ে এলেন গোপিকারঞ্জনবাবু,—পান-দোক্তার ঝাঁঝালো গন্ধে আমার গা গুলিয়ে উঠলো, ফিসফিস করে বললেন,—মঞ্জুলার কাছে একদিন নিয়ে চলুন না দাদা—

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম, বললাম,—"মঞ্জুলা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঐ যে সুন্দরী রূপসী,—যে নাকি কোনো পুরুষেই তৃপ্ত নয়,—একটিবার তাকে পরখ করে দেখতে চাই আমি। আপনি যেখানে ফেল, আমি সেখানে নির্ঘাৎ পাশ করব,—হেঁ হেঁ হেঁ—"

"আমরাও,—আমরাও তার যৌবনের দর্প ভেঙে দিয়ে আসব,—সমস্বরে বলে উঠলো টুলু, বুলু আর লুলু।

এতক্ষণে এদের হেঁয়ালীর ধোঁয়ার ভেতরে আসল, ব্যাপারের আগুনের ফুলকি দেখতে পেলাম, বললাম,—"ও আপনারা বুঝি "অভ্রভেদী"তে প্রকাশিত "অবচেতন গল্পের নায়িকার কথা বলছেন?"

ওরা চার জন মাথা ঝাকিয়ে বলল,—"হুঁ।—"

"কিন্তু সে তো একটা গল্প মাত্র, নিছক কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে তার বাহ্যিক সম্পর্ক আছে বলে মনে হলেও আসলে মঞ্জুলা তো অশরীরী,—ছায়া—"

"ছায়া না মায়া না কায়া তা বুঝবার মতো বয়েস আমার হয়েছে, বুঝলেন মশাই—"একটু যেন রেগে গেলেন গোপিকারঞ্জনবাবু,—"ও সব ভাঁওতা অন্য জায়গায়, অন্য কারুর কাছে দেবেন। এ শর্মার নাম গোপিকা-রঞ্জন। জানেন আমি আন পেড্ বয় থেকে কাজ শুরু করে আজ একজন চার্জম্যান—"

"আর আমি ফায়ারম্যান্ থেকে ফোর ম্যান্—" ফোড়ন কাটল টুলু।

বুলু মুখ খুলল,—"গপপো বলে চালালে কী হবে, সুন্দরী যুবতী মঞ্জুলার সঙ্গে কী ভাবে চুটিয়ে প্রেম করেছেন সে সব কথা, তার রোমহর্ষক বিবরণ তো নিজের জবানীতেই লিখেছেন মশাই, এখন সব ব্যাপার বেমালুম অস্বীকার করে সাধু সাজা হচ্ছে? হুঁ:—"

লুলু বলল,—"আমরা বুঝি বুঝি না কিছু? আমরা বুঝি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি?"

মনে মনে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে বললাম—"আপনারা ভয়ানক ভুল করছেন—"

"ভুল! তার মানে?" ভুরু কুঁচকে টুলু বলল।

"মানে ও গল্পের আমি আর আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার লেখক এই মলয় মালাকার এক নয়—

অবিশ্বাসের সুতীক্ষ্ণ হাসিটা গোপিকারঞ্জন বাবুর মুখে এমনভাবে ফুটে উঠলো যে কথাটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম যে এ ধরণের সূক্ষ্ম যুক্তি লোহা বলার হিসেব করা মাথায় কিছুতেই ঢুকবে না। এরা চিরকালই লেখার "আমি"কে লেখক বলেই জেনে এসেছে।

আমার কিংকর্তব্য বিমূঢ় ভাব দেখে আরও একটু শব্দ হলেন গোপিকারঞ্জন বাবু,—"মঞ্জুলার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে সব নিখুঁত বর্ণনা আপনি দিয়েছেন তা নিজের চোখে না দেখে লেখাই যায় না,—আর তা পড়ে আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে মশাই, সত্যি বলছি, মঞ্জুলার মায়া করব না। আপনি শুধু একটিবার ওর সঙ্গে আমার আলাপটা করিয়ে দিন মলয়বাবু—"

গোপিকারঞ্জন তাঁর আগুন সেঁকা লোহার মতো হাতে আমার ডান হাতটা চেপে ধরলেন। মটু করে একটা শব্দ হ'ল। টুলু, বুলু আর লুলু তিনদিক থেকে ঘিরে ধরল আমাকে। আমার কোনো কথাই কানে তুলল না ওরা। প্রথমে অনুনয়, পরে শাসানী, শেষে রীতিমতো ভয় দেখাতে লাগল।

ওদের একমাত্র দাবি মঞ্জুলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেই হবে।

আলবার্তো মোরাভিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে গল্প লিখে যে এমন বিপদে পড়তে হবে তা আগে কে জানতো!

কেটে গেল মাস দুই চার। সাহিত্যের ভূতকে কিন্তু ঘাড় থেকে নামাতে পারলাম না। একটি দুটি করে গল্প বার হতে লাগল এখানে ওখানে, নানা পত্রিকায়। যদিও সাহিত্য-কর্ম কাজটিকে অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে করত বলেই সেই লেখাগুলো নিকাশনপুরবাসীরা খুঁজে পেতে পড়ল, এমন কি অত্যুৎসাহীরা আসানসোলে সে পত্রিকা না পেয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে কলকাতা থেকে আনিয়ে নিল।

সেদিন কী একটা কাজে হীল অ্যাণ্ড ডেস্প্যাচ অফিসে গিয়েছিলাম। বড়বাবু খগেন সমাদ্দার জ্যাকক্লিপ দিয়ে কান চুলকাচ্ছিলেন, আমাকে দেখেই পরম সমাদরে ডাকলেন,—"আরে মলয়বাবু যে! আসুন,—আসুন,—বসুন ঐ চেয়ারটায়—"

খগেনবাবু যে চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রচুর ছারপোকা থাকার লোকপ্রসিদ্ধি ছিল। তাই তাঁর বসবার আমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খগেনবাবুর বসন্তের গর্তভরা মুখখানা দেখতে লাগলাম।

লোকের পেছনে কাঠি দেওয়াই খগেনবাবুর বিশেষত্ব, তাই তাঁর অমায়িকতায় যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হলাম।

সুমুখে ঝুঁকে, ঊর্ধ্বাঙ্গটি টেবিলের প্রায় সমান্তরাল করে ঘরের আর পাঁচজন ডেস্প্যাচ কেরাণী যাতে শুনতে পায় এমনভাবে ফিস্‌ফিসিয়ে খগেনবাবু বললেন, "এবার কাকে ঠুকলেন মশাই?"

"তার মানে?"

"আহা, লুকোচ্ছেন কেন মশাই! আমি কি আর এসব পাঁচ কান করতে যাবো?" বলে একটা চোখ টিপে খ্যা খ্যা করে হেসে উঠলেন খগেনবাবু।

আমি তাঁর কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

যেন একটু করুণা করে খগেনবাবু বলতে লাগলেন, "আরে মশাই, আমি ঐ 'সাদা ফুল ও কালো ভ্রমর' গল্পটার কথা বলছি। নাম ধাম পাল্টালে কী হবে, রোলিং মিলের সমরেশবাবুর রাঙা টুকটুকে বউ ছায়ার সঙ্গে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের ছোঁড়া সাহেবের কেচ্ছার কথাটাই তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছেন ঐ গল্পটাতে। একটু সাবধানে থাকবেন মশাই,......" বলে আবার চোখ টিপে একটা ভয়ানক ইঙ্গিত করলেন খগেন সমাদ্দার।

আমার মুখ সাদা হয়ে গেল, কাঁপা গলায় অস্ফুটস্বরে বললাম,—"কেন? নইলে কী?"

খুশী খুশী সুরে খগেনবাবু বললেন,—সমরেশটা আবার ভীষণ গোঁয়ারগোবিন্দ কি না, চেহারাটাও ষণ্ডামার্কা,—বলা তো যায় না, ওর ঘরের কথা গপ্পো লিখে সারা দুনিয়াময় প্রচার করেছেন বলে রাতবিরেতে পেছন থেকে মাথায় লাঠিও বসিয়ে দিতে পারে—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—"

পাকা কাঁঠালের গন্ধে মাছিগুলো যেমন এসে জোটে, তেমনি করে কেচ্ছা-পিপাসু কেরাণীরা ভীড় করে এসে দাঁড়াল আমার চারপাশে।

আমার নাক দিয়ে যে গরম নিশ্বাস পড়ছিল তার উত্তাপ কারখানার বাত্যা-চুল্লীর চেয়ে কিছু কম হবে না, বললাম,—"আমি তো সমরেশবাবু বা তাঁর স্ত্রী, বা হোড় সাহেব, কারুর সম্বন্ধেই কিছু জানি না,—এই প্রথম শুনছি আপনার মুখে—"

"হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ,—নিক্কাশনপুরের সবাই যা জানে সে বিষয়ে অজ্ঞতার ভাণ করলে কী হবে! গায়ে ময়লা মাখলে কি যমে ছাড়ে? যা ছিল গুজগুজ ফিসফিসএর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা আপনি ঢক্কা নিনাদে প্রচার করেছেন চারিদিকে। তবে হ্যাঁ,—বেড়ে লিখেছেন মশাই! আহা কী ডেস্‌ক্রিপশন্! সেই যে ছায়ার শোবার ঘরে নীল বাতির আলোয়—"

আমি কাতর হয়ে বললাম,—"বিশ্বাস করুন খগেনবাবু, ও গল্পটা আমার বানানো নিছক কল্পনামাত্র, তা ছাড়া নায়িকার নামও তো ছায়া নয়,—স্বাগতা—"

"ও সব ছেঁদো কথায় ভবী ভুলবে বলে তো মনে হয় না আমার,—নিন, আসুন—" বলে যে কাজটি তিনি কদাচিৎ করে থাকেন তাই করে বসলেন খগেনবাবু, একটা নাম্বার টেন সিগারেট অফার করলেন আমাকে।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে অন্যান্য কেরাণীদের বিস্মিত মুখের ওপর দিয়ে তাঁর হাতির মতো চোখ জোড়া বুলিয়ে নিয়ে খগেনবাবু বললেন,—"খাশা লিখেছেন সত্যি! সব ঘটনাই একেবারে হুবহু মিলে গেছে, এমনকি সেই মাইথন ড্যামে মুনলাইট পিকনিক পর্যন্ত।"

তৃপ্ত মুখে গলা নামিয়ে আবার বললেন খগেনবাবু,—"এবার আমাদের ধর সাহেবের বোনের কেচ্ছাটা নিয়ে বেশ চুটিয়ে গপ্‌পো লিখুন তো মলয়বাবু, সেই যে এইভাবে ফটো তুলিয়েছিল…" বলে বিবস্ত্র হবার ভঙ্গী করলেন।

এর পর ছ'মাসের মধ্যে আর কলমই ধরলাম না। কে জানে কার জীবনের সঙ্গে আমার কাহিনী মিলে যাবে, [illegible] মিলিয়ে দেবেন, লেখকের দৈহিক প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।

কিন্তু আমি ছাড়লে কী হবে। সম্পাদকমশাইরা যে না-ছোড়-বান্দা, তাগাদার পর তাগাদায় প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুললেন। ভাবলাম, দূত্তোর ছাই, বাস্তব ধর্মী গল্প লেখার ফলেই না যতো বিপদ, যতো গণ্ডগোল, এবার তা হলে লেখা যাক রহস্য-গল্প গোয়েন্দাকাহিনী। কল্পনার বল্গাহীন ঘোড়া ছুটিয়ে দেব অসম্ভব আর অবাস্তবের মাঠে। কোনো মিঞার কিছু বলবার আর জিম্মত হবে না।

অনেক ভেবে চিন্তে দারুণ দারুণ রহস্যেভরা একটা প্লট ঠিক করলাম। গোয়েন্দাকে করলাম অমর, অসম সাহসী, অসম্ভব বুদ্ধিমান ও প্রচণ্ড সংস্কৃতিবান। সে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, নাচতে পারে, গাইতে পারে, লক্ষ্যভেদে অসওয়াল্ডকেও হার মানায়। সবার ওপরে সে সাক্ষাৎ কন্দর্পকান্তি। লেখা শেষ হলে রিভাইজ করবার সময়ে পড়তে গিয়ে আমারই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল।

বিশেষ পূজা সংখ্যায় রহস্য উপন্যাসটি বার হল। ভাবলাম, এবার তা হলে নিশ্চিন্ত। কৈফিয়তের দায় নেই। দুশ্চিন্তায় রাত জাগা নেই, রাত বিরেতে অতর্কিতে মাথায় লাঠি পড়বার ভয় নেই। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় দিন কাটতে লাগল।

কিন্তু কথামালার নেই একচক্ষু হরিণের গল্পটা যে আমার জীবনেই এমন মর্মান্তিক ভাবে সত্যি হয়ে উঠবে তা জানতে আমার তখনো বাকী ছিল।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। মাইথনের বাঁধের জলে আবির গুলে সূর্য সবে পাটে বসেছে। লাইব্রেরীর বই পাল্টাতে রবীন্দ্রভবনে যাচ্ছিলাম। নির্জন নেহেরু রোডের বাঁকে একটা ঝাঁকড়া মাথা তেঁতুল গাছের নীচে জনার্দন জানা ওরফে যদু বাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। যদুবাবু ঘোর গম্ভ লোক, গল্পের বই তো দূর স্থান, খবরের কাগজটাও পারেন না। জনশ্রুতি এই যে প্রতিমাসে মাইনে নেবার দিনে পে-শীটে সই করতে গিয়ে তিনি তিনবার নিব পাল্টান। তবে মুরুব্বীর জোর আছে, টিল ফিনিশিং জেকশানে বড়ো পোস্ট পেয়ে গেছেন।

একটু দূরত্ব রেখে মোড় ঘুরতেই দুই লাফে এগিয়ে এসে আমার পথ আগলে দাঁড়ালেন যদুবাবু, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—"এই, আমার নামে গপপো লিখেছিস কেন? চাবকে লাল করে দেব তোকে—"

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, "আপনার নামে গল্প? কই এমন কোনো গল্প লিখেছি বলে তো মনে পড়ছেনা যদুবাবু—"

"মনে পড়ছে না?" চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি,—"আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব,—আমার নাম জনার্দন জানা,—" বলে আমার আস্তিন গুটিয়ে আমার সার্টের কলারটা চেপে ধরলেন তিনি।

ভড়কে গিয়ে বললাম, "আহা চটছেন কেন মিছিমিছি? খুলেই বলুন না কথাটা। কী গল্প লিখেছি আপনার নামে?"

"এই যে পূজা সংখ্যা "রক্তের আলপনা"তে লিখেছিস—"বলে পকেট থেকে দোমড়ানো পত্রিকা খানা বার করে আমার চোখের সামনে মেলে ধরলেন তিনি।

এক নজর তাকিয়েই চিনতে পারলাম তাকে, মনে হল যে ক্ষীণপ্রাণ পত্রিকাটার ওপর দিয়ে একটা টর্পেডো বয়ে গেছে। শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। তবু সাহসে ভর করে বললাম,—"কিন্তু এটা তো গোয়েন্দা গল্পের পত্রিকা যদুবাবু—"

"তা আমি জানি, ভন্টু বলেছে, বইখানা এনেছে, জায়গাটা দেখিয়েছে"—দাঁতে দাঁত ঘসে যদুবাবু বললেন। মনে হল যে অবরুদ্ধ ক্রোধের তাড়নায় তিনি যেন কাঁপছেন।

বিদ্যুৎচমকের মতো এক রাশ চিন্তা আমার মনের আকাশে উঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেল, তবু যদুবাবুর মতো কাঠখোট্টা লোকের উষ্মার কারণ বার করতে পারলাম না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আরও রেগে গেলেন যদুবাবু বললেন,—"কী, চুপ করে আছিস কেন? "নর-মুণ্ডের গেণ্ডুয়া" গল্পটা কি তোর লেখা নয়?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ওটা তো খুন খারাপির গল্প যদুবাবু,—গোয়েন্দা কন্দর্পকান্তির কীর্তিকাহিনী, ওটা আপনাকে নিয়ে লেখা হল কেমন করে?"

আমার সার্টের কলারটা আরও জোরে চেপে ধরে হিস হিস করে যদুবাবু বললেন,—"কেমন করে? জানিস না, না?"

"সত্যিই না।"

"ঐ যে কী কান্তি নামে গোয়েন্দাটা,—ও হতভাগার চাকরটার নাম রেখেছিস যদু—আমার নামও তো যদু,—আমি তা হলে চাকর?"

এতক্ষণে যদুবাবুর উষ্মার কারণটা খুঁজে পেয়ে হাসব কি কাঁদব তা চট্ করে ঠিক করতে পারলাম না।

যদুবাবু থামলেন না, সবেগে বলে চললেন,—"তোর আস্পর্ধা তো কম নয় ছোকরা, আমাকে চাকর বানাতে চাস? জানিস, তোর মতো দশটা লোককে আমি চাকর রাখতে পারি,—পাজী, বেল্লিক, ছুঁচো—

যদুবাবুর ওজন পাকা দু' মণ, ষাঁড়ের মতো আঁটসাট গড়ন, তাই গালাগাল গুলো হজম করে বললাম,—"কিন্তু দাদা, দুনিয়াতে যদু বলতে তো আপনি একা নন, হাজার হাজার যদু আছে, খুব আটপৌরে নাম ওটা। যাদব চক্রবর্তির অংকের বই খুলুন, দেখবেন প্রায় অংকেই যদু, মধু, রাম, শ্যামের নাম। তা হলে যদু নামটা ব্যবহার করাতে আমার অপরাধটা কোথায় বলুন?"

"তা হলে চাকরটার নাম রাম বা শ্যাম না রেখে বেছে বেছে যদু নামটাই বা রাখলি কেন বল? ভন্টু ঠিকই বলেছে, এ শুধু লোক সমাজে আমাকে হেয় করবার চেষ্টা—"

গলায় কলারের নিদারুণ ফাঁস, চিঁচিঁ করে বললাম,—"তা হলে রামবাবু যে বাম হতেন দাদা, শ্যামবাবু রাস্তা জ্যাম্ করে দাঁড়াতো—"

"দাঁড়াতো বেশ করতো—আমার তাতে কী?"

"তা হলে কী নাম দেব চাকরটার তা বলুন। এই নিকষণপুরে কুড়ি হাজার লোকের বাস, প্রত্যেকেরই আর কিছু থাক বা না থাক, একটা করে নাম আছে। গল্পে যে নামই আমি ব্যবহার করিনা কেন, কারুর না কারুর নামের সঙ্গে মিলে যাবেই যাবে। তারা সবাই যদি এমনি ভাবে চামলা করতে শুরু করে দেয়, তা হলে তো বাংলা গল্পে জাপানী বা রুশ, বা ফরাসী নাম ব্যবহার করতে হয় দাদা—"

যদুবাবু গোয়ার গোবিন্দ লোক। যুক্তির ধার দিয়েও গেলেন না, চোখ পাকিয়ে বললেন,—"যা, এবারের মতো ছেড়ে দিলাম তোকে, কিন্তু ফের যদি এ রকম বেয়াদপি দেখি তা হলে আর আস্ত রাখব না। মনে রাখিস আমার নাম জনার্দন জানা, তোর মতো ছাইভস্মকে ছাই এর মতো এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব।"

যদুবাবু চলে গেলেন।

আমি গলায় হাত বুলাতে বুলাতে বাড়ি ফিরলাম। দেবী সরস্বতীর পায়ের কাছে সাধের শেফার্স কলমটি রেখে দিয়ে বললাম,—"ঢের শিক্ষা হয়েছে মা, আর না।"

সেই থেকে আর গল্প লিখি না। এবং সত্যি কথা বলতে কি বেশ সুখেই আছি।

বলছাড়া বেয়াড়া বাছুরটাকে পালে ফিরে পেয়ে নিকষণপুরবাসীরাও নিশ্চিন্ত।

সাধকের সাথে—৩

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ডেরাডুন

যোগীরাজ শ্রীমদ্ ভৈরবানন্দ তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস মহারাজ আমাদের সহিত ডেরাডুন আসিয়া, নং ২৯ সারকুলার রোডে আমার বাটিতে উঠিলেন। তাঁহার ব্যবহারের জন্য ঐ বাংলোর উত্তর পশ্চিম কোণের ঘর ও সংলগ্ন স্নানের ঘর রাখা হইয়াছিল। আহারান্তে দুপুরে মহারাজ ঐ ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এক সময়ে শয্যা হইতে তিনি জানালার বাহিরে একটি সূক্ষ্ম দেহীকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। মূর্তিটি বিরাটকায়—অনুমান পঞ্চবিংশ হস্ত দীর্ঘ এবং সেই অনুপাতে দেহের অবয়বগুলি বৃহৎ। ইহার মস্তকে দীর্ঘ কেশ ছিল, ইহার বর্ণ নীল, ওষ্ঠাধর রক্ত বর্ণ, এবং ঈষদরুণ আয়ত চক্ষু দুটী তেজোদীপ্ত ছিল। ইনি মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহারাজ তাঁহার ভাবভঙ্গীতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু মূর্তিটি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া যথাস্থানে থাকিলেন। মহারাজ বুঝিয়াছিলেন ইনি কোন প্রেতাত্মা বা সাহায্য প্রার্থী বিদেহী নহেন। তিনি ইহার উপর নিজ সাধনশক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু ফল কিছুমাত্র হইল না—তিনি নড়িলেন না। মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন ইনি কে, নিশ্চয়ই কোন শক্তিমান সূক্ষ্ম শরীরী, সাধারণ বিদেহী নহেন—কারণ যে শক্তির প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণও কম্পিত হন, তাহাতেও ঐ মূর্তি অটল থাকিলেন। মহারাজ তখন উঠিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিয়া, তাঁহার উপর পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে তুমি? শীঘ্র বল। কি চাও?" তখন ঐ বিরাট সূক্ষ্মশরীরী উত্তর দিলেন, "আমি শিবানুচর। প্রভু আদেশ করেছেন আপনাকে তাঁহার স্থানে যাইতে হবে।" মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "কোথায়?" তিনি তখন আমার বাটির বায়ু কোণের দিকে অঙ্গুলি দ্বারা দিগ্‌নির্দেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বৈকালে মহারাজ আমাকে একদিক দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐদিকে দূরে কোন প্রতিষ্ঠিত শিববিগ্রহ আছেন কি?" আমি বলিলাম, "আমার জানা কোন শিবমন্দির নেই, তবে দূরে ঐদিকে টপকেশ্বর নামে একটি অনাদিলিঙ্গ, ক্ষুদ্র তটিনীর ধারে, একটি পর্বতগুহাতে আছেন।" মহারাজ তখন দুপুরের ঘটনাটি আমাকে বলিলেন।

পর দিন ভোরে টপকেশ্বর নিজ মন্দির হইতে মহারাজকে দেখা দিয়া বলিলেন, "এখানকার লোকেরা আমাকে টপকেশ্বর শিব নামে প্রচারিত করেছে, কিন্তু যেরূপ দেখিতেছ, আমি বটুক ভৈরব।" মহারাজ তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাদি নিবেদন করিলেন। ভৈরব মহারাজকে বলিলেন, "যত শীঘ্র পারো, আমার মন্দিরে এসো, এবং আমার এই মন্ত্রটি প্রচার করো। যখন তোমরা আসিবে, তখন তোমার অমূল্যের বাগানের ফুল হইতে, তার সুন্দর ফুলের একটি মালা আমার জন্য আনিবে। তুমি আমার যৌগিক পূজা করিবে, আর অমূল্য যেন পুষ্পমাল্য, গন্ধ, পুষ্প, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, দুগ্ধ গঙ্গাজলাদির দ্বারা শিবপূজার ন্যায় আমার স্থূল পূজা করে, ও নৈবেদ্য অর্পণ করে।" ভৈরবের আদেশানুযায়ী আমরা সকল ব্যবস্থা করিলাম, এবং আমাদের প্রতিবেশিনী ডাক্তার কুমারী এল থাপন অনুগ্রহ করিয়া পরদিন প্রভাতে তাঁহার মোটর গাড়িতে আমাদের সকলকে লইয়া, টপকেশ্বরে যাইতে সম্মত হইলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় আমার বাটির নিকটবর্ত্তী, একটি শিব মন্দির দর্শনার্থ মহারাজকে লইয়া গেলাম। মন্দিরটি মিঃ সেন, একজন ধনী বাঙ্গালী, দ্বারা নির্মিত। নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। যতটা হইয়াছে, দেখিতে সুন্দর। গত সালে সেন সাহেবের দেহান্ত হইয়াছে, তাঁহার পুত্র অবশিষ্ট কার্য্য সম্পূর্ণ করিবেন কি না জানা নাই। বিগ্রহ

র্শনার্থ একটি মাত্র দ্বার আছে। ইহা কোঠের উত্তর দিকের দেয়ালে। পূর্ব বা পশ্চিম দিকের দেয়ালে কোন দ্বার করা হয় নাই, জানি না। মহারাজ বলিলেন এই নির্মাণ একটু দোষযুক্ত হইয়াছে। বিগ্রহে সত্তা অনুভূত হয় নাই। পূর্বে একটি বাঙ্গালী সাধু এই মন্দিরে পূজক ছিলেন, এবং অতি যত্নের সহিত শিবলিঙ্গকে পুষ্প, পত্রাদির দ্বারা সুন্দরভাবে সাজাইয়া পূজা, আরতি আদি করিতেন, উপদেশমূলক আখ্যায়িকাদি বলিতেন। এখন তিনি ডেরাদুনে অন্যস্থানে থাকেন।

মহারাজ যখন একদিন ঐ মন্দিরের সামনের রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি একটি অশরীরীকে দেখিলেন। কিন্তু তাহার সহিত কোন কথা না বলিয়া ভ্রমণে চলিয়া গেলেন। যখন ফিরিতেছিলেন, তখন অশরীরীটি রাস্তার নিকটে আসিয়া মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অভিবাদন জানাইল। মহারাজ যখন তাহাকে তাহার বর্তমান অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে ঐ শিব মন্দিরটিকে দেখাইয়া নিজের কপাল চাপড়াইল। কর্মফল ভোগ করিতেছে জানাইল। অশরীরীটি একটি প্রেত আত্মা ছিল। পরিধানে ভাল কাপড়, হাতে ছড়ি।

২০শে নভেম্বর প্রাতে আহ্নিকাদি সারিয়া, পূজার প্রয়োজনীয় উপকরণ, অনেকগুলি ভাল মাল্য, পুষ্প বিল্বপত্রাদি, মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ লইয়া আমরা টপকেশ্বর দর্শনার্থে রওনা হইলাম। পথে একটি হনুমানজীর মন্দিরে তাঁর দর্শন ও পূজন করিয়া কেণ্টোনমেণ্টের মধ্য দিয়া টপকেশ্বরাভিমুখে চলিলাম। মন্দিরের নিকটে মোটরগাড়ি রাখিয়া, পূজার দ্রব্যাদি লইয়া, সিঁড়ির ন্যায় রচিত প্রশস্ত পাকা বাঁধা ঢালু ধাপগুলি দিয়া উপত্যকায় নামিয়া বাঁদিকে গুহার প্রবেশের বাঁধান পথ ধরিয়া, গুহার প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলাম। গুহাটি নদীর (বা নালার) প্রদেশ হইতে অনুমান ১০।১২ হাত উচ্চে অবস্থিত।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি এই স্থান প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম। তখন পাড় হইতে মন্দির পর্যন্ত নামিবার একটি প্রস্তরাকীর্ণ ঢালু পথ ছিল, নদীর কোন বাঁধান ঘাট ছিল না, গুহার সংকীর্ণ পথটিও বাঁধন ও বেড়াঘারা রক্ষিত ছিলনা, এবং প্রবেশদ্বারে লোহার গারাদি ছিলনা যেমন এখন আছে। মনে হয় প্রধান গুহাটিও যেন এত প্রশস্ত ও বাসোপযোগী ছিলনা। নদীতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আসাযাওয়া ছিল এবং স্থানটি একটু ভয়াবহ মনে হইত। সাধু-সন্ন্যাসীরা মুখ্য ও পার্শ্ববর্তী গুহাগুলিতে থাকিতেন আর সাধনভজন করিতেন। তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম কখন কখন শৌচের জন্য বা জল আনিবার জন্য যাইয়া মাঝে মাঝে একাধিক সাধু নরখাদক ব্যাঘ্র কবলে জীবন হারাইতেন। সূর্যাস্তের পরে কেহ সাধারণতঃ নদীতে যাইত না। এখন স্থানটির অনেক উন্নতি হইয়াছে। মুখ্য গুহাটি সুরক্ষিত, এবং নদীর ধারে বসতি হওয়ায় এখন হিংস্র জন্তুদের ভয় নাই।

গুহায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ শুনিলেন সূক্ষ্ম দাসদাসী এবং অন্য বাদ্যাদির রব—ভৈরবের অনুচরেরা একজন সাধকের আগমনে বাদ্য বাজাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছে। আমরা অবশ্য কিছু শ্রবণ করি নাই।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উপরের চাতালে একজন পুরোহিত, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, এক দম্পতিকে সম্মুখে বসাইয়া হোমের দ্বারা কোন ক্রিয়া করিতেছিলেন। মন্দিরের পূজক—বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সাধক-ও ঐ চাতালে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ভৈরব-দেবের দর্শন করিয়া পূজা করিতে বসিলাম। মহারাজ সূক্ষ্ম পূজা করিলেন, আমি বটুকমন্ত্রে, যেমন পারিলাম, স্থূল পূজা করিলাম। আমার স্ত্রী এবং ডাঃ থাপনও পূজাদি করিলেন।

পূজাকালে মহারাজ বটুক ভৈরবের পূর্ণমূর্তি, দিব্য দৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

বটুক ভৈরবের মুখমণ্ডলের কণ্ঠপর্য্যন্ত বর্ণ শ্বেত, কণ্ঠদেশ হইতে নাভি পর্যন্ত দেহ ও চারি হস্ত কৃষ্ণবর্ণ, এবং নাভির নিম্নে সমস্ত শরীর (চরণ পর্য্যন্ত) অগ্নিবর্ণ। তাঁহার উপরের দুই হস্তে তিনি শূল ও খড়্গধারণ করিয়া আছেন। নিম্ন দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা ও বাম হস্তে ছিন্ন মুণ্ড। তাঁহার হস্তের কব্জী ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা এবং তাহার উপরে সর্প জড়ান। ইনি ত্রিনয়ন, মস্তকে জটা ও তাহাতে সর্প জড়ান। গলায় মুণ্ডমালা, রুদ্রাক্ষ মালা ও বিষধর ফণিরাজ জড়ান। ইঁহার পরিধেয় ছিল মহিষ চর্ম।

গিয়াছিলাম। আমি পূর্ণ শিব নহি—শিবের অনুচর—তাই শিবানুচর বলিয়াছিলাম।"

মহারাজ আমাকে বলিলেন, "তন্ত্রে আছে মহামায়ার সম্মুখে ভৈরব মাধ্বী সুরাপান করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই গুহাতেও স্থূলভাবে তত্রত্য বটুক ভৈরবের পাষাণ বিগ্রহের উপর (মুখে) জলরূপে সুধা প্রস্তর হইতে চুইয়া অবিশ্রান্ত টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে। হিন্দুধর্মের ও প্রকৃতির কি অপূর্বলীলা, তাহা না দেখিলে কিছুই বুঝা যায় না। এখানকার পূজক ও স্থানীয় অধিবাসীরা প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না। অনাদি লিঙ্গের উপর টপ্ টপ করিয়া অবিরত বারিপাত দেখিয়া নাম দিয়াছেন টপকেশ্বর।"

আমাদের পূজা শেষ হওয়ার পর বটুক ভৈরব প্রীত হইয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং মহারাজকে শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিলেন, "এখানকার পূজককে আমার প্রকৃত বীজমন্ত্র, "ওঁ বূং হুং বটুকভৈরবায় নমঃ" বলিয়া দাও, এবং এই মন্ত্রে পূজা করিবার নির্দেশ দাও।"

মহারাজ তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "আমি এই অঞ্চলে আজ প্রথমবার এসেছি, এবং কোন স্থানীয় লোকের সহিত আমার পরিচয় নাই। এত দিন ধরিয়া যাহা চলিতেছে, এবং যাহা লোকেরা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাকে আমি একটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত লোক যদি পরিবর্তন করিতে বলি, কেহ আমার কথা শুনিবে না, এবং প্রচলিত মন্ত্রকে যদি অশুদ্ধ বলি, শিব বলিয়া যিনি বিখ্যাত পূজিত, তাঁহাকে যদি বটুক-ভৈরব বলি, তাহা হইলে কলহাদি হইবে।" ভৈরব বলিলেন, "না! কলহ হইবে না।" ইহা শ্রবণ করিয়া মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "তবে আপনি আপনার আদিষ্ট কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করিয়া দিন।"

আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা পূজান্তে উঠিবা মাত্র স্থানীয় পূজক, (বাঙ্গালী সন্ন্যাসী) ছুটিয়া আসিয়া মহারাজের দুই হস্ত ধরিয়া পদপ্রান্তে প্রণতি নিবেদন করিতে উদ্যত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে বাধা দিয়া নিষেধ করিয়া বলিলেন, "দেবস্থানে কোনও মনুষ্যকে—সে যত বড় সাধক বা সাধিকা হউক না কেন, নমস্কার করিতে নাই। ইহাতে দেবতাকে অবমাননা করা হয়। দেবস্থানে দেবতাই নমস্য অন্য কেহ নয়।" পূজক তখন মহারাজকে উপরের চাতালে উপবেশন করিয়া আলাপ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি দেখিলাম যে দম্পতি হোমাগ্নির নিকট উপবিষ্ট ছিল, তাহারা ইতিমধ্যে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ছুটিয়া মহারাজের কাছে আসিয়া, নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল। স্ত্রীলোকটি মহারাজের হস্তে কিছু টাকা গুঁজিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিল। সেই সময়ে অন্য যাত্রীরা সেখানে আসিল। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মহারাজকে ভাল কলার ছড়া, অপর একজন মিষ্টান্ন নিবেদন করিল। মহারাজ কিন্তু গ্রহণ করিলেন না—টাকা কটি পূজককে দিলেন, ফল ও মিষ্টি যাত্রীদের ফিরাইয়া দিলেন। তারপর তিনি পূজকের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন এবং ভৈরব-দেবের নির্দেশ তাঁহাকে জানাইলেন। পূজকের প্রার্থনায় মহারাজ স্বহস্তে তাঁহাকে মন্ত্র লিখিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন "এই মন্ত্রে তুমি নিয়মিত পূজা করিবে, নহিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।"

ইহার পর পূজারী ঐ গুহায় ও অন্য গুহাগুলিতে অবস্থিত সকল মূর্তিগুলি আমাদের দেখাইলেন। ভৈরবের শিলা মূর্তি ব্যতীত অন্য কোন শিলা বা বিগ্রহে দেবসত্তা অনুভূত হয় নাই। বটুক ভৈরবের সাথে মহাশক্তি বর্তমান আছেন। গুহাগুলি নিভৃতে সাধনার জন্য উপযুক্ত স্থান। বর্তমান সন্ন্যাসী পূজারী একটি ক্ষুদ্র গুহাতে থাকিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া সাধনা করিয়াছিলেন।

পার্শ্ববর্তী একটি গুহার বহির্ভাগে একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালাইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, দুটি যুবক তাঁহার নিকটে বসিয়া তুলসী রামায়ণ হইতে গান ও ব্যাখ্যা করিতে-ছিল। পূজারী মহারাজকে বাহিরে লইয়া গিয়া নিভৃতে তাঁহাকে নিজ সাধনাদির সম্বন্ধে কিছু বলিতেছিলেন ও উপদেশ লইতেছিলেন, আমি গুহায় দাঁড়াইয়া রামায়ণ শুনিতেছিলাম। বিলম্ব দেখিয়া আমি ফিরিবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিলাম এবং পূজারীর নিকট বিদায় লইয়া উপরে উঠিবার পথে আর দুটি মন্দির দর্শন করিয়া, চড়াই উঠিয়া গাড়িতে ফিরিলাম।

গত শনিবারে মহারাজ বলিয়াছিলেন মা কালী ডাকিতেছেন। এখন আবার বলিলেন মা তাঁহার মন্দিরে যাইয়া পূজা করিবার আদেশ দিতেছেন। আমরা মার পূজার জন্ত পুষ্প মাল্যাদি ও অন্ত পূজার দ্রব্য আনিয়াছিলাম। মা কালীর মন্দিরে বহুবর্ষ পূর্বে গিয়াছিলাম। মন্দিরের স্থানটি কোথায় বিস্মৃত হইয়াছিলাম। মহারাজকে তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "মা এই রাস্তার শেষে ... হইতে ডাইনের পথটা দেখাচ্ছে; ঐ দিকেই যেতে হবে।" ডাক্তার থাপন গাড়ি চালাইতেছিলেন তাঁহাকে ঐ দিকে যাইতে বলিলাম। এক মাইলের অধিক যাইয়া এক স্থানে গাড়ি রাখিয়া আমি পাশের একটি রাস্তায় যাইয়া একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম কালীমন্দির কোথায়? ... জন বলিয়া উঠিল "আপনি মন্দিরের সামনেইত দাঁড়াইয়া আছেন"। তখন আমরা মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মন্দিরের দ্বার তালা বন্ধ করিয়া একটি লোক—সম্ভবতঃ মন্দিরের পূজারী চলিয়া যাইতেছে ... মন্দির বন্ধ করিবার সময় হইয়াছিল। আমি মনে ভাবিলাম মার আহ্বানে আসিয়াও পূজা না করিয়াই ... তে হইবে কি? না! পূজারী ফিরিলেন এবং দ্বারটি খুলিয়া দিলেন। মন্দিরে মা কালীর মূর্তিটি এক ...ণের দিকে ছিল এবং ইহা ছাড়া শিব, দুর্গা ও গণেশ ...দের মূর্তিও ছিল। আমরা পূজাদি করিলাম এবং ...র পর মন্দির পুনঃ বন্ধ করা হইল। মহারাজকে কালী বলিলেন, "এরা আমাকে স্থানচ্যুত করেছে আর ...র নিজ বীজ মন্ত্রে পূজা হইতেছেনা। তুমি এই বিষয়ে ...র বল"। মহারাজ মাকে নিবেদন করিলেন, "মা! ... জানো আমি এখানে অপরিচিত। আমার কথা শুনবে না। তুমি যদি যোগাযোগ করে দাও তাহলে ...র নির্দেশ মত বলা সম্ভব, এবং তা'তে কাজও হবে।" ভৈরব যেমন ঘটাইয়াছিলেন, মা কিন্তু সেই রূপ করিলেন না, তাই তাঁহার পূজা সম্বন্ধে পূজারীকে বলা হয় নাই।

ডেরাদুনে অবস্থান কালে মহারাজকে সাথে আমি ডেরাদুন ও মুসৌরীর কয়েকটি দেবালয়ে গিয়াছিলাম। ডেরাদুনে একটি বহুপূজিত শিবমন্দিরে শিব ও দেবীর বিগ্রহে অল্প সত্তার অনুভব হইয়াছিল এবং মুসৌরীর লাইব্রেরীর নিকটস্থ দেবালয়টিতেও নারায়ণ-বিগ্রহে সত্তা আছে। ডেরাদুনে বৃক্ষে দেবীর ছবি ঝুলাইয়া মূলে সিন্দুর ফুলপাতা ধূপ দীপাদি দিয়া একটি স্থান দেবস্থান বলিয়া প্রচারিত। মহারাজ তথায় যাইয়াই বলিলেন, "এখানে কোন দেবসত্তা নেই, ঐ গাছে দুটি প্রেত আত্মা দেখছি। এরা বলছে ফকীর ছিল। একজন ৭০ বৎসরের অধিক প্রেত হয়ে আছে, অপরটি শতবর্ষেরও অধিক প্রেতত্ব ভোগ করছে।" তাহারা মহারাজকে অভিবাদন করিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া প্রেতত্ব হইতে মুক্তির জন্ত মহারাজের অনুগ্রহ প্রার্থী হইল। মহারাজ এদের নাম বলিয়াছিলেন আমি লিখিয়া রাখি নাই। মহারাজ কর্মফল ভোগে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাদের যাইতে বলিলেন। শুনিলাম ঐ স্থানে দুটি কবর ছিল।

একদিন মহারাজ বলিলেন, "কৈলাশেও যেতে হ'বে, বাবা ও মা (শিব ও পার্বতী) ডেকেছেন।" আমরা জানিতাম মহারাজ সূক্ষ্ম শরীরে বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে তিনি যে-কোন স্থানে সূক্ষ্ম শরীরে যাইতে পারেন। কৈলাশে বা দূরস্থ স্থানে বা লোকে সূক্ষ্ম দেহে যাওয়া আসা তিনি সাধারণতঃ রাত্রিতে করেন। সূক্ষ্ম দেহে ভ্রমণ কালে স্থূল দেহটির রক্ষা প্রয়োজনীয়-বিশেষতঃ দুষ্ট প্রকৃতির বিদেহী হইতে। ইহারা স্থূল দেহ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে পারে যদি সাধক শক্তিমান না হয়। স্থূল দেহ ত্যাগ করিবার সময় এবং পুনঃ ইহাতে ফিরিবার সময় বোধ হয় স্থূল দেহে কিছু প্রক্রিয়া হয়, কারণ যে রাত্রিতে মহারাজ কৈলাশে গিয়াছিলেন তাহার পর দিন তাঁহাকে ক্লান্ত মনে হয়েছিল। কৈলাশে যাতায়াতে ও শিব সন্নিধানে অবস্থানে মোট প্রায় তিন ঘণ্টা তিনি (অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরে) স্থূল দেহের বাহিরে ছিলেন। তিনি এক বার বলিয়া ছিলেন অবলোকনের বিষয় যদি নিকটস্থ হয় তাহা হইলে এক স্থানে বসিয়াই উহা দেখা যায় যদি দূরস্থ হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্ম শরীরে যাইয়া দেখিতে হয়। ডেরাদুনে বসিয়া ১১০ মাইল দূরস্থ গাজিয়াবাদে তাহার বাড়ির বিষয়ে অনেক কিছু আমার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে আমার উপস্থিতিতে তিনি বলিলেন এবং সে উহা সব সত্য বলিয়া স্বীকার করিল। ইহা নিকটস্থদর্শনের একটি উদাহরণ। মাকড়দহ হইতে সূক্ষ্ম শরীরে এক হাজার মাইল

দূরে ডেরাডুনে আমাকে দেখিয়া যাওয়া, ইহা সূক্ষ্ম শরীরে দূর ভ্রমণের উদাহরণ। ইহা হইয়াছিল ১৯৫৫ ইং অক্টোবর মাসে যখন আমি ডেরাডুনে সাইকেল হইতে পড়িয়া আহত হইয়াছিলাম এবং ঐ সংবাদ পাইয়া তিনি সূক্ষ্ম শরীরে আমাকে দেখিবার জন্য ডেরাডুনে আসেন, এবং আঘাত কষ্টকর হইলেও ক্ষতিকর হইবে না আর উহা প্রারব্ধানুযায়ী হইয়াছে, ইহা দেখিয়া ফিরিয়া যান।

ডেরাডুনে মহারাজ আমাদের সাথে আছেন ইহা আমরা যথা সম্ভব প্রকাশ করিতাম না, কারণ তিনি অধিক লোক-সমাগম পছন্দ করেন না—বিশেষতঃ যখন অধিকাংশ সাক্ষাৎ প্রার্থী বিষয় বাসনা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা লইয়া তাঁহার কাছে যায়। সাধনা সংক্রান্ত উপদেশের প্রার্থী বিরল। কয়েক জন দীক্ষা প্রার্থীদের আবেদন তিনি গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত জানিয়া তাহাদের দীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কাহাকেও দীক্ষাদান করেন না। তাঁহার শিষ্য একটিও নাই। সদ্‌গুরুর নিকট উপযুক্ত শিষ্য যাহা কিছু পাইতে পারে তাহা সমস্তই তাঁহার কৃপায় দীক্ষার্থী তাঁহার নিকট পায়—প্রয়োজনীয় স্থূল পূজা হোমাদি করা, তাঁহার কাছে ইঙ্গিতে দীক্ষার্থীর ইষ্ট মন্ত্রাদি জানিয়া যথা সময়ে যথাবিধি তাহা তাহার কর্ণে দেওয়া ইত্যাদি সকল স্থূল কর্ম তাঁহার আদেশে ও পরিচালনায় অন্য কেহ করে। তিনি স্বয়ং দীক্ষার্থীর মন্ত্রচেতন করা (কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা সুষুম্নার দ্বার উন্মুক্ত করা, শক্তিদান করা, তাহার কল্যাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য করা, ইত্যাদি করেন। তাঁহার দক্ষিণা হয় যে কোন একটি ফল—ইহাও তিনি ইষ্টকে নিবেদন করিয়া দীক্ষার্থীকে ফিরাইয়া দেন।

মন্ত্র-গুরু হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি অতি দুর্লভ। কারণ গুরু পদ বাচ্য তিনিই যাহার নির্দিষ্ট সাধন বৈভব আছে, যিনি শিষ্যের যথার্থ কল্যাণকামী এবং সাধনপথে তাঁহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণে সমর্থ। আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিন্দুপীঠে যিনি সাধন করিতেছেন—ইহাই গুরু হইবার জন্য ন্যূনতম সাধন বৈভব। ইহা যাঁহার আছে তিনি নিম্নতম স্তরের গুরু। যিনি সবিকল্প (সম্প্রজ্ঞাত) সমাধি লাভ করিয়াছেন তিনি উত্তম গুরু হইতে পারেন।

যাঁহাদের সাধন স্তর বিন্দুপীঠের নিম্নে তাঁহারা প্রকৃত গুরু পদ বাচ্য নহেন। আজ্ঞা চক্রে কুলকুণ্ডলিনী সহ সাধনা করিলে দিব্য দৃষ্টি লাভ হয় না এবং ইহার নিম্নে রজোগুণের স্থান। গুরুর কর্তব্য পূর্ণ ভাবে পালন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সাধন বল ঐ স্তরে হয় না। মন্ত্র যোগে দীক্ষা দেওয়ার পূর্বে ভাবী শিষ্যের সম্বন্ধে গুরুকে অনেকগুলি বিষয় নিজ সাধন বলে দেখিয়া লইতে হয়। কখন কখন কেবল গত জন্মের সাধনাই নহে তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনাও দেখিতে হয়। গুরু তত্ত্ব ও গুরুর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মহারাজ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অন্য প্রবন্ধে প্রকাশ করা হইবে।
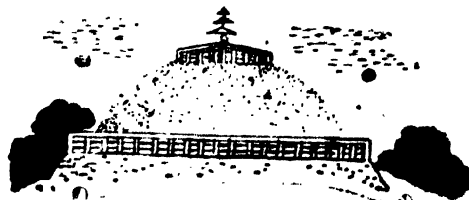
বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রামায়ণের ঘটনা ও রামায়ণ-কাহিনী খ্রীষ্টপূর্ব একবিংশ শতাব্দীর ধ'রে হিসেব করলে আমরা দেখতে পাই যে, একবিংশ শতাব্দীতে নেপাল বাদে সমগ্র উত্তরাপথ বা আর্যাবর্তে আর্যবিস্তার সম্পূর্ণ হয়ে আছে। অন্তত মিথিলা পর্যন্ত পূর্ব ভারতে আর্য সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মহাভারতের যুগের মতো বসতি অত ঘন নয়, লোকসংখ্যাও কম; তা ছাড়া অনার্যরা মহাভারতের যুগের মতো প্রায় বশীভূত নয়, বরং শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। উত্তরাপথেও তাদের উপদ্রবে আর্যদের সন্ত্রস্ত থাকতে হত; দাক্ষিণাত্যে তখন পর্যন্ত আর্যবিস্তার সাধিত হয় নি। অগস্ত্য মুনি রামচন্দ্রের আগে দাক্ষিণাত্যে আর্য সভ্যতার বার্তা বহন ক'রে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেন নি। সম্ভবত তিনি লঙ্কার রাক্ষস জাতির লোকদের দ্বারা নিহত হন।

রামচন্দ্রের সময় থেকে দাক্ষিণাত্যে আর্যবিস্তার সুরু হয়। মহাভারতের যুগে সে বিস্তৃতি যতটুকু হবার, হয়ে গেছে। গুপ্ত বংশের পতনের পর গত প্রায় দেড় হাজার বছরে সমগ্র দক্ষিণাপথ কখনও উত্তরাপথের আর্যবংশোদ্ভূত জাতিদের দ্বারা অভিভূত হয় নি। তবে তুর্কি, মুগল আর ইংরেজদের দ্বারা হয়েছে। বর্তমান ভারতে আর্য ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী দুটির অবস্থানগত অনুপাত যা, তা মোটামুটি অশোকের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অশোক ভারতীয় আর্যদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত ক'রে এবং আরো নানাভাবে শোণিত-মিশ্রণের যে-ব্যবস্থা ক'রে দেন, তাতে পরবর্তীকালে আর ভারতীয় আর্যদের বেশী তেজ ও উৎকর্ষ অবশিষ্ট ছিল না। নেপাল ও সিংহলে কিরাত ও রাক্ষস নামক অনার্য জাতিদের সরিয়ে আর্যভাষা পরবর্তীকালেও সম্প্রসারিত হয় বটে, কিন্তু দ্রাবিড়দের অপসারণ আর সম্ভবপর হয় নি।

বররুচির প্রাকৃত প্রকাশ ব্যাকরণে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের উল্লেখে এবং তার প্রামাণিক উৎকর্ষের দাবিতে বোঝা যায় যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে আর্য সভ্যতা প্রাচীন হয়ে এসেছে। রামচন্দ্রের সময়ে বিন্ধ্য পর্বতমালার ঠিক দক্ষিণে ভারতীয় আর্যদের বসতিই ছিল না। কিন্তু পরবর্তী আড়াই হাজার বছরে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সংক্রান্ত। কেন্দ্রই হয় মহারাষ্ট্র।

বিদ্যানিধি প্রমাণ করেছেন যে, বেদ বিভাগ খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪১ সালে হয়েছিল। পরে এ-সম্বন্ধে আরো আলোচনা করা যাবে। বেদ-বিভাগ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দীর হলে যিনি বেদ-বিভাগ করেন এবং সঙ্কলন ক'রে প্রথমবার বেদকে গ্রন্থবদ্ধ করেন, তিনিই প্রথম বেদব্যাস। সেকালে বেদব্যাস উপাধিবিশিষ্ট অনেক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা পুরাণের বিভিন্ন গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে সঙ্কলন ক'রে রাখতেন। আমরা ভুল ক'রে ভাবি যে, একা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদ সঙ্কলনের কাজ শেষ ক'রে সমস্ত মহাভারত ও যাবতীয় পুরাণাদি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রথমে বেদব্যাস শব্দের যে অর্থ ছিল পরে তা পরিবর্তিত হয়ে যে কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিতকে ঐ বিশেষণে ভূষিত করা হত বিশেষত যদি তিনি বেদের অনুলিপি রচনাসংক্রান্ত কোন কাজে নিযুক্ত থাকতেন।

তা হলে ২৪৪১ সালে প্রথম বেদ-বিভাগের সময়ে যিনি প্রথম বেদ-সম্পাদনা করেন, তিনিই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হ'লে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধও খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতকের হয়ে পড়ত। অবশ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কনিষ্ঠ বা পরবর্তী ব্যাস হয়ে পরে আর একবার চূড়ান্তভাবে বেদ সম্পাদনা ক'রে থাকবেন। বর্তমানে লভ্য ঋগ্বেদের প্রাচীনতম পুঁথির ভাষা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের হতে পারে। কারণ, যতদূর জানা যায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নই ঐ সময়ে শেষবারের মতো বেদ-সম্পাদনা করেছিলেন। বেদ পাঠ ও বিশ্লেষণ ক'রে তার ভাষা যদি এখন পণ্ডিতদের কাছে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর

চেয়ে বেশি প্রাচীন মনে না হয়ে থাকে, তা হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রথম-রচিত ঋক্‌গুলির ভাষা কোন্ সময়ের, সেটা জানা চাই। শেষবারের সম্পাদনার ভাষা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর ব'লে ঋগ্বেদ পঞ্চদশ শতাব্দীতেই রচিত হয়েছিল বা বৈদিক আর্যরা ঐ সময়ে প্রথম ভারতে আসেন বা বৈদিক সভ্যতার কাল ঐ শতাব্দী থেকে আরম্ভ, এমন-সব অদ্ভুত ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

বৈদিক সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ শুধু ভাষার ওপর নির্ভরশীল নয়, ঋগ্বেদে উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনার অনুষ্ঠান-কালের নিরূপণ মহত্তর প্রমাণ উপস্থাপিত করে। ১৯৬৫ সালে যদি কেউ আধুনিক ভাষায় ধর্মপালের দিগ্বিজয় বর্ণনা করে, তাহলে সেই দিগ্বিজয়কাহিনী প'ড়ে তার ভাষা থেকে মনে হবে, ধর্মপাল বিংশ শতাব্দীর লোক। এই রকম যুক্তি অবলম্বনে ধরা হয় যে, রামায়ণ মহাকাব্যের ভাষা যখন অমুক শতাব্দীর, তখন রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীও সেই শতাব্দীর ঘটনা। অনুরূপ ব্যাপার বৈদিক সাহিত্যেও সংঘটিত হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের ভাষায় বহু প্রাচীনতর কালের ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সে-সব ক্ষেত্রে ভাষা পঞ্চদশ শতকের, কিন্তু বর্ণিত ঘটনা পঞ্চবিংশ শতক কি আরো পুরোনো আমলের।

রাম প্রথম বেদ-বিভাগের পরের লোক। রামের সময়ে বেদের শাস্ত্রীয় শাসন অত্যন্ত কঠোর। তিনি যজুর্বেদ-রচনাকাল বা সঙ্কলন-কালের অর্থাৎ ২৪৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে না পরে, সেটা বোঝা চাই। শূদ্ররা আর্যসমাজে গৃহীত না হলে বেদপাঠ তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ—এমন অনুশাসন ধার্য হতে পারে না। ঐ নিষেধাজ্ঞা বেদ-বিভাগ ও সঙ্কলনের পরেই জারি হতে পারে, তার আগে নয়। বেদ বিভাগের পরেই তার পঠন-পাঠনের সীমা নির্দিষ্ট হবার কথা। বেদ বিভাগের আগে বর্ণাশ্রমধর্ম বা বর্ণাশ্রমবিভাগও ঋগ্বেদের যুগে তত স্পষ্ট হবার কথা নয়। রামচন্দ্র কর্তৃক শূদ্র তপস্বীর প্রাণনাশ থেকে বোঝা যায় যে, বর্ণাশ্রমবিভাগ তখন পুরোহিত বা ঋষিশাসিত ভারতীয় আর্যসমাজে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সব দিক দিয়ে দেখলে বেদ-বিভাগের পর বর্ণাশ্রম ভারতীয় সমাজে রামচন্দ্র খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতকের পরে এবং একবিংশ শতকের হওয়া সম্ভবপর।

রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষার সাহিত্য-গ্রন্থ পুরাণগুলিতে দেবাসুরের যুদ্ধবৃত্তান্ত বারবার উল্লিখিত। অথচ ঋগ্বেদে প্রথম দিকে "অসুর" শব্দ সদর্থে সম্মানবাচক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। পরবর্তীকালে ইরাণীয় আর্যদের সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে অসুর শব্দের অর্থের অবনতি ঘটে। কিন্তু দেবাসুরের যুদ্ধ খালি ভারতীয় আর ইরাণীয় আর্যদের যুদ্ধ নয়, মিলিত বা বিচ্ছিন্ন আর্যজাতিসমষ্টির সঙ্গে খাস অসুর বা আসুরীয় বা আসীরীয় জাতির যুদ্ধও বটে। যখন অসুর শব্দের দ্বারা ইরাণীয়দেরও বোঝানো হতে লাগল, তখন থেকে দেবাসুরের যুদ্ধ মানে ভারতীয় আর্য আর ইরাণীয় আর্যদেরও যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। দেবাসুর সংগ্রামের কাল নির্ণয় করতে পারলে ভারতীয়-আর্যভাষা ও সভ্যতার স্বরূপ ও কাল, দুই-ই ভালো ক'রে বোঝা যায়। বৈদিক সভ্যতা ও সাহিত্যের ভাষার কাল নিরূপণের পথে দেবাসুর-সংগ্রামেরও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা ক'রে নেওয়া যেতে পারে।

রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলী ঘটবার আগেই দেবাসুর-সংগ্রামের প্রথম পর্যায় আরম্ভ হয়ে যায়, তার প্রমাণের অভাব নেই। তারকাসুর-বধ রামচন্দ্রের আবির্ভাবের আগেই সমাপ্ত হয়েছে। বিশ্বামিত্র সে-কাহিনী রাম-লক্ষ্মণকে শুনিয়েছেন।

"অসুর" শব্দের দ্বারা হিন্দু পুরাণে সেমীয় অসুর জাতিকেই বোঝাবার কথা। কিন্তু ধর্মবিরোধের জন্যে বৈদিক ও আবেস্তাপন্থীরা পরস্পরকে দেবাসুর উপাসক বলত, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেব—ভারতীয় আর্য-দেবতা ও বৈদিক আর্যজাতি; ভারত-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠীর মূল ভাষাভাষী আদিম আর্য জাতিকেও "দেব" বলা হয়ে থাকবে। অসুর—ইরাণীয় আর্যদেবতা ও আবেস্তাপন্থী পারসিক আর্যজাতি। এ্যাসিরিয়ান্ বা আসীরীয় জাতিকেও অসুর বলার কথা। কিন্তু বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের উপাসনা ত্যাগ ক'রে ইরাণের আর্যরা হঠাৎ অসুর-মেধা বা আহুর্ মজ্‌দার উপাসনা ধরল কেন, সেটা বোঝা দরকার। বৈদিক অসুরমনা পারসিক আক্রমন।

পশ্চিমে অবস্থিত থান অসুর জাতির দেবতার নাম অসর্‌মজ্‌দা। এদের সংলগ্ন প্রতিবেশী ইরাণি আর্যেরা ক্রমশ এদের বীরত্বে ও শক্তির অস্ফোটে মুগ্ধ হয়ে বৈদিক দেবতাদের পরিত্যাগ ক'রে অসুর জাতির দেবতা অসর্‌মজ্‌দাকে গ্রহণ করে। করা স্বাভাবিক। সে-ক্ষেত্রে বিরক্তচিত্ত ভারতীয় আর্যরা আসীরীয়দের সঙ্গে ইরাণি আর্যদের সমপর্যায়ভুক্ত ক'রে উভয় জাতিকেই এক বিশিষ্ট জীবনাদর্শের পূজারীরূপে একত্র অসুর ব'লে উল্লেখ করবে, এটা সম্ভবপর। অসর্‌মজ্‌দা নামটির সঙ্গে আহুর্‌মজ্‌দা নামের মিল ঐতিহাসিক ঔৎসুক্যের বিষয়।

প্রকৃত অসুর জাতি সেমীয়, ইরাণি অসুর উপাসকরা আর্য। উভয়ের শোণিতমিশ্রণে বর্তমান পারসিক জাতির উদ্ভব। এই মিশ্রণ আরো বৃদ্ধি পায় পারস্যে আরবের সেমীয় ধর্ম ও জাতির আগমনে। বর্তমান ইরাণি জাতীয় চরিত্রে এই আর্য-সেমীয় মিশ্রণের কুফল স্পষ্ট দেখা যায়। আডল্‌ফ্‌ হিটলারের মাইন কম্‌প্‌ফ্‌ গ্রন্থের এই অভিযোগও সত্য যে, সেমীয় জাতিগুলির সাহচর্যে বারবার আর্য-জাতিদের বিশুদ্ধি ও উৎকর্ষ নষ্ট হয়েছে।

বিচ্ছিন্ন হবার আগে ইরাণীয় আর্যরা বৈদিক আর্যদের সঙ্গে একই দেবতার উপাসনা করত। মিত্র ও ইন্দ্র, দুই শাখার আর্যদের উপাস্য দেবতা ছিলেন। কিন্তু বৈদিক জাতির মধ্যে ইন্দ্রের প্রাধান্য ছিল; আবেস্তায় তিনি বেরেথ্রঘ্ন—বৃত্রঘ্ন, এই নামের দেবতারূপে স্বীকৃত, কিন্তু নগণ্য দেবতারূপে পরিগণিত। তার কারণ, ইন্দ্র-উপাসনা বৃষ্টি প্রধান দেশেই সম্ভবপর অথচ ইরাণে বৃষ্টির পরিমাণ কম। পক্ষান্তরে, মিত্র বেদে অপ্রধান দেবতা না হলেও শ্রেষ্ঠ পদমর্যাদা লাভ করেন নি; কিন্তু ইরাণীয়দের কাছে তিনিই সেরা দেবতা ব'লে গণ্য হতেন। কারণ, ইরাণে গ্রীষ্ম প্রবল, বারিপাত সামান্য। মিত্র গ্রীষ্ম বা অগ্নি বা তাপাধিক্যের দেবতা। পাঞ্জাবে এখনকার দিনে গ্রীষ্ম প্রবলতম ঋতু নয়। মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে এক সময়ে বারিপাত ও প্লাবনের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন হবার পর পারসিকরা তাদের স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থে বৈদিক প্রধান দেবতাদের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু মাত্র অবশিষ্ট রেখেছিল। অসুর জাতির প্রভাবে ইরাণীয় আর্যদের মধ্যে স্থূল ভোগবাসনা অতি প্রবল হয়ে ওঠে। তাদের জীবনাদর্শের এই দিকটা ভারতীয় আর্যদের বিরাগের কারণ হয়। বটকৃষ্ণ আবার এই দিকটার জন্যেই তাদের প্রশংসা করেছেন। ইরাণীয় আর্যদের জীবনরসরসিকতা প্রসিদ্ধ, ইসলামের উপপ্লবও ইরাণীয়দের জীবনতৃষ্ণা সঙ্কুচিত করতে পারে নি। সুফিদের কবিতায় তার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। বলা হয় তো বাহুল্য নয় যে, সুফিদের কাব্যসাধনা ও অধ্যাত্মদৃষ্টি মোটেই ইসলামের অনুমোদিত নয়।

বিশ্বানিধির মতে, ইরাণীয়দের সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের বিচ্ছেদের কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দী; কিন্তু বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতির ধারণা, সময়টা বিংশ শতাব্দী। আসলে বেদ-বিভাগের পরেই ব্যাপারটা ঘট্‌বার কথা। বেদ-বিভাগ পঞ্চবিংশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে দু বার হয়ে থাকলে ঐ দু বারের কোন একবারের অব্যবহিত পরে ঐ বিচ্ছেদ হবার কথা। ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে এক দলের মত, ঐ বিচ্ছেদ প্রথমবারের পর অর্থাৎ ওয়েল্‌স্‌, বটকৃষ্ণ প্রভৃতির মত অনুসারে বিংশ শতকেই ঘটেছিল। অন্য দলের মত, দ্বিতীয়বারের পর অর্থাৎ সুনীতিবাবু, সুকুমারবাবু প্রভৃতির মত অনুসারে ঐ বিচ্ছেদ দশম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সাধিত হয়। জরথুস্ত্রের মতামত-সম্বলিত পুঁথির ভাষা কিন্তু ঋগ্বেদের তুলনায় অনেক অর্বাচীন, সে পুঁথি অষ্টম শতকের ভাষার পরিচয় বহন করছে।

সম্ভবত আর্যদের গৃহবিচ্ছেদ অনেক দিন আগে হয়ে থাকলেও আবেস্তার পুঁথি সঙ্কলিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-সপ্তম শতকে; সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদ ও অন্যান্য বেদ শেষবারের মতো সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে। অসুর ও গ্রিকদের ক্রমান্বয়ে পরিচালিত সামরিক অভিযানের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত ইরাণীয়দের ধর্মগ্রন্থ সঙ্কলনে, সম্পাদনে ও সংরক্ষণে বিঘ্ন হওয়া স্বাভাবিক; তা ছাড়া ইরাণভূমির এক বৃহদংশ বরাবর ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে থেকে গেছে; সে সব জায়গায় বৈদিক-ধর্মের প্রাধান্য দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকা অসম্ভব নয়।

প্রাপ্ত পুঁথির ভাষা-বিচারে মনে হবার কথা যে, বেদ-সমূহ যখন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের আর আবেস্তা অষ্টম

শতকের, তখন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। বস্তুত ভারতীয় আর ইরাণীয়দের গৃহবিচ্ছেদ এই সময়ে হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি এই জন্যেও যে, এই সময়ে মহাভারতে-বর্ণিত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ভারতীয় আর্যদের ক্ষাত্র শক্তি নিস্তেজ আর অসুর জাতির বিশেষ বাড়বাড়ন্ত। অসুরদের সামরিক শক্তি আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ইরাণীয় আর্যদের চোখ ঝলসে দেওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয়-ইরাণীয় আর্য-বিচ্ছেদ এই সময়ে সম্পন্ন হোক বা না হোক, প্রকৃত অসুর জাতির সঙ্গে আর্যদের বিরোধ আরো বহু দিন আগের। ঋগ্বেদের গোড়ার দিকে অসুরপ্রশংসা থাকলেও পরে যখন বেদগ্রন্থে অসুর নিন্দিত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিতেও অসুরকে শত্রুভাবাপন্নরূপে দেখানো হয়েছে, তখন বেদ-বিভাগের কাছাকাছি সময়ে আর্য-অসুর সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। খাস অসুর জাতির সঙ্গে বেদ বিভাগের আগেই আর্যদের শত্রুতা নিশ্চয় হয়েছিল। তা না হলে বেদগ্রন্থে অসুরনিন্দা থাকত না। আবেস্তা রচিত হবার আগেই আর্যরা বিভক্ত হন এবং বৈদিকরা ইরাণীয়দেরও "অসুর" ব'লে ধার্য করেন। মূল অসুর জাতির সঙ্গে আর্যদের সংঘর্ষ বহু পুরাতন হলেও ইরাণীয় আর্যদের আসুরিক রূপান্তরের সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের সংঘাত খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ সাল থেকে পরবর্তী কালে হয়ে থাকবে— খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর আগে সম্ভবত হয় নি। তার কারণ আর্য-অসুর সংঘাতের ইতিহাসেই পাওয়া যাবে।

আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে উত্তর-পশ্চিম পারস্যে বর্তমান আজেরবাইজান এলাকায় অসুর জাতির প্রাধান্য সুরু হয়। এদের উদ্ভব হয়েছিল আরো আগে। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে আর্যদের সঙ্গে তাদের সংগ্রাম চলতে থাকে প্রায় বিরামবিহীনভাবে। জাতিগত ও ধর্মগত, দুই কারণেই সে-বিবাদ চলত। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, দু বার অসুর জাতি প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে: একবার খ্রীষ্টপূর্ব বিংশ শতক নাগাদ, আর একবার খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতক নাগাদ। ভারতীয় আর্যদের জ্ঞাতি হিত্তিদের সঙ্গে তারা প্রথমবার পরাক্রান্ত হবার সময়ে অবিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করত। এই সব যুদ্ধে হিত্তিরা অন্যান্য আর্য জাতি-

দেবাসুরের সংগ্রাম বলা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০-৬০০ সালে দ্বিতীয়বার পরাক্রান্ত হবার সময়ে তারা ইরাণীয় আর্যদের এতটা অভিভূত করে যে, ইরাণীয়রা ধর্মের ক্ষেত্রে সেমীয় প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিয়ে বৈদিক আর্যদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘোষণা করে। ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ কাস্সি বা কাসীয় জাতি উত্তর-পশ্চিম ইরান থেকে বাবিলনে গিয়ে ৫০০ বছর রাজত্ব করে। এরা ছিল আর্যভাষী। তাদের প্রধান দেবতা সূর্য আর মরুৎ। এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়ায় ১৯০০-১২০০ খ্রীষ্টপূর্ব সালে যে হিত্তি আর মিতান্নিরা রাজত্ব করত, তারা তো আর্যভাষী ছিলই। ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব সাল নাগাদ তাদের দুই জাতির নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধের অবসানে সন্ধিপত্রে বৈদিক আর্য দেবতারা উল্লিখিত হয়েছেন দেখা যায়। হিত্তি ভাষায় লিখিত অশ্বশিক্ষার বইএ সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেছে। মিশরের সম্রাট আখেনাটন এক মিতান্নি রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রে তাঁর কাছে সূর্যোপাসনা গ্রহণ করেন। বিদ্যানিধি তাঁর বইএ লিখেছেন: "পশ্চিম দেশের পণ্ডিত দেখাইয়াছেন, আখেনেটন সূর্যস্তুতি করিয়াছেন; সে স্তুতি অবিকল ঋগ্বেদের সাবিত্রস্তুতির অনুবাদ।" আখেনাটন বা আটন দেবতার উপাসক এই রাজার সময় সিনুহে-র রচনার দ্বারা ১৩৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ব'লে নিরূপিত হয়েছে।

আখেনাটন খুব শক্তিশালী প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক সম্রাট ছিলেন না; কোন বড় বংশও তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তাঁকে তাঁর জীবিত কালেই আমন দেবতার পূজকেরা উৎখাত করে। মিশরে একেশ্বরবাদ তথা সূর্যোপাসনাও এর পর বন্ধ হয়ে যায়। এমন অবস্থায় সুদূর মিশরের এক দুর্বল রাজার রচনার অনুকরণ করা শক্তিশালী দাম্ভিক রক্ষণশীল বৈদিক আর্যদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বরং ভারত-ইরানের ইন্দো-ইরাণীয়দের সবিতা-স্তুতির আদর্শ গ্রহণ করাই দুর্বলচিত্ত কিন্তু আদর্শবাদী রাজার পক্ষে স্বাভাবিক। এ-সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ sinuhe-র কাহিনীতে পাওয়া যাবে যা ইতিহাস-অনুমোদিত।

ভারত-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠীর আলোচনায় এবং আখেনাটন-বিরচিত সূর্যস্তুতিপাঠে বোঝা যায় যে, ২০০০-১৫০০

থেকে মিশর পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। ঋগ্বেদ আর মাত্র ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দের বলার উপায় থাকে না। ভারতীয়-আর্য ভাষাসমূহের তথা ভারতীয় আর্যজাতি সমূহের তথা ভারত-ইতিহাসের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে আমাদের অন্তত মহাভারতের যুদ্ধকে দিগ্‌দর্শনরূপে গ্রহণ ক'রে এগোতে হয়।

মহাভারত ও অন্যান্য প্রাক্-পাণিনি ভারতীয়-আর্য সাহিত্য থেকে দেবাসুরের সংগ্রাম-কালটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃত অসুর জাতি কাল্‌দীয় জাতির কাছে ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করে। বিজ্ঞানিধির মতে, খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের ইতিহাসে উল্লিখিত কাল্‌দীয় জাতি সম্ভবত আর্য। কাসাইট বা কাস্‌সি জাতির মতো যারা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকে বাবিলন অধিকার করে, কাল্‌দীয় জাতিও খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে বাবিলন দখল করে। ৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দেও তারা সেখানে ছিল। আলেকজান্দরের মৃত্যু (৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সংঘটিত হবার অব্যবহিত পরে প্রায় ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বেরোসস্ বা বুরঃ নামে এক ধর্মযাজকের রচনায় প্রতিফলিত বৎসরগণনা থেকে বোঝা যায় যে, কাল্‌দীয়রা ভারত থেকে পারস্য উপসাগরের তীরে গিয়ে পড়েছিলেন।

কাস্‌সি ও কাল্‌দীয়দের দ্বারা হাজার বছরের ব্যবধানে দুবার অসুর জাতি পর্যুদস্ত হয়। দেবাসুরের যুদ্ধ-বর্ণনা পড়লে বোঝা যায় যে, অসুরদের সঙ্গে আর্যদের বহু পুরুষ ধ'রে দীর্ঘকাল দফায় দফায় যুদ্ধ হয়েছিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের প্রাক্‌কালে অসুররা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে না গেলেও একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। জরথুস্ত্র ও গৌতম বুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে এদের চরম আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই সময় ইরাণীয় আর্যদের ওপর অসুরদের প্রভাব বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। মহম্মদীয় ধর্ম প্রচারের আগে পর্যন্ত ইরাণীয় আর্যরা আর্যধর্ম ও অসুরধর্মের সংমিশ্রণে গঠিত ধর্মাচার পালন করত; পূর্ব দিকের বৈদিক ও পশ্চিম দিকের অসুর আচারের মিলিত প্রভাবপ্রাধান্যে এমন হতে পেরেছিল। আর্য জাতিরই এক শাখা কাসীয়রা অসুরদের প্রথম প্রাধান্য চূর্ণ করার পর পরবর্তী কালে যখন দ্বিতীয়বার অসুর প্রাবল্য দেখা যায়, সম্ভবত সেই সময়ে জোরোয়াস্তরের অ হেস্তা প্রথম রচিত হয়। আর্য জাতির আর এক শাখা মিড বা মেদে জাতি কাল্‌দীয় এবং ইরাণীয়দের সাহায্যে অসুরদের চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে।

অতএব, বিশুদ্ধ ইতিহাস অনুসারেই আর্য-অসুর সংগ্রাম ২০০০-৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দের অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর স্থায়ী এবং এখন থেকে চার থেকে আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত সময়ের মতো প্রাচীন ব্যাপার। রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ অনুসারে ঐ সংগ্রাম আরো বেশি স্থায়ী ও প্রাচীন। মিড ও পারসিকদের হাতে ইতিহাসের রঙ্গভূমি থেকে অপসারিত হবার আগে পর্যন্ত ২৫০০—৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দব্যাপী প্রায় দু হাজার বছর ধ'রে অসুরদের সঙ্গে ভারত-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত জাতিগুলির প্রবল যুদ্ধ চলত। (ক্রমশঃ)

ভূতের বিচার

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অকৃতদার শ্রীকান্ত চৌধুরী, সকলে তাঁহাকে কান্তবাবু বলিয়াই জানে। সুশ্রী সুগঠিত দেহ। যৌবন অতিক্রান্ত হইলেও যৌবনের শক্তিসামর্থ্য এখনও অটুট। এমনই সুন্দর স্বাস্থ্য তাঁর।

চুঁচড়ার নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। সেই গ্রামেরই দত্তদের একটি ছেলের সহিত শ্রীকান্তের ভাব ছিল খুব বেশী। ছেলেটির নাম ধনপতি দত্ত। দুইজনে যৌথ কারবার আরম্ভ করেন। সেই ব্যবসায়সূত্রে সৌহার্দ্য তাঁহাদের আরও গভীর হয়।

কান্তবাবু কিন্তু কিছুকাল পরে ব্যবসায় ছাড়িয়া রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন। ছোটবেলা হইতেই তাঁহার অভিনয়ে আসক্তি ছিল। নিজ পল্লীতে সখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। এখন কলিকাতার একজন বিখ্যাত অভিনেতা তিনি। বিশিষ্ট চরিত্র অভিনয়ে ও তদনুরূপ বেশবিন্যাসে তিনি সুদক্ষ।

"বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে" 'আলমগীরের' অভিনয় হইতেছিল। রঙ্গালয় দর্শকে পরিপূর্ণ। কান্তবাবু নাম ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিলেন। সকলে মুগ্ধনেত্রে তাঁহার সুনিপুণ অঙ্গভঙ্গি ও অপরূপ সাজ-সজ্জা দেখিতেছিল, শুনিতেছিল তাঁহার অপূর্ব্ব অভিনয়। অভিনয় দেখিতেছে সে কথা সকলে ভুলিয়া গেল। তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে যেন মোগল সাম্রাজ্যের শেষ রশ্মি জ্বলিয়া উঠিতেছে। যখন রঙ্গমঞ্চ হইতে আলমগীর চলিয়া গেলেন তখন তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল। সকলে একযোগে আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল।

কান্তবাবু রঙ্গমঞ্চের ভিতরে তাঁহার নিজস্ব কক্ষে প্রবেশ করিয়া ক্লান্তদেহে একখানি আরামচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। রূপকার ছুটিয়া আসিল। তাঁহার জামাজুতা, নকল চুলদাড়ি খুলিয়া লইল। কান্তবাবু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রূপকার তাঁহার হাতের ও মুখের রঙ ঘসিয়া তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইল। তিনি একখানি দৈনিক সংবাদপত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। এক স্থানে তাঁহার চক্ষু আটকাইয়া গেল। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন —"ধনপতি নিহত! পুলিশ এ পর্য্যন্ত খুনের কোন কিনারা করিতে পারে নাই।" ভাবিলেন—ইহা কিরূপে সম্ভব হইল! ধনপতির তো কোন শত্রু ছিল না। অমন অমায়িক, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী ব্যক্তি বিরল। তাঁহার একমাত্র কন্যা যুথিকা—কি অসহায় অবস্থায় সে এখন পড়িয়াছে!

কান্তবাবুর মনে পড়িল কৈশোরে ও যৌবনে ধনপতি দত্তই তাঁহার প্রিয়তম সাথী ছিল। এখনও তাঁহাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশে গিয়া কাঠের কারবারে ধনপতি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। এখন দেশে ফিরিয়া পাট ও চাউলের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অনিয়মিত আহার্য্য গ্রহণে তাঁহার স্বাস্থ্য কিছু ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেই কারণে একজন অংশীদার লইয়া ব্যবসায় চালাইতেছেন। দৌড়-ঝাঁপের কাজ সেই অংশীদারই করে। ব্যবসায়ের নীতি পরিচালনা ধনপতিবাবু নিজেই করিয়া থাকেন।

চুঁচড়ার গঙ্গাতীরে এখন ধনপতিবাবুর প্রকাণ্ড প্রাসাদ। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত সুরম্য উদ্যান। কিছুদিন হইল তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। অনুরুদ্ধ হইয়াও আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। চুঁচড়ার এই বাড়ীতে কান্তবাবুর যাতায়াত আছে। কখনও কখনও এখানে আসিয়া দুই-চারি দিন থাকিয়াও যান। ধনপতির কন্যা যুথিকাকে তিনি নিজ কন্যার মতই ভালোবাসেন। যুথিকাও কান্তবাবুকে আপনজন বলিয়াই জানে।

অংশীদার গৌরমোহন দাঁ। গৌরমোহনের সুন্দরী বিধবা ভগিনী বিমলা, এবং ধনপতিবাবুর দুইজন বন্ধু—সুলোচন মিত্র ও বিপ্রদাস ভদ্র তাঁহার সংসারে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। সুলোচন ও বিপ্রদাস ধনপতির গ্রামের লোক, সমবয়সী, দুইজনেই দাবাখেলায় ওস্তাদ। ধনপতিবাবুও দাবা খেলিতে ভালোবাসেন, এবং অবসর সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে দাবা খেলিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। সুলোচন ও বিপ্রদাস—উভয়েরই স্ত্রীপুত্রাদি সেবারের কলেরা মহামারীতে মরিয়া যাওয়ায় ধনপতি দত্তের আহ্বানে তাঁহারা উহার চুঁচড়ার বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য আসেন। তাহার পর নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার আস্বাদ পাইয়া, এবং বন্ধু ধনপতির অকুণ্ঠ আদরযত্নে মুগ্ধ হইয়া, শোকসন্তাপ ভুলিয়া এই স্থানেই তাঁহারা থাকিয়া গিয়াছেন।

ধনপতিবাবুর এক স্বজাতি পুত্র ব্যবসায় শিখার আশায় চুঁচড়ার বাড়ীতে তাঁহার নিকট যাতায়াত করে। সে যুবক, সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র ও কর্মঠ। সুতরাং অল্পদিনেই ধনপতির স্নেহের ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নাম সুকুমার। সুকুমার যুথিকা অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড়। এক বাড়ীতে মাঝে মাঝে থাকায় এবং ধনপতির প্রশ্রয়ে তাহাদের দুজনের মধ্যে বেশ একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। কান্তবাবু ধনপতিবাবুর নিকট এই যুবকটির অশেষ প্রশংসা শুনিয়াছেন, এবং ধনপতিবাবু যে যুথিকাকে ইহার হস্তে সমর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন তাহাও কান্তবাবু জানেন। এই দুর্ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ এক কার্য্যোপলক্ষে ধনপতির বাড়ীতে সুকুমার আসিয়া রহিয়া গিয়াছে।

সংবাদপত্রে নিদারুণ সংবাদ পাইয়া কান্তবাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না। রূপকারের হাত হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সত্বর বাড়ী চলিলেন। খবরের কাগজের শিরোনামা—"চুঁচড়ার ধনী ব্যবসায়ী ধনপতি দত্ত নিহত। খুনের কোন সূত্রই পাওয়া যায় নাই!" কান্তবাবুর চক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিতে লাগিল। তিনি আরও অস্থির হইয়া উঠিলেন। বাড়ী যাইতে যাইতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—এ খুনের কিনারা করিতেই হইবে।

কান্তবাবু মধ্যরাত্রে বাড়ী পৌছিয়া মুখ হাত ভাল করিয়া ধুইয়া শয়ন করিবার পূর্ব্বে অভ্যাসমত দাঁড়া-আরশীর সামনে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইলেন। সহসা দেখিলেন তাঁহার কাঁধের ওপর দিয়া ধনপতি যেন উঁকি মারিতেছেন। ধনপতিবাবুর বিষণ্ণ মুখখানি তাঁহার নজরে পড়িল বেশ স্পষ্ট ভাবেই। তখন তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং সেই ছায়ামূর্ত্তিকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ধনপতি, স্থির জেনে যাও, তোমার হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিবই, এবং তাহার সমুচিত শাস্তি যাহাতে হয় তাহারও ব্যবস্থাই করিব"। তখনই সেই ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া গেল।

সে রাত্রে কান্তবাবুর আর ঘুম হইল না। কোন রকমে রাত্রির শেষ কয়েকঘণ্টা কাটাইয়া ভোরের ট্রেণে তিনি চুঁচুড়া গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সুলোচনবাবুর সহিতই তাঁহার প্রথমে দেখা হইল। তিনি বিষণ্ণ চিত্তে উদ্যানপথে পদচারণা করিতেছিলেন। কান্তবাবুকে দেখিয়া তিনি যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু মুখোমুখী হইয়াও কেহই সহজে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া কান্তবাবুই সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংবাদ-পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম তাহা কি সত্য?" তখন সুলোচনবাবুর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"হাঁ সত্য। কিন্তু কি করিয়া এরূপ অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল, তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিতেছি না। সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমি ও বিপ্রদাসবাবু আহারাদির পর বৈঠক-খানায় দাবা খেলিয়াছি, তাহার পর যে যার গৃহে গিয়া শয়ন করি। সকালে উঠিয়াও কিছু শুনি নাই। সবে চা খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইব এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে করুণ ক্রন্দন শুনিয়া ছুটিয়া গেলাম। দেখিলাম মা যুথিকা কাঁদিতে কাঁদিতে ধনপতির শয়ন গৃহের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি—ধনপতি টেবিলের ওপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার ঘাড় দিয়ে রক্ত গড়াইয়া পড়িয়া শুকাইয়া গিয়াছে। ঘরের মেজের রক্ত।

টেবিলের উপরে রক্ত। ধনপতির দেহে প্রাণ নাই। তখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইল। পুলিশ আসিয়া প্রাথমিক তদন্ত করিয়া মৃতদেহ চালান দিল এবং ঘরটিতে তালা দিয়া একজন প্রহরী বসাইয়া গেল। আজ আসিয়া তাঁহারা সকলের জবানবন্দী লইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন।"

সুসজ্জিত বৈঠকখানায় দুইজনেই গিয়া বসিলেন। কান্তবাবু আসিয়াছেন শুনিয়া বিপদের প্রতিমূর্তি যূথিকাও ধীরপদে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নিকট হইতে কান্তবাবু জানিতে পারিলেন—রাত্রি প্রভাত হইলে ধনপতিবাবুর জন্য চা তৈয়ারী করিয়া তাঁহার খানবেহারা বনমালী গিয়া দেখিল যে দালানের দিকের দরজা খোলা রহিয়াছে এবং সেই দরজার বিপরীত দিকে যে টেবিলে বসিয়া ধনপতিবাবু লেখাপড়া করিতেন সেই টেবিলের ওপর মাথা দিয়া তিনি শুইয়া আছেন। দরজা খোলা দেখিয়া বনমালী বেশ কিছু বিস্মিত হইল। প্রতিদিন বনমালীই বাবুকে ডাকিয়া তুলিত। তিনি নিজ হাতে দরজা খুলিয়া দিলে সে প্রাতঃকালীন চা টেবিলের ওপর রাখিয়া ঘরের টুকিটাকি কাজ করিত। ধনপতিবাবুও গৃহসংলগ্ন কলঘরে হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া চা খাইতেন ও সেদিনের খবরের কাগজখানি আনিয়া দিতে বলিতেন। কাগজের ওপর একবার চোখ বুলাইয়া তিনি নীচের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতেন এবং প্রয়োজন হইলে বিষয় কর্ম্মে মন দিতেন, বা বন্ধু দুইজনের সহিত গল্প করিতেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কন্যা যূথিকা সকালের জলখাবার লইয়া স্নেহময় পিতাকে খাওয়াইয়া যাইত এবং তাঁহার বন্ধুদ্বয়েরও জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া দিত।

ধনপতিবাবুকে পূর্ব্ব হইতেই উঠিয়া দরজা খুলিয়া ঐভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বনমালী তো অবাক্। সে কাছে গিয়া দেখিল ধনপতিবাবুর মুখ বিবর্ণ। ঘাড় হইতে রক্তের ধারা নামিয়াছে। টেবিলে রক্ত। টেবিল হইতে সে রক্তের ধারা মেজের পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া বনমালী চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শুনিয়া সকলেই ধনপতিবাবুর শয়নগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিশে খবর দেওয়া হইলে চুঁচড়া থানা হইতে ইন্সপেক্টর বসু আসিলেন। প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া মৃতদেহ পরীক্ষার্থে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া একজন কনষ্টেবলকে পাহারায় বসাইয়া দিয়া বলিয়া গেলেন—মৃতদেহ লইয়া যাওয়ার পরে সে যেন ঘরে তালা লাগাইয়া সেইখানেই উপস্থিত থাকে। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত ঘরের তালা যেন খোলা না হয়, এবং কেহ যেন ঘরে প্রবেশ না করে।

কান্তবাবু সকলের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময়, একটু বেলা হইলে ইন্সপেক্টর বসু তাঁহার কথা মত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার আর তিনি একাকী আসেন নাই। সঙ্গে আনিয়াছেন প্রসিদ্ধ 'ডিটেক্টিভ' শ্রীসুনীল আচার্য্যকে। ধনপতির কন্যা যূথিকা, এবং ধনপতিবাবুর বন্ধুদ্বয় সুলোচন মিত্র ও বিপ্রদাস ভদ্রের অনুরোধেই ইন্সপেক্টর বসু এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কান্তবাবুর সহিত সুনীল আচার্য্যের পরিচয় ছিল। কান্তবাবুকে এইস্থানে দেখিয়া শ্রীআচার্য্য বিস্ময় প্রকাশ করিলে কান্তবাবু বলিলেন—"ধনপতি আমার বাল্যবন্ধু। এই বাড়ীতে প্রায়ই আমি আসিয়া থাকি। যূথিকা মায়ের এই বিপদ শুনিয়া আজই সকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

যূথিকাও তখন বলিল—"কাকাবাবু আসিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন। আমি একেবারে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন কাকাবাবুর ওপরই সকল ভার পড়িল। আমি একান্তে একটু কাঁদিয়া শান্তি পাইব।"

পুলিশের সম্মুখে এক এক করিয়া সকলকেই আসিতে হইল। বনমালীই প্রথমে খুনের কথা জানিতে পারে বলিয়া সেই প্রথমে আসিল এবং যাহা দেখিয়াছিল আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। তাহার পরই গৌরমোহনবাবুর ডাক পড়িল। তিনি বনমালীর কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া সহসা মন্তব্য করিলেন—"এটা ঠিক খুন নয়, আত্মহত্যা বলিয়াই মনে হয়। কারণ মৃতদেহের পার্শ্বে ধনপতিবাবুরই পিস্তল পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।" ইন্সপেক্টরবাবুও স্বীকার করিলেন যে—পিস্তলটি তিনি পরীক্ষা করিবার জন্য মৃতদেহের নিকট হইতে কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন—উহা ধনপতিবাবুরই।

সুলোচনবাবু ও বিপ্রদাসবাবু বৈঠকখানাতেই কান্তবাবুর নিকট বসিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে একই কথা

বলিলেন—"আমরা সেদিন রাত্রে আহারাদির পর অনেকক্ষণ দুজনে দাবা খেলিয়া নিজ নিজ ঘরে গিয়া শয়ন করি। পরের দিন সকালে উঠিতে একটু বিলম্বই হইয়াছিল। অভ্যাসমত বেড়াইতে বাহির হইবার সময় সকলের চীৎকারে এই বিপদের কথা জানিতে পারিলাম। ধনপতির শয়নগৃহে গিয়া তাঁহাকে মৃতাবস্থায় দেখিলাম।"

বিমলাদেবী আসিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যূথিকারও নূতন কিছু বলিবার ছিল না। সুকুমারও নূতন কিছু বলিতে পারিল না।

মৃতদেহ পরীক্ষার ফলও ইন্সপেক্টর বসু জানাইলেন যে-পিস্তলের গুলিতেই ধনপতিবাবু প্রাণ হারাইয়াছেন, এবং সেই পিস্তলটি তাঁহার নিজের। পিস্তলের গায়ে একাধিক লোকের হাতের আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়াছে। অপরাধীকে ধরিবার সঠিকসূত্র উহাতে পাওয়া যায় নাই।

ধনপতিবাবু যে গৃহে নিহত হইয়াছিলেন 'ডিটেকটিভ' আচার্য্য সেই গৃহটি দেখিতে চাহিলেন। ইন্সপেক্টর বসু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরের জিনিসপত্র একইভাবে রাখা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কাহাকেও কোন জিনিস স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই।

ধনপতিবাবু যে টেবিলটির উপর উবুর হইয়া পড়িয়াছিলেন সেই টেবিলটিই প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। টেবিলের উপর রক্তের ছাপ লাগা একখানি ব্লটিং প্যাড্ ছিল। সেইখানি আতসী কাঁচের সাহায্যে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল ব্লটিং প্যাড্খানির একদিকে একটা অস্পষ্ট ছাপ দেখা যাইতেছে যেন ৫০০০্ টাকার একখানি চেক কাটিয়া উহাতে 'ব্লট' করা হইয়াছে, এবং চেকের তারিখটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—সেই দুর্ঘটনারই দিনের তারিখ। ইন্সপেক্টর বসুর সাহায্যে টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া চেকবইখানি পাওয়া গেল। তাহার মুড়িতে দেখা গেল সত্যই সেইদিন ৫০০০্ টাকার একখানি 'বেয়ারার' চেক নিজ নামে কাটা হইয়াছে। তার ঠিক আগের দিনে অনুরূপ আর একখানি ১০০০্ টাকার চেক কাটা হইয়াছিল তাহাও চেকের মুড়িগুলি হইতে জানা গেল।

সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক হইতে চেক দুইখানি ভাঙান হইয়াছে কিনা এবং কে উহা ভাঙ্গাইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য শ্রীআচার্য্য কান্তবাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইলেন। বৈকালে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দুইজনে যূথিকার সঙ্গে একান্তে দেখা করিয়া ইন্সপেক্টর বসুর সহিত কি পরামর্শ করিলেন তাহা অন্য কেহ জানিতে পারিলেন না। ইন্সপেক্টর বসুও তাঁহাদের পরামর্শ মত ধনপতিবাবুর গৃহের সম্মুখের পাহারা তুলিয়া দিয়া, ঘরের চাবিটি যূথিকাকে দিয়া—তিনজনেই এক সঙ্গে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় যূথিকা দেবী বাড়ীর সকল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে এক এক করিয়া বলিতে লাগিলেন—"রাত্রির আহারাদির পর যদি তাঁহারা আজ ধনপতিবাবুর শয়নগৃহে কিছুক্ষণের জন্য সমবেত হন তাহা হইলে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করা যায় কিভাবে এখন হইতে তাহার পিতার ব্যবসা-বাণিজ্য চালান হইবে এবং সংসারের সুব্যবস্থা করা যাইবে।" এমন আকুল মিনতিভরা স্বরে যূথিকা এই কথাগুলি বলিলেন যে কেহই আর ইহাতে কোন আপত্তি করিল না।

রাত্রি ৯টার মধ্যেই সাধারণতঃ ধনপতিবাবুর বাড়ীতে আহারাদি শেষ হইত। আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। শীতের রাত্রি। জানালাগুলি সব বন্ধ। তাহার উপর মূল্যবান পর্দা ফেলা। দালানের দিকের দরজাটি খোলা, অন্য দরজাটি তালাবন্ধ। দালানের দরজা দিয়াই একে একে সকলে উপস্থিত হইলেন এবং ধনপতিবাবুর বসিবার টেবিলের দুইপার্শ্বে যে চেয়ারগুলি সাজান ছিল তাহাতেই একে একে বসিলেন। যূথিকার নির্দ্দেশে চেয়ারগুলি ইতিমধ্যে বনমালী রাখিয়া গিয়াছিল।

ঘরে একটিমাত্র নীল আলো জ্বলিতেছিল। যূথিকাই সর্ব্বপ্রথমে কথা কহিল। সে বলিল—"কয়েকদিন হইতেই আমার মনে হইতেছে আপনারা সকলে একত্রিত হইয়া পরামর্শ দিলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিব। আর আপনারা আন্তরিক চেষ্টা করিলে প্রকৃত অপরাধীও ধরা পড়িবে। আপনারা সকলে একটু চিন্তা

করিয়া দেখুন—এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য কি।

দালানের দিকে মুখ করিয়াই সকলে বসিয়া আছেন। মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য সকলকে কেমন একটু অন্যমনস্ক দেখাইতেছে। হঠাৎ দালানের ভিতর কাহার ভারী পায়ের শব্দ শুনা গেল। কেহ যেন সেই ঘরের দিকেই আসিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—ধনপতিবাবু তাঁহার মোটা লাঠিটি হাতে করিয়া মন্থর-গতিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেন তিনি তাঁহার অভ্যাসমত রাত্রির আহারের পর একটু বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিলেন। ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারখানিতে বসিয়া লাঠিটি টেবিলের উপর আড় করিয়া রাখিলেন। বনমালী আসিয়া উহা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

মৃত ধনপতিবাবুকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিমলাদেবী তো চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহিরে যাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। কম্পিত কলেবরে নিজ চেয়ারের উপরই আবার বসিয়া পড়িলেন।

ধনপতিবাবু বাড়ীর প্রায় সকলকে একত্র দেখিয়া একটু হাসিলেন, তাহার পর স্বভাবগম্ভীর স্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি এ কয়দিনই রাত্রে এখানে আসিতেছি, কিন্তু তোমাদের কাহাকেও এঘরে দেখিতে পাই না। আজ সকলকে একত্র পাইয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি আমাকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া তোমরা বেশ ভয় পাইয়াছ। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই। তোমরা একে একে আমার নিকট উঠিয়া আসিয়া নিঃসঙ্কোচে সত্য কথা বলিয়া যাও—সেই দুর্ঘটনার রাত্রে কে কে আমার ঘরে আসিয়াছিলে, এবং কে কি করিয়াছিলে এবং বলিয়াছিলে; তাহা হইলে তোমাদের কোন অনিষ্ট হইবে না। আর যদি মিথ্যা কথা বল, বা সত্যের অপলাপ করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে আমার প্রেতাত্মা বিশেষ রুষ্ট হইয়া অশেষ অনিষ্ট সাধন করিবে এবং প্রকৃত অপরাধীকে এমন শাস্তি দিবে, যে শাস্তির কথা এ পর্য্যন্ত কোন দেশের কোন আইনজ্ঞও কল্পনা করিতে পারে নাই।"

প্রেতাত্মার কথা শুনিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কেহই উঠিয়া কিছু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে যূথিকাই উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং টেবিলের ধারে গিয়া কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল—"বাবা, আপনি আহারান্তে বেড়াইয়া ফিরিবার পরই আমি আপনার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনার আর কোন প্রয়োজন আছে কি না। তাহার পর আপনার অনুমতি লইয়া আমি নিজের ঘরে চলিয়া গেলাম। প্রত্যহই তো এইভাবে আপনার সহিত দেখা করিয়া তাহার পর শয়ন করিতে যাই। কিন্তু সেইদিন যে আপনার নিকট আমার শেষ আসা তাহা"...আর সে বলিতে পারিল না। কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল।

সুকুমার তাহাকে ধরিয়া আনিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল। তাহার পর সুলোচনবাবু ও বিপ্রদাসবাবু একে একে উঠিয়া আসিয়া বিষণ্ণ মুখে এক কথাই বলিলেন: "ভাই, আমরা সেদিন রাত্রে দাবা খেলায় এত মত্ত ছিলাম যে তোমার কোন খোঁজখবরই করি নাই। পরদিন সকালে শুনিলাম" বলিতে বলিতে তাঁহাদের গলা ধরিয়া গেল। আর কিছু বলিতে পারিলেন না। চোখ মুছিতে মুছিতে নিজ নিজ আসনে গিয়া বসিলেন। যূথিকার কেবল ভয় হইতেছিল সুকুমার কিছু অন্যায় না করিয়া থাকে। কারণ এ কয়দিন তাহাকে কেমন গম্ভীর দেখাইতেছিল। সেই এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল—"কাকাবাবু, আহারাদির পর সেদিন রাত্রে যখন আপনি একটু বেড়াইয়া ফিরিলেন তখন আমি আপনার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলাম—সন্ধ্যার সময় যখন আমি একাকী বাগানের পথে বেড়াইতেছিলাম, তখন গাছের আড়ালে কাহারা যেন কথা কহিতেছে সন্দেহ হওয়ায়, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। তখন অল্প অন্ধকার হইয়াছে। লোক চিনিতে পারিলাম না। তবে শুনিতে পাইলাম একজন অপরকে বলিতেছে "ধনপতিবাবুর নিকট হইতে আরও কিছু টাকা চাহিয়া লও। দেখিতেছ না, সুকুমারই শেষে সকল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। তখন আমাদের স্থান কোথায় হইবে জানি না। তাই একটু চেষ্টা করিয়া যতগুলি টাকা হস্তগত করিতে পার, চেষ্টা করিয়া দেখ।" আর একজন অতি মৃদু স্বরে কি বলিল ঠিক বুঝিতে

পারিলাম না। এ সকল কথা আমার বিশেষ ভাল না লাগায় সেদিন রাত্রেই আপনাকে বলিয়া গেলাম।

সুকুমারের এই কথা শুনিয়া গৌরমোহনবাবুর ও বিমলাদেবীর ভাবভঙ্গিতে কেমন যেন একটু অস্থিরতা প্রকাশ পাইল। তখন ধনপতিবাবু তাঁহাদের প্রতি অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"তোমরা যদি নিজেদের মঙ্গল চাও, তাহা হইলে সেদিন রাত্রে তোমরা আমার নিকট আসিয়া কে কি বলিয়াছিলে বা কি দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা অকপটে বল।"

তখন গৌরমোহনবাবু ধীরে ধীরে নিজ আসন হইতে উঠিয়া বেশ সঙ্কোচের সহিত টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ভীত কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিল—"সেদিন একটু বেশী রাত্রে আপনি আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। এ সময়ে আপনার ডাক শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত ও বিচলিতই হইয়াছিলাম। তথাপি আপনার নিকট আসিয়া দেখিলাম টেবিলের ওপর আপনার দক্ষিণ হস্তের কাছে আপনার পিস্তলটি রহিয়াছে। একখানি চেক বই হইতে আপনি কি লিখিতেছেন। আমাকে দেখিয়া একটু বসিতে বলিলেন। আমি না বসিয়া আপনার টেবিলের ধারেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। আপনার চেক লেখা হইলে সেখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—তোমার ভগিনীর অনুরোধে আজই সকালে একখানি একহাজার টাকার চেক কাটিয়া দিয়াছি। আবার তোমরা আমার নিকট হইতে আরও টাকা হস্তগত করিবার পরামর্শ করিতেছ শুনিলাম। কি ভাবিয়াছ জানি না। আমাকে অত দুর্ব্বলচিত্ত মনে করিও না। এখানে ধাপ্পা দিয়া আর একটাকাও লইতে পারিবে না। আজ হইতে তোমাদের সহিত আমার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম যাহাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাল হয় তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইব। কিন্তু তোমাদের এই নীচতার পরিচয় পাইয়া তাহা আর হইল না। তোমাকে যে আমার ব্যবসায়ের শুপ্ত অংশীদার করিয়াছিলাম তাহার জন্ত এই ৫০০০৲ টাকার চেক দিতেছি। উহা লইয়া তুমি আমাকে এই কাগজখানিতে লিখিয়া দাও যে তোমার আর কোন অংশ আমার কারবারে রহিল না। আর কাল সকালেই তোমরা আহারাদির পর আমার বাড়ী হইতে তোমাদের জিনিস পত্র লইয়া চলিয়া যাইবে। আর কোনওদিন এ বাড়ীতে প্রবেশ করিবে না।" এই সকল কথা শুনিয়া আমি কাগজখানিতে সই করিতে ইতস্তত করায় আপনি পিস্তল তুলিয়া আমাকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া উহা লিখাইয়া লইলেন। পিস্তলটি আবার আপনার পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া যখন আমার লেখা কাগজখানি পড়িতেছিলেন—তখন আমার কি দুর্ম্মতি হইল, আমি সহসা পিস্তলটি তুলিয়া লইয়া আপনার ঘাড়ে গুলি করিলাম। আপনি অস্ফুট শব্দ করিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া শুইয়া পড়িলেন। আমিও চেকখানি ও লেখা কাগজটি লইয়া আপনার ঘরের দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময়ে ভয়ে আপনার ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া আসিলাম আর ঘরের দরজা বাহির হইতে টানিয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। পিস্তলটিও আপনার পার্শ্বেই রাখিয়া আসিতে ভুলি নাই।" এই বলিয়া গৌর-মোহনবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন।

তাহার পর বিমলাদেবীকে অনুসন্ধান করিয়া বেশ রুক্ষ স্বরেই ধনপতিবাবু বলিলেন—"এবার তোমার কি বলার আছে সত্য করিয়া বল।"

বিমলাদেবী তাঁহার আসন ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। সেইস্থানে বসিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে কোনও রকমে বলিলেন—"দাদার প্ররোচনায় আমি আপনার নিকট হইতে নানা অছিলায় মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা লইয়াছি। সেদিন সকালেও আপনার নিকট হইতে একখানি একহাজার টাকার চেক্ লইয়া গিয়াছি আমার স্বর্গত স্বামীর সকল ঋণ শোধ করিব বলিয়া। তাহাতেও দাদা সন্তুষ্ট না হইয়া আরও টাকা আপনার নিকট হইতে আনিয়া দিবার জন্ত আমাকে সেদিন সন্ধ্যায় বাগানের ভিতর একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন। আমি উহাতে সম্মতি দিতে পারিতে-ছিলাম না। বিবেকে বাধিতেছিল। সেই কারণেই কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা কাটাকাটি হইতেছিল। সুকুমারবাবু সম্ভবত সেই সকল কথার কিছুটা শুনিয়া আপনাকে গিয়া বলিয়াছিলেন, আপনিও সেইদিন রাত্রেই আমাকে

ডাকিয়া পাঠাইলেন। দাদা অনেক পরে একখানি ৫০০০৲ টাকার চেক্ আনিয়া আমার হাতে দিলেন। আর একখানি কি কাগজ তাঁহার হাতে ছিল সেখানি পুড়াইয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে সেদিন বিশেষ বিভ্রান্ত দেখিলাম। আমার সহিত আর বিশেষ কথা-বার্ত্তা বলিলেন না। নিজের শয়ন ঘরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বোধহয় নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে শুনিতে পাইতেছিলাম তিনি যেন অস্থিরপদে পায়চারি করিতেছেন এবং স্বগতঃ কিছু বলিতেছেনও। আমারও সেদিন ঘুম হইল না। কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় মন ভরিয়া রহিল, সকালে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম আপনি নাকি আত্মহত্যা করিয়াছেন।"

এই সকল কথা শুনিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল জানালার ভারী পর্দা নড়িতেছে। সেই পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ইন্‌স্‌পেক্টর বসু ও ডিটেকটিভ্ আচার্য্য। ধনপতিবাবুরও কৃত্রিম সুপুষ্ট গোঁফজোড়া ও মাথার পর-চুলা খসিয়া পড়িল। ধনপতিবাবুর জামা ও জুতাও তিনি খুলিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল শ্রীকান্তবাবুই ধনপতি-বাবুর চেয়ার অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। কান্তবাবুর অভিনয় নৈপুণ্য ও বেশভূষা পরিধান-কৌশলের পরা-কাষ্ঠা দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্মিত হইলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু গৌরমোহন দাঁকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করিলেন। আদালতের বিচারে পরে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইল। যূথিকা কিন্তু হতভাগিনী বিমলা দেবীকে ছাড়িলেন না। বাড়ীর কর্ত্রী করিয়া রাখিয়া দিলেন।

শ্রাদ্ধশান্তি সুসম্পন্ন হইলে শ্রীকান্তবাবুর উদ্যোগেই যূথিকার সহিত সুকুমারের বিবাহের ব্যবস্থা পাকা হইল। সুকুমার পিতার নিকট সে সংবাদ পাঠাইলে তিনি ধনপতিবাবুর অপঘাত মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া লিখিলেন —শ্রীকান্তবাবুর ব্যবস্থায় তাঁহার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি আছে। আর তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে শ্রীকান্তবাবু কলিকাতার বাস উঠাইয়া চুঁচড়াতেই ধনপতিবাবুর গৃহে আসিয়া সুকুমার ও যূথিকার অভিভাবক হইয়া থাকুন। অভিনয়ের তো তিনি চরম উৎকর্ষ দেখাইলেন। আর অভিনয়ের কি প্রয়োজন তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যও একদিন করিয়াছিলেন, আজও তিনি সুকুমারকে সহকারী করিয়া ধনপতিবাবুর পরিত্যক্ত কারবার দেখাশুনা করুন।

যূথিকাও তদনুরূপ অনুরোধ করিতে থাকিলে শ্রীকান্ত-বাবু চুঁচড়ায় আসিয়া যূথিকাদের নিকটেই জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইতে মনস্থ করিলেন।*

---

* কোন ইংরাজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।
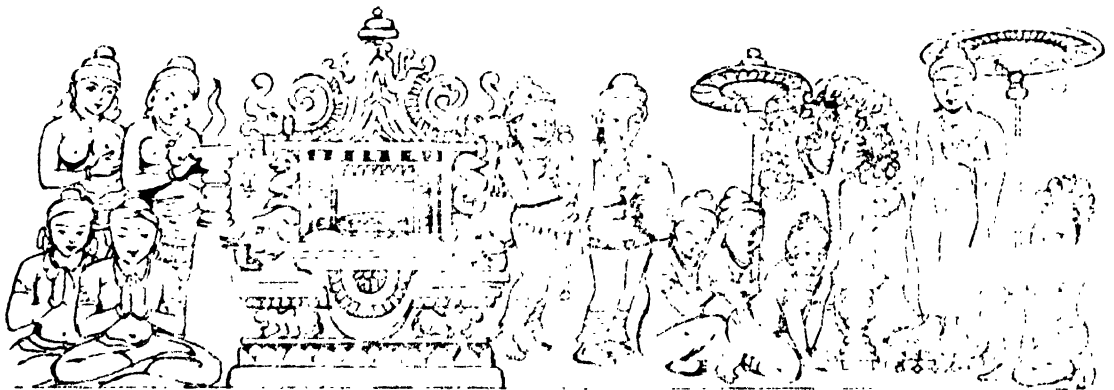
রবীন্দ্রসঙ্গীতে দক্ষিণীসুর

শ্রীজয়দেব রায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে দেশবিদেশের সকল শ্রেণীর সুরই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভারতবর্ষের বহুগানের ধারা মিশ্রিত হইয়াছে। উত্তর ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটীয় রাগরাগিণীরও সেখানে ছায়াপাত হইয়াছে।

উত্তর ভারতের সঙ্গীত ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত স্বতন্ত্রধারা। দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতি আর্যাবর্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দ্রাবিড় সংস্কৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিদেশী প্রভাব মুক্ত। তাহার কারণ, দাক্ষিণাত্য বহুদিন ইসলামী প্রভাব বিমুক্ত ছিল। উত্তর ভারতের শিল্প ও সঙ্গীত মুসলমান ওস্তাদদের দীর্ঘদিন সাধনামিশ্রিত, কর্ণাটীয় সঙ্গীত ইসলামী সংস্কৃতি বিমুক্ত ও বিশুদ্ধ হিন্দু সঙ্গীত।

দক্ষিণ ভারতের গানের প্রধান বিশেষত্ব মীড়ের অভাব, এক সুর হইতে অপর সুরে গমনাগমন এই গানের ধারায় সম্পূর্ণ সমান্তরাল। দক্ষিণী গানের সার্গম অত্যন্ত দ্রুত, আলাপ সুপ্রসারিত, গানে বিলম্বিত লয় নাই বলিলেই হয়। দাক্ষিণাত্যের জলদ বা দ্রুত গায়কী অত্যন্ত বৈচিত্র্যকর, সার্গমের গতি যেন ক্রমশই বর্ধনশীল।

প্রাচীন তামিল সাহিত্যে সঙ্গীতের রাগরূপ লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আছে। বহুপ্রকার তারের যন্ত্রের ও রাগিণীর ধারার পরিচয় ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রাচীন তামিল-সাহিত্যে দেওয়া হইয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে রচিত শিলালিপিতেও শ্রুতি, স্বরভেদ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

বিজয়নগরের রাজবংশের সঙ্গীতে সবিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। কর্ণাটীয় সঙ্গীতের সুষ্ঠু বিশ্লেষণ তাঁহাদের উৎসাহে সম্ভব হইয়াছিল। শারঙ্গদেব ছিলেন উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী এবং দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটী উভয় সঙ্গীতধারার সমানরূপ বিশেষজ্ঞ। তাঁহার 'সঙ্গীত রত্নাকর' কর্ণাটীয় ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অন্যতম প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ। ষোড়শ শতাব্দীতে রাম অমাত্য নামক সঙ্গীতবিদ্‌ও কর্ণাটীয় সঙ্গীতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

উত্তর ভারতের ধ্রুপদ গীতিরীতি দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতধারায় 'কীর্তনম্' নামে পরিচিত। হিন্দুস্থানী গীতিরীতির খেয়াল দাক্ষিণাত্যে 'কৃতি' নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ তাঞ্জোরের ত্যাগরাজ ধ্রুপদ ও খেয়াল উভয় ধারাতেই নবযুগের প্রবর্তনা করিয়াছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত গীতিকবিও ছিলেন।

কিন্তু কর্ণাটী গান চিরকালই বিজ্ঞানপ্রধান, হিন্দুস্থানী গানের ন্যায় ভাব ও ললিতবাণীর প্রাধান্য সাধারণভাবে কর্ণাটী গানে নাই। ফলে, এ গানে সুরবিজ্ঞান বিশুদ্ধ আকারে ও অবিমিশ্ররূপে রক্ষিত হইয়াছে।

উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী রাগরাগিণী দাক্ষিণাত্যে ভিন্ন নামে পরিচিত—আধুনিক দশটি ঠাট কর্ণাটী গানে নিম্নোক্ত ঠাটের নামে বিদিত—(১) বিলাবল ঠাট—শঙ্করাভরণ; (২) কল্যাণ ঠাট—কল্যাণী; (৩) খাম্বাজ ঠাট—হরিকাম্বোধি; (৪) ভৈঁরো ঠাট—মায়ামালবগৌল; (৫) পূরবী ঠাট—কামবর্ধনী; (৬) মারবা ঠাট—গমনপ্রিয়া; (৭) কাফি ঠাট—খরহর প্রিয়া; (৮) আশাবরী ঠাট—নটভৈরবী; (৯) ভৈরবী ঠাট—হনুমতোড়ী এবং (১০) তোড়ী ঠাট—শুভপন্তু ভরালী। কর্ণাটীয় সঙ্গীতের ছন্দে উত্তর ভারতীয় তালও ব্যবহৃত হয় না। এগানে নানা দীর্ঘ মাত্রার ছন্দের সাক্ষাৎ মেলে, যেমন, মণিতাল, প্রমাণতাল, পূর্ণতাল (২৩ মাত্রা), শ্রীকরতাল, ভুবনতাল (২৯ মাত্রা), উদয়তাল, ধীরতাল, যোগতাল প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন তাল ভিন্ন নামে ব্যবহার করিয়াছেন, এই শ্রেণীর তাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ইতিপূর্বে বিশেষ ব্যবহৃত হয় নাই। এই ধরণের দক্ষিণী তালগুলির কবি নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন। কর্ণাটীয় সঙ্গীতের আটমাত্রার তাল 'সারতাল'। কবি তাঁহার গানে এই তালের ব্যবহার করিয়াছেন 'রূপকড়া' নামে। যেখান হইতে গানের সূচনা সেই প্রথম অক্ষরেই তালের সম, আর ফাঁকের

ব্যবহার নাই। এই তালের গান 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে'।

কর্ণাটীয় সঙ্গীতের নয়মাত্রার তাল 'বস্তুতালে'র কবি নামকরণ করিয়াছেন 'নবতাল'—'দুয়ার মোর পথপাশে' গানে।

কর্ণাটীয় সঙ্গীতের ১১ মাত্রার তালের নাম মণিতাল, সিন্দুতাল, নীলতাল। কবি তাঁহার গানে ১১ মাত্রার তালের নামকরণ করিয়াছেন 'একাদশী'। এই তালের গান 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর।' কর্ণাটীয় সঙ্গীতের ছয় মাত্রার তালের নাম 'পক্তি'ও 'রূপক', কবি তাঁহার গানে এই তালের নামকরণ করিয়াছেন 'ষষ্ঠী', এই তালের গানের নিদর্শন 'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে'॥

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দক্ষিণী গানের চর্চা হইত নিয়মিত। বস্তুত দক্ষিণী গানের দুর্বোধ্য ভাষা সে গানের রসগ্রহণ হইতে আমাদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সঙ্গীতের রূপায়ণে ভাষার মূল্য নিরর্থক, একমাত্র সুররস পরিভোগের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য কথার সার্থকতা। এই কথা মনে রাখিলে আমরা দক্ষিণী গানের রসগ্রহণে সক্ষম হইলেও হইতে পারি!

রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রারম্ভক যুগে দক্ষিণী গানের অনুশীলনের একটি পর্ব আছে। 'বীণাবাদিনী' ও 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' পত্রিকায় দক্ষিণী গানের স্বরলিপি নিয়মিত প্রকাশিত হইত। ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে দক্ষিণী গান গাওয়াও হইত।

এই সকল দক্ষিণী ভজনের মধ্যে মীনাক্ষী মন্দিরের ভজনগুলি তাঁহাদের গৃহেও নিয়মিত পরিবেশিত হইত বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ একটি গান, ত্রিতালে নিবদ্ধ—

শ্রীশে মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বর সাক্ষী
শঙ্করী গুরুগুরু গুহ, সমুদ্ভবে শিবে মা।
পামরমোচনী পঙ্কজলোচনী পদ্মাসনা বাণী
হরিলক্ষ্মী বিভুতে সন্তবি॥
কমলাসন বন্দিতে পালাক্তে, কমনীয় করোদর
সম্রাজ্যে কমলানগরে সকলাকারে কমল,
নয়নধৃত জগদাধারে কমলে, বিমলে
গুরুগুন জননী কমলাপতি স্তুত হৃদয়ে মায়ে
কমলশশি-বিজয়বদনে দেবি কমললোচনী,
বাগেদেবী শ্রীগৌরী পূজিত হৃদয়ানন্দী কমলাক্ষী
পাহি কামাক্ষী কামেশ্বরবর সতী কল্যাণী॥

মীনাক্ষী মন্দিরের এই শ্রেণীর একটি ভজনগানের সুরের অনুকরণেই কবি পরবর্তীকালে রচনা করিয়াছিলেন —বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী।

দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ গানটির সুরের নাম মুখই, তাল কাওয়ালী। এই গানটি সরলা দেবী দাক্ষিণাত্যের ত্রিচিনাপল্লী হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। গানটি—

মন্দং মন্দং বাতে বিচলতি নীরে,
শীতে স্বচ্ছে নিবহতি গুঞ্জতি,
ভৃঙ্গে চলতি, সুখং মনসিজ মৃদুশর মুক্তঃ কঃ॥
শীত, করেস্মিন পীযূষং, নব পঙ্কজ নেত্রে লঘু,
ভ্রমতি মাধমাসে সংপ্রাপ্তে
মনসিজ মৃদুশরমুক্তঃ কঃ॥
আম্র কিসলয় রক্ত, পরভৃত ভুংক্তে বিকশতি
কান্তারে বৃক্ষ ললিত লতাশ্লিষ্টা বিহগা,
প্রিয়নিন্দা কুষ্টা মন্ত্রে 'খিলমপি বিশ্বং মধু
মলরক্তং, বিলসতি রক্তোক বিঘটতি,
শিরোপরি লয়রতি মধুসখা মনসিজ, মৃদুশরমুক্তঃ কঃ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দ্বিতীয় গানটির স্বরলিপি করিয়াছেন।

এই শ্রেণীর আরও দক্ষিণী গান সরলা দেবীর শতগানে রক্ষিত আছে, যথা—

হংসধ্বনি, আদিতালে রচিত বাতাপিগণপতিম্ ভজেহম্, বারণস্য বরপ্রদম্।

খরহরপ্রিয় রাগিণী ও রূপকতালে রচিত—শ্রীত্রিপুর সুন্দরীণা চিন্তয়িচুর্দুম্‌মা প্রভৃতি।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণী গানের প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাঁহার গৃহের সঙ্গীত পরিবেশ হইতে। ব্রহ্মসঙ্গীতের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে তখন ক্রমান্বয়ে সুর সংগ্রহ করা হইত। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নমামি মহিষাসুরমর্দিনি' নামক একটি তামিল গানের সুর অনুকরণে রচনা করেন নারায়ণী সুরে, যৎছন্দে—

ভজরে ভজরে ভবখণ্ডনে, ভজরে বিশ্বজনবন্দনে ;

জগৎ-সজ্জন ভকতচিত্ত বিনোদনে, মোহনে
পালনে তারণে, প্রণতজন সৌভাগ্যজননে ॥
শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ময় জ্ঞানে, মুক্তিদাতা জগৎপ্রাণে,
অন্তর্যামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত পাতকনাশনে,
সর্বলোকাশ্রয় প্রভু এক, সত্য জ্ঞানে, প্রেমাত্মনে ॥

মূল তামিল গানটির ভাষাও উপলব্ধি করিতে অসুবিধা হয় না—গানের তালের নাম 'চাপু'—

নমামি মহিষাসুরমর্দিনি,
নমামি মামকাপালিনি।
মহিষমস্তক নটন বেদ-বিনোদিনি মেদিনি মানিনি মালিনি
প্রণতজন সৌভাগ্যজননি ॥
শঙ্খচক্রশূলাঙ্কুশপাণি শক্তিসেনা মধুরবাণী
পঙ্কজনয়নি পন্নগবেণি পালিব শুরুগুনং পুরাণি।
শঙ্করার্ধশরীরিণি সমস্ত দেবতারূপিণি
করুণালঙ্কৃতা জননি কাত্যায়নি নারায়ণি ॥

এই ধারার আদি গান 'ভজরে ভজরে ভবখণ্ডনে'। কবির মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই প্রকার তামিল গানের সুরে রচনা করেন—

জয়দেব, জয়দেব, জয়মঙ্গলদাতা, জয় জয়,
সংকট ভয় দুখত্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা, জয়দেব।
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা··· ॥

রবীন্দ্রনাথের সুরগুরু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দক্ষিণী গানের সুর অনুকরণে নবধারায় বাংলা গান রচনা করিলেন। তিনি উৎসকে অবলম্বন করিয়া নবতর সৃষ্টির প্রেরণা দিলেন, 'ফেরতা' তালে তিনি সৃষ্টি করিলেন—

প্রণমামি অনাদি অনন্ত সনাতন পুরুষ
নিখিল জগতপতি পরমগতি
মহান্, ভকত জীবন-ন ॥

ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণী ভজনের চিরাচরিত সুরে জলদ লয়ে রচিত গান—

অন্তরের ধন প্রাণরঞ্জন তুমি স্বামী
এসেছি হেথা আজি তোমারি আশে।
প্রেমচন্দ্র! তোমা হেরি দুখ-ঘন দূরে যায়,
বিমল জ্যোৎস্না তায়, আনন্দ বিকাশে।
সুন্দর মূরতি হেরিয়ে বিস্মিত মোহিত আমি,
সঙ্গীত শুনি অন্তরে, সুধাময় তব বাণী ॥

রবীন্দ্রসঙ্গীতে অন্যান্য ভারতীয় সুরের প্রভাব প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া ইন্দিরা দেবী বলিয়াছিলেন—"মাদ্রাজী সুরের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথের গানে লক্ষিত হয়। তার একটি কারণ আমার মনে হয় কার্যোপলক্ষে সরলা দেবীর অনেককাল মহীশূরে অবস্থান ও সেখান থেকে সুন্দর সুন্দর গান আনয়ন। তার মধ্যে 'আনন্দলোকে' গানটিই বোধহয় সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয়, যদিও তার মূল কথা জানি নে।"

'আনন্দলোকে' গানটি খৃস্টান সঙ্গীত বা চার্চ সার্ভিসের ভঙ্গীতে রচিত—গম্ভীর সুরের উঠা-পড়া তাহাতে পরিলক্ষিত হয়—

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে।
বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণ গ্রহতারক
চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান, করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে ॥
ধরণী'পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধুর শোভা,
ফুলপল্লব গীতগন্ধ সুন্দর বরন।
বহে জীবন রজনীদিন চির নূতন ধারা
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে।
স্নেহপ্রেম দয়াভক্তি কোমল করে প্রাণ।
কত সান্ত্বন কর বর্ষণ সন্তাপহরণে।
জগতে তব কী মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব;
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে ॥

এই ধরণের বিলাতী গীতিরীতির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—"আনন্দলোকে, আজি শুভদিনে প্রভৃতি গানেও বিলিতী সুরের ছকে আশ্চর্য নিপুণভাবে কথা বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান বেঁধেছিলেন। এ বড় সামান্য কথা নয়। কথার বাঁধুনি কোথাও সুর থেকে বেরিয়ে গেল না।"

মহারাষ্ট্রীয় ধ্রুপদ 'নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস জানবে' নামক একটি গানের সুর অনুকরণে কবি প্রথমযুগে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন—

বিশ্ব রাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে।
* * * তব স্নিগ্ধ সুশোভন লোচন-লোভন
শ্যাম সভাতল-মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে

তোমার নিশ্বাস-সুখ-পরশে উচ্ছ্বাস হরষে,
পল্লবিত মঞ্জরিত গুঞ্জরিত উল্লসিত সুন্দর ধরা;
দিকে দিকে তব বাণী, নব নব তব গাথা,
অবিরল রসধারা॥

পরে সেই গানটি একটি ঋতুসঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়—

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা পারাবারে॥

সরলাদেবী মহীশূরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে বহুদিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সুরের অন্যতম ভাণ্ডারী ছিলেন তিনি। তাঁহার কল্যাণে বহু মহীশূরী সুরের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতে।

মহীশূরী ভজনের সুরে কবির একটি বিশিষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত যাচনগীতির ভঙ্গীতে গীত হয়—

একী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে,
আনন্দ বসন্ত সমাগমে।
বিকশিত প্রীতি-কুসুম হে
পুলকিত চিত্ত কাননে।
জীবনলতা অবনতা তব চরণে।
হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে
কিরণ মগন গগনে॥

গানটির সুর দক্ষিণ ভারতীয় 'পূর্ণষড়জ', ছন্দ একতালা।

বেদমন্ত্রগানেও কবি পরে এই সুরটির ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৯১ সুক্তটিতে কবি পূর্ণষড়জের প্রয়োগ করেন—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্। * *
সমানো মন্ত্রঃ, সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
* * সমানী ব আকূতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

অর্থাৎ তোমরা সমবেত হও, একসঙ্গে প্রার্থনা বাণী বলো, একত্রে মিলিত হইয়া অন্যের মনকে জানো, তোমাদের স্তবমন্ত্র এক হোক। সিদ্ধিলক্ষ্য এক হোক, তোমাদের হৃদয় মন এক হোক, তোমাদের অধ্যবসায়, চেষ্টা, অন্তর্লক্ষ্য এক হোক, তোমাদের সকলের হৃদয় মন এক হইয়া তোমাদের সম্মিলন সার্থক হোক ইহাই প্রার্থনা।

মহীশূরী সুরের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানের মধ্যে খাম্বাজের সুরে ঠুংরি গান—

চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, চিরশান্তি, তুমি হে প্রভু।
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে (তোমার জগতে)
চিরসঙ্গী চিরজীবনে।

মহীশূরী বেহাগের সুরে—

চিরসখা ছেড়ো না, মোরে ছোড়ো না।
সংসার গহনে নির্ভয় নির্ভর নির্জন সজনে সঙ্গে রহো।

কর্ণাটী খাম্বাজের সুরে তাল ফেরতায় প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত—

আজি শুভদিনে পিতার ভবনে,
অমৃত সদনে চল যাই। চল চল চল ভাই॥

এই গানটির মূল সুর কবি সংগ্রহ করিয়াছিলেন কারোয়ারে থাকিতে নিম্নের গানটি হইতে—

পূর্ণ চন্দ্রাননে চিত্তহরণে মন্মথমোহনে মোহিনী॥

তৎকালীন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণাংশে-স্থিত কর্ণাটের প্রধান নগর ছিল কারোয়ার। সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে বিচারপতি ছিলেন। সেদিনকার স্মৃতিপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—"কারোয়ার এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলয়াচলের দেশ। কিছুদিনের জন্য আমরা সদর স্ট্রীটের দল সেখানে সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম।"

সেখান হইতে সেই স্বল্পকালেই কবি বহু অপরিচিত সুর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেদিনকার সাক্ষী ইন্দিরা দেবী বলিয়াছেন—

"পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল বোম্বাই প্রদেশ। তাই সেই প্রদেশের নানা ভাষার গানভাণ্ডার নমুনার কথাই আমাদের প্রথমে মনে পড়ে। বিবাহের অনতিপূর্বে তিনি কারওয়ার নামক বোম্বাই-এর যে সুন্দর বন্দরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেখানে এক সময়ে একদল নর্তকী গান শোনাতে আসে, মনে পড়ে তাদের কাছে কয়েকটি কানাড়ী ভাষার গান শুনি ও শিখি যা পরে তিনি ভাঙেন।"

এই ধরণের গান—

১) সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোন শোন পিতা।
কহ কানে কানে, প্রাণে প্রাণে, মঙ্গল বারতা॥

এই গানটির মূল সুর কানাড়ী—'চারিবর্বা পর্বত'।

২) বড় আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরাও না জননী,
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে ···।
এই গানটির মূল কানাড়ী গান—'সখি বা বা'।

অন্ত্যযুগেও দক্ষিণীসুর কবির গানে বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সে প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"আবার দেশকালপাত্রে সমসাময়িকের কাছ ঘেঁষে এসে দেখা যায় আমরা মাদ্রাজে যাই না-যাই, মাদ্রাজ আমাদের কাছে এসেছে অর্থাৎ শান্তিনিকেতনেরই একজন মাদ্রাজী ছাত্রীর কণ্ঠের সুন্দর সুন্দর মাদ্রাজী গান রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ভেঙেছেন। তা এখানকার অনেকে আমার চেয়ে ভালই জানেন।"

এই ছাত্রীটির নাম শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণান্ (গোবিন্দ)। বিশ্বভারতী কলাভবনের ছাত্রীরূপে তিনি কবির সংস্পর্শে আসেন। তেলেগুভাষী পরিবারে তাঁহার জন্ম, বাঙ্গালোরের কাছে গারিকার আদি বাড়ি। মাদ্রাজের কাছে অ্যাডেয়ারে অ্যানি ব্যাশান্ট-এর স্কুলে তাঁর শিক্ষালাভ। ১৯১৮ সালে কবি বিদেশ যাত্রাপথে অ্যানি ব্যাশান্ট-এর আশ্রমে কয়েকদিন ছিলেন, সেইখানেই তিনি সাবিত্রীর কণ্ঠমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার আহ্বানে সাবিত্রী শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগদান করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব দক্ষিণী সুরাশ্রিত তেলেগু, তামিল গানগুলি শুনিয়া সেগুলির অনুকরণে বাংলা গান রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। কবি অবশ্য দক্ষিণী সুরে রচিত সংস্কৃত ভজনগুলির সুরেই তাঁহার নববিচিত্র ঋতুসঙ্গীতগুলি রচনা করিয়াছেন।

মাদুরার মন্দিরে দেবী পার্বতীর রূপপরিচিত মীনাক্ষী দেবী রূপে। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরে নিত্যপূজা সাঙ্গ হয় ভজনগানের দ্বারা। এই বন্দনা-সঙ্গীতের অন্যতম প্রসিদ্ধ রচয়িতা ছিলেন মুথুস্বামী দীক্ষিত। তেলেগু ভাষায় ছাড়া দীক্ষিত সংস্কৃত-ভাষায় মীনাক্ষী বন্দনা-গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার এই শ্রেণীর গান ছিল—

মীনাক্ষী মে মুদম্ দেহি,
মে চ কাক্ষী রাজমাতঙ্গী ·।

রবীন্দ্রনাথ রচিত গান—
বাসন্তী হে ভুবন মনোমোহিনী
দিক্‌প্রান্তে, বনবনান্তে, শ্যামপ্রান্তরে
আম্রছায়ে সরোবর তীরে···॥

কর্ণাটীয় সঙ্গীতধারায় পূর্বকল্যাণী রাগে আদিতাল গুরুগুহা মুদ্রায় গানটি রচিত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পূরবী রাগিণীর সঙ্গে পূর্বকল্যাণীর মিল আছে।

দক্ষিণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাররূপে তাঞ্জোরের ত্যাগরাজের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার রামচরিত গান উত্তরভারতের তুলসীদাসের রামচরিতের ন্যায় অত্যন্ত জনসমাদৃত। ত্যাগরাজের গান তেলেগু ভাষায় রচিত, রবীন্দ্রনাথ তেলেগু গানের রস হয়তো সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত নিম্নের গানটির সুরকে তিনি তাঁহার সুরভাণ্ডারে গ্রহণ করিয়াছেন—'বৃন্দাবন লোলা'

সেই গানটির সুর অনুকরণে রচিত হইয়াছে—
নীলাঞ্জন ছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যামবনান্ত বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।
মন্থর নব নীল নীরদ পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা, কান্ত-বিরহ-কান্তারে॥

মূল গানটি কর্ণাটি সঙ্গীতের তোড়ীরাগে রূপকতালে রচিত। দক্ষিণী তোড়ীর সঙ্গে উত্তরী ভৈরবীর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এই গানে 'ত্যাগরাজ মুদ্রা' নামে পরিচিত দক্ষিণ ভারতীয় তানালাপ কবি বাংলা গানেও ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা গানে ছয়মাত্রার তাল রাখা হইয়াছে।

তৃতীয় গানটিও ত্যাগরাজ রচিত তেলেগু ভাষায় ভজন 'নিদু চরণ মূলে' গানটি অবলম্বনে রচিত—
বাজে করুণ সুরে হায় দূরে
তব চরণতল চুম্বিত পন্থবীণা।
এ মম পান্থচিত চঞ্চল হায়,
জানি না কী উদ্দেশে।
যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে হায়
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে॥

এ গানটির দক্ষিণী রাগিণীর নাম সিংহেন্দ্রমধ্যম এবং ছন্দের নাম ত্রিপাদ।

নবীন গীতিনাট্যের জন্য গানগুলির সৃষ্টি, প্রতিটি গানই কর্ণাটী ভঙ্গীতে তানবহুল রীতিমত কলাকৌশলাশ্রিত গান।

কবির শেষ দক্ষিণী সুরাশ্রিত গান—'নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরি দ্বারে' নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার জন্য রচিত।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিভান্ত
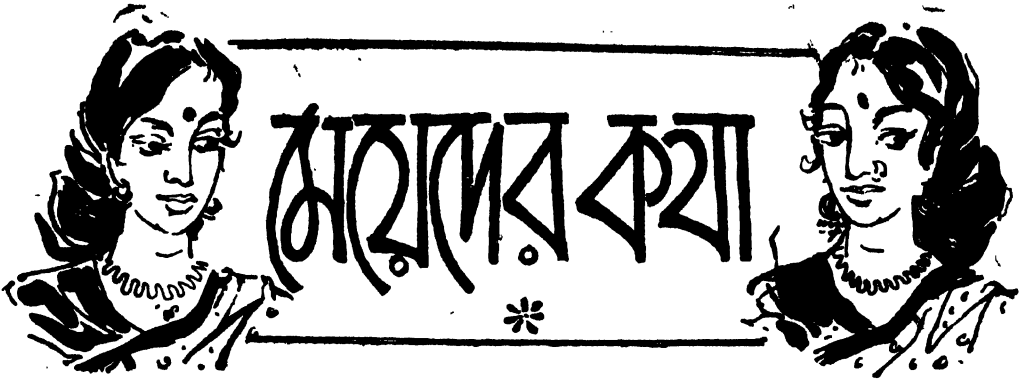
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মেয়েদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি এমন দূরপ্রসারী যে ভিন্ন ঘরের বা ভিন্ন সমাজের মেয়েদের প্রতিও তাঁর কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না। তাদেরও বাহ্য আচরণের অন্তরালে নিহিত সত্যের প্রতি কবি আপনার দরদী মনকে প্রসারিত করে দিয়ে রেখেছেন। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের ক্ষেমংকরীর চরিত্রে আমরা এ কথার প্রমাণ পাই। নলিনাক্ষের মা ক্ষেমংকরী—শুচিবাতিকগ্রস্ত মানুষ। তিনি নিজের পাকে খান, অনাত্মীয় মানুষের ছোঁওয়া তিনি খান না। কিন্তু কবি এ সবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ক্ষেমংকরীর নিজেরই মুখে। ক্ষেমংকরী বলছেন, এ একটা সংস্কার, একটা অভ্যাস যা ছাড়বার শক্তি তার নেই। কিন্তু এর মধ্যে কোন মানুষের প্রতি বিরূপভাব বা কোন ঘৃণার ভাবনা নেই। বরং কবি দেখিয়েছেন যে এমন অনেক মানুষ আছে যারা আধুনিকতা বা উদারতার ভাণ করে, কিন্তু তারাই আসলে আরো বেশি সংকীর্ণমনা, মানুষকে তারা ব্যথা দেয়, নিজেদের প্রগতিশীল মতবাদের দোহাই দিয়ে। যে মানুষ মানুষকে অবহেলা করে, বেদনা দিয়ে তার প্রতি অসহিষ্ণু আচরণ করে, সে কেমন করে নিজেকে প্রগতিবাদী, উদারমনা বলতে পারে, কবি তা বোঝেন নি। যারা পুরানো সংস্কার মতে আচার পালন করে চলে সেই প্রাচীনপন্থী মানুষরা অনেক সময়ে নীরবে, গোপনে অন্যের পথে কিছু বাধা সৃষ্টি না করে আপন মনে তা করে যায়। কিন্তু যারা নিজেদের প্রগতি ও আধুনিকতার বাহন বলে মনে করে, তারাই অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হয়ে অন্যকে নিজের মতে আনতে চায়। যদি তা না পারে তবে অত্যাচার, বিদ্রূপ, এমনকি তাকে চরম ব্যথা দিয়ে, অপমান করে, তাকে ত্যাগ পর্যন্ত করে থাকে। কবির মতে বরং আচারের অন্ধ সংস্কারে থাকাও ভালো, কিন্তু প্রগতির দোহাই দিয়ে অনুদার হয়ে ওঠা আরও মন্দ। ক্ষেমংকরী হেমনলিনীর কাছে আপন জীবনের এই বর্ণনা দিয়েছেন—"একটি বেশ ভালো মেম পাইয়াছিলাম। সে আমাকে সেলাই শিখাইতে আসিত। সে চলিয়া গেলে আবার আমাকে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িতে হইত। কী করিব মা, সংস্কার। উহার ভালোমন্দ জানি না, না করিয়া থাকিতে পারি না। তোমাদের লইয়াও যে এতটা ছুঁই ছুঁই করি, কিছু মনে করিও না মা। ওটা মনের ঘৃণা নয়, ও কেবল একটা অভ্যাস। নলিনদের বাড়ীতে যখন অন্যরূপ মত হইল, হিন্দুয়ানী ঘুচিয়া গেল, এখন তো আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, কোন কথাই বলি নাই, আমি কেবল এই কথাই বলিয়াছি যে যাহা ভাল বোঝ কর, আমি মূর্খ মেয়ে মানুষ এতকাল যাহা করিয়া আসিলাম, তাহা ছাড়িতে পারিব না।"

আচার পরায়ণা প্রাচীনপন্থী স্ত্রী ভিন্ন মতের জন্য

স্বামীকে ত্যাগ করতে চায়নি, সে সব সহ্য করে শুধু নিজের মনে নিজের আচার পালন ক'রে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু আধুনিকপন্থী স্বামী মতের ভিন্নতার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে। এতে কে বেশী অনুদার, কবির এই প্রশ্ন। যে মানুষ আচার পরায়ণ, সেই যে অনুদার, সব সময় তা নয়। মানুষের প্রতি যার ভালোবাসা আছে সেই উদার। সে আচার পালন করলেও, শুচিতা বাঁচিয়ে চললেও, তার উদারতা নষ্ট হয় না। কিন্তু মানুষের প্রতি যে নিষ্ঠুর, যে অসহিষ্ণু, যে জোর করে নিজের মত পরের ওপরে চালাতে চায়, যে মতের দোহাই দিয়ে নিষ্ঠুর হতে পারে, মানুষকে ব্যথা দিতে পারে, তেমনি প্রগতিবাদীকে কবি ধিক্কার দিয়েছেন। এমনি করে হিন্দু ঘরের আচারপরায়ণা কিন্তু বৎসলস্বভাবা মেয়েদের কবি পক্ষ সমর্থন করেছেন, এই ক্ষেমংকরীর চরিত্র বর্ণনায়। কবি এই চরিত্রের মধ্যে আরও বলেছেন যে অনেক সময় এও দেখা যায় যে এই সমস্ত আচারপরায়ণা মেয়েরা সময় উপস্থিত হলে এমন উদারতার পরিচয় দিতে পারেন যা অনেক প্রগতিবাদী মেয়ে বা পুরুষ পারে না। আসল জিনিষ হল মানুষের মনের দরদ। সেই দরদ যার আছে সে ঠিক সময়ে সংসারের সমস্ত বাধা কাটিয়ে আপন উদার মনের পরিচয় দিতে পারে। হয়ত সে ছোট জিনিষে আচার মানে কিন্তু মস্ত বড় ব্যাপারে সংস্কারমুক্ত উদার মনের পরিচয় দিয়ে বসে। নলিনাক্ষের স্ত্রী কমলা না জেনে অন্য পুরুষের সংগে বাস করেছে। কবি উপন্যাসের উপসংহারে আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে আচারপরায়ণা ক্ষেমংকরী কমলাকে তার গৃহে স্থান দিতে, তাকে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না। এখানে তাঁর হৃদয়, তাঁর উদার মমতা, তাঁর সংস্কারের উপরে জয়ী হবে। মানুষের বাইরেটা দেখেই তাকে বিচার করা চলে না। মানুষের আসল পরিচয় তার অন্তরে। বাইরে সে আচারপরায়ণ হক বা প্রগতিবাদী হক মনে যদি তার ভালোবাসা থাকে, তবে সে সব বাধা জয় করে আপন উদারতার পরিচয় দেবেই। আর যার মনে ভালোবাসা নেই সে যতই প্রগতিবাদের কথা বলুক না কেন, কাজের বেলায় সে আপন সংকীর্ণ মনেরই পরিচয় দেবে। অন্য গল্পে কলিকার চরিত্রের মধ্যে আমরা এই কথাটা দেখি। ক্ষেমংকরীর সঙ্গে কলিকার বেশ তুলনা হতে পারে। কলিকা একজন সদ্যঃস্নাত মেথরকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিতে পারল না অথচ সে মিটিং-এ গিয়ে বড় বড় প্রগতির কথা বলে এবং শোনে, আর হিন্দুঘরের একান্ত আচারপরায়ণা এই ক্ষেমংকরী অন্য পুরুষের সংগে থাকা সত্ত্বেও কমলাকে ত্যাগ না করে তাকে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করলেন। কমলা যখন ভয় পেল যে সমস্ত কথা শুনলে শাশুড়ী তাকে গ্রহণ করবেন কিনা, তখন নলিনাক্ষ তাকে বলল—"মা তাঁহার জীবনে অনেক অপরাধকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন, যাহা অপরাধ নয় তাহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিবেন।" নলিনাক্ষের মা তাঁর অনুদার নিষ্ঠুর তথাকথিত প্রগতিবাদী স্বামীকে যে ক্ষমা করেছিলেন, এখানে নলিনাক্ষ সেই ইংগিতই করছে। তিনি যখন অপরাধী স্বামীকে ক্ষমা করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয় নিরপরাধে তাঁর পুত্রবধূকে ত্যাগ করবেন না, নলিনাক্ষ কমলাকে এই আশ্বাস দিল।

ঠিক এই রকম কথাই বলেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর বিপ্রদাস বইতে। বিপ্রদাসের মা আচারপরায়ণা হিন্দু মেয়ে। কিন্তু তার স্পর্শবিমুখতা বা শুচিবাইয়ের অর্থ মানব-বিমুখতা নয়। ওটা একটা অভ্যাসমাত্র। ওতে কোন মানুষের প্রতি কোন অনাদর বা কোন ঘৃণাভাব নেই। এই কথাই আমাকে একদিন বলেছিলেন পূর্ব বাংলার মুসলমান কবি জসীমুদ্দীন। রবীন্দ্র শত-বার্ষিকীতে বম্বেতে যে সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল সেখানে এক হোটেলে আমরা তাঁর সংগে একত্রে ছিলাম। কথায় কথায় আমি একদিন তাঁকে বললাম হিন্দুস্থান পাকিস্থান আবার এক হয়ে যায় না কেন? আগের দিনে না হয় হিন্দু-মুসলমানে ছোঁয়াছুঁয়ি ছিল। আগের দিনের মেয়েরা না হয় মুসলমানের ছোঁয়াকে ঘৃণা করত কিন্তু আমরা তো তা করি না। আমার কথা শেষ হতে না হতে কবি উদ্দীপ্ত হয়ে বলে উঠলেন। আগের দিনের হিন্দু মেয়েরা ছুঁতেন না বটে কিন্তু তাঁরা যেমন ভালোবাসতেন আপনারা তেমন ভালোবাসতে পারবেন না। শুনে লজ্জায় সত্যিই মাথা হেঁট হয়ে গেল।

কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মানবমনের আন্তরিক সত্য ধরা পড়ে যায়। তাঁরা বাইরের স্থূল আবরণ ভেদ করে অন্তরকে দেখতে পান। বুঝলাম জসীমুদ্দীন সত্যিকারের কবি বটে। তখন আমারও মনে পড়ে গেল, নিজের এক দিদিমাকে। তাঁকে দেখেছি কেমন করে সাবধানে ছোঁয়া বাঁচিয়ে তিনি প্রতিবেশী গরীব নমঃশূদ্র পাড়ার ছেলেমেয়েগুলোকে খাবার জিনিষ দিতেন। ঘরে এতটুকু জিনিষ এলে তিনি ওদের না দিয়ে খেতে পারতেন না। নিজের পাত থেকে তুলে তুলে তিনি ওদের ডেকে খাওয়াতেন। তবে এ খেয়ালটুকু ছিল যে ছোঁয়া না যায়, তাই উঁচু থেকে তাদের হাতে কলাটা, মূলোটা, মাছটা ফেলে দিতেন। কিন্তু যাদের দিতেন তারাও শুচিবাতিকের অন্তরালে তাঁর ভালোবাসা-টাকে নিশ্চয় চিনত। তা না হ'লে তারাও অমন ক'রে হাত পেতে এসে তাঁর দুয়ারে দাঁড়াত না, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরলেও আসত না।

কবি জানতেন নারীর প্রকৃতি সংস্কারের অধীন। অনেক সময় এই সংস্কার বশে সে আপনার প্রিয়জনকে পর্যন্ত ব্যথা দিতে, এমন কি তাকে ত্যাগ করতেও পারে। "বিসর্জন" নাটকে রাণী গুণবতী পূজায় বলি-দানের যে সংস্কার সেই সংস্কারের বশে রাজার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হ'য়েছেন। এমন কি রাজার পরম দুর্দিনেও তিনি আপনার সংস্কার নিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন রাজার করুণ মিনতিতেও তার হৃদয় গল্‌ল না। অথচ কবি দেখিয়েছেন যে রাণীর অন্তরের অন্তস্তলে রাজার প্রতি ভালোবাসা ছিল। সেই ভালোবাসার জন্যেই তার হৃদয় দুয়ারে রাজার অমন করুণ মিনতি। রাজা যদি জানতেন যে সত্যিই রাণীর প্রাণে তাঁর জন্যে কোথাও কোন ভালোবাসা নেই, তাহ'লে তিনি অমন ক'রে মিনতি কখনোই করতেন না। হৃদয়হীনার পায়ে প্রণয় নিবেদনের অসম্মান তিনি কখনোই স্বীকার করতেন না। কিন্তু রাজা নিশ্চয় জানতেন রাণীর অন্তরের প্রেমকে ক্ষণিকের জন্য আড়াল করেছে শুধুই তার সংস্কার।

কবি দেখিয়েছেন যে মুহূর্তে এই সংস্কারের বাঁধন, রঘুপতির কথায়, রাণীর মন থেকে খসে পড়ে গেল, সেই মুহূর্তে রাণী আপনার আসল প্রকৃতিকে ফিরে পেলেন এবং তখনি তিনি রাজার সন্ধানে ছুটে চল্‌লেন।

রাণী গুণবতীকে কবি স্ত্রীচরিত্রের সংকীর্ণতার এক চমৎকার উদাহরণ করে দেখিয়েছেন। অন্ধ সংস্কার এমনি জিনিষ যে সেখানে মনের কোনরকম বিচার শক্তি থাকে না। সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে মানুষ যেমন কিছুই দেখতে পায় না, অন্ধ সংস্কারের বশে রাণীরও সেই দশা। তাই তিনি রাজার মনের সত্য উপলব্ধিকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করেন না। সেদিকে মন দেবার, তা নিয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করবার চেষ্টা পর্যন্ত রাণীর মনে নেই। এমন কি রাণীর মন এমনি অনুদার ও সংকীর্ণ যে তিনি প্রেমের দোহাই দিয়ে তাঁর প্রিয়জনকে তার মত ত্যাগ করে, তাঁর নিজের মতে মত দিতে বলেন। রাণী রাজাকে বলেন, "তুমি দেবতা না মান, যুক্তি না মান, কিন্তু প্রেমের দোহাই তো মান। প্রেমের জন্যে তুমি যদি অন্যায়ও কর তবু দেবতা তোমাকে ক্ষমা করবেন।" প্রেম যেখানে সংকীর্ণ, এই রকম অন্যায় আবদার সেখানেই সম্ভব। প্রেম যেখানে উদার এবং সত্য, সেখানে সে নিজের মত প্রেমাস্পদের উপরে জোর ক'রে চাপিয়ে দিতে চায় না। তার বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করবার জন্যে কোন মতই তাকে পীড়ন করতে পারে না। প্রেমের এই উদার রূপের একটা দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি। শিক্ষার সংগে মনের উদারতার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, আমার তো মনে হয় তা নেই। মনের যে গুণ বা যে দোষ আছে শিক্ষা তাকে আরও বাড়িয়ে তোলে মাত্র। শিক্ষা মানুষের মনে কোন দোষ বা কোন গুণ সৃষ্টি করতে পারে না। তবু যে উদাহরণ আমি দিচ্ছি সেখানে মেয়েটি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা। গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, জীবনের অবস্থা বিপর্যয়ে, ঘটনাচক্রে কাছাকাছি এসে পড়েছে এক মুসলমান যুবকের। দুজনে দুজনকে ভালোবেসেছে কিন্তু মিলনের কোন পথই খোলা নেই। একমাত্র পথ হ'তে পারত হয়ত' মুসলমান যুবকের স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে হিন্দুধর্মে দীক্ষা নেওয়া। কিন্তু সেখানে মেয়েটির মত নেই। সে বলে ও-যে আপন সমাজের মধ্যে গণ্যমান্য একজন। ও-যে আপনার সমাজে অনেক সংস্কার কর্ণধার,

অনেক দায়িত্বের ভার ও নিয়ে আছে। আমি কি ও-কে বল্‌ব একটা মেয়ে মানুষের জন্যে আপনার সমাজের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করতে? প্রেমের এই উদার রূপ দেখে আমার মন খুশী হ'য়েছে। অথচ সাধারণ সমাজের দৃষ্টিতে মেয়েটির এই প্রেম নিতান্তই পাপ বলেই বিচার করা হবে। এর মধ্যেকার মহত্ব বুঝতে পারে এমন কজন লোক আমাদের সমাজে আছে জানি না।

কিন্তু রাণী গুণবতী ঠিক এর বিপরীত। তিনি এমনি সংকীর্ণমনা যে তিনি চান নিজের প্রণয়াস্পদকে দাসত্ব শৃংখলে বেঁধে তাকে দিয়ে নিজের হুকুম মত কাজ করাতে। সেখানে সে যদি রাজি না হয়, তাহ'লেই তাঁর প্রেমের অভিমানে আঘাত লাগে।

কবি জানতেন মেয়েদের মনের এই সংকীর্ণতা তার প্রকৃতিগত। শিক্ষা বা তার অভাবে এর কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু তবু আমরা দেখি যে কবি এটা বিশ্বাস করতেন যে অশিক্ষিত নারীর কাছে সংস্কারের বন্ধনটা দৃঢ়তর। তাই 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে কমলার চরিত্রে কবি দেখিয়েছেন যে সে কেমন ক'রে সম্পূর্ণই সংস্কারের অধীন। বিবাহের সংস্কার তার মনে এমন বদ্ধমূল এমন প্রবল যে যে মুহূর্তে সে জানতে পেল যে রমেশ তার স্বামী নয়, সেই মুহূর্তে তার ঘর, তার দেওয়া উপহার, তার চিঠি, তার সান্নিধ্য সবকিছু এক মুহূর্তে তার কাছে অপবিত্র হয়ে উঠল। আর একদিন যে সে রমেশের পাতে বিনা কোন দ্বিধায়, বিনা ঘৃণায় খাবার খেতে প্রস্তুত ছিল, সে যে আঁচল দিয়ে মুছে রমেশের খাবার জায়গা পরিষ্কার করেছিল, এটাও তার ভালবাসা নয়, এও ছিল তার সংস্কার মাত্র। স্বামী সম্বন্ধে তার মনে যে একটি বদ্ধমূল সংস্কার ছিল, তাই তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। রমেশের প্রতি তার যে দরদ, যে আকর্ষণ, সেও ঐ সংস্কারেরই ফল। তাই যে মুহূর্তে এই সংস্কার তাকে রমেশের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল, সেই মুহূর্তে তার মনে রমেশের জন্যে আর কোন দয়া—কোন মায়া, কোন করুণা কোথাও রইল না। আর যে স্বামী তার সম্পূর্ণ অপরিচিত তারই সন্ধানে সে পরিচিত আশ্রয় ত্যাগ করে অজানা পথে বের হ'ল।

কমলাকে কবি অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে বলেই দেখিয়েছেন। কবি নিশ্চয় বলতে চান যে অশিক্ষিত বলেই তার মন এমন সম্পূর্ণরূপে সংস্কারের বশ। কোন শিক্ষিতা মেয়েকে নিয়ে হয়ত' কবি এমন গল্প লিখতে পারতেন না। কিন্তু তবু কবি একথাও দেখিয়েছেন যে একমাত্র সংস্কারই যে কমলার মনে রমেশের প্রতি বিমুখতার একমাত্র কারণ তা নয়। তার মধ্যে অন্য কথাও ছিল। রমেশের গৃহত্যাগের আগে একথাও জানতে পেরেছিল যে সে আসলে হেমনলিনীরই অনুরাগী শুধু দায়ে পড়েই সে কমলাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কমলার প্রতি তার প্রেম, প্রেম নয়, এ তার পৌরুষের করুণা। তাই এখানে কবি নারী প্রকৃতির সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার অভিমানী আত্মসম্মান-বোধকেও দেখাতে চেয়েছেন।

অশিক্ষিতা মেয়েদের প্রতি কিন্তু কবির কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা ছিল না। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে আমরা পাশাপাশি দুটি নারী চরিত্র দেখতে পাই। এক হেমনলিনী ব্রাহ্ম ঘরের উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে এবং শহরে মানুষ, আর কমলা অশিক্ষিতা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। কমলার বর্ণনার মধ্যে আমরা তার প্রাণের মমতার কথা দেখতে পাই। আশ্রয়হীন ছেলে উমেশের জন্য কমলার প্রাণে মাতৃস্নেহ। গাজিপুরের বৃদ্ধ···খুড়োমশাই এক বেলার পরিচয়েই তার পরমাত্মীয় হয়ে ওঠেন। খুড়োর মেয়ে শৈল এবং তার শিশু কন্যা কমলার পরমাত্মীয় হয়ে উঠল। খুড়োর মেয়ে শৈলও কমলার মতই একটি অশিক্ষিতা মেয়ে। তারও প্রাণ-মায়ায় মমতায় ভরা। স্বামীর প্রতি তার মনে অগাধ ভালোবাসা। আবার কমলার দুর্দিনে, সখী স্নেহের বশে সে নিজের স্বামীকেও একা রেখে কমলার সন্ধানে কাশীতে এসেছিল। এমনি প্রাণের দরদ আছে যে মেয়ের, তাকে কবি অশিক্ষিতা বলে অশ্রদ্ধা করেন নি। ঠিক তেমনি কবি এটাও দেখিয়েছেন যে মেয়েরা শিক্ষিত হলেও তাতে তাদের হৃদয় বৃত্তিগুলোর কোন পরিবর্তন হয় না। হেমের মন কমলার মতই প্রেমে ভক্তিতে বিশ্বাসে ভরপুর। তা তেমনি করুণায় কাতর। শিক্ষা হেমের মনকে এতটুকু কঠোর করেনি। প্রাণের

কোমলতার দিক থেকে হেম, কমলা এবং শৈল একই জাতের মেয়ে। কিন্তু সব মেয়েই এমন নয়, এ কথাও কবি জানতেন। যে মেয়েদের প্রাণে করুণা নেই, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নির্মমতা আরও বেড়ে ওঠে। এইজন্যে আমরা দেখি অনেক সময় প্রৌঢ়া মেয়েদের নিতান্ত রুক্ষ, কর্কশ স্বভাব। ছোটবেলায় তাদের স্বভাবের এই কর্কশতা হয়ত' ততটা প্রকাশ পায়নি। এই রকম মেয়েদের লক্ষ্য করেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরের' প্রবন্ধাবলীর এক জায়গায় মেয়েদের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে তারা ঠিক নারকেলের মত। কচি বেলায় মিষ্টি, কিন্তু ঝুনো হয়ে গেলে তখন তাতে দন্তস্ফুট করা মুশ্‌কিল।

এই জাতীয় মেয়ে অবশ্য অশিক্ষিতা হলে তার স্বভাবের স্থূলতা আরও বেশি করেই প্রকাশ করতে থাকে। অশিক্ষিতা, প্রৌঢ়া মেয়েদের অমার্জিত মনোভাব এবং রুচি বিগর্হিত কথাবার্তার বর্ণনা আমরা 'নৌকাডুবি' উপন্যাসেই পাই। নবীনকালী ছাড়াও চক্রবর্তী খুড়োর প্রৌঢ়া গৃহিণীর বেলাতেও কবি ঐ রকম বর্ণনা দিয়েছেন। যে মেয়ের প্রাণে মমতার অভাব আছে, প্রৌঢ় বয়সে তার মন আরও বেশি পরুষ হয়ে ওঠে। তার দেহের স্থূলতার সঙ্গে তার মনেরও স্পর্শ-কাতরতা হারিয়ে গিয়ে তা স্থূল হয়ে ওঠে। চক্রবর্তী খুড়ো যখন কমলাকে গাজিপুরে নিয়ে এলেন, তখন তাঁর স্ত্রী হরিভাবিনী যে কমলাকে খুব সযত্নে গ্রহণ করলেন তা বোঝা যায় না। অবশ্য তিনি নবীনকালীর মত ছিলেন না। কিন্তু তবু কতকটা স্থূল প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন। কমলার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তায় একটা সমবেদনার অভাব, এক নির্দয় সমালোচকের মনোভাব ধরা পড়ে। প্রৌঢ়া নারীর আরেক দুর্বলতা তার ঐশ্বর্যের অভিমান। সর্বদাই সে নিজের ঐশ্বর্যের গর্ব এবং গল্প করতে ভালোবাসে। এ অভিমান শুধুই তার টাকা পয়সা, গয়নাপত্র এবং আসবাবপত্র নিয়েই নয়, নিজের ছেলে এবং মেয়ের রূপ, খ্যাতি, যোগ্যতা, ঐশ্বর্য ইত্যাদি নিয়েও তাদের মনে অভিমান। এই নিয়ে তারা সদা-সর্বদা পরের কাছে গল্প করে এবং গল্প করতে গিয়ে অনেক কথাই বাড়িয়ে বলে। কমলাকে দেখেই চক্রবর্তী-গৃহিণী তার গয়নার অভাব নিয়ে তার মুখের ওপরেই সমালোচনা শুরু করলেন। বাপের বাড়ী থেকে কিছু নিয়ে আসনি বুঝি? তোমার স্বামী তোমাকে কিছু দেয়নি বুঝি? তুলনায় নিজের অনুপস্থিত মেয়ের উল্লেখ করে বললেন যে তার স্বামী তাকে দু'মাস অন্তর একখানা করে গয়না গড়িয়ে দেয়। এমনি করে কবি প্রৌঢ়া নারীর মনের সংকীর্ণতা, তার অসৌজন্য ও সমবেদনার অভাবের কথা বলেছেন।

[ক্রমশঃ]

অপরাধ জগতে নারী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

অভিশপ্ত বনবিবি তলা

গোরখালি ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক হবে, মাহুদি গ্রাম। বহুকালের পুরোন চেহারা আজও বদলায়নি। সেদিন ছিল আরো ভয়াবহ! অর্থাৎ বিশ শতকের আগে। ঝোপ জঙ্গলে, মনে হোত কোন আদিম অরণ্য-ভূমি। দিনেও সূর্য প্রবেশ করতে পারত না। মনে হোত—দিনমানটাকেও, অরণ্য রাত্রি কুহকিনী। রাতে মানুষের সাড়া পাওয়া যেত না। জঙ্গুলে জীবদের শুধু থেকে থেকে চাপা গর্জন শোনা যেত।

জনবসতির অবশ্য নেহাৎ অভাব ছিল না। তবে, চাষীশ্রেণীর অশিক্ষিত সমাজের বাস ছিল। এক একটা গোষ্ঠী এক এক জায়গায় দল বেঁধে বাস করতো। যেখানে মানুষের সাড়া নেই—সেখানে উদ্ভিদ জগতের আদিগন্ত বিস্তৃতি! আকাশ ছোঁওয়া তাল-তমালের সারি।...এমনি বনাঞ্চলগুলো—মাইলের পর মাইল পর্যন্ত—দূর বিসারি ছিল।

ঠিক এই রকম একটা বনভূমি। জায়গাটা মাহুদি গ্রামেরই সীমানাভুক্ত। বনের ভেতর বিরাট একটা

পুরোন বটবৃক্ষ বহুকালের ইতিহাস নিয়ে দাঁড়িয়ে। তার নীচে—পাথর ভরানো চত্বর। ঐ জায়গাটা নাকি জীবন্ত দেবীর আস্তানা। সবাই বলে 'বনবিবি'তলা। বহু দূর দূর জায়গা থেকে লোক এসে এখানে পুজো দেয়। মানৎ করে।

এমনি একদিন কি একটা মনের বাসনা নিয়ে এসেছিল—কড়ালী। বয়স বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি। অসম্ভব লম্বা। তেমনি কঙ্কালসার দেহ। একটা হাড়ের খাঁচায় শুধু যেন ছোট্ট প্রাণটা পোরা ছিল। দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তেমনি চোখের নীচে দুটি খোঁদল গর্ত। আর অস্বাভাবিক কটা উঁচু দাঁত—সামনের দিকে ঝুলে এসেছে। দেখলে মনে হোত, সব সময় একটা বীভৎস হাসি হাসছে। এবং দু'চোখেও ক্ষুধা-লোভ-বাসনার উদগ্র ছায়া। ঘাড় অবধি চুল। সাদা কালোয় মেশানো। ঈষৎ কোঁকড়ানো! আর মিশকালো গায়ের রং। সব দেখে শুনে, কড়ালীকে একটা হিংস্র নরখাদক ডাইনির মত মনে হোত।

কড়ালী অসম্ভব স্নেহশীলা নারী ছিল; কিন্তু তার অসাধারণ ভয়াবহ কুৎসিত রূপটাই ছিল—তার অভিশপ্ত জীবনের অন্তরায়! তার বাইরের চেহারাটা দিয়ে—সকলে তাকে বিচার করেছে ভয়ঙ্কর ভাবে। জন্ম থেকেই সে পৃথিবীর কারো স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা পায়নি। শুধু তার জীবনে একজন নিঃস্বার্থ প্রেমিকা—তার মা—কড়ালীর জন্ম মুহূর্তেই—পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। কাজেই সে ছিল সকলের কৃপার পাত্রী। এমন কি বাবাও তাকে কখনো স্নেহ করেনি। করেছে আজীবন সন্দেহ! কড়ালী নাকি মানুষরূপী ডাইনি। কড়ালী একটু বড় হতেই বাবা তাড়িয়ে দেয়। আর ওই চেহারায় তার তো বিয়েও হবে না। কাজেই কড়ালীকে যখন পথে পা বাড়াতে হোল, তখন বছর ষোল বয়স। পথে পথেই দিন গেছে। কখনো সে নারীর সহজাত সৌন্দর্যের অধিকারী হতে পারেনি। এমনই তার চেহারা, হাবভাব ছিল। কখনো গাছতলায় শুয়ে, কখনো কোনদিন কারো বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে দিন গেছে। কিন্তু একদিন দু'দিন গেলেই গৃহস্থরা ভয় পেত। আশ্রিতা কড়ালীকে সংগে সংগে তাড়িয়ে দিতো।

পৃথিবীর এই নিষ্ঠুরতা দেখে দেখে এক রূপহীনা নারী—চেয়েছিল শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। সে দেখেছিল, শিশুরা তাকে দেখে ভয় পেলেও—কখনো যেন ঘৃণা করেনি। ওরা দল বেঁধে খেলার মাঠ থেকে ছুটে আসতো—তাকে দেখবার জন্যে। যখন সে শেকড়ভরা কোন গাছের তলায় বসে থাকতো—তখন ওরা আসতো। ছেলেমেয়েগুলো কথা বলতে চাইতো। কড়ালী বলতো—আমা খোকান খুকুনরা, আমাকে দেখতি ক্যানে ভয় পাও? আমি মানুষটা আছি না। তোমাদের মত—এই দেখ না চুখ, নাক, হাত, পা······ বলতে বলতে কড়ালী ওর সব অঙ্গ দেখাতো। হয়তো বোঝাতে চেষ্টা করতো, তার ওপর পৃথিবীর মানুষের ধারণা কত মিথ্যে। সংসারে আর সকলের মত সমান অঙ্গ নিয়ে সে মানুষ হয়ে জন্মেছে। "উরা বুঝে না আমাকে। বড় কাঁদায়—কষ্ট দেয়। তরা দেখতি পারিস না? আমারটা কে লো আছে র‍্যা? কড়ালীর শেষ কথাটা এটাই ছিল।

নিজের দেহ দেখাতে দেখাতে কখনো বা শিশুর দলের সামনে কেঁদে ফেলতো, কখনো যেন নিজের ভাগ্যটার ওপর বড় রাগ করে—পাঁজরাসার বুকটাকে দু'হাতে চাপড়াতো। বোঝাতে চাইতো—জীবনের অনেকগুলো বছর যেন এমনি করে কেঁদে,—নিজের ওপর রাগ করে গেছে, আর না খেয়ে না ঘুমিয়ে গেছে। কে আর তাকে খেতে দেবে? পৃথিবীতে সে একা হয়েই এসেছিল।

কোন বাড়ীতে সে ঝি-এর কাজ করতে চাইলেও—রাখত না। সকলে ওর চেহারা দেখে ভয় পেত। সন্দেহ করতো। ছোট ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নিয়ে যেত। কাজেই কড়ালীকে তার ক্ষুধার খাবার যোগাড় করতে হোত—পথে ফেলে দেওয়া কারো উচ্ছিষ্ট বাসি পচা জিনিস। সে সব খেয়ে খেয়ে একদিন তার সারা শরীরে ঘা হয়ে গেল। আরো বীভৎস হয়ে উঠলো কড়ালীর চেহারা। মনে হোত চিতার আগুন থেকে পুড়তে পুড়তে একটা ঝলসানো দেহ উঠে এসেছে। অনেকে দূর থেকে দেখলেও পালাতো ত্রাসে!

গোরখালি ষ্টেশনের কাছাকাছি থেকেই—অবশেষে

একদিন কড়ালী এসেছিল—মাসুদি গ্রামের 'বনবিবি'-তলায়। সেখানে তার আস্তানা করে নেয়। দিন রাতই সে সেখানে পড়ে থেকে অদৃশ্য জীবন্ত দেবীকে বিড় বিড় করে কি বলতো। তার সব কথার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠতো,—যারা 'বনবিবি'তলায় পূজো দিতে গিয়ে শুনতো—, কড়ালী বলতো 'আমি মানুষটা, আমি মানুষটা র‍্যা!' আর সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে বয়ে যেত জলের ধারা। কিন্তু এ দৃশ্যেও কেউ কোনদিন অভিভূত হয়নি। কড়ালীর এত কাতরোক্তির পরও তাকে কেউ 'মানুষ' বলে স্বীকার করেনি। বলেছে—'ডাইনি' 'পেত্নী' 'ডাকিনী' 'যোগিনী' ইত্যাদি! অনেকে ওখান থেকে কড়ালীকে লাঠি মেরেও তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। তবু, কড়ালী যায়নি। জীবনের শেষ আশ্রয়, আর জীবনের শেষ ভিক্ষার মত—এই 'বনবিবি'তলাটাকে সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল। ভেবেছিল, সকলের প্রার্থনা যখন 'বনবিবি' শোনে, তখন কড়ালীর আবেদনও ব্যর্থ হবে না।

কিন্তু 'বনবিবি'র অকরুণ হৃদয়ের স্পর্শটুকু শেষ পর্যন্ত পেল কড়ালী। গাছের ফল, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় সে—আবার কখনো না খেয়ে সে আঁচল লুকিয়ে রাখে। যখন দ্বিপ্রহরের পাখী ঢাকা মধ্যাহ্ন নেমে আসে মাসুদি গাঁয়ে—তখন দুষ্ট ছোট ছেলের পাল ছুটে আসতো তার কাছে। আঁচলে লুকোন সেই ফলগুলো সে বিলিয়ে দিত—তাদের মধ্যে। এইভাবে সংগৃহীত তার মুখের খাবার কতদিন বিলিয়ে দিয়েছে কড়ালী। কতদিন ওদের কাছে বসে সে গল্প বলতো। আস্তে আস্তে ছেলেমেয়েগুলোর ভয় গিয়েছিল। বরং তাদের কাছে খুব একটা আকর্ষণ হয়েছিল 'বনবিবি'র তলার কড়ালী।

এমনি করে ওদের মধ্যে একটি সুন্দর ছেলে কড়ালীর খুব ভক্ত হয়ে যায়। অঞ্চলটা ছিল মুসলমান প্রধান। ওদেরই কারো ছেলে—রসুল। বছর ছয় সাত বয়স। গরীব চাষার ঘরের ছেলে। কড়ালী খুব ভালবাসতো রসুলকে। আশ্চর্য, ছেলেটাও তাকে কেমন করে যেন আপন করে নেয়। পৃথিবীর চির কাঙালী কড়ালী, একটি শিশুর অপার বন্ধুত্বে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে।

রসুলকে একদিন না দেখতে পেলে সে ছুটে যেত রসুলদের বাড়িতে। রসুলের বাবা আমিনুল্লা লাঠি নিয়ে প্রথম তেড়ে আসতো। তারপর কিভাবে বুঝেছিল, কড়ালী সত্যি তার ছেলেকে ভালবাসে।

রসুলের একবার খুব অসুখ করলো। আমিনুল্লার ওই একটাই ছেলে। অনেক হেকিম কোবরেজ করেও যখন সে ভাল হয়ে উঠতে চায় না—তখন পাগলিনীর মত কড়ালী ছুটে এসে 'বনবিবি'তলার পূজোর ফুল এনে দিয়ে বলেছিল—"রসুকে এই ফুল ছুঁইয়ে দাও—বিটা আমার ভাল হয়ে যাবে।"

সত্যি, রসুলের মাথায় ছোঁয়াতে সে ভাল হয়ে গেল। এর পর থেকে অমিনুল্লা বিশ্বাস করতো কড়ালীকে। রসুলও ভাল হয়ে আবার আসতে লাগলো কড়ালীর কাছে। ফলপাকড় যা পেত কড়ালী—তার কিছুটা সে রসুলের জন্য লুকিয়ে রাখতো। রসুল এলে, কত সময় তাকে নিজে হাতে খাইয়ে দিত। কেন জানি, কুরূপা এই স্নেহশীলা নারীর প্রতি রসুলেরও কেমন একটা আকর্ষণ এসেছিল। রসুল জন্ম থেকেই মাতৃহীন। সুরূপা তার বিমাতা—কোনদিনই তাকে দিতে পারেনি অন্তরের অনাবিল প্রীতি। কাজেই রসুলও সেখানে কড়ালীর মতই কাঙালী ছিল।

কড়ালী যেন রসুলের মা সেজেছিল। ছোট্ট রসুলকে বুকে চেপে একদিন আদর করতে করতে কড়ালী ওকে বলেছিল 'আমি তুর মা, তুই আমার বিটা।' শুনে আনন্দে গড়িয়ে পড়েছিল ছেলেটা—'বন বিবি' তলার কত নিঝুম দুপুরে—ওরা মা ছেলের খেলা করতো। বন কেতকীর গন্ধে উদাস হ'য়ে উঠতো বাতাস। ওরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেত—নিবিড় বনারণ্যে।

ঘন গাছ-গাছালীর গভীর জঙ্গল। কড়ালী এই বনজ পৃথিবীকে ভালবাসতো। ছেলেটাকেও সে মাঝে মাঝে নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে রসুল ভয় পেত। বলতো—কড়ালীর ছেঁড়া আঁচল টেনে—তুই-ই যা। উধারে আমি যাবনি। ভালুক আছে—বাঘ আছে উধার! আমি যাবনি—

কড়ালী ওর কুৎসিত মুখে হাসতো। সহসা রসুলকে কোলে তুলে নিতো, বলতো—চ' মুইর সোঙ্গ। ইাটতি না করো না, আমি নে যাব।' সত্যি, অতি দূর বন পথ দিয়ে কড়ালী হাঁটতো—রসুলকে কোলে নিয়ে।

এমনি করে একদিন সন্ধ্যের অন্ধকারে তারা ফিরে এলো 'বন বিবি' তলায়। রসুলের জন্য চারদিকে তখন খোঁজ পড়ে গেছে। আমিনুল্লা সারা 'বন বিবি' তলায় আঁধার পথ খুঁজছে। এমন সময় ওদের ফিরে আসতে দেখে আমিনুল্লা চমকে উঠলো। এই সাঁঝ অন্ধকার বনপথ দিয়ে ওরা কোথা থেকে এলো? কড়ালী তার রসুলকে নিশ্চয় নিয়ে গিয়েছিল কোন মতলবে।

আঁধারে কড়ালীর হতবিমূঢ় দু'টি চোখ জ্বলে উঠলো! আবার তাকে অবিশ্বাস করছে? আমিনুল্লা কি ভেবেছে—রসুলকে সে মেরে ফেলবে বলে নিয়ে গিয়েছিল? আমিনুল্লা তার ছেলের হাতটা ধরে চেঁচিয়ে উঠলো—'ডাইনি, কুথায় নে গেচিলিস ছ্যালেকে? জানিস না তকে পুঁতে থোব ভুঁয়ের মধ্যি?

কড়ালী নিঃশব্দে শুধু আঙুল তুলে দেখালো, যেখানে বন—ঘন নিবিড় অরণ্য-সমুদ্র, যেখানে একজনও অবিশ্বাসী মানুষ নেই—যেখানে কড়ালী ঘৃণিত নয়, উপেক্ষিত নয়, সেখানেই সে গিয়েছিল—তার আদরের রসুলকে নিয়ে। আবার সে ফিরে এসেছে।

আমিনুল্লা এর পর আর কিছু না বলে, তার কুটিরে ফিরে এলো। রসুলও জানালো, কড়ালী মা তাকে রোজই প্রায় বেড়াতে নিয়ে যায় ঘন অরণ্যে। কোলে করেই নিয়ে যায়। গাছের ফল পেড়ে খেতে দেয়। আবার নিয়ে আসে—'বন বিবি' তলায়। সব কথা শুনেও আমিনুল্লা ছেলেকে শাসন করলো এই বলে, যাতে আর না সে কড়ালীরূপী দানবীর কাছে না যায়। ওকে বিশ্বাস নেই। কখোন কি করতে পারে!

সত্যি, আর রসুলকে যেতে দিত না তার বাবা। কয়েক দিন ধরে যেন 'বন বিবি' তলার বাতাসে একটা বিষণ্ণ সুর বয়ে গেল। কড়ালী হাঁফিয়ে উঠলো। ওরা কি তবে আর ছেলেটাকে আসতে দেবে না। আবার সেই মানুষের ঘৃণা—সন্দেহ! তবু কড়ালী পাগলের মত ছুটে যায় রসুলদের বাড়ীতে। আমিনুল্লা ওকে দেখতে পেয়ে লাঠি নিয়ে তেড়ে এলো।

ফিরে এলো কড়ালী। আর আসে না ছেলেটা। 'বন-বিবি' তলা বড় নিস্তব্ধ নিঝুম! গাছের তলায় ছিমিয়ে পড়ে থাকে একটা কঙ্কাল শরীর। দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে শুধু জল। তবু পাতার শব্দে চমকে ওঠে কড়ালী। এই বুঝি এলো ছেলেটা। না, দূর বনের শুধু পাতা ঝরার শব্দ শোনে।

এমনি করে, বোধহয় মাসাধিককাল কেটে গিয়েছিল। সত্যি, একদিন এলো ছেলেটা তার পাতানো কড়ালী মায়ের কাছে। বাবার চোখে ধুলো দিয়েই পালিয়ে এসেছিল রসুল। কড়ালী ওকে দেখে পাগলের মত হেসে কেঁদে ওঠে। সহসা ওকে সর্বশক্তি দিয়ে জাপটে ধরে। বলে—চ তুই। তোকে নে যাই—উই বনে। ফল পেড়ে খাব—সাপের নাচন দেখবো।'

রসুলের কানে তখন বাবার কথাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠলো, 'ওই আক্কুসীর কাচে যাবি নে। বনে নে গিয়ে মেরে ফ্যালবো। উরে বিশ্বাস নাই।'

রসুল, সহসা কড়ালীর আবেষ্টন থেকে ছিটকে পড়ে। বলে—'যাবনি উথায়, তুই—যা—তুই গে চলে যা!

সহসা, কড়ালীর চোখ দুইটা জ্বলে উঠলো। রসুল যাবে না তার সংগে? তার বাবার মতই ঘৃণা সন্দেহ করছে তাকে?—কড়ালী আর থাকতে পারে না। কেমন যেন দিশাহারা হয়ে যায়। সাঁড়াশীর মত দু'টো হাত দিয়ে টেনে নেয় রসুলকে। বলে, 'তোকে আমি নে যাব। আমি ঠিক নে যাব। তুই আর যেতে পারবি না—উখানটায়। অরা আর আসতে দিবে না। আমার জিনিটা কেড়ে নিবে র‍্যা।' বলতে বলতে কি ভাবে—সব শক্তি দিয়ে ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিল। রসুল হাত পা আছড়ায়। নেমে পড়তে চায়। আর সেই অবস্থায় কড়ালী রসুলকে নিয়ে ছুটতে থাকে। কি এক অমানুষিক শক্তিতে কড়ালী ফুলছে!* এই প্রথম কড়ালীর চির স্নেহ সিক্তি চোখে—দানবীর ক্রোধ জ্বলে উঠলো। সে আর মানুষ নয়। কড়ালী এই

প্রথম প্রমাণ করতে চাইল—সে মানুষ নয়। মানুষ নয়। ডাইনী, রাক্ষুসী, আরো ভয়ঙ্কর কিছু!

ঘন বনান্তরালে—রসুলের ভয়ার্ত ক্ষীণ আর্তকণ্ঠ উদ্বেগ হ'য়ে উঠতে থাকে। বলে, 'আমি যাবনি··· আমি—যাবনি—আমি যাবনি···উ—ধা—র···

কড়ালী হাসতে থাকে। প্রাণপণে ছুটতে থাকে। তাকে সে রসুলকে লুকিয়ে রেখে আসবে ঘন বনের মধ্যে। আর কেউ কোনদিনও তাকে খুঁজে পাবে না। আমিনুল্লা এসে আর ধরে নিয়ে যাবে না। তার জিনিস সে লুকিয়ে রাখবে। গুপ্তধনের মত।

রসুলের দু'চোখ ভয়ে স্থির হ'য়ে থাকে। কি যেন বুঝেছিল, কড়ালীর মায়ের ভয়ঙ্কর চোখ দুটো দেখে। আর একটি কথাও বলতে পারে নি। আর একবারও সে পালাবার চেষ্টা করে নি। ভয়াবহ আতঙ্কে সে স্থির হয়ে গিয়েছিল।···

ঘন বন। এত ঘন বনে যেন কখনো তারা বেড়াতে আসেনি। কোন মানুষই বোধ হয় খুঁজে পাবে না ঐ জায়গাটাকে। রসুল চীৎকার করে কাঁদলেও—কেউ শুনতে পাবে না। কড়ালী আনন্দে বীভৎস হাসি হাসে। দু'চোখে উদগ্র ঘৃণা, প্রতিহিংসা।

নিজের পরণের শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে নেয় কড়ালী। তাই দিয়ে গাছের সংগে বাঁধে রসুলকে। দানবীয় শক্তিতে একটা ছোট্ট শরীরকে বিচিত্র বন্ধনের আড়ালে ঢেকে বাঁধে! বন বিতানের হাওয়ার সুরে কি একটা কান্নার শব্দ বাজলো। কড়ালী সেই মুহূর্তে চীৎকার করেই হেসে উঠলো।

তারপর, সে ফিরে এলো 'বনবিবি' তলায়। সেদিনও, সাঁঝ অন্ধকার! রসুলকে খুঁজতে এলো আমিনুল্লা। কড়ালী বীভৎস হাসি হাসতে হাসতে বললো—বিটাকে থুয়ে এসেছি বনে। তরা আর খুঁজে পাবি না। আর তোদের কাছে উকে যেতে দিব না।'

এরপর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল 'বনবিবি' তলা।·· সবাই বলে, কড়ালী রাক্ষুসী খেয়ে ফেলেছে ছেলেটাকে। নইলে, অমন বীভৎস চোখ মুখ হয়। সবাই জোটবদ্ধ হ'য়ে কড়ালীকে ঘিরে ধরলো। অমানুষিক ভাবে মারতে লাগলো। তবু কড়ালী বললো না, রসুল কোথায়। শুধু সেই একই কথায় হাসে পাগলিনী—'উকে আর তরা পাবি নে। লুকিয়ে রেখেছি। খুঁজে পাবি নে।'

তবু খুঁজতে বের হোল অনেকে। দু' একজন জংলীও গেল লণ্ঠন হাতে নিবিড় অরণ্যে। এক সময় পাওয়া গেল রসুলকে। গাছে বাঁধা অবস্থায়। শেয়ালে ছিঁড়ে খাচ্ছে—একজন জংলী পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো। আর একজন রসুলের ছিন্ন ভিন্ন দেহটাকে টেনে নিল।

সেই নিয়ে ফিরে এলো—ওরা মাসুদি গাঁয়ে। 'বনবিবি' তলায় লোক ধরে না। সবাই ঘিরে রেখেছে কড়ালীকে। রসুলের ক্ষত বিক্ষত মৃত দেহ দেখে সকলেই জ্ঞানহারা হয়ে গেল।

অভিশপ্ত 'বনবিবি' তলার মাটির পাশে—সেই প্রথম কবর খোঁড়া হোল একটি জীবন্ত মানুষের সমাধির জন্য। কড়ালীকে সবাই মিলে শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিল। তার শেষ কথাটি ছিল—মাটির তলায় যাবার আগে—"আমার সঙ্গে রসুলকেও দে-যা। উকে নে—চলে যাই।"

অভিশপ্ত 'বনবিবি' তলায় আর কেউ কোনদিন থেকে যেত না। তারপর থেকে সকলেই বলতো—'ও জায়গা দেবীর আস্তানা নয়। পিশাচিনীর নরক। ওখানে গেলে পাপ হয়। অমঙ্গল হয়।'

কিন্তু বনবিবি তলায় মধ্য রাতের বাতাসে কেউ যদি কান পেতে থাকতো—হয় শুনতো—নিশ্চয়, সত্যিই আমি পিচাশিনী নই। তোমরা মানুষ হয়ে—আমাকে তাই করেছিলে। কাজেই রসুলের মৃত্যুর জন্য তোমরাই অপরাধী। মানুষের প্রতি মানুষের সন্দেহ—ঘৃণা—নিষ্ঠুরতা—এমনি করেই কত জীবনের সমাধি এনে দেয়—অপরাধ ইতিহাসে তার খতিয়ান লেখা নেই।

*

সুপর্ণা দেবী

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নর-নারীদের ব্যবহারোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদের প্রকার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই মোটামুটি পরিচয় দিয়েছি। কাজেই সে প্রসঙ্গের পুনরালোচনা না করে, আপাততঃ তখনকার আমলের পোষাক-পরিচ্ছদ রচনার উপকরণ...অর্থাৎ, সুবিখ্যাত প্রাচীন 'অমরকোষ' গ্রন্থে যে বিষয়টিকে 'বস্ত্রযোনি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ দেওয়া যাক। 'অমরকোষ' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে সেকালে প্রায় দশ রকম উপায়ে 'বস্ত্রযোনি' বা পোষাক-পরিচ্ছদ রচনার কাজ সুসম্পাদিত হতো। যেমন :—

১। বাল্ক—বল্কল বা গাছের ছাল থেকে বানানো অঙ্গবস্ত্রাদি।

২। কার্পাস—কাপাস বা শিমুল, আকন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন ফল থেকে সংগৃহীত তুলা-জাত অঙ্গবস্ত্রাদি।

৩। কৌশেয়, কৃমিকোশোত্থ—গুটিপোকা বা ঐ ধরণের কীট থেকে সংগৃহীত রেশম, তসর প্রভৃতি উপকরণে রচিত পট্ট-বস্ত্রাদি।

৪। রাঙ্কব, মৃগরোমজ—ভেড়া, ছাগল, রঙ্কুমৃগ প্রভৃতি জীব-জন্তুর রোম ব্যবহারে রচিত পশমী অঙ্গ-বস্ত্রাদি। (প্রাচীন 'অমরকোষ' গ্রন্থে 'নীশার' বা 'প্রাবরী' নামে উল্লিখিত।) ইত্যাদি

এছাড়া সুপ্রাচীন 'মহাভারত' গ্রন্থেও 'বাহ্লীচীন সমুদ্ভব' (বাহ্লীক ও চীনদেশে জাত বস্ত্রাদি)। 'পাটজ' (পাট-জাত বস্ত্রাদি), 'ঔর্ণেয়' (উর্ণা-জাতীয় তন্তু-ব্যবহারে বয়ন-করা পশমী বস্ত্রাদি), 'রাঙ্কব' (রঙ্কু-মৃগের রোমজ পশমী-বস্ত্রাদি), 'আবিক' (মেষ-লোমজাত পশমী-বস্ত্রাদি), 'কীটজ' (কীট জাত-তন্তু ব্যবহারে বয়ন-করা রেশমী বস্ত্রাদি), 'কার্পাস' (কাপাস জাতীয় তুলায় তৈরী বস্ত্রাদি) এবং 'অজিন' (চর্মনির্মিত বস্ত্রাদি) —এই কয়েকটি রকমের বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণাদি-গ্রন্থেও উপরোক্ত বিবিধ 'বস্ত্রের' বা 'বস্ত্রযোনির' সবিশেষ বিবরণ মেলে। এই ধরণের বিভিন্ন বস্ত্রাদি ছাড়াও, পরবর্ত্তী আমলে প্রাচীন ভারতীয় সৌখিন-সমাজে স্বর্ণসূত্রগ্রথিত সুদৃশ্য মনোরম 'ক্ষৌম-বস্ত্রেরও' যে রীতিমত সমাদর ও ব্যাপক প্রচলন ছিল, সেকালের নানান্ গ্রন্থে তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন 'মার্কণ্ডেয়-পুরাণ' গ্রন্থে 'অজর' এবং 'বহ্নিশুদ্ধ' নামে দুই ধরণের অভিনব বস্ত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেগুলি যে কোন্ উপাদানে রচিত হতো, দুঃখের বিষয়, তার এতটুকু হদিশ মেলে না আজ। ভারতের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ সুবিখ্যাত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও' বহুবার 'অগ্নিশুদ্ধ' বস্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেখানেও তখনকার আমলে এ-ধরণের বস্ত্র যে কোন্ বিশেষ উপাদানে রচিত হতো, তার সুস্পষ্ট আভাস নজরে পড়ে না। তবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে স্ত্রী-পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রাদি যে সৌখিন-সুন্দর ছাঁদের হতো, সে সম্বন্ধে প্রচুর নজীর মেলে—সেকালের নানান্ কাব্যে, নাটকে, পুরাণে, ইতিহাসে। প্রাচীন আমলে হংস-চিত্রাঙ্কিত সুদৃশ্য সৌখিন অভিনব বস্ত্রের যে বহুল প্রচলন ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাকবি কালিদাস রচিত 'রঘু-বংশ' ও 'কুমারসম্ভব' কাব্যে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও বিশেষ উল্লেখ মেলে যে কৌটিল্যের (চাণক্য পণ্ডিত) সমসাময়িককালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকে মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ মরাল-শুভ্র শ্বেতস্নিগ্ধ বিশেষ এক ধরণের 'দুকূল' বা 'সূক্ষ্মপট্টবস্ত্র' (বাঙলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ 'মসলিন' জাতীয় কাপড় ?) বয়ন-শিল্পের জন্য সুবিখ্যাত ছিল।

ভারতের প্রাচীন পুঁথি-পত্রে তৎকালীন সমাজের নর-নারীদের ব্যবহারোপযোগী সৌখিন-সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদের আরো নানান্ বিচিত্র-বিবরণ মেলে। কিন্তু শুধু পোষাক পরিচ্ছদে অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করা ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় সমাজে রূপচর্চ্চার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে পুরাকালে বিভিন্ন অলঙ্কার ব্যবহারেরও বিশেষ রীতি ও সমাদর ছিল। নর-নারী নির্ব্বিশেষে সেকালে সোণা, রূপা, তামা প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুনির্মিত ও রঙীন বহুমূল্য বিবিধ রত্ন-মণি-মাণিক্যখচিত নানা রকম সৌখিন-সুন্দর অভিনব ছাঁদের অলঙ্কার ধারণের যে প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল আগামী সংখ্যায় সে সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ

এমব্রয়ডারী শিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

গত সংখ্যায় এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের উপযোগী বিচিত্র অভিনব ধরণে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে বিবিধ সামগ্রীতে যে সব সৌখিন সুন্দর আলঙ্কারিক নক্সা রচনা করা যায়, তার মোটামুটি হদিশ দিয়েছি। এবারে বলছি—সূচীশিল্পের সেই কলা-কৌশল-পদ্ধতি অবলম্বনে ঘর-সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি সামগ্রী রচনার কথা।
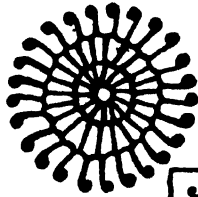
উপরের ৯নং চিত্রে 'ক'-চিহ্নিত সুদৃশ্য আলপনার মতো ছাঁদের যে গোলাকার 'আলঙ্কারিক-চক্রের' (Decorative circular motif) নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি সৌখিন ধরণের ব্লাউশ, অঙ্গাবরণী চাদর, স্কার্ফ, পর্দা, টেবিল-ক্লথ, কুশান-কভার, হাত-ব্যাগ, বটুয়া, থলি, বালিশ-ঢাকা প্রভৃতি নানারকম সামগ্রীকে সূচীশিল্প-শ্রীমণ্ডিত করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে। এই ধরণের নক্সা রচনার জন্য গত মাসের আলোচনায় উল্লিখিত 'বাটন্-হোল্ হুইল্' (Buttonhole-wheel) সূচীশিল্প পদ্ধতিটি অনুসরণ করা প্রয়োজন। নীচের ছবিটি দেখলেই তার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলবে।
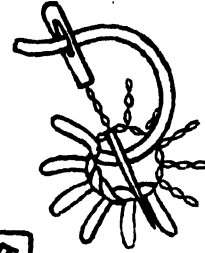
এছাড়া আরেক ধরণের অর্থাৎ, গতবারে উল্লিখিত 'অল্টারনেটিভ্ বাটন্‌হোল্ হুইল' (Alternative Buttonhole-Wheel) সূচীশিল্প পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলেও উপরোক্ত ৯নং চিত্রের নক্সা নমুনাটিকে সামান্য রদবদল করে রূপ দেওয়া যাবে। নীচে পুনর্মুদ্রিত ৬নং চিত্রে দেখানো নক্সা নমুনাটিতে তার আভাস মিলবে।
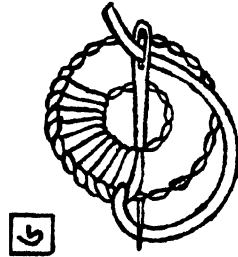
এমনি ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার কলা-কৌশলেরই সামান্য হের-ফের ঘটিয়ে অনায়াসেই রচনা করা যাবে—উপরের ৯নং চিত্রে দেখানো 'খ'-চিহ্নিত অর্দ্ধ-চক্রাকার সুদৃশ্য আলঙ্কারিক 'বর্ডার' বা 'পাড়ের' নক্সা নমুনাটি।

আলোচ্য ৫ ও ৬নং চিত্রে দেখানো নক্সা নমুনাটিরই ঈষৎ রকমফের করে, সহজেই রচনা করা যাবে—উপরের ৯নং চিত্রের 'গ'-চিহ্নিত আলপনার ছাঁদের গোলাকার নক্সা নমুনাটিকে।

স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ, এই কয়েকটি চক্রাকার নক্সা-নমুনা রচনার কলা-কৌশলের হদিশ দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় ইতিপূর্বে উল্লিখিত ৭ ও ৮নং চিত্রের নক্সা-নমুনা দুটির কলা-কৌশল-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

কনে দেখা আলো

সমীরণ রুদ্র

গতবছর পূজার সময় দেশে যাচ্ছিলাম অর্থাৎ আমাদের গ্রামে বনপলাশিতে। ট্রেন থেকে নেমে খানিকটা পথ—জলপথে অর্থাৎ নৌকায় যেতে হয়। নৌকার ছইএর মধ্যে একা বসেছিলাম চুপচাপ। বসে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম আর কত কি ভাবছিলাম। তখন আকাশের পশ্চিম কোণে কুমকুমের রঙ লেগেছে। ধীরে ধীরে আকাশ এবারে নীলচে হয়ে আসছে! আর একটু পরেই চাঁদ উঠবে। অজস্র তারাও নীলাভ রেশমী শাড়িতে জ্বলবে অগণিত রূপালী চুমকি। একটা করুণ সুর থেকে থেকে ভেসে আসছিল। ভাল করে কান পেতে শুনলাম। হাঁ একটা বাঁশের বাঁশীর মিঠে মেঠো সুর মাঝে মাঝে ছন্দিত হচ্ছিল। আমাদের এই নদীটির নাম শিলাবতী। এর দুপারেই বনতুলসী আর কাশের বন। নৌকাটাকে গভীর জলের দিকে সরিয়ে আনলো মাঝি। আমি চুপচাপ তেমনি ভাবেই বসেছিলাম আর ভাবছিলাম পুরানো দিনের সব কথা।

অতীতের ঝাঁপিতে হাত দিতে প্রথমেই যা উঠে এল তাও এই নদী শিলাবতী। এমনি পূজার সময়, একটি পল্লীগ্রামের কুঁড়ে ঘর ও একটি আশ্চর্য সুশ্রী তরুণী মেয়ের স্মৃতি। সাল মনে নেই। তবে কুড়ি-বাইশ বছর আগের কথা। তখনো আমার বিয়ে হয়নি। কিন্তু বিয়ের কথা হচ্ছিল। সেবার আমার সঙ্গে আমার বন্ধু শচীন ছিল। শচীন আমার সহপাঠী ছিল। তারপর সহকর্মী। ঠিক হয়েছিল যে পূজার ক'দিন শচীনদের গ্রামে সোনাখালিতে আমি থাকবো। তারপর একাদশী কিংবা দ্বাদশীর দিন আমাদের বন-পলাশিতে আমি চলে যাবো। দুজায়গাতেই আমরা কোলকাতা থেকে এই কথা জানিয়ে পত্র দিয়েছিলাম। আমার বাড়ীতে শুধু আমার বাবা ছিলেন অভিভাবক। আর শচীনের বাড়ীতে শুধু ওর মা। এঁদের দুজনেরই খুব ইচ্ছা ছিল যে শচীনের বোন সুতপার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। অর্থাৎ সুতপার সঙ্গেই আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল এবং তা অনেকদিন থেকেই। সুতপা সেবার বেথুন থেকে বি. এ. দেবে। সে আমাদের কদিন আগেই তার কলেজ বন্ধ হতে সোনাখালিতে চলে গেছলো। আমরা গেলাম পঞ্চমীর দিন। ঠিক এমনি সময়টাতে গড়ের ঘাটে নেমে আমরা শচীনদের গ্রামের পথে পা বাড়িয়েছিলাম। রুক্ষ ধুলো মাটির রাস্তা, রুক্ষ সাদা মাটির ফাটা মাঠ, মাঝে মাঝে আকন্দর ঝোপ, বৈঁচি ও বুনোফুলের ঝোপ। কোথাও বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, কোথাও দু'একটুকরো সবুজ সব্জির ক্ষেত, কোথাও বা আখের ক্ষেত, তাছাড়া চারধারে সাদা কাশ আর সরের ঢেউ।

নদীর পাশেই সোনাখালি গ্রাম। শচীনদের বাড়ীতে যখন আমরা পৌছালাম তখন মন আমার এক আশ্চর্য তৃপ্তিতে ভরে গেল। এত স্নিগ্ধ সুন্দর রমণীয় জায়গা যে আছে এ পৃথিবীতে তা আমি আগে এমন করে জানতাম না। গিরিমাটি দিয়ে রাঙানো উঠান, তকতকে ঝকঝকে। থোকা থোকা লাল সাদা নয়ন-তারা ফুলে সাজানো, পাশেই তুলসীর বেদী। সিঁড়ি দিয়ে দু'তিন ধাপ ওপরে উঠলেই প্রশস্ত মাটির দাওয়া, দাওয়ার নীচে লতানে গোলাপের চারা এখানে ওখানে, আশে পাশে সন্ধ্যামণি। এধারে লাউ মাচা। সর্বত্রই একটা পরিচ্ছন্নতার ছাপ। আর পবিত্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন শচীনের মা—অর্থাৎ আমাদের মাসীমা। আমরা তাঁকে

মাসীমাই বলতাম। মাসীমার চোখ দুটি ছিল ভারী মিষ্টি। আর মুখের কথা আরো মিষ্টি। কথা শুনলে প্রাণ আনন্দে ভরে যেত। আমাদের তিনি হাত মুখ ধোবার জল দিলেন। দাওয়াতে বসবার জন্য সতরঞ্চি বিছিয়ে দিলেন। তারপর একটি হাত পাখা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বাতাস করবেন। আমি ওকে প্রণাম করলাম। উনি আমার চিবুক স্পর্শ করলেন। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর সুতপাকে ডেকে বল্লেন—"পদ্ম, শচীন আর সুশান্তকে চা আর জলখাবার দে।" সুতপার ডাক নাম পদ্ম। শচীন তখুনি গ্রামের বারোয়ারি পূজার তদ্বির ও তদারক করতে চলে গেল। কারণ ও ছিল পূজা কমিটির অন্যতম পাণ্ডা। মাসীমা গেলেন রান্না ঘরে। সুতপা একটি ডিসে করে ক'টা পানতুয়া ও এক গ্লাস জল নিয়ে এল আমার জন্যে। শিশু গাছের ডালে তখন কিচিরমিচির করছে নীড়ে ফিরে আসা ক'টা পাখি। সেই গোধূলি লগ্নে অর্থাৎ কনে দেখা আলোয় আমি দেখলাম আমার ভাবী কনেকে। তাকে অবশ্য আমি কোলকাতাতে আগেও দেখেছি অনেকবার। কথাও বলেছি বহুবার। কিন্তু আজ যেন তাকে নতুন করে দেখলাম। আগে দীর্ঘাঙ্গী হলেও একটু কৃশ সে ছিল। এখন যেন তার দেহে শুক্লপক্ষের পূর্ণতা এসে গেছে। গালে, গলায়, কণ্ঠায়, বুকে, বাহুতে, মসৃণ রেখা এঁকে বেঁকে মাখন কোমল মেদ লেগেছে। রঙটা যেন তার আরো ধবধবে হয়েছে। অপলক বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি তার দিকে চেয়েছিলাম। হ্যাঁ, একেবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে। সুতপা মৃদু হেসে বলল—কি দেখছ অমন করে? আমিও মৃদু হেসে বললাম—দেখছি তোমাকে। পুরুষের দেহে কোনও বিস্ময় আছে কিনা, তোমাদের মেয়েদের চোখ তা জানে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কুমারী নারীর দেহের যৌবন বিস্ময় যেন তার আগাগোড়া। তার কালো চুলের রাশির মধ্যে পারিজাত কাননের সুগন্ধ কেমন করে যে জড়িয়ে যায় তার সংবাদ কেউ জানেনা। তার ললাটে, চোখের কোণে, নাসাগ্রে, আরক্ত অধরে, বাহুমূলে, বক্ষযুগলে, কটি মেখলায়—যে পেলবতা, এবং সৌকুমার্য উচ্ছলিত, তারই স্তবকে স্তবকে বাসা বেঁধে থাকে বাসনার সহস্র ফণা! কুমারীর সর্বাঙ্গে এবং প্রত্যঙ্গে, প্রাকৃত একপ্রকার মধুর বন্য গন্ধ কেন যে নিগূঢ় আকর্ষণে পুরুষকে কাছে টানতে থাকে, মেয়েরা একথা জানে বৈকি। সেই জন্যেই তো ফুলের পাপড়ি যেমন ভিতরের কুঁড়ির গন্ধকে চাপা দেয়, তোমরাও তেমনি আচল দিয়ে ঢাকা দাও তোমাদের দেহ সৌরভকে। সুতপা ছিল ভিন্ন ধাতুতে গড়া মেয়ে। সে বলল—সুশান্ত, তোমার লেখা গল্প ও কবিতা অনেক আমি ইদানীংকালে পড়েছি। আমি জানি তুমি কবি ও সাহিত্যিক। কিন্তু আমি চাই তুমি সত্য হবে নিজের ধর্মে ও নিজের মর্মে। সেই তোমার একমাত্র কাজ। আমি তোমার সেই কাজের সহচরী। মেয়ে মানুষের উপর লোভাতুর স্তুতিবাদ, মিথ্যা প্রণয়ের মাধুরী বিলাপ তোমার লেখায় ও কথায় এইসব জঞ্জাল তুমি অন্ততঃ ঘেঁটোনা। তুমি আনবে বলবানের বীরদর্প, আনবে দুর্জয় প্রাণ, শত সূর্যের তেজ, ভুল ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে হিংসা। তোমার লেখায় যেন পাই বৈশ্বানরের সর্বনাশা আগুন, ছিন্নমস্তার রক্তপিপাসা, পরশুরামের প্রচণ্ড ঘৃণা, পণ্ডিত দুর্বাসার আজন্মের আক্রোশ। তুমি কবি, তুমি হলে সৃষ্টির প্রথম পুরুষ। আমি তোমার কবিতা, তোমার কল্পনাদাতা। হে আমার কবি তোমার কবিতায় ও লেখায় সারা বাংলার না না সারা ভারতের ছায়া পড়ুক এই আমি চাই। তুমি ফুটে ওঠো, সেই আমার আনন্দ। এই সময় একটি হারিকেন লণ্ঠন জালিয়ে মাসীমা দাওয়ার উপর রেখে গেলেন। আমরা সতরঞ্চির উপর দুজনে পাশাপাশি বসেছিলাম। সুতপা আবার বললে—তুমি আমার রূপের কথা তখন বলছিলে। কিন্তু তোমার রূপের কথা তুমি কিছু জাননা। তোমার প্রশস্ত ললাট, ঘন কালো দুটি ভুরু, বিস্তৃত বক্ষোপট। আমার মনে হয় একমাত্র গ্রীক দেবতা অ্যাপলোর শ্বেতমর্মর মূর্তির সঙ্গেই শুধু তোমার তুলনা করা চলে। আজ ছয় বছর ধরে তোমায় আমি দেখছি সুশান্ত। কিন্তু এখনও যে অনেক জন্ম, অনেক জন্মান্তর ধরেই এই দেখা আমার শেষ হবে না। কারণ আমি তোমার সেই কবিসত্তায় যে আত্মলীন। আর তুমি জ্যোতির্ময় আমার

সত্তায়। তোমার চোখের ওপরে ভরে উঠেছে আমার এই দেহ, এই যা দেখছ এখন তুমি কানায় কানায়। আবার আমার চোখের ওপরে তোমারও দেহের সব লক্ষণ একে একে ফুটেছে—মেয়ের চোখ ঠিক যেগুলি চায়। এর মধ্যে কোনদিন তুমি যদি অসুর হয়ে উঠতে, তাহলে দেখতে আমিও রাক্ষসী হয়ে উঠেছি। কিন্তু কোনদিন তুমি তা হওনি আমাকেও তা হতে দাওনি। তাহলে কি দরকার আমাদের এই নোংরামিতে? মেয়ে মানুষের ইনট্যুইটিভ দৃষ্টি খুবই প্রখর সুশান্ত। তোমাদের চোখ দেখলে, তোমাদের মুখ দেখলে, তোমাদের গা ছুঁলে আমরা বুঝতে পারি তোমাদের সর্বনেশে পোটেন্সি। কিন্তু একথাও থাক। আজ যা বলছিলাম তা হচ্ছে এই যে কি দরকার আমাদের যৌন বিহ্বলতার আবেগ উচ্ছ্বাসে যখন আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য ও অবিচ্ছিন্ন? যখন আমি তোমার প্রিয়া, সখী, প্রণয়িনী ও তোমার ভাবী স্ত্রী? যখন তুমি আমার সকল মাধুরীর প্রতীক ও অমৃতের পাত্র?

দমকা হাওয়ায় আলোটা একসময় খাবি খেয়ে নিবে গেল। বাইরে পঞ্চমীর চাঁদ কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। শীতের আমেজলাগা ঠাণ্ডা রুক্ষ হাওয়া এক একবার ঝাপট দিয়ে চলেছে গাছ পালায়। তারই সড়সড় শব্দ ছাড়া বাইরের পৃথিবী একরকম নিশ্চুপ। মাসীমা বোধ হয় ওধারের ঘরে একলা ঘুমিয়ে আছেন। কেবলমাত্র আমরা দুজন সেইখানে সেইভাবে মুখোমুখি বসেছিলাম। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। সেদিকে চেয়ে সুতপা একসময় আবার বললে—এখন খাবে না সুশান্ত? বললাম—রাত্রে কি খেতে দেবে সুতপা?

সে বলল—তোমার প্রিয় খাদ্য ফ্রায়েড্ রাইস, কড়াই শুঁটি ও টমাটো সুপ, মাংস ভাজা, মাছের ফ্রাই।

বললাম—বাঃ চমৎকার। কিন্তু কে রান্না করেছে এসব?

সে বলল—আমি ছাড়া তোমার রুচি আর জানে কে? ভয় নেই—কাল দিনের বেলা ভাতের সঙ্গে শুক্তো, ভাজা মুগের ডাল, পুঁই চচ্চড়ি আর লাউঘণ্ট করে দেবো। তোমার খাদ্য বৈচিত্র্য বা রুচি আমি জানি। হেসে বললাম—ওরে বাব্বাঃ, তুমি যে আমার নাড়ীনক্ষত্র সব একেবারে জেনে ফেলেছ। কেমন করে এতো সব জানলে শুনি! সে বললে—ওমা, আমি যে মেয়ে। আমি জানবো না তো কে জানবে? এ যে বিজ্ঞানের প্রথম কথা। আমার জ্ঞান আর শিক্ষা এনেছি প্রজাপতি ব্রহ্মার পাঁজর থেকে। এ যে কল্প-কল্পান্তের, জন্মজন্মান্তরের। নিষিদ্ধ ফল তুমি জানতে না সুশান্ত, আমিই তোমাকে সেই ফলের সন্ধান দিয়েছিলাম লক্ষ লক্ষ বছর আগে। আমি যে মেয়ে! সৃষ্টির আদিতত্ত্বে মেয়ের দায়িত্বই বেশী। একথা তুমি ভুলে যেওনা। এসো, চলো, খাবে চলো।

এইসময় বাইরে শচীনের গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। শচীন বোধ হয় এখন ফিরলো। আমরা তিনজন সে রাত্রে একত্রে বসে খেলাম। তারপর যে যার নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন ছিল ষষ্ঠী। ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন শুনলাম প্রভাতী পাখিরা প্রাতঃসূর্যের বন্দনা গান ধরেছে। দূরে পূজা মণ্ডপ থেকে ঢাকের বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। মনটা ভেসে চললো লাবণ্যের মধুর আবেশে। এর কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকলো সুতপা প্রাতরাশের সামগ্রী নিয়ে। টোষ্ট, পোচ, কড়াইশুঁটি সিদ্ধ ও কফির জন্য ফুটানো দুধ। সদ্যঃস্নাত ছিল সে। এলো চুল সে বাঁধেনি। ভিজা চুলের সজলতায় সঙ্গে মৃদু সুগন্ধ জড়ানো। মুখশ্রীর উপর সে কখনো প্রসাধন করতো না। সুর্মা বা কাজল, রুজ বা লিপষ্টিক, পাউডার বা পরাগ কোনটাই ব্যবহার করতো না। সেদিন তার পরনে ছিল একখানা পরিচ্ছন্ন সুতি শাড়ি, গায়ে ছিল একটি সাদা চিকনলেসের ব্লাউজ, পায়ে তার কোন স্লিপার ছিল না, তাকে আধুনিকা তরুণীর মতো দেখাচ্ছিল না। মদালসা প্রণয়িনীর ঢংও ছিল না। বরঞ্চ যেন কল্যাণশ্রীসম্পন্না প্রসন্নময়ী সুগৃহিণীর মতোই দেখাচ্ছিল। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। যেন পাচ্ছিলাম তার মধ্যে এক পরমাশ্চর্য অমৃতের আস্বাদ। সে মিষ্টি হেসে বলল—তুমি স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে হলে কি হবে তুমি কিছু জানো না। নারীর সকল অস্ত্র যে তার সহজাত। সে জন্মায়

হননের শক্তি নিয়ে। তার দুই চোখে, দুই বক্ষে, দুই নিতম্বে, দুই জঙ্ঘায় এবং দুই চরণে মৃত্যু বাসা বেঁধে থাকে। কিন্তু অন্যদিকে অন্যভাবে দেখ নারীর চক্ষে কল্যাণশ্রীর নিমীলিত আভা, বক্ষে সঞ্জীবনী অমৃত-ধারা, নিতম্বে ও জঙ্ঘায় প্রাণসৃজনের সর্বকালের রহস্য কথা, এবং তার দুই চরণক্ষেপে কাননের কুসুমসম্ভার প্রস্ফুটিত। তুমি কবি এ সব কথা কি তুমি জানো না? নিশ্চয়ই জানো। তবে কেন বারে বারেই এমন করে অবাক হচ্ছো?

হেসে বললাম—হ্যাঁ সুতপা জানি বৈকি সে কথা কিন্তু আমি যে কবি। তাইতো সকল অবস্থায় আমার রস পাওয়া চাই।

সুতপা বললে—তুমি আমার মধ্যে রস পাচ্ছ কেননা আমি তোমারই সৃষ্টি।

সেদিন বিকেলবেলা। দুজনে দুপেয়ালা চা নিয়ে বসেছিলাম। আমাদের ঘরের বাইরে ছিল রোদে উজ্জ্বল এবং আনন্দে উজ্জ্বল সুন্দর এক অপরাহ্ণ। ওকে আমি বললাম—শুনেছি গাছতলাও পরিচ্ছন্ন হয় মেয়েদের হাতে। পুরুষের মধ্যে কুরূপ আছে, চোর ডাকাত আছে, বর্বর ও শয়তানও আছে, তা থাক, মেয়েরা খুশী থাকে ভালবাসার সত্তায়। ভালবাসায় মেয়ে মরে, ভালবাসায় সে বাঁচে। কিন্তু কি এই ভালবাসা সুতপা? তুমি কি বলতে পারো এ কেমন?

সুতপা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল—ওটা ফুল ফোটার মতন, সুশান্ত। মাটির অনেক নিচের থেকে একটা নির্যাস ওঠে ওপর দিকে। অনেক পথ, অনেক অলিগলি ডালপালা শেকড়-মাকড় তাকে পেরিয়ে আসতে হয়। তারপর সেই শক্তি ধরায় কুঁড়ি, একদিন সেই কুঁড়ির বুক ফেটে যায়। তার নামই বোধ হয় ভালবাসা। সপ্তমীর দিনটিও আমার কাটল সুন্দর ও মধুর ভাবে, সুতপার সঙ্গে সহজ হাসি পরিহাসে। বিকেলের দিকে আমরা দুজনে একবার পূজা মণ্ডপে গিয়ে ঠাকুর দেখেও এলাম। রাত্রে সুতপার হাতের রান্না রোস্টেড্ চিকেন ও শিককাবাবের রোল খেলাম।

অষ্টমীর দিন হঠাৎ তার কেঁপে কেঁপে জ্বর এল। সেদিন আমি আর কোথাও বাইরে যাইনি। তার পাশে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিলাম। তার উত্তপ্ত কপালে ও মাথায় সারাক্ষণ হাত বুলিয়ে দিলাম। কপালে জলপটি দিলাম। সে এক সময় আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললে—সুশান্ত, আমার অক্ষত কৌমার্যের প্রতিটি রক্তবিন্দু শিউরে শিউরে অসহ্য পুলকে আত্মহারা হয় তোমার এই আশ্চর্য সুন্দর সবল হাতের স্পর্শে। তখন আমি জানতে পারি আমার অগ্নিস্রাবী দেহলতার মধ্যে এক অস্থির বাসনা লকলকে শিখায় জ্বলে ওঠে—কাল নাগিনীর লোল রসনার মতো। তখন আমি ভুলে যাই আমার অঙ্গবাসকে শাসন করা দরকার। এজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

তাকে বললাম—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। তুমি তো কখনোই অসংযত নও। তাছাড়া তোমার এখন জ্বর। তুমি পীড়িতা। আমি তোমার ভাবী স্বামী। আমার কাছে লজ্জার তো কিছু নেই। বিয়ে আমাদের অনেক-দিন আগেই হয়ে গেছে। সেই যবে মন-দেয়া-নেয়া শেষ হয়েছে। এখন শুধু মন্ত্রপড়াটা বাকি আছে বৈতো নয়। তুমি সেরে ওঠো। এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। কাপড় চোপড় বা বেশবাস তোমার ঠিকই আছে। তার জ্বর ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। ভেবেছিলাম ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বর কিন্তু না ভয় হল তাই গ্রামের ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠালাম। তিনি এসে সম্ভবতঃ কুইনাইন জাতীয় কিছু ওষুধ দিলেন।

রাত্রের দিকে সুতপা বললে—সুশান্ত, আমি যদি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই তাহলে আমি কি নিঃশেষে মুছে যাবো?

বললাম—এসব কথা বলতে নেই। জ্বরের ঘোরে সে উত্তরের জন্য জিদ ধরলো। তখন আবার তাকে শান্ত করার জন্য আমি বললাম—তুমি মুছে যাবে না। থাকবে তোমার স্পিরিট। তোমার আওয়াজ থাকবে পাখির ডাকে, দীঘিতে ভাসবে তোমার চোখ, হাওয়ায় নিঃশ্বাস, রোদে তোমার রং। আর আকাশ? আকাশ ধরে থাকবে তোমার সব বাসনার স্বপ্ন। কিন্তু তুমি না থাকলে আমার কি উপায় হবে সুতপা? আমি যে শুকিয়ে যাবো।

সুতপা বললে—তুমি কেন শুকোবে? আমি ওপর

থেকে দেখবো তোমার মাথা উঁচু হয়েছে সকলকে ছাড়িয়ে। সেই যথার্থ কবিকে, সেই বিরাট পুরুষকে দেখছে সবাই সকল দিক থেকে। সেই পুরুষের পায়ের নিচে কোন্ একটা সামান্য মেয়ের শুকনো কঙ্কাল করে যেন পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেছে। ইতিহাস কেন তার খোঁজ করতে যাবে, সুশান্ত? আবার বলি তুমি ফুটে ওঠো, সেই আমার আনন্দ। নবমীর দিন সকালে দেখলাম জ্বরে সে জ্ঞান হারিয়েছে। একেবারে অচৈতন্য অবস্থা। মাসীমা স্থির শান্ত হয়ে বসে ওর কপালে জলপটী দিয়ে পাখার হাওয়া করছেন। তখুনি শচীন গেল ডাক্তারকে খবর দিতে ও আনতে। আর আমি ছুটলাম মহকুমা সহরে। আট মাইল রাস্তা। নৌকায় পৌঁছাতে দেরী হবে। তাই শচীনের সাইকেল নিয়েই গেলাম। ওখানের হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়েই এলাম। আসবার সময় আইস ব্যাগ ও বরফ নিয়ে এলাম। পাশকরা ডাক্তারবাবু সুতপাকে দেখে মুখ গম্ভীর করলেন। আড়ালে বললেন—ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়া। তারপর মেনিনজাইটিস আক্রমণ করেছে। এক্ষুণি একটি ইন্‌জেকসন দেওয়া দরকার। কিন্তু সে তো এই গ্রামে পাবেন না। মহকুমা সহরেও পাবেন কিনা সন্দেহ। একেবারে সদর থেকে গিয়ে আনতে হবে। তাই ছুটলাম জেলার সদর সহরে। বাসে গেলাম, বাসে এলাম। স্নান ও আহার কিছুই করিনি। কিন্তু ফিরলাম যখন তখন বোধ করি অনেক দেরী হয়ে গেছে। গ্রামের ডাক্তারবাবু তখুনি অবশ্য ইনজেকসন করে দিলেন। তবে বললেন ফলাফল কি হবে তা বলতে পারছি না কারণ দেরী হয়ে গেছে।

রাত তখন অনেক। পাশের ঘরে শুয়ে আছি। কিন্তু ক্লান্তিতে ও অবসাদে দুর্ভাবনাতে চোখে আমার ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। ঝিঁঝিঁর আওয়াজের সঙ্গে আরো বিচিত্র শব্দের সুর মিশেছিল। শুনলাম একটা তক্ষকের ডাক আর একটা রাত-জাগা পাখীর ডাক। শিয়রের খোলা জানালা দিয়ে এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে বুনো গাছপালার গন্ধ আসছিল। হঠাৎ একটা করুণ আর্তনাদ উঠল। ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার সুর। বুঝলাম এ মাসীমার কণ্ঠস্বর। এ তাঁর মর্মভেদী কান্না। বুঝলাম সুতপা চলে গেল। হৃদয়ের মধ্যে অব্যক্ত এক যন্ত্রণা অনুভব করলাম। সে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করলাম যেমন ক'রে লোহার খাঁচার মধ্যে বনের পাখী করে রক্তাক্ত হয়ে। মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো হায় ভগবান একি তুমি করলে? মনে মনে সুতপার উদ্দেশ্যে বললাম—সুতপা, আমার হাত ধরো, তোমার সঙ্গে আমিও স্বর্গে যাবো। এসো, মুখে রাখো মুখ, চোখে চোখ, শরীরে শরীর। আসলে তুমি সেই স্বাতী নক্ষত্রের প্রবাদ মাখানো অশ্রু, তুমি যৌবনের প্রত্যেক কবির মীরা, কবিদের প্রেরণা, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রুদ্ধ লোভ ভুল ও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ হয়। তাই তুমি থাকো না এখানে, এই পৃথিবীতে, স্বর্গের বাগানে তাই তোমায় ছুটে যেতে হয়। সেই রাতে, নিশাচরী ভাবনায় নিভে আসা আগুনের তাতে, বারবার শুধু শুধু এই কথাগুলো আমার মনে করেছিল আনাগোনা, অন্ধকার নতজানু, ক্ষুধার্ত কল্পনা।

নদীর চড়ায় সুতপার চিতা জ্বলছিল। আমরা ক'জন একটা শিমুল গাছের তলায় বসেছিলাম। একটা গ্রামেরই ছেলে চিতার কাছে গিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে কাঠ ফেটে শব্দ হল, চিতার ওপর কয়েকটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন আতসবাজির মতন বাতাসে উড়ে ফেটে গেল। সামান্য ছাই উড়ল।

সেইদিকে চেয়ে চেয়ে আমার সুতপার বলা কথাগুলি বারবার মনে পড়ছিল। আর চোখ দুটি জলে ভেসে যাচ্ছিল। মনে পড়ছিল কত ছোট খাটো স্মৃতি।

সুতপা বলেছিল—সুশান্ত, আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পরিপূর্ণতা। জীবনভর যে সাধনা তুমি করবে তাকে বলা চলে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা। আমি যদি মরেও যাই তাতে কোনো খেদ নেই। এজন্য তুমি দুঃখ কোর না। তুমি সত্য হবে নিজের ধর্মে ও নিজের মর্মে। একজন যথার্থ কবিকে পরিপূর্ণ প্রতিভায় ফুটিয়ে তুলতে যে আমি চেষ্টা করেছি সেই আমার আনন্দ। সেই পুরুষের পায়ের নীচে কোন্ একটা সামান্য মেয়ের শুকনো কঙ্কাল করে যেন পঞ্চ-

ভূতে মিলিয়ে গেছে ইতিহাস বলো মানুষই বলো কেন তার খোঁজ করতে যাবে? ভালবাসা মৃত্যুর চেয়ে বড় এই কথা মনে রেখো।

দাহ শেষ হয়ে গেল। নদী থেকে মাটির কলসীতে জল ভরে এনে স্বতপার চিতায় ঢেলে দিলাম। তাই দিতে হয়। তার নিশ্চিহ্ন শরীরের ছাইয়ের রাশি দুহাতে অঞ্জলি ভরে ভরে আমি নদীতে ভাসিয়ে দিলাম। তার আত্মার তৃপ্তি হোক। সে শান্তি পা'ক।

কিছু চিতাভস্ম একটি পাত্রে আমি রেখে দিলাম। সারা জীবন আমার শোবার ঘরে তা-রেখে দেবো বলে। একটা সাদা ধবধবে বক নদীর ওপর দিয়ে গোধূলির আলোর সীমানা পেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। এমনি সময় মাঝির ডাকে আমার সম্বিত ফিরে এল। শুনলাম সে বলছে ও বাবু, আপনি বলেছিলেন— গড়ের ঘাটে নৌকো এলে আপনাকে ডাকতে। এই তো সেখানে পৌচেছি। হেথা আপনি নামবেন কি? সোনাখালি গ্রামে যাবেন কি?

ঘাটের সিঁড়ির ওপর একটি অন্ধ ছেলে বসেছিল। তার হাতে একটি মাটির হাঁড়ি ছিল। সে তার আঙুলগুলি দিয়ে সেটাকে তবলার মত করে বাজাচ্ছিল আর সুরেলা কণ্ঠে গাইছিল একদা বিখ্যাত একটি গান— "ওরে মাঝি, তরী হেথা ভিড়িয়োনাকো আজিকে সাঁঝে॥ ভিড়িয়োনাকো চলুক তরী এমনি উজান মাঝে।"

আমার দুটি আঙুলের মাঝে নিভে যাওয়া সিগারেটটা আমি জলে ফেলে দিলাম। একবার নদীর দিকে তাকালাম মনে হল এ তো নদী নয়, একটা নারীর মর্মবেদনা। সে বলেছিল—জীবনবোধই সাহিত্যের যথার্থ মর্মবাণী। মনে মনে বললাম—বেশ তবে তাই হোক, জীবনকে আশ্রয় করেই জীবনবোধ প্রকাশিত হোক।

গড়ের ঘাটকে পিছনে ফেলে আমার নৌকা সোজা উত্তরমুখো এগিয়ে চললো বনপলাশির দিকে। আমি জানি মানুষের জীবন-সত্য মৃত্যুকে স্বীকার করে না। মৃত্যু থেকে সে অমৃতে যেতে চায়।

"বউ ঠাকুরাণীর হাট" ও "বঙ্গাধিপ পরাজয়"

অধ্যাপিকা ডঃ অর্চনা মজুমদার, এম.এ., পি.এইচ.ডি.

অনেকে অনুমান করেন, 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রধানত প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১ম খণ্ড ১৮৬৯, ২য় খণ্ড ১৮৮৪) নামক উপন্যাস থেকেই প্রেরণা পান এবং তাঁর কাহিনীর উপকরণও এই গ্রন্থ থেকেই অনেকখানি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই অনুমান সর্বাংশে সত্য নয়। বস্তুত: বউ-ঠাকুরাণীর হাট রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রতাপচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু উপকরণ নিয়েছেন তাতে সন্দেহ না থাকলেও বিস্তৃত বিবরণে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের সঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের গ্রন্থের নানারকমের পার্থক্য দেখা যায়। এই দুই গ্রন্থের মধ্যস্থ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে দেখানো হল।

বর্তমানকালে এবং পূর্বেও কখনও কখনও যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য বাঙালি বীর ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে পূজিত হয়ে থাকেন বা হয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গাধিপ পরাজয়ের লেখক ঠিক সে চোখে প্রতাপাদিত্যকে দেখেননি। তাঁর মতে প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব আছে বটে কিন্তু তিনি দস্যু, পরস্বাপহরক ও দুরাচারী।

'প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত দুষ্ট রাজা, স্বরাজ্যে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করেন, বঙ্গের অপর একাদশ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন। (বঙ্গাধিপ পরাজয়, পৃ: ৮৯, ৯০)

'এ নরাধম প্রতাপাদিত্য বঙ্গরাজ্য শূন্য করিয়াছে। বঙ্গের একাদশ রাজার রাজত্ব কোথাও বলপূর্বক, কোথাও বা কৌশলে, কোথাও বা অতি অকথ্য ভয়ানক পাপ পরামর্শে লইয়াছে। বঙ্গে সেই একমাত্র ছত্রধারী। তাহার রাজত্ব শাসনে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আবার হিন্দুরাজা বলিয়া অহঙ্কারও আছে। বঙ্গে অদ্বিতীয়।... অত্যন্ত তেজস্বীও বটে, কিন্তু এমত পাপবুদ্ধি আর দুটি দেখিতে পাই না। যত্তপি ধর্মপথে থাকিত, অন্ত কাহার সাধ্য বঙ্গ মুসলমান বলের অধীন করে। রণকৌশলে সুনিপুণ, রণক্ষেত্রে একটি প্রকৃত বীরও বটে, কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়দোষেই সব নষ্ট করিয়াছে। অদম্য বিষয়লাভাশয় তাহার সঙ্গে অসম্ভব উৎসাহ ও ব্যগ্রতা একত্রিত হইয়া সে কত পাপে লিপ্ত হইয়াছে।'

(ঐ পৃ: ১৮৮)

'আমাদের রাজার মাসুলের বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত নজর। ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত পীড়নে অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

(ঐ পৃ: ৯০)

'মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অন্যান্য দৌরাত্ম্য শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়।' (ঐ পৃ: ৯০)

'মহারাজ বসন্ত রায় যখন যশোরের রাজা ছিলেন, একবার বিষয় কর্মের অনুরোধে গ্রামান্তে প্রায় দুই মাস থাকিতে হয়। প্রতাপাদিত্যের তখন বয়:ক্রম প্রায় পঁচিশ বৎসর। তাহার পিতার পরলোকাবধি তাহার খুড়ো মহারাজ বসন্তরায় রাজ্য করিতেন। খুড়ার অবর্তমানে একদিন কতকগুলি দস্যু লইয়া মহারাজ বসন্তরায়ের অন্ত:পুরে বলপূর্বক প্রবেশ করেন ও রাজ্য-লাভাশয়ে মহারাজ বসন্তরায়ের একমাত্র দুগ্ধপোষ্য বালককে নষ্ট করিতে উদ্যোগ পান।' (ঐ পৃ: ১৬৬)

'বউ ঠাকুরাণীর হাটে' রবীন্দ্রনাথ যে প্রতাপাদিত্যকে এঁকেছেন তিনিও দুর্বিনীত, হৃদয়হীন ও দাম্ভিক। প্রতাপাদিত্যের প্রজাপীড়ক মূর্তিটি'ও ভারতীপত্রে প্রকাশিত 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে' প্রকাশ পেয়েছিল। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদয়াদিত্য তাঁর পত্নী সুরমাকে বলছেন—'দেখ সুরমা, পূর্বে আমি নিতান্ত দুর্বল ছিলাম, কোন কাজ করিতে পারিতাম না, ইতস্তত: করিয়া, সংশয় করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম। চারিদিক হইতে প্রজাদের রোদন শুনিতে পাইতাম,

পিতা নিজের স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য অসহায়ের সর্বস্ব কাড়িয়া লইতেন, আমি নীরবে সকলি দেখিতাম,... সেদিন শুনা গেল, মহারাজা মন্ত্রণা করিয়াছেন, সহসা রাত্রি যোগে লোক পাঠাইয়া মাণিকপুরের জমিদারের জমি কাড়িয়া লইবেন, সে ক্ষুদ্র এক ভূস্বামী, ক্ষুদ্র এক জমিদারী ছাড়া তাহার আর কিছু নাই; দুর্বলের সর্বস্ব যায় দেখিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ গিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিলাম। তাহার পূর্বে আর একদিন মহারাজা স্থির করিয়াছিলেন, মতিগঞ্জের গৌরীচরণ ঘোষকে প্রাসাদে ডাকিয়া আনিবেন ও সেই অবসরে তাহার একমাত্র কন্যাকে কাড়িয়া আনিয়া প্রিয়পাত্র মহেশ পালিতের সহিত বিবাহ দিয়া দিবেন। গৌরীচরণকে পিতা এই বিবাহে অনুরোধ করিয়াছিলেন সে সম্মত হয় নাই, এই নিমিত্ত এই রাগ!' (ভারতী, কার্তিক ১২৮৮, পৃঃ ৮)

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যকে স্বার্থসর্বস্ব, অত্যাচারীরূপে চিত্রিত করলেও প্রতাপাদিত্যের প্রত্যাকাঙ্ক্ষার পেছনে যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল তাও উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রতাপাদিত্য কচুরায়কে বলছেন 'আমার রাজ্যলোভ ছিল না—স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—বঙ্গে স্বাধীনতা সংস্থাপন। আমি দেখিলাম যে, বঙ্গ বহুতর ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকিলে কখনই উন্নত হইতে পারিবেক না। আমি দেখিলাম বঙ্গোদ্ধারের একমাত্র উপায় একাধিপত্য। আমার ইচ্ছা ছিল যে, বঙ্গে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাপন করি। কিন্তু বঙ্গে রাজমণ্ডলীতে দেখিলাম যে, পরস্পরের প্রতি এত দ্বেষ ও পরস্পরের এত হিংসা যে ঐকতার লেশ নাই। একতান না হইলে কোন কর্মই সিদ্ধ হয় না। আমার ইচ্ছা ছিল, দ্বাদশ ভৌমিককে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের প্রীতিভাজন হইলে ভৌমিকের রাজকোষের সাহায্যে ও প্রজার বলে, যবন ও দিল্লীর মোগলকে বঙ্গ হইতে দূরীকরণ করিব।'

(বঙ্গাধিপ পরাজয় পৃঃ ৫৩০—৩১)

মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণকে প্রতাপাদিত্য বলেছেন—'আমার কেবল রাজ্যলাভেচ্ছাই বলবতী নহে। আমি লোভে মুগ্ধ হইতেছি না। পাপ আবার আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে বলিয়া সমাচার পাঠাইয়াছিল। কি আস্পর্ধা! এ কি কাহার সহ্য হয়? আমি ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে যে বিদেশীয় যবন বসিবে ইহা আমার অসহ্য। পৃথুরাজ চৌহান যে ছত্র শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, সে ছত্র, অশ্বমাংস লোলুপ......অসভ্য তাতারে অধিকার করে এ কোন্ সৎ হিন্দুর বক্ষে সহে? আমাদিগের দেশ, আমাদিগের ধন, আমাদিগের অস্ত্রবল; আমাদিগের সেনা, আবার আমাদিগেরই সেনানী কি ম্লেচ্ছ যবনের স্ববৃত্তি চরিতার্থে নিযুক্ত থাকিবে! এ কেমন কথা?

(ঐ পৃঃ ২৯১—৯২)

রবীন্দ্রনাথের বউ ঠাকুরাণীর হাটের প্রতাপাদিত্যও এই কথাই বলেছেন—'আমার ব্রত এই—এই যে ম্লেচ্ছেরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে, যাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আর্যধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা মোগলকে কন্যা দিতেছে, হিন্দুরা আচারভ্রষ্ট হইতেছে, এই ম্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব, আমাদের আর্যধর্মকে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিব। এই ব্রত সাধন করিতে অনেক বলের আবশ্যক। আমি চাই, সমস্ত বঙ্গদেশের রাজারা আমার অধীনে এক হয়; যাহারা যবনের মিত্র, তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে না। পিতৃব্য বসন্ত রায় আমার পূজ্যপাদ, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই, তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,......। আমার ইচ্ছা যায় বংশের জন্য, বঙ্গদেশের জন্য, ঐ বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায়-বংশকে বাঁচাই, বঙ্গদেশকে বাঁচাই।' 'বঙ্গাধিপ পরাজয় গ্রন্থেও পিতৃব্য বসন্ত রায়ের প্রতি প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের কারণ এই যে বসন্ত রায় দিল্লীশ্বরের বিরোধিতা না করে দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করেছেন—'তিনি বিনা যুদ্ধে দিল্লীশ্বরকে পত্র লিখিয়া দিলেন ও তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন......জাতশত্রু মুসলমানকে আপনার হস্ত দিলেন ও হিন্দুধর্মের বিপরীত আচরণ করিলেন। তবে বঃ পঃ'র মতে বসন্ত রায়কে

হত্যা করার কারণ কেবল যে দিল্লীশ্বরের প্রতি বসন্ত রায়ের আনুগত্য প্রকাশ তাই নয়, প্রতাপাদিত্যের ব্যক্তিগত স্বার্থও এর মূলে ছিল।

বসন্ত রায়ের হত্যার ঘটনা বউ ঠাকুরাণীর হাটে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রতাপচন্দ্রের গ্রন্থে তা নেই। সেখানে দেখা যাচ্ছে বসন্ত রায়ের দ্বিতীয়া পত্নী বিমলা দেবীর (রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বিমলা নাম ত নেইই বসন্ত রায়ের কোন পত্নীর কথাও নেই) সহযোগিতায় প্রতাপাদিত্য তাঁর পিতৃব্যকে হত্যা করেন। মানসিংহ বলছেন 'তুমি সহস্তে (স্বহস্তে) বিমলা দেবীর সঙ্গে যোগ করিয়া মহারাজ বসন্ত রায়কে বিষ খাওয়াছিলে।' এই বিমলা দেবীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের গোপন ভালোবাসা ছিল।

যতদূর মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বসন্ত রায়ের হত্যার ঘটনায় রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র থেকে কিছু বিবরণ গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে বসন্ত রায়ের হত্যা ব্যাপারের যে বিবৃতি আছে তা ইতিহাসের দিক থেকে কতখানি সত্য জানিনে, কিন্তু তা রীতিমতো চমকপ্রদ বা dramatic।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বউ ঠাকুরাণীর হাটে কবি ও রাজা বসন্ত রায়ের যে চরিত্র এঁকেছেন তা রসের দিক থেকে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। বসন্ত রায় 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীরই পূর্বাভাস। তিনি বৈষ্ণব বৈরাগীর মতোই জীবন ও মৃত্যু দুইই অত্যন্ত সহজভাবে নিয়েছেন এবং সংসারের আনন্দময় পথে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে চলেছেন। প্রতাপাদিত্যের দ্বারা তাঁর জীবননাশ বসন্ত রায়ের জীবনের মহত্ব খর্ব তো করতে পারেইনি, বরং মহত্তর করে তুলেছে।

বঙ্গাধিপ পরাজয়ে বসন্ত রায়ের কথার বেশি উল্লেখ নেই, তবে এই গ্রন্থে বসন্ত রায়ের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এটুকু পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে এই বসন্ত রায় ছিলেন শান্তিপ্রিয়, বুদ্ধিমান্, 'জ্ঞানে ও বিদ্যায় জগজ্জয়ী পণ্ডিত।'

বউ ঠাকুরাণীর হাটের উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের উপযুক্ত ভাবশিষ্য এবং কবি-চিত্তের অধিকারী, কোমল স্বভাব, উদার, স্নেহপ্রবণ, মহৎ চরিত্র। তিনি সর্বাংশে পিতা প্রতাপাদিত্যের বিপরীত। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে উদয়াদিত্য চরিত্রটি নেই। তবে উদয়াদিত্যের মতো ভূমিকা একটি আছে, সেটি সূর্যকুমারের। এই সূর্যকুমার প্রতাপাদিত্যের পুত্র নয়। সূর্যকুমারের পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্য দুই বৎসরের শিশু সূর্যকুমারকে নিজের কাছে আনেন। মহারাণী তাঁর প্রতিপালনের ভার নেন এবং পুত্রস্নেহে লালন পালন করেন। সূর্যকুমার তাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তানের স্থান গ্রহণ করেন। তিনি একদিকে বীর ও তেজস্বী, অন্যদিকে ধীর, কোমল ও সরল স্বভাবের যুবক।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা সুরমা চরিত্রটি স্বমহিমায় পরম ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ উদয়াদিত্যের বীর্য ও মহত্ব দুয়ের পশ্চাতে সুরমার দেওয়া প্রেরণাই সর্বাগ্রগণ্য। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে সূর্যকুমারের পত্নীর উল্লেখ নেই। সেখানে একথা বলা হয়েছে যে, প্রতাপাদিত্যের কন্যা সরমার সঙ্গে সূর্যকুমারের বিবাহের সম্ভাবনা ছিল। এই সরমা চরিত্রটি বউ ঠাকুরাণীর হাটের বিভা চরিত্রের অনুরূপ। সরমার পিতৃপ্রেমের সঙ্গে বিভার ভ্রাতৃপ্রেমের তুলনা চলে। প্রতাপাদিত্যের বন্দী অবস্থায় সরমা যেভাবে তাঁর সেবা করে তা বউ ঠাকুরাণীর হাটের উদয়াদিত্যের বন্দী অবস্থায় বিভার সেবার কথা স্মরণে আনে। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে প্রতাপ ঘোষ লিখেছেন—'শীর্ণা সরমা প্রতাপাদিত্যের সেবায় এত উৎসাহ ও প্রীতি যে, অপর কাহাকেও তাঁহার কণামাত্র সেবা করিতে দেন না। সরমার অপূর্বদৃষ্ট পিতৃভক্তি, অলৌকিক শ্রদ্ধা ও অসামান্য অধ্যবসায় দেখিয়া ছাউনির ভটমণ্ডলীতে তাহার জন্য প্রতাপাদিত্যের প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে। (বঙ্গাধিপ পরাজয় পৃঃ ৫৩০) রবীন্দ্রনাথ তাঁর বউ ঠাকুরাণীর হাটে লিখেছেন—'বিভাও প্রায় কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। গৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়া যখনই প্রভাত প্রবেশ করিত, কারাগার খুলিয়া গিয়া তখনই বিভার বিমলমূর্তি দেখা দিত। বিভা বেতনভোগী ভৃত্যদের কিছুই করিতে দিত না, নিজের হাতে সমুদায় কাজ করিত, নিজে আহার আনিয়া দিত, নিজে শয্যা রচনা করিয়া দিত।'

'বউ ঠাকুরাণীর হাটের' রামচন্দ্র অতি অপদার্থ, ভীরু

ও চাটুকারসেবিত জমিদার। তাঁর স্থূল মনের পরিচয়ও উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি নিজের বুদ্ধির দোষেই প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের পাত্র হন। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে রামচন্দ্রের প্রতি প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের কারণ অন্য। নিজের স্বার্থসিদ্ধির মানসেই প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে বিনাশ করতে চান। রামচন্দ্রের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ও তাঁর উদ্ধারের যে ঘটনা বউ ঠাকুরাণীর হাটে আছে, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ তা রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত জেমস্ ওয়াইজের লেখা থেকে গ্রহণ করেছেন। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে এ ঘটনাটি অন্য ধরণের। সেখানে রামচন্দ্রের উদ্ধার ব্যাপারে মহিষীর সহায়তাও ছিল বলে মনে হয়। উপন্যাসে আছে—'মহিষী বলিলেন, জামাতার জন্য আমি কতবার বলিয়াছি, বিশেষ উপরোধও করিয়াছি, কিন্তু……অনুরোধ করিলে বলেন যে রাজন্যায় ও কৌশল স্ত্রীজাতির বোধগম্য নহে। আমি কি করিব—কেবল নিরালে বসিয়া কাঁদি ও কালীর স্তুতিবাদ করি।'

'বিমলা বলিলেন—মহিষি, তোমার গুণ ও সপত্নী দুহিতার প্রতি প্রেম জগৎবিখ্যাত।……আমরা জানি যে, তোমারই সহায়তায় রামচন্দ্র জীবনলাভ করিয়াছে, নতুবা রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবার সময় তাহার মস্তক ছিন্ন হইত।' তবে এ বিষয়ে রমাই বীরের কৃতিত্বই সর্বাধিক। প্রতাপ ঘোষ লিখেছেন—'রামচন্দ্রের উদ্ধারের প্রধান উদ্যোগী রমাই বীর সমস্ত কর্মই মস্‌করায় ও রসিকতায় নির্বাহ করে।……

(রামচন্দ্র) রমাই বীরের কৌশলে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, শব বলিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার অনুমতি হয়; রমাই বীর সন্ন্যাসী সাজিয়া সেই শব লইয়া নৌকায় তোলে, পরে তাহার স্ত্রী প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে লইয়া রাতারাতি যশোহর হইতে পলায়ন করিয়াছে।' (বঙ্গাধিপ পরাজয় পৃঃ ৪৪৪) বউ ঠাকুরাণীর হাটে' রামমোহন মালের যে ভূমিকা, বঙ্গাধিপ পরাজয়ে রমাইয়ের ভূমিকা অনেকটা সেই ধরণের। রামচন্দ্রের প্রিয়পাত্র রমাই একাধারে বীর ও প্রভুভক্ত।—'সে লোকটি কিন্তু সুচতুর; এত কৌশল ও ছল করিয়াছে যে, সহজে কোন বিষয় বোঝা যায় না সমস্তই যেন ভেল্‌কিবাজী।' (ঐ)

বঙ্গাধিপ পরাজয়ে রামচন্দ্রের পত্নীর নাম সুমতি এবং সে মহিষীর সপত্নী-দুহিতা। রামচন্দ্রের কারাবাসকালে সেও স্বেচ্ছায় করাগারে দিন কাটায়—'সে নবীনা বালা রাজরানী হইয়াও আজন্মকাল স্বেচ্ছাবাসে (?) কারাগারে কাটাইল। কিন্তু সে সতীলক্ষ্মী! এমত পতিপরায়ণা বালিকা আমি আর কখন দেখি নাই। (ঐ পৃঃ ৩৫২—৫৩)

'বউ ঠাকুরাণীর হাটে' রামচন্দ্র রায় তাঁর পত্নী বিভাকে গ্রহণ করেননি। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে এ ঘটনা নেই। রামচন্দ্র রায় ও সুমতি যে একসঙ্গে বসবাস করেছিলেন এখানে তার উল্লেখ আছে। যতদূর মনে হয় রবীন্দ্রনাথ 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে' রামচন্দ্র রায় ও বিভার কাহিনীটি জেমস্ ওয়াইজের লেখা থেকে গ্রহণ করেছেন। সেখানে এ কাহিনীর যে বর্ণনা রয়েছে তা' বউ ঠাকুরাণীর হাটেরই অনুরূপ—Ramchandra Rai succeeded on the death of his father Kandarpa Rai……He married a daughter of Rajah Pratapaditya of Jessore. Between the families of Jossore and Chandradip there were many ties of friendship, and the marriage was celebrated with great pomp, but ended in a permanent quarrel between the families. Ramchandra against the advice of all his friends, insisted on taking with him famous Jester, named Ramai Bir who amused him by his wit and frolies. On the marriage day, this jester, dressed in a female germents, entered the house occupied by the Rani, and conversed with her. His disguise was complete, and she did not detect the imposture. Shortly afterwards, it was discovered, and Raja Pratapaditya was so enraged. that he vowed

he would put his newly-made son-in-law to death. The bride, however, warned her husband, and at night he escaped from the place and reached the encampment where his followers were. The rivers had all been obstrueted, but accompanied by a trusty servant, Rammohan Mal, famous for his strength, he embarked in a small canoe and fled. At the places where the obstructions were Rammohan dragged the boat over the bank, and launched it on the other side. In this way the Raja escaped and reached Chandradip in safety.

It was not until after the lapse of many years and probably not until the death of Pratapaditya in 1593 that the bride joined her husband. At the place where she hulted, until permission was obrained from her husband to proceed, a market was established, which is still called the "Badhu Thakurani Hat" (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I, No III 1874, পৃঃ ২০৮)

(পিতা কন্দর্প নারায়ণের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র রায় সিংহাসনে বসেন। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের এক কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। যশোর ও চন্দ্রদ্বীপ এই দুই রাজপরিবারের মধ্যে নানা সূত্রে বন্ধুত্ব ছিল, কাজেই এই বিবাহ খুব আড়ম্বরের মধ্যে দিয়েই সম্পন্ন হল, তবে তার অবসান হল দুই পরিবারের মধ্যে এক চিরস্থায়ী কলহের সৃষ্টি করে। রামচন্দ্র রায় তাঁর সমস্ত হিতৈষীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে; রমাই বীর নামে একজন বিখ্যাত ভাঁড়কে সঙ্গে নেবার জন্তে জোর করতে লাগলেন। এই রমাই বীর কৌতুক ও ভাঁড়ামির দ্বারা রামচন্দ্র রায়কে আমোদ দিত। বিবাহের দিনে এই ভাঁড় স্ত্রীলোকের পোশাকে রানীর অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। তার ছদ্মবেশ ছিল নিখুঁত, রানী তার প্রতারণা ধরতে পারেন নি। কিছুক্ষণ পরেই যখন তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ল, রাজা প্রতাপাদিত্য এত ক্রুদ্ধ হলেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন তাঁর নব-জামাতা রামচন্দ্রকে হত্যা করবেন। এদিকে নববধূ স্বামীকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়ায় তিনি রাত্রেই রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে আপন অনুচরদের সঙ্গে মিলিত হলেন। নদীপথ চারদিক দিয়েই বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু মহাবলশালী বিশ্বস্ত ভৃত্য রামমোহন মালকে সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট ডোঙায় চড়ে তিনি পালিয়ে গেলেন। যে সমস্ত জায়গায় বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে সমস্ত জায়গায় রামমোহন মাল তীরের ওপর দিয়ে নৌকা টেনে নিয়ে গিয়ে অন্যজলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। এইভাবে রাজা নিরাপদে চন্দ্রদ্বীপে পৌছতে পারলেন। অনেকদিন পর, হয়ত ১৫৯৩ সালে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্যের কন্যা তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়। স্বামীর অনুমতি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতাপাদিত্যের কন্যা যেখানে অবস্থান করেছিল সেখানে একটি হাট গড়ে ওঠে, যেটিকে আজ অবধি বউ ঠাকুরাণীর হাট বলে অভিহিত করা হয়।)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বউ ঠাকুরাণীর হাটের মূল হিসেবে সাধারণভাবে বঙ্গাধিপ পরাজয়কে যে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথ বউ ঠাকুরাণীর হাট গ্রন্থ রচনায় 'বঙ্গাধিপ পরাজয়', রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র এবং এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত জেমস্ ওয়াইজের প্রবন্ধ এই তিনটি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং তাঁর সংগৃহীত উপকরণের সঙ্গে কবি তাঁর উপন্যাসোচিত কল্পনা মিশিয়ে 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' গ্রন্থটিকে অতুলনীয় মহত্ব দান করেন।

শিক্ষা সমস্যা

কিছুকাল হইতে আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা বার বার পরিবর্তনের ফলে সাধারণ মানুষ তাহাদের পুত্র কন্যাদের কিভাবে শিক্ষাদান করিবে তাহা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে সরকার বুনিয়াদি শিক্ষা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঁচটি শ্রেণী লইয়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি শ্রেণী লইয়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বিলাতের অনুকরণে তিন ও চার বৎসরের শিশুদের জন্য প্রাক্-বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু কেন জানি না কর্তৃপক্ষ এই বুনিয়াদী শিক্ষাও সমর্থন করিতেছেন না। বহুদিন হইতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রথম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা চলিতেছে। এই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু এজন্য কিছুতেই ব্যয় বরাদ্দ হইতেছে না।

এখনও দেশে বহু দশ শ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয় আছে। সেখান হইতে স্কুল-ফাইনাল পাস করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে প্রি-ইউনিভারসিটি পড়িয়া তবে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হইতে হয়। দেশে মাত্র কতকগুলি একাদশ শ্রেণীর স্কুল হইয়াছে। সেখান হইতে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করিয়া কলেজে যাইতে হয়। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শেষ তিন বৎসর শিক্ষার্থীরা তাহাদের রুচি অনুসারে কলা, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তী জীবনে ওই বিশেষ শিক্ষা তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সহজ করিয়া দেয়। এইভাবে সর্বদা শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন চলিতেছে। তাহাতে একদিকে যেমন অভিভাবকরা বিভ্রান্ত হইয়া যাইতেছেন অন্যদিকে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীর দল উপযুক্ত পরামর্শ ও উপদেশের অভাবে কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। আমরা ২০ বৎসর পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি বটে কিন্তু এই ২০ বৎসরে দেশের কোন ব্যবস্থাকেই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পারি নাই।

বহু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, শত শত কলেজ এবং হাজার হাজার উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ইহা সত্য ; কিন্তু কোথাও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা দেখা যায় না। গত ২০ বৎসরে স্কুল-কলেজের বাড়ী নির্মাণে সরকার যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ অপব্যয় হইয়াছে বলিলে ভুল বলা হইবে না। সকল চেষ্টা সত্ত্বে দেশবাসী যে অন্ধকারের মধ্যে ছিল সেই অন্ধকারেই পড়িয়া আছে। উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া ছেলেমেয়েরা স্বাধীন মনোবৃত্তি পায় না এবং বৃথা অর্থ ও সময় নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করে। কে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিবে ? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে সাধারণ মানুষ যেমন উচ্চ পদ লাভ করিতেছে তেমনিই চিন্তা ধারায় অসাধারণত্ব না থাকায় তাহাদের দ্বারা কোন ভাল কাজ হইতেছে না। ২০ বৎসর এইভাবে নতুন নতুন প্রস্তাব লইয়া কাটাইয়া দেওয়া হইল। এখন ধীর স্থিরভাবে ভবিষ্যতের কার্য-প্রণালী ঠিক করা প্রয়োজন।

আমরা শুধু সাধারণ শিক্ষার কথা চিন্তা করিয়া

থাকি। ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শিক্ষা এত অধিক ব্যয় বহুল হইয়াছে যে ধনীরাও তাহাদের পুত্র-কন্যাদের সে শিক্ষা দিতে সাহস করেন না। দেশের এক শ্রেণীর লোকের টাকা বাড়িয়াছে সত্য কথা কিন্তু সেই শ্রেণীর লোক সংখ্যায় এত কম যে তাহাদের নগণ্য বলা চলে। দেশকে নতুন শাসকের দল যে কোন্ পথে লইয়া চলিয়াছেন তাহা তাঁহারাও ঠিকভাবে বুঝিতে পারিতেছেন না। ফলে এত অধিক অর্থ ব্যয় ও বিবিধ ব্যবস্থা সত্বেও সর্বত্র শৃঙ্খলার অভাব বাড়িয়া চলিয়াছে।

গত কয় বৎসর পরীক্ষার সময় যে গণ্ডগোল দেখা যাইতেছে তাহা কোন সভ্য দেশে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। একদিকে যেমন প্রশ্নপত্র প্রস্তুত বিষয়ে শত শত ত্রুটি প্রকাশিত হয় অন্যদিকে তেমনি পরীক্ষার্থীরাও অতি সামান্য ত্রুটি লইয়া তাহাকে বিরাট আকার দান করে ও পরীক্ষা লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। গলদ কোথায় এবং কেন তাহা হইতেছে সে সম্বন্ধে কেহ অনুসন্ধান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন না। ফলে তাহার সংশোধনেরও কোন উপায় নির্ণীত হয় না। গত কয় বৎসর ধরিয়াই পরীক্ষার সময় বার বার পরীক্ষা পিছাইয়া যাইতেছে ও পরীক্ষার্থীরা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। দেশের অভিভাবকবৃন্দও এ সকল বিষয়ে উদাসীন। তাহারা পুত্র-কন্যার স্কুল কলেজের বেতন দিয়া তাহাদের পাঠ্য পুস্তক কিনিয়া দিয়া এবং সম্ভব হইলে অতিরিক্ত গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন। পুত্র-কন্যারা সারাদিন কি করে না করে বা স্কুল কলেজে যাইয়া কিভাবে শিক্ষালাভ করিতেছে তাঁহারা তাহা জানিবার চেষ্টা পর্যন্ত করেন না। কেন এই অবস্থা আসিয়াছে তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া সেই কারণ দূর করিতে না পারিলে দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার খ্যাতিমান্ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭০তম জন্ম দিবস উপলক্ষে গত ১২ই জুলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হলে এক আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা শাখা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন। সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। সম্প্রতি তারাশঙ্করবাবু তাঁহার একখানি উপন্যাসের জন্য একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এক লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তারাশঙ্করবাবু বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামের অধিবাসী হইলেও বর্তমানে কলিকাতা টালায় গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার এই পরিণত বয়সে এই পুরস্কার লাভ বাঙালী জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় রবি-বাসরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ পত্রে তাঁহার বহু উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে তাঁহার ৭০তম জন্মদিনে অভিনন্দন জানাই এবং তাঁহার সুদীর্ঘ শান্তিময় জীবন প্রার্থনা করি।

শ্রীনরেন্দ্র দেবের জন্মদিন

শ্রীনরেন্দ্র দেব বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক এবং সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি। গত ২২শে আষাঢ় তিনি ৮০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। সেজন্য সেদিন কলিকাতায় ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির নিকট তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে তাঁহাকে এক প্রীতি সম্মেলনে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে। উদ্যোক্তা ছিলেন (১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার (২) নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা শাখার সভাপতি ও রবিবাসরের অধ্যক্ষ আচার্য শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

শ্রীনরেন্দ্র দেব মহাশয় ভারতবর্ষ কাগজের প্রথম প্রকাশের সময় হইতে উহার লেখক হিসাবে কাগজের সহিত যুক্ত আছেন। আমরা তাঁহার জন্মদিনে তাঁহাকে

শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই এবং প্রার্থনা করি তিনি সুদীর্ঘ শান্তিময় জীবন লাভ করুন।

স্কুল ফাইনালের ফল

গত ১১ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। শতকরা ৭১ জন পাশ করিয়াছে। পূর্ব বৎসরে শতকরা ৭১ জন পাশ করিয়াছিল। মোট ৩২ হাজার ছাত্র ছাত্রী পাশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে ২১ হাজার ছাত্র এবং বাকি সব ছাত্রী। ২৪ পরগণা হাবড়ার হাটথুবা কে. বি. কে. বিদ্যাপীঠের ছাত্রী শ্রীশ্যামলী ঘোষ প্রথম হইয়াছেন ও হুগলী জেলার কোৎরঙ বি. এস. বিদ্যালয়ের ছাত্র মৃণালকান্তি দে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠিত হওয়ার পর স্কুল ফাইনালে এই প্রথম একজন ছাত্রী প্রথম হইল।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মিউজিয়াম

সম্প্রতি উত্তর-বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালার স্বনামধন্য ঐতিহাসিক, রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে "অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মিউজিয়াম" নামে একটি পুরাকীর্তির সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার লেখক জলপাইগুড়ির শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী এই মিউজিয়ামে ৩২টি প্রাচীন মূর্তি, ৫০ খানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি এবং প্রচুর সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা দান করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া উত্তর-বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যোগ্য কাজই করিয়াছেন।

সাহারা

অসীমকুমার মাহাতো

এবার আমার ডাক দিয়েছে চিরকালের সাহারা,
তাইতো আমি এগিয়ে যাব দেখতে তারি ইশারা।
প্রাণের আবেগ, উন্মত্তা নিয়েই আজি পথচলা,
পেছু ডাকা নিয়ে আমার চলবে না আর না বলা।

মরণ সেথায় লুকিয়ে আছে বালির বুকে মুখ রেখে,
তাই বলে কি ফিরব আমি মরুর জীবন না দেখে ?
উষার কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে যাব প্রান্তরে,
দুঃসাহসের আবেগ শুধু রয়গো আমার অন্তরে।

মরু ঝড়ের আলিঙ্গনে দেব আমি আজ ধরা,
শান্ত ছেলের মত আমার চলবে না আর কাজ করা।
প্রলয় নাচে উঠছে মেতে বৈশাখেরই ঝঞ্ঝা আজ,
বাজিয়ে বিষাণ ছুটছে বায়ু দেখতে মরুর প্রলয় সাজ।

কোমল মাটির নরম ছোঁয়া আর তো ভাল লাগছে না,
জীবন-খেয়ার মাঝি আজি অন্য ঘাটে ভিড়ছে না।
পাল খুলেছে দেখতে কেবল মরুর বুকের অনন্ত,
অজানাকে জানতে চেয়ে এগিয়ে চলে দুরন্ত।

ঝড়-বৃষ্টি-মেঘ
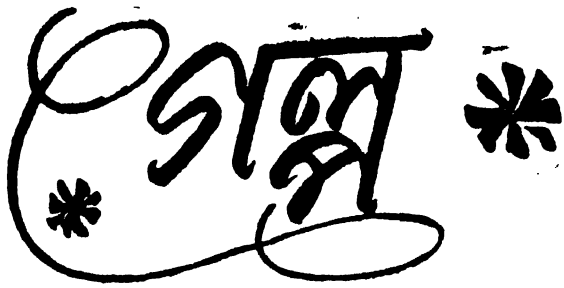
অরুণ দে

দরজায় খিল দিয়ে বিছানার উপর আছড়ে পড়ল বীণা। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে শিবনাথের মত শিক্ষিত মানুষ তাকে এতকাল শুধু ঠকিয়েছে—কেবল মিথ্যা কথায় ভুলিয়েছে।

শিবনাথের বন্ধু নরেন বীণার বাড়ীতে এসে প্রথম যখন খবরটা দিল তখন বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বীণা। নরেনকে এর আগে দেখেনি বীণা। লোকটা নিজেকে শিবনাথের বন্ধু বলে পরিচয় দিতেই বীণা তাকে ঘরে এনে বসিয়েছিল। ভেবেছিল, দিন পনের পরে তার সঙ্গে শিবনাথের গোপন বিয়ের যে ব্যবস্থা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে করা হয়েছে সে সম্বন্ধেই নরেন হয়ত কিছু বলতে এসেছে। কিন্তু তা নয়। নরেন জানাল—বীণা এ বিয়েতে রাজী হলে ঠকবে কারণ শিবনাথের নাকি অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়ে গেছে এবং তার একটা ছেলেও নাকি আছে।

এতবড় একটা ঘটনা এতকাল শিবনাথ যে কেন তার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল তা কিছুতেই ভেবে পেল না বীণা। একবার মনে হল নরেন হয়ত মিথ্যা কথা বলছে, পরক্ষণে ভাবল হয়ত সবই সত্যি। ঘটনাটা যদি সত্যি নাই হবে তবে লোকটা এমন খবর জানাতে আসবে কেন? তার নিজের তো কোন লাভ নেই।

বালিশটা চোখের জলে কিছুটা ভেজাবার পর বিছানায় উঠে বসল বীণা। মনে পড়ল—আজ বিকেলেই মেট্রো সিনেমার নিচে শিবনাথের সঙ্গে তার দেখা হবার কথা আছে। শিবনাথ সেখানে অপেক্ষা করবে। ঠিক পাঁচটার সময় সেখানে পৌছনোর জন্য বীণাকে দুদিন আগে নির্দেশ দিয়েছিল শিবনাথ।

বিকেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল বীণা। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধঘণ্টা আগে মেট্রো সিনেমার কাছে পৌছল। অন্যদিন এইরকম মিলনের সময় ঠিক করা থাকলে বীণা ইচ্ছে করেই দেরী করে। শিবনাথ তার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে দেখতে তার ভাল লাগে। কিন্তু আজ সে নিজেই আগে পৌছে গেল। অস্থির চিত্তে মেট্রো সিনেমার সামনের ফুটপাথে পায়চারী করল কিছুক্ষণ। যখন বুঝল লোকে অবাক হয়ে তার দিকে লক্ষ্য করছে তখন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াল।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছুক্ষণ আগে এল শিবনাথ।

বলল, "কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ", বীণা উত্তর দিল।

"স্কুলে যাও নি?"

"না।"

"আজকাল শিক্ষিকারাও ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে দেখছি। আগে বল নি কেন? তাহলে আমিও অফিস থেকে ছুটি নিতাম।"

"তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে।"

"কথা পরে হবে। চল আগে সিনেমাটা দেখে নি।"

"না।"

"এত গম্ভীর হয়ে কথা বলছ কেন? সিনেমায় যাবে না কেন?"

"মুড নেই। চল কার্জন পার্কে গিয়ে বসি তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে।"

অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও বীণা যখন কিছুতেই সিনেমা যেতে রাজী হল না তখন শিবনাথ বাধ্য হয়েই বীণার সঙ্গে কার্জন পার্কের দিকে এগিয়ে গেল। একটা অজানা

আশঙ্কায় তার বুক কাঁপছিল তবু যতটা সম্ভব সে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল।

কার্জন পার্কে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসল দুজনে। সন্ধ্যা নেমেছে। চারদিকে আবছা অন্ধকার। দূর আকাশে একফালি বাঁকা চাঁদ ওদের দুজনকে দেখার জন্যই যেন সবেমাত্র আকাশে উঠেছে। চাঁদের পাশে ছোট একটা তারা মিট মিট করে হাসছে।

কি বলবে সে সম্পর্কে অনেক কথা ভেবে এসেছিল বীণা। কিন্তু কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। তারপর অনেক কষ্টে শুধু বলল, "তুমি নাকি বিবাহিত? সত্যি?"

"তার মানে!"—বলল শিবনাথ।

"আমাকে ঠকাবার কি দরকার ছিল! ঘরে তোমার বৌ আছে, ছেলে আছে তবু কেন আমার জীবন নিয়ে এতকাল ছিনিমিনি খেলেছ। আমি তোমার কি ক্ষতি করেছিলাম।"

আর কিছু বলতে পারল না বীণা। কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে এল। চোখে জল ভরে এল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল শিবনাথ। কি যেন ভাবল। তারপর বলল, "কোথা থেকে কতকগুলো মিথ্যা কথা শুনে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ বীণা। তুমি কি জান না আমি তোমায় কত ভালবাসি। কোথা থেকে এসব অদ্ভুত কথা শুনেছ?"

বীণা নরেনের কথা বলল। নরেন যে তার পরিচিত সে কথা অস্বীকার করল না শিবনাথ। বলল, "কি মতলবে সে তোমার মন ভাঙ্গাতে এসেছিল জানি না কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না তুমি সেকথা কি করে বিশ্বাস করলে!"

"লোকটা মিথ্যা কথাই বা বলবে কেন?"

"তা সেই জানে। ও: ভগবান, তুমি একজন অচেনা লোকের কথায় বিশ্বাস কর অথচ আমার কথায় বিশ্বাস করছ না। তার থেকে বল না তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও না। ছুতো খোঁজার কি দরকার? সব বুঝেছি। আমি নিজেই তোমার পথ থেকে সরে দাঁড়াব।"

"আমি কি তাই বলেছি? প্রথমে তো আমারও বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু লোকটা যে বার বার—"

"থাক। লোকে যে বলে মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই, ঠিকই বলে। বিয়ের পনের দিন আগে তুমি আমার স্ত্রী আবিষ্কার করে আমাকে সরাতে চাও তো সরে যাব। তোমার মত সুন্দরীর আমার চেয়ে অনেক ভাল বর জুটবে তা জানি। আমি সামান্য কেরাণী হয়ত কোন বড় অফিসার তোমায় বিয়ে করতে চাইছে—তাই না বীণা?"

"এসব কি বলছ?"

"মেয়েরা মুখে যাই বলুক আসলে বড়লোকের ঘরণী হতে সবাই চায়। ভালবাসা তাদের কাছে ছেলেখেলা। কিন্তু তুমি যে তাদের দলে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।"

"আমার দোষ কি—নরেনবাবু যে বললেন তোমার বৌ আছে।"

"বেশ তো—বৌ যদি থাকেই তবে সে তো ঘরেই আছে। চল দেখবে চল। ওঠ।"

"এত রাগ করছ কেন?"

"দেখ, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের নামই ভালবাসা। এতদিনে বুঝলাম তুমি আমায় কোনদিন ভালবাসতে না। নইলে পরের কথা শুনে—যাক—আমি এর শেষ করতে চাই। আগামী রবিবার তোমাকে আমার বাড়ী যেতেই হবে। বৌ আছে কিনা স্বচক্ষে দেখে আসবে। আমি তোমায় নিয়ে যাব।"

"বেশ যাব।"

আরও অনেক কথা হল দুজনায়। ক্রমশ বীণার মন ভিজে এল। সে শিবনাথকে অবিশ্বাস করেছিল বলে অনুশোচনা করল, হালকা পায়ে মনের আনন্দে বাড়ী ফিরল।

এদিকে ভাবনায় আকুল হল শিবনাথের মন। বাড়ী ফেরার পথে নিজের স্ত্রীর কুৎসিত মুখ মনে পড়ল। এককালে টাকার লোভেই সে বিপাশাকে বিয়ে করেছিল। বিপাশা বড়লোকের মেয়ে। দেখতে বিশ্রী। বিয়ের পর শিবনাথ কোনদিনই বিপাশাকে ভালবাসতে পারে নি। বীণার সঙ্গে মিশেই সে প্রথম আনন্দের আস্বাদ পেয়েছিল। বীণার রূপ যৌবন তাকে মুগ্ধ করেছিল। বীণাকে সে চিরকালের মতই পেতে চায় কিন্তু বন্ধু

নরেন যে এমন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে কে জানত। বিয়ের আর পনের দিন বাকী। শিবনাথ ভাবল—এর মধ্যে যা হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বীণা যদি বুঝতে পারে যে সে সত্যি বিবাহিত তবে হয়ত পিছিয়ে যাবে। বীণা রবিবার দিন বাড়ীতে এলে কিভাবে তাকে সামলাবে তাই চিন্তা করতে লাগল শিবনাথ।

বাড়ীতে ফিরে অন্যদিন খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে শিবনাথ। স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। আজ সে নিজেই বিপাশাকে ডাকল।

বিপাশা রান্নাঘরে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। কিছুক্ষণ পর এল।

বলল, "কি ?"

"খোকা ঘুমিয়েছে ?"—শিবনাথ জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ।"

"এমন ময়লা কাপড় পরে আছ কেন ?"

"কাজ করছিলাম। তাছাড়া ফরসা কাপড় পরেই বা কি লাভ। আমার মত রূপহীনা মেয়ের দিকে তো কেউ নজর দেয় না।"

"আর কেউ না দিক তার স্বামী দেয় তবে সেকথা সে মুখে প্রকাশ করে না।"

"সত্যি ?"

"আমার এটাই বড় দুঃখ রইল বিপাশা তুমি আমায় কোনদিনই বুঝলে না।"

"আজ তোমার কি হয়েছে বল তো।"

"শোন বিপাশা, কেন জানি না আজ বড় ইচ্ছে তোমার কথা মত চলে, তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করে, বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব। তোমার সব কথা শুনব।"

"হঠাৎ এত দয়া যে! আমার কোন কথাই তো কানে তোল না।"

"না বিপাশা, এবার থেকে সব শুনব। এই যে ক'দিন ধরে তুমি বাপের বাড়ী যাবে বলছ অথচ আমি গ্রাহ্যই করি না—ভেবে দেখলাম কাজটা ঠিক হয় নি।"

"তোমাকে তো বলেছি বাবার শরীর খারাপ। এসময়ে একবার সেখানে যাওয়া উচিত। আমি তাঁর বড় মেয়ে।"

"কালকেই তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী রেখে আসব।"

"সত্যি ?"

"আমার মনে কেন জানি না, অনুশোচনা জেগেছে! কেবল মনে হচ্ছে তোমাকে এতকাল উপেক্ষা করে অন্যায় করেছি। তোমার বাবার শরীর খারাপ জেনেও যদি তোমাকে না পাঠাই তবে অপরাধী হয়ে থাকব।"

এত সহজে কাজ হবে ভাবেনি শিবনাথ। বিপাশার উপবাসী মন বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বামীর অনুরাগের স্পর্শ পেয়ে সহজেই নরম হয়ে এল। পরদিন স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী রওনা হল শিবনাথ। মেয়েকে অনেকদিন পর কাছে পেয়ে বিপাশার বাবা খুবই আনন্দিত হলেন।

একদিন সেখানে থেকে অফিসের জরুরী কাজের অজুহাতে কলকাতায় ফিরে এল শিবনাথ। এবার সে নিশ্চিন্ত হল। ভাবল, বীণা তার বাড়ীতে এলেও তার স্ত্রীপুত্রের সন্ধান পাবে না। সে তার পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করে তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলবে।

পরদিন অফিসে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল শিবনাথ। এমন সময় কোথা থেকে নরেন এসে হাজির। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সে বলল, "কেমন আছিস ?"

"আমাকে এখুনি বেরুতে হবে, গল্প করার মত সময় নেই।" গম্ভীর হয়ে বলল শিবনাথ।

"চলে যেতে বলছিস ?"

"তুই বন্ধু হয়ে আমার শত্রুতা করবি আর আমি তোকে আদর করে ঘরে বসাব—তাই চাস নাকি ?"

"শত্রুতা ? ও হ্যাঁ, বীণাদেবীর কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছি তাই ক্ষেপে গেছিস তো ? সে আমি তোর ভালর জন্যই করেছি নইলে পরে বিপদে পড়তে হবে।"

"আমার জন্য তোকে ভাবতে কে বলেছে ?"

"তোর জন্য ভাবি নি। তুই যে একটা রাস্কেল তা অনেকদিন আগেই জানি। ভেবেছি বৌদির জন্য। সে বেচারী ভাল মানুষ। সে তো কোন দোষ করে নি। বৌদি কোথায় ?"

"পরের ঘরের খবরে তোর কি দরকার ? ভবিষ্যতে যদি এ বাড়ীতে না আসিস তো খুশী হব।"

"তা জানি। বৌদি কষ্ট পাবে ভেবে এতদিন তাকে কিছু জানাই নি। এবার তোর সব কীর্তি খুলে বলব।"

"বয়েই গেল। বাজে না বকে ঘর থেকে বেরিয়ে যা নইলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

"বটে এতবড় কথা। আচ্ছা দেখা যাবে" বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল নরেন।

নরেন চলে যেতেই শিবনাথের কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল। স্ত্রীকে মনে পড়ল। বিপাশা দেখতে কুশ্রী কিন্তু তার স্বামীর প্রতি যত্নের কোনদিন অভাব দেখা যায় নি। কিন্তু শুধু সেবা পেলেই তো কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে না। বিপাশাকে কোনদিনই ভাল লাগে নি শিবনাথের। বিপাশার সঙ্গে বীণার তুলনা করল শিবনাথ। বীণার মুখ মনে পড়তেই স্ত্রীর বিষয়ে সব চিন্তা ভেসে গেল। বীণার জন্য সে যেন একটা অন্ধ আবেগের তাড়নায় ছুটে চলেছে। তার মনে হল বীণাকে বাদ দিয়ে এ জীবনের কোন অর্থ হয় না। বীণার দেহ মন সব কিছুর উপর তার চাই পূর্ণ অধিকার। আর সেই অধিকার পাওয়ার সহজ উপায় তাকে বিয়ে করা।

রবিবার দিন সত্যি বীণাকে বাড়ীতে নিয়ে এল শিবনাথ। বীণার মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল তাও দূর হয়ে গেল। সে দেখল বাড়ীতে শিবনাথ সত্যি একাই থাকে। স্ত্রী পুত্রের যে সব চিহ্ন বীণার চোখে পড়তে পারে তা আগেই লুকিয়ে রেখেছিল শিবনাথ। সে বাড়ীতে বেশিক্ষণ থাকল না। বীণাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল। দুজনে নানা জায়গায় মনের আনন্দে ঘুরল। আগামী সোমবার বিয়ে। ভাবী স্বামীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ফিরে পেয়ে বীণার মন যেন মুক্ত আকাশে ডানা মেলে উড়ে চলল।

সেদিন শনিবার।

স্কুল থেকে ফিরে বীণা বাড়ীতে এসে গুন গুন করে গান করছিল। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেল। দরজা খুলে দেখল সামনে নরেন দাঁড়িয়ে আছে। বীণার ইচ্ছা হল নরেনের মুখের সামনে দরজাটা ধপাস করে বন্ধ করে দেয়। তবু নিজেকে সংযত করে বলল, "কি চান?"

"আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে—বিশেষ জরুরী।" বলল নরেন।

"আপনার কোন কথা আর শুনতে চাই না। চলে যান।"—কর্কশ স্বরেই বলল বীণা। সে দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। সচকিত হল মহিলার কণ্ঠস্বরে। কে যেন বলল—"ও চলে গেলেও আমি তো ফিরে যেতে পারব না বোন। আপনার সঙ্গে আমার যে কথা না বললেই নয়।"

নরেনের অল্পদূরে একজন মহিলা যে তার ছোট্ট ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে তা এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি বীণা। দরজাটা সম্পূর্ণ খুলতেই চোখে পড়ল। মহিলাটি আবার বলল, "রাস্তা থেকে তাড়িয়ে দেবেন এত নিষ্ঠুর আপনি নিশ্চয় নয়।"

"আপনি কে? কি চান?" বলল বীণা।

"আপনি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন আমি তার স্ত্রী আর এটি আমার ছেলে।" বলল বিপাশা।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বীণা।

এরপর বিপাশার মুখে সব কথা শুনল। সব শেষে বিপাশা বলল, "স্বামীর নিন্দে করতে নেই তবু ওকে জানি বলেই বলছি ও টাকার লোভে একদিন আমায় বিয়ে করেছিল, আজ রূপযৌবনের লোভে আপনাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়েছে কিন্তু জেনে রাখুন ও আপনাকে ভালবাসে না।"

বীণা কি বলবে ভেবে পেল না। তার মনে হল তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখল শিবনাথের মুখের আদলের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

বিপাশা জানাল যে নরেন ঠাকুরপো তাকে বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছে। সে অনুমানে বুঝতে পেরেছিল যে তার বৌদিকে বিয়ের আগে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে শিবনাথ।

সব শেষে বিপাশা বলল, "এর পরেও কি ওকে বিয়ে করতে চান?"

"না না, কখনই না", চীৎকার করে উঠল বীণা। তারপর আবার বলল, "সব জেনেও আমি একজন ঠগ

প্রবঞ্চককে বিয়ে করব? আপনি কি আমায় পাগল ভেবেছেন?"

বিপাশা চলে যাবার পর একলা ঘরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বীণা।

বাড়ী ফিরে স্বামীকে কোন কথা জানাল না বিপাশা। সোমবার দিন সকালে শিবনাথ যখন সেজেগুজে বেরুল তখনও একটা কথা বলল না বিপাশা। সে বুঝতে পারল বীণার সঙ্গে মিলিত হয়ে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসে যাবার উদ্দেশ্যেই শিবনাথ বেরুল। মনে মনে হাসল বিপাশা। লোকটা হয়ত ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে তাকে যা তা বলবে। বীণা কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হবে না। সে তার প্রিয়জনের চরিত্র ও স্বরূপ জানতে পেরেছে। সে শিক্ষিতা মেয়ে—বিচার না করে কাউকে গ্রহণ করবে না। এতদিনের ভুলের অনুশোচনায় সে হয়ত ভেঙ্গে পড়েছে। লোকটাকে দেখে ঘৃণায় জ্বলে উঠবে।

সে রাত্রে কিন্তু শিবনাথ ফিরল না। চিন্তিত হল বিপাশা। লোকটা লজ্জায় আত্মঘাতী হল না তো? সারারাত দুর্ভাবনায় ঘুম এল না বিপাশার চোখে। পরদিন সকালবেলায় সে বীণার বাড়ীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু তাকে যেতে হল না। বীণার লেখা চিঠি নিয়ে একজন অপরিচিত লোক তার কাছে এল। কাঁপা হাতে চিঠিটা খুলল বিপাশা। পড়ল:—

"বুকের পাঁজরগুলো যদি বিষাক্ত হয়, যদি তাতে খুঁত থাকে তবু সেগুলো ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া যায় না। যে ভালবাসে, প্রিয়জনকে পেয়েই তার সাধ মেটে। প্রিয়জনের স্বভাব-চরিত্র সে বিচার করে না।

অনেক ভেবে দেখেছি শিবনাথকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। আমরা দূরদেশে চলে যাচ্ছি। যদি পারেন আমাদের ক্ষমা করবেন।"—বীণা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে রইল বিপাশা।

স্মৃতি

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

কেন দোলা দাও বুঝিতে না পারি,
কেন মোরে দোলা দাও?
অতীতের কথা কেন তুলে ধরো? কেন সেথা তুলে নাও?
ছিলাম বসিয়া, পুলকিত হিয়া—ভুলেছিনু ব্যথা গ্লানি—
কেন তুমি মোরে, নিয়ে এলে ধরে, ঝরাফুল বনে টানি?
কেন দিলে গেঁথে আজি নিরালাতে, ঝরাকুসুমের মালা?
এ মালা আমার জ্বালার উপরে আরো বাড়ায়েছে জ্বালা।

ধূ ধূ মরুহিয়া মরে গুমরিয়া অন্তর ভরা ব্যথা—
বুকের মাঝারে আজো সঞ্চিত পুরানো দিনের কথা।
কত আশা ছিলো, কত ভাষা ছিলো, কত কল্পনা রাশি—
কেন তুমি মোরে আনি এত দূরে হাসিছো কুটিল হাসি।

কেন গো ভুবনে জাগালে নয়নে অশ্রু মুকুতা মম?
বেশতো ছিলাম, সবকিছু ভুলে নিথর রাত্রি সম।
মরমের কোণে স্তম্ভিত ছিলো দুরন্ত ঝড়ো হাওয়া—
হৃদয়ের মাঝে ঢেউ ছিলো স্থির বুক ছিলো দুখে ছাওয়া।
তাহাদেরে তুমি জাগাইলে এসে ঝড় উঠাইলে মনে,—
হৃদয় সাগরে লবণের ঢেউ জাগাইলে তারই সনে।
সব কিছু ভুলে ছোট পাল তুলে আমার জীবন তরি—
চলেছিনু বেয়ে শুধু গান গেয়ে আপনার পথ ধরি'।

তারে তুমি এসে দোলা দিলে হেসে
বাধা দিলে পথে মোরে
সমুখে আমার ভীড় করে আসে তীব্র আঁধার ঘোর।

শেষ কোথায় ?

মহাশয়,

গত মাসে (আষাঢ়, ১৩৭৪) ভারতবর্ষ পত্রিকা পাঠকালে জানিতে পারিলাম যে, আপনি ভারতবর্ষ পত্রিকায় "পত্রলেখা বিভাগ" নামক একটি নূতন বিভাগ সংযোজনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই শুভ পরিকল্পনার জন্য আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। "পত্রলেখা" নামটি সুন্দর, শ্রুতিমধুর এবং প্রাচীন সাহিত্যের স্মৃতি-বিজড়িত। "ভারতবর্ষ" পত্রিকা আমাদের অতি সুপরিচিত এবং একান্ত আপনার জিনিস। প্রতি মাসেই আমরা অর্থাৎ আমাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পত্রিকাখানির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকি এবং পত্রিকাটি আসিলেই উহা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত আদ্যন্ত পড়িয়া ফেলি। আমার পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি তাঁহার স্কুলজীবন হইতেই "ভারতবর্ষ" পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অমর কবিতা মাথায় লইয়া যেদিন এই পত্রিকা প্রকাশিত হইল, সেদিনের কথা পিতৃদেব পরম শ্রদ্ধার এবং গভীর হৃদয়াবেগের সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। বিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ছিল "ভারতবর্ষ"। আমাদের গৃহের আসবাবপত্র-খেলনা-পুতুলের সহিত শৈশব হইতেই আমাদের যেমন পরিচয়, তেমনিভাবে আমরা "ভারতবর্ষ"-পত্রিকার সহিতও শৈশব হইতেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

এক্ষণে আমার মনে যে সকল জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইতেছে তাহা আমাদিগের প্রিয় পত্রিকার "পত্রলেখা" বিভাগে প্রকাশ করিবার এবং বিজ্ঞজনের মতামত জানিবার জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি।—

একদা কলিকাতা মহানগরী ছিল ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের প্রাণকেন্দ্র এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। মহামতি গোখলে বলিয়াছিলেন, "What Bengal thinks to-day, India will think to-morrow." তখনকার কলিকাতা ও বাঙ্গালা সম্বন্ধে গোখলের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, গুরুদাস, আশুতোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি যুগন্ধর মনীষীগণ আজ কোথায়? হায়, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! যাঁহাদের কীর্তিতে বাঙ্গালা গৌরবান্বিত ও ধন্য, তাঁহাদের স্মৃতিমাত্র এখন আমাদের সম্বল। আমার পিতৃদেব হিন্দুস্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার মুখে তাঁহার ছাত্রজীবনের যে সব কাহিনী শুনি তাহা এখন নিতান্তই গল্প বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৭০ সালের কার্তিক মাসে "ছাত্রের তীর্থ—কলেজ স্কোয়ার" শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের (১৯১৫—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ—এই এক দশকের) স্মৃতিচারণ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য এবং চরিত্র-গৌরব, সতীর্থগণের মেধা ও জ্ঞানানুরাগের কাহিনী আমাদের নিকট বিস্ময়কর বোধ হয়। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, অষ্টপ্রহরের মধ্যে চারপ্রহর তো বটেই, কোন কোন অধ্যয়নশীল কলেজের
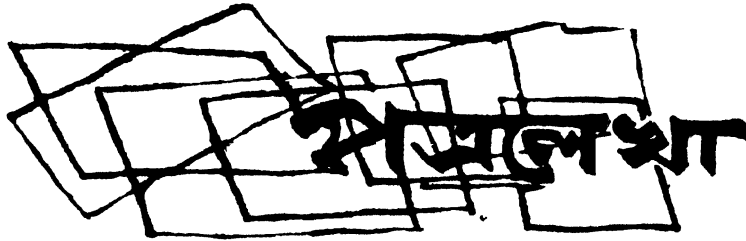
ছাত্র ছয়প্রহর পর্যন্ত পড়িতেন! কিন্তু আজকাল আমাদের বাংলাদেশে বিশেষতঃ কলিকাতার নাগরিক জীবনে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে, তাহাতে মনঃস্থির করিয়া পড়াশুনা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। জীবনের সর্বস্তরে কেমন একটা উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম ও অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়াছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পরীক্ষার হল হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরসভা, বিধানসভা এবং মহাকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই একটা বিভীষিকা, শৃঙ্খলহীনতা এবং অনিয়মের রাজত্ব চলিতেছে। কলিকাতা মহানগরীতে আর এখন শান্ত পরিবেশে স্থিরচিত্তে অধ্যয়ন-তপস্যার সুযোগ নাই। সকালে উঠিয়া সংবাদপত্র খুলিলে দেখা যায় সংবাদপত্রের তিন-চতুর্থাংশ বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলার সংবাদে পূর্ণ। হৈচৈ, ঘেরাও এবং বিক্ষোভ যেন নগর-জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ ট্রেন আটক, কাল সড়ক বন্ধ পরশু অফিস ও কারখানা ঘেরাও, অরাজকতা, হামলা প্রভৃতি চলিতেছে। আমরা সামাজিক জীব, দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া পড়িতে বসিলেও চতুর্দিকের আবহাওয়ার দ্বারা আমরা প্রভাবিত না হইয়া পারি না। এক্ষেত্রে এই মহানগরীতে নীরবজ্ঞানতপস্যা করা সম্ভব নহে। সংবিধানগত মৌলিক অধিকার তো দূরের কথা, বনের পশুপক্ষীর যেটুকু নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক স্বাধীনতা আছে, কলিকাতাবাসী শান্তিপ্রিয়, নিরপরাধ, নিরীহ নাগরিকের বোধ হয় সেটুকুও নাই! "একেই কী বলে সভ্যতা?" মহাশয়, আমি এক ক্ষুদ্রমতি স্কুলের ছাত্র, আমার বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি নিতান্তই সামান্য। আমরা শৈশবে রূপকথায় রাক্ষস-খোক্কসের গল্প পড়িয়াছি, আমার মনে হইতেছে আজকাল বাংলা দেশের সর্বত্রই যেন রাক্ষস-খোক্কসের উৎপাত চলিতেছে! আপনার মত বিজ্ঞ সুধীজনের কাছে আমার ন্যায় অল্পমতি বালকের এই প্রশ্ন যে, "দেশব্যাপী এই বিক্ষোভের মূলে কি এবং ইহার প্রতিকার ও শেষ কোথায়?" আশা করি আপনার বহুজনের নিকট সুপরিচিত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ পত্রিকার মাধ্যমে আপনি সমাজের নিকট আমার বালকমনের এই প্রশ্নটি উপস্থিত করিবেন এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত আপনার পত্রিকার মাধ্যমে সকলকে অবগত করাইবেন। ইতি—

শ্রীঅসীমজীবন বসু
ছাত্র, হিন্দু স্কুল, কলিকাতা

বিবাহের বয়স

মহাশয়,

গত "আষাঢ়" সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে "পত্রলেখা" নামে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আলোচনার একটি নতুন বিভাগ প্রবর্তন করেছেন জেনে বিশেষ আনন্দলাভ করলাম। আমরা, যারা সাহিত্যিক নই—সাধারণ পাঠক-পাঠিকামাত্র তাদের "ভারতবর্ষ"-এর মতন উচ্চ-শ্রেণীর পত্রিকায় মতামত প্রকাশের সুযোগ দান করায় জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনি বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছেন যে যে-কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা চলবে। আমার মনে বর্তমানে যে প্রশ্নটি জেগেছে সে সম্বন্ধে আপনার পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানতে ইচ্ছা করি।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছি যে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বাড়িয়ে ২০ বছর করা হচ্ছে। অর্থাৎ ২০ বছরের কম বয়সের কোনও মেয়ে বিবাহ করতে পারবে না—করলে আইনতঃ দোষী হবে। এখন আমার বক্তব্য এই যে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৩ বছর থেকে বাড়িয়ে ২০ বছর করা কি উচিত হবে? সারদা আইন অনুসারে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৩ করা হয়েছিল। তার আগে ১৩ বছরের কম বয়সের মেয়েরও বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। এইরকম মেয়েদের বিবাহের কোনওরূপ বয়স বাঁধা না থাকায় হয়ত সমাজের বা বিবাহিতদের কিছু ক্ষতিসাধন হচ্ছিল, তাই বয়সের সীমা বেঁধে দিয়ে বালিকা-বধূর সংখ্যা হয়ত কমান হয়েছিল? কিন্তু এখন আবার বিবাহের ন্যূনতম বয়স বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে এবং কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে মেয়েদের

বেশী বয়সে বিবাহ হলে সন্তান-সন্ততি কম হবার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ জন্মহার কম করবার পরিকল্পনারূপেই এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু তার অন্যদিকের প্রতিক্রিয়া কি আইন প্রণেতারা ভেবে দেখেছেন? এমনিতেই আজকাল মেয়েদের বেশী বয়সে বিয়ে হচ্ছে। কম বয়সে বিয়ে দেবার পিতামাতার ইচ্ছা থাকলেও নানা কারণে হয়ে উঠছে না। তার ওপর যদি বা কেউ ভাগ্যজোরে সতেরো আঠার বছর বয়সে মেয়ের বিবাহ দেবার সুযোগ পান তাহলে তাঁকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে আরও দুই তিন বছরের মতন। ততদিনে হয়ত নির্বাচিত পাত্র হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তাছাড়া যাঁর চার-পাঁচটি মেয়ে আছে, তাঁর অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। প্রতিটি মেয়ের বিবাহ দিতে হবে তার কুড়ি বছর বয়স হবার পর। কোনটির যদি ভাগ্যবলে কুড়ির কমেই পাত্র জুটে যায় তাও হয়ত হাতছাড়া হয়ে যাবে এই আইনের জন্যে। আর চার-পাঁচটি মেয়েকে কুড়ি বছর বয়স করিয়ে পার করতে করতে পিতা-মাতার বয়স যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে! সব কটিরইতো আর ঠিক কুড়ির পরেই বিয়ে হবে না—দেখাশোনা করতে করতে হয়ত তিরিশেই গিয়ে দাঁড়াবে! তাছাড়া বেশী বয়সে মেয়েদের বিবাহ হতে আরম্ভ করলে সমাজে দুর্নীতিও বেড়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা হতে আরম্ভও করেছে।

যাইহোক, আমার মনে যে কথাগুলি উদয় হয়েছে তাই লিখলাম অন্যান্য পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য এবং এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানবার জন্য।

বিনীতা—
শ্রীমতী শ্যামশ্রী সরকার
কলিকাতা

"মাদক সেবন কি প্রয়োজনীয়?"

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীজ্ঞান লিখিত "মাদক সেবন কি প্রয়োজনীয়?" লেখাটি পড়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। মদ্যপান যে কত ক্ষতিকর তা তো নিজের চোখেই দেখছি। আমাদের এক নিকট প্রতিবেশী মদ্যপান করে রাত্রে বাড়ী ফিরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি যে ব্যবহার করেন তাতেই বুঝতে পারছি আজ যে-সব ছাত্র-ছাত্রী "বার"-এ বসে বাহাদুরি করে মদ্যপান করছে ভবিষ্যতের সমাজে তারা কিরকম অশান্তি সৃষ্টি করবে—কত পরিবারের সুখ-জীবন নষ্ট করে দেবে। চুরুট-সিগারেট টেনে যে-সব বন্ধু বা বান্ধবী ধুয়ো ছাড়ে আর বাহাদুরি দেখায় তাদের সঙ্গও আমার পক্ষে অসহ্য। চা-কফির ভক্ত আমরা নই বটে, কিন্তু পেলেই পান করি, ক্ষতি হোক, আর নাই বা হোক। কিন্তু আপনার পত্রিকায় ব্রাহ্মীচায়ের যে সন্ধান দিয়েছেন তাতে আমি উপকৃত হয়েছি। ব্রাহ্মী চায়ের নেশা নেই—আর তাতে কণ্ঠস্বর যে ভাল হয় তা আমি পনের দিন সেবন করেই বুঝতে পেরেছি। আপনার এই প্রবন্ধের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

নিবেদিকা—
কল্যাণী সেন
ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

অবসরের সময়

মহাশয়,

আপনার জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকায় চিঠি-পত্রের মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকা ও জনসাধারণের মতামত ব্যক্ত করার, তাঁদের অভাব অভিযোগ জনসাধারণের, তথা শাসকমহলের গোচরীভূত করার যে সুযোগ সকলকে দিচ্ছেন, তার জন্যে সর্বাগ্রে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্প্রতি কেন্দ্র-শাসিত কর্মচারীদের পঞ্চাশ বৎসর বয়স বা পঁচিশ বছর চাকুরীর (যাহা পূর্বে সম্পন্ন হবে) অন্তে অবসর করিয়ে দেবার যে ব্যবস্থা হচ্ছে তা' সমাজ, দেশ ও জাতির পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হবে তা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার সাধ্যের অতীত। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

১) এ ব্যবস্থা চালু হলে, ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা কিরকমভাবে পূজা পেতে আরম্ভ করবে তা' শুধু

কল্পনা করা যেতে পারে। যাঁদের কলমের খোঁচায় চাকুরীতে উত্থান বা পতন ঘটে, তাঁদের প্রসন্ন করার বহু দৃষ্টান্ত অনেকের জানা আছে। এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ফলে, ওই সকল ক্ষমতাশীলদের ক্ষুধা ও লোভ আগ্রাসী হয়ে উঠবে। ওঁদের ক্ষুধা মিটাতে পারবে শুধু বিবেকহীন অনুগ্রহপ্রার্থী কর্মচারীর দল। তাঁরাই শুধু টিকে থাকবে। সৎ ও নিরীহ কর্মচারীদের নানা অছিলায় বিদায় করে দেবে ক্ষমতাপন্নের দল। এঁদের একটা দল তৈরী হবে—এঁদের দলেরই শাসনে চলবে আমলাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ। এঁদের যাঁরা তুষ্ট করতে পারবেন না, তাঁরা হাজার সাধু হোন, হাজার কাজের লোক হোন তাঁদের চাকুরী থাকবে না। দুর্নীতিতে দেশটা এমনিতেই রসাতলে গেল, তার উপর আবার এই নয়া ব্যবস্থায় দুর্নীতির আর অন্ত থাকবে না।

২) কুড়ি বছর বয়সে যে চাকুরীতে ঢুকেছে, তাকে ৪৫ বছর বয়সেই অবসর নিতে হবে।—আজকাল লোক যে রকম বেশী বয়সে বিয়ে করে তাতে হয়ত তার মাত্র পাঁচ বছরের ছেলে বা মেয়ে থাকবে ঘরে। ছেলেমেয়ে মানুষ করার কোন সুযোগ পাবে না এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তি। তাঁকে জীবনের দীর্ঘকাল কি করে কাটাতে হবে তা জানা নেই। বেকারের সংখ্যা এতে বেড়ে যাবে যে বেকার ব্যক্তির পক্ষে চাকুরী পাওয়া কঠিন হবে। এ ব্যবস্থার পক্ষে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা বলছেন, এতে বেকারী তো কমে যাবে। কারণ বিতাড়িত লোকেদের স্থানে নূতন লোক নেওয়া হবে। তা কিছুটা সত্য বটে। তবে ৪৫ বছর বয়সে বেকার ব্যক্তি একটা পুরো সংসার নিয়ে যে অসুবিধায় পড়বে পঁচিশ বছরের নির্ঝঞ্ঝাট বেকারের সে সমস্যা নেই। পঁচিশ বছরের যুবক নিশ্চয়ই কর্মক্ষেত্রে একটা স্থান করে নেওয়ার পক্ষে ৪৫ বছরের ভারাক্রান্ত ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী শক্ত সমর্থ।

৩) চাকুরীচ্যুত সরকারী কর্মচারীদের মত অসহায় মানুষ আর নেই। যেই দেশের শাসকমণ্ডলীর প্রতি জনসাধারণ তুষ্ট নয়, সেই দেশের কর্মচ্যুত সরকারী কর্মচারীরা আরও বেশী অসহায়। সরকারের চাকুরী করেছে, এই অপরাধেই হয়ত তাকে অনেক প্রতিষ্ঠানের দরজা থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হবে। যাঁরা সততা অবলম্বন করে নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন, তাঁরা ঘরেও ঠাঁই পাবেন না, বাইরেও নয়।

এ সকল অবশ্যম্ভাবী কু-পরিণামের দিকে দেশবাসীর, তথা বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, সুস্থচিত্ত নায়কদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে আমার এ পত্রলেখা সার্থক হবে মনে করি।

বিনীত—

কার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

২৪ পরগণা

* এই বিভাগের মতামতের জন্য কোনও সম্পাদক দায়ী নন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা সাহিত্য

মুহম্মদ সিরাজ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সে যুগের একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যোগ্য পিতার যোগ্যতম পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫) 'তত্ত্বাবোধিনী' সভার প্রতিষ্ঠাতা। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশের পর তিনি সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে আসেন। ধর্মান্দোলনে, বিশেষ করে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি অগ্রণী ছিলেন। এছাড়া হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিবিধানে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'মহর্ষি' খ্যাতির যোগ্য অধিকারী ছিলেন তিনি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে, 'ব্রহ্মধর্ম' (১৮৫১—৫২ খৃঃ), 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (১৮৫২ খৃঃ), 'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২ খৃঃ) এবং 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬৯—৭২ খৃঃ)। ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক বক্তৃতাবলীর মধ্যে তাঁর চিন্তাধারার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। ভাব, ভাষা সম্পূর্ণ মহর্ষির নিজস্ব। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তাঁর 'আত্মজীবনী'র ভাব এবং ভাষার মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাবুক-হৃদয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ সমুজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছে। যশস্বী পুত্র-কন্যাদেরও প্রভাবিত করেছে তাঁর এই গ্রন্থ। আবেগপ্রধান গদ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই 'আত্ম-জীবনী'। ভাবুকতা যে মহর্ষির প্রকৃতিগত ধর্ম তারই স্বাক্ষর এই গ্রন্থ।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মারফৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে আসেন। 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদনা ও রচনা নির্বাচনের ভার ছিলো অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের উপর। তাঁদের সঙ্গে মহর্ষির মতের মিল হতো না। দেবেন্দ্রনাথের রচনাও তাঁরা অনেক সময় নির্বাচন করতেন না। ফলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখেছেন—"কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগের এপথ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।" ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমালয় যাত্রা করেন। তাঁর ভাবুক মন হিমালয়ের নিবিড় নিভৃত স্থানে অধ্যাত্ম শান্তি লাভের আশায় উন্মুখ হয়ে ওঠে। 'আত্মজীবনী'তে সিমলা পাহাড়ের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। ইতিমধ্যে সমগ্র ভারতে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলে ওঠে। তখন তিনি সিমলা পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে অধ্যাত্ম শান্তির সন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ফিরে আসেন।

মহর্ষির জীবনের মহৎ কীর্তি 'তত্ত্ববোধিনী' সভা ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় যাঁরা লিখতেন তাঁরা সকলেই কীর্তিমান্ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জ্ঞান-তাপস অক্ষয়কুমার দত্ত এবং সুসাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের দান অপরিসীম। বাংলা সাহিত্যে ভাববিহ্বল এবং আবেগধর্মী গদ্যরচনার সৃষ্টি করেন দেবেন্দ্রনাথই প্রথম। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ পরিপুষ্ট কবি-প্রতিভা মহর্ষির ভাবুক হৃদয়জাত রচনার দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছে। রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথের ভাববিহ্বল রচনার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মহর্ষির রচনা সম্পর্কে তাঁর একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—"দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, উহা তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুকে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভ্রমণ-সাহিত্যের দিক উন্মোচন করেন। অধ্যাত্ম শান্তির আশায় তিনি হিমালয় পরিভ্রমণ করেন। সিমলা পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো। প্রকৃতির ভাব-গম্ভীর রূপের মনোজ্ঞ বর্ণনা দেন তিনি তাঁর 'আত্মজীবনী'র ভ্রমণবিষয়ক পরিচ্ছেদগুলিতে। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গদ্য রচনার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিলো। সে সময় বাংলা গদ্যের কোনো আদর্শ রূপ দেবেন্দ্রনাথের সম্মুখে ছিলো না। কিন্তু তিনি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি কুশলতার বলে বাংলা গদ্যের একটা স্বাভাবিক রূপ দাঁড় করিয়ে দেন।

পরিণতি

সুষমা মৈত্র

সত্যি বেঁচে যারা অপমানিত হয়, তাদের কে রক্ষা করবে! আমার জীবনে একথা যেমন সত্যি আর কারো জীবনে বোধহয় ততটা নয়। যতই কথাটা মলিনার মনে হচ্ছে অন্তরাত্মা গুমরে কেঁদে উঠছে অব্যক্ত-বেদনায়।

"না, না তুমি এখন যাও। তুমি এখন ভারী বেমানান।" মাত্র ঢুকছিল মলিনা জগদীশের ঘরে। আরও দু'জন লোক দেখে সে বেরিয়ে আসছিল কিন্তু এর মধ্যেই দুম্ করে জগদীশের এক কথায় ঝড়ের মতন বেরিয়ে এল মলিনা। কিন্তু বেরিয়ে এসেই নিজের অবিমৃশ্যকারিতার জন্যে নিজেই মর্মাহত হল। সে তো না গেলেই পারত। কেন সে যেতে গেল। জগদীশের টিফিন খাওয়ার সময় হয়েছিল তাই বলে সে টিফিনটা নিয়ে পরে যেতে পারত। লোক দুটি দেখে ফিরে এলেই সব চুকে যেত। না, চলে যাই, ওরা রয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ল আর একদিনের কথা। জগদীশের ঘরে বসে মলিনা। জগদীশের দু'জন বন্ধু ঘরে ঢুকল আর মলিনা তখনই যাই বলে চলে আসায় ওর কাছে পরে তিরস্কৃত হয়েছে এবং জগদীশের বন্ধুরা এটাকে অন্যভাবে নিয়েছে বলে জানিয়েছে। তাই আজ আবার সে-ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়—দু'মিনিট দাঁড়িয়ে তারপর চলে আসবে ভাবতে না ভাবতেই এ রূঢ় কথা!—"না, না, না তুমি এখন বেমানান। তুমি এখন চলে যাও।"

'সত্যি একেবারে চলে যেতে পারে না কি', সেই পুরাণো ইচ্ছেটা ওর মনে জেগে উঠে। অনেকদিন আগে ওর মনে এই কথাটা প্রায়ই উঁকি মেরে যেত। বিশেষত: মা মরে যাওয়ার পর প্রায়ই কথাটা মলিনার মনে হত—তারপর বাবাও চলে গেলেন। জীবনের আকর্ষণ সব কিছু হারিয়ে মলিনার কেবলই মনে হয় এ পৃথিবীতে তার কি প্রয়োজন! এখানে তার কেউ নেই, সকলেই যেন বলছে তুমি এখান থেকে যাও—এখানে তুমি ভারী বেমানান। তাই মলিনার এক এক সময় প্রবল ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা করতে। এখানে যেন বাঁচবার কোন অধিকার নেই ওর। অনধিকারভাবে কতোদিন সে আর মানুষের অনুকম্পা নিয়ে বাঁচবে। বন্ধুকে কথাটা বলছিল মলিনা। শুনে নলিনী বলেছিল বোকা মেয়ে কোথাকার, মরতে যখন একদিন হবেই তখন······কিন্তু—আমি যে বেঁচে থাকার কোন মানে খুঁজে পাই না নলিনী। আমার কোন্ ইচ্ছেটা এখানে পূরণ হয়েছে বলতে পারিস—এখানে আমার কে আছে!

"ওরে অত অধৈর্য হলে কী চলে! তোর চেয়ে কত ব্যর্থজীবন এ পৃথিবীতে রয়েছে চোখ তুলে চেয়ে দেখ না। না, শুধু নিজেকে নিয়ে মশগুল আছিস।"

কিন্তু······কিন্তু বলে আর কিছু বলতে পারেনি সেদিন। অবরুদ্ধ কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল মলিনার। আজ আবার সেই পুরাণো ইচ্ছেটা তার মনে প্রবলভাবে জেগে উঠল। জগদীশ ঠিকই বলেছে। এখানে সে বেমানান। এ সংসারে বাস্তবিক তার কোন প্রয়োজন নেই। নাহলে ছোটবেলায় মা হারাবে কেন। আবার বাবাকে নিয়ে কোনরকমে দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এসে যখন কলকাতার কাছে এই নোংরা কলোনীতে মাথা গুঁজে কায়ক্লেশে দিনযাপন করছিল তখন তিনিই বা অকস্মাৎ ছেড়ে চলে যাবেন কেন, তার কোন ব্যবস্থা না করে! যুক্তির ওপরে হাত বোলাবার চেষ্টা করে মলিনা। অকাট্য বলেই মনে হয়, সত্যি এখানে সে বেমানান। কোন অধিকার তার নেই আর এ সংসারে বেঁচে থাকবার। এখানে সে বেমানান বেমানান—বেমানান! একই কথার প্রতিধ্বনি শোনে মলিনা।

ক্ষিদে পাওয়ার, জগদীশ যখন টিফিন আনানো হয়েছে কিনা জানতে মলিনাকে ডাকল—ওর এক বন্ধু তখনও সেই ঘরে বসে। মলিনাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ওর বন্ধু "জগদীশটার এ ভারী অন্যায় আপনাকে যেন অর্ধচন্দ্র দিয়ে বের করে দিল!!"

মলিনার নারীত্বে ঘা লাগল। নারীজীবনে এর চেয়ে অপমানের আর কিছু বুঝি থাকতে পারে না—

একটি অপরিচিত পুরুষের সামনে আর একটি পুরুষ তাকে ঘর থেকে বের করে দিল—আবার সেই ঘটনার পুনরুল্লেখ করে যখন সেটাকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয় তখন মলিনা মরমে মরে যাচ্ছিল—তবু বলল, 'কী করব বলুন, তবুতো আপনার বন্ধুর ঘরে আসতে পাই এটাই পরম সৌভাগ্য'···বলতে গিয়ে গলাটা ওর ধরে আসছে বুঝতে পেরে মলিনা চুপ হয়ে গেল।

জগদীশ কী মনে করে বলল, 'ওর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে কী এটা বলা যায় না?'

ওরা দুই বন্ধুতে মিলে কী সব বলছিল। কোন কথা কানে গেল না মলিনার। কেবলই মনে হতে লাগল মলিনার—অনধিকারে এই পৃথিবীতে সে বাস করতে চাইলে এমনি অজস্র অনাদর ও অবহেলা যেন তারই প্রাপ্য। অনেকদিন আগেই সে জানত—এ পৃথিবীতে সে বেমানান। এখানে সবাই তার অপরিচিত। কেউ তাকে চায় না। অবাঞ্ছিত সে। নাহলে মা চলে যাবে কেন ছোট বেলায়। বাবাও কিছু না বলে না কয়ে চলে গেলেন কেন এইতো সেদিন! সে অবাঞ্ছিত বলেই তো সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেল। প্রত্যেকের মা, বাবাই তো মৃত্যুকালে ছেলে-মেয়েদের কিছু বলে যান—বিশেষতঃ মলিনার মত জীবনে অপ্রতিষ্ঠিত একটি নির্বোধ মেয়েকে তাঁরা কিছু বলে যেতে পারতেন। তবে কী তাঁরাও বুঝেছিলেন, 'আমি অবাঞ্ছিত'—কথাটা ভেবেই চমকে ওঠলো মলিনা! না, না, না আর সে পৃথিবীতে অনধিকারে থাকবে না। অন্ততঃ থাকা উচিত নয়। মলিনা আবার ভাবলে, আমি বাঁচতে চাইনি। আমিতো আত্মহত্যা করতেই চেয়েছিলাম। বাবা মরে যাওয়ার পর প্রবলভাবে সে ইচ্ছেটাই তো মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু জগদীশ মাঝখান থেকে এসে কেমন করে তা ভুলিয়ে দিয়েছিল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল জগদীশ। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করে এই চাকরিটা জোগাড় করেছে মলিনা। গল্প কপি করা। হাতের লেখা ভাল বলে চাকরিটা সহজেই পেয়ে গেল সে। সে আজ তিন চার বছর আগের কথা। জগদীশের শালীনতাপূর্ণ ব্যবহার কখনও মলিনার অনুভূতিকে আঘাত দেয়নি। যখন তখন সে জগদীশের ঘরে যায়—তা যতবড় হোমড়া-চোমড়া সাহিত্যিকই হোক্ বা অন্য যে কেউ হোক্। সেখানে মলিনার অবাধগতি। আর যাই হোক্ জীবনে বাঁচবার একটা মানে খুঁজে পেয়েছিল মলিনা। পৃথিবীর নোনাস্বাদ কাটিয়ে অন্তস্বাদ অন্তরঙ্গে জীবনটা যেন রাঙিয়ে দিতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু না, ভুল, ভুল, সবই ভুল। ক্ষণিকের ভুলে সে আত্মহারা হয়েছিল। এ পৃথিবীতে আদৌ তার বাঁচবার অধিকার নেই। এখানে সে বেমানান। এখানে সে অবাঞ্ছিত। এখানে তাই বিনা কারণেও শুনতে হবে তাকে, না, না, না তুমি যাও—তুমি এখানে বেমানান। যত কথা ক'টি মনে পড়ে, মলিনা অস্থির হয়ে উঠে তত। কোথায় সে তার মুখ লুকাবে। এ মুখ আর সে কাউকে দেখাবে না। এখানে সে বেমানান! বেমানান! বেমানান!

হঠাৎ নিজের বসবার জায়গায় ফিরে টেবিলের ড্রয়ার খুলে একসিট কাগজ বের করল মলিনা। কলমটা খোলাই ছিল। সেটাকে তুলে নিয়ে লিখল—অনিবার্য-কারণবশতঃ আমি চাকরিতে ইস্তাফা দিলাম আজ থেকে। তারপর টেবিলের ওপর পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল সন্তর্পণে কাউকে কিছু না বলে।

* * * *

এই ঘটনার মাস চার পাঁচ পরের কথা। একদিন কাগজে একটি রোমহর্ষক দুর্ঘটনার কবল থেকে রেল-গাড়ীর ড্রাইভারের তৎপরতা ও সতর্কতায় একটুকুর জন্য একটি মেয়ের জীবন কীভাবে রক্ষা পায় কৌতূহলী হয়ে পড়ল জগদীশ। মেয়েটা নাকি ভদ্রঘরের। কিন্তু তার কথাবার্তায় পাগল বলেই মনে হয়—তাকে রেল-পুলিশ হাজতে পাঠাচ্ছিল কিন্তু তার মুখে শুধু একই কথা—থেকে থেকে চীৎকার করে বলছে, আমি এখানে বেমানান, সত্যি আমি এখানে বেমানান। আমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। বিশ্বাস করো জগু: আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না—আমি আর তোমার ঘরেও ঢুকব না। এই তো আমি চলে যাচ্ছি। পুলিশ তাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে। এই—এই তার চেহারা,—কোন আত্মীয়স্বজন থাকলে যেন তাকে নিয়ে যায়। খবরটা পড়ে জগদীশ একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর আবার কাজে মন দিতে চাইল কিন্তু মন দিতে পারলে না জগদীশ।

বাইশে শ্রাবণ

ডঃ শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি, এইচ, ডি,

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কয়েকটি দিন, বিশেষ স্মরণীয়; তার মধ্যে ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ অন্যতম। ভারতবর্ষে মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, এ শ্রদ্ধার নিদর্শন অন্যত্র আছে কিনা জানিনা। পরলোকগতের জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ভারতের সংস্কৃতির পরিপোষক। বিশ্বভারতীর তিন দিন ব্যাপী সমাবর্তন উৎসবের তৃতীয় দিন নির্ধারিত আছে পরলোকগত আশ্রমবাসীদের স্মরণের জন্য। সেদিন আশ্রমের একটি বিশিষ্ট দিন, ঐ দিনটি বিশেষ সংযমের সঙ্গে অতিবাহিত করেন প্রত্যেক আশ্রমবাসী। ঐ দিন সকলের আহার হচ্ছে নিরামিষ। রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ম প্রবর্তন করে গেছেন এবং আজও তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। পূর্বগামীদের সঙ্গে আমরা যে এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত তা ভারতবাসী কোনদিন ভুল করেনি। এই সহজ ধর্মের বলেই প্রতি বৎসর ২২শে শ্রাবণ উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পবিত্র মহাপ্রয়াণকে স্মরণ করে।

২২শে শ্রাবণের মহিমা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। এই দিনটি নানা স্থানে নানাভাবে প্রতিপালিত হয়ে আসছে, কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেননা যে কি ভাবে ধীরে ধীরে রবীন্দ্র-জীবন প্রদীপ এই দিনে নির্বাণলাভ করে। এই প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়াস করা হয়েছে।

মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্র নাথ কালিম্পঙে যান অসুস্থ শরীর নিয়ে। সেখানে প্রতিমা দেবী পূর্বেই এসেছিলেন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। এখানে কবিকে নিয়ে আসেন তাঁর পার্শ্বানুচর সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়। এখানে আসার পর কবিগুরুর কিছুটা স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। কবিতা লেখা তখনও অব্যাহত। কালিম্পঙকে উদ্দেশ করে তখন যে কবিতাটি লিখেছিলেন তা 'জন্মদিনে'র কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

এখানে এসে মাত্র কটা দিন তিনি সুস্থ ও প্রফুল্ল ছিলেন, কিন্তু ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৪০) কবিগুরু আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার যাওয়া আসা করতে লাগলেন। কবির অসুস্থতার কথা শুনে মৈত্রেয়ী দেবী এলেন তাঁর কাছে, কবির মুখ আবার প্রফুল্ল দেখা গেল। হৃদয়ের গোলমালে শরীর অসুস্থ হয়েছে, বললেন ডাক্তার। কবিতা লেখার তখনও বিরতি নেই। বেলা সাতটার দিকে কবিতার খাতা নিয়ে বসলেন প্রতিমা দেবী। দুপুরের দিকে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন কবি। মুখ লাল বর্ণ, সংজ্ঞা অস্পষ্ট। এই সময় তিনি কাউকেই চিনতে পারছিলেন না। ডাক্তার এসে আবার দেখে গেলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। সন্ধ্যার পর কবিগুরু একটু সুস্থ বোধ করলেন—তখন কাউকে চিনতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল না। এই সময় হাসপাতালের দুজন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন যে কিডনীর অসুখ চলছে। সে রাত্রি বড় কষ্টে গেল; শুয়ে বসে তাঁর রাত্রি কাটল, ঘুম ভাল হল না। সকাল হলে কলকাতায় টেলিফোনে জানানো হল অনিলচন্দ্রকে এবং পতিসরে যথারীতি জানানো হল রথীন্দ্রনাথকে। দুপুর থেকে জ্বর বেড়েই চলল, সন্ধ্যার দিকে রুগী এলিয়ে পড়লেন। রাত্রি আটটার দিকে দার্জিলিং থেকে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন য়ুরোমিয়া রোগের বিষক্রিয়ায় রুগী অচেতন হয়ে আছেন। ডাক্তার অপারেশন করতে চাইলে প্রতিমা দেবী তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন, যে পর্যন্ত কলকাতা থেকে সকলে না আসছেন। অগত্যা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ চলল। ক্যান্থারিস ৩০ শক্তি দু ঘণ্টা পর পর খাওয়ান হতে লাগল। সে রাত্রি বড় দুর্যোগ পূর্ণ, নানা আশঙ্কায় সকলের মন আচ্ছন্ন। ভোরের দিকে রুগীর অবস্থা একটু ভাল দেখা গেল, তিনি সকলকে চিনতেও পারলেন। সকাল হলে কলকাতা থেকে এলেন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ তিনজন ডাক্তার নিয়ে। এর পর এলেন মীরা দেবী অনিল চন্দ, সুধাকান্ত রায় চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বললেন, একটু সুস্থ হলেই কবিকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে। সে দিন ছিল ২৮শে

সেপ্টেম্বর। কবি একটু সুস্থ বোধ করলেই তাঁকে পরের দিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আনা হল।

মহাত্মাজী মহাদেব দেশাইকে পাঠিয়ে দেন কবিগুরুর অসুস্থতার খবর জেনে। রবীন্দ্রনাথ কানে ভাল শুনতে পেতেন না। মহাত্মাজীর প্রেম, প্রীতি ও সহানুভূতির বার্তা জোরে জোরে তাঁকে শোনানো হলে কবির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। অতিশোকেও তাঁর চোখে জল বিশেষ দেখা যেত না, কিন্তু এবার মনে হল, কবিগুরু অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছেন। অক্টোবর-নবেম্বর দু মাস কাটল কলকাতায়। এই সময় অপারেশনের কথা উঠেছিল কিন্তু স্যার নীলরতন সরকার মহাশয়ের নির্দেশে অপারেশন বন্ধ থাকে। নবেম্বরের শেষের দিকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে কবিকে আনার অনুমতি পাওয়া গেল ডাক্তারদের কাছ থেকে। আশ্রমের খোলা বাতাস, শীতের তাজা ভাব কবির দেহ-মনকে সজাগ করে তুলবে, এই ছিল সকলের ধারণা।

এই রোগযন্ত্রণার মধ্যে কিন্তু কবির মন সক্রিয় ছিল। এই সময় 'রোগশয্যায়' এর দশটি কবিতা সৃষ্টির পর 'আরোগ্য'র কবিতাবলী, 'গল্প সল্প' এবং 'জন্মদিন' এর কবিতারচনা সুরু হয়। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসার পরও 'রোগশয্যায়' এর কবিতারচনা অব্যাহতই ছিল।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীরা কবির সেবার ভার নিলেন। দেখতে দেখতে ডিসেম্বর এল। চীন থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রী এলেন ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংক্রান্ত আলাপ আলোচনা করতে। অসুস্থতা নিয়েও কবি নিজে অতিথির অভিনন্দন পত্র লিখে দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে এল আশ্রমের সমাবর্তন তিথি ৭ই পৌষ। অসুস্থতার জন্য উৎসবে যোগদান করতে না পারায় কবিগুরু মনে বড়ই ব্যথা পেলেন। 'আরোগ্য' নামে গদ্যভাষণ পঠিত হয় এই উৎসবে, ভাষণটি লিখে নেন অমিয় চক্রবর্তী মশায় এবং সভায় পড়েন ক্ষিতিমোহনবাবু।

এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল, আর তখন বাংলাদেশের শাসনভার ছিল মুসলিম লীগের হাতে। দৈনন্দিন খবর পাবার জন্য কবিগুরু উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। সংবাদপত্রের পাতা ভরে উঠত নানা অত্যাচার কাহিনীতে—তার মধ্যে মুখ্য ছিল অসংখ্য নারীহরণ ও নারী নির্যাতন। কবি এই আঘাত সইতে না পেরে 'অবিচার' নামে এক কবিতা লিখে তাঁর মনোবেদনা জানান দেশবাসীকে। এই সব লেখার ব্যাপারে রানী চন্দ ছিলেন অগ্রণী। কবি যেতেন বলে, আর লিখে নিতেন রাণী চন্দ। 'গল্প সল্প'-এর লেখাও চলছিল এই সময়, কিন্তু পড়লে মনে হয় না যে রচয়িতা তখন ছিলেন অসুস্থ।

শীতকালটা একরকম কেটে গেল ভাল-মন্দয়। কখনও রোগ একটু বৃদ্ধি পেত, আবার কখনও কমে যেত। জ্বর কিন্তু প্রত্যেক দিনই আসত, কিন্তু জ্বরের কথা কবিকে বলা হতনা। সকলের সঙ্গেই সহাস্যে কথাবার্তা বলতেন, অনুচরদের সঙ্গে করতেন হাস্য কৌতুক, তা'তে তাঁর ঘরটি রুগীর ঘর বলে মনে হত না। এই রকম প্রাণখুলে হাসি প্রায় শেষের দিকেও ছিল অম্লান। সেবা শুশ্রূষাকারীদের মনে প্রফুল্লতা জাগিয়ে রাখবার জন্য কবিগুরু মুখে মুখে নানা হাস্যোজ্জ্বল কবিতা বলে যেতেন। তিনি 'আরোগ্য কাব্যখানি তাদের নামেই উৎসর্গ করে গেছেন।

রোগে শীর্ণ হয়ে গেলেও কবিচোখের উজ্জ্বলতা ছিল অটুট। তাঁকে তপঃক্লিষ্ট ঋষি বলে ভ্রম হত। এই সময় তাঁর চুল ছেঁটে ফেলা হয়, তাতে তাঁর প্রশস্ত ললাটদেশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। যেমন ভাল দেখতে পেতেন না, তেমনই শুনতেও পেতেন খুব কম। তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য গান গাইয়ে শোনানো হত; কিন্তু ভাল শুনতে না পারায় কষ্ট বোধ করতেন।

কবিগুরু দুটি কবিতা উপহার দিলেন শেষ মাঘোৎসবে। বসন্তোৎসবও যথারীতি পালিত হয়। 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন এই উৎসবে। নাটকটি মঞ্চস্থ হবার পূর্বের দিন তাঁর সামনে অভিনীত হলে কবি দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। উৎসবের দিন সার্থকভাবে নাটকটি অভিনীত হলেও যেন কোথায় তার এক করুণ সুর বেজে উঠেছিল। এই ভাবে চলে গেল ১৩৪৭ সাল; এল ইতিহাস বিশ্রুত ১৩৪৮ সাল। নববর্ষ পালনের সঙ্গেই কবির জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হল। তিনি লিখে দিলেন তাঁর শেষ জন্মদিনের জন্য—

হে নূতন,
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ॥
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।
উদয়দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্ত মাঝে
চির নূতনের দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ॥

এইবার নববর্ষে কবির লেখা 'সভ্যতার সঙ্কট' অভিভাষণটি এবং 'জন্মদিনে' বইখানি বের হয়। এবারকার উৎসবটি যেন বড় সুন্দর হয়েছিল; বোধহয় তাঁকে সামনে বসিয়ে এ উৎসব আর হবে না এমন কিছু একটা কোথাও প্রচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে সাজিয়ে উত্তরায়ণের বারান্দায় আনা হল; তাঁকে দেখে সেদিন সকলেই পরিতৃপ্ত। আশ্রমবাসীদের সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তাই ছিল তাঁর শেষ জন্মদিনের শেষ আশীর্বচন। সেবার ২৫শে বৈশাখেও আশ্রমবাসীরা 'বশীকরণ' অভিনয় করে কবিকে আনন্দ দান করেছিলেন। ত্রিপুরা রাজদরবার থেকে এই সময়ই তিনি 'ভারতভাস্কর' উপাধি পান।

তখন গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যার তাপ কিছু কমলে তাঁকে আনা হত বারান্দায়। মাথায় তখন তাঁর ঘুরত গল্পের প্লট, আর তা লিখে নিতে বলতেন প্রতিমা দেবীকে। এইভাবে একদিন দুপুরে কবি এক গল্প বলে গেলেন, আর প্রতিমা দেবী তা লিখে নিলেন খাতায়। 'বদনাম' গল্পের উৎপত্তি হল এইভাবে। 'প্রগতি-সংহার'ও এইভাবে রচিত হয়। টুকরো টুকরো রচনাও কিছু সৃষ্ট হয়েছিল এই সময়।

গ্রীষ্মের পরে এল বর্ষা। এই সময় দেখা গেল তাঁর আঙুলের অসাড়তা। কলম দিয়ে আর লিখতে পারতেন না তিনি, অতি কষ্টে নাম সই করতেন। বর্ষার বেগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোগও চলল বেড়ে। একদিন কবি পুত্রবধূকে ডেকে বললেন যে তাঁর পরলোকের ডাক এসেছে। শান্তিনিকেতনের ভার নেবার কথাও তিনি জানালেন।

এ সময় তাঁর চিকিৎসা চলছিল কবিরাজি মতে চিকিৎসক ছিলেন শ্যামাদাস বাচস্পতি মশায়ের পু[illegible] কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ। ইতিমধ্যে ডাক্তার বিধানচ[illegible] রায় প্রমুখ চিকিৎসকবর্গ কবিকে পরীক্ষা করবার জ[illegible] এলেন শান্তিনিকেতনে এবং ব্যবস্থা হল, শ্রাবণ মা[illegible] অস্ত্রোপচার করতে হবে। সুতরাং কলকাতায় তাঁ[illegible] নেবার আয়োজন চলল। সাধনার স্থানটি ছেড়ে যে[illegible] কবির মন বেদনায় ভরে উঠল। যাত্রার সব প্রস্তুত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে নেবার জন্য একখানি সেলুনগা[illegible] ব্যবস্থা করেছিলেন। আশ্রমবাসীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ি[illegible] নীরব উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কবিগুরুকে বিদায় দিলেন; তিনি আশ্রম-দেবতার উদ্দেশে যেন শেষ প্রণাম জানালেন।

কলকাতায় গেলেন কবি; ৩০শে জুলাই হল অস্ত্রে[illegible] পচার। ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় করেছি[illegible] অস্ত্রোপচার। অস্ত্রপ্রচারের কিছু পূর্বে কবিগুরু শেষ অ[illegible] নিবেদন করেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে,
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চির স্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে

আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেয়েছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

অস্ত্রোপচারের পরে দেখা গেল, রুগী ভালর দিকে—ক্ষীয়মাণ প্রদীপের যেন প্রোজ্জ্বল দীপশিখা। সকলের মন আনন্দে ভরে উঠল। সবাই ভাবল, কবিগুরু বোধহয় সেরে উঠলেন; কিন্তু ৩রা আগষ্ট অবস্থা খারাপের দিকে চলল; চেতনা তখন আচ্ছন্ন। তিনদিন গেল এইভাবে। ৬ই আগষ্ট বিকেল থেকে বড়ই বাড়াবাড়ি। এল রাত্রি, সেদিন রাখীপূর্ণিমা। এক আসন্ন আশঙ্কা যেন সেই পূর্ণিমার নিশি ঘন মেঘরাশির মধ্যে নিজেকে ঢেকে রাখল। সারা রাত্রি চলল যমের সঙ্গে লড়াই। ৬ই আগষ্ট হল ভোর; এল ঐতিহাসিক দিনটি—৭ই আগষ্ট, ২২শে শ্রাবণ। ধীরে ধীরে রুগীর নিঃশ্বাস শান্ত হয়ে এল; তার পাশে বসে রামানন্দবাবু উপাসনা করলেন; বাড়ীর মেয়েরা মাঝে মাঝে ব্রহ্মসংগীত গাইতে লাগলেন। বেলা ১২টা ১০ মিনিটে কবিগুরুর পবিত্র আত্মা এ মরজগৎ ছেড়ে অমরলোকে প্রস্থান করল—সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার।

গনা চাই

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ

রাধার ঘরের ঠিকানাটা পারবে দিতে আমায় সখি ?
জোড়াকার্ডে মনের কথায় তাঁকে একটা পত্র লিখি ;
ধরা ছোঁয়ার অন্তরালে আমায় শুধু ঝুলিয়ে রাখা
দীর্ঘ দিবস ধ'রে এমন স্পষ্ট কথার বাহিরে থাকা ;
হয় কি ভাল, কর বিচার, প্রাণের সাড়া তোমার জানা
অহর্নিশি আশায় আশায় ঘোরার কি আর নেইক সীমা ;
গোপন প্রাণের নীরব ভাষা, নয়ন জলের কাজল কালি
রক্ত রেখায় দেগে দেব মনের রঙিন স্বপনগুলি
রাধার বাণী আমার বীণায় ফুটবে কিনা, স্পষ্ট কথা
রাজার মেয়ে, জানাক আমায় বোঝে যদি মর্ম ব্যথা
ব্যর্থ প্রাণে ঘুরব না আর শূন্য আশার মরীচিকা
রাধার নামে পত্র লেখায় হবে ক্রিয়ার সমাপিকা।

শরতের দিন

অমরনাথ বসু

শরতের মাস নতুন দিনের মাস
কখনো মেঘ অথবা মেঘহীন আকাশ
ভুলবো না আমি ঝরা শিউলির নিঃশ্বাস
এইন সর্বত্র ফুলের বাতাস !
ভুলবো না আমি বাংলার প্রিয় গ্রামগুলি
ওরা আজ বহু পুরানো দিনের স্মৃতির সমাধি
ওদের গভীর ভালবাসা আজ কেমনে ভুলি
তবুও বুঝছি ওরা আমার সর্বত্র আঁখি !
প্রথম দিনের শরত সকালে শিউলির ফুল
মৃত্যু যে রং দেয় ছেহে ফুলে সেই আগরণী
আর 'বাংলা' হায় তুমি অপসরণের ভুল
তোমার রূপের বাহার আজ ধ্বনি প্রতিধ্বনি !
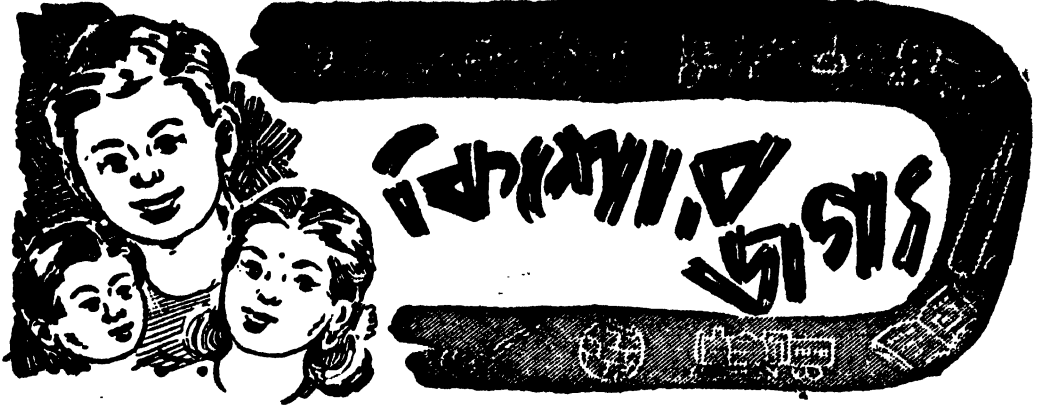
সংকট ও সমাধান

শ্রীজ্ঞান

বর্ত্তমানে আমাদের দেশ যে একটা বিরাট সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তা বোধহয় তোমরাও বুঝতে পাচ্ছ। খাদ্যসংকট ও অর্থসংকটে সাধারণ মানুষ আজ মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। চারিদিকেই একটা হতাশার ভাব যেন ছড়িয়ে পড়ছে—অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কায় যেন মানুষের মনকে অভিভূত করে ফেলছে !

ছাত্রদের উপরেও এর প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে উঠছে। বিদ্যায়তনে উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাবও ছাত্রগোষ্ঠীর উপর চেপে বসেছে। ফলে বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে সস্তা রাজনীতি ও নানা "ইজম্"-বাদের দিকেই কিশোর ছাত্ররা ঝুঁকছে। তাতে তাদের লেখাপড়ার ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ক্ষতিও যথেষ্ট হচ্ছে। চঞ্চলমতি বালকদের মন আরও চঞ্চল হয়ে উঠছে। স্থৈর্যের ও ধৈর্য্যের অভাবে তাদের কিশোর-মন বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা তাদের আচরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হতে চলেছে।

একদিকে যেমন অনাচার, অবিচার, অন্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি তার সমাধানের নামে আরও অনাচার, আরও অবিচার, আরও অন্যায় ঘটান হচ্ছে। কিন্তু এ কি ভাল ? তোমরাই ভেবে দেখ এরকম অবস্থা চলতে থাকলে দেশ কোথায় নেমে যাবে ?

অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হবে ন্যায় দিয়ে, অ[বি]চারের সুবিচার দিয়ে, আর অনাচারের সদাচার দি[য়ে]। তবেই তো সমাজের মধ্যে থেকে এই সব দোষ দূর হ[বে], তবেই তো মানুষ আবার ভদ্র, শান্ত, বিনয়ী হয়ে উঠবে। দেশের দুঃখ, দুর্দ্দশা দূর করতে দলাদলি ভুলে একম[ন] একপ্রাণ হয়ে সচেষ্ট হবে—কঠোর পরিশ্রমে ফসল ফলি[য়ে] খাদ্য সংকটের সমাধান করবে।

তোমরাও কি তা চাও না ?—নিশ্চই চাও। প্রত্যে[ক] শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই তা চায়, কিন্তু দুষ্টের প্রভাবে [ও] প্রতাপে তা কার্য্যকর করতে পারে না। কিন্তু তোমাদে[র] মতন কিশোর কিশোরীদের উপর দেশ অনেক আ[শা] রাখে, তাই দেশের এই দুর্দ্দিনে তোমাদেরই এগি[য়ে] আসতে হবে একতাবদ্ধ হয়ে সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে স[কল] সংকট সমাধানের জন্যে। সকল ভেদাভেদ ভুলে, সক[ল] প্ররোচনাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, সকল অনাচার, অবিচা[র], অত্যাচারকে দলিত করে তোমরা দেশের কাজে, দশে[র] কাজে এগিয়ে এস। তোমাদের সাহায্য পেলে দু[ষ্ট] শক্তিকে প্রতিহত করে দেশ আবার জেগে উঠবে—আব[ার] সুখ সম্পদ ভরে উঠবে।

তোমরা কি এগিয়ে আসবে না ?—নিশ্চয়ই আস[বে], এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

মনোহর মৈত্র

১। অঙ্কের হেঁয়ালি :

বলতে পারো—চার অঙ্কের এমন কোন্ সংখ্যা আছে, যাকে ১০ দিয়ে ভাগ করলে, ভাগাবশিষ্ট (Remainder) থাকবে ৯; ৯ দিয়ে ভাগ করলে, ভাগাবশিষ্ট থাকবে ৮; ৮ দিয়ে ভাগ করলে ৭; ৭ দিয়ে ভাগ করলে ৬; ৬ দিয়ে ভাগ করলে ৫; ৫ দিয়ে ভাগ করলে ৪; ৪ দিয়ে ভাগ করলে ৩; ৩ দিয়ে ভাগ করলে ২; এবং ২ দিয়ে ভাগ করলে, ভাগাবশিষ্ট থাকবে ১?

বৈকুণ্ঠ দেবশর্ম্মা

'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। এমন একটি পাখীর নাম করো, যাকে উল্টে দিলেই মাছ হয়ে যায়।

৩। এমন একটি ফলের নাম করো, যাকে উল্টে সাজালেই খুব আমোদ হবে।

৪। সে জিনিষটি কি, যা আমরা নিত্যই ভেজে কিম্বা তরকারী বানিয়ে খাই···এবং সে জিনিষটির নাম উল্টে দিলেই—চাবুক বোঝায়?

বলো তো ভেবে-চিন্তে এ তিনটি ধাঁধার উত্তর?

রচনা : রাজা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গত মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর :

১। ১০ মাইল মাত্র।

২। আরাম।

৩। মানচিত্র।

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সর্বেশ্বর, ধনঞ্জয়, নিত্যানন্দ, সদানন্দ, বিরজা, নীরজা, পদ্মজা ও পঙ্কজা লাহিড়ী (নবদ্বীপ), দীনবন্ধু, সত্যকিঙ্কর, রামমোহন, ভুবনেশ্বরী, পুণ্যলতা, চারুলতা ও অনন্তকুমার রায় (কলিকাতা), শান্তা, কিশোর, মোহনলাল, অরুণিমা ও চন্দ্রিমা পালচৌধুরী (রাণাঘাট), নীলমণি, আশুতোষ, পৃথ্বীশ, মৌলিনাথ, কামদারঞ্জন ও বাসুদেব দত্ত(কলিকাতা), সোমেশ, যোগেশ, জবা, পুষ্প, মল্লিকা, ছন্দা, গোপা ও বাবলি (ডালটনগঞ্জ), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), সুধাংশু ও অলকা মুখোপাধ্যায় (কাঁচড়াপাড়া), শর্ম্মিলা, শর্ম্মিষ্ঠা, শচীন্দ্র ও মৃদুলা রায় (কলিকাতা), হাবলু, টাবলু, সুষমা, পুতুল, নিপু ও সঞ্জীব (হাওড়া), ফণী, রোচনা ও খুকু সাহা (কলিকাতা), পরাশর, পাতঞ্জলি ও খনা মৈত্র (রাঁচি), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), লক্ষ্মী, সত্যেন্দ্র, অজিত, মুরারি, সঞ্জয়, অমিয়, সুনীল, লনা ও নমিতা (ভিলাই), বিজু ও বুজু ভাদুড়ী (কলিকাতা), পুপু, ভুটিন ও রাজা (কলিকাতা),

গত মাসের দুটি ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), সুনীত, অমিয়, প্রশান্ত, রাণা, কৃষ্ণলাল, ভুবনমোহন, মাণিক, পিণ্টু, অভি, মৃণাল, কৃষ্ণা, ভোলা, তিলক, বাপি ও তনু (কলিকাতা), দেবাংশু, শুভ্রাংশু ও লীনা সেন (শিলঙ), রাণা, বুনা, লিপি, গৌর, আরতি, প্রণব, প্রশান্ত, চন্দ্রিমা, রেণু ও দুর্গা (কলিকাতা), হিমাংশু, হারাণচন্দ্র, সীতাংশু ও সুষমা মুখোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি), অজয়, হরিদাস, রাসবিহারী, দুলাল, হরিনারায়ণ, গোপীনাথ ও ধীরেন মল্লিক (কলিকাতা), অশোক, অনাবিল, সুনন্দা, সুচেতা, আলো, খোকন, পিপু, ঝুণ্টু, কাবুল ও পার্থ চক্রবর্তী (কৃষ্ণনগর), পমু, খুকু, রিণি ও রণি (কাইরো), বিজয়েন্দ্র, বিনয়েন্দ্র, অজয়েন্দ্র, অরুণেন্দ্র, ও ইন্দিরা সিংহ (হাজারীবাগ)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

ইন্দ্র, বিমান, রজত, কল্যাণ, শচীন, রবি, আনন্দ, কুমকুম, কাজল ও সঙ্ঘমিত্রা (কলিকাতা), কমলেশ, বিজয়, বিনয়, অতুল, ছবি, কাজরী, গীতা, চামেলী, কুন্দ, রাজগোপাল ও চরণদাস ঘোষ (বর্দ্ধমান), মানস, চারুচন্দ্র, মতিলাল, সুধীর, মহেন্দ্র, রাজেন্দ্র ও মৃন্ময়ী

সেনগুপ্ত (গোহাটি), শচীদুলাল, রামদুলাল, মদনমোহন ও মানসী বসু মল্লিক (জামশেদপুর), বারীন, গোপেশ, সোমেশ, চারুতোষ, পুলিন, পূর্ণিমা ও মাধুরী গঙ্গোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী), বাপী, বেবী, অনিল, বাসন্তী, রুণু বৌদি, দুর্গা বৌদি, কৃষ্ণাবৌদি, গীতাদি ও দ্বিজেন্দ্র মোহন সরকার (কলিকাতা)।
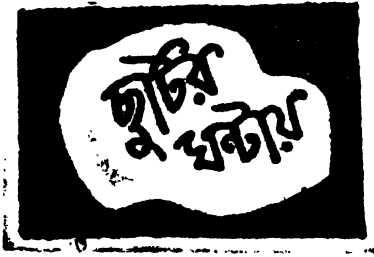
চিত্রগুপ্ত

গত সংখ্যায় রাসায়নিক-উপাদানের বিচিত্র-প্রক্রিয়ার ফলে, বিজ্ঞানের যে অভিনব-কারসাজির প্রসঙ্গালোচনা করেছি, এবারেও তেমনি-ধরণের আরেকটি আজব-মজার খেলার কথা বলছি। এ খেলাটির কলা-কৌশল রপ্ত করে নিয়ে তোমরা খুব সহজেই টুকিটাকি কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম আর সুলভ-মূল্যের রাসায়নিক-পদার্থের সাহায্যে ছুটির দিনে দিব্যি মজাসে নিজেদের বাড়ীতে আত্মীয়-বন্ধুদের আসর জমিয়ে তুলে বিজ্ঞানের রহস্যময়-কারসাজির দৌলতে অভিনব-উপায়ে বিচিত্র-অদ্ভুত ধরণের 'রূপালী-রঙের অগ্নি-শিখা' (Silver Fire) জ্বালানোর কায়দা-কসরৎ দেখিয়ে সবাইকে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো।

বিচিত্র-অদ্ভুত এই 'রূপালী-রঙের অগ্নি-শিখা' কি উপায়ে জ্বালিয়ে তোলা সম্ভব—আপাততঃ, তারই কলা-কৌশলের হদিশ দিচ্ছি।

গোড়াতেই বলে রাখি—এ-ধরণের আজব-মজার 'রূপালী-রঙীন আগুনের শিখা' জ্বালিয়ে তুলতে হলে, দুটি বিশেষ-উপকরণ জোগাড় করে রাখা দরকার। অর্থাৎ, লোকজনের আসরে এ খেলাটি দেখানোর জন্য চাই—এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠকয়লা (a piece of burning charcoal) এবং খানিকটা 'নাইট্রেট অফ্ সিলভারের' শুকনো-দানা (a morsel of the dried crystals of Nitrate of Silver)। তবে মনে রেখো,—নাইট্রেট অফ্ সিলভারের' শুকনো-দানার বদলে 'লুনার্ কষ্টিক' (Lunar Caustic) রাসায়নিক-পদার্থ ব্যবহারে কিন্তু এ খেলার মজা দেখানো সম্ভব নয়। কাজেই আসরে আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে এ কারসাজি নিখুঁত ভাবে দেখাতে হলে, পূর্বাহ্ণেই যথ যথ রাসায়নিক-পদার্থটি জোগাড় করে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

উপরোক্ত উপকরণ দুটি সংগ্রহ করে নিয়ে, আসরে দর্শকদের সামনে খেলা দেখানোর সময় —গোড়াতেই ঘরের মেঝে কিম্বা টেবিলের উপরে বড় একটি কাঁচের বা কাঁসা-পিতল অথবা তামার পাত্রে জ্বলন্ত কাঠকয়লার টুকরোটিকে সযত্নে-সাবধানে বসিয়ে রেখে, সেটির উপরে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে দাও খানিকটা নাইট্রেট অফ্ সিলভারের শুকনো-দানা। তাহলে দেখবে—সঙ্গে সঙ্গে চোখের সুমুখে সেই জ্বলন্ত কাঠকয়লার উপরে ছিটানো 'নাইট্রেট অফ্ সিলভারের' দানাগুলি গন্‌গনে-আগুনের ছোঁয়াচ লেগে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে ফুলঝুরির আলোর-বিন্দুর মতো অসংখ্য ছোট-ছোট রূপালী-রঙের শিখাচ্ছটায়! শুধু এই আজব-মজার অগ্নিশিখার রঙিন ছটাই নয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো দেখতে পাবে যে জ্বলন্ত-কাঠ-কয়লার টুকরোটিও ক্রমে ক্রমে আগাগোড়াই রূপালী-রঙে ছেয়ে গিয়ে উজ্জ্বল-ঝকঝকে হয়ে উঠেছে।

এই হলো—এবারের মজার খেলাটির আসল রহস্য। এমন আজব-কাণ্ডটি ঘটলো—বিজ্ঞানের বিচিত্র অভিনব রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে।

খেলার কলা-কৌশলের পরিচয় তো পেলে...এবারে তোমরা নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে ছাখো এবং ছুটির আসরে নিখুঁতভাবে আজব-মজার এই কসরৎটি দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দাও তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সবাইকে।

আগামী সংখ্যায় এমনি-ধরণের আরেকটি মজার খেলার কলা-কৌশলের পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

কৃষ্ণনগরের বারদোল মেলা ও উটজ শিল্প

ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার এম এ-পি এইচ ডি·ডিপএড

শাহ আলম বাদশাহের দূত পীর দোস্ত আলমের তত্ত্বাবধানে নির্মিত কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর বিরাট চক, নহবৎখানা, সিংদরজা, বিষ্ণুমহল ও সারিবন্দী খিলানে সজ্জিত দোলমঞ্চ শোভিত দেওয়ান-ই খাস ও আমের নক্সাভূষিত প্রখ্যাত সুবিশাল পূজার দালান, যা স্কটল্যাণ্ড হতে আগত বাবার বন্ধু বাইরী সাহেবেরও অপূর্ব বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। মহিমান্বিত সে দোলমঞ্চে লালশালু মোড়া কাঠরায় বীরুইএর মদনমোহন, তেহট্টের কৃষ্ণরায়, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, গঙ্গবাসের বলরাম, রাজবাড়ীর কৃষ্ণচন্দ্র, গোবিন্দদেব, ব্রহ্মণ্যদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, গড়ের ও নদের গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহের অপূর্ব সমাবেশে বারদোল অনুষ্ঠিত হয়—বৈশাখের শুক্লা একাদশী হতে। মেলা প্রায় মাসাবধি কাল স্থায়ী হয়।

গড়ের চৌহদ্দির মধ্যে মেহগিনি, চম্পক, সেগুন প্রভৃতি বড় বড় গাছের তলে এক বিরাট মেলা বসে—যাকে লোকে 'চাঁদের আলোর মেলা' বলে। এই মেলায় গ্রামান্তর—দূর দেশান্তর হতে গোরুর গাড়ী বা বাঁশের এক ঘোড়ার গাড়ী করে লোকে সপরিবারে এসে গাছ তলায় রেঁধে খায় ও রাত কাটায়।

স্যর জেহাঙ্গীরজী বায়েজী, অধ্যক্ষ গিলক্রীষ্ট, মিণ্টো-অধ্যাপক হ্যামিল্টন, সাহেবের কাছে অর্থনীতি ও রাজনীতি পড়েছিলাম। তাঁদেরই ইচ্ছামত নদীয়ার উটজ শিল্প বিষয়ে কিছুটা অনুসন্ধান ও আলোচনা করেছিলাম, বেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের জন্য। অর্থনীতির ছাত্র শ্রীমান্ দেবপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে এবার মেলা দেখতে গিয়ে উটজ শিল্প সম্বন্ধে যা কিছু একটু-আধটু সংগ্রহ করতে পেরেছি এই ছোট প্রবন্ধে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। গোটপাড়ার নামজাদা কুঁজো ও বাগাঁচড়ার হাঁড়ির সুনাম সেখানকার মাটির জন্যই কতকটা, ফুলেনবলা ও বাগাঁচড়ার বাঁশের বাঁশীও গরীব কারিগরদের অবসর সময়ের হাতের কাজ, কাটোয়ার কাঠের পুতুল—যার উপরের রঙিন নক্সা মিশরীয় মামীর উপরকার নক্সার মত, একথা আমি বহুপূর্বে "ভারতবর্ষে" উল্লেখ করি। এ ছাড়া কাটোয়ার পাথরের জিনিষপত্র ও ছোট ছোট মূর্তিও দেখলাম। মূর্তিগুলি বাংলার পাল ও সেন রাজগণের সময়কার ভাস্কর্যের পরিচয় দেয়। সেখানকার বিশ্বনাথ ভাস্করের কাজই বারাণসী ও জয়পুরের পাথরের মূর্তি—শিল্পের খ্যাতির মূলে। ধামা, কাঠা প্রভৃতি বেতের কাজ প্রধানতঃ রাণাঘাট সাবডিভিসনের, দিগনগরের বেতের উপর তা বেশী নির্ভর করত। এখন উদ্বাস্তু কলোনির চাপে বেতবন উজার। কারিকরদের এখন আসামের বেতের উপর নির্ভর করতে হয়, তাতে দামও বেশী পড়ে। "কাঠের ঘোড়া-কাঠের ঘুড়ী জল পীঁ পীঁ পীঁ" একটা ছড়া এই ভাবের ছেলে বেলায় মায়ের মুখে শোনাছিল। পূর্ববাংলার গোলমালের পর থেকে বহু যায়গার লোকই তো এ বাংলায় এসেছে। লাঙ্গলবন্ধের উদ্বাস্তুরা অনেকে ব্রহ্মপুত্রতীর ছেড়ে শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে এসে ঘর বেঁধেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের কাজ—কাঠের ঘোড়া, কাঠের ঘুড়ী ও কাগজের জন্তু জানোয়ার ও পাখী এখন শান্তিপুরের বলে পরিচিত হচ্ছে। জল পীঁ পীঁ কাদাখোঁচার মত একরকম পাখী নদীয়ার পূর্ব ধারে বিলে দেখা যায়, তাদের পা অপেক্ষাকৃত লম্বা। তবে লাঙ্গলবন্ধের এ-শিল্প স্থানীয় পরিবেশের সুযোগ সুবিধা হারিয়ে এখন ভটস্থ, উপযুক্ত সময়ে সরকারী সাহায্য না পাওয়াতে এ শিল্পও ক্ষীয়মাণ হতে বসেছে। শিল্পীদের ঘরে নেই ভাত, আবশ্যক কাঠও মিলে না। শান্তিপুর বেলেডাঙার তাঁতের শাড়ী সুন্দর ও সস্তা; এখানেও সহানুভূতিসূচক সরকারী তত্ত্বাবধান আবশ্যক। কৃষ্ণনগরের শাখা লুপ্তপ্রায়, নবদ্বীপে শাঁখের কাজ এখনও কিছু কিছু আছে। কাঁসার বাসনের কাজও ভুজারপাতেই এখনও কিছু কিছু চলছে। কালনার কাঠের বাসনও মন্দ নয়, তবে সেগুলিকে জনপ্রিয় করতে রং এর বাহার ও দাম কমানর দরকার। নদের লক্ষ্মী প্যাচা তো ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মীর চরণোপান্তে শোভা পাচ্ছে। সব চেয়ে আকর্ষণীয় হল ঘূর্ণী কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল—যার স্বাভাবিকতা ও বিষয় প্রাচুর্য বিস্ময়জনক। ভারতের কয়েকটি পণ্যের মধ্যে এর চাহিদা পৃথিবীর বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ শিল্পটির বিশ্ববাজারে ভবিষ্যৎ আরও বড় বলে মনে হয়। তবে সরকার পক্ষ থেকে তেমন উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখা যায় না। মোট কথা জাপানের উটজ শিল্প ব্যবস্থার অনুকরণে আমাদের কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এখন থেকেই সতর্ক ও জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হয়ে কাজ করতে হবে। শুধু রিপোর্টে কাজ হবে না। ডাক্তারের মত শিল্পের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তার ব্যবস্থা গ্রহণ জাতীয় সম্পদের রক্ষার জন্য করতে হবে, অফিসারদের কোমরের কাপড় মাথায় বেঁধে কাদায় পড়া গোরুর গাড়ীর চাকা মারতে হবে, তবেই সাধারণের সঙ্গে যোগে কাজ এগিয়ে যাবে।

"চাতক"
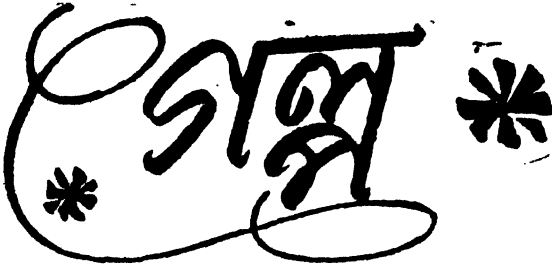
শ্রীজগবন্ধু নাথ

অনেক চেষ্টা করেও যখন ভাল মেস পাওয়া গেল না তখন অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও সন্তোষকে সাধারণ একটা মেস বেছে নিতে হল। নির্দিষ্ট দিনে সন্তোষ বেডিং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সুটকেশে ভর্তি করে কলকাতার ঐ অন্ধকার মেসেই এসে উঠল। অন্ধকার গলির মধ্যে একটা দোতলায় কয়েকখানি ঘর নিয়ে ছোট্ট একটা মেস। অন্য মেসের মতো এখানে ঠাকুরের ব্যবস্থা নেই। যে যার রান্না নিজেই করে নেয়। একটা ঘরের মধ্যে সারি সারি উনুন জ্বলে সকাল ও সন্ধ্যায়। মেসের সভ্যেরা নিজেদের প্রয়োজন মত রান্না করে নেয়। তারপর তারা বেরিয়ে যায় নিজেদের কাজে। এত কষ্টেও তারা ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করে না। হাসিমুখে কাজ চালিয়ে নেয়। রাত্রে এ মেসে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে না। ছোট্ট হেরিকেনের আলোগুলো টিম টিম করে জ্বলে। কলেজ আর পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাশের ছাত্রেরা বই পত্র নিয়ে পড়তে বসে। তাদের কোন অসুবিধা হয় না।

কিন্তু সন্তোষের বাধ বাধ ঠেকতে লাগল। বাড়ীতে ইলেকট্রিকের আলোয় পড়া অভ্যাস, টেবিল-চেয়ার ভিন্ন তার পড়ায় মন বসে না। কিন্তু এখানে মেঝের ওপর পাটি পেতে বসে হেরিকেনের টিম্ টিমে আলোয় এম, এ পরীক্ষার পড়া করা সন্তোষের পক্ষে বেশ কষ্টকর হয়ে উঠলো। এতটা যে অসুবিধা হবে তা ও এর আগে চিন্তাও করেনি। কিন্তু উপায় নেই। একবার যখন এসে পড়েছে তখন আর ফিরে যাওয়া যায় না। এখানে যত অসুবিধা হোক না কেন; তাকে তা স্বীকার করেই নিতে হবে। আর তা, ছাড়া এরাও তো মানুষ। এরা যা পারে সন্তোষ তা পারবে না কেন? এদের মতো সহজ হতে না পারাটা তার পক্ষে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

এই অসুবিধাগুলো জয় করতে দুটো দিন কেটে গেল। অবশ্য আরম্ভ হবার বেশ কদিন আগেই ও এসেছে। নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য দুটো দিন প্রয়োজন এটা ও ভাল ভাবেই জানত। বই-পত্তর খুলে বসল সন্তোষ। ওদের সংগে তাল রেখে পড়ার মনসংযোগ তা বেশ সহজ হয়ে গেল। প্রথম দিন পরীক্ষা দিয়ে এলো। ভালই হলো। খুশী হলো সন্তোষ পরীক্ষা দিয়ে। এতটা ও আশা করেনি।

সেদিন রাত দশটা পর্যন্ত পড়া করল। আর ভাল লাগল না পড়তে। শুয়ে পড়লো ও। হেরিকেনের আলোটা কমিয়ে দিল। ঘুমটা ভাল ভাবেই এসেছিল। হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। খক-খক-খক। কাশির শব্দ ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল। পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতদিন ছিলেন না। আজ এসেছেন। তিনিই কেশে চলেছেন এক ভাবেই।

—আপনার কি শরীর অসুস্থ? জিজ্ঞাসা করল সন্তোষ বিছানা থেকে।

—না। সংক্ষিপ্ত উত্তর এল পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছ থেকে। খক-খক-খক—মা—গো! আবার সেই কাশি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাতরাতে লাগলেন সারা রাত। সন্তোষের ঘুম আর এলো না। ভয়ও হলো। টি, বি, নয়তো? কিন্তু উপায় নেই। ও এই মেসে নতুন। শুধুমাত্র একজন পরিচিত ভদ্রলোকের জন্য এই মেসে স্থান পেয়েছে। সন্তোষ আর কথা বলল না। ক্রমশঃ রাতের অন্ধকার কেটে গেল। বাইরে ভোরের পাখীর কলরব সন্তোষের কানে ভেসে এলো। আর ও লক্ষ্য করল বৃদ্ধের কাশির বেগ কমে গেছে। তিনি এখন আরামে নিদ্রা যাচ্ছেন। ভোরের আলো জানলার ফাঁক দিয়ে বার বার উঁকি মারতে লাগল। সন্তোষ উঠে পড়লো।

পরের দিন ছুটি। অফুরন্ত অবসর। অথচ আগামী দিনের পরীক্ষার পড়া করতে হবে। সকালে টিফিন সেরে নিয়ে সন্তোষ পড়তে বসল। বেলা আটটা হবে। সকালের মিষ্টি রোদ সন্তোষের গায়ে এসে পড়েছে। ভাল লাগছিল সন্তোষের। মেসের এই ছোট্ট ঘরটায় রান্না চাপিয়েছে বোর্ডাররা। আস্তে আস্তে গল্প করছে ওরা। সন্তোষ পড়ছে।

—আজকে কি রান্না করছেন বীরেনবাবু? জিজ্ঞাসা করেন অজয়বাবু।

—কি আর করব। রাধারাণী যা জুটিয়ে দিয়েছেন তাই চাপিয়ে দিলাম। বললেন বৃদ্ধ বীরেনবাবু।

সন্তোষ তাকিয়ে দেখল পালঙ্ শাক চচ্চরি হচ্ছে। আবার ও পাড়ায় মনোনিবেশ করল।

—মাছ কটা কত নিলো জিজ্ঞাসা করে অজয়বাবু।

—চারটে মাছ তিরিশ নয়া পয়সা দাম নিলো।

সন্তোষকে আবার তাকাতে হল। চারটে ছোট পোনার বাচ্চা নুন হলুদ মাখান রয়েছে থালার ওপর। কোন কথা বলল না সন্তোষ। পড়তে লাগল ও।

বেলা বাড়তে লাগল। রোদের উত্তাপও বেড়ে গেল। সন্তোষ পড়ে চলেছে। ছাতুর রান্না হয়ে গেছে। বীরেনবাবু অর্থাৎ ছাতু বেড়িয়ে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে আর

পড়লেন। মাথাটা কোন রকমে আঁচড়ে নিলেন। এরপর একটা আসন পেতে পূজোয় বসে গেলেন। সন্তোষ মাঝে মাঝে দেখছে ওদের বিচিত্র কার্য। ওরাও মানুষ। ওরা বাঁচতে চায়।

—জয় গোপাল—জয় গোবিন্দ। গোপাল-গোবিন্দ কৃপা কর। রাধারাণী কৃপা কর। কানে ভেসে আসছে সন্তোষের। বৃদ্ধ পুজো করছেন। ও তাকিয়ে দেখল। একটা বালক শ্রীকৃষ্ণের ফটো টাঙ্গানো আছে দেওয়ালে। আর তার পাশেই আর একজন সাধুর ফটো টাঙ্গানো। বোধহয় গুরুদেবের ফটো। অজয়বাবুরও রান্না শেষ হয়ে গেছে। তিনিও পুজোয় বসেছেন। চণ্ডীপাঠ করছেন। পাশের আর একজন ভদ্রলোক গীতা পাঠ করছেন সুর করে। অপূর্ব এক পরিবেশ। অপূর্ব সামাজ্য। এই ছোট্ট ঘরের মধ্যে এদের সংসার। এরা বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবেও। এরা সংগ্রাম করেই বাঁচবে।

সন্তোষের পড়তে আর ভাল লাগছে না। ওর মনটাও চঞ্চল হয়ে গেছে। মনে পড়ছে বাড়ীর কথা। এতক্ষণে মা রান্না করছেন। হয়তো ওর কথা চিন্তা করছেন। ভাই বোনেরা খেলা করছে। হুটোপাটি করছে। জ্বালাতন করছে মাকে। বই বন্ধ করে রাখলো ও। দুপুরে এরা কেউ থাকবে না। তখন ও পড়বে। সেই ভাল।

বৃদ্ধ বীরেনবাবুর পূজো শেষ হয়ে গেছে। প্রসাদ পেল সন্তোষ। পরম ভক্তিভরে খেয়ে নিলো ঐ প্রসাদ।

—দাদু। ডাকল সন্তোষ।

—কী! কিছু বলবে?

—হ্যাঁ—আপনার বাড়ী কোথায়?

—বর্দ্ধমান জেলার দেয়ারা গ্রামে।

—এখানে কোথায় চাকরী করেন?

—এক কাপড়ের দোকানে। উত্তর দিলেন বীরেনবাবু।

—আপনার বয়স হয়েছে। চাকরী না করলেও তো চলে।

—ওনার কথা বোলো না। অকারণ খাটছেন। খাটার কোন প্রয়োজন নেই। বললেন পাশের ভদ্রলোক।

সন্তোষ কোন উত্তর দিল না। এখানে কোন কথা না বলাই ভাল।

—ওনার কথা ছেড়ে দাও। না খাটলে কি আর সংসার চলে?

বললেন বীরেনবাবু।

—আ—হা সংসারে দুজন তো লোক। গ্রামে জমি আছে। আপনার খাটার দরকারটা কি মশাই! সোজা কথা বলুন যে আমার এখনও কামনা বাসনা যায়নি। বললেন ঐ ভদ্রলোক।

বীরেনবাবু কোন প্রতিবাদ করলেন না।

—জমির ধানে কি আর সংসার চলে! মাস গেলে আশি টাকা পাই! এখানকার খরচ চালিয়ে কত টাকাই বা বাড়ীতে পাঠাতে পারি। বললেন বীরেনবাবু।

ওই কথাগুলো বলতে বীরেনবাবুর অনেক কষ্ট হল বলে মনে হল সন্তোষের।

—আপনার কেউ নেই? জিজ্ঞাসা করল সন্তোষ।

—এক ছেলে ছিল—মারা গেছে। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এখন আর কেউ নেই। আছে শুধু ওই হতভাগিনী। বীরেনবাবুর গলাটা ঈষৎ কেঁপে গেল।

—সব রাধারাণীর ইচ্ছা। তাঁর জিনিষ—তিনি নিয়ে নিয়েছেন। বললেন তিনি আবার।

আর কোন কথা বলল না সন্তোষ। ও বুঝতে পারল বীরেনবাবুর আসল ব্যথা কোথায়।

—দুঃখ করবার কিছু নেই ভাই। এই জগৎটা মায়ার খেলা। দুদিন খেলা করে চলে যাব। সব রাধারাণীর কৃপা। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়। আমার গুরুদেব বলেন—নাম্নৈব কেবলম্। শুধু নাম কর। তাহলেই মুক্তি পাবে। দাদু আবার শুরু করলেন।

—ঠিকই বলেছেন। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়। সন্তোষ উত্তর দিল।

—জান, আমাদের গ্রামে ডাকাতে কোন এক বাড়ীর বিগ্রহ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। বিগ্রহটা ছিল পিতলের—ডাকাতরা মনে করেছিল বোধহয় ওটা সোনার হবে। তারপর কান্নাকাটি শুরু হল বাড়ীতে। গুরুদেবকে আনান হল। তিনি বললেন—নাম কর, বিগ্রহ ফেরৎ পাবে। তারপর নামকীর্তন শুরু হল। একমাস যেতে না যেতেই বিগ্রহ পাওয়া গেল। বাড়ীর কাছে এক পুকুর ছিল। ঐ পুকুর থেকেই বিগ্রহ পাওয়া গেল। নামের এমনই মহিমা যে তা ভাষা দিয়ে বোঝান যায় না। সবই বিশ্বাস। তোমার বিশ্বাস থাকে তাহলে নাম করেই মুক্তি পাবে। বললেন দাদু। সন্তোষ দাদুর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করল। দেখল ওই মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটছে। চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা নামছে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। সমর্থন জানাল সন্তোষ।

দাদু এবার ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসলেন। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই খাওয়া শেষ হয়ে গেল। মুখ ধুয়ে নিলেন তিনি। জামাকাপড় পড়ে নিলেন।

—এবার কাজে বেরুতে হবে। দেরী হয়ে গেছে আজ। বললেন তিনি।

—কটায় জয়েন করতে হবে? জিজ্ঞাসা করল সন্তোষ।

—দশটায়।

—কখন আসবেন ?

—রাত দশটা বেজে যাবে।

—এত রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয় আপনাকে ?

—হ্যাঁ ভাই। এত খেটেও নাম পাওয়া যায় না। দাদুর গলায় বিষাদের সুর।

আর অপেক্ষা করলেন না তিনি। বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

বেলা এগারটার মধ্যে ঘরটা খালি হয়ে গেল। সবাই চলে গেছে নিজের নিজের কাজে। সন্তোষ এখন একা। সন্তোষ খেয়ে নিল। এবার পড়তে হবে। কাল পরীক্ষা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার। শাঁখের শব্দ ভেসে আসছে। কাসর-ঘন্টার শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। সন্তোষ একা এই অন্ধকার ঘরটার মধ্যে বসে আছে। দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিয়েছে জানলার ফাঁক দিয়ে। সামনের বাড়ীতে ইলেক্ট্রিকের আলো জ্বলল। সন্তোষের ঘরে অন্ধকার। আলো জ্বালতে ইচ্ছা করছে না। এই অন্ধকার ভাল লাগছে আজ। এরা কেউ আসেনি। আসতে এখনও দেরী আছে। বাইরে পেঁচা ডাকছে কর্কশ স্বরে। আর ভাল লাগছে না। বড় একা লাগছে এখানে। মনে হচ্ছে এটা একটা পাষাণ পুরী। এখানে চেঁচালেও কেও সাড়া দেবে না। যদি কেও এসে খুন করে চলে যায়, তবুও না।

হেরিকেনটা টেনে নিল সন্তোষ। আলোটা জ্বালল। টিম্ টিম্ করে জ্বলতে লাগল হেরিকেনের আলো। তবুও সন্তোষের মনে হল অন্ধকার দূর হল না। ইলেকট্রিকের আলোর কাছে হেরিকেনের আলো!

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। সন্তোষ বই নিয়ে পড়তে বসল। সাতটা বেজে গেল। তবুও কেউ এলো না। সন্তোষ পড়ায় মন বসাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বার বার ছন্দ কেটে যেতে লাগল। বার বার মনে পড়তে লাগল বাড়ীর কথা। আটটা বাজল এক সময়। একজন দুজন করে বোর্ডাররা এলেন। কেউ কেউ কাজ সেরে বেড়াতে গিয়ে ছিলেন। বেড়িয়ে আটটা বাজিয়ে মেস ঢুকলেন। আবার উনুনে আঁচ পড়লো। রান্না শুরু হল। পাশের ভদ্রলোক আঁচ দিলেন না।

—রান্না করলেন না ? জিজ্ঞাসা করল সন্তোষ।

—না আজকে আর ভাল লাগছে না।

—কি খাবেন তাহলে ?

—হোটেলে খেয়ে নেবো।

আর কোন কথা বলল না সন্তোষ। এই হল এদের জীবন। একঘেয়ে জীবন। এখানে শরীর অসুস্থ হলে কেউ দেখবার নেই। পরিবার, আত্মীয় স্বজন পড়ে থাকে দেশে। সুতরাং অসুখ করলে কষ্টের সীমা থাকে না। হাতের কাছে এক গ্লাশ জল কেউ এগিয়ে দেয় না। তাদেরও তো কাজ আছে। আছে ঝামেলা। কে আর পরের ঝামেলা পোহাতে চায়।

রাত বেড়ে গেল। দশটা বাজল এক সময়। সন্তোষ খেয়ে নিল। তারপর বিছানাটা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ল। সেদিন রাত্রেও বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার কাশতে লাগলেন। কাশতে কাশতে হাঁপাতে লাগলেন। বার বার মা—মাগো বলে কাতরাতে লাগলেন। কিন্তু সন্তোষ দেখল এতে কারও নিদ্রার ব্যাঘাত হচ্ছে না। সবাই পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। সন্তোষও ঘুমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ভাল-ভাবে ঘুম হল না।

এমনি ভাবে কেটে গেল বেশ কিছু দিন। সন্তোষের চারটে পেপার পরীক্ষা হয়ে গেল। এতদিনে ও মেসের হাব ভাব বুঝে নিয়েছে। নিজেকে অনেকটা মানিয়ে নিয়েছে। বুঝেছে ওকে পরীক্ষা দিতে হবে। কে কি করছে না করছে সেদিকে লক্ষ্য করবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ঐ হচ্ছে ওদিকে লক্ষ্য দিতে হলে সন্তোষের ক্ষতিই হবে। সুতরাং চোখ কান বুঁজে পড়াশুনা করে যাওয়াই শ্রেয়।

সেদিন ওর ছুটি ছিল। বেলা তখন তিনটে হবে। হঠাৎ ও দেখলো ধীরেনবাবু হন্ত দন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

—কি হলো দাদু ? জিজ্ঞাসা করল ও।

—নাতিটার শরীর খারাপ। চিঠি এসেছে বাড়ী থেকে।

—আপনি বাড়ী যাচ্ছেন।

—দেখি কেমন আছে। ওটাই তো মাথার মণি।

—কেন আপনার মেয়ের আর ছেলেমেয়ে হয়নি।

—না ভাই। অনেক সাধ্য সাধনা করে ওই একটি পাওয়া গেছে রাধারাণীর কৃপায়।

ধীরেনবাবু একটা ব্যাগে করে কয়েকটা জিনিষ নিলেন।

—চলি ভাই। বেড়িয়ে গেলেন তিনি।

সন্তোষের মনটা বিষাদে ভরে গেল। কিন্তু ওর কিবা করবার আছে ? শুধু ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল। ঠাকুর ধীরেনবাবুর প্রতি কৃপা কোরো।

এরপর কটাদিন কেটে গেল। সন্তোষ পরীক্ষা ভাল ভাবেই দিল। আর মাত্র একটা পেপার বাকী। মাঝে দুটো দিন ছুটি। পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পরই ওকে বাড়ী চলে যেতে হবে। আর ছুটি নেই। ধীরেনবাবু সেই যে গেছেন, আর খবর নেই।

হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা তিনি ফিরে এলেন ব্যাগ হাতে করে। মেঝের ওপর ব্যাগটা ফেলে রেখে বসে পড়লেন। কোন কথা বললেন না তিনি।

আপনার নাতির খবর কি ? জিজ্ঞাসা করল সন্তোষ।

—রাধারাণী কৃপা করেছেন ভাই। উত্তর দিলেন বীরেনবাবু।

সন্তোষের মনটা বিষাদে ভরে গেল! আশা করেছিল ভাল খবর পাবে। কিন্তু তার বিপরীত খবর ওকে নিরাশ করে দিল। ও লক্ষ্য করল দাদুর মুখে কোন ভাবান্তর নেই। চোখের কোলে নেই জলের ছাপ। তিনি শান্ত।

—দুঃখ করবার কিছু নেই ভাই। সবই রাধারাণীর কৃপা। তিনি দিয়েছিলেন, আবার তিনি তাঁর জিনিষ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বীরেনবাবু বললেন।

আর বললেন না তিনি। উঠে পড়লেন এবার।

—একি উঠলেন যে ? জিজ্ঞাসা করল সন্তোষ।

—বসে থাকলে কি আর চলে। কাজে যেতে হবে না!

—কালকে যাবেন। বলল সন্তোষ।

—না কাল গেলে চলবে না। একদিন কামাই করলে যে মাইনে কেটে নেবে।

—মাইনে কেটে নেবে ?

—হ্যাঁ—এখানে ছুটি নেই। সপ্তাহে শুধু একদিন ছুটি পাই।

সন্তোষ আর কোন কথা বলল না। বীরেনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

সন্তোষ শুধু ভাবতে লাগল কেন এমন হয় ? জগৎটা কি সত্যি মায়া!

পরীক্ষা শেষ হল সন্তোষের। যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। হাতে আর ছুটি নেই। আর মাত্র একদিন তারপর অফিসে জয়েন করাত হবে। পরের দিন সকালে উঠল সন্তোষ। হাত মুখ ধুয়ে নিল। টিফিন সেরে নিল।

আজ আর ভাল লাগছে না ওর। অনেক উৎসাহ আর আশা নিয়ে ও এসেছিল পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এবার তো যাবার পালা। তবুও মনটা বাঁধ মনে না। অবাধ্য মনটা যেন বার বার পিছু ডাকে। বার বার মনে হতে লাগল এদের কথা। যারা তার আপনার নয়। অথচ তাদের জন্য তার অসংযত মনটা বার বার যেন কেমন কেমন করতে লাগল। এই দাদু, অজয়বাবু, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র চঞ্চল বার বার তার মনের কোণে ভীড় করতে লাগল। এদের ও দূর থেকেই দেখেছে এর আগে। এর আগে কবার এসেছেন মেসে। এদের সংগে আলাপ হয়েছে। নিকট থেকে এদের বুঝবার সুযোগ সন্তোষ পায়নি। এই কুড়ি দিনে এরা যেন তার আপনার জনের মতো মনের কোণে ঠাঁই করে নিয়েছে।

—আজকেই চলে যাচ্ছেন ? জিজ্ঞাসা করলে চঞ্চল।

—হ্যাঁ ভাই আর থাকলে চলবে না। হাতে আর ছুটি নেই। বলল সন্তোষ।

—আপনার সংগে আলাপ করে আমার খুব ভাল লাগল। কলকাতায় এলে দেখা করবেন। পরীক্ষার খবর দেবেন।

—নিশ্চয় দেখা করব। আর পরীক্ষার খবর ঠিকই পাবে।

আচ্ছা একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন ?

—কি প্রশ্ন ?

আজকাল মানুষ প্রাণখুলে মিশতে পারে না কেন বলতে পারেন ?

হাসল সন্তোষ।—তার কারণ আমরা আজকাল আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছি। আমরা নিজেদের স্বার্থের কথায় চিন্তা করি বেশী। তাই অন্যের সংগে প্রাণ খুলে মিশতে পারি না। বলল সন্তোষ।

ঠিকই বলেছেন। আজকের মানুষ বড় স্বার্থপর। বিশেষ করে শহরের মানুষ।

সন্তোষ বুঝতে পারল চঞ্চল শহরে থাকলেও সে গ্রামের মানুষ। তাই গ্রাম্য সরলতার ছাপ তার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এটা কি থাকবে ? হয়তো না। একদিন এও স্বার্থপর হয়ে যাবে। সরলতাকে ফেলবে হারিয়ে।

—চঞ্চল!

—কিছু বলবেন ?

—আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?

—বলুন, নিশ্চয় রাখব।

—তুমি যেখানেই থাক না কেন এই আন্তরিকতাকে নষ্ট কোরো না। ওটা জীবনের সম্পদ। ওটাকে হারালে আমাদের আর কি থাকল ?

—কথা দিলাম। চঞ্চল আর কোন কথা বলল না। ওর ভাববাদী মন গভীর সমুদ্রে ডুব দিল।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। দশটা বাজে। এবার উঠতে হবে। গুছিয়ে নিতে হবে সব। এখানে এসে ও সব খুলে দিয়েছিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। এবার গুটিয়ে নেবার পালা।

—সন্তোষ। ডাকলেন অজয়বাবু।

—কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ—তোমার সংগে একটা কথা ছিল।

—বলুন।

—ভিতরে চলো।

সন্তোষ অজয়বাবুর সংগে ভিতরে গেল। বসলো খাটির ওপর। অজয়বাবুও বসে পড়লেন।

—আমার একটা কথা রাখবে ?

সন্তোষ একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। কি এমন কথা যার জন্য অজয়বাবু তাকে ভিতরে নিয়ে এলেন!

—তোমাকে আমার খুব ভাললাগে। দেখ সংসারটা বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে লাজলজ্জা করলে চলে না।

—জানি।

—তোমার বাবার সংগে আমার পরিচয়। ছোটো বেলা থেকে তোমাকে দেখে আসছি। একদিন আমার অবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু আজ সব গেছে। কোন রকমে বেঁচে আছি মাত্র।

সন্তোষ লক্ষ্য করল অজয়বাবুর চোখ দুটো চিক্ চিক্ করছে।

—কাকাবাবু! ছেলেবেলা থেকে সন্তোষ অজয়বাবুকে কাকাবাবু বলেই সম্বোধন করে।

—তুমি তো শিক্ষিত ছেলে। সব জান। সব বোঝ। তোমাকে আর কি বলব। শুধু একটি মাত্র প্রার্থনা যদি ভারতীর দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নাও। আমি জানি তোমার মত হলেই হবে।

সন্তোষ কোন কথা বলতে পারল না। কি উত্তর দেবে ও! ও আশা করেনি অজয়বাবু আজ হঠাৎ তার কাছে এই প্রস্তাব করে বসবেন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁকে দেখে আসছে ও। উনি তার স্বজাতি। সুতরাং একটা অন্তরংগ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাদের সংগে। ও জানে অজয়বাবুর মনের গোপন ইচ্ছাটা বহুদিন থেকে পাক খাচ্ছে মনের মধ্যে। তিনি ওর পিতার কাছে প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু সন্তোষের মত না থাকায় তা আর কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। আজ অজয়বাবুর কাছে সন্তোষকে উত্তর দিতে হবে হ্যাঁ—অথবা না। কিন্তু ও কি ক'রে না বলবে মুখের ওপর। সুতরাং ওকে বলতে হল—আমাকে সময় দিন কাকাবাবু। বাড়ী গিয়ে সব জানাব।

বুদ্ধিমান্ অজয়বাবু সবই বুঝলেন। আর কোন কথা বললেন না তিনি। বরঞ্চ নিজে মনে মনে লজ্জিত হলেন। নিজেকে হয়তো ছোট মনে করলেন। সন্তোষ উঠে পড়ল। অজয়বাবুও উঠে পড়লেন, আর কোন কথা হল না।

যাবার সময় ঘনিয়ে এল। বেডিং ও সুটকেশ গুছিয়ে নিল সন্তোষ। সেদিন রবিবার। তাই দাদুর ছুটি। মেস থেকে বার হননি আজ। সন্তোষের সংগে কোন কথাও বলেননি। অথচ দিনের কর্ম সবই তিনি করেছেন মুখ বুঁজে।

—আসি দাদু। আপনাদের সংগে কাটিয়ে আনন্দ পেলাম। আর বিশেষ করে আপনাকে আরও ভাল লাগল।—বলল সন্তোষ।

—চললে। বেশ! তোমাকেও ভাল লাগল ভাই। তোমার মত মন খুব কম দেখা যায়। আর আর কিছু ভাল লাগে না। এ জগৎ ছেড়ে চলে যেতে পারলে বেঁচে যাই। কিন্তু রাধারাণী তো কৃপা করছেন না। কপালে যে কত কষ্ট আছে কে জানে!

—না—না—ওসব কথা বলবেন না। দুঃখকে ভুলে যাওয়ার মধ্যেই তো প্রকৃত আনন্দ। আলোর পাশে অন্ধকার থাকবেই। সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করল সন্তোষ।

—ঠিকই বলেছ। তবুও ভুলতে পারি কৈ? বার বার সেই কথা মনে হয়। অলোক যদি বেঁচে থাকত; তাহলে কি আমাকে আজ খেটে খেতে হতো? আমার দুর্ভাগ্য।

—দাদু, যে গেছে তার কথা চিন্তা করে অকারণ দুঃখ পাচ্ছেন। রাধারাণীর কথা চিন্তা করুন। শেষ বয়সে আর তো কামনা নেই আপনার। রাধারাণী মুক্তি দেবেন আপনাকে।

—ঠিক বলেছো! ঠিক বলেছো তুমি। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তুমি সুখী হও। তোমার কল্যাণ হোক।

সন্তোষ দাদুর মুখের দিকে তাকাল। দেখল দাদুর চোখ দুটো চিক্ চিক্ করছে। এ জল আনন্দের। সন্তোষের তাই মনে হল।

সময় হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখল সন্তোষ। আর দেরী করলে চলবে না। বাইরে রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। ও মাথা নত করল।

দাদুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল সন্তোষ।

—কল্যাণ হোক তোমার। আশীর্বাদ করলেন তিনি।

বেডিং আর সুটকেশটা তুলে দিল রিক্সায়। উঠে বসল সন্তোষ।

—চলি দাদু।

—ও কথা বলতে নেই ভাই। বলতে হয় আসি। —আবার আসবে—কেমন।

—আসব। কথা দিল সন্তোষ।

রিক্সা চলতে লাগল কলকাতার পিচ ঢালা শক্ত পথ দিয়ে। রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওই মেস বাড়ীটা আর দাদুও।

—কিন্তু সন্তোষের মাথায় বারবার ঘুরতে লাগল ঐ একটি মাত্র কথা।—অলোক যদি বেঁচে থাকত তাহলে কি আমাকে আজ খেটে খেতে হত? আমার দুর্ভাগ্য!

সামনের ট্যাক্সিটা আর্তনাদ করে রিক্সার পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গেল।

ভারতবর্ষের গণ তান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিক শিক্ষা পরিকল্পনা

শ্রীসমর দত্ত

বর্ত্তমানে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন এক বিশেষ পর্য্যায়ে উপনীত হয়েছে বলা চলে। তাই এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত বলে কিছু মন্তব্য নিবেদন করলাম।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিশেষ ভাবে স্বীকৃত ও সমর্থিত। সেই জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রমিকগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশই আগ্রহী। কারণ গণতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী, দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন এবং শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নই যে শ্রমিক জীবনের মান উন্নয়নে সক্ষম গণতন্ত্র সম্মত সমাজ ব্যবস্থায় সেই কথাটি পরিস্ফুট। শুধু তাই নয়। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এ কথাও বলা হ'য়ে থাকে যে দেশের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য পরিকল্পনার প্রতি এই ধরণের ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থন ও সহযোগিতা জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি কেমন ক'রে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে যদি না ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্যগণের মনপ্রাণ শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। এই প্রশ্নের উত্তরে পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শ্রমিক-শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের বিধান দিয়াছে।

শ্রমিক শিক্ষার রীতিনীতি সম্বন্ধে মতামত ও পরামর্শ দেবার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় শ্রমিক শিক্ষা বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে এই কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি ঐ বছরের মার্চ মাসে প্রথম রিপোর্ট পেশ করে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে এই কমিটির শ্রমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সুপারিশগুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হয়। ঐ সুপারিশগুলির ভিত্তিতে শ্রমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা রচিত হয় তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় যে :—

'...... to create over a period of time, despite lack of general education, a well-informed, constractive and responsible minded industrial labour force capable of organising and running trade unions on sound lines without leaning heavily on outsiders and without lending themselves to texaploitation by eatraneous interests'.

এই পরিকল্পনাটি তিনটি স্তরে সমাপ্ত। পরিকল্পনাটি অনুসারে শ্রমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্ম সম্পাদনার প্রথম স্তরের ব্যক্তিদের বলা হয় শিক্ষা অধিকারক (Teacher Administrator) অথবা (Education officer)। সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে যারা স্নাতকোত্তর কেবল মাত্র তারাই শিক্ষা অধিকারক হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। শিক্ষা অধিকারকের পদে নিযুক্ত হবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থীগণকে কমপক্ষে ছয় মাস কাল শ্রমবিদ্যার কলা কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে হয়। তারপর বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে শ্রমিক সাধারণকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষা অধিকারকগণকে পাঠানো হয়। বিভিন্ন কল কারখানা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিককে এই আঞ্চলিক কেন্দ্র গুলিতে শিক্ষা-নবীশ রূপে পাঠানো হয়। শিক্ষা অধিকারকগণের তিন মাস শিক্ষা লাভের পর প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, তারা শ্রমিক-শিক্ষক পদে নিযুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। এই অবস্থাটা হ'ল দ্বিতীয় স্তর।

দ্বিতীয় স্তরে শ্রমিক শিক্ষকগণ নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে

ফিরে এসে শ্রমিক শিক্ষার কাজে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (unit level class) মাধ্যমে তারা শিক্ষা সম্বন্ধীয় কর্ম পরিচালনা করে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি আঞ্চলিক শ্রমিক শিক্ষা পরিষদের (Regional Workers Education Board) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

তারপর তৃতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে আঞ্চলিক পর্ষদের প্রতিনিধিগণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকদের কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সে সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে শ্রমিক শিক্ষকগণকে প্রয়োজন মত উপদেশ দেয় ও সাহায্য করে।

উল্লিখিত তিনটি স্তরে প্রদত্ত শিক্ষার পাঠ্য বিষয়বস্তু কেন্দ্রীয় পর্ষদ কর্তৃক গঠিত একটি বিশেষ উপ-সমিতি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। নির্দ্ধারিত পাঠ্য বিষয় বস্তু বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকগণের শিক্ষার উপযোগী হ'ল কিনা তা আঞ্চলিক পর্ষদ পরীক্ষা ক'রে দেখে নেয়। শ্রমিক-শিক্ষকগণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় শ্রমিক-শিক্ষা সম্পর্কিত পুস্তক রচনারও ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প-সংস্থা শ্রমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্রীয় শ্রমিক শিক্ষা পর্ষদ আর্থিক সাহায্যদানেরও ব্যবস্থা করেছে। নূতন দিল্লীর Adult Education Society এবং বম্বের মিল মজদুর সঙ্ঘকে এই পর্ষদ যথাক্রমে দশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দিয়াছে।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বম্বেতে শিক্ষা অধিকারকগণের প্রথম ট্রেনিং কোর্স সুরু হয়। দ্বিতীয় কোর্স সুরু হয় কলকাতায় ১৯৫৯-৬০ সালে। তৃতীয় কোর্স সুরু হয় আবার বম্বেতে ১৯৬১ সালে। প্রথম ট্রেনিং কোর্স আরম্ভ হয় ১৩টি কেন্দ্রে। যথা :—

(১) ইন্দোর (২) দিল্লী (৩) হায়দ্রাবাদ (৪) ধানবাদ (৫) ক'লকাতা (৬) বম্বে (৭) বাঙ্গালোর (৮) কানপুর (৯) আলুয়াই (১০) নাগপুর (১১) মাদ্রাজ (১২) যমুনা নগর এবং (১৩) তিনসুকিয়া।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ১৮৬৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫১৪৯টি দলে ১,০৮,৯৫৪ জন শ্রমিককে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে কতকগুলি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা চক্রে ১১০ জন ডেলিগেট প্রতিনিধিত্ব করে। আলোচনা চক্রটিতে গৃহীত মত অনুসারে কেন্দ্রীয় পরিষদ আঞ্চলিক পরিষদগুলিকে (ক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পাঞ্চলে অস্থায়ী উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য (খ) আঞ্চলিক এবং উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির শ্রমিক শিক্ষকগণকে মাসিক ২০ টাকা থেকে ৪০ টাকা পারিশ্রমিক দেবার জন্য (গ) বিদ্যমান কেন্দ্রগুলিকে আবাসিক কেন্দ্রে পরিণত করবার জন্য অথবা নূতন নূতন আবাসিক কেন্দ্র গঠন করবার জন্য এবং (ঘ) নূতন নূতন স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নির্দ্দেশ দেয়।

এই নির্দ্দেশগুলি অনুসারে নাগপুর কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে আকোলা, মাদ্রাজ, কয়েমবাটুর এবং দিল্লীতে শ্রমিক শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে নাগপুরের নিকটবর্ত্তী কাদরী খনি অঞ্চলে নির্ব্বাচিত শ্রমিকদের, সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীদের এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের ট্রেনিং-এর জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যক্রম প্রবর্ত্তিত হয়। পরবর্ত্তীকালে এই পাঠ্যক্রম বাঙ্গালোর এবং ক'লকাতার কেন্দ্রগুলিতেও প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে India Telephone Industries Ltd এবং Government Porcelain Factories Ltd এর কর্ম্মচারীদের জন্য বাঙ্গালোর কেন্দ্রের উদ্যোগে দু'টি স্বল্প-মেয়াদী পাঠ্যক্রম (two short term courses) প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ মাসেই ক'লকাতা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় Jay Engineering Works Ltd এবং Bharat Woolen Mills Ltd-এর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যবৃন্দের ট্রেনিংএর জন্য আর একটি স্বল্পমেয়াদী পাঠ্যক্রম প্রবর্ত্তিত হয়। বিভিন্ন কয়লা খনি অঞ্চলে প্রচলিত শ্রমিককল্যাণ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে এবং Employment Exchangeগুলির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত টেক্‌নিকাল স্কুলগুলিকে আলোচ্য শ্রমিকশিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে নেবার চেষ্টা চলেছে। এতদ্ব্যতীত একটি কেন্দ্রীয় শ্রমিকশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শ্রমিক শিক্ষার জন্য দু'কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ঐ পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয় যে প্রতি বছরে ৪টি ক'রে নূতন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হ'বে। এই ৪টি কেন্দ্রের মধ্যে দু'টি হ'বে আবাসিক। এই ধরণের কেন্দ্রে এক বৎসর মেয়াদী একটি কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষা অধিকারকগণকে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা থাকবে। শ্রমিক শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার অগ্রগতির জন্য দেশের ট্রেড ইউনিয়ন এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্য্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য দানের কথাও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ঐ পরিকল্পনায় এ কথারও উল্লেখ আছে যে ১৯৬৬ সালের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হ'বে। প্রত্যেকটি শিক্ষাকেন্দ্রে বাৎসরিক ৭৫টি অথবা তদূর্দ্ধ কর্মচারীকে শ্রমিক শিক্ষকরূপে গড়ে তুলতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় আনুমানিক এক হাজার শ্রমিকশিক্ষক এক হাজারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা ক'রে প্রতি বছরে এক লক্ষ অথবা তদূর্দ্ধ শ্রমিককে শিক্ষিত ক'রে তুলতে সক্ষম হ'বে। International Labour Organisationএর অন্যতম কর্মকর্তা এবং শিকাগোর Roosevelt Universityর অর্থনীতির অধ্যাপক Dr. Charles Orr ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন ক'রে এ দেশের শ্রমিক শিক্ষা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য বহু মূল্যবান্ মতামত জ্ঞাপন করেন।

শিক্ষা সমাপনান্তে বিভিন্ন কলকারখানা এবং উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন ক'রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের কথাও এই শ্রমিকশিক্ষা পরিকল্পনায় বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। যথাসময়ে শ্রমিকগণকে ভাক্রা-নাঙ্গাল, হিন্দুস্থান ষ্টীল প্ল্যান্ট, ভিলাই ইস্পাত উৎপাদন প্রকল্প, দুর্গাপুর কোকচুল্লী, বিভিন্ন তৈল শোধন কেন্দ্র এবং এই ধরণের আরো অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদর্শনের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হয়। এমনিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং আপন কর্ম্ম সম্পাদনে নূতন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতালব্ধ শ্রমিকগণই যে নব-ভারতের শিল্প রূপায়ণে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হ'বে এবং যুগপৎ সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ন্যায় সঙ্গত দাবী-দাওয়া আদায় ক'রে নিতে সক্ষম হ'বে—এই রকম ধারণা পোষণ করা ভুল হ'বে ব'লে মনে হয় না।

কিন্তু তবুও একটা কথা থেকে যায় এবং সেই কথাটি এই প্রসঙ্গে বলা অযৌক্তিক হ'বেনা বলেই মনে হয়। যদি এ দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে পারস্পরিক বহাল এবং বৈরিতা প্রতিনিয়ত চলতে থাকে, যদি রাজনৈতিক কারণবশতঃ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি একতাবদ্ধ হ'তে না পারে এবং যদি ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনাটিকে পূর্ণোত্তম সমর্থন না করে তাহলে এই পরিকল্পনা অনুসারে শ্রমিক শিক্ষার ফলাফল উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং আশাপ্রদ না হওয়াই স্বাভাবিক। সেই কারণে ভারতবর্ষের স্বনামখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের উচিত তাঁদের হৃদয় অনুসন্ধান করা এবং যতদূর সম্ভব এক মন এক প্রাণ হ'য়ে শ্রমিক-শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থে এই শিক্ষা পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করা। সরকারী উদ্যোগে এ সম্বন্ধে যা কিছুই করা হোক্ না কেন, পরিকল্পনাটির সার্থক রূপায়ণ দেশের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সমর্থন এবং কার্য্যকরী ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল। সেই জন্য শ্রমিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন এলাকায় বহিরাগত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়। অতীতে বহু বহিরাগত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে যোগসূত্র হিস'বে ট্রেড ইউনিয়ন এলাকায় বহু কাজ ক'রে শ্রমিক শ্রেণীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। বর্ত্তমানেও বহু নেতা বহিরাগত হ'য়েও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থেকে শ্রমিক কল্যাণকর কর্ম্মে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। অবশ্য এর জন্য তাঁদের বহু বিদ্রূপ ও বক্রোক্তি সহ্য করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তথাপি তাঁরা শ্রমিকগণের সার্ব্বিক কল্যাণের জন্য অকম্পিত বিশ্বাসে সুনির্দ্দিষ্ট পথ ধরে চলেছেন। তারা জানেন যে বহুলোকের কথার ধুলোর তলায় কর্ম্মীর সত্যকার পরিচয় সাময়িক চাপা পড়ে যায়। ধুলোর আস্তরণ সরে গেলে কর্ম্মীর প্রকৃত পরিচয় অসংখ্য মানুষের চোখের সামনে আবার উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

যাই হোক্, পরিকল্পিত অর্থনীতির সাহায্যে নূতন ভারতবর্ষ গঠনের কাজে এদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে হ'লে এমন একদল ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীর প্রয়োজন যারা শ্রমিক আইন, অর্থনীতি, জাতীয় অর্থনীতির পশ্চাদ্ভূমি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা, হিসাব (Accounts) ও হিসাব পরীক্ষা (Auditing), বেতন নির্দ্ধারণ ও পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্থিরীকরণ এবং মালিক ও সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের যুক্তিসঙ্গত দাবীদাওয়া আদায় ক'রে নেবার কলাকৌশল সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে সমর্থ হবে। পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লব্ধ এই রকম একদল ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীর যখন আবির্ভাব হ'বে শুধু তখনই ট্রেড ইউনিয়ন এলাকা থেকে বহিরাগতের বিদায় নেওয়ার প্রশ্ন ওঠা যুক্তিসঙ্গত হ'বে—তার আগে নয়। কিন্তু সেদিন এখনও অনেক দূরে।

চারণ-কবি ডি. এল. রায়

শ্রীদুর্গাদাস হাজরা

কবি ও নাট্যকার হিসাবে যদিও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সমধিক পরিচিত কিন্তু তবুও ইনি শুধু কবি নন—চারণ কবি। ডি, এল, রায় নামেই ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত।

কৃষ্ণনগর সিটি স্টেশনে নেমে শহরের দিকে এগুলে স্টেশনের প্রায় কাছেই ঠিক ডানদিকে পিচের রাস্তার ধার ঘেসে চিহ্নিত করা যে ভূমিখণ্ড আছে, সেইটাই হ'ল কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমি।

নদিয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর মহারাজ সতীশচন্দ্রের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পুত্র হলেন—দ্বিজেন্দ্র লাল রায়। বাংলা ১২৭০ সালের ৪ঠা শ্রাবণ (ইংরেজি ১৮৬৩ সালের ১৯শে জুলাই) দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বৎসর বয়সে তিনি স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন। পরে কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। স্কুলের ছাত্র জীবনে তিনি অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বরাবরই প্রথম হতেন। এই স্কুলজীবন থেকেই তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ হয়। অনেক ছোট বেলা থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। সেই সময় তাঁর ছেলে বেলায় (১২ থেকে ১৭ ছবরের মধ্যে) রচিত 'আর্য্যগাথা' প্রকাশিত হয়। কবিতা লিখা ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল ভাল গান গাইতে পারতেন। ইহার অন্যতম কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মসূত্রেই সঙ্গীতানুরাগ লাভ করেছিলেন। তাঁহার পিতা সঙ্গীতের একজন একনিষ্ঠ সাধক ও সুগায়ক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার এই সঙ্গীতপ্রিয়তার যোগ্য উত্তরাধিকারী। নিজে গান জানতেন বলেই হয়তো তিনি এতো গান রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সুকণ্ঠের জন্যে সকলে তাঁকে প্রশংসাও করতেন। মধুকবি বিদেশী সাহিত্য মন্থন করে একটা দেশী-বিদেশী সমন্বিত কাব্যাদর্শ স্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও সেইরূপ ইংরেজী ও বাংলা গানের সমন্বয়ে নূতন সুরে নূতন ভাষায় অজস্র হাসির গান ও স্বদেশী গান রচনা করিয়া যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ীভাবে অক্ষয়সম্মানের অধিকারী।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে এম, এ পাশ করেন। তারপর তিনি ছাপরা জেলার রাভেলগঞ্জে গিয়ে এক স্কুলে মাষ্টারি শুরু করেন। এই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন তাঁরই অগ্রজ নরেন্দ্রলাল। এখান থেকেই তিনি সরকারী বৃত্তিলাভ করে বিলেতে যাবার সুযোগ লাভ করেন এবং কৃষিবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করার জন্য বিলেত যান। লণ্ডনে থাকাকালিন দ্বিজেন্দ্রলাল "লিরিকস্ অফ ইণ্ড" নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলেত থেকে এফ, আর, এ, এস ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। সেই সময় সমুদ্র যাত্রা করলে, সমাজের অনুশাসনে পড়তে হতো, তাই দ্বিজেন্দ্রলালও হার গেলেন না। প্রায়শ্চিত্ত করার দাবি উঠল তাঁর। কিন্তু তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে স্বীকৃত হলেন না। ফলে তিনি হলেন একঘরে। এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময় থেকেই সমাজের উপর কশাঘাত করে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ভণ্ডামি, ভীরুতা ও কুসংস্কারের প্রতি তীব্র বিরক্তি তাহাতে অভিব্যক্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল চাহিয়াছিলেন জাতির কল্যাণ, সাহিত্যকেও মানব সাধারণের ভাবভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে। যাহা সর্বজনহৃদয়বেদ্য, যাহা সবল সুস্থচিত্তের পথ্য, যাহা মনের মোহ সৃষ্টি না করিয়া প্রাণে আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার করে, যাহার রস রামায়ণ-মহাভারতের কাব্য রসের মতো লোকায়ত—দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাকেই শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য প্রতিভা একদিন বাংলা দেশের নাট্যসাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল। বাঙালী দর্শকসমাজকে দিয়েছিল অফুরন্ত

নাট্যরসের আস্বাদ, কাব্যসাহিত্য দিয়েছিল প্রাণের স্পর্শ, ব্যঙ্গ কবিতা আর গান দুর্বল সমাজকে করেছিল কশাঘাত, স্বদেশী সংগীত জাগিয়ে তুলেছিল সারা দেশকে। তাঁর প্রথম নাটক "তারাবাঈ"। এই সময় থেকেই তিনি নাট্যকার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। এর পর তাঁর অনেক নাটক প্রকাশিত হয় একে একে :—দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, সিংহল বিজয়, বঙ্গনারী প্রভৃতি। প্রত্যেকটী নাটক এককালে ক'লকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে দিনের পর দিন অভিনীত হয়েছিল।

একাধারে কবি ও নাট্যকার, অন্যধারে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাই তিনি স্বাধীনতার অনেক আগেই আজকের কথাগুলি বলতে পেরেছিলেন—

ঘুচাতে চাস যদি রে এই হতাশাময় বর্তমান ;
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভাইএর প্রতি ভাইয়ের টান।

মাতৃমন্ত্রের উদ্‌গাতা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বদেশী সংগীতে সারা বাংলাদেশকে একদিন উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। দেশ-জননীকে তিনি সব চাইতে বেশি ভালবাসতেন। তাই তিনি এমন করে বলতে পেরেছিলেন—

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি
কৃপার পাত্রী ?
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

তা ছাড়া আরও গাইলেন—

এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না'ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি।

এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গান সকলেরই বিদিত। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গানে মুগ্ধ না হন এমন লোক বাংলা দেশে বিরল। বাঙ্গালী মহিমা, বৃদ্ধা-কুমারী-কাহিনী, ডেপুটী কাহিনী, প্রভৃতি কবিতা, মাদসা খাও, বদলে গেল মতটা, নতুন প্রেম প্রভৃতি হাসির গান তার প্রমাণ।

"নতুন কিছু করো,
একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো সব কাটো,
কানগুলো সব ছাঁটো ;
পাগুলো সব উঁচু করে,
মাথা দিয়ে হাঁটো"।

তারপর ওহে লম্পটবর এসো হে,
ওহে বকেশ্বর এসো হে,
ওহে কলমজীবী,—নভেল পাঠক—
ঘরে ঝাঁটা খেতে এসো হে

আরও সে আসে ধেয়ে এন ডি ঘোষের মেয়ে
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্—চায়ের গন্ধ পেয়ে।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। এই জন্য বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা দেশ কবির কাছে চিরঋণী। সব শেষে কবিকে স্মরণ করবো—তাঁরই মাতৃমন্ত্রে—

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

বাসাংসি জীর্ণানি : শক্তিপদ রাজগুরু

পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে যে দিন ভারত স্বাধীন হ'ল পরিবর্তনের নব নব সংঘাতের জন্যে তাকে প্রস্তুত হ'তে হলো। বাঙলার বুকে নেমে এল পুরাতনকে ভাসিয়ে নেওয়ার দুর্বার বন্যা। জীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ জমিদারী প্রথার অবসান হল। একটা অত্যাচারী সমাজের অবলুপ্তি ঘটল। বাঙলার গ্রাম-জীবনে একটা পরিবর্তনের ঘোরতর ঘনঘটা। আশে পাশে গড়ে উঠল শিল্পাঞ্চল। সুযোগ-সন্ধানীরা তার সুবিধা পুরা মাত্রায় গ্রহণ করল। তৈরী হল নূতন শোষক সম্প্রদায়—ব্যবসায়ীর দল। পুরাতন জমিদারদের হটিয়ে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে তাদের অভ্যুদয় ঘটল। লোভী লালসা-মাতাল তাদের মন। বাইরে কর্মীর ছদ্মবেশ। গ্রামের মানুষ উচ্ছিন্ন হল। শিল্পের যন্ত্রদানব তাদের হাজার বছরের মূল ছিন্ন করে নিয়ে গেল তার অগ্নিময় গহ্বরে। চাষী চাষ—কর্মকার তার কামারশাল ছেড়ে ছুটে গেল কারখানায়। গ্রামজীবনের শত শত বছরের গড়া বনিয়াদ কয়েক মুহূর্তে যেন চূর্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু চূর্ণ হয়ে যেতে দেয় নি একদল মানুষ। দুর্গাপুরের কাছের একটি গ্রামের মানুষ। গ্রামকে ধ্বংস হতে তারা দেয় নি। তারা গ্রামকে ভালবাসে এমন কয়টি মানুষকে নিয়ে সৃষ্ট করল সমবায়—রিক্ত মানুষদের ক্ষীণ শক্তিকে প্রবল জীবনোন্মাদনায় রূপান্তরিত করল—পরিত্যক্ত গ্রামের জমিতে ফুটিয়ে তুলল আবার সোনার ধান। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে ফিরিয়ে আনল আলোর ঝরণা ধারা। মানুষের সমবেত প্রয়াসে বিশ্বাসী অশোক, শিখা, এমো কালী, নারাণ ঠাকুর, মিষ্টি কোহার, অবিনাশ বায়েন, যুগের সংঘাতকে পরাভূত করে—মানুষের কাছে বেঁচে থাকার আশা—উদ্দীপনা সৃষ্টি করে জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে শক্তিমান ঔপন্যাসিকের অনুপ্রাণিত কাহিনীতে। এ-গ্রন্থের বহুলপ্রচার সংকটের সম্মুখীন দেশবাসীর কল্যাণার্থেই একান্ত আবশ্যক।

সাধারণ মানুষ, দেশ সেবী, জননায়ক প্রত্যেকের কাছে প্রশংসা ও স্বীকৃতির দাবী রাখে শক্তিপদবাবুর 'বাসাংসি জীর্ণানি'।

[প্রকাশক:—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩-১-১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৪৲ টাকা মাত্র।]

সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন : ডঃ বাণী চক্রবর্তী

ডক্টর শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত গবেষণাগ্রন্থ "সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন" পাঠ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। ইহাতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও প্রাঞ্জল-ভাষায় উহার প্রকাশ করিয়া লেখিকা সাধারণের নিকট রঘুনন্দনকে সমাজসংস্কারকরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি অধ্যায়ে লেখিকা স্মৃতিশাস্ত্রের ইতিহাস, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির সহিত উহার সম্পর্ক, প্রাক্-রঘুনন্দনযুগে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বঙ্গীয় স্মৃতিকারগণের দানের কথা বলিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে রঘুনন্দনের আবির্ভাব কাল, তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়, তাঁহার শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গ্রন্থকর্ত্রী স্মৃতি-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তত্ত্বগুলির রচনায় পৌর্বাপর্য নিরূপণ করিয়াছেন। শেষের তিনটি অধ্যায়ে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্তমূলক তত্ত্বগুলির উৎকর্ষখ্যাপক অতি-সূক্ষ্মদৃষ্টি পূর্ণ এবং প্রচুর সংস্কৃত উদ্ধৃতি সম্বলিত আলোচনা প্রশংসার যোগ্য। সমগ্র পুস্তকখানিতে লেখিকা সার্থক ভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন যে রঘুনন্দন প্রকৃত সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, সমাজসংহারক নহেন।

রঘুনন্দনের তত্ত্বগুলিতে পরমতখণ্ডন পূর্বক স্বমত-স্থাপনের জন্য মীমাংসাশাস্ত্রের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। সাধারণ পাঠার্থীর পক্ষে মীমাংসাশাস্ত্রের আলোচনা দুরূহ। তাই ডক্টর চক্রবর্তী প্রাঞ্জল ভাষায় এই অদ্বিতীয় সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাধারণের পক্ষে রঘুনন্দনের বৈশিষ্ট্য,

তাঁহার উদারতা, সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষার কঠোরতা, তাঁহার যুক্তির দৃঢ়তা প্রভৃতি সহজবোধ্য করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নকারী, সমালোচনাকারী এবং সমাজসংস্কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইবে এবং পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে।

আরও উল্লেখযোগ্য যে ভট্টপল্লীনিবাসী ধর্মশাস্ত্র-অধ্যক্ষ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ স্মৃতিবাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়াছেন।

[প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম্, লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, মূল্য—৭'৭৫।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

শ্রীশ্রীদেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী—

পূর্বভাগ ও উত্তর ভাগ। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী কাঠিয়া বাবা তর্ক তর্ক ব্যাকরণতীর্থ বিরচিত। এই দুই খণ্ড গ্রন্থপাঠ করিলে দেবর্ষি নারদের মহত্ত্ব ও তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। সাধারণতঃ দেবর্ষি নারদকে একজন কলহপ্রিয় দিব্যপুরুষ বলিয়া মনে করা হয়, বস্তুতঃ তিনি যে কত বড় জ্ঞানী এবং বিশ্ব সংসারের কত মঙ্গল বিধানকারী তাহা এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়।

নানা পুরাণ হইতে সঙ্কলন করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায়—এই দেবর্ষি কথিত উপদেশ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৃহদাকার গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে অণুমাত্র ক্লান্তি বোধ না হইয়া সানন্দে সমাপ্তি পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়। ঘটনাগুলির সহিত উপদেশাবলী এমন ভাবে সাজান হইয়াছে যে—উপদেশের শুষ্কতা মোটেই অনুভূত হয় না। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে,—প্রত্যেক উপদেশের তাৎপর্য্য বিশেষ ভাবে বিবৃত হওয়ায় নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতবাদ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এই গ্রন্থটি একটী গবেষণাত্মক বিরাট সংগ্রহ পুস্তক হইলেও ইহার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব বহুস্থানে বিশেষভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'সর্বভূতের মধ্যে শ্রীহরিই অবস্থান করিতেছেন জানিয়া সর্বপ্রাণীতে অহিংসাবলম্বন' বা 'যোগক্ষেমের জন্য চেষ্টা না করিয়া সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানে নির্ভরতা ও সদা সন্তোষ অবলম্বন'—'আত্মস্বরূপ ও আত্মানাত্মস্বরূপ বর্ণনা'—'ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈতের উপদেশ'—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির মহিমা'—এই সমস্তই নারদের উপদেশের অন্তর্গত।

যাঁহাদের সমস্ত পুরাণ পাঠের সময় হয় না, তাঁহাদের পক্ষে এই অপূর্ব সঙ্কলন গ্রন্থ বহু পুরাণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও রসাস্বাদ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে। এই গ্রন্থ এক অমূল্য-নিধিরূপে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হউক, ইহাই কামনা করি। মহন্ত শ্রীশ্রীধনঞ্জয় দাসজীর ইহা এক অমর অবদান,—ইহা বঙ্গ সাহিত্যকে এবং বঙ্গবাসিগণের প্রাণকে অলঙ্কৃত, ও সঞ্জীবিত করিবে,—ইহা আমার বিশ্বাস।

ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ
অধ্যক্ষ, ভাটপাড়া সংস্কৃত কলেজ
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুরাগে রাঙা : শ্রীজগদীশ প্রসাদ দাশ

রাঙামাটী গ্রাম। পরম বৈষ্ণব বংশীদাসের কন্যা কমললতার সঙ্গে নবগোপালের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের প্রেম। এ প্রেম যেন যমুনাতীরের রাধা-কৃষ্ণের লীলা রসের স্নিগ্ধ আবেশ সৃষ্টি করে রাঙামাটী আর চম্পাবতীর শ্যামল পল্লবঘেরা কুটীরে কমললতা ও নবগোপালের কীর্তন সুরের ঝঙ্কারে কিন্তু নবগোপালের পিতৃঋণ শোধ করতে গিয়ে তাকে ঘরবাড়ী সব ছেড়ে দিয়ে চম্পাবতীতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় মামার কুটিরে। কমললতা বা বংশীদাসের সাহায্য নিতে রাজী হয় না নবগোপাল। চম্পাবতীতে এক আশ্চর্য সুযোগ মিলে নবগোপালের। রেডিও কোম্পানীর অনুপমবাবু তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নিয়ে আসে তাকে কোলকাতায় এখানে নবগোপালের সফলতার অন্ত নেই। সে রেডিওতে, রেকর্ড কোম্পানিতে, জলসায় সর্বত্র প্রশংসা পায়, সম্মান পায়, অর্থ পায়, আরও পায় বন্দনার মত ধনবতী বেতার-শিল্পীর প্রেম। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার মনে আসে সং ছেড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বেরিয়ে পড়ার ডাক। সে ডাকে উতলা হয়ে পড়ে নবগোপাল—সে বন্দনাকে ডাকে তার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু বন্দনা কি পারে সমস্ত বৈভব, যশ, সম্ভোগের উপকরণ ফেলে তার সঙ্গে যেতে? নবগোপাল তাই একাই ফিরে যায় চম্পাবতী গ্রামে—যেখানে তার রয়েছে মা, মামা-মামী রয়েছে—ঘটনাচক্রে কমললতাও রয়েছে। নবগোপাল ফিরে পায় কমললতাকে তার কৃষ্ণপ্রেমের সাথীকে।

লেখক একটা কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। আজকের দিনের পাঠক-পাঠিকার কাছে তাকে অবাস্তব বলে মনে হতে পারে হয়ত কিন্তু লেখকের এই শিল্পকর্মকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

[প্রকাশক—শ্রীতারাপদ বসু। ১০১ কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট কলিকাতা-১২ মূল্য ২'৫০।]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যা
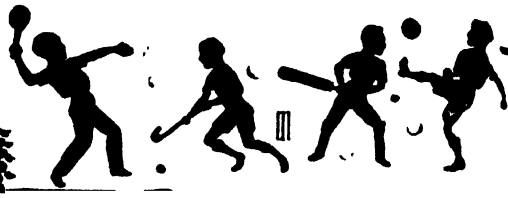
ক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
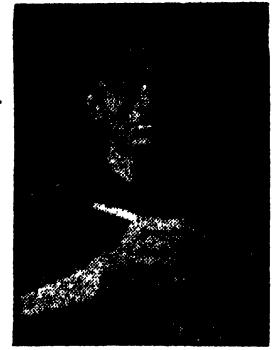
ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল:

১৯৬৭ সালের স্বল্পমেয়াদী (মে ৩ থেকে জুলাই ২২) ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সফরের মোট ২০টি খেলায় ভারতবর্ষের জয় মাত্র ৩, ড্র ১০ (এর মধ্যে বৃষ্টির জন্যে ৫টি খেলা পরিত্যক্ত) এবং পরাজয় ৭টি। কাউন্টি ক্রিকেট দলের বিপক্ষে ভারতবর্ষের একমাত্র জয়—ডার্বিসায়ারের বিপক্ষে ৬৬ রানে। ভারতবর্ষের ৭টি পরাজয়—তিনটি টেষ্ট ম্যাচ এবং চারটি কাউন্টি ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলা। ইংল্যাণ্ড প্রথম টেষ্টে ৬ উইকেটে, দ্বিতীয় টেষ্টে এক ইনিংস ও ১২৪ রানে এবং তৃতীয় টেষ্টে ১৩২ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়। অপরদিকে এই চারটি কাউন্টি ক্রিকেট দল—কেণ্ট ৭১ রানে, সারে ৮ রানে, ইয়র্কসায়ার এক ইনিংস ও ৬ রানে এবং লিষ্টারসায়ার ৭ উইকেটে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে। ১৯৬৭ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে এক ইনিংসের খেলায় ভারতীয় দলের সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ৬৩ (বিপক্ষে লিষ্টারসায়ার কাউন্টি দল)। ভারতীয় দলের এই শোচনীয় ব্যর্থতার প্রধান কারণ—বৃষ্টিপাত, আঘাত পেয়ে খেলোয়াড়দের অকর্মণ্যতা এবং শারীরিক অসুস্থতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভারতীয় দলের অনুশীলনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড সফরের উদ্বোধন খেলা (মে ৩৫) থেকেই বৃষ্টিপাত সুরু হয়। সফরে উপর্যুপরি চারটে খেলা (৪র্থ থেকে ৭ম) বৃষ্টির জন্যে পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং ভারতীয় ক্রিকেট দল অনুশীলনের প্রয়োজনীয় সময়ই পায়নি। প্রবীণ টেষ্ট খেলোয়াড় চান্দু বোরদের ব্যর্থতায় সকলেই মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করেছিলাম। ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সুতরাং ইংল্যাণ্ড সফরে নবাগত তরুণ খেলোয়াড়দের মতই তিনি যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেবেন তা কেউ ভাবেননি। তিনটি টেষ্টের ইনিংসে বোরদের মোট রান দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৬০ (গড় ১০)। সফরে চন্দ্রশেখরই ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মহলকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিলেন। টেষ্টে ইংল্যাণ্ডের ৩৮টা উইকেটের মধ্যে ১৬টা উইকেট পান। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই শোচনীয় ব্যর্থতার জন্যে খেলোয়াড়রা যতখানি দায়ী তার থেকে বেশী দায়ী ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তারা। ইংল্যাণ্ডে বৃষ্টি-বাদলার সময় হল এই মে মাস। ১৯৬৭ সালের ক্রিকেট মরসুমে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের ইংল্যাণ্ড সফরের তালিকা এইভাবে তৈরী হয়েছিল—একদলের সফর শেষদিকে অপর দলের সফর আরম্ভ। সফরের সময় নিয়ে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের মধ্যে টস হয়। ভারতবর্ষ টসে জয়ী হয়েও প্রথম দিকের সফর (মে ৩—জুলাই ২২) বেছে নেয়। ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকর্তাদের এই সিদ্ধান্তের ফলেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের শোচনীয় ব্যর্থতা। জাতীয় সম্মানকে জলাঞ্জলি দিয়ে ১৯৬৭ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল যে ৯০০০ ষ্টার্লিং পাউণ্ড বৈদেশিক

মুদ্রা উপার্জন করে এনেছেন এটাই তাঁদের আত্মতুষ্টির প্রধান পাথেয়।

ভারতবর্ষের প্রাক্তন টেষ্ট খেলোয়াড় হেমু অধিকারীর পরিচালনায় ইংল্যাণ্ড সফররত ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল এপর্যন্ত ১১টি খেলায় অপরাজিত (জয় ৭ এবং খেলা ড্র ৪) থেকে ভারতবর্ষের বা মুখ রেখে খেলছে।

ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষ :

ইংল্যাণ্ড : ২২৮ রান (জন মারে ৭৭ এবং কেন ব্যারিংটন ৭৫ রান। প্রসন্ন ৫১ রানে ৩, চন্দ্রশেখর ৯৪ রানে ৩ এবং বেদী ৭৬ রানে ২ উইকেট)

ও ২০৩ রান (ব্রায়ান ক্লোজ ৪৭ এবং ডেনিস এ্যামিস ৪৫ রান। প্রসন্ন ৬০ রানে ৪, চন্দ্রশেখর ৪৩ রানে ৩ এবং বেদী ৬০ রানে ২ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ৯২ রান (ইঞ্জিনিয়ার ২৩ রান। ব্রাউন ১৭ রানে ৩, হবস ২৫ রানে ৩, ইলিংওয়ার্থ ১৩ রানে ২ এবং স্নো ২৯ রানে ২ উইকেট)।

ও ২৭৭ রান (অজিত ওয়াদেকার ৭০ এবং পতৌদি ৪৭ রান। ক্লোজ ৪ এবং ইলিংওয়ার্থ ৪ উইকেট)।

এজবাষ্টন মাঠে আয়োজিত ইংল্যাণ্ড-ভারতবর্ষের দশম অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের টেষ্ট সিরিজের শেষ তৃতীয় টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ১৩২ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে সিরিজের তিনটি টেষ্ট খেলাতেই জয়লাভের গৌরব লাভ করে। তৃতীয় দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের পনের মিনিট আগে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭৭ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ফলে ১৯৬১-৬২ সালের ভারত সফরে ইংল্যাণ্ড ০-২ খেলায় (ড্র ৩) ভারতবর্ষের কাছে ইংল্যাণ্ড পরাজিত হয়ে যে 'রাবার' সম্মান হাতছাড়া করেছিল তা একটি টেষ্ট সিরিজ (১৯৬৪ সালের টেষ্ট সিরিজের ফলাফল অমীমাংসিত ছিল) অপেক্ষার পর তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হল। ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের বিগত দশটি টেষ্ট সিরিজের ফলাফল বর্তমানে দাঁড়িয়েছে— ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৭, ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় ১ এবং 'রাবার' অমীমাংসিত ২ বার (১৯৫১-৫২ এবং ১৯৬৪০)। উভয় দেশের এই দশটি টেষ্ট সিরিজের ৩৭টি টেষ্ট খেলার ফলাফল—ইংল্যাণ্ডের জয় ১৮, ভারতবর্ষের জয় ৩ এবং খেলা অমীমাংসিত ১৬ বার।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের আলোচ্য তৃতীয় টেষ্টে মাত্র ৯২ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। এই নিয়ে সরকারী টেষ্ট ক্রিকেটে একশত রানের নীচে ভারতবর্ষের এক ইনিংসের খেলা শেষ হল দশবার—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পাঁচবার, অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনবার, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে একবার ক'রে।

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড় :

ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ইংল্যাণ্ডের বয়কট উভয় দেশের পক্ষে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন (২৭৭ রান ও গড় ১৩৮'৫০)। ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাটিংয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছেন পতৌদির নবাব (মোট রান ২৬৯ এবং গড় ৪৪'৮৩)। উভয় দেশের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন ইংল্যাণ্ডের কেন ব্যারিংটন (৩২৪ রান ও গড় ৬৪'৮০)।

বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ইংল্যাণ্ডের রে ইলিংওয়ার্থ উভয় দেশের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন (২৬৩ রানে ২০ উইকেট এবং গড় ১৩'১৫)। তিনি উভয় দেশের পক্ষে এই সিরিজে সর্বাধিক উইকেট লাভেরও সম্মান লাভ করেছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান এবং সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন বি চন্দ্রশেখর (৪৩৫ রানে ১৬টা উইকেট এবং গড় ২৭'১৮)।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন তিনজন—জিওফ বয়কট নট আউট ২৪৬ রান (লিডস), বেসিল ডি'ওলিভেরা ১০৯ রান (লিডস) এবং টম গ্রেভনী ১৫১ রান (লর্ডস)। অপরদিকে ভারতবর্ষের মাত্র একটা সেঞ্চুরী—পতৌদির নবাব ১৪৮ রান (লিডস)।

ডেভিস কাপ :

১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক পর্যায়ের খেলা প্রায় শেষ হয়েছে, শুধু বাকি এশিয়ান জোনের। ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপের ফাইনালে ওঠে বাছাই দেশ স্পেন

প্রতিযোগিতায় অবাছাই দেশ রাশিয়াকে পরাজিত করেছে। অপরদিকে 'বি' গ্রুপের ফাইনালে ৫নং বাছাই দক্ষিণ আফ্রিকা ৫-০ খেলায় ১নং বাছাই ব্রেজিলকে পরাজিত করেছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত খেলোয়াড় বব্ হিউইট বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা এবং সেই সূত্রে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে খেলেছিলেন। তাঁর যোগদানেই দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে এই জয় সম্ভব হয়েছে। আমেরিকান জোনের ফাইনালে ইকোয়েডার অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৬৩ সালের ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকাকে পরাজিত করেছে। এরপর ইণ্টার জোন সেমি-ফাইনালের একদিকে খেলবে স্পেন এবং ইকোয়েডার এবং অপরদিকের সেমি-ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এশিয়ান জোন বিজয়ী দেশ। এশিয়ান জোনের ফাইনালে খেলবে ভারতবর্ষ এবং জাপান।
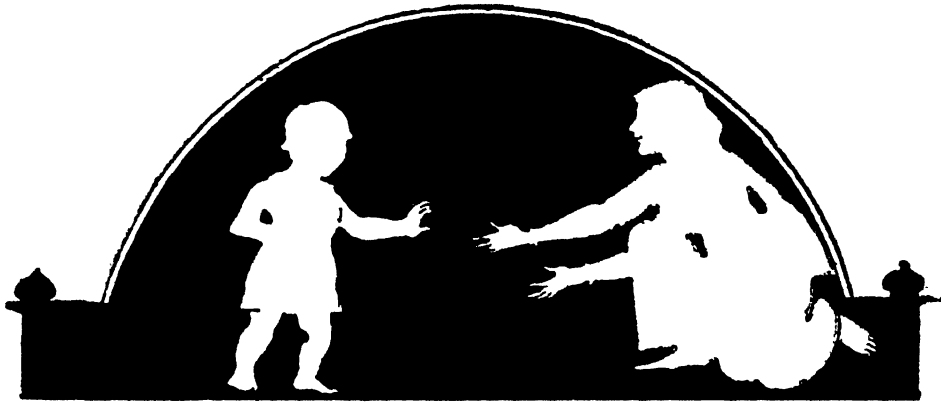
সম্পাদকদ্বয়—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

অক্ষরে অক্ষরে

সতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ডাকাত, পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা বলেন কি? দাম—পাঁচ টাকা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

আধুনিকতম উপন্যাস

সরোবর

সবেমাত্র প্রকাশিত হ'ল

অভাবগ্রস্ত একটি ছোট্ট সংসার—তার তরুণ দম্পতীর জীবনে পড়েছে নৈরাশ্যের ছায়া। দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ তাদের দুটি মনের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া ক'রেছে—তাদের পারস্পরিক আকুতিকে যেন সফল হ'তে দিচ্ছে না। জীবনের মূল্যায়নে তাহ'লে কি ঐশ্বর্যই স্থানই সব চেয়ে বড়? 'সরোবর'-এ পাওয়া যাবে তারই উত্তর।

দাম—২'৭৫

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

অপরাধ-বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড। (যন্ত্রস্থ)

অপরাধ, অপরাধ-রোগী, অপরাধ-প্রবণতা, স্বভাব-অপরাধী, অপরাধ-বিভাগ, অপরাধ-চিকিৎসা, অপরাধ-সাহিত্য, খেউড় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ড। (যন্ত্রস্থ)

অপরাধ-পদ্ধতি, বোগাস ম্যারেজ ট্রিকস্, ধর্মের পোশাকে প্রবঞ্চনা, ঠগী ভিখারী, মিথ্যা বিজ্ঞাপন, পকেটমার, গৃহ-চোর, রেলওয়ে ও ডাকঘরের অপরাধ, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ড। দাম—৫৲

যৌনজ অপরাধ, যৌন-বোধ, প্রেম-বোধ, মিশ্র-প্রেম, প্রেম-রোগ, পরা বিদ্যা, ব্যভিচার, শ্লীলতাহানি, নারী-হরণ, ভ্রূণ-হত্যা, যৌনজ প্রবঞ্চনা, নারী-নির্যাতন, উৎকোচগ্রহণ ইত্যাদি

চতুর্থ খণ্ড। দাম—৪৲

রাজনৈতিক অপরাধ, মিথ্যাচরণ, পেশাগত অপরাধ, চুক্লামি, চাটুকারিতা, উকীলকৃত অপরাধ, ভেজালবৃত্তি সংক্রান্ত অপরাধ ইত্যাদি।

পঞ্চম খণ্ড। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ। দাম—৬৲

অশ্লীলতা, আত্মহত্যা, অকারণ, মনোবিকার দাঙ্গাহাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, গুণ্ডামি, দ্যূতক্রীড়া, জালিয়াতি, হত্যা বা খুন, রাজনৈতিক হত্যা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ খণ্ড। দাম—৫৲

অপরাধ-নির্ণয়, অকুস্থল গমন ও পরিদর্শন, অপতদন্ত, গ্রেপ্তার, ওয়াচ ও ট্যাপিঙ, খানা-তল্লাসী, বিবৃতি-গ্রহণ, প্রমাণ সংগ্রহ, পদচিহ্ন এবং টিপচিহ্ন, পদ্ধতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

সপ্তম খণ্ড। (যন্ত্রস্থ)

রোমহর্ষক ডাকাতি, বেনামা পত্র লিখন, অপহরণ, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধের বিজ্ঞান-সম্মত তদন্ত পদ্ধতি।

অষ্টম খণ্ড। দাম—৪৲

সাধারণ, স্বাভাবিক ও অসাধারণ উপায়ে অপরাধ নিবারণের বিভিন্নপ্রকার অভিনব উপায় সম্বন্ধে আলোচনাই এই খণ্ডের বিষয়বস্তু। তাছাড়া নিয়োগপ্রথা, জনবিক্ষোভ, পাহারা ও টহলের কার্য, আরক্ষবাহিনী এবং স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতির ইতিহাস সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে গবেষণা করা হয়েছে।

ভাদ্র—১৩৭৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

ওঁ শান্তিঃ

রমা দেবী, কাব্যতীর্থ

বর্ত্তমান বিশ্ব আজ বিজ্ঞান সভ্যতার পাদদেশে দাঁড়াইয়া ভোগোন্মত্ততা, জ্ঞান ও বলগর্বে জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার মনের গতি আজ মানব কল্যাণের প্রতি ধাবিত না হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে তুচ্ছ ভোগ—লালসার তৃপ্তি সাধনে। কিন্তু কোথায় তৃপ্তি? হিংসাদ্বেষ অহমিকা ও প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ মানব মন তাই আজ আত্মদ্বন্দ্ব, আত্মকলহ ও সংঘর্ষে দিশেহারা।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

অর্থাৎ মনদ্বারা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মানব বিষয়-সমূহে আসক্ত হয় আসক্তি হইতে অভিলাষ এবং অভিলাষের অপূরণে ক্রোধ। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম এবং তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ ও ক্রমে মানব নাশ প্রাপ্ত হয়। আজকের পৃথিবী নানা সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া তাই ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে।

যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী তাঁহারাও অতৃপ্ত, যাঁহারা সম্বলহীন তাহারাও অতৃপ্ত। এই যে অশান্ত মনোবৃত্তি চরম পর্য্যায়ে উঠিয়াছে তাহাতেই আমরা ক্লান্ত ক্ষুব্ধ বলুষিত। সারা বিশ্বের মানব আজ তারস্বরে চীৎকার করিতেছে চাই!

চাই ! চাই ! বিশ্বপ্রকৃতিও উত্তরে জানাইতেছে নাই ! নাই ! নাই ! চতুর্দ্দিকে আজ যুদ্ধ নিবারণ, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি নানা রকলের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শান্তি কোথায় ?

কিন্তু ফেলিয়া আসা শতাব্দীর দিকে পিছন ফিরিয়া তাকাইলেই দেখিতে পাই পরিপূর্ণ শান্তি। যে শান্তি মানবকে অমরত্ব দান করিয়াছে। এই শান্তি লাভ করিতে হইলে চাই শান্ত সমাহিত মন যাহার একমাত্র প্রার্থনা হইবে—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতঙ্গময়।

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে প্রজ্ঞাচক্ষু প্রাচ্য ঋষিগণ তিমির-বগুণ্ঠিত ছন্দহারা জগতের ঊর্দ্ধে যে শাশ্বত ছন্দের সাথে অতীতে আত্মযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাই ব্রহ্মবিদ আধার মাধ্যমে নিঃসৃত চিরভাস্বর পূর্ণছন্দময় বেদরাশি।

যদিও আজিকার মানব ভোগসুখের নিরবচ্ছিন্ন কোলাহলের মাঝে বন্ধনের বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এমনই বদ্ধ যে অনন্তের আহ্বান তাহার মনের সূক্ষ্মতারে বাজে না। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে আধিপত্য বিস্তার করিয়াও তাই সে শান্তিহীন, তাই তাহার অন্তরাত্মা অসতর্ক মুহূর্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠে ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। অতৃপ্ত অন্তরে জাগিয়া ওঠে সেই আদিম অভীপ্সা—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

আমাদের ভারতের মর্মবাণী আমাদের শিক্ষা দিয়াছে ভোগ জীবনের লক্ষ্য নয়—ত্যাগেই ভোগের আনন্দ। এই আনন্দালোকের দিশারী যাহারা, অমৃতময় পথের পথিক যাহারা, সেই বৈদিক ঋষিরা তাঁহাদের উদাত্ত কণ্ঠে—বলিয়াছেন—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেম চক্ষুভির্যজত্রাঃ
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

হে অনন্ত ! হে অসীম ! আমরা যেন তোমার কল্যাণময় মূর্তিখানি দেখিতে পাই, শুনিতে পাই তোমার কল্যাণময়ী বাণী। এই পৃথিবী তাঁহাদের কাছে অসীম করুণাময়ী, পথে পথে তাঁহার কল্যাণ বিভূতি। ইহার আকাশে মধু, বাতাসে মধু, পার্থিব ধূলিও মধুময়। মধুময় বনস্পতি মধুময় ওষধি। মধুর রাত্রি, মধুর দিন, মধুময় আকাশগঙ্গায় ভাসিতেছে সূর্য্য, দিগন্তের হাসিতেও ঝরিয়া পড়িতেছে মধু। আজিও এই মধুর সঙ্গীত মধুময় হইয়া মিশিয়া রহিয়াছে তাঁহাদের সেই অমৃতময় স্তোত্র—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধুনক্তমুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

এই মধুর আনন্দরসে উজ্জীবিত সাধকেরা সর্বজনের কল্যাণ কামনায় আবারও গাহিয়াছেন—

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

অর্থাৎ হে দেব

সবিতা, যাহা কিছু অকল্যাণ যাহা কিছু মলিন তাহা দূর কর। হে পবিত্র জ্যোতির্ময় ! জীবন ভরিয়া দাও কল্যাণের সুরে, যাহা মঙ্গল তাহাই যেন জীবনে পূর্ণ হইয়া উঠে তোমার প্রসাদে।

স্মরণাতীত কাল হইতে দেখা গিয়াছে নদীর প্রতি সাগরের যেরূপ অসীম আকর্ষণ, যেরূপ আকুল আহ্বান, মানব চিত্তেও পূর্ণতা প্রাপ্তির আবেগ তেমনই। তৃষিত হৃদয় অহরহ ছুটিয়া যায় সেই অমৃতময়লোকে। সব কিছুর দাবী মিটিলেও তাই তাহার চির বুভুক্ষিত মন বলিয়া উঠে 'ততঃ কিম্'! তাহার সেই পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রার্থনা তাই ধ্বনিত হয় মন্ত্রে—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি
বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি
বলমসি বলং ময়ি ধেহি
সহোঽসি সহোময়ি ধেহি ॥

তুমি তেজ আমাকে তেজস্বী কর। তুমি বীর্য্য আমাকে বীর্য্যবান কর। তুমি বল আমাকে বলবান্ কর। তুমি সহ্য শক্তি আমাকে সহনশীল কর। বৈদিক ঋষিরা বৈরাগ্যবাদী ছিলেন না তাঁহারা জীবনকে পরমানন্দে পরিপূর্ণতার মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন। শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে তাঁদেরই মুখনিঃসৃত বাণী আজিও নানা অনুষ্ঠানে শুনিতে পাই—

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ
বনস্পতয়ঃ শান্তি বিশ্বে দেবাঃশান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ
সর্ব্বং শান্তিঃ শান্তি রেবচ সা মাং শান্তি রেধি।

দ্যুলোক ভূলোক শান্তিতে ভরিয়া উঠুক, ওষধি বনস্পতি জল শান্তিময় হউক, বিশ্ব শান্তি হউক, পরম শান্তি আসুক।

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি !

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

ঈশ্বর ভয়ে দেবতারা সব কম্পনরত হয়
তাঁহার আদেশে যেখানে যা কিছু সব কিছু স্থির রয়
মৃত্যুরে হতে পার
কেন সেতু নাহি আর
ব্রহ্মের মাঝে অমৃত পরশ শুধু সেই জন পায়
মৃত্যুর তার কাছে পরাভব অমৃত শুধুই তায়।

জ্যোতির্দর্শনাৎ (৪০)

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ
উপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য)
এই জীব এই শরীর হইতে উঠিয়া যখন যায়
পরমেজ্যোতিসে আপন স্বরূপ দেখিবারে তবে পায়
এ জ্যোতি সূর্য্য নহে নিশ্চয়
তাই দরশন বলিয়া বুঝায়।

আকাশোঽর্থান্তরত্বা দিব্যাপদেশাৎ (৪১)

আকাশো হ বৈ নামরূপয়োনির্বহিতা
তেষাং যদন্তরা তদব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা।
আকাশ নাম ও রূপেরে বুঝায়ে জেনো ইহা নিশ্চয়
নামরূপ যাহে দুই নিমগণ আত্মা অমৃত হয়।
জগতের মাঝে নাম রূপ ধরি সকলেই রয় দেখি
অরূপ ব্রহ্ম রূপের আধার সবরূপ সেথা ফাঁকি
নাম রূপ দুই সেথা মানে পরাজয় রূপাতীত সেইজন
আকাশের মত সবের ঊর্দ্ধে বর্ণনাতীত হন।

সুষুপ্ত্যু ক্রান্ত্যোর্ভেদেন (৪২)

ঘুম ও মৃত্যু সময়ে জানিও ঈশ্বর ছাড়ে দেহ
পরমেশ্বর দেন দরশন পুণ্যজন সে সেহ
কতম আত্মা ইতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু
হৃদ্যন্তঃ জ্যোতিঃ পুরুষঃ।
বৃহদারণ্যক — প্রশ্ন হেথায় আত্মাকে হয় অন্তর মাঝে যিনি
বিজ্ঞানময় পরম পুরুষ প্রাণের মাঝারে তিনি
সংসার হতে মুক্ত সেজন
ব্রহ্মের মাঝে বাহ্যংজ্ঞন
বাহ্য বিষয় হতে অচেতন অন্তর নাহি জানে
অমৃতের মাঝে মগন যেজন অমৃত ভরা সে প্রাণে।

পত্যাদি শব্দেভ্যঃ (৪৩)

পতিশব্দেতে বোঝা যায় ইহা ব্রহ্মের কথা হয়
শ্রুতি বাক্যেতে উদ্ধৃত করি শঙ্কর তাহা কয়
"সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ
নিখিল জগৎ যার বশে রয়
সকলের প্রভু সেই নিশ্চয়
আত্মা জানিও সংসারী কভু নয়
শ্রুতির বাক্য মিথ্যা এ নয়
আত্মা সত্য অমৃতময়
তাই দেহ ছাড়ি অমৃতে মগন হয়।

প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ

আনুমানিকম্ অপি একেষাম্ ইতি চেৎ শরীর রূপক
বিন্যস্ত গৃহীতেঃ দর্শয়তি চ (১)

সাংখ্য দর্শনোক্ত প্রকৃতি এ যদি ইহা বলা যায়
তাহার কারণ শরীরে লইয়া তবে ঈশ্বরে পায়—
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরং
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ

কঠোপনিষদ

ইন্দ্রিয় হতে বিষয় শ্রেষ্ঠ বিষয় হইতে মন
মন হতে বড় বুদ্ধি জানিও বুদ্ধি হইতে হন
আত্মা সে বড়, আত্মা হইতে অব্যক্ত বড় হয়
অব্যক্ত হইতে ব্রহ্ম সে বড় গতি সেই নিশ্চয়।
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রমন্যাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আট

ওদের দিন পঞ্জিকায় শ্রেষ্ঠ আনন্দসভা বসত সন্ধ্যায় —গানের আসরে। কখনো কখনো সেখানে কাশীর কোনো কীর্তনীও গাইতেন। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে অসিতকেই গাইতে হ'ত হিন্দি ভজন বাংলা কীর্তন বা আধুনিক ভক্তিসঙ্গীত—দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের বা ওর স্বরচিত নানা গান। ললিতার বাঁধা দুএকটি গানও অসিত গাইত মাঝেমাঝে—কখনো একা, কখনো ললিতার সঙ্গে জুড়িতে। রোজ বিকেলে কিছুক্ষণ ললিতাকে শেখাত ওর স্বরচিত গান বা মীরাভজন। তারাও শিখত ওর সঙ্গে। ললিতা মোটের উপরে ভালোই গাইত। তারা—সাদামাটা। তবে দোয়ার দিতে ভুল করত না। তাই ওদের শিবিরে অসিতের যে কিছুই লাভ হ'ত না তা নয়—যদিও ললিতাকে ও শেখাত বিশেষ ক'রে এই সূত্রে তার নির্মল মনের স্পর্শ পেতে। এমন স্বচ্ছ নির্ভীক সরল অথচ স্বভাবভক্তিমতী মেয়ে ও জীবনে বড় বেশি দেখে নি।

ওদের সান্ধ্য সভায় প্রায়ই আসতেন কাশীর এক নামকরা বিদ্বান্। প্রসাদ তাঁর নাম দিয়েছিল crashing bore। তিনি যত্রতত্র তর্ক তুলতেন নিজের বিদ্যা জাহির করতে। লোকে তাঁকে নিয়ে আড়ালে হাসিঠাট্টা করত—কিন্তু তাঁর সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস করত না। মা ললিতাকে বিশেষ ক'রে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ গায়ে না মাখতে। নিজের মেয়েটিকে তিনি জানতেন তো—কখন কী কাণ্ড বাধিয়ে বসে কে জানে! কিন্তু ললিতা সময়ে সময়ে চঞ্চল হ'লেও মা-র কথা মনে রেখে নিজেকে সামলে রাখত।

সেদিন ছিল গুরুপূর্ণিমা। প্রেমল ললিতাকে বল্ল প্রথমে একটি গুরুবন্দনা গাইতে তারার সঙ্গে। ওরা গাইল অসিতের কাছে শেখা একটি গুরুবন্দনা মীরাভজন :

> আঈ শরণ তিহারী সদ্‌গুরু, আঈ শরণ তিহারী
> জনম জনমকী দাসী মীরা বারবার বলিহারি।

তারপর মা বললেন অসিতকে গাইতে শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত গুর্বষ্টক স্তোত্র। অসিতের সচরাচর গুরুবন্দনা গাইতে তেমন ভালো লাগত না—আরো এইজন্যে ওর মনে হ'ত গুরুপদে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারে তার পক্ষে গুরুবন্দনা গাওয়া হ'য়ে দাঁড়ায় গতানুগতিক—কপটতারই কাছাকাছি। কিন্তু মা-র প্রেমলের দ্বিবিধ গুরুকৃপা ওকে ভরসা দেওয়ায় ও শঙ্করাচার্যের এ-স্তোত্রটি গাইতে গাইতে ও সেদিন যেন যেন আবিষ্ট হ'য়ে পড়ল—যেন মনে হ'ল আসছা ঘ যে এ গানের মাধ্যমে এক অচিন আবির্ভাব হাতছানি দিয়ে ডাকছে! এ-ধরণের অদ্ভুত অনু ওর এর আগে কোনদিনই হয় নি, তাই গাইতে গা ওর মধ্যে জেগে উঠল এক অনস্বকৃপপূর্ণ আবেশ। গেয়ে চলল নানা তান দিয়ে সুরবিহারের পাখা মেলে :

> "শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
> যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
> গুরোরংঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
> ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং।

ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বঞ্চ গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরো……ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥
বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু সক্তস্তথাপি।
গুরো……ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥"

অসিতের গান শেষ হ'লে ললিতা গুরুপূর্ণিমার উৎসবের জন্যে এ-স্তবটির যে বাংলা অনুবাদ করেছিল (অসিতের সাহায্যে) সেটি গাইল ঐ একই সুরে অসিতের সঙ্গে—তারা ও প্রেমল দোয়ার দিল :

যদি দেহ হয় তব কান্ত সবল, অতুল কীর্তি যশ মান,
হয় হিমালয় সম দীপ্ত অমেয় তব ধন,
যদি গুরুর চরণকমলে লিপ্ত না রহে তোমার মন
প্রাণ—
হবে এ-সকলই ছায়া ছায়া ছায়াবাজি হে সুজন!
যদি বেদ-বেদান্ত থাকে তব নখদর্পণে ওগো বিদ্বান্,
করো গদ্যে পদ্যে নিখিল চিত্তরঞ্জন,
যদি গুরুর……হে সুজন!
যদি বিদেশে মান্য স্বদেশে ধন্য হও গৌরবে গরীয়ান্,
রটে বিশ্বসভায় তোমার মহিমাকীর্তন,
যদি গুরুর……হে সুজন!

গানের শেষে এক যুবক জিজ্ঞাসু প্রেমলকে বলল : "কিন্তু সাধুজী, গুরুর চরণকমলে মনকে লিপ্ত রাখব কেমন ক'রে?"

প্রেমল : একান্তী হ'য়ে প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই।

যুবক : কী প্রার্থনা করব? মানে কিসের?

প্রেমল : নিষ্ঠা ও চিত্তশুদ্ধির।

যুবক : কার কাছে? গুরুর না ইষ্টের?

প্রেমল (হেসে) : গুরু ইষ্ট অভেদ। তাই যার কাছে প্রাণ চায় প্রার্থনা করতে পারো। আন্তরিক হ'লে গুরুর কাছে প্রার্থনা করলেও সে-প্রার্থনা ভগবানের কাছে পৌঁছাবেই পৌঁছাবে।

তর্কপণ্ডিত এতক্ষণে ছিদ্র পেলেন, বললেন তড়্পে উঠে : "কিন্তু এ কেমন কথা সাধুজি? শাস্ত্রীরা সবাই ভগবানের উপাধি দিয়েছেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—যেখানে গুরুরা তো দেখতে পাই অগুন্তি গজান অলিতে-গলিতে পথেঘাটে—ব্যাঙের ছাতার মতন। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে আপনি রকমারি গুরুর কাছে ধর্ণা দিতে পারেন। তন্ত্রসার বলেন নি কি—

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গো পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ।"

ব'লেই নিজের অনুবাদ শুনিয়ে দিলেন :

মধুপ্রলুব্ধ অলি যথা ধায় ফুল হ'তে ফুলে মধুর আশে,
জ্ঞানপ্রলুব্ধ শিষ্য উধাও হবে গুরু হ'তে গুরুর পাশে।

প্রেমলের মুখ লাল হ'য়ে উঠল। বলল : "জানি তার্কিকজি। এ-শ্লোকটি আমিও পড়েছি স্যর্ জন্ উড্রফের বইয়ে। কিন্তু তিনি বলেন যে, তান্ত্রিকদের মধ্যেও মতভেদ আছে। যেমন ধরুন গুরুতন্ত্র আছে—মহাদেব পার্বতীকে বলেছিল :

গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টঃ, রুষ্টে রুষ্টস্ত্রিলোচনঃ।
গুরৌ তুষ্টে শিবা তুষ্টা, রুষ্টে রুষ্টা চ সুন্দরি!

(জিজ্ঞাসুর দিকে তাকিয়ে) : অর্থাৎ গুরু তুষ্ট হ'লে হরগৌরী উভয়ে তুষ্ট হন, রুষ্ট হ'লে রুষ্ট হন।

তর্কপণ্ডিত (সদাপটে) : কিন্তু মাপ করবেন, আপনি অবান্তরের অবতারণা করছেন, সাধুজি। আমার প্রশ্ন ছিল—শিষ্য যখন জ্ঞানের জন্যে ডজনখানেক গুরুর দরবারে ধর্ণা দিতে পারে শাস্ত্র মেনেও—

প্রেমল (হাত তুলে) : রহুন রহুন। আপনার গোড়ায় গলদ হচ্ছে জী! কারণ আপনি ধ'রে নিয়েছেন শিক্ষক আর গুরুকে সমার্থক ধ'রে নিয়ে। কিন্তু এ গোল হয় পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে ধারণা সাফ্ না থাকলে—যেমন ধরুন, শিব শক্তি পুরুষ প্রকৃতি জীবাত্মা পরমাত্মা, মায়া, লীলা, অবতার…ইত্যাদি। যারা ধ'রে নেয়—গুরুও যা শিক্ষকও তাই, তারা যেতে পারে বৈকি পথ চলতে জুতোর মতন গুরু বদলে। কিন্তু যারা বাইরের গুরুর মধ্যে চাক্ষুষ করেছে অন্তরের গুরুদেবতাকে তারা গুরু বদলাতেই পারে না প্রাণ গেলেও।"

মা হঠাৎ টুক ক'রে ব'লে বসলেন : "সাধু তুলাল! সাধু! তুমি ঠিকই ধরেছ। কারণ যে একবার তার এই যথার্থ গুরুর দেখা পেয়েছে সে জ্ঞানার্থী হ'য়ে ডজন খানেক গুরুর কাছে যেতেই পারে না যেমন সতী স্ত্রী

প্রেমার্পিনী হ'য়ে যেতে পারেন অজস্রখানেক নাগরের কাছে।

সভায় এক আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে গেল। তর্কপণ্ডিত রেগে উঠে গজ গজ করতে করতে সভা ত্যাগ করলেন: এমন প্রগল্‌ভ সভায় আর আসব না ব'লে।

তর্কপণ্ডিতের প্রস্থানের পর হাসির রেশ মিলিয়ে গেলে মা অসিতের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিটিয়ে বললেন: "কেমন জবাব দিয়েছি ঠিক ভালো বলো তো বাবা?"

অসিত (হেসে): মা, আজ আমি বুঝতে পেরেছি—ললিতা কার কাছ থেকে পেয়েছে দুষ্টুমির দীক্ষা।

প্রেমল: কিন্তু মা নিছক দুষ্টুমি করতে চেয়েই একথা বলেন নি। য়ুরোপে আমেরিকায় সত্যিই হাল আমলে এই ধুয়ো উঠেছে যে সতীত্ব চিত্তশুদ্ধি ব্রহ্মচর্য এসবই সেকেলে মেকি টাকা, কাজেই এ-যুগে অচল—যেখানে স্বেচ্ছাচারের তাম্রমুদ্রাই মান পায় গিনি সোনার। অর্থাৎ কি না, এ-নাস্তিক যুগের জপমন্ত্র হ'ল—My will not thine be done. আর গুরুর কাছে নত হ'তে যে আমাদের এত আপত্তি, বিদ্রোহের যুক্তি-তীরন্দাজি তার মূলে আছে এই স্বেচ্ছাবিহারের প্রচণ্ড আসক্তি।

অসিত: একথা মানতে বাধে না ভাই, কিন্তু গুরুকে যখন ইষ্টের পদবী দিই তখন মন টোকে: মানুষের মানবতার নানা দোষ ত্রুটি চ্যুতি সত্ত্বেও তাকে কেমন ক'রে ভগবানের সঙ্গে একাসনে বসাব? ভগবানের প্রতিনিধি, এজেন্ট, মোহান্ত বলো বুঝি, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান বললেই প্রশ্ন আসে—যতদিন কাউকে অভ্রান্ত ব'লে দেখতে না পাচ্ছি ততদিন তাকে ইষ্টের আসনে বসালে কি গুরুকে বেশি মান দিতে গিয়ে ইষ্টের মানহানি হবে না? (মা-কে) কিছু মনে করবেন না মা, আপনাকে দেখে আমার অন্তরে যে-শ্রদ্ধা জেগে উঠেছে তার মূলে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু তার একটা কারণ—আপনার মধ্যে holier-than thou ভঙ্গি দেখতে পাই নি, আপনার বলতে শুনি নি যে, আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী কাজেই দেবী, কাজেই অভ্রান্ত না হ'য়েই পারেন না।

মা (প্রেমলকে): তুই ওকে বুঝিয়ে দে বাবা! আমার কি তেমন বুদ্ধি আছে যে এ-ধরণের দারুণ চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে পারি?

অসিত: ছি ছি, এ চ্যালেঞ্জ নয় মা। আমি সত্যিই জানতে চাই। কারণ আমার গুরুকরণের পথে সত্যিই এই এক বিষম বাধা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিশেষ প্রেমল ও প্রণবের ধমকে যে, গুরুর সব কথাই নির্বিচারে মানতে হবে। আমি যে দেখেছি মা যে, যাঁদের গুরু ব'লে দুর্দান্ত নামডাক তাঁদের মধ্যে অনেকেই শুধু যে কুযুক্তি দিয়ে চেলাদের ভাঁওতা দেন তাই নয়—সত্যি কালোকে শাদা ব'লে সত্যার্থীকে মিথ্যার পথে চালান গুরুগিরির ঠাট বজায় রাখতে।

প্রেমল: সদ্‌গুরু কখনই বলেন না যে, তিনি অভ্রান্ত। তাদের মগজী বুদ্ধি অনেক সময়ে ধারালো না হ'তে পারে, কিন্তু তাতে খুব যায় আসে না এই জন্যে যে মগজী বুদ্ধি আসলে এ পথের দিশারি নয়। তবে কালোকে যাঁরা শাদা বলেন চেলাদের ভোগা দিয়ে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে গুরুগিরি করতে, তাঁরা দুদিন বাদে ধরা প'ড়ে যানই যান। তুমি কি দেখতে পাও না যে, জগতে আজ পর্যন্ত বহু সাধুসন্ত জন্মেছেন, কিন্তু যাঁরা সত্যি সাধু ব'লে দাঁড়িয়ে গেছেন তাঁদের চিনতে কি কারুর ভুল হয়েছে, না তাঁদের কথা শুনে কারুর অধোগতি হয়েছে? জগতে সত্যিকার মহাত্মা যাঁরা তাঁরা যুগে যুগে দেশে দেশে এক কথাই বলেছেন: সত্যাশ্রয়ী হ'তে, নিরভিমান, নির্লোভ, নিষ্কাম, নির্মোহ হ'তে। কেউ বলেন নি শঠ, মিথ্যুক অধীর লম্পট দাম্ভিক হ'তে। কিন্তু আসলে এসব প্রশ্নের বাধা আমাদের পথ আগলে দাঁড়ায় না। মুখ্য বাধা হ'ল চারটি: শ্রদ্ধার অভাব, বৈরাগ্যের অভাব, তৃষ্ণার অভাব ও আন্তরিকতার অভাব। অর্থাৎ যে সত্যি চাইবে সে দিশা পাবেই পাবে—যদি সদ্‌গুরুকে বরণ করে তাহ'লেও হয় তার মধ্যে দিয়েইপাবে অভাবনীয় ভাবে, নৈলে ইষ্ট তাকে দিব্যদৃষ্টি দেবেন যার প্রসাদে সে দেখতে পাবেই পাবে যে, সদ্‌গুরুর মধ্যে সৎ আদৌ নেই, বদই জাঁকিয়ে বসেছে নিজেকে সৎ জাহির ক'রে।

মা: বাবা, এ সব ব্যাপার ঠিক যুক্তি বুদ্ধির স্কুল মাষ্টারি উপদেশের পথে ঘটে না। সদ্‌গুরুরা অনেক সময় প্রথম দিকে জেতে বটে কালোকে শাদা ব'লে কাজ হাসিল ক'রে। কিন্তু শেষে ধরা পড়েই পড়ে। একটা গল্প বলি শোনো বোঝাতে দুটি তত্ত্ব: এক, যারা গুরু

বাক্যে সত্যি বিশ্বাস ক'রে ভুল পথকে ঠিক পথ ভাবে তার ভুল পথ আর ভুল থাকে না। দুই, যে-সদ্‌গুরু শিষ্যকে ভুল পথে চালায় সে ধরা পড়েই পড়ে বদ্‌গুরু ব'লে।

এক লোভী তান্ত্রিক সাধনা ক'রে কয়েকটা সস্তা বিভূতি পেয়েছিল। তাই ভাঙিয়ে তা'র খুব নামডাক হয় মহাযোগী ব'লে। অধিকাংশই আসত তার ধড়িবাজি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে নানা সিদ্ধাই তুকতাক শিখতে. কিন্তু একদিন এল এক গরীব মুচি যে সত্যিই ভগবান্ ছাড়া কিছু চায় না। সে ঐ বদ্‌গুরুকেই সদ্‌গুরু ভেবে দীক্ষা চাইল। গুরু গরীব চেলা চাইলেন না, তাই ভাগিয়ে দিলেন তাকে দূর-ছেই ক'রে। কিন্তু তার প্রাণ ভগবানের জন্যে এতই ব্যাকুল যে, সে গালাগালি সত্ত্বেও বার বার এসে কেঁদে পড়ে: "প্রভু, আপনি বলেছেন গুরু ইষ্ট অভেদ, আর গুরু বিনা গতি নেই, তাই আপনার পায়ে পড়ি আপনি বলুন কেমন ক'রে আমার হবে এ-দর্শন। আমাকে ইষ্টমন্ত্র দিন। নৈলে আমি ছাড়ব না।" গুরু শেষটা তিতিবিরক্ত হ'য়ে বললেন: "যা তোর ইষ্ট গাধা। গাধা মন্ত্র জপ করলেই তাঁকে পাবি। এবার পালা। আমাকে আর দিক্ করিস নি।"

সরল মুচি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে সংসার ছেড়ে বনে চ'লে গিয়ে একমনে গাধামন্ত্র জপ করতে করতে পেল ইষ্ট নারায়ণের দর্শন—গাধা ঝলকে উঠেই নারায়ণের রূপ নিল। মুচি মহানন্দে গ্রামে ফিরে এসে রটাল যে গুরুর কৃপায়ই তার ইষ্টলাভ হয়েছে গাধামন্ত্র জপ ক'রে। বলবামাত্র সবাই গাধামন্ত্র জপ করা সুরু করল "জয় গুরু জয়" ব'লে। অমনি হল কি, বদ্‌গুরুর ধড়টা রইল মানুষের, আর মুণ্ডুটা হ'য়ে গেল গাধার! হবে না? সে যে বলেছিল গুরু ইষ্ট অভেদ আর সেই মুচির গাধামন্ত্র জপ ক'রেই সিদ্ধি লাভ হয়েছে। কাজেই দুই আর দুয়ে চার—মুচির যেই গাধারূপী ইষ্টলাভ হ'ল, সেই বদ্‌গুরুকে হ'তে হল জলজ্যান্ত গাধা। লোকে শিউরে উঠে এ না-জন্তু-না-মানুষকে কুলোর বাতাস দিয়ে গ্রাম থেকে দূর ক'রে দিল।

ললিতা (হেসে গড়িয়ে প'ড়ে): মা গো মা! সত্যিই তোমার তুলনা তুমি। (অসিতকে) কেমন দাদু? এবার?

অসিত (হেসে): ভাই, হার মানতে হয়েছে শেষে।

প্রেমল: Better late than never ভাই!

নয়

অসিতের নিমন্ত্রণ ছিল জলন্ধরের এক সঙ্গীত সভায়। কিন্তু কাশীতে এসে সে যেন যুগপৎ পাঁচ পাঁচটা জালে বাঁধা প'ড়ে গেল: প্রেমল, ললিতা, শান্তিময়, প্রণব, মহেন্দ্রবাবু।

মহৎ মানুষ ওর মন টানত আশৈশব। স্বামী বিবেকানন্দের একটি অঙ্গীকার ওর মনে গেঁথে গিয়েছিল তাঁর চিঠি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি লিখেছিলেন: "আমি গৃহস্থও বুঝি না সন্ন্যাসীও বুঝি না, যথার্থ সাধুতা, উদারতা, মহত্ত্ব যেথায় সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হোক্।"

"পত্রাবলী"-তে স্বামীজির নানা পত্রের আন্তরিকতা তেজ ও মহত্ত্ব ওকে মুগ্ধ করত বটে, কিন্তু এ পত্রটি ছিল যেন একটি বাণী—যে, সংসারে মহত্ত্ব আছে ব'লেই তার দৃষ্টান্তে মানুষ তার ক্ষুদ্রতার পিছুটান কাটাতে পারে।

মাঝে মাঝে অসিতের মনে প্রশ্ন উঠত: প্রণবকে না হয় মহৎ ব'লে সনাক্ত করল—(সে স্বদেশ স্বজন ছেড়ে বিদেশে বিভুঁয়ে এসে নামকরা সার্জনের মোটা আয় ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পায়ে ঠেলে বৈরাগী হ'য়ে বনবাস বরণ ক'রে নিল গুরুসেবা করতে—এ কজন পারে? আর মহত্ত্বের একটি অভিজ্ঞান তো তার দুরূহতাই বটে)—কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর মধ্যে কী এমন মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েছে? শুনেছিল অবশ্য যে, বহু দীনদুঃখীর অসুখে উনি শুধু যে দক্ষিণা নিতেন না তা'ই নয়, দরকার হ'লে তাদের বিনা মূল্যেই ওষুধ দিতেন। একদা ললিতা এমন কথাও বলেছিল যে, তিনি ডাক্তার হ'য়ে যা উপায় করতেন তার প্রায় অর্ধেক খরচ হ'য়ে যেত দীনদুঃখীর চিকিৎসায়। দাতাকে মহৎ না ব'লে উপায় নেই। কিন্তু ও আকৃষ্ট হ'য়েছিল ঠিক এ-দানের মহত্ত্বে নয়—তাছাড়া এ-দানের কথা তো ওর কাছে জনশ্রুতিই বটে—আকৃষ্ট হয়েছিল। অন্তরে অনুভব করেছিল ব'লে যে, তিনি উদার মহৎ অনাসক্ত। অর্থাৎ ইন্‌টুইশন্—স্বভাব কোনো কোনো মুখ দেখলে যেমন মনে হয় সরল, বিশ্রব্ধ বা স্নেহশীল।

কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে ওর একটি নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল তাঁর সম্বন্ধে যাকে অঘটন না ব'লে উপায় নেই। অসিতের জীবনে অঘটনের আবির্ভাব হ'য়েছে যেন প্রতিপদেই—উঠতে বসতে। প্রণব কি ওকে সাধে বলত: "চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তুমি তেমনি অঘটনকে টানো ভাই! গুরুলাভও তোমার হবে এম্নি অঘটনের ক্রিয়ায়, ব'লে রাখলাম—পরে মিলিয়ে নিও।" কিন্তু এ-অঘটনটিকে ও কী নাম দেবে ভেবে পায় না যেন! Revealing, বলা চলে, কিন্তু কোন্ অঘটনটাই বা ঐশী লীলার ভাষ্যকার এই অর্থে revealing নয়?

ডাক্তারবাবু বৃন্দাবন থেকে কাশী এসেছিলেন খানিকটা ভাবার ও প্রেমলের জন্যেই। কারণ বৃন্দাবনে তিনি শুধু যে নিজের ক্লিনিকে রোগী দেখতেন তাই নয়, রামকৃষ্ণ মিশনেও তাঁকে প্রত্যহ একঘণ্টা ক'রে রুগী দেখতে হ'ত। ডাক্তারের ছুটি নেই, সবাই জানে। তবু তিনি প্রেমলের সঙ্গসুখে এত আনন্দ পেতেন যে, ভাবা কাশী যাবে ধরতে তিনি রাজী হয়েছিলেন সাগ্রহেই—প্রেমলের সঙ্গের জের আরো দুদিন টানতে চেয়ে। আনন্দের এমন স্বর্ণসুযোগ তো জীবনে বার বার আসে না—rävely ravely comest thon spirit of delight—শেলির কথার কি মার আছে?—বলতেন তিনি প্রায়ই। কর্তব্য? অনবদ্য আদর্শ বটে। কর্তব্য-পালনে আনন্দও আছে বৈ কি। কিন্তু সাধুসঙ্গের ও ভজনের আনন্দ তৃপ্তির সঙ্গে মুক্তির আভাষ দেয় না কি? তাই তিনি বিবেকী ডাক্তার হ'য়েও এককথায় রাজী হয়েছিলেন কাশীতে পাঁচ-সাতদিন কাটিয়ে আসতে—কর্তব্য থেকে ছুটি নিয়ে আনন্দের রংমহলে দুচারদিন থেকে একটু রঙিন হ'য়ে ফিরতে। ডাক্তারির ধূসরতা সময়ে সময়ে তাঁর মনকে কেমন যেন নিয়ত একঘেয়েমির চাপে অতিষ্ঠ ক'রে তুলত।—বলতেন তিনি অসিতকে উঠতে বসতে।

কিন্তু ঢেঁকির স্বভাবও তো অপ্রতিবাদ্য কাজেই কাশীতে দু'দিন ছুটি ভোগ করতে এসেও তাঁকে ধান-ভানার কাজেই বাহাল হ'তে হ'ল। মহেন্দ্রবাবু অনেক রোগীর শক্ত রোগ সম্বন্ধে তাঁকে "কন্সাল্ট" করতেন। ফলে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে বেরুতে হ'ত। তিনি সানন্দেই রাজী হ'তেন আরো এই জন্যে যে, এ-সূত্রে তিনি মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গ পেতেন একটু বেশি ঘনিষ্ঠভাবে। (কে না জানে সতীর্থদের মধ্যে সহজেই ঘনিষ্ঠতা হয়?)

একদিন মহেন্দ্রবাবুর ডাক পড়ল এক তিনতলার ঘরে। তখন প্রণব বলল ডাক্তারবাবুকে যে, মহেন্দ্রবাবুর থ্রম্বোসিস আছে, তার উপর রক্তের চাপও মাঝে মাঝেই কষ্ট দেয়, কাজেই বেশি সিঁড়ি ভাঙা ভালো নয় তাঁর পক্ষে। সুতরাং ডাক্তারবাবু মহেন্দ্রবাবুকে বললেন তিনি যাবেন তাঁর বদলি। কিন্তু এ-রুগীটি ছিল মহেন্দ্রবাবুর প্রিয়বন্ধু, বায়না ধরল—না, আর কোনো ডাক্তারে তার বিশ্বাস নেই। পেটে দুষ্টক্ষত (ulcer) থেকে রক্তস্রাব হচ্ছে বেশি—পরিবারের সবাই ভয় পেয়ে মহেন্দ্রবাবুকে ছেঁকে ধরল। বলল চেয়ারে ক'রে ওঠাবে।

কিন্তু মহেন্দ্রবাবু চেয়ারে ক'রে উঠতে কিছুতেই রাজী হলেন না, বললেন আস্তে আস্তে উঠবেন জিরুতে জিরুতে। প্রণব তো আপত্তি করলই, ডাক্তারবাবুও বারণ করলেন—(কারণ সম্প্রতি কয়েকটি শক্ত রোগের চিকিৎসায় উৎকণ্ঠা হওয়ার দরুণ মহেন্দ্রবাবুর রক্তের চাপ ফের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল—তিনি একরকম ডাক্তারবাবু ও প্রণবেরই চিকিৎসাধীনে ছিলেন)—কিন্তু তিনি শুনলেন না, বললেন: "কিচ্ছু হবে না, আমি খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে উঠব।"

কিন্তু কয়েকটি সিঁড়ি ভাঙতেই তিনি বুকের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর মনের জোর ছিল অসাধারণ—ইষ্ট নাম জপ করতে করতে কোনোমতে উঠলেন তিনতলায়। কিন্তু এই শেষের তলাটিই হ'ল তাঁর কাল—রুগীর ঘরে ঢুকবার আগেই মূর্ছা।

হৈ হৈ ব্যাপার! সবাই তাঁকে গভীর ভক্তি করত কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে তোলা হল মোটরে।

গঙ্গাতীরে যখন তিনি পৌছলেন তখন দেখা গেল মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে।

ঘণ্টা দুই পরে তাঁর জ্ঞান হ'ল। প্রণব প্রেমল ললিত ও অসিত বারান্দায় অপেক্ষা করছিল—মা ঘর থেকে কখন কী হুকুম দেন। অসিত বারান্দায় একটি মোড়ায় ব'সে ভাবছিল আবোল তাবোল—এ কী হ'ল…কেন এমন হ'ল…

পরোপকার করতে গিয়ে…ইত্যাদি ইত্যাদি।

হঠাৎ সবাই চমকে উঠল: "জয় মা!" শুনে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে অসিত দেখে—মহেন্দ্রবাবুর ম্লান মুখ যেন আলো হ'য়ে উঠেছে—তিনি তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে জানলার দিকে। মুখে তাঁর দিব্য হাসি ফুটে উঠল। সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো। তিনি কিন্তু কারুর পানেই না তাকিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন জানলার পানে। তারপরই তাঁর দু-চোখের কোল থেকে অবিরল ধারা নামল। মা গভীর স্নেহে অশ্রু মুছে তাঁর বুকে হাত রেখে অজপা জপ করে চললেন। মুমূর্ষুর মুখ উঠল আরো উজ্জ্বল হ'য়ে বললেন: 'আহা মা…মা…মা গো …ব'লে একটু থেমে কারুর দিকে না তাকিয়ে অথচ সবাইকেই যেন সম্বোধন ক'রে বললেন: দেখতে পাচ্ছ না? মা নিতে এসেছেন ছেলেকে তাঁর—বেলা শেষে… মা…মা মা…এসো মা…মাকে কালো বলে কে রে?… সৌম্যসৌম্যতরাশেষসৌমেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী…* গাও সবাই মা-র নাম…শুধু তাঁর নাম…

আশ্চর্য! কণ্ঠস্বরে জড়তার লেশও নেই! দেহ নিশ্চল পক্ষাঘাতে, কিন্তু মুখে কী আলো, মধুর হাসি!!

মা অসিতের দিকে তাকিয়ে বললেন: "গাও বাবা, মা-ও শুনবেন…"

অসিতের রোমাঞ্চ হয়…মা এসেছেন স্বয়ং!…ধরল একটি স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত:

তোমার চরণ যে করে বরণ তুমি যে শরণ দাও
　　　　　　　　　　　　মা তারে,
একথা মিথ্যা হ'ত যদি—যেত ডুবে এ-অবনী
　　　　　　　　　　　　অন্ধকারে।
　　জানি না কিছুই—জানি মৃন্ময়ী,
　　শুধু জানি—তুমি মা, পরশমণি,
ধূলাও তোমার পরশে তারার নামাবলী হ'য়ে
　　　　　　　　　　　　জ্বলে আঁধারে

*১ দৈত্যনাশিনী করালী, দেবের বরদা, অমৃত
　　　　　　　　　　　　শান্তিময়ী!
যা কিছু জগতে আছে সুন্দর তারও চেয়ে তুমি
　　　　　　　　　　　　কান্তিময়ী। (চণ্ডী)

একথা জেনেছি তোমারি প্রসাদে পেয়েছি মা তাই
　　　　　　　　　　　　পার অপারে।
ঠাঁই রাঙা পায় তোমায় যে চায় কোথা ভয় তার
　　　　　　　　　　　　ধরণীতলে?
অঘোর রুক্তবেদনায়ও তার ওঠে মা তোমার চেতনা
　　　　　　　　　　　　জ্ব'লে।
　　কাঁটা দেয় তা'রে গোলাপদীক্ষা,
　　যে শুধু তোমারি করে প্রতীক্ষা
পারে কি মা হ'তে হারা মরুপথে প্রাণনদী তার
　　　　　　　　　　　　তুরভিসারে,
তুমি হাসো ব'লে কোটি তারা জ্বলে করি উপহাস
　　　　　　　　　　　　শূন্যতারে।

সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রবাবু ব'লে উঠলেন: "ঠিক মা, ঠিক। সবই তোমার—আলোও তোমার আঁধারও তোমার, ফুলও তোমার কাঁটাও তোমার, জীবনও তোমার মরণও তোমার। তুমি দেখিয়ে দিলে মা, দেখিয়ে দিলে। মা দেখিয়ে দিয়ে পারবে কেন মা? তুমি তো পাতানো মা নও।" ব'লেই ডাকলেন: "প্রেমল, প্রণব, সবাই এসো। …বড় আনন্দের দিন। (ললিতাকে) কাঁদে না মা! তোমাকে দেখছেন—দেখছেন তিনিই (মা-কে দেখিয়ে) ওর মধ্যে দিয়ে আর (প্রেমলকে দেখিয়ে) ওর মধ্যে দিয়ে। জানো? তোমার মা এসেছিলেন আমারই ডাকে। আমি তাঁকে লিখেছিলাম যে, আমার ধূলাখেলা সাঙ্গ হয়েছে।"

মা মাথা নীচু ক'রে তাঁকে প্রণাম করলেন, বললেন: "হ্যাঁ। আমিও দেখেছিলাম। আর বলেছিলাম মনে আছে—যে তুমি যা চাইছ তা পাবে। "কেবল"—ব'লে চকিতে আঁচলে চোখ মুছে—"এত শীগগির ডাক আসবে ভাবি নি—(ললিতাকে) কী পাগলী রে! বললেন না উনি—যাবার বেলায় পিছু ডাকতে নেই! আনন্দ লগ্ন এসেছে রে—চোখের জল ফেলছিস কি! গান গা— মাকে বরণ ক'রে।"

ব'লে মৃদুস্বরে ধরলেন রামপ্রসাদের গান:

　　অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি?
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।

(এ) দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি।

(ললিতা ও তারাকে) ধরো ধরো মা গাও :

দেহের মধ্যে স্বজন যেজন তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি

এবার শমন এলে হৃদয় খুলে তায়দেখাব

ভেবে রেখেছি

(প্রেমল, প্রণব, অসিত ও ডাক্তারবাবুকে)

তোমরাও দোয়ার দাও বাবা :

সারাৎসার তারা নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি

রামপ্রসাদ বলে—দুর্গা ব'লে যাত্রা ক'রে ব'সে আছি।

ওদের দোয়ারের রেশ মিলিয়ে যেতেই মহেন্দ্রবাবু বললেন প্রেমলকে : "আমাকে নিয়ে চলো বাবা গঙ্গাতীরে। অন্তর্জলী……অন্তর্জলী……মা মা মা!"

সবাই ধরাধরি ক'রে কয়েক ধাপ নামিয়ে তঁকে গঙ্গাতীরে আনতেই বললেন : "না না, কোন বিছানা না …মাটি…মাটি…পা ডুবিয়ে দাও :

অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে

অর্ধ অঙ্গ রবে স্থলে……।

ব'লে গঙ্গাজলে কটি পর্যন্ত ডোবাতেই "আসছি গো মা"—ব'লেই স্থির উত্তান নয়ন।…

মা স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে সকলের মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে ভাবমুখে বললেন : "না না কান্না নয় নয় নয়। শুভ দিনে চোখের জল ফেলতে আছে?… দেহের খাঁচায় যে আলোর পাখী বন্দী ছিল সে আজ… ঐ যে…মা-র পায়ে মুক্তি পেল…কাশীতে দেহরক্ষা…কাশীর গঙ্গায় অন্তর্জলী…ধন্য…আহা…জয় মা!" ব'লে অসিতকে : "গাও বাবা শুধু গাও…গাও…হ্যাঁ…গাইবে বৈ কি… গাও গঙ্গার নাম গাও…মা…মা…মা…"

অসিত ধরে, ললিতা ও তারা দোয়ার দেয় :

এসো গগনগঙ্গী, খরতরঙ্গী, বৃন্দসুন্দর গানে।

এসো মূর্ছনে তব উছলিয়া নব রাগমালা-তানে।

আমি অর্পি তব চরণে মা,

লভি আমি তব বরণে মা,

যত ধূলিধূসর মলিনতা হর' অমল তব বরদানে।

এসো প্রেমমন্ত্রে আজি

ম্লান প্রাণতন্ত্রে বাজি,

করো পূর্ণ অন্তর মা, নিরন্তর ধন্য তব আহ্বানে।

আমি চাহি না মা শক্তি,

করি প্রার্থনা শুধু ভক্তি,

তব সুচির শরণে জিনিব মরণে নিত্য সাঁঝবিহানে।

এসো শান্তি নির্ঝরি মর্মে,

জয় ভক্তি' নর্মে কর্মে,

এসো পতিতপাবনি! ললিতলাবণি! মধুরিমা

অভিমানে॥

মা-র সমাধি…নিশ্চল…দীপ্ত…আধ নিমীলনেত্র…মুখে হাসি…অপাঙ্গে আনন্দাশ্রু …

সবাই গঙ্গামাটির'পরে সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে মা-কে প্রণাম করে…

(দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত)

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

লবণ সাগর বা বাল্‌খাশ্ হ্রদের তীরে দেবাসুর-সংগ্রাম প্রথম আরম্ভ হয়। এখানে পাঠকদের বোঝার সুবিধের জন্যে পৌরাণিক নামগুলির আধুনিক বাংলা অর্থ খানিকটা তুলে দেওয়া হল। বিশুদ্ধ পুরাণ ছাড়া বৈদিক সাহিত্য ও রামায়ণ-মহাভারতের নামগুলিরও অর্থ দেওয়া হচ্ছে :—

দেব—আদিম আর্যভাষী মূল আর্য জাতি, ঋগ্বেদীয় বৈদিক আর্য জাতিও এই নামের অন্তর্গত হতে পারে।

মানব—ঋগ্বেদের পরবর্তী বৈদিক আর্যজাতি এবং ভারতীয়-আর্যভাষী জনসমষ্টি।

অসুর—এ্যাসিরিয়ান বা প্রকৃত অসুরজাতি এবং অসুর-দেবতা উপাসক ইরানীয় আর্যজাতি।

দৈত্য, দানব—বৈদিক আর্যদের জ্ঞাতি পাশ্চাত্য আর্যজাতিসমূহ।

রাক্ষস—লঙ্কার প্রাচীন অনার্য জাতি।

বানর—দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতিসমূহ।

ভল্লুক—নিগ্রোবটু কৃষ্ণকায় অনার্য জাতি।

পক্ষী—"বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ"—বাঙালি, ছোটনাগপুরি আর মণিয়ালি অনার্য জাতিসমূহ।

নাগ—নাগপূজক জাতি।

কিরাত—পার্বত্য ভোট-চীন ভাষাভাষী জাতি।

দাস বা দস্যু—দ্রাবিড় জাতি।

ব্যাধ, নিষাদ—অস্ট্রিক জাতি। ব্যাধের বিকৃত রূপ "বেদ্দা" শব্দের দ্বারা নিগ্রোবটুদেরও বোঝায়।

পিশাচ—তিব্বতীয় পাহাড়ি অনার্য জাতি।

কিম্পুরুষ—তিব্বতীয় জাতি।

গন্ধর্ব—তুর্কিস্থানবাসী সঙ্গীতজ্ঞ জাতি। এরা ভারতীয় আর্যদের এক শাখা বা তোখারীয় আর্যজাতিও হতে পারে।

সপ্ত দ্বীপ, নব বর্ষ ও সপ্ত সমুদ্রের সংজ্ঞা, অবস্থান ও বিস্তারক্ষেত্রে এক এক যুগে এক এক ভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

সাধারণত দৈত্য-দানব-অসুর তিনটি নামকেই সমার্থক ধরা হয়। কিন্তু এটা মস্ত বড় ভুল। দৈত্য ও দানব পরস্পর থেকে আলাদা তো বটেই, তারা আবার অসুর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। অসুররা অনার্য এবং সেমীয়; কিন্তু দৈত্য ও দানবরা পরবর্তীকালে মিশ্র হয়ে পড়লেও তারা ভারতীয় আর্যদের জ্ঞাতি এবং মূলত ভারত-ইউরোপীয় জাতির লোক। দেবজাতির প্রথম উদ্ভব কাস্পিআন সাগরের তীরে, তাদের আদিপুরুষ কশ্যপ মুনি, যিনি ইন্দ্রেরও পিতা। তিনি অদিতির গর্ভে যেমন দেবতাদের, তেমনি দিতির গর্ভে দৈত্যদের এবং দনুর গর্ভে দানবদের জন্ম দেন। অদিতির বংশধর দেবরা দৈত্য ও দানবের জ্ঞাতি ভাই। দেব, দৈত্য ও দানব —আদিম আর্য জাতির এই তিনটি শাখাই এক উৎস থেকে উৎপন্ন। দৈত্যদানবাদি কশ্যপের অন্য সন্তানেরা ইউরোপীয় ও এশীয় অন্যান্য আর্যদের পূর্বপুরুষ।

কশ্যপের বাস ছিল ঘৃত সমুদ্রের তীরে স্বর্গভূমিতে। ঘৃত সমুদ্রের বর্তমান নাম কাস্‌পিআন সাগর বা কাশ্‌পীয় সমুদ্র। কশ্যপ নাম থেকে কাস্‌পিআন শব্দ এসে-থাকা স্বাভাবিক। কাস্‌পিআন সাগর ও তিএন্‌শান্ পর্বতের মধ্যস্থ ভূখণ্ড পৃথিবীর অসংখ্য জাতির আদি বাসস্থান; বিদ্যানিধির মতে পুরাণে এই অঞ্চলকেই স্বর্গ বলা হয়। এই এলাকাই আদিম আর্য জাতিরও আদি বাসস্থান।

দেব ও অসুরদের আকৃতিগত পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। অর্থাৎ তাঁরা দুটি স্বতন্ত্র জাতি ব'লে তখনই পরিগণিত হতেন। পুরাণে বর্ণিত শিব বা মহাদেব বা তন্ত্রশাস্ত্র-প্রবর্তক মহাপুরুষ দেবাসুর-সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ের বা তারকাসুর বধের ঘটনার সমকালীন এবং রামচন্দ্রের বেশ কিছু পূর্ববর্তী লোক।

মহাদেব বা তাঁর প্রবর্তিত তন্ত্রশাস্ত্র কপিলমুনি বা সাংখ্যদর্শনের পরবর্তী রচনা; বেদ-বিভাগের আগে তন্ত্রের উদ্ভব হয় নি, এটাও স্মরণীয়। অতএব, মহাদেব-সতী-হৈমবতী-কার্তিকের-তারকাসুর-কাহিনীর সময়-নিরূপণ খুব কঠিন কাজ নয়। কার্তিকেয়ের জন্মের আগে মহাদেব দক্ষকে তন্ত্রশাস্ত্র রচনার কথা বলেছেন। তন্ত্র রচনা ও প্রবর্তন নিয়ে বেদাচারী দক্ষের সঙ্গে প্রথম তান্ত্রিক মহাদেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মহাদেব প্রথমে বর্ণাশ্রমপ্রধান আর্যসমাজ-চ্যুত হলেও পরে আর্যসমাজে গৃহীত হন এবং তন্ত্রশাস্ত্র ভারতে প্রচলিত হয়। কিম্পুরুষ বা বিকট আকারের তিব্বতীয় লোকেরা শিবের অনুচর ছিল। তন্ত্র সাঙ্গ বেদ ও কপিলমুনি-প্রবর্তিত সাংখ্যদর্শন থেকে উদ্ধৃত ব'লে বর্ণিত। সাংখ্য ও তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বদুটি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কপিলমুনি রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভগীরথের পূর্ববর্তী। ভগীরথ গিরীন্দ্রশেখরের হিসেব অনুসারে রামচন্দ্রের পূর্ববর্তী দ্বাবিংশ পুরুষ। বেদ-বিভাগ প্রথমবারের মতো ২৪৪৯ খ্রীষ্টপূর্ব সালে হয়ে থাকলে তন্ত্রের উদ্ভব ভগীরথ এবং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দীর পরে। ভগীরথ রামচন্দ্রের প্রায় চার-পাঁচ শতাব্দী আগের লোক হতে পারেন। সুতরাং ভগীরথও প্রায় প্রথম বেদ-বিভাগ কালের বা তার কিছু পূর্ববর্তী আমলের লোক। প্রথম বেদ-বিভাগ যে রামচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালের অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতকের, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রামচন্দ্র খ্রীষ্টপূর্ব একবিংশ শতকের, প্রথম বেদ-বিভাগ পঞ্চবিংশ শতকের, ভগীরথ পঞ্চবিংশ-ষড়্‌বিংশ শতকের এবং কপিলমুনি প্রায় তার সমকালীন লোক—এ-রকম হিসেব করা যুক্তিসঙ্গত। তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপার তা হলে খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪৯-২০৫৫ সালের ব্যাপার। বেদ-বিভাগ সম্পন্ন হয়ে বেদশাস্ত্র যখন বর্ণবিভাগ ও অধিকারভেদের ওপর স্থাপিত হল, তখনই বৈদিক-অবৈদিক আর্য-অনার্য সর্বসাধারণের জন্যে শিব তন্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং আর্যসমাজ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে লাগল বৃহত্তর হিন্দুসমাজে, যে-সমাজ ঢের বেশি উদার, পরমত-সহিষ্ণু, বহু ক্ষুদ্র সমাজের বিরাট সমষ্টি, সর্বাস্তিবাদী, বহুপূজক, একেশ্বরবাদী অথচ পৌত্তলিক যে কোন মত ও পথের আশ্রয়স্থল। কিন্তু শোণিত-মিশ্রণের সম্ভাবনার পথ এই তন্ত্র-সাধনার দ্বারা উন্মুক্ত ও স্বীকৃত হল। তান্ত্রিক আচার-পদ্ধতি হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। কিন্তু সেগুলি শাস্ত্রাকারে প্রথম সঙ্কলিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ থেকে একবিংশ শতকের মধ্যে। বৈদিক রুদ্রোপাসনা আর সৌবীর জাতির লিঙ্গোপাসনা যুক্ত হয়ে শিবোপাসনা প্রবর্তিত হল এই সময়ে। শিব নিজে আর্যজাতির লোক হলেও আর্য-অনার্য উভয় জাতির এবং মিশ্র বর্ণসঙ্করদের নেতা তথা দেবতা ব'লে গণ্য হন; তাঁর পূজা-পদ্ধতিও আর্য-অনার্য উভয় রীতির মিশ্রণ এবং তা আর্যসমাজসম্মত ছিল না। অবশ্য বৈদিক আর্যদের বিরক্তিভাজন হলেও বৃহত্তর হিন্দুসমাজে শিব সাদরে অতি জনপ্রিয় দেবতারূপে বৃত হলেন।

রামায়ণ-কাহিনী তন্ত্রের পর লিখিত। দেবাসুর-সংগ্রাম তথা আর্য-অসুর সম্পর্কের অবনতি এবং বেদে অসুরদের প্রশংসা বন্ধ ক'রে, নিন্দা সুরু করা—এ-সব ঘটনা বেদ-বিভাগ হবার আগের ব্যাপার হতে বাধ্য।

পেন্‌সিল্‌ভ্যানিআর অধ্যাপক Morris Jastrow, Jr., ১৯১৫ সালে The Civilisation of Babylonia and Assyria গ্রন্থে যা লিখেছিলেন, তাতে দেখা যায় যে, কাসাইট আর্যরা খ্রীষ্টপূর্ব একবিংশ শতকেই বেশ প্রাবল্য লাভ করে। বাবিলনের বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরাবি ২০৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মারা যান। তাঁর পুত্র সাম্সুইলুনার আমলে কাসাইটদের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এরা অর্ধসভ্য, পার্বত্য, দ্রুত শিক্ষালাভে পটু জাতি ছিল। ২০৭১ খ্রীষ্টপূর্ব সালে সাম্সুইলুনার সঙ্গে এদের যুদ্ধ হয়। এই সময়ে অ-সেমীয় সুমের জাতি বা সুমেরীয়রা কোণঠাসা অবস্থায় দক্ষিণ অঞ্চলে পতিত জমিতে বাস করত। তাদের জ্ঞাতি ব'লে অনুমিত মহেঞ্জোদাড়োর সুবীর জাতি বা সিন্ধু-সৌবীরদেরও তখন প্রায় এক অবস্থা। হিটাইট বা হিত্তিরাও খ্রীষ্টপূর্ব বিংশ শতকে প্রবল হয়ে ওঠে এবং সিরিয়া থেকে কৃষ্ণ ও কাশ্যপ সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করে। অর্থাৎ অসুর-বাবিলনীয় দুই সেমীয় জাতির শ্রীবৃদ্ধির দিনেও কাস্‌সি, হিত্তি, মিতান্নি প্রভৃতি ভারত-ইউরোপীয় জাতিগুলির বিশেষ

শক্তি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। অধ্যাপক মশাইএর মতে, ইউফ্রাতেস নদীতটের সেমীয় সভ্যতাদুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ বছরের মতো প্রাচীন। ঐতিহাসিকদের মতে, আর্যদের সঙ্গে সেমীয়দের যুদ্ধ অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব একবিংশ শতকের মতো প্রাচীন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আর্য জাতিগুলি প্রায়শ উত্তর দিক থেকে সমাগত দস্যুদল বা Northmen-রূপে কর্মরত ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৯২৬ সালে হিত্তিদের আক্রমণে বাবিলনীয় রাজবংশ বিধ্বস্ত হয়। তার মানে, হাম্মুরাবির পর ২০৮১—১৯২৬—মাত্র ১৫৫ বছরের মধ্যে অত বড় সম্রাটের রাজবংশ ধ্বংস হয়। ২০৭১—১৯২৬—মাত্র ১৪৫ বছরের মধ্যে আর্যদের আক্রমণে সেমীয়রা বিপর্যস্ত হয়। হিত্তিরা খত্তি বা ক্ষত্রিয় নামেও পরিচিত ছিল। মিতান্নিরা এদেরই জাতি। অতএব, ভারতীয় বৈদিক আর্যজাতি এবং ক্ষত্রিয়দের শাখা এই সময়ে ব্রহ্মপুত্র-ভাগীরথীতীর থেকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত এলাকায় সামরিক আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

আর্যদের সহিষ্ণু ও পরিচ্ছন্ন অধ্যাত্মচিন্তা অসুর বা সেমীয় এবং মিশরী বা হামীয় পুরোহিতদের কাছে অসহ্য বোধ হত। মিশরীয় জাতি ভারতীয় আর্য উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত হলেও আর্যদের পছন্দ করত না। ভিন্ন উপাদানগুলির প্রাধান্যই এর কারণ ছিল। সেমীয় জাতিগুলি পরে ব্রহ্মতত্ত্বের অনুকরণে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মতবাদের পরমত-সহিষ্ণুতার পরিবর্তে তারা মার্দুক ও ইএওবা বা জিহোভার মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বাধিকারপ্রমত্ত পরমত-অসহিষ্ণু এক ঈশ্বরের পরিকল্পনা রচনা করে।

তিগ্রিস ও ইউফ্রাতেস নদীর যে-মোহানাভূমি পারস্য উপসাগরের কূলে অবস্থিত, তাকে ঐ অধ্যাপক Sea Land বলেছেন। মহাভারতে ঐ অঞ্চলকে সাগরগর্ভে অসুরের বাসভূমি ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাবিলনের সেমীয়রা যখন সাগররাজ্যবাসী সুমেরদের রণকামড়ে বিব্রত, তখন হিত্তিরা সাম্সুদিতানাকে পরাস্ত ক'রে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯২৬ সালে বাবিলনে এক হিত্তি সর্দারকে সিংহাসনে বসায়। অব্যবহিত পরে অষ্টাদশ শতকে কাসীরাও বাবিলনে রাজত্ব করে। হয়তো মধ্যবর্তী কালে, ২০শ—১৮শ শতকে সুমেরীয়রা কিছুদিন, Jastrow-র অনুমান, প্রায় ১৫০ বছর, সমস্ত সুমের ও আক্কাদ শাসন করতে পেরেছিল। আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টপূর্ব সালে কাসাইট আর্যরা বাবিলন জয় করে। ১৯২৬—১৭৬০=১৬৬ বছরের মধ্যে হিত্তি কাস্সি প্রাধান্যের ফাঁকে অজ্ঞাতপরিচয় সুমেরীয় জাতি কিছুদিন ক্ষমতা পেয়ে থাকবে।

পাঁচশো বছর কাস্সিদের অধীনে থাকার পর বাবিলন ও নিনেভে মহানগর কেন্দ্রদুটিতে সেমীয়রা বলবান্ হয়ে ওঠে। কিন্তু ৬৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অসুরসম্রাট এসারহাদ্দনের সময়ে আর্য Volkerwanderungen (ফেল্কেরভ্যান্দেরুঙ্গন্ = গণঅভিপ্রয়াণ) প্রবল হয়ে ওঠে; সিমেরীয়, মান্নাই ও আশ্গুজীয় নামের আর্য জাতিগুলির খবর আসুর রাজকীয় ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। ৬২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অসুরবানপাল মারা যাবার পর বিশ বছরের মধ্যে নিনেভে-র পতন ঘটে উত্তরপূর্বাগত আর্য দঙ্গলের আক্রমণে। এটা গৌতম বুদ্ধের নিতান্ত সমকালীন ঘটনা। ৬৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অসুর সাম্রাজ্য ইরান থেকে মিশর পর্যন্ত সমস্ত পশ্চিম এশিয়া এবং মিশরের বা মধ্যপ্রাচ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু আর্যদের আদি বাসভূমি ইরান ও ভারত থেকে আগত আর্যদের সম্মিলিত আক্রমণে প্রাক্-গৌতম যুগেই অসুরদের ধ্বংস আরম্ভ হয়। জগতের চরম শক্তিশালী বা তৎকালীন পৃথিবীর বৃহত্তম তথা প্রথমস্থানীয় সামরিক শক্তির মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা থেকে সত্তর বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বিপুল বিক্রমে লড়াই ক'রে অতিরিক্ত শক্তিক্ষয়ে অসুর জাতি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আসুরিক শক্তি ও সভ্যতার দৌর্বল্য এই থেকে সূচিত হয়। ভারতীয় আর্য সভ্যতার দৃঢ় বনিয়াদ এর দ্বারা আরও স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করা যায়।

৬৮০ খ্রীষ্টপূর্ব সালেও Sea Land বা সাগর-রাজ্য যে এসারহাদ্দনের বশ্যতা স্বীকার করে নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানকার লোক ছিল মুখ্যত অ-সেমীয় সুমের জাতি। তারা সেমীয়দের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে। পরবর্তী কালে তারা ইরানের আর্যদের সঙ্গে মিশে গিয়ে থাকবে।

জাতির লোক; তিনি ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্ব বাবিলনে—যা তখন অসুর সাম্রাজ্যের বা সেমীয় সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সর্বপ্রধান নগর—অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে বাবিলন ও অসুর রাজ্যের রাজনৈতিক অবলুপ্তি হয়।

বাবিলনীয় জাতির উপাস্য মার্দুক হচ্ছে অসুরমজ্দা থেকে আগত আহুরমজ্দার মতো এক দেব-সত্তার বাবিলনীয় সংস্করণ। Jastrow লিখেছেন যে :—

"The prayers addressed to marduk is sometimes so pronounced that if one substi-Mutes Yahweh or god for Marduk, they might form part of a Jewcish or Christian servirce of to-day,

"মার্দুকের উদ্দেশে নিবেদিত প্রার্থনা কখনও কখনও এমনভাবে বিঘোষিত যে, মার্দুকের বদলে যদি জিহোভা বা গড্ ব্যবহার করা যায়, তা হলে আজকের দিনের ইহুদি বা খ্রীষ্টান উপাসনার অংশ গঠন করা যেতে পারে।"

যুগ যুগান্তরব্যাপী পরিবর্তন সত্ত্বেও সেমীয় অধ্যাত্ম-প্রকৃতি যে অপরিবর্তিত আছে, তা অধ্যাপক মশাই পঞ্চাশ বছর আগে লিখে গেছেন। আসুরিকতার বৈশিষ্ট্য ও অসুরচরিত্রের সংজ্ঞা সম্বন্ধে Jastrow লিখেছেন :—

"Undue emphasis on might; craving for power, amblition to extend power beyond the natural boundary; cruel and remorseless."

"শক্তির ওপর অযথা গুরুত্ব আরোপ; ক্ষমতার লালসা; স্বাভাবিক সীমানার বাইরে ক্ষমতা সম্প্রসারণের উচ্চাশা; নিষ্ঠুর এবং অনুতাপবিহীন।"

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার সাহিত্যে অসুরদের ঠিক ঐ প্রকৃতিই বারবার নির্দেশ করা হয়েছে। সেমীয়রা দেবতাদের প্রাকৃতিক শক্তির প্রমূর্ত রূপ মনে করত; ভারতীয় আর্যরা তা কখনও করে নি। তারা দেবতাদের প্রাকৃতিক শক্তির অন্তরালে অবস্থিত নিয়ন্ত্রী শক্তি ব'লে ভাবত। অশ্ব ও অশ্বারোহীর মধ্যে যে পার্থক্য, সেমীয় দেবতা মার্দুক, অসুর প্রভৃতির সঙ্গে রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতির সেই পার্থক্য। আর্য দেবতা যথারীতি বাবিলন-অসুর রাজ্যে দৈত্যে পরিণত; বৈদিক দেবতা দ্যৌঃ বা দিউস্ বা গ্রিক দেবতা জিউস সেমীয়দের ভাষায় "তিউ" দৈত্যে পরিণত, যার চরম লক্ষ্য কেউ জানে না ব'লে আতঙ্কের অবধি নেই—"whose final goal no one knows" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের "শেষ নাহি-যে, শেষ কথা কে বলবে ?" এই সঙ্গীতে অসুর-প্রাণে জাগবে আতঙ্কের স্পন্দন। মানবাত্মার অনন্ত অভিসার অসুর-মনে আনে অনৈশ্চিত্যের বিভীষিকা!

মিশরীয় পুরোহিতরা সূর্যোপাসক একেশ্বরবাদী ঋগ্বেদপন্থী আটনসেবক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে। আমন প্রভৃতি পৌত্তলিক দেবদেবীর উপাসনায় তাদের আগ্রহ ছিল। অসুররাও মার্দুক ও অসুর দেবতার উপাসক ছিল। বুদ্ধের সমকালে বাবিলনের সুমেরজাতীয় রাজা নেবোপোলাস্সার (৬২৫-৬০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সাগরভূমি থেকে এসে রাজত্ব লাভ করেন। তাঁর ছেলে নেবুচাদ্নেজার (৬০৪-৫৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বাবিলনকে মহাসমৃদ্ধি দান করেন। অথচ বিদ্যুদ্বেগে আসুরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবিলনেরও পতন হ'ল। তার কারণ jastrow বুঝতে পারেন নি।

প্রকৃত রহস্য এই যে, ইতিমধ্যে বাবিলনীয় সভ্যতা দারুণভাবে মিশ্র সভ্যতা হয়ে পড়েছিল। নেবুচাদ্নেজারের সমৃদ্ধি মাত্র এক পুরুষে তাঁর পুত্র আমেলমার্দুকের সময়ে লুপ্ত হল। সুমেরীয় আমেলমার্দুক কর্তৃক সেমীয় দেবতার নামে অভিহিত হওয়া থেকে মিশ্রণের পরিমাণটা বোঝা যায়। আমন হোতেপ থেকে আমেলমার্দুক পর্যন্ত বিভিন্ন রাজন্যবৃন্দের ইতিহাস আলোচনায় বোঝা যায়, শোণিত-মিশ্রণের কুফল বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার ধ্বংসের কারণ। অতি মিশ্রণের জন্যেই অসুর, বাবিলনীয় সুমের, এলামীয়—কোন জাতিই স্থায়িত্ব লাভ করে নি। আর্য হ'লেও মিশ্রণের জন্যে হিত্তি, মেদে, কাশী, কুশ, আগ্নেয় ও তুষার জাতিগুলি চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইরানীয় আর্য ধর্ম-মতবাদ জরথুস্ত্রপন্থা এক সঙ্গে আসুরিক উপাসনা ও পৌত্তলিকতা বরবাদ করে। অবশ্য জোরোআস্তর-বাদের মধ্যে আসুর ধর্মমত অনুস্যূত হয়। বৈদিক ভারতের পতনের পর ভারতে ক্ষাত্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় অসুরদের অভ্যুদয় হয়েছিল। অসুরদের পতনের পর পারস্য, গ্রিস ও মৌর্য ভারতের অভ্যুদয় সূচিত হল

দেবাসুর সংগ্রামের আনুমানিক কালনির্ণয়প্রসঙ্গে প্রথমবার বেদ-বিভাগ ২৪৪৯ খ্রীষ্টপূর্ব সালে হয়েছিল ব'লে ধরা হয়েছে। এবার বেদ-বিভাগের কাল নির্ণয় করা যাক। যদি প্রথমবার বেদ বিভাগ ২৪৪৯ সালেই হয়ে থাকে, তা হলে আর্য অসুর যুদ্ধবিগ্রহ পঞ্চবিংশ শতকেরও পূর্ববর্তী। সমুদ্র-মন্থনের পৌরাণিক কাহিনীর সময় থেকে প্রথম দেবাসুর-যুদ্ধ সুরু হ'ল ধরা যায়। কিন্তু অনুমান করা যায় যে, আর্যরা আরও আগে থেকে অসুরদের সামরিক শক্তির পরিচয় পেয়ে আসছিলেন। তাঁরা অসুরদের ভয় করতেন, পুরাণে তার পরিচয় আছে। তারকাসুর-বধ কাহিনী খ্রীষ্টপূর্ব একবিংশ থেকে পঞ্চবিংশ শতকের বটে, কিন্তু দেবাসুরের আরও আগের যুদ্ধকাহিনীও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বেদ-বিভাগের কাল থেকে ঐ সব যুদ্ধের কাল হিসেব করা যায়। আপাতত বেদ-বিভাগের কাল আমাদের আলোচনায় প্রয়োজন।

ঋগ্বেদ কৃষিপ্রধান সভ্যতার কাব্য; অথচ, তাতে গোধূম ও মসূর শস্যদুটির উল্লেখ নেই। পূজার নৈবেদ্য, পিতৃপুরুষের তর্পণে গম বিহিত নয়; গম ঋগ্বেদের আর্যদের অজ্ঞাত ছিল। আর্যরা যে খাবার নিজেরা খেতেন, সেই গৃহীত স্বীকৃত ভোজ্য দ্রব্যই তর্পণে উৎসর্গ করা হত; যথা যব ও তিল। কিন্তু যজুর্বেদে (শুক্ল, ৬৩) বৈদেশিক শস্য ব'লে উল্লিখিত গম ও মসুরি সাধারণ খাদ্যরূপে স্বীকৃত। এ-দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিদ্যানিধি মশাই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বেদ-বিভাগের আগে শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদের শ্রেণীবিভাগ হতে পারে না। যদি যজুর্বেদ পঞ্চবিংশ খ্রীষ্টপূর্ব শতকের সঙ্কলন হয়, তা হলে ঐ সময়ে গম ও মসুরি আর্যদের খাদ্যে পরিণত। মহেঞ্জো-দাড়োয় গম পাওয়া গেছে। তার সভ্যতা অন্তত তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের, অনার্যরা নিশ্চয় বেদ-বিভাগের আগে থেকে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতকেরও আগে থেকে গম ও মসূরের চাষ করত। আর্যরা তাদের কাছ থেকেই ও-দুটি নিয়ে ছিলেন। অতএব ঋক্ ও যজুর্বেদের মধ্যবর্তী সময়ে আর্য সমাজের অল্পসংখ্যক খাদ্যের মধ্যে গম ও মসূর গৃহীত হয়। ঐ মধ্যবর্ত্তী সময় দীর্ঘকালব্যাপী। কারণ, ঋগ্বেদের সরল প্রাণচঞ্চল সভ্যতা যজুর্বেদ জটিল ও সমৃদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

স্বপন প্রিয়া

নৃপেন আকুলি

তুমি কেন মোর মনের কাননে সোনার হরিণী হয়ে—
খেল লুকাচুরি দুনয়নে কেন এত চপলতা লয়ে ?
কাছে এসে কেন সয়ে যাও দূরে দাও না কেন ধরা,
এই কি তোমার ভালবাসা প্রিয়া নিয়ত ছলনা করা ?
আমার এ হাতে হাত মিলাইতে ডাক দিয়ে কেন যাও ;
দূর হ'তে কেন আমার আঁখিতে আঁখিটি মিলাতে চাও ?
দূর হতে শুনি নূপুরের ধ্বনি, শুনি যে তোমার গান ;
চকিতে পলাও ক্ষণিকে আমার আকুলিত করি প্রাণ।
কখনো দাঁড়াও নিশীথ শয়নে তন্দ্রার উপকূলে—
দুহাতে জড়ায়ে কুসুমের মালা নীরবে চরণ ফেলে।
কখনো তোমার কোমল হাতের ছোঁয়া দিয়ে শিরোপরে-
সুদূর আকাশে মিলাইয়া যাও চাঁদের রশ্মি ধরে।
একি অভিমান ভালবাস বলে তা যদি হয় প্রিয়া—
তোমারে তুষিতে হবনা বিমুখ সারাটি হৃদয় দিয়া।
এ বিরহ ব্যথা সহিতে পারিনা কাছে এসে ধরা দাও—
মোর হৃদয়ের তটিনীর কূলে বাহিয়া সোনার নাও !
তোমার আসন সাজায়ে রেখেছি প্রাণের মর্ম-মূলে ;
তোমারে বরিতে গাঁথিয়াছি মালা ব্যথার অশ্রু-ফুলে।
এসো কাছে এসো তোমার আঁখির অরুণ কিরণ পাতে
আমার এ আঁখি ভরে দাও প্রিয়া স্বর্গীয় সুষমাতে !

রতনমণির বিয়ে

শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দশ বারো বছরের নাতনী রতনমণিকে নিয়ে রোজ মাছ বেচতে আসতো নতুনবাজারে শশীমুখী। লম্বা ছিপছিপে কালো'কুলো মোহারা গোছের চেহারা। কাঁচা-পাকা পাতলা চুলগুলো বড় বড়ীর মত পিছন দিকে বাঁধা থাকতো। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো পাকা তেঁতুলবীচির মত হোয়ে গিয়েছিল। পরণে সাদা থান আধময়লা—মাছের আঁসটানিতে ও জল লেগে লেগে হাতের পায়ের আঙ্গুলগুলো হেজে গিয়েছিল। টাটকা মাছ সে বিক্রী করতো। ট্যাংরা, গুলে, পার্শে, চিংড়ী ইত্যাদি মাছই সে রোজ আনতো। তার দোকানে সেইজন্যে ভীড়ও হোত খুব। দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই তার সব মাছ কেটে যেতো। নাতনী রতনমণি তার পাশেই বসে থাকতো। আধময়লা গোলগাল ভরাট-ভরাট চেহারা। টানাটানা ভাসাভাসা চোখ দু'টী,—টোলপড়া গাল দু'টিতে হাসলে পরে আরো টোল খেয়ে গিয়ে ভারি সুন্দর দেখা'তো। আধময়লা একটি ফ্রক পরে রুখু রুখু টানটান করে চুল বেঁধে রোজ ঠাকুরমার পাশে বসে বসে উট্-ঘুট্ করতো।

রোজই তাকে বাজারে দেখতাম। হয়, কোনদিন ঠাকুরমার পাশে বসে ছুটো বাট্‌কারা নিয়ে ঠোকাঠুকি করছে, নয়তো বালতি করে জল নিয়ে আসছে কিম্বা ভাঁড়ে করে চা-বিস্কুট, পান আনছে। কখনও ঠাকুরমার কাছে বকুনি খেয়ে গোঁজ হোয়ে বসে আছে। কখনও ঠাকুরমার কথায় হেঁসে গড়িয়ে পড়ছে।

জেলেদের মেয়ে হ'লে কি হবে গড়ন পিটনে আচ্ছা-আচ্ছা রূপসী মেয়েদেরও সে ঈর্ষার বস্তু। তার ওই বালিকা বয়সেই নিটোল স্বাস্থ্যে ভরা দেহবল্লরীতে কুড়ীর মাগল তাণ্ডব তাণ্ডব করছে। আগত লাবণ্যভরা যৌবনশ্রীর ছোঁয়াচ লেগে বাইরে ফুটি' ফুটি' হোয়ে বেরিয়ে আসবার জন্য সবে যেন উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। পঞ্চ রসের একত্রিত সঞ্চিত রসধারা স্বরগী হোয়ে একটু একটু করে তার তনুপল্লব মনকে আচ্ছাদিত করবার জন্য উন্মুখ। সে হয়তো তখনও তেমন ভাবে নিজেকে অতটা অনুভব করতে না পারলেও আশেপাশের সম-ব্যবসায়ী ছেলে ছোকরারা চোখ ঠারাঠেরি ও আভাসে ইঙ্গিতে নানারকম ঠাট্টা তামাসা করতেও ছাড়তো না। ওদের সমাজে ও রকম চলে।

বহুদিন থেকেই আমি শশীমুখীর কাছ থেকে মাছ নিতাম। মাছের 'কন্ট্রোল' হওয়াতে লাইন দিয়ে মাছ কেনা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। শশী-মুখীকে আগে থেকে বলা ছিল—সে রোজ আমার জন্যে যেদিন যেমন মাছ আনতো আলাদা ওজন করে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে দিত। আমি গিয়ে নিয়ে আসতাম। যেদিন না যেতে পারতাম কি দেরি হোত শশী মাসী ঘর যাবার পথে আমাদের বাড়ী দিয়ে যেতো বা আমার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতো। রোজই দেখতাম নাতনী কাছে বসে বসে হয় মুড়ি খাচ্ছে—নয়তো যা হয় কিছু একটা করছে। তার সম্বন্ধে কোন দিন কোন প্রশ্নও মনের মধ্যে জাগতো না।

সেদিন আমার বাজারে যেতে বেশ খানিকটা দেরী হোয়ে গেছলো—এতটা দেরী কোনদিনই আমার হয়নি একটা বিশেষ জরুরী কাজে খুব সকালেই বেরুতে হয়েছিল। এতটা যে দেরী হোয়ে যাবে তা মোটেই ভাবিনি। বাড়ীতে এসেই জ্যেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা করলা

শশী মাছ দিয়ে গেছে নাকি? জ্যেঠাইমা বল্লেন: কই না বাবা! শশী তো আসে নি? আমি তাড়াতাড়ি মাছের থলিটা নিয়ে ছুটলাম: মনে মনে চিন্তা করতে করতে যাচ্ছিলাম যে, আজ হয়তো আর মাছ পাওয়া যাবে না—শশী মাসি যখন বাড়ীতে মাছ দিয়ে যায়নি—তাহলে নিশ্চয়ই আজ হয় তো কিছু হয়ে থাকবে, হয়তো শশীমাসি আসেনি নয় কম মাছ অন্য কেউ জোর করে কিনে নিয়েছে। যাই হোক ব্যাপারটা কি তাই জানবার জন্য ছুনোমুনো মনে গিয়ে দেখি, শশী তার দোকানপাট তুলে দিয়ে বাড়ী যাবার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছে আমার অপেক্ষায়! আমাকে দেখেই বললে: কি গো বাবাঠাকুর! আজ এত বেলা হোয়ে গেল কেন গো বাবু। আমি এই এখনি যাচ্ছিলাম তোমাদের ঘরে দিয়ে আমার ঘরকে চলে যেতুম।

আমি বললাম: আজ একটা বড় জরুরী কাজে গিয়েছিলাম মাসি—তাই এতটা যে বেলা হ'য়ে যাবে তা ভাবিনি—এই দেখ না বাজার-হাট কিছুই করা হয়নি এখনও, তাই ছুটতে ছুটতে আসতে হোল। আমি তাকে মাসি বলেই ডাকতাম। তা'তে সে খুব খুশীই হোত। মাঝে মাঝে সে আমাদের বাড়ী যেতো আসতো এবং খেয়ে-দেয়ে সন্ধ্যের সময় যেতো। যেদিন আসতো সেদিন বেশ কিছু মাছ নিয়ে আসতো। আমার জ্যেঠাই-মা তাতে রাগ করতেন কিন্তু কিছুতেই সে তা শুনতো না বলতো: শুধুমুহু রাগ করবেন নি দিদিঠাকুরুণ ছেলেপুলেদের জন্যে একটু আধটু আনন্দ করে নিয়ে আসি তাতে আমার তৃপ্তি হয় মনটা, তাতে রাগ করে কি মা?

জ্যেঠাইমা বলতেন: রাগ ত করিনি শশী 'গরীব মানুষ! কি দরকার বাপু। শশী হাসতে হাসতে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলতো: বেশ গো বেশ! এখন একটু পানদোক্তা দেন তো আগে। বলে বঁটি নিয়ে মাছগুলো কুটতে বসতো।

সে যাক, আমি বললাম: মাসি, তুমি তো বাছা যাওনি বলেই আমায় আসতে হোল। অন্যদিন যাবার পথে পৌঁছে দাও: আজ দেরি দেখে বাধ্য হয়ে আমাকে আসতে হোল।

সে বললে: আমি যাচ্ছিলাম গো, বলে মাছগুলো আমার থলেতে ঢেলে দিলে। আমি বললাম: হ্যাঁ মাসি, আজ তোমার আদরের নাতনীকে দেখছি না যে বড়?

শশী মাসি মৃদু হেসে একটু থতমত খেয়ে বললে: তাকে আজ আর আনিনি বাবাঠাকুর! ডাগরাডুগুরটী তো হচ্ছে, তাই পাশের বাড়ীর গিন্নীর কাছে রেখে এসেছি। বলে কাপড়ের খুঁট থেকে পানদোক্তা বের করে খেতে খেতে উঠে দাঁড়াল তারপর পাশে রাখা বেঞ্চীর ওপর থেকে একফালি কুমড়ো আর পুঁইশাকের আঁটিটা তুলে নিয়ে ঘরমুখো হোলো। আমিও বাজার করবার জন্যে চলে গেলাম।

* * *

বেঙ্গল কেমিক্যালের কাছে যে খাল আছে সেই খালের ধারে জেলেদের সব বস্তি আছে। সেখানে দু' কামরা মাটীর ঘর আর সামনে একফালি উঠুন বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা শশীমুখীর আস্তানা। উঠনে, মাচায় লাউগাছ, নটে ডাটা, তুলসী গাছ আর মনসা ও একটী সজনে গাছ আছে। ঘর ও উঠুন বেশ পরিপাটী করে গোবরের লেপ দিয়ে নিকানো। দাওয়ার ধারে জানালার মাথায় সাদা খড়ি দিয়ে নানান্ প্রকার চিত্রবিচিত্র লতা ফুল ইত্যাদি আঁকা আছে। সামনে একটা সরু গলি তারপরেই অন্যান্য জেলেদের ঘর। কোথাও নানান প্রকার ইতর ভাষায় ঝগড়া হচ্ছে, কোথাও বা তাড়ি খেয়ে কেউ নানান্ প্রকার অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ করছে। কোথাও বা কলের জলের জন্যে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল নিচ্ছে।

শশীমুখী একটী ছেলে ও একটী মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। তখন ছেলের বয়স বছর চোদ্দ আর মেয়েটীর বয়স বছর দশেক হবে। তারপর এই মাছ বিক্রী করে কোন রকমে ছেলেমেয়ে দুটীকে মানুষ করে তুলেছিল। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল বেশ অবস্থাপন্ন ঘরে। কিন্তু বেশীদিন তার কপালে সুখ সইলো না—স্বামী মারা গেল। ছেলেপুলে কিছুই হয়নি। একদিন প্রতিবেশী এক জেলে ছোঁড়ার সঙ্গে যোগসাজসে তারা পালিয়ে গেল। আজ পর্য্যন্ত তার কোন হদিস্ পায়নি শশী। সেদিন শশী শুধু কাঁদেনি—এক ঝলক উত্তপ্ত শোকের তাপ খালি তার বক্ষরন্ধ্র ভেদ করে গিয়েছিল। শুধু একবারটী হয়ত

আপন মনেই বলেছিল, "হা—হতভাগি! এতই যদি তোর মনে ছিল—আমাকে জানালি না কেন? যতই হোক আমি তোর মা—মেয়েমানুষ। তোর ব্যথা বুঝে আমিই তো তোর সকল বেদনার, সকল দুঃখের ব্যথা মুছিয়ে দিয়ে শান্তির প্রলেপ দিয়ে দিতাম।

দিনকতক শশী বাজারে আসা বন্ধ করে সামনে খালের ধারে পাড়ের ওপর আশুদ গাছের তলায় উদাস নয়নে বসে থাকতো. চোখ দিয়ে অজস্র জলধারা বুক বেয়ে গড়িয়ে পড়তো, আঁচলের খুটে চোখ মুছে বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আতপ্ত মনের নানান্ চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়তো। সামনে খালের জল একটানা বয়ে যায়—ফেরি সালতিতে কতযাত্রী পারাপার হয়। খালের ওপাড়ে বিরাট ধাপার বাদা। দুস্তর প্রান্তর জুড়ে পেঁকো জল আর শরখাকড়া, শোলা আর বড় বড় জাতের পানার রাজত্ব। কত বিষধর সেখানে আড়ে-পাড়ে আহারের সন্ধানে ঘাপ্টি মেরে বসে থাকে। বাদা পার হলে ওধারে বেশ গাঁয়ের নিশানা দেখা যায়। শশীমুখী তার বিবর্ণ বিষণ্ণতার চোখ দুটো দিয়ে সবই দেখে কিন্তু যেন সবাই তার কাছে শূন্য! এমনি করে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—ছটা ঋতু কেটে যায়। তারপর আবার শশীর মনও মায়া-মমতার সংসারের পানে আসক্ত হয়ে ওঠে। জেলের ছেলে বিপিন সকাল বেলা মাছ ধরে এনে মা'কে দেয়—মা বাজারে গিয়ে বিক্রী করে আসে। দুপুরে গোলদারির কাজ করে বিপিন। জেলে পাড়ার সম্পর্কে কেউ মাসি, কেউ পিসী-দিদি-দিদিমা-ঠাকুমা—শশীর কাছে এসে বলে: ও বিপিনের মা—তোমার বিপিনের এবার বিয়ে থা' দাও গো—ছেলে বড় হয়েছে। আর কতদিন নিজে নিজে খেটেখুটে মরবে?—বরং বৌ এসে ঘর সংসার করুক।

শশী একটা বড় রকমের লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে: পোড়া কপাল আমার! আমার বরাতে কি সুখ আছে গা—ওই তো কত সাধ আহ্লাদ করে পেটের মেয়ের বিয়ে দিলুম—কি হোল:—সবই আমার কপাল। ছেলের বিয়ে দিলে কি আমার সুখ হবে? সে ভরসা করি না বাছা!

* * *

পাড়া প্রতিবেশী সবার উপরোধে অনুরোধে শশীমুখী তার ছেলে বিপিনেরও একদিন বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ নিয়ে এল। তার অন্তঃসারশূন্য দুঃখের জীবনে আবার সুখের আশার আলো জ্বলে উঠে পরম সার্থকতায় বেশ দিনকতক মন ভরিয়ে তুললো।

কলুর ঘানীর মত একটানা এই সংসার চলে। না আছে বৈচিত্র্য না আছে কোন স্বাদ—চলেছে তো চলেইছে। ঘানিতে যেমন শস্যগুলোকে দলে পিষে রস বের করে ছেড়ে দেয় তেমনি এই সংসারের গতি চলেছে এমনি আবহমানকাল ধরে. কারো বরাত উজ্জ্বল সুখের আলোয় ঝলমল করে আর কেউ বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে একেবারে চুপসে যায়। এই চরাচরের নিয়মই এই। তাই শশীর ভাগ্যে অত সুখ সইল না।

বিপিনের বিয়ে হবার বছর দুয়েক পরে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলো। কিন্তু হঠাৎ কি যেন হোল প্রসব করতে গিয়ে স্ত্রী হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল সেই নবজাত কন্যাকে নিয়ে তখন থেকেই শশীমুখী পরম স্নেহে যত্নে মানুষ করতে থাকলো।

শশীমুখীর জীবনে একের পর এক এক করে নিদারুণ আঘাত এসে এসে তাকে যেন আরও শক্ত করে তোলে। শশীমুখী ভাবে ছেলের আবার বিয়ে দেবে। উদ্যোগ আয়োজন চলতে থাকে কিন্তু তা অদৃষ্ট দেবতা বিষম বিদ্রূপভরা খর নয়নে চেয়ে চেয়ে হাসে।

সেদিন শ্রাবণাকাশ ভোর থেকেই ঘন কাল মেঘে ভরে গেল। একটা গুমট হাওয়া বইতে লাগল। একটু একটু করে মেঘগুলো আরও ঘন হ'য়ে গভীর আঁধারে এই বিশ্ব চরাচরকে ভরিয়ে দিলে।

খুব ভোরে উঠে সব দিনের মত সেদিনও বিপিন মাছ ধরতে গিয়েছিল, হঠাৎ প্রবল ঝড়ের সঙ্গে মুষল ধারে বৃষ্টি এবং তার সঙ্গে ঝাপ্টা। মাথার উপর কড়কড় নাদে মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাধানো বিদ্যুতের ঝিলিক। চারিদিক অন্ধকারে ভরে গেছে কোন কিছু নজরে আসে না। এমন কত দিন সে বৃষ্টিতে মাছ ধরতে বেরিয়েছে। মাথাঘুরনী দিয়ে জালটা একচক্কর ঘুরিয়ে নিয়ে যেমনি ফেলেছে বাদার জলে আর সেই সঙ্গে

কোথায় এক বিষধর সাপ ছিল পায়ে দিল ছোবল—ব্যস্! উঃ! বাপরে! গেলুম রে বলে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে সেখান থেকে একরকম ছুটতে ছুটতেই ঘরে এসে উঠোনে আছড়ে পড়ে গেল। শশী তাড়াতাড়ি ছুটে এলো—কোলপাঁজা করে দাওয়ায় নিয়ে শুইয়ে দিয়ে সবাইকে ডাকাডাকি করতে লাগলো। পাড়ার লোক ছুটে এল, রোজা বদ্যি, ডাক্তার অনেক কিছু করা হলো—শশীর সব কিছু পুঁজিপাটা দিয়েও বিপিনকে রক্ষা করতে পারলে না। কালে খেলে কে তাকে রুখবে—সে মহাকালের কবলে চলে গেল! শশী আছাড় খেয়ে পড়লো বিপিনের নিশ্চল দেহের ওপর। শশীর অন্তর, হাড়, মাস, বুক সব কিছুকে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে শুধু জড়পিণ্ডের মত যেন মহাশূন্যে দোলাতে লাগলো। দুর্ব্বার দুর্বিসার নিয়তি অলক্ষ্যে শুধু একটু হেসে উঠল।

পরিবর্ত্তনশীল জগৎ—সেই পরিবর্ত্তনরূপ কালস্রোতের মুখে যা পড়ছে ক্ষুদ্র তৃণ খণ্ডের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব কিছুকে ভেঙ্গে চুরে তচনচ করে অনন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। পিছনে ফেলে যাচ্ছে অতীতের যা—কিছু ঐতিহ্য, যা কিছু সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, সাধনা, কত স্মৃতিবিস্মৃতি কত অক্ষয় কীর্ত্তি, কত সভ্যতার ইতিহাস। সব কিছুকে যেন পায়ে দলে এগিয়ে চলেছে। অসৎ প্রবৃত্তির উগ্র বিষে যেন ধরিত্রী কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। শীর্ণ হাহাকারে এই মহা গ্লানির ভার যেন আর সহ্য না করতে পেরে বেদনায় ব্যথায় যেন কেঁদে কেঁদে ওঠে।

সেই গতানুগতিক—দিন হয়—রাত আসে বিশ্ব চরাচর আবর্ত্তিত হয়। সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে, ব্যথায় বেদনায়, শোকে তাপে, আনন্দে পুলকের মধ্য দিয়ে সংসার চলে।

সংসার চলে ধূমায়িত পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে বুকে নিয়ে দিনের পর দিন অশান্তির আগুনে পুড়ে পুড়ে। সমাজে সভ্যতায়, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, জঠরে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সর্বস্থান ব্যেপে যেন একটা বিশৃঙ্খলতায় ভরে যায়। যেন মহা-অমানিশায় মহাশ্মশানের মাঝে ভূত প্রেত দানাদত্তিগুলো অবাধে দাপাদাপি করছে। ছোট বড়র বিচার নাই, শ্রদ্ধা ভক্তির বলাই নাই, কোন কিছুর যেন ধার ধারে না—বিচার বিবেচনা নাই, সত্যাসত্য, পাপপুণ্য সব যেন অতলান্তিক মহাসাগরে তলিয়ে গেছে। শুধু স্বেচ্ছাচার আর দাম্ভিকতার উদগ্র বিলাস নেশায়, কামের সেবায় কৃমি-কীটের মত ছুটে চলেছে। অন্ধ স্বার্থের পসরা নিয়ে হানাহানি চলছে।

শোকে তাপে শশীর বুক ভেঙ্গে গেছে। ঘরের দাওয়ায় খুঁটি ঠেসান দিয়ে উদাস নয়নে সুদূর মহাশূন্যের পানে চেয়ে চেয়ে অজস্র স্মৃতির বোঝা যা বুকে জমা হয়ে আছে তা বুক ঠেলে চোখ ছাপিয়ে হু-হু করে বুক ভাসিয়ে দেয়।

শরৎকালের আকাশে সাদা কালো মেঘগুলোও আলো ছায়া বিস্তার ক'রে তার মনের সঙ্গে যেন বিষাদে ভরে ওঠে। দু' বছরের নাতনীকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এমনি করে করে শশীর দিন কাটে—আবার মাছ বেচতে আসে বাজারে।

একটানা তৃপ্তি জীবনভোর কেউ পায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা জীবনে নানা পরিণতি ঘটে যায়। কত আসে সমস্যা, কত আসে ঝড় ঝঞ্ঝা—মনের আকাশে মেঘ জমা হয়—হয়তো দু' এক পশলা বর্ষণও হয়ে যায়। মেঘ কেটে যায় আবার, হয়তো কিছু সময়ের জন্য তৃপ্তি আসে। কিন্তু সে তৃপ্তি ক্ষণিকের। অন্তরের কোন্ গভীর তল দেশে একটা অতৃপ্তি সর্ব্বদাই কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে বিঁধতে থাকে। সারা জীবন ধরে সে অতৃপ্তির নিবৃত্তি হয় না। সুখও নাই শান্তিও নাই—একটা জগদ্দল পাথর যেন এই বুকের মধ্যে চেপে বসে থাকে।

মনের মধ্যে সেই গভীর ব্যথা নিয়ে শশীর দিন কাটতে থাকে। আস্তে আস্তে নাতনী বড় হতে থাকে।

এক এক দিন শশী রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের জীবনের নানান্ সমালোচনা করে। সে তো কোন দিন কোন পাপ কাজ করেনি—তবে কেন তার এমন হোল! তবে কি স্বামীর মরণের পর—তখনও তার সোমত্ত বয়েস—একজন এসে ছিল তার কাছে। তার সব ভার নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে তাকে আবার সুখী করতে। ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় মন চেয়েছিল সেই ভাল। কিন্তু সে তো তারপর নিজেকে বেঁধে ফেলেছিল সংযমের কঠোর বাঁধনে। আর আর তাদের জাতের মত নিজের নিজের চরিত্রকে বিলিয়ে দেয়নি! সেইটুকুই তার এই জীবনে যা ক্ষণিকের

দুর্ব্বলতা ঘটেছে—লঘু পাপে গুরু শাস্তি তার ভাগ্য-বিধাতা তাকে তবে দিলেন কেন? এ কেমন বিচিত্র বিধান বিশ্ব নিয়ন্তার! সে ভেবে কূল পায় না—ছট্‌ফট্ করে করে কখন যেন সর্ব্ব শ্রান্তি হরা পরম নিশ্চিন্তময়ী নিদ্রার কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। এমনি করে কালের চাকা ঘুরে ঘুরে দশটী বছর পেরিয়ে যায়।

মাঘের শেষ। প্রবল প্রতাপ শীতের আর সে দাপট নাই। আগত বসন্তের উদাস করা দখিন বায়ু মাঝে মাঝে উঁকি ঝুকি মারছে। শুষ্ক পত্রগুলি ঝরে পড়ে তরু শির হতে—অলস বাতাসে খস খস আওয়াজ তোলে। খালের ধারে ঘেঁটু কাঞ্চন, আর আকন্দ ফুল ফোটে। কোন্ সুদূরের তরু শাখে বসা কোকিলের কুহু-কুহু মিঠে স্বর ভেসে আসে। এখন খালের জল শীর্ণ প্রায়। তবুও ছোট বোটে করে খেয়া পার হয়। তাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে খালের পাড়ে ঘাট তৈরী করা স্থানে মেয়েরা বাসন মাজে, স্নান করে। কেউ বা গাছের তলায় বসে বসে সমবয়সীদের সঙ্গে গল্প করে। জেলে পাড়া—কোথাও কেউ তাড়ি খেয়ে বমন করতে থাকে। কেউ বা আবার নানান্ ইতর ভাষায় অপরের সঙ্গে গালাগালি করতে থাকে। এমনি ধারা চলে এদের নিত্যকার জীবন যাত্রা।

এখন রতনমণি বেশ ডাগর-ডোগরটী হয়েছে। ভরা ভাদরের ভরা নদী যেমন চলে—তেমনি তার দেহবল্লরীতে ভরা যৌবনের ঢলঢল লাবণ্য মণ্ডিত উদ্দাম ফেটে পড়ছে। অনাবিল নব জীবনের আবেগে বন্যায় যেন সে সব কিছু প্লাবিত করে দিতে চায়। যৌবনের স্বপ্নে আত্মহারা হয়েও তার বালিকা সুলভ চপলতা তাকে মাধুর্য্য মণ্ডিত করে রেখেছে। পাড়ার সমবয়সী আরও পাঁচ ছ' জন মেয়েদের সঙ্গে সে চোর চোর খেলে, কখনও বা ডিঙ্গি করে ওপারে গিয়ে লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। এমনি করে প্রত্যহিক একটা না একটা নিয়ে সে থাকে। শশী কখনও তাকে বকুনি দেয় বলে: হ্যালা রোজ রোজ তোর ধিঙ্গিপনা যে বেড়ে উঠছে বড়। এখন একটু সামলে-সুমলে থাকতে পারিস না।

রতন বলে: কি করেছি ঠাকুমা? ওই ওদের পুটি, হাঁসি, উষা আর পটলির সঙ্গে তো একটু লুকো-চুরি খেলছিলাম- এতে কি দোষ হয়েছে তাই বল না—

শশী বলে: হতভাগি! বুঝতে পারিস না কেন? সোমত্ত বয়েস এখন অত বাড় ভাল নয়! রতন চুপ করে থাকে।

* * *

পাড়ার ছেলে শ্যামল ওদের মধ্যে বেশ একটু ফিটফাট থাকে। সেও মাছের ব্যবসা করে। বেশ দু' পয়সা কামায়। সিনেমা দেখে, মাঝে মধ্যে মদ খায়। সবার সঙ্গে মেলামেশা করে। রতনের ওপর তার খুব ঝোক। রাস্তাঘাটে দেখা হ'লে যেচে কথা বলে: রতন যে, আমাদের ক্লাবে নতুন বই হবে ত'তে একটা পার্ট নিবি?

রতন বলে: বাব্বাঃ! তাহলে ঠাকুমা কি আর আস্ত রাখবে শ্যামলদা? শ্যামল হাসতে হাসতে বলে: আমি তোর ঠাকুমাকে যদি রাজী করাই তাহলে! রতন হেসে কাপড়ের কোণ্‌টা নিজের আঙ্গুলে পাক দিতে দিতে বলে, রাজী করাও তো আগে তারপর পার্ট।

শ্যামল আড়চোখে চেয়ে রতনকে লেহন করতে থাকে; সত্যি রতি—তুই যদি পার্ট করিস খুব ভাল মানাবে তোকে। শর্ম্মিষ্ঠা বইএ তুই শর্ম্মিষ্ঠা করতিস্ আমি যযাতি—কেমন—

রতন বলে: যাও! বলে শ্যামলের পানে চেয়ে ফিক্ করে হেসে ছুটে চলে যায়। শ্যামল তার পানে খানিক চেয়ে থেকে নিজের কাজে চলে যায়। এমনি করে আড়াল পেলেই শ্যামল রতনের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করে। কিন্তু রতন আমল দেয় না।

সেদিন শশী সন্ধ্যাবেলা রতনকে বলে: ও দিদি, তাড়াতাড়ি এক ঘড়া টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে আয় তো ভাই? খুব তাড়াতাড়ি আসবি। রতন ঘড়া নিয়ে জল আনতে যায়। বস্তীর সরু আঁকাবাঁকা গলি পেরিয়ে বড় রাস্তা, সেখানে কল। রতন কলসী নিয়ে সরু গলিটার বাঁক ঘুরতে যাবে এমন সময় শ্যামলের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি। নেশায় ভরপুর শ্যামল রতনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়—বলে এমন সময় কোথা যাচ্ছিস্ রে রতি? ব'লে তার কামনাময় মন দিয়ে তাকে লেহন করতে থাকে।

রতন বলে: পথ ছাড়, জল আনতে যাচ্ছি।

শ্যামল বলে: তা'ত দেখতেই পাচ্ছি—বলে অনিমেষ

নয়নে তাকে দেখতে থাকে। আজ এই সন্ধ্যে বেলায় এমন নির্জ্জন স্থানে একাকিনী রতনকে হাতের কাছে পেয়ে হঠাৎ তার সব কিছু সংযমের বাঁধ ছিঁড়ে গেল—তায় আবার মত্ত অবস্থা! শ্যামল জড়ান কথায় কটাক্ষ করে বলে আবার: মাইরি রতন! তোকে এখন বেশ দেখাচ্ছে। চ' না একদিন সিনেমা দেখে আসি দুজনে—খুব ভাল বই উত্তম-সুচিত্রা আছে—মানে ভালবাসার বই কি না।

রতন তীক্ষ্ণ স্বরে বলে: পথ ছাড়। ও সব যা তা কাজে কথা আমার কাছে বলছ কেন? যেতে হয় তুমি যেও—

শ্যামল বলে: উঃ! আজ তোর খুব রোখ দেখছি যে, আজ যখন এমন আড়ালে পেয়েছি—বলেই হঠাৎ তার ডান হাত চেপে ধরে বলে: মাইরি তোকে আমার কি ভালই না লাগে—তোর জন্যে মরমে মরে যাচ্ছি—তুই কিছুই বুঝিস না—মাইরি যদি বলিস তাহলে আমি তোর ঠাকুমাকে রাজী করিয়ে তোকে বিয়ে করি—

রতন সজোরে তার হাত ঝিনকে তাকে ফেলে দিয়ে চেঁচাতে থাকে: ও ঠাকমা এই দেখনা শ্যামলদা মদ খেয়ে আমার সঙ্গে যা তা নষ্টামি করছে রাস্তা আগলে—

পাশের চালা ঘরে বুড় শ্যামলাল বসে বসে শনদড়ি কাটছিল। হঠাৎ মেয়েছেলের গলার শব্দে এসে পড়লো। তাকে দেখে রতন ছুটে গিয়ে বলে: দেখ না মেসে, আমি জল আনতে যাচ্ছি আর আমার পথ আগলে শ্যামলদা মদ খেয়ে যা তা সব নোংরা কথা বলছে—বলেই কেঁদে ফেললো।

শ্যামলাল ও পাড়ার একজন মাতব্বর ব্যক্তি, সবাই মানে-গোনে। তাই তাকে দেখেই শ্যামল কেমন যেন চুপসে গেল। শ্যামলাল চীৎকার করে বলে: হারামজাদ পাজী—নচ্ছার! ভর সন্ধেবেলা একগাদা তাড়ি গিলে এসে নষ্টামি করবার জায়গা পাচ্ছিস না। বলেই ঠাস করে গালে একটা চড় কষিয়ে বলে শীগগির ঘরে যা বলছি—নইলে তোর একদিন কি আমার একদিন—

শ্যামল চড় খেয়ে সুড় সুড় করে গালে হাত বুলাতে বুলাতে চলে গেল রা কাড়লে না একটীও।

শ্যামলাল রতনকে বলে: ভর সন্ধ্যেবেলা সোমত্ত মেয়ে—একলা এমন করে জল আনতে যেও না মা—জানতো জেলেপাড়ার ছেলে ছোকরাদের কাণ্ডকারখানা। চল্ তোর সঙ্গে যাই—বলে রতনের সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং জল নেওয়া হলে তাকে আবার পৌছে দিয়ে গেল। যাবার সময় শশীকে বলে গেল—আর কোনদিন যেন রাত বিরেতে রতনকে একলা না ছাড়।

চড় খেয়ে শ্যামলের রোখ গেল বেড়ে। সে ভাবে যেমন করেই হোক রতনকে সে তার করায়ত্ত করবেই। রতনের ওপর তার একটা আসক্তির জিদ্ চেপে গেল। পাড়ার ওর জুড়ি ও বয়সী অনেক মেয়েও তো আছে। কিন্তু রতনের মত দেখতে শুনতে অমন মোহভরা মেয়ে কই? কাজেই শ্যামলের গোপন হৃদয় তৃষা যত বাড়ে তত সে উত্তেজিত হয়। এবং নানান্ ছলা, কলা, কৌশলের আশ্রয় নেয়। কিন্তু কোন ক্রমেই সে সফলকাম হয় না। শশী সবকিছু রতনের মুখে এবং শ্যামলালের মুখে শুনে অবধি প্রথমে শ্যামলালের কথামত পাড়ার মাতব্বরদের কাছে বলে। তাছাড়া শ্যামলের দূরসম্পর্কের মামা-মামির কাছেও বলে দেয়—এবং শ্যামলকেও খুব সাবধান করে দেওয়া হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্যামল ছোঁক্-ছোঁক্ করে বেড়ায়। শশী গালাগালি দেয়—শেষে রোজ নাতনীকে সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা নিয়ে বেড়ায়।

সেদিন শশী রতনকে নিয়ে মাছ বেচতে আসে বাজারে। আমি সেদিন বাজারে যেতে পারিনি। অনেক বেলা পর্য্যন্ত দেখে শশী মাসির মাছ বেচা শেষ হোয়ে গেলে—সে মাছ নিয়ে আমাদের বাড়ী এসে হাজির। আমার জ্যেঠাইমা অনেকদিন বাদে মাসীকে দেখে বলেন: কি শশী, অনেকদিন বাদে যে বড়—পথ ভুলে নাকি?

শশী বিনয়ের সঙ্গে বলে: না দিদি ঠাকুরুণ! নানান্ ঝঞ্চাটে পড়ে আসতে পারিনি—বলে তার আনা মাছ বঁটীটা নিয়ে কুটতে বসে যায়। জ্যেঠাইমা বলেন: আচ্ছা পাগলী মেয়ে তো দেখছি—আগে চা-টা জলটল খা—তারপর ও-সব হবে'খন।

শশী বলে: এই তো ক'টা মাছ এখনি হয়ে যাবে বলে মাছগুলো কুটে ফেলে—তারপর ধুয়ে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় রেখে দেয়। জ্যেঠাইমা চা জলখাবার

নিয়ে শশী আর রতনকে দিতে দিতে বলেন: ও শশী, তোর নাতনীটা তো বেশ ডাগরডুগর হয়েছে দেখছি—এবার বে থা' দে—

শশী বলে: হ্যাঁ ঠাকরুণ, তার তরেই তো তোমার কাছে এসেছি গো? আমি বড় বিপাকে পড়ে গেছি দিদি—বলে: ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে। জ্যেঠাইমা বলেন: আরে? হঠাৎ হোল কি তোর—কি হয়েছে বলবি—না কাঁদবি—

শশী আদ্যোপান্ত সব বলে যায়—তার সব কথা শুনে জ্যেঠাইমা বলেন: এক কাজ কর শশী—তোর নাতনীকে আমার কাছে রেখে যা। যতদিন না ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারিস—থাক আমার কাছে। এখানে থাকলে আর কোন কিছুর ঝুকি থাকবে না তোর—তুই পাত্র দেখ—তারপর তোর পছন্দমত পাত্র দেখা ঠিক হোয়ে গেলে ওর বিয়ে এখান থেকেই আমি দেবার ব্যবস্থা করব। তোর কোন ভয় নাই—

শশী চোখের জল মুছতে মুছতে আবার কেঁদে উঠে বলে: দিদি ঠাকরণ! তোমার ঋণ জীবনে শুধতে পারবনি—কি যে আমার উপকার করলে তা একমাত্র পরমেশ্বরই জানেন! আমার বুক থেকে পাষাণ নেবে গেল। রতি তোমার কাছে থাক। বলে—রতনকে বললে: তুই এখানেই থাক দিদি—আমি মাঝে মধ্যে এসে দেখে যাব।

জ্যেঠাইমা বলেন: রতন তুই এখানেই থাক ভাই—লজ্জা-টজ্জা করিস্ না—ঘরের মতন সব যখন যা ইচ্ছা যাবে চেয়ে চিন্তে নিবি—বলবি। যা ওপরে গিয়ে তোর বৌদির সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।

রতন আমাদের বাড়ীতেই থাকে। জ্যেঠাইমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি রতনের ওপর প্রতিফলিত হোয়ে সর্বদা ঘুরতে ফিরতে থাকে। রতনের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রতনও বেশ সব জড়তা কাটিয়ে এখন অনেকটা সহজ সরল হ'য়ে উঠেছে। টুকটাক্ কাজকর্ম করে, খায়-দায় আর বৌদির ফাই-ফরমাজ সহ ছোট ছেলেটাকে নিয়ে থাকে। আমার দাদা এখানে থাকেন না—জামসেদপুরে রেলের ডাক্তার, তিনি সেখানেই থাকেন। শনিবার আসেন সোমবার চলে যান। সংসারের সব ভার আমার ওপর। অবশ্য জ্যেঠাইমার পরামর্শমত সবই করতে হয়।

* * *

সে বছর পৌষমাসে হঠাৎ দারুণ শীত পড়ে গেল। শীতের নির্মেঘ নীলাকাশ মেঘের আস্তরণে ছেয়ে গেল। তার সঙ্গে পাগলা ব তাসের মাতনে বেশ জমজমাট করেই সারা দিনরাত ধরে বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর থেকেই এই শীতের প্রাকোপে হাত-পা পেটের মধ্যে পুড়ে বেড়ান ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ঠাণ্ডাজল ছোঁয় কার সাধ্য—যেন বরফ। সেদিন কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছি। ফিরতে সন্ধ্যে উত্তরে গেছে। এসে দেখি আমাদের ভিতরের রকে একটী ছোকরা বসে আছে। জ্যেঠাইমা তাকে বসিয়ে রেখে দিয়েছেন। আমি বাড়ী ফিরতেই আমাকে জ্যেঠাইমা রান্নাঘরে ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই আমাকে বললেন: দেখ বাবা সতু! বড় সমস্যায় পড়েছি বাবা · কি করব বল্—

আমি বললাম: কি ব্যাপার বল—

জ্যেঠাইমা: ওই যে ছোকরা আমাদের রকে বসে আছে না—ও—বল্‌ছে রতনের ঠাকুমার নাকি খুব ব্যামো হয়েছে তাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে—রতনকে নিয়ে যাবার জন্যে। তা আমি বাপু ঠিকমত বুঝতে পারিনি তাই বসিয়ে রেখেছি তোর আসার অপেক্ষায়! কি কোরব বল্ - রতনকে কি তাহলে পাঠিয়ে দেব?

আমি একটু ভেবে বললাম: ওর নাম কি রতন ওকে চেনে কিনা—এ সব কিছু বলেছে?

জ্যোঠাইমা বললেন: না বাছা! রতিকে এখনও কিছু বলিনি—কি জানি কিছু বুঝে উঠতে পারিনি সত্যিই ওর ঠাকুমা ওকে পাঠিয়েছে কিনা? তাছাড়া ওকে ওর ঠাকুরমা আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে তো? একটা যা হয় বাপু তুই কর!

আমি বললাম: ঠিক আছে। আমি এখনি যাচ্ছি—

জ্যোঠাইমা কথার ওপর কথা দিয়ে সস্নেহে বললেন দাঁড়া বাবা! সেই কখন এক গাল খেয়ে বেরিয়েছিস আগে চা জলখাবারটা খেয়ে নে তারপর যাবি।

জ্যেঠাইমার দেওয়া চা, জলখাবার খেয়ে গেলাম সেই ছোকরাটীর কাছে। গিয়ে দেখি সে মনের

আনন্দে রকে বসে বসে দিব্যি মৌজ করে বিড়ি টানছে আর পা দুটো দোলাচ্ছে। আমাকে দেখেই হুশটানের বিড়ি আচমকা ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি তাকে বললাম: শুনলাম তুমি শশীর কাছ থেকে আসছ? সে হাত দুটি কচলাতে কচলাতে বেশ বিনয়ের সঙ্গে বল্লে: আজ্ঞে হ্যাঁ, পিসীর ভারি ব্যামো—তাই আসতে পারলে না আমাকে বললে কাশীনাথ তুই একবার বাবুদের বাড়ী যা—গিয়ে রতনকে আমার নাম করে নিয়ে আয় বাবা। আমাকে সব ঠাঁই-ঠিকানা বলে দিলে—

আমি বললাম: কিন্তু তোমার সঙ্গে রতনকে পাঠাই কোন ভরসায়—তুমি যে ঠিক্ শশীর কাছ থেকে আসছ তার কোন নিদর্শন আছে কি?

সে বললে নিদর্শন কি কোরে থাকবে বাবু শশী পিসী কি লেখাপড়া জানে যে চিঠি নিয়ে আসব? তা আপনাদের ইচ্ছে হয় পাঠিয়ে দেবেন—না হয় না দেবেন—

আমি বললাম: কিন্তু—

সে আমার কথায় কথা দিয়ে বললে: তাহলে কি বাবু আমি মিথ্যে মিথ্যা আসছি—

এই কথায় আমার একটু বিশ্বাস হোল। সে হ'লেও তো হ'তে পারে। যাই হোক বললাম: তোমায় রতন নিশ্চয়ই চেনে—যখন তুমি ওই খানেই থাক!

সে বললে: রতন আমায় বিশেষ চিনে না—আমি-ও পাড়ায় থাকি না। আমি থাকি বৌবাজারে। মাছের আড়তে কাজ করি। পিসী আমার ওখান থেকে মাছ আনতে যায়। তাই দিন না যাওয়াতেও আমি পিসীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাই পিসী বললে: কাশী আমার নাতনীকে বাবা এনে একটু উপকার করতে হবে। তাই এলাম।

আমি তার কথা শুনে বললাম: তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি এখুনি আসছি। বলে জ্যেঠাইমার কাছে গিয়ে সব বললাম। জ্যেঠাইমা বললেন: তবে এক কাজ কর বাবা, ওর সঙ্গে আমাদের বুড়ো চাকর দীনুকে পাঠিয়ে দে। সত্যিই তো মানুষটার অসুখ করেছে আসবেই বা কেমন করে! তার চাইতে রতনের সঙ্গে দীনুও যাক—বুড়ী কেমন থাকে দেখে আসতেও তো পারবে?

আমি বললাম: সেই ভালকথা—বলে আমি কাশীকে গিয়ে বললাম: দেখ বাপু রতনকে তো তোমার সঙ্গে একলা পাঠাতে পারব না। তোমায় চিনি না শুনি না—তাই তোমাদের সঙ্গে আমাদের চাকরটা যাবে।

সে আগ্রহের সঙ্গে বললে; বেশ তো বাবু যাক না—তা'তে আর কি হয়েছে? তারপর রতনকে খাইয়ে দিয়ে দীনুকে সঙ্গে দিয়ে বেরুতে করতে রাত্রি প্রায় দশটা বেজে গেল।

* * *

দীনু ও রতনকে নিয়ে কাশীনাথ বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তারপর বাসে করে মাণিকতলায় গিয়ে নেমে নারিকেলডাঙ্গার বাসে চেপে রেলপুর পার হ'য়ে গিয়ে কাঁকুরগাছির চৌমাথায় নেমে পড়ল। রতন বললে: এখানে কেন নামলে—এ বাস তো একেবারে আমাদের ঘরের কাছে গিয়ে থামবে।

কাশীনাথ বললে: হ্যাঁ গো তা তো জানি—আমি একবার আমার বোনের বাড়ী হোয়ে তারপর যাব।—বলে সি, আই টী রোড ধরে উল্টোডাঙ্গার দিকে এগোতে লাগল। রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা হবে, ও অঞ্চলটা তখন সবে ভেঙ্গেছে জন-মানব শূন্য স্থান। মাঝে মধ্যে দু' একটা দরমা ঘেরা লম্ফ জ্বালা পান বিড়ীর দোকান। এই রকম একটা দোকানের কাছে একটা খালি ট্যাক্সি আগে থেকে ঠিক করা ছিল—দাঁড়িয়ে আছে। রতনকে উঠতে বলে কাশীনাথ। রতন গাড়ীতে উঠলে—দীনুকে চার আনা পয়সা দিয়ে বলে: দীনুদা, ওই দোকান থেকে চার আনার বিড়ী একটু তাড়াতাড়ি নিয়ে এস তো? দীনু বিড়ী আনতে গেল। আর ইতিমধ্যে ট্যাক্সিওলাকে ইসারা কোরে দিলে কাশীনাথ। সে অতি বেগে চালিয়ে নিয়ে চললো। রতন তখন হেঁ-ই হেঁ-ই করে চীৎকার করে বলে উঠলো: ওকি হোল? দীনুদা যে রয়ে গেল—এই ট্যাক্সিওলা গাড়ী থামাও বলছি—

কাশীনাথ গম্ভীর স্বরে বলে: অত চেঁচাচ্ছ কেন? যেমন আছ চুপ করে থাক। রতন ক্রুদ্ধ স্বরে বলে: ঠাকুমার কাছে নিয়ে যাবার অছিলায় এ আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ—শীঘ্রি গাড়ী থামাও বলছি নইলে আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করব বলছি।

কাশীনাথ বলে : এত সস্তা নয়—চেঁচালে মুখে কাপড় পুরে দোব। যা বলছি তাই কর। আর কোথায় নিয়ে যাচ্ছি সেটা বুঝতে পারছ না—নরকে। বিস্ময়ে, ভয়ে, দুঃখে, রতন তখন যেন কেমনধারা হোয়ে গেছে। তাতে আবার এখন অধিক রাত্রি, পথে জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সারা শরীর তার ভয়ে হিম হোয়ে গেছে—অজানা আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠছে। কণ্ঠ থেকে তালু থেকে নাভি পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হোয়ে গেছে। এ, সে আজ কোন দুষ্ট গ্রহের খপ্পরে পড়ে গেল। ভেবে উঠতেই তার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করল কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে কোন সাড়াও যেন বেরিয়ে আসতে চাইল না।

ইতিমধ্যে ট্যাক্সিটা যেখানে এসে থামলো—সে স্থানটা একটা বস্তী। উল্টাডাঙ্গার খালের অপরদিকে সরাসরি যে যেন রোড চলে গেছে তারই শাখা গলি যেখানে গিয়ে মিশেছে সেখান থেকে চার দিকে চারটী পথ চলে গিয়েছে। তারি একটা পথের ধারে এই বস্তী। টিনের বেড়া দেওয়া সামনে মাটির দেওয়াল দেওয়া সদর দরজা, এমনি পৃথক পৃথক ভাবে থাকবার জন্য ঘর। একখানি দাওয়া বিশিষ্ট তিন খানি করে ঘর—কল, পায়খানা ও রান্নাঘর সহ বিধি ব্যবস্থা করা আছে। ওখানে খালের ধারে বড় পথ খালের দু' ধার দিয়ে চলে গিয়েছে। খালে মহাজনদের নৌকা ধরে সারি সারি বাঁধা আছে। রাস্তার তাদের সব বড় বড় গুদাম, কারখানা সারবন্দী হয়ে আছে। বড় বড় নৌকায় ও লঞ্চে কত প্রকার দ্রব্য সামগ্রী স্তূপাকার হোয়ে বোঝাই করা আছে। কোনটাতে খড়ের গাদা, কোনটায় বড় বড় কাঠ, হাঁড়ীকলসী ভরা ইত্যাদি সব সামগ্রীতে পূর্ণ। মাঝিরা রান্নাবান্না করছে, কেউ বা তামাক খাচ্ছে, কেউ বিড়ী ধরিয়ে বসে বসে গল্প করছে। পাড়ের ওপর দিয়ে বড় বড় লরী, রিক্সা, মোটর, গরুর গাড়ী ইত্যাদি যাতায়াত করছে। কোথাও বা মাল খালাস হচ্ছে, কেউ বা নৌকার পাটাতনে বসে গান ধরেছে। এমনি চলে এখানকার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা।

গাড়ীটা এসে থামতেই কাশীনাথ গিয়ে দরজায় টোকা মারলে। দরজাটা খুলে দিয়ে শ্যামল কেমন মনমরা ভাবে দাওয়ায় এসে বসলো। রতনকে নিয়ে কাশীনাথ যখন ভেতরে ঢুকলো তখন শ্যামলকে সেইখানে দেখেই রতন একেবারে চমকে গেল।

কিন্তু প্রথমে সে বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল যে লোকটা তাকে এখানে এনেছে তার বোধহয় বোনের বাড়ী। তবুও তার মনে একটা আশঙ্কা ও এই আকস্মিক বিপদের যে তরঙ্গ উত্তাল ভাবে তুলছিল সেই বিপদে শ্যামলকে দেখে তার অনেকটা ভরসা হোল। যতই হোক পাড়া-প্রতিবেশী তো? তবুও চেনা-জানা—তাই তার এতক্ষণের সব সংশয় খানিকটা কেটে গিয়েছিল—সে শুষ্ক কণ্ঠে শ্যামলকে বললে : শ্যামলদা, তুমি এখানে—এঁরা বুঝি তোমার কেউ হয়—

শ্যামল এতক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। তার অন্তর মধ্যস্থ সৎবিবেক তাকে যেন পুনঃ পুনঃ নাড়া দিয়ে ভেতরে ভেতরে কশাঘাত করে বলছিল এটা কি ভাল হোল—এটা কি যুক্তিযুক্ত হোল—এমনটা না করলেই হোত?—আবার পরক্ষণে এটাও মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল—কি হোয়েছে—আমি অন্যায় কিছু করিনি। আমি ধর্ম্মমতে ওকে বিয়ে করব। যাকে ভালবাসি তাকে না পেলে কে কবে সুখী হয়—আত্মসুখ কে না চায়।—

সহসা রতনের ডাকে তার সম্বিৎ ফিরে এলো। হঠাৎ সে যেন কতকটা অপরাধীর মত আড়ষ্টকণ্ঠে জবাব দিতে গিয়ে পারলে না—তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললে : না—এরা—তুমি কাদের কথা বলছ?

রতন বললে : এই যে—যে লোকটা আমাকে নিয়ে এলো—এটা তো তার বোনের বাড়ী?

শ্যামল বললে : ও—হাঁ—

তার এই খাপছাড়া কথায় রতন কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। পিছনে যে কাশীনাথ দাঁড়িয়ে ছিল তা সে দেখেনি। তাই তাদের কথার মাঝখানে কথা দিয়ে কাশীনাথ বলে : সত্যি কথাটা বলেই ফেল না শ্যামল? অত ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ কেন? আমি বাব্বা : অতশত বুঝিনে যা করতে হবে তা পষ্টাপষ্টি করাই তো সৎসাহসের কাজ!

শ্যামল তাকে কতকটা ধমকের সুরে বলে : থাম্—থাম্ অত সৎসাহস দেখিয়ে কাজ নেই—সে যা আমি বুঝবো করব। এখন তুই ঘরটা খুলে দে—রতন ঘরে গিয়ে বসুক—অনেক রাত হোয়ে গেছে। রান্নাঘরে তোদের

খাবার ঢাকা দেওয়া আছে রতনকে দে, তুই খা—বলে শ্যামল উঠে কলঘরে চলে গেল।

কাশীনাথ রতনকে বলে: চল ঘরে চল—বলে দাওয়াটা পার হ'য়ে গিয়ে সামনের ঘরের শেকলটা খুলে আলো জ্বেলে দিলে।

রতন ঘরের কাছে গিয়ে বললে: তুমি যে বলছিলে কি ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় তা সে কি কথা তোমায় বলতে হবে।

কাশীনাথ বলে: সে কিছু নয়—এমনি?

রতন বলে: রাস্তায় যে বললে তুমি বোনের বাড়ী হোয়ে আমায় ঠাকুমার কাছে নিয়ে যাবে তা তোমার বোন কোথায়—তাকে দেখছি না তো?

কাশীনাথ মৃদু হেঁসে বলে: আমার বোন এখানেই থাকে—তবে আজ তারা সব তারকেশ্বর গেছে—কাল আসবে।

রতন বলে: তবে আমাকে ঠাকুমার কাছে—দিয়ে আসবে চল।

কাশীনাথ প্রথমে সাড়া দেয় না, তারপর আমতা আমতা করে বলে: আজ রাত হোয়ে গেছে কাল সকালে পৌঁছে দোব।

রতন বলে: না, তা হবে না—আমি এখুনি যাব। তুমি যে বললে ঠাকুমার খুব অসুখ—তবে সেখানে না নিয়ে গিয়ে এখানে নিয়ে এলে কেন? আর যদিই নিয়ে এলে তো এখন যখন তোমার বোন্ নেই তখন আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হবে এখুনি।

কাশীনাথ বলে: এত রাতে তোমায় কেমন করে দিতে যাব বল: আজ এই রাতটুকু এখানেই থাক—কাল সকালেই দিয়ে আসব। বলে রান্নাঘরে চলে যায়। তারপর রান্নাঘর থেকে খাবার এনে বলে: কই ঘরে এলেনা—ঘরে এসে খাবারগুলো খেয়ে নাও—

রতন গোঁ হয়ে সেখানে বসে থাকে। বলে: আমি তো বাবুদের বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।

কালো আঁধারে বিশ্ব চরাচর ছেয়ে গেছে। রতনের মনেও কালো ঘন নিরাশা-ভরা আঁধার—চোখ দিয়ে উদ্গত অজস্র উত্তপ্ত জল টপ্‌টপ্‌ করে গণ্ড বেয়ে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে।

কাশী খাবার ধরে দিয়ে তবুও বলে: কই গো—খাবে এস না—রতন সাড়া দেয় না। কাশী বলে: সাড়া দিচ্ছ না যে,—কি খ্যাঁচড়া মেয়েরে বাবা! একই গোঁ—

এমন সময় কলঘর থেকে মুখহাত ধুয়ে শ্যামল আসে। গামছাটা আল্‌নায় রাখতে রাখতে বলে: যাও রতন খেয়ে নাও—রাত হোয়ে গেছে। ঘরে বিছানা করা আছে। খেয়ে শুয়ে পড় খিল্ দিয়ে। কাল সকালে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

রতন সাড়া দেয় না দেখে শ্যামল, তার কাছে যায়—দেখে, রতন কাঁদছে—শ্যামল বলে: কাঁদছ কেন?—একটা রাত, তুমি কি জলে পড়ে গেছ নাকি? কাল তোমায় পৌঁছে দোব তো বলছি—।

অগত্যা নীরবে রতনকে ঘরে যেতে হয়।

*　　　*　　　*

রাতে রতনের চোখে ঘুমের লেশমাত্র নাই। সারারাত বিছানায় পড়ে পড়ে কেঁদেছে। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহী যেমন পিঞ্জর ভেঙ্গে পালাবার জন্য ছটফট করে তেমনি রতনের মনে নানান কৌশল এসে ভিড় কোরে কোরে তাকে অস্থির কোরে তোলে। সে ভাবে যেমন কোরেই হোক এই রাতটুকু পোহালে সে আলোআঁধারের সুযোগ নিয়ে একাই পালাবে। পেটকাপড়ে বাঁধা গোটা পাঁচেক টাকা ছিল—সে একবার দেখে নিলে ঠিক আছে কি না। তারপর অপেক্ষায় অপেক্ষায় সারা রাতটুকুর সময় কাটাতে লাগলো।

সবে পূবের আকাশে শুভ্র উষার প্রথম আবির্ভাব ঘটতে সুরু করেছে—দিঙ্‌মণ্ডল মেঘের আস্তরণে ছেয়ে গিয়ে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। একটা হিমেল ঠাণ্ডা হাওয়া দেহের হাড় কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওধারের নিমগাছের বাসা থেকে কাকেদের ডানার ঝাপটার সঙ্গে ডাক শোনা যাচ্ছে। রতন ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করে আপাদমস্তক কাপড়-ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি ঘরের খিলটা খুলে এধার-ওধার দেখে নিয়ে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সন্তর্পণে সদর দরজার খিলটা খুলে আবার একবার দেখে নিয়ে রাস্তায় এক পা আর সদর দরজার চৌকাটে একপা দিয়েছে অমনি পিছন থেকে কাশীনাথ এসে বলে: এত ভোরে কোথায় চললে গো?

রতন চমকে ওঠে—তারপর আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেলে বলে : কোথায় আবার যাব—এ কোথায় এসেছি তাই দেখবো বলে এসেছি।

কাশী বলে : তবে অমন কোরে চুপিসাড়ে আসবার কি দরকার ছিল ?

বেশ যা হোক—চুপিসাড়ে আবার কোথায় ? বলে রতন সেইখানে বসে পড়লো যাতে না ধরা পড়ে যায়। কিন্তু কাশীনাথ বলে : চল, চল ঘরে চল। এত ভোরে রাস্তার ধারে দাঁড়ায় না।

অগত্যা রতনকে আবার ঘরেই ফিরতে হোল। সারা রাতের সব কৌশল—বৃথায় গেল

* * *

এদিকে দীনু পান আর বিড়ী নিয়ে এসে দেখে ট্যাক্সিসহ মাল উধাউ। সে অতশত তখন না বুঝেই বিড়ী আনতে গিয়েছিল এক্ষণে সে বোকার মত খানিকক্ষণ সেইখানে হতচকিতের মত দাঁড়িয়ে থেকে ভাবে : এ কি হোল ! তাকে বেশ বোকা বানিয়ে আচ্ছা ঠকান ঠকিয়ে বেশ অনায়াসে রতনকে নিয়ে সরে পড়লো ছোকরাটা ! এখন সে কি কোরবে ? তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। ফিরে গেলেও সকলে তাকে যা' নয় তাই বলবে। কি কোরবে কিছুই স্থির করতে না পেরে অগত্যা সে ঘরমুখোই হোলো। তখন ও রাস্তায় বাস চলতো না। জনশূন্য পথ শীতের হিমেল বাতাসে কাঁপন ধরিয়ে দেয়—সে হাঁটতে সুরু করলো। বাড়ীতে এসে একেবারে কেঁদে ফেলে ইতিবৃত্ত সব যখন বললে তখন আমরা সবাই একেবারে হতবাক্ হোয়ে গেলাম। জ্যেঠাইমা তো বিষম ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন : এখন কি করি বাছা ! পরের গচ্ছিত ধন নিজেদের বুদ্ধির দোষে খোয়া গেল ? এতো ভাবতে পারিনি। এখন কি করি—সোমত্ত মেয়ে তাকে নিয়ে বদমাইসগুলো কতই না অত্যাচার কোরবে ?—আর শশীই বা কি বলবে ! পরের ঝামেলা স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে এখন একি ফ্যাসাদে পড়লাম বল দেখি বাবা ?

আমি বললাম : দাঁড়াও দেখি, বলে জামাকাপড় ছেড়ে একেবারে সোজা থানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আদ্যোপান্ত সব ঘটনা বলে ডাইরি লিখিয়ে কিছু টাকা সেলামি দিয়ে চলে এলাম। যাতে আজ রাতেই ওরা এর একটা কুলকিনারা করতে পারেন সেই কারণে। এছাড়া এত রাতে আর কিই-ই বা করতে পারা যায়। ভাবলাম যা হয় কাল সকালে করা যাবে। জ্যেঠাইমাকে এসে বললাম : ভয় নাই মা—পুলিসে খবর দিয়েছি। ওরা তদ্বির তদারক করবে। যাতে আজ রাতেই কিছু করতে পারে তারও ব্যবস্থা ওরা করবে। কাল সকালে রতনের খোঁজখবর আর তার ঠাকুমা'র কাছে গিয়ে সব বলব বলে নিজের শোবার ঘরে চলে গেলাম। সারারাত বিছানায় পড়ে ছটফট করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয়নি। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা গোঁজাল আবদ্ধ থেকে খালি খচ্ খচ্ করে বিঁধছিল। সারারাত এমনি ধারা নানা চিন্তা করে করে ভোরের দিকে কখন একটু ঘুমিয়ে গেছি। জ্যেঠাইমার ডাকে যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন একটু বেলা হোয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি রতনের খোঁজে। প্রথমে থানায় যাই। সেখানে গিয়ে শুনি তাঁরা এখনও কোন হদিস্ পান নি—তবে জোর চেষ্টা চলছে। সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। উল্টাডাঙ্গায় যাব কি শশীমাসীর কাছে যাব চিন্তা করি। শেষে বৌবাজারের বাজারে কাশীনাথের সন্ধানে চলি।

* * *

শীতের বেলা হু-হু শব্দে কেটে যাচ্ছে। মনের মধ্যে একটা গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে বৌবাজারের মাছপটিতে এসে সংবাদ নিয়ে জানলাম যে কাশীনাথ বলে এখানে একজন মাছওলা থাকে বটে কিন্তু আজ দু'দিন সে আসেনি। হয়তো দেশে গিয়ে থাকতে পারে। যাই হোক একটু আধটু হদিস্ পেয়ে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বাড়ীতে এসে দেখি শশী আমাদের ভিতরের উঠোনের ধারে রকের উপর বসে আছে। তার দু' চোখ বেয়ে জল ঝরছে। আর জ্যেঠাইমা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

আমি যেতেই জ্যেঠাইমা বিষণ্নমনে বল্লেন : হ্যাঁরে সতু—বাবা কিছু হদিস্ মিললো। তারপর শশীর পানে চেয়ে বলেন : কি কোরে বুঝবো বল্—এমনি কোরে ধাপ্পা দিয়ে সে তাকে নিয়ে যাবে তা'তো ভাবিনি ? যাই

হোক—এখন যেমন করেই হোক খুঁজে তাকে বের করতেই হবে।—তা কি হোল বাবা?

আমি বললাম: একটু হদিস পাওয়া গেছে। দেখি একমুঠো খেয়ে নিয়ে ফের চেষ্টা করে দেখি?—বলে শশীকে বললাম: হাঁা মাসী বলতে পার কাশীনাথ বলে যে ছোকরাটা রতনকে নিতে এসেছিল তাকে তুমি চেন কিনা?

মাসি বলে: ওঃ। কাশী! তাকে চিনবোনি কেনে গো—সে তো বৌবাজারে মাছ বিক্রী করে। তবে, হাঁা—সে তো তেমন ধরনের ছেলে নয়। বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে: তবে সেই হতচ্ছাড়া শ্যামলার সঙ্গে তার খুব ভাব! যদি তার পাল্লায় পড়ে এমনি কিছু করে থাকে তাহলে—

আমি বললাম: শ্যামল তো তোমাদের স্বঘর—যদি কিছু করে তবে অতটা ভাববার কোন কারণ থাকবে না। এমন তো তোমাদের হয় গো—যাই হোক মাসি তুমি দু' একদিন এখানে থেকে যাও।—বলে আর না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি স্নানাহারের উদ্দেশ্যে ওপরে চলে গেলাম।

শীতের অপরাহ্ণ। পূবের রবি পশ্চিমে হেলে পড়ে সবে ডুবুডুবু অবস্থায় ম্লান রক্তাভা ছিটিয়ে দিয়ে ঘর মুখো হয়েছে। অপর দিকে ধূসর আকাশ ধীরে ধীরে ঘন আঁধারে ভরে আসছে। আকাশের কোল ঘেঁসে ঘর মুখো বলাকারা দলবেঁধে তীরবেগে ভেসে চলেছে। পাশের বাড়ীর ভাঙ্গা চিলে ছাতে কতকগুলো কাক জটলা করে ভীষণ চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। রাস্তায় দু' একটা করে আলো জ্বলে উঠছে। সেদিন রবিবার, ছুটীর দিন, তাই ট্রামে বাসে বাদুড় ঝোলা হ'য়ে ঘরে ফেরবার গরজ নাই অফিস যাত্রীদের। আহারাদি সেরে নিয়েই একটু বিশ্রাম করে আবার চললাম থানায়—যা হয় আজকে কিছু করা যায় কি না।

* * *

সারারাত জেগে এবং কেঁদে কেঁদে অনেক ফিকির ফন্দী এঁটেও ব্যর্থ মনস্কাম হয়ে রতন আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। বাইরে তখন তেমনিই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন সে উঠলো তখন বেলা অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে তার মন সরছে না। তবুও অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন রকমে প্রাতঃকৃত্য সেরে দাওয়ায় এসে বসে। শ্যামল কলঘর থেকে মুখ হাত মুছতে মুছতে বলে:—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি রান্না ঘরে সব যোগাড় আছে তোমার যা ইচ্ছা যাবে করে নেবে। বলেই জামা কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। যাবার সময় সদর দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে যায়। রতন অনেকক্ষণ বসে বসে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে গাল লাল করে কখন যে সেই-খানে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেছে তা সে টের পায়নি।

শ্যামলের ডাকে তার যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন অপরাহ্ণ। সে তাড়াতাড়ি ধড় মড়িয়ে ওঠে কাপড় চোপড় সামলে নিয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকে বিহ্বলের মত। তারপর সে অবস্থাকে কাটিয়ে নিয়ে শ্যামলের দিকে চেয়ে বলে: কই গো শ্যামলদা, তুমি যে কাল রাতে বললে যে সকালেই ঠাকমার কাছে দিয়ে আসবে—তা কখন্ যাব? সেই তো সকালে বেরিয়ে গেলে আর এই এতক্ষণে ঢুকলে—ঠাকুমার অসুখ আমার মন খারাপ হোয়ে আছে।

শ্যামল তার একেবারে কাছে এসে স্নেহের সুরে বলে: রতন! আমার একটা কথা তোমার সঙ্গে আছে। আগে শোন তারপর তোমায় আমি দিয়ে আসব।

রতন বলে: কি কথা? তাড়াতাড়ি বলে আমায় এখন দিয়ে আসবে চল, আমি আর একদণ্ডও এখানে থাকব —না? যদি না দিয়ে এসো তাহ'লে আমি একলাই চলে যাব—

শ্যামল বলে: শোন। আমিই তোমায় কৌশল করে হেথায় আনিয়েছি তোমার ঠাকমার অসুখের অছিলায়। সে থাক—তোমায় আনিয়ে অবধি আমার মনে নানান চিন্তায় জর্জরিত করে দিচ্ছে তাই সারাদিন আমি খালি ভেবেছি—আমি ভাল করলাম কি মন্দ করলাম! আজ তাই তোমায় সব কথাই খুলেই বলছি। সত্যি রতন আমিই তোমায় প্রতারণা করে এখানে এনেছি, এই ঘর ভাড়া করেছি, ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে সব ঠিক করে রেখেছি—আমরা দু' জনে ঘর বাঁধবো বলে। রতন! সত্যি বলছি আমি তোমায় ভালবাসি—সেই ভালবাসার মোহে পড়ে আমি এই বিপজ্জনক কাজ করেছি। তুমি আমায় ভালবাস কি না জানি না—

আমি তোমায় ভালবাসি—। রতন! এই কথা রাষ্ট্র হোয়ে যাবে বোধ করি পুলিশ আসবে—হয়তো আমাকে জেলেও যেতে হবে। আমি তোমায় বিয়ে করে ঘর পাততে চাই—দু'জনে সুখী হব বলে। এখন যা করবার তা তো করেই ফেলেছি তবে তুমি যদি রাজী হও তাহ'লে আমার সব বাধা কেটে যায়।—পুলিশ জেল আর কিছুই হবে না। যদি তুমি অমত কর তাহলে তোমার ঠাকুমার কাছে আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব—আমার এই চিরাকাঙ্ক্ষিত ভালবাসা আমার বুকেই জেগে থেকে লীন হয়ে যাবে। জেনো আমার এই জীবনটা বৃথায় চলে যাবে। অন্য কাউকে আমি আমার সহচরী করতে পারব না—সে প্রবৃত্তিও আমার নেই।—হ্যাঁ, আমার মাকেও আনতে পাঠিয়েছি মেদিনীপুর থেকে তার সঙ্গে মাসিমাও আসবেন। তারা এসে পড়লো বলে কাশী গেছে আনতে—এখন তো আমার সব কথা শুনলে? কি করতে চাও বল।

রতন শ্যামলের কথা শুনে রোষে একেবারে ফেটে পড়ে বলে: এ তুমি কি করলে? এমন ভাবে আমার সর্ব্বনাশ করতে তোমার বিবেকে বাধলো না একটুও? তাই যদি তোমার ইচ্ছে ছিল তবে একটু দয়া করে সৎ-সাহস দেখিয়ে ঠাকুমার কাছে বললে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হোয়ে যেতো শুনি? তাও যদি ঠাকুমা মত না দিত তো বাবুদের বাড়ী গিয়ে সব কথা বললেই তো পারতে? না-না-তুমি আমায় ঠাকুমার কাছে রেখে এসো আমি কোন কথা শুনবো না—এখন আমি যাই কোথায়?

তার কথায় বাধা দিয়ে শ্যামল বলে: বিধিলিপি খণ্ডাবে কে বল? সে যা হবার তা তো হোয়েই গেছে? এখন যদি তুমি সম্মত হও—তাহ'লে তোমায় নিয়ে আমি সুখী হই—আমার বিয়ের জন্য সব প্রস্তুত করা আছে। খালি—

রতন ঝাঁঝালো সুরে বলে: না—না—না! তা হতে পারে না? আমায় যেখান থেকে এনেছ সেখানে রেখে দিয়ে আসবে চল—নইলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে আমি রক্তগঙ্গা হয়ে মরে যাব—

শ্যামল এবার একটু রাগত সুরে বলে: মিছে ঢং করে আর কি হবে রতন! তুমি এমন কিছু সতীসাধ্বী নও যে তোমার সব চলে যাবে? আমাদের সমাজে অত আদিখ্যেতা কে করে শুনি? তাছাড়া এখন তোমায় যদি আমি বিয়ে করি তা রুখবারই বা কে আছে? কিন্তু আমি তা কোরবনা—মা, মাসিমা আসছে—তোমার ঠাকুমাও আসবে—এতে যদি সবাই মিলে অমত করে তাহ'লে আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—তোমার ঠাকুমার সঙ্গে চলে যাবে। উপস্থিত তোমার যাওয়া হবে না—বুঝেছ?—বলে শ্যামল আবার রাস্তায় বেরিয়ে গেল। আর রতন ক্রোধে ক্ষোভে বসে বসে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগল। তার দেহটা বাতাস-লাগা প্রদীপ শিখার মত থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

* * *

এইখানে আর একটু পূর্ব্ব ইতিকথা বলে রাখি—। শশীর মেয়ে বীণার স্বামী মারা গেলে সে যার সঙ্গে আবার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। পালিয়ে গিয়ে নতুন সংসারে স্থায়ীভাবে মেদিনীপুরে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। ওদের সমাজে এরকমটা চলন আছে। সেখানে গিয়ে বীণার একটা সন্তান হয় নাম কাশীনাথ। তারপর দ্বিতীয় স্বামীও মারা যায়। কাশীনাথকে বীণা মানুষ করে তোলে। সেই কাশীনাথ এখন বড় হোয়েছে। কোলকাতায় এসে বৌবাজারে মাছের কারবার করে। শশী কিন্তু কোনরকমেও জানতে পারে না যে কাশীনাথ তার নাতি। মাছ কেনাবেচা নিয়েই বেশীর ভাগ ওদের কথা হোত। আর কাশীর দূর সম্পর্কের মাসতুত ভাই হল শ্যামল। শ্যামলেরও মা আছে বাপ নাই। শ্যামল কোলকাতায় এসে কাশীনাথের সঙ্গে বখরায় কারবার করত। প্রথম প্রথম কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে নেশাভাঙ করত শ্যামল। রতনের সঙ্গে যেদিন মত্ত অবস্থায় ওরকম একটা কাণ্ড হোয়ে গেল—সেদিন থেকে আর সে নেশা করত না। খালি একটা মোহ ছিল সেটা রতনকে পাবার দুর্নিবার আকর্ষণ। শ্যামল সামান্য কিছু লেখাপড়া জানতো কাজেই আর আর মাছওয়ালাদের মতন ওর প্রকৃতি ছিলনা। একটু ভদ্রয়ানাতেই কাটাতো। শ্যামল কাশীনাথের মাকে মাসিমা বলে ডাকতো। কাশীনাথের মায়ের সঙ্গে শ্যামলের

মায়ের খুব গভীর হৃদ্যতা ছিল। কাজেই শ্যামল কাশীকে পাঠিয়ে ছিল তার মাকে ও মাসিকে আনবার জন্য। এধারে শ্যামল বিয়ের জন্য সমস্ত যোগাড়যন্ত্র করে রেখেছে। খালি ওদের আসার অপেক্ষা মাত্র। আর ওরা এসে পড়লে কাশীকে দিয়ে শশীকে এখানে এনে তার সম্মতি নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা।

সারাদিন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। সেই কোন্ সকালে কাশীনাথ বেরিয়ে গেছে এখনও ফিরে আসেনি। রাত্রি আটটা পর্যান্ত শ্যামল থানের ধারে পায়চারি করতে থাকে। মনটা তার বড়ই উদ্বিগ্ন উদ্‌ভ্রান্ত এবং চঞ্চল। বিবেকের সঙ্গে নানান্ বিষয়ে তার তখনও দ্বন্দ্ব চলছিল। আর মাঝে মাঝে তার ঘরের কাছে গিয়ে দেখে আসছিল কাশীনাথ ওদের নিয়ে মেদিনীপুর থেকে ফিরল কি না। তার ওপর আবার রতনকে সে ভাবে নিয়ে এসেছে সেখানেও যে একটা বিভ্রাট ঘটবে—হয়তো বা পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করে জোর তল্লাসী চলছে। নানান্ চিন্তায় চিন্তান্বিত শ্যামল খালি ছটফট করে বেড়াচ্ছে।

এমনি সময় কাশীনাথ এসে হাজির—সঙ্গে তার মা ও মাসিমা। ওদের গাড়ী এসে থামতেই শ্যামল তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের গাড়ী থেকে নামবার পূর্ব্বেই সব ইতিবৃত্ত অকপটে বলে। মা ও মাসিমা বলে: আচ্ছা বাবা! আমরা যখন এসেছি কদ্দূর কি করা যায় ভেতরে গিয়ে আগে কথাবার্ত্তা কয়ে দেখি তারপর সব ব্যবস্থা হবে'খন।

বীণাও জানে না রতন তার কে। আজ দীর্ঘদিন সে এখান থেকে চলে গেছে কারো কোন খোঁজখবর রাখেনি। তারপর নামতে নামতে বলে: মেয়েটী একা আছে বলেই তার যতকিছু দুশ্চিন্তা—মেয়েমানুষ দেখলে মেয়ে-মানুষ সব কথা খুলে বলে ফেলে সে বিষয়ে কোন চিন্তার দরকার নেই। কাল সন্ধ্যার সময় কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে। তা যদি না ইচ্ছে থাকে তবে এখানেই ব্যবস্থা করা যাবে।

শ্যামল বিয়ের যোগাড়যন্ত্র পূর্ব্বেই সব করে রেখেছিল। ওরা ঘরে গিয়ে রতনকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে অনেকটা রাজী করিয়েছে এবং বলেছে যে এই বিয়েতে তার ঠাকুমাকেও এখানে আনতে কাশী চলে গেছে। তাহ'লে আর বাধা কিসের?

তখনকার মত অবস্থায় অত পরিচয়াদির কথা কেউ ভাবেনি। আগে কাজ হয়ে যাক তারপর সব পরে হবে।

পরদিন সন্ধ্যায় কালীঘাটে না গিয়ে এই বাড়ীতেই চুপিচুপি জনা দশবারো লোক নিয়ে বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছে। হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে মিলন সময় আগত হয় হয়—ঠিক সেই সময় শশীমাসিকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর সত্যেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে উদয় হলাম আমি।

শশীকে সামনে দেখে একদিকে রতন—ঠাকুমা গো এরা আমায় জবাই করছে গো বলে—ডুকরে কেঁদে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শশীর বুকে—অপর দিকে বীণা তার মাকে অনেকদিন বাদে দেখতে পেয়ে সামনে ছুটে গিয়ে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বলে: মা—মা—তু—মি—র—ত—ন! বলে কেঁদে ওঠে।

আমি, পুলিশেরা ও ইন্সপেক্টর সত্যেনবাবু আমরা সকলে হতভম্ব হোয়ে যাই। তখন সেই অবাঞ্ছিত মুহূর্তে শশীমাসি সব পরিচয়ান্তে সত্যেনবাবু সাক্ষাতে শ্যামলের সঙ্গে রতনের শুভমিলন হোয়ে যায়। অতঃপর সকলে ভূরিভোজে আপ্যায়িত হোয়ে দুই হাত এক করে দিয়ে সেই শুভরাত্রির শুভপরিণয়ে মঙ্গলস্তোত্র পাঠ করে যে যার ঘরে ফিরে যায়। আর এই শুভরাত্রিতে হারানো মেয়ে ও নাতনী খুঁজে পায় মা ও ঠাকুমাকে। আর শশী শ্যামলের এক হাত ও রতনের আর হাত নিয়ে মিলিয়ে দেয় সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব মিটিয়ে—। আর এত দিনের আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ পায় তার মানসীকে। এ বলে আমি—ও বলে তুমি—।

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম মন্ত্র (১।১।৭)।

মন্ত্র—বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈ তাং শান্তিং কুর্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্॥

অর্থ—(নচিকেতা যমালয়ে উপস্থিত হইবার তিনদিন পরে যমরাজ সেখানে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার শ্রদ্ধেয় অমাত্যবর্গ তাঁহাকে বলিলেন :—) "বৈশ্বানর অগ্নি আসিয়াছেন বলা হয় যখন ব্রাহ্মণ গৃহস্থ-গৃহে অতিথিরূপে আগমন করেন। তাঁহার যথাবিধি সেবা করিয়া তাঁহার শান্তির ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং, হে যমরাজ, তাঁহার পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন করুন"।

ব্যাখ্যা—নচিকেতা যমালয়ে পৌছিলেন। যম তখন অনুপস্থিত। মানুষের মৃত্যুর সময় যম বা তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত হ'ন, মানুষ বরং অপ্রস্তুত থাকে। কিন্তু নচিকেতার পুরুষার্থের ফলে বিপরীত হইল। তিনি প্রস্তুত হইয়া যমের দপ্তরে পৌছিলেন, কিন্তু যম তাহা জানিতেন না, তাই তিনি অপ্রস্তুত থাকায়, হাজির ছিলেন না। কাজ না থাকিলে, কে কবে আফিসে বসিয়া থাকে? যমরাজ তিনদিন ছুটি উপভোগ করিতেছিলেন। নচিকেতাকে কাজেই তিনদিন যমের কার্য্যালয়ে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে হইল। তাঁহার আগন্তুকদের খাতার (Visitors' Book এ) নচিকেতাকে নিজের নাম লিখাইতে হইবে। "এসেছি বন্ধু, তোমার গৃহে, তুমি আমার উপায় কর" এই ভাব অন্তরে রাখিয়া নচিকেতা অপেক্ষায় রহিলেন।

অমৃতের পথে যাঁহারা যাত্রী, যাঁহারা মৃত্যুর আশীর্ব্বাদ পাইবার যোগ্যতা রাখেন, তাঁহাদের এইভাবে তিনরাত্রি অপেক্ষা করিতে হয়, এই কথা এখানে সংগোপনে বলা হইয়াছে। এ কথাটি মনে রাখিবার কথা। যীশু যখন সশরীরে স্বর্গে যা'ন, তাঁর স্বইচ্ছায় মৃত্যু ঘটে ক্রুশের উপর, শুভ শুক্রবার (Good Friday) সন্ধ্যায়। মেরী ম্যাগডালীন (Mary Magdalene) নামক একটি শোকাতুরা রমণী স্বীয় গুরুর শেষ লীলা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, যোগাসনে তিন রাত্রি ধরিয়া, ধৈর্য্য সংকারে প্রতীক্ষা করেন। শেষে ইষ্টার সোমবারে (Easter Mondayতে) ভোরের আলোয় তিনি দেখিলেন, যীশু কবর হইতে উঠিয়া সশরীরে স্বর্গে চলিয়া যা'ন। তখন সেই বার্ত্তা মহিলাঋষি যীশুর শিষ্যদিগের কাছে গিয়া, ঘোষণা করিয়া, তাঁহাদের চমৎকৃত করেন। এসকল ইতিবৃত্ত ও ইহার পরের আনুসঙ্গিক ঘটনা বাইবেল ধর্ম্ম-পুস্তকে উল্লিখিত আছে। আমাদের বলিবার কথা, যীশুকেও Resurrection অর্থাৎ সশরীরে স্বর্গগমনের জন্য মৃত্যুর আগারে তিন রাত্রি অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। যাহা আর্য্যগণের কঠোপনিষদে পাই, তাহাই সেমিটিক্ জাতির ধর্ম্ম ইতিহাসে উপলব্ধ হইল। নচিকেতাকেও তিন রাত্রি প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। যেমন নিয়ম, সেইমত কাজ।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, কেন এইরূপ প্রতীক্ষার বিধান? ইহার উত্তরের আভাস আর্য্যজাতির ধর্ম্মপুস্তক শ্রীচণ্ডীতে পাই। ব্যক্ত মনুষ্যজীবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, অব্যক্ত যমালয়ে তিনটি রাত অপেক্ষা করিয়া, নিজ প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া, সেই অপ্রাকৃতিক স্থান হইতে আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিবার সময় আসে। এই তিন রাত্রিকে চণ্ডীতে বলা হইয়াছে, কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রি। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ মনুষ্য জীবনে চক্রবৎ ঘোরাফেরা করে ও নিত্য নূতন আশা ও প্রতীক্ষার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত হইলে পর তখন আত্মবান্ হওয়া যায় (গীতা, ২।৪৫)। এই তিন গুণের পর্য্যায়ক্রমে অবসান লক্ষিত হয়, এই তিনটি রাত্রে। সত্ত্বগুণ শেষ হয়

কালরাত্রে, রজোগুণ মহারাত্রে এবং তমোগুণ মোহরাত্রে। এইরূপে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহের সীমানা পার হইতে হয় (গীতা, ১৪.২২-২৩ দ্রষ্টব্য)। তখন এসকল গুণের প্রতি অনুরাগ বা বীতরাগ কিছুই আর মানবসত্তায় বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া, তাহারা আর চক্রাৎ সে জীবনে ফিরিয়া আসে না ও মানুষ ত্রিগুণাতীত হইতে সক্ষম হয়। গীতায় বলা হইয়াছে, "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী" (২।৬৯) অর্থাৎ এই তিনটি রাত্রে সাধারণ মানুষ ঘুমাইয়া থাকে ও সেই অবসরে, রেলের গার্ড (Guard) যেমন পরিবর্ত্তন হয় যাত্রীদের রক্ষার জন্য, সেই মত গুণগুলি পরে পরে নিজ আয়ত্তে মানুষকে ধরিয়া লয়। কিন্তু নচিকেতার মত সাধক (যিনি যমের সঙ্গে বসবাসের অভিলাষী হইয়া) সংযমী হ'ন, তিনি জীবন-মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, সকল হিসাবনিকাশ করিয়া, যমের দপ্তরে শেষ খেয়া পার হইবার জন্য আসিয়াছেন, কাজেই তিনগুণ আর তাঁহাকে কেমন করিয়া স্ববশে আনিবে? তাই তিনি জাগিয়া প্রতীক্ষা করেন তিন রাত্রি ধরিয়া।

নচিকেতা দ্বিজ বটে। আধ্যাত্মিক জন্ম হইবার যাঁহার সুযোগ হইয়াছে তিনিই দ্বিজ। নচিকেতা "সত্তাকুল জাত", তাই তিনি ব্রাহ্মণ। যমালয়ে তিনি সশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, অতএব ক্ষুধাতৃষ্ণা তাঁহার সবই থাকিবে। যেমন দেবতাদের থাকে বা তাহার বেশী। ঐতরেয় উপনিষদে দেখি, দেবতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা তৃপ্ত করিবার জন্য যে ব্যবস্থা তাহা মানুষ অনেক সময়ে ভুল করিয়া নিজ ভোগের জন্য মনে করিয়া থাকে (১।২৫)। মানুষ যে এইরূপে দেবতাদের প্রাপ্য নিজেরা অপহরণ করে তাহা গীতায় বলা হইয়াছে (৩।১২)। কাজেই নচিকেতার শরীরে বৈশ্বানর বসতি করিতেছেন, যিনি বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষ হইয়াও মানবদেহে আশ্রয় লইয়া থাকেন এবং তাঁহার কৃপায় মানুষ খাদ্যসামগ্রী পরিপাক করিতে সক্ষম হয় (গীতা, ১৫।১৪ বিশেষ দ্রষ্টব্য)। নচিকেতা ব্রাহ্মণ, সশরীরে যখন আসিয়াছেন, বৈশ্বানর অগ্নি তাঁহার উদরে থাকিয়া আহার চাহিবেন। তিনি যমের বাড়ীর অতিথি। এইরূপ অবস্থায়, নচিকেতার সর্ব্বপ্রকার শান্তি-বিধানের জন্য পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি দেওয়া যে যমের একান্ত কর্ত্তব্য তাহা স্মরণ করাইয়া তাঁহার নিজ অনুচর বা সহচরেরা এইরূপ অনুশাসনের উল্লেখ করিলেন।

তাঁহাদের অনুশাসন সেইজন্য এখানে অল্পের মধ্যে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। যমকে "বৈবস্বত" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি সূর্য্যের সন্তান। সূর্য্য যেমন জীবের জীবন-ব্যাপী ভর্ত্তা, সেইরূপ যম জীবের জীবনান্তে মরণের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা। সূর্য্য জীবের জীবনকালে তাহার আহারের ব্যবস্থা করেন, তাঁহার অনুকূল্যে। যম আহারের ব্যবস্থা করেন মরণান্তে তাঁহার "অতিথি"দের জন্য। অতিথি কে? যে মরণের নির্দিষ্ট তিথি অনুযায়ী আসে না, তাহার নিজের ইচ্ছায় আসে সে। যে তিথি অনুযায়ী প্রেতলোকে যমালয়ে আসিতে বাধ্য হয়, তাহার জন্য শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা তাহার আত্মীয়গণ ইহলোক হইতে যথাযোগ্য নির্ব্বাহ করেন। অতিথির জন্য যমকে ব্যবস্থা করিতে হয়। অতএব নচিকেতা যখন অতিথিরূপে আসিয়াছেন, তাঁহার সেবা ও তুষ্টির আয়োজন যমরাজকে করিতে বলা হইল।

অষ্টম মন্ত্র (১।১।৮)।

মন্ত্র—আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাং
চেষ্টা পূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্বৃঙ্ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥

অর্থ—(এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-অতিথি উপবাসী থাকিলে গৃহস্থের যে প্রকার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়:—) ব্রাহ্মণ অতিথি অনাহারে বাস করিলে সেই অল্পবুদ্ধি গৃহস্থের সমস্ত আশা ভরসা, সাধুসঙ্গের ফল, জীবনের ছন্দ, যাগযজ্ঞের ফল, জনসাধারণের প্রতিদান, পুত্র এবং পশু সবই ব্যর্থ যায় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—অতিথি ব্রাহ্মণের যথাযথ সেবা না হইলে কিরূপ ফল হয় তাহা বিবৃত হইল। ব্রাহ্মণকে পালন করা সেকালে সকল গৃহস্থের গৌরবময় কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। যে গৃহস্থ তাহা বুঝিতেন না, তাঁহাকে "অল্প মেধস" অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি বা নির্ব্বোধ বলা হইত। অল্পবুদ্ধি বা মূর্খ, কারণ সে কালের ব্রাহ্মণ যাহা লইতেন তাহার অনেক বেশী দিতেন। তিনি যখন গৃহস্থের দ্বারে

পদার্পণ করিতেন, অনেক আশা পূরণ করিয়া ফিরিতেন তাহা নিশ্চিত ছিল। তাঁহাকে কোনমতেই অবহেলা করা উচিত নয় বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি ত পরিপূরক ছিলেন, গৃহস্থ যাহা কিছু মঙ্গলকার্য্য করিয়াছেন, যাহা কিছু মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন, সমস্তই তিনি সফলতায় মণ্ডিত করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। মানুষ কত অজানা বস্তুর আশা করে, কত প্রকার জানা আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রীর জন্য প্রতীক্ষা করে, কত সাধুসঙ্গ এই সকল কারণে লালসা করিয়া পাইয়া থাকে, কত মধুময় বাক্যের দ্বারা নিজ জীবনের ছন্দ রচনা করে, কত যাগযজ্ঞ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, কত উদ্যান ও কূপ প্রভৃতি উপযুক্ত সংস্থা বা যোগ্য ব্যক্তিকে দান করিয়া থাকে, এ সব সদাচার কিসের জন্য? সৎ ব্রাহ্মণ কবে গৃহে আসিয়া তাঁহার অনুগ্রহ—আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিবেন, তাহারই জন্য ত? আর সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে যথাযথ সেবা না করিলে, পুত্র, পশু প্রভৃতি যাহা কিছু গৃহস্থের সম্পদ সবই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না কি?

এতক্ষণে বুঝা গেল, নচিকেতা পিতার যজ্ঞস্থলে দক্ষিণা-দানে যদি কৃপণতা প্রকাশ পায় তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পিতার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য কেন উতলা হইয়াছিলেন। পুত্র ও পশুকে এই মন্ত্রে এক নিঃশ্বাসে একত্র বলা হইল, গাভীদের অবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া নচিকেতা পুত্ররূপে তাঁহার নিজের কি অনিষ্ট হইতে পারে তাহা যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে সে সময়ে ব্যস্ত হইয়া নিজ সম্বন্ধে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে উৎসুক হ'ন তাহা আর বিচিত্র কি? তাহা ছাড়া পিতার জীবনের কার্য্য উত্তরাধিকারী পুত্রকে পূর্ণ করিতে হয়। সনাতন ধর্ম্ম অনুসারে, প্রথমে নিজ কর্ত্তব্য পালনে অভ্যাস কর, পরে নিজ অধিকার আপনা হইতেই তোমার হস্তে আসিবে। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, আমরা প্রথমে অধিকার চাই, পরে কর্ত্তব্য যাহা পালন করিতে হইবে, তাহা দেখা যাইবে। পুত্র নচিকেতা পিতার উপযুক্ত সন্তান বলিয়া নিজ কর্ত্তব্যবোধে পিতাকে প্রশ্ন করেন, "বাবা, আমাকে তাহা হইলে আপনি কাহার হস্তে অর্পণ করিতেছেন? বিনাশের হস্তে দিতেছেন কিনা স্মরণ করিয়া দেখুন"। পিতা যাহা বলিলেন, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে নচিকেতা কর্ত্তব্য-বোধে পিতার সত্যপালনের জন্য যমের গৃহে আসিয়াছেন। তাঁহার অধিকারের কথা তিনি ভাবেন নাই। তাহা ত যেমন আসিবার আসিবে।

ঠিক সেই কথা যমের আত্মীয় সুধীবর্গ, তাঁহাকে তিন রাত্রি পরে ফিরিতে দেখিয়া, নচিকেতার সম্মানার্থ যাহা করিবার তাহাই এখানে অনুরোধ করিতেছেন। সেকালে কর্ত্তব্য নিরূপণ এইভাবেই হইত বলিয়া শাস্ত্রের মহিমা বর্দ্ধিত হইত এবং সাধু ও ব্রাহ্মণগণ সকলের প্রীতি ও সেবা অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত হইতে প্রয়াসী হইতেন।

[ক্রমশঃ]

ধর্ম অনুশীলনের শুভদিন আগতপ্রায়

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমরা পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতীয় মানব বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা ধর্ম অনুশীলন করিয়া আসিতেছি। কিন্তু, ইহা অতি সত্য যে, আমরা সকল ধর্মের অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তি নীতি ও ধর্ম বিষয়ে অত্যন্ত অবনত জীবন যাপন করিতেছি। ইহার অনেক প্রকার জাগতিক কারণ দেখান যাইতে পারে ও দেখান হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই জানিনা, এবং জানিলেও হৃদয়ের দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না।

আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার প্রকৃতকারণ হইতেছে—ভগবানের ইচ্ছা। তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করিবেন, তখন তাহা অবশ্যই হইবে। তিনি যতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে এই অবস্থায় রাখিতে ইচ্ছা করিবেন, ততদিনই আমাদিগকে এই অবস্থায় থাকিতে হইবে। আবার তিনি যখন আমাদিগকে উন্নত জীবন যাপন করিতে দিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই আমরা উন্নত নৈতিক ও ধর্মজীবন যাপন করিতে পারিব।

এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কি আমরা অদৃষ্টের দাস? আমাদের কি পুরুষকারের কোনশক্তি নাই? যাঁহারা অদৃষ্টবাদী তাঁহারা পুরুষকারের শক্তি অস্বীকার করেন, এবং যাঁহারা পুরুষকারবাদী তাঁহারা পুরুষকারের অসীম শক্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব দিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার মত, জ্যোতিষ শাস্ত্রের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়কেই স্বীকার করিয়াছেন তবে বলিয়াছেন, যে আমাদের পুরুষকার অসীম নহে, উহা সীমাবদ্ধ—উহা ভগবানের ইচ্ছার ও অদৃষ্টের অধীন। তিনি একটি উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। একব্যক্তি একটি গরুকে ঘাস খাওয়াইবার জন্য তাহাকে মাঠে আনিল, এবং একটি গোঁজের সহিত একটি দড়ি বাঁধিয়া গরুটার গলায় আটকাইয়া দিল। ঐ গরুটা ঐ দড়ির সীমার মধ্যে মাঠের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবে ও ঘাস খাইতে পারিবে, কিন্তু দড়ির সীমায় বাহিরে যাইতেও পারিবে না, এবং ঘাসও খাইতে পারিবে না, উপরন্তু, ঐ গোপালক যখন ইচ্ছা তখনই ঐ গরুটাকে দড়িশুদ্ধ ঐ মাঠ হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিবে। আমাদের পুরুষকার ঐ প্রকার সীমাবদ্ধ। ভগবান্ আমাদিগকে যে সীমাবদ্ধ পুরুষকার দিয়াছেন, তাহার সীমার মধ্যে আমরা বহু ভালমন্দ কাজ করিতে পারি ও করিয়া থাকি, কিন্তু ঐ সীমার বাহিরে কিছু করিবার আমাদের শক্তি নাই। উপরন্তু, ভগবান্ যখন ইচ্ছা আমাদের ঐ সীমাবদ্ধ পুরুষকার হইতেও বঞ্চিত করিতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সীমাবদ্ধ পুরুষকার সম্বন্ধে মত, সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত, এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিলে তাহার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে। প্রকৃত পারদর্শী জ্যোতিষী যে কোন ব্যক্তির জন্ম সময় জানিতে পারিলে, অথবা তাহার কররেখা দেখিতে পারিলে নির্ভুল ভাবে বলিয়া দিতে পারেন, ঐ ব্যক্তি জীবনে কিপ্রকার সফলতা অর্জন করিবেন। অথবা কি প্রকার নিষ্ফলতার ভিতর দিয়া জীবন কাটাইবেন, যদি আমাদের জন্মসময়েই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের, পুরুষকারের ফলাফল জানিতে পারা যায় তাহা হইলে ঐ পুরুষকার যে সীমাবদ্ধ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকেনা। আমরা যত অধিক পুরুষকার ব্যবহার করিনা কেন, তাহার ফলাফল আমাদের জন্ম হইতেই স্থির হইয়া আছে। ইহা আমরা জানিনা অথবা জানিলেও মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারিনা। যতদিন ভগবানের ইচ্ছা না হইবে ততদিন আমরা পুরুষকার সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিব না। আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলেই, আমরা ঐ সত্য উপলব্ধি করিতে পারিব।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা আলোচনা করিয়া আমি নিবেদন করিতেছি যে, আমাদের নৈতিক ও ধর্মজীবনের অবনতির মূলে আছে আমাদের

অধিকাংশ ব্যক্তির মনে ধর্মের মূলতত্ত্বগুলির সম্বন্ধে ও ধর্ম অনুশীলনের নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিশেষ ভ্রান্ত ধারণা। যতদিন আমরা ঐ ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করিতে না পারিব ততদিন আমাদের নৈতিক ও ধর্মজীবনের উন্নতি হইবে না। অবশ্য কবে, আমরা তাহা পারিব তাহা সম্পূর্ণ ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। তবে, সম্প্রতি শতাধিক বৎসরে ধর্মে ও বিজ্ঞানে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং ধর্মনেতৃগণের ও বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে আমাদের স্থুল বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ধর্মানুশীলন প্রকৃতপথে ও সার্থকতার পথে পরিচালিত হইবে।

ধর্মানুশীলনে এই পরিবর্তন আশা করিবার কারণগুলি এখানে বিশ্লেষণ করিতেছি।

বর্তমান সময়ে নিম্নলিখিত এগারটী ধর্মকে পৃথিবীর প্রধান ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়—

ভারতীয় ধর্মে—(১) হিন্দু, (২) জৈন, (৩) বৌদ্ধ ও (৪) শিখ। পূর্ব-এশিয়ার ধর্ম—(১) তাও, (২) কনফিউসিয় (৩) সিণ্টো। পশ্চিম-এশিয়ার ধর্ম—(১) জোরোথাষ্ট্রিয়, (২) ইহুদি, (৩) খৃষ্ট ও (৪) ইসলাম।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি ধর্মে নানাপ্রকার উচ্চতত্ত্ব ও অনুশীলনের প্রণালী আছে এবং প্রত্যেকটি ধর্মের অনুশীলনে নানা প্রকার অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কার পূর্ণ নিয়মাবলী প্রচলিত আছে। ধর্ম অনুশীলন সার্থক করিতে হইলে ধর্মের উচ্চ সারতত্ত্বগুলি গ্রহণ করা ও ধর্ম অনুশীলনে অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কার পূর্ণ নিয়মাবলী পরিত্যাগ করা আবশ্যক। কিন্তু নানা প্রকার জাগতিক কারণে আমরা তাহা করিতে পারিতেছি না।

আমাদের এই অসফলতার প্রধান কারণ হইতেছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা, এবং তাহার পশ্চাতে আছে ধর্মপালক ও ধর্মানুশীলনকারিগণের এবং বৈজ্ঞানিকগণের ভ্রান্ত ধারণা।

একদিকে, আমরা ধর্মানুশীলনকারিগণ ধর্মের তত্ত্ব ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং আমরা ষড়রিপুর দাস হওয়ায় আমরা উহার যতটুকু জানি তাহাও প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ। তদুপরি নানা কারণে ধর্মরক্ষক এবং প্রচারকগণ উহার অন্তরালে [illegible] কায়েমী স্বার্থ ও আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। ঐ স্বার্থ ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য তাহারা আমাদের মনে ধর্ম পুস্তকের প্রতিটী কথার আর্থিক সত্যতায় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার জন্য ধর্ম ও ধর্মপুস্তক সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে আমোদের মনে একটি সম্পূর্ণ অহৈতুক ভীতি সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগকে ধর্মতত্ত্ব ও নিয়মাবলী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে না দিয়া আমাদিগকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতেছেন। অপরদিকে বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের গবেষণা হইতে ধর্মকে দূরে রাখিয়াছেন এবং (১) আমাদের ধর্মানুশীলনে অনেক কুসংস্কার ও অনেক অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া ও (২) ধর্মের প্রধান-তত্ত্ব ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না পাওয়ায় ঐ বৈজ্ঞানিকগণ ধর্ম ও ধর্ম-অনুশীলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

ইতিমধ্যে খৃষ্টীয় অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ সময় হইতে ধর্মানুষ্ঠানকারিগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ—একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে লাগিলেন। ধর্মানুষ্ঠানকারিগণের মধ্যে অনেক মনীষী ব্যক্তি দেখিলেন যে গতানুগতিক ভাবে ধর্মানুশীলন করিয়া ভগবান্ লাভও হয় না, এবং গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানও হয় না, তখন তাঁহারা ভারতবর্ষের আগত বিদেশী ব্যক্তিগণের সহিত ও পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল অন্য ব্যক্তিগণের সহিত যোগাস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে অনেক ধর্মানুশীলনকারী ব্যক্তিগণ ধর্মে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রমশঃ তাঁহাদের সংখ্যা বর্ধিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থপর ধর্মপালকগণের কবল হইতে, এবং ধর্মে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে, অল্প বিস্তর মুক্ত হইলেন। অপরদিকে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন যে তাঁহারা গবেষণার দ্বারা অনেক জাগতিক বিষয়ে কার্য-কারণের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারিলেও বহু কার্যের কারণ আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না, এবং সকল পদার্থের মূল কারণ আদৌ বুঝিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায়, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকগণ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অসীমতা সম্বন্ধে অনেকগুলি বিষয় আবিষ্কার করিলেন, এবং এই বিংশ শতাব্দীর অভূতপূর্ব আবিষ্কারে তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অভিভূত হইয়া পড়িলেন,

এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ সম্বন্ধে বিবিধ ধর্মপুস্তকে কি বলিয়াছে তাহা জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন।

বৈজ্ঞানিকগণ এখন জানিতে পারিয়াছেন, আকাশে এক একটী দৃশ্যমান ক্ষুদ্র ছায়াপথের মধ্যে অন্ততঃ দুইশত কোটি নক্ষত্র আছে, এবং সেই প্রত্যেকটী নক্ষত্র আমাদের দৃশ্যমান সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। সম্প্রতি রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ ককেশাস পর্বতের মানমন্দির হইতে একটি সূর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা দশলক্ষ গুণ উজ্জ্বল। বৈজ্ঞানিকগণ এখন জানিয়াছেন যে, এইপ্রকার কোটী কোটী ছায়াপথ বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে কয়েক কোটী ছায়াপথ লইয়া একটি ছায়াপথ-মণ্ডলী (Metagalaxy) আছে, এবং ঐ প্রকার শত শত ছায়াপথ-মণ্ডলী আছে। ঐ ছায়াপথগুলিও তন্মধ্য স্থিত সূর্য-তারকাগুলি নিজ নিজ নির্দিষ্ট পথে নিয়মিত ভাবে ঘুরিতেছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোনটি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় নব্বই হাজার মাইল বেগে ঘুরিতেছে। তাঁহারা আরও জানিয়াছেন যে, আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় অন্ততঃ এককোটী পৃথিবী আছে, যেখানে ঘাস, বৃক্ষ ও জীব বাস করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন যে, এইভাবে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করিবার ও সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীতে পরিচালন করিবার জন্য নিশ্চয় একটি অনন্ত শক্তি আছে ও কার্য চালাইতেছে, এবং এই শক্তিকেই ধর্মগ্রন্থে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ ধাপে ধাপে ঐ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন যে ঐ বিরাট শক্তির ভিতর মানুষের ন্যায় মন আছে, এবং কেহ কেহ বলিতেছেন যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে ভগবানের অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তাঁহারা বলিতেছেন যে ঐ অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের এই দৃশ্যমান জগৎ একটি আলপিনের ন্যায় ক্ষুদ্র ও নগণ্য।

এই অবস্থায় বৈজ্ঞানিকগণ ধর্মের তত্ত্বগুলি ও নিয়মাবলী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া দেখিতে প্রস্তুত হইতেছেন, এবং ধর্মানুশীলনকারী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ধর্মে ঐ দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার অনুমোদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে যে ভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিজ নিজ অসম্পূর্ণতা ও পরস্পরের সহযোগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা ক্রমেই দ্রুতগতিতে উভয়ে উভয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া সম্পূর্ণ মিলন ও সহযোগিতা লাভ করিবেন। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো কয়েক দশকের মধ্যে, নতুবা আগামী খ্রীষ্টীয় একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের প্রকৃত পূর্ণমিলন হইবে। এবং তাহার ফলে ধর্ম অনুশীলন বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং আমাদের সকলের ধর্মানুশীলন সার্থক হইবে।

সেই শুভদিন আগতপ্রায়, আমাদের বহু সহস্র বৎসরের নিষ্ফল ধর্মানুশীলন সার্থক হইতে আর বেশী দেরী নাই।
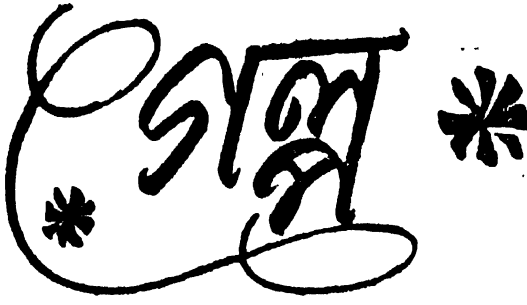
হরিষে বিষাদ

সুমিতা সরকার

নিয়মমত সকাল সাতটায় ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা ভবেশবাবুর সামনে এনে রাখল মালতী। ভবেশবাবু কলমটা বন্ধ করে, খাতাটা সরিয়ে, চশমাটা খুলে রেখে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলেন, তারপর অপস্রিয়মানা মালতীর দিকে তাকিয়ে ডাকলেন—"বৌমা"—মালতী ঘোমটা টেনে ফিরে দাঁড়াল। ভবেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন —"তুমি ত এ বছরেই স্কুল ফাইনাল পাশ করলে না বৌমা?"

মালতী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

এ বছরই স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে মালতী এবং তারপরই ভবেশবাবুর পুত্রবধূ হয়ে এ-বাড়ীতে এসেছে। আর পড়া হয় নি। মালতীর দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে ফেলেন ভবেশবাবু—"বৌমা, তুমি আরো পড়বে?"

মালতীর চোখে বিস্ময় ভরে ওঠে।

"ছেলেটা আমার মনের মত মানুষ হল না," অধ্যাপক ভবেশবাবুর গলার স্বর করুণ হয়ে ওঠে, 'তুমি যদি চাও আমি তোমাকে ইউনিভারসিটি পর্য্যন্ত পড়াব।"

মালতী নতুন বৌ। শ্বশুরবাড়ীতে স্বভাব সুলভ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে তার মা তাকে বারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অভাবনীয় প্রস্তাবে মালতী বধূসুলভ গাম্ভীর্য্য ভুলে কিশোরীর উচ্ছলতায় বলে উঠল—"পড়ব বাবা"।

ভবেশবাবু খুশী হলেন। মালতী চলে গেল। মালতী মনের খুশী প্রথমেই প্রকাশ করতে গেল বারীনের কাছে।

বারীন তখন স্নান সেরে পোষাক পরে বেরচ্ছিল। আজ তাদের সেমিফাইনাল ক্রিকেট ম্যাচ। এই খেলা খেলা করেই বারীনের লেখাপড়া হয় নি। অবশ্য তার জন্য ফাঁকিতে পড়ে নি। ভালো খেলোয়াড় এই সুপারিশে ভাল চাকরিই পেয়েছিল। একজন নতুন অধ্যাপকের চেয়ে মাইনে তার কম নয়।

কিন্তু পুত্রের এহেন সাফল্য বিদ্যাভিমানী অধ্যাপকের মনঃপুত হয় নি। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে তাঁর মস্ত বড় পণ্ডিত হবে। সে সাধ মিটল না।

মালতী পিছন থেকে সার্টের কলার ধরে টানল। ঠিক বেরনর মুখে বাধা পেয়ে একটু বিরক্ত হল বারীন, সামলে নিয়ে বল্লে "কি বলছ?"

"জানো, আমি কলেজে ভর্ত্তি হব—বাবা বলেছেন"।

"আচ্ছা—বাবা তাহলে পুত্রবধূকে দিয়েই পুত্রের দুঃখ মেটাবেন! যাও, বিদুষী হয়ে এস", বারীনের চোখে বিদ্রূপ।

ম্লান হয়ে গেল মালতী। বারীন অনুতপ্ত হল, "আরে, রাগ করলে না কি? আমি কিছু বলিনি ত! ঠাট্টা করছিলাম।"—বিদ্রূপটাকে কৌতুকে রূপান্তরিত করে বারীন চলে গেল।

মালতী আস্তে আস্তে ঢুকল রান্নাঘরে। যোগমায়া ভাতের হাঁড়িতে জল ঢেলে একটু বিরক্তকণ্ঠে বল্লেন "এক পেয়ালা চা দিয়ে আসতে তোমার এত দেরী হল বৌমা!"

মালতী ভীরু চোখে তাকাল—"মা, বাবা বলছিলেন কলেজে পড়তে।"

"পড়তে? কাকে?"

"আমাকে"—মালতী পারলে মাটিতে-ই মিশিয়ে যায়।

যোগমায়া হেসে ফেলেন, "তোমার বাবা বুঝি এবার তোমাকে নিয়ে পড়লেন। নিজে সারাজীবন লেখাপড়া নিয়ে রইলেন, তাতেও সখ মিটল না!" —হাসির মধ্যে দিয়েও বিরক্তিটা চাপা পড়ল না যোগমায়ার।

কিন্তু ভবেশবাবু নির্বিকার। তিনি নিজে গিয়ে মালতীকে বাড়ীর সব চেয়ে কাছের মেয়েদের কলেজটায়

ভর্ত্তি করে এলেন এবং রোজ নিজে পড়াতে যাওয়ার পথে মালতীকে কলেজে পৌঁছে দিয়ে আসতে লাগলেন।

প্রকাশ্যে আপত্তি কেউ করল না বটে, কিন্তু দশটার মধ্যে পুত্রবধূকে ভাত দেওয়ার সময়ে যোগমায়ার ব্যবহারে মিলল একটু অসন্তোষ। বারীনের কথার সুরে প্রচ্ছন্ন রইল একটু জ্বালা।

মালতী নির্বোধ নয়। ঠিকই বুঝতে পারল। লেখা-পড়া করতে তার খারাপ লাগে না বটে—কিন্তু এরকম ভাবে দিনের পর দিন কিছু করা সম্ভব বলে মনে হল না তার। নিজে যখন মত দিয়েছিল ছেলেমানুষী ইচ্ছাটাই ছিল বেশী—সমস্ত কিছু ভেবে দেখার সময় বা মন ছিলনা। কিন্তু এখন ঘড়ি ধরে স্নান, খাওয়া আর কলেজে যাওয়া সব দিন ভাল লাগছে না তার। মাঝে মাঝে তারও ইচ্ছা করে কলেজে না গিয়ে ঘরের কাজ নিয়ে একটু বসতে। শনিবারে সিনেমায় যাওয়া আর হয় না। সন্ধ্যাবেলা বারীন যখন ঘরে থাকে তখন তার সঙ্গে গল্প করবে না ক্লাসের টাস্ক করবে তাই নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়ে যায় মালতী। কিন্তু কিছু বলতে পারে না ভবেশ বাবুর দিকে চেয়ে। বৃদ্ধ অধ্যাপক তাঁর সমস্ত উৎসাহ নিয়ে মালতীকে পড়াচ্ছেন। নিজে তার বই কিনে দিয়েছেন। নিজে তার পড়া শোনা দেখেন।

দ্বিধাচ্ছন্ন মন নিয়েই দিন কাটে মালতীর। তারপরে একদিন বেরবার সময়ে মালতীকে পেলেন না ভবেশবাবু।

"বৌমা—"

মালতী এল না। এলেন যোগমায়া—"বৌমা আজ কলেজে যাবে না।"

"যাবে না? কেন? আজ যে ওদের টিউ—টোরিয়াল।

"ওর শরীরটা ভাল নেই।"

"কি হয়েছে?"—উদ্বিগ্ন হলেন ভবেশবাবু।

"বিশেষ কিছু হয় নি। তুমি যাওনা বাপু। তোমার অত খোঁজে কি দরকার? রোজ দশটা চারটে করে করে বৌমার চেহারাটা কি হয়েছে একবার দেখেছ!"

চিন্তিত হয়ে ভবেশবাবু চলে গেলেন। তারপরের দিনও মালতী গেল না। তার পরের দিনও নয়। তার পরের দিন বিরক্ত হলেন ভবেশবাবু—"কি আশ্চর্য্য! ওর যে আর একমাস পরে পরীক্ষা! এখন এত কামাই করলে কি চলে? এখনই ত সব ইম্পরট্যান্ট কোয়েশ্চেন-গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

"আঃ তুমি থামো"—যোগমায়া এগিয়ে এলেন, তাঁর চোখে আনন্দের আভা ঝলমল করছে,—"দেখ, বৌমা আর কলেজে যাবে না। ওকে এখন কয়েক মাসের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠাতে হবে।"

"বাপের বাড়ী?"—ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে নিথর হয়ে গেলেন ভবেশবাবু।

"তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।"

"আমার কতদিনের সাধ নাতির মুখ দেখব! দেখি আবার কোন দিকে গেল বৌমা। ছেলেমানুষ—কিছু ত জানে না।" —যোগমায়ার কণ্ঠে অপরিসীম আনন্দ আর স্নেহ ঝরে পড়ল।

দূর থেকে মালতীকে রান্নাঘরে যেতে দেখলেন ভবেশ-বাবু। আসন্ন মাতৃত্বের কমনীয়তায় ঢল ঢল করছে মুখখানি। সলজ্জ ভঙ্গিতে সরে গেল মালতী।

পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বারীন। তার মুখেও পরিতৃপ্তির ছাপ দেখলেন ভবেশবাবু। ভবেশবাবুর চোখের সামনে ছায়ার মত ভেসে গেল—কলেজ—ক্লাস—পরীক্ষা—ইউ-নিভারসিটি।

বাড়ীর সবাই সুখী। নতুন আশার সম্ভাবনায় আনন্দিত।

তাঁরও কি দুঃখিত হওয়া উচিত? একমাত্র ছেলে —প্রথম নাতি আসবে—এমন আনন্দের কথা আর কি আছে? কিন্তু তবু···বৌমা পরীক্ষাটা দিল না···বিদ্যা-প্রিয় অধ্যাপক ধীরে ধীরে নিজের পথে বেরিয়ে পড়লেন একলাই।

৫

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লস এন্‌জেলিস্

সন্ধ্যাবেলা আমার আমেরিকা ও ইউরোপ পরিদর্শনের এক কর্মসূচীর খসড়া এনে দিল হার্ভে; তাতে দোসরা 'মে' থেকে পয়লা জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিনের কর্মসূচী লেখা। তবে এতে শুধু প্রতি সপ্তাহে সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পাঁচদিনের কাজের খবর আছে। এখানে শনি ও রবিবার ছুটী; ফলে সপ্তাহে দুদিন আমার যথেচ্ছ দেখাশোনা চল্‌বে। হার্ভের কর্মসূচীতে লেখা আছে কোথা, কবে, কার কাছে, কার সঙ্গে যেতে হবে ইত্যাদি। নীচে তার সামান্য নমুনা দিলাম।

২রা মে সোমবার—পাম স্প্রিং

৩রা মে মঙ্গলবার—লসএনজেলিস্ কাউন্টি স্যানিটেশন ডিষ্ট্রিক্ট (৮'০০-পার্ক হার্ষ্ট)

৪ঠা মে বুধবার " "

৫ই মে বৃহস্পতিবার—লসএনজেলিস পৌর প্রতিষ্ঠান (ব্যুরো অব্ সেনিটেশন) ৭'০০ চ্যাসহিউম

৬ই মে শুক্রবার " "

৯ই মে সোমবার—লসএনজেলিস পৌর প্রতিষ্ঠান (জল ও শক্তি সরবরাহ বিভাগ)

১০ই মে মঙ্গলবার— " "

১১ই মে বুধবার—ডিজনী ল্যাণ্ড (সহগামী—শ্রীমতী ক্যান্সিস হার্ভে).

১২ই মে বৃহস্পতিবার—মেট্রোপলিটন জলসরবরাহ বিভাগ (হার্ভি)

১৩ই মে শুক্রবার " "

১৪ই মে শনিবার—লসএনজেলিস থেকে সানফ্রানসিস্‌কো।

শনি ও রবিবার আমার ইচ্ছামত কর্মসূচী মনে মনে প্রস্তুত ক'রে কে-থা, কার সঙ্গে দেখা করব বা কি দেখে আস্‌ব সে-সব জল্পনা-কল্পনাতে আমার বেশী সময় ব্যয়িত হ'ত; কেন না সপ্তাহের সরকারী কাজ কলে চল্‌বে, জানি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিদর্শন বিশেষ ক'রে যেগুলি প্রধান দ্রষ্টব্য সেগুলি দ্রুত ব্যবস্থা ক'রে দেখে নেওয়া চাই, কেন না কয়েক দিনের মধ্যেই স্থান পরিবর্তন।

মঙ্গলবার হার্ভে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রাতরাশের সময় খবরের কাগজ দেখতে দেখতে বল্‌ল যে আজ শ্রীমতী তোমায় পার্ক হার্ষ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন, টেলিফোনে আমি সবই বলে রেখেছি। পার্ক হার্ষ্ট হলেন লস এন্‌জেলিস্ কাউন্টি স্যানিটেশন ডিষ্ট্রিক্টের জেনারেল ম্যানেজার। ডঃ হার্ভে লাডউইগের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। হার্ভে হ'ল এনজিনিয়ারিং সায়েন্সের ইনকরপোরেটেডের (Engineering science Inc.) প্রেসিডেন্ট। জো, ফিনী ও রাসেল্ লাডউইগ, ভাইস-প্রেসিডেন্টদ্বয়।

দেখলাম শ্রীমতী হার্ভে পার্ক হার্ষ্ট সাহেবের সঙ্গে এত পরিচিতা যে হার্ভের আমায় নিয়ে যাওয়ার দরকার হ'ল না। হার্ভে বেরিয়ে গিয়েছিল সকাল সাড়ে সাতটায়, আমরা গেলাম সকাল আটটায়। পার্ক হার্ষ্ট সাহেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর তাঁর সহকারী ফ্রাঙ্ক বোয়ারম্যানাম আমার পরিদর্শনের ভার নিলেন ও দুপুরে ফিরিয়ে আনতে বললেন পার্ক হার্ষ্টের সঙ্গে লাঞ্চ খাবার জন্যে। হিসেব পত্র কেমন ক'রে এখানে

রাখা হয়, কোথায় কোন জল ও ময়লাকল কেমন চলছে তার পূর্ণ সংবাদ আফিসে ব'সে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় বহু ছোট ছোট সহর। তাদের পৃথক পৃথক আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ রাখতে হয়। বোয়ারম্যান নিয়ে গেল তাদের একটা ওঁচলা ফেলার জায়গায়। ওচলা ফেলার জায়গা বললেই মাছি ভণ ভণ করা দুর্গন্ধময় ধাপার কথাই মনে হয়। কিন্তু এখানে যে পদ্ধতিতে ও যে স্থানে এ কাজ চলে তাতে নোংরামির বিন্দু বাষ্পও নেই। লস্ এন্‌জেলিস সহরে উচু নীচু পাহাড় ও খাদ দুই-ই আছে। এমনি এক পাহাড়ের গায়ের ঢালে পীচে মোড়া রাস্তা দিয়ে লরী এসে কাৎ ক'রে ওঁচলা ফেলে যাচ্ছে আর এখানে একটা স্ক্রেপারে সেগুলি ঠেলে ঠেলে খাদে ফেলে দিচ্ছে, আর পাহাড়ের গা থেকে মাটী ধ্বসিয়ে এনে তার উপরে চাপা দিচ্ছে। এমনি ক'রে তারা কয়েকটি খেলার মাঠ তৈরি করেছে যা খাদ ও পাহাড়ে হয়ে থাকলে কোন কাজেই লাগত না। লরী ক'রে ওঁচলা এনে লরী শুদ্ধ ওজন করে তার থেকে খালি লরীর ওজন বাদ দিয়ে ওজন মাফিক ডলারে মূল্য দিয়ে তবেই ওঁচলা ফেলার যায়গায় যেতে পারবে। রাস্তার পরিকল্পনাটী এমন যে এক মিনিটের কম সময়ে লড়ী ওজন করিয়ে দাম-দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। লরীগুলো পৌর প্রতিষ্ঠানের নয়। বাড়ীর ওঁচলা ফেলার দায়িত্ব বাড়ী-ওয়ার ও সেই ওঁচলা সরাবার জন্য ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানও আছে।

এই ওঁচলা ফেলার জায়গাটীতে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে দেখলাম আমাদের এখানে এরকম করা সম্ভব কিনা? পাহাড়ের চুড়োর ধাপে আমরা দাঁড়িয়ে লরী করে এনে পুরোনো (ভাঙ্গা নয়) সোফাসেট, পরদা, টি, ভি, সেট, চেয়ার কাঠের তক্তা, ঘাসপাতা, ছাই পাঁশ, পাথর রাবিশ ফেলতে দেখছিলাম। একটা লরী করে এনেছে বাক্স বাক্স প্লাষ্টিকের কী সব জিনিষ। কাছে গিয়ে দেখি থাকে থাকে প্ল্যাষ্টিকের বাটী বাক্স ভর্তি করে এনে ফেলে দিয়েছে। এগুলোতে বিমানে ক্রীম, পুডিং স্যালাড প্রভৃতি দেয়। একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেয়। অনেক বাক্সের লেবেল খোলা হয়নি। তাছাড়া ঐ গাদাতে রয়েছে লুডোর ঘুটি, মদের বোতালের সখি মূর্তির ছিপি, এমনি সব নিত্যব্যবহার্য্য কত না জিনিষ।

আমার সহগামী বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম—কেন এরা নতুন জিনিষগুলোকে কবর দিতে আনে। এগুলো কি নীলেমে বিক্রি হয় না?

—নিশ্চয়ই হতে পারে। কিন্তু তার ব্যবস্থা করতেও পয়সা লাগবে। হয়তো কোন দোকান উঠে গেছে। যার ফালতু মাল নতুন দোকানদারের কোন কাজে আসবে না। তখন সে যত শীঘ্র পারে খরচা করে কোন রকমে পরিত্যাগ ক'রে। নিষ্কৃতি পেতে চায়। কেন না ঐ জায়গাতেই তো নতুন মালে দোকান সাজানো হবে।

আমি বললাম বোধ হয় তাই হবে! আমার মনে একটু অদ্ভুত চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। সেটা তোমায় বলেই ফেলি। এই ওঁচলা ভরার জায়গায় কোন দিন তেলের সন্ধানে বা অন্য কোন কারণে হাজার বছর বাদে যখন খোঁড়া হবে তখন দেখা যাবে যে তদানীন্তন প্রাচীন সভ্যতার ও প্রগতির এক স্বাক্ষর মৃত্তিকার আস্তরণ ভেদ করে মানুষের উত্তরপুরুষেরা একদিন পেতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বের করবেন আজকের মাটী চাপা দেওয়া T, V, set, আসবার পত্র, কাপড় চোপড় ইত্যাদি থেকে সভ্যতার ধারা ও তার যোগসূত্র; আর পাবেন প্রচুর গবেষণার খোরাক।

স্তরে স্তরে ওঁচলার উপর মাটী চাপা দিয়ে নীচু জায়গা ভরাট করলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। হয় না মাছির ভণভণানি ইঁদুরের উপদ্রব, দুর্গন্ধের উদ্ভব। সংক্রামক রোগ বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রাতঃকালীন পরিদর্শন-পর্ব শেষে আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্য অফিসে ফিরলাম। পার্ক হার্ষ্ট ও তার কাজ ছেড়ে আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে একটা ভাল হোটেলে এলেন। এখানে রগবেষণাগারে নোনা জল মিষ্ট করার জন্য নানা পরীক্ষা চলেছে। আর কিছু আলোচনা হ'লে। এখানে বৃষ্টিপাত পাত কম বলে দূর দুরান্ত থেকে জল আনতে হয়। তাই ময়লা জল এখানে বেলে ও কাঁকুরে জমিতে শুষতে দেওয়া হয়। সেইময়লা জল বালির মধ্য দিয়ে যাবার সময় পরিশুদ্ধ হয় ও অন্য জায়গা থেকে নলকূপ দিয়ে সেই জল তোলা হয়। তাতে জলের ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি চলে। এখানে মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত প্রায় হয়না। ডিসেম্বর থেকে

এপ্রিলের মধ্যেই যা কিছু বৃষ্টি।

লস এনজেলিসকে বলা হয় 'চাকায় চলা সহর, (city on wheels) এখানে ৪৫৭'৯৫ বর্গমাইল বিস্তৃতির উপর তিরিশ লক্ষেরও অধিকলোক বসবাস করে। এটী যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম উপকূলে বৃহত্তম সহর। এখানে পাহাড় আছে, মরুময় অঞ্চল আছে, খরস্রোতা নদী আছে, সমুদ্র আছে, আর আছে প্রচুর মটর গাড়ী ও "ফ্রী-ওয়ে" যা আমেরিকার কোন সহরে এত বেশী নেই। এখানে অনেক স্থলে "ফ্রী-ওয়ে" শুধু দ্বিতল হয়ে ক্ষান্ত নয়; কোথাও বা ত্রিতল "ফ্রী-ওয়ে" আছে। লস্ এনজেলিস হচ্ছে "লস্ এনজেলিস কাউন্টি"র মধ্য বৃহত্তম নগরী। কিন্তু এ ছাড়া বহু ছোট ছোট শহর এর গণ্ডির মধ্য রয়েছে যেমন মোন রোভিয়া, আর্কেডিয়া লা-হাবরা, আল হাম্বরা, প্যাসাডিনা এলটাডিনা, নর্থ হলিউড, ওয়েষ্ট হলিউড, মে-উড, ওয়েষ্ট উড, লীন উড, ব্রেন্ট উড হাইটেস্, সেঞ্চুরী সিটি,ইউনিভা-স্যাল সিটি, টেম্পল সিটি, ষ্টুডিও সিটি, হার্ডগো সিটি, প্রভৃতি।

সকালে প্রায়ই কুয়াশা। ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে প্রচুর। যেহেতু এটী শিল্পপ্রধান অঞ্চল তাই এখানে অবাঞ্ছিত 'স্মগের' (smog)এর প্রাদুর্ভাব হয়। "Smog",—একটী নতুন কথা, বর্তমানে 'Gherao'-এর মত ব্যবহৃত হচ্ছে। Smo[ke] আর [F]og এ মিলিয়ে এর নাম "Smog" হয়েছে। বর্তমানে এই 'স্মগ' প্রতিরোধ ও নিরাকরণের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন হ'তে চলেছে।

লসএনজেলিসের প্রতি আমার বহুদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ছাত্রাবস্থায় 'জেম্স হর্প উড্জীনসের' 'The Mysterious Universe' ও আর্থার এডিংটনের stars in their Courses পুস্তকে Mt. Wilson বীক্ষণাগারে তোলা গ্রহনক্ষত্রের ছবি ও সর্ববৃহৎ (তৎনকার দিনের) দূরবীক্ষণের কাহিনী এক বিস্ময়ের বস্তু ছিল। যৌবনে হলিউডের নট-নটীরাও কম আকর্ষণীয় পদার্থ ছিলেন না। আর পরমহংস যোগানন্দজীর self Realisation Fellowship (S. R. F) নবনির্মিত মন্দির ও ধর্মীয় সনাতন হিন্দু অভিযান চাক্ষুষ করার ইচ্ছেও প্রবল ছিল। তা ছাড়া তো রয়েছেই বর্তমান শিল্পোন্নয়নের বিরাট প্রয়োগ-বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনা।

মঙ্গলবার দিন সকালে এলেন লসএনজেলিস্ পৌর প্রতিষ্ঠানের ব্যুরো অব স্যানিটেশনের ডিরেক্টর চ্যাস্ হিউম আমায় তুলে নিয়ে যেতে। তিনি কাছাকাছিই থাকেন; তাই আমায় তাঁর সঙ্গী করে নিয়ে যাচ্ছেন। এ দুদিন তাঁর সঙ্গেই কাটবে। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন ও রাত্রে তাঁর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও নৈশ ভোজ। হিউম পরিবার 'লুডউইগ' বা 'লাডউইগ' পরিবারের অতি পরিচিত। ভদ্রলোকের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে স্বভাবে অতি শান্ত ও মৃদু প্রকৃতির লোক। ওঁরা এসেছিলেন মূল স্কটল্যাণ্ড থেকে। পিতৃপুরুষের অর্থাৎ স্কটিশ হাইল্যাণ্ডারদের ঐতিহ্যের বিশেষ নিদর্শনটুকু আজও তাঁরা বিস্মৃত হননি। ওঁর স্কটিশ হাইল্যাণ্ডারদের চেক কাটা রঙিন ডবল মোজা, হাফপ্যান্ট, মাথায় টিউনিক্ ও মুখে ব্যাগ পাইপ। তিনি পিতলের 'পিক্‌ল্' বাঁশীও বাজাতে পারেন। সন্ধ্যায় ওঁদের ওখানে কাজের শেষে ফিরতে ব্যাগ-পাইপ বাজিয়ে শুনিয়ে দিলেন। শ্রীমতীর খাঁচার ছোট্ট পাখীটাকে যে কত আদর ও যত্ন করেন তার পরিচয়ও দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি; বিশেষ করে তাঁর রঙীন ঠোঁট দুটী পাখীটার ঠোঁটে লাগিয়ে চুমু খেয়ে। আদর দেখাবার জন্য পাখীটাকে খাঁচা থেকে বের করে এনেছিলেন। ডিনারে বেরিয়ে যাবার সময় আবার খাঁচায় পুরে রেখে দিলেন। পাখীটা যে কত ভাল কত কথা কইতে পারে, কত অনুগত ও কত প্রিয় তার কাহিনী যেন বলে শেষ হতে চায় না।

আমি তখন বললাম—'বাণভট্টের' লেখা কাদম্বরী কাব্যে এমনি এক শুকপাখী একটা পা তুলে রাজার দিকে দেখিয়ে এক অপূর্ব সংস্কৃত শ্লোক ব'লে ছিল। সভায় সকলে স্তম্ভিত। শবর রমণী কি যে কথা বলছে বুঝতে না পেরে ঐ হরবোলা পাখীটাকে রাজদরবারে রাজাকে উপহার দেবার জন্য এনেছিল।

—তখনকার দিনেও এমন কথা পাখী কইতো?

—কইতো তো বটেই। সারা 'ঈশপস্ ফেবলই'

জীবজন্তদের কথাবার্তার মারফতে নীতিকথা লেখা হয়েছে। এমনকি সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রের' অনুরূপ কাহিনী বলা হয়েছে পশুপক্ষীদের মুখ দিয়ে।

আমি পাখীটার প্রতি এত আদর দেখে ভাবলাম নিশ্চয়ই শ্রীমতী নিঃসন্তান। সাধারণতঃ নিঃসন্তান যাঁরা তাঁদেরই পশুপক্ষীর উপর একটা বিশেষ আকর্ষণ ও অনুরাগ জন্মায়। তাই সেই খবরটা জানবার জন্য জিগ্যেস করলাম, 'তোমার বড়ছেলের বয়স কত?'

—তার বয়স বছর আটাশ হবে। সে বিয়ে করে স্যানফ্রানসিস্কোয় থাকে। সেখানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে কি না?

তখন বুঝলাম অনুমানটা সত্য নয়। ছেলেমেয়েরা ছিল। এখানে এখন কেউ নেই—তাই একটা অবলম্বন চাই। পাখী ছাড়াও ছোট্ট একটা শ্যামদেশের কুকুর রয়েছে। দিনের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা ও পাত্রগ্রহণ করেছেন।

হিউম সাহেবের সঙ্গে লসএনজেলিসের পৌর প্রতিষ্ঠানের অফিসে এলাম। ঐটী নগরের প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত। তার পাশেই জল ও শক্তি (water & power) প্রতিষ্ঠানের বিরাট কাচের বাড়ী। তলায় জলের ফোয়ারা। আরও নীচুতে দু'তিনতলা মোটর রাখবার জায়গা। এই বাড়ীটাকে দূর থেকে মনে হয়, বিশেষ করে রাতের বেলা, যেন একটা বিরাট উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ বরফ খণ্ড। ভেতরের ফুল্ল আলো এর স্বচ্ছতার যেন রূপ দেয়। তিনি সিটী হলের ওপরের তলায় নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় সহর, ফ্রীওয়ে সার বেঁধে মটরবহর, বিমানবন্দর, কলকারখানা, সমুদ্রের উপকূল দূরের পাহাড়।

ইতিহাস বলে—

বর্তমানের এই মহানগরী লসএনজেলিস আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের 'যাংনা, নামের গ্রামেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ফাদার জুনিপেরোসেরা ও ডনফিলিপ ডি নেভে স্পেনের রাজার নামের স্মরণে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের 'যাংনা গ্রামের ধারে একটি (Pueblo) উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁরা ঐ স্থানটীর নতুন নামকরণ করেন—El Pueblo De Nouestra Senora La Reina De Los Angeles De Porciuncula—অর্থাৎ স্পেনিশে যার অর্থ হ'ল; এটী আমাদের পরকিউনকুলার রমণীকুলের শ্রেষ্ঠা পরীরাণীর নগরী। ইংরাজিতে—City of our Lady, the Queen of Angeles of Porciuncula.

কাউনসিল চেম্বারে গিয়ে ইতিহাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নগরীর পতাকার বিবর্তনের এক প্রকৃষ্ট পরিচয় ও নিদর্শন পেলাম। প্রথমে দেখা গেল স্পেনিশ পর্যটক জুয়ান রোডরিগ্ কেব্রিলোর (Juan Rodriguez Cabrilloর) পতাকা। ইনি ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে ৮ই অক্টোবর লসএনজেলিস বন্দরে নোঙর ফেলেন। তারই অভিজ্ঞান স্বরূপ এই পতাকা।

দ্বিতীয় পতাকা হল মেক্সিকো গণতন্ত্রের। এটী মেক্সিকোর সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

তৃতীয় পতাকা হ'ল ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী গৃহীত ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের পতাকা।

চতুর্থ পতাকা হ'ল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীন গৌরবের (Old glory) পতাকা।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ হ'ল রয় সাইলেন্ট (Roy silent) পরিকল্পিত ও অর্পিত লসএনজেলিস মহানগরীর পতাকা। ১৯৩১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১০,০০০ অর্ডিন্যান্সের বলে এটী গৃহীত হয়।

সপ্তম পতাকা হল স্পেনের রাজা তৃতীয় কারলোসের (Carlos III) পতাকা যখন Elpueblo de Nuestra senora la Reina de Los Angeles de Porciuncula ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টম পতাকা হ'ল প্রথম স্পেনীয় ভূপর্যটক 'ভাস্কোনুনেজ বালবোয়া'র (Vasco Nunez Balboa) পতাকা। ইনিই ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রথম পশ্চিম গোলার্দ্ধে প্রশান্ত মহাসাগর দেখেন।

পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার সিটি কাউন্সিলের উপর। মেয়র হলেন প্রশাসনিক দিকের কর্তা আর সিটী এটর্নী আইন বিষয়ক কর্তা। কাউন্সিল ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকেই নির্বাচনের মাধ্যমে চার বছরের জন্য কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

প্রতি সোম থেকে শুক্রবার বেলা দশটার সময়

কাউন্সিলের সভা বসে। সিটি ক্লার্ক (City clrck) হ'লেন কাউন্সিলের সচিব। এই কাউন্সিলের সদস্য দি.য় city charter অনুযায়ী পনেরোটি কমিটি গঠিত হয়। কাউন্সিলে একজন সভাপতি পনেরো জন সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন। অ'র সেই সঙ্গে একজন President pro-tempore ও নির্বাচিত হন যিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভার কাজ পরিচালনা করেন। পনেরোটী কমিটীর প্রতিটিতে তিনজন সদস্য। তার মধ্যে একজন স·াপতি। প্রতি কমিটি বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে মিলিত হন। কমিটীগুলি হল :

১। Building and Safety,
২। Charter and Administrative Code.
৩। Governmental Efficiency.
৪। Industry and Transportation.
৫। Personnel.
৬। Planning.
৭। Police, Fire and Civil Defencc.
৮। Public Health & Welfar.
৯। Public Works,
১০। Recreation and Parks.
১১। Revenue and Taxation.
১২। State, Country and Federal Affairs.
১৩। Traffic.
১৪। Water and Power.
১৫। Public Works Priority.
১৬। Board of Referred Powers.

ওপরের কমিটিগুলির সঙ্গা থেকে জানা যাচ্ছে যে যে-সব কাজ প্রাদেশিক সরকার ভারতবর্ষে ক'রে থাকেন তার অনেক কিছুই এখানে পৌর সরকার ক'রে থাকেন যেমন পুলিশের কাজ, আগুন নেভানো, অসামরিক প্রতিরক্ষা, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পরিবহন, শক্তি সরবরাহ প্রভৃতি। পৌর সরকারের শক্তি ও অর্থ এখানে যথেষ্ট, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারেরও। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্থ অতি প্রচুর, তাই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। তাই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মত অত শক্তিশালী হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি। ক্রমশঃ

আলোর উৎস

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

অন্ধকার রাত্রি।

বাইরের কিছু চোখে পড়ছে না। তবু কি যেন দেখতে চেষ্টা করছেন দু'টি বোন। দু'টি যমজ বোন—শুভা আর বিভা। চেহারায় অনেক তফাৎ দু'জনের। কিন্তু মন-প্রকৃতি এক। দুজনে যেন এক আত্মা।

জানলার রেলিং ধরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন শুভা-বিভা। অন্ধকারের বুক চিরে চিরে দেখছেন। চার বছর বয়সে গ্রাম ছাড়া। অবিশ্যি নাড়ীর যোগ ছিন্ন হয় নি একেবারে। মাঝে মধ্যে এসেছেন গেছেন। থেকেছেন খুব কম। বাবা-মা থাকতে দিতে চাইতেন না তাঁদের আদরের দুলালদের। গ্রামে অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে প্রায়। মেয়েরা অসুস্থ হ'য়ে পড়তে পারে। কলকাতায় থাকলে, কিছু হ'লে—ভালো ডাক্তার-বৈদ্য পাওয়া যাবে সহজে।

বাবা মা—প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর রাজলক্ষ্মী দেবী যতবার মেয়ে দু'টিকে দেশের বাড়ীতে জন্ম স্থানে নিয়ে এসেছেন—ওঁদেরই পীড়াপীড়িতে। শুভা-বিভার আব্দার অনুরোধ এড়াতে পারতেন না মা-বাবা।

এবারে এসেছেন দু'বোনে। মা-বাবা সংগে নেই। আর কোনো দিন সংগেও আসবেন না। তাঁরা চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের মতো। কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীর মতো হুগলীর আঁটপুর গ্রামের জমি জায়গা বাড়ীঘরেরও উত্তরাধিকারিণী হয়েছেন দুবোন। মা-বাবার চোখের মণি ছিলেন দু'টি বোন। তাঁদের কোনো পুত্র সন্তান হয় নি।

যে সময়ে এলেন দেশে শুভা-বিভা—দেশের বড় দুর্দিন চলছে। আকাল হয়েছে। না খেয়ে মরছে অনেকে। মরছে জমিদাররা নয়। চাষীরাই শুধু। কেন এমন হ'চ্ছে? চাষীদের ডেকে পাঠিয়ে পরামর্শ করতে চেয়েছেন ওঁরা। ওদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু নায়েব গোমস্তা আশপাশের জ্ঞাতিস্বজন আর প্রতিবাসীরা দিনরাত বুঝিয়ে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত হ'তে বলছেন। ভগবানের ওপর কলম চালাতে বারণ করেছেন। কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন সকলে।

দেশে থাকার জন্যে জিদ বেড়েছে দু'বোনের। নিজেদের উদ্দেশ্য-সংকল্প থেকে একপা নড়েননি। নড়বেনও না। ওঁদের মনের মধ্যে অহর্নিশি জাগছে কেবল—চাষারাই মরছে কেন না খেতে পেয়ে? ওদের হাতেই তো চাষ-বাস! প্রকৃতি তো নির্দয় হয় নি। সময়ে জলবৃষ্টি হয়েছে। তবু ফসল ফলল না?

জানলায় দাঁড়িয়ে কি যেন শুনতে পাচ্ছেন দু'বোন। উৎকর্ণ হয়ে উঠছেন। বাতাসে ভেসে আসছে শত সহস্রলোকের অন্তরের করুণ আকুতি। মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচতে চাইছে ওরা মৃত্যুর গহ্বরে মাথা কুটে কুটে।

দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না আর বেশীক্ষণ ওরা। দু'বোনে দুটি লণ্ঠন হাতে নিয়ে, তরতর ক'রে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে নীচে। চার বছর বয়সে যে ভাবে নামতেন, চব্বিশেও তার একটু তারতম্য দেখা গেল না।

দ্রুত পায়ে চলছেন। একরকম ছুটেই চলেছেন দুজনে। গাছ গাছালি বাড়ীঘর পাশ কাটিয়ে চাষীপল্লীর কুঁড়েঘরের দিকে ছুটছেন। বাতাস কাটার ভয়াবহ শন শন আওয়াজ উঠল মুহূর্তে। শুভা-বিভার খানিক দূরে প্রাণঘাতী লাঠি ঠিকরে পড়ল। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই দু জনের। পথের বাধা আটকাতে পারছে না, পারবে না বুঝি ওঁদের।

আবারো লাঠি পড়ল। আশ্চর্য, আগের মতো খানিক দূরেই পড়ল। লাঠিয়াল ইচ্ছে করেই এই ত্রাস সৃষ্টির খেলা খেলছে, না লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছে তা' বুঝতে পারা যাচ্ছে না। পারা গেল একটু পরে।

চাষীসর্দার কালোশশীর দাওয়ায় উঠেছেন দুবোন। সর্দার ঘুমোয় নি। অন্ধকারে ধুকছে। লণ্ঠনের আলোয় নিশুতি রাতে এই ভাবে শুভা বিভাকে দেখে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেল। স্বপ্ন কিনা ভাবল হয়তো খানিক। না, সত্যিই দেখছে তাদের গাঁয়ের মেয়েকে, তাদের প্রাণের বড়মা ছোটমাকে।

এই বড়মা ছোটমা যখনি গাঁয়ে এসেছেন তাদের ঘরেই বেড়াতে এসেছেন। মুড়ি পাটালী গুড় চেয়ে খেয়েছেন হাসিমুখে। বিনিময়ে দিয়েছেন অনেক। তাদের কষ্টে চোখের জল ফেলেছেন। যখন চাষ করা দেখতে আসতেন, বলতেন, এত কষ্ট! পাস্ তো অর্ধেক। চলে রে তোদের? পেটের খিদে না মরলে খাটবি কি করে? বাঁচবি কি ক'রে? অপরের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে বাঁচাবি কি করে? তোদের ছেলে মেয়েরা মানুষ হবে কেমন করে রে! তোরা ম'লে দেশ মরবে, জাত মরবে—সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বড়মা ছোটমা দিয়ে যেতেন অনেক। অফুরন্ত স্নেহ ভালোবাসা ঢেলে দিয়ে যেতেন। ভাঁড়ার উজার করে ঢেলে দিয়ে যেতেন নিজেদের নিঃস্ব করে, ওদের প্রাপ্য ফসল।

দেশে জমিদার চাষীর দেনা পাওনা নিয়ে গোলমাল সুরুর সময় মায়েদের আনতে বলেছিল সর্দার সকলকে। কথায় কর্ণপাত করেনি কেউ। সকল ঘটনা মায়েদের জানাতে ইচ্ছে হয়েছিল খুব সর্দারের। জমিদাররা তাঁদের পাওনা ফসলে সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। সকলে মিলে এক জোট হয়ে পাওনা বারো আনা করেছেন। চার আনা নিয়ে কাজ করতে হয় কর, না হয় কাজ ছাড়। কাজ ছাড়তে বাধ্য করেছেন ওনারা। অনাহারে মরছে চাষীরা। ওদের গোলায় গোলায় ভরা জমানো ধান। ভাবনা নেই কিছু।

মায়েরা সাক্ষাৎ সশরীরে এসেছেন। কালোশশী সর্দারের ক্ষীণদৃষ্টি একটুও প্রবঞ্চনা করেনি। আনন্দে বুক চোখ মুখ ভরে উঠছে। মনে হ'চ্ছে চীৎকার করে চাষী ভাইদের ডেকে বলে—মায়েরা এসেছেন। তোরা আবার বেঁচে উঠবি।

কালোশশী দুর্বল হাতখানা বাড়িয়ে দিচ্ছে। পায়ের ধুলো নেবে মায়েদের। এগিয়ে গেলেন দু'জনে। সর্দারকে ব্যস্ত হতে বারণ করলেন ইশারায়। কাছে এসে বসলেন। প্রাণ ফিরে পেল সর্দার।

সমস্ত ঘটনা শুনলেন সর্দারের মুখে গাঁয়ের বড়মা-ছোটমা। দুচোখের জল গড়িয়ে পড়ল দুজনের গাল বেয়ে। ঘরের ভিতর থেকে বাচ্চা ছেলের কাতর গোঙানি ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। ভিতরে গেলেন ওরা। সর্দারের নাতির পিত্তবমি হচ্ছে থেকে থেকে। দুহাতে পরিষ্কার করছেন দু'জনে। সামনে এসে দাঁড়াল যমদূতের মতো কানু লাঠিয়াল।

মায়েরা দেখলেন। ওদের চার চোখ দিয়ে যেন আগুনের হালকা ঠিকরে পড়ল কানুর মুখের উপর। সইতে পারছে না কানু। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মাথা নীচু করে সরে গেল খানিক তফাতে। ভীরু কণ্ঠে বলল, বড়মা ছোটমা! বিশ্বাস করুন! আমি দোষী নই। আপনার জ্ঞাতি ভায়েরাই আপনাকে ভয় দেখিয়ে সরাতে বলেছিল। ওদের বলবেন না যেন—চাকরী যাবে।

ফিরে এসেছেন বাড়ীতে বড়মা ছোটমা। ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন কালোশশীর নাতির জন্যে। যে ক'দিন ছিলেন, দেখতে এসেছেন রোজ। আগের মতো নিজেদের ভাঁড়ার উজার করে বলিয়েছেন ধানচাল চাষীদের মধ্যে। সকলের কটূক্তি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করেছেন।

নিজেদের সমস্ত জমি দান করে দিয়েছেন চাষীদের। অন্য জমিদারদের অনুরোধ করেছেন, তাঁরা দান না করতে পারেন যদি—আগের নীতিতে ফিরে গিয়ে অন্তত এদের বাঁচান আর সংগে সংগে নিজেরাও বাঁচুন।

বড়মা ছোটমার ত্যাগের দৃষ্টান্তে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন শেষপর্যন্ত অন্য জমিদাররা।

প্রসন্নকুমারের শুভা বিভা—গ্রামের বড়মা ছোটমা একদিন দেবী-শক্তিমাতা নামে ভারতের বহুক্ষেত্রেই শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ পরমহংস আর পরিব্রাজক স্বামী সচ্চিদানন্দ পরমহংস—দু'জনেই এদের দেবী শক্তি আখ্যায় ভূষিত করেন প্রথমে।

মৃত্যুর সহচর ব্যাধির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা দেখা যায় দেবীমাতা শক্তিমাতার বাল্যকাল থেকেই। গ্রামে অসহায় ব্যধিগ্রস্ত মানুষের অসহায়

মৃত্যুবরণ করা দেখে তাঁরা অস্থির হয়ে উঠতেন। কালকে রোধ করবার পথ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করতেন।

পথ খোঁজার শেষ হ'ল একদিন।

কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আবার এসেছেন পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ পরমহংসজী। সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত সংক্রামক প্লেগ রোগের তাণ্ডব সুরু হয়েছে চতুর্দিকে। মানুষ মরছে এক এক করে। চব্বিশ ঘণ্টার জ্বরে অচৈতন্য অবস্থাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে অনেকে। আকাশ বাতাস মাটির বুক থেকে শুধু কান্নার রোল উঠছে। লোক পালাচ্ছে দলে দলে।

পাশের বাড়ীর বিধবা বৌটি মারা গেল প্লেগে আক্রান্ত হয়ে। কোলের চার বছরের ছেলেটি মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উঠবে না কিছুতেই। মা ঘুমুচ্ছে, উঠবে না কেন? মাকে সে তুলবেই। দেবীমাতা ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে এলেন বাড়ীতে।

জ্বরেতে গা আগুন ছেলেটির। প্লেগের কোপদৃষ্টি পড়েছে। দেখলেন পরমহংসজী। মায়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কি সব অজানা গাছের শেকড় পাতা বেটে ছেলেটির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রলেপ দিয়ে দিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা কাটল। আটচল্লিশ ঘণ্টাও কাটল। ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল ছেলেটি।

পরমহংসজীকে দিয়ে বহু লোকের জীবন দান করালেন মায়েরা। ভারতীয় ভৈষজ্যের মৃতসঞ্জীবনী গুণের প্রমাণ পেলেন। মৃতসঞ্জীবনী শক্তির গবেষণায় মগ্ন হয়ে রইলেন তাঁরা দিনের পর দিন।

শরীরকে রোগমুক্ত সুস্থ রাখবার জন্যে দেশেদেশে ঘুরে লুপ্ত-গুপ্ত ভারতীয় যোগ ভৈষজ্য শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করে গেছেন দেবীমাতা শক্তিমাতা। সূর্যরশ্মির সপ্তবর্ণের রোগ নিরাময়ের প্রক্রিয়াও আবিষ্কার করে গেছেন তারা।

তাঁরা চেয়েছিলেন দেশ জাতিকে সুস্থ সবল করে গড়ে তুলতে। দেশের কুসংস্কার আগাছাকে সমূলে তুলে ফেলতে। মাতাজীরা বলতেন, শিশুরাই দেশ জাতের প্রাণ, মেরুদণ্ড। ওদের ঠিক মতো তৈরী করে তুলতে হলে মায়েদের আদর্শ জননী হতে হবে। সংযমী হতে হবে। বিলাস ত্যাগ করতে হবে। আদর্শ জননীর স্নেহ, শাসন, আকর্ষণ, মন, শক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি একটি গুণ থাকা অবশ্যই চাই।

তাঁরা বলতেন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের চেয়ে বড় আত্মীয় হল আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধের আত্মীয়। সকলের আত্মশক্তি এক—অখণ্ড। এক আত্মশক্তিই একটি সুতোয় বেঁধে রেখেছে বিশ্বের মানুষকে। এখানে কোনো জাত দেশ ধর্মসম্প্রদায়ের সীমানায় বাধা নেই।

দেবীমাতা-শক্তিমাতা নেপাল, টেহরী, গাড়োয়াল তিব্বতে মাতাজী নামে পরিচিত হন।

ভারতের—বাঙলা দেশের বুকেই এক সময়—আজ থেকে একশ' দু বছর আগে—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর দেবী মাতা শক্তিমাতা জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বসংসারের মধ্যে তাঁরা নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাই বুঝি ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'তে পারেন নি কখনো। মা হবার ইচ্ছে পূরণ হয় নি। বিয়ের কথা বললে, বলতেন মা হ'য়েই তো জন্মেছি। চতুর্দিকে সন্তান···

মুখ বন্ধ হয়ে যেত মা-বাবার। মা বাবার মুখ বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু সবার মুখ খুলেছিল। দেশ জাত তাঁদের প্রাণ ভরে 'মা মা' করে ডেকে ধন্য হয়েছিল।

শক্তিমাতা তাঁর দেহত্যাগের দিন-ক্ষণ মাস তিথি পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর কলকাতায় দেহত্যাগ করেন তিনি। শক্তিমাতার দেহত্যাগের পর দেবীমাতা প্রায় এগারো বছর ছিলেন। তখন তিনি একাই দেবী শক্তিমাতা নামে খ্যাত হন। তিনিও তাঁর দেহত্যাগের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই নভেম্বর কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

দেবীমাতার দেহত্যাগের ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম উপলব্ধি করলে বিস্ময়ের অন্ত থাকেনা। তিনি জানিয়ে ছিলেন, দুবোনে পাশাপাশি থাকতেন এক সময়ে। দেহত্যাগের মাস বার তিথি পক্ষও পাশাপাশি থাকবে দুজনের। যে বছর যে সময়ে এই যোগাযোগ ঘটবে সেই সময় তিনি দেহত্যাগ করবেন। হয়েছিলও তাই। শক্তিমাতা কার্ত্তিক মাসের বুধবারে শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শরীর ছাড়েন। অগ্রাণ মাসের বৃহস্পতিবারে কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে দেহত্যাগ করেন দেবীমাতা।

দেবীমাতা শক্তিমাতা নশ্বর দেহত্যাগ করলেও, এখনো বেঁচে রয়েছেন তাঁদের নির্দেশ আদেশ উপদেশ বাণীর মধ্যে। জীবদ্দশাতেই তাদের ঘিরে অনেকে এক অনুগত মণ্ডলী গড়ে তোলেন। এই অনুগত মণ্ডলীর প্রধান ছিলেন তাদেরই প্রিয় বর মানস পুত্র যোগিশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ প্রণবানন্দ পিতাজী মহারাজ।

পিতাজী মহারাজ মাতাজীদের স্মৃতিভবন গড়ে তোলেন কালীঘাটে কালীমন্দিরের অনতিদূরে। স্মৃতি ভবনের নামকরণ করেন 'মাতৃকাশ্রম প্রণব সংঘ।' ১৫বি ঈশ্বরগাংগুলি ষ্ট্রীটের আশ্রম সংঘের নিভৃত কক্ষে ব'সে ব'সে নিরানব্বই বছরের বৃদ্ধ পিতাজী মহারাজ আজো মাতাজীদের নির্দেশ পালন ক'রে চলেছেন।

আশ্রম সংঘে এসেছেন বহু দেশবিদেশের—দূরের কাছের মানুষ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক দেশ নেতা মনীষী এসেছেন। তাঁদের যুক্তিবাদী মন নিয়ে আলোচনা করেছেন। মুগ্ধবিস্ময়ে শুনেছেন পিতাজীর মুখের কথা। সন্তুষ্টচিত্তে জেনেছেন মাতাজীদের আবিষ্কৃত লুপ্ত গুপ্ত ভারতীয় যোগ-ভৈষজ্য বর্ণচিকিৎসার ক্রিয়াপদ্ধতির বিজ্ঞান তত্ত্ব। ডঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রভৃতি বিজ্ঞান সন্ধানী মানুষেরাও এই বিজ্ঞানতত্ত্বের স্বীকৃতি জানিয়েছেন। পিতাজীর 'বায়ু রশ্মি বিজ্ঞানে' (সারণী) এর উল্লেখ রয়েছে।

দেবীমাতা শক্তিমাতা যে আলো জেলে গেছেন—এখনো অনির্বাণ হ'য়ে রয়েছে সেই আলো পিতাজী মহারাজের মধ্যে।

সনেট-যুগ্ম

শ্রীসুধীর গুপ্ত

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বিবর্ত

শ্রীকৃষ্ণ লীলা-বিবর্ত অতি অতুলন
কে বর্ণিবে? কে নির্ণিবে অচিন্ত্য অপার
ভেদাভেদ-রস-সিন্ধু-তরঙ্গ-বিস্তার
রহস্যের অনাদ্যন্ত মত্ত বিক্ষেপণ?
সচ্চিৎ-আনন্দ-ঘন নিখিল-রঞ্জন
অব্যক্ত অপূর্ব্ব রাসে—রসে অনিবার
নিত্য বৃন্দাবনে করে অমৃত সঞ্চার,
দুর্লভ দুর্ব্বার কী যে তা'র আকর্ষণ!
কৃষ্ণার্ত্তির আলোড়নে রাধা চিত্তে তাই
মিলন—মাথুর—মহাভাব সম্মিলন
স্ফূর্ত্তি পায় মুহুর্মুহুঃ; তুলনা তো নাই;—
রূপে রূপে অ-রূপেরই চলে আস্বাদন।—
বুঝেও বুঝে কি কেহ কে কা'রে বুঝাই!
বহু একই, একে করে আত্ম-নিমজ্জন।

ভক্তি ও গবেষণা

কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণে পায়; অপূর্ব্ব আবেশে
বিশ্ব-বৃন্দাবন ভরি' মুরলী-ধ্বনিতে
বৈকুণ্ঠের প্রেম বার্ত্তা লভিতে লভিতে
কৃষ্ণ-সমর্পিত-প্রাণ হ'য়ে অবশেষে
নদী সম রসোর্ম্মিল সিন্ধুতে সে মেশে;
তরঙ্গ-বিহঙ্গ রঙ্গে থাকে তরঙ্গিতে।
নর-জন্ম—মহাজন্ম লীলায় মিলিতে
প্রেমানন্দে, চির-গতি কৃষ্ণেরই উদ্দেশে।
কৃষ্ণ গবেষক কিন্তু শুদ্ধ সন্ধানের
জ্ঞানৈষণা বৃত্তি-জাত সুখ শুধু পায়;
তা'ও লব্ধ নহে হেথা কভু সকলের;—
তা'র-ও যে প্রেরণা জাগে কৃষ্ণেরই ইচ্ছায়।
জ্ঞান-চর্য্যা বুঝি শেষে পরম রসের
ভিয়ানের পানে ধীরে বিজ্ঞে নিয়ে যায়।

ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ

সবিনয় নিবেদন,

"ভারতবর্ষ"র ১৩৪৭ সালের আষাঢ় সংখ্যার ৫৭-৬১ পৃষ্ঠার একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে লেখক ঋষি প্রজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রবন্ধে লেখক ব্রহ্ম গায়ত্রীর একটী ব্যাখ্যা করেছেন, সেই সম্বন্ধেই আমার একটু 'বিচি কিৎসা' রয়েছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের যাহাদের শ্রদ্ধা ও অবসর আছে, তাঁহারা দিনে তিনবেলা না হউক অন্ততঃ দুবেলা ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করেন। 'যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞঃ', —প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে মন্ত্র জপ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ চিন্তা বা মনন করার নিয়ম আছে;—নতুবা তাহা তাদৃশ ফলোপধায়ক হয়না,—সুতরাং ব্রহ্মগায়ত্রীর মানেটা ঠিকভাবে জানা তাঁহাদের সকলেরই দরকার।

গায়ত্রীর তিনটী অংশ ত্রিপাদা গায়ত্রী,—যথা,— (১) ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, (২) তৎসবিতু র্বরেণ্যং ভর্গ দেবস্য ধীমহি, (৩) ধিয়ঃ যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। প্রথম অংশের মানে তিনটী লোক, আর দ্বিতীয়াংশের 'তৎসবিতুঃ' মানে যে তাহাদের স্বষ্টিকর্ত্তা' এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু প্রবন্ধ লেখক সমুদয়টীর একত্রে মানে করেছেন, 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (বরেণ্যং ভর্গঃ) যে জ্যোতি যে শক্তি দ্বারা পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত সেই (ধিয়ঃ) শক্তি আমাদের অন্তরে বর্ত্তমান, তাহাই আমাদের অনুপ্রাণিত করুক।" ইহা হইতে আমরা কি ধ্যান বা মনন বা চিন্তা করিব তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।

পক্ষান্তরে 'তাহাই আমাদের অনুপ্রাণিত করুক' বলায় ইহা যদি একটী প্রার্থনা বাক্যই হয়, তবে এখানে অনুপ্রাণিত করার প্রকার কি হইবে, এবং প্রার্থনাটী কি হইল তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না।

'তৎসবিতুঃ দেবস্য বরেণ্যংভর্গ ধীমহি' সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বষ্টিকর্ত্তা দেবের বরেণ্য ভর্গ ধ্যান করি এরূপ মানে করিলে বুঝিতে একটু সহজ হয়; আর 'ভর্গ' মানে 'ব্রহ্মজ্যোতিঃ' করুন, 'শক্তি' করুন বা 'মহিমা' করুন, উহা চিন্তা, ধ্যান বা মনন করা যায়। তবে তাঁহার অজস্র মহিমা চিন্তা করা আরও সহজ।

রহিল তৃতীয়াংশ 'যো নঃ (অস্মাকম্) ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ' 'যিনি আমাদিগের ধী বা বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন বা করুন। 'প্রচোদয়াৎ' এখানে বিধিলিঙের বিভক্তি দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং প্রার্থনাই হওয়া উচিত যদি 'যঃ' বা 'যিনি' না থাকিত। কিন্তু 'যঃ' বা যিনি থাকায় বিধিলিঙের মানে 'লটের' মত হয়—তাহা হইলে মানে 'পরিচালিত করেন' হয়। কিন্তু ব্রহ্মগায়ত্রী ছাড়া শাক্ত ও বৈষ্ণব সব গায়ত্রীতেই 'যঃ'-হীন বিধিলিঙ্ থাকায় স্পষ্টতঃ প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমার চিন্তার স্বাধীনতাটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে না দিলে 'পরিচালিত করেন' বলা যায়না। হিন্দুমাত্র অহঙ্কার থাকা পর্য্যন্ত উহা ভাবনা করা যায়না।

বিনীত—

শ্রীউষাকান্ত মুখোপাধ্যায়

৩২, সুলতান আলম রোড,

কলিকাতা-৩৩।

বাংলা গান

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, 'ভারতবর্ষ'-তে আপনাদের নবসৃষ্ট পত্র-লেখা বিভাগটির জন্য সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দনসহ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পত্রিকার অগ্রগতির পথে সুস্থ সমালোচনা অপরিহার্য। পত্রলেখা বিভাগটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠুক, কামনা করি, শুধু সমালোচনাই নয়, কিছু সম্ভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রও যদি সৃষ্টি করা যায় তবে আমার বক্তব্যটুকু তুলে ধরবার ভরসা পাই। আমি সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই :

আমাদের দেশে বর্তমানে বাংলা গানের বড়ই দুর্দিন। দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যার ফলে ভাল বাংলা গান রচনা হচ্ছেনা। সুরের কথা তো বাদই দিলাম। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল এবং আরও বিশেষ কয়েকজন গীতিকারের গানগুলি বাদ দিলে দেখা যাবে, অবশিষ্টাংশে যে গানগুলি পড়ে রইল তার বেশীরভাগই কাব্যাংশে অতি দুর্বল—লিরিক ভাব বর্জিত কতকগুলি বাছাই করা শব্দের সমষ্টি মাত্র!

সুরের ক্ষেত্রে, গানের মূলভাবকে কেন্দ্র করে সুর দেওয়া হয় না (অবশ্য, মূলভাব যদি কিছু থেকে থাকে)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় গানের পদ বা বাণী বাহুল্য হয়ে পড়ে; এবং একালের সুরকারেরা সুরকে তীব্রভাবে হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট করবার নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ফল ভাল হচ্ছে না। আসল কথা, গানের ক্ষেত্রে অর্থকরি দিকটা উগ্রভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে বলেই যত বিপর্যয়।

তাই সম্পাদকদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ তাঁরা যেন বিষয়টি চিন্তা করে দেখেন এবং একটি সঙ্গীতের বিভাগ খুলে নতুন গীতিকার ও সুরকারদের উৎসাহিত করেন। বাংলা গানকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করে তার সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে, আধুনিক বাংলা গানের নতুন, সুন্দর এবং সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠবে। সুন্দর গান সমাজকেও সুন্দর করে। ইতি—

বিনীত—
অরুন সেন বি-এ, বি-টি
শিক্ষক : টাকী গভঃ স্কুল,
টাকী, ২৪ পরগণা।

ছাত্র সমাজ ও রাজনীতি

সবিনয় নিবেদন,

"কিশোর জগৎ" বিভাগে শ্রীজ্ঞান রচিত "সংকট ও সমাধান" (শ্রাবণ, ১৩৭৪) প্রবন্ধটি পড়ে আনন্দিত হয়েছি। শ্রীজ্ঞান ঠিকই বলেছেন যে, বর্তমানে ছাত্র সমাজ সস্তা রাজনীতি ও 'ইজম্'-বাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

আমাদের দেশের অনেক ছাত্র-ছাত্রীকেই আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়াশোনা করতে হয়। তাদের বাসস্থানেরও সমস্যা রয়েছে। এর সঙ্গে তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী হিসেবে রয়েছে সস্তা রাজনীতি। তাদের কাছে বিদ্যার্জন গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতির জটিল তত্ত্ব বোঝে না। তাদের যদি "কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? এই দলের নীতি কি? কমিউনিজমের সংজ্ঞা কি? জনসংঘ, ফরোয়ার্ড ব্লকের নীতি কি? এই দলগুলির প্রতিষ্ঠাতা কে?" ইত্যাদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তারা জবাব দিতে পারে না।

তারা জানে রাজনীতির অর্থ ধর্মঘট করা, ট্রাম-বাস পোড়ানো, "ঘেরাও" করা, ইত্যাদি। এইভাবে তারা জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় করে।

আমার মতে, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর রাজনীতির যথার্থ স্বরূপ জানা উচিত; কিন্তু বিদ্যার্জন কালে ফলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ যাঁরাই প্রথিতযশা রাজনীতিজ্ঞ, তাঁরা সকলেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে সাধ্যমত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরই সমাজ-সেবার কাজে এগিয়ে আসা উচিত। এতে জাতির কল্যাণ হবে আর রাজনীতির জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

বিনীত—
প্রবীরগোপাল মুখোপাধ্যায়
১৪, লোকনাথ চ্যাটার্জ্জী লেন,
শিবপুর, হাওড়া।

শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাস

সুনীলচন্দ্র বসু

অর্থনীতির সঙ্গে যে সাহিত্য ওতপ্রোত হয়ে আছে একথা এখনও সাহিত্য সমালোচকদের কাছে স্বীকৃত না হলেও অর্থনৈতিক অবস্থা ভেদে যে সাহিত্যিকদের মেজাজ গড়ে ওঠে এবং সেই মেজাজ তাঁর সৃষ্টির ওপর প্রতিফলিত হয় একথা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, জাতিগতভাবে ঠিক তেমনি সত্য। ভারতীয় সাহিত্যে 'রামায়ণ' 'মহাভারত' থেকে আরম্ভ করে কালিদাসের রচনা সম্পর্কে অর্থনৈতিক প্রকৃতির মূলগত প্রভেদের বিশ্লেষণ করে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল পূর্বে সাহিত্যের উপর অর্থনৈতিক প্রভাবের কথা স্বীকার করে লিখেছিলেন: "যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে রাজ বিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজ বিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে, রামায়ণ আমাদের দেশে আর্যদের বিজয় অভিযানের কাহিনী এবং সংগ্রামী সাহিত্যের প্রতীক রামায়ণ-এ আর্য অনার্যের যুদ্ধ ও আর্যদের জয়লাভই এই কাব্যের মুখ্য বিষয়। মহাভারত-এ ভারতবর্ষে আর্যদের প্রতিষ্ঠা এবং যে দেশ তারা জয় করেছে সেই দেশের ভাগ বাটোয়ারা এবং গৃহযুদ্ধের কাহিনী, কালিদাসের নাটক ও কাব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "ভারতবর্ষ ধনশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্য রসপ্রবাহিনী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। বিলাসিতার স্রোত লাগিল, তাহারই ফল কলিদাসাদির কাব্য নাটকাদি।"

সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র উল্লখিত এই সত্য শুধু আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়—বিশ্বের সকল দেশের সাহিত্য প্রসঙ্গে সমানভাবে প্রযোজ্য। একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ইংলণ্ডে তথা ইউরোপে অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে তাদের সাহিত্যের প্রকৃতি পরিবর্তন করেছে। দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যক্তিবিশেষ, কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসন ও ইংরাজ প্রবর্তিত অর্থনীতি একদিন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল আমাদের দেশের বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকরা তারি ছবি তুলে ধরেছিলেন তাঁদের লেখা উপন্যাসে। জীবনধারণের জন্যে যে জীবন সংগ্রাম আছে এবং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে অর্থনীতির বেশ বড় রকম ভূমিকা আছে, তার ঘাত-প্রতিঘাত আছে, তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে এ সম্পর্কে আমাদের দেশের সাহিত্যিকেরা আশ্চর্য রকম নীরব থেকে গেছেন। তাই বিগত যুগের ঔপন্যাসিকদের রচনায় বাস্তবের ভূমিকার চেয়ে কল্পনা বিলাস বড় হয়ে উঠেছে। আমরা বাংলা সাহিত্যের বিগতযুগে এর ব্যতিক্রম দেখেছি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত "দেনাপাওনা" উপন্যাসে। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসখানির আগে ও পরে আরও কতকগুলি উপন্যাস লিখলেও শরৎচন্দ্র সমাজমুখীন প্রখর আত্মসচেতনশিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন একমাত্র এই উপন্যাসখানিতে। একদা যে অর্থনীতি ও বিন্যাসের উপর আমাদের ইংরাজ-পূর্ব যুগের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি ইংরাজ শাসনের কালেও আমাদের গ্রামীন জীবনে প্রচলন ছিল তার কোন চিহ্নই আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কারো উপন্যাসে পাইনে। বিগত যুগের বাংলা সাহিত্যে সেই অর্থনীতি সমাজ-ব্যবস্থা ও লোক-জীবনের অপেক্ষাকৃত প্রামাণ্য চিত্র আমরা দেখতে পাই শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের "দেনাপাওনা-ই" প্রথম উপন্যাস যার প্রাণধারণের জন্যে জীবন সংগ্রামের বাস্তবরূপ উদঘাটন করা হয়েছে।

সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে কাম ও অর্থনীতি জীবন আর মানব সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে কাম ও অর্থনীতি। অনাহারের সময় ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে আমরা যা কিছু ধরে

থাকি তাই-ই অর্থনীতি, আর ক্ষুধা নিবৃত্তির পর দেহমনের সুখ আর আনন্দের জন্যে যা কিছু করে থাকি সেইটাই কাম। কাম ও অর্থনীতিই পৃথিবীর সবদেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। কামহীন জীবন অসত্য আর অর্থনীতি শূন্য জীবন মিথ্যা। নরনারীর ব্যক্তিগত জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই দুয়ের প্রভাব অপরিসীম এবং এই দুয়ের সমন্বয়েই নরনারীর ব্যক্তিগত সমাজজীবনে পরিপূর্ণতার পরিচয় বহন করে, একথা জীবনের ক্ষেত্রে যেমন সত্য সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঠিক ততখানিই সত্য, এর অন্যথায় সৃষ্ট সাহিত্য আংশিকভাবে দুষ্ট হয়। দুঃখের কথা আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকে যাঁরা উপন্যাস রচনা করে আসছেন তাঁদের কারুই উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের উপর অর্থনীতির যে ভূমিকা তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। একমাত্র শরৎচন্দ্রের এই 'দেনাপাওনা' উপন্যাস ছাড়া, শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে দরিদ্র জীবনের কথা থাকলেও এযুগে কোন ঔপন্যাসিক তার মূল উৎস-এর অনুসন্ধান করেন নি যার জন্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল প্রমুখের লেখায় ব্যক্তিজীবনের দুঃখ-বেদনাই বড় হয়ে উঠেছে, তা সামাজিক রূপ পায়নি। এর ব্যতিক্রম একমাত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি তাঁর মধ্যজীবনের উপন্যাসগুলিতে আমাদের অর্থনীতি-ভিত্তিক সমাজজীবন উত্তরণ করেছেন, যার পথ প্রদর্শক হল শরৎচন্দ্রের এই দেনাপাওনা উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাস জীবানন্দ ষোড়শীর জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে অর্থ-নৈতিক ভিত্তি সামাজিক জীবন। একদিন যে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজবিন্যাসের উপর গ্রামীন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল তারই ধ্বংসাবশেষ শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে। আরও কথা এই যে দুটি নরনারীর বিরহ-মিলনের ঘাতপ্রতিঘাতের সার্থক রূপ পেয়েছে বৃহত্তর সমাজ কল্যাণে। এই কারণে বাংলা সাহিত্যে 'দেনাপাওনা-র' আবেদন ও ভূমিকা অসাধারণ। 'দেনা-পাওনা' বাংলা সাহিত্য জগতের প্রথম অর্থনৈতিক ভিত্তি সামাজিক উপন্যাস বলে ঘোষণা করলে ভুল অথবা অন্যায় করা হবে না।

এই গ্রন্থের আয়তন 'গৃহদাহ' এবং 'চরিত্রহীন' এর মতো বৃহৎ না হলেও 'দেনাপাওনার' সামাজিক ভূমিকা অনেক বড় এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত। আমাদের বাংলাসাহিত্যে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তের দপ্তর 'সাম্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুস্তকে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করলেও বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদী মানসিকতার বীজ বপন করেন। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে জীবানন্দ ষোড়শীর জীবনের সমান্তরালে যে আবেগের স্রোত বয়ে চলেছে সেটি বৈষয়িক ঘাত-প্রতিঘাতে উত্থিত সমাজতান্ত্রিক আবেগ, যেটিকে আমরা Sentimetal Socialism আখ্যা দিতে পারি।

'দেনাপাওনা' উপন্যাসে দুটি ধারা আমরা সমান্তরাল বয়ে যেতে দেখি, এর একটি ধারা ব্যক্তিগত (জীবানন্দ-ষোড়শী) অপর ধারাটি সামাজিক (যেখানে জীবানন্দ ও ষোড়শী ছাড়া, আরও অনেকে আছে, আছে প্রাকৃতজন) । এখানে বিচারের বিষয় এই দুটি ধারার মধ্যে মূলধারা কোন্‌টি—ব্যক্তিক বা সামাজিক? এর মূলধারাটি হল সামাজিক এবং ব্যক্তিজীবন-কে অবলম্বন করে সেটি বিকাশ লাভ করেছে। ব্যক্তি অবলম্বন (means) এবং সমাজ লক্ষ্য (end)। জমি-দার জীবানন্দ চৌধুরী চণ্ডীগড় গ্রামে বৈষয়িক কাজ আর বৈষয়িক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের জনাই তিনি গ্রাম ছেড়ে গেছেন। উপন্যাসের মূল সুরটি সামাজিক এবং অর্থনীতিগত। শক্তিমান লেখক শরৎচন্দ্র শিল্পের মাধ্যমে সার্থকরূপ দিয়েছেন। বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলিতে ও সমস্যা উদ্ভূত আবেগগুলি রসমণ্ডিত করে দেহরূপ (embo-didment) দিয়ে। অর্থনৈতিক সমস্যা যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যে এবং উপন্যাসের বিষয় বস্তু হতে পারে 'দেনা-পাওনা' তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দেনাপাওনা উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের উপর এই উপন্যাসরচনার সময়কালের প্রভাব এত গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই উপন্যাসের সৃষ্টি। শরৎচন্দ্রের শিল্পীমানস এই সময়কার ভাবস্রোতে ভেসে গেছল। শরৎচন্দ্র এই সময় প্রখর ভাবে সমাজ সচেতন হয়ে তাঁর এই উপন্যাসে বৃহত্তর অব

হেলিত সমাজের কথাই তুলে ধরেন। খুটিয়ে বিচার করলে আমরা জানতে পারব যে দেনাপাওনা উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দেশের দুটি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, প্রথমটি ১৯২১ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, দ্বিতীয়টি অল্পকাল পরে সংঘটিত তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ আন্দোলন 'দেনা-পাওনা'র দেহ আর অসহযোগ আন্দোলন এই উপন্যাসের আত্মা।

দেনাপাওনা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের ধারা বহির্ভূত সৃষ্টি। 'দেবদাস' 'বামুনের মেয়ে' 'চরিত্রহীন, 'গৃহদাহ, 'শ্রীকান্ত (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব) ইত্যাদি উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রভাবান্বিত হয়ে শরৎচন্দ্র যে দুখানি উপন্যাস রচনা করেন সে দুখানি হচ্ছে 'দেনাপাও ।' আর 'পথেরদাবী' শরৎচন্দ্রের শেষোক্ত উপন্যাসখানি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের, জন্যে যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে উঠছিল তারই ভিত্তিতে রচিত, পরে 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের মূলানুসন্ধান করতে বসলে হুগলী জেলার বিখ্যাত তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের কথা মনে করিয়ে দেবে। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের অনতিকাল পরেই শরৎচন্দ্র 'দেনাপাওনা' রচনা করেন। এই সত্যাগ্রহ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে প্রখ্যাত গল্পকার শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, এই নবদুর্গা উপন্যাস লেখেন। উপন্যাসে প্রভাত কুমার কেদারেশ্বরের (তারকেশ্বরের?) একজন ব্যভিচারী মোহন্তের চরিত্র অঙ্কন করেন আর শরৎচন্দ্র 'দেনাপাওনা' উপন্যাস খাড়া করেন অর্থ নৈতিক (বৈষয়িক) এবং সামাজিক ভূমিকার উপর। তারকেশ্বরের গণবিক্ষোভ শরৎচন্দ্রের শিল্পীমানসে এতই আলোড়ন ধরেছিল যার ফলে 'দেনাপাওনার সৃষ্টি। তবে স্থান কাল ঘটনাবলী শিল্পীমানসের সংস্কার ফলে নবরূপ ধারণ করেছে পাত্রপাত্রীর রূপান্তর ঘটেছে। শরৎচন্দ্র দেনাপাওনা উপন্যাসে সমাজজীবনকে স্থাপন করেছেন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সমাজবিন্যাসের পটভূমিতে।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল—কোন ব্যক্তিবিশেষ তার স্বত্বভোগী ছিলনা, দেবোত্তর সম্পত্তির মালিকানা যেমন জমিদারের ছিল না। তেমনি দেবোত্তর সম্পত্তির ও কৃষি শিল্পের উৎপাদনের মালিকানা কোন ব্যক্তিবিশেষের না থাকার দরুণ কৃষি ও উৎপাদনের অংশ দেব সেবার জন্যে রেখে অবশিষ্টাংশ ভূমিচাষি ক্ষেত মজুর, শিল্পীবৃত্তি ও পেশাগত সকলেই উৎপাদনের অংশীদার হত—উৎপাদনের ভোগ সত্ব থেকে তারা বঞ্চিত হত না। লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নয়া জমিদারতন্ত্র পরোক্ষভাবে এই দেবোত্তর ব্যবস্থার এবং প্রত্যক্ষভাবে নিরীহ প্রজাদের ক্ষতির কারণ হয়েছিল। শরৎচন্দ্র, 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে সেই জমিদার প্রপীড়িত দেবোত্তর সম্পত্তি ও নিপীড়িত প্রজাপুঞ্জের কথাই বলেছেন। তাই 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের প্রারম্ভে দেখি :

> "...একদিন যথার্থ-ই সমস্ত চণ্ডীগড় গ্রাম দেবতার সম্পত্তি ছিল, কিন্তু আজ মন্দির সংলগ্ন মাত্র কয়েক বিঘা ভূমি ভিন্ন সমস্তই মানুষে ছিনাইয়া লইয়াছে। গ্রামখানি এখন বীজগাঁর জমিদারী ভুক্ত। কেমন করিয়া এবং কোন দুজ্ঞেয় রহস্যময় পথে অনাথের ও অনাথের সম্পত্তি এবং নিঃসহায় দেবতার ধন অবশেষে জমিদারের জঠরে আসিয়া স্থিতিলাভ করে, সে কাহিনী সাধারণ পাঠকের জানা নিষ্প্রয়োজন।"
>
> দেনাপাওনা, পৃঃ ১।

শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাস সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিন্যাস ও বাঙ্গালীর ঐতিহ্য এবং জীবনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই উপন্যাসে আমরা প্রথম লোকজীবনের ভূমিকা দেখতে পাই, বাংলা সাহিত্যে 'দেনাপাওনা'ই প্রথম উপন্যাস যেখানে লেখক প্রচ্ছন্নভাবে (চাই কি নিজের অজান্তে) সমাজতন্ত্রবাদের বীজ বপন করেন। সমাজতন্ত্রে ভূমির মালিকানা কোন জমিদার কোন জমিদারকে বংশানুক্রমে দেওয়া হত না। তেমনি প্রজাদের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্কও ছিল অন্যরকম। উৎপাদন ও শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক বিন্যাস সামন্তেরা নিয়ন্ত্রণ করত এবং সকলেই ছিল সমাজ নির্ভরশীল। বৈষয়িক, বাণিজ্য, ব্যবসা প্রভৃতি সমাজবহির্ভূত কোন কিছু করা সম্ভবপর ছিল না শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা উপন্যাস শুধু এর বৈষয়িক ভূমি ব্যবস্থাটি অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। সামন্ততন্ত্রের সমাজমানসিকতা সমাজতন্ত্রবাদে প্রতিফলিত হয়—প্রথম তফাৎ রাজার স্থলে সব কিছুই রাষ্ট্রের অধীন—উৎপাদনে

বণ্টনের এক চেটিয়াত্ব কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, দেবোত্তর সম্পত্তিভূত প্রজারা দেবোত্তরের অন্তর্ভূক্ত ভূমি সত্বভাষার যে সুযোগ সুবিধা পেত তা জমিদারীর অন্তর্গত ভূমি ব্যবব্যবস্থায় এরই বাস্তবানুগ বৈপরীত্য ছবি আমরা প্রথম দেখতে পাই শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে—চণ্ডীদেবীর ভৈরবীর মধ্যে আমরা দেখি জমিদার তন্ত্রের প্রতিবাদ, সে সমাজশক্তির প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবল পরাক্রম জমিদারের বিরুদ্ধে। শরৎচন্দ্রের শক্তিশালী লেখনী এই উপন্যাসে সর্বপ্রথম জটিল কঠিন অর্থনীতি ও বৈষয়িক ব্যাপারকে রস বস্তুতে পরিণত করে দেন। প্রথমতঃ শরৎচন্দ্র 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে নায়ক নায়িকার ব্যক্তিগত আবেগকে সামাজিক আবেগে রূপান্তর করেছেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি সমাজজীবনের সাক্ষীপুরুষ হিসাবে পাঠকের ব ক্তিগত আবেগকে সমাজমুখীন করেছেন।

কাম ও অর্থনীতিকে ভিত্তি করে, কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ব্যক্তি ও সমাজজীবন ব্যক্তি ও সমাজজীবনের যত কিছু জটিলতা ঘাতপ্রতিঘাত, প্রতিক্রিয়া এই দুটিকেই কেন্দ্র করে সৃষ্টি হচ্ছে। সাগরতরঙ্গের মতো উঠাপড়া বাড়ছে—তীরভূমিতে এসে আঘাত করছে। সাহিত্যেও বিচিত্রলীলা দেখা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'রজনী' 'বিষবৃক্ষ ইত্যাদি উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' 'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি' 'ঘরে-বাইরে' ইত্যাদি উপন্যাস, শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' থেকে আরম্ভ করে 'চরিত্রহীন' 'গৃহদাহ' 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি উপন্যাস এগুলি সবই সৃষ্টি হয়েছে কামজীবনকে ভিত্তি করে। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের প্রারম্ভে নায়ক-চরিত্র লালসার যে লেলিহান শিখা ও রিরংসার যে আগুন অত্যন্ত প্রখর ও মূলভাবে প্রকাশ পেয়েছিল কামজীবনের সেই দাহ শেষ পর্যন্ত বায়িত হয়েছে সমাজ কল্যাণে তৃষিত দুটী দেহমন মিলিত হতে চেয়েছে দেশঋণ ও সমাজ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি নিয়ে—পুরুষানুক্রমে জমা দেনা তার পুরুষাক্রমে শোধ দেবার এই আগ্রহ অত স্ত সামাজিক তাই শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' কামজীবন গৌণ হয়ে অর্থনীতি প্রধান উপন্যাসে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী

লীলা বিশ্বাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

লিপিকার এক টুকরো গল্পে কবি লিখেছেন একটি তরুণী যখন তার চিঠিখানি নিয়ে ছাতের এক কোণে বসে পড়ছিল, তখন এক স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়ার সেখানে আবির্ভাব হ'ল, যেন কপোতীর পিছনে শ্যেনপাখীর মত। এই স্থূলাঙ্গীর বর্ণনায় কবি লিখেছেন, তার হাতের বালা যত মোটা তার সিঁথিও তেমনি চওড়া, এবং যত চওড়া সিঁথি, ততই মোটা করে সিঁন্দুর লেপা। স্থূলতা তার অন্তরে এবং বাইরে। তাই সে তরুণীর প্রেমকে সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখে না। নির্মম দণ্ডদাতার মত তার মনোভাব। প্রৌঢ়া নারী যে তরুণীর প্রেমকে কতখানি অক্ষমার চোখে দেখে কবি তা জানতেন। বোধহয় এতখানি অক্ষমার কারণ প্রৌঢ়ার মনের গোপন ঈর্ষা। তরুণীকে সে তার তারুণ্যের জন্যেই ঈর্ষা করে। যে প্রেমে আজ আর তার অধিকার নেই, তা যখন কোন তরুণী তার সামনে ভোগ করে, তখন সে তা সহ্য করতে পারে না। শাশুড়ী যে ছেলের বউকে দেখতে পারে না, তার মধ্যেও বোধহয় এই ঈর্ষার মনোভাবটাই কাজ করে।

চক্রবর্তী খুড়োর প্রৌঢ়া গৃহিণী এবং তার যুবতী মেয়ে শৈলের স্বভাবের যে পার্থক্য তা শুধুই যে বয়সের জন্যে, তা নয়। এ পার্থক্যের কারণ স্বভাবের পার্থক্য। তবু যা'র স্বভাব সুন্দর নয় যৌবনে তার যতটুকু স্পর্শকাতর সমবেদনা এবং উদারতা থাকে বয়স হ'লে সেটুকুও আর থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্কীর্ণতা, ঐশ্বর্যের অভিমান ও স্বার্থপরতা বেড়ে চলে।

'গোরা' উপন্যাসে কবি অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে প্রৌঢ়া নারীর এক চমৎকার চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন, সুচরিতার মাসি হরিমোহিনীর বর্ণনায়। এইরকম মেয়েরা যখন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকে তখন তাদের মত দীন আর কেউ নেই। তখন তারা সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, কোন অত্যাচারেরই কোন প্রতিবাদ করে না। তারা তখন নিজের প্রয়োজনকে এমন সঙ্কুচিত ক'রে আনে যাতে সংসারে কারো সঙ্গে তাদের বিরোধ না বাধে। আশ্রয়দাত্রী বরদাসুন্দরী যখন জল তোলার বেহারাকে অন্য কাজে পাঠাতে লাগলেন, তখন হরিমোহিনী রান্না করাই ছেড়ে দিলেন। তিনি শুধুই ফলমূল খেয়ে থাকতে লাগলেন। তিনি যে সকলের ছোঁয়া জলে রান্না করতেন না, তাঁর এই সংস্কারে আঘাত দেবার জন্যেই

বরদাসুন্দরী—বিশেষ ক'রে উঁচু জাতের সেই বিশেষ বেহারাকে সময় বুঝে অন্যত্র কাজে পাঠাতেন। যখন এইরকম প্রতিকূলতার মধ্যে বিনয় হরিমোহিনীর প্রতি একটু মমতা দেখাল, তখন হরিমোহিনী বিনয়কে আশ্রয় করতে চাইলেন।

প্রতিকূল অবস্থায় এই যে একান্ত দীনতা এটা চরিত্রের নিম্নস্তরেরই একটা লক্ষণ। ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অত্যন্ত সুলিখিত একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে এই কথা পড়েছি যে নিম্নমানের প্রাণীদের একটা ক্ষমতা হ'ল এই যে তারা যখন দেখে যে অবস্থা, আবহাওয়া প্রতিকূল হ'য়ে উঠেছে, তখন তারা জীবনের লক্ষণ ঘুচিয়ে দিয়ে মড়ার মত হ'য়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ তারা বেঁচে না থেকেও শুধুমাত্র টিকে থাকতে পারে। এই অবস্থায় তারা বহু দীর্ঘ দিনও টিকে থাকতে পারে। কিন্তু কেন উঁচু মানের প্রাণীর এ ক্ষমতা নেই। হয় সে বাঁচে নয় সে মরে, কিন্তু জীবন্মৃত হ'য়ে সে থাকতে পারে না। অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে হরিমোহিনীর মধ্যেও আমরা তাই দেখি বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অত্যাচারের সামনে নিজের বেঁচে থাকার দাবীকে ক্রমেই সঙ্কুচিত ক'রে এনে শুধুমাত্র টিকে থাকার চেষ্টা। এই মরার মত টিকে থাকার ক্ষমতা রোগ-বীজাণুদের মধ্যে খুব বেশি রকম দেখা যায়। রোগের বীজাণু যখন অবস্থা অনুকূল দেখে তখনই প্রবল হ'য়ে ওঠে। নীচু স্তরের মন যার তারও স্বভাব ঠিক রোগের বীজাণুদেরই মত। দুঃসময়ে যে ছিল দীনহীন, সুযোগ পেলেই সে নিজমূর্তি ধারণ করে বসে।

হরিমোহিনী যে মুহূর্তে সুচরিতার বাড়ীতে এসে তার অভিভাবিকার পদে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন তখনি তিনি তার সেই দীনতা ছেড়ে নিজের আসল স্বভাবের পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন। নিজের দুঃসময়ে যে বিনয়কে তিনি আশ্রয় করেছিলেন, তখন তিনি সেই বিনয়ের আচরণে তার হিন্দুয়ানার ব্যতিক্রম দেখে তার প্রতি বিরূপ হ'য়ে উঠলেন। তিনি গোরার মুখের উপর তাকে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে তাকে অপমান ক'রে বিদায় করে দিলেন। গোরার মা আনন্দময়ীকেও তিনি ছেড়ে কথা কইলেন না। তিনি যখন সুচরিতার উপরে অধিকার লাভ করলেন, তখন এই অধিকার অন্য সকলের হাত থেকে রক্ষা করে রাখবার জন্যে তিনি একেবারে উদ্যত হ'য়ে উঠলেন। যখন তাঁর কোথাও কোন অধিকার ছিল না, তখন তাঁর মনে যে বৈরাগ্য ছিল, নিজের ব'লে একটু কিছু পাওয়ার পরে তা সম্পূর্ণ চলে গেল। তখন তাঁর আসক্তি অন্য সাধারণ মানুষের আসক্তির চেয়েও অতি-মাত্রায় প্রবল হ'য়ে উঠল। যে ধর্মকে একদিন তিনি জীবনের সান্ত্বনা ও আশ্রয় ব'লে অবলম্বন করেছিলেন আজ সেই ধর্ম তাঁর কাছে স্বার্থসিদ্ধির উপায় হ'য়ে উঠল। হরিমোহিনী ঠাকুরের ভোগের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়ে তাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে বশ করতে চাইলেন।

অশিক্ষার মতই অল্পশিক্ষাও মনের স্বাভাবিক অনুদারতার সঙ্গে মিলে মেয়েদের চরিত্রের অবনতি ঘটায়। 'গোরা' উপন্যাসে বরদাসুন্দরী অল্পশিক্ষিতা, ব্রাহ্ম মেয়ে। অভদ্রতা এবং অসৌজন্য তার প্রকৃতিগত। কিন্তু অল্প-শিক্ষার ফল তার পক্ষে এই হ'য়েছে যে তিনি নিজের অভদ্র আচরণকে সত্যপরতা এবং স্পষ্টভাষিতা ব'লে অহঙ্কার করেন। তার মনের সঙ্কীর্ণতার সীমা নেই। তিনি দলগত সঙ্কীর্ণতার দ্বারা একেবারে নিজের চারিদিকে গণ্ডী টেনে ব'সে আছেন। সে গণ্ডীর বাইরে উদার মনুষ্যত্বের কোন কথা বোঝবার ক্ষমতাই তার নেই।

যেমন অন্য সমস্ত বেলায় তেমনি মেয়েদের বেলায়ও কবি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে, সমস্ত সঙ্কীর্ণ মনো-ভাবের উর্ধে। মেয়েদের দোষ এবং গুণ তিনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমানভাবে দেখেছেন। গোরা উপন্যাসে হরিমোহিনীর চরিত্রে যত দুর্বলতা ও ত্রুটি, বরদাসুন্দরীর চরিত্রে কবি ততোধিক দোষত্রুটি দেখিয়েছেন। আর এ সমস্ত সঙ্কীর্ণতার অন্যপারে আছেন আনন্দময়ী।

সাহিত্যের নির্মম সমালোচকদের লক্ষ্য ক'রে কবি লিখেছেন—তাদের প্রাণে প্রেম নেই, তাই তারা প্রেম দিতে জানে না। তারা কবির কাব্য যখন পড়ে তখন তারা প্রেম দিয়ে তার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করতে জানে না। কিন্তু যার প্রাণে প্রেম আছে তার চোখে ভুল ত্রুটিগুলোই বড় হ'য়ে দেখা দেয় না। সে ভুল ত্রুটির মাঝেও আপনার শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখে। ঠিক এই কথাই বলা চলে প্রেমিক কবির নিজের বেলাতে।

মেয়েদের প্রকৃতির নানা ত্রুটি, নানা সঙ্কীর্ণতা ও দুর্বলতার কথা তাঁর অজানা ছিল না, কিন্তু তবু তাঁর প্রেমের মধ্যেই ছিল অসীম ক্ষমা। তাই মেয়েদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা কখনো হার মানে নি। কবি দরদী পাঠকের এই বর্ণনা দিয়েছেন—

"করুণ চোখে যে প্রেম দেখে ভুল,
সকল ত্রুটি জানে,
তবু যে অনুকূল,
শ্রদ্ধা যার তবু না হার মানে।"

এমনি ক'রেই দেখার চোখ ছিল দরদী কবির, মেয়েদের বেলায়। মেয়েদের প্রতি যে কবির কতখানি দরদ এবং অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা ছিল, তা 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনীর চরিত্র কবি যেমন ক'রে এঁকেছেন, তার থেকে বোঝা যায়। সাধারণ মানুষ বিনোদিনীকে ক্ষমা করতে পারে না। বিনোদিনী নিজের যৌবনের অতৃপ্ত উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষার বশে সর্বদা চঞ্চল হ'য়ে আছে, সে বিলাসিনী যুবতী। পুরুষ চিত্তকে বিভ্রান্ত করবার জন্য সে সদা সচেষ্ট। কিন্তু তবু কবি জানতে পেরেছেন যে বিনোদিনীর মধ্যেও নারীর কল্যাণী-রূপ সুপ্ত হ'য়ে আছে। বাইরের বিলাস চঞ্চলতার অন্তরালে নারীর অন্তরের কল্যাণ-রূপ দেখবার দৃষ্টির গভীরতা ছিল কবির। চড়ুইভাতির মধ্যাহ্নের অবসরে বাগানে ব'সে যেদিন বিনোদিনী বিহারীর কাছে নিজের ছোটবেলার কথা বলতে লাগল, তখনকার বর্ণনায় কবি লিখেছেন—

"বিনোদিনীর মুখে খর যৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্য স্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে সে কৌতুক তীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নান রূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বল কৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্ত সজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল, তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তি-মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গময় কৌতুক-বিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারী প্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই, বিনোদিনী সলজ্জ সতী-স্ত্রী ভাবে একান্ত ভক্তি ভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মত সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে বিহারীর মনে মুহূর্তের জন্যেও উদিত হয় নাই। আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পর্দাখানা মুহূর্তের জন্য উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে। বিহারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন। অবস্থা বিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া ওঠে সংসারের কাছে সেটাই সত্য।"

কিন্তু কবি অন্তর্যামীর সঙ্গে একত্রে অন্তর-সত্য দেখতে পেয়েছেন, তাই তিনি বিনোদিনীর মত মেয়েকেও দুর্গতির মধ্যে পরিত্যাগ করেন নি।

কবি বিশ্বাস করতেন কামনা নারীপ্রকৃতির একভাগে থাকলেও তার অন্যভাগে আছে সেবার আকাঙ্ক্ষা। নিতান্ত বিলাসিনী যে নারী তারও অন্তরে আছে অকৃত্রিম সেবা পরায়ণতা। নারী কাজ ভালোবাসে, সেবা ভালোবাসে। কাজের মধ্যে সেবার সময়ে সে কামনাকে প্রশ্রয় দেয় না। বিনোদিনীও তেমনি সেবাপরায়ণা কর্ম-কুশলতাশালিনী মেয়ে। সে যখন মহেন্দ্রের মায়ের সেবা করে, মহেন্দ্রের বাড়ীর গৃহস্থালীর কাজ করে, তার মাঝে মহেন্দ্রের আনাগোনা তার কাছে বিসদৃশ ব'লে বোধহয়, এতে সে বিরক্ত বোধ করে। বিলাসপরায়ণ কামনা নারী প্রকৃতির একটা দিক হ'লেও এটাই তার সমস্তখানি নয়। সে কাজের সময়ে কাজের ব্যাঘাত সেবার সময়ে কামনার লোলুপ আনাগোনা পছন্দ করে না। নারীর মন শুধুই বিলাসে নয়, তার মন কাজে এবং সেবায়। সেবা ক'রে সে তৃপ্তি পায়, কাজ করে সে আনন্দিত।

কবি মেয়েদের সমালোচনা করেছেন কিন্তু মেয়েদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা এত বেশী গভীর ছিল যে তিনি মেয়েদের বিদ্রূপ করতে কখনো পারেন নি। অন্যান্য অনেক শ্রেষ্ঠ লেখক মেয়েদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। মেয়েদের কতকগুলো দুর্বলতা আছে, একথা অস্বীকার করা চলে না। তারই মধ্যে একটা দুর্বলতা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন 'আনন্দমঠে' গৌরী দেবীর। সুন্দর

যুবক সন্ন্যাসী ভবানন্দ যখন গৌরী দেবীর গৃহে গেলেন, তখন গৌরী দেবী আটহাত একখানা কাপড় পরে রান্না করছিলেন। ভবানন্দকে দেখে লজ্জাশীলা গৌরী দেবী সেই কাপড়খানা টেনেটুনে ঘোমটা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্থূল দেহভার বেষ্টন করে কাপড় কানের কাছে এসে জবাব দিল। প্রৌঢ়া মেয়েমানুষের যুবকের সামনে এই লজ্জা বিলাসের চেষ্টা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হেসে নিয়েছেন। ভবানন্দ গৌরী দেবীর মনোভাব বুঝে নিয়ে বল্ল, যে যখন বয়সের হিসাব হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল যে তুমি আমার চেয়ে ছোট। ভবানন্দের একথায় গৌরী দেবী পরম প্রীত হ'লেন যদিও আসলে তিনি ভবানন্দের চেয়ে অন্ততঃ বছর পঁচিশের বড়। ভবানন্দ বল্ল ব্রহ্মচারীর অনুমতি পেলেই সে গৌরী দেবীকে বিয়ে করতে পারে। একথা বিশ্বাস করতেও গৌরী দেবীর বাধে না। শুধু যখন ভবানন্দ কল্যাণীর খোঁজ করল, তখনই গৌরী দেবী বিমর্ষ হ'য়ে পড়লেন। প্রৌঢ়া নারীর যুবক-প্রীতি দেখে বঙ্কিমচন্দ্র ঠাট্টা করেছেন। এই নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন ইংরেজ লেখক ডিকেন্স। তাঁর বিখ্যাত পিকুইক পেপারে প্রৌঢ়া কুমারী নারীকে প্রতারক প্রণয়ী যখন বাগানে বসে প্রণয় নিবেদন করল তখন সে লজ্জায় বিবশা কিশোরীর মত হাবভাব দেখাতে লাগল। কপট-প্রণয়ী প্রৌঢ়া কুমারীকে নিয়ে পালিয়ে এল। কুমারীর দাদা এসে ওদের ধরল এক হোটেলে। তখন প্রণয়ী বল্ল "ইনি তো আর নাবালিকা নন, এঁর বয়স তো ২২শের বেশি। দাদা বল্লেন— ২ কে বলে, ওর বয়স ৫২র বেশী। তাই শুনে কুমারী দারুণ আঘাতে মূর্ছিতা হ'য়ে পড়লেন। বয়সের উল্লেখ মেয়েদের কাছে এমনি অপ্রীতিকর এবং এমনি শকিং। এই কুমারী পিসীকে রাগাবার জন্য ওর ভাইঝিরা—ওকে বলে—"পিসীমা, গাড়ীর জানালা দিয়ে তোমার মাথাটা বাইরে রেখ না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে, তোমার বয়স হয়েছে তো।" কিন্তু এই জাতীয় ব্যঙ্গচিত্র রবীন্দ্ররচনার মধ্যে কোথাও নেই। শুধু একটা ছোট গল্পে কবি লিখেছেন যে গুরুচরণ নামে কোন ভদ্রলোকের মৃত্যুকালে তার স্ত্রী পান্তাভাত খেতে বসেছিলেন ডাঁটা চচ্চরি দিয়ে। কারণ তিনি জানতেন আর কখনো পান্তাভাত খেতে পাবেন না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে যখন তার খাওয়ার মাঝখানে বাধা পড়ল তখন তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন,—দুটো যে পান্তাভাত খাব তারও সময় পাই না, অথচ বেচারা গুরুচরণ মৃত্যুকালে তার সমস্ত সম্পত্তি তার স্ত্রীর নামেই উইল করে দিয়ে গেলেন।

কবি মেয়েদের বেলায় যা কিছু বন্দনাগান গেয়েছেন তা যে ব্যক্তি নির্বিশেষে সবার বেলায়ই খাটে কবি তা মনে করতেন না এবং আমরাও তা মনে করব না।

সে যাই হ'ক সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে এই একটিমাত্র ব্যঙ্গচিত্র আমরা পেয়েছি।

অপরাধ জগতে নারী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

কালে সমাধি

সকলে বলে, সন্ন্যেসী মা। কালীদেবীর পীঠস্থানের সর্বময়ী কর্ত্রী। শিবতলা মাঠ পেরিয়ে—গ্রাম সীমানার পারে আশ্রমটি অবস্থিত। নাম কালী আশ্রম। সামনে খরস্রোতা নদী বয়ে যায়। নদীর ওপারে, ঘন প্রকৃতির মাঝে সবুজের অন্ধকার। তার ওপার, উন্মুক্ত ধু-ধু করা অনেকটা আকাশ।

এ সব দেখতে দেখতে দিন কাটে সন্ন্যেসী মায়ের। বাকি সময় পূজা আরাধনায়। অসাধারণ রূপবতী তিনি। শ্বেতবর্ণ রঙ। গেরুয়া বসনে—আর রুদ্রাক্ষের অলঙ্কারে আরো রূপ খোলে। স্বর্গীয় রূপের সে ছটা। বয়সও অল্প। বলতে গেলে যুবতী। তবু এ বয়সে—সংসার ছাড়া মন নিয়ে কি করে দিন ক্যাটাচ্ছেন—একথা অনেকেই জানতে চাইতো। আশ্রমে প্রতি নিয়ত যারা আসতো, তারাই এই কৌতুহলে মরে যেত। মা কেন, এমন বয়সে সংসার সমাজ ছেড়ে এলো।

অথচ মন্দিরের পুরোন দাসী বলে, মায়ের কিছুরই অভাব ছিলনা। বড় বাড়ী বড় গাড়ী দুটি আদর্শ সন্তান। সব ফেলে, সব হারা হয়ে—কেন এই দেবালয়ে দিন কাটান কেউ জানেনা। কেউ বলতে পারে না, কেন তিনি অমন সোনার সংসার ছেড়ে এসেছিলেন।

গ্রামটার নাম আনন্দময়ী। কে দিয়েছিল এমন নাম কে জানে। সন্ন্যেসী মা বলেন, এখানে এসে তিনি সত্যি আনন্দময়ীর কোলে শুয়েছেন। আর কেন জানি উঠতে ইচ্ছে করেনা। আর মন চায়না আনন্দময়ীকে ছেড়ে যেতে। দেখতে দেখতে সন্ন্যেসী মায়ের অনেক ভক্ত শিষ্য হ'য়ে গেল। চার দিনে গুণ মুগ্ধ মানুষের ভীড়।

ঠিক এমনি করে—বছর ছ'য়েক অবস্থানের পর—এক-দিন খুব অপরিচিত একজন লোক এসে একটা ছোট্ট চিরকুট মায়ের হাতে দিল। সে সময়—সন্ধ্যারতীর পর—প্রার্থনা সভা বসেছে দেবালয় প্রাঙ্গণে। মানুষের ভিড়। একটি শুচি শুভ্র মূহূর্ত। হঠাৎ মা পাগলের মত আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন চিরকুট পড়ে।

কি এক ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইলেন—লোকটার মুখের দিকে। লোকটা ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিল। আস্তে করে শুধু বললো—জবাব যদি কিছু দেন তো—দিতে পারেন। 'সন্ন্যেসী মা' কিছু না বলে ধীর পায়ে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। সভাস্থ মানুষ সব বিস্মিত।

লোকটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর, সেও চলে গেল—কোন জবাব না পেয়ে। সেই রাতেই সমাধিস্থ হবার আগে সন্ন্যেসী মা, তাঁর প্রধানা প্রিয়তমা শিষ্যা—যোগবতীকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিভৃত ঘরে। রাত তখন প্রথম প্রহর। আনন্দময়ী গ্রামখানা তখন থম থমে। বোবা ভয়ে যেন সে রাতটা কাঁপছে। মা' তাঁর শ্বেত পদ্মের মত একখানি হাত বাড়িয়ে—সেই চিরকুটটা দিলেন যোগবতীকে পড়তে। পিদিমের আলোয়—সমস্ত ঘরখানা স্পষ্টালোকিত ছিলনা। যেখানে আলোর উজ্জলতা, সেখানে যোগবতী চিরকুট মেলে ধরলো।

অনুসূয়া,

ভেবেছো তুমি আত্মগোপন করে থেকে আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে, আমি আজ সব জেনেছি! আমাকে কে পাগল করেছিল। ভেবেছিলে, উন্মাদ আশ্রম থেকে আর কোনদিনই আমি ভাল হয়ে ফিরবোনা। ফিরেছি। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আগের মানুষের মত। আমার স্মৃতি-শক্তি বরং আরো প্রখর হয়েছে। মনে পড়ে অনু, দীর্ঘ ছ' বছর আগে, আমি জ্বরের ঘোরে বিছানায় পড়ে কাত-রাচ্ছিলাম। তখন আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম—জল। তুমি তক্ষুনি কি একটা ঘোলাটে রঙের জল এনে দিলে। আমি খেতে গিয়ে চমকে উঠলাম। বললাম, এ' রকম কেন? এ' আমি খাবনা। জলটা পালটে দাও। তখন তুমি বললে—খেয়ে নাও। তোমার মাথায় যন্ত্রণার একটা অসুধ মিশিয়ে দিয়েছি। আমার বাপের বাড়ীর দেশের সেই বেদেনী এসেছিল। তাকে বলতে সে একটা শেকড় দিয়ে গেল। জানালো এটা বেটে জলের সংগে খাওয়ালে মাথার অসুখ চিরদিনের মত সেরে যাবে।

নিরুপায় আমি তখন, মাথার কষ্টও সে সময় হচ্ছিল। তোমার কথায় বড় বিশ্বাসে সেজন্য আমি খেয়েছিলাম। দিন দুয়েক ধরে—সারা শরীরে আমি অস্থিরতা অনুভব করি। মাথার কষ্ট আরো অনেক বাড়লো তারপর···তারপর আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম। আমাকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়েছিল—আমার মা। তুমি সে কাজে অনেকবার বাধা দিয়েছিলে। তুমি চেয়েছিলে আমি পাগল হয়ে থাকি চিরকাল। আর তোমার প্রেমের অভিসার দিনের পর দিন চলুক। কিন্তু আমাকে যখন আমার মা জোর করে পাঠিয়ে দিল--তখনই তুমি আত্মগোপনের চেষ্টা করেছিল। সন্ন্যাসী হওয়ার ছদ্মবেশ ধারণ করে—এই ভয়ঙ্কর পাপ থেকে সরে থাকতে চেয়েছিলে—নির্দোষ সেজে। আজ আর তোমার ক্ষমা নেই। এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি চলে আসবে—রায় লজে। নইলে, পরিণাম কল্পনাও করতে পারবেনা।

তোমার স্বামী প্রদ্যোত রায়।

চিঠি পড়ে যোগবতী, বিস্মিত চেখে চেয়ে রইল—সন্ন্যেসী মায়ের দিকে। দীপালোক নিভে আসছিল। আনন্দময়ী গ্রামে রাত্রি· আরো অন্ধকারে ঘনিয়ে উঠলো। নদীতীরের বাতাস এলো ছুটে। কিছুক্ষণ আত্মস্থ থাকবার পর মা সুরু করলেন।

"যোগবতী, তুই আমার প্রিয় শিষ্যা। আজ আমার বিদায় রাত্রি। কিন্তু জীবনের অনেক বিদায় বেলার বিষণ্ণ কাহিনী তোকে আজ বলে যাব। শেষ হলে তুই চলে যাবি। তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে—নরহরি। এই রাত্রি পথ দুর্গম হলেও—তোকে ফিরে যেতে হবে। তোকে আজ বলে যাই—এক সন্ন্যেসী মায়ের গল্প। আর যদি পৃথিবী ছাড়ি, তবে এই দেবালয় দেউড়ীর সন্নিকটে—সমাধিস্থ করিস আমাকে। কালী মায়ের সহস্র নামের অঞ্জলি দিস। বলে মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যোগবতী স্তব্ধ। দিশাহারা এক রাত্রি যেন ঘুমন্ত শিশুর মত চমকে উঠলো। পার্শ্বস্থ কক্ষে—দেবী বিগ্রহের জাগ্রত মূর্তি! সামনে সমাসীন সন্ন্যেসী মা।

কে যেন জীবনের দূর পরপার থেকে বলে যাচ্ছিল—"দীর্ঘ ছ' বছর আমার সাধের সংসার ছেড়ে এই আনন্দময়ীর কোলে ফিরে এসেছি। আবার আমায় ছেড়ে যেতে হবে। যাবার আগে বলি, 'রায় লজ' সেই বাড়ীর একমাত্র বধূ আমি। রূপের জন্য—অর্থশালী প্রদ্যোত রায় আমোকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়ের পর, আমার এই রূপই অভিশাপ হয়ে দাঁড়ালো। চরিত্রহীন মত্তপ প্রদ্যোত রায়—নিজের দোষ স্খালনের জন্য প্রতি মুহূর্তে আমাকে সন্দেহ ক'তো। বাড়ীতে একটা চাকরও থাকতে পারতনা। যে কোন পুরুষ বাড়ীতে এলে আমার উপর নির্দয় অত্যাচার করতো। বলতো—সবাই আমার গোপন প্রেমের প্রেমাস্পদ। বাপের বাড়ী থেকে আমার মামা কাকা—বা ওই সম্পর্কের কেউই আসতে চাইতোনা। স্বামী সকলকে অপমানিত করেছে। তাতেও নিষ্কৃতি হয়নি, আমাকে একদিন বন্ধ ঘরে পুরে দিল। বাইরে থেকে দরজায় তালা পড়লো। এমন কি আমাকে খেতে দিতে আসতো পর্যন্ত স্বামী। পাছে অন্য কেউ এলে যদি আমি গোপনে কিছু করি!

এই সব সন্দেহের কোন যুক্তি ছিলনা। বলতো—'আমার রূপ, হ্যাঁ এই রূপই নাকি—সর্বনেশে। একদিন কেঁদে বললাম—দাওনা তবে আমার মুখখানা পুড়িয়ে। সবই তো পুড়িয়ে দিচ্ছো। জ্বলে যাচ্ছে আমার সব শরীর মন। তবে, ওই একটা মুখ রেখে কি লাভ!

এ কথায় সে বলেছিল, এ' মুখ আমার! আমারই সম্পদ! আমি নষ্ট হতে দেবনা। অন্য কারো অভিপ্রায় আমি নির্মূল করবো। আর এই আলো বাতাসহীন কক্ষে তোমাকে আজীবন বন্দী-জীবন যাপন করতে হবে। শুধু··· রাত্রে··· যখন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ঘুমিয়ে পড়বে কাউকে তুমি দেখতে পাবেনা শুধু আমাকে ছাড়া—তখনই তুমি আমার শয্যাসঙ্গিনী হবে।

চীৎকার করে একদিন কেঁদে উঠি—বলি—আমাকে মেরে ফেলো, আমাকে খুন কর তুমি, এর চেয়ে অনেক ভাল। আমার কাতর আর্তনাদ শুনে সে ছুটে এলো—বদ্ধ মাতাল অবস্থায়। কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে দিয়ে গেল। ঘরে যে দুটো জানলা খোলা থাকতো সে দুটোও একদিন বন্ধ করে দিয়ে গেল। পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন আমার চোখের ওপর থেকে মুছে গেল। চির অন্ধকারে—দাঁড়িয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম।

তার মধ্যেই, আমি সব টের পেতাম। বাড়ীর

দাসীরা পর্যন্ত প্রদ্যোত রায়ের ব্যভিচার থেকে মুক্তি পেতনা। বাড়ীর বাইরে—বাঈজীদের উৎসবখানা থেকেও সে কোন কোনদিন গভীর রাত্রে ফিরতো। আর কোন কোনদিন দুপুরেও দাসীদের কান্না শুনতাম। তার মধ্যে অনেকে পালিয়ে গিয়েছিল 'রায় লজ' থেকে। নতুন যারা আসতো—তারা জানতনা—এটা মরণকূপ! এই মরণকূপেই একদিন ঝাঁপ দিয়ে বড় অসহায় হ'য়ে পড়েছিল —প্রদ্যোত রায়ের এক নিজস্ব দাসী। প্রৌঢ়া বয়সী বিধবা সারদা জানত না—কি ভয়ঙ্কর অভিশাপ তার জীবনে নেবে আসবে। যেদিন সে জানতে পারলো— এক অবাঞ্ছিত সন্তানের মা হতে চলেছে—সেদিন আর্তনাদ করে কেঁদে পড়েছিল প্রদ্যোত রায়ের পায়ে।

মনিব তাকে মরবার নির্দেশ দিল। অসহায় নারী তাতেই রাজি হোল। কিন্তু কি ভাবে সে মরবে? প্রদ্যোত রায় নিজে হাতেই তার মৃত্যুর আয়োজন করলো। একটা ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে কড়িকাঠ দেখিয়ে দিল। বললো ওই সিলিংএ দড়ি আটকে গলায় দিতে হবে। তবে প্রদ্যোত রায় নিজে হাতেই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

মনিব নিজ হাতেই দাসীর মৃত্যুর আয়োজন করেছিল। তবু মরবার আগে কার যেন অন্তরভেদী কান্না শুনেছিলাম। মৃত্যু প্রতীক্ষিতার শেষ একটি কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম—"আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, তবু আমায় যেতে হচ্ছে…। ও বাবু আমাকে কি তুমি বাঁচাতে পারনা?"

আমি যে ঘরে বন্দী ছিলাম, ঠিক তার পাশের ঘরে এই কাণ্ড চলছিল। পরের দিন ভোরে—সমস্ত মানুষের কাছে মিথ্যে প্রচার হোল, 'দাসীটা' আত্মহত্যা করেছে। কোথা থেকে কি করে এসেছে—তারই এই ফল। পুলিশ এলো। তদন্ত হোল। তবু, এ নরহত্যাকারী প্রদ্যোত রায় বে-কসুর খালাস পেল। এর পরেও, একজন চরিত্রহীন অত্যাচারীর জীবনে নানা ঘটনা ছিল। অভিশপ্ত 'রায় লজে' দিনের পর দিন এক মৃত্যুভীত কান্না শুনেছি।

সেই অন্ধকার বন্দীখানায় থেকে পর পর দু'টি সন্তানের মা হ'লাম। মনে হয়েছিল শয়তানের অভিশপ্ত বংশ বাড়ছে। আর নয়। আর আমি এ হ'তে দেবনা। এই অভিশপ্ত বংশবৃদ্ধি হতে দেবনা। শুধু তাই নয়। স্বামীকেও সরাতে হবে এ পৃথিবী থেকে। যেমন সে প্রতিটি মানুষকে —পৃথিবীর আলো বাতাস নিতে দেয়নি। কিন্তু কি করেই বা এই সঙ্কল্প পালন সম্ভব?

আকুল হয়ে উঠেছিলাম, 'অত্যাচারী' বিনাশের জন্য। ঈশ্বর বোধহয় শুনেছিলেন—আমার সঙ্কল্প। তাই অপ্রত্যাশিত ভাবেই সুযোগ এসে গেল আমার। বন্দীত্ব আমার ঘুচলো। আরামবাগে আমার এক দেওরের কাছে থাকতো শাশুড়ি। তিনি হঠাৎ চলে এলেন— বড় ছেলে অর্থাৎ প্রদ্যোত রায়ের কাছে থাকবেন বলে। তিনি আসার পরই—সহসা আমার বন্ধন ঘুচলো। বোধহয় প্রদ্যোত রায়—তার মায়ের কাছে ভাল মানুষ সেজে থাকতে চেয়েছিল কিংবা অন্দরের অভিশপ্ত কান্নার সাক্ষী এসে পড়েছিল বলে। আমি অন্ধকার ঘর থেকে—বাইরের আলোয় এলাম। আঃ কতদিন পর—এ জগতের আলো বাতাস দেখলাম। আমার ছেলে দু'টোকে দু'জন দাসী মানুষ করতো। মায়ের বুকের দুধ টুকুও, তাদের খেতে দেওয়া হয়নি। প্রদ্যোত রায় দাসীদের হুঁসিয়ার করেছিল এই বলে ছেলে দুটোকে যেন কোন দিন তাদের মা না চিনতে পারে। এটা আর কিছু নয়। এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারীর কারণহীন উল্লাস।

তাই বাইরে এসে দেখলাম দু'টো ছেলেকে। দু' তিন বছর বয়স ওদের। সত্যি ওদের চিনতে পারিনা। ওরা আমাকে একবারও মা বলে ডাকলেনা। কাছে টানতে গেলাম, কোলে নিতে গিয়ে সভয়ে সরে এলাম— ওরা আমাকে দেখে যেন ভয় পাচ্ছে। ভয় হোল আমারও মনে হোল ওরাও আমার নয়। আমিও ওদের নই। নিষ্ঠুর সেই অত্যাচারী, আমাদের চিরদিনের জন্য আলাদা করে দিয়েছে।

এর পরই, মনটা আরো মরীয়া হ'য়ে উঠলো। আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ধীরে ধীরে প্রতিশোধ পরায়ণা হ'য়ে উঠছিলাম। একটা খুনের নেশাই চেপেছিল মাথায়। আশ্চর্য, তবু খুন করতে পারিনি—তাকে। হাতের কাছে খুন করার অস্ত্র যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পারলামনা। চিন্তা করলাম—খুন ছাড়াও—তার পশুত্বকে চিরদিনের জন্য কি করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়?

অনেক ভেবে ঠিক করলাম, ওকে পাগল করে দিতে

হবে। মানে তার সর্বনাশা উল্লাসকে—চেতনাহীন করে তোলা। ধীরে ধীরে—এই কাজে দৃঢ় সংকল্প হ'য়ে উঠলাম। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ীর দেশ থেকে একজন বেদিনী আসতো। একদিন তাকে চিনতাম। ছেলেবেলা থেকে তার সংগে ভাব। অভাবে পড়ে—গয়া বেদিনী শহরে বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করাই তখন কাজ। একদিন 'রায় লজে' ভিক্ষে করতে এসে, আমার সংগে দেখা হ'য়ে গেল। আবার সেই চেনা শোনার পুরোন পরিচয় নতুন করে ফিরে আসে। তার পরে গয়া প্রায়ই আসতো আমাদের বাড়ী।

এক সময় শুনেছিলাম, ওর আশ্চার্য ক্ষমতা। যে কোন মানুষের ও' মন্দ করতে পারে। তার প্রত্যক্ষ ফল অনেক আমরা জানতাম। একদিন ওকে দিন দুপুরে—দেখলেও মানুষে ভয় পেতো। ওর দেওয়া অনেক মন্ত্র পড়া শেকড় আশ্চর্যজনক কাজ করতো। অনেকে শত্রু নাশ করবার তার জন্য শরণাপন্ন হোত।

তারপর? একদিন আমাকেও তাই করতে হোল। যেদিন আবার এলো গয়া, সেদিনই ওকে চুপি চুপি বললাম—আসল ব্যাপার। গয়া রাজি হয়। বিনিময়ে তাকে সোনার হার দোব বলেছিলাম—যদি কাজটা সফল হয়।

সে কাজ আমার সফল হয়েছিল। গয়ার দেওয়া শেকড়—বেটে জলে গুলে খাইয়ে দিয়েছিলাম—স্বামীকে। তারপরের ঘটনা—এই চিঠিটা। ভেবেছিলাম, সত্যিই অত্যাচারী প্রদ্যোত রায় আর কোন দিনই ভাল হয়ে উঠবেনা। আবার মাথা তুলে দাঁড়াবেনা, সেই পশুটা। তবে আর, তাকে বিনষ্ট করবার শক্তি আমার নেই। আমি পরাজিত যোগবতী। আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ, নিষ্ফল! কাজেই এখান থেকে আর কোথাও আমি চলে যাবার চেষ্টা করি। যাতে আর কোন দিনও না সেই ভয়ঙ্কর পশুটা আমাকে তাড়া করে।"

চুপ করলেন সন্ন্যাসী মা। রাত প্রায় মধ্য প্রহর। দেবালয়ের—নরহরি গেল—যোগবতীকে পৌছে দিতে—গ্রামস্থ কুটিরে। একটা ঝড়ো বাতাসে উদ্বেগ হয়ে ওঠা রাত ফুরিয়ে আসছিল...।

আনন্দময়ী গ্রামের সে রাত শেষ হয়েছিল। সেই মধ্যে রাতেই সন্ন্যাসী মা সমাধিস্থ হয়েছিলেন। যখন রাত শেষ হোল, ভোরে পাখীর ডাক শোনা গেল, শিউলি তলায় ঝরে পরেছিল—অনেক ফুল তখনই সবাই ছুটে এসেছিল—দেবালয়ে।

সমাধিতেই—মা দেহ ত্যাগ করেছেন। চির মৌন সেই ধ্যান আর ভাঙেনি।

আনন্দময়ী গ্রামের সেই সন্ন্যাসী মাইয়ের গল্প—আমার এক পাতানো ঠাকুমা বলেছিল। যোগবতী তার মা। সে যেন কতকাল আগের কথা। শুনেছি, আজও আছে কালী আশ্রম, আজও নাকি আনন্দময়ীর কোলে—শুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে—সেই সন্ন্যাসী মা।

সেই মা'য়ের চির সমাধির দিনটি প্রতি বছরে ফিরে এলে বেশ ঘটা করে—আজও স্মরণোৎসব হয়। ইচ্ছে আছে—এই দিনে, একদিন আনন্দময়ীর কাছে যাব।

সুপর্ণা দেবী

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে রূপচর্চ্চার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে সোনা, রূপা, তামা, পিতল প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু-নির্মিত এবং বিবিধ রঙীন-বহুমূল্য রত্ন-মণি-মাণিক্যখচিত সুদৃশ্য-মনোরম বিচিত্র-সৌখিন ছাঁদের নানারকম অলঙ্কার-ধারণের রীতি যে বহুল-প্রচলিত ছিল, সেকালের কাব্য-সাহিত্য-ভাস্কর্য্য-চিত্রকলায় তার প্রচুর নিদর্শন মেলে। নর-নারী নির্বিশেষে পুরাকালে নানাবিধ অলঙ্কার-ধারণের বিশেষ রেওয়াজ এবং যথেষ্ট সমাদরও ছিল। একালে ভারতবর্ষে—পুরুষের অলঙ্কার ধারণের রীতি লুপ্তপ্রায় হলেও, এদেশী মহিলা-সমাজে অবশ্য এখনও অলঙ্কার-প্রিয়তার অভাব ঘটেনি। সেকালের ভারতীয় সমাজে

মেখলা ও নূপুর ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল অলঙ্কারই পুরুষেরা পরম আগ্রহ-সমাদরে ধারণ করতেন। তাছাড়া পুরাকালের সৌখিন-পুরুষেরা 'শৃঙ্খল' নামে এক ধরণের বিচিত্র-অভিনব 'কোমরবন্ধনী' (Belt) বা 'কটিবন্ধনালঙ্কার' ব্যবহার করতেন—প্রাচীন ইতিহাসে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন যুগে মহিলারা কোনো রকম 'নাসালঙ্কার' ব্যবহার করতেন কিনা, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট হদিশ মেলে না। পুরাণে সর্ব্বাঙ্গের বিবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু নাসালঙ্কারের কোনো বর্ণনা নেই। এমন কি, প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ 'অমরকোষেও' নাসালঙ্কারের কোনোই উল্লেখ মেলে না। কাজেই ধারণা হয় যে সম্ভবতঃ আমাদের দেশে মুসলমান শাসন-সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজে নথ, নোলক ও বেসর প্রভৃতি নাসালঙ্কারের আবির্ভাব এবং বহুল-প্রচলন হয়েছে। সুপ্রাচীন-আমলের কথা ছেড়ে দিয়ে, তদ্বোক্ত-কালের কথায় উপস্থিত হলে সুস্পষ্ট-পরিচয় পাওয়া যায় যে তৎকালীন সৌখিন-সমাজে অন্যান্য আভরণের মধ্যে নাসালঙ্কারেরও সবিশেষ উল্লেখ রয়েছে। তবে মুসলমান শাসকদের রাজত্বকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব বিদেশী পরিব্রাজক ভারত-দর্শনে এসেছিলেন, তাঁদের অন্যতম পাশ্চাত্যের খৃষ্টান-ধর্ম্মযাজক সুপণ্ডিত এ্যাবি ডুবোয়া দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত নানারকম বিচিত্র-অভিনব নাসালঙ্কারের উল্লেখ করেছেন।

নাসালঙ্কার ছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সমাজে অন্যান্য নানাধরণের সুদৃশ্য-মনোরম যে সব অলঙ্কারাদির বহুল প্রচলন ও সমাদর ছিল, সেকালের বিবিধ পুঁথি-পত্রে তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। ভারতের সুবিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ 'অমরকোষে' তৎকালীন সমাজে ব্যবহৃত যে সব অলঙ্কারাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকাদের অবগতির উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গক্রমে তার একটি মোটামুটি তালিকা নীচে প্রকাশিত হলো।

১। মুকুট, কিরীট প্রভৃতি মস্তক-ভূষণের উপযোগী অলঙ্কারাদি ;

২। চূড়ামণি, শিরোরত্ন প্রভৃতি মস্তক-ভূষণ উপযোগী অলঙ্কার ;

৩। তরল—শিরোভূষণোপযোগী হারের মধ্যস্থিত মণিযুক্ত অলঙ্কার ;

৪। বালপাশ্যা, পারিতথ্যা প্রভৃতি 'ঝাঁপটা'-জাতীয় মস্তক-ভূষণের উপযোগী অলঙ্কার ;

৫। পত্রপাশ্যা, ললাটিকা প্রভৃতি 'সিঁথী'-জাতীয় ললাট-ভূষণের উপযোগী অলঙ্কার ;

৬। কর্ণিকা, তালপত্র বা তরপত প্রভৃতি 'কানবালা'-জাতীয় অলঙ্কার ;

৭। কুণ্ডল, কর্ণবেষ্টন প্রভৃতি কর্ণ-ভূষণের উপযোগী—অলঙ্কার ; (পাশ্চাত্য-পরিব্রাজক এ্যাবি ডুবোয়া তাঁর তথ্য-বিবরণে তৎকালীন দাক্ষিণাত্যে এই ধরণেরই ১।৮ প্রকার কর্ণভূষণের উল্লেখ করেছেন)।

৮। গ্রৈবেয়ক, কণ্ঠভূষা, কণ্ঠিকা প্রভৃতি গ্রীবা-ভূষণের উপযোগী অলঙ্কার ;

৯। লম্বন, লালন্তিকা প্রভৃতি 'কণ্ঠমালা'-জাতীয় অলঙ্কার ;

১০। প্রালম্বিকা (সোনার মালা), উরঃসূত্রিকা (মুক্তার মালা) প্রভৃতি কণ্ঠ-ভূষণের উপযোগী অলঙ্কার ;

১১। বলয়, কটক প্রভৃতি 'হাতের বালা'-জাতীয় অলঙ্কার ;

১২। কেয়ূর (হাতের তাড়, কঙ্কণ (হাতের কাঁকন) প্রভৃতি হস্ত-ভূষণের উপযোগী অলঙ্কার ;

১৩। অঙ্গুরীয়ক, ঊর্ম্মিক', অঙ্গুলিমুদ্রা (অক্ষরযুক্ত আঙটি) প্রভৃতি 'আঙটি' জাতীয় অলঙ্কার ;

১৪। শৃঙ্খল প্রভৃতি পুরুষের কটি-ভূষণের উপযোগী অলঙ্কার ;

১৫। মেখলা, কাঞ্চী, সপ্তকী, সারস প্রভৃতি 'গোট', 'চন্দ্রহার' জাতীয় স্ত্রী-কটি ভূষণের উপযোগী অলঙ্কার ;

১৬। মঞ্জীর, নূপুর, ক্ষুদ্রঘণ্টিকা প্রভৃতি স্ত্রী-পদ-ভূষণের উপযোগী 'মল', 'পাইজোর' জাতীয় পাদালঙ্কার ;

উপরোক্ত অলঙ্কারাদি ছাড়াও, প্রাচীন 'অমরকোষ' গ্রন্থে বিবিধ ধরণের যে সব হার বা মালিকা ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলির অন্যতম হ'লে—'একাবলী' অর্থাৎ 'এক-নরী হার', 'নক্ষত্রমালা' বা 'সাতাশ-নরী হার', 'দেবচ্ছন্দ' ও 'শতযষ্টিক' বা 'শত-নরী হার'।

স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ, এখানেই আলোচনা মুলতুবী রাখতে হলো। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরো কিছু হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

(ক্রমশঃ)

আবার চীনা আক্রমণ—

গত ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ভারতের উত্তর সীমান্তে হিমালয়ের উপর ১৩০০০ হাজার ফিট উচ্চে নাথুলা নামক স্থানে চীনা সৈন্যেরা রাইফেল ও মেসিন গান দিয়া ভারতীয় ঘাঁটি আক্রমণ করে। পরে তাহারা মর্টার আক্রমণ করিতে থাকে। অবশ্য ভারতীয় সৈন্যেরা তখনই বাধা দিতে থাকে। দুই তিন দিন ধরিয়া প্রচণ্ড আক্রমণের পর যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু দুইদিনে উভয় পক্ষেরই বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

ভারত শুধু বাধা দিয়াছে মাত্র কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করে নাই। তাহারা চীনা দূতাবাসের মারফৎ আক্রমণের প্রতিবাদ জানাইয়াছে। নাথুলা নামক স্থানে একটি যাতায়াতের সরু পথ আছে। সেই পথের দুই ধারে পাহাড়ের উপর সৈন্য সমাবেশ করিয়া চীনারা আক্রমণ করিয়া থাকে। চীনা সৈন্যেরা সমগ্র তিব্বত অধিকার করিবার পর বহু স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া বসিয়া আছে। সুবিধা পাইলেই তাহারা ভারতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার চেষ্টা করে। চীন বর্ত্তমানে অসাধারণ ক্ষমতাশালী একদিকে রাশিয়ার সহিত আর একদিকে জাপানের সহিত সে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণে ভারতের প্রতিও তাহার লোভ আছে। কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় চীন শান্তি স্থাপন করিতে চায়না।

সম্প্রতি ভারতের উপ প্রধান মন্ত্রী শ্রীদেশাই আমেরিকায় যাইয়া এবিষয়ে মার্কিণ প্রেসিডেন্টের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু চীন পাল্টা আক্রমণ না করিলে সে কিছুতেই শান্ত হইবে না। চীনকে আক্রমণ করিবার শক্তি ভারতের থাকিলেও সে বিষয়ে রুশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতির সাহায্য না পাইলে ভারত আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না, এ অবস্থায় চিরদিন ভারতের উত্তর সীমান্তে পাকিস্থান ও চীনকে বাধা দিবার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সৈন্যদল রক্ষা করিতে হইবে। সম্প্রতি সিকিমের রাজা প্রায়তে আসিয়া ভারতে সহিত নানরূপ বন্ধুত্ব পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহাই চীনের বর্ত্তমান আক্রমনের কারণ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচাগলার পদত্যাগ—

সর্ব্বভারতীয় ভাষানীতি লইয়া দিল্লীর মন্ত্রীসভায় মতভেদের ফলে কেন্দ্রের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীএম, সি, চাগলা মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী ভারতে ১৭টি রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের নীতি স্বীকার করিলেও কেন্দ্রীয় ভাষারূপে ধীরে ধীরে হিন্দীকে জোড়দার করার পক্ষপাতী। নূতন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনও শ্রীমতী গান্ধীকে এবিষয়ে সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীচাগলা মনে করেন যে, যেহেতু ভারতের কয়েকটি রাজ্যে জোড় করিয়া হিন্দী ভাষা চালাইলে সেখানকার অধিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন সেই হেতু তিনি মন্ত্রীসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস মন্ত্রীসভার বাহিরে থাকিয়া এবিষয়ে আন্দোলন করিলে তাহা অধিক ফলদান করিবে।

সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সহিত পশ্চিমবঙ্গও শ্রীচাগলার এই নীতি সমর্থন করে। হিন্দী বলিয়া কোন ভাষা এখনও বিশেষ সমৃদ্ধ হয় নাই, তাছাড়া দুইশত বৎসরের অধিককাল আমরা যে ইংরাজী ভাষা অধিকার করিয়াছি তাহাকে সমগ্র পৃথিবীর যোগাযোগের ভাষা বলা যাইতে পারে। সেই ইংরাজীকে প্রধান স্থান হইতে হঠাইয়া সেই স্থানে হিন্দীকে বসাইলে ভারতের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক হইবে।

আমাদের মনে হয় মাত্র ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা

স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, আরও কমপক্ষে ২০ বৎসর অপেক্ষা করিয়া দেখা হউক, তখন যদি ইংরাজীর প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় তখন এবিষয়ে বিবেচনা করা হইবে। বিষয়টি লইয়া গত ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে দিল্লীতে একটি সর্ব্বভারতীয় সম্মেলন হইতেছে। সম্মেলনের ফলাফল যাহাই হউক না কেন উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজীকে মাধ্যম হিসাবে না রাখিলে কি করিয়া ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, উচ্চ বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব আজ পর্য্যন্ত আমরা তাহা ভাবিয়া পাইনা।

শ্রীচাগলা প্রবীন ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও ঐরূপ নানা উচ্চপদে কাজ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তির পরিচয় ভারতবর্ষ ১০ বৎসরে বহুবার পাইয়াছে। তিনি নিজে বারবার বলিয়াছেন যে, ভারতের সংহতি রক্ষার জন্য এমন একটি ভাষাকে সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতে হইবে যাহা সকলে মানিয়া লইবে।

তিনি ভারতীয় হিসাবে হিন্দী ভাষাকে ভালবাসেন। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের সংহতি নষ্ট করিয়া হিন্দীকে চালাইতে চান না। কেন যে ভাষা সমস্যা লইয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত শ্রীচাগলার মতভেদ দূর হয় নাই তাহা জানিনা। আমাদের বিশ্বাস এবিষয়ে একটা আপোষরফা হইবে এবং ভারত ভবিষ্যতে শ্রীচাগলার সেবা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনও এবিষয়ে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এবিষয়ে কোন মন্তব্য না করিয়া সকল চিন্তাশীল দেশবাসীকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

কাঁথিতে ভীষণ বন্যা—

মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। জেলাটিতে বহু নদী থাকায় প্রায় সকল মহকুমাতেই ধানের চাষ ভাল হইয়া থাকে। ঝাড়গ্রাম ও গড়বেতা উচ্চভূমিতে অবস্থিত হইলেও সেখানে অন্যান্য ফসল ভাল হয়। ২৪ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রের জল বৃদ্ধিতে মেদিনীপুরের একাংশ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এবার কাঁথি মহকুমায় নদীপথে সমুদ্রের জল ঢুকিয়া বহু স্থানে ফসল নষ্ট করিয়াছে এবং বহু লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। দীঘাতে সমুদ্রের ধারে নূতন শহর গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহারও আংশিক ক্ষতি হইয়াছে। একে তো সারা পশ্চিমবাংলায় খাদ্যাভাব, তাহার উপর কাঁথি মহকুমায় যে সকল স্থানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় সে সকল স্থানে ধান উৎপন্ন না হইলে সমগ্র দেশের দারুণ ক্ষতি হইবে।

কাঁথির নদী দিয়া জল ঢুকিয়া হুগলী জেলার আরামবাগ ও হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমাও ক্ষতি করিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার তমলুকবাসী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দুর্গতদিগকে সাহায্যদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন কিন্তু সমগ্র বাংলার এই বিপদে তিনি কাহাকে দেখিবেন ?

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপ অঞ্চলও নদীর জল বাড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহাই পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য।

বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব—

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রায় এই বৎসর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে পি-এইচ-ডি ডিগ্রি (Doctorat de troisieme cycle) লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয়বস্তু "বাংলাদেশে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য"। অধ্যাপকগণ তাঁহার গবেষণার বহু প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমতী রায় দিল্লী হইতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ১৯৬৩সাল হইতে ফরাসী সরকারের বৃত্তিকারী ছাত্রীরূপে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত—Ecole Pratiquedes Hantes Etudes নামক সংস্থায় গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

অনিবার্য্য কারণে এই সংখ্যার আকার কিছু ছোট হইল এবং কয়েকটি বিভাগ প্রকাশকরা সম্ভব হইল না। আগামী সংখ্যা হইতে আবার পূর্ব্ব-আকারে সব কয়টি বিভাগ সহ প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক

আগামী "আশ্বিন" (শারদীয়) সংখ্যায় লিখছেন ঃ---

প্রবন্ধ ও কবিতা ঃ---

ডঃ রমা চৌধুরী
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
" কুমুদরঞ্জন মল্লিক
" যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
" সুধীর গুপ্ত
" গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি

সঙ্গীত — স্বামী সত্যানন্দ

গল্প ঃ—

শ্রীদিলীপকুমার রায়
" পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য
" শক্তিপদ রাজগুরু
" সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
" মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
" হাসিরাশি দেবী
" প্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি

কার্টুন গল্প— শ্রীঅখিল নিয়োগী

নাটক— শ্রীমন্মথ রায়

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

শিল্পী : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

আশ্বিন—১৩৭৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
  বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
  বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥ ৩-
দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতেঃ
  নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
  উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥ ৩৪
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥ ৩৫

শ্রীশ্রীচণ্ডী নারায়ণীস্তুতি

বঙ্গের দুর্গোৎসব

শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী

মাতৃপূজা ভারতের চিরন্তন ধর্ম্ম। বাংলাদেশ এই ধর্ম্ম পালনে অগ্রণী। প্রাক চৈতন্য যুগে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চৈতন্য যুগে মহাপ্রভু স্বয়ং ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ প্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, যবন হরিদাস ও রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, ভট্ট রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ প্রমুখ ষড় গোস্বামী, আবার চৈতন্যোত্তর যুগে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু, চরণদাস বাবাজী, রামদাস বাবাজী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যগণের অধ্যাত্মসাধনায় সারা বাংলা দেশে যে প্রেম ধর্ম্মের প্লাবন বয়েছিল, শক্তিসাধনায়ও তেমনি নান্নুরের চণ্ডীদাস, মেহারের সাধক সর্বানন্দ, নদীয়ার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, তারাপীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপা, বর্দ্ধমানের সাধক কমলাকান্ত, হালিসহরের সাধক রামপ্রসাদ, চট্টলের সাধক ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য ও সাধু তারাচরণ পরমহংসদেব, ফরিদপুরের রামঠাকুর, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও অপরাপর মাতৃসাধকের অসামান্য তপশ্চর্যায় বঙ্গভূমি পবিত্র ও ধন্য হয়েছে।

কিন্তু বঙ্গের দুর্গোৎসব সকল বাঙ্গালীর নিজস্ব উৎসব। দেবী মহামায়ার আবাহন ও আরাধনায় বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এই উৎসবকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শারদোৎসব, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত এর নাম দিয়েছেন দুর্গোৎসব। এই উৎসবের দিনে বঙ্গভূমিতে অভূতপূর্ব আলোড়ন জাগে, অভিনব পুলকে দুলে ওঠে বাঙ্গালীর চিত্ত।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ও কালীবিলাস পুরাণে শরৎকালে দুর্গোৎসবের উল্লেখ থাকলেও শরৎ ঋতুতে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার উল্লেখ মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে নেই। কবে কোন শরতের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী ভগবতীর আরাধনা করেছিলেন কোন মহারথী সেই ইতিহাস ছায়াচ্ছন্ন। তবে একথা স্বীকার্য যে শরতেম বঙ্গভূমি উৎসব ও মাতৃপূজার পক্ষে প্রশস্ত। শরতের বাঙলার নিসর্গ শোভা অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়। শরতে বঙ্গমাতার অপরূপ নয়নাভিরাম শোভা দেখেই হয়তো বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাসের চিত্ত আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল। তাই শরৎ কালকেই মাতৃপূজার প্রকৃষ্ট সময় নির্দ্দিষ্ট করে তাঁর বাংলা রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধনের উপাখ্যানটি সংযোজিত করেছিলেন।

সত্যিই অভিনব বঙ্গভূমির শারদ রূপ। বর্ষণ-মুক্ত প্রকৃতি 'সদ্যস্নানসিক্ত বাসনা,' উদার নির্মেঘ আকাশ সৌর করোজ্জ্বল, যামিনী 'শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত, নদ নদী, খাল বিল সলিল-সিঞ্চিত পরিপূর্ণ, তটভূমি কাশ ফুলের শুভ্র হাস্যোজ্জ্বল শোভাময়। সবুজ শস্যক্ষেত্র, নব পত্রোদ্‌গমে বৃক্ষরাজি হরিদ্বর্ণ, দিকে দিকে সবুজের সমারোহ, গাছে গাছে দোয়েল কোয়েল শ্যামা পাপিয়ার কলগান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:—

> "পারেনা বহিতে নদী জলধার
> মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর,
>
> *　　*　　*
>
> ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,
> তোমার কানন-সভাতে।"

কবি নজরুল শরতের বঙ্গজননীর বন্দনা গান গেয়েছেন—

> "গন্ধে আকুল শেফালিকা, বকুল মুকুল করছে নতি,
> নীপের বনে গোল বেঁধেছে, হচ্ছে মা তোর
> পুষ্পারতি।
>
> *　　*　　*
>
> বাদল মেঘের সজল হাওয়ায় নদীর বুকে ঢেউ
> খেলে যায়
>
> দোয়েল শ্যামা ডাক দিল তাই
> শ্যামল সেজেছে ধরণী।"

মাঠে ও সরোবরে অজস্র অস্ফুট শ্বেত রক্তকুমুদ ও শতদল। টগর, কেতকী, মল্লিকা, জবা, শেফালিকা, স্থলপদ্ম, সূর্য্যমুখী গোলন চাঁপা, সুবর্ণ পর্কটি ও নানা বর্ণের কুসুম শোভায় বৃক্ষরাজি সুশোভিত। ঋষি বঙ্কিমের বঙ্গ ভূমি শরতে 'ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনী''—আবার কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মভূমি সর্ব ঋতুতে 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা।' প্রকৃতি যেন তার অফুরন্ত সৌন্দর্য-সম্ভার উজার করে দিয়ে সযত্নে সাজিয়েছেন বাংলা মাকে। শরতের বাতাসে হিমের স্নিগ্ধ পরশ। কৃষকের ঘরে ঘরে শস্য সম্ভার, প্রবাসীর মনে মনে মায়ের কোলে ফিরে আসার সম্মোহন স্বপ্ন।

এমনি মধুর পরিবেশ আসে শারদীয়া মাতৃপূজার পুণ্য মহালগ্ন।

পাঁচশো বছর আগে বাংলার অন্যতম বার ভুঁইয়া তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাঙ্গলায় প্রথম শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। একই বৎসরে উত্তরবঙ্গের কুসুম্বি ও প্রতাপ-বাজু পরগণার প্রবল পরাক্রান্ত ভূস্বামী রাজা জগৎ নারায়ন নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাসন্তী দুর্গোৎসব সম্পন্ন করেন।

তারপর থেকে পাঁচশো বছর ধরে বঙ্গ ভূমিতে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শুধু ধনীর পূজা মণ্ডপেই মাতৃপূজার আরাধনা হতো। তাঁদের পূজা মণ্ডপে দীন দরিদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁদের পূজা ছিল ধনীর বিলাস। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাঙ্গালিনী' কবিতায় এই পূজার চিত্র তুলে ধরেছেন।

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে,
হের ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে।"

পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাড়ম্বরে, ধনীর সন্তানেরা দামী পোষাক পরে ঠাকুর দেখছে, আর ছিন্ন বাসনা কাঙ্গালিনী মেয়েটি তার ছোট ভায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ম্লান মুখ। মাতৃ সন্দর্শনের জন্য তার চিত্ত আকুল উদ্বেল, কিন্তু ধনীর আনন্দ যজ্ঞে তার অধিকার কোথায়, তাই সে দাঁড়িয়ে "নিতান্ত সংকোচভরে একধারে আছে সরে।"

তার অসহায় অবস্থায় করুণা-বিগলিত-চিত্ত কবি মন্তব্য করেছেন :—

"মাতৃহারা মা যদি না পায়, তবে আজ কিসের উৎসব?

*   *   *

ভরে মিছে সহকার-শাখা
ভরে মিছে মঙ্গল কলস।"

মাতৃপূজায় ধনী নির্ধন সকলের সমান অধিকার। সকলেই যেন মাতৃপূজায় সমান অংশ নিতে পারে। তাই তিনি দেশবাসীকে সম্মিলিত আহ্বান জানিয়েছেন :—

"মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ নীরে।"

সকলের স্পর্শে পবিত্র হবে মঙ্গল ঘট, মাতৃ অভিষেক সকলের সক্রিয় অংশ গ্রহণেই হবে সার্থক।

মানব দরদী কবিগুরুর এই আবেদনে আজ সাড়া দিয়েছে দেশবাসী। পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে আজ সার্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাতৃমন্দিরের দ্বার আজ সকলের জন্য উন্মোচিত হয়েছে।

মাতৃপূজার দিন আসন্ন। সকলেই আগ্রহে প্রতীক্ষমাণ। মায়ের সন্তানেরা আয়োজনে ব্যস্ত। মুখর হয়েছে সারা দেশ। দোকানে দোকানে নব বস্ত্রাদি কেনা বেচার ধুম পড়েছে। স্থানে স্থানে মাতৃপূজার মণ্ডপ তৈরী হচ্ছে। বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র ও পত্র পুষ্পে আচ্ছাদিত হলো পূজা মণ্ডপ। তোরণ দ্বারে রোপিত হলো কদলী বৃক্ষ, আম্র পল্লব শোভিত মঙ্গল ঘট স্থাপিত হলো।

এলো মহাষষ্ঠী। আগমনী গানের সুর ভেসে আসতে লাগলো বাতাসে দূর দিগন্ত হতে। জননীর অস্ফুট পদধ্বনি শোনা গেল পাখীর কূজনে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, নির্ঝরিনীর কলতানে, নদীর কুলুনাদে, বৃক্ষপত্রের মৃদু মর্মর ধ্বনিতে।

মা এলেন। বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠ বিহারিণী মহিষাসুর-মর্দিনী, দশ প্রহরণ ধারিণী জগজ্জননী রূপে। দশদিক উদ্ভাসিত হলো মায়ের রূপচ্ছটায়। বাঙ্গালী-প্রাণের সুস্পষ্ট অভি-ব্যক্তি রূপে মা কন্যারূপেও আবির্ভূতা হলেন সন্তানের গৃহে। সঙ্গে নিয়ে এলেন সর্বত্যাগী পতি বৃষভবাহন মঙ্গল-ময় শিবকে। এলেন সিদ্ধি ঋদ্ধি বিদ্যা ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক গণদেবতা মূষিক-বাহন সিদ্ধিদাতা গণেশ, কমলা কমলদল বিহারিণী, পেচক-বাহিনী লক্ষ্মীদেবী, শ্বেত-মরাল-বাহিনী, শুভ্র-কমলাসীনা বীণাপাণি বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী

ও ময়ূর-বাহন দেবসেনাপতি শক্তিরূপী কার্তিকের দেবী মহামায়ার পুত্র কন্যা। ভক্ত সন্তানগণ গাইলো "শংখে শংখে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে"। পুরাঙ্গনাগণ শংখ ও হুলুধ্বনিতে স্বাগত জানালো, বরণ করলো জননীকে।

নবপত্রিকার দ্বারা কলা বউ সাজানো হলো, মঙ্গলবেদী রচিত হলো, স্থাপিত হলো মঙ্গল ঘট। মাতৃ পূজার শুভ উদ্বোধন হলো।

ষষ্ঠীর নিশি না পোহাইতে নহবৎ বাজলো, সপ্তমীর ভোরে সানাই গেয়ে উঠলো, সুরময় হলো ভোরের বাতাস। স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিহিত পুরোহিত এলেন। সমবেত হলো নামাবলী আচ্ছাদিত দেহ স্নানশুদ্ধ বৃদ্ধের দল।

সর্বজনহিতায় সর্বজনসুখায় চ সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য সংকল্প করলেন পুরোহিত। ভক্তি গদ-গদ চিত্তে চণ্ডীপাঠ শুনতে লাগলেন ধর্মপ্রাণ বয়োজ্যেষ্ঠেরা—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

চারদিক আনন্দ কলরবে মুখর করে ছুটে এলো শিশুর দল। পূজার দীপ জ্বললো। ধূপের সুরভিতে আমোদিত হলো মণ্ডপ। ঢাক ঢোলের নাদে মুখরিত হলো পূজাঙ্গন, ভক্তিরসে পরিপ্লুত হলো সকলের অন্তর, সমাপ্ত হলো প্রথম দিনের পূজা। ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন সকলে কৃতাঞ্জলি-পুটে মায়ের চরণে নিবেদন করলে ভক্তি অর্ঘ্য। হিংসা বিদ্বেষ ভাব দূরে গেল, প্রেম, ভক্তি ভালবাসা অন্তরে অন্তরে জেগে উঠল যুগপৎ। সাত্ত্বিক ভাবের কাছে পরাজয় স্বীকার করলো তামসিক ভাবরাজি। সার্বজনীন ভ্রাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হলো সকলের চিত্ত। তরুণেরা মহাউল্লাসে ও উৎসাহে শব্দ বিস্তারক যন্ত্রের সাহায্যে সঙ্গীত ও হাস্যকৌতুক পরিবেশন করলো সারাদিন। সন্ধ্যায় বেজে উঠলো মঙ্গলারতির বাদ্য। আলোয় আলোয় ঝলমল করতে লাগলো পূজা মণ্ডপ। রাজপথ জনসমুদ্রে পরিণত হলো। মণ্ডপে মণ্ডপে আনন্দের হাট বসলো। কাতারে কাতারে দর্শনার্থী চললো রাজপথ বেয়ে যেন এসেছে সকলের ঘরের বাইরে এসে আনন্দযজ্ঞে যোগদানের দিন। কুলললনারাও বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে মাতৃবন্দনায় যোগ দিলেন।

এমনি করে মহাসপ্তমী মহাষ্টমী ও মহানবমী শেষ হলো, এলো বিজয়া দশমী বা বিসর্জনের তিথি।

মাকে বিদায় দিতে হবে। শূন্য হবে পূজামণ্ডপ। রুদ্ধ হবে আনন্দের প্রবাহ। বেদনা-ভারাক্রান্ত হলো ভক্ত সন্তানদের হৃদয়। অশ্রুসিক্ত হলো নয়ন। তবুও যেতে দিতে হবে 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি' পুরনারীরা জননীর সিঁথিতে সিন্দুর পরালো।

যাবার বেলায় কানে কানে বললো, আবার এসো, আবার এসো, ভক্তরা রুদ্ধকণ্ঠে বলল "গচ্ছতু, পুনরাগমনায়।"

মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নিয়ে বাদ্যভাণ্ড ও আলোক সজ্জা সহকারে চলল শোভা যাত্রা। দীর্ঘ পরিক্রমার পর গঙ্গার পুণ্য সলিলে বিসর্জিত হলো প্রতিমা। নিরঞ্জনান্তে গৃহে ফিরে এলো মায়ের সন্তানেরা।

তারপর শুরু হলো বিজয়ার আলিঙ্গনের পালা। সকল বিভেদ ভুলে সকলকে ভাই বলে তুলে নেবার আনন্দ উৎসব।

কিন্তু কেন এই বিজয়ার উৎসব? কিসের এ বিজয়া? দেবাসুর সংগ্রাম চলে আসছে সৃষ্টির গোড়া থেকে। অসুরকে পরাজিত করে দেবতারা আনন্দোন্মাদ চিত্তে পরস্পর কোলাকুলি করতেন, রাজারা যুদ্ধ জয় করে বিজয় উৎসব সম্পন্ন করতেন, তাই এর নাম বিজয়া। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী জাতির বিজয়া কিসের? কি যে করলাম আমরা? আমাদের বিজয়া গভীর তাৎপর্য্যময়। আমাদের বিজয়া হলো মাতৃ পূজার ফলে হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদি তামসিক বা আসুরিক ভাবকে জয় করে প্রেম ভক্তি ইত্যাদি দেব ভাবের প্রতিষ্ঠা আমাদের অন্তরে। অবাঞ্ছিত ভাব রাশিকে জয় করেছি। এই জয়ের আনন্দে আমরা করি বিজয়ার বিজয় উৎসব— মিলনের পরম উৎসব।

বৈরাগ্য ও উদারতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালী মৃন্ময়ী প্রতিমাকে বিসর্জন দিয়ে সব জীবের মধ্যে চৈতন্য রূপে বিরাজিতা জননীর চিন্ময়ী সত্তাকে আবিষ্কার করে বিশ্বমৈত্রীর পরম অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে আলিঙ্গনের জন্য বাহু প্রসারিত করে। বিজয়ার মিলন বাঙ্গালীর বিশ্বমৈত্রী প্রচারের প্রতীক। এই মিলন

মহোৎসবের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালী জগৎকে জাগাতে চায়। তার প্রাণের স্পন্দনে সে অনুভব করে নিখিলের মহাপ্রাণ স্পন্দন। শক্তিরূপা জননীর আরাধনা করে সে অর্জন করেছে এই দুর্লভ মনোভাব। সার্থক হয়েছে তার বাৎসরিক মহাপূজা। সে আজ জয়ী আজ তার বিজয় উৎসব। মিলনের পরমানন্দে আত্মহারা বাঙ্গালী এই কারণেই বিজয়ার মিলন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সাড়ম্বরে।

এমনি করে সমাপ্ত হয় বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব। আবার বছর আসে ঘুরে—আবার আসে মাতৃপূজার আহ্বান।

বন্দে মাতরম্

শ্রীশ্রীদশভুজা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

এবার তোমার করছে পূজা
　　নয়ন জলে এ দেশবাসী।
দুর্ভিক্ষের যে বিভীষিকায়—
　　শুকিয়ে গেছে সকল হাসি।
উৎকণ্ঠা ও অনটনে,
শান্তি নাই যে কারো মনে।
অর্দ্ধাসনে উপবাসে
　　আছে তারা দেখ্‌বে আসি।

২

রাত্রে আছে ডাকাতির ভয়—
　　লুটতরাজ যে চলছে দিনে।
ঘুচাবে কে এ দুর্দ্দশা—
　　মাগো তোমার কৃপা বিনে?
পল্লীগ্রামের সে শ্যামশ্রী—
দেখ্‌তে এবার আর পাবে কি?
হতশ্রী প্রায় সবাই হ'ল
　　শক্তি দাও মা শক্তিহীনে।

৩

তবু, দীঘি সরোবরে—
　　ফুটলো কমল তোমার লাগি,
আগমনী গান গাহিছে
　　বৈরাগী ও অনুরাগী।
আনন্দময়ী মা এসো,
জনম জনম ভাল বেসো,
আমরা তোমার আশায় আছি
　　পথ চাহি দিনরাত্রি জাগি।

৪

দশ হাতে লও অন্নথালি—
　　দাও খেতে দাও বুভুক্ষিতে,
তুমি বই আর কে পারে মা
　　দেহের মনের আহার দিতে?
প্রাচুর্য্য ঐশ্বর্য্য আনো,
আবার মাগো কাছে টানো
দশ্‌ দিকে আনন্দ ছুটুক—
　　সৌরভে গৌরবে গীতে।

(অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ)*

(সত্যভিত্তি কাহিনী)

পুনার মন্দির গ'ড়ে উঠল অসিতের জন্মদিনের মাত্র পাঁচদিন আগে। ভালোই হ'ল: গৃহপ্রবেশ হবে জন্মদিনে। তপতী ডাক দিল অসিতের বিলাত ফেরৎ বন্ধু শশধরকে যে বিলেত গিয়েও "বুদ্ধিবাদী" ব'নে যায় নি। বরং নানা ধর্মগ্রন্থ প'ড়ে আরো "বিশ্বাসপন্থী" হ'য়ে উঠেছিল। তপতী ওদের রুটিমাখন পরিবেষণ ক'রে সবে চা ঢালছে এমন সময়ে অসিতের ভক্তিমান্ পিওন এসে ওদের দুজনকে প্রণাম ক'রে তপতীর হাতে একটি টেলিগ্রাম দিয়ে চ'লে গেল। তপতী খামটি হাতে নিয়েই বলে: "তোমার ডাক্তার বন্ধুটি যে দেখছি তোমাকে বেশ এক হাত নিয়েছেন!"

শশধর (টোষ্ট মুখে তুলতে গিয়ে থেমে তপতীর মুখের দিকে চেয়ে): আপনি তো খামটি এখনো খোলেন নি দিদি!

অসিত: তোমাকে বলি নি—ও সদরের খাম ছুঁয়ে অন্দরমহলের চিঠির ঘোমটা খুলতে পারে?

শশধর: হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলেছিলে বটে—যোগবিভূতি যেন।

অসিত: সিদ্ধাই বলাই ভালো—যোগবিভূতি একটু বেশি গালভরা নাম। (তপতীকে) মা ভৈঃ বৎসে! শশধর সোনার চাঁদ ছেলে—সিদ্ধাই-টিদ্ধাইকে মিভীভাল ব'লে নাকচ ক'রে দেয় না। তাই একটানা ব'লে চলো—কী লিখেছে মৃন্ময়? আমি তো ভেবেছিলাম মন্দিরের জন্যে টেলিগ্রামে ও অন্ততঃ শুভেচ্ছা জানাবে আমাকে।

শশধর (চমকে): কে? ডক্টর মৃন্ময় ঘোষ?

অসিত: এফ-আর-সি-এস। সোজা ব্যাপার নয় (তপতীকে হেসে) আমাকে দেখলেই ও উজিয়ে ওঠে সেকেলে ব'লে গাল দিতে। কিন্তু হঠাৎ চিঠিতে কী লিখল রেগে?

---

* অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান
তাই দুঃখ পায় প্রাণ (গীতা)

শশধর : হাতে পাঁজি মঙ্গলবারে কাজ কি? খুলেই দেখ না।

অসিত : না আরো রসাল হবে তপতীর মুখে শুনলে—মানে, খামটা না খুলে।

তপতী : না, থাক্, আমি হঠাৎ মুখ ফস্‌কে ব'লে ফেলেছিলাম।

শশধর (হেসে) : ছি দিদি! আমাকে এখনো এত অবিশ্বাস? আমি কি আপনার কোনো কথা কখনো অবিশ্বাস করেছি? তাছাড়া জানেন, আমি পল ব্রান্টনের লেখা A search in secret Egypt পড়েছিলাম কায়রোয়। তাঁর কথাও আমি অবিশ্বাস করি না এমন কি যখন তিনি কায়রোর বিখ্যাত যোগী তাহরা বে-র কথা লিখেছেন যে কুম্ভক ক'রে তিনি দিনের পর দিন মাটির নিচে থাকতে পারেন।

তপতী (হেসে) : কিন্তু এ-সিদ্ধাই দেখতে কায়রো যাবার দরকার করে না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

শশধর : দেখেছেন?

তপতী : হ্যাঁ, আর দু দুবার। প্রথমবার মা-ও শহরে, আর দ্বিতীয়বার দেরাদুনে। দেরাদুনে যোগীটিকে কবর দেওয়ার পর এক খাস সাহেব বায়না ধরলেন—উপরের মাটি সিমেন্ট ক'রে দেওয়া হোক—যদি মাটির কবরে কোনো ফুটো ক'রে রেখে থাকে বুজরুকটা! আমরা অনেকে খুব বিরক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু খাস গোরা তো, তাকে তুষ্ট করতে সিমেন্ট করা হ'ল। তবু সে যোগী অগ্নিপরীক্ষারও-বাড়া কবর পরীক্ষায় পাশ করল—আপনি দেখেন নি নিজে?

শশধর : না, সে-সৌভাগ্য হয় নি। তবে দেখতে চাই সত্যিই। শুধু যোগবিভূতিই নয়—যাকে আজকাল খাস সাহেবরাও মানেন Extra-sensory-perception নাম দিয়ে—আমি তাও দেখি নি এ-পর্যন্ত। কেবল নামের ধুমধাম উপভোগ করেছি।

অসিত : বলেছ ভালো হে। নামের ধুমধামই বটে! ওরা কোনো কিছু মানতে হ'লে আগে এই ধরণের গালভরা নাম দিয়ে তাকে জাতে তুলতে চায়।

শশধর : রাগ কোরো না ভাই। কিন্তু যেসব অঘটন সচরাচর চোখে দেখা যায় না—তাদের মঞ্জুর করতে হ'লে সভ্যভব্য নামগুলো একটু কাজেও লাগে না কি?

অসিত : নামে তো আপত্তি নয়, কিন্তু ওরা যে বলে নাম দেওয়া মানেই ব্যাখ্যা, ভাষ্য—যা ছিল দুর্বোধ্য হ'য়ে গেল স্রেফ জলের মতন সাফ। এই ভাণ্ডীর খাম ছুঁয়ে ভেতরের চিঠি পড়ার কথাই ধরো না। এর হয়ত কোনো নামকরা হয় নি এখনো। কাজেই ওরা বলবেই বলবে—"নামঞ্জুর"। হিপনটিসম্, টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়াঁস টেলিকাইনেসিস—এইসব ব্যাপার নামের তিলক প'রে তবে না গ্রাহ্য হ'ল বুদ্ধিমন্তদের মহলে।

শশধর : তোমার একথা সত্যি বটে। কিন্তু কি জানো ভাই? কয়েকদিন আগে Challenge of the unknown ব'লে একটি চমৎকার বই পড়লাম। তাতে লেখক লিখেছেন বেশ একটি ভাববার কথা, মনে গেঁথে গেছে : যে, কোনো কিছুই আমরা বারবার না দেখলে মানতে পারি না যে এ হয়। তাই লেখক বলেছেন : আমরা যা জানি শুধু তা-ই জানতে চাই ফিরে ফিরে।*

অসিত : বইটি আমার আছে। এই দেখ (হাতের কাছে revolving shelf থেকে বার করে) লিখছেন সাহেব যে, আমরা যে জানা জিনিষেরই খবর পেতে চাই তার কারণ (পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) এই যে,

"We must be accustomed to a phenomenon before we will accept it. For most of us, the pleasure of recognition is frequently far greater than the pleasure of acquiring new knowledge."†

---

* "People want to know what they already know; and they must be familiar with a phenomenon before they will believe it". (Chapter I, L. K. Anspacher).

† অর্থাৎ, কোনো কিছুতে অভ্যস্ত হ'লে তবে আমাদের বিশ্বাস হয় সে অকাট্য। অধিকাংশ লোকই সচরাচর কোনো নতুন খবর নিতে যত আনন্দ পায় তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পায় পরিচিত পথঘাটের খবর পেতে। (Challenge of the unknown, 28p.)

তপতী : আমার কিন্তু মনে হয় দাদা, যে, আমরা ঘরোয়াকে নিয়ে ঘরকন্না করতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজানার খবরও পেতে চাই, ঘরের গণ্ডী ভালোবাসলেও চাই তার পরিধি বাড়তে—নতুনকে দেখে ভয় পেলেও থেকে থেকে তার জয়গান না ক'রেও পারি না।

শশধর (খুশী) : ঠিক বলেছেন দিদি। কারণ মানুষ দেখতে সাদামাটা হ'লেও আসলে কী যে প্যাঁচালো—উঃ! তার মনের মহলে কত রকম তৃষ্ণা যে তাঁবু ফেলে কেবলই শিকারের খোঁজে ঢুঁ মারে এদিকে ওদিকে সেদিকে—(হেসে) ধরুন না কেন, আমারই কথা। যোগবাগের প্রসঙ্গে আমি ভয় খেলেও আমার মনে একটি তৃষ্ণা কবে থেকে যে বাসা বেঁধে আছে—আপনার কোনো ডাকসাইটে যোগবিভূতি চাক্ষুষ করবার—

তপতী (টুক ক'রে) : কী? আমাকে মাটিতে পুঁতে? রক্ষে করুন, আপনার তৃষ্ণা মেটাতে আমি তাহরা বে হ'তে পারব না, ব'লে রাখছি।

শশধর (হেসে) : বালাই! অমন অলুক্ষুণে আবদারকে কি কোনো ভদ্রলোক প্রশ্রয় দিতে পারে? আমি প্রার্থনা করি—আপনি মাটির ওপরে শতায়ু হ'য়ে দিনের পর দিন আপনার অপরূপ ভজনের পর ভজন আবৃত্তি ক'রে চলুন, আর অসিত সুরের পর সুর দিয়ে গেয়ে চলুক—সমানে। কেবল এই টেলিগ্রামে ডক্টর সোম অসিতকে এক হাত নিয়েছেন কী ভাবে একটু ফাঁশ করুন, আমার চক্ষুকর্ণ সার্থক হোক—লক্ষ্মীটি দিদি!

তপতী (একটু চুপ ক'রে থেকে) : আচ্ছা। (খামটি দুহাতে ধ'রে একটু পরে) এ কী! ডক্টর সোম দাদাকে তার করেছেন আমেদাবাদ থেকে—বম্বে থেকে তো নয়।

শশধর : আমেদাবাদে একটি ডাক্তারদের কনফারেন্সে উনি প্রেসিডেন্ট যে, পড়েন নি কাগজে?

তপতী : না—আমি গত দুতিনদিন খবরের কাগজ খুলিই নি।

শশধর : না খোলাই ভালো—বাজে কথার ছোঁয়াচ যত কম লাগে ততই ভালো। কিন্তু বলুন এবার।

তপতী (একটু চোখ বুঁজে থেকে) : ডক্টর সোম ধমকাচ্ছেন (হেসে)।

"Temples are anachronisms. Why revive this medieval tomfoolery in this age of enlightened science and infallible reason, my dear obscurantist?"*

অসিত (শশধরকে খামটি দিয়ে) : এবার খোলো।

শশধর (খুলে প'ড়ে, তপতীকে) : তাই তো দিদি! আপনাকে লোকে ভানুমতী উপাধি দিয়েছে কি সাধে? কিন্তু বলুন না কেমন ক'রে পড়েন বন্ধ খামে কী লেখা আছে?

অসিত (হেসে) : বলবে কেন? এসব top secret : শুধু ডাক্তারদেরই একচেটে আছে—ভানুমতী যোগিনীদের নেই? (হেসে) মৃন্ময়কে পাল্টা তার ক'রে দেব না কি : বিজ্ঞানের ঘড়িতে মেলে কালের খবর, কৃপার অবতরণে মেলে মহাকালের খবর, যার ফলে বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে মানুষ হয় অমৃত—য এতদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি?

তপতী : কী হবে দাদা তার ফল? নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার কেমন ক'রে মানবেন—কৃপায় কি অমৃত আছে? ওঁরা একবাক্যে বলবেন—ধর্ম রাবিশ, কল্পনা। মন যার বেঁকে বসেছে সে যে কৃপার আলো ঢুকবার সব জানলাই বন্ধ ক'রে দিয়েছে বুদ্ধির—থুড়ি, কুবুদ্ধির—আগল দিয়ে।

শশধর : কিন্তু এতটা বলা কি উচিত দিদি? ডক্টর সোম বৈজ্ঞানিক তো—আর বৈজ্ঞানিকদের সব আগে চাই না কি খোলা মন নিয়ে সবকিছু বিচার করতে চাওয়া?

অসিত : তার মানে কি বলতে চাও—মৃন্ময় তার মন খুলে রেখেছে? গোঁ আর রোখকে যারা খুঁটি ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকে তাদের রুদ্ধ মনের আঁধার কাটবে কোন্ আলোয় শুনি?

শশধর : একটু অবিচার করা হচ্ছে অসিত, মাফ কোরো ভাই! ডক্টর সোমের মতন বৈজ্ঞানিক মনীষী কি সত্যি গোঁড়া হ'তে পারেন কখনো?

---

* মন্দির-টন্দির এ যুগে অচল। কেন মিথ্যে এ-জ্ঞানদীপ্ত বিজ্ঞান ও অভ্রান্ত যুক্তির যুগে এ-সেকেলে বোকামিকে চালু করতে চাইছ, হে বুদ্ধিবিরাগী?

তপতী : এ আপনি কী বলছেন শশধরদা ? গোঁড়ামি কি কেবল ধার্মিকদেরই একচেটে ? বৈজ্ঞানিকের গোঁড়ামি কি কিছু কম গাজোয়ারি বলতে চান ? আপনি যে-বইটির কথা বলছিলেন তাতেই পড়েন নি কি—কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলে বড় বড় বৈজ্ঞানিক ডাক্তারেরা ক্লোরোফর্মকে নামঞ্জুর করতে কী বিষম গোঁ ধ'রে ? শেষে মহারাণী তাঁর নিজের প্রসবের সময়ে ক্লোরোফর্ম তলব করার ফলে তবে না তাঁর পাঞ্জার প্রসাদে ডাক্তারদের চৈতন্য হয়। (অসিতকে) তুমি শশধরদাকে বলো না কেন ডক্টর সোমের কাহিনী।

অসিত (হেসে) : যাতে সঙ্গে সঙ্গে ওরও চৈতন্য হয় ? তথাস্তু। কেবল সে-কাহিনী তুমি বললেই ভালো হয়। কারণ মৃন্ময়ের বৈজ্ঞানিক দর্প চূর্ণ হয়েছিল তোমারই যোগবিভূতির ধাক্কায়।

তপতী : যা—ও। তোমার সবতাতেই ঠাট্টা। না আমি বলতে পারব না। না না না। তোমাকেই বলতে হবে।

অসিত : তথাস্তু। কেবল তাহ'লে আর এক পেয়ালা চা ঢালো। চা-য়ে চাঙ্গা জানোই তো। ওকে দাও আর এক কাপ। নৈলে গল্প জমবে কেন ?

Professor Charles Richet points out that the history of all the sciences warns us that the simplest discoveries have been immediately and automatically rejected as being impossible, or incompatible with the science of the day. For example, the orthodox authority, the great Magendie, denied the possibility of medical anaesthesia. His *ipse dixit* delayed the use of ether and chloroform for years. Magendie was not alone in his opposition to the use of anaesthetics. Indeed, not until Queen Victoria was delivered of a child with the aid of chloroform did English physicians accept anaesthetics generally. Queen Victoria deliberately asked for chloroform, in order to put the stamp of her official approval......It took all the authority of Victoria's immense influence to overcome the orthodox objection.

(CHALLENGE OF THE UNKNOWN by L. K. Anspacher (With the permission of Geroge Allen & Unwin Ltd) Chapter I, p. 29

অসিত (চায়ে চুমুক দিয়ে) : মৃন্ময়কে তুমি দারুণ শ্রদ্ধাভক্তি করো এতে আমার সত্যিই আপত্তি নেই। ওকে আমি বিলেতে ডাকতাম কী ব'লে জানো ? গুণধাম। একটি গুণ—ওর রোখ। ওর নাম ছিল চিন্ময়। ও বিলেতে গিয়ে নাম নিল মৃন্ময়। বলত : "ভারতবর্ষে এই সব পুণ্য নামের আওতায় থেকে থেকেই আমরা শূন্য—cipher—হ'য়ে গেছি : চিন্ময়, অমৃত, দেবকুমার, দেবীপ্রসাদ···ইত্যাদি। এরূপ আমাদের হ'তে হবে down-to-earth পার্থিব মাটির মানুষ—realist, বাস্তব। শান্তি-ফান্তি নয় অশান্তি, তীব্র অসন্তোষ, sleepless aspiration for perfection—আবার তোরা মানুষ হ'—দেবদেবী নয়—মানব মানবী। আর তার জন্যে চাই ধ্যানধারণা তীর্থমন্দির গঙ্গাস্নান নাকটিপে চোখ কপালে তুলে পাথর হ'য়ে ব'সে থাকা নয়, চাই বিশ্লেষণ গবেষণা নিরীক্ষা পরীক্ষা গোনাগুন্তি মাপাজোপা···ইত্যাদি।" আমি হেসে বলতাম : ভাই, সবাইকে তো ঠাকুর এক ছাঁচে ঢালেন নি। তাই যদুবাবু যা চান মধুবাবু তা চান না, কবিরা যা চায় মুদীরা তা চায় না, শিল্পীরা যা চায় বক্তারা তা চায় না, ধার্মিকরা যা যায় ছত্রপতিরা—dictator-রা—তা চায় না। (শশধরকে) ওকে আমি মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা করতাম গেটের নানা বাণী উদ্ধৃতি ক'রে—

শশধর (আশ্চর্য হ'য়ে) : কিন্তু গেটে যে ছিলেন মহাকবি—উনি কি ঋষিকে নবী মনে করতেন ?

অসিত : না। কিন্তু গেটে যে বিজ্ঞানের চর্চায় নাম করেছিলেন ঠিক বৈজ্ঞানিক না হ'য়েও—এতে ও কাবু হ'ত। ও জর্মন শিখে তাঁর Maximen Und Reflexiomen প'ড়ে একটু চমকে গিয়েছিল বৈ কি—বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে। তাই গেটের এ-শ্লোকটি আমি আঁকিয়ে উদ্ধৃত ক'রে ওকে বেশ একটু মুস্কিলে ফেলতাম—যে,

Oft adelt er was uns gemein erschien,
Und das Geschaetzte wird von ihm zu
nichts.

ওকে বেশি ক'রে ছুঁয়ো দিতে চেয়ে আমি এর অনুবাদ করেছিলাম চলতি ছড়ার মিল দিয়ে :

আমরা যাকে তুচ্ছ বলি, গায় কবি প্রায় তারই জয়,
যার গুণগাই আমরা—হেসে বলে সে : "ও কিছুই নয়।"

শশধর : কিন্তু এটি যে প্রায় গীতার শ্লোকটির দোসর :
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।

(তপতীকে) দিদি, এ-শ্লোকটি আমার এত ভালো লেগেছিল—বিশেষ ক'রে বিলেতে—যেখানে প্রগতি বাদীরা আত্ম গতি আর নেশাকে মনে করে জীবনের শেষ লক্ষ্য যে, আমি এর অনুবাদ করেছিলাম কয়েকটি বন্ধুকে ধমকাতে। অনুবাদটি এই :

সকলের চোখে মনে হয় যাহা নিশীথ কালো,
মুনি মহাজন দেখেন সেথায় উষা অমল :
বিমুগ্ধ প্রাণ য র নাম দেয়—আলোর আলো'
ঋষির নয়ন দেখে সেথা মায়া নিশার ছল।

তপতী (হাততালি দিয়ে) : বেশ সুন্দর অনুবাদ হয়েছে শশধরদা! এ-শ্লোকটি আমারও বড় প্রিয়। তাই (অসিতকে) আ'র কথাটি নয়, বলো যে কে যা প্রাণ চায়। উনি বুঝবেনই বুঝবেন—আমার আর সংশয় নাই।

অসিত (শশধরকে) : ও ঠিক বলেছে। আমিও "দ্বিতীয়লাম"—ইন্দ্রনাথের "ভারত উদ্ধারের" ভাষায়। অতএব এবার বলব সবই—অর্থাৎ কিছুই না রেখে ঢেকে। শোনো। (চায়ে চুমুক দিয়ে) চিন্ময় রাতারাতি মৃন্ময় সাহেব হ'য়ে যেতে দেখতে দেখতে পসার জমিয়ে দশ-বারো বৎসরের মধ্যে পুনায় এক রম্য নিলয় বানিয়ে মাঝে মাঝেই এসে কাটিয়ে যেত দুচার দিন ক'রে—আরো এই জন্যে যে, পুনায়ও ওর ভক্ত রুগী ছিল যথেষ্ট। ওর আর একটি গুণ ছিল—ও ডক্টরিতেও সত্যি একটু রিসার্চ করত। পুনায় National Chemical Academyতে ওর কয়েকটি প্রফেসর ভক্ত ওর নানা experiment-এর সহায়তা করত।

ফল যা হবার : প্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে আত্মবিশ্বাস আর ধর্মে অবিশ্বাস দুই ফুলে উঠল সমান তালে। আঙুল ফুলে কলাগাছ যাকে বলে। অর্থাৎ এর আগে যদি বলত দেব দেবী মন্দির কন্দির সব বাজে কুসংস্কার—অতঃপর বলা সুরু করল—ধর্ম হ'ল সর্বনেশে মনের আফিং—জানোই তো ইদানীন্তন সবজান্তাদের বুলি।

কিন্তু ঠাকুর আমার ওস্তাদ! বলে না—ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে? তাই ওকে আচম্‌কা হ'তে হ'ল এমন নাজেহাল—কিন্তু না, যথাপর্যায়েই বলি। (চায়ের পিয়ালায় ফের চুমুক দিয়ে)

বলেছি ওর অনেক ভক্ত। একটি মহাভক্ত ছিল ওরই ভাগনে—আহা বেচারী সন্দীপ অটো রিকশ চড়ে চার মাইল পথ ভেঙে রোজ সন্ধ্যায় আসত আমাদের ভজন শুনতে। তখন আমাদের মন্দির হয় নি—আমরা ছিলাম একটি আটচালায়। মৃন্ময় এলে প্রায়ই ভজন না হ'য়ে বাধত তর্কাতর্কি। তাই সন্দীপ "মামাবাবুকে" বিষ[illegible] ভক্তি করা সত্বেও উভয়সঙ্কটে পড়ত, বলত আমাকে[illegible] "ওঁকে একটু বোঝান না কেন দাদা? বিজ্ঞান, ডাক্তারি[illegible] খুব ভালো কথা। কিন্তু নাস্তিক হ'য়ে কেবল ধুলো[illegible] ধোঁয়া অণুপরমাণু নিয়ে রিসার্চ ক'রে মনে ভক্তি বি[illegible] শান্তি আসে না যে ছাই।" আমি বলতাম হেসে : "কি[illegible] ও তো ওর নিজের নব নামকরণ ক'রেই প্রমাণ দিয়েছে[illegible] যে, ও আদৌ চায়ই না দেবদেবী গুরুমন্ত্র ভক্তি শান্তি। একথা সন্দীপ একদিন মৃন্ময়কে বলার পর থেকে মা[illegible] মাঝে আমার ভজন শুনত বটে—তবে খানিকটা—মা[illegible] সন্দীপকে খুশী করতেই বলব।

তপতী (মৃদু হেসে) : ব্যাপারটা হয়ত ঠিক অ[illegible] তরল কি সরল নয় দাদা। অন্ততঃ আমার কী ম[illegible] হয়েছে তার বারই বলব? সন্দীপবাবুকে ডক্টর সে[illegible] সত্যিই স্নেহ করতেন। তা করবেন না? একে ভাগ[illegible] তার ওপর এমন ভাগনে যে "মামাবাবু" বলতে অজ্ঞা[illegible] ভক্তিতে তো ডাকসাইটে "মামাবাবুর" আপত্তি নে[illegible] আপত্তি কেবল ধর্মে ভক্তিতে, গুরু বা ভগবানের কা[illegible] নত হওয়ায়। সন্দীপবাবুর এই ধার্মিক মনোভ[illegible] দীনতাই ছিল ওঁর চক্ষুশূল। তাই এ-মোহ থেকে ছি[illegible]

নিজে ওকে তিনি একটু তুষ্ট রাখতে চাইতেন—আমেরিকা যেমন পাকিস্তানকে খুশী করতে চায়—না নৈলে পা'ছে সে চীনেদের দিকে বেশি ঝোঁকে?—কতকটা তেম্‌নি। অর্থাৎ তোমার ভজন শুনে ভাগনেকে একটু তুষ্ট না করলে যদি তার রুষ্ট ভক্তির সবটাই ভগবানের দিকে উধাও হয়, কে বলতে পারে? সবাই একটু হাতে রাখতে চায় নিজের ভক্তকে, নেওটো পূজারীকে।

অসিত (প্রসন্ন কণ্ঠে): ঠিক বলেছ ভগভী। ওকে খুশী করতে নয়, হাতে রাখতে। পাকিস্তানের উপমাটাও জুৎসই হয়েছে বৈ কি। (শশধরকে) থাক শোনো।

মৃন্ময় প্রায়ই পুনায় এসে দুচার দশদিন কাটিয়ে যেত, বলেছি একটু আগেই। কিন্তু সন্দীপের ওখানেই প্রায় ওর নিমন্ত্রণ থাকত দুপুরে। ও বিবাহ করে নি, কাজেই —ভাগনের ভক্তিতে আর ভাগনে-বৌ নীলিমার আদর-যত্নে ও খুশীই হ'ত বৈ কি। আমাদের কাছে আসত প্রায় ওদের সঙ্গেই। অবশ্য একলাও কখনো কখনো আসত—তর্ক করতে।

একদিন সকালে আমি ভগভীর কাছে ব'সে সবে গান ধরেছি এমন সময়ে ওর ফের ভাবসমাধি। সমাধি ভাঙলে বলল: "গান শুনেছি দাদা।" আমি মহানন্দে গানটি টুকে নিলাম ও আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে। গানটির কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করি শোনো—

ঐসী অচরজ দেখী বাত:
সাগর বুঁদ সমানে দেখা, নির্ধন দ্বারে নাথ!...
দেখা তীন লোককী পালক—গোকুলমে গোপাল!
দেখা বনতা নারায়ণ মুরলীধর নন্দকা লাল!
সদ্‌গুরু বন্‌ মীরা ঘর আয়া তিরলোকীকা নাথ!
ঐসী অচরজ দেখী বাত!

গানটি এত চমৎকার লাগল যে, তখনি তখনি অনুবাদ করে গাইতে সুরু ক'রে দিলাম:

আমি যা দেখছি বলব কেমন ক'রে?
নামল সিন্ধু বিন্দুতে, নাথ এলো দীনার ঘরে!
ভ্রমর কুঁড়ির বুক চিরে নেয় সব মধু তার লুটে,
তবু শুনে গুনগুন অলির ফুল ওঠে ফের ফুটে!
দেয় ধরা আকাশকে ধুলা, পায় ফিরে নির্ঝরে:
বলি অঘটনের কথা কেমন ক'রে?
বিশ্বপালক আসে হ'য়ে গোকুলের গোপাল!
দেখ নারায়ণ বাজায় বাঁশি রূপ ধ'রে নন্দ'লাল।
ত্রিভুবনেশ গুরুর রূপে এলো মীরার ঘরে।
আমি যা দেখেছি বলব কেমন ক'রে?
বলি অঘটনের কথা কেমন ক'রে?

চোখ বুঁজে গাইতে গাইতে যখন মন আবেশে গাঢ় হ'য়ে এসেছে, দেখি সন্দীপ চুপ ক'রে এক কোণে ব'সে গান শুনছে আর ওর দুই গাল বেয়ে নেমেছে অঝোর ধারা। ছুটি পেলে কখনো কখনো ও সকালেও এসে ধরত: "দাদা অন্ততঃ একটি গান!" পরে শুনলাম সেদিন ওর রক্তের চাপ বেড়ে মাথাব্যথার দরুণ ও ছুটি নিয়েছিল। আমাকে ও প্রায়ই বলত যে আমার মুখে কীর্তন ভজন শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওর দেহমনের সব তাপ জুড়িয়ে যেত। কথাটা উচ্ছ্বাসের মতন শোনালেও ও একটুও বাড়িয়ে বলে নি। ওর স্ত্রী নীলিমার মুখেও শুনেছি যে, ওর মাথাধরা অনেক সময়েই সেরে যেত ভজন শোনার পরে।

শশধর: কিন্তু এ কি সত্যি হয়—মানে, শুধু গানে নয়—জীবনে!

অসিত: কেন হবে না? সংসারে কত কী আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে আমরা অবিশ্বাস করিনা, কেবল ভগবানের নামে শান্তি অ'সার ফলে অসুখ সারতে পারে একথা শুনলেই যত অবিশ্বাস ফুঁসে ওঠে! ও প্রায়ই বলত যে, ওর মাথা থেকে প্রায়ই শান্তির প্রবাহ নামত ভজন শুনতে না শুনতে। আর কে না জানে মনের শান্তির প্রসাদে দেহের কত তাপ জল হয়ে যায়! অন্ততঃ সেদিন যে এ-ভজনটি শোনার পরে ওর দরুণ মাথাব্যথা সেরে গিয়েছিল এর সাক্ষী আছে—আর সাক্ষীর ম'ত সাক্ষী—সাক্ষাৎ ডক্টর মৃন্ময় সোম, এফ-আর-সি-এস! হ'ল কি, ও যখন এ-ভজনটি শুনতে শুনতে তন্ময় হ'য়ে গেছে ঠিক সেই সময়েই মৃন্ময় এসে হাজির। আমি গান গাইছি দেখে সে সন্দীপের পাশে চুপটি ক'রে বসে রইল—খানিকটা বাধ্য হ'য়েই বলব, কারণ গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সন্দীপকে জেরার সুরেই জিজ্ঞাসা করল: "সকালে তোর ওখানে যখন গিয়েছিলাম তুই যে বললি তোর দুর্দান্ত মাথাব্যথা?" সন্দীপ বলল একটু কুণ্ঠিত হয়েই:

"তাই তো এখানে এলাম মামাবাবু, গান শুনতে। ভজন শুনলে যে দেখেছি আমার মাথা ব্যথা সেরে যায় অনেক সময়েই।" মৃন্ময় গর্জে উঠল: "ননসেন্স! মাথা ধরেছে—অ্যাস্পিরিন খা।" সন্দীপ কাতর সুরে বলল: "আজ সকালে তিন তিনটা অ্যাস্পিরিন খেয়েও কিছু হয় নি মামাবাবু! কিন্তু এখানে আধঘণ্টা দাদার গান শোনার পর মাথাব্যথা একেবারে সেরে গেছে।" মৃন্ময় ভ্রূকুটি ক'রে বলল: "সত্যি সেরে গেছে, না কল্পনা?" আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম: "মৃন্ময়, মাথা ব্যথা সারার কারণটা কল্পনা হ'তে পারে, কিন্তু সারাটা ফ্যাক্টের কোঠায় পড়ে না কি? তবে অবিশ্যি যদি তুমি ওর কথা আদৌ বিশ্বাসই না করো তাহ'লে নাচার।" মৃন্ময় একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল: "না বিশ্বাস করেছি-শুধু ও স্বভাবে সত্যবাদী বলেই নয়, দেখতে পাচ্ছি তো ওর মুখের মেঘ একেবারে কেটে গেছে! সকালবেলা যখন ওকে দেখতে গিয়েছিলাম—সত্যিই ভাবছিলাম কোনো হার্ট স্পেশালিষ্টকে ডাকব কি না। ও যন্ত্রণায় একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল। (থেমে) তবে এ অঘটন ঘটেছে হয়ত অ্যাস্পিরিন-এর delayed action-এর দরুণ সে—কে বলতে পারে?

সন্দীপ একগাল হেসে বলল: "না মামাবাবু, আমি বলতে পারি। কারণ তিন তিনটে অ্যাস্পিরিনে প্রায় আমার দফা সেরেছিল। উঃ! মাথাঘোরা এমন বেড়ে গেল যে, মনে হ'ল যেন দুনিয়া হয়ে উঠেছে লাটিম—মনে পড়ল সেই মাতালের কথা যে বলেছিল রাতে বাড়ী ফিরবার সময়: "কে রাস্তার মোড় ধ'রে নড়াচ্ছে রে?" (হাসতে হাসতে) রাগ করবেন না মামবাবু, একটু হাসতে দিন—দাদার ভজনের জয়গান না ক'রে আমি পারছি না। ভাগ্যে চ'লে এসেছিলাম ট্যাক্সি ক'রে! জয় দাদাজির জয়, দিদিজিকে দণ্ডবৎ (প্রণাম ক'রে) যে, কাবু এক মুহূর্তে হ'য়ে দাঁড়াল বাবু।

ওর সরল প্রাণখোলা হাসি আমরা সবাই ভালোবাসতাম। এমনকি মৃন্ময়-যে-মৃন্ময়—যাকে আমি মাঝে মাঝে সুকুমার রায়ের ছড়া কেটে ক্ষেপাতাম—"রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা"—সেও ওর হাসিতে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারত না। সেদিনও এ-হাসিতে তার মুখের মেঘ কেটে গেল, সে ওর পিঠ চাপড়ে বলল: "অসুখ যে-কারণেই সারুক না কেন রে সন্দীপ, সারাটাই আসল—কংক্রীট রিয়ালিটি। কাজেই তুই বাবু হয়েছিস—বাবুই থাক, (হেসে) ফের যেন কাৎ হ'য়ে প'ড়ে সাবু খেয়ে থাকতে না হয়। আমার ভারি ভাবনা হয়েছিল।" ব'লেই উঠে চ'লে গেল—একটু যেন বিমনা হ'য়েই। তপতী কুটুস ক'রে মন্তব্য করল: "তর্কে হারলে পৃষ্ঠপ্রদর্শনই যে পন্থা, তোমার মুখেই তো শুনেছি দাদা!"

শশধর: তারপর?

অসিত: মৃন্ময় হঠাৎ উঠে চ'লে যাওয়ার পরে সন্দীপ হাতজোড় ক'রে বলল: "দাদা, মামাবাবুর হ'য়ে আমি ক্ষমা চাইছি। ওঁর মনটি সত্যি কী যে নরম—অথচ দেখুন, তর্ক উঠতে না উঠতে ওঁর জ্ঞান থাকে না—বিশেষ ধর্ম নিয়ে তর্ক। আপনি কিন্তু গায়ে মাখবেন না ওঁর এই উগ্র ঢং, ওঁকে গান শুনিয়ে যাবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার ভজন শুনতে শুনতে উনি অজান্তে একটু একটু ক'রে বদলে যা'বেন।" আমি সন্দীপকে বললাম: "তোমার মামাবাবুকে আমিও ভালোবাসি, সন্দীপ। ওর বহুগুণ—কেবল মুস্কিল এই যে, বিজ্ঞানের অন্ধ দাপটের ঝাঁঝ ওর দৃষ্টি গেছে ঝাপসা হ'য়ে, তাই ও দেখেও দেখে না যে, গোঁড়ামি বৈজ্ঞানিকদেরও পেয়ে বসে সব দেশেই। এ আমার কথা নয়, কারণ এই গোঁড়ামির ফলেই ও বিজ্ঞানকে সর্বশক্তিমান্ ভগবানের বেদীতে চড়িয়েছে। চড়াবে না? knowledge is power এ-বুলি তো বিজ্ঞানেরই। ফল কি হয়েছে দেখতেই তো পাচ্ছ: ও ধ'রে নিয়েছে যে বিজ্ঞানের মাপাজোপা গোনাগুন্তির ফলেই মানুষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হ'তে পারে।

এমন সময়ে ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···আমি টেলিফোন ধরতেই মৃন্ময় বলল: অসিত, আমি আচমকা উঠে এসে অভদ্রতা হ'য়ে গেছে, কিছু মনে কোরো না। কিন্তু ভজন শুনে অসুখ সারে এতবড় কথাটা বিশ্বাস করতে হ'লে আগে অনেক data চাই। কারণ সত্যকে জানতে হ'লে বহু data জোগাড় করা ছাড়া আর পথ নেই। Statistic

is the only way to truth… ইত্যাদি।

শশধর: কিন্তু এতবড় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার হ'য়েও

অসিত: বৈজ্ঞানিক হ'লেই কি রাতারাতি স্বভাব বদ্‌লে যায় ভাই? গীতায় কি সাধে বলেছে: প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি? একথার ভাষ্য মিলবে—পরের দিনই কী হ'ল শুনলে। তাই শোনো।

হ'ল কি, পরদিন সকালেই ফের মৃন্ময়ের আবির্ভাব। আগের দিন একটু বিমর্ষ মতন হ'য়েই উঠে গিয়েছিল তো? সেদিন উজ্জ্বলমুখে হানা দিল যেন তার শোধ তুলতে। বলল: "অসিত, 'মাথো আথো'-র তুকতাকে অবিশ্বাস হয় কি সাধে রে ভাই? কী হ'ল শুনবে? কাল তো সন্দীপ ভজন শুনতেনা শুনতে মাথাব্যথা সারে—বলল গদগদ হ'য়ে? আচ্ছা, কিন্তু আজ সকালেই একেবারে পটপরিবর্তন—on revolviug stage—যাকে বলে। নীলিমা টেলিফোন করল: 'সন্দীপের মাথাধরা এত বেড়েছে যে দুতিনবার বমি ক'রে নেতিয়ে পড়েছে।' আমি শুনেই ছুটলাম। মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে তবে ও ঘুমিয়েছে—ওঁ শান্তিঃ।" বলেই ঝাঁঝালো ব্যঙ্গ হেসে বলল: "ও কি হয় রে ভাই? যা নয় তাই! যুগ বদলে গেছে যে! এখন Zeitgeist আর ধর্ম নয়—বিজ্ঞান সায়েন্স, ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স। ধর্ম গুরু কৃপা ভজন এসব বুজরুকের ভেল্কিবাজি আর চলবে না। চোখ চেয়ে দেখতে পাচ্ছ না—বিজ্ঞান কী ভাবে হু হু ক'রে মানুষকে এগিয়ে দিচ্ছে—আর সেই অনুপাতে প্রভুপাদ অজ্ঞান ধর্ম পিছু হটছে?"

আমি বললাম: "ভাই, বিজ্ঞানের জাঁকালো অগ্রগতি কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় চাহিদা তথা জিজ্ঞাসা হ'ল মুক্তির, শান্তির, প্রেমের। তার চাবি ধর্মেরই হাতে চিরদিন ছিল, এখনো আছে, পরেও থাকবে। কোনো যুগেই ভেল্কিবাজি যথার্থ ধর্মের হাতিয়ার নয়। আর একটা কথা: ভেল্কিবাজি কি বিজ্ঞানও কিছু কম দেখাচ্ছে? নাগাশাকি হিরোশিমায় দুটি মাত্র বোমা ফেলে অ্যাটম যে নরমেধযজ্ঞ করলেন চক্ষের নিমেষে তার সঙ্গে প্রভুপাদ ধার্মিক ভেল্কি পাল্লা দিতে পারে কি? পারবে কেমন ক'রে বলো? ধর্ম যে চায়ই না গবেষণা করতে কী ভেল্কিতে সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি নরহত্যা করা যায়।" মৃন্ময় চ'টে উঠে বলল: "যে জেগে ঘুমতে চায় তাকে কেউ জাগাতে পারে না। তাই যাও তুমি ওকে ভজন শোনাতে ফের—আমি উঠি—আমার কাজ আছে।"

কিন্তু তপতী ছাড়ল না। ওকে শান্ত ক'রে চা খাইয়ে ভুতিয়ে পাতিয়ে ওরই মোটরে আমরা তিনজনে গেলাম সন্দীপের কাছে। তার তখন জ্ঞান হয়েছে। তবে মার্ফিয়ার দরুণ দারুণ গা ঘোলাচ্ছে—বলল নীলিমা কেঁদে। আমি নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "কিন্তু কাল ও ভজন শুনে তো বেশ ভালো ছিল।" নীলিমা বলল: "হ্যাঁ। কিন্তু দুর্ভাগ্য তো একা আসে না দাদা। কালই বিকেলে আমাদের বড় মেয়ে বম্বেতে পা পিছলে অজ্ঞান হয়ে গেছে—টেলিফোনে এই খবর পেয়েই উনি ফের পড়লেন।"

আমি মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললাম: "কী বন্ধু? এবার? ডাক্তারি কাটাকুটিতে ভাঙা হাত জোড়া লাগলে ফের সে হাতে ঘা পড়লে যদি হাড় আবার ভাঙে তাহ'লে কি বলা চলে যে আগেরবার ভাঙা হাড় জুড়ে যায় নি ডাক্তারি নৈপুণ্যে? কেবল ভজন শুনে অসুখ সারাই যত দোষ করল!"

মৃন্ময় কোণঠেসা হ'য়ে বলল: "আমার এখন তর্কাতর্কি করার সময় নেই। এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম—আমার এক অ্যামেরিকান ডাক্তার বন্ধু এসেছেন—ডাকসাইটে হার্ট স্পেশালিষ্ট—আমি তাঁকে কনসালটেশনে ডেকে নিয়ে আসছি এক্ষুনি।" সন্দীপ আপত্তি করতে যেতেই সে বলল: "তাঁর ফী-র জন্য তোকে ভাবতে হবে না। মামাবাবু তো এখনো মরে নি রে!" বলেই প্রস্থান—জলভরা চোখে। নীলিমাও চোখ মুছে বলল: "মামাবাবু ওঁকে কী যে ভালোবাসেন দাদা…

সন্দীপ গাঢ়কণ্ঠে বলল: "সত্যি দাদা! বহুপুণ্যে এমন মামা পেয়েছি। কী স্নেহ, দয়া, দিলদরিয়া! কেবল ওঁর ঐ এক বাই ডাক্তার আর ডাক্তার—বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান। কিন্তু আমার সত্যি ডাক্তারে আর বিশ্বাস নেই—না এই দুরন্ত ফোঁড়াফুঁড়িতে। কী সে কষ্ট! কিন্তু কী করব বলুন? ডাক্তার দেখাব না বললে যে মামাবাবু

মনে বিষম কষ্ট পান। মরুক গে দাদা, আপনি আমাকে গান শোনান একটু—তাহ'লেই আমার মাথাব্যথা সেরে যাবে, আমি জানি। সত্যি বলছি দাদা, আমার মন বলে—আমি যদি সেরে উঠি তো উঠব কেবল ঠাকুরের কৃপায়—আপনার ভজন শুনে আর দিদির পায়ের ধুলোর জোরে।" তপতী কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল: "আমার পায়ের ধুলোর কোন শক্তিই নেই ভাই—তবে এ আমি বিশ্বাস করি যে, ভজনে অসুখ সারে।" ব'লেই আমাকে বলল: "তুমি গাও না সেই গানটি—ভাগবতের অভয় বাণী—যেটি কাল রাতে গাইছিলে: 'তুমি আমায় করলে গ্রহণ।"

অসিত (শশধরকে): শোনো গানটি—যেটি সন্দীপকে শুনিয়েছিলাম সেদিন।

তুমি আমায় করলে গ্রহণ ভয় দেখাবে আমায় সে কে ?
তোমার আমার মাঝে আড়াল নয়ন যেন আর না দেখে।

কত অশ্রু কত ব্যথা
অভিনয়ের কতকথা—

গেয়েছি তো রঙ্গরাগে, আজ আমি সে-বিলাস রেখে
ধরব তোমার চরণ মাগো, নয় শুধু আর থেকে থেকে—
তাপহরা মূর্তি তোমার রাখব প্রাণের পটে এঁকে।
অবান্তরের ভ্রান্তিপুলক, চাই না যা তা চাওয়ার মায়া,
মোহের পালা শেষ করো আজ, আগুন দিয়ে পোড়াও কায়া।

যে-কায়া মা এত প্রিয়
সে যে কারা নয় তো গৃহ,

মন্দির সে হবে মাগো, রইলে তুমি সেথায় জেগে,
কাঁটা হবে কুসুম—তোমার চরণকমল-পরাগ মেখে,
চিন্তায়ও যার অভয়—তাকে পাই যদি, ভয় দেখাবে কে ?"

শশধর: গানটি সত্যি চমৎকার, দাদা। বলতে কি, অঘটনের যাদুবিদ্যা নিয়ে যে এমন চমৎকার গান বাঁধা যেতে পারে—আমি সত্যিই ভাবতেও পারি নি।

তপতী (সকুণ্ঠে): তোমার গল্পটাই চলুক দাদা। অঘটন গল্পেই বেশি মানায়—গানের চেয়ে।

অসিত: গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ উঠে ব'সে বলল—যেমন প্রায়ই বলত—যে, তার মাথাব্যথা একদম সেরে গেছে। "শুধু তাই নয় দাদা", জুড়ে দিল সে সানন্দে, "গানটি শুনতে শুনতে যেন আমার মন আলো হ'য়ে উঠল—ভয়ের ছায়াও রইল না আর, কে যেন কানে কানে বলল: 'ভয় নেই রে, তাঁকে ভালবাসলে ভয় থাকে না আর—জীবনেও না মরণেও না।' তা হবে না দাদা? আপনি যে গানের মধ্যে দিয়েই পেয়ে গেছেন অভয়ের চাবি। না, এ আমার একটুও বাড়ানো কথা নয় দাদা। আমি কাল স্বপ্নে কী দেখেছি শুনবেন? দেখলাম যে—

কিন্তু কথাটা ওর শেষ হল না, কারণ ঠিক এই সময়ে ভূপালীতে কড়ি মধ্যমের মতন মৃন্ময়ের অভ্যুদয় হ'ল—সুরের পরে মূর্তিমান্ বেসুর—তার উপর তার সঙ্গে সেই আমেরিকান ডাক্তারও দিলেন হানা। তপতী তাঁকে দেখেই আমাকে জনান্তিকে বলল: "তুমি গান গাইছ এতে নাস্তিক সাহেব খুব বিরক্ত হয়েছেন। পালাই চলো।" তপতী প্রায়ই অনেকের চিত্তের হদিশ পেত—তাই পেয়েছিল সাহেবের নাস্তিক মনের রাগের খবর।

সাহেব আমাদের অভিবাদনের উত্তরে সামান্য একটু মাথা হেলিয়েই মুখ ফিরিয়ে সন্দীপের পাশে সশব্দে চেয়ার টেনে বসলেন। তপতী রাস্তায় বেরিয়েই আমাকে বলল: "ডক্টর সোম গোঁ ধ'রে খুব ভুল করেছেন। এ-অসুখ ডাক্তারির এলাকায় নয়। সন্দীপবাবু ঠিকই ধরেছেন যে, তাঁর রোগের চাবিকাটি আছে ঠাকুরের কৃপার মণিকোঠায়—যে-কৃপা বার বারই এসেছে তোমার ভজনের মধ্যে দিয়ে"।

আমি করুণ হেসে বললাম: "কিন্তু উপায় কী বলো—যখন নাস্তিকের কাছে বিজ্ঞান ছাড়া আর সবকিছুই বাতিল?" তপতী বলল: "তবু সন্দীপবাবুকে এ সময়ে তুমি দূরে ঠেলো না তাঁর মামাবাবুর তর্জনগর্জনে।"

---

* মামেকমেব শরণম্ আত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥
(ভাগবত ১১।১২।১৫)

নিখিল দেহীর আমার শরণ চায়
যে আমারে জানে নিয়ন্তা, লভে বরাভয় সে ধরায়।

কিন্তু ভবিতব্য বলে আর কাকে ? ঠিক সেই দিন-রাত্রেই লক্ষ্ণৌ থেকে আমার এক পাঞ্জাবী বন্ধুর তার এল : "থ্রম্বোসিস—উড়ে এসো দয়া ক'রে।"

আমি সন্দীপকে টেলিফোন ক'রে লক্ষ্ণৌয়ের ঠিকানা দিয়ে পরদিনই সকালে পুনা থেকে উড়ে সন্ধ্যায় লক্ষ্ণৌয়ে পৌছলাম।

দুদিন পরে সন্দীপ তার করল : "কবে ফিরছেন ? দেরি করবেন না।"

এদিকে লক্ষ্ণৌয়েও বন্ধুর প্রাণ নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি যাকে বলে। উভয়সঙ্কট। ভেবে চিন্তে তার করলাম যে যতশীঘ্র পারি ফিরছি—বন্ধু একটু সেরে উঠলেই।

কিন্তু হায় রে, দুদিন বাদে বন্ধুর কাছে খবর এলো তাঁর এক জামাই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে লণ্ডনে। শুনেই তিনি ফের পড়লেন। আমি ফের নিলীমাকে তার করলাম : "ফিরতে আরো দিন কয়েক দেরি হবে—সন্দীপ কেমন আছে জানিও।"

অবাক্ ! এবার উত্তর দিল খোদ মৃন্ময়—টেলিগ্রামে : "সন্দীপ নার্সিং হোমে। আশু ভয়ের কারণ নেই তবে মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত বেড়েছে। ও কেবলই বলছে—তোমার ভজনই এর একমাত্র ওষুধ। ওকে বোঝাতে পারছি না। তুমি যতশীঘ্র পারো চ'লে এসো।"

তিন চারদিন বাদে লক্ষ্ণৌর বন্ধু একটু শান্ত হ'লে ডাক্তার আমাকে বলল : "বিপদ কেটে গেছে"। "আমি মৃন্ময়কে তার করলাম—পরদিন কোন্ প্লেন-এ পুণা পৌছব।"

পুণার বিমান ঘাঁটিতে মৃন্ময় তার মোটর নিয়ে হাজির। বলল : "সন্দীপের মাথাব্যথা একটু কমেছে, কিন্তু এক নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে—বুকে ব্যথা সুরু হয়েছে। তবে ডাক্তার সাহেব ভরসা দিয়েছেন—এ বদহজমের জন্তে হয়েছে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। তাই গতকাল সন্দীপ বাড়ী ফিরেছে কয়াজির নার্সিং হোম থেকে।" তপতী কিন্তু আমাকে একান্তে বলল : ডাক্তার ধরতে পারে নি। ও স্বপ্নে দেখেছে সন্দীপের মাথার উপরে অশুভ কালোছায়া।

মৃন্ময় আমাদের বাড়ী পৌছে দিয়ে বলল : "ঘণ্টাখানেক বাদে মোটর পাঠিয়ে দেব ভাই—সন্দীপের তর সইছে না, কেবলই বলছে— গান না শুনলে ওর অসুখ সারবে না। পাগল বলে আর কাকে ?"

আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তপতীর স্বপ্নের কথা শুনে। কারণ ওর স্বপ্নদর্শন যে ভুল হয় না—এ আমি বার বারই দেখেছি। কিন্তু গোঁড়া নাস্তিককে একথা বললে উল্টো উৎপত্তিই হবে তো। তাই শুধু বললাম : "একটা গান আছে ভাই দ্বিজেন্দ্রলালের :

"পাগলকে যে আপন ভাবে,
সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল—একদিন সেটা
বোঝা যাবে।"

শশধর : তারপর ?

অসিত : আমরা সন্দীপের ওখানে পৌছলাম সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। সে আমাদের দেখেই উজিয়ে উঠল। শুয়ে শুয়েই আমাদের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল : "আপনাদের জয় হোক দাদা দিদি। এবার আমি সেরে উঠবই উঠব—দেখবেন। আর সেরে উঠব ডাক্তারের ইঞ্জেকশনে নয়—আপনার গান শুনেই"—বলল মহা উৎসাহে।

কিন্তু হবি তো হ—ঠিক সেই সময়েই মৃন্ময় পাশের ঘরে ডাক্তারকে টেলিফোন করছিল—শুনতে পেয়ে ঘরে ঢুকে বলল বিরস কণ্ঠে : "আমি ডাক্তার সাহেবকে ডাকতে যাচ্ছি। কিন্তু আজ রাতে একটু চুপচাপ থাকো—গান শুনতে হয় তো কাল শুনো—আর মনে রেখো তোমার ব্লাডপ্রেসার আজ কমেছে ডাক্তারের ইঞ্জেকশনেই।" ব'লে সবেগে প্রস্থান।

সন্দীপ কাঁদো কাঁদো সুরে বলল : "দেখুন তো দাদা অত্যাচার ! গান শুনলে আমি ভালো থাকি তবু মামার ঐ পোড়া ডাক্তারের কথাকে বেদবাক্য মনে ক'রে কিছুতেই আমাকে গান শুনতে দেবেন না।" ব'লে রুখে উঠে : "না, মামাবাবুর কথা আমি আর শুনছি নি। লক্ষ্মীটি দাদাজি, আপনি গান গান—আহা দিদির ঐ গানটি আমার কী যে ভালো লাগে : 'ডোল রহী ডগমগ নৈয়া কহাঁ হো খেবনহার' !"

আমি নীলিমাকে বললাম : "কী বলো নীলিমা ?" মৃন্ময় না থাকলে নীলিমা অন্য মানুষ, অকুণ্ঠেই বলল

"গান দাদা, গান। আপনার গান শুনলে ওঁর অসুখের যন্ত্রণা কমে এ কি আমি বার বারই দেখি নি? মামাবাবুর সব ভালো—কেবল এই এক কী যে গোঁ—" ব'লেই থেমে গেল সন্দীপের মুখের দিকে চেয়ে।

আমি তপতীর দিকে তাকাতেই সেও বলল: "নীলিমা ঠিকই বলেছে—তুমি গাও। তাছাড়া—" ব'লে মৃদু হেসে: "ডাক্তার সাহেব তো এখানে নেই যে রেগে আগুন হ'য়ে আমাদের ভস্ম ক'রে দেবেন!"

সন্দীপ মামাবাবুকে গভীর ভক্তি করলেও ডাক্তার সাহেবকে সইতে পারত না—শিশুর মতন আনন্দে হেসে হাততালি দিতে দিতে বলল: "ঠিক বলেছেন দিদি। আপনার জয় হোক।"

অগত্যা আমি ধরলাম গানটির বাংলা অনুবাদ:

তরণী আমার করে টলমল—কোথা কাণ্ডারী হায়?
হে আমার দিশারি, তুমি কোথায়?
তট বন্ধন কাটিয়া পড়েছি দেখ মাঝদরিয়ায়
এ-লগনে দিশারী তুমি কোথায়?

গেয়ে নানা আখর তান দিয়ে ভাবাবেশে সুরু করেছি:

ছোট যে জীবন তরণী আমার,
কেমনে সহিবে আঘাত অপার?
ওঠে কেঁপে সে যে বারবার লক্ষ ঢেউয়ের ঘায়?
এ-অকূলে দিশারি তুমি কোথায়—

এমন সময়ে—হা অদৃষ্ট!—অশান্ত মৃন্ময়ের সঙ্গে আরো অশান্ত ডাক্তার সাহেবের পুনরভ্যুদয়। বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না তাঁর অপ্রসন্নতা। বললেন আমাকে বিরস কণ্ঠেই: "রোগীর পক্ষে এখন কোনরকম আবেগই ভালো নয়। ভজন শুনলে ওঁর 'হার্ট-বীট' বেড়ে যায় ইমোশনের দরুণ। তাই উপস্থিত গান-টান শোনা বন্ধ রাখতেই হবে।"

সন্দীপের মুখের প্রভাতী আলো যেন দপ্ ক'রে নিভে গেল। করুণ সুরে বলল: "কিন্তু আমি গান শুনলে ভালো থাকি স্যর—"

স্যর আতপ্ত কণ্ঠে বললেন: "That's all make-believe—wishful thinking: I know what I am talking about."

অগত্যা সদুঃখে বিদায় নিতে হ'ল। সবজান্তাদের সঙ্গে কমজান্তারা পেরে উঠবে কেমন করে বলো?

ঘণ্টাখানেক বাদে মৃন্ময় এসে হাজির। দুই ভুরু যতটা তোলা যায় তুলে গুরুগম্ভীর সুরে বলল আমাকে হকচকিয়ে দিতে: ইনি একেবারে যাকে বলে দুর্দান্ত ডাক্তার—হার্ট স্পেশালিস্ট, ব্রেন-স্পেশালিস্ট ..আরও কতকী ..যত উপাধি পেয়েছেন (হেসে) জুড়লে একমাইল লম্বা হয়। আমেরিকার দুদুটি প্রেসিডেন্টকে ফিরিয়ে এনেছেন from the jaws of death…" ইত্যাদি ইত্যাদি ঝাড়া দশ মিনিট তাঁর অঘটনী প্রতিভার স্তবগানের পর তাঁকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ব'ল জাহির ক'রে স-খেদে বলল: "কেবল দুঃখ এই যে সন্দীপ তাঁকে দুচক্ষে বেড়ে দেখতে পারে না। সে কি রকম অবুঝ জানোই তো। নৈলে বুঝতই বুঝত—গান শোনা ওর পক্ষে কেন ডেঞ্জেরাস।"

আমি বললাম: "কিন্তু তাহ'লে তুমি আমাকে সাত-তাড়াতাড়ি আসতে তার করলে কেন?

মৃন্ময় চোখ কপালে তুলে: "আমি? সে কি?" তারপর সব শুনে চ'টে বলল: "সন্দীপ করে নি তার—সে ম'রে গেলেও মিথ্যা কথা বলবে না—এ নিশ্চয় নীলিমার কাজ—আমার নাম ক'রে তার করেছে তোমাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনতে। খুব অন্যায়, খুব অন্যায়" বলতে বলতে আচম্‌কা উঠে চ'লে গেল ফের।

রাত তখন দশটা। আমরা খানে বসতে যাব এমন সময়ে টেলিফোন। মুরুব্বিয়ানা সুরেই মৃন্ময় বলল: "নীলিমাকে ক্ষমা করেছি। মেয়েছেলে তো, বেচারী ভয় পেয়ে তোমাকে তার করেছিল আমার নাম ক'রে—নৈলে তুমি হয়ত তাড়াতাড়ি ফিরবে না ভেবে। মরুক গে, একটি ভাল খবর আছে। ডাক্তার সাহেব এইমাত্র সন্দীপকে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন: "He is definitely out of the woo:—তাঁর শেষ দুটি ইঞ্জেকশনের delayed action. Long live science! কেবল বললেন—এখন ওকে অন্তত: সাত-আটদিন খুব সাবধানে রাখতে হবে। মানে…কিছু মনে কোরো না ভাই—ওকে গান-টান শোনানো এখন বন্ধ রাখতেই হবে।"

আমি একটু আতপ্ত সুরেই জবাব দিলাম: "কিন্তু তপতী বলছে ভগবানের নামে সন্দীপের মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হ'তেই পারে না।"

মৃন্ময় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: "ডাক্তারের চেয়ে তোমরা

বেশি জানো না কি—বিশেষ যে—ডাক্তার ওকে সারিয়ে তুলেছেন ? তুমি তো পারো নি। তোমার গান শুনে এসে সেদিন ও ফের পড়ে নি কি ?

আমি বললাম : "আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। তোমরা দুই সবজান্তা সায়েন্টিস্ট মিলে যা করতে চাও কোরো। কেবল ব'লে রাখি—রাগ কোরো না—তপতী বলল ও কাল রাত্রে স্বপ্নে ওর মাথার ওপর অশুভ কালো ছায়া দেখেছে—আর সে-ছায়া আজও ছিল সন্ধ্যাবেলা—যখন আমি ওর কাছে গান করছিলাম।"

"ছায়া ? You mean shadow ?"

"Bull's eye, my great scientist !"

"ঠাট্টা রাখো। হেঁয়ালির ভাষায় কথা কইলে যদি আমি বুঝতে না পারি তাহ'লে সে-দোষ কি আমার ?"

"মোটেই হেঁয়ালি নয়। কারণ বুঝতে চাইলে তুমিও বুঝতে পারতে। ছায়া বলতে বোঝায় অশুভ। গুরুদেবও কারুর কারুর মাথার উপরে ছায়া দেখতেন।"

মৃন্ময়ের ঝাঁঝালো হাসি বেজে উঠল টেলিফোনে : "আর অমনি তারা পটাপট শিঙে ফুঁকত ? Tell that to the marines, my credulous saint !"

আমি রাগ চেপে বললাম : "ঢের হয়েছে স্ল্যাং, ভাই, ক্ষ্যামা দাও—তেলে জলে কি মিল থায় ? চলি।"

"শোনো শোনো, I beg your pardon !—কিন্তু বলতে চাও কি যে, সন্দীপের মাথার উপর ছায়া দেখা মানেই তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি—দেখ এবার কিন্তু স্ল্যাং বলি নি একেবারে ভাগবত।"

আমি বললাম : "এ বলাবলির ব্যাপার নয় বন্ধু, বোঝাবুঝির ব্যাপার। সংসারে অনেক কিছুই ঘটে যা উগ্র বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না নম্র জিজ্ঞাসা দিয়ে বরণ করতে হয়। তবে এ-আলোচনা নিষ্ফল। কারণ তোমাদের ছাগল যদি তোমরা ল্যেজের দিকে কাটতে চাও—বাইরের লোকের কী বলবার থাকতে পারে ? ভাগনে তো মামারই সম্পত্তি। গুড্ নাইট।"

কিন্তু মুখে "শুভরাত্রি" বললে কী হবে—সন্দীপকে কী ক'রে ওর হাতে ছেড়ে দিই—তপতীর মৃত্যুছায়া দর্শনের পর ? সারারাত ভালো ঘুম হ'ল না। শেষ রাতে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে ব'সে সন্দীপের জন্যে প্রার্থনা সুরু করলাম। তপতী তখন পাশের ঘরে ঘুমচ্ছে।...

ঘণ্টাখানেক প্রার্থনার পরে মন শান্ত হ'লে চোখ চেয়ে দেখি তপতী পাশে ব'সে সমাধিস্থ। ভোরবেলার এক ফালি সোনার রোদ ওর মুখের উপর পড়েছে। কী পবিত্র মুখ ! আমি এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

একটু পরে ওর ধ্যান ভাঙল। আমাকে প্রণাম ক'রে বলল : "দাদা, সন্দীপ বাবুর জন্যে অত ভেবো না। যিনি সবাইকে দেখেন তিনি অমন সরল ভক্তকে দেখবেন না এ কি হ'তে পারে ?"

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম : "তুমি ঠিক বলেছ তপতী। আমি আর মন খারাপ করব না। এই মাত্র প্রার্থনাও করছিলাম—যেন সব দুর্ভাবনা ঠাকুরের 'পরেই ছেড়ে দিতে পারি। কেবল একটা কথা—তুমি শুধু একটিবার সন্দীপের ওখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো, ব্যস্। আমি গেলে হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে—তাই তোমাকে যেতে বলছি।"

তপতী আমাকে চা দিয়ে ট্যাক্সি ক'রে চ'লে গেল। আধঘণ্টা বাদে ফিরে এসে বলল : "বৃথা দাদা, অশান্ত বাবু ঘাঁটি আগলে ব'সে আছেন। আমাকে এমন কি নীলিমার সঙ্গেও দেখা করতে দিলেন না। শুধু বললেন ব্যঙ্গ হেসে : "সন্দীপ ভালোই আছে এইমাত্র ডাক্তার সাহেব দেখে ব'লে গেলেন কোনো ভয় নেই—ছায়ায় ওর কিছু করতে পারবে না ও-আলোর এলাকায়ই আছে—বিজ্ঞানের অমোঘ আলো।"

আমি বললাম : "কিন্তু এখানে প্রাণ নিয়ে টানাটানি যখন সন্দীপের, তখন সে কী বলে একটু জানার দরকার ছিল যে।"

তপতী চোখের জল মুছে বলল : "কিন্তু উপায় কী দাদা ! সন্দীপ বাবু ভক্তিমান্ হ'লেও তাঁর সর্বজ্ঞ মামাবাবুর সামনে কী রকম বেহাল জানোই তো। আমার মনে আছে—গুরুদেব একদিন গীতার পাঠ দেবার সময় বলেছিলেন যে, ঠাকুর ক্লৈব্যকে আমল দিতে পই পই ক'রে মানা করেছিলেন এই জন্যে যে, দুর্বলতাকে আমল দিলে আসুরিক শক্তিদের ডাক দেওয়া হয়, তাই তারা ছুটে আসে ঠিক যেমন হাওয়ার চাপ যেখানে কম সেখানে ছুটে

আসে হাজারো ঝড় ঝাপ্টা। এযে জীবনের ধর্ম, দাদা।"

আমি বললাম বিষণ্ণ সুরে: "জানি তপতী। কাল স্বপ্নে দেখেছিলামও ঠিক এই ব্যাপারই যে, সন্দীপ চাইছে উঠতে উপরের দিকে কিন্তু একটা পিছুটান আঁকশির মতন ওকে নিচু দিকে টানছে। শেষটা আঁকশিরই জয় হ'ল—ও প'ড়ে গেল মুখ থুবড়ে।"

তপতী বলল: "ঠিকই দেখেছ দাদা। সন্দীপ বাবু তাঁর মামার প্রতি ভক্তিকে এত বড় ক'রে দেখেন যে ঠাকুরের কৃপাকে ঘা খেয়ে ফিরে যেতে হয়।"

আমি বললাম: "একেই আমি বলি problem of choice তপতী। সব বুঝেও কেন মানুষ উঁচু দিকে উঠতে না চেয়ে নিচু টানের সঙ্গেই মিতালি করে?"

* * *

এর পরে দুদিন কোনো খবরই পাই নি সন্দীপের। ওদিকে ঘেঁষিও নি—মনটা ভাল থাকা সত্ত্বেও। কেবলই ভাবি তপতীর দেখা ছায়ার কথা। ভাগবতের কথাও থেকে থেকে মনে হয়—বিশ্বরূপের "ছায়াস্মৃ মৃত্যুঃ"—ছায়া হ'ল মরণেরই প্রতীক যে।

তিন দিনের দিন সকালে হঠাৎ মৃন্ময়ের টেলিফোন: "সন্দীপ কাল রাতে ঘুমের মধ্যে মারা গেছে হার্ট ফেল ক'রে। আমি যাচ্ছি বম্বে। আমার কাজ ফুরিয়েছে। ওর এক মেয়ে জামাই এসেছে। দুই ছেলেও কাল আসছে।" ব'লেই ক্লিক। বুঝলাম আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না।

শশধর: ঘুমের মধ্যে হার্ট ফেল? কী কাণ্ড!

তপতী: দাঁড়ান। কাণ্ড-র এখন হয়েছে কী। এ তো সবে কলির সন্ধে। (অসিতকে) দাদা, সংহারের পর এবার উপসংহারটা বলো পুনশ্চ দিয়ে।

অসিত: না, এবার তোমার বলার পালা। ও এখন শুনুক উত্তম পুরুষের মুখ থেকেই—অধম পুরুষের শোনা কথায় কাজ কী!

তপতী (রাগতঃ): কী যে তুমি! ছি ছি! (হেট হ'য়ে প্রণাম ক'রে) কেবল খোঁচা! ডক্টর সোম তরপে ওঠেন কি সাধে?

অসিত: মধুর চাকে খোঁচা না দিলে কি মধু মেলে বৎসে? বলো। না, বলতেই হবে তোমাকে—নৈলে—

তপতী: আচ্ছা আচ্ছা বলছি। শুনুন শশধরদা। আমরা ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম সন্দীপ বাবুর ওখানে পরদিন যাব—গোলমাল একটু কমলে। সারাদিনই অবশ্য সন্দীপ বাবুর কথা মনে হচ্ছিল, আর প্রশ্ন জাগছিল—ওপারে তিনি কেমন আছেন। সেদিন শেষ রাতে ধ্যানে বসতেই দেখি—সন্দীপবাবু! বললেন: "দাদাকে বলবেন আমি নতুন বাড়ীর চাবি খুঁজে পাচ্ছি না।" আমি বললাম: "আপনার বাড়ীর চাবি?" তিনি বললেন: না না। আমার বাড়ীর, আলমারি, লোহার সিন্ধুকের সব চাবি তো সরমাকে দিয়ে এসেছি। আমি বলছি এখানকার বাড়ীর কথা—যার চাবি আছে দাদার কাছে।" বলেই অন্তর্ধান।

সকালে চায়ের টেবিলে দাদাকে একথা বলতেই তিনি বললেন: "হঠাৎ সন্দীপ চাবির কথা বলল কেন কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনা। আর এই রহস্যময়ী সরমাই বা কে? বাড়ীর গিন্নি যখন নীলিমা তখন চাবির গোছা তো তার কাছেই থাকার কথা।" আমি তখন বললাম: "তোমাকে এতদিন বলি নি—তুমি সবাইকে ব'লে ফেলো ব'লে। নীলিমা আমাকে একদিন বলেছিল যে সন্দীপ বাবুর সঙ্গে ওর প্রায়ই খিটিখিটি হয়। তাছাড়া নীলিমার থেকে থেকে মাথা ঘোরে তো। তাই সন্দীপবাবু লোহার সিন্ধুকের চাবি ওর হাতে দেন না। সরমা কে বলতে পারি না—তবে মনে হয় ওঁর কোনো মেয়ে বা পুত্রবধূ হবে।"

শশধর: তারপর!

তপতী: আমরা সন্দীপবাবুর ওখানে যাব যাব ভাবছি এমন সময়ে একটি রোগা কিন্তু শ্রীমন্তিনী মেয়ে নামল ম্লান মুখে ডক্টর সোমের মোটর থেকে। নীলিমার মুখ বদানো। বুঝলাম সন্দীপবাবুর মেয়ে। শুনেছিলাম তাঁর তিনটি মেয়ের কথা—কিন্তু কে কোথায় থাকে জানতাম না। জিজ্ঞাসাও করি নি কোনোদিন, নীলিমাও বলে নি কারণ সে জানত সাংসারিক কথায় আমি পারৎপক্ষে থাকতে চাই না।

যাই হোক মেয়েটি ম্লান মুখে দাদাকে প্রণাম ক'রে বলল: "দাদাজি, আমাকে আপনি দেখেন নি কোনোদিন, কারণ আমি থাকতাম সুদূর আসামে আমার শ্বশুর-

বাড়িতে। শ্বশুর মহাশয় মারা যাওয়ার পর আমার স্বামী বম্বে আসেন বদলি হ'য়ে। মাত্র দশবারো দিন আগে এসেছি। আমি আপনার বন্ধুর মেয়ে—" ব'লে কেঁদে : "যিনি কাল রাতে আমাদের মায়া কাটিয়ে চ'লে গেছেন। …আমি শুনেছিলাম তাঁর অসুখ, তবে ডাক্তার দাদামনি আমাকে টেলিফোনে বলেছিলেন ভয়ের কোনো কারণ নেই তাই আমি আসি নি—আরো আমার অসুখ করেছিল ব'লে।" আমি বললাম : "তুমিই কি বম্বেতে স্নানের ঘরে প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলেন ?" সে বলল : "হ্যাঁ দিদি। মাথায় বিষম চোট লেগেছিল। মার মতন আমারও প্রায়ই মাথা ঘোরে—সারতে দেরি হবে, ডাক্তার বলেছে। তবু আমি আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার স্বামী আসতে দেন নি। মার ওপরে বেশি চাপ পড়বে ব'লে। এক রুগীকে নিয়েই অস্থির তিনি—আর ভার বাড়ানো কেন ?" ফের চোখ মুছে সে ব'লে চলল : "পরশুদিন—মানে শনিবার সকালে মা টেলিফোন করলেন ট্রাংক কলে যে বাবার মাথার অসুখ খুব বেড়েছে—এক আমেরিকান স্পেশালিষ্টকে ডাকা হয়েছে। শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না—মোটরে চ'লে এলাম। পৌছ-লাম রাত দশটায়। এসে দেখি বাবা নেতিয়ে পড়েছেন মাথার অসহ্য যন্ত্রণায়—আর এক লালমুখো গোরা ডাক্তার ইঞ্জেকশানের পর ইঞ্জেকশন দিয়ে চলেছেন।" ফের তার চোখ জলে ভ'রে এল, আঁচলে মুছে ব'লে চলল : "সে যে কী যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না দিদি ! তা হবে না ? জ্বর একশো চার, মাথায় ব্যথা বুকে ব্যথা, কষ্ট। এক এক সময়ে যেন প্রলাপের সুরে মিনতি : "দাদা দাদা দাদাজি… একটি গান আপনার…একটি অভয়ের গান'—ব'লে অশ্রুল কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে—'আমি জানি আপনার কীর্তন শুনলেই আমি সেরে উঠব—উঠবোই উঠব… তার পরই কথা জড়িয়ে আসে। দেখে মা মূর্চ্ছা গেলেন—সে আর এক বিপদ ! ডাক্তার দাদামণি অবিশ্যি তক্ষনি নার্স নিয়ে এলেন—কিন্তু আমি পড়লাম অথই জলে—আরো এই জন্যে যে তিনি আমাকে টেলি-ফোনের কাছে আসতেই দিলেন না—পাছে আমি আপনাকে ডাকি। কেবলই বলেন : উনি মস্ত ডাক্তার—ওঁর কথা না শুনলে বিপদ হবে। উনি প্রচণ্ড হার্ট-স্পেশালিষ্ট · এই সব ধুমধড়াক্কা।—ছাই স্পেশালিষ্ট। ঠাকুরের নাম শুনলে সব বিপদ কেটে যায় এটুকুও যে জানে না সে পোড়ার মুখো কী জানে শুনি ?" ব'লে একটু থেমে ফের চোখ মুছে ব'লে চলল : "কিন্তু বিপদ একলা আসে না তো দিদি ! এর পর সেই উনুন মুখোর সঙ্গে এল আর একটি হাঁড়িমুখো—স্পেশালিষ্টই হবে। দুজনে মিলে গুজুর গুজুর ক'রে পরামর্শ ক'রে দিল এক দুর্দান্ত ইঞ্জেকশন কী বলে যেন—হ্যাঁ ইন্টারভেনাস, ইন্টার-ভেনাস। নাম শুনেই আমি প্রমাদ গণলাম। কিন্তু উপায় কি ? মা-ও অন্য ঘরে শুয়ে—মূর্চ্ছা ভাঙে নি তখনো—তাছাড়া আমি কে বলুন ? আমার কথা ওরা শুনবে কেন ? দিল ওরা ফুঁড়ে সেই বিষম ইঞ্জেকশন। আর তারপরেই—যা হবার—বাবার যন্ত্রণা এত বেড়ে গেল যে কেবল কাৎরাতে লাগলেন—একবার ওঠেন আবার শোন এপাশ ওপাশ।" ব'লে ফের চোখ মুছে : "সে-যন্ত্রণা দেখে আমার ফের মাথা ঘোরা সুরু হ'ল। অতি কষ্টে সামলে বাবার মাথা টিপে দিই—পায়ে হাত বুলোই, কিন্তু বাবার ঐ এক কথা : "দাদাজি…দাদাজি…একটি গান …একটি ‥বলতে বলতে ক্রমশঃ কেমন যেন নিঃঝুম মতন অবস্থা। তারপর হঠাৎ চম্‌কে উঠে "দাদাজি দিদিজি !' হ'লেই আমাকে বললেন : 'তাঁদের আমার প্রণাম দিস।' ব'লেই নেতিয়ে পড়লেন। আমি ভয় পেয়ে ডাক্তার দাদামনিকে ডাকলাম, তিনি এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন : 'কিছু ভয় নেই…ঘুমিয়েছে। এসময়ে ঘুমই চাই। ঘুমই চাই। খুব সুলক্ষণ।' ব'লে পাশের ঘরে টেলিফোনের কাছে একটা সোফা টেনে ঘুমিয়ে পড়লেন।…তখন আমি একটু ভরসা পেয়ে মাটিতে মাদুর পেতে শুতে না শুতে ক্লান্ত চোখে আমার ঘুম ছেয়ে এল। ভাঙল যখন—ভোর পাঁচটায়—তখন…তখন সব শেষ হ'য়ে গেছে।" বলেই আমার কোলে ভেঙে পড়ল। আমি ওর মাথা বুকে টেনে নিয়ে বললাম : "অত কাঁদে না দিদি। তিনি ভক্ত ছিলেন, ঠাকুর তাঁকে দেখবেনই দেখবেন।"

সে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসে ফের চোখ মুছে বলল : "জানি দিদি কেবল এ দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না যে, ওরা শুধু ফুঁড়ে ফুঁড়ে বাবাকে মেরে ফেলল। যদি

দাদাজির গান শুনতে দিত তাহ'লে তিনি বেঁচে যেতেন—আমি জোর ক'রে বলতে পারি।"

আমি বললাম: "কিন্তু যারা জানে না, যে তারা অজ্ঞান তারা তো অজ্ঞানের হুকুমেই চলবে দিদি।…তাই তুমি অত কান্নাকাটি কোরো না। তাতে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে না।"

সে বলল: "ঠিক কথা দিদি। ঐ দেখুন, আসল কথাটাই বলা হয় নি, যে জন্যে আজ আসা। মা আমাকে আজ সকালে বললেন দাদাজিকে এই কথাই বলবে: যে, কাল শেষ রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে, বাবা খুব অশান্ত। বললেন মাকে: "আমাকে কেবল দাদাই শান্তি দিতে পারেন।"

দাদাজি চম্‌কে বললেন: "আমি? সে কি?"

সে বলল: "হ্যাঁ। মা বললেন—আজ তাঁর দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে দাহ করতে আপনি যদি সেখানে এসে একটু প্রার্থনা করেন তাহলেই বাবা শান্তি পাবেন।'

দাদাজি বললেন: "প্রার্থনা করব বৈকি মা। শ্মশানেও যাব নিশ্চয়ই। কেবল একটা প্রশ্ন করতে চাই—যদি কিছু মনে না করো।"

সে আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "মনে করব? সে কি!"

দাদাজি বললেন: "আমি জানতে চাই—তোমার বাবা তাঁর চাবি গোছা কাকে দিয়ে গেছেন?"

সে একটু অবাক হয়ে বলল: "আমাকেই দিয়ে গেছেন দাদাজি। বলছিলাম না—মার মাথা ঘোরে প্রায়ই? তাই পাছে চাবি হারিয়ে ফেলেন ব'লে বাবা পরশু দিন আমি আসতেই আমাকে চাবি দিয়ে বললেন: "সাবধানে রাখিস মা—লোহার সিন্দুকের চাবিও আছে এতে।" আমি বললাম: "তোমার নাম কী জিজ্ঞাসা করা হয় নি।"

সে বলল: "সরমা"

* * *

শশধর অবাক হ'য়ে খানিকক্ষণ তপতীর পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ উঠে প্রণাম করে।

তপতী (নমস্কার ক'রে ব্যস্ত হ'য়ে): করেন কী শশধরদা?

শশধর (হেসে) যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রষ্টারূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

মনের গহনে স্মরণ মনন হয় যেন মোর প্রিয়

ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

বিশ্বের মাঝে বিরাজিছ তুমি
তুমি ছাড়া কেহ নাই
অহং-জ্ঞানের অন্ধ বিচারে
তোমারে যে ভুলে যাই।
হৃদয়ে বাহিরে আলোকে আঁধারে
দেখা অদেখার পারে
কান্না হাসিতে তব আনন্দ
দোল দেয় বারে বারে।
তুমিই সগুণ তুমি গুণাতীত
সাধক তোমারে ডাকে

লোভ মোহ বশে মুক্তিরে চাই
পড়ে থাকি মোরা পাকে
তোমার মোহন রূপের লীলায়
ভুলিয়া মায়ার ডোরে
আমার আমিকে চিনিতে পারিনা,
তাই তুমি থাক সরে।
নাহি আর কিছু চাহিবার প্রভু
ভক্তিই প্রাণে দিও
মনের গহনে স্মরণ মনন
হয় যেন মোর প্রিয়।

যশোদা-মা'র জীবনে সাধু সমাগম

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত আশ্বিন সংখ্যায় ভারতবর্ষে ম তা আনন্দময়ী প্রসঙ্গে যশোদা মা'র কথা লিখিবার সঙ্কল্প জানাইয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা পূরণ করিবার ইচ্ছা করি। তাঁহার প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণ প্রেমজী, যিনি পূর্ব্ব আশ্রমে প্রফেসার নিকুসন নামে পরিচিত ছিলেন, ইংরাজী ১৯৬৫ নভেম্বর মাসে নৈনীতাল হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। আমি তাঁহাকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যশোদা মা'র জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি বলেন, "Dada, I want to keep my mind fallow (কৃষিমুক্ত) for some-time"। এক্ষণে মা'র মত অমূল্য জীবনের কথা আর কেহ লিখিতে পারিবেন কিনা, আমার জানা নাই। যশোদা মা পূর্ব্ব আশ্রমে মণিকা দেবী ছিলেন, তখন তিনি আত্মীয়তা সূত্রে আমার মাসিমার স্থান অধিকার করেন ও খুবই আপনার হ'ন। সেই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি তাহা বিনম্রচিত্তে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ জানাইতেছি। শেষে নিজ জীবনে আমি তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছি তাহারও আভাস দিলাম।

১

তাঁহার প্রবর্ত্তিত আলমোড়া আশ্রমে ইংরাজী শিলালিপিতে পাই:—তাঁহার জন্ম তারিখ—১৭ই জুন, ১৮৮২ এবং তাঁহার দেহত্যাগ হয়, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪৪।

মণিকাদেবীর জন্ম হয় গাজীপুরে গঙ্গাতীরে। গাজীপুর গোলাপ বাগানের জন্য বিখ্যাত। ইংরাজের আমলে এখানে অহিফেনেরও চাষ হইত কিনা জানি না। তবে Opium Depatment এর বড় দপ্তর এখানে ছিল ও সেখানে মণিকা দেবীর পিতা স্বর্গীয় রায় বাহাদুর গগন চন্দ্র রায় একজন বড় অফিসার ছিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত গগনবাবু একবার বিলাত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসেন। সে সব গল্প তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি। তিনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইলেও উদার হিন্দু ছিলেন। তাঁহার গাজীপুরের গৃহে প্রতি রবিবার ধর্ম্ম সভা বসিত। সেখানে ভজন, ভাষণ, কথাবার্ত্তা সবই ধর্ম্মবিষয়ে হইত। ঠাকুর রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পর, সম্ভবতঃ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় পর্য্যটন কালে গাজীপুরে পাওহারী বাবার সৎসঙ্গ পাইবার জন্য যখন আসেন, তখন তিনি প্রত্যেক রবিবারে এই ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত থাকিতেন, রাধাকৃষ্ণের ভজন গাহিতেন ও হিন্দু সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। গগনচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার জীবন কালেই স্বামীজী লিখিয়াছেন—"a gent leman whose innate nobility and spirituality have endeared him to all and to whom weowe our introducton to the saint" (Sketch of the life of Pauari Baba)

মণিকা দেবী তখন বালিকা। তাঁহার কথা স্বামীজীর জীবনী লেখকেরা উল্লেখ করেন না। তবে শুনা যায়, স্বামীজী এই সময়ে কয়েকবার তাঁহাকে বেল ও তুলসী পাতা দিয়া পূজা করেন। তাহা কুমারী পূজা কিনা, ঠিক জানা নাই। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় প্রণীত, "আবার ভ্রাম্যমান" পুস্তকের ২৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বালিকা মণিকার জীবনে ইহা কম আদরের কথা নহে।

শিশু বয়স হইতেই মণিকা যে সাধুসঙ্গের দিকে আকৃষ্ট হ'ন তাহা পাওয়ারী বাবাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা বলিতেন। পাওয়ারী বাবা গঙ্গাতীরে একটি গুহায় বাস করিতেন। তিনি পরম যোগী ছিলেন, পবন আহার করিয়া জীবনধারণ করিতেন, অন্য কিছু খাইতেন না। নিরবচ্ছিন্ন যোগে তন্ময় হইয়া থাকাই তাঁহার জীবনের সাধন ছিল। তাঁহার গুহার মুখে বিষাক্ত সাপের আড্ডা ছিল। কেহই গুহায় প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। বাহিরেই জল ও ফুল পাতা এবং নৈবেদ্য দিয়া যোগীঠাকুরের পূজা করিয়া স্থানীয় লোকেরা প্রসাদ লইয়া চলিয়া যাইতেন। শিশু মণিকা যখন সেইরূপ পূজার সময় ভৃত্যসহ উপস্থিত থাকিতেন, কাহারও মানা না শুনিয়া

গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেন ও কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইত যে পাওহারী বাবা তাঁহাকে কোলে করিয়া গুহার বাহিরে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া যাইতেন। এই ভাবে কুমারী মণিকা যে অল্প বয়স হইতেই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট।

২

কুমারী মণিকার বিবাহের সময় আসন্ন হইতেই তাঁহার পিতা গগনবাবু তাঁহাকে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সেই যোগ্য-পাত্রে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করেন। সে সময়ে তিনি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে মনোনীত করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিষয় বিশেষ ভাবে একটু জানিতে হয়। তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা পাইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু (ও পরে স্বনামধন্য) স্বর্গীয় মোতিলাল নেহেরু প্রভৃতির আগ্রহে আইন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ওকালতি করিতে তাঁহার ইচ্ছা না হওয়ায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকারী কলেজে ৺কাশীতে অধ্যাপকের কাজ স্বীকার করেন। সেখানে তাঁহার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া সেকালের থিওজফিকাল সোসাইটি (Theosophical Society) মিসেস্ বেসান্টের সঙ্গে তাঁহাকেও ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোর বিশ্বধর্ম্ম সভায় প্রতিনিধিরূপে পাঠান। সেখানে মান্দ্রাজ হইতে প্রেরিত স্বামী বিবেকানন্দ, কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে যুবক জ্ঞানেন্দ্রনাথকে নিজ আদর্শ সমর্থন করিতে হয়। ইহাতে তাঁহার পাশ্চাত্য দেশে প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয় ও তিনি বিদেশে বহু বন্ধুবান্ধব পান। যদি তিনি ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্য জীবনের ব্রত বলিয়া লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মত সুবক্তা চিন্তাশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির ভবিষ্যৎ যে কি হইতে পারিত তাহা বলা যায় না। কিন্তু তিনি ধর্ম্ম যাজনের দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনসংগ্রহ করিবার পথ সমীচীন না মনে করিয়া, গৃহস্থভাবে শিক্ষার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করাই সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন।

কুমারী মণিকারও সৌভাগ্য যে তাঁহার মত সাধু-মনীষীকে স্বামীরূপে বরণ করিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিদেশে খ্যাতি থাকায় তিনি প্রায়ই পাশ্চাত্য দেশে যাইতেন ও তাঁহার সঙ্গে মণিকাদেবীও অনেক দেশ ও দেশবাসীর সংস্পর্শ লাভ সম্ভব হইয়াছিল। মণিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা পাশ না করিলেও বিলাতী আচার ব্যবহার ও ভাষা অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। একবার ইওরোপ ভ্রমণকালে, কোন প্রার্থনা সভার পর, তিনি ও তাঁহার স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ, বারট্রাম কীটলি (Bertram Keightley) নামক এক ধনী বিদ্বান্ ও চিরকুমার তপস্বীর সংস্রবে আসেন। কীটলি সাহেব Wrangler (গণিতবিদ্), ব্যারিষ্টার এবং ব্রহ্মবিদ্যায় একজন পাণ্ড ছিলেন। তিনি কেমন করিয়া জানিতে পারেন যে মণিকা ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আত্মীয়তা চলিয়া আসিতেছে ও সেই কারণে নিজে বয়সে বড় হইলেও তাঁহাদের "মা ও বাবা" ডাকিলেন ও তাঁহাদের কাছে ভারতে জীবন যাপন করিবার জন্য এ দেশে আসিলেন এবং তাঁহার অতুল ধন-সম্পত্তি চক্রবর্ত্তী পরিবারের সেবায় নিয়োগ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যাতহিত অনুযায়ী তিনি লখনউ ও পরে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষার অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন ও কিছুকাল মাদাম ব্লাভাটস্কি (Madame Blavattsky) প্রভৃতি আধ্যাত্মিক নেতৃবর্গকে নিজ লেখনীর দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মৃত্যুকালে তাঁর উইলপত্রে লেখেন যে ৺কাশীতে গঙ্গাতীরস্থ তাঁহার প্রাসাদতুল্য গৃহ "রাধাবিলাস" কীটলি সাহেবের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল ও সাহেবের জীবদ্দশায় জ্ঞানেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীগণ কেহই তাহা কোন প্রকারের হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ উত্তর প্রদেশে এলাহাবাদ, কাশী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের মধ্যে একজন হ'ন এবং ইংরাজ লাট সাহেবেরা তাঁহাকে এতই সম্মান করিতেন যে ১৯২০ নাগাদ লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাঁহাকেই উপকুলপতি (Vice chancellor) মনোনীত করা হয় ও প্রায় ৫।৬ বৎসর কাল তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময়ে তিনি কয়েকজন গুণী ব্যক্তিকে সেখানে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে নাম করা সুপণ্ডিত ইংরাজও ছিলেন। ইংরাজীর অধ্যাপক নিক্সন, দর্শন অধ্যাপক চ্যাডউইক ও ডাক্তারী শাস্ত্রের অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই বিদ্যাদান করিতে আসিয়া মণিকা দেবীর (একণে

মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর) শিক্ষার্থী হইলেন ও পরে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং যখন তিনি যশোদা মা হইয়া সন্ন্যাসিনী হইলেন তখন তাঁহারই পথে তাঁহার অনুসরণ করেন। এ সমস্ত সুবিধা মণিকা দেবী তাঁহার স্বামী ডক্টর চক্রবর্ত্তীর পদমর্য্যাদার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইল। ১৯৩৭-এ তাঁহার স্বর্গারোহণ হইলে মণিকাদেবী (তখন তিনি যশোদা মা) লিখিত হিন্দীপুস্তক "পুনরাবর্ত্তন"-এর ভূমিকায় সাধকরত্ন রাধিকাপ্রসাদ লিখিয়াছিলেন:—"পূজ্য লেখিকা পরিচয় কেবল ইতনা কা কাফী হোগা কি আপ লব্ধ প্রতিষ্ঠ, জগদ্বিখ্যাত ডক্টর জি-এন্-চক্রবর্ত্তী, ভূতপূর্ব্ব vice Chancellor, Lucknow Uuiversity কী যোগ্য ধর্ম্ম, পত্নী হৈঁ। জিন হোনে...য়োরোপকেকইবার যাত্রা কীআর ও অন্তমে পতিদেব সে আজ্ঞা লেকর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ কিয়া হৈ।...হাল মে ডক্টর চক্রবর্ত্তীনে "শিব শিব" কহতে হুয়ে মহা সমাধিমে প্রবেশ কিয়া।...যহ এক শান্তিময়, মহত্বপূর্ণ জীবনকা উপযুক্ত অন্ত থা"।

৩

জীবনে যেমন সাধু সমাগম হইতেছিল, যশোদা মা'র অন্তর ততই সৎভাব ও সাধুভাবে বিকশিত হইতেছিল। উত্তর প্রদেশবাসী তাঁহার ছাত্র ও শিষ্যদের জন্য যে অপূর্ব্ব দুইখানি হিন্দীপুস্তক তিনি রচনা করেন তাহারা সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। "সরল ধর্ম্মশিক্ষা" কোথাও পাই নাই "পুনরাবর্ত্তন" পুস্তকখানি যাঁহারা যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমজী তাহার প্রকাশনের ব্যবস্থা করেন। The homeward Journey নাম দে'ন। ইহা The Universal Suppy Agency, 6 and 7, Clive Street, Calcutta হয়ত এখনও পরিবেশন করিতে পারেন। মূল্য দুই টাকা। আমরা এখানে প্রথমে পুনরাবর্ত্তন পুস্তক হইতে পাঠ লইব।

পুনরাবর্ত্তন বলিতে পুনর্জ্জন্ম বুঝায়। লেখিকা কিন্তু পুনর্জ্জন্ম আছে কি না ইত্যাদি শাস্ত্রীয় গবেষণা লইয়া আরম্ভ করেন নাই, তিনি বলেন, আমাদের জীবনেই দুঃখ-কষ্টের পুনরাবর্ত্তন চলিতেছে এবং এই চক্রের আবর্ত্তন যদি স্থগিত বা প্রশমিত করা যায় তাহা হইলেই আনন্দ ও ক্রমশঃ শান্তি পাওয়া যায়। আমাদের জীবনে "অকাল মৃত্যু হরণম্" ও "ব্যাধিবিনাশনম্" গুরুকৃপায় আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহা সাধন করিলে পর "পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"। পুস্তকের মলাটের উপর এই বাণী পাই। ইহা মায়ের মতই কথা। এখন জানিতে হয়, আমাদের জীবনে আমরা "দুঃখ" কেন পাই। যশোদা মা বলেন "দুঃখকে ভোগমে কোঈ ভগবান্‌কো, কোঈ আপনে ভাগ্যকো, কোঈ শাসন বিধানকো দোষী ঠহরাতে হৈঁ। যথার্থ মে হম আপনে দুঃখোঁ কো রচনা আপ করতে হৈঁ" (পৃ ২)। সেই কারণে নিজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। সাম্প্রদায়িক বা ধার্ম্মিক নির্য্যাতন, রাজনৈতিক পীড়ন বা সামাজিক অত্যাচার ও অবিচারের দিকে মনোযোগ দিলে বড় বড় রকমের পুনরাবর্ত্তনের চক্রে পড়িয়া পিশিয়া যাইবে, নিজের পথ খুঁজিয়া পাইবে না। সেই জন্য নিজ সত্তায় দোষ ত্রুটির অন্বেষণ করিলে ও ক্রমশঃ নিজের ভার নিজে বহন করিতে পারিলে, সংসারে উপকার হয়। এইখানে জীবনে পরে পরে পালনীয় কয়েকটি সহজ নিয়ম লেখিকা উদাহরণ সহ জানাইয়াছেন। যেমন:—(১) মন, বাণী এবং কর্ম্ম দ্বারা কোন প্রাণীকেই দুঃখ দিবে না। (২) অপরের দোষ না দেখিয়া নিজের দোষের অনুসন্ধান কর। (৩) নিজের দৃষ্টি সর্ব্বদা সত্যের দিকেই রাখিবে। (৪) নিজের আত্ম-স্বরূপ চৈতন্যের সঙ্গে একাকার হইতে হইবে। আমরা ত ঐ বিভুচৈতন্যের অংশ যেমন পুত্র পিতার অংশ। (৫) সকলের অর্থাৎ জীব মাত্রেরই সঙ্গে প্রেমপূর্ব্বক জীবন যাপন করিবে। (৬) বাহিরের রূপ ছায়া মাত্র। উহা ধরিয়া থাকিবেনা। ছায়া ধরিয়া থাকিলেদুঃখ পাইতে হইবে,কারণ উহাও মুছিয়া যাইবে। এইখানে খাওয়া, পরা, শয়ন করা, নিদ্রা যাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ম বলা হইয়াছে, যাহাতে অন্তরের শক্তির অপচয় না হয় বরং সুস্থ সবল থাকিয়া, জীবনের যে প্রধান উদ্দেশ্য, ভগবৎ সাধন, তাহাতে তন্ময় হইতে পারা যায়। যশোদা মা বলেন, জীবন ধারণ করিবার জন্য ডাক্তার, ঔষধ প্রভৃতির যেমন প্রয়োজন সেইরূপ সাধনার জন্য শাস্ত্র পাঠ ও গুরুনির্দ্দেশ সাহায্যকারী। পথে চলিতে চলিতে যেমন যাহা আবশ্যক তাহা আসিয়া যায়। তবে সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে গুরু অন্তরে রহিয়াছেন, কত ভাবেই তিনি

বাহিরে আত্ম প্রকাশ করেন। যাহা অন্তরে আছে, বাহিরে তাহারই প্রকাশ জীবনে অনুভব করা যায়।

এইবার ভিতরকার জীবনের স্তরগুলি সম্বন্ধে যশোদা মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা Homeward Journey পুস্তকের ভাষায় নমুনা স্বরূপ জানাই :—The plain fact is that unless we make difinite efforts to conrol our senses, then those senses will surely control us (p 27) I Egoism and sense desire keep us turned away from god (p 38) I As long nss there is consciousness of I" the separate self, so long there con be no consciousness of the Divine self and wherethe latter is, all self entirely dies" (p 32)

যশোদা মা'র উপরে ইংরাজীতে উদ্ধৃত কথাগুলি এত সরল ও সুন্দর যে তাঁহারই ভাবে আমি তাহা আত্মস্থ করিবার জন্য মনের মধ্যে এইরূপে লিখিয়া রাখিয়াছি :—

ইন্দ্রিয়ের দাস হবে না জীবনে তাহারা রহিবে ভৃত্য।
মনে প্রাণে বহু কামনার থালা, ঘোচে না ভবের নৃত্য॥
স্বার্থ পলিতা থাকিতে সঞ্চিতা, জ্বলিবে অহঙ্কার।
"অহং" থাকিতে "সোঽহং" ভাতিবে, কেন মিছে
আশা তার!

যশোদা মা সর্ব্বজনের হিতের জন্য প্রায়ই বলিতেন, "যত্র জীব তত্র শিব" (পুনরাবর্ত্তন, পৃ ১১) আবার সেই পুস্তকের প্রথমেই "অন্নপূর্ণা"র চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন সেই চিত্রে মাতা অন্নপূর্ণা এক হস্তে পরমান্ন ভাণ্ড ও অপর হস্তে পরিবেশনের পাত্র লইয়া বিশ্বজগতের সকল প্রাণীর ক্ষুৎপিপাসা মিটাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। পুস্তকের পরিশেষেও দেখি লেখিকা তাঁরই উদ্দেশে বলিতেছেন, "একমাত্র মাতা হী ক্ষুদা মিটা সাকতী হৈঁ। মাতা কে কৃপা সেহী হম অপনে শক্রওঁ কো জীত কর শ্রীকৃষ্ণ সেবা কে লিয়ে সমর্থ হো সকতে হৈঁ।...একমাত্র অন্নপূর্ণা কী কৃপা মে হী হম আপনে পিতাকে চরণোঁ মে, আপনে সচ্চে অধ্যাত্মিক স্বরাজ্যমে, "পুনরাবর্ত্তন" সকতে হৈঁ।"

অন্নপূর্ণা, শিব, ও সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সাধন পথের চির সাথী ছিলেন, যশোদা মা'র অধ্যাত্ম জীবনে। আমরা পূর্ব্বেই অবগত হয়েছি যে জ্ঞানেন্দ্রনাথও এই পথের পথিক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ জীবনে "শিবদুর্গা"র সাধক ছিলেন এবং কাশী ধামে তাঁহার নির্ম্মিত "রাধাবিলাস" প্রিয়জনদের উপহার দিয়া গেলেন। এইরূপ যুগল সম্মিলনেই, আমাদের হিন্দুর জীবনে সহধর্ম্ম পালন হয়।

৪

ডক্টর চক্রবর্ত্তী যখন কীটলি সাহেবকে লইয়া ৺কাশীতে বাণপ্রস্থ যাপন করিতে গেলেন (১৯২৫-৬) তখন যশোদা মা তাঁহার স্বামীর অনুমতি অনুসারে সন্ন্যাসিনী হইলেন। তাঁহার সহিত তাঁহারই দেওয়া নামাঙ্কিত প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণপ্রেমও চলিলেন। যশোদা মা'র শরীর নিঃশ্বাসের কষ্টের জন্য প্রায়ই অসুস্থ থাকিত বলিয়া হিমালয় বাস স্থির হইল। কৃষ্ণপ্রেমজী আলমোড়া জেলায় মীরটোলা নামক স্থান পছন্দ করিলেন। তখনকার ইংরাজ লাট সাহেব সেখানে বন বিভাগ হইতে এক সুপ্রশস্ত সম্পত্তি অতি সামান্য খাজনায় যশোদা মা ও তাঁর শিষ্য পরম্পরাকে প্রদান করেন। সেখানে চাষের জমি, ফলের বাগান, রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও কয়েকটি কটেজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া উঠে। প্রাঙ্গণে ঝরণাও ছিল। ইহার মধ্যে অতিথিশালা, ঔষধালয়, পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। পাঠশালায় যশোদা মা স্বয়ং নিয়মিত ভাবে পড়াইতেন ও গ্রামবাসীদের বিনা খরচে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা ছিল। ঔষধপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা ঔষধালয় হইতে হইত। Dr. Alexander যাঁহাকে যশোদা মা "আনন্দপ্রিয়" বলিয়া ডাকিতেন সেখানে সেবার কার্য্য জীবনের ব্রতরূপে পালন করিতেন। আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম, সমস্ত খরচ পত্র ত আপনাদের বহন করিতে হয়। আপনার পেনসন যদি আপনি না ছাড়িতেন, তাহাতে অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হইত না কি"? তিনি বিনীত ভাবে উত্তর দে'ন, "ভগবান কৃষ্ণ গীতায় কর্ম্মফল ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন"। আমি মূর্খের মত বলিলাম, "কর্ম্মফল ত্যাগ করিলে তাহাও ত একটা কর্ম্ম করা হয় এবং তাহার আবার ফলের প্রত্যাশা করা হয় না কি?" আনন্দপ্রিয়জী সশ্রুনেত্রে বলিলেন, "কি করি, যতটুকু প্রভু বুঝান তাই করি"। আমি তখন তাঁহার মর্ম্মবেদনা বুঝিয়া তাঁহাকে বলি, "আমি বুঝিয়াছি, আপনার কর্ম্মফল আপনি ত্যাগ করেন নাই, পরমদেবতার কৃপায় তাহা ত্যাগ হইয়া গিয়াছে।

এরূপ যখন হয়, তখন কোন আশঙ্কার আর স্থান থাকে না"। আমার মনে পড়ে, আনন্দ প্রিয়জীর ইংরাজী ঔষধ ও কৃষ্ণ প্রেমজীর জলীয় ঔষধ যখন রোগের উপশম করিতে পারিত না, তখন রোগীরা যশোদা মাকে বলিতেন ও মা তখন স্থানীয় বৃক্ষলতার "জড়ী বুটি" দিয়া অনেক সময়ে রোগীদের আরোগ্য করিতেন। এই ভাবে মা একবার কৃষ্ণ প্রেমজীকেও মারাত্মক ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। মা আমাকে পরে বলিয়াছিলেন, "যেখানে ব্যাধি ঠিক সেই স্থানেই ভগবান্ ঔষধের ব্যবস্থা রেখেছেন"। এইরূপে সেই আশ্রম ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের যশোদা মা অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন।

কিন্তু সব চেয়ে মধুর লাগিত, তাঁহার জীবনে কৃষ্ণপ্রেমজীর লীলা। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম নিজমুখে পরিব্রাজক দিলীপবাবুকে বলিয়াছিলেন, "মা'র সঙ্গে দেখা হবার আগে এমন কোন মানুষ আমার চক্ষে পড়েনি যিনি দেবদেবীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে কথা বলতে পারেন। মা যে ভাবে কথা বলতেন দৈবদর্শন দৈববাণী সম্বন্ধে, তখন বুঝতে পা'তাম যে এ সব ওঁর কাছে শোনা কথা নয়, চোখে দেখা। তখন আর দ্বিধা রইল না। বললাম, এঁরই শরণ নিতে হবে।" (শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় প্রণীত "আবার ভ্রাম্যমান" পুস্তক ২৫৭ পৃষ্ঠা।) কৃষ্ণপ্রেমজী শ্রদ্ধেয় দিলীপবাবুকে আবার বলেছিলেন, "ভাই, গুরুচরণে আত্মসমর্পণ বৈ পথ নেই।...গুরু তা করিয়ে নে'ন না কেন? গুরু তা করবেনই না। তিনি যে চান স্বেচ্ছায় আত্মদান। সংগুরু কখনই জোর করেন না। অপেক্ষা করেন, যতক্ষণ না ঘা খেয়ে আমরা ফিরি তাঁর চরণে আত্মসমর্পণের দিকে"। (দিলীপবাবুর ঐ পুস্তক পৃ ২০৬)।

কৃষ্ণপ্রেম ও যশোদা মা'র কথা ভাবিলে মনে হয়, গুরু ও শিষ্যের এইরূপ একীভূত জীবনের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সম্পদ কাল পরম্পরা ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে ও জীবন দেবতার ইচ্ছা অনুসারে চিরকাল চলিবে। যশোদা মা'র দেহত্যাগের পর কৃষ্ণপ্রেমজী বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন গুরুর অশরীরী সঙ্গতীর্থে। এক্ষণে কৃষ্ণপ্রেমজীর প্রিয় ইংরাজ শিষ্য আশীষ মহারাজ সেইখানে সেইভাবে তপস্থার ধুনী প্রজ্জলিত রাখিয়াছেন। তিনি আমাকে আশা দিয়াছেন, "Yogi Krishnaprem" নামে বোম্বাই থেকে যে পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তাহাতেও যশোরা মা'র সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণপ্রেমজীর দুইখানি পুস্তক The Yoga of the Katho Panishad" এবং "Man, the measure of things" দেশবিদেশের সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যাঁহারা যশোদা মা'কে কৃষ্ণপ্রেমজীর গ্রন্থে জানতে চান, তাঁহার রচিত "The Yoga of the Bhagvat Gita" পুস্তকে তাহা পাইবেন। তাই বোধ করি কৃষ্ণপ্রেমজী উৎসর্গলিপিতে নিবেদন করেছেন, "This book is dedicated to my Guru to whom alone is due whatever truth its pages contain".

৫

এইবার নিজের কথা একটু বলে শেষ করি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যখন যশোদা মা সন্ন্যাসিনী হইয়া উত্তর বৃন্দাবন (মীরটোলা) আশ্রমে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সেই সময় চাকরী উপলক্ষে আমার আলমোড়ায় যাওয়া হয়। আমি তাঁহার কাছেই গিয়া উঠি। আমার বেশ মনে পড়ে, বৈকালে তাঁর স্থানে গিয়া দেখি, বারান্দায় মাসিমা চেয়ারে বসে ভাগবত ব্যাখ্যা করছেন ও সম্মুখে কৃষ্ণপ্রেমজী কম্বলের উপর মেজেতে বসিয়া, পুস্তকখানি সম্মুখে রাখিয়া, শুনিতেছেন। তখন বৃষ্টি থামিয়া রৌদ্র উঠিয়াছে ও দূরে বদরীনাথ ও কেদারনাথ পাহাড়ের উপর শেষ উত্তাপটুকু ঢালিয়া দিয়া সূর্য্যদেব বিদায়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

আমি হাত মুখ ধুইয়া, মাসিমা'র কাছে বসিয়া কফি প্রভৃতি খাইলাম। মাসিমা সাধু হইয়াছেন, তবু এসব কোথা হইতে ব্যবস্থা হইল, তাই ভাবিতেছি। মাসিমা বল্লেন, "বাবা, রাতে তুমি আমার সাথে খাবে, না ওঁর সঙ্গে খাবে?" তখন জানিলাম, ডক্টর চক্রবর্ত্তী, প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম অবকাশে যেমন সমুদ্র সফরে বাহির হইতেন, সেবার তাহা না করিয়া আলমোড়ায় এখানেই আসিয়াছেন।

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাসিমা, আপনার সঙ্গে খেলে কি খা'ব, আর তা না হলে কি পা'ব, তা'ও বলুন।"

মাসিমা বল্লেন, "আমার সঙ্গে বৈষ্ণবী খাবার। আর ওখানে সাহেবদের মত"।

আমি তখনও নিরামিষ আহারে পোক্ত হই নাই। তাই হাসিয়া বলিলাম, "মাসিমা, আপনি যদি অনুমতি দে'ন, রাত্রে সাহেবদের সঙ্গে খাব। আর দিনের বেলা, আপনার সঙ্গে।"

তাহাই হইল। রাত্রে কৌটলি সাহেব, ডক্টর চক্রবর্ত্তী ও উত্তর প্রদেশের লাট দরবারের একজন ইংরাজ সদস্যের সহিত খানা খাইলাম। মাসিমা সব সময়ে আমার চেয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্নেহ দিয়া আমার অবস্থাটা সহজ করে দিয়েছিলেন ও আর সকলের সঙ্গে বেশ হাস্যকৌতুক ও গল্প করিতেছিলেন। আমার দৃষ্টি তখন খাবারের দিকে। তাই সে সব কথা এখন আর মনে নাই।

কয়েকদিন পরে নিজ বাসায় স্থিতু হইলে পর মাসিমার কাছে বেড়াইতে যাই। পথে আলমোড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি বৃদ্ধ রাম মহারাজজীর সঙ্গে দেখা হয়। ওখানে গিয়াই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম, তাই তিনিও আমার সঙ্গে চলিলেন।

এইবার মাসিমার হাস্যকৌতুকের একটু পরিচয় দিই। যত্ন করে বসাইয়া, এদিক ওদিককার প্রসঙ্গের পর মাসিমা বল্লেন, "বাসা ত স্থির হোল, এইবার মা ভাই-বোনদের নিশ্চয়ই আনবে। কিন্তু গৃহিণী না হলে গৃহ হয় না।"

আমার যাহা বলা উচিত ছিল না, তাহাই কেমন টপ্ করে বলে ফেল্লাম, "মাসিমা, মেয়েদের ছেলে দেখলেই আপনি সন্ন্যাসী করেন, আর নিজের ছেলেকে কাছে পেলেই গৃহস্থ হতে বলেন?"

মাসিমা কোন সময়েই অপ্রস্তুত হইবার পাত্রী নহেন। বল্লেন, "বাবা, চাকরী করবে, বিশেষ সরকারী চাকরী করবে, তারপর যদি বিবাহ না কর, তাহ'লে এ দেশের মেয়ের কি গতি হয় বল ত?"

একটু থামিয়া বল্লেন, "দেখ, আমার যে জীবন দেখছ, তা' সম্পূর্ণ আমার স্বামীর জন্য। আমি ত কিছুই জানতাম না। আমাকে শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিবার জন্য ভাল ভাল পণ্ডিত রেখে, সৎসঙ্গের জন্য বিভিন্ন ধরণের সাধু মহাত্মাদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে, আমাকে কত সুযোগ দিলেন ও নিজের সঙ্গে নিজেই পরিচিত হতে পারলাম, সে সব কি ভোলবার কথা বাবা, বাঙালীর মেয়ের জীবনে স্বামীর চেয়ে দেবার কেউ নেই।"

রাম মহারাজজী চুপ করিয়া ছিলেন। আমি সান্ত্বনা পাবার জন্য তাঁর দিকে দেখিলাম।

বৃদ্ধ সাধু মহারাজ কিন্তু মাসিমার পক্ষ লইলেন। তিনি বল্লেন, "অরুণবাবু হয়ত ভাবছেন এই ঠাণ্ডা পাহাড়ী দেশে আর একটা শরীরকে এ'নে তাকেও কষ্ট দিবেন কেন? কিন্তু কষ্ট হয় না, তাহাতে উভয়েরই আনন্দ হয়। আপনার কি সুবিধা হবে জানে'ন?" বলিয়া আমার দিকে দেখিলেন।

মাসিমা বল্লেন, "আপনি সাধু মানুষ। আপনি একটু বলুন ত।"

রাম মহারাজজী যেন তাঁর দিদিমার আমলের স্মৃতি মনে করে এক গাল হেসে ভেবে ভেবে বল্লেন, "তবে শুনুন একটা সেকালের ছড়া মনে পড়ছে—

"তেল তপ্ত, তপন, তুলো, তপ্ত ভাতে ঘি
পাপোষ, পাছুরী, আর শ্বশুরের ঝি
এ সব যার আছে, তার শীতে করবে কি?
আর; এসব যার নাই, তার শীতে হি, হি, হি!!!"

আমি ত অবাক্। সাধু মহারাজের কাছে এমন কথা আমি প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু রাম মহারাজজী এমনই শিশুর মত সরল ও মাতৃজাতির প্রতি তাঁর কি গভীর শ্রদ্ধা। তাই মাসিমার কাছে এসে, তাঁর বিগত জীবনের স্নেহে অভিভূত হয়ে একেবারে সেকালে চলিয়া গিয়াছিলেন।

আমি তাঁহার সহিত সুর মিলাইতে না পারিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলাম, "আর এসব যার নাই কপালে, ঠকঠকালে হবে কি!"

মাসিমা বল্লেন, "তার মানে?"

আমি বল্লাম, "মাসিমা, আমাদের দেশে বিয়ে আমরা করি না, আমাদের বিয়ে হয়। কেমন, আপনিই বলুন?"

মাসিমা বল্লেন, "সেই রকম, চাকরী হবে বলে ত হস্ত গুটিয়ে বসে থাক না। পরীক্ষায় পাশ হবার হলে হবে, বলে ত নিশ্চিন্ত থাক না। তবে আশ্রমধর্ম্ম পালনের বেলা অন্য বিচার কেন?"

মাসিমা কি যেন ভাবিতেছিলেন। তাই আরও শুনিবার জন্য নীরব রহিলাম।

মাসিমা বলেন, "এই দেখ, আমার সন্ন্যাস লওয়ার সময় আসিল, অমনই আমার স্বামী আমাকে নিজের হাতে গেরুয়া পরিয়ে দিলেন। শুধু তাই নহে। হিমালয়ে আশ্রমে বাস হবে, তাই আশ্রমের খরচের জন্য মাসিক তিনশত টাকার ব্যবস্থা করলেন, যতদিন এই শরীরটা থাকে। বল দেখি, স্বামী ছাড়া আর কা'র কাছে এত যত্ন মেয়েমানুষ অযাচিত পায়?"

মাসিমার অন্তরে দাম্পত্য জীবনের স্মৃতিবিজড়িত যে মধুময় আদর্শ সেদিন দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি আজও ভুলি নাই। তাঁহার কথাগুলি যেমন মনে আসিল, লিপিবদ্ধ করিলাম। এক্ষণে, গুরুদেবের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"মনে রাখিবা'র চির অবকাশ, থ'কে আমাদেরই বয়সে,
বাহিরে যাহার না পাই সাক্ষাৎ, অন্তরে জেগে রয় সে॥"

শরতের চিঠি

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

সম্পন্ন দিনের স্তব সবুজ ধানের ক্ষেত করে উচ্চারণ,
কৌশিক, তোমার কাছে এ-কথা আমার আজ
জানাতেই হবে;
ক্লান্তির যে-ছায়া দেখে নিরাশার আর্তি নিয়ে সহস্রের
মন,
সুফলা প্রান্তরে বসে আবার সে-বুকগুলি ভ'রে ওঠে
সংগীতের রবে।
মাঠের অস্তিত্ব আজ শ্যামলের ধ্যান নিয়ে সৃষ্টির প্রয়াসী,
সবুজ প্রচ্ছদপটে মর্মের কাহিনী বলে স্বপ্নিল আশ্বাসে;
এ-কথা জানাবো আমি ছন্দের এ সততায়, যাকে
ভালোবাসি,
কৌশিক, আমার চিঠি পড়ো তুমি একবার এ-আশ্বিন
মাসে।

আমার সম্মুখে আজ মাঠের অনেক কথা প্রেমের
মতন,—
কেবল ছড়িয়ে যায়, আমি তাই ধ'রে রাখি আকাঙ্ক্ষিত
সুরে;
মানুষ বাঁচতে চায় বলে' খায় স্নিগ্ধ শস্য, শরতের
প্রতীকী যৌবন:
সৃষ্টির সমৃদ্ধ ছবি টেনে আনে এ-শরৎ সকালে দুপুরে।

সাঁওতাল মেয়েটি চলে ধানের এ-আলপথে বাঁচবার
বিশ্বাসে,
কৌশিক, আমার চিঠি পড়ো তুমি একবার এ-আশ্বিন
মাসে।

একটী কচি ছেলের কান্না

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

না, না, না—কিছুতেই না—এই অভিশপ্ত দেশে আর জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়—জন্মশাসনে না হয়, আইনকানুন বৈজ্ঞানিক উপায়ে-অপায়ে না হয়, আসুন্ নেমে লোকক্ষয়-কৃৎ মহাকাল—তাঁর ডমরুতে বেজে উঠুক্ মৃত্যুর করাল পদধ্বনি—সংহারে সংহত সুর। এই ছিলো সুমিতার মত। দেশ মানে মাটি নয়, দেশ মানে মানুষ, যে মানুষ সুস্থ স্বস্থ, সিদ্ধি যর করতলায়াত্ত, ঋদ্ধি যার সম্যক্। তা নয়, কেবল জন্ম মৃত্যু বিবাহ। মরণকে অবশ্য রোধ করা যায়না, কিন্তু জননকে—কেন জন্ম দেবে পিতামাতা সন্তানকে, যদি না তাকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে পারে, খেতে পরতে শুতে দেওয়া শুধু নয়—স্বাস্থ্যে, ঐশ্বর্যে বীর্যে শৌর্যে রমণীয় কমনীয় করে তুলতে পারে, কেন সমাজশক্তি প্রশ্রয় দেবে সেই অশুভ বিলাসকে, কেন রাষ্ট্রনীতি আইনের নিগড়ে বাঁধবে না সেই সব স্ত্রীপুরুষকে যারা এই সব বিষয়ে বেপরোয়া—সেদিন আর নেই যেদিন লোকে বলত - জন্ম দিয়েছেন যিনি আহার জোগাবেন তিনি। অন্ন দেবার মালিক ভগবান্—চিন্তামণিই চিনি জোগাবেন—আজ তো সেই শক্তিকে লোকে উপহাস করে বলে—ভ্রান্ত আরণ্যকের নির্বোধ দুঃস্বপ্ন। সুমিতার অবচেতনে নয় সচেতন ভাবেই এই সব চিন্তার ধারা ঘুরতো। মা-বাপের বারোটি সন্তানের জীবিতদের নয়জনের একজন ছিল সে, হেলায় ফেলায়, দুঃখে দারিদ্র্যে শোষণে শাসনে মানুষ হয়েছিল একান্নবর্তী পরিবারে খুড়ো জেঠা পিসীমা জেঠীমার সঙ্গে, তাঁদের ছেলেপুলেদের সঙ্গে একত্র। বংশবৃদ্ধির অশোভন পরিণাম, তার মায়ের খুড়ীর, দিদির কষ্ট সে দেখেছে একমনে। তারপরে কোথায় কী ঘটে গেলো, যৌথপরিবার প্রথা গেলো ভেঙে, গ্রামীন সমাজ হলো চূর্ণ, সমাজ ব্যবস্থার হলো লোপ—হা অন্ন হা অন্ন শুধু মুখের বুলিতে নয় বুকের উপর আঘাত দিলে বুলেটের মত। কে কোথায় গেলো ভেসে, শুধু দেশ হলো ভাগ নয়, মনেরও হলো বিভাগ, স্নেহের, মমতার, শ্রদ্ধার, সবচেয়ে বড় হয়ে উঠলো অন্নচিন্তা চমৎকারা। খুব জেদী আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল তার, তাই টক্ টক্ করে পরীক্ষা সমুদ্র সাঁতরিয়ে গায়ের মেয়ে গিয়ে উঠলো মেডিক্যল কলেজের দরজায়। তার পরের ইতিহাসের পথপরিক্রমটা সরল ও ঋজু। পরীক্ষায় শুধু সসম্মানে নয়, প্রথম হয়ে পাশ করে সে পেয়ে গেলো বিদেশ যাবার সুযোগ। তারপর সে এসেছে এখানে।

কিসের একটা অস্পষ্ট শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো সুমিতার। হ্যাঁ, একটা কচি ছেলের কান্নাই বটে। ডাক্তার মানুষের ঘুমটা সজাগ হলেও সারাদিন চরকির মত ঘুরে রাত্রির নিদ্রাটি হতো নিবিড় ও উপভোগের জিনিষ, সামান্য স্বপ্নের খাদও থাকতোনা মেশানো, জড়িয়ে যেতোনা কল্পনার জালে ভাঙা ধ্যানের অল্প একটু আধটু টুকরো। বিবাহ করেনি, দেহে মনে তারজন্য কোন ক্ষোভ নেই তার, প্রিয়-বিরহিত সে, আত্মীয়দেরও বেশী আমল দিতো না। তার উপর ছিল অফুরন্ত দেহের শক্তি, সুনিয়ন্ত্রিত কাজের শৃঙ্খলা, মনের প্রশংসনীয় স্থৈর্য। কিছুতেই সে বিচলিত হতো না, কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারতোনা। সহর থেকে দূরে নূতন তৈরী শিল্প সহরের একটী চিকিৎসা সদনের সর্বাধিনায়িকা সে। দিনান্তে মহুয়া মাতাল রক্তপলাশের দল তাকে সাঁঝের বেলায় মাদলের বোলের সঙ্গে ডাকে, অস্তসূর্যের সঙ্গে তাল রেখে দীর্ঘ গৈরিক পথ হাতছানি দেয়, কিন্তু ঠাসা

কাজের বুননে সে আপনাকে ঘিরে রাখে—তার বত্রিশ বছরের মন্থিত মন আপনি মন্ত্রশান্ত সাপের মত নুইয়ে পড়ে। ক'বছর হলো এই কাজটাই বেছে নিয়েছে সে স্বেচ্ছায়, বিলাত ফেরত এফ্‌ আর সি এস্‌, ডি জি-ও হলেও। তার মার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম—তিনি করবেন তাকে নৃত্যপটিয়সী, গায়িকা, শিল্পী—কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। অর্থ ও আভিজাত্যের মোহ, দিনে রাতে পশারের স্বপ্ন, অতিকায় শহরের মায়াজাল, মোটা ব্যাঙ্কব্যালেন্স তাকে ধরি ধরি করেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল। চলে এসেছিল এইখানে, নিখুঁত ব্যবস্থায় গড়ে তুলেছিল এই প্রতিষ্ঠানটি গোড়া থেকে। পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ—মাতা তো সন্ন্যাসিনী বললেই হয়—সংসারের প্রতি ছিলনা কোন তেমন আকর্ষণ। শুধু একটি মানুষ তাকে ডাকতো গ্রামের দিকে—দামোদরের পারে। অনেকে বলতো রুক্ষ তার প্রকৃতি, কর্কশ তার ব্যবহার, লালিত্যহীন তার ভঙ্গী, তারাই আবার প্রশংসা করতো তার নিরলস নিষ্ঠার, অক্লান্ত সেবার, অদ্ভুত নিপুণতার। কত মৃত্যুপথযাত্রিণীকে সে টেনে নিয়ে এসেছে বৈতরিণীর ওপার হতে, কিন্তু কোন শিশু দ্বিজত্ব লাভ করেনি তার হাতে, কোন নূতন মায়ের গোপন আশীর্বাদ ঝরেনি চোখের জলের সঙ্গে। নিন্দাস্তুতিতুল্য মৌনী হয়ে যন্ত্রের মত কাজ করে গেছে সে নিঃশব্দে ঘড়ির কাঁটার মত প্রহরে প্রহরে। তার প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্ব বা মেটার্নিটি ওয়ার্ড ছিলনা। জন্মশাসনের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। এ বিষয়ে শুধু উৎসাহ নয় কঠোর মনোভাব ছিল তার।

অষ্টাদশী নার্স অমিতার গোপন অভিসার যেদিন হাতে-নাতে ধরা পড়লো, সেই মুহূর্তে তাকে বিদায় দিতে তার একটুও বাধেনি, যদিও সে ছিল তার অত্যন্ত প্রিয় এবং গ্রামসম্পর্কে কিছুটা নিকট। সে কেঁদে বলেছিল—দিদি, আমার কোথাও যাবার স্থান নেই, পরে একটু গুছিয়ে বসলে ও বলেছে বিয়ে করবে। শুষ্ক হাসি হেসে নিরাসক্ত কণ্ঠে সুমিতা বলেছিল—আচ্ছা, সেদিন নিমন্ত্রণ-পত্রটা পাঠিয়ো, এখন ত যাও, একঘণ্টার মধ্যে নার্স কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাবে, নইলে দরোয়ান—

আবার যেদিন কম্পাউডার শ্রীচরণের নামে নালিশ হলো যে মিকশ্চারের বদলে টিউবওয়েলের জল সরবরাহ হয়েছে ফ্রিওয়ার্ডে, সেদিন পুলিশের আসতে আধঘণ্টাও দেরি হলোনা। বাসায় এসে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরেছিল শ্রীচরণের সাতাশ বছরের স্ত্রী সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে, বলেছিল—মা, সাতসাতটি কচিকাঁচার মুখ চেয়ে এবারকার মতো মাফ্‌ করুন, মুখের অন্ন কেড়ে নেবেন না, ভগবানের দোহাই······

স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ধমক্‌ দিয়েছিল সুমিতা—সাতাশ বছরে সাতটি শিশুর জন্য দায়ী কি একলা ভগবানই? যখন তখন তাঁর নাম নিয়ে তাঁকে অপমান করবেন না, বেরিয়ে যান—

হাঁ৷ কড়ি ছেলের কান্নাই বটে! এই সব ঝামেলা থেকে রাত্রের বিশ্রাম নিরবচ্ছিন্ন করবার জন্যই হাঁসপাতাল থেকে দূরে তার বাড়ী। কাছে নার্সদের আস্তানা, কিন্তু সেখানে এই গভীর রাত্রে শিশু আসবে কোথা থেকে, অন্ততঃ সেটা যে রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ এটা তো সকলেরই জানা কথা। বিছানায় উঠে বসল সে, খোলা জানলার দিকে এগিয়ে গেল—দেখতে পেলে দূরে পরিচারিকা ও সহচারিণীদের কোয়ার্টারে একটি ছোট ছেলেকে বুকে নিয়ে ঘুরছে একটি মেয়ে এবং মাঝে মাঝে লুকিয়ে যেন চুমুও খাচ্ছে তার টুকটুকে লাল গাল দুটিতে। ভেবেছে গভীর রাত্রে সুপারিন্‌টেনডেন্টের শ্যেনচক্ষু এই ডিসিপ্লিন-ভঙ্গ দেখতে পাবেনা। না, এ চলবেনা। এতো শুধু নিয়মভঙ্গ নয়, স্বাস্থ্যের প্রতিকূলতা, ভাবালুতার প্রশ্রয়, হয়তো বা নীতির পথ থেকেও স্খলন।

তখনি একটা হেস্তনেস্ত করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সুমিতা, চোখে পড়লো সামনের বিস্তৃত দিগন্তটা—নিঝুম নিথর গভীর কালোর কোলে ডুবে রাত্রির তামসী-তপস্যার রূপের ছটা। মহাকাল যেন মহাকালীকে কোলে নিয়ে ধ্যানের নৈঃশব্দে ডুবে গেছেন। কালোর মধ্যেও কোথাও যেন একটা মালিন্যহীন আলোর অভিসার। কবিত্ব করার বাতিক একদিন তার ছিল, বয়সও পেরোয়নি, তবু সে চেয়ে চেয়ে দেখে, কেন এতদিন চোখে পড়েনি, সে কথাও ভাবে। নীল আকাশের দিকে দিকে হাজার হাজার তারকার পত্রলেখা, তারি আঁকা অসংখ্য জোনাকির ফুটকি—কালো রাত্রিকে যেন চমকি

বসানো নীলাম্বরী পরিয়ে চিন্ময়ী করে তুলেছিল। ওদিকে মৃন্ময়ী মায়ের বুকে গাছের ফাঁকে ফাঁকে একটা অস্পষ্ট ছায়ার রেখা। নগ্নিকার নিরাবরণ বুকে যেন নিরাভরণ বাঁধন পড়েছে কার নিরাবিল পরশে সারাদিনের কলরবে ক্লান্ত তপ্ত মেদিনী রাত্রির স্তোত্র পড়ে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়েছে এই রসস্পর্শের কাছে।

বুকটা কেমন করে উঠলো সুমিতার—বয়ঃসন্ধির যুগ থেকে অনেকগুলো দিন তো উবে গেলো মহাকালের নিঃশাসে নিষ্ফলা হয়ে, ভাবলে—নাঃ থাক্ কাল সকালেই যা হয় করা যাবে।

বিছানায় ফিরে এসে নিজেকে এলিয়ে দেয় সে —কিন্তু তার এতদিনের সাধা ঘুমে বাধ সাধলো কে? এ কী হলো তার, হজমের বৈলক্ষণ্য, না রক্তের চাপবৃদ্ধি, না বয়সের দোষ, না যৌবনের শেষ কামড়। বয়সের কথায় হাসি আসে তার। বত্রিশটি বসন্ত পিককুহরিত হয়ে তার বুকের উপর দিয়ে রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ করে চলে গেছে—শুনতে পাও নি? সময় কোথায় শোনবার? কেনই বা শুনবে সে—এককালে সে যে ভাববিলাসিনী ছিল না তা নয় যে ফাগুন দিনের আগুন-রাঙা রাতের কল্পনায়, নববর্ষার উতল ধারায়, দামোদরের প্লাবনে, বেত্রধারে বেতসী তরুতলে তার চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতোনা, একটু ঔৎসুক্য উৎকণ্ঠা প্রতীক্ষা জড়িত বুকের দ্রুততালে হৃৎস্পন্দন হয়তো বাড়তো—সেদিন অবচেতনে, ছুটি কচি হাতের নরমস্পর্শ জাগিয়ে তুলতোনা শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে তন্ত্রীতে মত্ত এড্রেনালাইনের তাণ্ডব। কে জানে—হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার পাতানো ঠাকুমাকে, তার বাপকে বুকের সুধা দিয়ে যে মানুষ করেছিল কতো উৎসাহ, কতো আশা নিয়ে। এই ক্ষুধা যে অনন্ত, এই 'তনহা' রাক্ষসীই জীবনবোধকে প্রবুদ্ধ করে জীবনবাদ থেকে জীবনবেদে নিয়ে যায়—কোনো বুদ্ধদেবই সে মারকে এড়াতে পারেনা। কোন 'ইজমই' সেখানে সম্পূর্ণ খাটেনা। সব যুগেই যদিও মানুষ গড়ে নেয় তার পথ ও মত, তবু সব পথ এসে মিশে যায় শেষে এক অনির্বচনীয় নির্বিশেষে, সেখানে সবাই সমান—পূর্ণ কে পূর্ণকে বাদ দিলেও পূর্ণ কুম্ভই ভরে ওঠে।

ছ্যাঁৎ করে ওঠে তার সজীব মন—সত্তার ফিলজফী আওড়াচ্ছে নাকি সে—নঃ মনকে বন্ধমুক্ত করতে গেলে আহুতি দিতে হয়।

২

তারও আগে জেগে উঠেছিল সুখদার বোন মোক্ষদা—সুমিতারই খাস্ পরিচারিকা। মাঝবয়সী পড়ন্ত যৌবনের শেষ রশ্মিরেখায় তখনও শ্রীময়ী ও সুগঠনা। আধো জাগ্রত ঘুমের ঘোরে চমকে উঠেছিল সে—অ্যাঁ, ঐ কাঁদচে না—

সেদিন আবার তার ঘরে এসেছিল তার সুস্পুষ্ট উচ্ছিষ্ট যৌবনের নবতম রসিক মালিক—তিনতরফা কণ্ঠিবদলের জোরে হাতবদলী দখলীসত্ত্ব নিয়ে।

হাঁসপাতালের কোয়ার্টারে ছেলে বা স্বয়ং স্বামীকে নিয়ে থাকা বেআইনী ছিল সুমিতাদেবীর রাজত্বে। শুধু হপ্তায় দুদিন তারা যেতে আসতে পারতো।

চোখ রগড়ে উঠে বসল মোক্ষদা, আলোটা জ্বাললে, তারপরে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলে—ছোটছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে কিনা—

প্রায় সমবয়সী গোরাচাঁদের উঠন্ত ভুঁড়িটা নাকের ডগার সঙ্গে তাল রেখে উঠছে আর নামছে, তার দিকে চেয়ে মোক্ষদা হঠাৎ বিতৃষ্ণায় কঠিন হয়ে ওঠে, মনে হয় একটা বিরাট্ অজগরের সর্পিল নিঃশ্বাস তাকে কুৎসিত লেহন করছে, আশ্চর্য হয়ে যায় রাতের পর রাত এদেরি হাত ধরে আবার ভাঙা ঘর মন জোড়া দিয়ে পাড়ি জমাতে চেয়েছিল সে। ঘনদুধ-খাওয়ার পর পিটুলি গোলা জল গেলা আর কি, হাসিও পায়, কান্নাও আসে। চিরকালের পুরুষের কাছে নারী চায় শুধু কি আদর-সোহাগ যত্ন প্রেম ভালবাসা না তারও অতিরিক্ত একটা কিছু যা রূপ নেয় রক্তমাংসে, যাকে দিনে দিনে লালন করতে হয় নিজের দেহের প্রতিটি কোষে। তাইতো চেয়েছিল সে—এখন স্বামীই হয়ে গেছে সেই শিশু। যে শিশু সে হারিয়েছিল এক অদ্ভুত রাতে, সে শিশু তার কোলে আসেনি আর ফিরে—দ্বিচারিণী সে হয়েছে, শুধু ঐ লোভে। কতো বছর হলো অনেক, অনেক দিন।

হঠাৎ রেগে সজোরে মানুষটাকে নাড়া দিয়ে বলে—এনম ঘুমকাতুরে নেশাখোর লোক দেখিনি বাপ্পু বাপে

জন্মে !

অতিকষ্টে চোখ মেলে চায় সে, হাত ধরে টেনে বলে—কি হলো, এতো রাত্তিরে ঘ্যানর ঘ্যানর কেন ?

আস্তে আস্তে মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করে—শুনতে পাচ্ছো ?

কী, খুলেই বল না—

কান্না—

চটে ওঠে গোরাচাঁদ—কান্না আবার কোথায়, ও কিছু নয়, টিপ টিপ বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ—ঠোট্ ফোলানো ছোট্ট ছেলের গোঙানীর মত—দিলে তো এমন জমাটী মৌজটা মাটি করে ?

না, না।

রাত তিনপহরে পাগলামীর আর জায়গা পেলেনা—ভোর পাচটায় তোমার ঐ সর্দারনী সুপারিন্টেনডেন্ট সুমিতা দেবীর চোখ এড়িয়ে পালাতে হবে—এখন আর ঢং পিরীতির সময় নেই—আর মিলের মালিকরা কিছু ভাই সম্বন্ধী নয়। মৌজ করে পাশ ফিরে সে নাক ডাকাতে সুরু করলে।

অনেকদিন আগের একটি ঘটনা তার চোখের উপর ভেসে উঠলো। তখন সে চাকরী করে কলকাতায়। সুমিতার কাছেই—সে তখন এক নার্সিং হোম খুলেছে। বিকেলবেলা ঠেলাগাড়ী ঠেলতে ঠেলতে, বুড়ী বিমলি বলে চলেছে—বাঁচে কিনা সন্দেহ, সারাদিন কাঁদচে, বৌটারও কি নাকাল, অতি বড় শত্তুরেরও যেন ওরকম রোগ না হয়।

লক্ষ্মীঝি মেজবৌএর খাস ঝি, বেশ গম্ভীয়ানী চেহারা, বললে—অনেক কিছু ডাক্তার ওষুধ মানত-মাদুলী গিন্নীমা ত করালেন, কপালে নেই, কাজের কিছু হলোনা—

রেখে দে তোর কপাল, কালে কালে কতই দেখলুম, কচিখুকী নই, পাপ—

বড়লোক মনিববাড়ীর নিন্দেয় লক্ষ্মী অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে পিছন পরে শ্যামার দিকে চেয়ে বললে—গিন্নীমা কুষ্ঠী দেখিয়েছিলেন দুষ্ট শনির দৃষ্টি পড়েছে—আচার্য ঠাকুর বলেছেন যে ডাইনীতে চোখ দিয়েছে, তা নাহলে আর অমন রাজপুত্তুরের মত ছেলে—মুচকি হেসে বিমলি বলে—সে তো ঠিকই, ডাইনীই, তবে সেটা মেজবাবুর ডাইনে বাঁয়ে—অমন রূপসী বিদুষী বউ, দুধেআলতা রং, দুর্গা-পিতিমের মত চেহারা, তারও রং কালি করালি। প্রথমটি ত ঐরকমেই গেল—ঐ যে আমাদের বড় লেডী ডাক্তার উনি তো দেখেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, বললেন—চিকিৎসার যতো দরকার ছেলের নয়, ততো বাপের—মার মার করে উঠেছিল কর্তারা—এ কী বেয়াদবী বিলেত ফেরত ডাক্তার, তায় মেয়েমানুষ—সোজা মুখের উপর জবাব দিয়ে চলে গেলো—আপনদের আদালতে নিয়ে গিয়ে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে চাবুক দিতে হয়—

লক্ষ্মী অপ্রসন্ন মুখে বলে—কাজ কী বাপু বড়ঘরের বড় কথায়, যৌবনকালে ও ধরণের একটু আধটু সবাইর থাকে—কিন্তু ছেলের ভাতের ঘটা দেখিছিলি শ্যামা—সাতদিন ধরে খেয়ে পেটের ব্যথায় মরি।

তা আর দেখিনি দিদি—কিন্তু ছেলেটাকে দেখলে কান্না পায়, যেন পেঁচোয় পেয়েছে—

বিমলি ছাড়বার পাত্রী নয়, ফোড়ন দেয়—শাশুড়ী মাগীও তেমনি, সারাদিনই বউএর পিছনে খিটিখিটি, ছেলে যে বারমুখো তা আর নজরে পড়েনা, ভাবটা বউ কেন বাঁধতে পারেনা ছেলেকে—নিজেরা যেন কতো পেরেছিলেন কর্তাদের। মোক্ষদা আঁচল খুলে একখিলি জড়দা দেওয়া পান বিমলিকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁ, মাসী, কি হয়েছে গা মেজবাবুর ছেলের ?

আর সবাই সহরের পোড় খাওয়া, চোখ টেপাটেপি করে। বুড়ী বিমলি মুখ ঘুরিয়ে বলে—থাম্ ছুঁড়ি নিজের চরকায় তেল দে কতদিন গাঁ ছেড়ে এসেছিস, গলা টিপলে দুধ বেরোয় যে এখনও, তা, মেঘে মেঘে বেলা ত কম হলো না ? শ্যামা হেসে বললে—বেশ ভাল পান তো, গিন্নীর ভাবর থেকে সরিয়েছিস বুঝি—

না, না মোক্ষদা তো ঐ নার্সিং হোমের বড় মেম-সাহেবের কাছে কাজ করে—বিমলি জবাব দেয়।

হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকারে সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওপরের দিকে তাকায়, ছোট্টছেলের সমস্ত শেষশক্তি নিংড়ে গলা ফাটানো সে এক করুণ কান্না। তার সাথে কান্নাভেজা মিহিগলায়—মর মর্ তুইও জুড়ো আমিও জুড়োই। সঙ্গে সঙ্গে কাংস্যকণ্ঠি শাশুড়ীর ভারিক্কি ধমক—রোগা ছেলের গায়ে হতে—এমন রাক্ষুসী মাকেও বলিহারি, কি অপয়া মেয়েকেই ঘরে এনেছিলুম—সংসার জ্বালিয়ে ফেললে, ঝাড়

মারি লেখাপড়া শেখা মেয়েদের—বংশের তিলক্ বেঁচে থাক, রাজা হোক—

চুপি চুপি শ্যামা বলে—বৌটাও ফুঁপিয়ে কাঁদচে—হে মা তারা মেয়ে জাতের কি পেহার।

হঠাৎ দামী মোটরের হর্ণে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। সেজবাবু এক জোড়া কুকুর সঙ্গে নৈশ অভিযানে বেরিয়ে গেলেন, গন্ধ ছড়িয়ে।

শ্যামা ফিস্ ফিস্ করে বলে—ঐতো মেজ বউ—মেজ বাবুর গাড়ীর হর্ণ শুনলেই বারান্দায় এসে দাঁড়াবে।

সেবলা তার কাজ ছিলোনা নার্সিং হোমে—সুমিতার কোন ফাই-ফরমাস থাকলে অবশ্য মোক্ষদা যায়। বাসায় গিয়ে নিজের দাওয়ায় বসে হাঁপাতে থাকে। মনে মনে সে মানত করেছিল ছেলেটিকে ভাল করে দাও ঠাকুর।

চোখের সামনে ফুটে ওঠে রুগ্ন শিশুর ব্যথাকাতর ডাগর চোখের অসহায় দৃষ্টি, পাশে সারা বিশ্বের অবিশ্বাস ও হতাশা নিয়ে তারি বয়স অতি বড় রূপসী একটি শুকনো মায়ের চোখে জলের রেখা।

কবছর আগের বানের রাতের কথাও মোক্ষদার মনে পড়ে। সেদিন আকাশের কি ভেঙে পড়া কাতরতা। মত্ত সাগরের উন্মত্ত নর্তনের মাঝে দুর্দম দোলনায় দুলতে দুলতে রুদ্ধ অভিশাপের ক্রুদ্ধ গর্জনে এগিয়ে এসেছিলেন মরণের দেবতা—সে কী রূপ, ধবধবে, বিরাট—মাথাটা গুলিয়ে যায় যেন—ভাবেতেই পারেনা সব কিছু খুইয়ে, সব কিছু হারিয়ে সে এখনও বেঁচে আর তাও এই হিংস্র নখর সমাজে উঃ না, ছেলেটা কাঁদচে না।

সেদিন সে সত্যিই রেগেছিল। মানুষটার কি আক্কেল জোয়ান মরদ জ্বরে ও আমাশায় ভুগে কঙ্কালসার, তিনদিন উপোষের পর না-খাওয়া না-দাওয়া, ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে চললেন কি না ভিন গাঁয়ে কীর্তনের আসরে। কীর্তনের নামে লোকটা যেন পাগল হয়ে যেত। সত্যিই তার মত খোল বাজিয়ে তল্লাটে আর কেউ ছিলনা। খোল যখন বোল দিত 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম নিতাইগৌর রাধেশ্যাম" তখন মনে হোত দুহাত তুলে 'জয় গোবিন্দ' বলে হেমকান্তি গৌরতনু নদেরনিমাই নেমে এলো

বুকটা মুচড়ে এলো মোক্ষদার—নীচু জাতের মেয়ে হলে কি হয়, সে বোষ্টমের আখড়ায় কণ্ঠী নিয়েছে চণ্ডালদেরও যিনি কৃপা করে গেছেন। গৌর বিনোদ বাবাজীর আখড়ায় এক জমাটী কীর্তনের আসরেই তার প্রথম রসের কলি ফুটেছিল। তখন বয়সই বা কতো সবে সতেরো—পিছছিপে তন্বী. গদাইএর বেটা ভীম তখন ভীমই ছিল বটে—সুন্দর সুঠাম চেহারা, ঢলঢল স্বাস্থ্য, চকমকে যৌবন। বুড়ো বাবাজী দেখে শুনে বলেছিলেন—রাধারাণীর কৃপা পেলেই হলো, গৌর হে সবই তোমার কৃপা।

কী দিনই গেছে—ভীমের দরাজ বুক, জোয়ান দিল, সবল পেশী, মুখর ভালবাসা—আর আজ গোরাচাঁদের মত মনে ও দেহে ক্লেদাক্ত মানুষ—গা যেন গুলিয়ে ওঠে তার কিন্তু পেটের দায়ে কারুর আশ্রয়ে বয়সকালে থাকতেই হয়—এই তো তাদের অলিখিত নিয়ম—তবু সে শিখছে কাজ রোগী পরিচর্যার যদি নিজের একটা আশ্রয় নিজেই জুটিয়ে নিতে পারে—বড় দিদিমণি ত আশ্বাস দিয়েছেন। তবে গোরাচাঁদকে ঘরে নিজে নিয়ে এলেও মোটা টাকা নিয়ে তার মা-ই তাকে জোর করে প্রায় বললেই হয় নিয়ম মত কণ্ঠীবদল করিয়ে দিয়েছে—তাদের জাতে এসব সচল।

মোটে দশ বছর আগের কথা, বাড় বাড়ন্ত ঘর, ক্ষেত-খামার, জোত-জমি গোয়ালভরা গাই বলদ—কোলভরা ছেলে। তার সারা দেহ থর থর করে কেঁপে ওঠে শিরদাঁড়া বেয়ে শির শির করে ওঠে গা। তারপর অজন্মা, দেনা, রোগ, মহাজন, ডিক্রী ক্রোক, মন্বন্তর, বান—সব ডুবে গেল। জিনিষ থেকে মানুষ অবধি, মনুষ্যত্ব থেকে সতীত্ব পর্যন্ত, ছেদ পড়লো প্রাণের ধারায়—সে বেঁচে আছে আজো—আশ্চর্য আর বয়স মোটে চব্বিশ।

সারাদিন পরে ঝড়বৃষ্টি মাথায় দুর্যোগঘন ভরা রাতে ভীম যখন ফিরেছিল তখন রাতটা অনেকখানি এগিয়েছিল। রেড়ির পিদিমটা গিছল নিভে—কোলের ছেলেটা মায়ের শুকনো বুকে দুধ না পেয়ে এলিয়ে পড়েছে ছেঁড়া কাথাঁর মধ্যে। বাইরে আকাশে বাতাসে জলে সে কী মাতামাতি মিতালী। ভীমের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে মোক্ষদার তপ্ত রাগটা গিছল জুড়িয়ে, মুখের 'রা' সে কাড়েনি। অমুখর মৌন অভিমানে শুয়ে পড়েছিল স্বামীর পাশে।

ভীম ভেবেছিল—নাঃ, বড্ড রেগেছে আজ, রাগবারই কথা।

শুধু তার গায়ে হাতটা রেখেছিল সে।

ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল মোক্ষদা।

শেষ রাতে সে কী জলের তোড় বাইরে কি গোঁ গোঁ শব্দ।

ওঠ ওঠ বান নেমেছে। মরাই এ যে কটা ধান ছিল ভেসে গেলো গোয়ালের গরু পর্যন্ত।

চালের উপর তারা পুঁটলি পাটলা নিয়ে, চারদিকে জল আর জল, অথই জলের রাজত্ব।

চালটা ছিটকে চলল বানের স্রোতে, অন্ধকারে লাগল একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা। কোলের ছেলেটা জলে পড়ল টাল সামলাতে না পেরে।

'গেল গেল' বলে চেঁচিয়ে উঠছিল মোক্ষদা।

নাড়ী ছেঁড়া প্রথম সন্তান—উঃ মাগো।

তাকে ধ তে গিয়ে ভীমও গেল তলিয়ে মহারবষার রাঙা জলে।

হায় ভগবান সত্যই কি তুমি ছিলে, না আজও আছো!

একটা জোর কান্নার শব্দে বর্তমানে ফিরে এলো মোক্ষদা—কাঁদচে, কে, কারা, কেন কাঁদচে? এবারে তার ভুল নেই, ঠিক শুনেছে সে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি, আশ্চর্য ভজহরির নাকের ডাকও বেশ শোনা যাচ্চে। মা, মাগো! অসহ্য, পেটের নাড়ীগুলোও বুঝি মোচড় দিচ্চে, বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে···এতদিনের সব কিছু অশুচি অজাত—

থাকতে পারলে না মোক্ষদা, বেরিয়ে পড়ল দৌড়ে। শুধু একটা কচি ছেলের কান্না নয় আর একটা গুমরে ওঠা চাপা কান্নার সুর—খোকা, খোকারে মানিক আমার—কতদিনের হারিয়ে যাওয়া শোনা সুর।

চলেছিল মোক্ষদা নিশিতে পাওয়া স্তিমিতের মত।

ঢং ঢং চারটে বাজলো—আকাশে কিন্তু একটু রক্তিম অরুণাভা—আর একটি হিরণ্যগর্ভ দিনজাগচে—জবাকুসুমসংকাশ দেবতা আসছেন কান্নার শব্দশুনে শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখলে সে যে ঠিক গেটের সামনে রক্তের কাদায় মাখা একটি সদ্যজ মাংসের ডেলা, কোন মায়ের ভুলের ফসল না কোন অভাগিনীর মমতাহীনতার পরিচয় কে জানে—তাড়াতাড়ি গিয়ে সে তুলে নিলে তাকে কোলে, গরমজল করে সেঁক দিয়ে মধু খাইয়ে যখন তাকে নিয়ে বেড়াচ্ছিল তখনই সুমিতার নজরে পড়েছিল সে।

ভরা ভোরের তিমিরহরন আলোয় কালকের নিদ্রানীরব ঝিল্লীমুখর রাতের ঘটনাগুলো মনে পড়লো সুমিতার। 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিতে যায় বারে বারে, আমায় জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।' দুর্বল হয়ে পড়েছে সুমিতা—একটি ছোটছেলের কান্না তার শক্ত নার্ভে এখনও অন্যসুর বাজিয়ে চলছে—না, না, সে ডিসিপ্লিন ভাংতে দেবেনা—দোষী যে তাকে শাস্তি দিতেই হবে।

ডাক পড়লো সকলের—চিত্রা, মিত্রা, বিনতি, মিনতি, সেবা, শুভা, কবরী, গীতা, চারু, ঘণ্টার মা, হরির মা, রামী, মেরী, সবাই জুটলো বড়দিদিমণির দরবারে।

গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন কাল রাত্রে ছোটছেলের কান্না শুনেছেন তিনি ক্যাম্পাসে—ব্যাপার কী? কোথা থেকে এলো ছেলে—জবাবদাও, আমি জানতে চাই ···কেউ কথা বলেনা—

এমন সময় তার নজর পড়লো—মোক্ষদা গরহাজির মোক্ষদা কোথায়—শীগ্‌গির ডাকো—

কোলে ছেলে নিয়েই ঢুকলো সে—শান্ত স্তব্ধ একটি দীপশিখার মত—একটি মা—

বড়দিদিমণির মনে পড়লো যেন ম্যুরিলোর ইম্যাকুলেট্ কন্‌সেপ্‌শনের ছবি এঁকে দিলে কে আকাশে—মেরীর কোলে যীশু, গণেশজননী না মা যশোদা, বড়দিদিমণির মুখ দিয়ে কথা বেরুলোনা—সকালের আলোর একটি তির্যক রেখা—জন্মশাসন প্রণালীর খসড়া দুড়ে পড়ে রইলো—হিরণ্ময় হয়ে উঠলো সমস্ত চত্বর। কেঁদে ককিয়ে উঠলো শিশুটি।

— স্মৃতিচারণ —

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

১

ঠিক আটষট্টি বছর আগে বয়স যখন দশ,
সেদিন থেকে বহির্জগৎ মাতায় আকর্ষণ
দিগ্ দিগন্তব্যাপী আকাশ জোগায় প্রাণে রস,
একলা বেড়াই মস্ত মাঠে শ্যামল কুঞ্জবনে।
চার আনা সের সর্ষের তেল, তিন টাকা মণ চা'ল,
চার পয়সায় মিল্‌তো ইলিশ, দু-পয়সায় দুধ,
পটোল বিকায় পয়সা সেরে, অপর্যাপ্ত ডা'ল,
কাঙাল মানুষ কক্ষণো কেউ চায়নি খেতে খুদ!

২

এমন দিনে হঠাৎ শুনি মরলো ভিক্টোরিয়া,
মাতৃশোকে দেশের মানুষ আকুল হোলো কেঁদে;
সেই ছোঁয়াচে কান্নাতে মোর জল আসে চোখ দিয়া,
স্বতঃস্ফূর্ত রাজভক্তির প্রকাশ দুঃখে খেদে।
লর্ড্ কার্জন বঙ্গভঙ্গ করলো যখন এসে,
সুরেন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র গর্জে বজ্রনাদে;
সঙ্গোপনে আমদানি হয় বোমা-পিস্তল দেশে,
সারা বাংলাদেশটা ক্ষেপে উঠলে প্রতিবাদে।

৩

পরদেশী ঢের শাসনকর্তা মরলো গুলী খেয়ে;
প্রশংসিত তাঁবেদারদের হোলো জীবন নাশ;
বঙ্গবিভাগ রদ্ করে' যায় আবার এসে ধেয়ে,
রাজধা'নী যায় দিল্লী নয়া গড়তে ইতিহাস।
দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধে সে কী বিপর্যয়!
পাকিস্তানের সৃষ্টিতে আজ টান্‌ছি তা'রো জোর্;
মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কী ভয়ানক ভয়!
অঢেল মড়া মানুষ দেখা কত না দুঃখের!

৪

বাল্যকালে গণ্ডগ্রামে ছিলাম পরম সুখে
অভাব কি যে কেউ বুঝিনি, স্বভাব ছিল খাঁটি;
আজ শহরে শীর্ণ দেহে ধুঁকছি অধোমুখে,
ভেজাল-দেওয়া খাদ্য খেয়ে জীবন হচ্ছে মাটি!
ছোক্‌রা দামাল ছোক্‌রা অনেক ধুঁকছে যক্ষ্মারোগে,
তন্বী শোভন সুন্দরীরা যায় অকালে মারা;
সবাই একটা নকল-করা বিলাসিতায় ভোগে,
স্বস্তি পেতে ধায় সিনেমায় হয়ে পাগল-পারা।

৫

দূর-অতীতে আসল মানুষ ঢের দেখেছি চোখে,
জীবন তাতেই ধন্য হোলো মধুর সঙ্গ পেয়ে;
স্পর্শ গভীর হর্ষ বিলায়, কর্ণে সুধা ঢোকে,
তাই আটাত্তর বর্ষে আজো চল্‌ছি হেসে গেয়ে।
ছন্দহারা ছন্নছাড়া নকল-বীশ নই,
রপ্ত করতে বেজায় ঘৃণা ধার-করা ভাব ভাষা;
ভাব গোপনের পণ্ডিতী নেই, প্রাণ খুলে সব কই,
কাব্য লিখে মন করে না পুরস্কারের আশা!

৬

আসবে না রে সুখের সুদিন, আসবে না আর ফিরে!
আর যাবো না মুগ্ধ হয়ে বড়াল-কবির কাছে!
বিশ্বকবির আলয় যেয়ে বসবো না আর ঘিরে!
সরোজিনীর শুনতে বাণী ছুটবো না আর পাছে!
আর পাবো না গিরিশ ঘোষের দেখতে অভিনয়!
শুনবো না আর জগদীশের অরবিন্দের কথা!
চিত্তরঞ্জন দাশের প্রাণের উক্তি সুনির্ভয়!—
ব্যর্থ এ'ন স্মৃতিচারণ, ব্যর্থ ব্যাকুলতা!

৭

হারিয়ে গেছে বন্ধু অনেক, বাল্যসহচরী!
মায়ের পেটের ভাই-বোনেরা, বাপ-মা ক্রমে ক্রমে!
হারিয়ে গেছে, আর পাবো না, বৃথাই তাদের স্মরি!
নির্জনে তাই পূর্বস্মৃতি মনের মাঝে জমে!
জীবন্-নদী চলছে ব'য়ে বড়ই সঙ্গীহীন!
হারিয়ে যাবে, সব হারাবে—স্বতঃসিদ্ধ এই;
জন্ম হলেই মরবে মানুষ প্রাচীন অর্বাচীন,
জন্মভূমি হারিয়ে গেল—এর বাড়া দুখ নেই!!

নাট্যকার অপরেশচন্দ্র

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১)

বাঙ্গালা সন তেরশত বাইশ সাল। হেতমপুর রাজবাড়ীতে বীরভূম-অনুসন্ধান সমিতির সহ-সম্পাদকরূপে বীরভূমের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের কাজে লাগিয়াছি এক বৎসর আগে। রাজবাড়ীতে ৺সরস্বতী পূজায় খুব ধুম হইত। যাত্রা, কবিগান, ঝুমুরীনাচ—সর্ব্বসাধারণের আমোদের উপকরণ ছিল প্রচুর। কলিকাতা হইতে মিনার্ভার দল লইয়া থিয়েটার করিতে আসিলেন অপরেশচন্দ্র। হেতমপুরের রাজাদের একটা সখের যাত্রা ও একটা থিয়েটারের দল ছিল। থিয়েটারের বাঁধা ষ্টেজ ছিল। দর্শকদের বসিবার আসন ছিল। কলিকাতার দল সেই ষ্টেজেই থিয়েটার করিবেন। মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন—অপরেশচন্দ্রের পৃথক বাসা দিয়া তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন আমার উপর। আমি হেতমপুরে যাওয়ার পর নানা কারণে কোন জ্ঞানীগুণী আসিলে রাজকর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর না করিয়া মহারাজকুমার তাঁহাদের দেখাশোনার ভারটা আমাকেই দিতেন। মহারাজকুমারের সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি "রমাবতী" নাম দিয়া একখানা নাটকও লিখিয়াছিলেন, ছাপাইয়া ছিলেন। রাজবাড়ীর ষ্টেজে সেটা অভিনীতও হইয়াছিল কয়েকবার। আমি এবং রাজাদের জমিদারীর ম্যানেজার বন্ধুবর শ্রীবনবিহারী ঠাকুর ঐ নাটকে অভিনয়ও করিয়াছিলাম একবার। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কয়েকবারই হেতমপুরে আসিয়াছিলেন। মহারাজকুমার তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন।

অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন প্রবোধ গুহ এবং রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসুর গুণী পুত্র জানকীনাথ বসু। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর আসিলেন লাভপুরের নাট্যকার নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে। তাঁহার সঙ্গে আমার এবং অপরেশচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। সুতরাং তাঁহার মাধ্যমে আলাপটা বেশ জমিয়া উঠিল। মহারাজকুমার কলিকাতায় গিয়া রিপণ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অপরেশচন্দ্রকে একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। কয়েক বৎসর পর নির্ম্মলশিবের "নবাবী আমল" নাটক লইয়া—আমি অপরেশচন্দ্রের ভালুকপাড়ায় কলিকাতার বাড়ীতে মাসখানেক থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানার বাসাবাড়ীই আমার সেদিনের কলিকাতার আশ্রয়স্থান ছিল। পনের কুড়িদিন এমনকি একমাস পর্য্যন্তও থাকিতাম আমি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার বাসায়। যতবার গিয়াছি—প্রথম দিনের মতই অনুজের অধিকারে প্রতিবার সমান স্নেহেই অভ্যর্থিত হইয়াছি। অকপট অন্তরের অনাবিল সরল মধুর স্নেহ। কলিকাতার বাসাবাড়ীতে, ষ্টার থিয়েটারে, নাগের বাগানে—পদাই মল্লিকের বাগানে, তাহার সাঁওতাল পরগণার জামতাড়ার বাড়ীতে—কখনো কখনো কয়েকদিন ধরিয়াই তাহার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী ছিলাম। আহার নিদ্রা বিশ্রাম এক সঙ্গে। সুতরাং আমি তাঁহাকে যেমন জানিয়াছি, চিনিয়াছি, বোধহয় অপর কাহারো সে সুযোগ ঘটে নাই। বাতের তীব্র আক্রমণ জনিত অপটু শরীরে নিজের হাতে তিনি বড় বেশী লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার "গণেশ" কর্ম্ম করিতাম প্রধানতঃ তিনজনে, জানকী বসু, রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং আমি। কখনো কখনো প্রবোধ গুহ। কর্ণার্জ্জুন হইতেই আমার গণেশ কর্ম্মের আরম্ভ বলিতে পারি। অনেকটা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসিয়া একটানা তিনি ছয় সাত ঘণ্টা বলিয়া যাইতেন। একবার সারারাত্রি জাগিয়া একখানা ইংরাজী নাটকই অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন মুখে মুখে। লিখিলেন জানকী

বসু মহাশয়। ঘটনাটা বলি—মিনার্ভায় থাকিতে তিনি সংবাদ পাইলেন ষ্টারে "সাইন্ অব দি ক্রশ" অনুবাদের চেষ্টা হইতেছে। প্রবোধ গুহ বলিলেন—"এরা নিশ্চয়ই মূল নাটক পায়নি। হয় উপন্যাস নয় বায়স্কোপের গল্পটা দেখে অনুবাদ করবেন। আমি এম্পায়ার থেকে মূল নাটক এনে দিতে পারি।" অপরেশচন্দ্র বলিলেন "আনুন"। প্রবোধ গুহ নাটক আনিয়া দিলেন। ঘণ্টা দশ ধরিয়া একাসনে বসিয়া তিনি নাটকখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন। নাম হইল "আহুতি"। "আহুতি" মিনার্ভায় অভিনীত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র নাটক লিখিয়াছিলেন অপরেশচন্দ্র চৌদ্দ দিনে। অভিনয় হইয়াছিল কোহিনুরে। গিরিশচন্দ্রের পরে এমন একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনয় শিক্ষক ও থিয়েটার পরিচালক বাঙ্গলায় আর দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না সেকালে। পাতিপুকুরের ওদিকে নাগের বাজারে কলিকাতার সুবর্ণ বণিক বংশের অন্যতম ধনীসন্তু গদাই মল্লিকের বাগানে তাঁহার অধিকাংশ নাটকই লিখিত হইয়াছিল। দিনে রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া গল্প গুজবেই কাটিত। বেশ ভোজনবিলাসী ছিলেন, ষ্টোভে ও ইকমিক কুকারে নিজেই রাঁধিতেন। খাওয়ার পর দীর্ঘ নিদ্রা। লিখিবার সময় খাওয়ার শেষে রাত্রি দশটা হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। গদাই মল্লিকের সর্দ্দারমালী জগা দশবারটি কলিকায় তামাক সাজিয়ে উপরে টিকা গুছাইয়া রাখিয়া যাইত। আমরা পরের পর কলিকায় আগুন দিয়া লইতাম। সিগারেট খাইতেন যে রাত্রে তামাকের পরিবর্ত্তে, একটী নূতন কৌটা খোলা হইত। রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত লেখা চলিত, ঐ সময়ের মধ্যে কলিকা কিম্বা সিগারেটও খতম হইয়া যাইত, পুড়িয়া ছাই! অপরেশচন্দ্র মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীয়ানার গৌরব করিতেন। বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি লইয়া তাঁহার মনে বেশ একটা গর্ব্বের ভাব ছিল। তবে ন্যাকামি ভণ্ডামি দেখিতে পারিতেন না। সুযোগ পাইলে আঘাতও হানিতেন নিজের নাটকে। বেশ মজলিশি লোক ছিলেন অপরেশচন্দ্র।

(২)

ভগবান মুখোপাধ্যায়ের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার ন'ড়ুগ্রামে। ভগবানের আরো ছয় ভাই ছিল, তাই ইহারা সাতভাই মুখুজ্জে নামে পরিচিত ছিলেন। লোকে বলিত "সাতভেয়েরা। ভগবান বিবাহ করিয়া মহেশপুরে শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করেন। মহেশপুর সেকালে ছিল নদীয়ায়, পরে যায় যশোরে। এখন কোথায়? সন ১২৮২ সালের ৪ঠা শ্রাবণ পিতার মামার বাড়ীতে মহেশপুরে অপরেশচন্দ্রের জন্ম হয়।

পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়—নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত "কৃষিতত্ত্ব" পত্রের সম্পাদক হইয়া কলিকাতায় আসেন। পাইকপাড়ার যে বাড়ীতে বিপ্রদাস থাকিতেন অপরেশচন্দ্র সে বাড়ী আমাকে দেখাইয়াছিলেন। টালার মুখুজ্জে বাড়ীর পাশের পাঠশালায় অপরেশচন্দ্রের পাঠ সুরু হয় পাঁচ বৎসর বয়সে। কিছুদিন পরে বিপ্রদাস মেদিনীপুরের একটি বিদ্যালয়ে হেড্ পণ্ডিত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন। সে সময় প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয় বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক ছিলেন। বিপ্রদাস মেদিনীপুরে যে পাড়ায় থাকিতেন সেখানে চৌকিদার রাত্রে রোঁদে বাহির হইয়া হাঁক দিত "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"। স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর তখন মেদিনীপুরে প্রবল প্রতিষ্ঠা। মেদিনীপুর হইতে বিপ্রদাস কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলায় বাসা লইলেন। তিনি মাসে মাসে খণ্ড খণ্ড আকারে পাকপ্রণালী বাহির করিতে লাগিলেন। অপরেশচন্দ্র প্রথম বেঙ্গল একাডেমীতে, পরে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে শেষে মেট্রপলিটানে আসিয়া কেতাবতী শিক্ষায় পূর্ণচ্ছেদ টানেন। সন ১২৯৯ সালের কার্ত্তিকী অমাবস্যায় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তখন স্কুলের শেষ পরীক্ষা হইত চৈত্র মাসে। তিনি পরীক্ষার খাতায় অঙ্কের প্রশ্নের উত্তরে দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশীর নিমচাঁদের বুকনীগুলি লিখিয়া রাখিয়া চলিয়া আসেন।

স্কুল যাতায়াতের পথেই তাঁহার থিয়েটারের যোগাযোগ ঘটে। স্বনামধন্য মনোমোহন পাঁড়ের পিস্তুতো ভাই নসীরাম (সুরেন্দ্রনাথ) তাহাকে এক আড্ডায় লইয়া যান। এইখানেই প্রভাকরের সুবিখ্যাত ঈশ্বর গুপ্তের ভাইএর নাতি মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ফলেই তিনি প্রভাকরে কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করেন। মাঝে মাঝে প্রুফও

দেখিয়া দিতেন। পরে "প্রয়াস" নামক একখানা কাগজেও লিখিতেন। বোধহয় রসময় লাহা এবং শৈলেন সরকার সম্পাদক। প্রয়াসের সংস্রবে সুরেশ সমাজপতি, কবি অক্ষয় বড়াল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়।

মণীন্দ্র গুপ্ত রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা থিয়েটার লইয়া নাম দেন প্যাণ্ডোরা। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস রিহার্সাল দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অভিনয়ের সুযোগ হয় নাই। বাড়ীতে মা নাই, তার উপরে থিয়েটারে যাতায়াত! পিতার কঠোর তিরস্কারে অপরেশচন্দ্র দেশত্যাগী হইলেন। প্রথম বর্দ্ধমান, পরে রাণীগঞ্জ তাহার পর পাটনা, কাশী, জামালপুর, ভাগলপুর ঘুরিয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন। কিন্তু দিন-যাপনের উপায় কি? কিছুদিন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার কে, বি, দত্তের পিতাকে ভাগবত শুনাইতেন। বৈকাল হইলেই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন। দেখিতেন একটি চৌকির উপর গ্রন্থখানি সাজানো আছে। দত্তের পিতাঠাকুর বলিতেন এসেছেন ব্রাহ্মণ, প্রণাম। পাঠ শুনাইয়া জলযোগ। দত্তের পিসীমা পরিপাটিরূপে জলখাবার খাওয়াইতেন। কিছু প্রণামীও মিলিত, কিন্তু সে যৎসামান্য। ঠিকাদারীর কাজে কিছুদিন গেল। কিছুদিন গেল ই, আই আর-এর পার্শেল অফিসে। অতঃপর হোরমিলার কোম্পানীর কেরাণীগিরি প্রায় ছয় বৎসর। এমনই করিয়া আট নয় বৎসর কাটিয়া গেল। থিয়েটারের সঙ্গে যে সম্বন্ধ কিন্তু অক্ষুণ্ণ ছিল। নলডাঙ্গার জমিদার এক বন্ধুর থিয়েটার ছিল। এই থিয়েটারেও তিনি যাইতেন। এই বন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরভূমে সিউড়ীতে এস, ডি, ও হইয়া আসিয়াছিলেন—সুরেশরঞ্জন দেবরায়। সিউড়ীতে থিয়েটার করিতে আসিয়া অপরেশচন্দ্র দেবরায় ও তাঁহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। মা একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া দুপুরে খাওয়াইলেন। আমি সঙ্গে ছিলাম। সন তেরশত চারি সাল কি পাঁচ সাল পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

সন ১৩১১ সালে নড়াইলের জমিদার বন্ধুর ইণ্ডিয়াম থিয়েটারে যোগ দিয়াছিলেন। শিক্ষক অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী। অধ্যক্ষ জানকীনাথ বসু। কপালকুণ্ডলায় নবকুমার, চন্দ্রশেখরে চন্দ্রশেখর এবং জনায় প্রবীরের ভূমিকা শিক্ষা করিয়াছিলেন, অভিনয় হয় নাই। এই বৎসরেই মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা থিয়েটার লীজ লইয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভায় আসেন। অধ্যক্ষ চুণীলাল দেব। শনিবারে কপালকুণ্ডলা ও রবিবারে সংসার অভিনীত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। অভিনয় করিবার কথা মনোমোহন গোস্বামীর। বৃহস্পতিবার তিনি নোটীশ দিলেন "আর থিয়েটার করিব না"। অর্দ্ধেন্দুশেখরের নির্দ্দেশে চুণীলাল অপরেশচন্দ্রকে শনিবারে নবকুমার ও রবিবারে প্রিয়নাথের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে তুলিলেন। পাবলিক থিয়েটারে সেই অপরেশচন্দ্রের হাতে খড়ি। অপরেশচন্দ্র কিছুদিন এমারেল্ড থিয়েটারে মহেন্দ্র বসুর নিকটও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তিনকড়ি মাঝে মাঝে অভিনয়ে নামিতেন। জনায় তিনি জনা, চুণীলাল প্রবীর। এক রাত্রিতে চুনীলাল অপরেশচন্দ্রকে প্রবীরের ভূমিকা দিয়া নিজে অর্জ্জুন সাজিলেন। তিনকড়ি নূতন লোক দেখিয়া রাগ করিয়া চুনীলালের নিকট নালিস জানাইলেন। কিন্তু চুনীলালের দৃঢ়তা দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং নূতন অভিনেতা অপরেশচন্দ্রের সঙ্গেই অভিনয় করিলেন। অপরেশচন্দ্র ও-দিনের কথা বিস্মৃত হন নাই। নিজের সুদিনে এবং চুনীলালের দুর্দ্দিনে তাঁহাকে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডে আনিয়া এই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। আমরা অযোধ্যারবেগমে তাঁহাকে সুজাউদ্দৌলার ভূমিকায় দেখিয়াছি। সন ১৩১১ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ মিনার্ভায় ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রতাপাদিত্য অভিনীত হয়। চুনীলাল প্রতাপ, অর্দ্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্য ও রডা। অপরেশচন্দ্র শঙ্কর। তারাসুন্দরী কল্যাণী। চুনীলালের প্রণীত "নাসিব" এবং অর্দ্ধেন্দুশেখরের "ভগবান ভূত" জমিলনা। টাকার খুব টানাটানি! মিনার্ভার দল গেলেন মফঃস্বলে, কটক ঘুরিয়া মালদহ। ঝগড়া বাধিয়া দল ভাঙ্গিয়া গেল। চুনীলাল দল ত্যাগ করিলেন। গিরিশচন্দ্র আসিলেন মিনার্ভায়। ১৩১১ সালে ৩রা ফাল্গুন অধ্যক্ষরূপে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হইল। তাঁহার হর গৌরী জমিল না। ১৩১১ সালের ২১শে চৈত্র গিরিশচন্দ্র "বলিদান" খুলিলেন—করুণাময় গিরিশচন্দ্র, দুলাল চাঁদ দানী (সুরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্রের পুত্র) অপরেশচন্দ্র কিশোর। বলিদান খুব জমিয়াছিল। ১৩১২ সালে

শ্রাবণ মাসে রাণাপ্রতাপ খোলা হইল। দানী প্রতাপ, অপরেশচন্দ্র সক্তসিংহ। ১৩১২ সাল ২৪শে ভাদ্র গিরিশ চন্দ্রের সিরাজউদ্দৌলা অভিনীত হইবে। মনোমোহন পাঁড়ে চাহেন সিরাজ অপরেশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র চাহেন সিরাজরূপে দানীকে। মতভেদের সূচনায় তিনি গিরিশ-চন্দ্রকে সিরাজের ভূমিকা লিপি ফেরৎ দিয়া মিনার্ভা হইতে চলিয়া আসেন।

৩

অক্ষয়, কালীকুমার তাঁহাকে ষ্টারে লইয়া গেলেন। অবৈতনিক অভিনেতা রূপে তিনি যোগ দিলেন অমৃত মিত্রের নিকট শিক্ষার আশায়। পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে মোহনলালের ভূমিকায় প্রশংসা অর্জ্জন করিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। শরচ্চন্দ্র রায় কোহিনূর খুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অপরেশচন্দ্র তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৩১৪ সালের ২৬শে শ্রাবণ চাঁদ বিবি অভিনীত হইল। অপরেশ মালোজীর ভূমিকায় প্রশংসা অর্জ্জন করিলেন। বৎসর দুই কোহিনূরে থাকিয়া নিজে এক থিয়েটার খুলিলেন—বাণী থিয়েটার। বাণী থিয়েটার চলে নাই। বাঙ্গলা ১৩১৬ সালের শেষের দিকে ইং ১৯১০ সালে এম্পায়ার থিয়েটারে আমেরিকান টুরিষ্টদের জন্য একটা অভিনয়ের আয়োজন হয়। ব্যারিষ্টার শ্রীশচন্দ্র বসু উদ্যোক্তা। বাণী থিয়েটার এম্পায়ারে অভিনয় করেন। এই খানে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে ঘনীভূত হইয়াছিল। প্রবোধচন্দ্র থিয়েটারের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। বাণী থিয়েটারে লোকসান হওয়ায় অপরেশচন্দ্র পুনরায় মিনর্ভায় আসিলেন সন ১৩১৭ সালে। তখনো গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায়। মনো-মোহন পাঁড়ে স্বত্বাধিকারী। ১৩১৮ সালে মহেন্দ্র মিত্র মিনার্ভা লীজ লইয়াছিলেন। এই সময় প্রকাশ্য নীলামে মনোমোহন পাঁড়ে কোহিনূর কিনিয়া লন। মহেন্দ্র মিত্রের মৃত্যুতে পুনরায় মনোমোহন মিনার্ভার দখল লইলেন। কোহিনূর হইতে আবার অপরেশচন্দ্র মিনার্ভায় আসিলেন। অভিনয় করিলেন—গৃহলক্ষ্মী নাটকে হীরু ঘোষালের। বেশ প্রশংসা হইল। ১৩১৯ সালের ৫ই আশ্বিন গৃহলক্ষ্মীর প্রথম অভিনয়। ১৩২১ সালে তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। সেই সময়েই প্রথম নাটক অপরেশ-চন্দ্রের রঙ্গিলা মিনার্ভায় অভিনীত হয়। কিন্তু তিনি কোন কারণে মিনার্ভা ত্যাগ করেন।

পুনরায় তিনি মিনার্ভায় ফিরিলেন ১৩২২ সালে।

১৩২২ সালে উপেন্দ্রনাথ মিত্র মিনার্ভা লীজ লইলেন। অধ্যক্ষ হইলেন অপরেশচন্দ্র। দ্বিতীয় নাটক আহুতি, তৃতীয় নাটক শুভদৃষ্টি ও চতুর্থ নাটক রামানুজ মিনার্ভায় অভিনীত হইল। মিনার্ভায় কাটিয়া গেল কয়েক বৎসর। ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি ষ্টারে যোগ দিলেন—গিরীন্দ্র মল্লিকের সঙ্গে। দেড় বৎসর পরে নিজেই ষ্টারের ভার গ্রহণ করিলেন। সন ১৩২৭ সালে অপরেশচন্দ্রের রাখীবন্ধন ষ্টারে অভিনীত হইল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে অভিনীত হইল ছিন্নহার, বাসবদত্তা, অযোধ্যার বেগম। অপ্সরা সুদামা ও অযোধ্যার বেগম ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অপরেশ-চন্দ্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। ১৩২৯ সালের ৺বিজয়া দশমীর দিন তিনি "কর্ণার্জ্জুনের" কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

সন ১৩৩০ সালের বৈশাখ মাসে অপরেশচন্দ্র আর্ট থিয়েটার। লিমিটেডকে লীজ দিলেন ষ্টার থিয়েটার, অধ্যক্ষরূপে রহিলেন নিজে। আর্ট থিয়েটারে তাহার প্রথম নাটক কর্ণার্জ্জুন। শত রাত্রির অভিনয় উৎসবের আয়োজন হইল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ মিলিয়া অপরেশচন্দ্রকে সেই উৎসব সভায় নাট্যবিনোদ উপাধি প্রদান করেন। নাট্যকার নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে এক রাত্রিতে এই উপাধি অপরেশচন্দ্রের হস্তে প্রদানের আয়োজন করেন। অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে কথা বলিয়া ঐ তারিখ স্থির করা হইয়াছিল। সময়ও তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু আসিলেন না। ফোন করিয়া জানিলাম হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলিলেন অনিলবরণের স্মরণ ছিল না। একটা সভা হইতে তিনি ষ্টারের পাশ দিয়েই ফিরিয়াছেন। এখন বড় ক্লান্ত, আর আমরা তাঁহাকে বলিতে পারিব না। সে দিনের আয়োজন পণ্ড হইয়া গেল। টাকা গেল নির্ম্মল শিবের। আর্ট থিয়েটারে পর পর অপরেশচন্দ্রের নাটক—ইরাণের রাণী, বন্দিনী, শ্রীকৃষ্ণ, চণ্ডিদাস, মগের মুলুক

পুষ্পাদিত্য, ফুল্লরা, মন্ত্রশক্তি (অনুরূপা দেবীর উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত) শকুন্তলা, শ্রীগৌরাঙ্গ, পোষ্য পুত্র (উপন্যাস হইতে), এবং মা (উপন্যাস হইতে) এই নাটকগুলি অভিনীত হয়। অপরেশচন্দ্রের রচিত এক-খানি উপন্যাস ছিল ভদ্রা। এতদ্ভিন্ন "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" নামে তাঁহার অন্য এক খানি গ্রন্থ আছে। রঙ্গালয়, নাটক ও অভিনেতা লইয়া আপন স্মৃতি পরিক্রমার এইখানে ত'র পরিচয় পাবেন।

সিরাজউদ্দৌলায় তিনি অভিনয় করিবার সুযোগ পান নাই, প্রধানত গিরিশচন্দ্রের জন্যে। কিন্তু সে কারণে গিরিশচন্দ্রের উপর তাঁহার কোন ক্ষোভ বা অভিযোগ ছিল না। তিনি তাঁহাকে বঙ্গ রঙ্গালয়ের স্রষ্টা নাট্যকার ও নট-নটীগণের গুরু এবং প্রতিভাধর নাট্যকার রূপে আজীবন পূজা করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনদিন কোন কথা তিনি সহ্য করেন নাই। দানী—সুরেন্দ্রনাথের দুর্দিনে তাঁকে আর্ট থিয়েটারে আনিয় নাট্যা-চার্য্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বেতন দিয়াছিলেন মাসে হাজার টাকা। অভিনেত্রী কৃষ্ণভামিনীকে তিনিই শিক্ষা দিয়াছিলেন। দুর্গাদাস তাঁহারই নিকট হাতে খড়ি লইয়াছিলেন। তুলসী চক্রবর্ত্তী অকুণ্ঠ কণ্ঠে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে আমি তাঁহার অধ্যক্ষতার দিনে আর্ট থিয়েটারে অভিনয় করিতে দেখি-য়াছি। শিশিরকুমার অপরেশচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। নূতন থিয়েটার খুলিবার দিনে ভাদুড়ী মহাশয় অপরেশচন্দ্রকে আনিয়াই রঙ্গালয়ের উদ্বোধন করাইয়াছিলেন।

অপরেশচন্দ্রের পুরাতন সহকর্মী, দুঃস্থ অভিনেতার বিধবা কেহ সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট আসিয়া কোন দিন বিমুখ হইয়া যান নাই। কর্জ্জ করিয়াও তিনি কাহারো পুত্র স্থানীয়ের বিবাহের খরচ, কাহারো স্বামীর শ্রাদ্ধের ব্যয় বহন করিয়াছেন। অপরেশচন্দ্রের মগের মুলুক, অযোধ্যার বেগম, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি নাটকের ভাষা অনবদ্য। গুরু চণ্ডালী দোষ ও ফেরাঙ্গ ফ্যাসান বিবর্জ্জিত নাটকের ব্যাকরণ তিনি গিরিশচন্দ্রের মতই মানিয়া চলিতেন। তিনি চরিত্র সৃষ্টি করিতে জানিতেন। নাটকে তাহার মৌলিক সৃষ্টি আছে। আর্ট থিয়েটার একবার রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভার অভিনয় করিয়াছিলেন। দীনেন্দ্র নাথ আসিতেন থিয়েটারে গান শিখাইতে। অহীন্দ্র চৌধুরী চন্দ্র বাবুর ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। কয়েক দিন ভাদুড়ী মহাশয়কেও ঐ ভূমিকায় দেখিয়াছি। অপরেশচন্দ্র রসিক সাজিতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। পরদিন অপরেশ চন্দ্রের সঙ্গে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম গুরুদেবকে। অপরেশচন্দ্রের ও অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া গুরুদেব বলিলেন—"সাচ্ এ ক্রিয়েসন"।

অপরেশচন্দ্রের অনেক শত্রু ছিল। তাহারা অযথা নিন্দা রটাইত। কিন্তু থিয়েটারেতো নগদ বিদায়। হাজার হাজার দর্শকের হাততালি। তাহাদের মুখে মুখে প্রচারিত সুখ্যাতি। সে আর রোধ করিবে কে? নৈহাটীতে শাস্ত্রী মহাশয়ের আমন্ত্রণে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র বিনয়তোষ (পরে ডক্টর) আমার বন্ধু ছিলেন। সুতরাং আমি দুই দিন আগেই গিয়াছিলাম। অধিবেশনের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় শুনিলাম অপরেশচন্দ্র নিমন্ত্রিত হন নাই। শাস্ত্রী মহাশয়কে কথাটা বলিতেই তিনি বিনয়তোষকে বলিলেন আর্জ্জেন্ট টেলিগ্রাম করিয়া দাও। তাহাই হইল, অপরেশচন্দ্র ঠিক সময়েই আসিয়া সম্মেলনে যোগ দিলেন। অথচ নাট্যকার অমৃত-লাল বসু ছিলেন নৈহাটী সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি। ভাবিয়াছিলাম—তিনিই অপরেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। অপরেশচন্দ্রের নিকট শুনিলাম অমৃতলাল তাহাকে কোন সংবাদই দেন নাই।

ষ্টার থিয়েটারের দোতালায় একখানা ঘর ছিল। অপরেশচন্দ্র সেই ঘরে বসিতেন। ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু নামকরা লোক মাঝে মাঝে সে ঘরে আসিতেন, বসিতেন। থিয়েটারের সাজ পোষাক লইয়াও আলোচনা করিতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো প্রায়ই আসিতেন। সময় সময় সে ঘরে জ্ঞানীগুণীদের বেশ একটা জম জমাট মজলিস বসিত। সরস গল্প, মার্জ্জিত রসিকতায় হাসির তুফান ছুটিত। আবার বহু গুরু গম্ভীর বিষয়ও আলোচনায় স্থান পাইত। সে এক দিন গিয়াছে। ১৩৪১ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ অপরেশচন্দ্র লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন।

অপরেশচন্দ্রের তিন কন্যা ও একটি পুত্র ছিল। পুত্রের নাম হরিচরণ। কন্যাদের কেহ আছে কিনা জানিনা। পত্নী বহু দিন পূর্ব্বেই লোকান্তরে গিয়াছেন। হরিচরণ ও নাই, আছেন হরিচরণের বিধবা, অপরেশচন্দ্রের সন্তানহীনা পুত্রবধূ।

মানুষের কামড়ে

[নাটক]

মন্মথ রায়

[সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ডমরু'র কার্যালয়। ছোট ঘর, দেয়ালে দীর্ঘদিন চুনকামের অভাব। দুটি টেবিল, গুটি কত চেয়ার এবং একটি আলমারি। টেবিলেরউপর কাগজ-পত্র ফাইল; মোট কথা অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। কিন্তু তবুও এই পত্রিকার টি'কিয়া থাকার ব্যাপারে সন্দেহ দূর হয় না। ঘরের পিছনে দরজ টি বাইরের দিকে যোগাযোগের জন্ম এবং ডান দিকের দরজা স্বত্বাধিকারী—সম্পাদক পিনাকী পাইনের বাড়ী এবং প্রেসে যাইবার রাস্তা। ঘরে পিনাকী একা টেবিলে বসিয়া সংবাদ পত্র পড়িতেছেন, একটু পরে স্ত্রী মন্দিরা এক পেয়ালা চা এবং দুখানি বিস্কুট লইয়া প্রবেশ করিল। সকাল।]

মন্দিরা। (চায়ের পেয়ালা সামনে রাখিয়া) এই রইলো তোমার পাঁচন।

পিনাকী। (চমকিয়া) এঁ্যা ?

মন্দিরা। সকাল বেলার পাঁচন গেলো।

পিনাকী। ওঃ, বুঝলাম। গোয়ালা দুধ দেয়নি—চিনি কেনার পয়সা নেই—পাঁচন মানে চিনি দুধ ছাড়া চা। তা মন্দ কি ? চৈনিক চা। তবে দৈনিক না হলেই বাঁচি।

মন্দিরা। আজ ঘরে চালও বাড়ন্ত।

পিনাকী। ঘাস খাও।

মন্দিরা। কি বললে ?

পিনাকী। ঘাস খাও। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঘাস ভিটামিনে বোঝাই। না না আমি বলছি না, বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, আমাদের কর্তারাও বলছেন, এই আজকের কাগজেও আছে।

মন্দিরা। যাঁরা বলেছেন তাঁরা খান।

পিনাকী। (কাগজ পড়িতে পড়িতে) এই যে ঘাসের বড়া, ঘাসের চপ, ঘাসের পোলাও—

মন্দিরা। (রুখিয়া উঠিয়া) তুমি খাও, তুমি খাও আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে যতো পার গেলো।

পিনাকী। (ভয়ে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ও বাবা! কামড়াবে নাকি ? (কাগজটি চট করিয়া দেখিয়া লইয়া) আজকের কাগজেই আছে—"মানুষের কামড়ে এগারজন মানুষ আহত"।

[বাহিরের দরজা দিয়া এই পত্রিকার ম্যানেজার এবং মন্দিরার ভাই মৃদঙ্গের প্রবেশ।]

মৃদঙ্গ। কিসের কামড়ে কি আহত ?

পিনাকী। মানুষের কামড়ে এগার জন মানুষ আহত। একটা আরো বাড়ছিল, উনি—আমাকে—

মন্দিরা। [মৃদঙ্গকে প্রায় কাঁদিয়া] আর তো পারিনা আমি। আমাকে বাঁচাও ছোড়দা।

মৃদঙ্গ। হচ্ছে, হচ্ছে, সব ব্যবস্থাই হচ্ছে। বাবাও বলছিলেন তোকে নিয়ে যেতে।

পিনাকী। জোড়ে যেতেই বলেছেন হয় তো, কি বলো ? আঃ, শ্বশুর বাড়ী কতদিন যাইনি। [মন্দিরাকে] যাও গো, গোছগাছ করে নাও।

মন্দিরা। আমাকে না বলে পালিওনা কিন্তু ছোড়দা। অনেক কথা আছে।

মৃদঙ্গ। ব্যাপার কি পিনাক দা ?

পিনাকী। কিছু না, কিছু না, ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রা।

মৃদঙ্গ। না, না, খুলে বলো।

পিনাকী। আমার নাম 'পিনাকী' পাইন। আমার স্ত্রীর নাম 'মন্দিরা' পাইন। শ্যালক তুমি, তোমার নাম

'মৃদঙ্গ' মিত্র, আর সর্বশেষ আমার সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকাটিরও নাম 'ডমরু'। অতএব বুঝতেই পারছো সমস্বরে বেজে উঠলেই অর্কেষ্ট্রা। ভবেকাগজ আর সংসারের অবস্থা প্রায় 'অব্যক্তক্য ধনুগুর্ণ'। কাজেই অর্কেষ্ট্রায় বাজছে তাণ্ডব।

মৃদঙ্গ। তাই বলে কামড়াকামড়ি ?

পিনাকী। আজ ঘরে ঘরেই প্রায় এই ব্যাপার। মানুষ খেতে না পেয়ে খ্যাপা কুকুরের মতো যাকে পাচ্ছে তাকে কামড়াচ্ছে। বিশ্বাস না হয় এই দেখো। আনন্দ বাজারের আজকে এই চিত্তাকর্ষক সংবাদটা দেখো। আমি পড়ে শোনাচ্ছি। এই দেখো বড়োবড়ো হেডলাইন। "মানুষের কামড়ে এগারজন মানুষ আহত। কলিকাতা পাস্তর ইনষ্টিটিউটের বিবরণ। কলিকাতা পাস্তর ইনষ্টিটিউটের রিপোর্ট হইতে জানা যায় মানুষের কামড়ে আহত এগার জন মানুষের চিকিৎসা করা হয়। তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এই বৎসর ঘোড়ার কামড়ের ২টি ঘটনা, গরুর কামড়ে, ১৪টি বানরের কামড়ে ৫৩টি, শৃগালের কামড়ে ৫৭, বিড়ালের কামড়ে ১৮টি, এবং কুকুরের কামড়ে ১৪০টি কেস ইনষ্টিটিউটে চিকিৎসা করা হয়। মারা গিয়াছে গাধার কামড়ে ১১ জন, মহিষের কামড়ে ১ জন, ভল্লুকের কামড়ে ১ জন এবং ভেড়ার কামড়ে ২ জন। এতদ্ব্যতীত এই বৎসর ইনষ্টিটিউটে আঁচড় বা লেহনে আহত মোট ১৫৬৫টি প্রাণীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

মৃদঙ্গ। ওরে বাবা!

পিনাকী। কিন্তু সবচেয়ে ইণ্টারেষ্টিং হচ্ছে, মানুষের কামড়ে ১১ জন আহত।

মৃদঙ্গ। সাংঘাতিক ব্যাপার!

পিনাকী। হবে না ? যা দিন কাল পড়েছে। চালের দাম যেমন হু হু করে উঠছে, মানুষ কি আর মানুষ আছে ? সব ক্ষেপে যাচ্ছে। তোমার বোনই তো এখননি আমাকে প্রায় কামড়ে ছিলেন আর কি! বাবার কাছ থেকে আজ কিছু খসাতে পেরেছো ?

মৃদঙ্গ। না পিনাকদা। বাবাকে বলেছিলাম আর কিছু টাকা না দিলে আমাদের 'ডমরু' আর বাজছে না।

পিনাকী। কি বললেন তিনি ?

মৃদঙ্গ। বললেন 'ডমরু' কাগজের নামটা পাল্টে দাও।

পিনাকী। মানে মাড়োয়ারী টেকনিক। গণেশউল্টে নতুন নামে পাওনাদারদের কলা দেখিয়ে—কি বলো ? তা বেশতো-বেশতো। কি আর একটা নাম হয় বলে তো ?

মৃদঙ্গ। বাবাই বলে দিয়েছেন। বলেছেন, কাগজের নাম 'ডমরু' বদলে রাখে 'শিঙে'। আর তাই তোমরা দুজনে মিলে ফোঁকো।

[কম্পোজিটার নৃসিংহ সিংহের প্রবেশ, রোগা-পটকা চেহারা। জামা কাপড়ে কালির দাগ। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি।]

পিনাকী। এই যে হেড কম্পোজিটর, নৃসিংহ সিংহের প্রবেশ। তোমার নামটা পাল্টাও নৃসিংহ!

নৃসিংহ। কেনো স্যার ? নামটা কি দোষ করলো ?

পিনাকী। ওই রোগা পটকা চেহারায় ওই নাম—সবাই হাসে।

নৃসিংহ। চেহারার আর দোষ কি ? তিন মাস মাইনে দেন না। কিন্তু আজ মাসের পয়লা। আর ছাড়ছিনা।

মৃদঙ্গ। ওরে বাবা, কামড়াবে নাকি ?

নৃসিং। হ্যাঁ তা কামড়াতে পারি। আজ ট্রামে আসতে আসতে একজন কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিলো মানুষের কামড়ে এগার জন মানুষ আহত।

পিনাকী। ওরে বাবা, তুমিও জানো দেখছি। না না কামড়াতে হবেনা শোনো। (মৃদঙ্গকে দেখাইয়া) ম্যানেজারবাবু বিজ্ঞাপনের বিলগুলো নিয়ে এখনি বেরুচ্ছেন। আজ ফার্ষ্ট আওয়ারেই কিছু টাকা পাওয়া যাবে আশা আছে। মৃদঙ্গ—(ড্রয়ার হইতে কয়েকটি বিল বাহির করিয়া) এই নাও, একেবারে শিওর হিট। তুমি ভাই আর দেরী কোরো না। প্রত্যেকটি মিনিট—

মৃদঙ্গ। অত্যন্ত মূল্যবান। বলাই বাহুল্য। দাও আমি যাচ্ছি।

পিনাকী। দেখো ভাই, দেরী কোরো না। ওপরে চাল বাড়ন্ত (নৃসিংহকে দেখাইয়া) সামনে তিনমাস, আর বাইরে (কান পাতিয়া শুনিয়া) অগণিত পদধ্বনি

শুনতে পাচ্ছ? সব পাওনদার। পেপার মার্চেন্ট, ব্লক মেকার, দপ্তরী—এসব তো আছেই তার ওপর মুদী, গোয়ালা, ধোপা, বাড়ীওয়ালা—সপ্তরথী পরিবেষ্টিত এই অভিমন্যুকে যদি বাঁচাতে চাও—

মৃদঙ্গ। কোনোদিন ঘাবড়াওনি—আজ ঘাবড়াচ্ছ কেন দাদা?

পিনাকী। ঘাবড়াচ্ছি কি সাধে! এগারজন আহুত। জানো না? কার মনে কি আছে কে জানে!

মৃদঙ্গ। ওরে বাবা, তাই তো। যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।

[বিল লইয়া ত্বরিৎপদে প্রস্থান]

নৃসিংহ। সে মশাই, আপনার যতো পাওনাদারই থাক আমাকে আজ 'নাম্বার ওয়ান' মনে করবেন দয়া করে।

পিনাকী। মানে?

নৃসিংহ। হ্যাঁ মশাই। শেষে যে বলবেন সব দিতে দিতেই চলে গেলো হে, তুমি বরং—(হঠাৎ উত্তেজিতভাবে) মানে এই বরং ফরং আমি আজ শুনবো না।

পিনাকী। ও বাবা, কামড়াবে নাকি?

নৃসিংহ। হ্যাঁ কামড়াবো। কাল আবার কাগজে উঠবে এগারোজন নয় বারোজন।

পিনাকী। (সানুনয়ে) শোনো ভায়া শোনো। তুমি আমাদের হেড কম্পোজিটার, তোমার দাম তো আমি বুঝি। রবিঠাকুর রবিঠাকুরই হতেন না যদি না তাঁর লেখা এই কম্পোজিটাররা কম্পোজ করতো। বসো ভাই বসো। ঠাণ্ডা মাথায় একটা বুদ্ধি করা যাক।

নৃসিংহ। বলুন।

পিনাকী। আজ সব পাওনাদারদের তাড়াতে হবে।

নৃসিংহ। (চট করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া) মানে?

পিনাকী। না না তোমাকে নয়। তুমি ছাড়া আর সবাইকে। এবং এই যে তাড়াবো তা তোমারই সাহায্যে।

নৃসিংহ। (আবার চট করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া) মানে পাওনাদার ঠেকাতে হবে আমাকে?

পিনাকী। পাওনাদার কামড়াতে হবে তোমাকে। —মানে সত্যি সত্যি কামড়াও আর না কামড়াও, কামড়াতে এগিয়ে যাবে তুমি। (নিজে মুখভঙ্গী করিয়া দেখাইয়া) মানে, মুখের ভাবটা তোমার হবে এমনি। চোখের দৃষ্টিটা হবে এমনি। দাঁতগুলো যেন সব বেরিয়ে আসবে। গোঁ গোঁ শব্দ করবে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে।

নৃসিংহ। কোথায়?

পিনাকী। পাওনাদারের দিকে।

নৃসিংহ। বলেন কি মশাই, কামড়াতে হবে?

পিনাকী। সেটা তোমার ইচ্ছে। মানে লোক বুঝে।

নৃসিংহ। আজ্ঞে মেয়েছেলে পাওনাদারও তো আছে। সেই যে ছবি এঁকেছে?

পিনাকী। মেয়েছেলে আর নো মেয়েছেলে। কামড়াতে ইচ্ছা হয় কামড়াবে, ইচ্ছে না হয় বেশ খানিকটা কাছে গিয়ে গা শুঁকবে। মানে, যেমন করেই হোক, পাওনাদার ভাগাতে হবে। আর তাতেই আমারো কিছু থাকবে, তোমারও কিছু থাকবে।

নৃসিংহ। দেখবেন মশাই, কথার খেলাপ না হয়।

পিনাকী। আঃ তুমি আমাকে আজও চিনলে না নৃসিংহ।

নৃসিংহ। বড্ডো বেশী চিনি কিনা তাই। তা, দিন আজ কি কম্পোজ করতে হবে।

পিনাকী। তুমি একটু বসো। আজকের বাজার খরচটা দেখি ধার পাই কিনা কারো কাছে। এক পেয়ালা চাও যোটে নাই আজ। [ত্বরিতপদে বাহিরে প্রস্থান। মন্দিরা দরজার আড়ালে ছিল, এবার অফিস ঘরে ঢুকিল]

নৃসিংহ। এই যে বৌদি, নমস্কার। আড়াল থেকে শুনছিলেন বুঝি সব? বলুন তো কি লজ্জার কথা।

মন্দিরা। নৃসিংহবাবু, আপনাকে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নৃসিংহ। অনুরোধ? আমার কাছে? আপনি বলছেন কি বৌদি?

মন্দিরা। হ্যাঁ, আমি নারী সমাজের কাছে একটা আবেদন রচনা করেছি। আমার এই লেখাটি এ অফিসের

আর কাউকে না জানিয়ে 'ডমরুতে' ছাপাতে হবে আপনাকে।

নৃসিংহ। আপনার স্বামীর কাগজ—আপনি তাঁকে দিচ্ছেন না কেন?

মন্দিরা। আমার এই রচনাটা স্বামীদের শায়েস্তা করবার একটা গোপন সংকেত। তাই কোনো স্বামীর হাতেই আগে দেওয়া চলে না। আপনাকে দিচ্ছি, কারণ আপনি এখনো কারও স্বামী নন, এবং কাজেই আপনি স্ত্রী সম্পর্কে নির্ভয়। এই নিন। (রচনাটি তাহার হাতে দিল) দয়া করে দেখবেন এই শনিবারেই যাতে বেরোয়, স্মল পাইকায় নয়, পাইকা এন্টিকে। আমি আপনাকে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি নৃসিংহবাবু। না-না পাচন নয়—পাশের বাড়ী থেকে দুধ চিনি যোগাড় করেছি।

[অন্দরে প্রস্থান]

নৃসিংহ। (রচনাটি চোখ বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। শেষ পাতার কয়েকটি লাইন জোরে জোরে না পড়িয়া পারিল না)

"স্বামী-অবহেলিত বাংলার অগণিত নারী সমাজের প্রতি এই আমার শেষ আবেদন, পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের এই বার্ষিক বিবরণটি দংশনরূপ মারণাস্ত্রের যে মূল্যবান ইঙ্গিতটি দিয়াছে তাহা কাজে লাগাইতে হইবে। চুম্বনে স্বামী বশ হয় কিনা জানিনা, তবে দংশনে যে হইবেই তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"—ওরে বাবা! (একজন মাড়োয়ারী পাওনাদার কর্তৃক অনুসরিত পিনাকীর প্রবেশ। তাহাদের পায়ের আওয়াজ পাইয়া নৃসিংহ ভিতরে গিয়া আত্মগোপন করিল)

পাওনাদার। না না, আজ হামি কোই বাত না শুনবো এডিটর বাবু। কমসে কমভো দো মহিনা হো গিয়া —দো শো রিম নিউজ প্রিণ্টকা দাও বাকী রহিয়েসে। এমনি করলে তো হামার গণেশ ভি উল্টে যাবে।

পিনাকী। শুনুন রামরামবাবু, বসুন। আপনি নেপোলিয়নের নাম শুনেছেন, নেপোলিয়ন?

পাওনাদার। নেই বাবুজী, কালীনারাণের সাথে কারবার আছে নেপিলনের সাথে নাই।

পিনাকী। ও, আপনার নেই? তা না থাক, কিন্তু জেনেরাখুন, খুব বড়ো কারবার ছিলো ওই নেপোলিয়নের। আর এটা জেনে রাখুন দুনিয়ার দুটি লোক আজ পর্য্যন্ত 'না' বলেনি। এক নেপোলিয়ান, দুই আমি। 'না' আমি বলবোনা, তবে এক বিপদ হয়েছে কি জানেন? আমাদের হেড কম্পোজিটার নৃসিংহ সিংহ মানুষ কামড়াচ্ছে। কোনো রকমে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছি ওই ঘরে। তাকে পাঠাতে হবে এখুনি আবার পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে চিকিৎসার জন্য।

পাওনাদার। এঁ্যা?

পিনাকী। হঁ্যা।

পাওনাদার। আজ কাগজেই খবরটা নিকলেসে—এগারোটা আদমীকে—

পিনাকী। হঁ্যা কামড়েছে, এবং সে হচ্ছে আমাদের এই হেড কম্পোজিটার নৃসিংহ সিংহ। যাদের কামড়েছে তাদের চিকিৎসা হচ্ছে, কিন্তু যে কামড়াচ্ছে তাকে কেউ ধরতে পারছেনা। কারণ জানেন?

পাওনাদার। এঁ্যা, না তো? কেনো?

পিনাকী। দেখতে দেখায় বেশ ভাল মানুষ। ভারি অমায়িক। কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো আপনার কাছে। আপনি বললেন রামরাম। সেই ফাঁকে ও মেরে নিল ওর কাম।

[সঙ্গে সঙ্গে হাততালি—এবং প্রায় সাথে সাথেই আড়াল হইতে নৃসিংহের প্রবেশ।]

এই যে নৃসিংহ কেমন আছো?

নৃসিংহ। (অমায়িকভাবে পাওনাদারের দিকে অগ্রসর হইল) রামরাম বাবু! রামরাম।

পাওনাদার। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীতকণ্ঠে) জি রামরাম। এডিটারবাবু হামার জরুরী কাম। হামি চললাম।

পিনাকী। শুনুন, আপনার টাকাটা—

পাওনাদার। ও আপনি যখন সুবিস্তা হবে দিবেন।

[একরূপ পলায়ন করিয়া বাঁচল]

নৃসিংহ হো হো করিয়া হাসিতেই পিনাকী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। বাহির হইতে মাড়োয়ারী পাওনাদারটির উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা শোনা গেল।]

পাওনাদার। (নেপথ্য হইতে) আরে মোশা, অন্দরে

কোথা ঘুমছেন, একদম জান চলিয়ে যাবে।

অন্য পাওনাদারের নেপথ্যকণ্ঠ। জান চলিয়া যাবে মানে? আজ পাওনা টাকা না পেলে কুরুক্ষেত্র করবো।

পাওনাদার। (নেপথ্যে) আরে মোশা জান আগে না রূপিয়া আগে। আজ কাগজে একটা খবর নিক্‌লালো দেখেন নাই? একটা আদমী এগারটা আদমীকো কামড় দে দিয়া।

নেপথ্যকণ্ঠ। হাঁ্যা হাঁ্যা দেখেছি, মানে শুনেছি আজ কাগজে বেরিয়েছে।

পাওনাদার। ও আদমীটা এই ঘরের মধ্যে ঘুষে আছে। উটার নাম নিসিন্‌হ সিন্‌হ আছে।

নেপথ্যকণ্ঠ। সিংহ?

পাওনাদার। হাঁ্যা বাবা সিন্‌হ। মানুষ আজ সিন্‌হ হলো। না হলে বুঝেন না হামি রামরাম আগরওয়ালা, হামি রূপেয়া ছোড়কে পালাচ্ছি। রামরাম, রামরাম—

বহু নেপথ্যকণ্ঠ। ওরে বাবা, তাই নাকি? চলো ভাই চলো, আজ কেটে পড়ো।

[পাওনাদারদের পলায়নের কোলাহল থামিয়া গেল। এবার ইহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল। এবার অন্দর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল মন্দিরা এবং বাহির হইতে মৃদঙ্গ]

মন্দিরা। ব্যাপার কি নৃসিংহবাবু?

মৃদঙ্গ। ব্যাপার কি পিনাকদা?

পিনাকী। আজকের কাগজের এই মানুষ কামড়ানো খবরটা জোর কাজে লেগে গেছে। রটনা করলাম এই নৃসিংহ সিংহ ভালো মানুষটি সেজে মানুষ কামড়ে বেড়াচ্ছে। যাঁহাতক এই রটনা, সঙ্গে সঙ্গে বাইরের এই ঘটনা। কিন্তু তোমার মুখ শুকনো কেন?

মৃদঙ্গ। তুমি বললে তোমার বিলগুলো শিওর হিট। পাঁচশোর মধ্যে আদায় হলো মাত্র পঞ্চাশ। পুরো একটা শূন্যই বাদ।

পিনাকী। তবে তোমরাও আজ বাদ পড়লে। (টাকাগুলি হাতে লইয়া) এতো এখুনি আমার চাল ডাল কিনতে যাবে।

মন্দিরা। চাল-ডাল কিনতে। ঘুটে কয়লা আর কেরোসিনের পাওনাই পঞ্চাশ টাকার বেশী। চুলোও ধরবেনা ওতে আজ।

নৃসিংহ। ও টাকাটা আমাকে দিন। আমার চুলো দুদিন জ্বলছে না।

পিনাকী। একটাই যখন সয়েছ, আর একটা দিন সয়ে থাকো নৃসিংহ।

নৃসিংহ। কথার খেলাপ করবেন না স্যার।

পিনাকী। আগে এডিটার বাঁচবে তবে তো কম্পোজিটার! কি বলো মৃদঙ্গ?

[ইতিমধ্যে নৃসিংহ পিনাকী প্রদর্শিত কামড়াইবার টেকনিক অনুযায়ী মুখভঙ্গী করিয়া পিনাকীর সামনে আসিয়া পড়িয়াছে।]

নৃসিংহ। (বিকৃতকণ্ঠে) আমি কামড়াবো।

পিনাকী। ওরে বাবা। এ কি। আরে শোনো শোনো।—[কিন্তু নৃসিংহ শুনিলনা। সে পিনাকীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে কামড়াইতে গেল। মন্দিরা ছুটিয়া আসিয়া নৃসিংহকে টানিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মৃদঙ্গ টেবিলের তলায় লুকাইয়াছে।]

মন্দিরা। আরে শুনুন শুনুন। আঃ ছাড়ুন।

নৃসিংহ। না, আজ আর আমি ছাড়বোনা।

মন্দিরা। (চীৎকার করিয়া) আপনি আমার লেখাটা পড়েন নাই? কামড়াবার কথা আপনার নয়, আমার।

নৃসিংহ। ও তাও তো বটে। (পিনাকীকে ছাড়িয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিনাকীর উদ্দেশ্যে বলিল) বেঁচে গেলেন স্যার। কারণ কামড়ানোর কপিরাইটটা (মন্দিরাকে দেখাইয়া) ওঁর। নিন এই লেখাটা পড়ুন। (পকেট হইতে লেখাটি বাহির করিয়া পিনাকীর হাতে দিল। পিনাকী চট করিয়া তাহা চোখ বুলাইয়া দেখিল। ইতিমধ্যে মৃদঙ্গ টেবিলের তলা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।)

পিনাকী। ওরে বাবা। (পাঠ) "চুম্বনে স্বামী বশ হয় কিনা জানিনা, তবে দংশনে যে হইবেই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

মন্দিরা। নৃসিংহবাবু, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন, এটা শনিবারের 'ডমরু'তে ছাপা হবে। মনে থাকে যেন।

[অন্দরে চলিয়া গেলেন]

নৃসিংহ। ছাপাবো, আমি ছাপাবো। আপনাকে রুখবার ক্ষমতা আজ এডিটারেরও নেই।

পিনাকী। মৃদঙ্গ!

মৃদঙ্গ। দাদা।

পিনাকী। আমি কাগজ তুলে দিলাম। আজ থেকে পিনাকীর 'ডমরু'-'শিঙা' হলো। ফোঁকো ভাই ফোঁকো। যত পারো ফোঁকো।

যবনিকা

বহু বিবাহ রোধ গান

শ্রী[illegible]

আজকাল লোকে একটা বিয়ে করতে পারে না, আর এই সেদিন পর্যন্ত লোকে একসঙ্গে একাধিক বিয়ে করত—ভাবলেই আশ্চর্য লাগে। হিন্দুগৃহস্থ অবশ্য এই হাল আমল পর্যন্ত একটির বেশী বিয়ে স্বচ্ছন্দেই করতে পারত, আর মুসলমান গৃহস্থ আজও তা পারে। ১৯৫৫ সালে হিন্দুবিবাহ আইন অনুমোদিত হওয়ার আগে পর্যন্ত একস্ত্রী জীবিত থাকতে একাধিক বিয়ে করা চলতে পারত, কিন্তু এখন আর তা চলে না। গ্রামের লোকের তখন ঘরে ভাত ছিল, আর নির্লজ্জের মতো একসঙ্গে দুটো তিনটে বিয়ে ক'রে বসত। কিন্তু এখন আর কেউ সে সাহস করে না!

গ্রামে গ্রামে ঘরে ভাত থাকলেই তখন লোকে বিয়ের পর বিয়ে ক'রেই চলত। সতীন বলে তখন এক সমস্যাই ঘরে ঘরে বিরাজ করত। সতীন কাঁটা অবশ্য আজও আছে, কিন্তু এক সঙ্গে দুটি বিয়ে এখন আর কেউই করে না। একটি মরলে আর একটি বিয়ে অবশ্য এখনও অনেকেই ক'রে থাকে।

বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সঙ্গে বহু বিবাহ রোধের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ই। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর মহান্ প্রচেষ্টা তেমন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে নি। বিধবাবিবাহ আইন অনুমোদিত হলেও যেখানে কুমারীদেরই বিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য নয় সেখানে বিধবা-বিবাহ তেমন চলন লাভ করে নি। প্রেম ক'রে যারা বিয়ে করবে তারা বিধবা কেন, সধবা বিবাহেও পেছু পা নয়।

বহু বিবাহ আপনা থেকেই ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছিল। কুলীনদের মর্যাদা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিবাহ করার বুকের পাটাও লোকের কমে যায়। আর্থিক অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এক সঙ্গে একাধিক পত্নী প্রতিপালনের সাহস ও বুকের পাটাও লোকের থাকল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহ রোধের জন্য দুই খণ্ড পুস্তক পর্যন্ত লিখেছিলেন—'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি—না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। সে বই পড়ে কেউ বিয়ে করতে যেত না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকর্মী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গান গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর মঙ্গল ইচ্ছাকে।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সে আমলের বাংলাদেশের এক স্মরণীয় পুরুষ। সামাজিক গান রচনায় তাঁর জুড়ি বাংলা সঙ্গীত জগতে একটিও নেই। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বহুবিবাহের কুফল বর্ণনা ক'রে বহু গান রচনা ক'রে গিয়েছেন।

অল্প বয়সে রাসবিহারীর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর পিতৃব্য ছিলেন নিষ্ঠাবান কুলীন বিবাহ-ব্যবসায়ী। যৌবন লাভ করার আগেই রাসবিহারীর আটটি বিবাহযোগ ঘঠে গেল। নবম বিবাহ উপলক্ষে ক'রে রাসবিহারীর সঙ্গে পিতৃব্যের বিবাদ ঘটল।

কাকা তাকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। রাসবিহারী এখন অকূলে পড়লেন উপার্জনের তাঁর আর কোন উপায় জানা ছিল না! তাঁর না ছিল বিদ্যাবুদ্ধি, না ছিল পরিশ্রম করার ক্ষমতা। পেটচালানোর একটি মাত্র পথই তাঁর জানা ছিল—সেটি হ'ল বিয়ে করা।

কতকটা বাধ্য হয়েই আবার তাঁর পুরানো উপজীবিকার দিকে আসতে হ'ল অর্থাৎ আবার কুলীনদের কুলরক্ষা শুরু করলেন। এবার আরও ছয়টি বিবাহ তাঁর সম্পন্ন হ'ল।

এবার হাতে মোটা টাকা এলে তিনি বিয়ে করা ছেড়ে দিলেন, আর বহুবিবাহের কুফল বর্ণনা ক'রে গান বেঁধে

গ্রামে গ্রামে প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন। এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহযোগিতা তিনি লাভ করে ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই তাঁকে এ কাজের ভার দিয়েছিলেন। ঢাকা বরিশাল জেলার বিস্তৃত অঞ্চলে তিনি বহু বিবাহের কুফল বর্ণনা ক'রে বেরিয়েছিলেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয় জানতেন যে, বক্তৃতা বা বিবৃতির দ্বারা এ কুফল রহিত করা সম্ভব নয়, এ জন্যে চাই জনগণের নিজেদের উপলব্ধি।

রাসবিহারীর গানে মূলত আক্রমণ করা হয়েছিল প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে। এই সমাজব্যবস্থার প্রচলন বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথাকে অবলম্বন ক'রেই। কৌলীন্য প্রথাই এনেছিল ব্যভিচার, ভ্রূণ হত্যা, সমাজে পাপ—

বল্লালী তুই যারে বাঙ্গালা ছেড়ে
ডুবল ভারত কদাচারে
সোনার বাঙ্গালা যায় রে জ্বারে খারে।
ভ্রূণহত্যা সঙ্গে ক'রে ব্যভিচার তুই যারে মসে—
পাপস্রোতে ভাসালি রে বঙ্গমায়েরে
অপার পাথারে॥

এই সব কুলীন কন্যারা কোনদিনই স্বামিগৃহে যেতেও পেত না, পিতৃগৃহে ভ্রাতৃবধুগণের সেবায় তাদের জীবন উৎসর্গ করতে হত। সারাজীবন ধরে তারা কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক দেবীবরকে অভিশাপ দিত—

মনো দুঃখ কব কায়।
দুঃখকে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়?
কঠিন পিতামাতা তায়,
স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিলে দু'জনে
(কেবল) ভ্রাতৃজায়গণের দাস্যবৃত্তি করে—
পোড়া উদর পোষি আজীবন ধরে,
আছি ভ্রাতার মুখ চেয়ে ভ্রাতা পাছে কোন ত্রুটি পায়॥
হায় মোদের যে সম-পতি সবার করে গতি,
চক্ষু মেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী,
বুঝি মরা দেবীবরে থেকে যম ঘরে—
নিতে বারণ করে যমরাজায়॥

'মেলে'র বন্ধন না ভাঙ্গলে তাদের বিয়ের উপায় ছিল না, এক মাত্র নির্দিষ্ট কয়েক জন ছাড়া আর কারো সঙ্গে তাদের বিয়ের গাঁটছড়া বাঁধার উপায় ছিল না। রাসবিহারী মেলের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন—

মেল ভাঙ, মেল ভাঙ কুলীন সবে।
তবে সে মঙ্গল হবে, সমাজেতে রবে গৌরবে।
মেলে মেলে নাহি মিল, ইথে কি যে ফল বল,
মিল খেলে মিলে মিল,
জাতিকুল সকলি রহিবে॥

রাসবিহারীর অধিকাংশ সুর প্রচলিত যাত্রার গানের সুর, সেটাই ছিল তখনকার দিনের জনপ্রিয় সুর।

এ ছাড়া কৃষ্ণকান্ত পাঠকের প্রচলিত সুরে তাঁর রচিত কুলীন বরের বিবাহ সজ্জা গাওয়া হয়েছে। এ গানে কিন্তু সেই বুড়ো বর চিরকালীন গৌরীপ্রিয় হরের ভূমিকাই গ্রহণ করেছে—

যাই লো সই, ঐ অসুরে বুড়ো হেরে ডরে মরে।
দিলে কাসটা যে আকাশটা ফাটে,
কাঁপে লাঠির বাঁশটা ধরে।
সাজায়ে পাটকাপড়ে আটকায়ে মুকুট শিরে,
বললে মায় দেখিস বরে নয়ন-ভরে॥
এ সুর প্রচলিত যাত্রাগানেরই সুর।

——

সাগর দাঁড়ী

সুশান্ত পাঠক

"যশোরে সাগরদাঁড়ী, কপোতাক্ষ তীরে জন্মভূমি,"
ঘনতরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ গ্রামান্তরে তৃণাঞ্চল চুমি,
শান্ত কপোতের স্নিগ্ধ আঁখিসম স্বচ্ছ সুশীতল
স্রোত যেথা বহে ধীরে, বাজে শুধু মৃদু কলকল
মন্দ লয়ে, মিলাইয়া সযতনে আপনার সুর
শ্যাম পল্লীপ্রাঙ্গণের নিরুদ্বেগ, উদাস, মধুর
জীবন-সঙ্গীত সাথে। অকস্মাৎ সেথা কী জোয়ারে
পশিল আহ্বান বাণী সিন্ধু হতে, ডাকিল তোমারে
কলমন্দ্রে ফেনোচ্ছল উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ মাঝে,
উদ্দাম জীবনাবেগ অশান্ত বিক্ষোভে যেথা রাজে।
মুহূর্ত হলোনা দ্বিধা, সংগীহীন আপন তরণী
ভাসালে সমুদ্রজলে, লাভক্ষতি কিছু নাহি গণি।
তীরের সঞ্চিতবিত্ত অপ্রয়াসে তীরে এলে ছাড়ি
একান্ত অকুতোভয়ে, নিঃসীম সাগারে একা দাঁড়ী।
শুধু ঢেউ পরে ঢেউ অসহ আক্ষেপে উঠে ফুলি,
প্রবল পবন বেগে, মহোল্লাসে উথলে আকুলি
অতল, বেদনানীল, উচ্ছল লবণ অশ্রুর শি।
ংঘাতে কী মন্ত্রে শুভ্র ফেন হাস্যে উঠিছে উদ্ভাসি।
াহিরে দিবসযামী উন্মুখর প্রাণ চঞ্চলতা,
মন্তরে নিবীড়নীল মরণের চিরনীরবতা।
ীবনে-মরণে-মেশা অশ্রুহাসিভরা সিন্ধুবুকে
ন্মাদ তরঙ্গ-রঙ্গে নৃত্যে মাতি কী প্রচণ্ড সুখে,
ন্ত মনে অজানিতে, কখন লবণজলে ভরি,
তলান্ত পারাবারে সহসা ডুবিল তব তরী।
টিল সকল বন্ধ, বিন্দু হলো সিন্ধু মাঝে লয়,
ভিল অসীম, নিত্য, আপনার সত্য পরিচয়।
থা সুগম্ভীর, স্তব্ধ বাণীহীন নীল অন্ধকারে
মারে বরিয়া নিল, দুলাইল তব কণ্ঠহারে
াপন ভাণ্ডার হতে সুরাশা স্বপ্নের মণি গুলি,
বাল—মুকুতাগড়া মিলন বাসরদ্বারখুলি।

তাই কবি তব গানে শুনি বাজে সিন্ধুর নির্ঘোষ,
বাণীমন্ত্রে নিঃস্বনিছে ক্ষুব্ধচিত্ত না জানে সন্তোষ
অনন্ত জীবনতৃষা, আলোড়িয়া এ বিশ্ব নিখিল
কোথা খুঁজে পেলে নাকি আপনার অন্তরের মিল?
সে প্রচণ্ড প্রাণাবেগ তাই দৃপ্ত অমিত্র-অক্ষরে
ঢেলে দিলে নিঃশেষিয়া আপন পঞ্জর চূর্ণ করে।
তুমি ভগীরথসম বঙ্গভারতীর ক্ষীণ স্রোতে
আনিলে ভাবের বন্যা দূর পশ্চিমের উৎস হতে।
মুহূর্তেকে সে প্লাবনে ভাসালে লঙ্ঘিয়া দুই কূল,
উর্বর পল্বল তার ফুটে আজো অগণিত ফুল।
ছিল চিত্ত তন্দ্রালস ক্লান্তিভরা দীর্ঘ ঝিল্লিস্বনে
স্বপ্নাতুর ম্লান সাঁঝে, ঘনঘোর বজ্রের গর্জনে
সহসা জাগালে তারে। সুগম্ভীর তার প্রতিধ্বনি
প্রকম্পিয়া নভস্তল আজো শুনি ওঠে রণরণি।
বীর তুমি উদ্‌ঘোষিলে বীররসে ভাসি মহাগীত,
আজো তারি রুদ্রতালে স্পন্দমান হৃদয় শোণিত
ধায় ক্ষিপ্র ধমনীতে। যে বার্তা ঘোষিতে তুমি এলে,
তার প্রকাশের বাণী জানি কবি খুঁজিয়া না মেলে
নিত্য ব্যবহারে ম্লান দৈনন্দিন ভাষার ভাণ্ডারে
অনায়াসে। তাই আপনার মনে ভাঙ্গিগড়ি তারে
সৃজিলে অনিন্দ্যমূর্তি প্রাণমন্ত্রে করিলে বোধন।
চীৎকারিল সমস্বরে যতেক পণ্ডিত মূঢ়জন
তীক্ষ্ণ-নিন্দা-ব্যঙ্গ-বাণী। নিমজ্জিল নিজ অবসাদে।
হায়রে দর্দুর রব লজ্জা করে দেয় মেঘনাদে।
প্রবাহিল কাব্যধারা বেগবতী কল্লোলিনীবৎ।
লঙ্ঘিয়া উপলবন্ধ ভীমবলে কাটি নিজ পথ।
প্রাচী-প্রতীচীর মাঝে তুমি কবি পরিণয়হেতু
যতনে গড়িয়া দিলে প্রথম সে বাণীময় সেতু।
বঙ্গের উৎসুক চিত্ত উত্তরিল নব কল্পলোকে
তব কাব্যস্রোত বাহি। নিরখিল প্রদীপ্ত আলোকে

ভাস্বর জীবন-মূর্তি, মহোজ্জ্বল মরণের রূপ।
বিরল বীরত্ব কত, আত্মত্যাগ অমেয়, অনুপ
সোচ্চার স্বদেশ প্রীতি, প্রগাঢ় প্রণয় অতুলন,
মিলনের মহোল্লাস, বিরহের প্রখর দহন।
চিত্রিলে বিচিত্র বর্ণে যত্নে যাহা মহাকাব্য পটে
সুনিপুণ তুলিকায়। যে বাঁশরী যমুনার তটে
একদা ধ্বনিয়াছিল মুগ্ধ করি ব্রজাঙ্গনা হিয়া,
তব সকরুণ গানে পুনঃ তাহা উঠিল মন্ত্রিয়া
বিমোহিয়া বিশ্বচিত্ত। যত পাপ, যত মিথ্যাচার,
বর্ষিলে তাহার পরে তব শ্লেষ ব্যঙ্গ, ক্ষুরধার।
সহেছ জীবন ব্যাপী বঞ্চনার হতাশার দাহ।
তবুও উদার, স্বচ্ছ ছিল তব প্রাণের প্রবাহ
আমরণ। আপনারে শূন্য করি করি সমর্পণ
গেলে চলি নিঃস্ব হয়ে এসেছিলে যথা অকিঞ্চন।
উদার সমুদ্র যথা বক্ষো মাঝে সঞ্চিয়া লবণ,
শীতল সুমিষ্ট জল মেঘরূপ করে বরষণ।
তেমনি তোমার হৃদি রত্নাকর হতে মহাকবি
দিয়েছো তৃষার বারি, মণি-রত্ন-প্রভ কাব্য ছবি।
ওগো মধুব্রত কবি রচিলে যে মধুচক্র খানি
অনিঃশেষ আজো তাহা। ধন্য তুমি। ধন্য ধন্য মানি
"যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ তীরে জন্মভূমি"
বংগ মনঃ কোকনদে মধুরূপে নিত্য রবে তুমি।

* সালকিয়ায় "কল্পরূপ" প্রতিষ্ঠিত "মাইকেল থিয়েটার" উদ্বোধন উপলক্ষে—রচিত।

তুমি মিতা শুধু আলো

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

তোমারে দেখেছি কতদিন আগে সে কথা ত মনে নাই,
দেখা দিলে আজি কেন তা জানি না শরতের দিনটিতে ;
শূন্য হৃদয়ে চাওয়ার অতীতে কি যেন ফিরিয়া পাই,
সাতটি রাজার বাঞ্ছিত ধন পুরাতন ধরণীতে।

আলোঝলমল এই ধরাতল, নীলাকাশ, বনবীথি,
বন্ধু তোমার পরশ লভিয়া সবি হ'ল নিরুপম ;
রিক্তজীবনে আশা রাগিণীতে বাজে যেন কলগীতি,
দুঃখ দৈন্য আজিকে বিগত, আনন্দ অনুপম।

জীবনের এই বন্ধুর পথে কত পড়ি, কত উঠি,
কঠিন জীবনযুদ্ধে বিজিত পাইনাতো সফলতা,
প্রাণপণে ধরি আশা-মরীচিকা—শিথিল বদ্ধমুঠি,
শুধুই হতাশা, ব্যর্থ নিরাশা অশ্রু, বিষাদ, ব্যথা।

তমসায় ভরা এ জীবন-মাঝে তুমি মিতা শুধু আলো,
তোমার পরশে মুছে যায় শত জীবনের ক্রন্দন ;
মরুর বুকেতে একখানি মেঘ, বরষার বারি ঢালো,
শরৎ-স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতে লও অভিনন্দন।

"তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বম্"

অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী

"তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥"
(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৫৬)

"চরাচর বিশ্বজগতের তিনিই সৃষ্টিকারিণী।
প্রসন্না তিনি হন সকলের মুক্তি বরদায়িনী॥"

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে—এটী হল ব্রহ্ম বা তাঁর শক্তি স্বরূপিণী জগজ্জননীর একটী অতি সাধারণ বর্ণনা, যা পৃথিবীর সকল দর্শন-শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু কি নিগূঢ় এই সৃষ্টিতত্ত্ব। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, অতি সহজ-সরল এই তত্ত্ব—ব্রহ্ম কারণ, জীব-জগৎ কার্য; এবং কারণ মৃৎপিণ্ড থেকে যেরূপ কার্য মৃন্ময়-ঘটের উৎপত্তি হয়, ঠিক সেরূপই কারণ ব্রহ্ম থেকে কার্য জীব-জগতের উৎপত্তি হচ্ছে। এই হল বেদান্তের সুবিখ্যাত "পরিণামবাদ।" এই মতানুসারে, কারণ কার্যে সত্যই পরিণত, পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়। যথা, কারণ মৃৎ-পিণ্ড সত্যই কার্য জীব-জগতে পরিণত, পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়। একই ভাবে, বিশ্বকারণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সত্যই কার্য জীব জগতে পরিণত, পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হচ্ছেন।

পরিণামবাদ

কি রোমাঞ্চকর, রসঘন, রমণীয় কথা এটী—সচ্চিদানন্দস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্যবান্, অশেষ-সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য-বিলসিত, অনন্ত-জ্ঞান-শক্তি-কৃতি-সম্পন্ন স্বয়ং পরমেশ্বর এই তথাকথিত জড়-ক্ষুদ্র-অশুদ্ধ-অপূর্ণ-অতৃপ্ত জীব-জগতে সত্য-সত্যই পরিণত হচ্ছেন; এবং সেজন্য ইতে যাই মনে হোক না কেন, প্রকৃত-কল্পে জীব জগৎও ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পরিণামরূপে ব্রহ্মস্বরূপ, জীব-জগতেও ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কিছুই নেই; যেরূপ কারণ মৃৎ পিণ্ডের সাক্ষাৎ পরিণাম মৃন্ময়-ঘটও মৃৎ পিণ্ডের ন্যায় মৃৎস্বরূপ, এবং মৃন্ময়-ঘটেও মৃত্তিকা ব্যতীত আর অন্য কিছুই নেই। অতি মধুর-মোহন, সরস-শোভন, ললিত-লোভন তত্ত্ব এটী, সুনিশ্চিত!

কিন্তু, হায়, ন্যায়-শাস্ত্র অতি কঠিন বিচারক; অতি নিরপেক্ষ-পুঙ্খানুপুঙ্খ-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-সমালোচনা-প্রবণ এই দর্শন-শাস্ত্র! তারা কোনো তত্ত্বই ত নির্বিচারে গ্রহণ করতে সম্মত নয়। সুতরাং, তাদের দিক থেকে আপত্তি উত্থাপিত হয় প্রবল এই অতি মনোহর-তত্ত্বটীর বিরুদ্ধেও। কি সেই আপত্তি? সেটী হল এই :—

"স্থিতিবাদ" মতে সৃষ্টিতত্ত্ব

ভারতীয়-দর্শন প্রধানতঃ ও মূলতঃ "স্থিতিবাদ" (Static Conception of Reality), "গতিবাদ" (Dynamic Conception of Reality) একেবারেই নয়। সংক্ষেপে "স্থিতিবাদ"-মতে, পরম-তত্ত্ব, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিত্য, নির্বিকার, পরিবর্তনহীন, নিত্যপূর্ণ, নিত্য-শুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যমুক্ত-সত্তা-শাশ্বত-কাল। অপর পক্ষে, "গতিবাদ"-মতে পরম তত্ত্ব নিত্য-পরিবর্তনশীল, এবং এরূপ পরিবর্তনই তাঁর শাশ্বত-স্বরূপ। ভারতীয়-দর্শনের মধ্যে, একমাত্র "গতিবাদী" মতবাদ হল বৌদ্ধ মতবাদ। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) বৌদ্ধ-দর্শনে ঈশ্বরের কোনো প্রশ্নই নেই। অপরপক্ষে সেশ্বর সকল মতবাদই "স্থিতিবাদ"। অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রেই ঈশ্বরকে নির্বিকার, বা পরিবর্তনহীনরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং, তাঁকে কেবলমাত্র নিমিত্ত-কারণ-রূপেই গ্রহণ করা হোক, অথবা, অভিন্ন-নিমিত্ত-

উপাদান-কারণ-রূপেই গ্রহণ করা হোক—উভয় পক্ষেই অসুবিধা-অযৌক্তিকতা সমান।

প্রথম পক্ষে পরিবর্তনের দিক থেকে অধিকতর সুবিধা হলেও (যেহেতু, এক্ষেত্রে ঈশ্বর কেবলমাত্র নিমিত্ত-কারণরূপেই পরিবর্তনভাগী হচ্ছেন, উপাদান-কারণরূপে নয়), অন্যান্য দিক থেকে অসুবিধা-অযৌক্তিকতা অধিকতর—অর্থাৎ, ব্রহ্মের সর্ব-ব্যাপিত্ব-জগল্লীনত্ব প্রভৃতির দিক থেকে। কারণ, ব্রহ্ম কেবল-মাত্র নিমিত্ত-কারণ হলে, উপাদান-কারণটীকে তাঁর বাইরে থাকতে হয়; এবং সেক্ষেত্রে তিনি আর সর্বব্যাপী থাকেন কোথায়? পুনরায়, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর উপাদান-কারণ না হলে, জগল্লীন হবেন কিরূপে, অন্তর্যামীই বা হবেন কিরূপে? এরূপ বহু অসুবিধা-অযৌক্তিকতার উদ্ভব হয় এই মতবাদে—যা বেদান্ত মতবাদ নয় একেবারেই।

দ্বিতীয় পক্ষে, সর্বব্যাপিত্ব-জগল্লীনত্ব-প্রভৃতি দিক থেকে অধিকতর সুবিধা হলেও (যেহেতু, এক্ষেত্রে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের বাহিরে উপাদান-কারণ নেই), অন্যান্য দিক থেকে অসুবিধা অধিকতর—অর্থাৎ ব্রহ্মের পরিণাম; পরিবর্তন প্রভৃতির দিক থেকে।

তাহলে সিদ্ধান্ত কি? অনিবার্য সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর-কারণবাদ পরিণামবাদ বা ত্রিতত্ত্ববাদানুসারে সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, জীব-জগৎ আছে কিন্তু তাদের কোনো ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিমূলক, গ্রহণীয় ব্যাখ্যা নেই।

তাহলে? তাহলে কি আমরা অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী ভাবেই অদ্বৈত-বেদান্তের "বিবর্তবাদে" উপনীত হচ্ছি না, জগন্মিথ্যাত্ববাদে উপনীত হচ্ছি না? কারণ, অদ্বৈত-বেদান্তের "বিবর্তবাদ" ও "মিথ্যাবাদ" কেবলমাত্র এই কথাই বলছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থাৎ আমাদের দিক থেকে, জীব-জগৎ সত্য বলে বোধ হয়, সুনিশ্চিত। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, তা যে কি করে সৃষ্ট হল, তা ন্যায়সম্মত ভাবে কোনোক্রমেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এরই নাম "বিবর্ত" এরই নাম "মিথ্যা"—আপাতদৃষ্টিতে সত্য, অথচ পরিশেষে অবোধ্য, অনির্বচনীয় এবং সেজন্য সত্য নয়।

"গতিবাদ"-মতে সৃষ্টিতত্ত্ব

এস্থলে মূলীভূত প্রশ্ন হল এই:—"গতিবাদের মূলীভূত-সত্তা (The Absolute) নিত্য-পরিপূ[র্ণ] কি না?

যদি না হন, তাহলে এরূপ অপূর্ণ-সত্তাকে মূলীভূ[ত] সত্তাই বা বলা যাবে কিরূপে? কারণ, পৃথিবীর অন্যা[ন্য] সকল সত্তাই ত অপূর্ণ। সেক্ষেত্রে, এই বিশেষ-অপূ[র্ণ] সত্তাটীকেই "মূলীভূত-পরম-সত্তা" বলা হল কোন্ যুক্তি[তে] বলে? এরূপে, যদি এই মূলীভূত সত্তার অস্তিত্ব নির্ভ[র] করে জগতের ওপর, এবং জগৎ-সৃষ্টি না হলে য[দি] তিনি অপূর্ণই থেকে যান, তাহলে তিনি আর স্বাধী[ন] স্বতন্ত্র সত্য, সত্তা, তত্ত্ব রইলেন কই? এক্ষেত্রেও প্র[শ্ন] এই যে, এরূপ পরাধীন-পরতন্ত্র-সত্তাকে "মূলীভূত-পর[ম] সত্তা" বলা হল কেন? কারণ, জগতের অন্যান্য সক[ল] সত্তাই ত তাই। তাহলে হঠাৎ এই বিশেষ-সত্তাটীকে এরূপ ভাবে "মূলীভূত-পরম-তত্ত্ব" রূপে সম্মান দেওয়া হ[ল] কেন অকারণে?

পুনরায়, এই মূলীভূত-সত্তা যদি নিত্য-পরিপূর্ণ হ[ন], তাহলেও প্রশ্ন উঠবে যে, এরূপ নিত্য-পরিপূর্ণ-সত্তা ক্রমশঃ পরিবর্তনের অর্থই বা কি, এবং প্রয়োজন বা কোথায়? "মূলীভূত-সত্তা" অর্থহীন কিছুই কর[তে] পারেন না নিশ্চয়ই। যেমন, বীজ যখন অন্তর্নিহি[ত] শক্তি বলে ক্রমান্বয়ে, অনিবার্য ভাবেই অঙ্কুরে ক্ষুদ্র-বৃক্ষে বিশাল-মহীরুহে পরিণত হয়, তখন তার একটী অ[র্থ] আছে, যেহেতু এই ভাবেই অপূর্ণ বীজ ক্রমান্বয়ে পূর্ণ[তা] লাভ করছে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে, বিভিন্ন প্রণালী সাহায্যে, বিভিন্ন রূপ ধরে। এস্থলে, "পরিবর্তনের অর্থ "পরিবর্ধন" এবং সৃষ্টি কালে, এই ভাবেই, সে গতিশীল, সেই স্বভাবতঃই পরিবর্তনশীল মূল বস্তুটী—প্রারম্ভিক কারণটী নিজের ভিতর থেকে ধারাবাহি[ক] ভাবে, নব নব কার্য সৃষ্টি করে চলেছে। পার্থিব ব[স্তু] নিত্য পূর্ণ নয়; পরেও পূর্ণ হয় না, কিন্তু কালক্র[মে] যথেষ্ট পূর্ণতা লাভ করে এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে। বলাই বাহুল্য যে, নিত্য-পূর্ণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ক্ষে[ত্রে] এরূপ পূর্ণতার দিকে অভিযান, এরূপ পরিবর্ধন সম্ভব পরই নয়।

পরিবর্তন উৎকর্ষ-অপকর্ষসূচক

যদি বলা হয় যে, নিত্য-পূর্ণ, মূর্তীভূত-সত্তা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিজের মধ্যেই নিজে অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছেন—কিন্তু একদিকে পরিবর্ধিতও হচ্ছেন না উৎকৃষ্টতরও হচ্ছেন না; অন্যদিকে, হ্রাসপ্রাপ্তও হচ্ছেন না, নিকৃষ্টতরও হচ্ছেন না—তাহলে প্রশ্ন এই :—

যদি এরূপ নিরন্তর পরিবর্তন সেই বস্তুটীকে উৎকৃষ্টতর, অথবা নিকৃষ্টতর না করে, তাহলে তাদের কি "পরিবর্তনই" বলা যায়? কারণ, যদি সেই বস্তুটী ঠিক পূর্ববৎই থাকে, কণমাত্রও বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত, উন্নত বা অবনত অধিক বা অল্প, ভাল অথবা মন্দ না হয় একেবারেই, তাহলে ত তা পরিবর্তনই হল না নিশ্চয়ই।

উদাহরণ

যথা, সমুদ্র। সমুদ্র চিরচঞ্চল, সমুদ্র চির-গতিশীল। কিন্তু তার গতি তার নিজের মধ্যেই কেবল—তার সহস্র সহস্র ঊর্মির চিরন্তন উত্থান-পতন তার নিজের মধ্যেই কেবল। কিন্তু অস্বীকার করবার উপাই নেই যে, তাতে তার রূপ আকারাদি নিত্যই পরিবর্তিত হচ্ছে। একটী উত্তুঙ্গ যখন সগর্বে, সবেগে, সাড়ম্বরে উত্থিত হচ্ছে, তখন সমুদ্রের এক রূপ; যখন একটী ক্ষুদ্র বীচি সসঙ্কোচে, ধীরে বিনাড়ম্বরে উত্থিত হচ্ছে, তখন সমুদ্রের অন্য এক রূপ।

এরূপে, সেক্ষেত্রে কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে; এই সেই অনুসারে কিছু না হ্রাস-বৃদ্ধি, উৎকর্ষ-অপকর্ষ প্রভৃতি ঘটছেই ঘটছে। কারণ, পৃথিবীতে কিছুই নিরর্থক নয়। সেজন্য, পৃথিবীতে যা' কিছু ঘটছে, কিছু না কিছু অর্থ আছে, মূল্য আছে, সার্থকতা আছে। এই কারণেই প্রত্যেক পরিবর্তনই উৎকর্ষ-অপকর্ষের কারণস্বরূপ।

পুনরায়, যদি এক্ষেত্রে "পরিবর্তনের" কথাই বলা হয়, তাহলেও এরূপ "পরিবর্তনের" সার্থকতাই বা কতটুকু? কেনই বা অকারণে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এই ভাবে নিজেকে চিরচঞ্চল, চিরগতিশীল, চিরপরিবর্তনশীল করে রাখবেন? তাঁর কোনো কর্মই ত উদ্দেশ্য বিহীন, অকারণ, অসঙ্গত কর্ম হতে পারে না।

পুনরায়, যদি এরূপ তথাকথিত "পরিবর্তনের দ্বারা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কোনোদিক থেকেই হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছেন না, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট হচ্ছেন না, ভালো মন্দ হচ্ছেন না, তাহলে বলতে হয় যে, পরিপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত-কাল তাঁর ভিতরেই বিরাজমান। তাহলে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের এরূপ ক্রমাভিব্যক্তির (Evolution) কোনো অর্থই ত নেই। গতিও থাকবে, পরিবর্তনও থাকবে, ক্রমাভিব্যক্তিও থাকবে—অথচ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিত্যপূর্ণই থাকবেন—এ ত যুক্তিসঙ্গত নয় কোনোক্রমেই।

বস্তুতঃ, এরূপ "গতিবাদ" স্বভাবতঃই ক্রমাভিব্যক্তিবাদ এবং ক্রমাভিব্যক্তি নিত্য-পূর্ণতার বিরোধী। সেজন্য, মূর্তীভূত-পরম-সত্তাকে যখন সকলেই নিত্যপূর্ণ বলেই গ্রহণ করেন, তখন "গতিবাদ" গ্রহণ যাগ্য হয় কিরূপে? সেজন্য, আমরা দেখি, এই সুনিগূঢ় সৃষ্টিতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতে এই সকল সুবিখ্যাত দার্শনিক-মতবাদ সফল হতে পারেনি।

উপলব্ধি ও যুক্তি বিচার

কিন্তু, সে যাই হোক না কেন—সৃষ্টিতত্ত্ব ন্যায়ানু-মোদিত-ভাবে, যুক্তিসঙ্গত-ভাবে দর্শনসম্মত-ভাবে ব্যাখ্যা করা যাক, বা না যাক, যখন সাধন-বলে আমাদের অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হয়, তখন কি আমরা অনিবার্য-ভাবেই, সেই একই স্থির সিদ্ধান্তেই উপনীত কি হই না যে, আমাদের সঙ্গে পরব্রহ্মের, পরমেশ্বরের, পরম-জননীর নিত্য, অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ? যদি আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব-বাদী, পরিণামবাদী, অথবা ত্রিতত্ত্ববাদীগণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলি যে, তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই স্বয়ং জীব-জগতে সাক্ষাৎ ভাবে পরিণত হয়েছেন, তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুতে পরমাণুতে শাশ্বত-কাল লীন হয়ে আছেন, তাহলে আমরাও নিশ্চয় শাশ্বতকাল ব্রহ্মস্বরূপ—পরমেশ্বরের স্বগতভেদ, গুণ, শক্তি, অংশ, কার্য, পরিণামরূপে শাশ্বতকাল ঈশ্বরস্বরূপ। এর ত আর অন্যথা হতে পারে না—যেহেতু কারণ ও কার্য, দ্রব্য ও গুণ, শক্তিমান্ ও শক্তি, অংশী ও অংশ সমস্বরূপ হতে বাধ্য। কারণ, কার্যে স্বয়ং ও সাক্ষাৎ ভাবে পরিণত, অথবা রূপান্তরিত হয় বলে কারণ ও কার্য অনিবার্য-ভাবেই স্বভাবতঃই সমস্বভাব। যেমন, কারণ মৃৎপিণ্ড ও কার্য

মৃন্ময়-ঘট উভয়েই মৃত্তিকা-স্বরূপ। একই ভাবে কারণ ব্রহ্ম ও কার্য ব্রহ্মাণ্ড উভয়েই ব্রহ্মস্বরূপ। পুনরায় গুণ দ্রব্যে, শক্তি শক্তিমানে, অংশ অংশীতে নিত্য-বিরাজমান; এবং গুণ দ্রব্যের সঙ্গে, শক্তি শক্তিমানের সঙ্গে, অংশ অংশীর সঙ্গে সমস্বরূপ—যেহেতু কোনো বস্তুর মধ্যে এমন কিছুই থাকতে পারে না যা তার স্বরূপের বিরুদ্ধ—তাহলে ত তা মুহূর্ত মধ্যেই খণ্ড-বিখণ্ড, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংসীভূত হয়ে যাবে। অতএব ব্রহ্মের মধ্যে অ-ব্রহ্ম কিছুই থাকতে পারে না; এবং সেজন্য, জীব-জগৎ যদি ব্রহ্মের গুণ হয়, শক্তি হয়, অংশ হয় স্বগতভেদ হয়, কার্য হয়, পরিণাম হয়, এবং সেই কারণে, তাঁরই অন্তর্ভুক্ত হয় আদ্যন্তকাল, তাহলে, তারা অতি অবশ্যই ব্রহ্মস্বরূপ হবে।

পুনরায় অন্য দিক থেকে, যদি বলা হয় যে, সত্যই সৃষ্টি বলে কিছুই নেই, সৃষ্টি মিথ্যা, মায়া, বিবর্তই মাত্র—তাহলেও বলতে হয় যে, জীব-জগৎ প্রকৃতকল্পে জীব-জগৎ নয়, যদিও তাদের জীব-জগৎ বলে ভ্রম হতে পারে। তাহলে তারা কি? তাহলে ত আর কোনো বিকল্প নেই—বলতেই হবে যে, তারা ব্রহ্ম—তাদের অন্য কিছু বলে বোধ হলেও, তারা তা একেবারেই নয়—এ বোধ সম্পূর্ণরূপেই আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞানপ্রসূত; এবং সেজন্য, মিথ্যা বা ভ্রান্ত।

এই ভাবে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি-বিচারের কথা বাদ দিয়ে, যদি কেবলমাত্র সাক্ষাৎ অনুভূতি বা উপলব্ধির দিক থেকে সমগ্র বিষয়টাকে দেখি, তাহলে আমাদের নিজেদের ব্রহ্মস্বরূপত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সন্দেহ-শঙ্কা থাকতেই পারে না। সত্যই, এরূপ উপলব্ধি সাধারণ যুক্তি-বিচার থেকে বহু উর্ধ্বে, কারণ যুক্তি-বিচার মনের বুদ্ধির কার্য; এবং মন ও বুদ্ধি ব্যাবহারিক বা সাধারণ-সাংসারিক-স্তরগত। অপর দিকে, উপলব্ধি আত্মার আলোক; এবং সেজন্য পারমার্থিক বা অপার্থিব-স্তরগত। একই ভাবে, আমাদের অজ্ঞানও দ্বিবিধ, পারমার্থিক-বিষয়ক ও ব্যাবহারিক-বিষয়ক। প্রথম অজ্ঞানের জন্য আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি না; দ্বিতীয় অজ্ঞানের জন্য আমরা সাধারণ পার্থিব-বস্তু প্রভৃতিকে জানতে পারি না। প্রথম অজ্ঞান দূর হয় যুক্তি-বিচার-নিরপেক্ষ আত্মজ্ঞানে; দ্বিতীয় অজ্ঞান দূর হয় যুক্তি-বিচারমূলক সেই সেই বস্তুজ্ঞানে। প্রথমটি "নিদিধ্যাসন"-স্তরগত; দ্বিতীয়টী "মনন"-স্তরগত।

এরূপ সাক্ষাৎ, স্থির, ধীর, উপলব্ধিই আজ আমরা বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করি এই মহামাতৃপূজাকালে। তিনি ন্যায়ানুগত-ভাবে আমাদের সৃষ্টি করতে পারুন, বা নাই পারুন, তিনি যে আমাদের একান্তই আপনার জন, আমাদের সর্বস্ব, আমাদের আত্মা, আমাদের আলোক, আমাদের আনন্দ, আমাদের অমৃত—এই মধুর-মোহন মহাতত্ত্বটী যেন আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে পারি—তবেই ত হবে আমাদের পূজা সার্থক, নতুবা নয়॥

সংশয়!

শ্রীজ্ঞানপ্রিয় চক্রবর্তী

এই কিরে সেই ভারতবর্ষ! যে ছিল বিশ্বে মহিমময়,
যেথা বশিষ্ঠ 'বিশ্বামিত্রে' দানিল দীক্ষা করিল জয়!
এই কিরে সেই পুণ্যতীর্থ! রাখিতে যেথায় জীবের স্বার্থ
কাল-হলাহল দেব-ত্রিলোচন হরষে করিল পান,
দানব নাশিতে যেথায় 'দধীচি' নিজেরে করিল দান!
হেথা কিরে কভু মুনি-ঋষিকুল সবাকার মনে ফুটাতে ফুল,
ছড়ালো জগতে জ্ঞানের আলোক নাশিতে অন্ধকার,
শিখাইল সবে সাম্যে বরিতে—বিদূরিতে হাহাকার!
এই কিরে সেই দেবের তীর্থ, যেথা নরপতি ত্যজিয়া স্বার্থ,
রাখিতে সত্য মানব-ধর্মে ছাড়িয়া সিংহাসন,
হারায়ে রাজ্য পত্নী আপন, আপন পুত্র নয়নেরি ধন—
চণ্ডাল বেশে সাজাইল চিতা,—শ্মশানে অনুক্ষণ!
হেথা কিরে কভু কোনো মহামতি, কোনো সে রাজন,
কোনো সে ভূপতি,
আশ্রয় দিয়া ভীত পারাবতে, বাঁচাতে তাহারি প্রাণ,
অরাতিরে তা'র তনু আপনার—কাটিয়া করেছে দান!
হায়রে বিধাতা! আজি এ ভারতে,
সরমেতে মরি তাঁদেরে স্মরিতে,
যাঁহাদেরে স্ম'রি আজিও কাঁদিছে নদ-নদী উপবন;
সুনীল-সিন্ধু, গিরি-পর্বত, উদাসী বাউল মন!

আগমনী

রচনা :—স্বামী সত্যানন্দ সুর ও স্বরলিপি :—প্রবীর মজুমদার

শরৎ ভোরে আজ যে আমার
　　নয়ন গেছে ঠেকি
চাঁপার ডালে সোনার আলো
　　মধুর অনুরাগী ॥
গগন হ'ল গঙ্গাজলী—
　　সাদা মেঘের কাশে
পূজার বাঁশী দূরকে যেন
　　কাছেই দিল লেখি ।
শিউলী তলায়, আজ কুড়াবো
　　ঝরে পড়া দিন
রোদে জলে কে ছড়ালো
　　কমল মধুর চিন ।
কোথায় যেন জমে ছিল
　　পুরাণো সব কথা
আজ সহসা ছাড়া পেল
　　যুঁথি ফোটায় সেকি ॥

| | | | মা মা র্সা | র্সা ধা - | পা - মা | রা রা - | ণ্া ণ্া - |
　　শ র ৎ ভো রে ০ আ জ্ যে আ মা র ন য় ন্
| সা রা মরা | সা - সা | - - - | ণ্া ণ্া - | সা সা - |
　　গে ছে ০০ ঠে ০ কি ০ ০ ০ ন য় ন্ গে ছে ০
| রা রা - | মা - পমা | রা রা সা | ণ্া সা - | রা সরা রা |
　　ঠে কি ০ রে ০ ০০ ন য় ন্ গে ছে ০ ঠে ০০ কি

| - - - | সা সা র্সা | র্সা ধা - | পা - মা | রা মা - |
• • • শ র ৎ ভো রে • আ জ্ যে আ মা র

| ণ্ ণ্ - | সা রা মরা | সা - সা | - - - |
ন য় ন্ গে ছে •• ঠে - কি • • •

| রা মা রা | মা পা - | মা পা মা | পা ধা - | র্সা র্সা র্রর্সা |
চাঁ পা র ভা লে • সো না র আ লো • ম ধু •র্

— ধা পা ধপা | মা মা গা | রগা রা - |
অ সু •• রা গী • রে• • • শরৎ ভোরে ইত্যাদি

| | - - ধা | ণা পা ধা | ণা - - | র্সা র্রর্সা ণধা | - - ধা |
• • গ ◦ গ ন হো • • লো •• •• • ◦ গ

| ণা পা ধা | ণা - - | র্সা - - | র্রা র্রা র্জ্ঞর্রা | র্সা ণা - |
ং গা • জ • • লী • • সা দা •• মে ঘে র

| ধা পা - | ণা - র্সণা | ধা ধা পা | মা ধা - | ণধা পা - |
কা শে • রে • •• সা দা • মে ঘে র কা• শে •

| - - - | রা মা রা | মা পা - | মা পা মা | পা ধা - |
• ◦ • পূ জো র বাঁ শী • দূ র্ কে যে ন •

| র্সা র্সা র্রর্সা | ধা পা ধপা | মা মা গা | রগা রা - | |
কা ছে ◦ই দি ল •• লে খি • রে• • • শরৎ ভোরে ইত্যাদি

| | রা - জ্ঞা | রা মজ্ঞা রা | সা - রা | সা জ্ঞরা সা | ধ্ - ধ্ |
শি উ লী ত লা◦ য় আ জ্ কু ড়া বো• ◦ ঝ ◦ রে

| ণ্ ণ্ - | সা - রগা | মা - - | গা - মা | গা পমা জ্ঞা |
প ড়া ◦ দি ◦ •• ন্ • ◦ রো • দে জ লে• •

| রা - জ্ঞা | রা মজ্ঞা রা | সা রা সা | ণা সা - | রা - - |
কে ◦ ছ ড়া লো• ◦ ক ম ল্ ম ধু র চি ◦ ন্

| - - - | - - ধা | ণা পা ধা | ণা - - | র্সা র্রর্সা ণধা |
• ◦ • ◦ • কো ◦ থা য় যে ◦ • ন ◦◦ ◦◦

| - - ধা | ণা পা ধা | ণা - - | র্সা - - | র্রা র্রা র্জ্ঞরা |
• • জ ◦ মে •' ছি • • ল • • পু রো ••

| র্সা ণা - | ধা পা - | ণা - র্সণা | ধা ধা পা | মা ধা - |
সো ন ব্ ক থা • রে • •• পু রো • সো ন ব্

| ণধা পা - | - - - | রা মা রা | মা পা - | মা পা মা |
ক• থা • • ◦ • আ জ্ স হ সা • ছা ড়া •

| পা ধা - | র্সা র্সা র্রর্সা | ধা পা ধপা | মা মা গা | রগা রা - | |
পে লো • যূঁ থি •• ফো টা ◦র্ সে কি • রে• • ◦

শরৎ ভোরে ইত্যাদি

কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে প্রচারিত
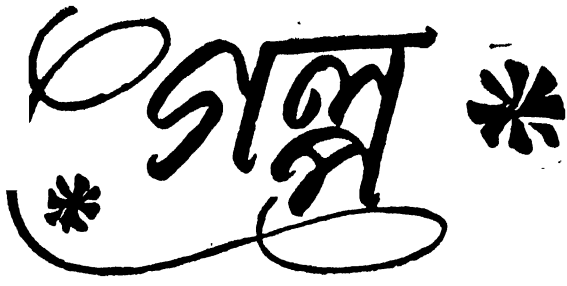
রাতের শেষ প্রহরে

তারা প্রণব ব্রহ্মচারী

(অলৌকিক কাহিনী)

দরজার পাল্লা দু'টোর মাঝ অবধি কাঁচ লাগানো। ভেজানো দরজা দিয়ে বাইরের সব কিছু দেখা যাচ্ছে। ভিতরে ব'সে ব'সে দেখছি। একটি মুখ আনাগোনা করল বার দু'য়েক। ভিতরে ব'সে থাকতে অনেকক্ষণ ধরেই অস্বস্তি বোধ করছি। নোংরা পরিবেশ। ঘরটা যে পরিষ্কার করা হয় কখনো—দেখলে মনে হয় না।

পাকুড় ষ্টেশনের এই একটিমাত্র ওয়েটিং রুমে গুটি-কতক লোক ব'সে আছি আমরা। দু'জন আপাদ-মস্তক খদ্দরে চাপা দিয়ে শুয়ে আছে মেঝেয়। বন্ধুবর অনিমেষ ঝিমুচ্ছে। ঘুম কাতুরে মানুষ। বেঞ্চির শেষ দিকটায় একটি বৃদ্ধ ব'সে ব'সে নাক ডাকাচ্ছে। ট্রেনেও একে দেখেছিলাম ওই একই অবস্থায়। বৃদ্ধের মুখখানা যেন ব্যাণ্ডেজ করা। চোখ-নাক ছাড়া মাথা থেকে সমস্ত মুখেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধার মতো করে কমফর্টারটি জড়ানো। মাঝে মাঝে নাক ডাকা থামছে, সর্বশরীর কেঁপে উঠছে।

বাইরে বরফ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া।

ট্রেন থেকে নেমেই বুঝেছিলাম। ভিতরেও বেশ ঠাণ্ডা। পাহাড়ের ওপর দেশটা। ফাল্গুনের শেষেও তাই হাড়কাঁপানো শীত। মাটির তলায় ছ'তলা আটতলা সমান নীচু অবধি পাথরখনি দেখতে এসেছি। এখানকার পাথরখানির কালোপাথর দেশবিদেশের রাস্তার বুকে ট্রাম লাইনের আশেপাশে আস্তানা গেড়ে রয়েছে।

নিউ ষ্টোন চীপ সাপ্লাই কোম্পানীর গেষ্ট হাউসে উঠে কিছু'দিন থাকব। কোম্পানীর মালিকের সঙ্গে কলকাতায় কথাবার্তা হয়ে গেছে। এখানকার ম্যানেজার গাড়ী নিয়ে আসবে সকাল ছ'টায়। কিন্তু দু'ঘণ্টা ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াল আমার পক্ষে। অনিমেষের দিকে তাকালেই বিরক্তিতে ভরে উঠছে মন।

যত নষ্টের গোড়া ওই। আগের ট্রেনে উঠেই এই বিপত্তি। বারণ মানলে না একটুও। এ ট্রেন ছাড়েনি যখন—এতেই উঠে পড়া ভালো। পরের ট্রেন আসবে অনেক দেরীতে। একটু আগে পৌঁছুলে ক্ষতি কি? ভালো ওয়েটিংরুম নিশ্চয় আছে। রাতটা কাটিয়ে দিলেই, ব্যস—।

অনিমেষের দিকে তাকালাম। নির্বিকার চিত্তে নিশ্চিন্তে দিব্যি ঘুমুচ্ছে।—আহাম্মকের কথায় এইভাবে বাইরে গিয়ে বারে বারে ঠকেছি। তবু লোকটার কথা এড়াতে পারি না কেন, জানি না।

ঘরটার দুর্গন্ধ বাতাস দম আটকে দিচ্ছে। উঠে পড়লাম। অনিমেষকে ধাক্কা দিতেই চমকে উঠে চোখ চাইলে।

চল! বেরিয়ে পড়া যাক। ম্যানেজার তো ব'লেই দিয়েছে—যে কোনো কুলিকে বললেই গেষ্ট হাউস দেখিয়ে দেবে।

পাগলামো করিস নে। ঘুমিয়ে নে একটু। ওদের গাড়ী তো আসছে ছ'টায়।

দু'চোখ বুঁজল আবার অনিমেষ। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ কিছুক্ষণ। অনিমেষের সঙ্গে যাবার কোনো লক্ষণই দেখলাম না। এগুলাম দরজার দিকে। ও থাক। গাড়ী ক'রে যাবে। আমি আগে পৌঁছুই। দরজা খুলতে যাচ্ছি, একটা মুখ সরে গেল আবার আগের মতোই। লোকটাকে ধরতে হ'বে। বোধহয় কুলি। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে।

বাইরে বেরুতে দেখে, লোকটা থমকে দাঁড়াল। মাথা-কান—সর্বাঙ্গ চটে ঢাকা। হাসতে হাসতে কাছে এগিয়ে এলো।

: বাবুজী কঁহা যায়েঙ্গে? হাতের রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল—কেতনা টাইম হুয়া বাবুজী?

: চার। তুম কুলি হায়?

: জী।

কুলির সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখলাম—সে কোম্পানীর গেষ্টহাউস জানে। আমাকে বেশ খুশীমনে পৌছে দিতে রাজী হ'ল। জানাল, রেল লাইনের ওপারেই। ওপরের পুল পেরিয়ে গেলে দেরী হ'বে। লাইন পেরুলেই পাঁচ মিনিটের পথ।

লাইন পেরুচ্ছি দু'জনে পাশাপাশি। ডান দিক বাঁদিক দেখছি। ট্রেন আসা যাওয়ার কোনো চিহ্ন নজরে পড়ল না। লোক-জনেরও না। আকাশ ভর্তি তারা। শীতের কাঁপনি লাগছে দেহ-মনে। জোরে জোরে চলছে কুলি। অনুসরণ করছি আমিও।

একটা পাঁচিলের সামনে এসে থমকাল। দেড়মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল। মাঝখানের গর্তে পা রেখে লাফিয়ে ওপারে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি ইতস্তত করছি। হাত বাড়িয়ে দিল। ইশারায় গর্তে পা রেখে ওর হাত ধরতে বলল। এবিষয়ে অনভ্যস্ত হলেও ওর কাছে বেকুব সাজতে মন চাইল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর কথা মেনে নিলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম ওর দেহের শক্তি দেখে। মুহূর্ত মধ্যে এক হাতে ক'রে, খেলার পুতুলের মতো তুলে নিল আমায়। জিগ্যেস করলাম, কোনো কষ্ট হয়নি তো?

: না। তবে আংটিটা হাতের তেলোয় বিঁধেছে শুধু।

আমি লজ্জিত হলাম। বড় দুঃখের বিষয়! আমাদের দু'জনের কথাবার্তা হিন্দীতেই হচ্ছিল। আমার কথা শুনে জোরে হেসে উঠল কুলি। বলল, কিছু হয়নি। আমি তামাসা করছিলাম স্রেফ বাবুজী।

চলেছি উত্তরদিকে আমরা দু'জনে। নিস্তব্ধ নিঝুম রাস্তা। দু'পাশের একতলা দোতলা তিনতলা বাড়ীগুলো ঘুমুচ্ছে। জানালা দরজা সব বন্ধ। ল্যাম্পপোষ্টের আলো জ্বলছে খানিক দূরে দূরে, কোনো বাড়ীর রকে অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে এ-ওর ঘাড়ের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। মানুষের পায়ের শব্দে মুখ দিয়ে সাড়া বেরুচ্ছে না একটুও কারো। ওদের নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে আছে যেন শুধু।

পাঁচ মিনিটের পথ আর একটু আর একটু ক'রে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনে তাকালে ষ্টেশন বাড়ীঘর আর নজরে পড়ছে না। কুলিকে বললাম, তুমি ভুল শুনেছ। ভুল বুঝেছ। ডিরেকশন দেওয়া আছে যা—ষ্টেশন থেকে তো এতদূরে গেষ্টহাউস নয়। গেষ্টহাউস সহরে। এ যে সহরের বাইরে এসে পড়ছি আমরা।

এবারেও জোরে হেসে উঠল কুলি।

কিন্তু মনে হ'ল, হাসির ধমকে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল যেন। আলো আঁধারে যেটুকু দেখা যাচ্ছে —মুখের পেশী বেশ শক্ত হ'য়েই উঠেছে। প্রথম হাসি এরকম ছিল না। প্রথম মুখ মিষ্টিমুখ দেখেছিলাম।

নির্বাক মুখে হনহনিয়ে চলছে কুলি।

নিষ্প্রদীপ সহরতলীতে ঢুকলাম যেন আলোর রাজ্য ছেড়ে। চারদিকে বাতাসের শন-শন আওয়াজ। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। আকাশ আলোর যেটুকু দেখা যায় দেখছি, কিছু দূরে মস্ত পুকুর। তালগাছ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মাঝে মাঝে প্রেত ছায়ার মতো।

পা দু'টো মাটির সংঙ্গে আটকে যাচ্ছে যেন। দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাশে এসে দাঁড়াল কুলি। মিটিমিটি হাসছে।

: ডর পাচ্ছেন বাবুজী? আর একটু বাকি। ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব। রেলের কুলিদের অবিশ্বাস করবেন না।

সাহসে ভর ক'রে বললাম, সেই বিশ্বাসেই সঙ্গে এসেছি।

চলতে লাগলাম আবার দু'জনে পাশা-পাশি। ওর গা আমার গায়ে ঠেকছে। ওর নিশ্বাস উত্তপ্ত হ'য়ে উঠছে ক্রমে। আমার গায়ে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। যাবার ইচ্ছে একদম নেই। তবু যেতে হ'চ্ছে। ওর শক্তির পরিচয় ওঠাবার সময় পেয়েছি আমি। ও যদি বোঝে আমি ভয় পেয়েছি ওকে—ওকে অবিশ্বাস করছি—তা' হ'লে ও ক্ষেপে উঠতে পারে। নৃশংস

হ'য়ে উঠতেও পারে। সম্পূর্ণ ওর কজার মধ্যে আমি। অনেক দূরে চলে এসেছি। বন্ধুবর চিন্তা ক'রে, খুঁজেও পাবে না এই বিদেশ বিভুঁয়ে। ছুটে পালাতে গেলেও পারব না ওর সঙ্গে দৌড়াতে। ধরা পড়ে যাব। এখানে হারিয়ে গেলে, গুমখুন হ'য়ে গেলেও— নিরুদ্দেশের খাতায় নাম পড়বে। দুনিয়া জানবে না— কোনো দিনই হদিস পাবে না কেউ। এই ভাবেই কোনো কোনো মানুষ কালের গহ্বরে তলিয়ে যায় বুঝি।

: বাবুজী!

রক্তজল করা ডাক। তবু মনকে শক্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা করলাম। এতক্ষণ যা' ভেবেছি—সবই মনের নিছক কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কল্পনার চোখেই ওকে দুর্বৃত্ত দেখছি, কল্পনার কানেই ওর প্রাণঘাতী কণ্ঠস্বর শুনছি। রেলের কুলিই বিদেশে সহায়— পথপ্রদর্শক। ওদের নিয়ে কখনো বিপদে পড়িনি কোনো জায়গায়। অহেতুক ভয় এটা। ও বিশ্বাসী। ভুল বুঝে, অন্য কোনো গেস্টহাউসে তুললেও, সেখান থেকে আসল জায়গার পাত্তা নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

চলছি মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

: বাবুজী! এসে পড়েছি এবার। আর একটু বাঁদিকে গেলেই পেয়ে যাব। পা চালিয়ে চলুন তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়েই, ভূত দেখার মতো চমকে উঠল কুলি। এরকম ইস্পাত-কঠিন মানুষের ভয় ধরতে পারে ভাবতেও পারি নি। হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার বাঁহাতটা সবলে চেপে ধরে, হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে ঝোপের আড়ালে এনে লুকিয়ে রাখল। ফিসফিসিয়ে বলল, একদম আওয়াজ ক'রবেন না। কোনো লোক দেখলেও না। চাপা চটের ভিতর থেকে একটা ছুরি বার ক'রে বুকের ওপর ধরল। —চীৎকার ক'রেছেন কি সব শেষ। আংটি ঘড়ি খুলুন।

পকেটে কি আছে বার করুন।

শীগগির—শীগগির।

মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো, রেলওয়ে কুলি হয়ে—

: কুলি নই আমি।

বুঝলাম, সুযোগ পেলে এরা এই ভাবেই রুজি রোজগার করে। ভদ্রতার সম্বোধ-টুকু একবারের জন্যেও খোয়ায়নি। মারবার হ'লে মেরে ফেলতে পারত ভয় দেখানো পেশা এদের। যা' কাছে আছে দিয়ে দিলে চলে যাবে। মনে হ'ল আমার এটা হওয়া উচিত ছিল। নিজের একগুঁয়েমির খেসারৎ—নিজেকেই দিতে হ'বে।

যা ছিল কাছে সব দিলাম কুলি বেশী দুর্বৃত্তকে। চলে যাচ্ছে। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল কোথা থেকে এক সবল দেহী যুবক—বুঝতে পারা গেল না।

: তোর সঙ্গের লোকটা কোথায়? শীগগির বল!

তখনো দু'হাতের মুঠোয় আংটি ঘড়ি টাকা লোকটার।

: জানি না।

পাশ কাটিয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি বাধল দু'জনের। ঘড়ি আংটি টাকা ছিটকে পড়ল। ভয়ংকর মূর্তি ধরল লোকটা। চাপা চটের তলা থেকে ছুরি বার করল। জামার তলা থেকে ছুরি বার করল আগন্তুকও।

একি দেখছি আমি! জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি! কোথায় আমি? কলকাতায় না পাকুড়ে?

চোখের সামনে দুটি দৈত্যের তুমুল যুদ্ধ দেখছি। দু'জনের মাথাতেই খুন চেপে গেছে। একজন অন্য জনের বুকে পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চলেছে। মৃত্যুর বিভীষিকা উন্মত্ত নাচে নেচে উঠেছে দু'জনকে ঘিরে।

এই অচেনা জায়গায়—ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কাকে ডাকব, কার কাছে পালিয়ে যাব—কিছু বুঝে উঠতে পারছিনে। আমি যেন নিস্পন্দ-নিস্পন্দ হ'য়ে গেছি। চলবার নড়বার বলবার—সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।

আগন্তুক আসতে ভেবেছিলাম, বাঁচব বোধহয় দুর্বৃত্তের হাত থেকে। লোকটা হয় তো দূর থেকে

অনুসরণ ক'রে চলছিল আমাদের—ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখতে পেয়েই, চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ঝোপের আড়ালে এনে লুকিয়ে রেখেছিল শিকারকে শিকারী। কিন্তু ধারণা ভুল। দু'জনেই সমব্যবসায়ী। শিকার অনুসন্ধানী। প্রথম শিকারী অংশীদার করতে চায় না মোটে দ্বিতীয় শিকারীকে। দ্বিতীয় শিকারী শিকারের অনুসন্ধান ক'রে তার প্রাপ্যগণ্ডা বুঝে নিতে চেয়েছিল বোধহয় ঠিক-ঠিক।

মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেল চক্ষের নিমেষে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দু'জনেই। রক্তাক্ত দেহ দু'টি পড়ে আছে ঝোপ থেকে খানিক দূরে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি। কতক্ষণ কেটেছে এইভাবে জানি নে। ভোরের আলো ফুটেছে। পথচারীরা চলতে সুরু ক'রেছে। দেহাতী মেয়ে জল নিতে এসেছে পুকুরে গাগরী কাঁখে। বীভৎস দৃশ্য দেখে গগনভেদী চীৎকার ক'রে উঠেছে। সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি। লোক ছুটে আসছে চারদিক থেকে।

লোকে লোকারণ্য। পুলিস এসেছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে আমাকে। সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। নির্বিঘ্নে নিরাপদ জায়গায় পৌছে দেবে—প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়ে গেছি আগন্তুকের মৃত দেহটি দেখে। আগন্তুককে দেখেছি সারাক্ষণ ট্রেনে। ওকে দেখেছি ওয়েটিং রুমে। স্পষ্ট মনে পড়ছে চোখ নাক বার করা কমফর্টার জড়ানো মুখখানা। দেহের ভারে নুইয়ে চলা দেখে ভাবতে পারা যায়নি ছদ্মবেশের আড়ালে এক দৈত্যদানব যুবক আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। এই যুবককেই দেখেছি অনেকবার জ্যাঠতুতো ভায়ের ঘরে।

জ্যাঠামশাই বারণ করতেন এর সঙ্গে মিশতে। এ দাগী আসামী। জ্যাঠতুতো ভাই-এর উচ্ছৃঙ্খ ব্যবহারে ত্যক্তবিরক্ত হ'য়ে পড়েছিলেন জ্যাঠামশাই ঘরবাসী করতে অনেক চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হ'(ছিলেন। ত্যাজ্যপুত্র করবার ভয় দেখিয়ে, অনুনা বিনয় ক'রেও ছেলের মন ঘোরাতে না পেরে বলতে: বিষয়ের ভার অংশটা আমাকে দিয়ে যাবেন।

আমিও জ্যাঠামশাই এর সুরে সুর মিলিয়ে বলতা ভাইকে—তোর নিজের দোষে সব হারালি। জ্যাঠামশা আমাকে কিছু দিলে—না করতে পারিনে তো আ আমি। ভালো হ'য়ে তুই এখনো পেতে পারিস সব আমার দিকে চেয়ে রাগে ফুলত ভাই। মনে হ' উদ্দেশ্য বুঝি সফল হবে। ভাই হিংসেতে পরিবর্ত হ'বে। জ্যাঠামশাই-এর ইচ্ছে পূরণ হবে হয়তে শেষ সময়।

জ্যাঠামশাই-এর বাড়ী থেকে আর এক জ্ঞাতিভা এসে সাবধান করত মাঝে মাঝে। জ্যাঠতুতো ভা নাকি শাসিয়ে বেড়াচ্ছে, বাপের সম্পত্তি—অন্য কে নেয় কি ক'রে একবার দেখে নেবে। কার ঘা কত রক্ত আছে বুঝে নেবে। এবাড়ীর অংশীদা হ'তে গেলে দু'জনের একজনকে সরতে হবে।

তখন মনে করতাম পরিবর্তনের পূর্বাভাস ও ভাই-এর। কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমাণ পেলাম—ভাই সত্যি ভেবে নিয়েছিল ওর বিষয় নেব আমি। তাই এ চক্রান্ত। আমার বেড়াতে আসার কথা জানতে পে তারই ডানহাত পেটোয়ালোককে পাঠিয়ে দিয়েছি পৃথিবী থেকে চিরজীবনের মতো আমাকে সরিয়ে দিতে।

বিধির বিধানের রহস্য বোঝা ভার!

সরাবার দায়িত্ব ছিল যার ওপর—সেই সরে গে দুনিয়া থেকে। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষ পেলাম আমি।

অতীত ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-সাধনা

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের পৃথিবীতে আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের উন্নত ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দেখে আর শুনে আমাদের তাক লেগে যায়। ওদের উন্নতিতে আমরা মানুষ হিসাবে গর্ববোধ করি। আজ আমাদের দেশ গরীব দেশ বলে খ্যাত। অনেক পশ্চাদ্‌পদ আমরা, ভারতবাসীরা, ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায়।

কিন্তু আমরা যদি একবার আমাদের দৃষ্টিটাকে অতীত ভারতবর্ষের, প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার দিকে ফেরাই, তবে দেখতে পাবো—প্রাচীন ভারতবর্ষ বিজ্ঞান-চর্চায় সারা বিশ্বের অগ্রণী ছিল। যথেষ্ট উন্নত ধরনের বিজ্ঞানচর্চা ছিল এখানে, আমাদের এই ভারতবর্ষে।

রসায়ন-বিজ্ঞান বলতে আপনারা সবাই জানেন যে, আমরা যা-কিছু পদার্থ কাজে লাগাই বা ব্যবহার করি, তা কোন্ উপকরণের দ্বারা তৈরী বা কিসের কিসের সংমিশ্রণে তৈরী, সেই সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা আর কি কি পদার্থের সমাবেশে আমাদের নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহ আমাদের প্রয়োজনে লাগে এবং আরো নানা-প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ পাওয়া যায় কি করলে, কেমন করে করলে, সেইসব উদ্ভাবনী শক্তিকে, সৃষ্টি রহস্যকে জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে রসায়ন-বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য বা সাধনা।

রসায়ন-বিজ্ঞান সম্পর্কে আরোও একটু বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে, যেমন ধরুন, আমরা স্নান করবার সময় যে সকল রঙ-বেরঙের সুগন্ধি তেল ব্যবহার করি, মাথায় দেই, গায়ে মাখি, যে সকল রঙ-বেরঙের সুগন্ধি নানাপ্রকার সাবান ব্যবহার করি, নানাপ্রকার ফেস-পাউডার, বডি পাউডার, মুখে মাখি, গায়ে লাগাই, নানারকমের ক্রিম, সেন্ট, হিমানী, স্নো প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহার করি, এই সবই রসায়ন-বিজ্ঞানের উন্নত ধরনের জ্ঞানলাভের ফলেই সম্ভব হয়েছে তৈরী করা। তাছাড়া ধরুন, আমাদের অসুখ হয়েছে, ডাক্তার এলেন, তিনি যে সকল ওষুধ ইঞ্জেকসন দিলেন, সে সকলও এই রসায়ন-বিজ্ঞানের দান।

বর্তমান যুগে উপরিউক্ত সকল শ্রেণীর নিত্য-ব্যবহারের জন্যে তৈরী দ্রব্যসমূহ ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেশে আমাদের এই ভারতবর্ষে আসে—আমাদের প্রয়োজনেই।

আপনারা সবাই প্রায় জানেন যে, কাগজের টাকায় বিদেশ থেকে এইসব প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ আমরা পাই না। এরজন্যে প্রচুর পরিমাণে সোনা-রূপা, পাট, তুলো প্রভৃতি ওদেশকে দিয়ে তবে আনতে হয়। ভারতবর্ষের উৎপন্ন ফসলগুলো ওদেশে চলে যায়।

তাছাড়া ভারতবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরাও উন্নত ধরনের এইসব রসায়ন-বিজ্ঞানের পাঠ নিতে, শিক্ষা নিতে ওদেশে যায়। শুধু যায় বললে হয়তো ভুল বলা হবে বলতে হবে যেতে বাধ্য হয়। কারণ তা না হলে রসায়ন-বিজ্ঞানে এদেশে উন্নত ধরনের শিক্ষালাভ হবে না যে! এটা সমগ্র জাতির পক্ষেও লজ্জার কথা। তাছাড়া আরোও একটা দিক আছে ভাববার মত যে অনেক সময় চাহিদামত দ্রব্যসমূহ উচিত মূল্যে বিদেশীরা আমাদের দেন না। অনেক বেশী আদায় করে ছাড়েন

আমাদের প্রয়োজন, না নিলেই নয়, তাই অনেক বেশী দাম দিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ক্রয় করে আনতে হয়। ফলে আমাদের প্রচুর পয়সা বিদেশীদের পকেটে চলে যায়। ওরা ধনী হয়, ওদেশ ধনী হয়। আর আমরা? আমরা গরীব হয়ে পড়ি।

আমরা আজ প্রায় ভুলতেই বসেছি যে, অতীতের ভারতবর্ষে, এখানে অনেক অনেক বিজ্ঞান-চর্চার নিদর্শন এখনোও পাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, কৃষি-কার্যেই বলুন, পশু পালনেই বলুন, বিজ্ঞান-চর্চায়ই বলুন, ভারতবর্ষ ছিল সারা বিশ্বের অন্যতম অভিনবভাবেই অগ্রণী।

আজ থেকে সে প্রায় দু' হাজার, আড়াই হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মেরও বহু বহু বছর পূর্বে এই ভারতবর্ষে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন, নাম তাঁর নাগার্জুন। তিনি অতীত ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞান-চর্চাকারী বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। রসায়ন-বিজ্ঞানে তিনি অনেক খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর সেই একাগ্র সাধনার ও চেষ্টার ফলে সমগ্র অতীত ভারতবর্ষে নানারকম বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

বেশীদূরে নয়, নাগপুরের নাম আমরা সবাই জানি। মধ্যপ্রদেশের একটি বিখ্যাত সহর এই নাগপুর। কিন্তু আমরা অনেকেই প্রায় জানি না যে, বিখ্যাত বিজ্ঞান-সাধক নাগার্জুনের নামানুসারেই নাগপুর সহরের নামকরণ। আজোও সেই মহান বিজ্ঞান-সাধকের নিজের হাতে গড়া বিজ্ঞান-অনুশীলন মন্দির বা রসায়ন বিজ্ঞানাগার, অতীত ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনার নিদর্শন অবাক হবেন দেখে, বিস্ময়বোধ করবেন। মনে মনে গর্ব অনুভবও করবেন তাঁর জন্যে।

তাছাড়া অতীত ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে দু'খানা প্রখ্যাত পুস্তক আছে, ওর একখানার নাম 'সুশ্রুত' আর একখানার নাম 'চরক'। তা আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন। দেখেছেন। পড়েছেন।

ওই বই দু'খানা পড়ে জানতে পারা যায়, বই দু'খানাতে বহু বহু প্রকারের রসায়ন-বিজ্ঞানের ফর্মুলা-সহ নানা রকমের রাসায়নিক বস্তুসামগ্রী তৈরীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অমূল্য পুস্তক দু'খানা খৃষ্ট জন্মেরও বহু বহু পূর্বে অতীব ভারতবর্ষেও রচিত হয়েছিল। সে কথা অনেক পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণীজন অনুমান করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এ থেকে জলের মত পরিষ্কার যে, খৃষ্ট জন্মাবারও প্রায় দু'হাজার বছর পরে ইউরোপে আমেরিকায়, সে সকল চিকিৎসা পুস্তক লেখা হয়েছে, তার অনেক আগেই ভারতবর্ষের এই চিকিৎসা পুস্তকের আবির্ভাব হয়েছিল। হয়েছিল অনেক অনেক চমৎকার চমৎকার দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত প্রণালী, নানারকম তৈরীর ফর্মুলাবিধি। একথা ভাবলে আজকে শুধু অবাকই নয়, বিস্ময় বোধও করতে হয়। অতীত ভারতবর্ষের রসায়ন-বিজ্ঞানক্ষেত্রেও খনিজ ধাতুর অপূর্ব উন্নতি-লাভের চমৎকার নিদর্শনও রয়েছে বর্তমানের দিল্লীতে—প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বের তৈরী পুরাতন প্রখ্যাত একটি লৌহ নির্মিত বাট ফুট উঁচু স্তম্ভ!

আপনারা সবাই জানেন যে, লৌহ জল বায়ুর ক্রমাগত স্পর্শে কয়েকদিনের মধ্যেই মরচে ধরে যায়। উপরের আবরণে ক্রমাগত চাল্‌টা উঠতে উঠতে শেষে একদিন সম্পূর্ণ বেহাল দর্শন হয়ে পড়ে লৌহখণ্ডটা। একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বেকার নির্মিত দিল্লীর এই লৌহস্তম্ভটিতে আজোও কোন প্রকার মরচে ধরেনি, চাল্‌টা ওঠা তো দূরের কথা।

আরোও একটা আশ্চর্যের বিষয় এমনি একটা বিরাট লৌহস্তম্ভ সারা ভারতবর্ষে কেন, সারা পৃথিবীর কোনও বিরাট লৌহ কারখানায়ও তৈরী করা অসম্ভব। তাহলে বুঝুন ঠেলা! অতীত ভারতবর্ষের ধাতু-বিজ্ঞানীগণ তাঁদের কৃতকর্মে কতখানি অভিজ্ঞ আর পারদর্শী ছিলেন এতেই বোঝা যায়।

বর্তমান বিশ্বে অবশ্য আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মান তথা সমগ্র ইউরোপে মরচে ধরে না (Rust-Proof) এমনি ইস্পাত তৈরীর ফর্মুলা আবিষ্কার হয়েছে সত্যি, কিন্তু অতীত ভারতবর্ষে তা তো প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বেই আবিষ্কার হয়েই আছে।

অতীত ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্তি কোনারক সূর্য-

মন্দির। এই কোনারক সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন সেখানে বহু লৌহকড়ি আছে। আশ্চর্যের বিষয়,—দেখলেই আপনাদের মনে হবে এইমাত্র বুঝি লৌহ-কারখানা থেকে তৈরী হয়ে সে লৌহকড়িগুলি এসেছে। ঝকঝকে, তকতকে একদম নতুন মনে হবে আপনাদের কাছে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় অতীত ভারতবর্ষে ধাতু-রসায়নে বিশেষ পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, ধাতুবিদ্‌গণ, ভালভাবেই জানতেন আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বেই যে, লৌহধাতুর সঙ্গে আরোও কোন কোন ধাতু, কি কি পরিমাণে মেশালে লৌহতে মরচে ধরতে পারে না।

অতীব দুঃখের বিষয়, অতীত ভারতবর্ষের এইসব মহান্ ধাতুবিদ্‌দের, ধাতু-রসায়নে বিশেষ পারদর্শী ও অভিজ্ঞ সাধকদের পরবর্তী যুগে ক্রমে ক্রমে রসায়ন-বিজ্ঞান চর্চায় ভাঁটা পড়ে। অর্থাৎ ভারতবাসীরা রসায়ন-বিজ্ঞান সাধনায় পেছিয়ে পড়ে।

মাত্র কয়েক শতাব্দী হ'ল বিজ্ঞান-সাধনায় ইউরোপ আমেরিকা, একাগ্র সাধনায়, অনুশীলনে, আশ্চর্যরকম তাড়াতাড়ি এবং আশ্চর্যরকম উন্নতি লাভ করেছে। আজকের টেলিগ্রাম, টেলিফোন, এরোপ্লেন, বেতার, সবাক সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতি অনেক অনেক অবাক করা জিনিষসমূহ তারা আবিষ্কার করেছে। বিজ্ঞান আজ মানুষ সমাজের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে, বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে সে দিয়েছে অপূর্ব শক্তি, অপূর্ব সাহস, অপূর্ব সম্পদ।

আজ রাশিয়া, আমেরিকা, জার্মান, ইউরোপ এই বিজ্ঞানের বলেই সারা পৃথিবীর চোখে বিস্ময়কর! অপূর্ব!! সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্র।

কি স্বাস্থ্যে, কি অর্থে, কি শিল্পে, কি বাণিজ্যে, কি ক্ষমতায়, সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসেছে এরা।

ইউরোপ আমেরিকার দিকে দৃষ্টি রেখে জাপানও এগিয়ে চলেছে সুদৃঢ় পদক্ষেপে। জাপানও তাই সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ দেশ হতে চলেছে।

বলা বাহুল্য, পৃথিবীর এই অগ্রগতিতে তাল রেখে, পৃথিবীতে একটা জাতি বলে পরিচয় দিতে হ'লে, আমাদের ভারতবর্ষকেও রসায়ন-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। অতীব আনন্দের বিষয় ভারতবর্ষ চিরদিনই আশাবাদী। তাই সেও আজ বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে অপূর্ব সফলতা লাভ করেছে। ভবিষ্যতেও করবে।

শুনলে গর্বে আমার বুক ভরে যায়—যখন শুনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের মাঝে আসন পেয়েছেন। সম্মান পেয়েছেন। সমাদর পেয়েছেন।

আজকের ভারতবর্ষে এ যে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ সংবাদ। সে বিষয়ে আপনাদের মধ্যে দ্বিমত আছে কি?

তাই বলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের সব পাওয়া হয়ে গেছে ভেবে বসলে চলবে না। যতদিন পর্যন্ত উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার ভারতীয় বিজ্ঞানীগণের সামনে খুলে না যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীগণের মনে রাখতে হবে, এ দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট, পরের মুখের দিকে চেয়ে কৃপার হাত পাতারও শেষ হবে না।

এটা যেন ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধকগণ মনে রাখেন। ভুলে না যান। বর্তমান ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা এই কথাটা স্মরণে রেখে চলবেন, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার মহান বিজ্ঞান-সাধনায় ব্রতী হবেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্বপ্ন সফল করে তুলবেন। বুকভরা এই আশা রেখেই "অতীত ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-সাধনা" নিবন্ধের এখানেই ইতি টেনে দিচ্ছি। এ বিষয়ে আরোও অনেক তথ্য পরে আপনাদের উপহার দেবো বলে ইচ্ছে রাখি। পূজোর প্রীতি ভালবাসা আর নমস্কার জানাই সবাইকেই।

উকিলের আড্ডা

রম্যরচনা

মদন চক্রবর্তী

ঘটনার সম্ভাব্য (probable) ও অসম্ভাব্য (improbable) ব্যাপার নিয়েই আইনজীবীদের যত সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় আবিষ্কারের চিন্তা নিয়েই তাদের মগজের কারবার…

আলোচনায় এই প্রসঙ্গ উঠতেই রজতবাবু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে গম্ভীর গলায় বললেন, এখানকার আবার কেস তার জন্যে মগজের ঘিলু সেদ্ধ করা ?

জগাদা ওরফে জগবন্ধুবাবু বিজ্ঞের ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন, এখানে আইনই নেই তো 'প্রোবেবলিটি' আর 'ইম্প্রোবেবলিটি'।

একজন বলে উঠলেন, এখানে উকিল আছে তো ?

এ কথায় বেশ হৈ-চৈ বাধাবার চেষ্টা করলেন আর একজন।

তাকে থামিয়ে দিয়ে সুপ্রকাশবাবু বললেন, কি মশাই, আইন আর উকিল-উকিল করছেন ? একটা প্রচলিত কথা আছে জানেন তো, যে সাক্ষী মিথ্যে হতে পারে কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা (circumstances) কখনও মিথ্যে হতে পারে না। আমি সেবার জেলা আদালতে এক অভিশংসকের (public prosecutor) এই উক্তির জবাবে প্রমাণ করে দিলুম যে কেবলমাত্র সাক্ষী নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও মিথ্যে হতে পারে !

সকলেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন, কি দিয়ে প্রমাণ করলেন ?

সুপ্রকাশবাবু আবেগময় কণ্ঠে শুরু করলেন, হুজুর, আদালতকে বললাম, মাননীয় দণ্ডদাত্রাধীশ [Sessions Judge), আমার বিজ্ঞ বন্ধু (Learned friend) বললেন, যে 'সারকমস্‌ট্যানসেস্‌' কখনও মিথ্যে হতে পারে না। কিন্তু 'সারকমস্‌ট্যানসেসের' প্রকার ভেদের জন্যেই আমার আসামী আজ আদালতে অভিযুক্ত। 'সারকমস্‌-ট্যানসেস্‌'ও যে মিথ্যে হয় তার হাজারো নমুনা দেওয়া যেতে পারে। আমার নিজের কথাই বলি শুনুন। আমার টেবিলে একটা ফুলদানি ছিল। সেটি আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া। ফুলদানিটার ওপর আমার প্রাণের চাইতেও বেশী মায়া ছিল। এক-দিন আদালত থেকে ফিরে দেখি সেটি মেঝের ওপর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে আছে। স্ত্রীকে প্রশ্ন করলাম, ওটির সদ্‌গতি কে করল ?

স্ত্রী ভীত কণ্ঠে জবাব দিল—খোকন।

আমি জ্ঞানহারা হয়ে আমার প্রাণাধিক পুত্রকে সজোরে মারলাম এক চড়। জ্ঞানহারা হয়ে পুত্র লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। তারপর তাকে আরোগ্যশালায় (Hospital) পাঠান হল এবং সেইখানেই তার…

সংবাদ শুনে স্ত্রী আছাড় খেয়ে পড়ল এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলতে লাগল, যে তার জন্যেই খোকন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। আমি অপরাধী সেজে স্ত্রীর কাছে মুখ দেখাতে পারছি না, অথচ স্ত্রীর জন্যে খোকন চলে গেল—ব্যাপার কি ?

অবস্থার একটু পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম।

স্ত্রী ঝাঁপিয়ে পড়ল, বলল, কি অন্যায় করলাম—

ওগো তুমি জান না, তোমার ফুলদানিটা ভেঙেছিল তোমার চাকর। পাছে তুমি তাকে নির্যাতন কর সেই ভয়ে আমি খোকনের নাম করেছিলাম। ভেবেছিলাম খোকনের নাম করলে তুমি রাগটা সামলে নেবে, কিন্তু আমার একি হল ?

তাহলে বুঝুন মহাশয় (sir) যে রটনার জন্যে ঘটনার অস্বাভাবিক পরিবর্তন পারিপার্শ্বিককে কেমন মিথ্যে প্রতিপন্ন করে।

রজতবাবু বললেন, আসামীকে ক'বছর খাটতে হল ?

সুপ্রকাশবাবু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, খাটতে হল মানে, বেকসুর খালাস।

ভূপেনবাবু বললেন, আর তোমার গল্প শুনে জজ সাহেবের চোখের জলে মামলার নথি (Record) ভিজে যায়নি তো ?

নবীনবাবু বললেন, আমাদের চোখেই জল এসে যাওয়ার জোগাড় আর জজ সাহেব তো সাধারণ লোক।

নবীনবাবুর উদ্দেশ্যে ভূপেনবাবু বলে উঠলেন, সেই জন্যেই শুনেছি বৌমা নাকি একটু কড়া মেজাজের মেয়ে ?

নবীনবাবুর চাপা রাগটা এবার ফেটে পড়বার উপক্রম হল। বোধহয় একটা সাংঘাতিক পরিণতির আশঙ্কা করে হঠাৎ দ্বিজদাস বলে উঠল, আরে মশাই, 'জুডিশিয়াল মার্ডার' অর্থাৎ 'ন্যায়িক হত্যা' বলে একটা কথা আছে জানেন ?

নবীনবাবুর প্রসঙ্গটা আপাতত চাপা পড়ল। দ্বিজদাসই হল লক্ষ্যস্থল।

দ্বিজদাস বলল, শুনুন মশাই, ন্যায়িক হত্যা মানে হল, আইন সঙ্গত খুন। অর্থাৎ বিচারে আসামীর প্রাণ-দণ্ড হয়ে যাবার পর সত্যকার আসামী ধরা পড়ল। কিন্তু বিনা অপরাধে যে মারা পড়ল, তার কি হবে ? 'মনু'র আইন থাকলে না হয় দণ্ডদাতারও একটা বিচার হত। কিন্তু বর্তমান আইনে সে উপবন্ধ (provision) নেই। তাই এটা বিচার পদ্ধতির বিশ্বস্ততা (bonafideness)। অতএব এটির নাম দেওয়া গেল আইন সঙ্গত হত্যা।

এই ধরণের 'সারকমস্ট্যান্সেসের' উদ্ধৃতি দিয়ে আমি একটা 'প্রোবেবল স্টোরি' বলেছিলাম এক সাহেব জজকে। ঘটনাটা হল এই—একদিন ভোরবেলায় উঠে দেখি পাড়াময় সোরগোল। ব্যাপার কি ? এক খুনী আসামী ধরা পড়েছে। সারা গায়ে তার রক্তমাখা। মৃত স্ত্রীলোকের ঠিক পাশে সে বিরাট এক উন্মুক্ত রক্ত-মাখা ছুরিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

পাড়ার নিধু এই অবস্থা দেখে চেঁচামেচি সুরু করে। তাতে অনেক লোকজন বেরিয়ে হাতে-নাতে আসামীকে ধরে ফেলে। আসামীকে যথারীতি পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়। কয়েক মাস পরে তার বিচার হয়—বিচারে তার ফাঁসি হয়।

এখানেই ঘটনার শেষ হল না। কয়েক মাস পরে প্রকৃত আসামী ধরা পড়ল। প্রকৃত রহস্যেরও উদ্ঘাটন হল। প্রকৃত আসামী ভোর রাত্রে একটা স্ত্রীলোককে এনে তার অলঙ্কারাদি খুলে নিয়ে রাস্তার ধারে তার বুকে ছুরি মারে। ছুরিটা স্ত্রীলোকের বক্ষস্থলে বেঁধা অবস্থায় রেখে আসামী উধাও হয়। এক চোর সারারাত্রি ধরে চুরির সন্ধানে ফিরে ভোর বেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পায়। স্ত্রীলোকটি তখনও জীবিতা। চোর মনে ভাবল, ছুরিটা যদি তার বুক থেকে খুলে দেওয়া যায় তাহলে হয়ত সে প্রাণে বেঁচে যেতে পারে। এই চিন্তা করে সে প্রাণপণে স্ত্রীলোকের বুক থেকে ছুরিটা উঠিয়ে নিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা রক্ত ছিটকে এসে চোরের সমস্ত দেহে ছিটিয়ে পড়ল এবং স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। চোর হতবুদ্ধি হয়ে ছুরিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় জনতা কর্তৃক ধৃত হল ও আসামীরূপে ফাঁসি বরণ করে নিল।

একজন বলে উঠলেন, এ ঘটনাটা বইয়ে ছাপা আছে ?

দ্বিজদাস বলল, আমার আগের ঘটনাটাও সুপ্রকাশ-বাবুর নিজস্ব নয় কোন এক ব্যারিষ্টার ভদ্রলোক ঘটনাটা প্রায় উদ্ধৃত করতেন। তবে কিনা, ছাপান ঘটনাই হোক আর কারুর কাছ থেকে শোনা ঘটনাই হোক, দেখতে হবে তা কাজে লাগবে কিনা আর তা 'প্রোবেবল' কিনা। মানুষ শেখে—দেখে, শুনে আর ঠকে। এই জাথ না বহুশ্রুত ঘটনা হলেও সেগুলো নিয়ে গজালি পাকিয়ে খানিকটা মশগুল হওয়া গেল তো ?

দ্বিজদাস চালাক লোক। সব উত্তেজনা নিমেষে থামিয়ে

দিয়ে রওয়ানা হল বাড়ীর উদ্দেশ্যে। শনিবারের বিকেল। তাই একে একে অনেকেই সরে পড়ল। যারা এখনও রইল, এতক্ষণ পরে তারা দ্বিজদাসের চালাকি ধরে ফেলল। উকিল মানে, সকলেই সমান অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিতে কেউ কারুর চাইতে হীন তো নয়ই বরং একে অপরের চাইতে একটু বেশী সমজদার বলে প্রত্যেকেরই ধারণা।

সেইজন্যে জগাদা বলে উঠলেন, দ্বিজদাস তো খুব মাতব্বরি করে কথা বলল, যেন আমাদের শক্তির বাইরে এসব। আরে বাবা, মামলার সবচেয়ে বড় জিনিষ হল Argument (আইনের যুক্তি)। যা দিয়ে বিচারকের মন ঘুরিয়ে 'হ্যাঁ' কে না আর 'না' কে 'হ্যাঁ' করান যায়। আমি একবার একটা নারী-ঘটিত মামলায় মেয়ের পক্ষ নিয়ে বলেছিলাম "the deapth of an ocean, the strength of a lion, the love of a woman, no body can tell it, Sir."

ভূপেনবাবু বললেন, শুনে হাকিম একেবারে প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলেন তো?

জগাদা বললেন, তামাশা রাখো হে, তামাশা রাখ। হাকিম নিরুপায় হয়ে বললেন, 'আপনার কাব্য শুনে তো আইনের প্রতি আমি অবিচার করতে পারি না।" নইলে কেমন চমৎকার উদ্ধৃতিটা হয়েছিল বলো তো?

ভূপেনবাবু দমবার পাত্র নন। তিনি বললেন, 'আরগুমেণ্ট নিয়ে ওসব কাঁচা কথায় আমাকে ভোলাতে পারবে না। বয়সকালে এমন সব আরগুমেণ্ট করতুম যে গোটা আদালত শুদ্ধ লোক ঝরঝর করে কেঁদে ফেলত। একবার এক খোরাকীর মামলায় স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে গিয়েছিলুম বাইরের এক আদালতে। আমার বিপক্ষের অর্থাৎ স্বামীর পক্ষের অধিবক্তা (Advocate) আইনের লাখো লাখো নজির তুলে ধরতে লাগলেন স্বামীকে যাতে খোরাকীর টাকা না দিতে হয় সেইজন্যে।

আমি সুরু করলাম—মাননীয় আরক্ষ শাসক মহাশয় (police magistrate), 'Thoughts from Tagore' এর একটা উক্তি বার বার আমার মনে এসে উঁকি মারছে "Woman thou hast encircled the heart of the world through deapth of thy tears as the sea has the earth." সমাজের তেমনি এক নারী, মায়ের মমতা ভরা প্রাণ দিয়ে যিনি ভবিষ্যতে দেশকে রত্নের আকর করে তুলতে পারতেন, তিনি আজ শরতের উৎসব শেষে ঝরে যাওয়া শিউলির শেষ বিদায় বার্তার জাগ্রত প্রতিমারূপে নয়নের কোণে শীতের শিশির কণার মত ছলছল নেত্রে কেবলমাত্র উদর পূর্তির দ্বারা বেঁচে থাকার করুণা ভিক্ষার আবেদন নিয়ে আপনার কাছে এসেছেন। কোন অভিযোগ নেই তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে·····স্বামীর নিষ্ঠুর অবহেলা ও অত্যাচারের জন্যে তিনি প্রতিকারের প্রার্থনা নিয়ে আসেননি। সমাজের পর্ণকুটির থেকে মাতৃরূপী দেবী এসেছেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনটায় শস্য শ্যামলা এই ধরিত্রীর বুকে মনুষ্যরূপে বিচরণ করার মত সঙ্গতির আবেদন নিয়ে। আমাদের দেখতে হবে, বক্তিতার দীর্ঘ-শ্বাসে সমাজ যেন অভিশপ্ত না হয়······মায়ের অশ্রুবিন্দু ধরণীর প্রাঙ্গণতলকে যেন মরুভূমি করে না তোলে······ সমাজের প্রতিটি ধূলিকণা ধিক্কারে আমাদের মনুষ্য-জীবনকে যেন বিফল করে না তোলে?

বক্তব্য শেষ করে ভূপেনবাবু দেখলেন তিনিই কেঁদেছেন, আর যাদের কাঁদাবেন ভেবেছিলেন তারা সকলেই চম্পট দিয়েছেন। একটিমাত্র শ্রোতা রজতবাবু উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলে উঠলেন, তা এত জায়গা থাকতে এ মরণ-যমুনায় ঝাঁপ দিতে এলে কেন?

ভূপেনবাবুর কানে সে কথা গেল না। তিনি বার-লাইব্রেরীর মোহজাল ছিন্ন করে রাজপথের ফুটপাত ধরে মিলিয়ে গেলেন অগণিত জনরাশির মধ্যে···

সেই কবে কোন বিস্মৃত যুগে—

মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা হলেন—মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে, এক হাতে তাঁর ধান্য গুচ্ছ, অপর হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি!

সেই পৌরাণিক যুগের অতীতের ঐশ্বর্যমণ্ডিত কাহিনী কবে আমরা বিস্মৃত হয়েছি—জানিনা।

আজ সেই রূপকথা ছোটদের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। গেরস্ত বাড়ীর গৃহিণীরা অবশ্য আজও সন্ধ্যা বেলা দুটি করে বাতাসা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মা লক্ষ্মীর পুজো সমাপন করেন।

এই একান্ত অবহেলায় মহালক্ষ্মী যে কবে আমাদের প্রতি বিমুখ হয়েছেন, আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি বাঙালীর কাছ থেকে সরিয়ে ফেলছেন—তা আমরা নিজেরাই খোঁজ রাখিনা!

লক্ষ্মীর ঝাঁপির সঙ্গে সঙ্গে ধান গুচ্ছও আমাদের প্রতি বিরূপ হয়েছে। ধান হয়ত ফলে, তার থেকে চালও হয়ত বেরোয়, কিন্তু সেই চালে আর মা লক্ষ্মীর কল্যাণ স্পর্শ নেই। ভেতো বাঙালী আজ তাই চালের অভাবে দিশেহারা।

বাঙালী ছেলে আজ ইতিহাস হাতে নিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ইস্কুলের পড়া তৈরী করে "শায়েস্তা খাঁর আমলে বাঙলা দেশে টাকায় আট মণ করিয়া চাউল পাওয়া যাইত।"

গৃহ শিক্ষক পাশে বসে পড়া তৈরী করিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি রাগে আর দুঃখে ফোঁস করে উঠে বল্লেন, হুঁ! ইতিহাস লিখেছে, পাওয়া যাইত! তাতে আমাদের পূর্ব পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল।

পড়ুয়া ছেলেটি অবাক হয়ে গৃহে শিক্ষকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শিক্ষকমশাই ওইখানেই থামলেন না। নিজের কণ্ঠে যতখানি বিক্ষোভ সঞ্চয় করা সম্ভব—তাই নিয়ে বিকৃত বদনে বল্লেন, হুঁ! কবে ঘী খেয়েছি তাই নিয়ে আজও বড়াই চলছে! এই যে আমি বুড়ো মানুষ রেশনের দোকান থেকে ফিরে এলাম, এখন গোটা গুষ্টির মুখে কী দিই! শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত...

রাগে দুঃখে আর অপমানে শিক্ষক মশাই আর কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

ভীরু চোখে ছাত্রটি চির ক্ষমাশীল শিক্ষক মশায়ের দিকে তাকালো! মাষ্টার মশাই ত কখনো এমন করেন না!

তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা স্যার, আজকাল বুঝি জমিতে আর ধান হয় না? তার থেকে চাল বুঝি আর পাওয়া যায় না?

শিক্ষক মশাই তার অবোধ শিষ্যটির দিকে ক্ষণকালের জন্যে তাকালেন। বুঝ্লেন, ওর সাম্নে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটা উচিত হয় নি।

শিক্ষকমহাশয়ের চোখের সাম্নে পর পর অনেকগুলি ছবি ভেসে উঠল,—ঠিক ছায়াছবির চলমান আলেখ্যের মতো।

চিরাচরিত রীতি অনুসারে তাঁর শিষ্যটিকে চালের কথা কিছু বোঝালেন না। শুধু বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেই চলমান আলেখ্যের দিকে মানস-নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

* * *

বাংলা দেশের কৃষক রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে সোনার ধান ফলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তার তপস্যা যখন জয় যুক্ত হল—ধান যখন পেকে উঠল—সে মনের আনন্দে সেই সোনার ফসল কেটে বাড়ীর উঠোনে নিয়ে এলো। চাষী বৌ নবান্ন উৎসব করল। মালক্ষ্মীর আলপনা দিল, সত্য নারায়ণের সিন্নি চড়ালো। ছেলে-মেয়ে গুলো আনন্দে হাত তালি দিয়ে খড়ের গাদায় লুকোচুরি খেলা খেল্তে লাগ্লো।

হাড় ভাঙা পরিশ্রম শেষে চাষা যখন দাওয়ায় বসে হুঁকোতে সুখটান দিলে, তখন হঠাৎ দেখা গেল—তার সোনার ফসল অর্ধেক নিয়ে গেল জোতদার মহাজনের দল, আর বাদ বাকি দুদিনের জন্যে সঞ্চয় করল সরকার।

চাষা আপন মনে ভাবে,—মা লক্ষ্মী কি পায়ের ছোঁয়া দিয়েই পালিয়ে গেলেন? এখন সারা বছর নিজেরাই বা খাবে কি, ছেলেমেয়েদের মুখেই বা কি তুলে দেবে?

একমাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া বেচারা চাষার আর

তারপর দেখা গেল—মজুতদারের গোপন পরীক্ষাগার। এই মজুতদার হচ্ছে শেঠজী।

শেঠজীর লোক সারা দেশে ঘুরে ঘুরে চাল সংগ্রহ করে—গোপন গুদামে জমা করে।

তারপর চলে সেই চাল নিয়ে পরীক্ষা। শেঠজীর নিয়োগ করা বিজ্ঞানীরা আছে।

তাদের জন্যে মোটা মাইনে বরাদ্দ থাকে।

সেই সব বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকরা বলে দেয় কোন চালের সঙ্গে কি ধরণের পাথর কুচি আর কাঁকড় মেশাতে হবে।

শেঠজী আর একদল লোক নিযুক্ত করেছে,—তাদের কাজ হল—মাঠে ময়দানে ঘুরে ঘুরে ছাগলের নাদি জোগাড় করা। সেইগুলি রোদে শুকিয়ে কৌশলে চাল আর কাঁকড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মুনাফা লুটতে হবে।

কিন্তু শেঠজীর মন তাতেও খুশী নয়। নানা অঞ্চল থেকে পাথর কুচি সংগ্রহ করতে হয়। ট্রেণ ভাড়া দিয়ে সে গুলি আন্তে হয় শহর অঞ্চলে তার সেই গোপন গুদামে। টাকা রোজগারের পক্ষে অনেক বিঘ্ন। তাতে বহু সময়ের অপচয় হয়।

শেঠজীর পরিকল্পনা হল সেই গোপন গুদোম ঘরে বসেই—নানা ধরণের আর নানা আকারের পাথর কুচি তৈরী করতে হবে।

তাই শেঠজী তার বৈজ্ঞানিককে ডেকে বল্লে, দেখো বাবু, লিখ্ দেও জারমেনিমে,—এইসা মেশিন মাংতা যাঁইমে হরেক রকম পাথর কুচি চালকা মাফিক মিল যায়েগা! চালকা সাথ মিল কর দেগা! চার গুণ নাফা হো যায়েগা!

বলে শেঠজী আপন আনন্দেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু জার্মানী থেকে সে মেশিন আর এলো না। তার বদলে এলো চিঠি ভর্তি বকুনি!

মাথা চুলকে শেঠজী ভাবে, তা হলে চার গুণ মুনাফা কেইসে হোগা?

আবার দেশের আর এক দৃশ্য।

লোকে খিদের জ্বালায় গাছের পাতা সেদ্ধ করে খেতে শুরু করেছে!

ওদিকে দেশের সংস্কৃতিবান মহল-মহিলার দল ত' চুপ করে বসে থাকতে পারেন না!

তাঁরা খরা ত্রাণের জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। দুর্গতদের সাহায্যের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।

সুতরাং চাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর গানের জলসা।

নামকরা শিল্পীদল এসে নাচ-গানের রিহার্সেল শুরু করে দিয়েছেন।

সেই গানের আসরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন যত যন্ত্র-শিল্পী আর সঙ্গতওয়ালার দল।

একদল শিল্পী গলা খুলে গান ধরেছেন—

"চির কল্যাণ মন্ত্রী—তুমি ধন্য।

দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

আর এক দল তারস্বরে তানপুরোর সঙ্গে তালিম দিচ্ছে—

"ভাণ্ডার দ্বার খুলেছে জননী—

অন্ন যেতেছে লুটিয়া।"

যে করেই হোক, খরা ত্রাণের জন্যে রাশি রাশি টাকা তুলতে হবে। তবে সে অর্থ যদি যথাস্থানে না পৌঁছয় তার জন্যে শিল্পীরা অবশ্য দায়ী নন।

ওদিকে চাল নিয়ে চালবাজি চলেছে সারা দেশ জুড়ে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে কোথাকার চাল কি ভাবে রূপান্তরিত হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে—কেউ তার সন্ধান রাখে না।

মন্ত্রীদের ঘন ঘন গোপন বৈঠক বসে। তাতে স্থির হয়—এক জন মন্ত্রী আর এক জনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেবেন। আর একজন বিবৃতি দিয়ে সেটাকে জটিল করে তুলবেন। এই ভাবে 'চাপান' আর 'উতোরে' সংবাদ-পত্রগুলির পৃষ্ঠা ভরাট হবে। আর সেই ফাঁকে অন্ধকারের মজুতদারের দল—চাল নিয়ে দিব্যি চালবাজি চালাবে। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরুক,—তাতে কার কি বয়ে গেল যথা সময়ে 'স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌' ঠিক মতো অঙ্ক কষে সঠিক সংবাদ জানিয়ে দেবে। কাগজে কাগজে ফলাও করে সেই সংবাদ বিস্তারিত হবে। বিদেশী কাগজেও সচিত্র বিবরণী বাদ যাবে না!

মন্ত্রীদের প্রতি দোষ রোপ

অন্ধকার পথে চাল কি ভাবে আনাগোনা করে তার একটা আলেখ্য শিক্ষক মশায়ের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শেঠজীর পরীক্ষাগার থেকে শোধিত হয়ে গভীর রাত্রে সেই চালের বস্তাগুলি লরীতে ভর্তি হয়ে—অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল। খুব জোরালো দূরবীণ ধরেও আর তার হদিশ মিল্‌লো না।

বেতারে-বেতারে ঘোষণা করা হল—এবার দেশে ভয়ানক খাদ্যাভাব। তাই জন সাধারণের রেশন কমিয়ে দেয়া হল। মার্কিন মুলুক যদি কৃপা করে, আর ভিক্ষের গম নিয়ে সেখান থেকে জাহাজ ভাসে তবে—খাদ্য এ দেশে এলেও আসতে পারে।

ভেতো বাঙালীরা চিঁ-চিঁ করে কইলে আমরা গম চাই না, চাল চাই।

ভেতো বাঙালী শুধু ভাত খেতে চায়!

—রোটি খাও—পুরী খাও—হালুয়া খাও দহি বড়া খাও—লাড্ডু খাও—স্রেফ্ ভাত খানে সে কেইসে চলে গা !!!

বাঙালী চুপ চাপ বসে ভাবে, দেশের এত চাল তা হলে গেল কোথায়? দেশে চাল নেই—একথা ত' ঠিক নয়। ট্যাঁক থেকে টাকা বের করো—কত চাল চাই—অন্ধকারের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ঠিক দোর গোড়ায় এসে হাজির হবে। তবে আসল রহস্যটা কি?

চাল নিয়ে চালবাজি কিন্তু সারা দেশ জুড়ে ঠিক চলতো থাক্‌লো। ট্যাঁক থেকে টাকা বের করো—আলদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ঠিক চালের বস্তা এনে হাজির করবে।

বৈজ্ঞানিকরা বাঙালীকে ধমক দিয়ে বল্লে, চালে কোনো খাদ্যপ্রাণ নেই। তার চাইতে ভিটামিন খাও—প্রোটিন খাও—ডিম খাও—মাংস খাও—তাগৎ আচ্ছা হোগা—

বাঙালী ইতিমধ্যে বেশভূষা পাল্‌টে ফেলেছে, এখন সবাইকার ধিক্কার শুনে খাদ্যও ওলোট-পালট করে ফেল্লে।

তবু প্রাণে বাঁচতে হবে ত।

দুটি গরম গরম মাছের ঝোল-ভাত না জুটলে বাঙ্গালীর [illegible]

প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হবার উপক্রম [illegible]

এত চালবাজি তারই জন্যে সে উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।

প্রেমিকা প্রেমিকের পদশব্দের জন্যে উন্মুখ—

মেদিনী অরুণের আলোর আশায় রাত্রি জাগে—

তস্কর অন্ধকার রজনী কামনা করে—

কুসুম মধুকরের স্নেহ-পরশ চায়—

শিশু জননীর মধুর কোলের কাঙাল—

আর বাঙালী কাঙাল ভাতের জন্য—!

দেশ-বিদেশে সে শুধু ভাত ভিক্ষে করে—!

কিন্তু বাঙালী সেই ভুলে-যাওয়া বাদসাভোগ চালের নাম আর পাবে কোথায়?

সোনার বাংলার দুটি লক্ষীর ভাণ্ডার বাখরগঞ্জ আর *দিনাজপুর হাত ছাড়া হয়ে গেছে!* ময়মনসিংহের জমিতে পঙ্গপাল আর বাঙালী বাস্তহারার দল ধানী জমিগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে নানাজাতীয় কলোনী গড়ে তুলছে!

সোনার বাংলায় ধান গজাবে কোথায়? গোটা দেশটা আজ দালানে বাস করতে চায়—, জমিকে ওরা বিকিয়ে দিচ্ছে পরের হাতে। তাই ত' বাঙালী আজ লক্ষী ছাড়া।

যে ছাত্রদল স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ছিল—তারা আজ লক্ষীছাড়া হয়ে ট্রেনে ট্রেনে ভিখিরী আর ফেরীওলা সেজে চোরাই চাল চালাচালি করছে। বিক্রী করছে হিন্দুস্থানী পানের দোকানে! তাতে যদি দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখতে পাবে! ঘরে মা-বোন-ভাই দুটি ভাতের জন্যে কান্নাকাটি করছে—, চাল নিয়ে চালবাজি করছে—মুনাফালোভী কালোবাজারীর দল, আর বাঙালী তরুণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে!

সরকার রেশনে চালের পরিমাণ আবার কমিয়ে দিচ্ছে—

বেতারে বেতারে সেই সন্দেশ সাড়ম্বরে ঘোষিত হচ্ছে, কিন্তু গোপন-পথে চাল চালাচালি বিন্দুমাত্র কমছে না। গোপন গুদামগুলো সবার অলক্ষ্যে চালে ভর্তি হয়ে উঠছে। আর তার সঙ্গে মেশানো হচ্ছে পাথর কুচি, [illegible]

"এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে!!"

কোন্ নেতা যেন একবার বলেছিলেন—

"বাঙালী শুধু মিছিল বের করতে পারে—আর কাঁদতে জানে।"

আর ভেতো বাঙালী ভাতের জন্যে ভিক্ষে করতেও পারে।

কিন্তু সব সময় কি ভিক্ষেই মেলে?

অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে "জাপানী প্রথায়" ধান চাষ সুরু করে দিলেন।

কিন্তু সরকারের তহবিল থেকে অনেক কড়ি বেরিয়ে গেল। আসলে কিন্তু সেটা পর্বতের মূষিক প্রসব ছাড়া আর কিছু নয়!

আবার আর এক তাজ্জব ব্যাপার।

বাঙালী চাষীর দল—পশ্চিমবাংলার সীমান্ত প্রদেশে যে ধান ফলায়—, পাকলে কিন্তু সেই সোনা ধান পাকিস্তানী দস্যুরা এসে বেমালুম লুট করে নিয়ে যায়।

"যার ধন তার ধন নয়—
নেপোয় মারে দৈ।"

নিজের মাল যে সামাল দিতে পারে না—তার কান্না ছাড়া আর কি গতি আছে বল?

মায়েরা যদি ছেলে-মেয়ের মুখে ভাত তুলে দিতে না পারে ক্ষিদের সময়, তা হলে তারা কি করে? হয় কোলের ছেলেমেয়েদের বিক্রী করে দেয়, আর না হয় সবাই মিলে আত্মহত্যা করে।

পেটের দায়ে মায়ের সন্তান বিক্রয়

চালের অভাবে কত মা সেই নিষ্ঠুর পথ ধরে এগিয়ে গেছে কে তার সন্ধান রাখে?

খবরের কাগজই বা কত খবর ছাপবে? অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে কত ছেলেমেয়ে মায়ের কোল খালি ক'রে—এতদিনে বৈতরণী তীরে পৌছে গেল!

কিন্তু তবু গোপন পথের সুড়ঙ্গ দিয়ে কালোবাজারের গোপন গুহায় রাশি রাশি সোনার তাল···মণি-মুক্তো-হীরে-জহরৎ!! এ যুগের "অক্ষয় ভাণ্ডার" ত' গোপন সুড়ঙ্গপথেই আত্মগোপন করে থাকে!

দারুণ খরার খবর আসছে—দেশের চারদিক থেকে।

খরার জন্যে চাষীরদল মাঠে ফসল ফলাতে পারছে না। মাটি ফেটে চৌচির। তাতে দু'গাছি ঘাস পর্য্যন্ত গজাতে পারছে না।

কৃষকের দল আকাশের গন্‌গনে আগুনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ অন্ধ করে ফেলল। কিন্তু ইন্দ্রদেব ঊর্দ্ধ আকাশে অকরুণ হয়েই রইলেন। তাঁর ঐরাবত শ্বেত-শুভ্র শুঁড় দিয়ে এক ফোঁটাও বারি বরিষণ করলে না।

কিন্তু তাই বলে দেশের সংস্কৃতিবান পুরুষ ও মহিলারা ত' চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।

তাঁদের দয়ালু চিত্ত দ্রব হল।

খরাত্রাণের জন্যে এগিয়ে এলেন তাঁরা দলে দলে। জলসা আর নৃত্যনাট্যের মহড়া সুরু হয়ে গেল পল্লীতে পল্লীতে।

খরাত্রাণের জন্য নৃত্যের মহড়া চলে

বিভিন্ন রঙ্গালয়ে শিল্পীরদল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে লাগলেন।

পেটে অন্ন নেই, কিন্তু অদম্য উৎসাহ তাঁদের মনে।

তারা সংস্কৃতিবান মহল ও মহিলার দল। খরাত্রাণের জন্য তাঁদের মনগুলি থর্ থর্ করে উঠল।

গান ভেসে আসতে লাগলো—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম অঞ্চল থেকে—

"আজি এসেছি—আজি এসেছি
বঁধুহে—নিয়ে এই হাসি-রূপ-গান॥"

রাজ্যপাল আর মেয়র—

টাকার থলি ক্রমাগত হাতে তুলে নিতে লাগলেন। অবশেষে তাঁদের হাতে বাতের ব্যথা ধরল।

কিন্তু খরাত্রাণে সবাই উন্মুখ।

শিল্পীদল—ক্রমাগত বিচিত্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করে অনিদ্রা রোগে ভুগতে লাগলেন…

কিন্তু সেই গৃহ-শিক্ষকের চোখেও ঘুম নেই। তিনি যেন এতক্ষণ ধরে তাঁর চোখের সামনে এক বিরাট ছায়াছবি পরিদর্শন করলেন।

সেই সিনেমাটির নাম "চাল নিয়ে চালবাজি।"

হঠাৎ তিনি তাঁর ক্ষুদে পড়ুয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, এই বৃদ্ধের বচন শুনে রাখ—

বাঙালী যেমন ধীরে ধীরে তার পোষাকের পরিবর্তন করেছে—(বাঙালী ছেলেরা পরছে প্যান্ট, পাজামা, শেরওয়ানী, ড্রেন পাইপ আর কাবলি পোষাক, আর মেয়েরা শোভিত হচ্ছে—স্ল্যাক, সালোয়ার পাঞ্জাবী এবং—বিদেশী মেম সায়েবী বেশভূষায়) তেমনি খাদ্যেও তাদের পরিবর্তন আনতে হবে। হয়তো বাঙালীর খাদ্য হবে এখন থেকে রুটি, চাপাটি, ফুচ্‌কা, ইটলি, ধোসা, লাড্ডু আর পুরী…আর না হয় শেষ পর্য্যন্ত পোড়া রুটি!

চাল নিয়ে চালবাজি ত' বন্ধ হবে!!!

অপরিজ্ঞাত

বিভূতি বিদ্যাবিনোদ

যে পাতাটী ঝরে গেল বোঁটা হ'তে তার—
রাখতো লাগিয়ে সেটী তেমনি আবার;
যে কুঁড়ি এখনো তা'র খুলে নাই দল
ফুটিয়ে তোলার তুমি জান কি কৌশল?
ক্ষুদ্র বীজ রূপ ধরে মহীরুহ বড়,
কেমনে সম্ভব হয়, সে কেমনতর?
পাশাপাশি নিম, আক একই ক্ষেতে রয়
মধুর একটী কেন তেতো অন্য হয়?
বৃক্ষশিরে মিষ্টবারি কোথা হতে আসে
হাসিকান্না কেন হয় উল্লাসে ও ত্রাসে?
সাপের দংশন করা কেন যে স্বভাব,
চিরদিন জয়ী কেন প্রেমের প্রভাব?
ধ্বংসের অমোঘ অস্ত্রে যারা দেয় ধার—
ভাঙে শুধু, সাধ্য নাই ফিরে গড়িবার।

বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা

নির্মলগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

কালচক্রের বিঘূর্ণনে দিনে দিনে মাস এবং মাসে-মাসে বর্ষ অতিক্রান্ত হল। এক বৎসরান্তে, পুনর্বার বাঙ্গালীর ঘরে বেদ-বিধি বন্দিতা সন্তান-স্নেহ-বহ্নিবীর্যে মাধুর্য-সঞ্চারিণী মা দুর্গা আসছেন।

শরতের শিশির-সিক্ত ধানের শীর্ষে আর মৃত্তিকার কোমল বক্ষে যে কল্যাণীর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়—তাঁরই বোধন-লগ্ন আসন্ন। প্রাকৃতিক পর্যায়ে ঋতু হিসাবে শরতই উজ্জ্বলতার প্রতীক। বর্ষান্তে ঘন-পত্রশোভিত বনরাজি ও সবুজের সমারোহ, সৌরকরোজ্জ্বল দিন, ঘন নীলাকাশে শ্বেত বলাকা সদৃশ শুভ্র লঘু মেঘখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—প্রকৃতির ক্রোড়ে শরতের সোনালী স্পর্শ—চতুর্দিকে দুর্গা পূজার আগমনী সুরের মূর্ছনা! শরতের মনোরম প্রকৃতি চারিদিকে হেসে উঠেছে। মেঘ মুক্ত নির্মলাকাশ, সবুজ ঘাসের উপর শিশির-বিন্দু প্রভাতের বালসূর্যে ঝলমল করছে। বিকশিত কাশের গুচ্ছ, শিশিরার্দ্রীকৃত ধান্য-মঞ্জরী, শেফালিকার মিষ্ট সৌরভ আর সন্ধ্যার মেদুর মলয়ে শিউলির সুমিষ্ট সুবাস অলস-পাখায় ভর দিয়ে বইছে—এই সব মিলিয়ে শরতের সুমধুর যে পরিবেশ তা বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়-মনে জাগিয়ে তোলে পুলকানন্দ। বর্ষান্তে শরতের প্রসন্ন সুন্দর দিনে মা দুর্গা বঙ্গভূমিতে অন্ন, ঐশ্বর্য ও শক্তির বরাভয় নিয়ে প্রতি বৎসরই উদিত হন। মিষ্ট-মধুর পরিবেশটী এই অনবদ্য আবহাওয়ায় বাঙ্গালীর সর্ব-শ্রেষ্ঠ আনন্দোৎসব, বাঙ্গালী হিন্দুদের বৃহত্তর পূজানুষ্ঠান শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা রূপে, বর্ণে, রসে ও গন্ধে পরম রমণীয় হয়ে ওঠে।

বৎসরান্তে বাঙ্গালীর ঘরে অমৃত-স্বরূপিণী মাতা মহামায়া আসছেন। ইন্দ্রনীল, মহানীল, পদ্মরাগে অলঙ্কৃতা মহার্ঘ-বিলম্বিত মুক্তাহারে দীপ্তিময়ী আমাদের রাজরাজেশ্বরী জননী—তাঁর সর্বাঙ্গের বিদ্যুন্মালার ঝলকে আমাদের চিত্তে পুলক সঞ্চার করে। দশভুজা দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী জননী—তাঁর দক্ষিণে সৌভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মী, বামে বিদ্যা-রূপিণী সরস্বতী, সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বলরূপী কার্ত্তিকেয়। সব দেবতার সর্বপ্রকার তেজ, শক্তি ও দ্যুতি হতে এই দনুজদলনী দেবীর আবির্ভাব এবং অসুর বিনাশ করে সর্বাধিক মঙ্গল বিধানই এই শক্তির লক্ষ্য। সত্য-যুগের সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের তিন বৎসরব্যাপী দুর্গার আরাধনা থেকে প্রভাময়ী দ্যুতিময়ী, শক্তি ও তেজোময়ী এই দুর্গার পরিকল্পনা এনেছে। দুর্দমনীয় মহিষাসুরকে বধ করণার্থে সকল দেবতার বিক্রমরাশি একত্র হয়ে দুর্গা-মূর্তিতে পরিণত হয়েছিল। রাবণ নিধনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র শরৎ ঋতুতে আশ্বিন মাসে এই দুর্গা পূজা করেছিলেন এবং তারই স্মৃতি বাঙ্গালীর এই দুর্গার্চনা বহন করে। বাঙ্গালীর সংসার ও সমাজ জীবনের প্রতিবেশ আলোকে উদ্ভাসিত করে প্রতি বৎসরই পরমানন্দরূপিণী মূর্তিতে মাতা আবি-র্ভূতা হন। আকাশে-বাতাসে ও ঘরে-বাইরে আনন্দময়ীর শুভাগমনে প্রাণময়তার আবেগে আনন্দের ও সমারোহের সাড়া পড়ে যায়।

দুর্গার দুটি রূপই আমরা জানি—মাতা ও কন্যা অর্থাৎ হৈমবতী ও উমা। যদিও আমি সঠিক অবগত নই যে, কবে তিনি অম্ভৃন ঋষির গৃহ আলোকিত করে মেয়ে হয়ে জেগেছিলেন এবং কাত্যায়ন ঋষিকে মধুরস্বরে পিতৃ-সম্বোধনে আপ্যায়ন করেছিলেন, কিন্তু আমাদের ঘরে মাতার এই খেলাটি অদ্যাপি চলছে। আমাদের সান্নিধ্যে এসে হাসির মাধুরী বিচ্ছুরিত করে বলেন: আমি তোমাদের কন্যা, আমি হৈমবতী। জননীর এই তনয়া হওয়া নূতন কিছু নয়। বাইরে যিনি বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন এবং সেই ভাবে আমাদের পোষণ ও পালন করছেন আবার তিনিই আদরের সুরে আমাদের অন্তরে আকর্ষণ করেন—ইনিই উমা।

তিন দিনের জন্য কৈলাস-বাসিনী শিবা কন্যা উমা-রূপে

পিত্রালয়ে আসছেন, সেই হেতু তাঁর আগমনোপলক্ষ্যে চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গিয়েছে—যথাযোগ্যভাবে জগজ্জননীকে বরণকরবার জন্য সর্বত্র ব্যস্ততা ও উদ্যোগায়োজন পূর্ণোদ্যমে চলছে। ষড়ৈশ্বর্যশালিনী দেবী ভগবতীর ঈষৎ সহাস্য এবং অমলোজ্জ্বল রূপের মাধুরী বাঙ্গালীর মানসলোক আলোকিত করবে। বাঙ্গলার স্থলে, জলে, আকাশে, বাতাসে সাক্ষাৎ-ভাবে স্নেহময়ী জননীর মাধুর্যের সংস্পর্শ অনুভব করে বাঙ্গালী তাঁর সেবায় আত্ম নিবেদনে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। এ যেন দীর্ঘ সুপ্তির পর জাগরণের সাড়া! সুদীর্ঘকাল থেকেই বাঙ্গালীর জীবন ও মননের সঙ্গে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আদি কারণ-স্বরূপিণী আদ্যাশক্তি পূজার একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং সেই হেতুই পূজার আগমনে বাঙ্গালীর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। গ্রাম বা নগর, যেখানেই বাঙ্গালীর সমাজ গড়ে উঠেছে, সর্বই পূজার হাওয়া যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। জগন্মাতার অর্চনা বাঙ্গালীকে অনু-প্রাণিত করে, বাঙ্গালী সমাজে নবজীবনের অনুভূতি ও প্রেরণার সঞ্চার করে।

জননীকে পেলে কার না আনন্দ হয়? তাই আজ বাঙ্গালীর মনের মূলে কোন সুদূর অতীতের স্মৃতির সূত্রে একটি মিষ্ট মধুর সুর বেজে উঠেছে আর আকাশে বাতাসে আমরা সেই মধুর সুরের লহর অনুভব করছি। আজ আমরা আমাদের জীবনের গতানুগতিকতা এবং প্রাত্যহি-কতার উর্ধ্বে উঠে মায়ের অবারিত, অনাবৃত ও অনন্ত অপত্য স্নেহের প্রলেপে আমাদের সকল বেদনা শান্তি এবং সব দুঃখের বিস্মরণ ঘটিয়ে জীবনের ভবিষ্যতের আশায় জেগে উঠব। মাতৃপূজার এই কয়েকটি দিন চিত্তে এমনই একটি অনুকূল আর্দ্রাবস্থা আনয়ন করে যাতে স্নেহ-প্রীতি-দয়া সহজেই অঙ্কুরিত হয়। এই উৎসানন্দ-মুখরিত দিবসগুলি সমগ্র বাঙ্গালীর চিত্তেই ভাবের আন্দোলন এনে দেয়। মন আনন্দ কাব্য রচনা করে।

যথাযোগ্যভাবে জগন্মাতাকে আমাদের গৃহে বরণ করে নেওয়ার জন্য আজ আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। শারদীয়া পূজার শুভাবসরে দেবীকে ঘরে পেয়ে প্রেমভক্তিতে এই ক'দিন আমাদের চিত্ত পরিপ্লুত হয়। আমরা বৃহতের চেতনায় জননীর আত্মভাবটি অনুভব করি। তাঁর মৃন্ময়ী মূর্তি কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে আমাদের চিত্তে চিন্ময়ী-রূপই লাভ করে। দুঃখ-দুর্দশা-রাহিত্য, সংসারের অসংখ্য অভিযোগ এবং জীবনের অসম্পূর্ণতা আছে, কিন্তু সে সবকিছুই মাতৃ-পূজায় কোন ক্রমেই বিঘ্ন হতে পারে না। শারদীয়া এই মাতৃপূজার অবকাশ প্রত্যহ আসে না। এই সময় পারি-বারিক প্রতিবেশ হতে আমাদের চিত্ত সমাজের সব স্তরে সম্প্রসারিত হয়। তাঁর আবির্ভাবে সকল তমিস্রার মধ্যে জ্যোতির প্রকাশ পায়। দেবী আমাদের ভিতর আলো করে বাইরে এসে দাঁড়ান। সর্বজনের সেবার সূত্রে আমরা পূজাঙ্গনে আনন্দময়ীর লাবনী লীলা আস্বাদন করি। মাতার মন্ত্রমূলে জনসেবার ধর্ম আমাদের ধারণ করে রেখেছে।

মহিষাসুর-মর্দিনী দশভুজা-দুর্গা বাঙ্গলার সভ্যতার ও সংস্কৃতির মূলে উদার মাতৃ-সাহর্যের ধারা ছড়িয়ে কতদিন থেকে কিরূপে আমাদের সমাজ-চেতনায় প্রাণের বিলাস সঞ্চার করেছেন, অদ্যকার মাতৃপূজার এই শুভ ও পবিত্র লগ্নে তা আমাদের পক্ষে অনুধ্যানের বিষয়। মা কি ছিলেন এবং তিনি কি হতে চান সেই অনুধ্যানেই তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব—সেই জ্ঞান বা প্রত্যক্ষানুভূতির বলই মাতৃপূজায় আমাদেরই পক্ষে সম্বল এবং প্রকৃতপক্ষে তাই হচ্ছে পরম বল। বিশ্বপালয়িত্রী জীবধাত্রী মহাশক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতার পূজায় দুর্বলের অধিকার নেই।

বন্ধুর-পথে দুর্গম-অভিযানে আমরা বরাভয়দাত্রী মাতার রাঙা শ্রীপদের নূপুর-নিক্কনই শুনেছি। মাতৃপ্রেমের আগ্নেয় সংস্পর্শেই বাঙ্গালীরা আত্মাহুতির বীর্য স্ফূর্তি পেয়েছে। মাতার মনন মাধুর্যই অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বাঙ্গালীর রাজনীতিক-সাধনাকে শক্তি দিয়েছে। বাঙ্গলার বৈপ্লবিক সাধনার মূলে মাতৃভাবনার আধ্যা-ত্মিকতা বা রাজনীতি কতখানি ছিল, সে প্রশ্ন আজ সর্বৈব অবান্তর। অগ্নিবর্ণা জননীর অগ্নি ক্রীড়া প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ সম্পর্কে অবশ্যই বাঙ্গালীদের অন্তরে দোলা দিয়েছে এবং তজ্জন্যই বাঙ্গালী নিজদিগকে নিঃশেষে উৎসর্গ করবার পরম বলের নিদর্শন প্রদর্শন করতে পেরেছে। ত্যাগে, ধর্মে পাণ্ডিত্যে, শিক্ষায়, শিল্পে, চারুকলায়, ও বীর্যবত্তায় বাঙ্গালী নিজেদের প্রকাশ করেছে। বন্যা, অজন্মা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং বহুবিধ বিপর্যয়ের তীব্র ঝড়-ঝঞ্ঝা বাঙ্গলার উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে বাঙ্গলাকে বিপর্যস্ত করেছে,

কিন্তু জগন্ময়ী-জননীর প্রসন্ন-দৃষ্টি সর্বদাই বাঙ্গালীকে রক্ষা করেছে। যিনি রুদ্রা—তিনিই শিবা, কল্যাণী। যিনি পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, মাতৃরূপে যিনি বিশ্বকে পালন ও পোষণ করছেন, তিনি সর্বমঙ্গলা—সকলেরই তিনি কল্যাণ করেন।

মাতা ব্যতীত আমরা হই নি—আমরা সকলেই মায়ের সন্তান। জগজ্জননী রূপে হিন্দু যাঁকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আগ্রহে, সানন্দে ও আন্তরিকতায় পূজা করে আসছে, তাঁর নিকট উচ্চ নীচের ভেদাভেদ নেই। মূঢ়, ম্লান, মূক, নিঃসম্বল, অসহায়, প্রভৃতি সকলেই জননীর সন্তান। সন্তান-স্নেহে উন্মাদিনীর পূজায় সকল সন্তানেরই সমানাধিকার। মায়ের কোন সন্তানকে দূরে রেখে এই মাতৃপূজায় প্রবৃত্ত হওয়ার কোন অর্থ বা সার্থকতাই নেই। সর্বজনের সানন্দ সহযোগিতায় ও সন্তোষে যে মাতৃপূজা—সে পূজায় জননীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অবহেলিত, অবজ্ঞাত ও দুর্গত মায়ের সন্তানদের দুঃখ মোচন করে, তাদের অশ্রু মুছিয়ে, তাদের বুকে-কোলে টেনে নিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েও যদি আনন্দ দেওয়া যায়, তাহলে তদপেক্ষা বড় পূজা আর কিছু হতে পারে না এবং তাতে মা নিঃসন্দেহে সর্বাধিক প্রসন্না হবেন।

আমাদের সব অভাব অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-বাধা বিদূরিত করবার জন্যই তো আমরা মাতাকে আহ্বান করি। আর সকল সন্তানের সর্ববিধ দুঃখ ক্লেশ দূর করতেই তিনি আসেন। দেবীর অজস্র কৃপা-দৃষ্টি আমাদের উপর পতিত হওয়া মাত্র সব নিরানন্দ ঘুচে আনন্দধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

অতএব কোন প্রশ্ন, আশঙ্কা ও সংশয় না করে একান্তচিত্তে তদ্গতভাবে আজ আমাদের মাকে আহ্বান জানালে মা কখনই সাড়া না দিয়ে পারেন না। দেবী আমাদের সকল দুর্বলতা ও কাপুরুষতা দূর করবেন। আমাদের এই মাতৃপূজা বিশ্ববাসীর কল্যাণ এবং সমগ্র জগতের শান্তি আনবে। দেবী দুর্গার আশীর্বাদে সর্বজনেরই কল্যাণ ও মঙ্গল হবে। দিকে-দিকে পুলক খেলবে। আমাদের মাতৃপূজা, দুর্গা-পূজা সার্থক হবে।

বিশ্বের মাঝে বিরাজিছ তুমি

(সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)

ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

বিশ্বের মাঝে বিরাজিছ তুমি
তুমি ছাড়া কেহ নাই
অহং-জ্ঞানের অন্ধ-বিচারে
তোমারে যে ভুলে যাই।
হৃদয়ে বাহিরে আলোকে আঁধারে
দেখা অদেখার পারে
কান্না হাসিতে তব আনন্দ
দোল দেয় বারে বারে।
তুমিই সগুণ তুমি গুণাতীত
সাধক তোমারে ডাকে

লোভ মোহ বশে মুক্তিরে চাই
প'ড়ে থাকি মোরা পাকে
তোমার মোহন রূপের লীলায়
ভুলিয়া মায়ার ডোরে
আমার আমিকে চিনিতে পারিনা
তাই তুমি থাক দূরে।
নাহি আর কিছু চাহিবার প্রভু
ভক্তিই প্রানে দিও
মনের গহনে স্মরণ মনন
হয় যেন মোর প্রিয়।

যুগায়ন

কলেজ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো ছেলে এবং মেয়ে পিছু নিয়েছে—একেবারে ফিঙ্গে হয়ে লেগেছে! তাদের ইংরিজির সাজেস্‌সন দিতে হবে। ইম্‌পরটান্ট, মোষ্ট ইম্‌পরটান্ট বলে দিতে হবে।

বললুম,—তোমরা যা বলছ, তার মানে কোস্‌চেন বলে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের সময় আমাদের শিক্ষকদের কাছে একথা মুখে আনতে সাহস পেতাম না। ভাল করে পড়,—ফাঁকি দিয়ে পাশের চেষ্টা করবে কেন?

—স্যর আজকাল বাস্তবতার যুগ। ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ। যুগধর্মে সবই বদলায়। সংক্ষেপে, স্বল্পশ্রমে, সর্টকাটে পাশ করতে হবে—চাকুরী পেতে হবে।

—যুগধর্মে সবই পাল্টায়। ধরুন স্যর, আজ যদি কোন বাপ পুত্রকে বনে যেতে বলে, তবে সে কি সুবোধ রামচন্দ্রের মত বনে যাবে, না বাবার রাজ্যই পলিসি করে দখল করবে? আজ যদি কেউ সীতা নির্বাসন করতে চায় তবে তাকে কি খোরপোষের মামলায় পড়তে হবে না! আজকাল ব্যক্তিবাদের যুগ, ব্যক্তিকে বড় হতে হবে—এটা বুদ্ধিবাদ, যুক্তিবাদের যুগ।

—হ্যাঁ স্যর আপনাদের যুগ ত নেই, তার কথা বলে কি হবে? কি কি প্রশ্ন পড়েছে স্যর সেইটে সংক্ষেপে বলে দিলেই হবে।

কথায় কথায় অনেকদূর এসে পড়েছি। বললুম,—তোমরা কি ছাড়বে না?—না স্যর, আমরা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করবো স্যার। কোস্‌চেন বলে দিতেই হবে।

—দ্যাখো, আমি ব্লাড্‌-প্রেসারের রোগী আমাকে বেশী বিরক্ত করো না।

—কেন, রাগ করছেন স্যর, দেহ খারাপ হবে, মাথা ঘুরবে। তার থেকে বলেই দিন না। আমাদের ইউনিয়ন থেকে শেষে—বেঞ্চি ভাঙ্গার নির্দেশ যদি দেয়!

সংস্কৃত কলেজের সামনে এসে পড়েছি। মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে গেলাম। ওখানটায় ভীড়ও রয়েছে—কিছুক্ষণ বাদে চোখ মেলতেই দেখি, হাটু পর্যন্ত ধুতি, উড়ুনী গায়ে, চটি পায়ে, মাথার অর্দ্ধেকটা কামানো, পিছনে লম্বমান টিকি নিয়ে এক ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। চেহারা দেখেই চিনলাম, মহাপুরুষকে। যার জীবনী, যার কর্ম এবং যার অপার কারুণাময় হৃদয়কে বাল্যকাল থেকে প্রণাম করে এসেছি। এত বড় হৃদয় নিয়ে বাংলাদেশে আর কেউ জন্মায়নি—

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম। দেহমন পবিত্র হল—তিনি সহাস্যে মুখের দিকে তাকালেন।

পিছনে চেয়ে দেখি ছাত্র-ছাত্রীকুল খুক্‌খুক্‌ করে হাসছে। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম,—হাসছ যে!

কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক বলল,—আপনার কাণ্ড দেখে। রাস্তার মাঝে এই উড়ে রাঁধুনে বামুনটাকে প্রণাম করতে লজ্জা করল না। ওই ত চেহারা! একটা গাড়ী আর টেরিলিন স্যুটও যার নেই তাকে প্রণাম করা—এটা স্যর আমাদেরও অপমান করা।

—জানো ইনি কে? কে এই মহাপুরুষ!

ওরা হো হো করে হেসে উঠল,—মহাপুরুষ! তা স্যর চেহারা আর বেশভূষায়ই বুঝেছি।

—জানো, ইনিই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—

মেয়ে কণ্ঠে প্রশ্ন হল,—বিদ্যাসাগর কে রে? নাম ত শুনিনি—সিনেমা আর্টিষ্ট, না ক্রিকেট খেলোয়াড়! নতুন ফাইণ্ড বোধ হয়—

—কোনও পার্টির লিডার-টিডার বোধ হয়!

মাথা ঘুরছিল। চোখবুঁজে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কানে কেবল কথাগুলোই প্রবেশ করছিল, যতদূর মনে আছে আপনাদের কাছে নিবেদন করছি।

—হ্যাঁরে হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ছোটকালে পড়িস্ নি, এই বিদ্যাসাগর চাকুরী ছেড়ে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন।

—কেন?

—ওঁর মা লিখেছিলেন যে ছোট ভাইয়ের বিয়ে, বাড়ী যেতে হবে। সাহেব ছুটি দিলেন না তখন উনি রিজাইন করে বাড়ী চলে গেলেন—

—আজকাল এই বীরত্ব দেখালে বাড়ীতে বাবাই লাঠি পেটা করত; মায়ও ঝাঁটাপেটা করত এই বেকুবীর জন্যে। না হয় দু'দিন পরেই বাড়ী আসতিস্ তাই বলে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে—

—ওই ঘটনাটা মাতৃভক্তির উদাহরণ হিসাবে পড়ান হত পুরাকালে।

—তার মানে বলতে চাস্, সেই যুগে আহাম্মুকীর অন্য নাম ছিল মাতৃভক্তি। আজ এই মাতৃভক্তি দেখাতে গেলে রক্ষে আছে—বাপ মা পাড়ার লোক তেড়ে আসবে মারতে—

—হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ হাসির শব্দ—মাতৃভক্তি আবার কি রে?

—শুধু কি ওই। দামোদর নদীর ধারে যেয়ে দেখেন নদীতে বন্যা অথচ যেতেই হবে—মা বলেছেন কিনা। অমনি জলে ঝাঁপ, কোনমতে জল খেয়ে, ডুবতে ডুবতে ওপারে গিয়ে উঠলেন—

—বাপস্, মাতৃভক্তির গুঁতোয় প্রাণটাই যে যাচ্ছিল—কেন পরের দিনে গেলে কি হত? প্রাণটার থেকে একটা কথার দামই বেশী হল—এত বড় মূর্খতা কল্পনা করাই দায়— কথা ত হাওয়ায় ভেসে যায়—

মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন বলল,—সেকালের লোকগুলো এমনি বেকুবই ত ছিল। রামচন্দ্র বনে চলে গেলেন, কথাটি পর্যন্ত বললেন না—অ হা! কি বীরত্ব! কেন? এক ঘুষিতে বুড়ো দশরথকে মেরে রাজা হতে কে বারণ করেছিল!

—মহাপুরুষের কি বুদ্ধি! আরে, মা'ত চিরদিন বাঁচে না, বাঁচবেও না, তার একটা খেয়াল মেটাতে চাকুরী ছেড়ে দেওয়া, জলে ঝাঁপ দেওয়া! মা যা বলবেন তাই বেদবাক্য নাকি? তার বিচার করতে হবে না? যুক্তি দেখতে হবে না?

—জলে ঝাঁপ দেওয়ার কোন যুক্তি আছে? আর একটু হলে জল খেয়ে খেয়ে ডুবে যেতিস্ যে! না ডুবলেও জল খেয়ে পেট ঢিস ত হয়েছেই—

—বাপ্ মা মূর্খ হতে পারে, মূর্খের মত আদেশ দিতে পারে গ্রাজুয়েট ছেলে কি মূর্খ বাপ-মার আদেশই শুনবে, তা হলে আর শিক্ষার লাভ কি! শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন কি?

—যা বলেছিস্ মাইরি,—অকাট্য যুক্তি—আজকাল সব বাপ-মাই মূর্খ।

—সেদিন পাড়ার বড়দা বললেন, বৃদ্ধ অকর্মণ্য এই বাবা-মাগুলোকে খাওয়াতে খাওয়াতেই দেশে খাদ্যসমস্যা হ'য়ে গেছে। ওগুলো যদি মরে যেতো, বা ওদের যদি মারা যেত তবে কতো খাদ্য বাঁচত। এই নন-প্রডাক্টিভ্ একজিষ্টেনস্এর জন্যে এই খাদ্যসমস্যা।

—এর কোন মানে হয়! এই ত আমার বাবা পড়্ পড়্ পড়্ বলে দিবারাত্রি খ্যাচ্ খ্যাচ্ করছেন কিন্তু তিনি কি জানেন দেশে কত সমস্যা। সেই সমস্যার আমাদের মত তরুণের কর্তব্য কি?

—হাঁ, মা বললেন আর সুবোধ পুত্র জলে ডুবে মলেন।

—শোন্ শোন্ ওঁর আরও অনেক কাণ্ড আছে। পরের দুঃখ দেখলে মেয়ে মানুষের মত ভেউ ভেউ করে কাঁদতেন—

মেয়েলি কণ্ঠে জবাব এল,—মেয়েরা ভেউ ভেউ করে কাঁদে না—

—আগে, অনেক আগে প্রাচীনকালে কাঁদতো, এখন আপনারা এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে ত আমাদের উপরেই গেছেন—

—দেশে ইস্কুল নেই, উনি পকেটের টাকা খরচ করে ইস্কুল পিত্তিষ্ঠে করলেন—দেশের লোক শিক্ষিত হবে—

—আরে, যেমন তেমন একটা ইস্কুল ফাঁদতে পারলে মাসে পাঁচ শ' ত বটে,—তা হ'লে লোকটার ব্যবসাবুদ্ধি ছিল—অনেক টাকা কামিয়েছে।

—তা যদি থাকতো তবে দামোদরে ডুবতে যাবে কেন? উল্টে পকেট থেকে টাকা খরচ করে মহাপুরুষ নাম নিতে গিছলেন, তার পরে একেবারে সব ফাঁক—

আমার ফেল করার কারণ। ওর জন্যেই ফেল করেছি গতবার। মাইকেল মদফদ খেয়ে ফ্রান্সে মারা যাচ্ছিল উনিই ধার করে টাকা পাঠিয়ে তাকে বাঁচালেন। সেই মাইকেল ডিকসনারি দেখে দেখে যত কঠিন কথা দিয়ে ওই মেঘনাদ বধ লিখে আমার কপাল পোড়ালেন। ওঁর জন্যেই মেঘনাদ বধ,—শেষে আমাকেও বধ করে তবে স্বস্তি।

—দেখছিস্, লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালাগালি শুনছে, আর হাস্‌ছে—

মেয়ে কণ্ঠে জবাব হল,—সত্যি, দেখলে গা জ্বালা করে—দামোদরে ডুবলে ত এত জ্বালা হত না—

—আরও হিষ্ট্রি আছে। মাতৃভক্তির উপাখ্যান ত শুনলে, এবার তেজস্বিতার কাহিনী শোনো। একদিন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেব টেবিলে পা তুলে দিয়ে বসে আছেন, এমন সময় উনি গেলেন।

—তখন নিশ্চয়ই থপ্ করে কার সাহেবের বুট থেকে ধুলো নিয়ে মাথায় বুকে ওষ্ঠে ঠেকালেন—প্রমোশন হয়ে গেল, তাইত! ও জানি—

—না, না, পদধূলি নেন নি—

—কেন নেন নি? খুব অন্যায়, আজ স্বাধীনতা লাভের ২০ বছর পরেও আমরা পদধূলি নিচ্ছি—আনন্দে সাগ্রহে, আর উনি পারলেন না? জীবনবোধের এতই অভাব ছিল?

—যে বিলেতে যেয়ে দু'এক হাজার পাইট হুইস্কি খেলে এবং মেমসাহেবের সঙ্গে মুখ শোকাশুকি করে এলে এদেশে অন্তত: একটা সাহেব হওয়া যায়, সেই দেশের মহাপুরুষের পদযুগল সামনে পেয়েও ছেড়ে দিলেন! আশ্চর্য!

—নিশ্চয়ই নয়, অত বোকা মানুষ হয় না। ওই পদযুগল ধরেই ত বিদ্যেসাগর, পদ্মশ্রী-টিরিও হয়েছেন বোধ হয়।

—তোরা কিচ্ছু জানিস্ নে হিষ্ট্রি। এর পরে একদিন কার সাহেব ওর সঙ্গে দেখা করতে এলে উনি চটিশুদ্ধ ফাটা পা টেবিলে তুলে দিলেন—

—চটি শুদ্ধ! ফাটা পা! এতবড় পাষণ্ড, সায়েবের সামনে চটি, ফাটা পা তুলে দেওয়া। তবুও ধরণী দ্বিধা

সাহেব সার্টিফিকেট না দিলে চাকুরী হয় না, ডাম-ডুম তৈরী হয় না, প্ল্যানিং হয় না তাদের এত বড় অপমান! কাফি হাউজে না গেলে জীবনবোধ হয় না।

—যাদের দেওয়া প্যাণ্ট সার্ট না হলে আজ আমরা বিবস্ত্র থাকতাম—

—যাদের দেওয়া সুধা পান না করলে ভদ্রসমাজে পাত্তা পাওয়া যায় না—

—যাদের দেওয়া চপ্, কাট্লেট্, ফাউল ডেভিল্ না হলে বরযাত্রী খায় না—

—যাদের দেওয়া কাব্যসাহিত্য না পড়লে রসবোধ হয় না, সাবান পাউডার না হলে প্রসাধন হয় না—যাদের দেশের মাটি না ছুঁলে দ্বিজ হওয়া যায় না—

—তাই বোঝ্ আর কি! শুধু অপমান নয় আবার রসিকতা করে বললেন—এ ভদ্রতা তাঁর কাছেই শিখেছেন।

—অমার্জনীয়, অমার্জনীয়—আজও টেম্সের মৃত্তিকা না হলে দুর্গোৎসব হয় না।

—হাঁ মশাই, এই সব করেছেন? সত্যি করে বলুন নইলে—

সভয়ে চোখ খুললাম, হঠাৎ যদি মেরেই বসে। দেখি বেশ ভীড় জমেছে রাস্তায়। চোখ নামিয়ে নিলাম, চোখ বুঁজবার আগে দেখি চটি পরা একজোড়া পা—পা দু'টো আস্তে আস্তে পাথর হ'য়ে যাচ্ছে—চোখ বুঁজে ফেললাম।

—ওঁর আর একটা কাণ্ড শুনবি।

—কত আর বলবি ভাই। ওসব আমরা বুঝে নিয়েছি—চেহারা, বুদ্ধি ও বিদ্যায় যে সামঞ্জস্য আছে তা আর বলতে হবে কেন?

—শোন্ শোন্ ভারি ইন্টারেষ্টিং। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে এক ভদ্রলোক সঙ্গে সুটকেশ। কুলি কুলি বলে ডাকলেন কিন্তু কুলি নেই। ভদ্রলোক, তাই সুটকেশটী নিজে নিতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। উনি যেয়ে সেটা মাথায় করে পৌছে দিলেন—কিন্তু পয়সা নিলেন না—

—পয়সা ছেড়ে দিলেন? মানে পরমার্থ ছেড়ে দিলেন, বলিস্ কি?

সভাপতিত্ব করতে দেখে খুব লজ্জিত হলেন!

—কেন? লজ্জার কি আছে এতে। বিনি পয়সা কৌশলে কাজ হাসিল করেছেন এটা ত তার বুদ্ধি পরিচয়। তা'র বুদ্ধির তারিফ্ করি বরং—তিনি লজ্জিত হতে যাবেন কেন? এমন কেন করলেন?

—শুনে ছাখো।

—ও মশাই! শুনছেন এ কাজ করতে গেলেন কেন? করলেন ত পয়সা ছেড়ে দিলেন কেন! বলুন—কেন?

—শিগ্‌গির বলুন, হাসলে হবে না—নইলে আমরা দেখছেন ইঁট, ঝাড়বো—

বিদ্যাসাগর ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, নিজের কাজ নিজে করায় কোন লজ্জা নেই তাই শিক্ষা দিতে একটু লজ্জা দিয়েছিলাম—

—লজ্জা কিসের? বিনি পয়সায় যে কাজ হাসিল করতে পারে সেইত মহাপুরুষ আপনারই ত লজ্জা পাওয়ার কথা।

—হ্যাঁ, লজ্জা! আমার সুটকেশ বেডিং মাথায় করে সাত মাইল চলুন ত, তার পরে কুলি ভাড়া না নিয়ে আমাকে লজ্জা দেন ত দেখি! অত বেকুব পান নি আমাদের। বরং বন্ধু মহলে ক্রেডিট নেব, বিনে পয়সায় সুটকেশ বইয়ে নিয়েছি কেমন! মহাপুরুষ কালুদা, বার বছর অফিস্ যাচ্ছে, একটি দিনেও বাসট্রামে টিকেট করেনি।

—কৌশলে স্বার্থোদ্ধার, ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধারই ত শিক্ষার আদর্শ। প্রকৃত শিক্ষিত হলে তিনি আদৌ লজ্জিত হতেন না।

—এখনো দেশের বড় লোকদের খাতায় ওর নাম কিন্তু আছে—কেটে দেওয়া হয়নি।

—বড় লোক! উনি না দুর্ভিক্ষের সময় দেশের চার হাজার গরীব লোককে খাইয়ে দেনায় ডুবেছিলেন। তবে আর বড় লোকটা কি?

—হাঃ হাঃ, গরীব খাইয়ে কেউ বড় লোক হয়। গরীব শুষেইত লোকে বড় লোক হয় শুনেছি। ওর নাম এখনো কেটে দেওয়া হয় নি?

—কাটা না গেলেও ক্ষতি নেই, লোকে ওর নাম ভুলে

ডেন্ট বলে খোঁজ রাখি। এখন ওকে আর কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই নেয় না। এই নূতন শিল্পায়নের যুগে, জীবনের নূতন মূল্যায়নের যুগে ওর কোন দামই নেই। স্বর্ণই জীবনের মূল্য,—দরিদ্র শোষণ ব্যতীত স্বর্ণাহরণ হয় না—এটা যুক্তি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ হবস্ সায়েবও বলেছেন দেশের স্বার্থে জাল জুয়োচুরি কোনটাই দুর্নীতি নয়—একথা ব্যক্তির পক্ষেও সত্য—

—সায়েবে বলেছে ত! এত অকাট্য—

—ও মশায় শুনছেন,—এই যে সব কুকাজ আপনি জীবনে করেছেন এ-গুলো যে একান্তই বেকুবী সেটা কিছু হৃদয়ঙ্গম করলেন—

সমবেত নারী কণ্ঠে ধ্বনিত হল,—আর বেশী বলিস্ নি ভাই, শেষে কেঁদে ফেলবে। দেখছিস্ ত, চোখ দুটো কেমন ছলো ছলো করছে—

হি হি, হাঃ হাঃ—চারি পাশে উদ্দাম হাসির শব্দ।

—রাঁধুনে বামুন ত। সে কি জীবনের এই নবতম মূল্যায়ন, নবতম জীবন দর্শন বুঝবে! পিতৃমাতৃ ভক্তি! হাঃ—সেটাত একটা বায়োলজিকাল ফ্যাক্টর।

—প্রদীপের তেল চোখে দিয়ে পড়ে পড়ে যে বিদ্যে তাতে এসব বোঝা যায় না। নিয়ন লাইটে বসে পড়লে তবে ত বুঝতো!

—তবুও নাকি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতো।

—যাঃ! যাঃ! ওই চেহারা নিয়ে ফার্স্ট হতো। তো হাত কাকুড়ের তের হাত বিচি।

—হ্যাঁ রে সত্যিই—

—ওই নকল টকল করে পাশ করেছে হয়ত, আর সাহেবকে ধরে বিদ্যেসাগর হয়েছে।

—তা হলে উনি নিশ্চয়ই ভাল নকল করতে পারেন, দাঁড়া, ওই আর্টটা একটু শিখে নিতে হবে—ওটা খুব দরকার রে ভাই—

—না! সে আমি জানি,—ইন্‌ভিজিলেটরকে ছুরি দেখিয়ে এমন কাবু করেছিল যে তারা ধরতে সাহস পায়নি!

দেবেন, আজ তিন বছর ফেল করছি—আর চেয়ার বেঞ্চি ভাঙছি—আর কতকাল ভাঙবো?

—ও সব কিচ্ছু না, ও বোধ হয় ভাল এ্যাসিড বাল্ব আর বোমা তৈরী করতে পারে, একজামিনারকে বোমা দেখিয়ে কাৎ করেছে—

—শুনছেন স্যার, এখনও ইংরিজির কোশ্চেনগুলো বলতে দেরী করছেন! ওঁর কাছ থেকেই বোমার ফরমুলাটা নিয়ে নেবো—

—হো হো হিঁ হিঁ—চারিপাশে দাঁড়িয়ে ওরা হাসছে, তা চোখ বুঁজেই বুঝতে পারছি।

নারীকণ্ঠে নাকি সুরে কে যেন বলল, উনি আবার বই লিখেছেন।

—কি বই রে? উপন্যাস, ডিটেকটিভ না রম্যরচনা—সেকসী হবে ত!

—যাই বল, সিনেমার বই নিশ্চয়ই নয়—তাহলে নাম নিশ্চয়ই জানতাম।

—ওই সেই সততসঞ্চরমান জলধর পটল সংযোগে—হি হি, হা হা।

—ওরে বাপস্! ওর মানে কি?

—মানে হচ্ছে, সতরঞ্চিতে বসে শ্রীমান জলধর পটলে তুঁতের নীলজল সংযোগ করছে—হোঃ হোঃ

—এই লোকটিই না ব্যাকরণ কৌমুদী লিখেছেন!

—তার মানে, সেই লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্!
এমন বইও মানুষে লেখে মশায়? ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাথাটা আস্ত খেয়েছেন একেবারে। কেন দু'টো ডিটেকটিভ বই কি সিনেমার বই লিখতে পারেন নি!

একটু চোখ ফাঁক করে দেখলাম, বিপুল জনশ্রেণী দাঁড়িয়ে হাসছে, আর ওঁর চটি জুতোর উপর থেকে আস্তে আস্তে হাঁটু পর্যন্ত পাথর হয়ে গেছে।

এমন সময় একটা হৈ হৈ আরম্ভ হল। একটা লোক রাস্তা থেকে চীৎকার করছে, ওই, ওই লোকটা—

—কে? কে?

—ওই, চটিপায় টিকিধারী লোকটা আমার সর্বনাশ করেছে—সর্বনাশ করেছে।

কি করেছে, বলুন না,—ইট আছে কিনা এদিক ওদিক

—ওই লোকটা আর বেথুন সাহেব স্ত্রীশিক্ষা চালু করে গেছেন। এখন যে আমাকে ছেলে রাখতে হয়, ভাত রাঁধতে হয়। আর তিনি বন্ধুদের নিয়ে ফিরপোতে যান, ফাংসনে নাচতে যান—জলসায় যান, ছেলেটা কেঁদে কেঁদে টেঁসে যায়।

একটি জরাগ্রস্ত কণ্ঠে জবাব এল, তাতে ওঁর দোষ কি? উনি ত সীত সাবিত্রী গার্গী মৈত্রেয়ীর আদর্শ চালু করতে চেয়েছিলেন—বাংলার মাটির গুণে দার্জিলিংএর কমলালেবু বিষ টক হয়ে গেছে—

—তাই বলে নেচেগেয়ে বেড়াবে আর আমি হাঁড়ি ধরবো—

মেয়েগুলো ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, কেন যাবে না মশাই? চিরদিনই হাড়ি ঠেলবে আর ছেলে রাখবে? আর আপনারা দালালি মেরে বেড়াবেন?

—দুধ বিনে কচি ছেলেটা যে টেঁসে গেল—

—বেবি ফুড খাওয়াবেন। মা'কে গরু পেয়েছেন যে বাড়ীতে বসে দুধ দেবে!

—তাই বলে সে পরপুরুষ নিয়ে যা তা করবেন—যেখানে খুশী যাবেন।

—নিশ্চয়ই যাবেন। পরনারী নিয়ে আপনারা এ্যারিষ্টোক্রেসী করেন নি? আমরাও পাল্লা দিয়ে প্রেম করবো—পরপুরুষ নিয়ে ঘুরবো—

—নিশ্চয়ই ঘুরবো, টপলেশ লরবো,—এ্যাঁ আস্পর্দ্ধা কত?

—এ হবে না, হতে দেব না, হতে পারে না। স্বাধীনতা চাই—

—হতে দেবো না! প্রগতির যুগ সেটা যেন মনে থাকে। ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ, ব্যক্তিবাদের যুগ—

—তাই বলে হৃদয় থাকবে না, দরদ থাকবে না, অনুভূতি থাকবে না—

—না, না, ও-সব থাকলে প্রগতি হয় না। ওই যে সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ, হৃদয় দেখাতে গিয়ে ভিক্ষে করতে হয়েছে—বেকুবের যুগ চলে গেছে—

কে একজন উদাত্ত স্ত্রীকণ্ঠে বললেন,—বন্ধুগণ, আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নারীর এই অপমান দেখছেন অথচ যৌবনের

—ত্যাখ্ ত্যাখ্, ইট কোথায়, জাগরিত যৌবনের মহিমাটা দেখাই—

চারিদিকে ধুপ্ ধাপ্ শব্দ হতে লাগল, হৈ চৈ চীৎকার, ধাকাধাকি, মারামারির মত শব্দ। রেলিং ধরে চোখবুজে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এক ফাঁকে দেখলাম ওঁর কোমর পর্যন্ত পাথর হয়ে উঠেছে।

চীৎকার হচ্ছে—হৃদয় দেখাতে এসেছে! দেহ না থাকলে হৃদয় থাকে কোথায়? মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে দেওয়ার নাম হৃদয়?

—বড়লোক, কর্মবীর দেখতে চাও ত দেখ গিয়ে, চাল, ডাল, সরষের কারবারে কত বাড়ি হাঁকিয়েছে, ক্যাডিলাক কিনেছে। সমগ্র বড়বাজার কিনে নিয়েছে—

—তাই বলে পরপুরুষ নিয়ে এসব চলবে না। এই সব কে শিখিয়েছে, শিখতে বলেছে—

—শিখতে বলবে কেন? ওটা জন্মেই মানুষ শেখে, খেতে মানুষকে শেখাতে হয়? ধর ত বেটাকে—এখনও কপ্‌চাচ্ছে—ব্যাটার এতটুকু আর্ট জ্ঞান নেই।

আবার ধুপধাপ শব্দ—অনেকক্ষণ গোলমাল। শব্দেই বুঝলাম রাস্তাটা অনেক পাতলা হ'য়েছে। বহুলোক রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে গেছেন—

কতকগুলো ছেলে হাঁপাচ্ছে আর বলছে, নারীত্বের অপমান! রাস্তায় ইট থাকতে নারীত্বের অপমান কে করবে?

—জানিস্ হিষ্টি, ওই উনিও নারীত্বের অপমান করেছেন—

—কবে? কখন?

—জানিস্ নে, একদিন গভীর রাত্রে হাড়কাটা গলি দিয়ে সর্টকাট কচ্ছিলেন।

—হিঃ হিঃ, হাঃ হাঃ—লোকটা ত বেশ সেয়ানা দেখছি—ওদিকেও ছিলেন তাহলে?

—একটি নারী সঙ্গী বিহনে বুভুক্ষু হৃদয়ে, বিষন্ন তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। গভীর রাত্রি, কিন্তু তখনও একাকী—হৃদয়ে মরুর বুভুক্ষ—মাংসে ভয়াবহ তৃষ্ণা—

—আহা! আহা! কি বেদনাব্যাকুল মুহূর্ত—তারপর? তারপর?

অনেক হয়েছে। এই পাঁচটি টাকা নিয়ে যাও, ঘুমোও গিয়ে—

—হঃ, হার্সালি। দোকানে গিয়ে সওদা না নিয়ে কেউ দাম দেয়? অত গুল দিস্ নি—একেবারে গুলরাজ হ'য়ে গেছিস্। এও বিশ্বাস করতে বলিস্?

—আরে সত্যিই তাই,—বিশ্বাস কর—

—তা হবে, অক্ষম কাপুরুষ অনেক আছে জগতে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় পেয়ে টাকা ফেলে পালিয়েছে। ভয়—ভয়—

—তা কেন? রোগ ব্যাধিও ত মানুষের থাকে,—থাকতে পারে সেটা ভাবছ না কেন?

চারিপাশে হাসির হুল্লোড় চলতে লাগল—হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ।

হঠাৎ নারীকণ্ঠে তীব্র চীৎকার—তোমরা হাসছ? এতবড় আত্মগ্লানিতে তোমরা হাসছ?

সকলে সভয়ে চুপ করে গেল।

চারিদিকে পিন-পতন শব্দ শোনা যায় এমন নীরবতা। ঝড়ের পূর্বে যেন বনস্পতিকুল স্পন্দনহীন হয়ে প্রহর গুনছে।

—বুভুক্ষু নারীত্বকে উপেক্ষা করে, প্রত্যাখ্যান করে তাকে অপমান করা হয় নি? নারীত্বের নিশীথ বুভুক্ষাকে শুধু উপেক্ষা করেছে তাই নয়, নারীকে 'মা' বলে সম্বোধন করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে,—এতবড় পাষণ্ড প্রতারক ওই বামুন। তারপরে টাকা দিয়ে বুভুক্ষিত আত্মার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে—এতবড় অপমান। আত্মার শাশ্বত ক্রন্দনকে অপমান!

—বন্ধুগণ, আপনারা ভেবে দেখুন, এতবড় কলঙ্ক কথা নারীর পক্ষে এ যাবৎ শোনা যায় নি। নারীত্বের এতবড় অপমান কেউ করে নি কোনদিন। এই বিস্ময়কর অপৌরুষের প্রতিবিধান করার মত জাগ্রত-যৌবন তরুণ কি দেশে নেই!

—ওই যে, ওই যে, আধলা সব রয়েছে, ওই যে আধলা—ঝেড়ে দেত সব—ভেঙ্গে চুরমার করে দি।

সভয়ে চোখ খুলে দেখি অর্ধপ্রস্তরীভূত বিদ্যাসাগর চটি ফেলে ছুটে গিয়ে উঠলেন বারান্দায়। তাঁকে আড়াল করতে করতে আমিও পিছু পিছু ছুটলাম—পিছনে পাথর-বৃষ্টি হচ্ছে অবিরাম—

উনি চট করে একটা কাচের বাক্সের ডালা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। দেখতে দেখতে গায়ের রক্ত উবে গেল। শ্বেতপাথরের মূর্তি হয়ে বাক্সের মধ্যে বসে গেলেন। কাচের ডালাটা টেনে বন্ধ করে দিলেন।

পাথরের মূর্তিই বটে—যাক বাঁচা গেল।

পাথরের মূর্তি হলে কি হয়,- চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তবুও—আমি আশ্চর্য হলাম,—পাথরও কাঁদতে পারে!

——

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিভ্রান্ত

সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য মেয়েদের ছবিতে ভরা! মেয়েদের দেখে কিশোর কবি প্রথমে মুগ্ধ হয়েছেন। তাই তাঁর কিশোর কাব্যে দেখতে পাই কবির মুগ্ধ আবেগ। কিন্তু ক্রমে সেই রংগীন কুয়াশা স্বচ্ছ হ'য়ে এসেছে। পরিণত দিবালোকে কবি নারীকে স্পষ্ট ক'রে দেখেছেন। কিন্তু তরুণ প্রত্যুষের উষালোকে যাকে মায়াতে, ছায়াতে বিজড়িত ক'রে দেখেছিলেন, দিনের আলোয় তার সৌন্দর্য্য কবির চোখে আরও বেশী সুন্দর হয়েই দেখা দিল। আলো আঁধারে দেখার মায়া দিনের আলোয় যখন দূর হ'য়ে গেল, তখনও কবি নারীকে সুন্দর ব'লেই জানলেন। কিন্তু এ সৌন্দর্য্য দেহের লাবণ্যকে ছাড়িয়ে দেহাতীত মনের সৌন্দর্য্য। পরিণত বয়সে কবি নারীর মধ্যে কদর্য্যকে, কুৎসিতকে, তার লোভ, তার ঈর্ষা, তার সংকীর্ণতা—এ সমস্তকে দেখেছেন; কিন্তু তবু সব ছাপিয়ে কবিকে অভিভূত করেছে নারীর প্রীতি, তার স্নেহ, তার দরদ, তার মমতা ও ভালোবাসা।

সংসারের মধ্যে কবি ভালো এবং মন্দ দুই-ই দেখেছেন। কবি জানেন এ সংসারটা সাদা ও কালো, মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব নিয়েই চিরদিন চলেছে। কিন্তু তবু কবির মনের বিশ্বাস যে এ সৃষ্টি বিধানের মধ্যে চিরদিন ধ'রে কালোর ওপরে সাদারই জয় পতাকা উড়ছে। ঠিক যেমন জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিয়েই এই সৃষ্টি স্রোত বয়ে চলেছে, তবু মৃত্যুর ওপরে শেষ বিজয় জীবনেরই। তা না হ'লে এত দিনে মৃত্যু তো এই সৃষ্টিধারাকে রুদ্ধ করেই দিত। কিন্তু এই জীবন ধারা মৃত্যুর কালো পাথরে ঠেকে রুদ্ধ হ'য়ে যায় নি। সে তাকে কলোচ্ছ্বাসে অতিক্রম করে ফুলে ফুলে ফেনায়িত তরংগিত, বর্দ্ধিত আবেগে চিরদিন ধ'রে বয়েই তো চলেছে।

নারীর বেলাতেও কবি দেখেছেন, তার ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, সংকীর্ণতা, কুটিলতা,—এ সমস্তকে ছাপিয়ে চলেছে তার প্রীতি ও প্রেমের তরংগিত জোয়ার।

ঠিকমত হিসেব ক'রে দেখলে আমরা দেখব যে সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যের অর্ধেকের বেশি কবি উৎসর্গ করেছেন নারীকে। বিশ্বের এই সেরা কাব্যশিল্পী যে অভাবনীয় নন্দন কানন সাজিয়ে রেখে গেছেন, তার অর্ধেক ফুল তিনি পূজো করেছেন নারীকে। হয়ত' এক চতুর্থাংশ দিয়েছেন দেবতার পায়ে, আরেক চতুর্থাংশ সাধারণ ভাবে মানুষ ও এই সুন্দরী পৃথিবীকে। রবীন্দ্রনাথের গানকে যেমন ভাগ করা হয়েছে পূজা, প্রেম এবং প্রকৃতি প্রধানতঃ এই তিন ভাগে, ঠিক তেমনি তাঁর সমগ্র সাহিত্যকেও ভাগ করা চলে এই তিন ভাগে। আবার এই ভাগের মধ্যে সীমা রেখা টানাও কঠিন। প্রেমের

যমুনা যে কোনখানে মিশে গেছে পুজোর গংগা ধারার সংগে তার নীল ও সাদার রেখা অনেক সময়েই স্পষ্ট ক'রে আলাদা করে দেখা যায় না। যা ছিল প্রেম অনেক সময়েই তা পুজো হ'য়ে উঠেছে। তাই অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের লেখায় কোনটা যে তাঁর নারীর পায়ে নিবেদন, আর কোনটা দেবতার পায়ে এ যেন বোঝাই যায় না। কবির মতে প্রেমই দুঃখের আঘাতে পূজা হয়ে ওঠে। কবি লিখেছেন—

"পূজা মূর্ত্তি ধরি প্রেম দেখা দিল
দুঃখের আলোতে।"

প্রেম মিলন বিলাপে বাধা পেলেই বিরহ—দুঃখের মধ্যে পুজোরূপে পরিণত হয়ে ওঠে, একথা কবি তাঁর অনেক রচনায় দেখিয়েছেন। তার উল্লেখ পরে করব।

কিশোর কবির চোখে নারী কি মোহিনী হয়েই না দেখা দিয়েছে। কিশোর কবির চোখে সারা পৃথিবীটা যেন নারীর স্বপ্নে ছাওয়া। কবির কৈশোর কাব্য পড়লেই একথা বোঝা যায়। নারী তার ইংগিতে ভংগিতে, হাস্যে লাস্যে, বিলাস মূর্চ্ছনায়, যে সুর-তরংগ তুলে বয়ে চলেছে, তার মাঝখানে মুগ্ধ কবি যেন দিশাহারা হ'য়ে পড়েছেন। কবি শুনেছেন আকাশে বাতাসে যেন কোন গোপন প্রেমের প্রলাপ ভেসে বেড়াচ্ছে। কবির জীবন কুঞ্জে যেন কার, গোপন পদপাত প্রতিক্ষণে কবিকে প্রতীক্ষায় আকুল ক'রে তুলেছে. যেন কে কুঞ্জবিথীর ছায়াস্তরাল থেকে এখনি বেরিয়ে আসবে কবির মুগ্ধ চোখের সামনে। কবিদের সম্বন্ধে এই কথাই লিখেছেন বার্ণাড শ'। কবিদের সারা জীবন নারীর স্বপ্নেই ছাওয়া। শ' তার 'ক্যানডিডা' বইতে যে কবির ছবি এঁকেছেন সে নারীর মোহিনীতে মুগ্ধ। কিন্তু তার মুগ্ধতা পূজার সমধর্মী। নারীকে সে দুল হাতে স্পর্শ করতে ভয় পায়। একলা ঘরে বসে নারীকে দেবীর মত দেখে, তার পায়ের কাছে সে নিজের স্থান নেয়, তার বেশী এগোতে সে যেন ভরসা পায় না। নারী যেন মহিমান্বিতা রানী—তার হাতে যেন রয়েছে রাজদণ্ড, তাই তার যেন ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে যাওয়া চলে না, যেন তার বেশী কাছে গেলে নারী তার রাজদণ্ড উদ্যত ক'রে কবিকে শাস্তি দেবে। এই দূরের পূজা এই হ'ল নারীর প্রতি কবির মানস। নারীর প্রতি যে মোহ ইতর মানুষকে চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট করে, কবিকে তাই নিয়ে যায় পূজার ধূপগন্ধি পবিত্র লোকে। তাই সাধারণের বেলায় যে নিয়ম কবির বেলায় সে নিয়ম খাটে না। সাধারণ মানুষের বেলায় আমরা চাই প্রেমের একনিষ্ঠতা, কারণ সেখানে এই নিষ্ঠা নিছক পূজা নয়, এর মধ্যে রয়েছে একটা স্থূলতার দিক, সেখানে একনিষ্ঠতা না থাকলে সমাজ এবং স্বাস্থ্য কোনটাই রক্ষা পায় না। কিন্তু প্রেম যেখানে দূরের পূজা যেখানে ভাবের বিলাস, সেখানে সে নিত্য নূতন পূজারতিতে বিলসিত হ'তে থাকলেও নিন্দনীয় নয়। ঠিক যেমন নিত্য নূতন প্রভাতে, নিত্য নূতন সূর্য্যের আলোয়, নূতন নূতন ফুল ফুটে ওঠে। কবির মানস সরোবরে যে অজস্র কাব্যের ফুল ফুটে উঠেছে এবং যা তিনি নিবেদন করেছেন নারীর পায়ে, তার প্রেরণা যোগান দিয়েছে একজন কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। কবির জীবনে যে একাধিক সূর্যোদয় ঘটেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সূর্যোদয়ে মানস সরোবরে যে পদ্ম ফুটে ওঠে, সেদৃশ্যের যত সৌন্দর্য্য এবং উদারতা, নারীর প্রতি কবির পূজা ততই উদার সুন্দর এবং পবিত্র।

কিশোর কবির গানের প্রথম যে সুর তারই মধ্যে বেজে উঠেছে নারীর আগমনীর সুর। কিন্তু তখনো নারী কবির কাছে স্পষ্ট রূপে দেখা দেয়নি। শুধু কবির জীবন ছেয়ে জেগে উঠেছে এক গভীর প্রত্যাশা। কিশোর কবি লিখেছেন—

"ছায়ায় আলোকে নিঝরের ধারে
কোথা কোন গুপ্ত গুহার মাঝারে
যেন হেথা হোথা কে কোথায় আছে
এখনি দেখিতে পাব।
যেন রে তাদের চরণের কাছে—
বীণা লয়ে গান গাব।"

কবি লিখেছেন "তাদের চরণের কাছে।" কবি বহু বচন ব্যবহার করেছেন, কারণ এখনো নারী—কবির চোখে কোন এক বিশেষ ব্যক্তি-রূপ গ্রহণ করেনি। এখনো কবির কামনা সাধারণ ভাবে নারীকে ঘিরে ঘিরে ফিরেছে। নারীর প্রতি কিশোর কবির প্রেম পূজারই তুল্য। তাই কবি নারীর চরণের কাছে ব'সে বীণা

বাজাতে পেলেই খুশী—। কিন্তু তার পরে ধীরে ধীরে দেখা যায় যে শুধু দূর থেকে পূজো করেই কবি খুশী থাকতে পারেননি। কবির মনের কথা ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়েছে। কৈশোরের পূজোর আবেগ, যৌবনের প্রেমে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তখন আর কবি বহুবচন ব্যবহার করেন নি, তখন কবির কামনা তাদের জন্যে নয়, কোন একজনকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপে কাছে পাওয়ার কামনা কবির মনে জেগেছে। কবি তাকে নিজের পাশে পেতে চান, নিবিড় ভাবে।

পুরুষের প্রেমের প্রথম আকৃতি আপনাকে পূজার মধ্যেই প্রকাশ করতে চায়। প্রকৃত পৌরুষের তাই ধর্ম। তাই ইয়োরোপের প্রণয় নিবেদনের প্রথা পুরুষ নতজানু হয়ে নারীর পদতলে প্রণয় নিবেদন করে। তেমনি কবিও নারীর চরণের কাছেই বীণা নিয়ে গান গেয়ে তাকে প্রথম প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার পরে কবির কামনা প্রকাশ পেয়েছে নারীর অপর ও নিবিড়তর নিকটতর সংস্পর্শের ছন্দে। কবি লিখেছেন—

"চাঁদের আলোতে দখিন বাতাসে,
কুসুম কাননে বাঁধি বাহুপাশে,
শরমে সোহাগে মৃদু মধু হাসে,
জানাবে না ভালোবাসা ?
আমার যৌবন কুসুম কাননে
ললিত চরণে বেড়াবে না—।
আমার প্রাণের লতিকা-বাঁধন
চরণে তাহার জড়াবে না ?

এখানে বাহুপাশের নিবিড় বন্ধনের সংগে সাথে রয়েছে চরণ বন্দনার ধুয়া। সত্যিকথা বলতে কবির সমস্ত জীবনের প্রেমের মধ্যে এই দুটি ভাবই পাশাপাশি বিরাজ করেছে।

[ক্রমশঃ]

নীল বিদ্রোহে বঙ্গনারী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ, নারী আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা যে যুগে ঘটিয়াছিল, যে যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একতার সমষ্টিবদ্ধ হইয়া পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, সে রকম যুগ দেশের ইতিহাসে কতবার আসে ? এই যুগে সমুদয় বাংলা দেশে নবজাগরণের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল। তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ সত্ত সমাপ্ত হইয়াছে। ইংরেজগণ এই অভ্যুত্থানকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিলেও ইহা স্বাধীনতা সংগ্রাম নামেই পরিচিত হইবার যোগ্য। ইংরেজ ঐতিহাসিক বাকল্যাণ্ড লিখিয়াছেন— "বাঙ্গালা সরকারের অধীন এমন একটা জেলা ছিল না যাহা প্রত্যক্ষ বিপদের ভিতর দিয়া যায় নাই।" ইংরেজ ঐতিহাসিক কে (Kay vol I-p498) লিখিয়াছেন—"এই সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাব সামান্য অগ্রণী হইলেই বহরমপুরের সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত এবং মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নবাবকে পুরোভাগে রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে হাত মিলাইত ; ফলে সমুদয় বাঙ্গলায় আগুন জ্বলিয়া উঠিত।"

প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ মাত্র সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমসাময়িক সংবাদ পত্র "হিন্দুপেট্রিয়ট" (২১শে মে, ১৮৫৭) হইতে জানা যায় "এই বিদ্রোহ আর বিদ্রোহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা এখন ব্যাপক বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছে, সিপাহীরা যেমন তাহাদের জীবনের সর্বস্বার্থ উৎসর্গ করিয়াছে। দেশবাসীরাও সেইরূপ তাহাদিগকে মহান্ জাতীয় আদর্শরূপে পবিত্রব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ শহীদরূপে গণ্য করিয়াছে, বেসামরিক জনসাধারণ এই বিদ্রোহে সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে

এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে।...ভারতবাসীদের মধ্যে এমন কেহ নাই, পরাধীনতার ক্ষোভ ও তাহার পীড়ন যে সম্যক উপভোগ না করে। সে ক্ষোভের একমাত্র কারণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব এবং সে ক্ষোভ বিদেশী আধিপত্যের সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছেদ্য। ভারতীয় শিক্ষিতদের মধ্যে প্রত্যেকেই মনে করেন যে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই বিদেশীদের আধিপত্যের ফলে খর্ব্ব হইতেছে।" সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও এই পটভূমিকায় সমগ্র বাংলাদেশে আরম্ভ হইয়াছিল "নীল বিদ্রোহ।"

রঞ্জক দ্রব্য হিসাবে নীলের প্রয়োগ খুব ব্যাপক; ইহা পৃথিবীর সমস্ত দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধুনা ইহা রাসায়নিক গবেষণাগারে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে নীল নামীয় একরূপ গাছ হইতে এই রং সংগৃহীত হইত। ভারতবর্ষে নীলের চাষ বহু পুরাতন, 'ইণ্ডিগো' নামেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী' ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া হইতেই নীলের চাষ করিতেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানী সাধারণ ভাবে সকলেই নীলচাষের অধিকার দিলেন। বাংলা দেশ এবং বিহারের কোন কোন অঞ্চল নীলচাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী ছিল। এই ব্যবসা এত লাভ জনক ছিল যে কোম্পানী অনুমতি দেওয়া মাত্রই শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায় বাংলাদেশে ও বিহারে এই ব্যবসা আরম্ভ করেন।

প্রথম দিকে ইংরেজ বণিকেরা নিজেরা নীলচাষে অগ্রসর হন নাই। দেশীয় জমিদারদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহাদের জমিতে তাঁহাদের প্রজাদের দ্বারাই চাষ করাইতেন। সাহেবরা সর্ব্বত্র নীলকুঠি স্থাপন করিয়া দেশীয় জমিদার ও জোতদারদের নিকট হইতে নীলের ফসল খরিদ করিয়া ঐ সকল কুঠিতে রঞ্জক দ্রব্য নিষ্কাষণ করিতেন। ক্রমে অধিকতর লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ও বিপুল আর্থিক বলে বলীয়ান হইয়া শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ নিজেরাই জমিদারী খরিদ করিয়া নীলের চাষ আরম্ভ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ও অন্য জমিদারদের প্রজাসাধারণকে দাদন দিয়া নীলচাষ করিতে বাধ্য করিতে থাকেন। শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের লোভ এতদূর বাড়িয়া যায় যে, অর্থ ও সামর্থ্যের বলে ইহারা ইচ্ছামত প্রজাদের উৎকৃষ্ট জমিতে মার্কাদিয়া (দাগ দিয়া) তাহাতেই নীলের চাষ করাইতেন। চাষীরা প্রয়োজনীয় আহার্য্য শস্য উৎপাদনের অধিকার, সময় ও সুযোগ পাইত না। দুই এক জন প্রজা প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলে নীলকর সাহেবরা অর্থের দ্বারা বশীভূত বুনো সাঁওতাল ও লাঠিয়ালদের দ্বারা শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রজাদিগকে পীড়ন করিতেন। এই ভাবে নীলকরদের অত্যাচার আরম্ভ হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতেই তাহা দরিদ্রদের পক্ষে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। নিজেদের ন্যায্য অধিকার দাবী করিতে গিয়া বহু প্রজার ভিটা মাটি উচ্ছন্ন হয় এবং তাহাদের সমর্থক বহু সংখ্যক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামবাসী অকারণে কুঠিতে কয়েদ হইয়া বিপন্ন হইত। স্থানীয় ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ অধিকাংশক্ষেত্রে ঘুষ ও অন্যান্য কারণে স্বদেশীয় কুঠিয়ালদের পক্ষ অবলম্বন করাতে প্রজাদের পক্ষে ন্যায় বিচার পাইবার সুযোগ ছিল না। ফলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন অবাধে চলিতে থাকে। ইহার ফলে সমুদয় বাংলাদেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষকগণ, বিশেষতঃ নীলচাষীদের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল এবং ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমুদয় বংলাদেশ জুড়িয়া নীলচাষীগণ নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র "নীলদর্পণ নাটক" প্রকাশ করিলেন। তাঁহার নাটকে শাসন ও শাসিতের নিগূঢ় সম্বন্ধ, দেশের অর্থনৈতিক শোষণের কুৎসিত রূপ সভ্যনাসিক মানুষের বর্ব্বর অন্তর সর্ব্বপ্রথম উদ্ঘাটিত হইয়া আন্দোলনে অতুলনীয় বেগ সঞ্চার করিল।

এই সময় বাংলাদেশের শুধু পুরুষই নহেন অনেক রমণীও নীলকরগণের অত্যাচার দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যে সকল বীরাঙ্গণা নীলবিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ বিস্মৃতা। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের পরিচয় সংগ্রহ করিতেও উৎসাহবোধ করেন নাই। কিন্তু "নীলদর্পণে"ই ইহার ইঙ্গিত আছে। নাটকের নায়ক নবীনমাধব বলিতেছেন—

"পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপট চিত্ত, বিবাদ বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখনও গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারীর নামে কম্পিত হন,—মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না।" বস্তুতঃ নীলবিদ্রোহে বাংলার নারীসমাজের অবিস্মরণীয় অবদান আছে এবং সে অবদান যে কোন দেশের রমণীসমাজের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

বাংলার ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক গ্র্যাণ্ট ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতা হইতে পাবনা যাইতেছিলেন, তখন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ কৃষক নদীর দুইধারে সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট সুবিচারের দাবী জানাইয়াছিল। এই বিরাট জনসমাবেশের কথা উল্লেখ করিয়া গ্র্যাণ্ট সাহেব নিজেই লিখিয়াছেন—

"যাইবার পথে অসংখ্য কৃষক বিভিন্নস্থানে সমবেত হইয়া দাবি জানাইতেছিল যে, গভর্ণমেণ্ট আদেশ জারি করিয়া নীলচাষ বন্ধ করিয়া দিন।...এমন কি গ্রামের স্ত্রীলোকগণও স্বতন্ত্রভাবে সমবেত হইয়াছিল।...তাঁহারা সকলেই শৃঙ্খলার সহিত সম্ভ্রমশীলতা ও কঠোর সংকল্পনিষ্ঠারও পরিচয় দিতেছিলেন। যদি কেহ অনুমান করেন যে সহস্র সহস্র নরনারী ও বালকবালিকাদের এইরূপ মনোভাব প্রদর্শনের কোন গভীরতর তাৎপর্য্য নাই, তাহা হইলে তাঁহারা মারাত্মক ভুল করিবেন, (Buckland—vol I-p 192)। গ্র্যাণ্ট সাহেব নীলচাষ বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

নীলবিদ্রোহ কালে বাংলার কৃষকরমণীগণ যে কি প্রকার সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে "ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড"-এ প্রকাশিত কৃষ্ণনগরের জার্ম্মান পাদ্রী বমভাইসের একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"বল্লভপুরের প্রজাগণ নীলচাষ করিতে অসম্মত হওয়ায় নীলকর সাহেব লাঠিয়াল পাঠাইয়া তাহাদের গ্রাম আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু নীলকরের আক্রমণ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কারণ নীলকরের লাঠিয়ালগণ আক্রমণ প্রতিরোধে দৃঢ়সংকল্প কৃষকবাহিনী দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল।" ইট-পাটকেল, গাছের বেল, পিতলের থালা, এবং ভালভাবে পোড়ানো ভাঙ্গা কিম্বা আস্ত মাটির বাসনপত্রাদি লইয়া কৃষকগণ লাঠিয়ালদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইল। "বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মেয়েরা এই সকল অস্ত্র প্রয়োজন মত ভালভাবেই ব্যবহার করিতে জানে। এইদিন লাঠিয়ালগণ যখন দেখিতে পাইল যে মেয়েরা এই সকল অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, তখন তাহারা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল" (হিন্দু পেট্রিয়ট হইতে উদ্ধৃত)।

শুধু তাহাই নহে; নীলবিদ্রোহ উদ্বোধিত করিবার জন্য বাংলার অনেক রমণী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতেন। নীলকর ষড়যন্ত্রে নীল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মেঘাই সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠন করিবার জন্য যে গ্রামে গ্রামে অবিশ্রাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, ইহা আজ অনেকেই অবগত আছেন।

ভাওয়ালের গ্রামে গ্রামে কৃষকগণ আজিও নীলকর দমনের জন্য রাণী সিদ্ধেশ্বরীর নামে গান গাহিয়া থাকে। ঢাকার প্রসিদ্ধ নীলকর ওয়াইজ সাহেব ভাওয়াল জমিদারীর সাত আনা অংশ অপর সরিকের নিকট হইতে খরিদ করিয়া বলপূর্ব্বক জয়দেবপুরের নিকটবর্ত্তী অংশ দখল করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। ওয়াইজ সাহেবের ত্রাসে ঢাকা জেলা কম্পিত ছিল।...১২৪৫ সালে বিবাদ চরমে উঠিল। সিদ্ধেশ্বরী চৌধুরাণী প্রজার কান্না ও নীলকর সাহেবের লাঠিয়ালদের অত্যাচার দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। কোচবংশী ও অন্যান্য লাঠিয়াল সংগৃহীত হইল। ভগীরথ পাঠান নামে ঢাকার একজন প্রসিদ্ধ পালোয়ান চৌধুরাণীর পক্ষে দলপতি হইল।...তারারিং কাছারীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে 'শিবের আক্কা' নামক পুষ্করিণীর উত্তরে মাঠের মধ্যে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ওয়াইজ সাহেব পরাভূত হন। কিন্তু পুনরায় নবোদ্যমে নীলচাষে ব্রতী হন। ইহার ফলে সিদ্ধেশ্বরীর সহিত ওয়াইজ সাহেবের আরও কয়েকটি সংঘর্ষ হয়; সে সকল সংঘর্ষে সিদ্ধেশ্বরীরই জয় হইয়াছিল। ঢাকা হইতে নীলকরের অত্যাচার বিলুপ্ত হইয়া আসিল।

অন্যান্য জেলার ন্যায় পাবনা জেলাতেও নীলকুঠি ছিল এবং এখানেও নীলকরগণ প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করে।

এই সময় নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য পাবনার জমিদারগণ প্রজাদের পক্ষগ্রহণ করেন, স্থানীয় পল্লীকবির রচনায় তাহার পরিচয় আজিও পাওয়া যায়—

মুল্লুকের গুড়াগুড়ি কর্তার গুরু করি
যা করেন গুরু ;
শুন কুঠালের সমাচার কালিদহে কুঠি যার,
ক্যানি সাহেব কাবস্থার কল্প শুরু।
সে আউসের জমিতে বোনে নীল, সব রায়তের হল মুস্কিল,
সব রায়তের মনে অবিস্তর ;
দিলেতে পাইয়া ব্যথা, নালিশ করে কলিকাতা,
গবনাল বলে ফিরে যাও ঘর।

* * *

তারাসের ছোটবাবু কুঠাল দেখে বড়ই কাবু
ফরিদপুর সে দিয়াছে ইজারা।
বড় তরফ বনয়ারীলাল, যার ডঙ্কা চিরকাল ;
সাহেব মারে ওল্ল ছারখার।
ডামরা আছে ছাত্র সরকার, করতে দেয়না নীলের কারবার
লাঠি ধরে ডেংরার পচা রায়,
রাজাপুরের বড়রাণী মা বলে ডাকে যাবে কানী
নীলের কুঠি উঠায়া ফেলায়।" ইত্যাদি

এখন সদরপুর নদীয়া জেলার অধীন (পূর্ব পাকিস্থানের কুষ্টিয়া জেলা); কিন্তু নীলবিদ্রোহের সময় সদরপুর পাবনা জেলার অধীন ছিল। সদরপুরের জমিদার-পত্নী প্যারীসুন্দরীর নাম আজও নীলকর দমনের জন্য যশোহর ও নদীয়া জেলায় প্রচারিত হইয়া থাকে। অত্যাচারী নীলকর কেণী সাহেবকে শায়েস্তা করিবার জন্য তিনি একবার ইংরাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যুদ্ধে প্যারীসুন্দরীর লোকজন, দারোগাকে বল্লমে বিদ্ধ করিয়া লইয়া সন্তরণপূর্ব্বক নদী পার হইয়া কোথায় চলিয়া গেল কেহ দেখিতে পাইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট মূর্চ্ছিত হইলেন। পুলিশ সাহেব অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু কেণী সাহেব রক্ষা পাইলেন না। প্যারীসুন্দরীর লোকেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাণীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। আর নীলের চাষ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং প্যারীসুন্দরীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া কেণী সাহেব মুক্তিলাভ করেন।

নীলকরগণের অত্যাচার দমন করিবার জন্য পাবনা জেলায় রাজাপুরের রাণীও যথেষ্ট বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া সামাজিক ইতিহাসে লিখিত আছে। পল্লী কবিতাতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নীলকরগণের অত্যাচার দমনে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। সহৃদয় লং সাহেব কারাবরণ করিয়া স্বজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বাঙ্গালী জাতির মনে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শিশিরকুমার ঘোষ নীলবিদ্রোহকে "বাংলার প্রথম বৈপ্লবিক সংগ্রাম" বলিয়াছেন। এই সংগ্রামে যে সকল বঙ্গবীরাঙ্গনা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সকল বঙ্গবীরাঙ্গনা নীলকরগণের অত্যাচার দমন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী কাল সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে। জনপ্রবাদরূপে যাহা এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে এখনও তাহা সংগ্রহ না করিলে আর কোনদিনই সে ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। বাংলাদেশের যে সকল অংশে নীলবিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এখন পূর্ব্বপাকিস্থানের অন্তর্গত। তাহাদের সহিত রাজনৈতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কোনদিনই ঘুচিবার নয়। উভয় অংশের বাঙ্গালীকে সেইজন্য এ ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া আসিতে হইবে। নীলবিদ্রোহ "বাঙ্গালীর প্রথম বৈপ্লবিক সংগ্রামে বঙ্গরমণীর যথাযোগ্য অবদানের বিবরণ সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইলে তবেই বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হইবে।

একজন প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরিয়ান

সুষমা মৈত্র

শৈশবে যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ গড়ে ওঠে পরবর্তী জীবনেও যে তার অনেকখানি 'প্রভাব' পড়ে—এ প্রায়ই দেখা যায়। মেরি ভার্জিনিয়ার জীবনেও এমনি একটি প্রভাব পড়ে, যার ফলে লাইব্রেরী তাঁর জীবনে ধ্যান জ্ঞান হয়। তিনি লাইব্রেরিয়ান হন। মাত্র ছ'বছর বয়স থেকেই তিনি লাইব্রেরীর সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন।

ভার্জিনিয়ার মা একজন স্কুল টীচার ছিলেন। স্কুলটি ছিল ভার্জিনিয়ার অবস্থিত।' ঐ স্কুলে কোন লাইব্রেরী ছিলনা। কিন্তু ভার্জিনিয়ার মা দেখলেন, একটি স্কুল আছে লাইব্রেরী নেই এ হতেই পারেনা। স্কুলে লাইব্রেরী অত্যাবশ্যক মনে করে তিনি 'তাঁর ছোট্ট মেয়ে মেরি ভার্জিনিয়াকে প্যারাম্বুলেটরে বসিয়ে শহরময় ঘুরে ঘুরে লাইব্রেরীর জন্য চাঁদা তোলেন। শহরের গণ্যমান্য বিশেষতঃ ধনিক ও বণিক শ্রেণীদের তিনি একথাটা বোঝাতে চেয়েছেন যে, একটি ভাল লাইব্রেরী ছাড়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন মানেই হয় না। বস্তুত, তাঁর সে আবেদনে ধনী ব্যবসায়ীরা বিশেষ ভাবে সাড়া দেন। তাঁদের আনুকূল্যে সে লাইব্রেরী গড়েও ওঠে।

শৈশবের এই অভিজ্ঞতা থেকে ভার্জিনিয়া বুঝেছিলেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে লাইব্রেরী অপরিহার্য এবং বড় হয়ে তিনি লাইব্রেরিয়ান হবেন বলেও মনস্থ করেন। আর সেই থেকে লাইব্রেরী তাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি আমেরিকার মত একটি বিরাট দেশের স্কুল, কলেজ পাবলিক লাইব্রেরীর সমগ্র সংস্থার প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্তা হন।

মিস গেভার বলেন, আমার মা-ই আমার পথ-প্রদর্শিকা। নাহলে আমি এ পেশায় আসতাম কিনা সন্দেহ ছিল। তাঁর মা এখনও জীবিতা। বয়স ৮৫ বছর। বর্তমানে মায়ে-ঝিয়ে একই বাড়ীতে বাস করেন।

মিস গেভার দীর্ঘাঙ্গী। ছিমছাম—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেয়ে। তাঁর ব্যবহারও ভারী মিষ্টি। লাইব্রেরিয়ান হতে হলে যে বিনয়—সৌজন্য—পাঠক দের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে দেওয়া দরকার সে সব সদ্গুণেরই তিনি অধিকারিণী। কোথায় কার কি প্রয়োজন, কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে সবদিকেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও অনু—সন্ধিৎসা।

এই লাইব্রেরিয়ান পেশাকে তিনি তাঁর জীবনে ধ্রুব জ্ঞানে গ্রহণ করেন। সদা সর্বদাই কিসে এর উন্নতি হয়—কি করে নতুন নতুন পরিকল্পনা করে একে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাওয়া যায়—মন প্রাণ ঢেলে সেই চেষ্টায় তিনি করে চলেছেন।

সুরুতে অবশ্য তিনি ইংরেজী সাহিত্যের টীচার হবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন। একজন্য তিনি ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে ১৯২৭ সালে র‍্যানিডলপ-মেকন উইমেন কলেজ থেকে পাশও করেন। এই কলেজটি ভার্জিনিয়ার

লাইপ্সবারজ শহরে অবস্থিত। পড়াশুনা তাঁকে খুবকষ্টের মধ্য দিয়েই করতে হয়। আর্থিক টানাটানির জন্য তাঁকে এই পড়াকালীন দু'টো চাকরি করতে হয়। একটি হল ওয়েটেস্ আর একটি লাইফ গার্ডের চাকরি। এই লাইফ গার্ড চাকরিটি আমেরিকায় বহুল প্রচলিত। অনেক কুমারী মেয়ে এই চাকরি করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করেন।

এর পর তিনি তাঁর জন্মস্থান ভার্জিনিয়ার ডেনভিলের এক স্কুলে শিক্ষিকার কাজ নেন। এখানেই হঠাৎ তাঁর লাইব্রেরিয়ান হবার সুযোগ আসে। তিনি এই স্কুলেরই লাইব্রেরিয়ান পদে বহাল হন। এই কাজে পারদর্শিনী হবার জন্য তিনি ওয়াশিংটনের ডি, সির পাবলিক লাইব্রেরীতে শিক্ষানবীশ নিযুক্তা হন। এখানে তিনি লাইব্রেরীয়ান হবার মত সব রকম জ্ঞান সঞ্চয় করেন। একটি লাইব্রেরী পরিচালনা করতে হলে যে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা-ও তিনি অর্জন করে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন।

ডানফিল্ডের স্কুল মাষ্টারী ছেড়ে তিনি নিউ ইয়র্কের কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ে, লাইব্রেরী সায়েন্সে যথাক্রমে মাষ্টার ডিগ্রি ও ফেলোশিপ লাভ করেন।

তারপর ভার্জিনিয়াতে রাজ্যব্যাপী লাইব্রেরী করার যে পরিকল্পনা হয় তিনি তাঁর ডিরেক্টর নিযুক্তা হন। পরে নিউইয়র্ক স্কার্সডেলের সেকেণ্ডারী স্কুলে লাইব্রেরিয়ান পদটি পান।

আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন বুলেটিনে, মিস্-গেভার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর সহকর্মী লিখেছেন, মেরি গেভারই এই লাইব্রেরীর নিয়ম কানুনগুলিকে কেবল মাত্র আইনের নিগড়ে না বেঁধে যাতে এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়, উন্নতিলাভ করে সেদিকেই ছিল তার সজাগ দৃষ্টি। প্রচলিত নিয়ম কানুনের বেড়া ডিঙিয়ে একে তিনি এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে গবেষণা করে চলেছেন। বিশেষ করে স্কুল লাইব্রেরীগুলির উন্নতির দিকে নজর খুব বেশী। কারণ কি করে ধাপে ধাপে পড়া শুনা করতে হয় এবং তা'থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হয় স্কুল হতেই তার হাতে খড়ি ভালভাবে ছাত্র ছাত্রীদের না দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়না। স্কুল কলেজের লাইব্রেরীগুলির এদিক দিয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

ভবিষ্যতে লাইব্রেরীগুলি যাতে উন্নতি সাধন করে —তার জন্য তিনি বিভিন্ন লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানদের নিয়ে একত্রে বসেন এবং তাদের মতামত নেন। এ কাজে তার নিরবচ্ছিন্ন ঔৎসুক্য ও কর্মপ্রচেষ্টা এত প্রবল যে, যে, গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি ভার্জিনিয়ার ইউনিভারসিটিতে লাইব্রেরী সায়েন্সে পরিদর্শক শিক্ষিকার কাজ করেন এবং জর্জিয়ার এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়েও পরিদর্শিকার কাজ নেন।

১৯৪২ সালে তিনি কলেজের লাইব্রেরিয়ান হন। টিনটনে নিউ জারসি ষ্টেট টীচারস কলেজে প্রথমে লাইব্রেরিয়ান পরে এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর নিযুক্তা হন। ১৯৫৪ সালে তিনি রুডগারস ফ্যাকাল্টি তও যোগদান করেন।

আমেরিকার—লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আগামীতে লাইব্রেরীর উন্নতি ও তার কর্মীদের ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা, লাইব্রেরীর আইন কানুন পরিবর্তন পরিমার্জনা ইত্যাদি করা হবে। লাইব্রেরী শিক্ষকের মতে যদি নাকি লাইব্রেরীর উন্নতি সাধন করতে হয়—তাহলে সব চাইতে প্রয়োজন তার নিজস্ব বাড়ী ও উপযুক্ত সাজ সরঞ্জাম আর সম্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী। সে কেরাণীই হন বা লাইব্রেরিয়ানই হন। অর্থাৎ লাইব্রেরী চালনায় জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ তাদের বুদ্ধিমত্তার ওপরই সুষ্ঠু লাইব্রেরী পরিচালনা অনেকখানি নির্ভর করে।

মিস্ গেভার বলেন, কোন নিষ্ক্রিয় কর্মীকে লাইব্রেরী পরিচালনার স্থান দেওয়া উচিত নয়। বস্তুত, লাইব্রেরীই হচ্ছে একটা জাতির শিক্ষা ও জ্ঞানের ধারক ও বাহক। তার পরিচালনায় আলস্যের স্থান নেই। তার কর্মীরা হবে সদাই চটপটে, উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন, বিনয়ী, ভদ্র—আর পাঠকদের সাহায্যে সর্বদা প্রস্তুত হয়েই থাকবে।

মিস গেভার বলেন কে না জানে একটি ভাল লাইব্রেরী নানাভাবে দেশের দশের উপকার করতে পারে। নানারকম বই-এর মাধ্যমে এর পাঠকরা যে জ্ঞান আহরণ করে তার ফল সুদূর প্রসারী। ইহা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। মূলতঃ যে সব ছেলেমেয়ে অর্থের অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে না—এই লাইব্রেরী তাদের নানাভাবে সাহায্য ক'রে তাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারে।

মিস্ গেভার লাইব্রেরী সংক্রান্ত যেখানে কোন মিটিং হচ্ছে জানতে পেলেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। লাইব্রেরী বিষয়ক যাবতীয় ব্যাপারে তাঁর এত প্রচুর উৎসাহ যে, তার পরিচালনা পদ্ধতিকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে উন্নততর করতে তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই।

ফিনল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেলসিঙ্কিতে, পরে হেগে আমেরিকান লাইব্রেরিয়ান এ্যাসোসিয়েশানের আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের যে কনফারেন্স হয়, তিনি আমেরিকান লাইব্রেরিয়ান এসোসিয়েশনের তরফ থেকে সেখানে যোগদান করেন। এছাড়া অন্যান্য দেশেও তিনি এ ব্যাপারে ভ্রমণ করেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা বিতরণ করেন। অন্যদেরও টানেন। ১৯৫০ সালে ছয় মাস যাবৎ তিনি ইরাণে কাটান, ইরাণ তেহরাণে আমেরিকার ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের লাইব্রেরী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে। এ, এল, এর প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন।

এ ছাড়া অবসর সময়টুকু তিনি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেন। ছোটবেলা থেকে তিনি পিয়ানো বাজান। কলেজে তো পিয়ানো-বাদিকা হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। আর পড়ার ব্যাপারে তিনি সর্বভুক্। যা পান তাই পড়েন, হোক সে সাময়িকী, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী বা রহস্য উপন্যাস। মা মেয়ে মিলে একত্রে একটি বাড়ীতে আছেন এবং নিজেরাই নিজেদের হাতে রান্না-বান্না থেকে যাবতীয় কাজ করেন।

এ সব সত্ত্বেও মিস গেভারের নিজের পেশায় প্রচুর উৎসাহ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব নেই। কি স্কুল কি কলেজ সব লাইব্রেরীরই প্রেসিডেন্ট তিনি, এ এল, এ-র চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর কাজ হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার্থে ভাল ভাল বই-এর সংগ্রহশালা তাদের সামনে রেকর্ড ও ফিল্ম মাধ্যমে উপস্থিত করা। তাছাড়া যে সব নামী বই, বহুল প্রচারিত সংগ্রহ লাইব্রেরীতে আছে সে বইগুলির নামও তাঁর কণ্ঠস্থ।

এই লাইব্রেরীয়ান পেশায় মিস্ গেভারের নাম দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে তিনি রুডগার রিসার্চ কাউন্সিল এ্যাওয়ার্ড পুরস্কার পান। ছোট শিশুদের স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের এবং পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নতি সাধনের জন্য তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

লাইব্রেরী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী হিসাবে International Library Science Honour Society তাঁকে হারবার্ট পুটনাম অনার্স এওয়ার্ড দেন। এই পুরস্কার সৃষ্টি হয় ১৯৩৯ সালে এবং দুইজন মাত্র পুরস্কার পান, তার মধ্যে মিস্ গেভারকে ১৯ ৩ সালে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

সুপর্ণা দেবী

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে রূপচর্চ্চার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে সোনা-রূপা-তামা-পিতল প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুনির্ম্মিত এবং সুদৃশ্য-মূল্যবান বিবিধ রত্ন-মণি-মাণিক্য, মুক্তা-প্রবাল-গজদন্তখচিত সৌখিন-অভিনব নানা রকমের অলঙ্কার ব্যবহারের বহুল-রীতি প্রচলিত ছিল—সে বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই মোটামুটি পরিচয় দিয়েছি। তৎকালীন ভাস্কর্য্য-চিত্রে, কাব্য-সাহিত্য ইতিহাস ও শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারাদির যে সব তথ্য-বিবরণ পাওয়া যায়, তারও উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক-যুগেই ভারতে অলঙ্কারের বিশেষ বাহুল্য হয়েছিল। সেই আমলেই 'খাদি' বা হস্ত ও পদের অলঙ্কার এবং 'মালা' বা হার ব্যবহারের রীতি সুপ্রচলিত হয়। ভারতের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ 'অমরকোষে' উল্লিখিত তৎকালীন সমাজের নরনারীদের অঙ্গশোভার উপযোগী বিবিধ অলঙ্কারাদির সুদীর্ঘ তালিকা ছাড়াও, সুপ্রসিদ্ধ-শাস্ত্রকার কৌটিল্য বা চাণক্য-পণ্ডিত রচিত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের কোশ-প্রবেশ্য রত্ন-পরীক্ষা ২-১১ অধ্যায়ে সমসাময়িক-যুগের আরো কয়েকটি বিশেষ ধরণের 'হার' বা 'কণ্ঠমালার' বিবরণ মেলে। যেমন—

১। ইন্দ্রচ্ছন্দ ('ষষ্টীনামষ্টসহস্রমিন্দ্রচ্ছন্দঃ')—অর্থাৎ, ১০০৮ নরী এক-ধরণের হার ;

২। বিজয়চ্ছন্দ—অর্থাৎ, উপরোক্ত কণ্ঠমালার অর্দ্ধেক (৫০৪ নরী) নরী আরেক ধরণের হার ;

৩। অর্দ্ধহার—অর্থাৎ, ৬৪ (চতুঃষষ্টি) নরী হার ;

৪। রশ্মিকলাপ—অর্থাৎ, ৫৪ নরী হার ;

৫। গুচ্ছ—অর্থাৎ, ৩২ নরী হার ;

৬। অর্দ্ধগুচ্ছ—অর্থাৎ, ২৪ নরী হার ;

৭। নক্ষত্রমালা—অর্থাৎ, ২০ নরী হার ;

৮। মাণবক—অর্থাৎ, ২০ নরী হার ;

৯। অর্দ্ধ-মাণবক—অর্থাৎ, ১০ নরী হার ;

১০। শুদ্ধহার—অর্থাৎ, একই ধরণের নরীযুক্ত হার ;

১১। ফলকহার—মধ্যভাগে ৩টি (ত্রি-ফলক) অথবা ৫টি (পঞ্চ-ফলক) রত্ন-শোভিত বিশেষ ধরণের হার ;

১২। একাবলী—অর্থাৎ, ১ নরী হার ;

১৩। যষ্টি—অর্থাৎ, উপরোক্ত 'একাবলীর' মধ্যভাগে কোনো একটি-রত্ন শোভিত হার ;

১৪। রত্নাবলী—অর্থাৎ, বিভিন্ন ধরণের রত্নখচিত হার ;

১৫। অপবর্ত্তক—অর্থাৎ, পর্যায়ক্রমে স্বর্ণ, মণি ও মুক্তা সাজিয়ে গাঁথা হার ;

১৬। সোপান—অর্থাৎ, সারি দিয়ে সাজানো মুক্তার মধ্যে স্বর্ণ-সূত্রে গাঁথা হার ;

১৭। মণিসোপানক—অর্থাৎ, উপরোক্ত অলঙ্কারে মণি গাঁথা হার।

'অর্থশাস্ত্রে' উল্লিখিত এই হারগুলি ছিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজের রূপচর্চানুরাগী-সৌখিন নরনারীদের মস্তক, গ্রীবা, কণ্ঠ বক্ষোদেশ প্রভৃতি অঙ্গ-ভূষণের উপযোগী বিশেষ প্রিয় অলঙ্কার।

এছাড়া প্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে' এবং 'মার্কণ্ডেয়-পুরাণেও' আরো কয়েক রকম হার বা মালার বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—'মহাভারতের' বনপর্ব্বে বর্ণিত 'নিষ্ক' এবং 'মার্কণ্ডেয়-পুরাণে' উল্লিখিত 'নাগহার'। পুরাকালের 'নাগহার' সম্বন্ধে অধুনা বিশেষ কোনো হদিশ না মিললেও, প্রাচীন যুগের 'নিষ্ক' হারের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে আজো প্রচলিত ও সমাদৃত সোনার মোহরের সারি গাঁথা মালা বা হার দেখলে। তন্ত্রোক্ত যুগের তথ্য-বিবরণেও তৎকালীন বিভিন্ন অলঙ্কারাদির মধ্যে 'নাসাভরণ' বা নাকের গহনারও সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে ৬৪ উপচার প্রসঙ্গে তার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে।

তবে প্রাচীন যুগের ভারতীয় সমাজে প্রচলিত প্রায় সকল অলঙ্কারেই তখন মণি-রত্ন ব্যবহারের বহুল রীতি ছিল। কারণ, ভারতবর্ষ চিরদিনই রত্নগর্ভা, মণি মাণিক্যের দেশ। তাই, শুধু অলঙ্কার শোভনের উদ্দেশ্যেই নয়, রাজসিংহাসন, রাজপালঙ্ক প্রভৃতি ছাড়াও প্রাচীন আমলের প্রাসাদ-অট্টালিকা প্রভৃতি সজ্জার জন্য বিভিন্ন মণি-মাণিক-রত্নাদি ব্যবহারের সবিশেষ রেওয়াজ ছিল। কৌটিল্য রচিত প্রাচীন 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে সেকালের এই সব বিভিন্ন মণি-রত্নের উল্লেখ এবং সেগুলি পরীক্ষার উপায়ও বর্ণিত আছে। প্রসঙ্গক্রমে, আরো উল্লেখ করা চলে যে পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে সুরু করে পরবর্তী আমলের সুপ্রসিদ্ধ 'মৃচ্ছকটিক' নাট্য-সাহিত্যেও মণি-রত্ন শোভায় প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সৌখিন-জনগণের গৃহ এবং আসবাবপত্রাদি সজ্জারও বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, প্রাচীন 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে বিলাসিনী-নটী বসন্তসেনার গৃহসজ্জা প্রসঙ্গে বিদূষকের বর্ণনার উল্লেখ করা যায়। যথা—

…"সুবর্ণরত্নানং কর্ম্মতোরণানি, নীলরত্নবিনিক্ষিপ্তানি ইন্দ্রায়ুধস্থানমিব দর্শয়ন্তি ; বৈদূর্য্যমৌক্তিকপ্রবালক-পুষ্পরাগেন্দ্রনীল-কর্কেতরক-পদ্মরাগমরকতপ্রভৃতীন্ রত্নবিশেষান্ বিচারয়ন্তি শিল্পিনঃ। বধ্যন্তে জাত-রূপৈর্মাণিক্যানি, ঘটান্তে সুবর্ণালঙ্কারাঃ। রক্তসূত্রেণ গ্রথ্যন্তে মৌক্তিকাভরণানি।

ঘৃষ্যন্তে ধীরং বৈদূর্য্যাণি ছিদ্যন্তে শঙ্খাঃ, শাণৈর্ঘৃষ্যন্তে প্রবালকাঃ।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আরো পরিচয় মেলে যে শুধু সোনা, রূপা, তামা, প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু এবং রত্ন-মণি-মাণিক্যই নয়, অলঙ্কার রচনার কাজে শাঁখ বা শঙ্খ

ব্যবহারের রীতিও সেকালে সবিশেষ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন 'মহাভারত' গ্রন্থেও 'কম্বু' অর্থাৎ শঙ্খ ধরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনীষী বাৎসায়ন রচিত সুপ্রাচীন 'কামসূত্র' গ্রন্থেও শঙ্খকে মণি হিসাবে অন্যতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সুপণ্ডিত কৌটিল্যও স্বরচিত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে শঙ্খকে মুক্তার আকর হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার প্রসঙ্গে আরো যে সব তথ্য-বিবরণ পাওয়া যায়, স্থানাভাবের কারণে আপাততঃ সে আলোচনা সম্ভবপর নয়। কাজেই পরে পুনরায় সুযোগ-সুবিধা অনুসারে যথাসময়ে সে প্রসঙ্গালোচনা করা যাবে।

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

ইতিপূর্ব্বে সুতী, রেশমী এবং পশমী কাপড়ের উপর সৌখিন-সুন্দর ছাঁদে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের কাজ করে নক্সা-রচনার উপযোগী 'স্তেভরন্-ষ্টিচ্' (Chevron Stitch), 'রুমানিয়ান্ ষ্টিচ' (Roumanian Stitch) 'বাটন্‌হোল্-ষ্টিচ্' (Buttonhole Stitch) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি অনুসরণে সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার কলা কৌশল সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ দিয়েছি। এবারে পরিচয় দিচ্ছি —ঐ ধরণেরই আরেকটি এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প পদ্ধতি অর্থাৎ, 'কৌচিং' (Couching) রীতির। 'কৌচিং' পদ্ধতিটিতেও নানারকমের সৌখিন—অপরূপ এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজ করা যায়।

সূচীশিল্পানুরাগিণী যে সব মহিলা সচরাচর নিজের হাতেই অল্প-বিস্তর সেলাইয়ের কাজকর্ম করে থাকেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই মোটামুটি জানা আছে সুতী, রেশমী বা পশমী কাপড়, সুতো আর নক্সার গুণাগুণ, প্রয়োজনীয়তা আর বিশেষত্ব অনুসারে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প পদ্ধতিরও কম-বেশী নানান্ ধরণের পরিবর্তন ঘটে। তাই বিশেষ-ধরণের কাপড়ের উপর এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের কাজ করে বিশেষ ধরণের সুতোর সাহায্যে নক্সা-নমুনাকে নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে হলে, বিশেষ-ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার অনুসরণই যুক্তিযুক্ত। আলোচ্য 'কৌচিং' (couching) রীতি অনুসারে সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতিটিও হলো সেই ধরণের আরেকটি উন্নত-উপযোগী প্রথা। তবে 'কৌচিং' সূচীশিল্প কাজের জন্য সচরাচর খাদি, দোসুতী, 'ম্যাচ প্রভৃতি মোটা ধরণের কাপড়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অভিনব এই 'কৌচিং' পদ্ধতিতে ছুঁচ সুতার সাহায্যে কিভাবে কাপড়ের উপর সেলাইয়ের ফোঁড় তোলা যায়— নীচের 'ক' এবং 'খ' চিহ্নিত চিত্রে তার আভাস দেওয়া হলো।
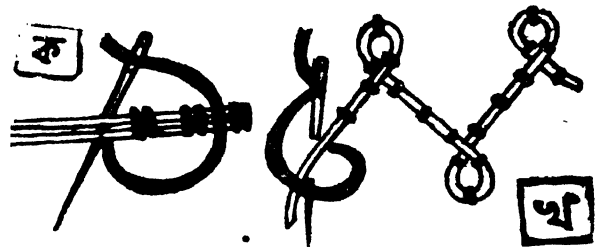
উপরের 'ক' চিহ্নিত চিত্রে দুই সারি সাদা রঙের সুতো সাজিয়ে 'কৌচিং' সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে কিভাবে অন্য আরেক সারি গাঢ় রঙের সুতোর সাহায্যে পরিপাটি ছাঁদে কাপড়ের উপর এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের নক্সা রচনা করা যাবে—তারই সহজ সরল পদ্ধতির নমুনা দেখানো হয়েছে।

উপরের 'খ'-চিহ্নিত চিত্রে দেখানো হয়েছে—কিভাবে সাদা-রঙের মোটা-ধরণের সুতোকে অপর একটি গাঢ়-রঙের সুতোর সাহায্যে 'কৌচিং' সূচীশিল্প পদ্ধতিতে কাপড়ের উপর এমব্রয়ডারী করা যাবে।

উপরোক্ত পদ্ধতি দুটি অনুসরণে নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে সুতী রেশমী বা পশমী কাপড়ে কৌচিং সেলাইয়ের কাজ

করে সুদৃশ্য-সৌখিন যে কোনো নক্সাকেই সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। সযত্নে সামান্য চেষ্টা করলেই যে কোনো শিক্ষার্থী সহজেই এমব্রয়ডারী-সূচি-শিল্পের এ কাজে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন। স্থানাভাবের কারণে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এবারে সম্ভবপর হ'লো না· আগামী সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে আরো কিছু হদিশ দেবার ইচ্ছা রইলো।

গতবারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলুম যে ইতিপূর্ব্বে আষাঢ়, ১৩৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নোক্ত ৭ ও ৮ নং চিত্রের নক্সা-নমুনা 'সারফেস্ বাটন্‌হোল্ ফিলিং' (surface Buttonhole filling বা বহিঃ-আঙ্গিক বাটন্‌হোল' এবং 'নটেড বাটনহোল্ ফিলিং' (knotted Buttonhole Filling) বা 'গিঁট-দেওয়া বাটন্‌হোল' পদ্ধতিতে সেলাইয়ের কাজ করার মোটামুটি হদিশ দেবো।

এবারে তাই, সে দুটি পদ্ধতিতে বিচিত্র-অভিনব সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে বিবিধ ধরণের সৌখিন ও নিত্যব্যবহারোপযোগী সামগ্রীতে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের
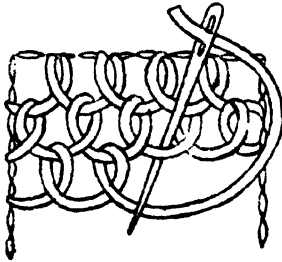
যে সব সুন্দর সুন্দর নক্সা রচনা করা যায়, তারই কিছু আভাস দিচ্ছি।
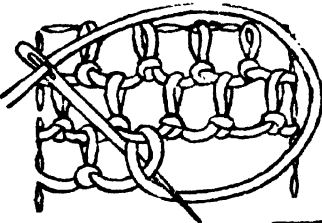
উপরোক্ত ৭নং চিত্রের নমুনা-অনুসারে এমব্রয়ডারী-সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে নীচের ১০নং ছবিতে দেখানো 'ক'-চিহ্নিত সুদৃশ্য-মনোরম 'বর্ডার' (Border) বা 'পাড়ের' ও 'খ'-চিহ্নিত বিচিত্র-ধরণের 'বাহারী-পাতার' আলঙ্কারিক-নক্সা দুটিকে রূপদান করা যাবে।
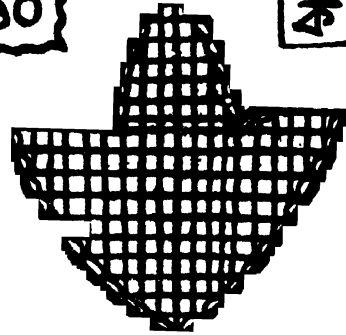
এ দুটি 'আলঙ্কারিক-নক্সা' (Decorative Motifs) সুষ্ঠু এবং যথাযথ ভাবে ব্যবহার করে অনায়াসেই সৌখিন ব্লাউশ, অঙ্গাবরণী, চাদর, স্কার্ফ (Scarf), পর্দ্দা, টেবিল-ক্লথ, কুশন-কভার (Cushion-Cover), হাত-ব্যাগ, বটুয়া-থলি, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি নানারকম নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রীকে সূচীশিল্প-শ্রীমণ্ডিত করবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে।
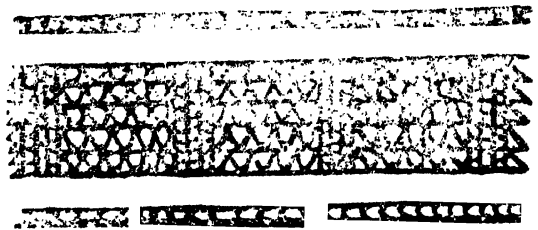
আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণেরই সরল-সুন্দর আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প পদ্ধতির কলা কৌশলের মোটামুটি পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে বারান্দায় এসে দাঁড়াই মনে হয় বিচিত্র কোন জগতে হারিয়ে গেছি। সেই কলরব কোলাহলমুখর পৃথিবীটা কোথায় হারিয়ে গেছে, চারিদিকে অন্তহীন স্তব্ধতা, তারাগুলো জ্বলছে, রাতের বাতাসে নীরব বেদনাময় হাহাকার।

দিনের দেখা পৃথিবীর সঙ্গে এর মিল নেই। নিজের মনের অতল কামনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রথমটা চমকিয়ে যায় মানুষ। অনেক না-বলা কথা ভিড় করে মনে। কোথায় একটা রাতজাগা পাখী ডেকে উঠে আবার থেমে গেল। সেই ক্ষণিক সুরের রেশটুকু অন্তহীন মাধুর্যের আশ্বাস আনে, বাঁচার আশ্বাস।

হঠাৎ মুঙ্গেরে গিয়ে সেই কথাটাই মনে হয়েছিল। ঊষর জীবনের ফেলে আসা কটি দিনকে আবিষ্কার করেছিলাম সেদিন কষ্টহারিণী ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে।

পুরাণিককালে জানকীকে উদ্ধার করে রামচন্দ্র এই ঘাটে গঙ্গাস্নান করে মিথিলানগরীর দিকে গিয়েছিলেন। সীতার সব কষ্ট লাঘব হয়েছিল এইখানে স্নান করে, তাই এর নাম কষ্টহারিণীর ঘাট।

তুমি তাহলে স্নান কর এখানে?

সুন্দর প্রশস্ত সিঁড়ি। কোর্টের শেষ সীমান্ত। এককালে এই দুর্গে বসে মীরকাশিম স্বপ্ন দেখেছিল, ইংরেজকে বিতাড়িত করার স্বপ্ন। আজও গঙ্গার জলধারায় এখানে ধ্বনিত হয় অতীতের বিস্মৃত ইতিহাসের বেদনাময় কাহিনী।

উঁচু পাড়ি। বহু নীচে উত্তরবাহিনী গঙ্গা প্রবহমানা। সোজা এসে কেল্লার নীচে জমাট পাথরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে একটা পাক দিয়ে বয়ে চলেছে, ওদিকে ষ্টীমার ঘাটে দু'একটা ষ্টীমার, লঞ্চ থেকে ধোঁয়া বের হয়, নীল আকাশসীমায় সেই কালো ধোঁয়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে চলেছে অলস মন্থর গতিতে।

ওপারের নীল ছায়াময় তীরভূমি, গঙ্গার বিস্তারে দু'একটা গাংচিল অলস পাখায় ভর করে উড়ে যায়। আমার কথায় হাসে নমিতা।

—না কষ্টটাকে সইয়ে নিইছি। ও নিয়ে আর ভাবিনা।

মিষ্টি আলো পড়েছে গঙ্গার বুকে, দু'একটা নৌকা ভেসে

চলেছে ওপাশে রূপোলী বালুচরের দিকে। কেল্লার গাছগুলোর নোতুন পাতার সমারোহ। হঠাৎ সেই মাঝরাতের স্বপ্ন দে। একটি সবুজ আলোকস্বপ্নময় জগতে আমি যেন হারিয়ে গেছি।

ভাবিনি নমিতাকে হঠাৎ এইখানে দেখতে পাবো। অনেকদিন আগেই কলকাতার ভিড়ে তাকে হারিয়ে ফেলেছি। জীবিকার অর্জনের দায়িত্ব তাকে নিজের হাতেই তুলে নিতে হয়েছিল।

পাশাপাশি বাড়িতে বাস করতাম; ওর দাদাই তখন সংসারের বোঝা টানছে। বিধবা মা আর ওই নমিতাকে নিয়ে ছিল তাদের সংসার। নমিতা তখন কলেজে পড়ছে।

পরিচয়টা সেই সুবাদেই গড়ে ওঠে। আমি তখন চাকরীর উমেদারী করছি, আর অবসর সময়ে দুএকটা টিউশানি করি।

নমিতাও মাঝে মাঝে আসতো বৌদির কাছে। আমার কাছেও আসতো দুএকটা প্রশ্নের উত্তর লিখে নিতে। বয়সের একটা ধর্ম আছে। অভাব অভিযোগও রয়েছে। বাঁচার মত একটা চাকরী খুঁজছি, তবু সেই অবকাশেও মন স্বপ্ন দেখে। তাই বোধহয় দুএকটা কল্পনা রঙীন গল্পও লিখি।

সেই খবরটা জেনে ফেলেছে নমিতা কি করে। সেইই প্রথম স্বীকৃতি দেয় লেখক হিসাবে। সেদিন ছিল আমার তরুণমন তার সেই পরিচয় আজ আমাকে বৃহত্তর জগতে পরিচিত করেছে।

সেদিনের স্বপ্নদেখার কোন সার্থকতা ছিলনা। নমিতারাও হারিয়ে গিয়েছিল।

আমরাও বাসাবদল করেছিলাম।

অনেকদিন পর হারানো নমিতাকে এখানে দেখবো ভাবিনি।

সাহিত্যসভার আমন্ত্রণ এড়াতে পারিনি। সকালের দিকে ট্রেনটা সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে এসে ঢুকছে। রুক্ষ পর্বতগুলো দৌড়ে আসছে ওই ট্রেনের সঙ্গে সমান তালে। হঠাৎ ট্রেনটাকে যেন অতল অন্ধকারে গ্রাস করে নিল ওর পাথরকঠিন বুকে।

আন্ধকারের বুক থেকে প্রাণভয়ে ছিটকে এসে পড়েছে ট্রেনখানা, সামনেই দিনের আলোভরা সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন। আথিতেয়তার নমুনা মেলে বাংলার বাইরে—দেখি ষ্টেশনে অনেকেই এসেছেন ছমাইল পথ উজিয়ে মুঙ্গের থেকে।

—তুমি!

নমিতা হাসিমুখে বলে। —শুনলাম আসছো—তাই এলাম। মাষ্টারী করি—এ ব্যাপারেও তাই নাক গলাতে হয়।

—তোমাকে এখানে দেখবো ভাবিনি।

হালকা হাসির সাড়া জাগিয়ে বলে—জানলে আসতে না?

—এখানে আমার মূলে তাহলে তুমিও?

জবাব দিলনা। ষ্টেশনের বাইরে এলাম। একটা লাইনও গেছে মুঙ্গের অবধি, তবু গাড়ির ব্যবস্থা ছিল।

বৈকালের আলো পড়েছে পিপলপাতির পথে। একদিকে পুরানো কেল্লার পাথরের দেওয়াল তারপরেই বুজে যাওয়া পরিখার খাতে জন্মেছে ঘন আগাছার জঙ্গল। একদিন ওখানে বইতো গঙ্গার জলধারা। লুসিংটন ক্যাপ্টেন এলিসের বাহিনী এসে থেমেছিল। ওই পাথরের লাল দরওয়ার প্রশস্ত পথ বেয়ে বের হয়েছিল গুরগিন খাঁয়ের পরিচালনায় অশ্বারোহী বাহিনী ক্যাপ্টেন সমরুর নেতৃত্বে পদাতিক দল, কামানের শব্দে ওই নীল আকাশ ভরে উঠেছিল।

আজ সব স্তব্ধ। মীরকাশিম প্রাণভয়ে পালিয়েছিল তার বিলাসভবন পরিত্যাগ করে, যাবার আগে বাংলার ইতিহাসের কটি নামকে মুছে দিতে চেয়েছিল। রাজা রামনারায়ণ, রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠের বংশধরদের এই দুর্গের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। সেদিনের উন্মাদ মীরকাশিমের হাত থেকে তারা কেউই নিষ্কৃতি পায়নি।

রাজবল্লভের দেহটাকে ওই উঁচু পাহাড় সমান কেল্লার বুরুজ থেকে নীচে ফেলেছিল গঙ্গার অতল জলে।

আজ সব স্তব্ধ। থেমে গেছে পদাতিক অশ্বারোহী বাহিনীর পদধ্বনি, কামানের গর্জন, মুঙ্গেরী বন্দুকের তীব্র গুলির শব্দ, কাদের জয়ধ্বনি, আর্তনাদ।

পরিত্যক্ত তক্ত মুবারকের আশপাশে শুধু হাহাকার, ওর শ্বেতশুভ্র মর্মরে রক্তের আলপনা। মীরকাশিম পলাতক। আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে ফেরার। কেউ

বলেন—মীরকাশিম এই মুঙ্গেরের গঙ্গার তীরে ছায়াচ্ছন্ন এই পিপুলপাতি ওই কেল্লার স্বপ্ন বুকে নিয়ে আগ্রার এক পথের ধারে ছিন্নভিন্ন একটা তাঁবুতে ফকীরের মত দীনহীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ফেলেছিল।

সেদিনও সাধের মুঙ্গেরকে সে ভোলেনি। আজও বোধহয় তাই এই ধ্বংসস্তূপকে ঘিরে আকাশবাতাসে রূপোলী বালুচর মেখলা গঙ্গার বুকে জাগে দীর্ঘশ্বাস।

এমনি অতীতের বুকভরা বেদনার জগতে হঠাৎ আমি এসে আমার অতীতের সেই বেদনাকাতর ছবিটাকে ক্ষণিকের জন্য আবিষ্কার করেছি। বলে ওঠে নমিতা।

—তাহলে ভালোই আছো? নাম হয়েছে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছো। বাজারে এখন বইপত্র ভালোই চলে। সিনেমা-থিয়েটারও হচ্ছে বই?

হাসি ওর কথায়!

ওইটাই কি সব! ওতো বাইরের পাওয়া মনতো হিসাব করে কি পেলাম আর কি পাইনি।

চুপ করে গেল নমিতা। বৈকালের মিষ্টি আলো ওই সারবন্দী অশ্বত্থের নোতুন পাতায় ঝিকিমিকি তোলে, আমার কথায় জবাব দেয়।

—ওর হিসাব কোনদিই মিলবেনা। দেখেছো?

গঙ্গার দুই তীরের দিকে দেখায় ওরা কোনদিনই মিলবে না। মাঝখানে থাকবে ওই জলের ব্যবধান। তাই নিয়েই জীবন।

আমার কথাটা এড়িয়ে যেতে চায়। গঙ্গার দিক থেকে ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস আসছে। বহু নীচে জলের উপর ভাসছে মুঙ্গের সহরের পানীয় জলের পাম্পিং ষ্টেশন, কয়েকটা বিরাট গাধাবোটে পাম্প বসানো আছে পরিত্যক্ত কেল্লায় আজ নোতুন মানুষ বসত গড়ে তুলেছে। অতীতের ইংরেজ শাসনের প্রতীক হয়ে টিঁকে আছে দুএকটা জনহীন সাহেবী বাংলো—ওদিকে গোলমোর অমলতাসের কালো পাতাভরা গাছগুলো আকাশে ফুলের বৈচিত্র্য এনেছে।

একদিন নবাব মীরকাশিমের মহাল ছিল এই দিকে। বিদেশী হুরীপরীদের রঙীন ওড়না পেশোয়াজের চুমকি বসানো ঝিলিমিলি এর আলোটুকুকে রঙীন করেছিল। আজকের খেটেখাওয়া মানুষের জীবনে সেই সুর অনুভব করার অবকাশ নেই।

নমিতা বলে।

—চলুন ওরা অপেক্ষা করবেন।

এই এক যন্ত্রণা। তাঁদেরও দোষ নেই। ভিনদেশী অতিথির দিকে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বাংলার মাটিতে যেটা এখন ভুলে গেছি ওখানে এখনও সেটা রয়েছে। আমার গৃহস্বামীর যত্নের সীমা নেই। বয়স্কা মাতৃসমা মহিলা নিজেহাতে যা আহারের ব্যবস্থা করেছেন, তা দেখে রেশনে অভ্যস্ত আহারে বাঙ্গালীর চক্ষু চড়কগাছে ওঠবার দাখিল। অসহায় কণ্ঠে বলি—এতো খাবো কি করে?

তিনিতো অবাক—সেকি! এখানের জলহাওয়াতে সব হজম হয়ে যাবে। নারে নমিতা?

নমিতাও এখানে এসে বাঙ্গালী মহলে মিশে গেছে। সব বাড়ীতেই তার অবারিত দ্বার। পরদেশে এসে সে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে। ভদ্রমহিলার কথায় নমিতাও সায় দেয়।

—তা সত্যিই।

...খাবার দাবারের পর আছে অতিথি অভ্যাগতের ভিড়। কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও আসেন। তারাই আমাদের পাঠকপাঠিকা। তাঁদের চটানো নিরাপদ নয়। অধ্যাপকদের চেয়ে ছাত্রছাত্রীদেরই বেশী সমীহ করি। অবশ্য আজকাল অধ্যাপকদেরও তাদের সমীহ করে চলতে হয় নানা কারণে।

...ভিড় সমাগত সাহিত্যের আলোচনা—দৈনন্দিনতত্ত্বের উপর তর্ক সবই সইতে হয়। মনের অতলে যেমন আছে—মাঝে মাঝে কলকাতার ভিড় এড়িয়ে নিভৃত সবুজসীমান্তে নীলপাহাড়ের কোলে সে উধাও হতে চায়। কিন্তু সেখানেও নিষ্কৃতি নেই।

রাত নামে। বিরাট হলে সাহিত্যসভার পর গানের আসর বসেছে। মেয়েদের একটা নৃত্যনাট্য। চিত্রাঙ্গদা।

এই আসরে দেখি নমিতার কর্মব্যস্ততা। এসবের সেই প্রধানা উদ্যোক্তা। অতীতে কলকাতায় যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম আজ তার দেহে যৌবনের সীমা পেরিয়ে উত্তর তিরিশের ছাপ। সেই কমনীয়তা অনেকটু হারিয়ে

গেছে তবু কণ্ঠের সেই মাধুর্য হারায়নি। রঙীন আবেশময় আলোয় নাচের ছন্দে তার সুর ফুটে ওঠে অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার সেই প্রেমনিবেদনের দৃশ্য সজীব প্রাণময় হয়ে ওঠে রূপরস বর্ণে তা' অপরূপ হয়ে উঠেছে।

কোন কল্পনার জগতে ওই একটি অধরা নারীকে কেন্দ্র করে মন সুদূরের আকাশসীমায় স্বপ্নজাল রচনা করে।

দে তোরা আমায়
নূতন করে দে
নূতন আভরণে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক
নূতন আভরণে।

সুরে ছন্দে আলোকবর্ণে ওরা নোতুন একটি স্বপ্নজগৎ রচনা করেছে। সে জগতের একজনকে আমি চিনি। সে ওই নমিতা।

ও যেন চিত্রাঙ্গদার মত আজ সেই তপঃক্লিষ্টা রূপে আমার সামনে প্রতিভাত হয়েছে।

রাত হয়ে গেছে অনুষ্ঠান শেষ হতে। ও খুব ক্লান্ত। ছাত্রীদের কলরব তখনও থামেনি। যন্ত্রপাতি গুটিয়ে যন্ত্রীর দল মঞ্চ থেকে নামছে।

চমৎকার হয়েছে তোমাদের অনুষ্ঠান।

মেয়েরাও জড় হয়েছে। ওদের মুখে চোখে খুশীর আভা। কলকাতায় কর্মব্যস্ত মন নিয়ে সব অনুষ্ঠান দেখা যায় না। এখানে আমার অখণ্ড অবসর, সেই শান্ত মন নিয়ে ওদের অনুষ্ঠান আজ সত্যিই মন ছুঁয়েছে।

ভিড় কমতে এগিয়ে আসে নমিতা।

—এখানে এসেও গানের চর্চা রেখেছো দেখছি।

মলিনভাবে হাসল সে।

—কি আর করবো তবু এ নিয়ে কিছুটা সময় কাটে।

কথায় কথায় পথ দিয়ে চলেছি। ও থাকে গল্লা মার্কেটের ওদিকে। আমার হোষ্ট তো গাড়ি আনতে ব্যস্ত।

তাকে নিরস্ত করলাম।

—এই তো পথ, পায়ে হেঁটেই চলে যাবো। ব্যানার্জি লজ আর কতদূর।

কাছেই তো।

..নমিতা তবু বলবার চেষ্টা করে।

—তুমি চলে যাও নাহয়।

তবু কজনে গল্প করতে করতে এগিয়ে আসি। শান্তস্তব্ধ শহর। একফালি চাঁদের আলো পড়েছে রাস্তায়। ভিড় নেই, ফাঁকা পথে আজ অনেকদিন পর একসঙ্গে চলেছি।

এ চলার আনন্দ থেকে অনেকদিনই বঞ্চিত ছিলাম।

সকালের আলোটুকু তখন জোরালো হয়নি। পূরব-সরাই-এর কাছে রেললাইন পার হয়ে রিক্সাটা চলেছে সীতাকুণ্ডের দিকে। দুদিকে আমবাগান, ঘনসবুজ গাছ-গুলোর ফাঁকে ফাঁকে লুটিয়ে পড়েছে দিনের প্রথম আলো। পাখীগুলো কলরব করছে। মহুয়া গাছগুলো ঘন পাতার আবরণে সেজে উঠেছে, বেড়ার ধারে ফুটেছে বেগুনী আর সাদা রংএর মেহেদী ফুল—তার মিষ্টিগন্ধ মিশেছে বাতাসে।

—মনে হয় এই সাজের অন্তরালে এর চিরমলিন রূপটাই সত্যি!

এ সবকিছু ঝরে যাবে শীতের শাসনে—এ রূপ দুদিনের।

ওর কথায় চাইলাম নমিতার দিকে। কাছ থেকে ওকে দেখলাম আজ।

কলকাতার সেই যৌবন সন্ধিক্ষণে দেখা মেয়েটির নিটোল সুষমায় আজ এসেছে বয়সের দৈন্য। দেহের সেই সুঠাম লালিত্য ঢেকে একটু ভারি হয়ে উঠেছে। মাথার চুলগুলোও হাল্কা হয়ে এসেছে। আশেপাশে হয়তো খুঁজলে দুগাছি চুলে সাদা আভাসও মিলবে। মুখের স্বপ্নময় কমনীয়তা আজ কঠিন বাস্তবের স্পর্শে অনেকটা হারিয়ে গেছে। আজ সে রূপবতী নয়। তবু ওই কল্পনার চোখে ওকে কোন স্বপ্নময়ী রূপেই দেখি। বলি

—চেহারা কিন্তু তোমার একটু খারাপ হয়ে গেছে নমি।

নমিতা হঠাৎ কেমন ক্ষণিকের জন্য চমকে ওঠে। বলে

—বয়স তো হোল। সবই বদলাচ্ছে আমিই বা বদলাবো না কেন?

—কিন্তু কি পেলে নমি!

নমিতা জবাব দিলনা। শীতের প্রথম হাওয়ায় দুচারটে শুকনো বিবর্ণ পাতা উড়ে চলেছে বাতাসে, জামালপুরের পাহাড়শ্রেণীর বুকে এসেছে নিঃস্ব পিঙ্গল আভাষ, শস্যরিক্ত খেতের দিকে চেয়ে থাকি।

সীতাকুণ্ড এসে গেছে।

কথাটা এড়িয়ে গেল নমিতা।

আজ ওর হয়তো বলার অনেক কিছুই আছে। সেদিন নমিতার কুমারীমন একজনকে কেন্দ্র করে কি বিচিত্র স্বপ্নজাল রচনা করেছিল, সেও সব দুঃখকষ্ট সয়ে সুখী হতে চেয়েছিল। কিন্তু আমিই কোন সাড়া দিতে পারিনি। আজ ওর সীমন্তে আজও কোন···পাওয়ার সলজ্জ রক্তরাগরেখা নেই, নিঃস্ব শূন্য সে সীমন্তরেখা ওর জীবন-পাত্রের মতই।

কয়েকটা বাধানো কুণ্ড। কালো কোনটায় বিবর্ণ জল রয়েছে, জন্মেছে নীলাভ শেওলা। দুচারটে ব্যাং লাফ দিয়ে পড়ল জলে। অবাক হই।

—এই তোমার সীতাকুণ্ড! উষ্ণ প্রস্রবণ!

—উষ্ণতা আর নেই। সেই ধারাটা কোথায় আটকে গেছে।

পরক্ষণেই একটু মলিন বিষণ্ণ হাসিতে মনের কি চাপাপড়া ব্যর্থতার বেদনা প্রকাশ করে বলে।

—বোধহয় পৃথিবীর অন্তরের সবজ্বালা আজ সর্বাঙ্গে সারা মানুষের মনে ফুটে উঠেছে।

মিষ্টি আলোটুকু ছোট বসতির বুকে প্রাণের সাড়া এনেছে। পাথরের টিলার উপরই দুএকটা গাছ কোন-রকমে ধুকে ধুকেও বেঁচে আছে।

সামনে পীরপাহাড়ের নীচে এসে রিক্সাটা থামল।

একটা ছোট পাহাড়ের রিজ টানা চলে এসেছে খানিকটা। তারই শেষ চূড়ায় পীরের সমাধি। এপাশে শাহী আমলের বিরাট একটা প্রাসাদ। হাটা পথ পাহাড়ের গা বয়ে উঠেছে। সরু পথের দুদিকে বনহেনা আর তেলিকদম গাছের জটলা। দুএকটা পলাশগাছও পাথরের খোঁদলে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে।

নমিতা গাইডের মত বলে চলেছে।

—এইটা ছিল মীরকাশিমের সেনাপতি গুরগিন খাঁনের প্রাসাদ। এই পাহাড়ের নীচে কোন দৈশ্যাবাসে তাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়।

বেশ খানিকটা চড়াই ঠেলে উপরে উঠলাম।

নমিতা হাঁপাচ্ছে। তার কপোলে চূলের ঘতিতে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ঝড়ো বাতাস আসছে বিস্তীর্ণ গঙ্গার দিক থেকে। সাদা বালির মরুভূমি যেন—দূরে বাবলা কাশবনের আড়ালে মূল গঙ্গার জলধারা তিনদিকে মুঙ্গেরকে ঘিরে রেখেছে। ওপাশে সবুজ আমবাগান তালগাছ ভরা গ্রাম সীমা—ওধারে সহরের বাড়ীগুলো—কলকারখানা।

শান্ত স্তব্ধ পরিবেশে একটা বাধানো চাতালে বসে আছি। হু হু উদাস এলোমেলো হাওয়া লাগে নমিতার আঁচলে, শূন্যদৃষ্টিতে গঙ্গার নিঃস্ব বালুচরের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছে সে।

—নমিতা

আমার ডাকে মুখ তুলে চাইল। ওর মনের অতল শূন্যতা ফুটে ওঠে সেই চাহনিতে। আজ মনে হয় জীবনে এতদিন সব পাওয়ার খুশীতে যে স্বপ্ন দেখেছি তা হয়তো মিথ্যা। নাম, প্রতিষ্ঠা—ঘর-সংসার-স্ত্রী সবই পেয়েছি—লোকে যা চায়।

কিন্তু সেই পাওয়ার অতলে একটা বেদনা ছিল—সেটা ভুলেছিলাম, কিন্তু আজ এই বিরাট অসীমের মাঝে—দিকজোড়া শূন্যতার বুকে এসে নিজের ব্যর্থতার একটু গোপন সংবাদ মনে জাগে।

নমিতা আজও সেই স্মৃতিটুকুকে ভোলেনি।

যৌবনের সীমা পার হয়ে উত্তর তিরিশের ব্যর্থ নারীমন তবু সচকিত হয়ে ওঠে এই আহ্বানে, কিন্তু সাড়া দেবার পথ আজ নেই। যেদিন ও ডেকেছিল সে ডাকে সাড়া দিতে পারিনি, আজ ওর পথও রুদ্ধ, আমার নিজের সবকিছুকেও অজনাতেই হারিয়ে ফেলেছি।

নমিতাও সেটা জানে। তাই বলে—

—অনেক কথাই ভেবেছিলাম সমী, কিন্তু তার আর দাম কি!

ও শুধু স্বপ্নই থাক। সত্যে তার কোন অস্তিত্ব নেই।

দমকা বাতাসে বনহেনার ঝোপ থেকে তীব্র মাদকময় সুবাস ভেসে আসে হলুদ দানাদানা তেলিকদম ফুল গুলো ঝরছে—শীতের রিক্ত বাতাসে শুধু ঝরারই পালা, ওই বালুচরের বুকে কয়েকটা মানুষ হেটে হেটে হারিয়ে গেল ওপারের দিকে।

নমিতা বলে

—জীবনে তবু সব সয়ে যায় সমী। কলকাতা—বাংলাদেশ ছেড়েছি অতীতের বন্ধু বান্ধবদের কাছে আজ হারিয়ে যাওয়া মানুষ আমি। তোমার কথা তবু মনে পড়তো আজ ভাবছি এ দেখা নাহলেই ছিল ভ লো।

কেন ?

এমনি করে ভু'ল যাবার কথাটায় দুঃখ পাই। এত দুঃখময় বর্তমানের মাঝেও অতীতের সেই হারানো যৌবন মনকে আবিষ্কার করে বর্তমান অতীতকে একার করে নিতে চাই।

বলে নমিতা।

—যা পাওয়া যায় না তাকে মিথ্যে আশা করা দুঃখেরই। দুঃখ তাতে বাড়ে সমী। আজ আমি বদলে গেছি—অনেক দায়িত্ব। তাই মনের সব কামনাকে চেপে রেখে চলতে হয়।…পাবার দাবী আমার নেই। তুমিও অনেক দূরে সরে গেছো। সরে গেছি আমরা দুজনেই। বর্তমানে নয়—অতীতের স্তূপের নীচে হারিয়ে গেছি।

ওর কথা গুলো মনে হয় সত্যি। কঠিন হলেও বাস্তব সত্যি। বিস্মৃতি সেই নির্জন স্তব্ধতার রাজ্য ছাড়িয়ে শহরের ভিড়ে এসে ঢুকল। বাজারে লোকজনের ভিড়। কোর্টে উকিল মক্কেলরা হাজির হয়েছে। এককালে কলরবমুখর শাহী কেল্লা আজ সরকারী আমলাদের কোলাহলে মুখর। অতীত ইতিহাস বর্তমানের ভিন্নরূপে এমনি করেই হারিয়ে যায়।

তবু সেই হারানো সুর ওঠে রাতের নিভৃত অন্ধকারে বাতাসের হাহাকারে। এ মানুষ গুলো সরে গেলেই তাদের ছায়ামূর্তি যেন ভিড় করে আসে। বাতাসে ওঠে নূপুর নিক্কণ, কার গজলের সুর ওঠে-তকৃত মুবারককে ঘিরে জাগে কান্নার কাতরানি। কষ্টহারিণীর ঘাটে এসে উত্তর বাহিনী গঙ্গা একবার মোড় নিয়ে বয়ে চলে।

…অতীতের সেই কাতর সুরের রেশটুকু তার স্রোতের সঞ্চরণে বয়ে গেছে।…

…সন্ধ্যার সেই তারার আলোয় দেখেছিলাম নমিতাকে বহু নীচে গঙ্গার স্থির জলে তারা গুলো দোল খায়, কোথায় ভেসে যাওয়া নৌকায় একটু আলো গৈবীনাথের দিকে হারিয়ে গেল। গৈবীনাথ ভাগলপুর রাজমহল—মুর্শিদাবাদ—কলকাতা অনেক দূর।

—নমিতা!

ওর হাতখানা আমার হাতে। কালো চোখের নীরব চাহনিতে কি বেদনার আভাষ।

—আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানিনা তবু তোমাকে মনে পড়বে নমি!

নমিতা সাড়া দিল না। বোধ হয় তার দুচোখে তবু জল নেমেছিল কি বেদনায়—লজ্জায়! শূন্যশাখা তার নিরাভরণতার লজ্জা খোলেনি। নোতুন আবরণও কিছু ছিল না তার। সে রিক্ত শূন্য রয়ে গেল।

—রাতের গাড়িতে ফিরে এলাম।

চাঁদনী রাত। বাইরে পাহাড় গুলো জেগে আছে কি নীরব যন্ত্রণার পুঞ্জীভূত সত্ত্বার মত।

ঘুম-ভাঙ্গা রাতে হঠাৎ জেগে উঠে ওই করুণ নিঃস্ব ধরণীর দিকে চেয়ে থাকি। মুঙ্গেরের বিষাদ-করুণ ব্যর্থতায় ইতিহাসে আর একটি বর্তমানের দীর্ঘশ্বাস মিশেছে। আজকের অগণিত মানুষের হাসিকান্নায় ছেড়ে হারিয়ে যাওয়া একজনকে মনে পড়ে।

মুঙ্গেরের কেল্লায় চাঁদনীরাত, গঙ্গায় তীরভূমি অলোরাজা পীর পাহাড় সবনিয়ে কল্পনার জগতে মিশিয়ে আছে নমিতা। ওদের ভুলিনি।

পান্থ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

দু'জনেই মোরা পথের পথিক,
ভাসিয়া চলেছি হবে ;
মুখ চেনাচেনি হ'য়েছে যখন
মনও জানাজানি হবে ;
চলারই ধারায় ধরায় কেহ যে
একেলা পিছে না র'বে।

২

পথের পথিক পথ দেখে চলে,
নেশা যে নয়নে নামে ;
দৃশ্য-পটের মিছিলও চলেছে
সমুখে—ডাহিনে—বামে।
মিতালি জমে যে মরমে—মিছিলে ;
কেমনে পান্থ থামে ?

৩

মায়াবী মিছিলে মায়া বুনে চলে :
মায়ার ধরমই এই,—
স্বপনের পরে স্বপনই দেখাবে ;
কে ধরিবে তা'র খেই !
মর্ম্ম-নয়নে দেখাবে মূরতি,
যদিও সমুখে নেই।

৪

স্বপ্ন-মূরতি হেরিতে হেরিতে,
দেরীতে কিম্বা ত্বরায়
যা'রে দেখি নাই দেখিবারে চাই
তা'রই সে সুবাস ছড়ায় ;
তার পরে কোন্ শুভ খনে তা'র
সঙ্গে সে পথ ভরায়।

৫

পথই যে পথের চরম প্রাপ্তি,—
মরমে যখনই বুঝি,
পরম সত্য লহমায় লভি ;—
পথের এ যোঝাযুঝি
শমে আসিবেই ; সফলও হবেই
জীবনের খোঁজাখুঁজি।

৬

যা'রে পাই নাই, সে-ও যে পান্থ,
সে-ও যে শ্রান্তি-বশে
পথের দাহের চাহে উপশম
প্রিয়-সংগম-রসে ;
পথের বাঁশীর সুর-সংকেত
তা'রও যে মরমে পশে।

৭

দু'জনেই মোরা পথের পথিক,
যুগযুগান্ত ধরি'
তনুর পোশাক পরিয়া দোঁহারে
দু'জনেই খুঁজে মরি ;
বুঝি না যে, প্রেম লীলা ক'রে যায়
বিভিন্ন দেহ গড়ি'।

৮

পথে ছাড়াছাড়ি, পথেই মিলন,
প্রেমও কাড়াকাড়ি পথে ;
পথে আর প্রা.ণ, পথে, প্রাণে, প্রেমে
ভেদ আছে কোন মতে ?
ভেদ কি আছে গো সাগরে, সরিতে,
তুষারে, মেঘের স্রোতে ?

আর্ত্তের আহ্বান

শ্রীজ্ঞান

আবার মহাপূজা এল। বৎসর পরে জগজ্জননী মাতা দুর্গা আবার বাঙলার ঘরে আসছেন। কিন্তু এবারে মার আগমনে সন্তানের মনে কোন সুখ নেই, মুখে হাসি নেই। অর্থ-সঙ্কট ও অন্ন-সংকট আজ জাতিকে যেন পিষে ফেলেছে। তার ওপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও অভিশাপের মতন দেশের ওপর পড়েছে। তাই হল যেন খরার পরই ঝরা—অর্থাৎ যাকে বলে বিপদের ওপর বিপদ। বাংলা ও বিহারে দু'বৎসর ধরে অভূতপূর্ব্ব খরা বা অনাবৃষ্টি হয়ে শস্য উৎপাদনে প্রচণ্ড বাধা ঘটিয়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করল। তারপর যে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতন নেমে এল বর্ষার ধারা, ধরণীকে শস্য শ্যামলা করবার জন্য! বুভুক্ষু মানুষ আশার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল—মাঠে মাঠে শ্যামল শোভা জেগে উঠল, ক্ষেতে ক্ষেতে শস্যের প্রাচুর্য্য চাষীর প্রাণে আনন্দের বান ডাকল। সবাই ভাবল এবার বুঝি মানুষের অন্নকষ্ট ঘুচবে। কিন্তু অলক্ষ্যে বিধাতা হাসলেন—বর্ষার রিমঝিম্ ধারা খরধারা হয়ে ঝরে পড়তে লাগল অবিশ্রাম গতিতে—ফুলে ফেঁপে উঠল নদনদী—ভাসিয়ে দিল ক্ষেত-খামার, পথ-প্রান্তর, ঘর-বাড়ী! হাহাকার উঠল গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে—বিহার রাজ্যের চতুর্দ্দিকে! প্রচুর শস্য ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়েছে, প্রভূত সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, গবাদি পশু ও জীবন নাশও হয়েছে অনেক!

মানুষের এই বিপদে মানুষ উদাসীন থাকতে পারে না। তাই সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি ও সেবা পরায়ণ মানুষেরা ছুটে গেছেন গ্রামে গ্রামে সাহায্যের জন্য। কিন্তু বাংলার যুব-শক্তি কি হাত গুটিয়ে থাকবে? যে শক্তি রাজনীতি করতে দক্ষ; আন্দোলন করতে পোক্ত; ঘেরাও, বন্ধ, হরতালে শক্ত সে শক্তি কি দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে সংগঠনী শক্তি নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দুঃস্থ মানুষের উপকার করতে এগিয়ে আসবে না? এ প্রশ্নের জবাব তোমরাই দিতে পারবে। তোমরা কিশোর কিশোরীরা, যুবক-যুবতীরা ইচ্ছা করলেই তোমাদের কল্যাণ হস্ত নিয়ে এই বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পার। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে দূর থেকেও তোমরা সাহায্য পাঠিয়ে দুস্থদের সাহায্য করতে পার। যে ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে রয়েছে, সেই সৃজনী শক্তি, সংগঠন শক্তিকে তোমরা কাজের মতন কাজে লাগাও। অকাজে ব্যয় না করে তোমাদের দুর্ব্বার শক্তিকে সেবার কাজে লাগাও; কারণ সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম্ম। মানুষের দুঃখে দুর্দ্দশায় তাদের সাহায্য করা মানুষের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য, সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। তোমরা ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মেছ। ভারতের বাণীই হচ্ছে সেবার বাণী, গৌতম, গৌরাঙ্গ, গান্ধীর বাণী—সে বাণীকে তোমরা মূর্ত্ত তোল তোমাদের কাজে ও কর্ম্মে। আর্ত্তের আহ্বানে দাও সাড়া।

শরীরামদ্যং খলু ধর্মসাধনম্

ভারতশ্রী শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত

বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজকাল অসাধ্যসাধন করছে। সে আজ উড়ছে উর্ধ্বাকাশে, অচিন্তনীয়বেগে পৃথিবী করছে প্রদক্ষিণ, বিচরণ করছে অবাধে সাগরের অতলতলে! মানুষ আজ পরিকল্পনা করছে চন্দ্রালোকে, শুক্র ও মংগলগ্রহে যাবার।

কিন্তু এই মানুষই আবার জরা-ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর

অধীন হইয়া যাপন করছে অসহায় জীবন। এ তার পক্ষে নিতান্ত অগৌরবও—জয়ের মাঝে পরাজয়। এই অগৌরব থেকে, পরাজয় থেকে মুক্তি পেতে হলে, দৈনিক নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা ও যোগসাধনার করতে হবে অনুশীলন। যোগসাধনার উদ্দেশ্য, শরীরকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করা, কষ্ট-সহিষ্ণুতার সহনশীলতা বাড়ানো, মনকে দৃঢ় ও সতেজ করা। আর ব্যায়ামের কার্যকারিতা নিজেকে সুদেহী করে গড়ে তোলা, দশের মাঝে, শত সহস্রের মাঝে নিজেকে পরিচিত করা, দেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা, দশের ও দেশের কল্যাণ প্রচেষ্টায় সুদেহীদের গড়ে তুলেতে আত্মনিয়োগ করা। আজ আমাদের দেশে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সমধিক। আমরা অসুস্থ হলে ডাক্তারের জন্যে যে অর্থব্যয় করি, সেই অর্থ যদি নিজেদের শরীরের জন্যে ব্যয় করি তাহলে সেটা সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্" এই ঋষিবাক্য ভুলে গিয়ে দেশ আজ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ স্বাধীন ভারতবাসী বিশেষভাবে বাঙালী হীনবল, ক্ষীণ-স্বাস্থ্য লইয়া যেন কোন রকমে বেঁচে আছে। রোগ-শোক পুষ্টিকর আহারের অভাবে আজ তারা মৃত. বাঙালী তরুণ ও যুবকদের যেন আর সেই মনোবল নেই—চোখের দৃষ্টি যেন নিষ্প্রভ, জীবন সংগ্রামে নেই শক্তি ও সাহস। শুধু খাদ্যাভাবই এর একমাত্র কারণ নয়। তাদের সংযমী হতে হবে। সাধারণ খাদ্য খেয়েই যদি নিয়মিত ব্যায়াম বা যোগাভ্যাস করা যায় তবেই দেহ ও মনের শক্তি লাভ করা যায়।

সত্যিকারের স্বাস্থ্য-সাধনা সেদিন শুরু হবে, যেদিন মানুষ শরীরকে পারবে জানতে, স্বাস্থ্যই যে একমাত্র সম্পদ এই সহজ কথাটা যেদিন বুঝবে, জীবাত্মার সংগে পরমাত্মার মিলন ঘটাতে পারবে।

শরীরই হচ্ছে সাধনার ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তিভূমি যদি সুদৃঢ় হয় তবেই এই ভিত্তির ওপর উচ্চস্তরের জীবন সৌধ, দিব্যজীবনের আকাশচুম্বী অট্টালিকা তোলা সম্ভব। হঠযোগের মতে দেহটা যন্ত্র, আর দেহকে ধারণ করে আছে আত্মারূপী যন্ত্রী। দেহ এবং দেহস্থ মন, বুদ্ধি, অহংকার, ক্রোধ প্রভৃতি এই আত্মারই বিভূতি বা শক্তি। এই শক্তির খেলাই চলছে অহর্নিশি দেহযন্ত্রের ভিতর। যদি দেহস্থ স্নায়ু পেশী ও গ্রন্থির কার্যকারিতা স্বাভাবিক ও দোষমুক্ত হয় তাহলে এই দেহযন্ত্রে স্ফুরিত হয়ে উঠবে আত্মার দেবভাব। আর যদি এই দেহযন্ত্রে ত্রুটী ঘটে, মালিন্যে ঢেকে যায় তবে দেহমন পাশবিকভাবেরই লীলাভূমি হয়ে উঠবে।

আজ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুয়েরই। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটার যথার্থ উৎকর্ষ

হয় না। কাজেই শিক্ষার সংগে সংগে স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হলে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শরীরচর্চার এবং যৌগিক ব্যায়ামের প্রচলন করতে হবে। পৌরাণিক যুগে আমাদের দেশের মেয়েরাও এই যোগবিদ্যা শিক্ষা করত আগ্রহ সহকারে।

মহাকালের রথ এগিয়ে চলেছে তার আপন খেয়ালে। সেই খেয়ালের বলি হচ্ছে মানুষ, জীবন-যুদ্ধে শ্রান্ত-ক্লান্ত একটি জীব। আজ শুধু আছে তার জীবন ধারণের গ্লানি। মানুষ ভুলে গেছে কবির সেই অমৃতময়ী বাণী :

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,।

শরতের ছেঁড়া মেঘের মত ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে মরছে অতৃপ্ত কামনা প্রতিটি মানুষের অন্তরে। মনের এই অতৃপ্তি কিন্তু মানুষের নিজের সৃষ্টি। এর হাত থেকে মানুষের নিস্তার নেই যদি না সে তার কলুষিত মনকে পবিত্রতার হোমানলে নির্মল করে তোলে। নির্মল মনের একমাত্র অধিকারী স্বাস্থ্যবানেরা, যারা হীনস্বাস্থ্য তারাও নিজ সাধনায় ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় স্বাস্থ্যবান হতে পারে। অনিন্দ্যসুন্দর রোমনগরী যেমন একদিনে গড়ে ওঠেনি, তেমনই সুন্দর স্বাস্থ্য একদিনেই গড়ে ওঠে না। এজন্য চাই একনিষ্ঠ সাধনা। দৈনিক নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা মানুষের শরীরকে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তুলবে, ছন্নছাড়া মনকে করবে দৃঢ়, সতেজ ও সুন্দর।

বর্তমানে মানুষের ধারণা যে ভাল খেতে না পারলে স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। অবশ্য ব্যায়াম করলে মানুষের যে কায়িক পরিশ্রম হয় তা পূরণ করতে কিছু সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। তবে সেই প্রয়োজনের দাবী ডাল-ভাত, রুটি শাক সবজীতে পূরণ করা যায়। আজ পশ্চিম বাঙলার তথা ভারতের বুকে যে অসংখ্য ব্যায়ামাগার গড়ে উঠেছে, তার মাধ্যমে আমরা হতে পারি সুন্দর স্বাস্থ্যের ও নির্মল চিত্তের অধিকারী। অনেকের আজও ধারণা যে শরীরচর্চা ও বিদ্যাশিক্ষা একসঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। শারীরিক ব্যায়াম ও মানসিক পরিশ্রম একই সঙ্গে হওয়া আবশ্যক। নতুবা একটির অভাবে অপরটির উৎকর্ষতা সম্ভব নয় মোটেই।

তাই আমার ছোট ছোট ভাই-বোনদের কাছে একান্ত অনুরোধ, তারা যেন ব্যায়ামচর্চ সম্বন্ধে উদাসীন না থাকে, যেন দুর্বার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে। তাহলে কোন বাধা, কোন বিপত্তিই তাদের সাধনাকে ব্যাহত করতে পারবেনা। সিদ্ধি তাদের অনিবার্য।

প্রাণ-প্রদীপ

শ্রীমতী সুজাতা সিংহ

কাঁদতে কাঁদতে মা মা ব'লে গোপা এল ধেয়ে—
কোলে তারে নিলেম তুলে তিনটী চুমু খেয়ে!
হাত বুলিয়ে গায়,
জিজ্ঞাসিলেম তায়—
"আহা হা এমন ক'রে মারলো কেরে তোরে?
বল তো দেখি কানে কানে, আচ্ছা না হয় জোরে।"
ব'ললো গোপা জড়িয়ে মোরে চোখের জলে ভেসে—
"মাঠের মাঝে ব'সেছিলেম এমনি সময়ে এসে
রায় বাড়ীর ঐ খোকা,
পাজি উল্লুক বোকা,
শুধু শুধু চিম্‌টি কেটে ক'রে দিল আড়ি,
ব'ললো আবার চোখ রাঙিয়ে মারব লাঠির বাড়ি।"
সোণার গোপার চাঁদ বদনে চুমু দিলেম এঁকে,
ব'ললেম তারে আদর ক'রে, "নেবোই নেবো দেখে
ঐ খোকার কেমন জোর
মারবে সোণায় মোর!
যেও না আর কখনই দুষ্টু ছেলের কাছে,
ভয় কি তোমার—এই তো খেলার জিনিষ পড়ে'
আছে।"
সন্ধ্যা প্রদীপ উঠলো জ্ব'লে আমার মনে পড়ে
শতদলে গোপার হৃদয় ফু'টবে থরে থরে।
চাঁদের কিরণ ছুঁয়ে
প'ড়বে তাহা নুয়ে—
গোপার আমার জীবনখানি এমনি মধুর সাঁঝে
মায়ের কাছে মনোরমের সানাই হ'য়ে বাজে

চড়াই পাখী

শ্রীঅভিনব গুপ্ত

কেবলই ক্রীড়াচাঞ্চল্য,—সমবেত মিলনের মিষ্টি-মধুর ঝগড়া আর ঝগড়া। আনন্দের ঝগড়ার সীমা নেই। কেবলই শুধু কিচ্ কিচ্—কিচ্ কিচ্ কিচির্ মিচির—কিচির্ মিচির্। ভোর হ'লেই জানালা খুলে দেখা যাবে অনেক অনেক ধুসর রঙের ছোট পাখী গাছে ব'সে কথোপকথন কর্‌ছে তা'দের নাচন্ তালে ছোটগাছটির ডালপালাগুলি নেচে উঠ্‌ছে। হয়ত বা গাছটি বল্‌ছে—"সুপ্রভাত! বন্ধু বিহগবৃন্দ, সোনার সুপ্রভাত!"

একটু তাড়া দাও। দেখ্‌বে ওরা কিচ্ কিচ্-কিচ্ কিচ্ শব্দ ক'রেই উড়ে যাবে ও-বাড়ির আল্‌তো রোদ লাগা ছাদের কার্নিশে। ওরা ছোট ছোট ডানা মেলে ঠিকানাহারা নীল-দিগন্তে ওড়ে না। ওরা গৃহবলিভুক্—ওরা যায় না বাসা ছেড়ে দূরে। বাড়ীর আনাচে কানাচে খাবার পেলেই শুরু হয় ওদের সুতৃপ্ত সুখের ভোজ। এর মধ্যেই কয়েকটা পাখী শুরু ক'রে দেয় মন্‌মাতানো গান। খাওয়া হবার পর শুরু হয় ওড়াউড়ি—ঘোরাঘুরি নানানরকম খেলা। এদের খেলা দেখে মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

লুকোচুরি খেলায় এদের জুড়ি মেলা ভার। এদের এই লুকোচুরি খেলা মানব-শিশুদের লুকোচুরি খেলা থেকে ভিন্ন। কিছুক্ষণ খেলার পরেই হাঁপিয়ে উঠে বিশ্রাম কর্‌তে শুরু ক'রে দেয় এরা।

দুপুরবেলা য'ন সমস্ত জগৎ থাকে নিস্তব্ধ—নিঝুম তখন এরা ছায়াশীতল স্থানে ব'সে কিচ্ কিচ্—কিচির মিচির ক'রে গল্প শুরু ক'রে দেয়। হয়ত বলে গর্ব্ব-ভরে নিজের নিজের নানারকম অভিজ্ঞতা হয়ত বা অতিরঞ্জনের সাথেই বলে সে সব মজার মজার গল্প। দুপুরবেলা য'ন সব নিঝুম, গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে নির্ব্বাক, আর তা'দের ছায়া অবাক হ'য়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকে, তখন ওদের হালকা-সুরের কিচির মিচির শব্দ শুনতে কা'র না ভালো লাগে! কত গল্প! কত অভিজ্ঞতার পরিবেষণ! কত অ্যাডভেঞ্চারের আড্ডা-জমানো কাহিনী! আমরা তাদের ভাষা বুঝতে পারি নে ব'লেই তা'দের দীর্ঘ গল্পকে কল্পনা ক'রে তা'র স্বাদ গ্রহণ ক'রে আনন্দ পাই।

কেউ হয়ত বলে,—দশ বারোটা কাক তা'কে নানা দিক থেকে আক্রমণ করেছিল। সে কাকদের ঠকিয়ে কেমনভাবে পালিয়ে এলো তা-ই অতিরঞ্জনের সাথে বলতে থাকে তা'র বন্ধুদের কাছে। যেন এই ভাব যে—'তোরা আমার মতো কলাকৌশল জানিস্‌নে। তোরা তোদের এই জীবনে কতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিস্।' তা'র অন্যসব বন্ধুরা তা'দের বীর, অভিজ্ঞতাসঞ্চয়কারী বন্ধুর দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে, বাড়িয়ে-বলা অভিজ্ঞতার আজগুবী গল্প একমনে শুনতে থাকে।

ধীরে ধীরে দুপুর ম্লান বিকেলে রূপান্তরিত হ'য়ে আসে। ক্লান্ত সূর্য্য হেলে পড়ে পশ্চিম দিগন্তে। তাঁ'র রক্তিম আভা নীল দিগন্ত ব্যাপ্ত করে; ব্যাপ্ত করে সমস্ত জগৎ। সেই ছোট পাখীরা রক্তিম আভা দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়! আবার তা'রা বসে গিয়ে সেই ছোট ফুল গাছটিতে—যেটিতে ব'সে তা'রা সেই দিনের জীবনটি শুরু করেছিল।

চড়াই পাখীর চটুলতায় কেবল যে আমাদেরই আনন্দ হয় তাই নয়—বড় বড় কবি ও শিল্পীদেরও আনন্দ হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর তাঁর বোন ডরোথী তা'দের ছোট বেলায় চড়াই পাখীর বাসা দেখ্‌তে খুবই ভালবাসতেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁ'র কবিতায় লিখেছেন,।

—"On me the chancediscovered sight
Gleamed like a vision of delight.
I started—seeming to espy
The home and sheltered bed
The sparrow's dwelling."—'The sparrow's nest.
William Wordsworth.

আচম্‌কা চড়াই পাখীর বাসা দেখার চমকপ্রদ আনন্দের স্বাদ কবি আমাদের পরিবেষণ করেছেন। ছোট পাখীদের এমন একটি আলগা মাধুর্য্যের রূপ আছে যে মনকে এ চঞ্চল রূপে আকর্ষণ না ক'রে পারে না।

আবার মহাকবি কালিদাসও 'মেঘদূত' কাব্যে চড়াই প্রভৃতি গৃহবলিভুক্ পাখীর বাসা গড়ার সমুৎসুক স্বাদপূর্ণ কথা সানন্দে লিখতে স্বানুভব করেছেন। কবি লিখেছেন,—

"নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।"—

"মেঘদূতম্', পূর্ব্বমেঘ, ২৪ সংখ্যক শ্লোক।

—গৃহবলিভুক্ পাখীদের মধ্যে চড়াই বা চটক পাখী বড়ই চটকদার—চলা ফেরার মধ্যে বেশ সপ্রতিভ চঞ্চলতা। মনকে মুগ্ধ করবেই। তাই কবিরা যে তা'দের গলায় কথার মালা রচনা ক'রে পারিয়ে দিয়েছেন, এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

সারাদিনের অবিরাম যাতায়াতের আনন্দ বেলা-শেষে একটি শমে এসে উপস্থিত হয়। চড়াইএর চাঞ্চল্য নম্র গোধূলির ধূসর পরিবেশে স্থগিত হয়। আস্তে আস্তে সূর্য্য ঢলে পড়ে পশ্চিমদিকে। তার দীপটি হাতে নিয়ে ঘুমপারাণী সন্ধ্যা নেমে আসে। পাখীরা সব বাসায় ফেরে। ছোট পাখীরাও অস্তগামী দিনমণিকে অভিবাদন জানিয়ে সন্ধ্যার ঘুমের স্বাদ নিতে ফেরে তা'দের বাসায়।

সূর্য্য ঢ'লে পড়ে যখন,
সন্ধ্যা নামে ধীরে ধীরে,
পাখীরা সব ফেরে তখন
তা'দের সাধের ছোট নীড়ে।
আবার ভোরে উঠবে তা'রা,
গাছের ডালে জুটবে তা'রা,
করবে তা'রা কিচির মিচির—
দুলবে ডালে ফিরে ফিরে।
ছোট শিশুর মনকে মাতায়,
তা'দের সাথে বন্ধু পাতায়,
সকাল সাঁঝে রাখে তা'দের
সাধের সোনার স্বপ্নে ঘিরে।

মনোহর মৈত্র

১। সংখ্যার হেঁয়ালি:

ঝুলন-যাত্রা উৎসবের দিনে মফঃস্বলের সহরে বিরাট মেলা বসেছে···লোকে লোকারণ্য মেলার আঙিনা। দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে গরুর গাড়ী, সাইকেল, আর মোটর-বাসে চড়েও বহুলোক এসেছে মেলায়। মেলার বাইরে পথে দেখছি—সাইকেল আর গরুর গাড়ী মিলিয়ে গাড়ীর সংখ্যা ১২৬; গরুর গাড়ী আর মোটর-বাস মিলিয়ে ১৩৩ এবং সাইকেল আর বাস মিলিয়ে গাড়ীর সংখ্যা ১১৫ খানা। বলো দিকিনি, কখানা গরুর গাড়ী, কখানা বাস আর কখানাই বা সাইকেল আছে?

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা

দাঁত আছে, খাই নাকো—
এমনি বরাত··
মুখোস নইকো আমি,
নইকো করাত···
সবার ঘরেতে আছি,
নিত্য সেবি সবে,
ত্রিবর্ণে রচিত নাম,
বলো দেখি তবে!

রচনা: শান্তনু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গত মাসের 'ধাঁধা ও হেঁয়ালির' উত্তর:

১। ২৫১৯;
২। শালিথ—খলিশা;
৩। জাম—মজা;
৪। শাক—কশা।

গত 'শ্রাবণ' মাসের ৪টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সুধাংশু, হিমাংশু, শীতাংশু, হারাণচন্দ্র ও সুষমা মুখোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), কবি, অমিত ও অধীশ বন্দ্যোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ), বুবু ও মিধু গুপ্তা (কলিকাতা), বিজয়া ও গৌরাংশু আচার্য্য (কলিকাতা), হাবলু, টাবলু, সুমা, পুতুল, নিপু ও খোকা (হাওড়া), পিন্টু, ফণী ও দোলন সাহা (কলিকাতা), লক্ষ্মী, সত্যেন্দ্র, মুরারি, লিলি, নমিতা, সুনীল, মঞ্জয়, রুবি ও অমিয় (ভিলাই), খুকু, রুনু, পুলপুল, শম্‌শম্, খোকন চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), ব্রতীন্দ্র, রথীন্দ্র, সতীন্দ্র ও শৈলজা হাজরা (বাঙ্গালোর), পুপু, ভুটিন ও রাজা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), দুর্গাদাস, রেণু, প্রণব, প্রশান্ত ও আরতি দেবশর্মা (বর্দ্ধমান), সোমনাথ পালিত (মজঃফরপুর), জোনাকী বাগচি (পূর্ব্ব পুটিয়ারি), সবিতা দাস (বনরায়পুর)।

গত মাসের ৩টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

শর্ম্মিলা, শর্ম্মিষ্ঠা, সঙ্ঘমিত্রা ও শচীন্দ্রকুমার রায় (কলিকাতা), কল্যাণ, সুধীশ, রজত, ইন্দ্র, রবি, বিজন বিমান, অনাবিল ও ধীরেন (কলিকাতা), বিজয়েন্দ্র, ইন্দিরা, বিনয়েন্দ্র, অজয়েন্দ্র ও অরুণেন্দ্র সিংহ (হাজারীবাগ), মণীন্দ্র, ব্রজেন্দ্র, শতদল, মোহিনীমোহন ও শ্যামলী রায়-চৌধুরী (নিউ দিল্লী), রাণা, বুনা, গৌর ও লিপিকা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), সুধীন, আরতি, যশোজিৎ ও প্রমীতা (বোম্বাই), মানস, শৈবাল, মানসী, অতনুকুমার, প্রমথনাথ ও চম্পকলতা রায় (শিলঙ)।

গত মাসের ২টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

দেবকীনন্দন ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া), অমিয়, প্রশান্ত, রবীন্দ্র, অভি, বাসুদেব, সুমীত, কৃষ্ণলাল, সুনীল, ভুবন, মাণিক, গৌতম, পৃথ্বীশ, আশুতোষ, নীলমণি ও কালিদাস (কলিকাতা), হরিদাস, অজয়, দুলাল, শোভা, বাণী, লোকেশ, রামু ও শ্যামলাল (রাঁচী), সুধীরচন্দ্র দাশ, গীতাদি ও দ্বিজেন্দ্রমোহন সরকার (কলিকাতা), বনলতা, অলকা, রেণু, রুমাদি, জয়া, নৃপেন, গোপাল, জীবন, ফণী, শেফালী, অনুরাধা, ছায়া, মীরা, পূর্ণিমা, অনিতা, কাজল, কনক, প্রদীপ, মঞ্জু, শিখা, কল্পনা, বিমলা, চঞ্চলা, রুনু, সুধাংশু, সুলেখা ও রত্না (লক্ষ্মীপুর খেরী)।

গত শ্রাবণ মাসের ১টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পার্থ, ধ্রুব, কাবুল, গীতা, সীতা ও মুকুল চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণনগর), সবু, পুটু, দেবু, নীতা, চন্দ্রিমা ও তপন হালদার (বিলাসপুর), রেবতী, ভানুমতী, সুজন, রাজেন্দ্র ও ধনঞ্জয় বসু (কলিকাতা), মুকুন্দ, সবিতা, শ্যামাচরণ, হেমমালা ও বাসন্তী তালুকদার (জলপাইগুড়ি)।

১। দিন-গোণার হেঁয়ালি :

সেবারে পূজোর ছুটিতে দার্জ্জিলিঙ গিয়েছিলুম—আবহাওয়া ভালো না হলেও, তেমন খারাপ হয়নি। তার মানে, নয়দিন বৃষ্টি হয়েছিল। তবে মজা ছিল এই যে যেদিন সকালে হতো বৃষ্টি, বিকালটা থাকতো পরিষ্কার নির্ম্মেঘ…আবার যেদিন বিকালে বৃষ্টি হতো, সেদিন সকালটা থাকতো চমৎকার নির্ম্মেঘ রৌদ্রোজ্জ্বল। সবশুদ্ধ ৭টি সকাল আর ৮টি বিকাল ছিল বৃষ্টিহীন নির্ম্মল। বলো তো—মোট কদিন আমি দার্জ্জিলিঙে ছিলুম।

বৈকুণ্ঠ দেবশর্ম্মা

'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। তিন অক্ষরের কথা—মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বোঝায়। প্রথম অক্ষর বাদ দিলে উদ্ভিদ-জাতীয়কে বোঝায়; দ্বিতীয় অক্ষর বাদ দিলে বিশেষ এক-ধরনের ফল হয় এবং তৃতীয় অক্ষর বাদ দিলে জমির সীমানা নির্দ্দেশ করে। তবে প্রথম অক্ষর বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অক্ষরটিকে তৃতীয়ের পিছনে সাজিয়ে রাখলে, বিশেষ আরেক-ধরণের ফল বোঝায়। বলো তো—কথাটী আসলে কি ?

রচনা : জোনাকী বাগচী (পূর্ব্বপুঠিয়ারী)

৩। অধিক বাড়িতে দিলে
তারে ধরা ভার…

আঁধারের মাঝে থাকে,
পাশে সবাকার।
সে যদি পড়িয়া যায়,
অস্ত্রে নাহি কাটে,
বুঝিতে পারো কি নাম,
এই ছড়া পাঠে ?

রচনা : ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গত শ্রাবণ মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর :

১। ৫৪ খানা সাইকেল, ৭২ খানা গরুর গাড়ী, এবং ৬৯ খানা মোটর-বাস।

২। চিরুণী।

গত শ্রাবণ মাসের দুইটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

অনুপম, নিরুপমা ও মনোরমা সেন (আসানসোল), পবিত্র, রাখালচন্দ্র, মাধবচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, স্মৃতি, প্রীতি ও কণা সান্যাল (কলিকাতা), সঞ্জীব, সুনীরা, পুতুল, সুষমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), প্রণব, প্রতাপ, মাধুরী, কাজরী ও বাঁশরী গুহ (রাঁচী), বিজু ও বুজু ভাদুড়ী (কলিকাতা), অধীশ, কবি ও অমিত হালদার (লক্ষ্ণৌ), পুপু, ভুটু ও রাজা (কলিকাতা), কুলু মিত্র (কলিকাতা), রাণা, বুনা, গৌর ও লিপিকা মুখোপাধ্যায় (চুঁচড়া), অমিয়, সঞ্জয়, সিসি, নমিতা, লক্ষ্মী, সত্যেন্দ্র, মুরারি, সুনীল (ভিলাই), প্রশান্ত, বাদল, রবি, সুশীল, অভি, ভুবন, ভাস্কর, সুনীত অমৃত, তিনকড়ি, কৃষ্ণলাল ও ভোলা (কলিকাতা), ফণী, রোচনা ও দোলন সাহা (কলিকাতা)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিজয়, বিনয় ও অজয় সিংহ (হাজারীবাগ), পিপু, খোকন, আলোক, লতু ও রম দেবশর্মা (কলিকাতা), রঞ্জত, কল্যাণ, বরুণ অনাবিল, অশোক, ইন্দ্র, বিশ্বতোষ, প্রাণতোষ ও কল্পনা হাজরা (শ্রীরকেল্লা), শম্পা, পম্পা, চম্পা, মোহন, শোভন ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), [illegible] পঙ্কজিনাথ, অপজিনাথ, শান্তি-লতা, চারুলতা ও তরুলতা রায় (নিউ দিল্লী), বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (গয়া), মহেন্দ্র, জীবেন্দ্র, মানবেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও কঙ্কাবতী রায়চৌধুরী (কলিকাতা)।
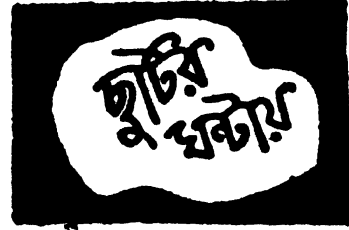
চিত্রগুপ্ত

এবারেও বলছি—রাসায়নিক-উপাদানের বিচিত্র-প্রক্রিয়ার ফলে, বিজ্ঞানের আরেকটি অভিনব রহস্যময় মজার খেলার কথা। এ খেলাটি কলা-কৌশল আয়ত্ত করে, অল্প কয়েকটি সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে তোমরা অনায়াসেই ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে আজব-উপায়ে অতি-সাধারণ একটি কাঁচের পাত্রের গায়ে আলোর উজ্জ্বল আভা ফুটিয়ে তোলার কশরৎ দেখিয়ে তাঁদের সবাইকে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

বিচিত্র মজার এই উজ্জ্বল-আলোর আভা কি উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব—আপাততঃ, তারই মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি।

এ ধরণের মজার কশরৎ দেখানোর জন্য খেলার সাজ-সরঞ্জাম হিসাবে চাই ধাতু-নির্মিত ছোট একটি থালা (a metallic Plate), একটি 'স্পিরিট-ল্যাম্প' (a Spirit-lamp), এক বাক্স দেশলাই, স্বচ্ছ কাঁচের তৈরী একটি 'ফানেল' (a transparent glass funnel) এবং অল্প খানিকটা কর্পূরের দানা (a small portion of Camphor)।

ফর্দ্দমতো এ' উপকরণগুলি সংগ্রহ করে, গোড়াতেই ঘরের মেঝে কিম্বা একটি সমতল চৌকী, টুল অথবা টেবিলের উপর ধাতু-নির্মিত থালাটির মাঝখানে জলন্ত 'স্পিরিট-ল্যাম্পটিকে' বসিয়ে রাখো এবং সেই থালাটিতে ছড়িয়ে দাও কর্পূরের দানাগুলি। তারপর কর্পূরের দানা ছড়ানো ঐ থালার-মাঝে-বসানো 'স্পিরিট-ল্যাম্পের'

জলন্ত-শিখার উপরে সন্তর্পণে উবুড় করে বসিয়ে রাখো স্বচ্ছ-কাঁচের তৈরী 'ফানেলটিকে'।

এমনিভাবে বসিয়ে রাখার কিছুক্ষণ বাদেই 'স্পিরিট-ল্যাম্পের' জলন্ত-শিখার তাপে কপূরের ছোট-ছোট দানাগুলি ক্রমশঃ বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে—বিজ্ঞানের আজব রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে, কপূরের দানাগুলি ক্রমেই স্বচ্ছ-কাঁচের তৈরী 'ফানেলটির' গায়ে সেঁটে গিয়ে দিব্যি-সুন্দর অদ্ভুত-ধরণের আলোর আভায় সমুজ্জল হয়ে উঠছে।

এই হলো—এবারের মজার খেলাটির আজব রহস্য। তবে আসরের দর্শকদের সামনে খেলাটিকে আরো মজাদার করে তুলতে হলে—এ কারসাজিটি অবশ্য অন্ধকার ঘরেই দেখানো ভালো।

এবারে এই পর্যন্তই! আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আজব-মজার আরেকটি অভিনব খেলার পরিচয় দেবো তোমাদের।

এবারে বলছি—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আরেকটি বিচিত্র-মজার খেলার কথা। এ খেলাটির কলা কৌশল নিতান্তই সহজ-সরল এবং খেলা-দেখানোর জন্য টুকিটাকি যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, সেগুলি জোগাড় করাও এমন কিছু ব্যয়সাপেক্ষ বা হাঙ্গামার কাজ নয়। সামান্য চেষ্টা করলেই সহরের ভালো ডাক্তারখানা বা রাসায়নিক-সামগ্রীর দোকান থেকে বিশেষ ধরণের কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ কিনে এনে, সযত্নে এ খেলার কলা কৌশলটুকু রপ্ত করে নিলেই, গোটা চার-পাঁচ কাঁচের গেলাসে জল ভরে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে অনায়াসেই তোমরা পূজার ছুটির আসরে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে অভিনব মজার এই রাসায়নিক-প্রক্রিয়া অর্থাৎ, 'রঙীন-জলের আজব-কশরতের' কেরামতী দেখিয়ে তাঁদের প্রচুর আনন্দ দিতে পারবে।

'রঙীন-জলের আজব কশরতীর' এই মজার খেলাটি দেখানোর জন্য চাই—ছোট এক শিশি 'প্রুশিয়েট্ অফ্ পটাশ' (Prussiate of Potash) সামান্য একটু 'সাল্‌ফেট্ অফ্ আয়রন' (Sulphate of Iron), খানিকটা 'নাইট্রেট অফ্ বিস্‌মাথ' (Nitrate of Bismuth) এবং অল্প একটু 'সাল্‌ফেট্ অফ্ কপার' (Sulphate of Copper)। এগুলি অবশ্য সংগ্রহ করতে হবে কোনো ভালো ওষুধের দোকান কিম্বা রাসায়নিক ল্যাবরেটরী থেকে। এছাড়া দরকার—এক গামলা পরিষ্কার জল আর গোটা-পাঁচ স্বচ্ছ-কাঁচের গেলাস।

ফর্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হলে আসরে দর্শকদের সামনে খেলার কশরৎ দেখানোর আগেই, নেপথ্যে ...অর্থাৎ, তাঁদের দৃষ্টির অগোচরে কয়েকটি দরকারী কাজ সেরে নেওয়া কর্তব্য। নাহলে, আসরে সবাইকার সামনে উদ্যোগ পর্বের এসব খুঁটিনাটি ব্যবস্থাগুলি সারতে হলে, আসল কশরতের মজা আর কেরামতী ব্যাহত হবারই সম্ভবনা বেশী। কাজেই উদ্যোগ আয়োজনের কাজটুকু আগে খেলা দেখানোর আগেই সঙ্গোপনে এবং সুষ্ঠুভাবে সেরে রাখাই ভালো।

উদ্যোগ-পর্বের কাজের সময়, গোড়াতেই কাঁচের গেলাসগুলিতে জল ভরে নাও। তারপর প্রথম গেলাসটির জলে কয়েক ফোঁটা 'প্রুশিয়েট্ অফ্ পটাশ' মিশিয়ে, সেটিকে আলাদা সরিয়ে রাখো—আসরে খেলা দেখানোর সময় ব্যবহারের জন্য। এবারে দ্বিতীয় গেলাসটির জলে মেশাও সামান্য একটু 'সাল্‌ফেট্ অফ্ আয়রন'। তবে নজর রেখো—এ গেলাসে কিন্তু রাসায়নিক পদার্থের চেয়ে জলের ভাগ যেন কিছু বেশী থাকে। কারন, তাহলে এ গেলাসের 'মিশ্রণ' বা 'Solutionটি' কশরৎ-দেখানোর প্রয়োজনানুযায়ী সামান্য একটু 'ফিকে' বা 'দুর্ব্বল' (a weak Solution) হবে। এ গেলাসের 'মিশ্রণটিকে' আসরে খেলা দেখানোর সময়ের জন্য আলাদা সরিয়ে রেখো।

এ কাজ সারা হলে, তৃতীয় গেলাসের জলে অল্প পরিমাণে 'নাইট্রেট্ অফ্ বিসমাথ' মিশিয়ে নাও এবং আগের অন্য দুটি গেলাসের 'মিশ্রণের' মতো, এ গেলাসটিকেও সযত্নে খেলার আসরের জন্য আলাদা সরিয়ে রাখো। তারপর চতুর্থ গেলাসের জলে মিশিয়ে নাও—অল্প একটু 'সাল্‌ফেট্ অফ্ কপার' এবং ইতিপূর্ব্বে যেমন করেছো, তেমনিভাবে আলাদা সরিয়ে রাখো এ গেলাসের 'মিশ্রণটুকু'। তাহলেই উদ্যোগ-পর্ব্বের কাজ মিটবে।

এবারে আসরের দর্শকদের সামনে 'রঙীন-জলের

আজব-কশরৎ' দেখানোর পালা। এ খেলা দেখানোয় সময়, দর্শকদের চোখের সুমুখে সাড়ম্বরে টেবিলের উপর সারি দিয়ে শূন্য নির্জ্জলা পঞ্চম গেলাসটির পাশেই সাজিয়ে রাখো—বিভিন্ন 'রাসায়নিক মিশ্রণের' স্বচ্ছ নির্ম্মল জল-ভরা চারটি আলাদা আলাদা গেলাস। এসব গেলাসের স্বচ্ছ নির্ম্মল 'মিশ্রণ' দেখে দর্শকদের কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা ধারণা জন্মাবে না যে তার মধ্যে কোনো কারসাজি রয়েছে বা গেলাসগুলিতে সাধারণ জল ছাড়া অন্য কিছু মিশিয়ে রাখা আছে। দর্শকদের মনে স্বাভাবিকতার এই ধারণাটি সুদৃঢ় করে তোলার পর, সুরু করো—খেলা দেখানোর আসল কশরৎটী।

অর্থাৎ, গোড়াতেই শূন্য নির্জ্জলা পঞ্চম গেলাসটিতে ধীরে ধীরে সযত্নে ঢেলে মিশিয়ে দাও—প্রথম এবং দ্বিতীয় গেলাসের স্বচ্ছ তরল 'মিশ্রণ' দুটি···প্রুশিয়েট্ অফ্ পটাশ্' এবং 'সাল্‌ফেট্ অফ্ আয়্‌রন্' মেশানো জল। এ দুটি তরল রাসায়নিক পদার্থের পরস্পর মিশ্রণের ফলে, দর্শকেরা অচিরেই দেখবেন যে বিজ্ঞানের রহস্যময় যাদুস্পর্শে পঞ্চম গেলাসের জলটুকু উজ্জ্বল অভিনব গাঢ় নীল রঙের হয়ে উঠেছে।

এ কশরৎ দেখানোর সঙ্গেই পঞ্চম গেলাসটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ধুয়ে সাফ্ করে নাও। তারপর সেই পঞ্চম গেলাসের মধ্যে আগের বারের মতোই ধীরে ধীরে মিশিয়ে দাও প্রথম এবং তৃতীয় গেলাসের স্বচ্ছ নির্ম্মল 'মিশ্রণ' দুটী—অর্থাৎ, 'প্রুশিয়েট্ অফ্ পটাশ্' আর 'নাইট্রেট্ অফ্ বিস্‌মাথ্' রাসায়নিক পদার্থের জল। এই দুটি রাসায়নিক পদার্থের পরস্পর মিশ্রণে দর্শকেরা এবারে দেখতে পাবেন যে পঞ্চম গেলাসের জলটুকু ধীরে ধীরে বেশ উজ্জ্বল অপরূপ হলুদবর্ণ ধারণ করেছে।

এ কশরতী দেখানোর পর, আগের বারের মতোই পুনরায় পঞ্চম গেলাসটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ধুয়ে সাফ্ করে নিয়ে ধীরে ধীরে সেটির মধ্যে মেশাও এবারে প্রথম ও চতুর্থ গেলাসের 'মিশ্রণ' দুটি—অর্থাৎ, 'প্রুশিয়েট্ অফ্ পটাশ্' এবং 'সালফেট্ অফ্ কপার' রাসায়নিক পদার্থ মেশানো জল। এভাবে 'মিশ্রণের' ফলে, দর্শকেরা এবারে দেখবেন যে পঞ্চম গেলাসের স্বচ্ছ নির্ম্মল জলটুকু ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে অপরূপ উজ্জ্বল 'বাদামী-লাল' রঙের।

দর্শকদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো এমন আজব কারসাজির আসল রহস্য জানা নেই, কাজেই 'রঙীন জলের' এই আজব কশরৎ দেখে তাঁরা যে রীতিমত অবাক হয়ে যাবেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

যাই হোক, এ খেলার কলা কৌশল তো শিখলে—এবার তোমরা নিজেরাই হাতে-কলমে পরখ করে ছাখো এ কশরতীর আসল রহস্য! আগামী সংখ্যায় এ ধরণের আরেকটি মজার খেলার পরিচয় দেবো।

—

ফুল পরী

শুচিস্মিতা দাশগুপ্তা

ফুলপরী, ফুলপরী, থাকিস কোথায়!
ডানা মেলে বেড়াস কি হেথায় হোথায়?
চোখে তোকে দেখিনাক শুনি কথা তোর,
দেখতে তো ইচ্ছা যে মনে আছে মোর।
স্বপ্নে যে দেখি তোকে, ওরে ফুলপরী।
জাগরণে তোকে মনে কল্পনা করি।
আমাদের অগোচরে চুপি চুপি ফুলে,
বলে যাস কত কথা মন প্রাণ খুলে।
জানতে পারিনাক, মিছে তুই নাকি?
সত্যি কি তুই নেই? সবটাই ফাঁকি?

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের উত্তেজনা এ যুগের বয়স্ক ব্যক্তি সকলেরই মনে আছে। মাষ্টারদা অর্থাৎ সূর্য সেন, লোকনাথ বল ইত্যাদি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ স্মরণীয় হয়েই থাকবেন কিন্তু ওঁদের সঙ্গে রমেন দের নাম কেউ করবে কি? ঐ রমেন দের ধরবার জন্য সেকালের বৃটিশাধীন পুলিশরা যে প্রচণ্ড উদ্যম ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল সেই লোহমর্ষণ কাহিনী আমরা সেই সেকালের কয়েকজন ছাড়া আর কেউই হয়ত জানে না, তাই মরবার আগে আমাদের সেই তারুণ্যের বিপজ্জনক ঘটনাগুলো যেমনভাবে ঘটেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই ছাপার অক্ষরে সকলকে জানিয়ে যেতে চাই। জানিয়ে যেতে চাই যে, আমার বন্ধু রমেনরাও বৃটিশানুরক্ত পুলিশের কম চক্ষুশূল ছিল না। তারাও কম কাজ করেনি সেই সব রক্তক্ষরা বিভীষিকার যুগে।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে জড়িত ছেলেরা তখন পুলিশ ও মিলিটারীর তাড়া খেয়ে যে যেদিকে পেরেছে সরে পড়েছে। পুলিশের গোপন সার্কুলার, 'ষোল থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের তরুণ ও যুবকদের ওপোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে, ঐ বয়সের অনেকগুলি আসামী ফেরার হয়ে ঘুরছে'। এস্ বি ডি ডি অর্থাৎ স্পেশাল ব্রাঞ্চ ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের লোকেরা সতর্কভাবে কড়া নজর রেখেই চল্‌ত।

এমনই এক সময়ে মধুপুর সার্কেলের পুলিশ তিনটি ছেলের সন্ধান পেলে ওদেরই ঐ অঞ্চলে। তিনজনেই কলেজের ছেলে বলে মনে হোল। প্রথম যখন নজর পড়ল তখন দেখা গেল, ওরা এক ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে উশ্রী ঝরণায়, ঝরণার কাছে এক পাথরের ওপোর বসে সেদ্ধ ছোলা, কাঁচা লঙ্কা এবং শুকনো চিঁড়ে খাচ্ছে। এস্ বি অর্থাৎ সি আই ডি-র স্পেশাল ব্রাঞ্চের তরুণ ও উৎসাহী এক চতুর কর্মচারী উশ্রী অঞ্চলে বিশেষ এক-জনের সন্ধানে ঘোরাফেরা করছিল। তার নাগাল সে পায়নি, পরিবর্তে এদের দিকেই তার সন্ধানী চোখের

নজর পড়েছিল। তার শিক্ষিত শাণিত দৃষ্টি এক লহমায় বুঝে ফেলে যে, এই তিনজন পালিয়ে পালিয়েই বেড়াচ্ছে, এরা নিশ্চয়ই—

ভদ্রলোকের পুরো নাম জানি না পদবী ছিল ভট্টাচার্য্য। মিঃ ভট্টাচার্য্য খুব সন্তর্পণে ওদের কাছাকাছি গিয়ে খুব ভদ্রভাবে প্রথম প্রশ্ন করছিল, একস্‌কিউজ মি জেণ্টেলমেন, এই উগ্রী ফল্‌স কোনরকম প্রাচীন পুরাকীর্ত্তি কিছু আছে কি? দেখবার মত?

তিনটি ছেলের মধ্যে যে একটু বেশী চটপটে, ঐ তিনজনের লীডার বলে যাকে মনে হোল, সে বল্লে, জানি না; আমরাও দেখতে এসেছি, কিন্তু ঝরণা ছাড়া আর কিছুই ত দেখছি না।

বাকী দুটি ছেলে তাদের কাঁধের ঝোলাগুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে তৎপর হয়ে উঠল। মিঃ ভট্টাচার্য্যের চোখে ধরা পড়ল তাদের সন্ত্রস্ত ভাব। কিন্তু প্রকাশ্যে ভট্টাচার্য্য কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেনি।

এক মুঠো চিঁড়ে মুখে দিয়ে একটি ছেলে বলে, কি রমেন আর নিবি না? হাত গুটিয়ে রইলি কেন?

তাহলে ঐ লীডারের নাম রমেন, ভট্টাচার্য্য নামটা মুখস্থ করে নিলে।

রমেন বল্লে না, আর ভাল লাগছে না।

তৃতীয় ছেলেটি বল্লে, সুধীরদার যেমন কাণ্ড, বল্লুম, চিঁড়েগুলো ভিজিয়ে নি, শুকনো চিঁড়ে কি খাওয়া যায়?

কিসে ভেজাবি? তোর ঐ রুমালে বেঁধে ঝরণার পাশের জমা জলে ডুবিয়ে খাওয়া বাপু আমার পোষাবে না। তোরা ভেজালেই পারতিস্‌, রমেন বিরক্ত হয়ে উত্তর দিয়েছিল।

ওদের কথাবার্ত্তায় বেশ একটু পূর্ব্ববঙ্গীয় টান ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে চেষ্টা করে কলকাতার উচ্চারণ মেশানো হয়েছে বলে ভট্টাচার্য্যের মনে হোল।

মনের ভাব গোপন রেখে ভট্টাচার্য্য বল্লে, কোথায় এসেছেন আপনারা?

এই বেড়াতে, উগ্রী দেখতে—রমেন ওর প্রশ্নটা যেন এড়িয়ে যেতে চায়।

ভট্টাচার্য্য বল্লে, বাড়ী?

কলকাতায়।

ভট্টাচার্য্য মনে মনে হাসলে। কলকাতার ছেলে, বেড়াতে এসেছে উগ্রী ঝরণায়, খাচ্ছে শুকনো চিঁড়ে এবং ছোলা সেদ্ধ, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এদের তাঁওতাবাজী! শিকার পেয়ে ভট্টাচার্য্য মনে মনে উল্লসিত হোল, সেই সঙ্গে শঙ্কিতও বটে। এরা তিনজন, ও একা। তা ছাড়া ওপারে যে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে সেটা ঠিক ভাড়াগাড়ী না হয়ে এদের দলেরও হতে পারে; তা হলে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নিয়ে এরা চারজন, অস্ত্রশস্ত্র নিশ্চয়ই আছে, অতএব এদের ঘাঁটানো উচিত হবে না। বেচারী ভট্টাচার্য্য নিজে এসেছে এক বেবী অষ্টিনে, নিজে চালিয়ে! অতএব সে বেচারী নিছক একা।

রমেনের দল ঝোলাঝুলি গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। বেলা তখন হবে আন্দাজ দশটা।

সে আমলে উগ্রী ঝরণায় যেতে হলে ঝরণার আধ মাইলটাক দূরে একটা ছোট্ট জলের ধারা পার হতে হোত। এখন তার ওপোর ভাল সাঁকো হয়েছে, গাড়ীগুলো এখন নির্বাধায় সাঁকোর ওপর দিয়ে যায়, কিন্তু সে সময়ে কেবলমাত্র বড় এবং উঁচু গাড়ীগুলোই জল ভেঙ্গে যেতে পারত। রমেনদের ফোর্ড ট্যাক্সিখানা বালি পাথর ও জল ডিঙিয়ে এসেছিল, কিন্তু ভট্টাচার্য্যের বেবী অষ্টিন জলের ওধারে অর্থাৎ এখান থেকে আধ মাইল দূরে পড়েছিল। ভট্টাচার্য্য রমেনদের অনুনয় করে বল্লে, যদি কিছু মনে না করেন, আমার গাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে যদি একটু লিফ্‌ট দিতে পারেন—

রমেন ওর সঙ্গীদের দিকে চেয়ে দেখলে। চোখে চোখে কি যেন ইশারাও হোল। রমেন বল্লে বোধ হয় ড্রাইভার রাজী হবে না, পাথুরে রাস্তা, গাড়ী ভারী হয়ে গেলে পাঙ্কার হবার ভয় আছে।

ভট্টাচার্য্য নাছোড়বান্দা। অনুনয়ের মাত্রা বাড়িয়ে বল্লে, তিনজনের জায়গায় চারজন হলে বেশী আর কত ভারী হবে?

অচেনা লোকের পীড়াপীড়িতে রমেনদের সন্দেহ ঘনীভূত হোল। দিনকাল খারাপ, চতুর্দ্দিকেই গোলমাল। কাউকে কোন আমল দেওয়া উচিত নয়। রমেন সুধীরের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে দেখেছিল। ভট্টাচার্য্য লক্ষ্য করলে।

সুধীর ছেলেটা মুখফোঁড়। সোজা বল্লে, আপনি ত আমাদের ভরসায় এখানে আসেন নি। আমাদের আগেই ত এসেছেন। আসার সময় আপনার গাড়ী আমরাও দেখে এসেছি।

ওরা তিনজনে ট্যাক্সির দিকে তাড়াতাড়ি পা চালালে।

পেছন থেকে ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ভট্‌চাযা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল। ছোকরা তিনজন ট্যাক্সির কাছে আসতেই ভট্‌চাযি্য ট্যাক্সির নম্বরটা মনে মনে মুখস্ত করে নিলে। ওরা গাড়ীতে উঠতেই ড্রাইভার ষ্টার্ট দিলে। ভট্‌চাযি্য তখন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি প্রায় যেন ছুটে চল্লো ওর নিজের গাড়ীর উদ্দেশ্যে। হাতে পেয়ে মাল যেন ফস্‌কে না যায়।

ফোর্ড গাড়ী ধোঁয়া ছেড়ে ভট্‌চাযি্যর দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। ভট্‌চাযি্য তখন রীতিমত দৌড় দিলে। আর একটা ভয় ওর মনে এল ওরা যদি যাবার সময় ওর গাড়ীটার কোন ক্ষতি করে যায়, কিংবা—কিংবা ওরা ত পরে এসেছে, বেবী অষ্টিনটাকে দেখে এসেছে। সেই সময়েই যদি গাড়ীটাকে জখম করে এসে থাকে। হয়ত ওর গাড়ীটাকে ওরা চেনে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে ভট্‌চাযি্য গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ছুটতে লাগল। একবার মনে হোল, তাই বোধ হয় করেছে, সেই জন্তেই লিফ্‌ট দিতে রাজী হোল না।

আধ মাইল দৌড়ে এসে লাফিয়ে লাফিয়ে জুতো ভিজিয়ে ভট্‌চাযি্য জল পার হয়ে বেবী অষ্টিনের কাছে পৌঁছে দেখলে গাড়ী ঠিকই আছে। এক নিঃশ্বাসে স্টার্ট দিতে চেষ্টা করলে। কিন্তু স্টার্ট হয় না। বিপদ, নিশ্চয়ই ওরা কিছু করে দিয়ে গেছে। চট্টগ্রামে যারা বৃটিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করতে গিয়েছিল তাদের অসাধ্য কিছুই নেই। হ্যাণ্ডেল হাতে ভট্‌চাযি্য গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামল। হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে স্টার্ট দেবে। কিন্তু যতই হ্যাণ্ডেল ঘোরায়, স্টার্ট আর হয় না। এখন উপায় ?

সে আসলে এ অঞ্চলে কোন লোকালয় ছিল না। অনেক দূরে একটা গ্রাম ছিল, কিন্তু গাড়ী মেরামতের কোন ব্যবস্থাই সেখানে নেই, ভট্‌চাযি্য সে কথা জানে। গাড়ীর ঢাক্‌না খুলে ভট্‌চাযি্য এটা ওটা নেড়ে-চেড়ে দেখলে, সমস্তই ঠিক আছে। তা হলে কি করা যায়। হঠাৎ ওর মনে হোল, সর্বনাশ, যদি রমেনদের কোন লোক আশে পাশে লুকিয়ে থাকে এবং ওকে দূর থেকে গুলি করে দেয়, তা হলে? এখানে এমন কেউ নেই যে ওর মৃত্যু সংবাদটা পর্যন্ত গিরিডিতে পৌঁছে দেবে। ভট্‌চাযি্যর কপাল দিয়ে দর্‌দর্‌ করে ঘাম ঝরতে লাগল। সে হতাশ হয়ে গাড়ীর দরজা খুলে ভেতরে নিতান্ত অসহায়ের মতন ষ্টিয়ারিং-এ ধপ করে বসে পড়ল। কি যে করা উচিত তা সে ভাবতেও পারছিল না। এ গাড়ীকে ওরা নিশ্চয়ই বিকল করে দিয়ে গেছে।

বসে বসে ভট্‌চাযি্য একে একে সব কথা বিশ্লেষণ করতে লাগল। আজ ভোরবেলা তেল মবিল ভর্তি করে সে বেরিয়েছে। আসার সময় গাড়ীখানা সুন্দর এল, কোন ট্রাবল্‌ দেয় নি ; এ গাড়ীতে এরকম ট্রাবল্‌ তার কখনও হয় নি। এখনও ত গাড়ীতে কোন গোলমাল হয়েছে বলে তার মনে হোল না কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে না কেন। স্টার্ট না হলে একে ঠেলে নিয়ে যাওয়াও ত মুস্কিল। গিরিডি প্রায় ন মাইল। তবে দূরের গ্রাম থেকে যদি দু'তিনজন লোক পাওয়া যায়, একমাত্র তাহলেই একে ঠেলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, না হলে—

লোক পেতেই হবে। এভাবে বসে থাকলে চলবে না। হয়ত ঠেলে দিলেই গাড়ীখানা চলতে পারে। তা হলে লোকই দেখতে হবে, অতএব মিছামিছি সময় নষ্ট করা উচিত নয়। গাড়ীর চাবিটা বন্ধ করে গাড়ী থেকে বেরুবে ভেবে গাড়ীর চাবি বন্ধ করতে গিয়ে ভট্‌চাযি্য দেখে, ওমা, একি ? চাবি ত খোলাই হয় নি।

এক বুক আশা নিয়ে চাবি খুলে সেল্‌ফে চাপ দিতেই গাড়ী স্টার্ট নিলে।

ভট্‌চাযি্য নিজের কাছেই নিজে যেন লজ্জায় মরে গেল। ছিঃ ছিঃ, দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনায় গাড়ীর চাবিটা না ঘুরিয়েই সে এতক্ষণ গাড়ী নিয়ে ঠেলাঠেলি করেছিল। প্রায় পনর বিশ মিনিট সময় সে সামান্য একটু ভুলের জন্ত অযথা নষ্ট করেছে। ওদিকে আধমাইল পাহাড়ী

পথ দৌড়ে আসতে ও কিছু না হোক অন্তত আট মিনিট গেছে। ষ্টীয়ারিং ধরেই ভট্টাচায্যি সবেগে গাড়ী ছোটালো গিরিডির দিকে।

কিছু দূর যেতে যেতেই মনে হোল, তাইত, ট্যাক্সির নম্বরটা কি যেন দেখেছিল সে, ঐ নম্বরটা, যেটা সে মুখস্থ করে নিয়েছিল।

সর্বনাশ! নম্বরটা কি ছিল ঠিক ত মনে হচ্ছে না।

নিজের গাড়ীতে আরও জোর দিলে, আরও জোর'—এই ন মাইলের মধ্যে ওদের কোন রকমে ধরতেই হবে, কিন্তু তা কি হবে?

ষ্টীয়ারিং ধরে গাড়ী চালাচ্ছে আর প্রাণপণে স্মরণ করার চেষ্টা করছে ট্যাক্সির নম্বরটা। হঠাৎ মনে হোল, হাঁ, এই নম্বরই বটে। ঠিক, ঠিক আছে—

একটা মরা-জরা বাছুর রাস্তার ধার থেকে ঘাস ছিঁড়ে খেতে খেতে হঠাৎ রাস্তার ওপরে এসে উঠল। কোন রকমে সেটাকে সামলে নিয়ে মিঃ ভট্টাচায্যি গিরিডির দিকে প্রায় ষাট মাইল বেগে ছুটে চল্ল।

পাঁচ সাত খানা গরুর গাড়ী পথের মাঝখান দিয়ে দুল্‌কী চালে চলেছে। হর্ণ দিতে দিতে ভট্টাচায্যি ওদের পেছনে এসে হাজির হোল। গাড়ীগুলো রাস্তার এক পাশ হতে ভট্টাচায্যি সন্তর্পণে ওদের পাশ কাটাতে কাটাতে গাড়োয়ানদের লক্ষ্য করে হিন্দীতে প্রশ্ন করলে, কোন মোটর এমনি ভাবে ওদের পাশ কাটিয়ে একটু আগে গিয়েছে কি না?

ওরা বল্লে, কেয়া পুছতা সাব?

ও আর একবার জিজ্ঞাসা করতেই তাদের মধ্যে একজন বল্লে, জী।

পাশ কাটিয়ে যেতে যেতেই ভট্টাচায্যি বল্লে, সে গাড়ীতে কে কে ছিল দেখেছ?

একজন গাড়োয়ান বল্লে, দেখা জী। এক সাহাব এক মেম সাহাব, আউর এক জবর কুত্তা।

আর একজন বল্লে, হাঁ জী, বহুৎ জবর কুত্তা, একদম্ শের্ কো মাফিক।

ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসে ভট্টাচায্যি মনে মনে বল্লে, জাহান্নম্ মে যাও।

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ভট্টাচায্যি পুরো জোরে গাড়ী ছেড়ে ভাবলে, কি জানি, তবে কি ওরা অন্য কোনদিকে ভাগল নাকি? কিন্তু এখানে ত মোটর যাবার অন্য রাস্তা আর নেই। একটাই ত রাস্তা।

একবার মনে হোল, হতেও পারে, ফিফ্‌থ্ মাইলের কাছে বেশ খানিকটা ঝোপ আছে। রাস্তা থেকে ঐ ঝোপে নামা অসম্ভব নয়।

ঐখানে গাড়ীটা লুকিয়ে রেখে—

কিন্তু আর ফেরা যায় না। তবে ট্যাক্সির নম্বরটা লিখে নেওয়া দরকার। ফের যদি ভুলে যায়!

গাড়ী থামিয়ে নোট বই বার করে ট্যাক্সির নম্বরটা টুকে রাখলে। মনে মনে সে হতাশ হয়ে গিয়েছিল। দৌড়োদৌড়ি করে আর কি হবে? পাখী যখন উড়েই গেছে, তখন একমাত্র ভরসা সেই ট্যাক্সির নম্বর। সেই নম্বর ধরে যদি কিছু করা যায়।

গাড়ী চালাতে চালাতে ভট্টাচায্যি ম্লান হাসি হাসলে, ভাবলে বামুনের বরাতে আর কি হবে! তিন-তিনটেকে হাতে নাতে ধরতে পারলে চাকরীতে সঙ্গে সঙ্গে প্রমোশন হোত, কিন্তু এ এখন বিশ হাত জল। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

গিরিডির কাছাকাছি এসে ও ঠিক করলে, প্রথমেই ট্যাক্সি স্টাণ্ডে গিয়ে ঐ নম্বরের গাড়ীটা খোঁজ করবে তারপর যেমন যেমন বুঝবে সেই মত চলতে হবে।

ট্যাক্সি স্টাণ্ডে খবর নিয়ে যা শুনলে, তা আরও মজাদার। স্ট্যাণ্ডের যে বুড়ো ট্যাক্সিওয়ালাটা পুলিশের স্পাইগিরি করে দু'চার টাকা পেত, সে লোকটা বল্লে, ঐ ট্যাক্সি ত আজ স্ট্যাণ্ডেই আসবে নি সাব, ও আজ পরেশনাথ পাহাড়ে যাবে সেখানে থেকে প্যাসেঞ্জার আনতে। এতক্ষণে,—হ্যাঁ, এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে।

তুমি কি করে জানলে? ভট্টচায্যি প্রশ্ন করেছিল।

সে বল্লে, কাল আমায় ঐ কথাই সে বলেছিল। এক জৈন মাড়োয়ারী ফ্যামিলিকে সে পরশু পরেশনাথ পৌঁছে দিয়েছিল, আজ তাদের আনার কথা। সে বলেছিল, সকালে আজ আর ভাড়া খাটবে না, একেবারে এগারটা নাগাদ গ্যারেজ থেকে সোজা পরেশনাথে রওনা হয়ে যাবে।

চোখ কুঁচকে ভট্‌চাযি্য একবার ভেবে নিলে নম্বরটা কি সে ভুল করেছে। জিজ্ঞাসা করলে, গাড়ীটা কি রকম বল ত?

সে বল্লে, হুড্‌কভার ফোর্ড গাড়ী, টি মডেল, কালো রং, পেছনের ডানদিকের মাড্‌ গার্ডটা টোল খেয়ে আছে।

ভট্‌চাযি্যর মনে পড়ল ঠিক তাই, তাহলে নম্বর বলতে ভুল হয়নি,—পেছনের মাড গার্ডের টোল্‌টাও ওর স্পষ্ট মনে আছে।

ভট্‌চাযি্য তাড়াতাড়ি থানায় চলে গেল।

থানা থেকে ভটচাযি্য ফোন করল হাজারীবাগকে। এই নম্বরের এইরকম গাড়ী, পেছনের ডানদিকের মাড গার্ডে টোল্‌ আছে, গিরিডি থেকে পরেশনাথে যাচ্ছে। ঐ গাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখ। কোন প্যাসেঞ্জার আছে কি না, পরেশনাথে যায় কি না, এককথায় ওর গতিবিধি নজর কর। সেই সঙ্গে আরও বল্লে, পরেশনাথে তোমাদের স্পেশাল মেসেঞ্জার পাঠিয়ে পরেশনাথকে জানিয়ে দাও ঐ গাড়ীটাকে বিশেষ দরকার।

হাজারীবাগ বল্লে, গাড়ীটা কি আটকাব? শিওর প্রুফ্‌ আছে?

ইতস্ততঃ করে ভটচাযি্য বল্লে, না, আটকাবার দরকার নেই, লক্ষ্য রাখবে, ফলো করবে এবং ওটাকে দেখলেই আমাকে জানাবে। ওটাকে আমার চাই।

ইংরেজ আমলের পুলিশের এইটুকু গুণ ছিল, তারা নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া কাউকে তার আইন সম্মত কাজে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করত না। নিঃশব্দে পেছন পেছন অনুসরণ করত অনেকেরই, কিন্তু নিছক সন্দেহের ওপোর কাউকে নিয়ে টানাটানি করত না।

এরপর ভটচাযি্য থানা অফিসারকে সংবাদটা সংক্ষেপে জানিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য পুলিশ মেসে চলে গেল।

বেলা আড়াইটের সময় টেলিফোন এল হাজারীবাগ থেকে। হাজারীবাগ পুলিশ জানাচ্ছে, এত নম্বরের গাড়ী হাজারীবাগ কলেজ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পরেশনাথের দিকে চলে গেছে। গাড়ীতে তিনজন ইয়ং ম্যান ছিল।

গিরিডি প্রশ্ন করলে, কলেজ হোস্টেলে কার কাছে ওরা গিয়েছিল?

হাজারীবাগ এর কোন উত্তর দিতে পারলে না। বল্লে, গাড়ী যখন হোস্টেলে গিয়েছিল তখন ওরা কেউ দেখে নি; বেরোবার সময় ওরা দেখেছিল।

গিরিডি থানা অফিসার বল্লেন, হোস্টেলের দারোয়ানের কাছ থেকে সব জেনে তাড়াতাড়ি খবর দাও এবং পরেশনাথে লোক পাঠাও ঐ গাড়ীর গতিবিধি এবং ঐ তিনজন ছোকরার সন্ধান নিতে। কুইক, মোষ্ট সিক্রেট, আর্জেন্ট।

বিকেলের দিকে ভটচাযি্য পুনরায় ডাকলে হাজারীবাগকে, কি খবর? হোস্টেলের দারোয়ান কি বলে?

হাজারীবাগ বল্লে, দারোয়ান অসুস্থ থাকায় আজ হোস্টেলের গেটে কেউই ছিল না। হোস্টেলের সামনের এক দোকানদার ঐরকম একটা গাড়ী দেখেছিল বটে, কিন্তু গাড়ীর ছোকরা তিনজন হোস্টেলের কোন্‌ ঘরে কার সঙ্গে দেখা করেছে বা কি করেছে তা সে বলতে পারলে না। তা ছাড়া হোস্টেলের খবর ত জানেন? হট বেড্‌ অফ টেররিসম্‌। কেউ কিছু বলবে না।

ভটচাযি্য বুঝলে, ঠিক তাই। এইমাত্র তিন সপ্তাহ আগে ঐ হোস্টেল থেকে দু'জনকে চালান দেওয়া হয়েছে রাজদ্রোহিতার অপরাধে। ওখানকার সব কটা বোর্ডারই শয়তান।

গিরিডির ও সি বল্লেন, হোস্টেলের সুপারিণটেণ্ডেন্টকে চাপ দিলে কিছু পাওয়া যাবে না?

ভটচাযি্য বল্লে, সে আরও সাংঘাতিক চিজ্‌। আইরিশ সাহেব, ডি ভ্যালেরায় পুষ্যি পুত্তুর। সারা পৃথিবীর সব টেররিস্ট্‌দের সঙ্গে ও বেটার আত্মার যোগ আছে।

টেবিলে চড় মেরে থানা অফিসার বল্লে, এমন লোককে হোস্টেল সুপারিনটেণ্ড করে কেন্? তাড়িয়ে দিতে পারে না?

ভটচাযি্য বল্লে, হুঁ খৃষ্টান পাদ্রী। লালমুখ,—ওদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস আছে কার? আমরা এই

দেশী পুলিশরা ওর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ পেলেও সাহেব এস্ পি আমাদের ধমকে উড়িয়ে দেবে।

এরপর দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ভটচায্যি বল্লে, পরেশনাথ একবার যেতে পারলে হোত। মনে হয় ওরা ঐখানেই কোন জায়গায় আড্ডা নেবে। ঘুঘু ছেলে সব। জানে পরেশনাথের ঐ ধারটায় টেলিফোন টেলিগ্রাম কিছুই নেই, তা ছাড়া জঙ্গলও গভীর। একবার লুকোতে পারলে কারুর বাবার সাধ্য নেই খুঁজে বার করে।

আপনি যাবেন? পুলিশের ও সি ভটচায্যিকে প্রশ্ন করলে।

ভাব্‌ছি। কিন্তু একা গিয়ে কি লাভ? তা ছাড়া ওরা আমাকে চেনে, আমাকে দেখলেই সাবধান হবে কিম্বা মরিয়া হয়ে—

তা ঠিক! আচ্ছা তা হলে যদি মিঃ যাজ্ঞিককে দেওয়া যায়!

খুব ক্লেভার ইন্‌ভিষ্টিগেটার।

চিন্তিত মুখে ভটচায্যি বল্লে, তা ওঁকে সব বুঝিয়ে দিয়ে পাঠানো যায়, কিন্তু—

কিন্তু কি?

নাঃ, কিছু নয়, ভটচায্যি বিমর্ষ মুখে ভাবছিল।

ও সি হেসে উঠল। বল্লে, হ্যাঁ তা বটে। আপনার ক্রেডিটটা যাজ্ঞিকই নিয়ে নেবে।

ভটচায্যি উঠে দাঁড়াল। মুখে বল্লে, ভেবে চিন্তে দেখি কি করা যায়। এখন ব্যাপারটা পুরো গোপন রাখবেন, আপনার স্টাফের কাছেও।

সেদিন রাত এগারটায় ফোর্ড ট্যাক্সিখানা গারেজে তুলে সেই ড্রাইভার নিজের বস্তিতে যাবার জন্যে পা ফেলতেই এক সিপাহী তাকে বল্লে, থানামে চলো, বাৎ হ্যায়।

ট্যাক্সিওয়ালা ঘাবড়ে গেল। বিরক্তও হোল। কিছুই সে করে নি,—শুধু শুধু থানায় কেন। বিশেষতঃ সে ভোর থেকেই খাটছে, দুপুরের খাওয়াটাও ভাল হয় নি, কিন্তু যমে ধরলে তাকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, পুলিশের বেলাও ঠিক তাই। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও গজ্‌গজ্‌ করতে করতে সিপাহীর সঙ্গে থানায় এসেছিল।

ড্রাইভারকে ভটচায্যি অনেকরকম প্রশ্ন করলে। লোকটা এত চালাক—সবরকম প্রশ্নের খুব সহজ সরল উত্তর দিয়ে গেল, কিন্তু ভটচায্যি বুঝলে, লোকটা ইচ্ছে করেই আসল ব্যাপার গোপন করে যাচ্ছে। করবেই ত, দলের লোক যে, ঐ সব সন্ত্রাসবাদীদের দল দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

ভটচায্যি প্রশ্ন করলে, আজ সকালে উস্ত্রী ফল্‌স গিয়েছিলে?

ড্রাইভার বল্লে, জী।

প্যাসেঞ্জার কে ছিল?

তিন বাঙ্গালী আদমী।

ওদের পেলে কোথায়?

স্টেশনমে।

এটা কি ঠিক যে তুমি তোমার বন্ধুর কাছে বলেছিলে যে, আজ সকালে তুমি ভাড়া খাটবে না দুপুরে পরেশনাথে প্যাসেঞ্জার আনতে যাবে?

জী!

তবে সকালে স্টেশনে গেলে কেন? ঐ তিনজন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে তোমার আগে থেকে ঠিক ছিল তুমি ভোরবেলা নিতে যাবে?

নেহি সাব। ও তিনজনকে আমি কখনও দেখি নি।

ভটচায্যি জোর ধমক দিয়ে বল্লে ঝুট বাৎ মাৎ বলো। এৎনা সবেরে স্টেশনমে কিঁউ গিয়া?

সে বল্লে, না গিয়ে উপায় ছিল না। যে বস্তিতে থাকে, সেই বস্তির জমিদার তাকে আগের দিন রাত্তিরে ডাকিয়ে কড়া হুকুম দিয়েছিল, একদম্ সুবা তার বাল-বাচ্চাকে সাড়ে পাঁচটার ট্রেন ধরিয়ে দিতে হবে। জমিদারের হুকুক ত লঙ্ঘন করা যায় না, তাই সে স্টেশনে ওদের নিয়ে গিয়েছিল।

তারপর? অপেক্ষাকৃত নরম হয়ে ভট্টাচার্য প্রশ্ন করলে।

তারপর ঐ বাবুরা আমাকে ধরলে, বল্লে, উস্ত্রী যেতে

বাবুরা কোন ট্রেনে এল? অত ভোরে কোন ট্রেন ত আসে না।

মালুম নেই। রাতমে এসে হয়ত স্টেশনেই ছিল ওরা।

তারপর ওদের নিয়ে তুমি উশ্রী গেলে?

জী।

গম্ভীর কণ্ঠে ভটচাযি্য বল্লে, দিল্লগী মাৎ করো। ভোর সাড়ে পাঁচটায় গিরিডি স্টেশন থেকে বেরিয়ে উশ্রী যেতে অত সময় লাগল কেন? আউর কাঁহা গিয়া ঠিক সে বাতাও। সাচ্ বলো, ঝুট বোলনেসে দশ সাল ফাটক হো যায়গা।

লোকটা প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড়। বল্লে, আমি বাবুদের বল্লুম, যেতে পারব না। দুপুরে পরেশনাথ যাব, কাজেই সকালে বেরুব না। নিজেকে খেতে হবে, গাড়ীর তদ্বির করতে হবে, একটা আলাদা চাকা নিতে হবে, কাজেই তার পক্ষে উশ্রী যাওয়া সম্ভব হবে না। এতে বাবুরা বলেছিল, বাবুরাও পরেশনাথ যাবে। তাতে সে বলেছিল, পরেশনাথ নিয়ে যেতে সে পারবে, কিন্তু ফিরিয়ে আনতে সে পারবে না, তার পরেশনাথে প্যাসেঞ্জার আছে। তাতে বাবুরা বলেছিল, ফিরিয়ে আনতে হবে না। এর পর বাবুরা ঠিক করেছিল তাকে নগদ আট টাকা দেবে যদি সে উশ্রী ঘুরিয়ে বাবুদের পরেশনাথে ছেড়ে দেয়। সে গরীব আদমী, খালি গাড়ী নিয়ে পরেশনাথ যাবে, যদি মুফৎ আট রুপিয়া—

ধমক দিয়ে ভটচাযি্য বল্লে, ঠিক আছে, তুমি আমার কথার জবাব দাও। ভোর সাড়ে পাঁচটায় গিরিডি থেকে বেড়িয়ে বেলা নটার সময় যখন উশ্রী গেলে তখন এই তিন ঘণ্টা সময়ে তুমি আর কোথায় গিয়েছিলে? উশ্রী যেতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগে না।

সে বল্লে, ভোরবেলা বেরুতে পারিনি। পাঁড়েজীর দোকান খুলিয়ে চাকা নিলুম, মুন্নিলালের কাছ থেকে তেল নিলুম, গিরিডি থেকে বাবুদের নিয়ে বেরুতে আট, সাড়ে আট বেজে গেল। আমার কোন কসুর নেই।

শান্তস্বরে ভট্টচাযি্য বল্লে, ঠিক আছে, এই দু'তিন ঘণ্টা সময় বাবুরা কোথায় ছিল?

বাবুরা আমার গাড়ীতেই ছিল।

গম্ভীরকণ্ঠে ভট্টচাযি্য বল্লে, দেখ ড্রাইভার, বাজে কথা বোলো না। এই গিরিডি টাউনে কি আর দ্বিতীয় ট্যাক্সি নেই যে বাবুরা তোমার গাড়ীর জন্য তিন ঘণ্টা সময় তোমার পেছনে পেছনে ঘুরল। আসল কারণ কি ঠিক করে বল।

সে বল্লে, যা বুঝলুম, বাবুরা দেশ দেখতে বেরিয়েছে। গিরিডি থেকে উশ্রী যাওয়া আসা পাঁচ টাকার সমস্ত ট্যাক্সীই যাবে, কিন্তু গিরিডি থেকে পরেশনাথ কোন ট্যাক্সী ত্রিশ টাকার কমে যাবে না। এই আমি আমার যে প্যাসেঞ্জার আনতে গিয়েছিলাম সেই প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে আমার রফা ছিল চল্লিশ রুপিয়া। এই এতটা পথ তিনজনকে তিন টাকায় নিয়ে যাবো বলেই বাবুরা এতক্ষণ সময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ভুরু কুঁচকে ভট্টাচাযি্য বল্লে, তুমিই বা ওদের তিন টাকায় নিয়ে গেলে কি করে? পরেশনাথ যেতে তোমার তেলই পুড়বে আট দশ টাকার।

অসহিষ্ণু হয়ে ড্রাইভার বল্লে, আমার ত খালি গাড়ী নিয়ে যেতেই হোত। বাবুদের পৌঁছে দিয়ে যে তিন টাকা পেলুম তাই' ত আমার লাভ।

ভট্টচাযি্য নড়ে-চড়ে বসল। মনে ভাবল, লোকটা কি ঘুঘু, কথার এতটুকু নড়চড় নেই। এমনও মনে হল যে, এইসব বদমাসদের ধরে আচ্ছাসে ধোলাই দিলে আসল কথা গড়গড় করে বেরিয়ে আসে। মুখে সে রকম ভাব প্রকাশ না করে ভট্টচাযি্য বল্লে, উশ্রী থেকে তুমি সোজা পরেশনাথ গিয়েছিলে?

সে বল্লে, জী।

উল্লসিত ভট্টচাযি্য প্রশ্ন করলে, মাঝখানে কোথাও দাঁড়াওনি? ঠিক করে ভেবে বল।

ড্রাইভার বললে, আধ ঘণ্টার জন্য হাজারীবাগে খাড়া হয়ে ছিলুম।

কেন?

হোটেলে খানা করেছিলুম।

সে সময় বাবুরা কোথা ছিল?

বাবুরা ভি খানা করতে গিয়েছিল।

তোমার সঙ্গে একই জায়গায়?

নেহি জী। বাবুদের সব দোস্ত আছে উও কলেজ কো হোস্টেলমে, বাবুরা হোস্টেলমে খানা কিয়া।

হোস্টেলের কোন ঘরে? কার কাছে?

মালুম নেই। হোটেল গেট-পর বাবুলোককো ছোড় দিয়া, ফির হঁয়াসে উঠায়ে লিয়া।

রাগে ভট্চাষ্যির সমস্ত শরীর নিসপিস্ করছে। একটা সামান্ত ড্রাইভারকে কোন দিক দিয়ে ঘায়েল করা যাচ্ছে না। এঃ, একেই বলে শয়তান নম্বর ওয়ান। একটু থেমে বল্লে, হাজারীবাগসে কাঁহা গিয়া?

বাস, একদম পরেশনাথ। বলেই লোকটা শুধরে নিয়ে বল্লে, নেহি জী, বীচ্‌মে চাক্কা পান্‌চার হো গিয়া। উও চাক্কা থোড়া কমজোরী থা। হঁয়া চাক্কা খোল্‌কর ষ্টেপনী লাগাকে পরেশনাথজীমে গিয়া।

কোন্ টাইমসে পৌঁছা?

করিব চার সাড়ে চার হোগা।

হঁয়া বাবুলোককো কাঁহা ছোড়া?

দিগম্বর ধরমশালামে। হামারা প্যাসেঞ্জার ভি হঁয়াই থা।

ড্রাইভারের দিকে তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে ভটচাষ্যি প্রশ্ন করলে, বাবুলোক ধরমশালার কোন ঘরে উঠল?

ড্রাইভার ঘাড় নেড়ে জানাল, সে খবর সে জানে না। চাকা পানচার হওয়ার জন্য তার দেরী হয়ে গিয়েছিল; তার প্যাসেঞ্জাররা মালপত্তর নিয়ে তৈরী হয়ে ধরমশালার বাইরে বসে খুব গোঁসা করছিল। সে যেতেই তারা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে চেপে বসেছিল। ঐ বাবুদের কোন খবর আর ড্রাইভার জানে না, জানাবার দরকারও ছিল না।

ভটচাষ্যি মনে মনে ড্রাইভারকে তারিফ করলে। কি সুন্দর একটি গল্প বলে গেল। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তবুও সে হাল ছাড়লে না। বল্লে, যে প্যাসেঞ্জার তুমি পরেশনাথ থেকে নিয়ে এসেছ তারা কোথায় আছে?

তাঁদের দশটা পয়তাল্লিশের লাষ্ট ট্রেন ধরিয়ে দিয়েছি। বহুৎ কোসিস করকে দশ-পয়তাল্লিশকো ট্রেন পাকড়া।

কথা কইতে কইতে রাত প্রায় বারটা বাজে। সুবিধাজনক কোন খবর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ভট্চাষ্যি চেয়ার ছেড়ে উঠল। মুখে বল্লে, ঠিক হ্যায়, তুম্ আবহি যাও, কিন্তু ঐ তিন বাবুকে কোথাও যদি পাও তাহলে তুরন্ত আমার কাছে নিয়ে আসবে।

লোকটা বল্লে, জী। তারপর সেলাম জানিয়ে বল্লে, ঐ-বাবুলোকদের কাছে কুছু চীজউজ ত ছিল না হুজুর। কোই চোরীকো মাল কি তুস্‌রা কুছ—

মাল থাক না থাক ওদের পেলেই আমার কাছে আনবে, গম্ভীরকণ্ঠে ফতোয়া দিয়া ভট্চাষ্যি বল্যে, আবহি ঘর যাও। ই সব বাৎ কোইকো মাৎ বোলে।

লোকটা আর একবার সেলাম দিয়ে থানা ছেড়ে পালিয়ে বাঁচল।

সেই রাত্রেই ভট্চাষ্যি হাজারীবাগকে সমস্ত বিবরণ দিয়ে পরেশনাথে উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে রমেনদের খোঁজ নিতে অনুরোধ করেছিল। হাজারীবাগ তৎপর হয়ে উঠল।

এদিকে ভটচাষ্যিও সারাটা রাত ধরে অনেক কিছুই ভেবেছিল। ভোর হবার আগেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে আবার গিয়ে বসল টেলিফোনে। এবার সে মধুপুরকে ডেকে বল্লে, এই রকমের তিনটি ছেলে মধুপুরে দু একদিন আগে এসেছে কি না, এলে কোথায় কি ভাবে উঠেছিল এই সমস্ত খবর যত শীঘ্র সম্ভব জেনে তাকে যেন বলা হয়। বিশেষ দরকার। এদের গতিবিধি নিতান্তই সন্দেহজনক। একজনের নাম রমেন, অপরের নাম সুধীর তৃতীয়টির নাম জানা নেই।

মধুপুর পুলিশ ওখানকার ধর্মশালা ও যাত্রী নিবাস খুঁজে একটা খবর পেয়ে গেল। একদিন আগে রমেন বসু ও রাজেন মুখুজ্জে নামক দুটি ছেলে মধুপুর ষ্টেশনের পাশে যে ধর্মশালা আছে সেইখানে এসে একটা ঘর নিয়ে মালপত্র রেখে সেই সকালেই ঘরে চাবি দিয়ে কোথায় যে বেরিয়েছে কেউ বলতে পারলে না। কিন্তু ওরা ত দু'জন সুধীর নামে ওদের সঙ্গে তৃতীয় কেউ ছিল না। তারপর এই রমেন বসুই ভটচাষ্যির রমেন কি না তাই বা কে বলবে। তা ছাড়া এই সমস্ত ছেলেরা ধর্মশালার খাতায় যে ঠিক নামই লিখেছে তারই বা নিশ্চয়তা কি? এরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত করাতেও ওস্তাদ।

মধুপুর ভটচাষ্যিকে জিজ্ঞাসা করলে, ধর্মশালার ঘরের তালা ভেঙ্গে ঘর সার্চ করতে হবে কি?

ভটচাষ্যি একটু ভেবে বল্লে, আইনতঃ ধর্মশালায় তিন দিন পর্যন্ত লোকে থাকতে পারে। ওদের ঘর নেবার পর বাহাত্তর ঘণ্টা পার হয়ে গেলে তারপর তালা ভাঙার কথা

চিন্তা করা যাবে। এখন শুধু নজর রাখ ঐ ঘরে কেউ আসে কিনা?

সেইদিনেই বিকালে হাজারীবাগ টেলিফোনে ভটচাযি্যকে ডেকে বল্লে, ঐ তিনজনের পাত্তা পাওয়া গেছে। ওরা বেলা দুটো নাগাদ একটা লরী চেপে পরেশনাথ থেকে রওনা হয়ে গেছে। লরীর নম্বর এত।

চোখ কুঁচকে ভটচাযি্য প্রশ্ন করলে, লরী ওরা পেল কোথায়?

হাজারীবাগ বল্লে, পরেশনাথ পাহাড়ে ওরা ভোরবেলা উঠেছিল। ঐ পাহাড়ের ওপোর হজুরীমলদের যে মন্দিরটায় পাথর বসানর কাজ হচ্ছে সেই মন্দিরের জন্য মধুপুর থেকে একটি লরী শ্বেত পাথরের টালি এনেছিল। সেই লরীতে সাপ্লায়ারদের যে সরকার এসেছিল তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা সেই খালি ফিরতি লরীতে মধুপুর রওনা হয়ে গেল। আমাদের যে লোক ওদের সন্ধানে গিয়েছিল সে লরীতেই ওদের সঙ্গে পরেশনাথ থেকে এখানে ফিরে এসেছে এবং ড্রাইভারকে ও সরকারকে ওদের গতিবিধির দিকে নজর রাখতে বলে এসেছে। লরী এবং ড্রাইভার পুলিশের চেনা, আপনি মধুপুরে ওদের দেখা পাবেন।

ভটচাযি্য তখনই বেবী অষ্টিনকে নিয়ে মধুপুরে রওনা দিলে।

রাত্রি আটটা নাগাদ মধুপুর থানায় এসে ভটচাযি্য আর একটি খবর শুনে একেবারে তাজ্জব! কি সাংঘাতিক ব্যাপার।

কলিকাতা পুলিশের একমাত্র বাঙ্গালী ডি, সি অর্থাৎ ডেপুটী কমিশনার দেওঘর থেকে মধুপুরকে টেলিফোনে জানিয়েছেন যে রমেন বসু নামে বাইশ তেইশ বছরের এই রকম দেখতে এক ছোকরা মধুপুরে এসেছে কি না খোঁজ করে দেখ। দেওঘর এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

চোখ কুঁচকে ভটচাযি্য বল্লে, সাংঘাতিক। এরা দেখছি সমস্ত বিহারটাকে ছেয়ে ফেলেছে। কিন্তু দেওঘরে কি ব্যাপার যে হয়েছে সেটা মধুপুর ঠিক বলতে পারল না। ভটচাযি্যর একবার মনে হল দেওঘরকে টেলিফোন করে জানা দরকার। কিন্তু ডি সিকে নিয়ে ব্যাপার! ভটচাযি্য অত্যন্ত জুনিয়ার লোক, দুইবার ফোনটা হাতে তুলেও সে বেচারী সাহস পেলে না। আকাশ বাতাস আবোল তাবল নানা রকম ভেবেই যেতে লাগল। ওদিকে মধুপুর ধর্মশালায় সবাই বসে আছে, ছেলেরা ফিরলেই খবর আসবে, পাহারওয়ালার অফিসেও বলা আছে, এত নম্বরের লরী ফিরলেই ড্রাইভারকে তারা গাড়ী এবং গাড়ীতে কোন আরোহী থাকলে সব সমেত থানায় পাঠিয়ে দিতে। এইভাবে সমস্ত আটঘাট বেঁধে ওরা অপেক্ষা করছে।

সাড়ে সাতটা নাগাদ মধুপুর ফোন পেলে দেওঘর থেকে। ডি সি স্বয়ং ফোন ধরে মধুপুরের ইন্‌চার্জকে ডাকছেন।

ইন্‌চার্জ দু'এক কথা উত্তর দিয়েই ভটচাযি্যকে ডেকে বল্লে, কথা বলুন। ফোনে হাত চাপা দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, ডি সি ডি ডি, কলকাতা, দেওঘর থেকে বলছেন।

ভটচাযি্য ফোন ধরলে, তার হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

ডি সি বল্লে, রমেন বোসেরা ফিরেছে?

না স্যার।

আপনারা ওখানে কি খবর পেয়েছেন? আপনিই ত ঐ ম্যাটারটা ইনভেষ্টিগেট করছেন?

হ্যাঁ স্যার।

যখনই যা খবর হয় দেওঘরকে জানাবেন, যত রাত্রিরই হোক, দ্বিধা করবেন না।

ইয়েস্ স্যার। স্যার একটা কথা—

বলুন।

ওখানে কি হয়েছে শুনতে পেলে আমাদের কাজের হয়ত সুবিধে হোত স্যার।

গম্ভীর গলায় ডি সি বল্লেন, পনর দিনের ছুটী নিয়ে দেওঘরে রিল্যাক্স করার জন্য আমি এখানে লজ্ নামক বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছিলুম। আমার ছেলের বন্ধু এক রমেন বসু আমাদের খুব পরিচিত। সে আমায় কলকাতায় বল্লে যে, সে আমার আগেই দেওঘরে আসতে চায়। আমি তার হাতে একটা চিঠি লিখে এখানকার বাড়ীওয়ালাকে বলেছিলুম রমেন যাচ্ছে, একে যেন বাড়ীটা

খুলে দেওয়া হয়। আজ সকালে আমি ফ্যামিলি নিয়ে দেওঘরে এসে দেখি এক অচেনা ছোকরা একটি মেয়েকে নিয়ে এ বাড়ীতে উঠেছে। সে নিজেকে রমেন বসু বলে পরিচয় দিয়ে, মেয়েটিকে বলছে তার স্ত্রী! বাড়ীওয়ালার হাতে দেখলুম রমেনকে দেওয়া আমারই হাতে লেখা সেই চিঠি রয়েছে। সেই চিঠি দেখিয়ে এই ছোকরা নিজেকে রমেন বসু পরিচয় দিয়ে বাড়ী খুলিয়েছে। এখন এই ছোকরা বলছে প্রকৃত রমেন মধুপুর নেমে গেছে, দু'একদিনের মধ্যেই আসবে।

ভটচাযি্য টেলিফোনেই প্রশ্ন করলে, ছোকরার চালচলন কিরকম স্যার?

সন্দেহজনক। জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই নেই। মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় নতুন সিঁদুর পরেছে। হয়ত দু'চার দিন।

তবে কি স্যার কোথাও থেকে চুরি করে এনে সিঁদুর পরিয়ে—

মে বি, নো ওয়াণ্ডার।

ওরা এখনও আপনার বাড়ীতেই আছে?

আছে, তবে পালানোর চেষ্টায় আছে বলেই মনে হয়।

ছাড়বেন না স্যার, যতক্ষণ না একটা ফয়সালা হয়—

শিওর। থানাকে বলে দরজায় পুলিশ গার্ড বসিয়েছি।

আমরা স্যার প্রাণপণ চেষ্টা করছি—ওদিক থেকে টেলিফোন কেটে গেল। ভটচাযি্য গুম্ হয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল। কেস্‌টা ক্রমে ক্রমে জটিল হয়ে উঠছে।

সাড়ে আটটা নাগাদ একখানা লরী এসে মধুপুর থানার হাতায় ঢুকল। লরীতে বেশ সোরগোল পড়ে গেছে। লরীটা থামার সঙ্গে সঙ্গেই লরীর ওপোর থেকে কারা যেন প্রায় অন্ধকারের মধ্যেই লাফিয়ে পড়ল। থানার সিপাহীরা দৌড়ে এসে ওদের দু'জনের জামার কলার চেপে ধরল, তৃতীয় ব্যক্তি তখনও নামে নি, বোধ হয় যেন লরী থেকে লাফিয়ে পড়তে সাহস পাচ্ছিল না। গোটা থানায় দারুণ চাঞ্চল্য। পাহারাওয়াদের সরকার মশাই ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে দরজা খুলে নেমে এল। থানার ও সি ও মিঃ ভটচাযি্য থানার সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। ভটচাযি্যর মুখে স্মিত হাস্য।

ও সি সিপাহীদের হুকুম দিলেন, উ দোনোকো অন্দর মে লে যাও, উপরওয়ালা ছোকরাকো উতারো।

সরকার মশাই এগিয়ে এসে নমস্কার করে বল্লে, হাজারীবাগ পুলিশের হুকুমে সোজা এইখানেই নিয়ে এলুম স্যার। পাছে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে পালায় তাই খুব জোরে চালিয়ে এসেছি।

ভটচাযি্য বল্লে, ঠিক আছে। পথে এরা কোথায় নামতে চেয়েছিল কি?

না স্যার।

সারা পথে এরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা কি করেছিল সে বিষয়ে কান রেখেছিলেন?

সরকার ঘাবড়ে গেল। বল্লে, তা ত কিছু শুনিনি স্যার। ওরা লরীর ওপোরে ছিল, আমি ছিলুম ড্রাইভারের পাশে। আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া আর কি?

এভাবে ওদের কথা শোনার জন্য হাজারীবাগ পুলিশ আমাকে কিছু বলেও নি, এবং চেষ্টা করলেও বুঝতে সব পারতুম না। ওরা ত বাঙালী, বাংলা বুলি আমি সব ঠিক বুঝি না।

ভটচাযি্য বল্লে, আচ্ছা যান, এবার যেতে পারেন।

ততক্ষণে তৃতীয় ব্যক্তিকে লরীর ওপোর থেকে নামিয়ে থানার ভেতর নিয়ে গেছে সিপাহীরা।

নিজের ঘরে বসে ও সি সিপাহীদের প্রথম হুকুম দিলে, ওদের সার্চ কর। সঙ্গে যা আছে সব আলাদা করে ফেল।

ভটচাযি্য ওসি-র দিকে চেয়ে দেখলে। বল্লে, রাইট, বোমা-টোমা নিশ্চয়ই আছে।

ও সি বল্লে, নাও থাকতে পারে। থাকলে পথেই একটা কাণ্ড ঘটিয়ে সরে পড়ত।

কে জানে, তবে সাবধান হওয়া ভাল। ভটচাযি্য মন্তব্য করলে।

শিওর, ও সি সায় দিলে।

কিছুক্ষণ পরে সিপাহীরা খবর দিলে আপত্তিজনক

তেমন কিছু নেই। ভালভাবে তল্লাসী করে মামুলী জিনিষের সঙ্গে এই একখানা ছুরি পাওয়া গেছে।

ছুরি হাতে নিয়ে ও সি দেখলে, বড় জবর ছুরি। ছোটবড় দুটো ফলা, তার সঙ্গে স্ক্রুড্রাইভার, কর্কস্ক্রু, এবং আরও দু'এক রকমের সরঞ্জাম রয়েছে। ও সি ছুরিখানা ভটচাষ্যির দিকে এগিয়ে ধরলে। ভটচাষ্যি সেখানা নাড়াচাড়া করে টেবিলের ওপোর রাখলে।

ও সি বল্লে, ওদের ডেকে আনো। তোমরা পাহারায় থেক।

তিনজন আসামী ঘাড় হেঁট করে টেবিলের ওপাশে এসে দাঁড়াল।

ও সি ভটচাষ্যিকে বল্লে, ইন্‌টারোগেট করুন।

গম্ভীর কণ্ঠে ভটচাষ্যি বল্লে, রমেন বসু কার নাম?

রমেন বল্লে, আমি।

রাজেন মুখুজ্জে কে?

রমেনই দেখিয়ে দিলে। রাজেন তখন ভয়ে প্রায় আধমারা।

হুঁঃ। আর সুধীর? সুধীর তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ,। সুধীর মুখ তুলে উত্তর দিলে।

পুরো নাম কি?

সুধীর খুব সাহসী, হয়ত মরিয়াও। ঘাড় তুলে বল্লে, ওদের পুরো নামধাম সব জানেন, আমারটা জানেন না? ভটচাষ্যি ধমকে উঠল। বাজে বোকো না, যা বলছি উত্তর দাও।

সুধীর সরকার, বুক টান করে সুধীর উত্তর দিলে।

ভটচাষ্যি কাগজে কি যেন লিখলে। তারপর কাগজ থেকে মুখ তুলে বল্লে, তিন মূর্ত্তিতে কোথায় কি মতলবে ঘুরছ?

সুধীর বল্লে, আপনি আমাদের দেখেন নি? উশ্রীতে, উশ্রী ফলসে?

দেখেছি। সেই দেখে পর্যন্ত তোমাদেরই সন্ধান করছি।

ও সি আপন মনেই বল্লে, লভ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট।

ভটচাষ্যি বল্লে, কি? উত্তর দাও।

সুধীর বল্লে, সাইট সিইং করছি।

বেশ ভাল; কি কি সাইট দেখা হোল?

উশ্রী আর পরেশনাথ।

হাজারীবাগে যাও নি?

হাজারীবাগের ওপোর দিয়েই ত যেতে হয়।

হাজারীবাগে কোথাও যাও নি?

না ত।

বাজখাঁই ধমক দিয়ে ভটচাষ্যি বল্লে, মিছে কথা বোলো না। কলেজ হোস্টেলে কার কাছে গিয়েছিলে?

আমি জানি না, সুধীর উত্তর দিলে।

জানি না মানে? চালাকী পেয়েছ?

মুখ তুলে রমেন বল্লে, ও জানে না। হোস্টেলে আমার এক বন্ধু ছিল, আমি তারই সন্ধানে গিয়েছিলুম।

কে সে? কোন্ ইয়ারে পড়ে? কি নাম?

তার নাম অজিত রায়। ফোর্থ ইয়ারে পড়ে।

কি কথা হোল তার সঙ্গে?

দেখা পাই নি। টেষ্টের পর সেণ্ট আপ্ হয়ে সে বাড়ীতে চলে গেছে।

কোথায় বাড়ী?

কলকাতায়?

কলকাতার ছেলে হাজারীবাগ কলেজে পড়ছে কি রকম? ঠিক করে বল।

ওর বাবা আগে হাজারীবাগে চাকরী করতেন। তখন ও হাজারীবাগে ভর্তি হয়েছিল। এখন ওর বাবা বদলী হয়ে গেছেন, তাই ছেলেকে হোস্টেলে রেখেছিলেন।

তোমার সঙ্গে দেখা হোল কোথায়?

ও আমার গ্রামের ছেলে।

তোমার দেশ কোথায়?

বরিশাল, ঝালকাঠি।

হুঁ। চাটগাঁয়ে গিয়েছিলে?

না ত।

ভটচাষ্যির মুখে অল্প হাসি ফুটে উঠল। বল্লে, মাষ্টারদাকে চেনো? সূর্য সেন?

রমেন বল্লে জানি না।

ভটচাষ্যি বল্লে, তা জানবে কেন? তুমি যে পালের গোদা।

তিনটি ছেলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ও সি বল্লে কলকাতার পুলিশ অফিসার মিঃ দত্তকে চেন ?

রমেনের মুখের ওপোর একটা আভা যেন খেলে গেল। অতিরিক্ত উৎসাহে সে বল্লে, চিনি তিনি আমাকে ছেলের মত ভালবাসেন।

ও সি ও ভটচাযি্য মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। ও সি বল্লে, তিনি এখন কোথায় কিছু জানা আছে ?

রমেন বল্লে, তিনি—তিনি ত কলকাতায় ছিলেন, এখন হয়ত দেওঘরে এসে থাকতে পারেন।

ভটচাযি্য বল্লে, তাঁর গতিবিধির ওপোরও নজর রাখা হয়েছে ?

রমেন বল্লে, নজর নয়, আমি জানি তিনি শিগগিরই দেওঘরে আসবেন।

ঘরের মধ্যে দ্রুতবেগে ঢুকল এক সিপাহী। খট্‌ করে এ্যাটেন্‌সনে দাঁড়িয়ে এক সেলাম দিলে। ও সি বুঝলে নিশ্চয়ই কোন জরুরী ব্যাপার, না হলে এভাবে সে আসত না। তার দিকে চেয়ে বল্লে, কি ?

হুজুর, এক আদমীকো পাকড়া।

মধুপুর ধর্মশালায় রমেনরা যে ঘরটা তালাবন্ধ করে রেখেছিল সেই ঘরের তালা খুলে একটা লোক জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে বেরুচ্ছিল, এমন সময় ওখানে সাদা কাপড়ে যে স্পাই পাহারাদার ছিল সে মাল সমেত লোকটাকে ধরে অন্য পুলিশের সাহায্যে থানায় টেনে এনেছে।

হাসিমুখে রমেনের দিকে দৃষ্টিপাত করে সিপাহীকে ভটচাযি্য বল্লে, লোকটাকে নিয়ে এস।

কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক বাঙ্গালী ছোকরাকে নিয়ে অন্য এক সিপাহী এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে আর একটি ভদ্রলোক।

রমেনরা কোমরে দড়ি বাঁধা লোকটার দিকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। ভটচাযি্য রমেনদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। ও সি অপর লোকটিকে বল্লে, ব্যাপার কি ?

সে লোকটি বিহারী। হিন্দীতে বল্লে, স্যার এই বাঙ্গালী ছোকরা বিকেলে একবার এবং সন্ধ্যের পর আর একবার ধর্মশালায় এসেছিল। এখন এই সাড়ে ন'টার সময় এসে ধর্মশালার দারোয়ানকে বল্লে, জিনিষ নিয়ে চলে যাব। আমি দারোয়ানকে টিপে দিয়েছিলুম। সে বল্লে, যাইয়ে, তারপর লোকটা ঘরের তালা খুলে জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে মুটের মাথায় চাপিয়ে বেরুতেই আমি ওকে এ্যারেষ্ট করে ওর মুটে সমেত এখানে নিয়ে এসেছি। মুটেটাও মাল মাথায় ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে।

ভটচাযি্য বল্লে, ঠিক আছে। বাইরে বসুন। কোমরে দড়িবাঁধা লোকটিকে বল্লে, বুঝে-সুঝে কাজ করতে হয় হে, বন্ধুর বামাল সরিয়ে ফেলা কি এতই সহজ ? ও সি-র দিকে চেয়ে বল্লে, ইউ আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড, এদের দলটা কত বড় বুঝতে পারছেন ? এরা গ্রেপ্তার হয়েছে খবর পেয়েই এদের মালপত্র সরিয়ে ফেলার জন্য অন্য লোক এগিয়ে এসেছে। এখন এই জিনিসগুলো সার্চ করান, এর মধ্যে বোমা থাকা বিচিত্র নয়।

মধুপুর স্টেশনের লাল জামাপরা যে কুলীটা চোরাই মাল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে বোমা শব্দটা শোনা মাত্রই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মালগুলো নামাতে গিয়ে প্রায় ধপাস করে মেঝের ওপোর ফেলে দিলে। স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ভটচাযি্য ঘরের অন্যপ্রান্তে দৌড়ে পালাল। সর্বনাশ! বোমা যদি ফাটে—

সে চমকে উঠতেই ও সি-ও লাফিয়ে উঠল। ও সি-র চেয়ারখানা উল্টে গেল। ভুঁড়ির ধাক্কায় টেবিলটাও হুড়মুড় করে নড়ে উঠল। দোয়াতের কালি চলকে টেবিলে পড়ল। জল ভর্তি কাঁচের গেলাস টেবিলে উল্টে সেখান থেকে গড়িয়ে মেঝেয় পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। জুতোর খটমট শব্দ করে তিন চারজন সিপাহী দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল। ওদের একজন ত বন্দুক হাতে তৈরী হয়েই এসেছে। ওদেরই বা দোষ কি ? ওরা অনুমানে বুঝে ফেলেছে, একদল বোমা পিস্তলের স্বদেশী ডাকু নিয়ে দারোগাসাব আর ডিটেক্‌টিভ সাব ঘরে বসে বোঝাপড়া করছেন। যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে এবং যে কোন বিপদের প্রতিরোধ করতেই হবে। ওরা বরাবর বাইরে বাইরেই ছিল বটে, কিন্তু একেবারে তৈরী হয়েই ছিল।

ভাগ্যি ভাল! গুলিটা আর কেউ চালায়নি।

সিপাহীরা এসেই আসামীদের হাত ওপোরে তুলতে বল্লে, ওরা চারজনেই ভয়ে ভয়ে হাত তুলল মাথার ওপোর।

ও সি একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বোধহয় যেন নিজেদের লজ্জা নিবারণের জন্যই গম্ভীরভাবে হুকুম দিলে চারো আসামীকো লক্ আপমে লে যাও। বন্দুকধারীর তত্ত্বাবধানে রমেনদের তিনজনকে এবং ধর্মশালা থেকে ধরে আনা ছোকরাকে সিপাহীরা লক-আপে নিয়ে গেল। রেলের কুলীটা হাতে পায়ে পড়ে খালাস পেয়ে গেল। ও সি-র সহকারী স্টেশনের লাইসেন্স দেখে কুলীটার নম্বর নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলে। তারপর টেবিলের জল ও কালি এবং মেঝের ভাঙ্গা কাঁচ সাফ করে ঘরটা ভদ্রস্থ করতে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল।

সবকিছু অঘটনের জন্য ও সি মনে মনে চটল ভটচায্যির ওপোর। কোথাও কিছু নেই, খামোকা এতটা ভয় যদি ভটচায্যি না পেত তাহলে ও সিকেও ঐভাবে লাফিয়ে উঠে সকলের সামনে এতটা বে-ইজ্জতী হতে হোত না।

ভীরু কাপুরুষরা এইভাবেই সব সময় নিজেদের ভীরুতার জন্য অপরকেই দায়ী করে থাকে।

মনের কথা মনে চেপে রেখে ও সি ভটচায্যিকে বল্লে, আজ আর কিছু হবে বলে মনে হয় না। আপনিও খুব ক্লান্ত। আজ থাক, কাল সকালে যা হয় করা যাবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভটচায্যি উঠল। বল্লে, ঠিক আছে। ওদের মালগুলো কিন্তু আজই সার্চ করিয়ে রাখবেন।

ভটচায্যি চলে গেল। ভাবতে ভাবতেই গেল। কেসটা হাতে এসেও কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। দেখা যাক, কাল সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করার পূর্বে যদি কিছু কনফেসান করানর ব্যবস্থা করা যায়। কাল ভোরবেলাই ব্যবস্থা করতে হবে।

ভটচায্যি যাবার পর ওসি কুলীর মাথায় বয়ে আনা মালগুলো খুলিয়ে সার্চ করালেন। উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। হঠাৎ মনে হোল, দেওঘরকে জানানো দরকার। ডি সি সাহেব বলেছেন, যত রাত্তিরেই হোক না কেন, রমেনরা ধরা পড়লে তাঁকে যেন সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়।

তিনি দেওঘরকে ফোনে জানিয়ে দিলেন।

ভোর চারটের গাড়ীতে ডি সি ডি ডি মিঃ দত্ত এসে মধুপুরে নেমেই সোজা চলে এলেন থানায়। ওসি বেচারা তার অফিসেই বসেছিল, কারণ আধ ঘণ্টা আগে দেওঘর ফোনে ডি সি সাহেবের মধুপুর যাত্রার কথা জানিয়ে দিয়েছিল এবং রাত্রের ডিউটিতে যে ছিল সে ভোর চারটের কিছু আগে সংবাদটা ও সি-র কোয়ার্টারে পাঠিয়েছিল। ওসি মুখে চোখে জল দিয়ে অফিসে এসে মনে মনে ডি সি, ভটচায্যি এবং ছোকরাগুলোর সকলেরই মুণ্ডপাত করছিল।

ডি সি সাহেব এসেই খুব ব্যস্তভাবে বল্লেন, আমি অমুক, ওসির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ওসি তাড়াতাড়ি উঠে নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিলে।

ডি সি বল্লেন, নমস্কার। ওরা কোথায়? ঐ ছেলেরা?

লক্-আপে স্যার।

চলুন চলুন, একবার দেখেনি।

লক্-আপের অপরিসর ঘরে ওরা চারজনেই কম্বল জড়িয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল। সিপাহীদের হাঁক ডাকে জেগে উঠতেই সিপাহী বল্লে, রমেন কৌন আছে—

মিঃ দত্ত তাঁর পদোচিত গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে নিজেই বাইরে থেকে হাঁক দিলেন, রমেন কি এখানে নাকি?

গলার আওয়াজ পেয়ে ধড়মড়িয়ে রমেন এগিয়ে এল। হ্যাঁ মেশমশাই—

ডি সি ওর হাত ধরে টানতে টানতে এঘরে এনে বল্লেন, ব্যাপার কি হে? কোথায় কি কাণ্ড বাধিয়ে বসেছ বলত? তোমার চিঠি নিয়ে যে গেছে, ও কে?

রমেন বল্লে, বলছি মেশমশাই, সবটাই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। মানে ব্যাপারটা—

ডি সি বল্লেন, তোমার সঙ্গে ওরা কারা?

আমার বন্ধু সব। এক সঙ্গেই কলকাতা থেকে এসেছি।

ও সি-র দিকে চেয়ে ডি সি বল্লেন, ওদের ডাকুন ডাকুন, এইখানে এসে বসুক সব। তারপর, কি হয়েছে সব খুলে বলত শুনি।

রমেন বল্লে, আপনার চিঠি নিয়ে আমি বাড়ীতে এসে যখন দেওঘর যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি তখন এই রাজেন, এরা আমাদেরই বাড়ীর একতালায় থাকে, এ এসে ধরলে যে এ-ও যাবে আমার সঙ্গে। এর বাবা মা বল্লেন, ছেলেমানুষ ধরেছে, আচ্ছা যাক, দু'চার দিন ঘুরে আসুক। ও যাবার জন্য তৈরী হোল। শৈলেন, যে আপনার ওখানে গেছে, ও আমার দূর সম্পর্কের মাসতুত দাদা, ওর বিয়ে হয়েছে এই গত অঘ্রানে। ও বল্লে যে ও-ও যাবে এবং ভারী ইচ্ছে ও বউদিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। আমার মা বল্লেন, ঠিক আছে, নিয়ে যা, তোর মেশমশাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে প্রথম উঠুক, তারপর দেওঘরে দিন পনরর জন্য একটা ঘর-টর দেখে ব্যবস্থা করে নিয়ে চলে যাবে। এইভাবে আমরা তিনজনে বউদিকে নিয়ে ট্রেনে এসে উঠলুম। রেলে বসে মনে হোল, আমার এই বন্ধু সুধীরের কথা। এর বাবা মা এবং সুধীর এরা প্রায় পনরদিন আগে মধুপুরে এসেছিল এবং আমাকে মধুপুরে আসার জন্য বলেও ছিলেন। এখানে আসার কোন ঠিক আমার ছিল না, কিন্তু ভাবলুম মধুপুরের ওপোর দিয়েই যখন যাব তখন এক দিনের জন্য মধুপুর ঘুরে গেলেই বা মন্দ কি? কিন্তু শৈলেনদা কিছুতেই রাজী হোল না। বউদিকে সঙ্গে নিয়ে ওর অসুবিধেও বটে। তাই গাড়ীতে বসেই ওকে বল্লুম যে, তুমি আমার চিঠিখানা নিয়ে দেওঘরে যাও, সেখানে ত আমাকে কেউ চেনে না, আমার নাম দিয়েই চালিয়ে দিও, আর একদিন পরেই ত আমি যাচ্ছি। তা ও আর কি করবে, ও রমেন বোস সেজেই বউদিকে নিয়ে দেওঘরে চলে গেল।

হাসতে হাসতে ডি সি বল্লেন, তারপর?

তারপর মধুপুরে নেমে ভাবলুম মালপত্র নিয়ে কোথায় এখন সুধীরেব বাড়ী খুঁজে বেড়াব। রেলের কুলী বল্লে পাশেই ধরমশালা আছে। ওখানে এসে ঘরও পেয়ে গেলুম। ঘরে মালপত্র রেখে চান-টান করে বেলা দশটা নাগাদ সুধীরদের খুঁজে বার করলুম। দুপুরে ঐখানেই খাওয়াদাওয়া হোল। সুধীরের বাবা বল্লেন, ধর্মশালা থেকে মালপত্র নিয়ে এস। সুধীর আমার সঙ্গে পরামর্শ করে বাবাকে বল্লে সবাই মিলে উশ্রী ঝরণা দেখে আসা যাক। ওর বাবা ওকে একলা ছাড়তেন না, তবে আমরা তিনজনে একসঙ্গে যাব বলতে তিনি রাজী হয়ে গেলেন। বল্লেন মালপত্রগুলো বাড়ীতে রেখে যাও। আমি বল্লুম, কি দরকার, একটা রাত্তিরের ব্যাপার, মালপত্র টানাটানি করতে মিছামিছি কতকগুলো কুলী-ভাড়া খরচ করা। তাই মাল যেমন ধর্মশালায় ছিল, তেমনই রইল, আমরা সুধীরের বাড়ী থেকেই সন্ধ্যের শেষ গাড়ীতে রওনা দিয়ে গিরিডি পৌঁছে রাত্তিরটি স্টেশানে থেকে ভোরবেলা ধরলুম এক ট্যাক্সি এবং সস্তায় সুযোগ পেয়ে পরেশনাথ পর্য্যন্ত ঘুরতে গেলুম। কিন্তু কোথা দিয়ে কি যে ফ্যাসাদ হয়ে গেল—

দত্ত সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। এই ব্যাপার? তা কিন্তু এ ছেলেটি কে?

ওকে আমরা চিনি না, রমেন উত্তর দিলে। ও বোধ হয় আমাদের ঘরে তালা বন্ধ দেখে কিছু উপার্জন করতেই এসেছিল।

কি হে, তুমি কোথা থেকে জুটলে? দত্ত সাহেব প্রশ্ন করলেন।

ছেলেটা মাথা হেঁট করে রইল।

ছি ছি ছি, ইয়ংম্যান, দেখতে ভদ্দরলোকের ছেলে বলেই মনে হয়, বাংলাদেশের বাইরে এইভাবে চুরিচামারী করে বাঙ্গালীদের মুখ পোড়াচ্ছ? ছিঃ। ও সি-র দিকে চেয়ে বল্লেন, একে চালান করার ব্যবস্থা করুন, নো মার্সি।

ও সি সিপাহীকে ডেকে বল্লেন, যাও একে লক্-আপে নিয়ে যাও।

আশ্চর্য্য! ছেলেটা একটিও কথা বল্লে না, নিঃশব্দে লক-আপে ফিরে গেল।

সুধীর বল্লে, সকাল হয়ে গেল, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী যাই, এক রাত্তির বলে তিন রাত্তির বাইরে রয়েছি, বাবা মা নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন।

দত্ত বল্লেন, তুমি ত আচ্ছা ছেলে হে! তোমার বাবা মা এখানে রয়েছেন, সে কথা ও সি-কে বলনি কেন? তাহলে কাল রাত্তিরেই হয়ত, কিছু ব্যবস্থা হয়ে যেত।

ঘাড় হেঁট করে সুধীর বল্লে, বাবার হাই প্রেসার, সেইজন্যেই চেঞ্জে এসেছেন।

থানায় আটকেছে এই খবর পেলে বাবার হয়ত হার্টফেল করবে, সেই ভয়ে কোনরকম পরিচয়ই দিইনি। এখনও বাবাকে এসব কিছুই বলব না। রমেনের দিকে ফিরে বল্লে, তুমিও যেন কিছু বোলো না। বলব উশ্রী, পরেশনাথ, গিরিডি এইসব ঘুরে আসতে দেরী হয়ে গেল। এতে বাবা হয়ত একটু বকবেন, কিন্তু কিছু মনে করবেন না।

থানার গেটে বেরুতেই ভট্টাচার্য্য সুধীরের জামার কলার চেপে ধরেছে। কি হে ছোকরা, একা একা যাচ্ছ কোথায়? ভটচায্যি সেইমাত্র ঘুম থেকে উঠে থানাবাড়ীতে এসে ঢুকছিল।

আজ্ঞে পালিয়ে। সুধীরের হাসি হাসি মুখ দেখে ভটচায্যের খুন চেপে উঠল। জামার কলার ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে থানায় এনে হাজির করলে। রুদ্রকণ্ঠে হাঁক দিলে সিপাহী—

হুজুর!

আসামী ভাগ্‌তা,—তুম দেখা নেই?

সাব উনকো ছোড় দিয়া হুজুর।

ছোড় দিয়া? কেইসে ছোড় দিয়া—?

ও সি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে এসে চাপা গলায় বল্লে, মিঃ ভটচায্যি, ডিসি সাহেব এসেছেন, ও ব্যাপার সব ডিস্‌চার্জড্ হয়ে গেছে।

এঁ? সে কি? সুধীরের জামার কলার থেকে ভটচায্যির হাতখানা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল।

সব শুনে ভটচায্যি সবিস্ময়ে বলেছিল, ছেলের বন্ধুর জন্যে ডি সি ডি ডি মিঃ দত্ত রাত দুপুরে না ঘুমিয়ে দেওঘর থেকে দৌড়ে এল মধুপুরে। দত্ত লোকটা ত সত্যিই ভাল।

কিন্তু একমাস পরে কলকাতায় এসে ভটচায্যি যখন লোক পরম্পরায় শুনলে যে মাত্র কদিন আগে রমেন বোসের সঙ্গে মিঃ দত্তর একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তখন সে কপালে চোখ তুলে আপন মনেই বলেছিল, ও সেইজন্যে—

ভাল লাগে এ পথ দিয়ে যেতে

শঙ্কর রায়চৌধুরী

যখন তোমার শহর দিয়েই যাই,
অন্ধকারে বারে বারে চাই।
ভূতের মতন ঝাপসা শহর মাঝে,
বিজলী বাতি নিলাজ আলোয় সাজে।
ঘুমাও তুমি তোমার নিরালয়,
আঁধার ভেঙ্গে বাহন আমার ধায়।
ছেলেবেলার তোমায় পেতে পেতে
ভাল লাগে এ পথ দিয়ে যেতে।

শিকড়

হাসিরাশি দেবী

মেঘ ডাকছে না? হ্যাঁ,—তাইতো!
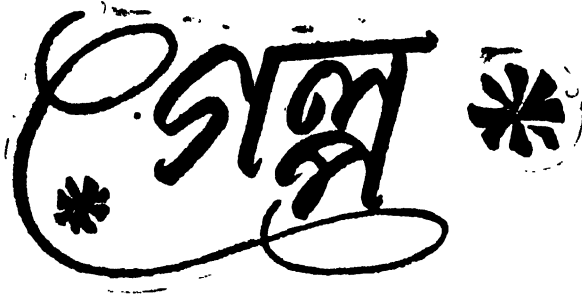
সচকিত হয়ে ওঠে অদিতি।

সামনের জানালায় দেখা আকাশটুকুতে ঐ তো ভেসে উঠেছে মেঘের ছায়া। হয়তো আকাশের কোনও দিক ছেয়ে যাত্রা সুরু করেছে ও, আর দেখতে দেখতে এখনি বৃষ্টি ধারায় নেমে আসবে।...এত দিনের রৌদ্রে তেতে থাকা দেওয়ালগুলোর গায়ে ঠেকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছড়িয়ে পড়বে সামনের ঐ বারান্দায়, যেখানে এখনও শুকোচ্ছে সারা সংসারের কাপড় আর জামা! কাঁথা আর মাদুর!

শোওয়া ছেড়ে উঠে বসে অদিতি। বৃষ্টি নামলে তবে কমবে গরমের এই কষ্টটা। ঠাণ্ডা হবে ঘরের মেঝেটা পর্যন্ত।

আঃ!

স্বস্তির এই ধ্বনিটা উচ্চারণ করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। কানে আসে স্বামী নিশিকান্তর বিরক্ত স্বর—:

: এখনি উঠলে যে? উনোনে আঁচ ধরাতে যাচ্ছ বুঝি?

গলার আওয়াজটাও যেমনি করকরে, বলবার ভঙ্গিটাও তেমনি শুকনো!

যেন—ঐ রোগা, হাড়-জির্ জিরে মানুষটার পক্ষে এইভাবে কথা বলাটাই সম্ভব, স্বাভাবিকও;

তবু ওর জবাব দিতে ইতঃস্তত করে অদিতি। মনে করে,—হয়ত ঠিক ঐ ভাবেই ও কথার প্রত্যুত্তরও দিতে পারে সে; কিন্তু তা দিয়ে লাভ! যে কথার আঘাতটাকে বুক পেতে নিলেও সইতে সময় লাগে, সে আঘাত ঐ রোগা মানুষটাকেই বা কি করে দেবে সে?

নিশিকান্ত কিন্তু ওর এই নীরবতাকে ক্ষমা করেনা; দম নিতে নিতে বলে—

: তোমাদের আর কি? ঘরে যে একটা হাঁপানে রুগী থাকে, সে কথা মনে রাখবার সময়ই বা কই? জীবনের দাম তো তার ক্ষমতার বাঁটখারাতেই মাপা। তাই সে অসুবিধায় হাঁপিয়েই মরুক আর থাবিই খাক, কি এসে যায় তাতে! জবাবটাও তো আমার জানাই,—উনোনে আঁচ না দিলে রান্না হবে কিসে,—আর সংসারের এতগুলো লোক দু'বেলা গিলবেই বা কি?—"

কথাগুলো একদমে বলা শেষ ক'রে নিশিকান্ত হাঁপায়।

চামড়া ঢাকা পাঁজর কয়খানার দ্রুত ওঠানামার সঙ্গে গলার মাদুলীটাও নড়তে থাকে ঘন ঘন।

অদিতি তবু ধীরভাবে ওঠে। শান্ত স্বরেই জবাব দেয়—

"দেখতে পাচ্ছনা মেঘ করেছে যে। বৃষ্টি নামলে সব ভিজে যাবে।"

"অঃ।"

অব্যক্ত মনোভাবটাকে এইটুকুর মধ্যেই যেন চেপে যায়। নিশিকান্ত কিন্তু কথা থামায় না,

—তারজন্যে তোমারই বা এত তাড়া কেন? বৌমা তো রয়েছেন, তি'নিই তুলবেন।"

একটা অবহেলা,—যেটাকে বিতৃষ্ণা ব'লে মনে হয় অদিতির,—এবার বোঝে, সেইটাকেই চেপে যাচ্ছে নিশিকান্ত,—কিন্তু পারছেনা; ওর রেখাবহুল মুখের বিকৃতিতে সে মনোভাব স্পষ্ট।

এরপর এখানে দাঁড়ালে আরও কোন অপ্রিয় কথা উত্থাপন করা নিশিকান্তের পক্ষে অসম্ভব নয়, জেনেই অদিতি সরে যায়।

তেরটি সন্তানের জননী অদিতি, কিন্তু অর্দ্ধেকের বেশী দিয়েছে ও মৃত্যুকে; বাকি আছে মাত্র কয়েকটা! যে কটাকে নেড়ে চেড়ে কেটেছে ওর জীবনের এই চল্লিশটা

বছর ; আর তাদের মধ্যের প্রথম ছেলে খোকনের বৌ লীলার ওপরই যেন নিশিকান্তর বিতৃষ্ণাটা বেড়ে চলেছে ক্রমশঃ—

: হবে না ? শাশুড়ীর মত ভাগ্যই হবে ওরও। ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোবেনা খোকনের ; ঐ তো চাকরী ! মাইনেই বা কত—যে এতগুলোকে গেলাবে !

সহ্য হয় না আর !

এক এক সময় মনে হয় অদিতি প্রতিবাদ করে। বলে

—: কিন্তু উদ্যোগ আয়োজন করে বিয়েটা দিয়েছিল কে ? তুমি নয় ?

কিন্তু ব'লবে কাকে ? শুনবেই বা কে ! নিশিকান্ত তখনও হয়ত ব'লে চলেছে—

: সে তবু এক সময় ছিল, যখন কোন রকমে দিন চলতো। আর এখন ? ··

"মা !"

শুক্‌নো আর ভিজে কাপড় জামাগুলো আলাদা রাখতে রাখতে অদিতি পেছনে ফিরে তাকায় ; কখন ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে লীলা। সমস্ত মুখ চোখে কুণ্ঠা মাখানো, সঙ্গে খানিকটা অপ্রস্তুতিও।

বলে—

"আমাকে একবার ডাকলেই তো পারতে মা। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম···।

"তা আমি জানি। তাছাড়া আমিও তো সন্তানের মা-ই বৌমা, আমিও ত বুঝি সব।

খুশীতে উপচে পড়ছে যেন অদিতির সমস্ত মনটা।

এই তো ওর সাজানো সংসার। স্বামী, সন্তান, ছেলে, ছেলের বৌ, আবার তারও ছেলেমেয়ে। এদের নিয়েই তো কাজ ! এদের নিয়েই তো ব্যস্ততার অবধি নাই অদিতির। বৎসরের মধ্যে বারটা ষষ্ঠী, আর তের রকমের বার-ব্রতের দিনগুলোকে আজও মনে করে ; তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে তো মঙ্গল চায় ওদেরই।

তোলা উনুনটায় আঁচ দিয়ে বাইরে থেকে বারান্দায় তুলতেই নিশিকান্তর বকুনি সুরু হল আবার—

"দক্ষ যজ্ঞ সুরু হ'ল আবার ! হবে না ! যা রাবণের গুষ্টি ! বেড়েই চলেছে কেবল, কমবার আর নাম নেই।"

আর চুপ করে থাকা যায় না। অন্ততঃপক্ষে প্রতিবাদ না করাটাই অন্যায়।

অদিতি বলে—

: এ সব কথা মুখে আনতে তোমার একটুও বুক কাঁপেনা ?

: কেন, কিসের জন্যে কাঁপবে শুনি ?

—: কাঁপবে, তুমি সন্তানের বাপ বলে। যেগুলোকে সংসারে এনেছ,—তাদের কথা ভেবে।

—তাই নাকি ?

নিশিকান্তর খোলে পড়া চোখ দুটো যেন জ্বলছে। বলে—

: ভাবি কি না, কি করে সেকথা বোঝাব ? আর বোঝাতে গেলেই বা বিশ্বাস করবে কে সে কথা ?"

আশ্চর্য্য ! নিশিকান্তও হাসতে চায় ! বোধ হয় কান্নার বদলে হাসে। বলে—

"জানো ক'নে বৌ—অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে কূল কিনারা খুঁজে পাইনি। মনে হয় আগের জগৎ আর এখনকারের জগতে বোধ হয় আকাশ পাতাল তফাৎ। আশা তো নেই ই উদ্দেশ্যও খুঁজলে মেলে না। কেবল আছে একটা তাগাদা ; সে তাগাদা পাওনার। খালি পাওয়ার হিসেব। সে হিসেব মেটাতে ঐ ছোট ছোট মানুষগুলোও যেন পাগল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কে মেটাবে ওদের চাহিদা ?"

অদিতি যেন কথা হারিয়ে ফেলেছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—নিশিকান্তর সেই বিরক্ত মেশানো করকরে গলার স্বরটা কেমন যেন ঝিমিয়ে এসেছে ! বহু রেখাভর্তি মুখখানাও কেমন একটা অসহায়তায় ভরা।

রাতের অন্ধকারেও ঘুম আসে না ; চুপ করে তাকিয়ে ঘরটার সবদিক যেন আজ আবার নতুন দৃষ্টিতে দেখতে চায় অদিতি।

নতুন করে মনে হয়—নিশিকান্তর হাত ধরে প্রথম যেদিন সে এবাড়ীতে এসেছিল, সেদিন শাশুড়ীকে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন—

"ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর।"

এ কথার গভীরতম অর্থ যাই হোক, আর অদিতির জীবনে তার যতটুকুই খাটুক সবটাই যে খাটেনি, অদিতি তা জানে।

বাড়িটা হয়তো সাতপুরুষের,—অন্ততঃপক্ষে অদিতির পরবর্তী তিনপুরুষকে অদিতি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে।

নিশিকান্ত, খোকন, আর তার ছেলে ঐ পাঁচ বছরের বাচ্চাটা!

যার মাথাটা বড়, শরীরটা এত রোগা যে মনে হয় কখন নিশিকান্তর মতই ওর বুকের ধুক্-ধুকুনিটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপরও আছে নিজের আর দুটো ছেলে মেয়ে। আজও যারা স্বাবলম্বী হবার বয়স পায়নি, উপায় তো নয়ই।

বয়স আর উপায় পেয়েছিল বড়ছেলে, মেজ ছেলে আর তার পরেরটা।

তারা চাকরী নিয়ে দূরে সরে গেছে। কাছে রয়েছে খোকনের ঐ বৌটা—যার কপালের লেখা বোধ হয় অদিতির চেয়েও দুঃখের।

দেওয়াল আলমারিতে এখনও দুই একটা কাঁচের পুতুল সাজানো, এখনও পুরানো সিঁদুর চুপড়ীটা লক্ষ্মীর গাছকৌটোর পাশে রয়েছে। আর তার ওপাশে একখানা ফটো—! ও ফটো তার—যে ছেলেটা এই সেদিন ওর কোলেই মাথাটাকে রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে।

রোগা মানুষ! ওষুধ যতটুকুই পড়ুক, পথ্য দিয়ে তো তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে!

তাই তো প্রতিদিনের মত ছানাটুকু ঐ জালের আলমারীতে তুলে রেখেছিল লীলা।

কিন্তু, গেল কোথায়? খেল কে?

ছোটয়-বড়য় ছেলের-মেয়ের সংখ্যা বাড়িতে ছয়জন। কেউ কারো কথা বলে না! সকলের মুখেই সেই এক কথা—

: জানিনে, দেখিনে, খাইনি!

লীলার চোখে জল আসে। নিরুপায় অদিতিও—। কেবল কানে আসে নিশিকান্তর তিক্ত, বিরক্ত স্বরের করক'রে আওয়াজ—

: খেয়ে ফেল সব, আমাকেও খেয়ে ফেল। তোদের পেটে যে-আগুন জ্বলে উঠেছে তাতে সব ভস্ম হয়ে যাবে, ছাই হয়ে যাবে পুড়ে।"

এরই মধ্যে আর একজন নতুন আসবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে লীলার দেহকে অবলম্বন করে; কিন্তু মনে নয়।

নিঃশব্দে মাথা কোটে ও দেবতার দরবারে; হয়তো বলেও—

নাও, নাও; ওকে নাও, আমাকে নাও; আমি বাঁচি, মরে বাঁচি।

শুধু কথা সরে না অদিতির মুখে। ওর প্রার্থনার কথাও যেন নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গেছে।

মনে হয় এ সংসারে মুক্ত আলো আর হাওয়ার স্পর্শ পেয়েছিল সেইদিন, যেদিন দৃষ্টির সামনে রামধনুর সাতটা রং দেখা দিত ফিরে ফিরে।

অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষায় ভরা মানসদেবতার দরবারে সেই প্রার্থনার কথাগুলো আজ শুধু ওর নিজের জীবনেই নয়,—লীলার জীবনকেও ব্যঙ্গ করছে—

"হাতে পো, কাঁখে পো, পিরথিবীতে ছড়ানো পো।"

লীলার রক্তশূন্য মুখখানা আর নিশিকান্তর বিরক্তির সঙ্গে বোধহয় ঐ অপুষ্ট-দেহ-বাচ্চাটার আর্তস্বর মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি তোলে—

"খেতে দাও, আমায় খেতে দাও।"

পদ্মিনীর দেশে

মীরা রায়

"গড় তো চিতৌড় গড় ঔর সব গড়ৈয়াঁ।
রাণী তো পদ্মাবতী ঔর সব গধেয়াঁ।
ঝর্ণা ঝরে গোমুখ পড়ে নরস্তে নাথকী ঠৌড়
ক্রোড় যুগ তপস্যা করে তব পাবে গড় চিতৌড়।"

তরঙ্গায়িত আরাবল্লী পর্বতমালার অটল গাম্ভীর্যে ভরা বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা বিন্দুর মত অফুরন্ত রহস্য বুকে নিয়ে অতীতানুসন্ধী মানুষের কৌতূহলের দরবারে বিচিত্রারূপিণী উপস্থিত চিতোর গড়, রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ গড়। হিমালয়ের বিরাটত্বের তুলনায় আরাবল্লীর পদমর্যাদার ঘরে হয়ত লঘিষ্ঠ সংখ্যার অঙ্ক বসবে, পার্বত্য কৌলিন্যেও হয়ত ঘাটতি পড়বে; তবুও তার অরণ্য বিলাসে, অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিখর উপশিখরে, খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে থাকা ঐতিহ্যময় রাজপুত জনপদে যে ইতিহাস চিত্রায়িত হয়ে একে অলঙ্কৃত করে রেখেছে, রাজস্থানকে সুদৃঢ় প্রহরায় দণ্ডায়মান সেই পার্বত্য-প্রহরীর কাহিনীময় রূপ হিমালয়ের বৈরাগীরূপের চেয়েও কম শুচিস্মিত নয়। ইতিহাসের এরকম আরণ্যক লীলাকেন্দ্র ভারতের আর কোন পর্বতমালায় আছে কিনা সন্দেহ। রোমান্স ও রহস্যের গভীর আবেদন নিয়ে পর্যটকের পরম তীর্থস্বরূপ হয়ে রয়েছে আরাবল্লীর অঙ্কশায়ী জনপদ-গুলোতে, এর কন্দরে প্রান্তরে অরণ্যে শিখরে রুক্ষবিধুর নির্জনতার মাঝে মেবারের শৌর্যবীর্যের ইতিহাস গুমরে কাঁদে, মৃত অতীত মুখর হয়ে উঠতে চায় এর স্মৃতিসত্তার গুলিকে কেন্দ্র করে। রাজস্থানের রঙমহলের রঙিন তোরণ খুলে দিয়ে পর্যটককে আহ্বান জানাচ্ছে আরাবল্লীর বুকে চিতোর গড়।

আরাবল্লীর একটি ছোট শিখরদেশকে অধিকার করে চিতোর তার ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিচিতির একটি বিনম্র প্রকাশ রেখেছে। রাজপুতনার অন্যান্য শহরের তুলনায় আকারে এটি ছোট হলেও এর ভগ্ন ধ্বংসস্তূপের প্রতিটি ধূলিকণায় মহাকালের চরণধ্বনির সঙ্গে কত না বীর্যময় অতীতের বিক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস, কত না অলিখিত ভাষার মূক আবেদন ভ্রমণ পথিককে বিচলিত করে তোলে—রুক্ষবালুময় প্রান্তর বিছিয়ে রূপকাহিনীর লোভ দেখিয়ে চিতোর এইসব পর্যটকদের আতিথ্য জানায়। ষ্টেশনে নামলেই যেন দৃষ্টির সামনে রাণী পদ্মিনী, সাধিকা মীরাবাঈ, দেশপ্রেমিক প্রতাপ ইতিহাসের পাতা ছেড়ে জীবন্ত মিছিল হয়ে আনাগোনা করে। মেবারের যত কিছু বীরত্বমূলক ভক্তিমূলক কাহিনী বেশীরভাগই ঘটেছে চিতোরকে কেন্দ্র করে।

রাতের অন্তিম মুহূর্তে উষার প্রসূতিকক্ষের দরজা খুলে বিদায় নেবার সময়ে আজমীরের ট্রেণটাকে চিতোর গড়ে পৌঁছে দিয়ে গেল। দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণে আবছায়া অন্ধকারে পর্বতনগরী চিতোরকে ভালো নজরে এল না শুধু স্মৃতির পর্দায় ভেসে এল অশ্বারূঢ় রাণাপ্রতাপের তেজোময় মূর্ত্তি জহর ব্রতের অগ্নিদীপ্তা পদ্মিনী, গিরিধারী প্রেয়সী মীরাবাঈ, যাঁদের স্মৃতিসম্পদে চিতোর আজ কালোত্তীর্ণ সমৃদ্ধিলাভ করেছে।

ষ্টেশান থেকে তিন মাইল পথ গেলে দুর্গের পাহাড়ের তলায় আসা যায়। গম্ভিরী নদীর ওপর পুল পেরিয়ে পাহাড়ের ওপরে দুর্গে যাবার রাস্তায় আসতে হয়। এই সেতুটি খিজির খাঁ তৈরী করান; ঝালিবাও থেকে পাহাড়ী পথের আরোহণ যেখানে সুরু হয়েছে সেখানে রয়েছে সিঁদুর মাখান এক স্মারকশিলা—নাম বাখারা-

বলকা, যোদ্ধা বাঘসিং বাহাদুর শাহ'র সঙ্গে যুদ্ধে এখানে নিহত হন। পাহাড়ের গায়ে প্রাকারবেষ্টিত পাকদণ্ডী এক মাইল পথ বিস্তৃত ধাপে উঠে গিয়েছে পাহাড়ের শীর্ষদেশে। উত্তর দক্ষিণে তিনমাইল লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে আধমাইল চওড়া স্থান জুড়ে সমতলভূমি থেকে প্রায় পাঁচশ ফুট উঁচুতে চিতোর দুর্গ তৈরী করা হয়েছে। নীচে থেকে শীর্ষদেশে আসতে গেলে সাতটি পোল অর্থাৎ কারুকার্যমণ্ডিত সুউচ্চ তোরণ পার হতে হয়। বেষ্টিত প্রাচীরের মাঝে মাঝে ফোকর বা গর্ত আছে তার মধ্য দিয়ে নীচের দৃশ্যাবলী মনোরমভাবে দেখা যায়। পাহাড়ে উঠতে প্রথম যে পোলটি পড়ে তার নাম পাদানপোল, আগে নাম ছিল পাটবন পোল; দ্বিতীয় পোলের নাম ভৈঁরো পোল—সোলাঙ্কী ভৈরব দাসের স্মরণে নির্মিত, যিনি বাহাদুর শাহ'র সঙ্গে যুদ্ধে আত্মবলি দেন। অল্পদূরেই রয়েছে কল্লাজী ও জয়মলজীর সমাধি, আকবরের চিতোর আক্রমণকালে এঁরা যুদ্ধে নিহত হন। এরপর যথাক্রমে হনুমান পোল, গণেশ পোল, জোড়লা পোল, লক্ষ্মণ পোল এবং সবশেষে রাম পোল পেরিয়ে এসে দুর্গদ্বারে প্রবেশ করতে হয়, দুর্গদ্বারকে প্রহরীর মত যেন রক্ষা করছে বীর পুত্তজীর সমাধি।

পুরাকালের পাতা ওলটালে দেখা যায় এই শৈলদুর্গ সর্বপ্রথম তৈরী করেন মোরি রাজা চিত্রাঙ্গদ, তাঁরই নামানুসারে দুর্গের নাম হয় চিত্রকোট যার থেকে আধুনিক নাম হয়েছে চিতোর। গিল্‌হোট রাজপুত্র বাপ্পারাও পরে মোরি মানসিংহকে পরাজিত করে ৭৩৪ খৃষ্টাব্দে চিতোরে মেবারের রাজ্যস্থাপন করে এখানে গিল্‌হোট বংশের সূচনা করেন। এই সময় থেকে চিতোর ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মেবারের রাজধানী ছিল। রাণী পদ্মিনীর রূপমুগ্ধ পাঠান নবাব আলাউদ্দিন খিলজী পদ্মিনীকে লাভ করবার জন্য ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করে ধ্বংস করেন, পরে বীর হাম্বীর আবার চিতোরের পুনরুদ্ধার করেন। দ্বিতীয় বার চিতোর অবরোধ করেন গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শা ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে। যুদ্ধে রাজমাতা জওহর বাঈ প্রাণত্যাগ করলেন। চিতোরের ভাবী রাণা উদয়সিংহকে ধাত্রী পান্নার জিম্মায় রেখে জহরব্রতে প্রাণ দিলেন উদয় সিংহের মা রাণী করুণাবতী। নিজপুত্রের প্রাণের বিনিময়ে ধাত্রী পান্না উদয়সিংহকে যেভাবে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন সে কাহিনী জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে রইল।

এই উদয়সিংহের সঙ্গে আকবরের প্রবল যুদ্ধ হয়। ভীরু দুর্বল উদয়সিংহ চিতোর ত্যাগ করে বনেজঙ্গলে পালিয়ে যান এবং উদয়পুর নামে নতুন এক নগরের গোড়াপত্তন করে সেখানে রাজত্ব করতে থাকেন। আকবর ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে চিতোর দখল করেন। এরপর ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর রাণা অমর সিংএর সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে চিতোরের শাসন-ভার রাণাকে প্রত্যর্পণ করেন। আকবরের নৃশংস আক্রমণে চিতোরের আকাশ-বাতাস জলস্থল ধ্বংসের লীলাভূমি হয়েছিল, রাজপুত বীর শ্রেষ্ঠ বহু যোদ্ধা এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছেন। রাজপুতকুলমণি বীর প্রতাপও মোগল সেনাদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যান, মেবারের অন্যান্য রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা দান করলেও তিনি আকবরের কাছ থেকে চিতোর উদ্ধার করতে পারেননি—বীর প্রসবিনী চিতোর রাণা সঙ্গ, রাণা কুম্ভ, রাণা ভীমসিংহ, রাণা প্রতাপের মত বীরশ্রেষ্ঠদের জন্ম দিয়ে ভারতের বীর চরিতমালায় এক একটি কোহিনূর সংযোজনের গৌরব অর্জন করেছে।

প্রথম প্রভাত আলোর ঘটকালিতে চিতোরের সঙ্গে যে পরিচয় ঘটল তাতে এক চিত্রশিল্পীর অপূর্ব শিল্প বিন্যাসের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ না হয়ে থাকা গেল না; দুর্গ-প্রাকারের ফাঁক দিয়ে নজরে এল নীচের বিস্তীর্ণ শুষ্ক সমতলভূমি এক রুদ্রকঠিন রূপের আড়ালে তার হৃতগৌরবের শোকে হাহাকারে ঐ উত্তপ্ত নিঃশ্বাস বহন করে পড়ে রয়েছে যদিও স্থূলদৃষ্টির বিচারে এই তপ্ত বায়ু প্রকৃতির দাবদাহ ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু সূক্ষ্ম-সমীক্ষার কাছে চিতোরাত্মার এই উত্তপ্ত বিলাপধ্বনি ঠিকই ধরা পড়বে। চারিদিকের নিসর্গ পটভূমিকায় এক মহাশিল্পীর অপূর্ব চিত্রায়ণ ক্ষমতার নিদর্শন রয়েছে। বহু নীচে চিতোরের স্থলভূমি ও বনভূমি ধূসরহরিতে

মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে, মহাশিল্পীর তুলি তাদের বর্ণারোপে কোথাও অসঙ্গতি ঘটায়নি। এদের মাঝে মডেলের বাড়ীর মত ছোট ছোট দেখাচ্ছে মানুষ বসতির ঘরবাড়ী রাস্তা ষ্টেশান রেললাইন ইত্যাদি। এখান থেকে সমস্ত চিতোরটা একনজরে দেখা যায়।

দুর্গে ঢুকেই ডান দিকে পড়ে কুম্ভমহল—বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। লম্বা বারন্দার পর বারন্দা সরু সরু থাম ও অলিন্দ দিয়ে ঘেরা তার ওপর রাণার দরবার হল। ওদের ভগ্নপিঞ্জরে রাণার শৌর্যগাথার অব্যক্ত গুঞ্জরন যেন শোনা যায়। কাল এখানে নিমেষ নিহিত তার গতিচিহ্নের কোন নিদর্শন এখানে নেই। প্রতিকক্ষেই জরা প্রাচীনের দুর্বোধ্য ইতিহাসের হিজিবিজি জটলা অন্ধকারে মিশে রয়েছে এখানকার এই ভগ্নস্তূপের এইটাই সম্পদ। ইতিহাসের এই অদ্ভুত রসিকতা দেখে অতি দুঃখের সঙ্গেই হাসি পেল নিয়তির এই অমোঘ বিধান অতি বড় কীর্তিমান মানুষও মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়েছে। রাণাকুম্ভের নানা কীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে চিতোর গড়ের সর্বত্র। কুম্ভমহলের সামনে দিয়ে ভূগর্ভস্থ একটি সরু সুড়ঙ্গপথ চলে গিয়েছে, এটি গিয়ে শেষ হয়েছে উন্মুক্ত এক চত্বরে! একে বলা হয় সতীমহল এবং এই সুড়ঙ্গপথকে বলা হয় রাণীকাভাণ্ডার। রাজস্থানের প্রথম জহর ব্রত এই চত্বরে সংঘটিত হয়। কথিত আছে আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের সময় রাণী পদ্মিনী সমস্ত রাজপুত রমণীসহ এই সুড়ঙ্গপথে প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে ঐ চত্বরে জহরব্রত করে প্রাণ বিসর্জন দেন। চত্বরটি আজও ভস্ম ও ধূলায় পরিপূর্ণ। পর্যটকের কল্পনাকে বাস্তবে সঞ্জীবিত করবার জন্য পরিদর্শক বোঝান এই ভস্মরাশি সেই জহরব্রতের অগ্নিস্বাক্ষর যদিও এটা স্থির যে এর ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। জহরব্রতর স্থানটি দেখলে এক বিয়োগান্ত ইতিহাসকে যেন প্রত্যক্ষ করে মন বিষাদ রসে ক্লিন্ন হয়ে ওঠে এই মানসিক স্থবিরতা-কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে রাজপুতের শৌর্যময় আত্মাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিল তথাকথিত ভস্মরাশির মধ্যে।

এই চত্বরের আর একদিকে রাণাকুম্ভের তৈরী বিজয়স্তম্ভ সত্যিকারের এক কালজয়ী স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে সগৌরবে বিরাজ করছে। রাণা মামুদ খিলজীকে যুদ্ধে পরাজিত করে তার চিহ্নস্বরূপ ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করান। নয়টি তলাবিশিষ্ট এই স্তম্ভটি ১২২ ফুট উঁচু, এক এক তলায় এক একটি ছোট খুপরী ঘর তার মধ্য দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। শীর্ষদেশের শেষের ছুটিতলা দেব-দেবীর পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে বিশেষ কারুকার্য-মণ্ডিত। এর শীর্ষদেশে উঠলে সমস্ত চিতোর দুর্গটা একনজরে বন্দী হয়ে পড়ে। কর্ণেল টডের অভিমত দিল্লীর কুতবমিনারের চেয়ে স্থাপত্য-শিল্পে চিতোরস্তম্ভ অনেক উৎকৃষ্ট এবং ঐতিহাসিক ফার্গুসন সাহেবের সমীক্ষায় এই স্তম্ভ রোমের ট্রজান টাওয়ারের চেয়েও শিল্পৌৎকর্ষে অনেক উন্নততর সৃষ্টি। এই স্তম্ভের উত্তরে জটাশঙ্কর শিবের মন্দির এবং দক্ষিণ পশ্চিমে সমিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দিরের বিগ্রহ ত্রিমূর্তি বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ। এটি মালবরাজ ভোজ নির্মাণ করেন এবং ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে রাণা মুকুল এর আমূল সংস্কার করান। এই মন্দিরে তিনটি শিলালিপি আছে, এতে লেখা আছে আজমীরের চৌহানরাজা আর্যরাজকে পরাজিত করে গুজরাটের চালুক্যরাজ কুমারপালের চিতোর অভিযান কাহিনী।

রাণাকুম্ভের প্রাসাদের পাশে ধাত্রীপান্নার মহল। সেটা পেরিয়ে পূর্বদিকে গেলে পড়ে ফতে প্রকাশ মহল, রাণা ফতে সিং-এর নির্মিত তাঁর বাসভবন। বর্তমানে ছাত্রদের বিদ্যালয় হিসাবে এটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সরু মেঠো পথ বেয়ে টাঙ্গা এসে দাঁড়াল মীরাবাঈ-এর মন্দিরের সামনে। ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে রাণাকুম্ভ এই মন্দিরটি তৈরী করান বলে এটিকে কুম্ভশ্যাম মন্দিরও বলা হয়। বিষ্ণুর বরাহ অবতার মূর্তির পূজা হয় এখানে। মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য হল তিনটি ক্রমখর্বাকৃতি, ঘর এবং তাদের মাথায় বড় থেকে ছোট চূড়া, চারপাশে সরু বারন্দা—গর্ভগৃহের মন্দির চূড়াটি পিরামিড আকৃতি ক্রমশঃ সরু হয়ে গগনমুখী। মধ্যেকার চূড়াটি অপেক্ষাকৃত ছোট গোলাকৃতি এবং সামনের কক্ষের চূড়াটি সবচেয়ে ছোট গম্বুজাকৃতি। এই বড় মন্দিরের পাশে আর একটি ছোট নিরাভরণ মন্দির এটি মীরার নিজস্ব মন্দির। এখানে বিগ্রহ কিছু নেই, একটি কৃষ্ণের ছবি আছে, তার পাশে কাঠের ফ্রেমের ওপর মীরার একতারা হাতে ভজনরত দীনমূর্তির প্রতিকৃতি

আটকানো আছে। চিতোরের রাণী হয়েও কৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বত্যাগিনী মীরা দয়িত দর্শনের সন্ধানে চিতোর ত্যাগ করে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে থাকেন। ষড়ৈশ্বর্যময় পুরুষোত্তমের তিনি প্রেয়সী তাঁর ঐহিক রত্নভূষণের কোন প্রয়োজন ছিল না। সংসারের বন্ধন তাঁকে ঘরে বাঁধতে পারেনি, বহু জায়গায় ঘুরে শেষে দ্বারকায় গিয়ে রণছোড়জী চরণে তাঁর মহাসমাধি ঘটে।

এ মন্দিরে সমস্তক্ষণই মীরার ভজন গাওয়া হয়, এ গান শুনলে মনে হয় মীরার আকুলকণ্ঠ আজও যেন মন্দিরের আনাচে কানাচে তাঁর নন্দলালার সন্ধানে গুমরে উঠছে, "মেরে তো গিরিধারী গোপাল দুসরো নকোই, জাকে শিরমৌর মুকুট মেরে পতি সোই।" মন্দির ছাড়িয়ে এলেও এ গানের রেশ চিতোরের আকাশে বাতাসে সর্বত্র ভাসছে। এই গানই যেন পুরাতনী চিতোরের বুকে আজও প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে রেখেছে। মীরার মন্দির ছাড়িয়ে গেলে পড়ল চিতোরেশ্বরী কালীর মন্দির। এঁরই মুখে একদিন প্রত্যাদেশ হয়েছিল "ম্যাঁয় ভুখা হুঁ," রাজপুতের রক্ত চাই, চিতোরের বিজয়লক্ষ্মীকে লাভ করতে গেলে এই তার মূল্য। এই মন্দিরটি সম্ভবত: চিতোরের প্রাচীনতম মন্দির। আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এটি নির্মিত হয়। এ মন্দির ছেড়ে আরও উত্তরে গেলে পড়ে সুরজকুণ্ড। চারপাশ ঘেরা একটি বিরাট জলাশয়।

দুর্গের মধ্যে কুণ্ডাকৃতি জলাশয় বহু জায়গায় রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুণ্ড গোমুখী কুণ্ড, পাথরের গরুর মুখ দিয়ে ভূগর্ভস্থ প্রস্রবণের জল বেরিয়ে এসে জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে, এখান থেকে সমস্ত দুর্গে জল সরবরাহ করা হয়। এর দক্ষিণে জয়মলপট্ট প্রাসাদ রয়েছে। সবগুলিই অতীত স্মৃতির ভগ্ন সঞ্চয় পাত্র হয়ে পড়ে রয়েছে পাশের জলাশয়টির নাম জয়মলকুণ্ড।

গোমুখ প্যালেসের উত্তরে জৈন সম্প্রদায়ের একটি অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির রয়েছে। চিতোরে একদা যথেষ্ট জৈনধর্মের প্রভাব ছিল তার পরিচয় রয়েছে সাতবিশ দেউড়ী, শৃঙ্গার চৌরী ও জৈনদের কীর্তিস্তম্ভে। সাতবিশ দেউড়ী একাদশ শতাব্দীর মন্দির। শৃঙ্গার চৌরী দ্বাদশ শতাব্দীর মন্দির, রাণাকুম্ভের কোষাধ্যক্ষের পুত্র ভেলকা এটি নির্মাণ করেন। কীর্তিস্তম্ভ জিজা নামে জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়ের এক ব্যবসায়ী দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মাণ ক'রে জৈনতীর্থঙ্কর আদিনাথের নামে উৎসর্গ করেন। ৭৫ ফুট উঁচু এই স্তম্ভটি সাততলায় শেষ হয়েছে; এর পাদদেশে মহাবীরের মন্দির রয়েছে।

দুর্গের সর্বদক্ষিণে রয়েছে রাণী পদ্মিনীর জল প্রাসাদ। বিরাট সরোবরের মাঝখানে রাণীর গ্রীষ্মাবাস এই প্রাসাদ। ঠিক এর বিপরীত দিকে স্থলভূমির ওপর অনুরূপ প্রাসাদ রয়েছে, এখানে রাণী-সখীবৃন্দ বাস করতেন। এর উপরতলার একটি কক্ষে চার দেওয়ালে চারটি আয়না এমনভাবে টাঙান আছে যে এই কক্ষের সামনাসামনি বিপরীতদিকের জলমহলের একটি কক্ষে দাঁড়ালে তার প্রতিবিম্ব এই আর্শীতে এসে পড়ে এবং জলমহলের ঘরে দাঁড়ালে ঐ মূর্তির প্রতিবিম্ব সরোবরের জলে পড়ে সেই অবয়ব ঐ টাঙান আর্শী-গুলিতেও ফুটে ওঠে, সুতরাং আর্শী লাগান ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালে জলমহলের কক্ষে দাঁড়ান মূর্তিকে চারপাশের আর্শীতে ফুটে উঠতে দেখা যায়। ঠিক এইভাবেই আলাউদ্দিন খিলজী আর্শীর মধ্য দিয়ে পদ্মিনীকে দেখে পাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে রাণা রতন সিং-এর সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ বাধল এই যুদ্ধে বহু বীর রাজপুতের প্রাণহানি ঘটে, এদের মধ্যে রাণীর আত্মীয় কিশোর বালক বাদল ও গোরার অপূর্ব রণকৌশল ও আত্মদান কাহিনী আজও অমর হয়ে আছে। আলাউদ্দিন বহুদিন চিতোর অবরোধ করে থেকে শেষে দুর্গ জয় করলেন। পদ্মিনীকে পাবার জন্য লোকজন নিয়ে আলাউদ্দিন বিজয়গর্বে প্রাসাদের দিকে এগোলেন কিন্তু আগুনের গগনচুম্বী লেলিহান শিখা রক্ত চক্ষুর শাসনে তাঁর গতিরোধ করল। সতীমহলে বিস্তৃত চন্দন কাঠের চিতাজুড়ে সমস্ত রাজপুত রমণীসহ সমাসীন রাণী পদ্মিনীর স্বর্ণদ্যুতি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে অগ্নিসজ্জার মধ্য দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই তেজোপূর্ণ অগ্নি সমারোহের কাছে একটি লোভাতুর চিত্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এই জায়গায় বাদল ও গোরার স্মৃতিসৌধ রয়েছে।

দুর্গের সর্বশেষ দক্ষিণ সীমানায় জলপ্যালেসের পর রাস্তা ঘুরে দুর্গের পিছন দিক দিয়ে পশ্চিমাভিমুখী হয়েছে।

মাঝে মাঝে চারদিক বাঁধানকুণ্ড পড়ে। এদের মধ্যে ভীমলাত কুণ্ডটি উল্লেখযোগ্য বড়। দুর্গের কিছু স্থায়ী সংখ্যক বাসিন্দা আছে, প্রায় পাঁচশত বাড়ী ঘরে দেড় হাজারের মত লোক বসতি রয়েছে। ছোট একটি স্কুল, ডাক্তারখানা, হাটবাজার, হাসপাতাল ইত্যাদি আধুনিক জীবনযাত্রার পদসঞ্চার ঘটেছে জীর্ণ সৌধ ও স্তূপগুলোর মাঝে মাঝে। এইসব নতুন অঙ্কুরের মাঝে পুরাতনী চিতোর অদ্ভুতজীর শিবমন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির, রাণা হামিরের মহালক্ষ্মী মন্দির, বনমাতা মন্দির, কুকুড়েশ্বর মন্দির, নীলকণ্ঠ শিবমন্দির, দেবী কালিকামন্দির ইত্যাদি বহু মন্দির ও স্মৃতিসৌধ'র মধ্য দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। হিন্দু ধর্মের ও শৌর্যবীর্যের পীঠস্থান চিতোর এসব চিহ্ন বুকে ধরে ভারতের জীবনদর্শনে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে রেখেছে। দুর্গ পরিক্রমা শেষ করে রাস্তা ঘুরে আবার দুর্গের প্রবেশমুখে রামপোলের কাছে গিয়ে মিশেছে।

রামপোলের ধারে ঠিক নীচে নামবার মুখে রয়েছে নৌলখাভাণ্ডার, যেখানে রাণাদের দৈনিক খচরের জন্য নয় লক্ষ টাকা মজুত থাকত, এর অল্পদূরে রয়েছে তোপখানা। এটি ছিল রাণাদের অস্ত্রাগার।

ভারতের হিন্দু রাজত্বের পূর্ণ গৌরব চিতোর চিরদিন বহন করে এসেছে ক্ষাত্র ধর্মের চরম বিকাশ রয়েছে এর ইতিহাসে। প্রকৃতি ও মানুষের নানা শিল্পসৃষ্টির এক দুর্লভ সমন্বয় এখানে ঘটেছে। এর প্রতিটি স্তূপে রয়েছে ইতিহাস-গন্ধী রোমান্স। প্রতিটি মন্দিরে প্রবাহিত হচ্ছে ভক্তিরসের পবিত্র মন্দাকিনী, প্রতিটি ধূলিকণায় রয়েছে দেশপ্রেমিকের চরম লাঞ্ছনার চিহ্ন, ধর্ম কর্ম ও শক্তি-সাধনার আর এক ত্রিবেণী সঙ্গমের তীর্থস্থান এই চিতোর গড়। পর্বতারণ্যের এক বন্য কঠিন রূপের আড়ালে আদিগন্ত বালুময় ধূসরতার আঁচল বিছিয়ে চিতোর যেন কোন তমোনিদ্রাভিভূত। তার এই স্তিমিত নিদ্রা ভাঙবার জন্য আবার প্রয়োজন হয়েছে রাণা কুম্ভ, রাণাপ্রতাপের মত দুঃসাহসী দুরন্ত দেশপ্রেমিক সন্তানের। অপরাহ্ণের অস্তমিত আলোয় চিতোর দুর্গকে পিছনে রেখে রওনা হলাম; আরাবল্লীর বিস্তৃত অবয়বের কোল ঘেঁষে শুয়ে পর্বত নন্দিনী চিতোর রহস্যের রঙমহল বুকে নিয়ে আবছা আলোয় ম্লানমুখে আমাদের বিদায় জানাল যে প্রাণহীন ভাঙ্গা অস্থিপিঞ্জরগুলোকে সে আজও পরম যত্নে আঁকড়ে ধরে আছে পর্যটক চিত্তের চরম আনন্দই তার মধ্যে নিয়ত প্রাণসঞ্চার করে চলেছে, এই অনুভূতির দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এগুলোকে নিছক পাথরের স্তূপ বলে মনে হবে না। এ শুধু স্তূপের অচলায়তন নয়, এগুলিতে রয়েছে চিত্রময় বাঙ্ময় প্রস্তর স্বাক্ষর, যার আবেদন একমাত্র বিশিষ্ট শিল্প চেতনাসম্পন্ন কলারসিক মনের কাছে স্বীকৃত হবে। চিতোরগড় ঐতিহাসিক কাহিনী দিয়ে মানুষ ও পর্বতারণ্যের মধ্যে একটি আত্মিক যোগসূত্রস্থাপন করেছে। ভারতের অতীত স্বর্ণ যুগের এক শ্রেষ্ঠ অধ্যায় রচিত হয়েছে চিতোরের পরিচয়ের মধ্যে।

লম্বা ঘর চারদিকে পর্দা ঢাকা, পরপর ইজেল সাজানো অর্ধ-গোলাকারে ইজেলে আঁটা ক্যানভাস। ক্যানভাসের সামনে প্যালেট আর অয়েল ব্রাশ হাতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ শিল্পীরা। আর্ট কলেজের লাইফ-ষ্টাডির ক্লাস। ক্যানভাসের পাশ দিয়ে লাইফের দিকে তাকালাম। লাইফ! যখনি লাইফের দিকে তাকাই তখন প্রশ্ন জাগে,— লাইফ! মডেল-বসা বেঞ্চে যে দেহটা বসে থাকে আশী জোড়া চোখের স্কেল-কম্পাস-মাপা দৃষ্টির সামনে নিশ্চল হয়ে, তাকে সেই সময়ে লাইফ বললে বিদ্রূপের মত মনে হয়। তবু ওরা লাইফ। ওদের ঐ পাষাণ নিশ্চল দেহের বুকে কান পাতলে জীবনের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের চোখে ওরা শুধু আঁকার বিষয় বস্তু। যে দেহকে মাপের স্কেলে ফেলে কেটে কেটে ক্যানভাসের রূপ দিই, সেই দেহেও যে মন থাকতে পারে, যন্ত্রণাও থাকতে পারে, আমরা তা ভুলে যাই। লাইফের দেহে যদি জীবনের ধাক্কা লেগে নড়ে যায় তাহলে আশী জোড়া ভ্রু কুঁচকে ওঠে চোখে দেখা দেয় বিরক্তির ছায়া। তাই এই ক্লাসটাকে যখন লাইফ ষ্টাডির ক্লাস বলা হয় তখন আমার হাসি পায়।

যাক ইজেলে ক্যানভাস এঁটে তাকালাম লাইফের দিকে। নতুন! সুন্দর! পবিত্র! একসঙ্গে মনে ধাক্কা দিলো তিনটি শব্দ। পর্দা ঢাকা আধ-অন্ধকার ঘরে, লাইফের পাশে জানলা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা আলো এসে পড়েছে ওর গায়ে। দরিদ্র অথচ সুন্দর দেহটাকে আবরণ দিয়ে রেখেছিলো শুধুমাত্র শাড়ির আঁচল তা কাঁধ থেকে খসিয়ে দেওয়া হয়েছে ওর কোলের ওপর, ক্লাসের প্রয়োজনে। তীক্ষ্ণ চোখে নতুন মুখটাকে দর্জির মত দৃষ্টির ফিতে দিয়ে মাপতে লাগলাম। আমার অভ্যস্ত দৃষ্টি হোঁচট খেলো ওর চোখের ওপর, চোখের পাতা বুঁজে এসেছে, মাথাটা ঝুলে পড়েছে প্রায় বুকের ওপর। রাগ হয় ওর এই লজ্জা পাওয়ার অভিনয় দেখে। মডেলের নিয়ম কোন অভিব্যক্তি থাকবে না, মনটাকে গুটিয়ে নিতে হবে নিথর পাথর দেহের মধ্যে। কিন্তু ঐ মুখ লজ্জার মুখোস এঁটে পঁচাত্তর জোড়া চোখকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা

করছে! লজ্জাবনত মুখ, যে মুখ দেখে সুন্দর আর পবিত্র মনে হচ্ছে, সে মুখ মডেলের হতে পারে না। এটা ওর ছল, অভিনয়। ওর অভিনয় দিয়ে প্রষ্টাদের শান্ত বুকে অশান্ত ঝড় তোলার চেষ্টা করছে। 'ন্যাকা!—এক ঈর্ষাকাতর নারী আমার কণ্ঠে ভর করে উচ্চারণ করলো,—'ন্যাকা!'

ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটি শুভ্রধারা আমার মনের কদর্য ভাবকে ভাসিয়ে দিলো। যন্ত্রণায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো তারপর যে শ্বাস মুহূর্তের জন্যে বন্ধ ছিলো তা দ্বিগুণ হয়ে দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হল। যে কণ্ঠ ঘৃণার শব্দ উচ্চারণ করেছিলো সেই কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল,—এ কি, এ যে মা।—হ্যাঁ আমি বিস্ময়ে দুঃখে অভিভূত হয়ে বলে উঠলাম তুমি মা!

সৃষ্টিকর্তার রক্ত মাংসের সৃষ্ট যে সুন্দর দেহটাকে দৃষ্টির রঙিন কাঁচ লাগিয়ে রং তুলির সাহায্যে ক্যানভাসে নিখুঁত রূপ দিয়ে দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা হবার স্বপ্ন দেখছিলাম আর ঘৃণা ছুড়ে দিচ্ছিলাম যে দেহটাকে, সেই দেহ ভেদ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছুটি শুভ্রধারা, আর ধুয়ে দিলো আমার মনের সব ঘৃণা, নিভিয়ে দিলো পঁচাত্তরটি বুকের পঙ্কিল কামনার আগুন।

প্রফেসারকে অগ্রাহ্য করে আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার কথা মেনে নিলো সহপাঠীরা! ক্লাসের নিয়ম ভঙ্গ করে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। সাহায্য করলাম আঁচলটাকে কাঁধের ওপর তুলে দিতে কারণ লজ্জার অপমানে ওর হাত কাঁপছিলো।

কিছু পরে ঘণ্টা পড়লো। টিফিনের ঘণ্টা। আমরা পাঁচটা মেয়ে গেলাম মেয়েদের কমনরুমে। অন্য ক্লাস থেকেও মেয়েরা এসে নানা রংয়ের বন্যা বইয়ে দিলো। এ রং ওদের তুলি থেকে ছড়ায় নি, এ-রংয়ের জেল্লা ওদের শাড়ী ব্লাউজ আর মনের খুশির। ওরা উচ্ছ্বসিত উচ্ছ্বাস ওদের কারণে অকারণে, ওদের চারপাশে সুখের চওড়া দেয়াল তাই ওরা এত উচ্ছ্বসিত। টেবিলের একপাশে বসলাম। ক্যান্টিন বয় চায়ের ট্রে এনে নামালো টেবিলের ওপর। মেয়েরা যে যার চায়ের কাপে আর চপ কাটলেটের প্লেট টেনে নিলো হৈ হল্লোর করে। তারপর চায়ের কাপ হতে আলোচনা সভা আরম্ভ হল। কার জন্মদিনে কত টাকার শাড়ী কিনলো এবং ক্লাশে কোন ছেলেটি কি রকম দৃষ্টিতে কারদিকে তাকিয়েছিলো, কোন প্রফেসর কার প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন।

আমি শুধু শ্রোতা। কারণ মনে মনে চিন্তা করার কিছু ক্ষমতা থাকলেও প্রকাশ করার আগ্রহ ছিলোনা, তাই চুপ করে শুনে যেতাম ওদের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর পূর্ণ বিবরণ আর ক্লাশের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ, আক্রমণ। আজও শুনছিলাম একমনে হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো ঘরের এক কোণে বসে আছে সেই লাইফ। আবার আমার হাসি পেল ওকে লাইফ মনে হতে জীবনের শেষ সম্বল দিয়ে যে যন্ত্রণায় অপমানে নিশ্চল তাকে বলছি, লাইফ! ঘরের এই উচ্ছ্বাস আর আনন্দের মধ্যে ও বসে আছে অপমান আর যন্ত্রণানীল মৃতের মত। এখনো ওর মাথা নীচু, যদিও ওর সারা দেহে আবরণ ছিলো তবু ও নিজেকে অপরাধী ভাবছে, দারিদ্র্যে অচ্ছুৎ হয়ে ঐশ্বর্যের পাশে বসে ঐশ্বর্যের জাত নষ্ট করার অপরাধে। আমি আমার যায়গা থেকে উঠে ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

তুমি নতুন?

হ্যাঁ, প্রায় বুজে আসা কণ্ঠে ও উত্তর দিলো।

কেমন লাগছে এই কাজ?—

না-নাঃ। আমি একাজ চাইনি।

তবে এসেছ কেন? কঠিন গলায় প্রশ্ন করি।

জানতাম না, এমন অবস্থায় বসতে হয় আমি জানতাম না। ওঁরা যে বলেছিলেন শুধু বসে থাকতে হবে।

কারা? আমি আবার জিজ্ঞেস করি।

যাঁরা শিয়ালদহে ছবি আঁকতে যান।

তুমি কোথায় থাকো?—

শেলদায়।

আর কে আছে তোমার?

আমার ছোট্ট খোকা আর তার বাবা। তিন মাস বয়েস আমার খোকার। পাকিস্তান থেকে নতুন এসেছি। খোকার বাবার অসুখ, কি খাওয়াবো, কি খাবো কোথায় থাকবো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা। তারা বললেন,—এখানে কাজ করলে রোজ পাঁচ টাকা পাবো, তাঁই এসেছিলাম, কিন্তু এমন করে বসতে হবে জানতাম না।

যখন প্রফেসর তোমায় অমন করে বসতে বললেন তখন

ভয় করছিলো।

সভ্য শহরে আসা নতুন তরুণী মায়ের চোখে ভয় লজ্জা আর দুঃখ এক-সঙ্গে ছায়া ফেলো। বুঝলাম বহু কথিত, লিখিত সত্য কাহিনীর আর একটি বাস্তব মূর্তি! পাকিস্তান মুসলমান, শিয়ালদহের ষ্টেশন। সেই একই যন্ত্রণাদায়ক সমস্যা। ওর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছিলাম।

কিরে। মিতা এতদিনে তুই একটা বান্ধবী পেলি?

সহপাঠীনীর কথায় ওর দিকে ফিরে তাকালাম, সহপাঠিনীকে মনে হলো,—সোনার রিংয়ে বাঁধানো ভেলভেটের বাক্সে রাখা এক খণ্ড কাঁচ। ওর বাবার সম্মান জনক প্রতিষ্ঠা, হচ্ছে ওর চারপাশে সোনার পাত আর ওর বাবার অর্থ ওকে ভেলভেটের বাক্সের মত আরাম আর নিরাপত্তার মধ্যে রেখেছে, কিন্তু সহপাঠিনী নিজে একখণ্ড কাঁচ। আসল হীরে হতে হলে যে প্রচণ্ড চাপ আর তাপ সহ্য করতে হয় তা ওকে সহ্য করতে হয়নি। ও কাঁচ তাই এত বেশী ঝকঝক করছে।

লাইফের কাছ থেকে উঠে এলাম। লাইফের ভাগ্য লেখার লেখনীটা আমার হাতে নেই। মিছেমিছি কয়েক জোড়া বিদ্রূপ চোখের শিকার কেন হই?

ঘণ্টা পড়লো। আমরা যে যার ক্লাসে চলে গেলাম। আমাদের ক্লাসে ও আবার মডেল-বসা বেঞ্চে বসলো লজ্জায় মুখটিকে নীচু করে। তারপর প্রতিদিনের নিয়মে ছুটি হ'ল।

পরদিন আবার আমরা জড়ো হলাম আমাদের ক্লাসে, কিন্তু লাইফ কোথায়! লাইফ আসেনি। বুঝলাম দারিদ্র্য ওকে এখনো যুদ্ধে হারাতে পারেনি। ক্লাসে অসন্তোষের গুঞ্জন ক্লাসের সকলের ক্যানভাস রং নষ্ট হলো।

পরীক্ষা সামনে, আউট ডোর স্কেচ জমা দিতে হবে, কয়েক জন ছাত্র ছাত্রী মিলে স্কেচ করতে বেরিয়েছি। চলতে চলতে দৃষ্টি থেমে যায়। একটা হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছে ঘোমটা টানা একটি বৌ, কোলে রুগ্ণ বাচ্চা। আমাদের সেই একদিনের লাইফ। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সহপাঠীরাও ওকে দেখলে আর বিদ্রূপ করলে— কাজ করে খাবে কেন? ওতে যে পরিশ্রম করতে হবে। তাই হাত পেতে খাচ্ছে। এরাই ভারতবর্ষের কলঙ্ক। ঘৃণায় মুখ বাঁকালো।

অবাক হয়ে তাকালাম সহপাঠীর দিকে। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তোমরা যে কাজ দিয়েছিলে তার চেয়ে কি এটা সম্মানের নয়? বুদ্ধদেব, নিমাই এঁরা কি ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করেন নি? নীতিবাগীশেরা বলবেন ওঁরা ঈশ্বরের নামে ভিক্ষাব্রত নিয়েছিলেন। ঠিক। আর 'এ' ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছে ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্বের জন্যে। যে কাজ তোমরা দিয়েছিলে, তাতে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হতো না, অন্তত এই রোদে রাস্তায় দাঁড়ানোর থেকে আরামের ছিলো। 'ও' ভারতের মেয়ে তাই অসম্মানের কাজ করার থেকে ভিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। কিন্তু যুগ পাল্টাচ্ছে আদর্শও পাল্টাচ্ছে। তাই যারা সম্ভ্রম ত্যাগ করে ঘুঙুর পায়ে নাচের তুফান তোলে কাফে ক্যাবারে— তাদের পায়ের তালে তালে টাকার বৃষ্টি করে;—

যুক্তি—পরিশ্রমের মজুরি দিচ্ছি। লজ্জায় ঘোমটায় মুখ ঢেকে যারা রাস্তায় হাত পাতে ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখে খাদ্য তুলে দিতে এ যুগে তারা ভারতবর্ষের কলঙ্ক। এ তর্ক শুধু আপন মনেই করি কারণ প্রকাশ্য ভাবে করলে অজস্র বিদ্রূপ বাণে আহত হ'বে আমার মন। আর ওর ভাগ্যটাকে নতুন করে লেখার লেখনীটা আমার নেই। তাই আবার চলতে থাকি স্কেচের বিষয়বস্তু খুঁজতে।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চম ইউনিভার্সিয়াড গেমস :

টোকিওর জাতীয় ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত নবপর্য্যায়ের পঞ্চম ইউনিভার্সিয়াড গেমসে (আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ানুষ্ঠান) আমেরিকা ৩২টি স্বর্ণ এবং ২৪টি রৌপ্যপদক জয় ক'রে অনুষ্ঠানে সর্ব্বাধিক স্বর্ণ এবং রৌপ্যপদক জয়ের গৌরব লাভ করেছে। আমেরিকার পরই চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় জাপানের স্থান—স্বর্ণ ২১ এবং রৌপ্য ১৭। তবে সর্ব্বাধিক ব্রোঞ্জ (২৫) এবং মোট পদক (৬৩) পেয়েছে জাপান। আমেরিকা পেয়েছে ৬টি ব্রোঞ্জ এবং মোট পদক ৬২টি।

আলোচ্য পঞ্চম ইউনিভার্সিয়াড গেমসের তালিকায় ছিল ১০টি বিষয়—এ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, ডাইভিং, ওয়াটার পোলো, ফেনসিং, টেনিস, ভলিবল, বাস্কেটবল, জিমন্যাষ্টিকস এবং জুডো। আমেরিকা সাঁতারের ২৬টি বিষয়ের মধ্যে ২৪টিতে স্বর্ণপদক জয়ী হয় এবং ১০টি বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করে। এ্যাথলেটিক্সে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেয় পশ্চিম জার্মানী। বাস্কেটবলে আমেরিকা পুরুষ বিভাগে এবং দক্ষিণ কোরিয়া মহিলা বিভাগের স্বর্ণপদক জয়ী হয়। ভলিবলের পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের স্বর্ণপদক জয়ী হয় জাপান। জাপান জিমন্যাষ্টিক্সের পুরুষ ও মহিলাদের দলগত এবং ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক জয় করে। তাছাড়া জাপান জুডোর সাতটি স্বর্ণপদকই হস্তগত করে। ফলে জাপান স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অটুট প্রাধান্য বিস্তার করে জিমন্যাষ্টিক্স জুডো এবং ভলিবলে। টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলসে জাপান, পুরুষদের ডাবলসে স্পেন, মহিলাদের সিঙ্গলসে ইংল্যাণ্ড, মহিলাদের ডাবলসে হল্যাণ্ড এবং মিক্সড ডাবলসের স্বর্ণপদক জয়ী হয় অষ্ট্রেলিয়া।

আলোচ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানে এই ১৬টি দেশ স্বর্ণপদক জয় করে—আমেরিকা ৩২ ; জাপান ২১ ; পশ্চিম জার্মানী ৮ ; ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালী ৩টি করে ; অষ্ট্রেলিয়া, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ড ২টি করে এবং দক্ষিণ কোরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস, অষ্ট্রিয়া, আইভরি কোষ্ট, স্পেন এবং যুগোশ্লাভিয়া ১টি করে স্বর্ণপদক জয় করে।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে হাঙ্গেরী (গতবারের চ্যাম্পিয়ান), রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, উত্তর কোরিয়া প্রমুখ আটটি সাম্যবাদী দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান থেকে বিরত থাকে। উত্তর কোরিয়ার যোগদান নিয়েই গোলমালের সূত্রপাত হয়। যেহেতু উত্তর কোরিয়ার কোন রাজনৈতিক স্বীকৃতি জাপ সরকারের কাছে ছিল না সেই কারণে সরকারী মহল থেকে উত্তর কোরিয়ার এই অনুষ্ঠানে যোগদান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল। এই রাজনৈতিক বাধা পরিহারের উদ্দেশ্যে একটা উপায়ও উদ্ভাবন করা হয়—দেশ হিসাবে যোগদান না করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ক্রীড়াসংস্থার নাম দিয়ে যোগদান করতে হবে। তখন উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে নাম দেওয়া হয় কোরীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র ক্রীড়াসংস্থা। অর্গানাইজিং কমিটি 'গণতান্ত্রিক' কথাটি বাদ দিলে নাম বিকৃত করার প্রতিবাদে উত্তর কোরিয়া প্রতিযোগিতা বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উত্তর কোরিয়ার সমর্থনে রাশিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি সাম্যবাদী দেশও ক্রীড়ানুষ্ঠান বর্জন করে।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ :

১৯৬৭ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং দল সর্ব্বাধিক পয়েন্ট (৪৯) সংগ্রহের সূত্রে দ্বিতীয়বার অপরাজিত অবস্থায় এবং মোট দশবার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব লাভ করেছে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৪৭ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স-আপ হয়েছে। তৃতীয় স্থান পেয়েছে

মোহনবাগান (৪৪ পয়েন্ট)। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৭০ বছরের ইতিহাসে মাত্র যে দশটি দল অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে তাদের মধ্যে আছে এই তিনটি ভারতীয় দল—মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৪৮ ও ১৯৬৭), ইষ্টবেঙ্গল (১৯৫০) এবং মোহনবাগান (১৯৬৪ ও ৬৫)।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় দলগতভাবে সর্ব্বাধিক (৫৯টি) গোল দিয়েছে মোহনবাগান এবং ব্যক্তিগত সর্ব্বাধিক গোল (২০টি) দেওয়ার গৌরবলাভ করেছেন মহমেডান স্পোর্টিং দলের পাপায়া।

দ্বিতীয় বিভাগে ক্যালকাটা জিমখানা লীগ চ্যাম্পিয়ান (২৮ পয়েন্ট) এবং পোর্ট কমিশনার্স (২৭ পয়েন্ট) রাণার্স-আপ হয়েছে। তৃতীয় বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে টাউন ক্লাব (২৮ পয়েন্ট) এবং রাণার্স-আপ ভ্রাতৃ সঙ্ঘ (২৫ পয়েন্ট)।

আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতা :

১৯৬৭ সালের আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস খেতাব জয়ী হয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্ব এবং আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন—মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, জন নিউকম্ব ১৯৬৭ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাবও জয়ী হয়েছেন। অপরদিকে শ্রীমতী বিলি জিন কিং ১৯৬৭ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় 'ত্রিমুকুট' সম্মান পান।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : জন নিউকম্ব (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪ ও ৮-৬ গেমে ক্লার্ক গ্র্যাবনারকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ১১-৯ ও ৬ ৪ গেমে শ্রীমতী এ্যান হেডেন জোন্সকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৮, ৯-৭, ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে বিল বাউরে এবং ওয়েন ডেভিডসনকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং রোজমারী ক্যাসালস) আমেরিকা) ৪-৬, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে মেরী এ্যান ইজেল এবং জোন ক্লডেড-ফেল্‌সকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

চ্যানেল সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড :

গত ১২ই সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত ভারতীয় সাঁতারু মীহীর-নারায়ণ রায় ১০ ঘণ্টা ২১ মিনিট সময়ে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সের দিকের চ্যানেল সাঁতারে পূর্ব্বের বিশ্ব রেকর্ড সময় [১০ ঘণ্টা ২৩ মিনিট] ভঙ্গ করেছেন। তবে ইংল্যাণ্ডের ব্যারি ওয়াটসন কর্তৃক ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত চ্যানেল সাঁতারের বিশ্ব রেকর্ড সময় (৯ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট) আজও কেউ স্পর্শ করতে পারেননি। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালে মীহীর রায় ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত চ্যানেল সাঁতারে ১১ ঘণ্টা সময় নিয়েছিলেন। উভয় দিকের চ্যানেল সাঁতারে তিনিই একমাত্র কৃতী ভারতীয়।

বছরের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় :

কলকাতার ভেটারেন্স ক্লাব সিনিয়র বিভাগে বি এন আর দলের অরুণ ঘোষকে এবং স্কুল বিভাগে নাকতলা হাইস্কুলের স্বপন দত্তকে ১৯৬৭ সালের ফুটবল মরসুমের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়ের সম্মান দিয়েছেন।

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল :

ভারতের প্রাক্তন টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হেমু অধিকারীর পরিচালনায় ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল ১৯৬৭ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। তাদের এই প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরের ১৮টি খেলার ফলাফল দাঁড়ায় : ভারতীয় দলের জয় ৯, ড্র ৮ এবং একটি খেলা বাতিল। ভারতীয় স্কুল দলের প্রত্যেক খেলায় প্রথম ইনিংসের রান বিপক্ষদলের প্রথম ইনিংসের থেকে বেশী উঠেছিল। লক্ষ্মণ সিং সফরে সর্ব্বাধিক মোট রান করে—৯৭৪ (ইনিংস ১৭, নট আউট ৩ বার এবং গড় ৬৯'৬)। তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পায় বাংলার রাজা মুখার্জ্জি—মোট রান ৬১০ (গড় ৩৫'৭)। বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় বাংলারই দীপঙ্কর সরকার—১৩টি খেলায় ৬৬টি উইকেট। সেঞ্চুরী করে লক্ষ্মণ সিং ৫টি, রাজা মুখার্জ্জি ২টি, সুরিন্দর অমরনাথ ২টি এবং কিরমানি ১টি।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্ত্তিক—১৩৭৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

মহাকালী

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ—"মহাকালী আর এক প্রকৃতির। বিস্তৃতি নয়, উচ্চতা, জ্ঞান নয়, বল ও বীর্য তাঁর নিজস্ব বিশেষত্ব। তাঁর মধ্যে আছে এক দুর্ব্বার তীব্রতা, পূর্ণ সিদ্ধির দিকে শক্তির বিপুল আবেগ, সকল সীমা, সকল বাধা চূর্ণ ক'রে ছুটে চলে এমন দিব্যপ্রচণ্ডতা। তাঁর সমগ্র ভাগবতীপ্রকৃতির ঝঞ্ঝা রুদ্র কর্ম্মের প্রভায় প্রস্ফুরিত—তিনি রয়েছেন ক্ষিপ্রতার জন্য, আশুফলদায়ী প্রক্রিয়ার জন্য, সাক্ষাৎ সঘন আঘাতে সব পরাভূত ক'রে সম্মুখ আক্রমণের জন্য। অসুরের প্রতি ভয়ঙ্কর তাঁর মুখ মণ্ডল, ভগবৎ বিদ্বেষীর উপর নির্ম্মম নিদারুণ তাঁর চিত্ত। বিশ্বলোকরাজীর যোদ্ধা তিনি—সংগ্রামে কখন পশ্চাৎপদ নন। কোনও ত্রুটি তাঁর অসহনীয় তাই মানুষের মধ্যে যা কিছু অনিচ্ছুক তার সাথে তাঁর রূঢ় ব্যবহার, যা কিছু চায় জোর ক'রে জ্ঞানহীন তমোগ্রস্ত হয়ে থাকতে, তার উপর তিনি কঠোরহস্ত। বিশ্বাসঘাতকতার, মিথ্যাচারের, বিদ্বেষের বিরুদ্ধে, তাঁর ক্রোধ সদা উদ্যত, নিদারুণ—দুষ্ট ইচ্ছা তাঁর কষাঘাতে অবিলম্বে জর্জ্জরিত। ভাগবত কার্য্যে ঔদাসিন্য, শৈথিল্য আলস্য তাঁর সহ্য হয়না। অসময়ে যে নিদ্রালু, দীর্ঘসূত্রী যে, প্রয়োজন হলে, তৎক্ষণাৎ তীব্র বেদনায় তাকে জাগিয়ে দেন। ক্ষিপ্র, ঋজু, অকপট যে সকল প্রেরণা, অকুণ্ঠ,

অব্যভিচারী যে সব গতি ধারা, অগ্নি শিখায় উর্দ্ধগামী যে অভীপ্সা, তাই মহাকালীর পদক্ষেপ। অদম্য তাঁর প্রবৃত্তি তাঁর দৃষ্টি তাঁর সবল শ্যেনপক্ষীর ব্যোমে বিহারের মত উত্তুঙ্গ দূর প্রসারী, উর্দ্ধায়িত পথে ক্ষিপ্রতার গতি, তাঁর প্রসারিত হস্ত বিধানের জন্য, অভয় দানের জন্য। কারণ তিনিও মা তাঁর স্নেহ তাঁর ক্রোধের মত তীব্র তাঁর কারুণ্য সুগভীর, আবেগ আপ্লুত। আপন শক্তিতে তিনি যদি নেমে আসতে পারেন, তবে যে সব বাধা আমাদের চলৎ শক্তিহীন করে রাখে, দস্যু যারা অন্বেষুক আক্রমণ করে, তারা সংহতি বিহীন বস্তুর মত এক মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে যায়। বিরোধীর পক্ষে তাঁর কোপানল ভয়ঙ্কর দুর্ব্বলের ভীরুর পক্ষে তাঁর প্রগতির পদক্ষেপ পীড়াকর কিন্তু বীরের শক্তিমানের মহত্তের প্রিয় তিনি, পূজিত তিনি। কারণ তারা অনুভব করে তাদের আধারে বিদ্রোহী যা তাকে আঘাতে আঘাতে সমর্থ ও নির্দ্দোষ সত্যে পরিণত করেন, কুটিল বিকৃত যা তাকে পিটিয়ে ঋজু করেন, অশুদ্ধ বা দোষ যুক্ত যা তাকে বহিষ্কৃত করেন। তিনি যদি না থাকেন তবে এক দিনে যে কাজ হয় তা নিষ্পন্ন করতে বহু শতাব্দী প্রয়োজন হত—তাঁর অভাবে আনন্দ হতে পারত হয়ত উদার গভীর কিম্বা কোমল মধুর সুন্দর কিন্তু তাতে থাকত না তার পরম পরাকাষ্ঠার প্রজ্জ্বলিত উল্লাস। জ্ঞানে তিনিই এনে দেন বিজয়িনী শক্তি, সৌন্দর্য্যে সুষমায় এনে দেন এক সমুচ্চ উর্দ্ধায়িত গতি আর সিদ্ধিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ক'রে তোলবার জন্য আমাদের যে মন্থর কষ্টকৃত প্রয়াস তাতে এনে দেন এমন আবেগ যার ফলে শক্তি বহুগুণিত হয়ে ওঠে দীর্ঘ পথ হ্রস্ব হয়ে আসে। পরতম যে আনন্দ, উচ্চতম যে উচ্চতা, মহত্তম যে লক্ষ্য, বৃহত্তম যে পরিদৃষ্টি, তা হতে ন্যূনতর কিছু তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারেনা। তাঁরই কাছে ভগবানের বিজয়িনী শক্তি আর আমাদের পরমা সংসিদ্ধি পরে নয় এখনই যদি সম্ভব হয়, তবে সে তাঁরই তেজের আবেগের ক্ষিপ্রতার প্রসাদে।"

মহাকালীর কাজ হ'ল মন্থর গতিকে ত্বরান্বিত করা, মিথ্যা, অন্ধকার, অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করা। এই পৃথিবীর বিবর্ত্তনের গতি অতি মন্থর তা জ্যোতিঃ, আলোককে স্বীকার করেনা, যত বারই আলো নামতে চেয়েছে, পৃথিবী তা বার বার অস্বীকার করেছে ("The earth consciousness does not want to change, so it reijects what comes down to it from above'' Sri Aurobindo) অবতারদের কাজ হ'ল এই পৃথিবীতে নতুন চেতনা নামিয়ে এনে বিবর্ত্তনের (Evolution) অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা, যা করতে সুদীর্ঘকাল লাগতো অবতার এসে অল্পকালের মধ্যেই তা সম্ভবপর করে তোলেন, এটা যেমন অবতার না হলে সম্ভবপর হয়না, ঠিক তেমনি দৈবীকৃপা, বিশেষতঃ মহাকালীর কৃপা ভিন্ন সাধকের সিদ্ধিলাভ ত্বরান্বিত হয়না। প্রত্যেক সাধককেই, যতই বড় অবতার হোন না কেন, প্রত্যেককেই বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই উঠতে হয় ("Resistence is the very law of evolution. Resistenee comes from Ignorance and Ignorance is a part of Inconscience. From the very beginning the opposition between knowledge and Ignorance was created……It is complete denial of the Divine……Every time light has tried to discen l, it has met with resistence and opposition. Buddha was denied …sons of light come, the earth denies them. rejects them,' —Sri Aurobindo), এই জড় পৃথিবী নিশ্চেতনার সৃষ্টি, অজ্ঞানতা তারই এক অংশ, এ হতেই আসে, আসল বাধা, সৃষ্টির প্রথম থেকেই চলছে এই দেবাসুর সংগ্রাম, অজ্ঞানতা শাশ্বতকে একেবারেই অস্বীকার করে যতবার আলো নামতে চেয়েছে ততবারই পৃথিবী তা অস্বীকার করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, বুদ্ধকে পৃথিবী অস্বীকার করেছে, এই জড় নিশ্চেতন পৃথিবী আলো চায়না, অবতাররা এসে তা নামিয়ে সৃষ্টির গতিকে ত্বরান্বিত করেন।

যাঁরা একবার মহাকালীর বা দৈবকৃপা পেয়েছেন, তাঁদের আর বেশী দুর্ভোগ ভুগতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্যত্র এমন শক্তিই নেই যে মহাকালীর শক্তিকে রোধ করতে পারে। দৈবকৃপা অহৈতুকী, তা পাত্র-অপাত্র, ভাল-মন্দ বাছেনা ("Divine Grace—It does not select the rightous and reject the sinner. It is a Power that is superior to any rule

even to the Cosmic Law. It works in its own mysterious way. At first it usually works, behind the veil preparing things, not manifesting. Afterwords it may manifest but the Sadhak does not understand what is happening, finally when he is capable of it, he both feels and understand. Some feel and understand from the very early but that is not the ordinary case." Sri Aurobindo) দৈবকৃপা কাজ করেন তাঁর রহস্যময়ী ইচ্ছায়। তা কোন জাগতিক আইনকানুন মানে না, প্রথমে তা কাজ করে গোপনভাবে সাধক তা টের পায়না যতদিনপর্যন্ত সেউ যুক্ত না হয়, উপযুক্ত হলেই সে তা উপলব্ধি করে তা, যাঁরা প্রথম থেকেই তা উপলব্ধি করেন তাঁরা অসাধারণ। যে একবার দৈবীকৃপা পেয়েছে তাঁর পথ সুগম হয়ে আসে, সিদ্ধিলাভ হয় সত্বর কারণ তাঁর কাজ দৈবী-শক্তিই করে দেন। জন্মজন্মান্তরের কাজ নিমেষে সম্পন্ন করতে মহাকালীই পারেন। তবে একথা সত্য উচ্চতর দেবকৃপা কদাচিৎই মিলে এবং এই কৃপা লাভের জন্য কিছু খাটতে হয়, ভজতে হয়, আত্মসমর্পণ করতে হয় তবেই তা সম্ভব হয়, তবে একবার দৈবীকৃপা পেলে তাঁর আর সিদ্ধিলাভের জন্য ভাবতে হয়না। একথাগুলি আমার অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। শাস্ত্রপাঠের সুযোগ আমার নেই, নইলে শাস্ত্র থেকে কিছু তুলে দিতে পারতাম ; মাত্র শ্রীঅরবিন্দের লেখাই আমার সম্বল এবং এইই যথেষ্ট মনে করি। মহাকালীর কৃপা মানে আশু শক্তির আশীষ (It is felt as something swift, sudden, dicisive, and imperative. when it intervens, it has akind of Divine or Supramental Sanction behind it and it is like a fiat against which there is no appeal, What is done can not be reversed or undone."—Sri Aurobindo) তাঁর ক্রিয়া হ'ল আকস্মিক ত্বরান্বিত করা, তাঁর কাজ পাল্টান যায়না বা তাঁর বিরুদ্ধ কিছু করা চলেনা, অদম্য, অপরাজেয়, দুর্দ্দম, দুর্ব্বার তাঁর শক্তি। মহাকালীর মন্দির কোথাও আছে বলে জানিনে, যা আছে তা কালীর, প্রাণময় জগতের চার হাতযুক্ত কালমূর্ত্তি, রুদ্র অজামলে অবশ্য শ্বেতবর্ণের কালীর উল্লেখ আছে কিন্তু সে রক্ষাকালী, মহাকালী নয়। মহাকালীকে যখন স্বপ্নে দেখি চিনতে পারিনি কারণ তাঁর রং না ছিল কালো বা তাঁর হাত ছিল চার, তবে বুঝছিলাম তবে মহাকালী বলে ধরতে পারিনি, ধরতে পেরেছিলাম সব শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়ে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পত্রালাপ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে দিলীপদার (রায়) কল্যাণে। আমার পত্রটি যাতে আমার এইসব অভিজ্ঞতার কথা দিলীপদাকে দিয়েছিলাম তা তিনি কৃপা করে শ্রীঅরবিন্দের কাছে পৌছে দিয়েছিলেন, এর জন্য দিলীপদার কাছে কৃতজ্ঞ।

মহাকালী আর কালী একই শক্তি নয়, মহাকালী আদ্যাশক্তি অধিমানস জগতের ("The overmind is a sort of deligation from the supermind which supports the present evolutionary universe in which we live here in Matter. The overmind is the Plane of the highest World of the Gods."—Sri Aurobindo) অধিমানস জগৎ অতিমানস জগতের প্রতিনিধি, যাঁদের কাজ হ'ল সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ে সহায়তা করা। উচ্চতম দেবদেবীদের আবসস্থল হ'ল অধিমানস জগৎ। মহাকালীর বিভূতির বা শক্তির বা রূপের শেষ নেই, যে কোন রূপেই বা বহুরূপেই তিনি আবির্ভূত হতে পারেন, সাধারণতঃ সোনালি বর্ণেই আবির্ভূত হন ("Mahakali usually golden, of a very bright and strong golden, hue".—Sri Aurobindo) এটি তাঁর ব্যক্তরূপের একটি, তাঁরই বিভিন্ন বিভূতি প্রাণময় জগতে কালী, রক্ষাকালী, শ্যামা ইত্যাদি নামেই সুপরিচিত ("Kali, Shayma etc, are ordinary forms seen through the Vital, the real Mahakali from whose origin in the overmind is not black or dark or terrible but golden colour and full of beauty, even when formidable to the Asura."—Sri Aurobindo) ; অধিমানস জগতের কারোরই বহু মাথা বা হাত নেই তা মাত্র প্রাণময় জগতের পক্ষেই সম্ভব

"The gods of the overmental Plane have not many heads and arms it is a vital symbolism, it is not necessary in other Planes."—Sri Aurobindo).

শ্রীঅরবিন্দ—"অধিমানসে রয়েছে মায়ার আদিরূপ যদিও তাহা বিদ্যামায়া, অবিদ্যাস্পৃষ্ট নয় তবুও তার থেকে অবিদ্যা স্তর, এমনকি অবশ্যম্ভাবী হয়েছে বিদ্যা অবিদ্যার সন্ধিস্থল। …অধিমানস চেতনায় প্রবেশ, অধিষ্ঠান এবং সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে "আনন্দ" স্তরে পৌছান (এক গভীর সমাধির মধ্য ব্যতীত অসম্ভব) বা অধিমানসে অত সহজে পৌছান যায় না।…অধিমানস বা অতিমানস প্রাপ্তির বহু পূর্ব্বে মানসে আত্মার উপলব্ধি, এসব চরম বস্তুর সম্বন্ধে এখন চিন্তা ক'রো না।" এক আত্মা বা চৈতন্যপুরুষের উপলব্ধি করতে জন্ম জন্মান্তর কেটে যায়, এসব উচ্চতর জগতের উপলব্ধিতো সুদূরের কথা। শ্রীঅরবিন্দ অধিমানস জগতকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন—মানস অধিমানস, সম্বোধি অধিমানস, প্রকৃত-অধিমানস ও ঋতচিৎ অধিমানস, (It is not so simple as that but it (the overmind) can be for convinience be divided into four planes—mental overmind, intuitive overmind true overmind. sapramenial overmeod but there are many layers in n each and each of these can be regarded as a plane itself." —Sri Aurobindo

এবার আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথায় আসি। ছেলে বেলায় আমি অতি কাল ও কদাকার ছিলাম, বাবা আমাকে তাঁর সন্তান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করতেন, প্রায় তের বৎসরের মত বয়স সব কালে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জ্জনের দিন (আমাদের গ্রামের বাড়ীতে প্রত্যেক বৎসরই ৺জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা হ'ত, আমি দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম চণ্ডী মণ্ডপের পাশের ঘরে, যখন বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়ে প্রতিমা নেওয়া হচ্ছিল তখনই আমার উপলব্ধি শেষ হয়) জীবনে প্রথম আমি উপলব্ধি করি মহাকালীর তবে তাঁর স্বরূপের নয়, তাঁর দিব্যস্পর্শ আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে ছিল, আমি ছিলাম তাঁর কোলে শুয়ে, অমন ঘুম আর জীবনে হয় নি, তাঁর দিব্য স্পর্শে আমার গায়ের রং আস্তে আস্তে বদলে যায়, মূল রং-এর চিহ্ন এখনও একটু আছে, যৌবনে সুশ্রীই ছিলাম বলা যায়। কালীবাড়ীর গায়েই ছিল আমাদের বাড়ী, খুলনায়, কালী ভক্ত তাই ছেলেবেলা থেকে, তবে সন্ন্যাসী হবার কোন ইচ্ছাই ছিলনা। আমার বাবার আশা ছিল ব্যারিষ্টার করবার, তাঁর সে আশা পূর্ণ হলনা। মহাকালীর আদেশেই আমি সংসার ত্যাগ করি, নিজের ইচ্ছায় নয়। গৃহ ত্যাগের সময় আমার কোন সংশয় বা দ্বিধা ছিলনা বা বলতে পারি সেআদেশ লঙ্ঘন করার শক্তি আমার ছিলনা। পালিয়ে তারকেশ্বর যাই, মেজদা ধরে নিয়ে আসেন বাড়ীতে। তার পর থেকে বাড়ীতে থেকেই সাধনা আরম্ভ করি সেটা ১৯৪০ সালের কথা। বাড়ীর অবস্থা খারাপ ছিলনা তাই কোন কাজ করতে হয়নি বলেই সাধনার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলাম, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলাম। মহাকালীর কৃপা পাই সাধনা আরম্ভের দুই বৎসর মধ্যেই. ঠিক মনে নেই কোনটা আগে আর কোনটা পরে। সম্ভবতঃ আগে দেখি অধিমানস জগতের দৃশ্য, দেখি গভীর উজ্জ্বল গলিত স্বর্ণ বর্ণ কোটি সূর্য্য তুল্য আলোর সমুদ্র, ঠিক যেমন আমরা দেখি ঝড়ের বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ ঠিক তেমনি, যদিও আকারে তা বহুগুণ বড়, তা ছিল সীমাহীন, আমি চীৎকার করে উঠে ছিলাম, তা সহ্য করতে পারিনি বলে, তারপর একদিন নানা আলোর খেলা, অপূর্ব্ব সে খেলা, এটা কোন্ জগতের তা জানিনে। সে বিভিন্ন রং-এর আলোর সংখ্যা দশ হতে বারোর মধ্যে সাতটো নয়, তা যেন বহু রামধনুর খেলা। এর পর একদিন পাই মহাকালীর পাদস্পর্শে, শান্তির (peace) উপলব্ধি. যতক্ষণ তাঁর পায়ে আমার মাথা ছিল ততক্ষণ মাত্রই ছিল শান্তির আনন্দ, তাঁর পর থেকে মাথা তুলতেই সব শান্ত অদৃশ্য হয়ে যায়। এর পর এক রাত্রে হয় মহাকালীর অবতরণ অবশ্য স্বপ্নেই প্রথম আরম্ভ হয়, প্রথম দেখি সোনালি কোটি সূর্য্যের আলো, আস্তে আস্তে সে আলো বা জ্যোতিঃ বিবর্ণ হয়ে আসছে। যতই সে জ্যোতিঃ বিবর্ণ বা অদৃশ্য হচ্ছে ততই এক দেবী মূর্ত্তি আস্তে আস্তে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর নেমে আসার দৃশ্য বেশ মনে আছে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে আসার মত স্নিগ্ধ ধীর পদক্ষেপেই তা হয়েছিল, সোনালি আলো শেষ পর্য্যন্ত ছিলনা। এই দেবী মূর্ত্তির সঙ্গে কোন গহনা

দেখেছি বলে মনে হয় না বা মাথায় মুকুটও ছিল না। মাতৃরূপা অপরূপ সাড়ী পরিহিতা মাথায় ঘোমটা দেওয়া, উজ্জ্বল বর্ণের সাধারণ মানুষের মত উচ্চতার, তিনি ঠিক আমার নাকের উপর পর্যন্ত ছিলেন। ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁকে দেখেছি তাঁর স্বরূপে তখন তাঁর সে জ্যোতিঃ ছিল না। তারপর তাঁর স্বরূপ অদৃশ্য হয়ে যায়, কিছুক্ষণ পরেই আমার হৃদয়ে বা হৃৎপদ্মে আরম্ভ হ'ল আলোড়ন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্নই দেখছিলাম। অন্তরে এই আলোড়নের ফলেই ঘুম ভেঙে যায়, শেষে অবস্থা এমন হ'ল যে, আমাকে কে যেন গামছা নেঙড়ানের মত চাপছে, প্রাণ ভেঙে যায় যায় এমন অবস্থা। উঠে বিছানায় বসে আছি তখন, চীৎকার করতে পারছি না। পাশের খাটে বাবা ছিলেন শুয়ে তখন প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁকে চলে যেতে বলি এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তা করেন। এটা ঘটে খুব ভোরে। পরে সকালে আমার অবস্থা হয় যেন ১০৬ ডিগ্রী ম্যালেরিয়া জ্বর হতে উঠছি, গায়ে অসহ্য ব্যথা, চুল উস্কো খুস্কো (এর পর আর মহাকালীকে ডাকিনি কারণ তাঁকে ধারণ করবার মত অবস্থা আমার ছিলনা, মনে করেছিলাম কোন সদ্গুরুর কৃপায় কিছু লাভ করে উপযুক্ত হলে আবার চেষ্টা করব। সদ্গুরুর কৃপা তো দূরের কথা ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলাতেই ব্রহ্মজ্ঞানটিই মাটি হয়ে গেল। মহাকালীকে ছেড়ে যে আত্মঘাতী ভুল করেছি তার মূল্য আজও দিচ্ছি কড়ায় গণ্ডায়, সে শক্তি আর ফিরে আসেনি। শ্রীঅরবিন্দের মত আমারও একটা সোনালি আশা ও স্বপ্ন ছিল কিছু করা, জগতের কল্যাণকর কিছু, তা নিজের জন্য নয়, হয় তো ভগবানের অনুমতিও ছিল নতুবা এত সব আমার লাভ হতনা, ব্রহ্মজ্ঞানটি আমার নিকট হতে কেড়ে নেবার পর মনে হ'ল আমার সব শেষ, আধ্যাত্মিক মৃত্যু আমার হয়ে গেল) তবে এটা নিশ্চিৎ জানি যে যখন একবার মুক্তিলাভ করেছি তখন এইই শেষ মনুষ্য জন্ম, "নাস্তি উত্তরো করণীয়ং" 'আমার করবার আর কিছু নেই।' হয়তো বিতাড়িত হয়ে পথে পথে ঘুরতে হবে, তাতে অবশ্য আমার কোন ভয় নেই। কারণ পরাৎপরের (supreme) স্পর্শ ও আশীষ যখন পেয়েছি তখন আমার জন্য ভাবনা করার আমার আর কারণ নেই); তখন হতাশ হয়ে পুরুষোত্তমের কাছে নিয়ত প্রার্থনা করতে থাকি তিনি যেন আমার মাথায় তাঁর অদৃশ্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে তিনি যে আমাকে ছাড়েন নি সে প্রমাণ দেন, তিনি তা করছিলেন যে ভাবেই আমি চেয়েছিলাম তবে স্থূল শরীরে তা হয় নি, হয়েছিল সবিকল্প সমাধির মধ্য দিয়েই। নির্ব্বিকল্প সমাধি হারালেও সবিকল্প সমাধি ছিল কয়েক বছর, আমি তা ত্যাগ করেছি সজ্ঞানেই চোখ বুজলেই এখনও আমি প্রাণময় জগতের সব দেখতে পাই, তার জন্য আমার ঘুমের বা সমাধির কোন প্রয়োজন হয় না। স্থূল শরীরে ভগবানকে বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা অসম্ভব। ঐ সময়েই বাণীনন্দা (স্বয়ং) খুলনায় আসেন, তাকে ষ্টেশনে গিয়ে আনবার কথা আমাদের ছিল, ঘুমাবার আগে সেদিন আমার অন্তর-পুরুষের (psychic) কাছে প্রার্থনা করেছিলাম ঠিক ভোর চারটার সময় আমাকে জাগিয়ে দিতে, ভোরে ওঠা অভ্যাস ছিলনা, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল অন্তর পুরুষ ঠিকমত সময়ে ডেকে দেবেনই তাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলাম, আমার অন্তর পুরুষ যখন আমাকে 'অরু' বলে শুরু গম্ভীর স্বরে ভিতরে থেকে ডাক দিয়ে জাগালেন ঠিক তখনই চারটার ঘণ্টার শব্দ শেষ হয় (আমার আসল নাম অরুণ নয় অরবিন্দ আমার নাম, অরু বলে সকলে ডাকত, পাকেচক্রে হয় তো বা গুরু শিষ্যের এক নাম থাকা ঠিক নয় বলে যে করেই হোক, তাকে আমি অরুণ করে নিই), এই সময়ে একটি মহাত্মা, আমার কাছে আসেন খুব সম্ভবতঃ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হবেন, কারণ তাকেই ডাকতাম খুব, এসেছিলেন, আমি তখন কেবল টাইফয়েড হতে উঠেছি, খুব দুর্ব্বল ছিলাম তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আর একটি মহাসুযোগ নষ্ট করলাম, ভয় না পেলে কিছু পেতাম তাঁর কাছ থেকে। এই-ই আমার অদৃষ্ট, সবই হারালাম আমাকে অনেকেই প্রতারক বলে উপহাস করেন। হয়তো কালে উৎপীড়িত ও বহিষ্কৃত হইতে পারি এই সব লেখার জন্য, আমি প্রস্তুত হইয়াই স্বাক্ষর রাখিয়া গেলাম, ভবিষ্যৎ আমার গভীর অন্ধকারময়, আমার অধ্যাত্ম জীবনের হয়তো এই শেষ, যদি কোনদিন কোন সত্যকার ব্রহ্মজ্ঞ যোগীর হাতে এই লেখা পড়ে মাত্র তিনিই বুঝতে পারবেন আমি কি করে গেলাম

আর কি করতে পারতাম। সাধারণ মানুষ আমাকে পাগল বা প্রতারক ভাবলে তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। শক্তি ছাড়া কিছুই করা যায় না ভাল মন্দ উভয় কাজই, আমরা জানি যত সূক্ষ্ম হাওয়া যায় ততই শক্তি বৃদ্ধ হয়, কোন মহান কিছু করতে গেলে ভগবানের শক্তি ছাড়া তা করা সম্ভবপর হয় না (শ্রীঅরবিন্দ—"শ্রীঅরবিন্দের শক্তি জিনিসটা কি? তাতো এই শরীরের বা মনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সেটা উর্দ্ধের শক্তি, আমি তা ব্যবহার করছি বা আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে।") শক্তি ভাল মন্দ উভয়ই আছে; Black Magic, সিদ্ধাই, গুহ্যশক্তি (Ocult powers) এর প্রায়শ মন্দ কার্য্যেই ব্যবহৃত হয় তাই ঠাকুর বলেছেন "বের শূকরী বিষ্ঠা, এগুলি সাধকের পক্ষে সর্ব্বনাশা। ("There is no libertion in getting Powers, It is a worldly search after enjoyments and is no enjoyment in this life; all search after enjoyment is vain; this is the old lesson which man finds so hard to learn, when he does leave it, he gets out of the universe and becomes free, The Possission of what, are called occult powers is only intensefying the world, and in the end, intensefying suffering. Patanjali warns us against these powers," Swami Vivakauanda) কামনাকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে শাস্ত্রে, কামনার শেষ কখনই হয় না, যারা সিদ্ধাই চান তারা ঐ সব শক্তি লাভ করে নিজের ও জগতের সর্ব্বনাশ ডেকে আনেন, মুক্তি মোক্ষ তাদের জন্য নয়। আজ শ্রীঅরবিন্দ যদি থাকতেন তাঁর প্রকৃত আদর আমি পেতাম। মহাকালীই আমার অধ্যাত্ম পথ খুলে সুগম করে দিয়েছিলেন ফলে কোন বারই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার সময় আমাকে কোনবেগ পেতে হয় নি এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার সময়ও, আসল কাজ তিনিই করে দিয়েছিলেন এবং আমার সিদ্ধির জন্য যা কিছু করবার তিনিই তা করিয়ে দিয়েছিলেন, আমাকে অতি অল্পই খাটতে হয়েছিল ("যে শাশ্বতকে বেছে নেবে, তাকে শাশ্বত আগেই বেছে নিয়েছেন। সে পেয়েছে সেই দিব্য সংস্পর্শ যা নইলে জাগৃতি আসে না, যা নইলে আত্মদানের দুয়ার খোলে না। কিন্তু এ-বার এই সম্পর্শ পেলে সিদ্ধি এলো, হয়তো আসে এক জন্মেই দ্রুত যুক্ত জ্ঞানের মত নেমে আসে এ সংসারের মাঝে ধাপে ধাপে বহু জন্ম ধরে ধীর ভাবে অনুধাবনের ফলে।" (শ্রীঅরবিন্দ)। ব্রহ্মজ্ঞান কাড় না সমাধির অভিজ্ঞতা ছাড়া মহাকালী সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা স্বপ্নের মধ্য দিয়েই হয়েছিল। অষ্টাঙ্গ যোগের পথে এক জন্মে সিদ্ধিলাভ করা দুরূহ এবং তা মাত্র সুদীর্ঘ কাল তপস্যার ফলেই সম্ভবপর হয় এবং তা কদাচিৎ কোন ভাগ্যবানের অদৃষ্টে মাত্র ঘটে। যোগসিদ্ধ কাউকেই আমি জানিনে বর্ত্তমানে, তার চেয়ে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে উচ্চতর লোকের অভিজ্ঞতা লাভ করা সহজ যদিও সকলের পক্ষে তা সম্ভবপর হয় না কিন্তু তা সম্ভব ও স্বাভাবিক ("Yes, certainly dream experiences can have a quiat value in them and convey truths that are not so easy in the waking state" Sri Aurobindo)

সাধনার প্রারম্ভে সিদ্ধিলাভ হয় না তা করতে বহুকাল কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে স্বপ্ন উপলব্ধি করা অনেক সহজ, প্রথমেই দেবদেবীদের স্থূল চক্ষে দেখা যায় না, তা দেখতে হলে কামজয়ী হতে হয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সুকঠিন। স্বপ্নের উচ্চতম দেবদেবীদের দেখাও সহজ নয়। যে কোন উচ্চস্তরের দেবদেবীকে দেখাই সুকঠিন তার চেয়ে আরো কঠিন তাঁদের স্পর্শ করা, সবচেয়ে কঠিন ভগবান বা তাঁর সঙ্গে একীভূত হওয়া, তাঁর সঙ্গে লীন হওয়া বা সাযুজ্য লাভ করা, মহাকালীর কৃপায় তাঁর সঙ্গে, ব্রহ্মসহ একীভূত বা বুদ্ধদেবের সঙ্গে বা অচিত্তের (Inconscient) এর সঙ্গে একীভূত হতে আমার মোটেই বেগ পেতে হয়নি তা আপনিই হয়ে গিয়েছিল। আমি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিনি মাত্র তাঁর চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়েছিলাম, তাঁর স্পর্শে রোগমুক্ত হই, তিনি একটি অবস্থা দিয়েছিলেন এমনকি পুরুষোত্তমের (Supreme) আশীষ ("মানুষ নিজের মধ্যে 'পুরুষোত্তম চেতনা' বলে কোন বস্তু যে আয়ত্ত করতে পারে . তা

আমি জানিনা ; কারণ গীতা বলেছে পুরুষোত্তম হলেন পরমপুরুষ, ক্ষর ও অক্ষরেরও অতীত তিনি, ধরে রয়েছেন এক এবং বহু উভয়কেই : গীতার বাণী হ'ল মানুষ পেতে পারে ব্রহ্ম-চেতনা, নিজেকে উপলব্ধ করতে পারে পুরুষের শাশ্বত অংশ বলে…শ্রীঅরবিন্দ"। কোন মানুষের পক্ষে পুরুষোত্তম হওয়া তো দূরের কথা ব্রহ্ম হওয়াই সম্ভব নয়, ব্রহ্ম বলে ব্রহ্মচেতনা লাভ করে ব্রহ্ম হয়না, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী তা হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, এ জন্য আমি নিজে বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছি।) পেতেও আমাকে কোন বেগই পেতে হয়নি। যারা ভগবান বা উচ্চতর দেবদেবীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাঁরা ঠকেন না "কচিৎ এমন হয় যে কোন কোন সাধকের আর অন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়না, কেননা তার যোগ সাধনার বাকী অংশটাকে অবিরাম সেই দিব্য সংস্পর্শের ও সেই দিব্য প্রেরণার ফলে আপন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। হৃৎকমলের যিনি অধিবাসী তাঁর সমুজ্জ্বল কিরণের প্রভাবে ভিতর থেকে জ্ঞানশতদল আপনা আপনিই ফুটে ওঠে। তবে এরকম সাধকের সংখ্যা খুব কম, তাঁরা সত্য সত্যই মহাপুরুষ, যাঁদের পক্ষে এ স্বপ্রকাশ স্বআত্মজ্ঞানই যথেষ্ট যাঁদের দরকার হয়না কোন লিখিত গ্রন্থ বা জীবন্ত শিক্ষাদাতার আশ্রয় গ্রহণ।" শ্রীঅরবিন্দ। একথা সত্যিই যাঁরা দৈব কৃপা পান তাঁরা অতীব ভাগ্যবান কিন্তু এর জন্য বেশ খাটতে হয়, দৈবকৃপা এমনি মেলে না, তা যদি হোত তাহলে সবাই যোগী হয়ে যেত ("Yoga itself is not easy, if it were so, it would be multitude and not only a few that would be practising it." Sri Aurobindo) ; সত্যকার চাওয়া হলে তা পাওয়া সম্ভব। ("আস্পৃহা বা অভীপ্সাই মানুষকে জানাইয়া দেয় সে ভবিষ্যতে কি হইয়া উঠিবে—তাহার সমস্ত আশা ও অভীপ্সার, কামনা বাসনার মূল সচ্চিদানন্দকে এখানে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা। কারণ অভীপ্সা আছে তাহা পূরণের উপায় নাই তাহা কখনও হইতে পারেনা। জগৎটা একটা পাগলের খামখেয়ালীর সৃষ্টি নয়।"—শ্রীঅরবিন্দ), যাদের ভগবানকে পাবার সত্যকার আস্পৃহা থাকে তাঁরা তা পাবেনই ("He who choses the Divine has been chosen by the Divine. The Divine holds him tight and will not let him go."—Sri Aurodindo) ; "আসল বাধাটি থাকে সর্বদাই আমাদের ভিতরে, বাহিরে নয়। মানুষ যদি অজেয় হতে চায় তবে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন ইচ্ছা, স্বার্থপরহীনতা ও বিশ্বাস। মুক্ত হওয়ার একটা ইচ্ছা আমাদের থাকতে পারে, কিন্তু যথোচিত বিশ্বাসের হয়তো অভাব আছে …পথটি দীর্ঘ কিন্তু আত্মসমর্পণ তাকে হ্রস্ব করে দেয়… উপায়টি কঠিন কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস তাকে সহজ করে দেয় —ইচ্ছা সর্বশক্তিমান কিন্তু তাকে হতে হবে দিব্য ইচ্ছা, স্বার্থহীন, প্রশান্ত, ফল সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন…ভগবানের যা ইচ্ছা তা ঘটবেই।"—শ্রীঅরবিন্দ।

"সর্বত্র জয়ম্ অন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"— "নিজের জয় মানুষ সর্বত্রই চায়, চায়না শুধু দুজায়গায় শিষ্যের ও পুত্রের কাছে। এটাই হ'ল আদর্শ সৎ গুরুর লক্ষণ। দাস্ত নামে বৃদ্ধ নিয়ম সাধক, বিশুদ্ধ নীতিধর্ম-পরায়ণ তার কাছে অনেক গভীর রসের রহস্য জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—বাবা, এইসব গভীর রাজ্যে আমার তেমন প্রবেশ নাই যেমন আছে আমার শিষ্য বল্লভ ও দুর্লভের। দাস্ত বৃদ্ধ বল্লভ দুর্লভ যুবা। প্রথমে নয় পরে ধরা দেয়। এরা ভগবানের প্রেমের রসেই ভরপুর, নীতির কথা বলেন নি। তুমিতো প্রধানতঃ নীতি দ্বারা পবিত্র জীবন যাপন কর ও নীতির কথাই উপদেশ দাও। যে উত্তর দাস্তের কাছে তাহা কখনো আশা করি নাই। গুরু হইয়া শিষ্যদের কথা এমনভাবে যে কেহ বলিতে পারে তাহা ধারণা ছিলনা। দাস্ত বলিলেন বাবা, উহাদের মত সৌভাগ্য কয়জনের? ভগবানের বিশেষ কৃপা না থাকিলে কি এমন সৌভাগ্য হয়? আমি প্রভুর মন্দিরের তাম্রপাত্র, প্রতিদিন আমাকে মাজিয়া নির্মল করিতে হয়, না মাজিলেই আমি মলিন হইয়া যাই। উহারা যে প্রভুর জন্য ঠিক বিকশিত কমল। এদের গায়ে কি এই মাজন চলে? তাঁর পূজায় কমল ঘসিয়া নষ্ট করিবে এমন সাহস কার? উহারা তাঁর চরণের প্রেমের কমল। এমন সৌভাগ্য কয়জনের? ভগবানের কৃপায় মেলে এই সৌভাগ্য। উত্তর শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।"

শ্রীক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী।

বুদ্ধদেব—"পৃথিবীতে এমন কোন দুর্লভ বস্তুই নেই যা উদ্যমশীল বীরগণের হস্তগত না হয়।" কোন সাধনাই সহজ নয় তবে দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে তাও সম্ভবপর হয়। মুক্ত সকলকেই হতে হবে এ জন্মে না হলে অন্য জন্মে তা করতেই হবে অতএব যা করতেই হবে তা আগে থেকে করাই বুদ্ধিমানের কাজ নতুবা বলতে হবে—"হে গার্গী! যারা অধ্যাত্ম জগতের অপূর্ব এই আনন্দ যাহা অক্ষয় অমৃত স্বরূপ তাহাকে বিদিত না হইয়াই এই লোক হইতে চলিয়া যান তাহারা বড় দুঃখী।" শ্রীঅরবিন্দ।

পথের-ফসল

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ব্যথা বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে, বাতায়নে বসে
জীবনের হিসেব—নিকেষ ;
অনেক, অনেক পথ কেটেছে, তাদের এনে
করেছি জড়ো ; রোমন্থনও ভালো লেগেছিল।
শস্য-শষ্প-পূর্ণ জীবন-শুরুতে
বাতায়নে বসে ভেবেছিনু,
ঐশ্বর্য সম্পদে ভরা জীবন আমার !
নদীর দুটো বাঁক—দুদিক দিয়েই
হিসেব করেছি, বাঁকাপথে কামনার
আমিই শুধু জীবনের আবেগে
কোথায় থেমে গেছি, মেলাবারও
পাইনি সুযোগ। সোজাপথ বাঁকা হয়ে
ভঙ্গুর জীবন তাই হতাশ্বাসে ছেয়ে
শান্তির নীড় চায়
পাবে কোথা ?
জীবন-ঐশ্বর্যে ভরা, আগামীদিনের স্বপ্ন
আজ মনে হয় : ভ্রান্ত, অতি ভ্রান্ত।
রশ্মিগুলো রাশ মানেনিকো কল্পনার
সুদূর প্রসার, সেও, থেমে থাকেনি।

———

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তৃতীয় পর্ব

এক

দু সপ্তাহ পরে

ভাই প্রেমল,

তোমাকে লিখব লিখব ক'রেও লেখা হয় নি এতদিন—কারণ আমি কাশী থেকে বেরুতে না বেরুতে কর্মভোগের পাকে প'ড়ে অশ্রান্ত ঘুরছি নানা ওস্তাদের খোঁজে। জর্মনিতে যখন ছিলাম তখন তাদের jugend-bewegung-এর * টানে দুই জর্মন যুবকের সঙ্গে পিঠে Tonister + বেঁধে তিন সপ্তাহ পদব্রজে ঘুরেছিলাম রাইন উপত্যকায়। (স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন জানো তো—পদব্রজে না ঘুরলে কোনো দেশকেই ঠিক দেখা হয় না—রেল মোটরে ঘুরে দেখা হ'ল উপর-ভাসা দেখা।) আমার নিয়তি খানিকটা নারদের মতনই বলব—যাঁকে দক্ষমুনি শাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি কোথাও "স্থিতু" হ'তে পারবেন না। আমার নিয়তিও খানিকটা অভিশপ্ত দেবর্ষির ঢঙে আমাকে ঘুরিয়ে মারতে বদ্ধপরিকর মনে হয়। তাই বিলেত থেকে ফিরেই আমি চরকির মতন অশ্রান্ত ঘুরে মরছি—আজ এখানে কাল সেখানে—যদিও আশা করি নারদমুনির মতন সর্বত্র ঝগড়া বাধিয়ে নয়। তর্ক? হ্যাঁ আমি স্বভাবে একটু তার্কিক মানি—(পিতৃদেবের কাছ থেকে পেয়েছি শুধু কণ্ঠই তো নয়—তাঁর উদ্দাম তর্ক-প্রবৃত্তি)—কিন্তু তর্ক মানে কি ঝগড়া? ধরো না কেন, তোমারই সঙ্গে। তর্ক করেছি তো কতই—কিন্তু সে কি ঝগড়া করতে, না শিখতে? সত্যি ভাই, তোমার সঙ্গে তর্কাতর্কি ক'রে কত যে শিখেছি কী বলব? একথা অবশ্য, মানি যে, তর্কাতর্কির মধ্যে দিয়ে যেটুকু ক্ষীণ আলো আসে তাতে ভালো দেখা যায় না। তুমিই বলতে কথায় কথায় যে, এ-আলো যেন প্রদোষের আলো—বড় জোর দুচারটে খানা খোন্দল এড়িয়ে চলতে শেখায়—দূর লক্ষ্য "গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ"-এর খবর দেয় না—যে-পথ চলেছে অচিন দেশে যেখানে বাস চিরচেনা আনন্দের। আমাদের হাজারো সংশয় দ্বিধা দোমনা দোলার কুমন্ত্রণায়ই তো আমরা সে-আনন্দলোককে হারিয়েছি। (মা একদিন হেসে বলেছিলেন—মনে আছে কি তোমার—যে, শিশু যখন জন্মায় তখন সব প্রথম কাঁদে—"কহাঁ এ, কহাঁ এ—এ কোথায় এলাম, কোথায় এলাম?" ব'লে।)

তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া তাই আমার বিশেষ দরকার ছিল ভাই। আমি যেখানেই যাই বন্ধু পাই—অঢেলই বলব। কিন্তু সব দুদিনের সংযাত্রী—দুচার পা এগিয়েই দেখি আর পা পড়ছে না সমান তালে—চলার ছন্দে গরমিল হচ্ছে পদে পদেই। কাজেই দুদিন বাদে—at the parting of the ways—তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলতে হয়েছে শুধু—ঐ জর্মনদের মতন—Wanderlust-কেই* সম্বল ক'রে। বিলেত থেকে ফিরে তাই নানা পথে নানা বন্ধুর সঙ্গ সাহচর্যে সুখ পেলেও কোনোদিনই তাদের দহরম-মহরমকে তেমন আমল দিই নি—তাছাড়া দেবার অবকাশও ছিল না, কারণ আমি দেশে ফিরে কেবলমাত্র Wanderlust-এর তাগিদেই ভ্রাম্যমাণ হই নি, হয়েছিলাম আমাদের দেশের গানের ঐতিহ্যের খবর পেয়ে সঙ্গীতে নবসৃষ্টির প্রেরণা পেতে। চেয়েছিলাম শুধু গাইয়ে হ'তে নয়—সঙ্গীতকোবিদ (musicologue) কবি ও সুরকার (Composer) হ'তে।

* যুগেণ্ড-বেভেগুং—যুব-আন্দোলন + পৃষ্ঠ থলি (Knapsack)

* ভ্রমণোৎসাহ

কিন্তু হায় রে! "শ্রেয়াংসি" যে "বহুবিঘ্নানি"—কোটায় পথে যে হাজারো কাঁটার অত্যাচার—এ-আপ্তবাক্যের মার নেই ভাই। ভ্রাম্যমাণ হয়ে ওস্তাদ ঢুঁড়তে গিয়ে সময়ে সময়ে আমার যে কী হাল হয়েছে—বিশেষ ক'রে এবার কাশী থেকে বেরিয়েই—যে, দেখলে ললিতা নির্ঘাৎ ছাপুণ নয়নে কাঁদত। জলে-জলময় গোয়ালঘরে আশ্রয় নিতে না হ'লেও ভাঙা তক্তপোষে কোনমতে শুয়ে, উপরে মশা ও নিচে ইঁদুর ও বিছের সঙ্গে পারাপার যুদ্ধ করতে হয়েছে বেরিলিতে এক ওস্তাদের পাশে ছিলের ঘরের আতিথ্যে। আর মশা তো নয় ভাই—অক্ষাংভীর ভাষায় "খেকশ" বলা চলে—যার প্রাক্তিহীন দংশনের ফলে পরদিন ওস্তাদজি আমার কমলাননকে কাঁঠাল ব'লে ভুল ক'রছিলেন!

কিন্তু সবই ট্র্যাজেডি নয় অবশ্য। ক্ষতিপূরণ মেলে বৈকি। সেখানেও যে ফুলের চেয়ে কাঁটা বেশি—অসুরদের দৌরাত্ম্য কালে-ভদ্রে এক আধটা সুর-এর দেখা মেলে একথা বলাই বাহুল্য। তবু মাঝে মাঝে অন্য ক্ষেত্রে ওস্তাদ-বৃন্দের দৌরাত্ম্যে মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'লেও বাকি আধ আনার সুধাস্বাদে প্রাণ জুড়িয়ে গেছে। কিন্তু লক্ষণীয় —তাঁরা কেউই ভজনের ভ-ও জানেন না, অথচ শুধালেই বলেন: "জান'তে কি!" একটা দৃষ্টান্ত দিই। এক বিখ্যাত ওস্তাদ খেয়ালের পরে ভজন গাইতে অনুরুদ্ধ হয়ে ধরলেন মহাপ্রাণতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ক্রন্দিত ভজন। গানটির প্রথম চরণ—"দ্রৌপদী পুকারী"। অর্থাৎ দুঃশাসনের উৎপীড়নে বিবসনা হবার ভয়ে দ্রৌপদী হাহাকার ক'রে কাঁদছেন। ওস্তাদজি গাইছেন "দ্রৌ দী পুকারী" ঠুংরি। কেবল তানের মন্দ্রধাক্কে সবাইকে চমকিয়ে দিয়ে! আর মুখে সে কী একগাল হাসি: "কী তান-কর্তবই দিচ্ছি একবার দেখ দেখ!" তাঁকে আমি গীতার কথা বলেছিলাম—পরধর্ম ভয়াবহঃ। বলেছিলাম আপনার নিজের এলাকা খেয়াল বাইসাহেব, আপনি ভালো ক'রেই জানেন। তবু কেন খেয়াল ছেড়ে ভজন গাওয়া! ভজন গাওয়া তো সম্ভব নয় ভক্তিকে ফলিয়ে তুলতে না পারলে।"

কিন্তু ঠাকুর কৃপাময়। তাই এর পরেই শোনালেন বিষ্ণুদিগম্বরের ভজন—এক রাম মন্দিরে। আহা সে কী ভজন! অন্ধবস্তু ভারতবিখ্যাত গায়ক—কিন্তু ভজনের সময় যাকে বলে "তৃণাদপি সুনীচেন" অবস্থা—চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। যখন শেষে গাইলেন তুলসীদাসের—

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ
সখা সহিত সরযূ-তীর
বৈঠে রঘুবংশ বীর
হরখ নিরখ তুলসীদাস চরণরে লিপটাঈ

তখন শ্রোতাদের মধ্যে ভক্ত লোকের চোখেই যে জল ঝরেছিল! পরের বার যখন দেখা হবে এ-গানটি মাকে শোনাবই শোনাব।

কিন্তু কবে—মাঝে মাঝেই ভাবি। কী আনন্দে যে কাটিয়ে এসেছি বৃন্দাবনে ও কাশীতে। তোমাদের সঙ্গে এভাবে হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা হওয়া—তা'তে যেমন অবাক লাগে, তেমনি প্রাণে ভরসা আসে। তাই, আমি কয়েকটি সাধুর সঙ্গে মিশে লাভ করেছি যথেষ্ট, কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠতা এ-পর্যন্ত এক শ্যামঠাকুর ছাড়া আর কারুর সাথে হয় নি।

কিন্তু তোমায় সূত্র কতগুলি লাভ হ'ল বলো তো! শ্যামঠাকুরের মাধ্যমে শুধু তাঁরই পুণ্য চরিত্রের আলো পেয়ে মনের অনেক অবসাদ আঁধার কেটেছে। কিন্তু আর কেউ দেখা দেন নি তাঁর আশে পাশে। শুনেছি তাঁর গুরু আনন্দ গিরির কথা, তবে তাঁর সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি। হরিদ্বারে যাবই অবশ্য তাঁর পুণ্য সঙ্গলাভে ধন্য হ'তে কিন্তু কবে যে যেতে পারব কে জানে ভাই? তোমার মুখেই শুনেছি যে প্রতি কর্মই আনে কর্মফলের জের chain of consequences; আমি গান গান ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি এর ফলে গানের নানা রূপ রস আমাকে পেয়ে বসছে না কি? নিশ্চয়ই আমার মনকে কিছুটা বাড়িয়ে তুলছে। ফলে ভজনের আরো যেন দূরে স'রে যাচ্ছে। একথা মনে হয় আরো এই জন্যে যে, এখানে ওখানে ভজন গেয়ে কই আর তেমন উজিয়ে উঠতে পারছি না তো—যেমন উঠতাম তোমার বা মা-র পুণ্য সঙ্গের পরিধিতে! মা বলতেন প্রায়ই মনে আছে—"ভজন শোনাবে কেবল ঠাকুরকে বাবা—যেন তুমি একা গায়ক আর তিনি একা শ্রোতা।" কিন্তু আমি কই সেভাবে তো গাইতাম না তোমাদের ওখানে কাশীতে! মনে হ'ত—তোমরাও শ্রোতা। ঠাকুর শুনছেন—একথা মা বলতে পারেন—

যিনি তাঁর হালচালের খবর রাখেন। কিন্তু আমার তো কতবারই মনে হয়েছে ঠাকুরকে অন্যমনস্ক···তাই হয়ত গাইবার সময়ে তাঁর কাছে যেতে প্রেরণা পেতাম না। কিন্তু তুমি মা বা ললিতা সামনে থাকলে প্রত্যক্ষ প্রেরণা পেতাম একথা জোর করেই বলতে পারি কারণ এ নির্জলা সত্য। তা যদি হয় তবে ভজনের প্রেরণা ঠাকুরের ভক্তের কাছ থেকেও মিলতে পারে একথা না মেনে করি কি বলো? তোমার এ বিষয়ে কী মনে হয় বলবে। আমাকে গোয়ালিয়র মহারাজের অতিথিশালায় ঠিকানাই এ চিঠির উত্তর দিও, কারণ আমার কলকাতা ফিরতে এখনো একমাস। এখানে দিন দশেক আছি। খুব গান শুনছি "মশহুর" ওস্তাদের আর সরোদ বাজনা শুনছি হাফেজ আলি খাঁর কাছে। তাছাড়া তাঁর কাছে ঠুংরিতেও তালিম নিচ্ছি। তিনি মাসখানেক বাদে কলকাতা আসবেন। তখন আমাকে ফের শেখাবেন বলেছেন। ইনি বাজিয়ে হ'লেও গান সবই এঁর মনের মঞ্জুষায় জমা আছে—কণ্ঠের কসরৎ না থাকলেও সুর আছে চমৎকার। অন্ততঃ শিখতে কোনো বেগ পেতে হয় না। কলকাতায় এক সারঙ্গি বাদকের কাছেও বিশ পঁচিশটি ঠুংরি শিখেছিলাম। তাঁর মুখে শুনেছি—তাঁর নাম গৌরীশঙ্কর মিশ্র—যে বড় বড় বাইজিরা সারঙ্গিয়াদের কাছেই তালিম নেন বেশির ভাগ।

কী হাবি জাবি বকছি? না, তোমাকে এসূত্রে একটু জানানো মন্দ নয়—কী ভাবে আমার দিন কাটছে। কারণ নৈলে তুমি নির্দেশ দেবে কেমন ক'রে কী ভাবে দিন কাটা উচিত।

একটা কথা—প্রশ্ন বলাই ভালো। মা বারবারই বলতেন—আমার গুরু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন গাঢাকা দিয়ে যথাকালে তাঁর দেখা পাবই পাব। কিন্তু আমি তো তার কোনো চিহ্ন দেখছি না। বলতে কি ভাই, এ জগতে কত কিছু 'মায়া-সত্যের' তো সাক্ষাৎ পাই উঠতে বসতে—এ-ও, তা-র নাম-সই চোখে পড়ে—গান, বাজনা, স্থাপত্য, চিত্রকলা, বিজ্ঞানের কীর্তি, সামাজিক হররা, বন্ধুবান্ধবের আদরযত্ন, আত্মীয় স্বজনের স্নেহ, কালে ভদ্রে ঈষৎ রোমান্সের আভাষ, রূপ রস গন্ধ বর্ণের নানান্ অনামা চমক—কেবল পাই না সাধুসঙ্গ—মেলে না ঠাকুরের কৃপার কোনো প্রত্যক্ষ আভাষ। অথচ আমরা যে জন্মেছি তাঁকে পেতে এ-বিশ্বাস আমার মন থেকে কোনো দিনই উবে যায় নি। তাই হয়ত তোমাদের দেখা পেয়ে এত উৎসাহ পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল—হঠাৎ যেন তাঁর কৃপার বাতাস বইল। সে সময় প্রাণের খেয়া দিব্যি আশার পাল তুলে চলেছিল আনন্দের হাওয়ায় ভক্তির দাঁড় টেনে, কিন্তু তোমাদের কাছ ছাড়া হ'তেই যেন আমার সেই যথাপূর্বং তথা পরং—এক কথায়, মিইয়ে পড়ছি ফের। কেন এমন হয়? যাঁর জন্যে জন্ম তিনিই থাকেন সব চেয়ে ঘন মেঘের আড়ালে, আর যারা অবান্তর তাদের ঢেউই ভাসিয়ে নিয়ে চলে কি-লক্ষ্য মোহনায় কোন নাম-না-জানা প্রাপ্তির রসদ পেতে—যে রসদে পেট ভরলেও তৃপ্তি হয় কই? তুমি আমাকে বলতে এই শূন্যতাবোধই বৈরাগ্যের পূর্বরাগ। হবে। তবে শুধু অতৃপ্তিতে পুঁজি ক'রেই তো কেউ খাঁটি বৈরাগী হতে পারে না তোমার মতন। তার জন্যে আগে কিছু তোড়জোড় চাই। কী সে তোড়জোড় একটু বলো না তাই, লক্ষ্মীটি! তোমার কথার মধ্যে দিয়ে যে দিনের পর দিন কত পথের পাথেয় পেয়েছি তার খবর রাখো কি? তোমার চিঠি থেকে আরো কিছু পাব—নিশ্চয় জানি। তাই তুমি নানা ভাবে ব্যস্ত আছ জেনেও তোমার কাছে দরবার না ক'রে পারছি না। আমাকে ভুলে থেকো না ভাই, there's a dear!

মাকে আমার প্রণাম দেবে। শেষ দিনে কাকাবাবুর দেহান্ত হবার পরে তাঁর "আনন্দ আনন্দ" ঝংকার আজো কানে বাজে। মৃত্যুকে এভাবে নিতে আর কাউকে দেখি নি এ-পর্যন্ত। গীতায় পড়েছি বটে যে, মৃত্যু হ'ল যেন বেশ বদলানো। কিন্তু আমাদের মতন ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব জীব যারা বাস করে ইন্দ্রিয়লোকে তারা—আত্মার অবিনশ্বরতার অঙ্গীকার মেনে নিতে পারে কই! অথচ কেউ যে পারে এ-আশ্চর্য সত্যকে চাক্ষুষ করায় ফলে অবিশ্বাস ঘা খায়ই খায়, সেটা একটা মস্ত লাভ নয় কি? ভাই, তাঁকে আমার প্রণাম দিও—অন্তরের প্রণাম। গুরুবাদের মর্মমহিমা আমি না বুঝলেও শুধু যে তাঁকে সদ্গুরু ব'লে চিনেছি তাই নয়—তাঁর সেই গুরুবাদের আশ্চর্য প্যারাবল্‌টি কোনোদিনই ভুলব না কারণ এ কার্য কঠিন

আলোয় আমার চোখের সামনে গুরুবাদের রহস্ত একটু ফিঁকে হ'য়ে এসেছে একথা বোধ হয় আমি বলতে পারি সত্যের অপলাপ না ক'রে।

আর ললিতা। কী অপরূপা। এমন শ্রদ্ধায় গাঢ় স্নেহে উজ্জ্বল আনন্দ নির্ঝরিনী কটা দেখা যায় আমাদের ঊষর জীবনের ধূসর বালুচরে? ঠাকুর তাকে ডেকে নিয়েছেন তোমার মাধ্যমে। প্রার্থনা করি—যেন সে তার শক্তিচঞ্চল প্রাণের ছোঁওয়ায় অনেক তামসিক সর্বহারাকে আলোর ভরসায় বিশ্বাসের আনন্দে জাগিয়ে মাতিয়ে হাসিয়ে রাঙিয়ে তোলে।

এতবড় চিঠি লিখব ভাবি নি। তবে অনেক কথা জ'মে ছিল তাই পারলাম না দাবিয়ে রাখতে। যদিও আরো কত কী বলতে হচ্ছে,—হয়েছিল বলা হ'ল না। তোমার চিঠিতে যদি আস্কারা দাও তাহলে বলব, কিন্তু যদি দমিয়ে দাও তাহ'লে এখানেই ইতি—আর তোমাকে উদ্ব্যস্ত করব না কখনো। সাবধান!

ইতি। তোমার স্নেহধন্য

অসিত।

রকেটের স্বপ্ন

শ্রীবংশী মণ্ডল

ভোরের আলোটা হাত বাড়িয়ে দাও বিছানার কাছে
আমি মগ্ন নীল ঘুমে—ছেলেটাও পাশে নেই
না বলে পালিয়েছে যদি কিছু বলি পাছে
সূর্য্যের হাত ধরে ছুটেছে মুখ তুলে পূব আকাশেই।

দুঃসাহসী দুরন্ত সে শত তীক্ষ্ণ উগ্র জিহ্বা মেলে
চলেছে বৈজ্ঞানিক রকেটে কিংবা আলোর অঞ্চলে
ওকি জানে? চলেছে সে অন্ধকার ঠেলে
আকাশের যত চাঁদ গ্রহদের টেনে আনবে ব'লে।

ও নিরস্ত্র ওর তূণে মারাত্মক অস্ত্র নেই তার
অনাগত রক্তকণা সে আকাশে ফিরে পায় যদি
তপস্থার মূল্য যত—মহাজাগতিক অব্যক্ত ইথার
পর্য্যন্ত সে ছুটেছে বনস্পতি আকাশ অবধি।

ভোরের সূর্য্যটা হাত বাড়িয়ে দাও আমার কাছে
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি ছেলেটাতো শুয়ে আছে।

কঠোপনিষদের সাধন পথ

অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নবম মন্ত্র (১।১।৯)

মন্ত্র—তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মে—
নশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতিত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥

অর্থ—(যমরাজ নচিকেতার যথাযথ সেবার দ্বারা তুষ্টি বিধান করিয়া পরে বলিলেন :—) "হে ব্রাহ্মণ! তুমি নমস্য অতিথি। তুমি তিনরাত্রি আমার গৃহে অনাহারে বাস করিয়াছ। হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে নমস্কার। আমার স্বস্তি (মঙ্গল) হউক্। সেইজন্য (প্রতি রাত্রির জন্য একটি করিয়া) তিনটি বর প্রার্থনা কর।"

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রের আলোচনার তেমন প্রয়োজন দেখি না। যমরাজ যে নিজের মঙ্গলের জন্য নচিকেতাকে দক্ষিণারূপে তিনটি বর প্রদান করিতে চাহিলেন তাহা ত তিনি নিজমুখেই বলিলেন। এই তিনটি বর যত গভীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব দেখিতে পাইব যে পরলোক সাধনের পথে মানবের ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। নচিকেতা উপবাস করিয়া যমের নিকট যাহা উপহার পাইলেন তাহা সর্ব্বমানবের পাথেয় হইল।

দশম মন্ত্র (১।১।১০)।

মন্ত্র—শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্
বীতমন্যুর্গৌতমো মাঽভিমৃত্যো।
ত্বৎ প্রসৃষ্টং মাঽভিবদেৎ প্রতীত
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে॥

অর্থ—(নচিকেতা বলিলেন :—) "হে যমরাজ! আমার পিতা গৌতম আমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাশূন্য এবং আমার প্রতি প্রসন্নমনা ও বিগতক্ষোভ হ'ন। আপনি যখন আমাকে মুক্তি দিবেন, তিনি যেন আমাকে চিনিতে পারিয়া আমার প্রতি সাদর সম্ভাষণ করেন। তিনটি বরের মধ্যে আমি এই প্রথম বর প্রার্থনা করি।"

ব্যাখ্যা—এখানে কয়েকটি কথা বুঝিবার আছে। মানুষ যমালয়ে চলিয়া গেলে পরে তাহার জীবিত আত্মীয়-স্বজন যেমন তাহার জন্য প্রার্থনা করে যে তাহার (প্রেতের) কোন প্রকার কষ্ট বা অশান্তি না হয়, ঠিক সেইরূপই যমের বাড়ী যিনি গিয়াছেন, তিনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতে থাকেন যেন তাঁহার পৃথিবীস্থ আপনজন অধীর বা চিন্তাগ্রস্ত অথবা শোকাকুল হইয়া অযথা কষ্ট না পান। তাই নচিকেতার পক্ষ হইতে তাঁহার পিতার জন্য শান্তি কামনা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ইহার পরের কথাটি অধিক মূল্যবান্। নচিকেতা জানাইয়াছেন, "হে যমরাজ! আপনি যখন আমার কর্ম্ম অনুসারে, আপনার বিচার মত, আমাকে পুনর্জন্ম দিয়া ধরাধামে পাঠাইবেন, তখন আমি কোথায় যাইব? নচিকেতা প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুসারে ভাবিতেছেন, মানুষের একমাত্র চিরসঙ্গী তাহার কর্ম্ম এবং তাহার কর্ম্ম তাহাকে মৃত্যুর পরেও পথ দেখায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে, যাজ্ঞবল্ক্য এই সহজ ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (৩।২।১৩)। কঠোপনিষদে কর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিয়া ইহাই যে সম্পূর্ণ সত্য নহে তাহা বলা হইয়াছে (২।২।৭ পরে আলোচ্য) এবং আমরা তাহা যথাক্রমে জানিব। এখানে সাধারণ মানুষের আদর্শমত নচিকেতার মন যখন এখনও তাঁহার পিতার নিকট পড়িয়া আছে ও তাঁহার যাহা করিবার বাকি আছে তাহাই তাঁহার ইচ্ছামত নিষ্পন্ন করিবার জন্য মতি স্থির রহিয়াছে তখন ত তাঁহারই গৃহে, যে ভাবে হউক, নচিকেতার আবার পৌঁছিবার কথা। যদি যমরাজ সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া, নচিকেতার জন্য শেষ পর্য্যন্ত তাহাই অবধারিত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে নচিকেতার সে সম্বন্ধে অন্তিম প্রার্থনা :—"পিতা যেমন আমাকে পূর্ব্বে স্নেহ করিতেন, আমি তাঁহার

নিকট ফিরিলে পর আমাকে যেন চিনিতে পারিয়া সেই মতই আদর সম্ভাষণ করেন।"

প্রথম বর প্রার্থনার এই শেষভাগ বড় মিষ্ট এবং সাধারণ মনুষ্যের একান্ত কাম্য। মৃত সন্তান, মৃত স্বামী মানুষের চিরপ্রিয়। যে আত্মীয়কে একবার আত্মদান করিয়া ভালবাসিয়াছি, তাহাকে কি ভোলা যায়? মৃত মাতা পিতাকে কেহ ভুলে না, মৃতা স্ত্রী বা আত্মীয় ও বন্ধু সেইভাবে আকর্ষণ করিতে পারেন। কাহারও সহিত যদি ভালবাসার সংযোগ, তাহার মৃত্যু হইলেও সমানভাবে অন্তরকে ধরিয়া থাকে বা অন্তর যদি তাহা ধরিয়া থাকে, তখন তাহা মানুষের স্বধর্ম। সেই স্বধর্ম ধারণ পূর্ব্বক মরণও ভাল। মরণের পর সে স্বধর্ম উৎকর্ষতা লাভ করে ও আবার প্রিয়জনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যমের যদি কৃপাকণা লাভ হয়। তিনিই ত ধর্ম্মরাজ, সকলের স্বধর্ম অন্তরঙ্গভাবে জানিয়া তিনি সুবিচার করেন। নচিকেতার সরলভাবে প্রার্থিত প্রথম বর যখন তিনি পরের মন্ত্রে মঞ্জুর করিলেন তখন আশা হয় ইহলোকসর্ব্বস্ব মনুষ্য সমাজকে এইরূপ করুণা প্রদর্শন করিতে তিনি কখনই বিমুখ হইবেন না। যাহা নচিকেতার পক্ষে যেরূপে সত্য, তাহা সকল প্রেমিক মানবের পক্ষেই সেইরূপে প্রযোজ্য। তাই বোধ করি, বাঙলার কবি বিহারীলাল মধুর ছন্দে জানাইয়াছে :—

"থাকুক না প্রিয়জন সপ্তর্ষি মণ্ডল পার,
থাকে যদি ভালবাসা, অবশ্য পূরিবে আশা,
অবশ্য হইবে জেনো মিলন আবার।
আনো এক পরমাণু, কর তিন তিন ভাগ
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হয়ে যাক্,
তার এক তিল তুমি, পারো কি করিতে লয়?
প্রকৃতি গুছানো মেয়ে, প্রকৃতি রাক্ষসী নয়!"

[ক্রমশঃ
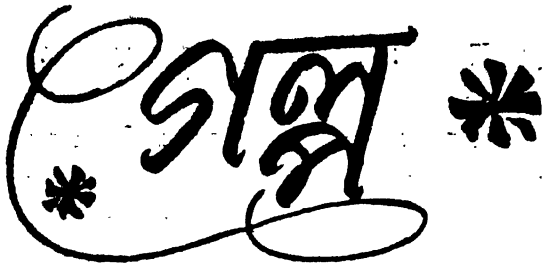
রক্তের নৃত্য

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[এই গল্প প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের একটী ঋণগ্রস্ত জমিদার পরিবারের কাহিনী এবং তৎ সঙ্গে একটী ভারতীয় বিবাহ। ভারতীয় বিবাহ ভোগার্থে নয়, ধর্মার্থে—পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণের নিমিত্ত। একটী শাশ্বত হিন্দুনারীর চরিত্র এই গল্পের প্রাণশক্তি।]

আমি অতি শৈশবে মাতৃহীন। আমার দিদিমার এক মাত্র কন্যার আমি এক মাত্র সন্তান। এজন্য কলিকাতায় আমার মাতুলালয়ে দিদিমার স্নেহে এবং তত্ত্বাবধানে আমি আবাল্য প্রতিপালিত। আমার পিতৃদেব ছিলেন কলিকাতা হইতে বহুদূরবর্তী একটী জিলায় একজন জমিদার। আমার মাতার মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। সে পক্ষেও কয়েকটি পুত্রকন্যা হইয়াছে। সুতরাং পিতৃস্নেহে আমি একরূপ বঞ্চিত। বৈষয়িক প্রয়োজনে বা পুণ্যসঞ্চয় উদ্দেশ্যে যাতায়াতের পথে যখন তিনি কলিকাতায় শুভাগমন করিতেন, তখন পিতৃ পদরজ গ্রহণে সমর্থ হইতাম। আমার পিত্রালয়ে গমন করিবার কোন প্রশ্ন আমার জ্ঞাতসারে কোন দিন কোন পক্ষ হইতে উত্থাপিত হয় নাই। আমার পাঠোত্তর জীবনে এবং আকস্মিক ভাবে বিবাহের পরে পিতৃভূমি দেখিবার যখন কৌতূহল হইল, তখন জানিলাম সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির ঐ অংশ ভারতভূমি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ভারত স্বাধীনতার পাদমূলে বলিপ্রদত্ত।

আমার দাদা মহাশয় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম দুর্দ্ধর্ষ জমিদার। বঙ্গের চারিটী বিভিন্ন জিলায় তাঁহার ছিল বিস্তীর্ণ জমিদারী। তাঁহার দাপটে নাকি বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। আমার জন্মের এক বৎসর পূর্বে আমার দাদামহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমার দিদিমার বিশ্বাস আমি পূর্বজন্মে আমার দাদামহাশয় ছিলাম। দাদামহাশয়ের গাত্রবর্ণ, তাঁহার শরীরের কয়েকটা বিশেষ চিহ্ন নাকি আমার শরীরে বর্তমান। তারপর আমার নানা ভাবভঙ্গী, কথাবলার ধরণ ধারণ, হাত পার চলন-চালন, নাক-মুখ চোখ সবই নাকি হুবহু আমার দাদা মহাশয়ের মতো। সুতরাং, আমার মাতার অকাল মৃত্যুর পর আমার দিদিমার স্নেহ ও ভালবাসা আমার উপর অতিরিক্ত মাত্রায় বর্ষিত হইয়াছিল সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমার নাম দিদিমার দেওয়া রাজ্যেশ্বর! বাড়ীর দাসদাসীরা আমাকে ডাকে রাজা সাহেব। দিদিমার ডাক-রাজন। মামাদের ডাক—'রাজু'।

আমার যখন জ্ঞান হইয়াছিল, তখন জানিলাম দাদা-মহাশয়ের সম্পত্তি দেনাগ্রস্ত এবং ঐ দেনা পরিশোধ জন্য রহিয়াছে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এর অধীনে। আমার তিন মামা এবং দিদিমা পৃথক পৃথক ভাবে মাসোহারা পান। তাতেই তাহাদের কোনরূপ বাহিরের ঠাট্ বজায় রাখা চলে—কিন্তু, ভিতরের ছুঁচুন্দরীর কীর্ত্তন বন্ধ হয় না।

আমার তিন মামা তিন মূর্তিতে বিরাজমান। বড়মামা বেজায় সাত্ত্বিক। মাথায় টিকি, গলায় তুলসী মালা, মাথায়, হাতে, বুকে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ—দক্ষিণ হস্তে থলির ভিতর জপমালা। পরিধানে সকালে সন্ধ্যায় সেকালের তসর গরদ। বাড়ীতে সর্বদা পদতলে কাষ্ঠ পাদুকা। বাহিরে কোথায়ও যাতায়াত একরূপ নাই। আহার অহিংস নিরামিষ। সকালে এক গ্লাস নিমের সরবৎ। দ্বিপ্রহরে একসঙ্গে সিদ্ধ ডালবাটা, ভাত, নানা তরকারী, ঘৃত, দধি। সন্ধ্যায় ফল মূল ও দুধ। অসুস্থতায় কবিরাজি পাচন। সময়ে অসময়ে গড়গড়ায় তামাক।

আমার মেজমামা বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার। ব্রীফের বড় একটা বালাই নাই। বাড়ীতে সর্বদা পরিধান—ঢিলা লংক্লথের পাজামা, ঢিলা কোট। বাহিরে কোট, প্যাণ্ট, সার্ট, হ্যাট, গলায় নেকটাই; মুখে পাইপ। আহার বাবুর্চির রান্না—নিষিদ্ধ পক্ষী ও ডিম। তবে হোটেলে বেশী। ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনার কাঁটা চামচ-সহযোগে। অসুস্থতায় বিলাতী ঔষধ ও পানীয়।

ছোটমামা খাঁটী স্বদেশী। পরিধানে খদ্দর পায়ে চপ্পল

হাতে পানের ডিবা কোমরে নস্তের কৌটা। বাহিরে যাইতে মাথায় গান্ধী টুপী। মুখ সর্বদা রক্তহস্তিক। পুলিশ মহাপে. দহরম মহারম। আহার দিশি মতে পঞ্চব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস। নিদ্রাভঙ্গ সকালে দশটা। দ্বি-প্রহরের আহার বেলা ২টায়। রাত্রিতে ১টার কম নয়। অসুস্থতায় হোমিওপ্যাথী, হাইড্রোপ্যাথী ও বাইয়ো কেমিক। নিজেই স্বয়ংসিদ্ধ চিকিৎসক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দীক্ষা কোন মামার কতদূরে যাইয়া চড়ায় ঠেকিয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই আমার তিন মামাই কথায় বিনয়ের অবতার। কিন্তু, ব্যবহারে তার প্রায় বিপরীত।

আমার তিন মামার তিনটী পৃথক বৈঠক খানা। বড় মামার বৈঠকখানায় সারিসারি কয়েকখানা খাট তারপর গদী ও চাদর। সম্মুখে তিন দরজা। তার মাঝে মাঝে কাঠের ফ্রেমের উপর সেকালের রূপাবাঁধা হুঁকা। বড় মামা বিবাহিত। কিন্তু বর্তমানে বিপত্নীক। একমাত্র কন্যা ছিল—তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পত্নী বিয়োগের পর বিবাহের চেষ্টা হইয়াছিল তখন মত হয় নাই। পঞ্চাশোর্দ্ধে যখন মত হইল তখনকাহারো গরজ নাই।

মেজ মামার বৈঠকখানা হাল ফ্যাসানে সজ্জিত নিম্নতলের একটী বড় কক্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বৃহত্তর ভাগে তিন দিকে সারি সারি কৌচ—পাশে পাশে 'টী'-টেবিল—তার পর ছাইদানী। অপর ভাগ তাঁর চেম্বার। কক্ষ মধ্যে একটী টেবিল—তিন দিকে চেয়ার সারি সারি অপর দিকে নিজের ঘূর্ণায়মান চেয়ার ও পুস্তকাধার। মেজ মামা এখনও বিবাহ করেন নাই—বিবাহ করিবেন না, বলিয়া নয়, উপযুক্ত সঙ্গিনীর সন্ধান হয় নাই। বিলাতে থাকিতে কী এক প্রেমের দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। বহু অর্থব্যয়ে তাহা চাপা পড়িয়াছে। বয়স চতুর্থ দশকের সীমানায়। বন্ধুবর্গ ইঙ্গবঙ্গ সমাজের লোক।

ছোট মামার বৈঠকখানা—কক্ষতলে একটী সাবেক বড় কার্পেট পাতা তার উপর জাজিম। মধ্যস্থলে এক খানি ডিম্বাকৃতি রৌপ্যবর্ণ বড় রেকাবী—তার পর দিশি বিড়ি কৌটায় পান ও জরদা। ছোট মামার বিবাহের সম্বন্ধ কয়েকটী আসিয়াছে বিবাহে বাধা মেজমামার বিবাহ কুলপ্রথানুসারে জ্যেষ্ঠানুক্রমিক বিধি। বয়স তৃতীয়দশকের মধ্যবর্তী।

প্রতিদিন তিন বৈঠকখানায় তিন প্রকৃতির লোকের সমাবেশ। বড় মামার কক্ষে সশব্দ ধূমপানের সঙ্গে আলোচনা—আধিদৈবিক। মেজমামার কক্ষে নিঃশব্দ ধূমপানে সঙ্গে আধি ভৌতিক এবং ছোট মামার কক্ষে বিড়ির নীরব ধূমের সঙ্গে সশব্দ হাস্যের সহিত আধ্যাত্মিক।

বড়মামার অবসর সময় কাটে নানা ধর্মগ্রন্থ পাঠে, মেজমামার ইংরাজী নভেলে ছোট মামার বাংলা উপন্যাসে। তিন কক্ষে তিন রকম সংবাদপত্র। বড়মামার কক্ষে ইংরাজী 'অমৃত-বাজার'। ছোট মামার কক্ষে 'ষ্টেটস্‌ম্যান'। এবং মেজমার কক্ষে বাংলা 'যুগান্তর।' আমার মামারা কেহ সংবাদপত্র পড়েন বলিয়া মনে হয় না—সংবাদ পত্রের বড় বড় হেডিং দেখিয়াই সন্তুষ্ট। তাহাদের বন্ধু বান্ধবগণ কিছুক্ষণ অবশ্য পড়েন। তাহাদের কেহ পড়েন "কর্মখালি" কেহ খেলাধুলার সংবাদ কেহ সিনেমার বিজ্ঞাপন। সংবাদ পত্রের সংবাদে তাহাদের আগ্রহ কম। চা-দোকানের আড্ডায় প্রকাশিত সংবাদে তাহাদের বিশ্বাস।

আমার তিন মামার সুস্পষ্ট অভিমত—আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রকৃত মানসিক উন্নতির বাধক। ইহা মানুষ গঠন করে না—মেষ গঠন করে। এরূপ পরিবেশ এবং দিদিমার অপর্যাপ্ত আদরের মধ্যে আমি কি করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করিলাম তাহা ভাবিলে আমি নিজেও আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া পারি না।

এই বাড়ীতে সকল হিস্যায় ঝি-চাকরের রাজত্ব। তাহারা একাধারে প্রভু, তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক ও সেবক। তাহাদের কোন কাজ বা ব্যবহারের উপর কথা বলিবার কেহ নাই। বড় মামার ঘরে ষাত্রিংশবর্ষীয়া বৃন্দা ঝি। মেজমামার ঘরে অজ্ঞাতকুলশীল শ্বেতশুভ্র-চোগা-চাপকান পরিহিত বয়-জন ও তাহার প্রণয়িণী কুন্তি। এবং ছোট মামার ঘরে ভৃত্য রামচরণ। দিদিমার ঘরে ক্ষ্যান্ত ঝি। ক্ষ্যান্ত, বৃন্দার মা শ্যামা ও রামচরণ এই তিন জন দাদা মশায়ের আমলের। ক্ষ্যান্ত দিদিমার বয়সী এখন অনেক কাজেই ক্ষান্ত, শুধু কথায় নয়। বৃন্দার মা শ্যামা ছিল

দাদামহাশয়ের স্বনজরে এবং ক্ষ্যান্ত ছিল দিদিমার। এজন্ত দু'জনের ছিল রেষারেষি। দাদামহাশয় বেঁচে থাকতে শ্যামা মারা যায়। তার বালবিধবা কন্যা তাহার স্থলে বহাল হয়। বৃন্দা আমার ছোট মামা থেকে চার বছর ছোটো। তবু তারা ছোট বেলায় একসাথে খেলেছে। বৃন্দা ছোট মামার প্রিয়। এজন্য বৃন্দার, বড় মামা ও ছোট্ট মামার ঘরে অসীম প্রতাপ। বৃন্দার চাল চলন বনেদী। গলায় স্বর্ণহার হাতে আংটী, পরিধানে আভিজাত্যের প্রদর্শক নরুন পাড় সূক্ষ্ম ধুতি, সায়া-সেমিজ। হাতে রৌপ্য নির্মিত পানের কৌটা। চলন গজেন্দ্র গমনে।

প্রতিদিন বৃন্দা বড় মামার ঘরে নিরামিষ আহার করে। রাত্রে গোপনে ছোট মামার ঘরে তাহার আমিষে বাধা নাই। এ বাড়ীর সবাই এই-কথা জানে। তবু কেহ জানেনা ভাণ করে। সে কখন মেজমামার হিস্যায় যায় না। তবে, দিদিমার ঘরে সুযোগ সুবিধা করিয়া আসিয়া ক্ষ্যান্তদির অনেক কাজ কর্ম করিয়া যায়। এজন্য ক্ষ্যান্ত বৃন্দাকে ভালবাসে। বৃন্দার অশালীন চালচলনকে ক্ষমা করে।

বাড়ীতে দাদা মশায়ের আমলের এক বাজার সরকার আছেন। এখন দিদিমা তার বেতন দেন। এখন আর তার বাজার করিতে হয় না। তবে বৃন্দা ও ক্ষ্যান্তদির বাজারের হিসাব লিখিয়া দিতে হয়। বয়স ষাট। তবে এখনও শক্ত আছেন। দরকার মত সব কাজই করেন। কোন আত্মীয় স্বজন এ বাড়ীতে এলে তাহাদের অভ্যর্থনা করেন। এ বাড়ার লোক-লৌকিকতা অভ্যর্থনাদির কোন ব্যয়ের দায় মামাদের নেই—সব খরচ দিদিমার এজন্য সরকার মহাশয় এখনও শুধু মামাদের নয় দিদিমার পক্ষে অপরিহার্য। দাদামশায় তাহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখিতেন-এখনও তিনি সেই সম্মানের অধিকারী আছেন।

আমার দিদিমার নিকট দাদা মহাশয়ের অনেক গল্প শুনিয়াছি। দাদামহাশয়ের দান ছিল যেরূপ অকুণ্ঠ, শাসনও ছিল তদ্রূপ কঠোর। বিরোধী প্রজার ঘর জ্বালাইবার ব্যবস্থা তাহারা ছিল আবার গৃহদাহের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটাইয়া সে স্থানে যাইয়া অগ্নি নির্বাণের ব্যবস্থা তিনিই করিতেন। তারপর নূতন গৃহ প্রস্তুতের ব্যবস্থা প্রজার মাথা ফাটাইবার ব্যবস্থা যেমন তাঁহার ছিল—তাহার পর নিজের হাসপাতালে আনাইয়া তাহার চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থাও তিনিই করিতেন। তাহার অত্যাচার কথায় ষট্‌কর্ণের ভেদের কোন যত্ন থাকিত না। কিন্তু তাহার সৎকর্মের উদ্যোগ সহস্রকর্ণ ভেদের সুব্যবস্থা তাহার থাকিত। থানা পুলিশ ছিল তাহার অর্থের বশে। উচ্চতম রাজপুরুষদের তিনি ছিলেন শিকার সহচর। এবং তাহার সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করিতেন। উচ্চতম রাজ পুরুষদের আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা তাহার ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল নিম্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের জন্য। তাহার বিশ্বাস ছিল উচ্চতম রাজ পুরুষদের হৃদয় বলিয়া একটা পদার্থ নাই—ক্ষমতার মত্ততায় তাহার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের এখও তাহা বর্ত্তমান। এই সকল নানা কারণে তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয়ের বহর ছিল বেশী। তিনি বলিতেন—অর্থের প্রয়োজন ভোগের জন্য মান প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য—সৎলোকের হিতের জন্য, অসৎ লোকজন দমনের জন্য। তিনি বলিতেন, যে অর্থ সঞ্চয় করে সে মূর্খ। যাহাদের জন্য করে, তাহাদের পরম শত্রু! সঞ্চিত অর্থ অনর্থের জন্মদাতা।

আমার জ্ঞানের পরিধি যতদিন ছিল আমার দাদা-মশায়ের রাজবাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে, ততদিন আমার আভিজাত্য বোধ ছিল উগ্র। পরে আমার জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতের বিষয়ের সংবাদে যখন জানিতে পারিলাম, আমি এই বাড়ীর একজন আশ্রিত মাত্র সেইদিন অকস্মাৎ আমার শূন্যগর্ভ আভিজাত্যবোধ আমাকে বিষম কষাঘাত করিল। সেইদিন আমার দুঃখের কি সুখের তাহা মনে নাই। তবে সে দিন আমি যেন আমাকে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। সেই দিন হইতে শুধু এই রাজবাড়ীতে কেন, এই জগতে আমার অনাত্মীয় কেহ যেন ছিল না।

আমার দিদিমা বৃদ্ধা মেদ ও মাংসে বিপুলা। তারপর উগ্র রক্তচাপে ক্লিষ্টা। তাহাকে নিয়মমত ভাবে দেখিবার, তাহার সম্বন্ধে সঠিক ভাবে তথ্যাদি গ্রহণ করিবার সময় আমার মামাদের কাহারো ছিল না। আবশ্যক মত ডাক্তার ডাকা ঔষধ আনা যাহ কিছু তাহার সম্পূর্ণ ভার

আমি সেই ভার গ্রহণ করিলাম। পূর্বজন্মের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা জানিনা, তবে দিদিমার ভাবনা আমি না ভাবিয়া পারিতাম না। স্নেহ সাধারণতঃ নিম্নগামী আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা তাহার ছিল স্বাভাবিক। আমার এই উর্দ্ধগামী স্নেহ ভালবাসাকে তিনি অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতেন। সকালে পড়া, স্কুলে কলেজে যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন আকর্ষণ আমার কোন দিন ছিল না। যতক্ষণ বাড়ী থাকিতাম দিদিমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় মগ্ন থাকিতাম, দিদিমা অনুযোগ করিতেন—"তোর কি কোন বন্ধু-বান্ধব নাই—পুরুষ মানুষের অতটা ঘরগোলা ভাব কি ভাল?" দিদিমা হাসতেন আমি হাসিতাম। এই দুই হাসি আমাদের উভয় অন্তঃকরণ স্পর্শ করিত।

দিদিমা অনেকদিন হইতে গোপনে গোপনে আমার জন্য একটা আভিজাত বংশীয়া সর্বসুলক্ষনা গৌরবর্ণা পরমা সুন্দরী পাত্রীর সন্ধানে ছিলেন। আমি কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই—দিদিমার ধৈর্যের বাঁধ যেন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আমার সম্মুখেই ঘটক-ঘটকীদের জোর তাগাদা দিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় না। যোটক মিল হয় ত, পাত্র বর্ণ মনোমত হয় না। যোটক ও গাত্রবর্ণ উভয় মনোমত হয়তো বংশটা ততো বনেদী হয় না। আবার সব যদিও মনোমত হয় তবুও কন্যাপক্ষ অগ্রসর হয় না! কারণ পাত্রের কলিকাতার নিজস্ব কোন বাড়ী নাই। দিদিমা তথাপি হাল ছাড়েন না। আমি অপমানে দগ্ধীভূত হইতে থাকি।

আমি দিদিমাকে বলি—দিদিমা! তুমি আর আমি এইতো বেশ আছি। এর মধ্যে অন্য পক্ষ আনা কি ভাল হবে? তখন কি আমি তোমাদের দুই জনের মনোরঞ্জন করতে পারবো?

পারবি রে! তুই পারবি! সত্যকারের পুরুষ মানুষ সবই পারে। আমাদের বংশীবদন ঠাকুর এক সঙ্গে ষাট হাজার গোপিনীর মনোরঞ্জন করতেন। আর তুই দুই জনের মন রাখতে পারবি নে! আগের দিনে সকল ধনী ব্যক্তির একাধিক বিবাহিতা পত্নী তো থাকতোই-তা'ব দে গোপনে প্রকাশ্যে অনেক থাকতো। তারা ছিল সত্যকারের পুরুষ! তারা তাদের সকলের মনোরঞ্জন করতেন। শক্তিমান পুরুষ নারীর সাধনার ধন। তখন কার পুরুষ ধনী হ'ক, দরিদ্র হ'ক সকলেই শরীরের চর্চা করতো। কুস্তি করা, মুগুর ভাঁজা, ডন বৈঠক করা, লাঠি খেলা সকল পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তখনকার পুরুষদের ছিল—তেজঃ, শাসন, ভালবাসা। স্ত্রীদের ছিল স্বামীর আদর। তাদের আহারও ছিল সেইরূপ। তাদের গলার স্বরে আকাশ বাতাস কাঁপতো। আমাদের বাল্যকালে এই সকল পুরুষ মানুষ কত দেখেছি—তাদের প্রশস্ত বুকে তারা হাতী তুলতে পারতেন। আর এখন দেখছি সব ভেড়াকাণ্ড। মেয়েদের আঁচল ধরে ঘোরে খায় তাদের মুখ-নাড়া, লাজলজ্জা নেই, মান নেই, সংসার অধম। স্ত্রীকে শাসন করবে কি? স্ত্রীর ক্রুদ্ধ স্বরে চারহাত দূরে ঘুরে পড়ে যায়। এসকল মেয়েমুখো পুরুষদের কি মেয়েরা ভালবাসতে পারে? এ সকল মেনীমুখো পুরুষরা কী করে মেয়েদের ভালবাসবে? যাদের শরীর চর্চা নেই তারা কী করে মেয়েদের মন হরণ করবে?

'তুমিতো আমার দাদা মহাশয়ের এক এবং অদ্বিতীয়া ছিলে তুমি কি তাঁকে মুখনাড়া দিতে? তিনি কি তোমার আঁচল ধরে ঘুরতেন?

দিদিমার মুখে একটু করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বললেন তা কেন? তোর দাদুর ছিল চার জিলায় জমিদারী—চার জেলায় মফঃস্বলে চারটে বড় কাছারী বাড়ী আমি চোখে দেখি নাই—তবে গোপনে শুনেছি, চারিটী জিলায় তার চারিটী বাঁধা ছিল। তাদের সামাজিক কোন সম্মান ছিল না সত্যি, তবুত কর্মচারী মহলে তাদের বিশেষ মান প্রতিপত্তি ছিল। তবু সারা জীবনে কোনদিন একটু অনুযোগ করবার ছিদ্র পর্যন্ত পাই নাই। যখন তিনি মহাল থেকে কলিকাতা আসতেন—তখন তিনি আমার জন্য এত উপহার আনতেন যা আমি এক মাসে দেখে উঠতে পারতাম না। একটা ঘর বোঝাই হতো। বাড়ী এসে আদরে আপ্যায়নে আমাকে ডুবিয়ে রাখতেন যেন এই কয় দিনের অদর্শনে বিরহে একেবারে আধপোড়া হয়ে এসেছেন আমাকে দেখে যেন শুকনো গাছ এক মুহূর্তে ফলে ফুলে পাতায় ভরে উঠেছে! এমনি ছিল তার ভালবাসার সমারোহ। আসল কথা কি জানিস্—যারা শুধু নিজের সুখ খোঁজে, তারা কোনদিন জীবনে নিজেও সুখী হতে পারে না বা কাউকে সুখী করতে পারে না। যারা নিজের

ভালবাসার জনকে সুখী করতে সকল সময় চেষ্টা করে, তারাই সুখের আস্বাদন পায়। সারা জীবনে আমি নিজের ভাবনা কোন দিন ভাবিনি—তার সময় পাইনি। কি করে তাঁকে সুখী করবো এই চিন্তা করেছি। তাঁরও ছিল সেই একই চেষ্টা। আমার মুখ চন্দ্র-সূর্য দেখতে পারতো না। পাল্কী শুদ্ধ গঙ্গা স্নান করেছি। কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ করতে পাল্কীর দুই পাশে কানাতের বেড়া দিয়ে তবে রুদ্ধ রিজার্ভ গাড়ীতে উঠেছি। টাকা পয়সা জিনিষ পত্রের কোন অভাব কোনদিন বুঝতে তিনি দেন নাই। তোকে সুখী দেখে আমি মরতে চাই। আমাকে শীগ্গীর কচি টুকটুকে রাণী বৌ এনে দে—তাকে দেখে আমি শান্তিতে মরি।

দিদিমার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। এর পর আর কথা চলে না। আমার বিবাহের চেষ্টা দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল।

২

বৈশাখ মাস। দিনের বেলা প্রখর রৌদ্রতাপ। সন্ধ্যার দিকে একটু শান্তি। টবের বেল-ফুলের গাছে ফুলের সমারোহ। রাত্রে হাস্নুহেনা গাছের সুগন্ধ নাকে আসে। আকাশে মেঘ থাকিলে রাত্রে গুমোট হয়। ঘুম ভাল হয় না। মাঝে মাঝে কাল বৈশাখীর ঝড় ও সামান্য বৃষ্টি হয়। প্রকৃতির শান্ত ও অশান্ত ভাবের অপূর্ব সমাবেশ এই বৈশাখ মাসে দেখা যায়।

এমন দিনে এক দিন বিকালের দিকে এলো আলিপুর কালেক্টার সাহেবের তক্মা-আঁটা এক আরদালীর মারফতে এক খানা চিঠি - চিঠি একেবারে তিন মামার নামে। চিঠিতে কি লেখা ছিল জানিনা। পর দিন সকালে খুব ভোরে উঠে মেজ মামা আমাকে জানালেন—চলো রাজু! কালেকটার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাব। শীগ্গীর তৈরী হও।" আমি কেন যাব সে কথা আমার সাহেব মামাকে জিজ্ঞাসা করতে আমার সাহস হ'লো না। মামার আদেশ! এর পর আর কথা কি?

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবস্থা—নাগাসাকী-হিরোসিমার অসংখ্য নিরপরাধ নরনারী শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা নির্বিশেষে অ্যাটম বোমায় প্রাণ দানে বাধ্য হইয়াছে—বিশ্বযুদ্ধের নায়ক হিটলার অন্তর্হিত বা মৃত। ভারত স্বাধীন হয় নি। স্বাধীনতার প্রসববেদনা কেবল মাত্র উপস্থিত হইয়াছে। তখনও বহু জিলায় বিদেশী শাসক। আমরা, দুই মামা—ভাগ্নে, সাজে পোষাকে গন্ধবর্ণে সাহেবদের মত—বেলা ৮ টার মোটরে কালেকটার সাহেবের কুঠীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। কালেকটার সাহেব বাহিরে আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মেজমামা আমাকে সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। সাহেব হাসিয়া করমর্দ্দন করিলেন। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

আমরা সকলে আসন গ্রহণ করিয়া দেখিলাম—সাহেবের এক পার্শ্বে একজন শ্যামল বর্ণ প্রৌঢ় দীর্ঘকায় স্থূল বপুঃ, লম্বোদর, গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোক বসে। তাকে বাঙ্গালী বলেই মনে হইল। কারণ, মস্তকে কোনরূপ আবরণ নাই। সাজে পোষাকে ভাবে-ভঙ্গীতে আভিজাত্যের কোন ছাপ নাই বা প্রদর্শনের চেষ্টা নাই। চুল গুলি প্রায় আধাআধি কাঁচা পাকা, কদমফুল ছাঁটা। গোঁফ দাড়ী কিছু গোঁচা খোঁচা—অন্ততঃ দুই কি তিনদিন পূর্বের। কালো রং এর পাম্প-সু পায়ে মনে হয় মাসাধিক কালী পড়ে নাই। কাপড় থেকে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী ফরসা—তার নীচে মনে হয় আধ ময়লা ফতুয়া কাঁধে এক খানি পাতলা মটকার চাদর। চোখে রোল্ড গোল্ডের ফ্রেমের চশমা—চোখ দু'টী বেশ বড় এবং উজ্জ্বল।

সাহেব মামা কালেক্টার সাহেবের পূর্ব পরিচিত। তাহার সহিত কিছু কুশল প্রশ্নের পর হঠাৎ কালেক্টার সাহেব আমাকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করিলেন—তোমার জীবনে উচ্চাশা (এ্যামবিশন) কি? আমাকে এরূপ একটা প্রশ্ন কেহ কোন দিন করিবে তাহা জীবনে এপর্য্যন্ত কল্পনায় আসে নাই। অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্নে আমি যেন স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া আসিলাম—আমি কি বলিব চিন্তা করিতেছি—এমন সময় যেন মুখ দিয়া বহির্গত হইল—"একস্পোর্ট ইম্পোর্ট বিজিনেস্"। (আমদানী রপ্তানি ব্যবসায়)। আমার উত্তর শুনিয়া সাহেব টেবিল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হিয়ার ইউ আর!" তার পর উচ্চ হাসি। মেজমামা তাহার আভিজাত্য নিঃশব্দ হাসি হাসিতে লাগিলেন। আমি কতকটা হতভম্ব, আমার কর্ণমূল মুখ চোখ যেন লাল হইয়া গেল। উপস্থিত

ভদ্রলোকটী তাহার পূর্বগভীর সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া আমাকে যেন তাহার দুই চক্ষু দিয়া গিলিতে লাগিলেন। আমার বড় অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তা'র পর সামান্য দুই একটা কথার পর সাহেব আমাকে বিদায় দিলেন। আমি কক্ষের বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমি আসিয়া আমাদের আনীত মোটরের বসিয়া পড়িলাম।

এই সময় আমার পূর্বশ্রুত একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। আমার দিদিমার এক ভাই যখন স্কুলে পড়িতেন তখন সেই স্কুলে এক জন পরিদর্শক আসেন—তিনি সকল ক্লাসের ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের জীবনে কাহার কি উচ্চাশা আছে, আমাকে বল। তখন ছাত্রগণ কেহ দারোগা কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ জজ, কেহ ডাক্তার কেহ উকীল, যাহার যেমন অভিরুচি বলিয়াছিল। তখন কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল। আমার দিদিমার ভাই সগর্বে বলিয়াছিলেন—আমার জীবনের উচ্চাশা "কুইন ভিক্টোরিয়া"। তখন সেখানে হাসির রোল উঠিয়াছিল। সেই দিন হইতে তাহার নাম স্কুলে হইয়াছিল "কুইন ভিক্টোরিয়া"। তিনি দিদিমার বড় ছিলেন। আমি তাঁহাকে ছোট বেলায় দেখেছি—মামারা তাকে ডাকতেন "কুইন মামা"। আমি তাকে ডাকতাম "কুইন দাদু"। তিনি ছিলেন সদানন্দ পুরুষ। লেখাপড়া বেশী দূর যায় নাই। তবে তিনি সেতারে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন—গান বাজনায় তাহার সময় কাটিত। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত তিনি জানিতেন। কিন্তু হাসির গান তাহার প্রিয় ছিল। ডি, এল, রায় এবং রজনী সেনের যত হাসির গান তাহার ছিল তাহা কণ্ঠাগ্রে। কত উৎসবে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত—সারা রাত ধরিয়া হাসির গান ও নানা ভাল ভাল গানের প্যারোডি গাহিয়া আসর মাতাইয়া রাখিতেন। এখন সে সকল শ্রোতাও নাই—সেরূপ গায়কও নাই। কালের পরিবর্ত্তনে সবই সীমিত হইয়াছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা পরে মেজ মামা ফিরিলেন। আমরা যখন বাড়ীতে ফিরিলাম তখন বেলা সাড়ে দশটার উপর।

সে দিন অপরাহ্নে ক্যান্তদি'র নিকট শুনিলাম—আমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী পরশ্ব আমার বিবাহ। পাত্রী সেই দিনকার সেই ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যা। কন্যা ম্যাট্রিক পাশ-কলেজে পড়ছে। ভদ্রলোকের নাম হরগোবিন্দবাবু। আমার মামাদের এই জিলার সমস্ত সম্পত্তি যায় যায়। তা তাহার নিকট কয়েক লক্ষ টাকার ঋণে আবদ্ধ। সম্পত্তির বর্ত্তমান আয়ে তাহার সদর খাজনা ও পরিচালনার ব্যয় কুলাইয়া মামাদের খোরপোষের টাকা দিয়া আসল টাকার কোন অংশ দেওয়া দূরের কথা প্রতিবৎসর সুদের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা যায় না। এজন্য মামাদের স্বার্থে এই বিবাহের ব্যবস্থা। ঘটক স্বয়ং কালেক্টার সাহেব।

স্থির হইয়াছে বিবাহের তারিখ হইতে মামাদের দেয় সমস্ত ঋণের টাকা মেয়ে জামাই এর যুগ্মনামে হস্তান্তরিত হইবে। হস্তান্তরের সময় হইতে কোন সুদ চলিবে না। শুধু আসল টাকা পনের বৎসর মধ্যে সমান কিস্তীতে পরিশোধিত হইবে আদায় টাকা মেয়ে জামাই এর যুগ্মনামে ষ্টেটব্যাঙ্কে জমা হইবে। যুগ্ম-সহি ভিন্ন কোন টাকা তোলা যাইবে না। পাত্রীর নাম ইন্দুমতী।

এই বিবাহে কোন যৌতক বিচার হইল না—দিদিমার মতামত-এর অপেক্ষা রাখিল না—এমন কি মেয়েটী পর্য্যন্ত দেখা হইল না। মেজমামা গত রাত্রে অপর দুই মামার আথারিটী (বিধিসম্মত অধিকার) সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সকলের পক্ষে চুক্তিপত্র সহিকরিয়া বিবাহ দিন পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং এ বিবাহ স্থির ও অপরিবর্ত্তনীয়। চুক্তিপত্রের সাক্ষী স্বয়ং কালেকটার সাহেব। দিদিমা সমস্ত কথা শুনিয়া একেবারে নিঃশব্দ হইলেন। বিবাহ সম্বন্ধে কোন পত্র কোন আত্মীয় স্বজনকে দেওয়া হইল না। একমাত্র আমার পিতৃদেবকে আমার বড়মামার নামে একটী "প্রীপেড" টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল তাহাকে আসিবার অনুরোধ করিয়া। তিনি উত্তরে "অসুস্থ"—জানাইয়া দিলেন।

কালেকটার সাহেবের সহিত সাক্ষাতের তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় আমার হবু-শ্বশুর মহাশয় প্রেরিত একটী সুসজ্জিত মোটরে আমার বড়মামার সঙ্গে, বিষণ্ণ দিদিমার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া, বর্ণ-পরিচয়ের প্রথম ভাগের গোপা

নামক সুবোধ ও সুশীল বালকের মত বিবাহ করিতে রওনা হইলাম। বরযাত্রী হইলেন আমাদের কুলপুরোহিত, বাজার সরকার মহাশয় এবং রামচরণ ভৃত্য। এই রাজবাড়ী হইতে কেহ বিবাহ করিতে যাইতেছ এরূপ লক্ষণমাত্র প্রকাশ পাইল না। আমার অপর দুই মামা অসুস্থ বলিয়া সঙ্গী হইলেন না। আমার মন দুঃখবেদনায় ভরিয়া উঠিল। আমার একমাত্র সান্ত্বনা আমার এই বিবাহ, আমি যাঁহাদের আশ্রয়ে আজন্ম প্রতিপালিত হইয়াছি, তাঁহাদের ঋণমুক্তির সহায়ক। এ বিবাহ আমার কর্তব্য! এই বিবাহ আমার সুখের লক্ষ্যে নহে—মামাদের স্বার্থের লক্ষ্যে।

বিবাহ বাড়ী যাইবার পথে একটী ব্যাণ্ডপার্টি ও আলোকসজ্জা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিল। তাহারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রে পশ্চাতে থাকিয়া আমাদিগকে বিবাহবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত করিল।

বিবাহ বাড়ীতে সমারোহ কম নয়। বিবাহ বাড়ীর অঙ্গে তীব্র আলোকসজ্জা—প্রকাণ্ড গেটের উপরে রসনচৌকী বাজিতেছে। বাড়ীটী বেশ বড় তবে আভিজাত্যবিহীন—নিম্নের সমস্ত কক্ষ মালগুদামে পরিণত। দ্বিতলের সম্মুখভাগের কয়েকটী কক্ষ লইয়া বিবাহের আসর। কালেকটার সাহেব এবং অন্যান্য রাজপুরুষগণ এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বিবাহে নিমন্ত্রিত। বরাসনটী একটী পত্রপুষ্পশোভিত চতুর্দ্দোলের মধ্যে আলোকসজ্জায় ঝলমল করিতেছে। তাহার মধ্যে যাইয়া যখন আমি বসিলাম তখন আমি বুঝিতে পারিলাম আজ সত্যসত্যই আমার বিবাহ এবং এই বাড়ীতে সমাগত সকলের মধ্যে আমি সর্বাগ্রে বরণীয় এবং দর্শনীয়।

বড়মামা এই বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই পাত্রীকে আশীর্বাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এবং আমার স্বর্গীয়া মাতার একটী মূল্যবান রত্নহার দিয়া পাত্রীকে আশীর্বাদ করিয়া ও বিবাহের অনুমতি প্রদান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা অসুস্থতা প্রভৃতি নানাকারণে কন্যাপক্ষের সনির্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা না করিবার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া বিবাহবাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এ বিবাহ বাড়ীতে আমার আত্মীয় ও পরিচিত বলিতে পুরোহিত ঠাকুর এবং ভৃত্য রামচরণ ভিন্ন কেহ থাকিল না। এতদিন বুঝিয়াও বুঝি নাই, আজ মর্মান্তিক ভাবে বুঝিলাম আমি পরাশ্রিত, আমার মন পুনরায় গভীর দুঃখের বেদনায় প্লাবিত হইয়া গেল। আমি যেন সুখদুঃখের অতীত একদেশে পদার্পণ করিয়া আমার সত্তাকে ভুলিয়া গেলাম।

যথাসময়ে শুভদৃষ্টি হইল। দেখিব না মনে করিয়াও দেখিয়া ফেলিলাম। প্রিয়ার মুখখানি শারদশিশিরস্নাত নবদূর্বাদলশ্যাম—তাহাতে শ্বেতচন্দনের অলকাতিলকা—চক্ষু দুইটী বড় ও দীর্ঘায়ত—চক্ষের ভিতর দুইটী গাঢ়-ঘনকৃষ্ণবর্ণ মণি যেন ব্যাধভয়ে ভীতা চকিতা হরিণীর মত চঞ্চল—যেন সুনির্ম্মল সরোবরে দুইটী সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম মধ্যে মধুপানে মত্ত দুইটী গাঢ়কৃষ্ণ ভ্রমর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেছে না। আমি নিষ্পলক নেত্রে সেই অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিলাম। আমার প্রিয় ও আমাকে তিন পলক দেখিলেন। চারিচক্ষের মিলনে বড় সুন্দর লাগিল। আমি নিজে উগ্র গৌরবর্ণ—সুন্দর বলিতে গৌরবর্ণই বুঝিতাম। কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই অপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব। আমি মুগ্ধ হইলাম। এই বিবাহে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা ও অশোভনতা, আমার মামাদের অনাত্মীয়সুলভ নির্মম স্বার্থপর ব্যবহার আমার হৃদয়ে যে পাষাণভার দিয়াছিল, তাহা যেন এক মুহূর্ত্তে কে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। আমার মনে হইতে লাগিল আমি বঞ্চিত হই নাই। আমি পাইয়াছি—আমার শ্রেষ্ঠ কামনার ধন—আমার জন্ম—জন্মান্তরের চির-বাঞ্ছিতাকে। আমার গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের মধ্যে আমি পাইয়াছি, যেন শান্তির প্রস্রবণ! আমার রিক্ত বঞ্চিত সর্বহারা মন যেন পাইয়াছে—অতুল সম্পদ, তৎসঙ্গে স্বর্গীয় সুষমা। এই ভাবে পাওয়াই শ্রেষ্ঠ পাওয়া।

৩

আমার শ্বশুর বাড়ীর কুলপ্রথাই হউক বা অন্য যে কোন কারণে হউক ফুলশয্যা এই বাড়ীতে হইবে জানিলাম। সুতরাং বিবাহের রাত্রি তারপর দুই দিন দুই রাত্রি শ্বশুর বাড়ীর নূতন পরিবেশে—বিবাহ বাড়ীতে সমাগত নানা আত্মীয়স্বজনের সহজ সরস ব্যবহারে—তাহাদের গ্রাম্যসুলভ রহস্যে, হাস্যে, কৌতুকে আনন্দে কাটিয়া গেল।

ফুলশয্যার পরদিন প্রাতে উঠিয়াই শুনিলাম এখনই

আমাকে মামাবাড়ী যাইতে হইবে। বড়মামা তাহাদের সরকার মহাশয়কে একখানি পত্রসহ পাঠাইয়াছেন। পত্রে কি আছে জানিতে পারি নাই। তবে শুনিলাম শ্বশুর মহাশয় এখনই যাইতে অনুমতি দিয়াছেন। আমি একাই চলিলাম, আমার সদ্যঃপরিণীতা বধূকে সঙ্গে পাঠাইবার কোন ব্যবস্থা হইলনা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। মনে হইতে লাগিল—অর্থগরিমার সঙ্গে আভিজাত্যের কোনরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে! আমি অবমানিত মনে করিলাম। মোটরে সরকার মহাশয়কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। তিনিও নিঃশব্দ নির্বাক সঙ্গী রূপেই থাকিলেন। তীব্র বৃশ্চিকযন্ত্রণা আমার সমগ্র মনকে অসাড় করিয়া ফেলিল।

মামাবাড়ীতে আসি। দেখি—বাড়ীটা শ্মশানভূমির মতো নিস্তব্ধ। দরজায় ডাক্তারের মোটর। দ্রুতপদে দিদিমার কক্ষে যাইয়া দেখি—তিন মামাই গম্ভীর মুখে তথায় দণ্ডায়মান—ডাক্তার বাবু রক্তের চাপ পরীক্ষা করিতেছেন। দিদিমার রক্তের চাপ অসম্ভব বাড়িয়াছে—উঠিতে বসিতে কথা বলিতে নিষেধ।

আমি দিদিমার বিছানার পার্শ্বে বসিলাম—তাহার হাতে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। দিদিমা একবার মাত্র দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—তাহার চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। আমি কোনরূপে অশ্রু সংবরণ করিলাম।

দুইদিন দুইরাত্রি এইভাবে কাটিয়া গেল। দিদিমার শুশ্রূষা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তার অবসর মাত্র ছিল না। দিদিমা একটু সুস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌ কেমন রে! মনের মতো হয়েছে তো!

আমার তো হয়েছে। তোমারও হবে মনে হচ্ছে।

দিদিমা হাসিলেন! যেন বহুদিন পরে মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ দেখা দিল। দিদিমা প্রশান্তমনে ঘুমাইলেই আমার শুধু মনে পড়িতে লাগিল--বিদায়কালীন ইন্দুর সেই অশ্রুসিক্ত স্নিগ্ধ শ্যামল মুখখানি। তাহার উপর দীর্ঘায়ত চক্ষু-ক্ষরিত বড় বড় মুক্তাবিন্দুগুলি। বুঝিয়াছিলাম সে পরাধীনা আর আমি পরাশ্রিত। সুতরাং আমাদের জীবনে বহু সহ্য করিতে হইবে। অসহ্য সহ্য করিতেই আমাদের জন্ম। বিবাহের রাত্রে অসংখ্য তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীর হাস্য কলরবে আমার প্রিয়ার একটি মাত্র কথা শুনিবারও সৌভাগ্য আমার হয় নাই। সেই সুযোগ আসিয়াছিল, অফুরন্ত ভাবে ফুলশয্যার রাত্রে।

আমাদের ফুলশয্যা রচিত হইয়াছিল—ত্রিতলের একটি প্রশস্ত, সুগন্ধি পুষ্পে সুসজ্জিত কক্ষে। সেই কক্ষের আশে পাশে কোন দিকে কাহারো আসিবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। ফুলশয্যার উৎসব শেষ করিয়া যখন সকলে নিম্নতলে গিয়াছিলেন তখন আমি আমার প্রিয়াকে পাইয়াছিলাম নূতন সঙ্গিনীরূপে নয়—যুগযুগান্তে পরিচিতা বিরহদগ্ধা আমার একমাত্র প্রিয়ারূপে, সখীরূপে। আর সেই শুভরাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল-হাস্যে, লাস্যে, বিলাসে নয়—দুইটী বিরহানলতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়ের অন্তর-তমস্থলে সঞ্চিত বহু দুঃখের কাহিনীর প্রকাশে অশ্রুসিক্ত-দুঃখতপ্ত ব্যথিত মথিত সমবেদনায় ভরা দুইটি হৃদয়ের মিলনে। আমাদের অতীত জীবনের সমস্ত হৃদয়ব্যথা যেন শান্তিজলে প্লাবিত করিয়া আমাদিগকে কোন সুদূরে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল তাহা আমরা সেই অনিদ্ররাত্রে বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ নিকটবর্ত্তী পার্কের পক্ষী কলরবে এবং রাজপথে জলসিঞ্চনের শব্দে আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম আমাদের দুইটী জড়দেহের বিচ্ছেদ আসন্ন। পরম সুখের দিন যে অতীত দুঃখ বেদনার স্মৃতি যে মধুময় হইতে সক্ষম তাহা আমরা সেই দিন বুঝিয়াছিলাম।

আমি জন্মাবধি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত। আমার প্রিয়াও তদ্রূপ। তাহাকে জন্ম দিয়া তাহার মা ছিলেন শয্যাগত—আজ কয়েক বৎসর তিনি সেই জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি আমার পিতৃস্নেহ কি তাহা জানিতে পারি নাই—আমার প্রিয়াও তদ্রূপ। আমার শ্বশুর-মহাশয়ের অর্থচিন্তা তাহার বাৎসল্য রসের অন্তরায়। আমার মাতার মৃত্যুদৃশ্য আমি দেখি নাই। আমার প্রিয়া সজলনেত্রে আমাকে বলিয়াছিলেন-স্বামীপ্রেমে বঞ্চিত একটী চিররুগ্নানারী-তাহার মাতার তিলে তিলে মৃত্যু কাহিনী। তাহার অভিভাবিকা হিসাবে আছেন তাঁহাদের সংসারে তাহার এক বৃদ্ধা পিসিমা—বিধবা বন্ধ্যা শুচিবায়ু গ্রস্ত ক্ষীণদৃষ্টি নারী। তিনিও তাহার পিতার মতো শুষ্ক কাষ্ঠবৎ নীরস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে আমার শ্বশুরমহাশয় ছিলেন অতিনিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের

কজন শিক্ষাব্রতী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী াত্র। আচার্য প্রফুল্লরায়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র। তাঁহার ৎসাহে আমার শ্বশুরমহাশয় অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া ্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে তিনি কোটীপতি। রুগ্না পত্নী এবং মাতৃ দুগ্ধে বঞ্চিত একমাত্র কন্যার দিকে দৃষ্টিপাতের তাহার ছিল সময়াভাব। অর্থ ছিল ধ্যান এবং জ্ঞান একমাত্র কামনা। অর্থ ভোগের সময় তাহার ছিল না—ইচ্ছাও ছিল না। এজন্য আমার প্রিয়ার জীবন ছিল দুঃখপূর্ণ ধুধু-মরুভূমি। আজ আমাকে পাইয়া হইয়াছে তাহার হৃদয় সুজলা সুফলা স্নিগ্ধ শ্যামলা। বহু জন্ম ধরিয়া আমার প্রিয়া নাকি আমার জন্যই তপস্যা করিয়াছে আমার মতো সুন্দর হৃদয়বান পুরুষ এই জগতে দ্বিতীয়টী নাই—ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার প্রিয়ার একমাত্র কামনা—আমি যেন চিরদিন তাহাকে আমার শ্রীচরণের দাসী করিয়া রাখি—তাহার সকল অপরাধ আমি ক্ষমা করি।

আমি তাহাকে আমার বক্ষে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিয়াছিলাম—আমিও এজীবনে তাহার মতো এত সুন্দর কমনীয় লাবণ্য-ময়ী মুখশ্রী দেখি নাই। আমার এই কথা বিদ্রূপ মনে করিয়া প্রিয়া কাঁদিয়া অস্থির। রূপের প্রশংসা শুনিলে কোন নারী যে কাঁদিতে পারে তাহা ছিল আমার কল্পনার বাহিরে। আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ভালবাসা দিয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। আমার প্রিয়া তখন তরঙ্গায়িত সমুদ্রে নিমজ্জমান প্রাণীর ন্যায় আমার বক্ষালগ্ন হইয়া থাকিল। আমি বলিলাম—ঈশ্বর সাক্ষী। আমি আমার অন্তরের কথা তোমাকে বলিয়াছি—কোনরূপ বিদ্রূপ করি নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার প্রাণের বিনিময় দিয়াও তোমাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিব।

ফুলশয্যার রাত্রের সেই মিলনস্বপ্ন ভাবনায় আমি যখন তন্ময় তখন কেবল সন্ধ্যা হইয়াছে। হঠাৎ আমার চমক ভাঙ্গিল বড়মামার ডাকে—রাজু! হরগোবিন্দবাবু মোটর পাঠিয়েছেন-তুমি ঐ মোটরে যাও।

আমি বলিয়া বসিলাম—"আমার শরীর ভাল নাই। যাইতে পারিব না।"

"সে কি! এমন কী হয়েছে যে মোটরে এইটুকু পথ যেতে পারবে না? সে দিন মা'র খুব বাড়াবাড়ী হয়েছিল—এজন্য তো মাকে একা পাঠাতে দিয়েছিলাম। এখন তোমাকে বৌমাকে নিয়ে জোড়ে আসতে হবে—এইটে কুলপ্রথা। মা আজ ভাল আছেন। তার মত নিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা হচ্ছে। এ নই যাও। পরশু সন্ধ্যায় আগে আসতে হবে। ঐ দিন বৌভাত। তুমি না গেলে মা'র অসুখ আবার বেড়ে যাবে; ছেলে মানুষি করো না।

বড় মামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কালেকটার সাহেবের সম্মুখে প্রথম সাক্ষাতে আমি হরগোবিন্দবাবুকে দেখিয়া যেন প্রীত হইতে পারি নাই। আমার মনে হইতেছিল সেদিন তাহার উচিত ছিল আমার সহিত ইন্দুকে পাঠান। আমার ধারণা হইয়াছিল তিনি তাহার অর্থ গরিমায় আমাকে গৃহজামাতারূপে গণ্য করিয়াছেন। এজন্য আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম—আমি আর শ্বশুর বাড়ী যাইব না। দিদিমাকে বলিয়া ইন্দুকে এ বাড়ীতে আনাইব।

বড় মামার আদেশ-দিদিমার অভিলাষ অমান্য করিবার সাধ্য আমার ছিল না। এজন্য স্থির করিলাম—আমি যাইব-তবে খাইয়া যাইব। সেখানে যাইয়া কিছু আহার করিবনা। পরদিন সকালেই ইন্দুকে লইয়া চলিয়া আসিব। আমার অভিজাত রক্ত আমাকে নানা ভাবনায় অস্থির করিয়া তুলিল।

শ্বশুর বাড়ী যখন পৌঁছিলাম-তখন বেশ একটু রাত্ত হইয়াছে, আমার শ্বশুর মহাশয় পথে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি মোটর হইতে নামিতেই আমাকে তাহার প্রশস্ত বক্ষে টানিয়া লইলেন। তিনি সুদীর্ঘবাহু ও স্থূলকায়। তাঁহার সস্নেহ দৃঢ় আলিঙ্গনে আমি যেন ক্ষুদ্রশিশুবৎ হইয়া পড়িলাম। আমার জীবনে এই প্রথম পিতৃস্নেহ অনুভব করিলাম, আমাকে আলিঙ্গনে রাখিয়া তিনি পদচালনা করিতে লাগিলেন—প্রণাম করিবার সুযোগও মিলল না।

তিনি আমাকে ত্রিতলের সেই সুসজ্জিত কক্ষের ভিতর আনিয়া তাহার আলিঙ্গন শিথিল করিলেন। তখন আমি তাহার পদে প্রণত হইলাম—তিনি আমার মস্তক-চুম্বন করিলেন। তারপর দিদিমার কুশল প্রশ্ন ও অন্যান্য দু'চারিটী কথা বলিয়া সত্বরে নিম্নতলে চলিয়া গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ার আগমন। বোধহয় আশে পাশে কোথাও ছিলেন, জামাতা-শ্বশুর সংবাদ বোধহয় শুনিয়াছেন। আমার শ্বশুর মহাশয় শুধু অর্থসংগ্রহের একটী যন্ত্র নন, তাহার মধ্যে মানুষোচিত মায়া মমতা-স্নেহ আছে, আমি যেন তাহা অন্ত অনুভব করিলাম। প্রিয়াকে সঙ্গে লইয়া শয্যায় আসিয়া বসিলাম।

আমার প্রিয়া আমাকে বলিলেন—তুমি শীগ্‌গীর হাত মুখ ধুয়ে নাও আমি খাবার নিয়ে আসি। এত রাত করে কেন এলে? কী ভাবনায় যে পড়েছিলাম।

আমি বলিলাম-আমি খেয়ে এসেছি। রাতে আর খাব না। তুমি শীগ্‌গীর খেয়ে এসো।

"তুমি তো এতো সন্ধ্যায় কোনদিন খাওনা। তবে কেন খেয়ে এলে?

আমি নিরুত্তর। আমার প্রিয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া করুণস্বরে বলিলেন-সত্যি করে বলো—আমাদের কি কোন অপরাধ হয়েছে?

"অপরাধ! সে কি! না-না। আমার শরীরটা যেন ভাল নাই।"

তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে—কী যেন একটা হয়েছে। বাবা এই দুই তিন দিন শুধু তোমার কথা বলে কাটিয়েছেন-তোমাদের বাড়ীর চিন্তা দিদিমার অসুখের চিন্তা, তাহার সমস্ত মনে ভরেছিল। তার অফিসের কাজকর্ম সমস্ত বন্ধ। টেলিফোনে কথা তোমাদের বাড়ীর পাশের এক বাড়ীতে বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে। আর তোমার মামাদের সঙ্গে। তাহার আহার নিদ্রা একরূপ ছিল না। বাবার মনে এত স্নেহ এত ভালবাসা এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল তাই এই দু'তিন দিন আমি শুধু ভাবছি। তুমি কি কি জিনিষ খেতে ভালবাস সব গোপনে জেনে নিয়ে সারাদিন ধরে সেই খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। ওঁকে আমি জীবনে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখি নাই। আজ তিনি কতবার এ সম্বন্ধে কি কি খাবার হচ্ছে জেনেছেন। তা—আর তোমাকে কী বলব। এখন যদি তুমি খেতে না যাও—বাবা এখনই উপরে ছুটে আসবেন।

"তা হ'লে সে দিন কেন তোমাকে আমার সঙ্গে পাঠালেন না?

ও-মা। সে কথা। আমাকে যে নিতে চেয়েছে বড় মামা যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে মাত্র কয়েকটী কথা-মা মৃত্যুশয্যায়! তোমাকে এখনই পাঠাতে হবে। বাবা আমাকে তোমার সঙ্গে পাঠাবেন সরকার মহাশয়কে বলেছিলেন। সরকার মশায় বল্লেন—এখন থাক্। কাল সমস্ত রাত মা'কে যমে-মানুষে টানাটানি করছে। এখনও অবস্থা সঙ্গীন! এই অবস্থায় নূতন বৌমাকে নেওয়া শোভন হবেনা। তুমি যদি জোর করতে তা হ'লে আমি যেতে পারতাম। তুমি তো একটা কথাও বলনি। তোমাদের রাজবাড়ীর নিয়ম কানুন আমরা কি করে জানবো বলো। প্রথম বিয়ের পর জোড়ে যাওয়া হিন্দুসমাজের প্রথা। আমার দুর্ভাগ্যে সে প্রথা ও ভঙ্গ হলো। আমি তিনদিন দুই রাত্রি শুধু ৺গোবিন্দজীউ ঠাকুরের কাছে কেঁদেছি—কত মানত করেছি-হে বিপদ বারণ, লজ্জাহরণ! কলঙ্ক ভঞ্জন ঠাকুর—আমার দিদিমাকে বাঁচিয়ে রাখ! আমি যেন যেয়ে তাঁকে দেখতে পাই—তার পদসেবা করতে পারি। আমার বাবা প্রতিদিন ভাল ঠাকুর এনে একশ আট তুলসী পত্র দিয়ে দিদিমার কল্যাণে ৺গোবিন্দজীউ-এর পূজা করিয়েছেন, কালীঘাটে যেয়ে নিজে পূজা দিয়ে এসেছেন। দক্ষিণেশ্বরে, আশেপাশে সকল ৺মায়ের মন্দিরে, তারকেশ্বরে ৺বাবার কাছে পূজা পাঠিয়েছেন। তুমি সেখানে যাবার পর থেকে দিদিমার অবস্থা ধীরে ধীরে ভাল হয়েছে। আজ বেলা ১০টায় বাবা জানলেন—দিদিমার রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়েছে। বাবা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছেন। তোমার দিদিমার ও মামাদের মত নিয়েই তোমার এখানে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। আগামী পরশুদিন সন্ধ্যায় বৌভাত। কালেকটার সাহেব বিবাহের খরচ, বৌভাতের খরচ, দিদিমার অসুখের খরচ, বাড়ী অঙ্গরাগের খরচ এই সব ভিন্ন খরচের জন্য অনেক টাকা মঞ্জুর করেছেন। আমরা সংবাদ পেয়েছি বড় মামা করছেন নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা, মেজ মামা বাড়ীর অঙ্গরাগ ও আলোক সজ্জার ব্যবস্থা, আর ছোটমামা ভোজের ব্যবস্থা। তুমি বুদ্ধিমান। তুমি বোধ হয় বুঝছ—আমাদের কোন দোষ নেই। এখন ওঠো। বাথরুমে যেয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসো—আমি খাবার নিয়ে আসি। বাবার মনে কষ্ট দিয়ো না।

প্রিয়াকে কাছে টানিয়া বলিলাম—সত্যি এখন

ক্ষিদে নাই। একটু রাত হ'ক পরে খাবো। এখন তোমার নূতন মুখে নূতন কথা শুনি—বড় ভাল লাগছে—তোমার মিষ্টি মিষ্টি কথা। তোমার মধুর কণ্ঠস্বর! আর সত্যি ভাল লাগ্‌ছে এখানকার আকাশ বাতাস সব। এখন শুধু তোমার কথা শুনি। এস আরো কাছে বসো।

: সিঁড়ির দরজা খোলা। সারা রাত পড়ে আছে। বাড়ীতে এখনও অনেক আত্মীয় স্বজন আছেন। কেউ উপরে এলে বড় লজ্জায় পড়্‌বো।

একটু বেশী রাতে খাইব না খাইব না বলিয়া অনেক বেশী খাইয়া ফেলিলাম। আমি প্রিয়াকে বলিয়াছিলাম—এসো এক সাথে খাই। সে হাসিয়া বলিল—আমরা এ বাড়ীতে একশ বছর পিছিয়ে আছি। তোমাদের বাড়ী যাই, তখন একসাথে খাবো। বিয়ের পরদিন থেকে আমাকে বাবার সাথে বসে খেতে হচ্ছে। আমার জ্ঞানে কোন দিন মনে হয় না—তিনি কোনদিন আমার খাওয়া দাওয়া বিষয়ে কোন খোঁজ নিয়েছেন। তুমি যেদিন এ বাড়ীতে পা দিয়েছ সে দিন থেকে এ বাড়ীর শুষ্ক রুক্ষ আকাশ বাতাস সব সরস মধুর হয়ে গেছে। তুমি ভগীরথের মতো এ বাড়ীতে লক্ষ্মীদেবীকে এনে এখানকার শুকনো গাছ ফলে ফুলে ভরে তুলেছ। আমি এ বাড়ীতে অবাঞ্ছিত হয়ে জন্মেছি। শুধু এবাড়ীতে কেন, বাংলার সকল মেয়ের জন্মই যেন একটা অভিশাপ! আজ আমাকে এ বাড়ীতে বাবার পিসিমার আর আর সকলের কী আদর! সে আমি এ বাড়ীর মেয়ে বলে নয়—তোমার স্ত্রী বলে। তোমাকে বাবা যে কী চোখে দেখেছেন তা' আমি শতমুখে বলে শেষ করতে পার্‌বো না। তোমার মত সুন্দর, সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, ধীর স্থির, বুদ্ধিমান ছেলে তিনি এ জগতে আর কোথাও দেখেন নি। দিনরাত শুধু তোমাদের কথা। কী করে তোমাকে সুখী করবেন এই কথা। তোমার মতো দেব-দুর্লভ স্বামী পেয়েছি, বলেই আমি আমার বাবার হারানো ভালবাসা শতগুণে ফিরে পেয়েছি।

আমার আহারের পর আমার ভুক্তাবশেষ লইয়া ইন্দু নিম্নতলে চলিয়া গেল। আমি শয্যা আশ্রয় করিয়া একখানি মাসিক পত্র পড়িতে পড়িতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম মনে নাই। হঠাৎ ঘুম ভাঙিতে দেখি—ভোর হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বে কেহ নাই! পার্শ্বে কেহ শয়ন করিয়াছিল তাহার চিহ্ন মাত্র নাই!

ইন্দু কি রাত্রে এককে আর আসে নাই। ক্ষোভে, ক্ষোভে ক্রোধে, অপমানে আমার অন্তর যেন জ্বলিয়া উঠিল! মনে হইতে লাগিল—এ জগতে সকল নারীই ছলনাময়ী। তাদের মুখের কথার সাথে অন্তরের কোন যোগ নাই। আর নারীর কথায় ভুলিব না। নারী নরকের দ্বার একথা সত্যি!

আমি চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিলাম—ভাবিতে লাগিলাম কাহাকে কিছু না বলিয়া গোপনে এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাই!

বাড়ীর একজন চাকর আসিয়া ডাকিল—দাদাবাবু!

আমি সাড়া দিলাম না। যে জাগিয়া আছে তাহাকে জাগাইবে কে?

কিছুক্ষণ পরে ইন্দু আসিয়া উপস্থিত। সদ্যস্নাতা—সুবেশা। সিক্ত গাঢ়কৃষ্ণ অলকদাম পৃষ্ঠে বিলম্বিত, তাহার উপর পরিধেয় বস্ত্রের সামান্য একটু অংশ। সিঁথিতে রক্তবর্ণ সিঁদুর রেখা কপালে বেশ বড় সিঁদুরের ফোঁটা রাত্রি অবসানে নবারুণ দৃশ্য! আমার চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত ছিল একেবারে বুঁজিয়া ফেলিলাম।

ইন্দু আমার বিছানায় বসিয়া আমার উষ্ণ কপালে তাহার শীতল হস্ত স্থাপন করিল। আমি বাধা দিব ইচ্ছা করিয়াও বাধা দিতে পারিলাম না। ইচ্ছা হইতেছিল ঐ হাত দূরে ফেলিয়া দি তাহাও করিতে পারিলাম না—আমার সংস্কৃতি, সংযম তাহার বাধক হইল। ইন্দু তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দিয়া আমার মাথার চুলের মধ্যে বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"লক্ষ্মীটি ওঠো! রাগ করোনা! কাল রাতে আমাদের বড় একটা বিপদ গিয়েছে। আমার বৃদ্ধা পিসিমা—চক্ষে কম দেখেন এজন্য রাতে বড় একটা ঘরের বাহির হন না। কালরাতে তোমাদের বাড়ীতে বাবার সব তত্ত্ব আসছে তাই দেখতে ঘরের বাহির হতে চৌকাঠে পা লেগে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। এক জন ডাক্তার প্রায় সমস্ত রাত পাশে ছিল। বাবা ও আমি সারারাত তার শুশ্রূষা করেছি। বাবা আমাকে বার বার উপরে আসতে বলেছেন। আমি তিন চার বার এসেছি—

দেখি তুমি খুব ঘুমে আচ্ছন্ন। বোধ হয় গত দুই রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই এজন্য তোমার ঘুম ভাঙাই নাই। একবার এসে মশারিটা ফেলে চারিদিক বিছানায় গুঁজে দিয়েছি। রাত্রে সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল—ঠাণ্ডা বাতাস দেখে গায়ে চাদরটা টেনে দিয়ে গিয়েছি তুমি একটুও জাগোনি। শেষ রাত্রে আসবো মনে করছিলাম—আমি কখন পিসিমার পায়ের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভেঙে দেখি ভোর হয়েছে। শুনলাম তুমি তখনও ঘুমোচ্ছো। সেই জন্য একেবারে স্নান সেরে উপরে এলাম।

আমি সমস্ত শুনিলাম। চক্ষু মেলিয়া তাহার স্নিগ্ধ কোমলকান্ত মুখখানি দেখিলাম। আমার অন্তর স্পর্শ করিল। আমি তাহার দক্ষিণ হস্তখানি টানিয়া লইয়া আমার বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম আমার ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হৃদয়ের শান্তির জন্য সচেষ্ট হইলাম।

ইন্দু বলিল—অত কি ভাবছো। ওঠো! বেলা আটটা বাজে। বাথরুমে যেয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসো। তোমার চা, খাবার নীচে তৈয়েরী হয়েছে—আমি নিয়ে আসি। তুমি উঠেছ কিনা বাবা সকলের কাছে খোঁজ করছেন।

আমি কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। শুধু তাহার দক্ষিণ হস্ত আমার বুকে চাপিয়া চাপিয়া আমার ক্ষোভের উপশম করিতে লাগিলাম।

ইন্দু বলিল—তুমি তো বলেছ আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করবে এখন ক্ষমা করছ না কেন? রাগ করোনা, ওঠো। আজ সারা দিন রাত তোমার কাছে থাকবো। পিসিমার জন্য নার্স এসেছে। আমার সেখানে ঢোকা আজ নিষেধ হয়েছে। লক্ষ্মীটি! তোমার পায়ে পড়ি—মনে হইল, ইন্দুর চক্ষের জল আসন্ন।

আমি আর কালক্ষেপ না করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কক্ষ সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম সেখানে স্নানের সমস্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে। একেবারে স্নান সারিয়া বাহির হইয়া দেখি—ধূমায়মান চা। তার সাথে আমার প্রিয় লোভনীয় নানা খাবার। পার্শ্বে ইন্দু এক অপরূপ ভঙ্গীতে বসিয়া।

আমি ঘরে আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর পরম ভক্তিভরে গলবস্ত্র হইয়া পতি-পরমগুরুপদে প্রণতা হইল। আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

: হাসলে যে!

: এ যুগে এ অচল।

: তা হোক। আমার কাছে এ সচল থাকবে। শুধু তুমি বাধা দিয়ো না—বিরক্ত হয়ো না। আর দেরী করো না। চা টা জুড়িয়ে যাবে। আগে খাবারটা খেয়ে ফেল। চা টা ঢেকে রাখছি।

: এত খাবার আমি একা খেতে পারবো না। এসো এক সাথে খাই।

: সিঁড়ির দরজা খোলা। জানতো আমরা এ বাড়ীতে একশ বছর পিছিয়ে আছি। তোমাদের বাড়ী যাই তখন এক সাথে খাবো।

: ওরে বাবা! আমার দিদিমা হাজার বছর পিছিয়ে আছেন।

তা হ'ক। তুমি ইচ্ছা করলে এক দিনে দু'হাজার বছর এগিয়ে আনতে পারবে।

হঠাৎ সিঁড়িতে শ্বশুর মহাশয়ের ভারী পদ শব্দ। আমি আর কথা না বলিয়া দক্ষিণ হস্তের সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম। শ্বশুর মহাশয় স্বীয় কন্যাকে কক্ষাভ্যন্তরে দেখিয়া বাহির হইতে কুশল প্রশ্ন করিয়া আবার সশব্দে নিম্নতলে চলিয়া গেলেন।

সমগ্র দিনটি প্রিয়া সঙ্গমে মধুর ভাবে কাটিয়া গেল। গত রাত্রের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দিবা ভাগে মিটাইয়া ফেলিলাম। তথাপি মদ বহ্নি সদাকাগ্রত উষ্ণ যৌবন রক্তের স্রোত আমাকে নানা ভাবে উন্মত্ত করিতে লাগিল। আমার প্রিয়া গত রাত্রের অনিদ্রার জন্য শয্যায় গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। আমিও সামান্য একটু তন্দ্রা উপভোগ করিলাম। বিকালে ফোনে জানিলাম—দিদিমা সুস্থ আছেন।

সূর্যাস্তের সামান্য পরে জলযোগান্তে কক্ষ সংলগ্ন বারান্দায় পদচারণা করিতে করিতে দেখিলাম বহু নূতন নূতন আসবাব পত্র নানা দ্রব্যাদি এ বাড়ীর নিম্নতলে আসিতেছে। ইন্দুকে জিজ্ঞাসায় বলিল—বাবার সামাজিক বুদ্ধিটা বড় কম। বিবাহে কোন দান সামগ্রী দিবার কথা ছিল না—এজন্য পূর্বে কেনা হয় নাই। এখন সেই ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা চলিতেছে।

৫

পরদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি—বাড়ীর

সরগরম। বেলা প্রায় ৮টা। শতাধিক নরনারী নূতন হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রে এবং নূতন রঙীন গামছা মাথায় বাঁধিয়া খুস জন্ত। ইন্দু স্নান সারিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম—এত লোকের ব্যাপার কেন? ইন্দু হাসিয়া বলিল—রাজবাড়ীর সম্মান রক্ষার জন্ত!

বেলা ১০টার মধ্যে সেই শতাধিক নরনারী নানা ভোজ্য ও দ্রব্য ও নানা আসবাব পত্রাদি লইয়া সারিবন্দী হইয়া বাহির হইয়া গেল। লরী যোগে পাঠাইলে যেখানে দু'তিনজন লোকে সমাধা হইত সেখানে শতাধিক ব্যক্তির নিয়োগ অর্থ ও শ্রমের অপচয়। ইন্দু বুঝাইয়া বলিল—"কোনো প্রদর্শন, অর্থনীতির অপেক্ষা রাখে না। লরীতে গেলে কে জানিত রাজবাড়ীতে তত্ত্ব যাইতেছে? শতাধিক লোকের এই মিছিল রাজপথের পথিকদের, পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদের নিশ্চয়ই কৌতূহল সৃষ্টি করবে—কোন উৎসবে ইহার কি কোন প্রয়োজন নাই?"—আমি আর কথা বাড়াইলাম না।

ইন্দু বলিল—এ বাড়ীর 'পাশপোর্ট' তো পেলাম। এখন রাজবাড়ীর 'ভিসা' পেলে হয়!

সন্ধ্যার পূর্বে পত্রপুষ্পসুশোভিত একখানি সুবৃহৎ মোটরযান ভৎসঙ্গে রাজবাড়ীর পুরাতন আমলের সাজ-পোষাকে তমকা আঁটিয়া ভৃত্য রামচরণ এবং মনোহর বেশে আমাদের সরকার মহাশয় উপস্থিত। ইন্দুর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সুখস্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত দেখিয়া তাহার অন্তর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহার আনন্দোচ্ছল সদ্যজাগ্রত পরিপুষ্ট যৌবনশ্রী আমাকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিল। তথাপি, আমরা দুইজনে বিবাহের বস্ত্র পরনে মোটরে উঠিবার সময় তাহার পিতৃচরণে নমস্কার করিবার সময় কেন যে অকস্মাৎ অশ্রুসিক্ত হইল—এ রহস্যের সমাধান করিতে পারিলাম না। নারী প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়। এক চক্ষে সে হাসিতে পারে এক চক্ষে কাঁদিতেও পারে। মোটরখানি ধীরে ধীরে শ্বশুরবাড়ী হইতে বাহির হইতেই রাজপথে অপেক্ষমান দু'টী ব্যাণ্ডপার্টি ও বহুপ্রকার আলোকসজ্জা আমাদের অগ্রে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু আমার দিকে অশ্রুসিক্ত চক্ষে চাহিয়া স্নিগ্ধ হাসি হাসিল। হাসিকান্নার এই অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিয়া আমি সত্যসত্যই মুগ্ধ হইলাম। ইচ্ছা হইতেছিল, তাহার হাসিকান্না মিশ্রিত অপূর্ব মুখশ্রী আমার বুকে মুখে চাপিয়া ধরি। বর্তমান পারিবেশে তাহা যখন অসম্ভব, তখন তাহার দক্ষিণ হস্তের করতলটী আমার উত্তরীয় তলদেশে টানিয়া লইয়া আমার উভয় হস্তে চাপিয়া আমার মনের আবেগের সান্ত্বনা দিলাম। আমার প্রিয়া তাহার প্রতিদানে একটু শান্ত হাসি হাসিয়া আরো নিবিড় হইয়া বসিল।

রাজপথের কৌতূহলী জনতার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যখন আমরা রাজবাড়ীর সুপ্রশস্ত গেটে আসিলাম তখন দেখি বাড়ীটা নূতন অঙ্গরাগে অভিনব নানাবর্ণের আলোকসজ্জায় অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে। গেটের উপরে সদ্যনির্মিত সুসজ্জিত মঞ্চে নহবৎ বাজিতেছে—লোকজনের গতাগতির বিরাম নাই। চতুর্দ্দিকে যেন মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হইতেছে।

আমরা রাজবাড়ীর বহির্দ্বার ও বহিরঙ্গন অতিক্রম করিয়া যখন ত্রিতল রাজবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম তখন দেখি বাড়ীর সম্মুখে তিন মামাই দণ্ডায়মান। সকলের একই বেশ—ধুতি, পাঞ্জাবী ও উত্তরীয়। আমরা পরপর যুগ্মভাবে তিন মামাকে প্রণাম করিয়া বহির্বাটী অতিক্রম করিয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিলাম—নানা বয়সের নারীমহল আমাদিগকে যেন বন্দী করিয়া ফেলিল। আমার মনে হইতেছিল আমি এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি—এতদিনের জন্মাবধি স্বপ্ন রচিত গৃহের সঙ্গে তাহার কোনরূপ সাদৃশ্য পর্যন্ত নাই।

এই হাস্যকলরবে মুখরিত নারীবৃন্দের বন্দীস্বরূপে কোনরূপে অতি ধীর পদক্ষেপে আমরা দ্বিতলে উঠিলাম। দ্বিতলের যে কক্ষটী দাদামহাশয়ের শয়নকক্ষ, তাহা এতদিন ছিল রুদ্ধ—বাড়ীর ভাঙাচোরা মূল্যবান বা অতিসাধারণ আসবাবপত্রের সংরক্ষণ স্থান। ইঁদুর, ছুচুন্দরী, চামচিকা, আরশোলা প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কাহারো অবাধ গতি ছিল না। আজ দেখি সেই কক্ষটী সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, খুস ভুত, বৈদ্যুতিক আলোকে, নূতন আসবাবপত্রে ও পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত।

আমরা সেই কক্ষটী অতিক্রম করিয়া সর্বপ্রথম দিদিমার কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

দিদিমা অনেক সুস্থ হইয়াছেন। তিনি সহাস্যমুখে

বিছানার উপর বসিয়া আছেন। আমরা দুইজনে তাহার পদে প্রণত হইলাম।

দিদিমা আমাদের দুইজনকে তাঁহার দুইপার্শ্বে সস্নেহে বসাইলেন। আমাদের গাঁটছড়া-বন্ধনটী তাঁহার ক্রোড়ে রহিল। দিদিমা একখানি ভারী হেহার ন'বধূর গলদেশে স্থাপন করিয়া তাহার হাস্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধ প্রশান্ত মুখখানি চুম্বন করিলেন। তাহার পর তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর শোক তাঁহাকে যেন নূতন করিয়া পাইয়া বসিল—এই শুভদিনে শুভমুহূর্তে তিনি সেই উদগত শোকাশ্রু অবরুদ্ধ করিতে পুনঃ পুনঃ মস্তকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। ইন্দুর চক্ষুও শুষ্ক ছিল না—মাতৃহীনা কিশোরীর তাহার জন্মাবধি অনাস্বাদিত মাতৃস্নেহ আজ যেন অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে দিদিমার সুপ্রশস্ত বক্ষে তাহার মুখ চাপিয়া রাখিল।

আমি একটী স্বর্গীয় চিরসুন্দরমহামহিমাময় দৃশ্য দেখিলাম—বহু জন্মজন্মান্তরের বিচ্ছিন্ন বিরহদগ্ধা দুই সখীর পুনর্মিলন! যেন আতপতপ্ত গ্রীষ্মের দিন শেষে মলয়ানিল স্নিগ্ধ পশ্চিমগগনের সূর্যের সহিত পূর্বগগনের জ্যোৎস্নাময়ী লাবণ্যময়ী পূর্ণচন্দ্রের মহামিলন—একজন অস্তগামিনী, অন্যজন নব দিতা।

বহির্বাটী হইতে সংবাদ আসিল নিমন্ত্রিতগণ নববধূ সন্দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। দিদিমা চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। আমি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিম্নতলে আসিলাম। তরুণীগণ সত্বর নববধূর প্রসাধনে তৎপর হইলেন। বুঝিলাম, আমার শ্বশুরালয়ে আমি ছিলাম সর্বপ্রথম বরণীয় ও দর্শনীয়। আর এখানে ইন্দুমতীই সর্বপ্রথম বরণীয়া ও দর্শনীয়া। আমি যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলাম। আমার সত্তা যেন আমার নিকট অবলুপ্ত হইল!

কখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে আমি দ্বিতলে উঠিয়া আসিয়াছি আমার মনে নাই। আসিয়া দেখি, দাদা-মহাশয়ের সুপ্রশস্ত শয়নকক্ষে একটী বিস্তৃত শয্যায় বসিয়া ইন্দুমতী। পরিধানে স্বর্ণতন্তু নির্মিত মূল্যবান বস্ত্র। মস্তকে অবগুণ্ঠন ওড়না। তাহার উপর মণিমুক্তা খচিত দিদিমার স্বর্ণ মুকুট। সর্বাঙ্গে দিদিমার ও আমার স্বর্গগতা মাতার জড়োয়া গহনা। তাহার মধ্যে মধ্যে পুষ্পের অলঙ্কার। বৈদ্যুতিক আলোকে তাহার সর্বাঙ্গ যেন ঝলমল করিতেছে। নববধূর চতুষ্পার্শ্বে উপহারের স্তূপ! কক্ষমধ্যে তিলধারণের স্থানাভাব। সকল মুগ্ধদৃষ্টি নববধূর মুখে নিবদ্ধ। আমি কিছুক্ষণ এদিক ও দিক ঘুরিয়া দিদিমার কক্ষে নিদ্রিত দিদিমার পদতলে বসিয়া রহিলাম। রাত্রি অনুমান বারটায় আমার শয়ন কক্ষে ঢুকিবার আমন্ত্রণ আসিল। আমি কক্ষে ঢুকিতেই, ইন্দু আমার পদে প্রণতা হইল। আমি যেন এতক্ষণ পরে আমার আমাকে ফিরিয়া পাইলাম।

কক্ষের চতুর্দিকে সুস্পষ্ট হাসির শব্দ। আমিও হাসিয়া বলিলাম—ভঃ হো!

: হাসুক্। এতো কোন অন্যায় কিছু নয়, যে আমি লজ্জিত হবো। তুমি আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল। মরিবার দিনও তোমার পদধূলি পাই, এই আশীর্বাদ তুমি করো। আমি আর কিছু চাইনা।

ইন্দু আবার প্রণাম করিয়া বলিল—রাত অনেক হয়েছে শোবে এস!

: আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে! শুলেই ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু, যারা আড়ি পেতে মশার কামড় খাচ্ছে—তাদের দশা কি হবে?

: সবাই নিজের নিজের কর্মফল ভোগ করে। তুমি কী ভাবে তা' রোধ করবে?

একজন তরুণী জানলার কাছে আসিয়া বলিল—রাজুদা, তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি শুয়ে পড়! তুমি যে ঠানদি বিয়ে করে এনেছ, তাতে আমরা সহজেই আমাদের কর্মফল নষ্ট করতে পারবো। আমরা চললাম। আসি-ঠানদি! প্রাতঃপ্রণাম! খুড়ি! গুড্‌নাইট্!
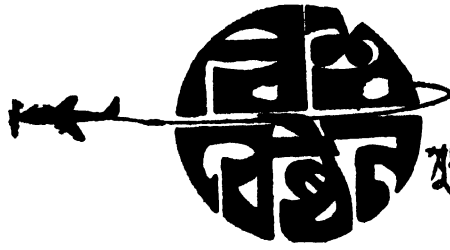
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হিউম সাহেব দুপুরে আমায় নিয়ে গেলেন নগর থেকে বেশ খানিকটা দূরে হলিউড অঞ্চলের এক বিখ্যাত হোটেলে। মনে হ'ল ফেরার সময় কোন না কোন ষ্টুডিও যাতে সুটিং দেখিয়ে আনবেন। আহারাদি পর্ব সেরে ফেরার সময় তা'র কোন লক্ষণই দেখলাম না। আমাদের দূর থেকে হলিউডের নটনটীদের প্রতি উদগ্র আকর্ষণ, এদের কিন্তু এতে একটুও মাথা ঘামেনা। তবে কটাক্ষপাত ক'রে মন্তব্য করতেও ছাড়েনা যে এবার একজন হলিউডের অভিনেতা ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের রাজ্যপাল হবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। বহু গাড়ীর পেছনে কাগজ এঁটে তাকে ভোট দেবার জন্য আবেদন জানাচ্ছে। আমাদের আসার পথে পড়ল লস এনজেলিসের অতি খ্যাতিমান খেলোয়াড়দল 'ডজার'দের বেস বলের ষ্টেডিয়াম। এখানে ফুটবল খেলা তেমন জনপ্রিয় নয় যেমন বেসবল। এই ষ্টেডিয়ামের গায়েই বিরাট ময়দান যাতে সহস্র সহস্র দর্শকদের মোটর গাড়ী রাখা যেতে পারে।

বৈকালে কিছু ঘুরে এসে হিউম সাহেবের সঙ্গে চললাম তাঁর বাড়ীতে, সেখানে খানিকক্ষণ বসে কিছু মিঠে জল পান করে শ্রীমতীকে প্রস্তুত হবার সময় দিলাম। ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ করে রবার্ট বার্নসের লেখার উপর আলোচনা হল, স্কটিশ কবি ও লেখকদের প্রতি এই পরিবারের বিশেষ আকর্ষণ, যেমন স্যার ওয়াল্টার স্কটের নভেল ও কাব্য গ্রন্থ। তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর ব্যাগ পাইপটা বের ক'রে Ave Maria গানটির সুর তুললেন। এই সব অবসর বিনোদনের নানা প্রক্রিয়া প্রদর্শনের পর আমরা পুরোনো লসএনজেলিসের কোলে প্রাচীন পরিবেশে এক মেক্সিকো হোটেলে রাতের আহারে গেলাম। খোলার চাল দেওয়া বাড়ী, ইচ্ছে ক'রে মৃদু আলো জ্বলিয়ে প্লাষ্টিকের লতাগুল্ম ঝুলিয়ে স্থানটিকে দু এক শতাব্দী পেছনে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে এখানে আহারের মূল্য কিছু বেশী। মেক্সিকো আহার্যদ্রব্যে ঝাল বেশী। তাতে বাঙালী খাদ্যের আমেজ কিছুটা আনে। আহার পর্ব সেরে রাতের লস্ এনজেলিস দেখে হিউম সাহেব আমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে সামান্য যে উপহারের জিনিষ ছিল তা শ্রীমতীকে দিয়ে বললাম—আমাদের নিবিড় পরিচয়ের অভিজ্ঞান, তুমি গ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ হব। সেই সময় আমার রবীন্দ্রনাথের 'দান' কবিতাটির কথা মনে পড়ল।

শুক্রবার দিনও চ্যাস হিউম এলেন আমায় তুলে নিতে। আজ আমি যাব বিশ্ববিখ্যাত হাইপেরিয়াম ময়লা শোধনশালায়, অফিসে এসে ওখানকার কর্মসচিবকে আমার যাওয়ার কথা টেলিফোনে বলায় গাড়ী করে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। সমুদ্রের ধারে এটির অবস্থিতি। বর্তমানে সামনের সমুদ্র সৈকত সাগর স্নানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই মনে হয় দূরে কে যেন মাটির চালে বৃহৎ এক আলতার শিশি ভেঙে ফেলেছে। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে ম্যাজেন্টা রঙের ফুল ফুটে থেবড়া হয়ে ঢেকে রয়েছে, কোথাও সবুজ পাতার ব্যবধান রংয়ের অবিচ্ছিন্নতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। এই দৃষ্টি লুব্ধ-নেওয়া অভিনব ও চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষেরই সৃষ্টি, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এক মহাকর্মকার রংয়ের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। পথের ধারে, ছোট-ছোট খোলা জায়গায় প্রচুর সার-সমৃদ্ধ সুমিত পুষ্পকেয়ারিকায়

নানা বর্ণের বিচিত্র পুষ্পের বিলাস। চিরাচরিত পদ্ধতি ব্যতিক্রমে হঠাৎ বিরাট এক থাবলা একই রকম পুষ্পের ঘন বিন্যাস ভূমায় আমেজ আনে, আনে বিরাটত্বের স্পর্শ। এই হাইপেরিয়ান (Hyperion) ময়লা শোধনশালটির বিশাল কলেবর ও যন্ত্রপাতিও একটা বিরাটত্বের ছোঁয়া আনে। প্রশান্ত মহাসাগর কূলে এটাই বৃহত্তম শোধনশালা, বিস্তৃত এই অঞ্চলে পদব্রজে পরিদর্শন শুধু সময়াপহারী নয়, পরন্তু ক্লান্তিকর, তাই এখানে কয়েকটি ব্যাটারিতে চলা দুজনে বসবার মত ছোট রবারের চাকার গাড়ী রয়েছে। রাস্তা কংক্রীটের, কর্মকর্তা ও আমি দুজনে ঐরূপ একটি গাড়ীতে যেতে নানা স্তরের শোধন প্রণালী দেখতে ও আলোচনা করতে লাগলাম। তিনি চালক, আমি দর্শক, গাড়ী ক'রে জায়গাটা একপাক ঘুরে আসতে প্রায় আধঘণ্টা লাগলো। এরা ময়লা শোধনের অবশিষ্ট জলীয় অংশ সমুদ্রের ভেতর সুড়ঙ্গ কেটেও খানিকটা পাইপ বসিয়ে নিয়ে গেছে, উল্টো হাওয়া যখন বয় তখন উজানে ঐ ময়লা পরিশুদ্ধ জল তীরের দিকে আসে।

শনিবার সার্জে, ক্যাজ'ময়ার জ্যাককে বলেছিল আমায় 'মাউণ্ট উইলসন' দূরবীক্ষণাগার ঘুরিয়ে আনতে। আমাদের বাসার ঠিক পেছনেই পর্বত চূড়ায় মাউণ্ট উইলসন দূরবীক্ষণাগার, সহজ খাড়া পথে সেখানে যাওয়া যায়না। যেতে হয় ঘুরে পাহাড়ের পেছন দিয়ে—এই বীক্ষণাগারের খ্যাতি ও নির্মাণ কৌশল, বিশেষ করে এর একশো ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনের প্রয়োগ বিজ্ঞানের এক বিশেষ নৈপুণ্যের নিদর্শন, এখানে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বেশ কয়েকটি টেলিভিশন প্রেরণাগার আছে। এর উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সাত হাজার ফুটেরও বেশী। সমুদ্রের নিকট বলে শীত তেমন নেই, দার্জিলিং এত উঁচু নয়, তবু তুষারশীর্ষ হিমালয় নিকটে বলে শীত বেশ বেশী। পাহাড়ী পথে যাবার সময় দেখলাম মেট্রোপলিটন ওয়াটার ডিষ্ট্রিক্ট অব সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার একটী ছোট জল সংগ্রহাধার পাহাড়ী নদীতে আড় বাঁধ বেঁধে। পাহাড়ী নদীতে বৃষ্টির অনুপাতে হঠাৎ জল বাড়ে ও কমে, কখন আড়বাঁধের মাথা পর্য্যন্ত জল ওঠে। এদিকে জল নিত্য সরবরাহ পর্বও চলছে। তাই পাম্পের শোষণ নলটী জলের মধ্যে যাতে সব সময় ডুবে থাকে তারই জন্য নদীর ধারে জাহাজের জেটির মত ভাসা অংশটীর একদিক তীরের সঙ্গে সংলগ্ন ও অপর দিক জলের লেভেলের নামা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উচু নিচু হয়. তারই বন্দোবস্ত রয়েছে। এতে কোন সময়েই জল পাম্প করতে কোনই অসুবিধে হয় না।

নিয়ম মাফিক ডানদিক ঘেঁসে চলেছি, সেদিকটা আবার খাদের দিক; বাঁ দিকটা পাহাড়ের চড়াইএর দিক। পাহাড়ের আড়াল থেকে হঠাৎ একটা গাড়ী বেগে আমাদের গাড়ীতে ধাক্কা মারে আর কী! কোন গতিকে পাশ কাটিয়ে শৈল অঙ্গে এক সংঘাতিক সংঘর্ষ থেকে দৈবক্রমে রক্ষা পাই। জাঁদরেল চেহারার ক্যাজ ও তার সুন্দরী স্ত্রী ক্যাথি এই দারুণ বিপদ কাটিয়ে গাড়ী খানিকক্ষণ থামিয়ে হাঁপাতে লাগলো। এদিকে অন্য গাড়ীর বাসীরা মদের ঝোঁকে আরও বেগে চলে গেল, আমার নির্লিপ্ততা দেখে দুজনেই স্তম্ভিত।

ক্যাজ ক্যাথিকে উদ্দেশ করে বলল—দেখো, মিঃ চাটার্জ্জি একটুকুও আতঙ্কিত হননি।

—কি করবো বলো। নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি? নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে; অদৃষ্টে থাকলে এই বিদেশ বিভূঁয়ে প্রাণতো যেতেই পারতো; সবচেয়ে সংঘাতিক হত পঙ্গু হয়ে যদি পড়ে থাকতে হত। ঘাবড়াবার কিছুই নেই, আমি desireless সেবক—"কপালে যা লিখেছে কালী তাই যদি হবে।"

ক্যাজের স্ত্রী ক্যাথারিণের সঙ্গে ওদের কলকাতায়-বেঙ্গল ক্লাব থাকার সময় আগে থেকেই পরিচয়। বেঙ্গল ক্লাব ছেলে পিলে নিয়ে থাকতে দেয় না;—হয় একক, নয় যুগল, তদূর্দ্ধে নয়, ওরা নিঃসন্তান। বিয়ের অনেকদিন হয়েছে, কিছুই হ'ল না, ওদের মনে দুঃখ রয়ে গেছে। মনের মধ্যে অবসর সময়ে শূন্যতার কাঁদা নিজাই বেঁধে, শ্রীমতী ক্যাথি কলকাতায় কোন কাজ করত না, শুধু ক্লাবে মেশা ছাড়া, এখানে এখন সে ছোটদের স্কুলে শিক্ষকতা করে। রোগা ছিপছিপে গড়ন—এখনকার তরুণরা যাকে 'তন্বী' বলবে, শ্যামদেশের একটা ছোট্ট কুকুর কলকাতা থেকে লস এঞ্জেলিস নিয়ে যায়। ব্যাংককে যখন গিয়েছিল, সেখান থেকে এটা কিনে আনে। অতি মিষ্টি ফুট-ফুটে চেহারা, কথাবার্ত্তা অতি বিনীত ও নরম।

আমি ক্যাথিকে জিজ্ঞাসা করলাম—ছোট ছেলে-মেয়েরা

যখন গোলমাল করে তুমি তখন ওদের কেমন ক'রে শাসন কর? তোমার কথা ওরা শোনে?

—খুব শোনে, নিশ্চয় শোনে।—

—শোনাবার জন্যে তুমি কি কর? বেত মারো, না চেঁচিয়ে ওঠ; না বকো।

—ব্যবস্থারা অচল, চেঁচাবই বা কেন? শুধু চোখ পাকিয়ে তাকাই।

—হেসে ফেলো না তো?

—কক্ষনো না।

—আমি ভাবতেই পারিনা যে তুমি গম্ভীর হ'তে পার আর চোখ পাকিয়ে দুষ্টু ছেলে মেয়েদের শান্তও করতে পারো?

—দেখবে?

—দেখাও, তুমি কেমনটি কর।

—'এই দেখ', ব'লে চোখ পাকিয়ে হেসে ফেল্লো। তখন আমি বললাম—আমার দিকে চেয়ে চোখ না পাকিয়ে, ক্যাজের দিকে চেয়ে চোখ পাকাও, দেখি ক্যাজ ভয় পায় কিনা? তোমার তো মা'কে মাঝে এমনি করতে হয় যখন ক্যাজ তোমার আবদার শোনে না!

—আমি আব্দার করি নাকি?

—কক্ষোনো না; হুকুম, স্রেফ হুকুম।

ক্যাজ উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে ও বলে—কথাটা অনেকটা ঠিক। তাদের পরিবারের শূন্যতা ঘোচাতে একটি পোষ্য নেবার প্রস্তাব চল্ছে। তার জন্য দলিল দস্তাবেজের খসড়া এটর্নী করছে।

এমনি কথা বার্তার আমরা মাউন্ট উইলসন পাহাড়ে যাবার রাস্তায় মোড়ে এসে পড়লাম। দূর থেকে Mt Wilson বীক্ষণাগারের একটি আলোকচিত্রও নিলাম। মাউন্ট উইলসনের ফটকে গিয়ে দেখি বিজ্ঞপ্তি লটকানো—বীক্ষণাগারে বড় রকমের মেরামতি কাজ চলেছে; অতএব বর্তমানে প্রবেশ নিষেধ। তাই বিফল মনোরথ হ'য়ে বাইরে থেকে টুকিটাকি দেখে ফিরলাম।

ক্যাজ ফেরার পথে নানা জায়গা ঘুরিয়ে সুপার মার্কেটে তাদের মাল পত্র কিনে আমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল।

রবিবার রাসেল লর্ড উইংগের আমায় সহর ঘুরিয়ে আনার পালা। সকালেই প্রাতরাশ ছুটির দিন ব'লে বেশ বেলায় সেরে হান্টিংটন লাইব্রেরী ও আর্ট গ্যালারী ঘুরে আসব ঠিক করলাম। এটা আমার আস্তানার খুবই কাছে, আর দেখে আসব সম্ভব হলে Self Realisation Fellowship বা যোগদা-সংঘের (S. R. F.) এর ধর্ম কেন্দ্র ও ক্ষেত্র। এ জায়গাটার প্রতি আমাদের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। এইখানে মূল কেন্দ্র করে ধর্ম প্রচার করতেন পরমহংস শ্রী ১০৮ যোগানন্দজী। পূর্বাশ্রমের যোগানন্দজী তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর গিরি জীউ মহারাজকে মোটর বাইকের 'সাইড কারে' ক'রে আমাদের হাওড়ার বাসায় পৌঁছে দিয়ে যেতেন। আমাদের জ্ঞান হওয়ার সময় থেকে শ্রীমৎস্বামী যুক্তেশ্বর গিরি জীউ মহারাজকে দু এক মাস অন্তর শ্রীরামপুর থেকে হাওড়ায় আসতে দেখেছি। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্মীয় জ্ঞানের অপরূপ ব্যাখ্যা আমরা কিশোরকালে পড়ার ফাঁকি দিয়েও মোহ মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। তিনি ছিলেন পূর্বাশ্রমে আমার পিতামহের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু; আমরা ছিলাম তাঁর গুণ-মুগ্ধ শ্রোতা ও ভক্ত। পরণে গেরুয়া রঙে ছোপানো আলখাল্লা, মাথায় রবীন্দ্রনাথের মত চুল, মাথায় পাগড়ি বাঁধা হাতে লাঠি, চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, তিনি বলতেন কাপড় ময়লা যাতে না দেখায় তাই গেরুয়া রংয়ে ছোপানো; আর পাগড়ি হ'ল স্নানের সময় বিকল্প পরিধেয় বসনের জন্য, লাঠি শুধু শ্বাপদ তাড়ানো, মাটিতে ঠুকে আওয়াজ করে সাপখোপ তাড়ানোও এবং মাঝে মাঝে দেহের ভর দেওয়ার জন্য তো বটেই।

কিশোরকালে স্বামীজী মহারাজ এসে বল্লেন 'যোগানন্দ আমেরিকায় চলে গেছে' স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও আমেরিকায় পূর্ব উপকূলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন ও সনাতন ধর্ম প্রচার সুরু করেছেন, তিনি যুক্তেশ্বর মহারাজের কাছ থেকে ক্রিয়াযোগের নানা প্রক্রিয়া শিখে গেছেন। লস এনজেলিসের কেন্দ্র ছাড়াও আমেরিকার বহু অঞ্চলে এ প্রতিষ্ঠানের শাখা, বহু সাহেব-মেম শিষ্য-সেবক হয়েছেন, স্বামী যোগানন্দজীর হঠাৎ তিরোধানে সম্প্রদায়ের ভাবভীর অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, মহাবীর বিষ্ণুঘোষ (যোগানন্দজীর ভ্রাতা) তাহার দৈহিক ও যৌগিক ক্রিয়া দেখাতে দাদার। জীবদ্দশায় আমেরিকা গিয়েছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার

অবশেষে অক্লান্ত কর্মি মার্কিন মহিলা 'শ্রীশ্রীদয়ামাতা' নাম নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। ওখান থেকে EAST WEST ব'লে একটা ইংরিজীতে মাসিক পত্র প্রকাশিত হ'ত। এখানে আমার পিতার (নীরানন্দ চট্টোপাধ্যায়) সম্পাদনায় 'সাধু সংবাদ' প্রকাশিত হত। East-Westএ যোগানন্দজীর বহু প্রবন্ধ ও আধ্যাত্মিক বাতাবরণে রচিত কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। যোগানন্দজী মার্কিন মনস্তত্বটী বেশ ভাল করে বুঝেছিলেন।

যোগ সাধনা করলে মানুষ যে আরও অর্থবান হ'তে পারে এই ছিল তাঁর মূল বক্তব্য, বিশেষ ক'রে আমেরিকাবাসীর কাছে। যোগ সাধনার ফলে শরীর হবে সুস্থ, মন হবে প্রফুল্ল, মানসিক ও দৈহিক অবসাদ হবে দূর, স্বাস্থ্য থাকবে অটুট, কার্য্য ক্ষমতা বেড়ে যাবে, অধিক পরিশ্রমের ফলে অধিক অর্থপ্রাপ্তি, মেয়েদের যৌবন থাকবে দীর্ঘদিন অটুট। আমেরিকার ডলারের মানদণ্ডে সকল কৃতিত্ব পরিমিত হয়—তা সে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক হ'ক না কেন! একদিন আমার এক বন্ধু কাজ থেকে ফেরার পথে নানা জনপথের গ্রন্থি মোচন ক'রে আমার S. R, F, আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'দয়ামাতা' একটি বৈঠকে ব্যস্ত থাকায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। তিনি তাঁর কাছে আমার জন্য আমার বাসায় দুদিন টেলিফোন করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সুযোগ গ্রহণ করা সময়ের অভাবে আমার পক্ষেও সম্ভব হয় নি! শান্ত পরিবেশে পর্বত চূড়ায় শ্যামতৃণাকীর্ণ সুমিত বৃক্ষশোভিত আশ্রমে মনের ক্লান্তি দূর হয়। 'স্বাগত-আফিসে' গেরুয়াসিল্কের শাড়ী পড়া ফুটফুটে হাসি ঝরে-পরা মুখে সুন্দরীরা অভ্যাগতদের মধুর কণ্ঠে আপ্যায়ন করছেন। ঠোঁটে রং মাখিয়ে পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী নন এঁরা। সবাই মহৎ ব্যস্ত; এই সন্ন্যাসিনী জীবনে এঁরা কর্মত্যাগী সন্ন্যাসিনী নন্। কেউ চেকোস্লোভেকিয়ার মেয়ে, কেউ কেনেডিয়ান, কেউ ইতালিয়ান প্রভৃতি। জানি না এরা পবিত্র কুমারী জীবন কতদিন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতার হাওয়া নিত্য বয়ে চলেছে? তবে এই আশ্রমে ঐ গৈরিক বসনা শাড়ী পরিহিতা তরুণীরা কেউ অনুসূয়া, কেউ প্রিয়ংবদা, কেউ শকুন্তলা, কেউ দেবযানী নাম নিয়েছেন। বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে জানি না এঁরা কতদিন সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের সর্বহিতায় ও জনসেবায় নিবেদিতা ক'রে রাখবেন? যতদিন না দুষ্মন্তের মত প্রেমিক এসে এদের পাণিগ্রহণ করেন?

রাসেল বলল 'এখনও তো লাইব্রেরী খোলার দেরী আছে, চলো আমার বাবা-মাকে দেখে আসবে। আজকে Mothers' day। সে তার মাকে কলকাতা থেকে আনা একটা বেনারসী শাড়ি উপহার দেবে। হয়তো স্ত্রীর জন্য এনেছিলো, সে তো এখন বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা করছে। একদিন এটর্নী এসেছিল এ বিষয়ে আলোচনা করতে হার্ডের বাড়ীতে। আমি এ বিষয় থেকে একটু দূরে থাকতে চাই; কেন না নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির পালা ওরাই ঠিক করুক—আপোষে ব কোর্টে। ওরা তো আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেনি। অন্য যারা করতে এসেছিল তাদের প্রয়াসে আমি অনাগ্রহ প্রকাশ ক'রে প্রসঙ্গটীকে দীর্ঘায়িত করতে দিই নি।

বুড়োবুড়ি বাবা ও মা—মনের সুখে থাকে। দুজনেরই বয়স আশী পার। বুড়ীর গাল আমসীর মত শুকিয়ে গেছে, কপালে বলি পড়েছে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, রাসেলের বাবা আমার সঙ্গে ভারতের খাদ্য সমস্যা কমুনিষ্টদের উৎপাত সম্বন্ধে নানা আলোচনা করলেন। মায়ের জিজ্ঞাসা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রী হওয়া বিষয়ে। এতে মার্কিন মেয়ে মহলে বিরাট সাড়া প'ড়ে গেছে; ইন্দিরা বহিন সম্বন্ধে জানার তীব্র আগ্রহ ও আনন্দ বেশী। রাসেল মাকে দিল শাড়ীটা এই বিশেষ দিনে উপহার। মা শাড়ী নিয়ে কি করবেন জানেন না। তাই আমিই ভদ্রমহিলাকে শাড়ী পরার কায়দাটা কোমরে কশি গুঁজে দেখিয়ে দিলাম। বুড়ো বুড়ী দুজনেই হাসে। গিন্নী রান্নাবান্না করেন কর্তা খান। ছেলে বউয়েরা কাছে থাকেন না। এদেশে বৌএর সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ীর থাকার রীতি নেই। স্ত্রীর মার অধিকার বেশী পুরুষের মায়ের চেয়ে। এরা এখানে যাকে In-laws বলে।

হান্টিংটন লাইব্রেরী ও আর্ট গ্যালারী:

সামান্ত সময় ব'সে চা পানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রে হান্টিংটন লাইব্রেরীর দিকে চললাম। এটা সোমবার, ছুটীর দিন ও সারা অক্টোবর মাস ছাড়া বেলা একটা থেকে বেলা সাড়ে চারটা পর্যান্ত খোলা থাকে। এটাতে উষ্টন ষ্ট্রীট (Euston) ও অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট দিয়ে ঢোকা যায়। মুখ্য প্রবেশ পথ অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট দিয়ে। প্রায় দুশো একর জমীর উপর বিন্যস্ত এই প্রতিষ্ঠান। আমেরিকান অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্বের এক কৃতী মহান নেতা হান্টিংটন ছিলেন আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে অতলান্তিক উপকূল পর্য্যন্ত রেল লাইন বিস্তার করার একজন অগ্রদূত। ক্যালিফোর্ণিয়ার ইলেক্ট্রিক ট্রেণ চালু করা ও হ্যাম্পটন রোড় নৌ বন্দরের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা তাঁরই কৃতিত্ব। এমনও সময় ছিল যখন তিনি সাটটি নানারকম বোর্ডের ডিরেক্টর ছিলেন। এত কর্ম ব্যস্ত মানুষের মনে সংগ্রহের কথা এবং জনগণের কল্যাণের কথাও যে জাগ্রত ছিল তা বিস্ময়কর। তিনি বই কেনার জন্য ছ'বছরে তখনকার দিনে ষাট লক্ষ ডলার ব্যয় করেন। তিনি নিউইয়র্ক প্যারিসের আকর্ষণ ছিন্ন ক'রে জীবনের অপরাহ্নে এই স্যান ম্যারিনোর (San-Marino) হান্টিংটন প্রাসাদে বাস করেন। পরে এইখানে তাঁর বিখ্যাত লাইব্রেরী, আর্টগ্যালারী ও বোটানিক্যাল উদ্যান স্থাপিত হয়। এই লাইব্রেরী মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার জন্য 'আরাবেলা ডি হান্টিংটন মেমোরিয়াল হল' স্থাপন করেন। সেখানে ফ্রেঞ্চ চীনে মাটির বাসনের ঘর, ফ্রেঞ্চ ডেকোরেটিভ আর্ট ঘর (French Decorative Art Room) ও ফ্রেঞ্চ স্কালপচার ঘর (French Sculpture Room) ফ্রাঁসোয়া বাউচারের (Francois Boucher) অপূর্ব Tapestries দিয়ে মোড়া ফ্রেঞ্চ ডেকোরেটিভ আর্ট রুম।

আরাবেলা ডি হান্টিংটনের স্মৃতি স্থাপনের পৃথক ব্যবস্থা ছাড়া স্যান ম্যারিনোর প্রাসাদ ও প্রাঙ্গণে রয়েছে, ১। গ্রন্থাগার ২। আর্ট গ্যালারী ৩। বৃক্ষ বাটিকা (Botanical garden)।

গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য ক্যালিফোর্ণিয়ার জনগণের আনন্দ উপভোগ ও ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করা ঐ লাইব্রেরী ও আর্ট গ্যালারির পরিচালনার ভার একটি ছোট অছি সংসদের উপর দেওয়া। এই অছি সংস্থার প্রথম সদস্যরা হলেন—Mr. Wilson, বীক্ষণাগারের অধিকর্তা জর্জ এলারি হেল (Geore Elleri Hale) হাওয়ার্ড ই, হান্টিংটন (পুত্র) আর্থার এম্, হান্টিংটন (সম্পর্কে ভাই) উইলিয়াম ই, ডান ও জর্জ এস্ প্যাটন।

এই গ্রন্থাগারে আছে মধ্য যুগের হাতের লেখা পুঁথির সংগ্রহ। ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত পুঁথি-গুলি অতি যত্নের সঙ্গে সুরক্ষিত। সবচেয়ে প্রাচীন সংগ্রহ হ'ল রচেষ্টরের বিশপ 'গুণডুলফে'র সংগৃহীত ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক পাদরীর লেখা ল্যাটিন বাইবেল। চসারের Cantarbury Tales নানা চিত্র সম্বলিত ভেলামের (Vellum) ওপর লেখা। কবি চসারের চিত্রও এখানে অঙ্কিত আছে।

প্রাচীন মুদ্রণের নমুনাও এখানে দেখা যায়। প্রথম হ'ল মুদ্রণের জনক Johann Gutenberg of Mainz এর ভেলমে ছাপা বাইবেল। এর মুদ্রণকাল ১৪৫০-৫৫। যেহেতু ছাপা অতএব এর বহু খণ্ড থাকা সম্ভব। এ পর্য্যন্ত জানা গেছে তার ৪৭ খণ্ডের এক খণ্ড এবং ভেলমে ছাপা বারো খণ্ডের মধ্যে অন্যতম খণ্ডটি এই সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত। ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন করেন উইলিয়ম ক্যাকসটন্ (Caxton) তাঁরই ছাপা Recycle of the history of the Troye প্রথম ইংরেজীতে ছাপা বই এখানে রাখা আছে। এই স্থানেই Canterbury Talesও ছাপা হয়। বাইবেলের নানা সংস্করণ নানা সময়ে ছাপা পুস্তকও আছে। বাইবেল সংগ্রহের কাজে Lord Ellesmere চলন্ত গ্রন্থাগার যাতে ১৬০০—১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ এন্টিওয়াপে ছাপা ছোট ছোট বই ছিল সেগুলি সংগৃহীত হয়।

আর ইংরাজী সাহিত্যের সংগ্রহশালায় আছে শক্সপীয়রের 'Mr. William Shakespear's Comedies, History Tragedes এর First Folio ; আইজ্যাক ওয়াল্টনের Compleat Angeles (1653) মিল্টনের Paradise Lost (1667), জন বেনিয়নের Pilgrim's Progress (1678), William Blake এর Songs of Experience (1794) প্রভৃতি।

আর আমেরিকান সাহিত্যিকদের রচিত হাতের লেখা যেমন 'এডনার এলেন পোর কবিতা "Annabel Lie" বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের হাতে লেখা আত্মজীবনী, জর্জ ওয়াসিংটনের হাতে লেখা বংশ লতিকা। আব্রাহাম-লিংকনের হাতের লেখা চিঠি প্রভৃতি।

একটী ঘরে নানা আকৃতির ও আয়তনের বিশ্বগোলক সংগৃহীত। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ পর্যটক Jodocus Hondiusএর গোলক। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত Willem Jansoon Blacker's বৃহত্তম গোলক। তাছাড়া দেওয়ালে টাঙ্গানো কত বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, নেতা প্রভৃতির প্রাচীর চিত্র। আর্টের সংগ্রহশালার প্রবেশ দ্বারে জুনো ও পার্শিকোনের মূর্তি। পাশেই দেখা গেল আফ্রিকা থেকে আনা Birds Of Paradise এর ফুল, আমরা যাকে বলি 'পারিজাত'। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাকে 'পারিজাত' আখ্যা দিতেন। দেওয়ালে টাঙ্গানো 'বাউচারের তৈরী আর একটি Tapestise; এর রচনাকাল পলাশী যুদ্ধের তিন বছর আগে অর্থাৎ ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। এখানের বিখ্যাত সংগ্রহ হ'ল গিয়োভার্নি বেলোনার 'Nessvs and Deianira" এবং ক্রার্ডচিং ভিনাস্।

এখানে বিখ্যাত বৃটীশ শিল্পী স্যার জোশুয়া রেনল্ডের (১৭২৩-১৭৯২) 'Lady Harewood' টমাস গেন্সবারোর (১৭২৭-৮৮) Edward II, Viscount Ligonier ও Penelope, Viscountees Ligonier, স্যার হেনরী রেয়ার্ণের (১৭৫৬-১৮২৩), William Miller, Lord Glendu, হুডনের তৈরী 'ডায়েনার ব্রোঞ্জ মূর্তি।' দক্ষিণ পশ্চিমের কোণের ছোট ঘরটির দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে জন কনষ্টবলের ('John Constable') (১৭৭৬-১৮৩৭) সেলিসবেরী ক্যাথিড্রাল, J. M. W 'Turner (১৭৭৫-১৮৫১) ভেনিসের Grand canal প্রভৃতির বহু চিত্র। এখানে রয়েছে অতি সুন্দর ভাবে সাজানো মর্মর মূর্তি, ব্রোঞ্জ মূর্তি, বৃহৎ তৈল চিত্র, জল রংএর চিত্র। কোথাও রয়েছে রংএর তীব্রতা, কোথাও অতি হাল্‌কা রংএর ছোঁয়া। রেণল্ডস্ ও গেনসবারোর চিত্র সমালোচনার নিম্নোক্ত উক্তি সত্যিই প্রণিধান যোগ্য।

'Reynold does not compare with Gainsborough as a painter; that is to say he did not regard the painter's touch as something akin to a musicin's, with the function of emotional expression over and above the task of laying pignment, representing form, and producing colour, so Reynolds has no special magic of the brush, but he was far more vensed in the scienee of picture-making than Gainsborough or any Britist Portait Painter, and was by no means inferior to the other in sensitive and sympathetic charactor reading.

বৃক্ষ বাটিকা :—

শ্যামল দূর্বাদল শোভিত অঙ্গনে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বৃক্ষরাজি সুন্দরভাবে সাজানো। এখানে নানা রকমের পাম, গোলাপ, সাইকেড্‌স্, ক্যামেলিয়া, ওমেলিয়া সীমিবিড়িয়াম (Cymibidium) সুমিত ব্যবধানে বেড়ে উঠেছে। এবং মাঝে বৃহৎ একটা প্রাচীন পাঠের আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে আছে ইটালীর 'পাদুয়া' থেকে আনা প্রস্তর মূর্তি যা সপ্তদশ শতাব্দীতে খুঁদে তোলা হয়েছিল। ক্যামেলিয়ার কেদারিকা উদ্দিত শাখার শিখরে পুষ্প ও কোরক ঊর্দ্ধে তুলে রডোডেনড্রন তরুশ্রেণী। নানা রকমের রাস্না ও ফার্ণ। পথের ধারে ধারে বেগোনিয়া, প্রিমুলা, ব্রিভিয়ার কেদারিকা ঋতু অনুযায়ী প্রস্ফুটিত হয়ে বীথির শোভা বর্দ্ধন করে।

পশ্চিম উদ্যান ও ক্যামেলিয়া সংগ্রহ :—

এখানে মনোহর 'সেক্সপীয়র উদ্যান'। মাঝখানে বৃক্ষের মধ্যে পুষ্প কেদারিকা। পুষ্প কেদারিকা ঘিরে পাথরের নুড়িতে মোড়া পথ ও পরিধির আরও দূরে নানা রং বাহারে ফুলের বাসর। এই ফুল ও গাছগুলি হ'ল, যা সেক্সপীয়র তাঁর কবিতা ও নাটকে ব্যবহার করেছেন তার সকল সমাবেশ। লম্বা দেবদারু কুইন্স্ ল্যাণ্ডের কৌরী (Kauri) নানা রকমের তাল ও খেজুর শ্রেণীর বৃক্ষ।

এর পরই চলার পথে পড়ে 'জাপানী উদ্যান' উঁচু নীচু

ডিজনীল্যাণ্ডের চিত্র

অনেক আর্থিক ক্ষতি ও দূরাগত একজনের সঙ্গে তার দেখা হবার কথা। প্রথমে আমার পৌরুষে একটু আঘাত লেগেছিল, মেয়ে নিয়ে যাবে গাড়ী চালিয়ে আর নিষ্কর্মা আমি তার পাশে বসে। আমার প্রদর্শিকা হতে বাধা নেই কেননা ভারতেও মেয়েরা একাজে পা বাড়িয়েছেন। আমার বাসা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে এই ডিজনীল্যাণ্ড শিশুদের আজব দেশ, আমার এই কাজের দিনে কেন আমি শিশুদের আনন্দরাজ্যে চলেছি।

মনে মনে ভাবলাম ভারী আমার সরকারী কাজ! একদিনে কী যায় আসে! প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর মত ব্যস্ত মানুষ সারা ভারতের জটিল দায়িত্ব নিয়েও ডিজনীলাণ্ডে যখন আসতে পারেন আমি সেই অদ্ভুত অঞ্চলটা না দেখে কেন যাব? মনে মনে গোপন ইচ্ছে যে নেই তা নয়, আমাদের দেশের ছেলেদের বেশী ব্যাদড়া হতে না দিয়ে নানা জানবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুললে অনেক বালক সুলভ চপলতা ও দুষ্টমি কমতে পারে।

জমিতে বীথি পথ কোথাও সিঁড়ি দিয়ে রেলিং ধরে ওঠা কোথাও গড়েন কাঁকর মোড়া পথ ছোট রামধনুর মত সেতু, ছোট্ট একটি চালা, ছেলেদের খেলার সাজ সরঞ্জাম, জলাধারে লিলি, চীনদেশ থেকে আনা প্রায় বিশ রকমের Comelia Acticuleta, জাপান থেকে আনা বহু রকমের ক্যামেলিয়া Joponia, এখানে নানা রকমের সরল Elm প্রভৃতি সযত্নে সংগ্রহীত হয়েছে।

মরু উত্থান—

এখানে মরুদেশের প্রায় এগারশো রকমের বৃক্ষ-ও গুল্ম সংগ্রহীত হয়েছে। কত রকমের কাকটাস্ (Cactus) অর্থাৎ মনসাশ্রেণীর পত্রহীন গুল্ম। কেউ বা বড় কাটা-দেওয়া গোলাবের মত, কেউ লম্বা বেলুনের মত, কেউ ত্রিশিরা, কেউ অতিলম্বা, কেউ অতি ছোট ছেতরালো, কারো ডগায় ফুল ফুটেছে। এতে জল দিতে হয়না; গায়ে কাঁটা জীবজন্তুতে এগুলো কাঁটার ভয়ে খায় না।

ডিজনীল্যাণ্ড :

বুধবার কর্মসূচী অনুযায়ী শ্রীমতী লাডউইগ হবেন আমার সাথী, তিনি গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাবেন। এদিন আফিস খোলা, হার্ডের আমার সঙ্গে গেলে ওর নাকি

এই চল্লিশ মাইল যেতে প্রায় একঘণ্টা লাগবে, আমরা আফিসের টাইমে বেরিয়েছি, সবাই ষাট সত্তর-আশী মাইল বেগে গাড়ী চালিয়ে চলেছেন। ধীরে গেলে শাস্তি হ'তে পারে, পুলিশে টিকিট দেবে এবং কোর্টে গিয়ে কিছু না কিছু জরিমানা দিতে হবে। তর্ক তুললে জরিমানা বেড়েই যাবে। গাড়ী চালানোর ব্যাপারে যদি বছরে অন্ততঃ তিনবার ত্রুটি দেখা যায় তবে অন্ততঃ সেই বছরের জন্য গাড়ী চালাবার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যবে। অর্থাৎ চলা ফেরার জন্য হয় ড্রাইভার নিয়োগ করতে হবে, নয় ট্যাক্সি করে চলা ফেরা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, দুইই বিশেষ ব্যয় সাধ্য ব্যবস্থা।

আমরা বিরাট প্রাঙ্গণে এলাম যেখানে গাড়ী রাখতে হবে। অদ্ভুত প্রতিভাশালী এই Walt Disney যিনি পর পর বহু ছবি এঁকে ও সেগুলি তুলে মিকি মাউসের

বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন, ছেলেদের আনন্দ দেবার জন্য তিনি Disney land তৈরী করেন। এতবড় শিশু-প্রেমিক সারা বিশ্বে নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। Disney Land কে ছোটদের যাদু রাজ্য বলা হয়।

বিনামূল্যে ডিজনীল্যাণ্ডে কোন ব্যবস্থাই নেই, আমরা দুই তরুণ-তরুণী টিকিট কেটে ঢুকলাম। শ্রীমতী হার্ডে টিকিট কাটতে যাচ্ছিলেন। তখন আমি বললাম—তোমরা তোমাদের বাড়ীতে আমায় কর্তা করেছ, অতএব আমার কথা তোমাদের শুনতে হবে। এখন বলছি তোমার গর্ব থলিতে তোমার ডলার বিল পোরো। এই নাও টিকিট কাটার ডলার।

—তথাস্তু—

টিকিট পাচ শ্রেণীর A, B, C, D, ও E, যার মূল্য যথাক্রমে ১০ সেণ্ট, ২৫ সেণ্ট, ৩৫ সেণ্ট, ৪৫ সেণ্ট ও ৫০ সেণ্ট। ১০টা টিকিটের বইএর দাম ৩ ডলার আর পনেরটি টিকিটের বই এর দাম ৪ ডলার। ৩ ডলারের টিকিটের ১টা A, ১টা B, ২টা C, ৩টা D ও ৩টা E। আর ৪ ডলারের টিকিটে ১টা A, ২টা B, ৩টা C, ৪টা D ও ৫টা E।

সারা ডিজনীল্যাণ্ডে ৫টা ভাগ করা হয়েছে। আগামী কালের রাজ্য (Tomorrow Land), আজব রাজ্য (Forntasy land), সীমান্ত দেশ (Frontier Land), দুঃসাহসিক রাজ্য (Adventure land), ও আমেরিকায় মূলপথ।

A-শ্রেণীভুক্ত টিকিটে আট রকম দ্রষ্টব্যস্থান আছে, কেউ বা মুখ্য রাজপথে যেমন প্রাচীন ঘোড়ায় টানা গাড়ী চড়া, প্রাচীন মোটর চড়া, আজব রাজের ঘুমন্ত রূপ প্রভৃতি, তেমনি B শ্রেণীর টীকিটে রয়েছে মোটর বোট চড়া, সার্কাস ট্রেণ (আজব দেশ) প্রভৃতি। C শ্রেণীর টিকিট রেড ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধতরী (দুঃসাহসকি রাজ্য) চন্দ্রলোকে রকেট ক্ষেপণ, সুইস পরিবারের বৃক্ষগৃহ (দুঃসাহসিক রাজ্য) তেমনি D শ্রেণীতে Mark Twain এর বিরাট জাহাজ, সেই বিরাট জাহাজে চ'ড়ে অল্প সময়ের মধ্যে নানা জায়গায় ঘুরে এলাম, পীটার প্যানের চন্দ্রোদ্ভাসিত লণ্ডনে ও 'Never —Never—রাজ্যে ওড়া প্রভৃতি। E শ্রেণীতে বহু মজার ব্যাপার: ডুবো জাহাজে করে সমুদ্র গভীরের রহস্য উদ্‌ঘাটন ও flying saucers, (আগামী কালের রাজ্য) যেটী অতি চাপে হাওয়ার জোরে সামান্য উচুতে ভেসে ভেসে যাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নৌবিহার যেখানে গঙ্গা, ইরাবতী, আমাজন, মিসিসিপির জঙ্গল ও সেখানের বন্য জন্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। জলের ভিতর থেকে জল হস্তী বিরাট হাঁ করে গিলিতে আসছে, হাতীরা শুঁড় নাড়িয়ে জল ছড়াচ্ছে, বাঘে তাড়া করায় লোক গাছে উঠ্‌তে ব্যস্ত, কালো ভালুক আছে দাঁড়িয়ে, গরিলা গাছের ডালে ব'সে দাঁত খিচোচ্ছে। মনোরেলে চড়ে আমরা দুজনে ঘুরে এলাম। মাঝপথে এক ষ্টেশনে নামবার ব্যবস্থা আছে, টিকিট নিয়ে গাড়ী চড়্‌ত দিয়েছে—Break Journey এর জন্য কাচের শিশি থেকে একফোটা ওষুধ হাতে লাগিয়ে দেয়, গাড়ীতে ফের চড়ার সময় আলোর তলায় হাত ধরলে দেখা যাবে ছোট দাগের অদৃশ্যচিহ্ন। অতএব বিনা পয়সায় বাকী পথটুকু যেতে দেবে।

পথে Micky mouse দাঁড়িয়ে। ছেলেরা Mickey mouse এর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাচ্ছে, বাপ মায়েরাও micky mouse এর সঙ্গে কাঁধে হাতদিয়ে ছবি তুলেনিচ্ছে, জীবজন্তু সবই প্লাস্টিকের; যন্ত্রেই নড়া চড়া ও গর্জন-আওয়াজ হচ্ছে, ডিজনিল্যাণ্ডের, পরিধি বাড়াবার জন্য চেষ্টা চলছে। নতুন পরিকল্পনা এতে ঢোকাবার নানা উদ্ভাবন পর্যন্ত চলেছে, কয়েক জায়গায় নির্মাণ পর্বও চলছে নতুন সন্নিবেশের জন্য। রোজ এখানে কনসার্ট বাজে।

পাচশো বিঘে বিস্তৃত ডিজনিল্যাণ্ড শীত ও বসন্ত ঋতুতে বুধ থেকে রবিবার পর্যন্ত বেলা ১০টা থেকে বৈকাল ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ৩০শে মার্চ থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিনই খোলা থাকে। উদ্বোধনী ভাষণে ওয়াল্ট ডিজনী বলেছিলেন, "Disney land will never be completed as long as there is imaginatoin ieft in the world.

এখানে বহু আহারের রেঁস্তোরা, মণিহারী দোকান, বই, খেলনা প্রভৃতি বিক্রী হয়। এখানে প্লাষ্টিকে তৈরী Monsanto-Home of the Future-এর পূর্ণ মডেলটি হল যোগচিহ্নের মত, এমনি ঘর কেউ ঐ কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে পারেন। Disneyland দেখে মনের

তৃপ্তি ও বয়সের হ্রাস অনুভূত হয়, বিশেষ করে শিশু ও শিশুদের প্রিয় জিনিষের পরিবেশে।

পেলামোর ও মাউন্ট উইলসন বীক্ষণাগার :

পেলোমোর বীক্ষণাগারে যাবার ব্যবস্থা করেছিল জো কিনি। সব সময়ই বলে চলেছে Ok. তাঁর ও আমার ইচ্ছানুযায়ী হার্ভের সঙ্গে আজ সকালে আফিসে এলাম। যিনি আমাকে নিয়ে যাবেন, তিনি এখানের ইঞ্জিনিয়ার—'এরণমেরণ' আফিসে হাজির। নটায় একটা টেলিফোন কল্' আসবে ক্যালটেক (অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়া টেকনিক্যাল ইন্‌সটিটিউসন) থেকে সেখানে অধ্যাপক কণ্টির সঙ্গে দেখা করতে হবে। 'কল' না আসায় আমরাই বেরিয়ে সাড়ে নটা নাগাদ 'ক্যালটেকে' পৌছলাম। বর্তমানে এখানের অধ্যাপকেরা রাশিয়ায় এক সম্মেলনে গেছেন। ইনি যদিও ফলিত পদার্থবিদ্যার বিশেষজ্ঞ নন তবে তিনি কাজ করেছেন তারকার গঠন নিয়ে, কি কি উপাদানে বিভিন্ন তারকা তৈরী? দেখা গেছে প্রায় সমস্ত তারকাই একই উপাদানে তৈরী। তবে শতকরা পাঁচভাগ তারকাতে উপাদানের কিছু তারতম্য দেখা যায়। কোথাও ক্যালসিয়াম কিছু কম, কোথাও সোডিয়াম, হিলিয়াম ইত্যাদি। তার সম্পূর্ণ কারণ আজও ধরা পড়েনি। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম রেডিও একটিভ উপাদান তারার মধ্যে পাওয়া গেছে কি?

—ভারী ইউরেনিয়াম অণু পাওয়া যায়নি তবে 'টেকনিসিয়াম' যার রেডিও একটীভ স্বয়ংক্রিয়তা আছে তেমন অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

—কে দিয়েছে এই অণুর নাম, টেকনিসিয়াম?

—ঠিক বলতে পারি না। তবে মনে হয় সম্ভবতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোন অধ্যাপক হবেন।

'পেলামোর বীক্ষণাগার' :

এখানে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের বীক্ষণ যন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা হয়। নিউ ইয়র্কের Corning কাচ কারখানায় ঐটীর আয়নার কাচ ঢালা হয়। ১৯.৭৫ টন কাচকে উপযুক্ত মাপে ঘ'সে আনতে ১৪.৫ টন ঘসার মসলা ব্যবহার ক'রে ১৪.৪ টনে নামানো হয়। ঠিক পরবলীয় (Parabolic) আকৃতিতে এনে এর নির্ভুলতা দাঁড়িয়েছে ২০ লক্ষের এক ভাগ। এটী বিরাট এক ইস্পাতের কাঠামোর ওপর বসানো। গবেষক-বা কোন পর্যবেক্ষককে দু' ফুট ব্যাসের এক চোঙায় ব'সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। সেই বসার আসনটী যন্ত্রের সাহায্যে যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা যায়। বীক্ষণ যন্ত্রটী ১৩৭ ফুট উঁচু ও অনুরূপ ব্যাসের গম্বুজের মধ্যে স্থাপিত। গম্বুজটীর ইস্পাতের ও ভিত্তির কাজের শেষ হয় ১৯৩৮ সালে। দর্পণটি প্রায় মোটামুটি ঘসা পর্ব শেষ হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। যুদ্ধের জন্য এই সব কাজ সাময়িক স্থগিতও থাকে। ১৯৪৭ সালে মহাযুদ্ধ বিরতির পর প্যাসডিনা (লসএঞ্জেলিস্) থেকে ১৩০ মাইল দীর্ঘ পথ প্যালামোর পর্বত চূড়ায় সম্পূর্ণ পালিশ-করা নভোবীক্ষণের দর্পণটি আনা হয়। এরপর চলল নানা জটীল যন্ত্রপাতির যথাস্থানে সন্নিবেশ ও সংযোগ। উঁচুতে ওঠার জন্য লিফ্‌টের ব্যবস্থাও আছে। এর মোট ওজন প্রায় ৫০০ টন। ১৯৪৮ সালে ৩রা জুন ঐটী বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ হেলের নামে 'হেল টেলিস্কোপ' নামে উৎসর্গিত হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬শে জানুয়ারি এটীর প্রথম আলোকচিত্র নেওয়া সুরু হয়। এটীর আলোক চিত্র গ্রহণ ক্ষমতা খালি চোখের চেয়ে ৩৬০,০০০ গুণ অধিক। ১৯৫৭ সালে প্যালোমোর পাহাড় থেকে যে আকাশ দেখা যায় তারই চারের তিন ভাগ নভো আলোকচিত্র তোলা হয়েছে। এতে ৩০০,০০০,০০০ আলোকবর্ষের দূরত্বের আলোর ছবিও আছে। [আলোক বর্ষ—একবর্ষে আলোক যতদূর যেতে পারে, ততদূর সেকেণ্ডে আলোর গতি ১৮৬,৩২৬ মাইল।

মাউণ্ট উইলসন বীক্ষণাগার :

মাউণ্ট উইলসন বীক্ষণাগারে দুটী বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে। একটী ১০০" ব্যাসের হুকার নভোবীক্ষণযন্ত্র অপরটী ৬০ ইঞ্চি ব্যাসের প্রতিফলন নভোবীক্ষণযন্ত্র। ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের নভোবীক্ষণের সাহায্যে খালি চোখের ৯০,০০০ গুণ বেশী দেখা যায়। ফটোগ্রাফের সাহায্যে এতে ১,০০০,০০০,০০০ তারার ছবি নেওয়া সম্ভব। এটী মুখ্যতঃ সৌর বীক্ষণাগার হিসেবে স্থাপিত হয় পরে নক্ষত্র জগতের গোপন রহস্য ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হ'তে থাকে। ওয়াশিংটনের কার্ণেগী ইনষ্টিটিউটের আনুকূল্যে

জর্জ এলরী হেলের অধ্যক্ষতায় ৬০ ফুট ও ১৫০ ফুট দীর্ঘ দূরবীক্ষণ তৈরি হয়। পরে ৬০ ইঞ্চি ব্যাসের প্রতিফলন নভোবীক্ষণ ও জন, ডি, হুকারের অর্থ সাহায্যে ৪৫,০০০ ডলার ব্যয়ে ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের প্রতিফলন নভোবীক্ষণ যন্ত্রটী নির্মিত হয়। ৬০০০০০০ ডলার ব্যয়ে ১৯১৭ সালে গম্বুজ নির্মাণ ও দূরবীক্ষণ স্থাপিত সম্পূর্ণ হয়।

১৯৪৮ সাল থেকে প্যালোমার মাউন্ট উইলসন বীক্ষণাগারের পরিচালনভার ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজির (Caltech) উপর ন্যস্ত আছে।

এখানে গ্রিফিৎ (Griffith) বীক্ষণাগার ও গ্রহাগার (নক্ষত্র মণ্ডল) এক বিশেষ দর্শনীয় স্থান। প্লাষ্টিকের তৈরী চাঁদের মডেলে ক্রেটারগুলো বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। সূর্য্যের দেহ থেকে উদ্ভূত শিখা অতি সুন্দর দেখা যায়। বিরাট গম্বুজের মত হলঘরে তারা ও গ্রহের প্রকৃত সন্নিবেশে কাল্পনিক রাতের আকাশে তারা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। জ্যোতিষবিদ্যার জটিল তত্ত্বগুলি এই গ্রহাগারের মাধ্যমে অতি সহজ বোঝা যায়, যা জ্যোতিষের বই পড়ে অনুধাবন করা সুকঠিন।

এখানে Marine Land বা জল নৌশালাটি অত্যন্ত মনোরম ও পৃথিবীর বৃহত্তম মীনাগার ব'লে এর খ্যাতি। শিক্ষা প্রাপ্ত তিমি, শীল ও ভোঁদড়রা নানা রকম ক্রিয়া-কলাপ দর্শকদের অবাক করতে দেখায়। মানুষ হলে হাত বাড়িয়ে সেলাম ঠুকে পয়সা চাইতো।

এখানের Labreatarpit দেখার আমার বাসনা ছিল। তাই বিদায়ের দিনে যাবার সময়ে ঐ আলকা-তরার হ্রদ দেখে এলাম। প্রাচীনকালে ঐ আলকাতরার হ্রদের উপর বৃষ্টি হওয়ায় জল মনে ক'রে অন্য জন্তুরা এসে ঐ আলকাতারার পাঁকে সমাধি লাভ ক'রেছিল। হিতোপদেশের গল্পে শেয়াল হাতীকে মহাপাঁকে ফেলে-ছিল তেমনি বন্যজন্তু এখানে আলকাতরায় এঁটে যাওয়ায় তাকে সাহায্য করা অথবা খাবার জন্য আরও বড় জন্তু আসে ও তাদের ঐ আলকাতরায় চির সমাপ্তি ঘটে। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন জীবজন্তুর হদিস্ পাওয়া গেছে তাদের আলকাতরার প্রলেপে সংরক্ষিত বৃহৎ অস্থি আবিষ্কারে। এখানেই Pleistocene or Glacial যুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। এটি Fairfax এভিন্যুএর কাছে wilshire বোভার্ডে উপর এক পার্কের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। এখানে যেমন 'বেসবল' খেলায় ডজারস্ ও 'এনজেলসেদের' খ্যাতি তেমনি আট হপ্তা ব্যাপী জুলাই থেকে আগষ্ট পর্য্যন্ত মুক্ত অঙ্গনে (হলিউড বোলের) ('Hollywood Bowl, এমফি থিয়েটারে' Symphanies under the stores অপূর্ব ঐক্যতান বাদনের খ্যাতি, এরা মনে করে এটা (The world's greatest music in the world's most beautiful amphi Theatre.

নববর্ষের দিনে সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হ'ল, গোলাপের মহোৎসব। লক্ষলক্ষ গোলাপ ও নানা পুষ্পে শোভিত নানা শকট, রথ, নৌকা ও আরও কতো কি সজ্জায় প্যাসাডিনায় কলরেডো বোভার্ড থেকে সুরু করে চলে যায় গোলাপ বোল (Bowl) খেলার স্থানে। একে বলে 'Tournament of the Roses'। এটা দেখা সম্ভব হয়নি কিন্তু শ্রীমতী হার্ভের মুখে এর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসার কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়েছি।

'জো কিনি' নেমন্তন্ন করেছিল রবিবার। রাসেল ও আমি হান্টিংটন লাইব্রেরী ঘুরে ওদের বাড়ী গেলাম, যেতেই ছেলেমেয়েরা একটা করে চুমু দিল ও নিল।

জো বলে—তুমি রাঁধতে পারো ?

—নিশ্চয় : ভারতীয়, না এখানের রান্না ?

জো কিনির বৃহৎ সংসার। সারি সারি ছেলে মেয়ে, তারা মাকে সাহায্য করে, কেউ স্যালাড্ কুচিয়ে দিচ্ছে, আলু ছাড়িয়ে দিচ্ছে, লেটুস গাজর ধুয়ে দিচ্ছে, অর্থাৎ মায়ের হাত সুরকুৎ। গনগনে আঁচে জো আর আমি সেঁকতে লাগলাম মুরগীর ঠ্যাং অর্থাৎ মুরগীর রোষ্ট করতে হবে। আগুনের তাপকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য মাঝে মাঝে জলের ছিটে দিয়ে খানিকটা তাপ নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে, প্রায় সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ওদের বাড়ীতে থেকে রাসেল ও আমি চলে আসি নিজেদের আস্তানায়।

একদিন আমার ওদের সকলকে নেমন্তন্ন করতে হলো, প্রায় জনা আটেক। আমরা চললাম লস এনজেলিসের বিমান বন্দরে। সেখানে শ' আড়াই ফুট উচু বাড়ীর চূড়ার উপর বাইরের দিকে হেলোনো বিরাট গোল কাচের ঘরে আহারের ব্যবস্থা। যার যেমন খুসী সে তেমন মদ নিলে, এটা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। তাই এখানে পাওয়া যায়

নানা দেশের খাদ্য—শুধু নামে, স্বাদে নয়। স্বাদ নেই এখানে কম্ নুন ও মশলা দিয়ে রান্না চলে। কেন শুধু ওদের প্রীতির দান গ্রহণ করব, প্রতিদান সম্ভব মত না দিয়ে? তাই এ ব্যবস্থা নিমন্ত্রণের।

আমায় যে টিকিট বিমান কোম্পানি দিয়েছিল তার সম্পূর্ণ বদল করতে হ'ল, নতুন সংশোধিত কর্মসূচী অনুযায়ী, সিডনীতে তো ম্যাক্সিকো যাবার অনুমতি ভারত সরকারের কাছ থেকে নিয়ে ছিলাম। এখন প্রয়োজন মেক্সিকো সরকারের কাছ থেকে প্রবেশের অনুমতি। ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের 'ট্রাভেল এজেন্ট'কে মেক্সিকোর ভিসা করিয়ে আনতে বলা হয়েছিল। সে বিফল মনোরথ হয়ে এসে বলল,—এর জন্য পয়সা লাগবে ও আমাকে এক হাজার ডলারের জামিন দিতে হবে। হার্ভে বলল, আমি জামিন দাঁড়াবো। কিন্তু দশ-না পনেরো ডলার ভিসার মূল্য লাগবে যে।

আমি এজেন্টকে বললাম, 'চলো আমরা দুজনে ওখানে যাই।' গেলাম মেক্সিকোর বাণিজ্য দূতের অফিসে। দেখালাম WHO fellowship এর কাগজ পত্র। এটা বিশ্ব-সরকারের ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ ভারত সরকারের একটু উচুতে। কন্সালেটের মহিলা বললেন 'আপনার এই ফেলোশিপের চিঠি পত্র দিয়ে যান।'

—সেটা সম্ভব না বরং একটা কাজ করুন। আপনি আসলটি দেখুন এবং ভিসাতে ছাপ মারার ক্রিয়া-কলাপ করুন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি এর একটা ফটোষ্ট্যাট (photostat) কপি পাঠিয়ে দোবো, তার হাতেই যেন পাশপোর্টটা দিয়ে দেন।

—ঠিক আছে, তা হলেও চলবে। আপনার পয়সাও কিছু লাগবে না।

এমনি করে মেক্সিকোর ভিসা নিতে হল। এখানে যেমন আমাদের পরিচিত এত লোক অন্য জায়গায় তো তেমন নেই। মেক্সিকোর 'মায়া সভ্যতা' দেখতে আমায় সপ্তাহখানেক সানফ্রানসিস্কোও এক সপ্তাহ নিউ অর্লিন্স থাকার পরই সাঁ হোয়ানের পথে ঘুরে যেতে হবে। তাই আমার ভিসা করার এত তাড়া। পরে সময় ও সুযোগ পাওয়া সংশয়াকীর্ণ। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে যা সহজ হয়, তা' পত্রস্মৈণদীতে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব, নয় এদেশে কি বিদেশেও।

[ক্রমশঃ]

কার্ত্তিকের কুয়াশা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

বৎসলা প্রকৃতি-মাতা স্নেহাতুর চিতে
কুয়াশার কম্বলের স্নিগ্ধ আবরণে
সর্ব্ব প্রান্ত আচ্ছাদিয়া অতি সন্তর্পণে
ব'সে থাকে। ঘরে আলো নিরালা নিভৃতে
উবশীর চন্দ্রিকার স্মিত হাসিটিতে;
ঝলকিত হ'তে থাকে তন্দ্রাতুর বনে।
শিশিরাদ্র' প্রভাতের পত্রের স্পন্দনে
স্বপ্ন রেণু ঝ'রে পড়ে প্রাণে সচকিতে।
হেমন্তের হিমে-ভরা শান্ত চারিধার।
প্রকৃতি মাতার মূর্ত্তি সুমন্তের পাশে
সমাহিত। শাখী—পাখী—পতঙ্গ সবার
স্বপ্ন-তন্দ্রা ধীরে ধীরে ফিকে হ'য়ে আসে।
প্রয়োজন নাই আর মাতৃ-প্রহরার।
কুয়াশা-কম্বল সরে। বিশ্ব জেগে হাসে।

বেকার
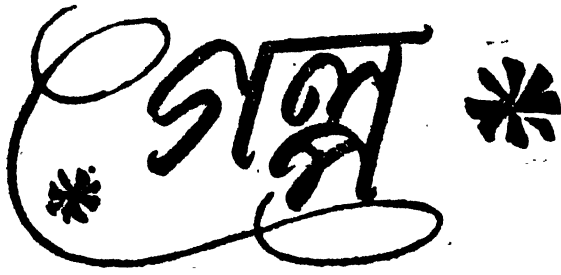
জয়শ্রী চক্রবর্ত্তী

বেরিয়েল গ্রাউণ্ডের শেষ কোণায় করবী গাছের নীচে খানিকটা রোদ পড়েছিল। খানিকটা গাছের শীতল ছায়া পড়েও—আলো আঁধারির রহস্য কৌতুকে ভরেছিল।

সেখানে বসেছিল মাণিক। হাতে ধরা চিনে বাদামের ঠোঙা থেকে একটা একটা করে বাদাম নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে—মুখের ভেতর ছুঁড়ে দিচ্ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল—ও একটা ক্ষুধা তৃপ্তির খেয়ালে মেতে উঠেছে। ওর নীরক্ত পুরু ঠোঁট দুটো নড়ছিল—মাথাটা আনন্দ চঞ্চল শিশুর মত দুলছিল।

কখনো ও' তাকাচ্ছিল—মধ্যাহ্নের আকাশের দিকে। দূরের পাখীগুলো দিগন্তরেখে লুকিয়ে পড়ছিল। ডানা নাড়তে নাড়তে রোদ ঝলমলে, মেঘের মধ্যে দিয়ে ডুবে যাচ্ছিল।

ভারি মজা লাগছিল মাণিকের। তপ্ত ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ওপরের অদৃশ্য জগৎটার দিকে তার সহসা রহস্য কৌতুকোচ্ছল মনটাও যেন চুপি চুপি খেলছিল। চোখে, রোদের তাপটা আঘাত দেবার চেষ্টা করলেই—বেচারা মুখ নামিয়ে নিচ্ছিল তখন করবী গাছের—শান্ত শীতল ছায়ার দিকে।

ওর মনে হচ্ছিল, বোধ হয় খুব ইচ্ছে করছিল, বেরিয়েল গ্রাউণ্ডের কচি নধর ঘাস গুলোর ওপর শুয়ে পড়তে জীবনের সংগে সমস্ত বোঝাপড়া করে যারা এই কবরের নীচে কফিনের মধ্যে চির নিদ্রিত—নিশ্চয়ই তারা খুব আরাম এবং অপূর্ব একটা শান্তি পাচ্ছে।

মাণিকেরও, ইচ্ছে করছিল অমনিকরে নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমুতে। ওপরে, নীল পরীর ডানা রঙের মত আকাশ, ধূ-ধূ-করা তার সীমান্ত হল রাজ্য, নীচে সবুজের গাঢ় নিস্তব্ধ একটি অন্ধকার ঘনিয়ে এসে—একটা রূপকথার গল্পের ছবি হয়ে উঠেছে। যদি একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া থাকতো সেদিনের রাজকুমারের মত একটি দুঃসাহসিক বাসনা থাকতো, তাহলে, তাহলে মাণিকও এই অবাস্তব জগতে দিক্‌শূন্য পাড়ি জমাতো।

ভাবতে ভাবতে—এই বিশ শতকের অতি পরিচিত ক্ষুধা এবং জীবন স্বপ্নের রোগে ভোগা একটি ইয়ং-এর অতি বিশীর্ণ দেহটি ঘাস বাগানে নরম শয্যায় লুটিয়ে পড়তে থাকলো। ছোট বেলার সেই দুষ্টু খোকার, অঘুমের চোখ দুটিতে—যে নিস্তব্ধ কোলাহলহীন স্বপ্ন নামিয়ে আনতো—সেই চতুর ঘুমের মাসী করবী গাছের আগ ডালের পাশ থেকে মাঝে মাঝে উঁকি দিতে লাগলো কাজেই মাণিক আর বসে থাকতে পারলনা। লম্বা টান হয়ে শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে সে অনুভব করলো সত্যি সে বড় ক্লান্ত। খুব শ্রান্ত হয়ে পড়েছে—একদা সেই জীবন স্বপ্নের সতেজ গ্রন্থিগুলো।

এতক্ষণ পর, রূঢ় বাস্তবটা ওর—চোখের ওপর দিয়ে ছায়াছবির মত ঘুরতে লাগলো। স্নান হয়নি মাণিকের, এই বেলা শেষেও। জঠরের শূন্যতায় যে নিদারুণ অস্বস্তি হচ্ছিল, বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে, সেই ক্ষুধা তৃপ্তির বিচিত্র খেলায় ওদিকটা নরম শান্ত হয়েছে। আনা দুয়েক পয়সার বাদাম—ঘণ্টা দুয়েক ধরে একটা একটা করে চিবিয়ে—মাণিক যেন, ক্ষুধার জগতে নতুন একটা কিছু আবিষ্কার করেছিল।

সেই ভোর বেলায় বেড়িয়েছিল মাণিক নানান জায়গায় ঘুরেছিল।...জীবন স্বপ্নের অত্যাশ্চর্য একটি দুর্লভ শব্দ চাকরী—বসন্ত কোকিলের মিঠে গানের মত—কানের কাছে বার বার বাজছিল।

প্রথম গিয়েছিল যে, ডাল হৌসি অঞ্চলের কোন একটা বড় অফিসের ম্যানেজার বাবুর কাছে। ভদ্র মহোদয়ের ঘুম থেকে ওঠার অনেক আগে থেকেই সাক্ষাৎ প্রার্থীদের লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে হয়। প্রায় ঘণ্টা দুই আড়াই কেটে গেলে, ম্যানেজার বাবুর খোস মেজাজি

বিহারী দারোয়ানটি এসে অতিরুক্ষ কণ্ঠে কিংবা জলদ গম্ভীর গলায় বলবে—"হুজুর, আভি নেই ভেট করেগা, ফিন্ রোস্ যা দিন কা—আইয়ে গা।'

'বহুৎ আচ্ছা!' বিমর্ষ সব সাক্ষাৎ প্রার্থীদের মধ্যে চাপা আর্তনাদ ভরে ওঠে। তবু, নানা স্বার্থের জন্য তাদের আসতে হবে—ম্যানেজার বাবুর দরবারে, হুজুরের এই মর্জি ও তাদের শূন্য বেদনার মত একটা চাপা কষ্টও, বুকে বিঁধে রাখতে হবে।

মাণিকও সেই ভাবে আর একবার গিয়েছিল, অমনি ঘণ্টা দুই—অপেক্ষা করে ম্যানেজার বাবুর দর্শন পায়।

"স্যার, এই যে আমার সার্টিফিকেটগুলো - মানে ইয়ে...আমি, আমি একটা কাজ না পেলে,—ইয়ে... বোঝেন তো স্যার এই বাজারে..." বলতে বলতে মাণিকের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রায় অনেকদিন ধরে—দারিদ্র্য ও নানা ধরণের যন্ত্রণার কথাগুলো একটা গল্পের মত সাজিয়ে মুখস্থ করেও সব নষ্ট হয়ে গেল। সেই দারিদ্র্য ও বেদনার সুন্দর প্লটটা—নতুন ও সেই প্রথম গল্পকারের চিন্তা রাজ্য থেকে কি ভাবে যে হারিয়ে গেল, মাণিক যেন তখন দিশা পাচ্ছিল না।

শেষে, 'ও' অবরুদ্ধ কণ্ঠে—জলছবির মত দুটি চোখ তুলে, শুধু চেয়েছিল। একটা অসম্ভব কামনা—বুকের ভেতর গুমরে গুমরে উঠছিল।

কতকগুলো সার্টিফিকেট না মাণিক জোগাড় করেছিল গ্র্যাজুয়েট হবার সবচেয়ে গৌরবজনক—সার্টিফিকেট ছাড়াও—আরো অনেক ক্যারেক্টার থেকে—এমন কি এম, এল, এর রেফারেন্সওয়ালাদের—বড় একটা চিঠি। সবই দেখলেন ম্যানেজার বাবু।

দেখতে দেখতে সহসা তাঁর জেব্রার মত মুখটা ব্যাজার হয়ে উঠলো। একটা তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্য ও অপরাগের অভিনীত দুষ্ট ভংগী নিয়ে বলে উঠলেন—বুঝলে খোকা আমাদের আপিসে তো কাজ খালি নেই—থাকতে পারে হয় তো বেয়ারার-টয়ারার চাকরী—সে তো তোমার যে—চলবেনা বাপু, যা হোক একটু লেখা পড়া শিখেছো—ভদ্রলোকের ছেলে বলেও মনে হচ্ছে...

মাণিক যেন সহসা আর্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—'তাই দিন না স্যার। তবু, তো একটা কাজ পাব। চাকরী... চাকরী...জুটবে একটা।...

উচ্চ রবে হেসে উঠলেন ম্যানেজার। বোধ হয় হাসতে হাসতে বিদীর্ণ হচ্ছিল—কঠিন বুকটা, ভাবছিলেন, আজকালকার ছোঁড়াগুলোর বুদ্ধিরও বলিহারি। দুটো খেতে পাবার হ্যাংলামীতে যা নয় তাই আবদার করা।

'য়্যাও—যাও খোকা—বাড়ী যাও...বয়স তোমার কুড়ি বাইশের বেশী নয়। এখন বাড়ী গিয়ে মা বাবার বুদ্ধি নেবার দরকার আছে...

সার্টিফিকেটের মোটা তাড়াটা বগলদাবা করে মাণিক বেরিয়ে এসেছিল পথে। মাতালের মত টলছিল, সহসা একটা সোনার স্বপ্ন এই মলিন পথের ওপর ধূলিসাৎ হয়ে যাবে—মাণিক যেন ভাবতে পারছিলনা। নিজেকে সামলাবার শক্তিটুকুও—কোন অদৃশ্য দস্যু যেন কেড়ে কুড়ে নিয়ে তাকে সর্বহারা করে তুলেছিল।

ঘোলাটে চোখে—যে জগৎটাকে সে তখন দেখছিল সে পৃথিবী তখন একটা দুঃস্বপ্নের গাঢ় রাত্রি।

মাণিক টলতে টলতে পথ হাঁটছিল...হেঁটে হেঁটে এসেছিল—পথের পর পথ অতিক্রম করে...

সহসা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মাণিক।...রোদের আলোয়—সেই ক্ষীণ পথটার পাশে আজও অপূর্বর বড় বাড়ীটা তেমনি সাজানো, ঝক্ ঝকে। সিনেমার একটা ছবির মত।...

বোধ হয় চোখের বিভোরতায় পুরোন কলেজ ফ্রেণ্ডের বাড়ীতে...মাণিক আচম্কা যেন ঢুকে পড়েছিল।...অনেক দিন পর, বোধ হয় বছর চারেক পর...মাণিক যেন অতি সন্তর্পণে ওদের সাজানো ফুল বাগানে প্রথম প্রবেশ করলো। চার বছর আগে, মাণিক আসতো এখানে, নিরভিমান ধনগৌরবের অধিকারী—সেই সহপাঠী অপূর্ব মল্লিক—পড়াশোনায় ভাল ছেলে মাণিককে ধরে বেঁধেই নিয়ে আসতো—এই মল্লিক ভবনে।..

মল্লিক বাগানে আরো কত নতুন ফুল গাছের চারা পোঁতা হয়েছে। কত সুন্দর সুন্দর ফুল—কত নতুন সবুজ পাতা বাহার গাছ যেন থরে থরে ভরে উঠেছে। মল্লিক বাগান যেন আরো সম্পদের অধিকারী হয়েছে।...

বন্দী কুকুরের থবর আর্তনাদ শুনেই—যেন সেই পরি-

চিত বাইরের ঘর থেকে অপু বেরিয়ে এলো। কোন বিস্মিত আনন্দ প্রকাশ না করে অপু ইশারা করলো—বাড়ীর ভেতরে যেতে। বড় কুণ্ঠায়, কষ্টে মাণিক যেন তখনও—ফুল বাগানে দাঁড়িয়েছিল।

নির্দেশ পেয়ে—যেন অনুগত ভৃত্যের মত মাণিক গিয়ে বসলো—ওদের বাইরে ঘরের দামী সোফায়।

অপুকে দেখে যেন চেনা গেলনা। কি ভীষণ মোটা হয়ে গেছে। কেমন যেন 'কর্ত্তা' কর্ত্তা ভাব। হাসি পাচ্ছিল সত্যি মাণিকের।

কিন্তু হাসতে পারেনি মাণিক। অপুর যে সেই হাসি খুশী মুখটা সে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না।

প্রথম দু' একটা কথার পরই অপু বলেছিল সে তার বাবার মিল কলিয়ারীর বড় বড় সেই বিজনেস নিয়ে মেতে আছে—কাজেই বন্ধু বান্ধবদের সংগে সাক্ষাৎ করবার বা গল্প করবার সময় নেই বললেই হয়।

মাণিক যেন হতবাক্ হয়ে বসেছিল। অপু জিজ্ঞেস করেছিল—'তুমি কি চাকরী করছো?'

চাকরী? না,. এই করবো, করবো মনে করছি··· বলতে বলতে মাণিক মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সহসা ওর মলিন ধূলি ধূসর বেশটার দিকে চোখ পড়ে যায়। ইস্, কখনো তো মাণিক আসেনি এমন ভাবে?

আজ যেন মনে হোল—ধন গৌরবের অধিকারী অপূর্ব মল্লিক উন্মাসিকের মত তাকে চেয়ে চেয়ে দেখছে! দেখছিল, রুক্ষ স্নানহীন উড়ন্ত চুলগুলো, জলছবির মত চোখের নীচে—আল্‌কাত্‌রার ছোপ, শীর্ণকায় শরীরটা ছেঁড়া বোতাম খোলা জামাটার ভেতর থেকে মাণিকের বুকটা যেন দেখা যাচ্ছিল···শুধু তার ভেতরের দৃশ্যটাই অপু দেখতে পায়নি। ইতিমধ্যে যন্ত্রণার নীল রঙটা সমস্ত হৃদপিণ্ডটাকে ঢেকে ফেলেছে নিদারুণ অভিমান আর অস্ম্রমবোধের কষ্ট সমস্ত রক্ত স্রোতে নাচছিল···না, না অপু যে অতদূরের দৃশ্য দেখতে পায়নি।

অপুর কথায় যেন চমকে উঠলো মাণিক···"আশ্চর্য, এতদিনেও একটা চাকরী পেলেনা, হোপলেশ!'

'চাকরী' না পাওয়াটা কি একটা অপরাধ? অপুর কথায় সেই রকম একটা সুর শুনে, মাণিক যেন আর দাঁড়াতে পারেনি।

মল্লিক ভবন থেকে দ্রুত পায়ে সে বেরিয়ে এসেছিল কিছুক্ষণ আগে মনে হয়েছিল, পুরোন বন্ধু হিসেবে মিল—কলিয়ারীর কোন একটা জায়গায় মাণিককে কাজে ভর্তি করার কথা বলবে অপু। বেকার, দারিদ্র্যপীড়িত বন্ধুর প্রতি সামান্য এই সান্ত্বনাটুকু দিয়ে অপু বন্ধুত্বের সৌজন্যটুকু রক্ষা করবে।···

আবার সেই রোদের পথ দিয়ে মাণিক হাঁটছিল পকেটে পড়ে থাকা মাত্র আনা দুয়েক পয়সা হঠাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দ করে উঠতে মাণিক যেন চমকে উঠেছিল। যাই হোক মধ্যাহ্নের জঠর যন্ত্রণার জন্য ওই টুকু সম্বল রেখেছিল ঈশ্বর। কাজেই, এক ঠোঙ বাদাম কিনে মাণিক সোজা এসে বসেছিল বেরিয়েল গ্রাউণ্ডে।

অনেকক্ষণ গড়িয়ে গড়িয়েও মাণিকের ঘুম এলো না। নিশ্চিন্ত এই কফিনের দেশে যারা চির নিদ্রিত মাটির নীচে—তাদের শীতল স্পর্শটা পেল যেন মাণিক।

ধীরে ধীরে একটা হিমশীতল বাতাস বইছিল। ইতিমধ্যে করবী গাছের শাখা থেকে সেই সুন্দর ফুলটা ঝরে পড়লো টুপ্ করে। শ্বেত করবীর পাপড়িগুলো যেন থেঁতলে গেল মাটিতে পড়ে।

আরও একটা ফুল, শূন্য সেই বৃন্তটার পাশে দুলছে। বড় একাকী, নিঃসঙ্গ তাকে মনে হোল। একটা শোকার্ত নিঃশ্বাস যেন মাটির দিকে নেবে আসছে···

মাণিকের আধো ক্লান্ত চোখে একটা দ্বিপ্রহরের স্বপ্ন নেবে এলো।······

করবী গাছে দোল খাওয়া ফুলটাকে দেখতে দেখতে তার মদিরার কথা মনে পড়লো।

খুব সুন্দর দেখতে নয়। কিন্তু মরুভূমির বুকে একটা ওয়েসিসের মিষ্টি স্বপ্নের মত মদিরার মুখটি। দুইবিস্তৃত কালো গভীর চোখ দুটি কি এক যাদুতে মাখানো!

মদিরা সেই চোখ টেনে, ঠোঁটে অল্প হাসি মাখিয়ে মাণিকের সমস্ত চেতনাকে যেন বোবা থমথমে করে দেয়। ওর যৌবনটাকে নিয়ে দুরন্ত খেলার ইশারায় পাগল করে দেয়।

নিশ্চয়ই এতক্ষণে ও খাওয়া দাওয়া সেরে একটা গল্পের বই খুলে নিয়ে বসেছে—বস্তি বাড়ীর সেই উঠোনটার পাশে। যেখানে একটা বড় কাঠ চাঁপার গাছ—

অনেক পাতা ভরা ডাল ছড়িয়ে, ছায়া করে দিয়েছে।…

স্কুল মাষ্টারের মেয়ের মনে, গল্পের অবাস্তব নায়কটি এতক্ষণে তার-হঠাৎ পাওয়া প্রেমিক'কে নিয়ে—সুখের আশার দেশান্তর হয়েছে! ইস, মদিরা যেন সে সময় আফশোষ করছে… যদি তার বেলায় এমনটি হোত…?

অনেকগুলো ভাইবোনের বড়দিদি হয়ে—গরীব নকুল মাষ্টারের মেয়ে হয়ে—একদিন দুঃসাহসিক বাসনায় প্রতিজ্ঞা-লীন হয়ে উঠেছিল…

কত ছোট থেকেই তো দেখছিল মাণিক। বস্তি বাড়ীটির শেষ দিকে ওরা থাকে, এদিকটায় মাণিকরা। মাণিক আর তার ছোট বোন লক্ষ্মী, বুড়ো বাবা মা। বাবা এখন রিটায়ার হয়ে সামান্য পেন্‌শন পাচ্ছেন। কাজেই, দারিদ্র্য এসেছে আরো চরম হয়ে মাণিকের চাকরী না জোটাতে।

এ' কথা কিন্তু মদিরার একদিন অবিশ্বাস হয়নি। শিক্ষিত ছেলের চাকরী তো হাতের মুঠোর জিনিষ—আর সেই বিশ্বাসেই মদিরা মেয়ে হয়েও—দুঃসাহসিকের মত আগেই প্রেম নিবেদন করেছিল মাণিকের কাছে।… সেও তো বছর দুই আগের কথা। এই দু'বছরে যখন মাণিকের চাকরী হোল না, তখন মদিরা বিশ্বাস হারাচ্ছে নিশ্চয়ই…

মদিরা যেন আজকাল কেমন বিমনা, তার বেকার প্রেমিকের প্রতি একটুও নজর দিচ্ছে না ভাবতে ভাবতে ভারি অভিমান হোল মাণিকের।

ভালো 'বেকার' হওয়া কি একটা গুরুতর অপরাধ করে ফেলা—সকলের ঘৃণা আর অবহেলা যেন মাণিককে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।…

একটা ছেলে বলে, মায়ের কত স্নেহ, কত আদরই না ছিল, বাবার একটা গর্ব গ্র্যাজুয়েট ছেলের জন্তে।…

মা ও বোন সেদিন কি বলছিল বাবাকে। বেড়ার পাশে চুপি চুপি দাঁড়িয়ে শুনছিল মাণিক। হ্যাঁ গো, তুমি বুড়ো হলে, তোমার দেখবার কেউ নেই—ভেবেছিল খোকাটাকে মানুষ করেছি—আর ভাবনা কি…কে জানতো…এমন করে আমাদের অদৃষ্ট জ্বলবে।

দু'হাতে কান চেপে ধরেছিল মাণিক 'চাকরী' না পাওয়াটা একটা সত্যিই দুর্ভাগ্য। কিন্তু সে দুর্ভাগ্যকে কি মা বাবাও ক্ষমা করে না? সেখানেও মাণিক বেকারত্বের অপরাধে অপরাধী?

সহসা বাবার কাসীর শব্দ শোনা গিয়েছিল। হাঁপানীর কষ্ট, বাবার কি ভীষণ কষ্টই না হচ্ছিল…মা যেন তাড়াতাড়ি বাবাকে সামলাচ্ছিল……

একটা ভীষণ অভিভূত লজ্জায় মাণিক ছুটে পালিয়ে এসেছিল পথে।…পাড়ার মোড়ের দিকে রায়-লজের লাল রকটাকে গুলজার করে—প্রতিদিনকার মত বসেছিল সেই, মুখ-চেনা সব ছেলের দল। মাণিকের মতই তারা বেকার। ওই একটা অপরাধে—অপরাধী তারাও বোধহয়। পল্লীর চেনা দাদুর দোকানে ধারে চা খেয়ে সব সকাল থেকে ওরা, গোল হয়ে বসে। সিনেমা আর রাজনীতির চর্চায়—ওদের মধ্যে মাঝে মাঝে হাতাহাতিও হয়ে যায়।

আবার রাস্তা দিয়ে কোন কুমারীকে যেতে দেখলে সবাই যেন সংবদ্ধ হয়ে গেয়ে ওঠে—হিন্দী গানের দু একটা কলি। শিস্ দিয়ে ওঠে শুধু রতন। সত্যি, ওকে দেখলে ভয় হয় মাণিকের। রায় লজের লাল রকের সব রংবাজ ছেলের শিরোমণি খুড়ো ও। পুলিশের খাতায় নাম ওর বাঁধা। চুরি, ছিনতাই—যার নারী অপহরণের অভিযোগও আছে ওর নামে…

সেই ভয়াবহ রতনকে শুধু ভয় পায় মাণিক…ও' না থাকলে, মাণিকও কোন কোন দিন ওদের মধ্যে গিয়ে বসে। দাদুর দোকান থেকে চা আনিয়ে দেয় ওরা, বলে—কি হে, শুভবয়, এসেছো দলে, চা খাও—সিগারেট খাও, ওরা সবাই যেন সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। মাণিক চা খেলেও—কখনো সিগারেট খেত না। সেই প্রথম মায়ের কথা শুনে আঘাত পেয়ে পালিয়ে গিয়ে ওদের দলে বসে একটা সিগারেট টেনেছিল সে।

প্রথম খেতে গিয়ে কি কাশি! বিশ্রী একটা গন্ধ! মদিরা তো সেই গন্ধ পেয়ে—দুদিন কথা বন্ধ করে দেয়। ভাল ছেলে আর শিক্ষিত বলেই না মদিরা ওকে ভালবাসতো? আর ভাল যারা তারা নিশ্চয় সিগারেট খায় না! মদিরা যেন তাই শোনাতে চেয়েছিল।…

হয়তো মদিরার জন্তেই মাণিক আর সিগারেট খায়নি বা আর কোনদিন ওদের দলে গিয়ে বসেনি।

কিন্তু তার পরেও মদিরা কেন তাকে দূরে সরিয়ে দিল। বোধ হয় সব অপরাধের চেয়ে আরও বড় অপরাধ—মাণিক যে চাকুরীহীন। মদিরার কোন স্বপ্নকেই আর মাণিক রূপ দিতে পারবে না বাস্তবে...

সত্যি কি তাই ?...বেলা পড়ে আসছিল মাটিতে ঝরে পড়া সেই ফুলটিকে নিয়ে মাণিক দু'হাতে চটকাতে লাগলো। দ্বিপ্রহরের স্বপ্নটা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যেতে লাগলো।

বিকেলের হলুদ রঙটা বেবিয়েল গ্রাউণ্ডের ওপর ছড়িয়ে যেতে যেতে এক সময় সন্ধ্যার ইশারা দেখা গেল।

একটা অজানা উত্তেজনায় মাণিক যেন কেঁপে উঠলো। সারাদিনই বোধ হয় মাণিকের জন্ত ঢাকা ভাতটা পড়ে আছে দাওয়ায়। লক্ষ্মী কতক্ষণ অপেক্ষা করে—হয়তো এখন গজ্ গজ্ করছে রাগে। বেচারা সারাদিন খেটে মরে। অথচ ওর বিয়ের বয়স হয়েছে কবে। এই বয়সে কোলে পিঠে ওর দুচারটে ছেলে পুলে থাকারই কথা কিন্তু শুধু দাদার চাকরীটার জন্তেই লক্ষ্মীর আজও বিয়ে হোলনা।

হয়তো সেই জন্তেই লক্ষ্মীও বোধ হয় আজকাল বিরক্ত মাণিকের ওপর। হয় তো লক্ষ্মীও ভাবছে—দাদার চাকরী না পাওয়ার জন্ত ওরও জীবনটা ব্যর্থ হতে চলেছে... শুধু দাদার অপরাধেই—লক্ষ্মী স্বামী পেলনা, সন্তান পেলনা—সুখের একটু মুখ দেখলোনা এত বয়সেও...

কেন জানি, মাণিকের জলছবির মত দুটো চোখ চিক্ চিক্ করে উঠলো—ছোট বোনটার কথা ভেবে।...

আস্তে আস্তে ও' উঠে দাঁড়ালো বেবিয়েল গ্রাউণ্ড থেকে। আস্তে আস্তে নেমে এলো পথে, সন্ধ্যের অন্ধকারে রাজপথ যেন মসীলিপ্ত হয়ে গেছে। তবু, বড় বড় ম্যানসনের আলো, ল্যাম্প পোষ্টের আলো, একটা রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি করলো মাণিকের চোখের সামনে...

ধীরে ধীরে পথ হাঁটছিল মাণিক। অনুভব করলো—ক্ষুধার কষ্টটা আবার জেগেছে...কাজেই এবার বাড়ীর দিকে ফেরা যাক।...

সহসা কাঁধের ওপর একটা ভারি হাত এসে পড়লো চমকে পেছন ফিরলো মাণিক...অন্ধকারে একটা মানুষ তার দিকে চেয়ে হাসছে...

কে রতন ? ভয়ে ঘৃণায় যেন মাণিক দু'পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু পালাতে পারলনা। কি এক দুর্বোধ্য আকর্ষণে রতন তাকে পথের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখলো যেন...

হ্যাঁ, ঠিকই, সেই রতন। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির সেই ছেলেটা। যার দলে রতনের শিরোমণি খুড়ো। সবাই যাকে ওই বলে ডাকে। সেই রতন যেন তার সর্বশক্তি অপচয় করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে...কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ? কেন ? কিসের জন্তে ?

ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে একটা দামী সিগারেট ধরালো রতন, একটা এগিয়ে দিল মাণিকের দিকে। মাণিক শত চেষ্টা করেও আপত্তি জানাতে পারলনা। হাত বাড়িয়ে সে নিল সিগারেটটা। রতনই আগুন জ্বেলে দিল। তারপর রতন চোখ টেনে টেনে লম্বা লম্বা ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো...দূরের আলোর দিকে চেয়ে।

মাণিক খেতে খেতে কাশতে লাগলো। রতন ওর পিঠে হাত বুলিয়ে হেসে বলে উঠলো—শুভ বয় ! এখনো রঙ লাগেনি গায়ে—কি বল ডিয়ার ফ্রেণ্ড্ ?

মাণিক কিছু না বলে, মাঝে মাঝে কাশতে লাগলো।

একটু পরে রতন বলে উঠলো—'খাবে কিছু। মানে পেট পুরে কিছু খাবার ? এই ধর কোন রেষ্টুরেন্টে বসে ?

মাণিক একটু অবাক হয়ে তাকালো রতনের মুখের দিকে। আস্তে আস্তে নিজের অজান্তেই যেন সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লো। রতন তখন ওর কাঁধে হাতটা রেখে সামনের দিকে এগোবার জন্তে পা বাড়ালো।...

ওরা একটা বড় রেষ্টুরেন্টে গিয়ে উঠলো। নিয়নের আলো জ্বলছিল। সমস্ত দিক যেন ঝল মল করছিল। মাণিক সত্যিই কখনো এমন জায়গায় আসেনি। পাড়ার দাশুর চায়ের দোকানটাকেই তার মনে পড়ে...আগে জ্বলতো সেখানে একটা হ্যাজাকের আলো এখন সেখানে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে।

সাদা পাথরের টেবিলটায় খাবারে খাবারে ভরে গেল।

রতন নানা রকম খাবার অর্ডার দিয়ে আনালো। বললো—নাও ভাই পেট ভরে খেয়ে নাও—যদি আরো লাগে বো'ল কিন্তু…

আশ্চর্য, রতন কিছুই খেলনা। এক ক্ষুধার্তকে খাওয়ানোর আনন্দে সে মেতে উঠলো। আশ্চর্য! রতন কি অন্তর্যামী?—

মাণিক কিন্তু কিছুই স্পর্শ করতে পারছিলনা। রতন ওর হাতটাকে তুলে দিল খাবারের ডিসের ওপর! বললো—ভাই তোমাকে দেখে বড় ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছিল… ভাই…ভাই…মানে, ওই চেহারাটাকে আমি চিনি কিনা!…আমিও একদিন অমনি ওই রকম ক্ষুধার কষ্ট পেয়েছিলাম। কিদের কষ্টে পথে ঘুরেছি কিনা…বলতে বলতে রতন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বড় রাস্তার দিকে তাকালো।

মাণিক খেতে লাগলো। সত্যি ওর পেটটা ভরতে লাগলো।' ও এতক্ষণে ক্ষুধাতৃপ্তিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল রতনকে।

রতন বসে আছে। ব্যাকব্রাশ করা চুল, ডেক্রনের সার্ট, টেরিকটের প্যান্ট, দামী সেন্টের গন্ধ আসছে—ওর দামী পোষাক থেকে।

রতন বসে বিজয়ীর ভংগীতে। বিয়ের হাসিতে উজ্জল লাগছে ওর মুখটাকে। যেন অনেকদিন পর, অনেক কষ্টের পর সে একটা সুখ সমৃদ্ধির রাজ্যে পৌঁছে গেছে। কোন গোপন সম্পদের ভাণ্ডার দ্বার সে খুলে ফেলেছে। ধনাগারের চাবিকাঠি এখন ওর হাতের মুঠোর মধ্যে।

কারেই ইচ্ছে করলে, ও দুনিয়াটাকে দেখে নিতে পারে। কাউকে আর বুঝি পরোয়া করে না রতন। সেই দুর্লভ ক্ষমতা অর্জনে রতন বলবান, দুর্ধর্ষ।

মাণিক যেন বিপুল বিস্ময়ে সেই অমিত শক্তির সম্রাটের দিকে মুগ্ধ বশে চেয়ে রইলো। ওর দর্পিত ভংগী, দৃপ্ত চাউনি, মাণিক যেন তৃষ্ণার্তের মত চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। তার সব কিছু এখন যেন পরাভূত হয়ে যেতে লাগলো—আমাদের ওই অপরাজেয় সম্রাটের সম্মোহনের জোরে ··

মাণিক হারিয়ে যেতে লাগলো ধীরে ধীরে…

মনোহারিকা

জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ

হে মনোহারিণী—
কেশবিন্যাস চরণধ্বনিতে কি কথা শুনি
নব যৌবন করে টলটল
নীলাম্বরাতে কালো-কল্লোল
চরণ নূপুরে রুনু ঝুনু সুরে
কি আবাহনী—
তন্বী তরুণী অধর সুমধুর বচনা
কবরীতে কর কুসুম জালিকা রচনা
বক্ষের হারে জ্বলিছে মণিকা
হে চির গরবিণী

আজি সখি কেন বিমল দখিন বায়ে
এসে বসিয়াছ বকুল কুঞ্জছায়ে
অংকে জ্বলিছে মুক্তাপুঞ্জ সুদূরের বিরহিণী
নদীকূলে কূলে জল ছল ছল
ধূমল আকাশে মেঘ টলমল
সুন্দরী বনে উদাস নয়নে
কাজল কাশীর রূপ পসারিণী।

———

বিশ্বভাষা-পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ঋক্‌বেদ ও যজুর্বেদের মধ্যবর্তীকালে সিন্ধুসৌবীর জাতির সভ্যতার উদ্ভব, বিস্তার এবং আর্যসান্নিধ্য লাভ ঘটে। ঐ সময়ে সিন্ধু-সৌবীর জাতির সভ্যতার প্রভাব আর্যদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়। তাদের কাছ থেকে গোধূম ও মসুর আর্যদের খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদী (Dry bed of the Ghaggar বা ঘাগর নদীর শুষ্ক কর্দমাক্ত খাত) ঋগ্বেদের কালে বিপুলা স্রোতস্বিনীরূপে আরব সমুদ্রে গিয়ে পড়ত। সরস্বতীর মোহনা থেকে মাঝামাঝি দূরে মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা র সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের অবস্থান। মহেঞ্জোদাড়োর কাছে সিন্ধু নদ সমুদ্রে গিয়ে পড়ত। এখন সমুদ্র প্রায় দুশো মাইল জমি ছেড়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ফা-হিএনের দেখা বঙ্গদেশীয় সমুদ্র আর এখনকার দক্ষিণবঙ্গীয় সমুদ্রের পার্থক্যের। ফা-হিএনের সময়ে চব্বিশপরগণা, খুলনা প্রভৃতি জেলার কোন অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ। তিগ্রিস ও ইউফ্রাতেস নদী দুটির মোহানার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখা গেছে। সেখানে সমুদ্র প্রায় একশো ত্রিশ মাইল স'রে গেছে। সরস্বতীর মোহনা থেকে সিন্ধুর মোহানার মধ্যবর্তী অববাহিকায় দুই মোহানার মধ্যবর্তী দেশ এই অর্থে মোহন-জো-ডেরো এই নামের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের অবস্থান। এই এলাকায় প্রায় ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দে সম্প্রতি খুঁজে-পাওয়া নগরটি তৈরি হয়। সেই নগরের ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও নগরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। অতএব, সভ্যতাটি খ্রীষ্টপূর্ব ত্রিশ শতাব্দীরও বেশি প্রাচীন।

এই সভ্যতার স্রষ্টা জাতিতে আর্য ছিল না। কারণ, এরা শিবলিঙ্গের মতো প্রতীকচিহ্নের উপাসনা করত—অর্থাৎ এরা লিঙ্গোপাসক জাতি ছিল। আর্যরা শিবলিঙ্গ উপাসনাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। অনেক পরে তন্ত্রশাস্ত্র প্রবর্তিত এবং আর্য-অনার্যমিশ্র হিন্দু সমাজ গঠিত হলে শিবলিঙ্গ পূজা সমাজে চ'লে গেলেও ঋগ্বেদের যুগে "শিশ্নদেবাঃ" ঘৃণাবাচক বিশেষণ ছিল। ঋগ্বেদে ঐ বিশেষণে যে জাতি ভূষিত, তারাই মহেঞ্জোদাড়োর প্রাচীন সভ্য জাতি। বালুচিস্থান ও ইরানের পথে সুমেরজাতির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। মহাভারতে উল্লিখিত সিন্ধু-সৌবীর জাতি সিন্ধু সরস্বতী মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত ঐ সুবীর জাতি। সুবীর জাতি ঋগ্বেদ থেকে রুদ্র-উপাসনা গ্রহণ করে এবং পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত লিঙ্গোপাসনা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতে শিবলিঙ্গ পূজার প্রবর্তন হয়। বৈদিক আর্যরা পশুপতি রুদ্রের উপাসনা করলেও শিবলিঙ্গের পূজা করতেন না। সুবীর জাতি সুমের জাতির কাছে গোধূম ও মসুর পেয়ে থাকবে। কিম্বা আরো পশ্চিমের এলাকা থেকে তারা ও-দুটি জিনিস প্রত্যক্ষভাবে বা সুমের জাতির মারফতে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকতে পারে।

সিন্ধু সৌবীর জাতি ঋগ্বেদের আর্যদের সমসাময়িক তো ছিলই, পূর্ববর্তীও হতে পারে। কিন্তু আর্য সুবীর সান্নিধ্যের ফলে আর্য জাতি কর্তৃক সুবীর জাতির খাদ্য গ্রহণ ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব সাল নাগাদ হয়েছে। মহাভারতে বলরাম সরস্বতী নদীকে প্রায় বিনষ্ট দেখেছিলেন। মহাভারতে সুবীর জাতির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাদের প্রবলতার কথা নেই। সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাওয়ায় ততদিনে মহেঞ্জোদাড়ো ধ্বংস হয়েছে এবং সুবীর জাতিও লুপ্তপ্রায়।

মহেঞ্জোদাড়ো ধ্বংসের কারণ—নদীর সঙ্কোচন, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের উৎপাত, ভূপ্রাকৃতিক আলোড়ন, বন্যা প্রভৃতি। কিন্তু প্রবল আর্য আক্রমণের ফলে ঐ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এ-রকম অদ্ভুত অনুমানের কোন প্রমাণ আর

পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আর্যদের সঙ্গে অনার্য জাতিগুলির অবশ্যই যুদ্ধবিগ্রহ হত। আর্যদের নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ লেগে থাকত প্রায়ই। তার ফলে যেমন আর্যদের বিলোপ হয় নি, তেমনি অনার্যদেরও লুপ্তি সাধিত হয় নি। মহেঞ্জোদাড়োর লোকদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই আর্যদের বারবার শক্তি পরীক্ষা হয়ে থাকবে। কিন্তু আর্যরা হরপ্পা থেকে মোহানা দুটির মধ্যবর্তী দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় চারশো মাইল ব্যাপী অঞ্চলের সভ্যতা ধ্বংস ক'রে দিয়েছিলেন, এমন কষ্টকল্পনার কোন কারণ এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

মহেঞ্জোদাড়োয় আকস্মিক প্লাবন যে হত, তার প্রমাণ বাঁধ ও জল-নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা। ঐ সভ্যতা যে যুদ্ধ ব্যতীত আর এক উৎপাতে ধ্বংস হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই উৎপাত প্রবল প্লাবনের অনুরূপ কিছু; কারণ, নগরে মানুষ আর গৃহপালিত পশুর কঙ্কাল বা অস্থি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় নি। মার্শালের মতে, স্থানটির মাটী অত্যন্ত লবণাক্ত; সুতরাং এমন কোন সামুদ্রিক প্লাবন হয়ে থাকবে যাতে অস্থিরাশি জলে ভেসে গেছে বা সিন্ধুমোহানার মাটির তলায় জলের তোড়ে গেঁথ গেছে। সে-ক্ষেত্রে জোর ক'রে বলা যায় না যে, যুদ্ধ নিহত বহু লোকের অস্থিরাশি ছিল কি না। যে-প্লাবন অস্থিরাশি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেই প্লাবনই একক-ভাবে সভ্যতার ধ্বংসসাধন করতে পারে।

দেখা যাচ্ছে যে, আর্যরা শুক্ল যজুর্বেদ গ্রন্থন বা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতকের আগে সুমীয় জাতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে তাদের খাদ্য গম ও মুসুরি, আধুনিক ভাল রুটি বা ডাল-রোটি খাদ্যরূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। তার আগে মাংস ও গব্য খাদ্যই তাঁদের প্রিয় ছিল। সে-সব সম্পন্ন হলে তবে তাঁরা খেতে পেতেন। সাধারণ আর্যের খাদ্য ছিল যব আর তিল, সাধারণ পানীয় ছিল সোম পানীয় বা সোমরস। সুরা লোভনীয় পানীয় ব'লে গণ্য হত; কিন্তু তাও মাংস, দুধ, ঘি প্রভৃতির মতো কেবল ধনীদের আয়ত্ত ছিল। সুরা নিন্দিত পানীয় বলেও গণ্য হত মত্ততাজনক ব'লে; বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায় যে, সুরাগ্রহণে ইচ্ছুক ব'লে ভারতীয় আর্য। সুর এবং সুরা গ্রহণে অনিচ্ছুক নরগোষ্ঠী অসুর ব'লে গণ্য হয়েছিল,

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সেমীয় ধর্মে এখনও মদ্যপান নিন্দিত, বিশেষত মুসলিমদের ধর্মে। সোমপানীয় বা সোমরস সুরা থেকে পৃথক, সম্ভবত ভাং বা সিদ্ধি ব'লে বিদ্যানিধির ধারণা। কিন্তু সোমরস চা হওয়াই বেশি সম্ভব; কারণ সোমলতার বর্ণনা চা-এর পাতার কথা মনে করিয়ে দেয়; তা ছাড়া তাতে বুদ্ধির মত্ততা জন্মায়, চা-এ তা হয় না। সোমরস মত্ততাজনক পানীয় ছিল না; তা চা-এর Liqueur বা কাথ হওয়াই সম্ভবপর। যবের রুটি, তিলের লাড্ডু আর চা সাধারণ আর্য অধিবাসীর খাদ্য ও পানীয় ছিল প্রায় সাড়ে-চার-পাঁচ হাজার বছর আগে পাঞ্জাবের দিকে, এটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। পরে গমজাত খাদ্যদ্রব্য ও ডাল খেতে আর্যরা বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

অতএব, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দীর আগে সুমীররা অতি শক্তিশালী জাতিরূপে বিদ্যমান ছিল। ঋগ্বেদের যুগে আর্যরা তাদের ভালো চোখে না দেখলেও যজুর্বেদে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত আর মহাভারতের যুগে তারা ভারত-সমাজের অঙ্গীভূত।

এই সঙ্গে ভারত পাকিস্থান রাষ্ট্রদুটি গঠিত হবার আগে পর্যন্ত ভারতে দ্রাবিড়দের ভৌগোলিক অবস্থানের রহস্যটা পরিষ্কৃতভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

বালুচিস্থানে প্রাক্ পাকিস্থান যুগে ব্রাহুই জাতি বাস করত। এখনও সংখ্যায় সামান্য কিছু ব্রাহুই পশ্চিম পাকিস্থানে থাকা সম্ভব। এরা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত; গোণ্ড জাতি মধ্য ভারতে বাস করে; মাল্তো জাতি রাজমহল পাহাড়ের সন্নিহিত এলাকায় থাকে; এরা সবাই দ্রাবিড়। ব্রাহুইস্থান থেকে গোণ্ডস্থান বা গণ্ডোআনা এবং সেখান থেকে রাজমহল পর্যন্ত এলাকায় দ্রাবিড়রা কি ক'রে বিচ্ছিন্ন ও অবলুপ্ত হল, সেটা চিন্তা করা দরকার। বর্তমানে ব্রাহুই এলাকা থেকে গোণ্ডভাষী এলাকা পর্যন্ত মধ্যবর্তী অংশে বালুচ, সিন্ধি ও রাজপুতদের বাস। গণ্ডোআনা থেকে রাজমহল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এলাকায় দ্রাবিড় ওরাওঁ ভাষা কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও ওরাওঁভাষী এলাকা পারে নি গোণ্ডভাষী এলাকাকে মাল্তোভাষী এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত করতে। মধ্যে আর্য ভাষা আর অষ্ট্রিক ভাষা ব্যবধানস্বরূপ বর্তমান।

এখন গণ্ডোআনা থেকে উত্তরে সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় দ্রাবিড়জাতিগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে। ব্রাহুই এলাকা থেকে গণ্ডোআনা এবং সেখান থেকে রাজমহল পর্যন্ত এলাকাতেও তারা আগে অবিচ্ছিন্নভাবে বাস ক'রে থাকবে। মাঝে মাঝে আরো-আগে থেকে-বাস করা অষ্ট্রিকদের বসতিগুলির কথা বাদ দিয়ে এ-হিসেব করতে হবে। পরে কোন নৃগোষ্ঠী দ্রাবিড়দের দক্ষিণ ভারতের দিকে বিতাড়িত করে কিম্বা ঐ অঞ্চল থেকে তাদের লুপ্ত করে। ব্রাহুইরা কোন মতে বালুচিস্থানে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে দেয়। তাদের অবস্থা মোটের ওপর অনুন্নত জাতির অনুরূপ।

মূল ভারত-ইউরোপীয় অনুমেয় ভাষায় মূর্ধণ্য ধ্বনিগুলি ছিল না, সে-কথা আগে উল্লিখিত হয়েছে। ভারত ইরাণীয় ভাষার মূল রূপেও মূর্ধণ্য ধ্বনিগুলি ছিল না। ইরাণীয়-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীন রূপেও মূর্ধণ্যবর্গ ছিল না। অবশ্য প্রাচীন পারসিকে ষ ধ্বনি আছে। বৈদিক ভাষায় এই ধ্বনিগুলি প্রবেশ করে ভারতে আর্য আগমনের পরবর্তী কালে মুখ্যত দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক সান্নিধ্যের ফলে, এমন অনুমান অনেকে করেন। ঋগ্বেদের ভাষায় মূর্ধন্য 'ল'-ধ্বনি পর্যন্ত আছে যা পরে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষ স্তরে লোপ পেয়েছে। ঋগ্বেদ রচনার সময়ে ভারতীয় আর্যজাতি ইরান-পাঞ্জাব অঞ্চলে সিন্ধু ও তার উপনদীগুলি বিধৌত দেশে বাস করতেন। সেখানে তাঁরা অতি ঘনিষ্ঠ দ্রাবিড় সান্নিধ্য কি ক'রে পেলেন, সেটা চিন্তার বিষয়। তখন বালুচিস্থান ও সংলগ্ন অঞ্চলে ব্রাহুইদের মতো আরো অনেক দ্রাবিড় জাতির লোকদের বসতি নিশ্চয় ছিল এবং তারা প্রবলপ্রতাপান্বিত না হলে আর্যদের প্রভাবিত করতে পারত না। আর্য বা ইন্দো-ইরাণীয় বা ভারত ইরাণীয় ভাষার বৈদিক-আর্য শাখার যে ভাষাভাষীরা সিন্ধু নদের পূর্ব দিকে উপনিবিষ্ট ছিলেন, অন্তত তাঁদের ভাষায় মূর্ধণ্য ধ্বনির প্রাবল্য থেকে যদি এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, তাঁদের ওপর দ্রাবিড় বা অন্য অনার্য প্রভাব বর্তমান ছিল, তা হলে এটাও মেনে নিতে হয় যে, দ্রাবিড় বা আর কোন এমন জাতি সিন্ধু নদের কাছেই এক বিরাট সভ্যতা নিয়ে বর্তমান ছিল যাদের ভাষায় মূর্ধণ্য ধ্বনিবর্গ অবস্থিত। হয় মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতাই সে-প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, নয় ব্রাহুইদের পূর্বপুরুষ বা জাতিস্থানীয় কিন্তু সভ্যতার উন্নত আরো অনেক দ্রাবিড় জাতি তখন আর্যস্থান বা ব্রহ্মাবর্ত দেশের কাছে বাস করত; অর্থাৎ বালুচিস্থান থেকে গণ্ডোআনা তথা রাজমহল পাহাড় বা মালদহ জেলা পর্যন্ত এলাকাও তখন দ্রাবিড়দের বাসভূমি ছিল। এই দ্রাবিড়রা "পুর" বা দুর্গ, নগর, দুর্গনগরী নির্মাণে সুদক্ষ ছিল। নগর-সভ্যতা নির্মাণে তারা আর্যদের পূর্ববর্তী, এ কথা আগে বলা হয়েছে। সিন্ধু নর্মদা অঞ্চলে একদা দ্রাবিড়রা বাস করত; সেই সময়ে বৈদিক আর্যরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভাষায় মূর্ধণ্য ধ্বনিগুলি গ্রহণ করেন, এমন হওয়া অসম্ভব নয়। প্রথম সংস্পর্শে আসার পর ঐ ধ্বনিগুলি আর্য ভাষায় প্রবিষ্ট হতে বহু বছর লাগে। তার পর ঋগ্বেদের "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ঋক্ রচনা সম্ভবপর হয়।

এই মত যদি সত্যি হয়, তা হলে আর্যদের ভারতে প্রবেশের কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের বহু আগে হয়ে পড়ে। যজুর্বেদ গ্রন্থন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতকের সঙ্গে আর্য-ভাষায় মূর্ধণ্য ধ্বনি প্রবেশের ব্যাপার আরও বহু আগে সংঘটিত হয়েছে।

দ্রাবিড়দের সিন্ধু নর্মদা এলাকায় বসবাস সুবীর জাতির চেয়ে কম প্রাচীন নয়। সুবীর জাতি তাদের সঙ্গে নামের মিল আছে যে সুমের জাতির, তাদের জাতিও হতে পারে। তারা সুমেরিয়া থেকে এসে দ্রাবিড়দের হটিয়ে দেয়, এটা অসম্ভব নয়। পরবর্তী কালে আর্য, শক ও হূনদের আক্রমণে দ্রাবিড়রা আরো সরে যায় এবং রাজপুত জাতি সিন্ধু-নর্মদা এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

মহেঞ্জোদাড়োর লিপি উদ্ধার হলে বোঝা যাবে, সুবীর জাতি দ্রাবিড় অথবা সুমেরীয়, কাদের জাতি। তবে এটা ঠিক যে, সুমেরীয় এবং দ্রাবিড়দের মতোই মহেঞ্জোদাড়োর সিন্ধু সৌবীর লোকেরা অনার্য জাতি। তাদের সম্বন্ধে সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণীয়:—

"পশ্চিমে সিন্ধু সৌবীর প্রদেশে আর্যপূর্ব সংস্কৃতি বিশেষ প্রবল ছিল বলিয়া এই অঞ্চলে আর্যভাষার ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটিতে বিলম্ব হইয়াছিল।" (ভাষার ইতিবৃত্ত, সপ্তম সংস্করণ।)

সৌবীর জাতি "যবন" ব'লে বর্ণিত হয়েছে মহাভারতে। অত এব, তারা ভারতের পশ্চিম দিক্ থেকে

আগত জাতি। আর্যদের বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক বৃত্তান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। ভরতের পূর্বপুরুষ যযাতির পুত্রদের মধ্যে পুরু আর্যাবর্তে রাজত্ব লাভ করেন। চার পুত্র যদু, অনু, তুর্বসু ও দ্রুহ্য চার দিকে দূর দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তুর্বসু যবনদের পূর্বপুরুষ ব'লে বর্ণিত। এই "যবন"-রা গ্রিক অথবা অন্য কোন পাশ্চাত্য আর্য জাতি হতে পারে। যযাতি দৈত্যগুরুকন্যা ও দৈত্যরাজকন্যা বিবাহ করেছিলেন। সুতরাং ভারতের আর্যদের সঙ্গে পাশ্চাত্য আর্যদের বিবাহাদি রাজকীয় স্তরে চলত। যযাতির অন্যতম পুত্র ম্লেচ্ছ জাতির পূর্বপুরুষ; দ্রুহ্য বৈভোজদের পূর্বপুরুষ; যদুর বংশধর স্বয়ং কৃষ্ণ, যিনি পুরুর বংশ প্রায় নির্মূল ক'রে ছাড়েন। অবশ্য তাঁর নিজের বংশও তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। সুবীরদেশ জয়দ্রথের সিন্ধুরাজ্যের শাসনাধীন হয়েছে মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের আগে। সুবীর রাজকুমারবৃন্দ জয়দ্রথের আজ্ঞাবাহী ছিলেন। অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে মহেঞ্জোদাড়োর পৃথক্‌ সভ্যতা বিলীন হয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছে।

পুরাণে দেখা যায়, জড় ভরতের সমকালীন রাজা রহুগণ; ইনি সুবীর জাতির লোক ছিলেন; তাঁর নামটিও একটু বিচিত্র, সেমীয় বা সুমের জাতির লোকদের নামের মতো অনার্যভঙ্গিম; "রওগণ" শব্দটি মনে পড়ে যায়। তিনি অন্তত ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের লোক। সুতরাং পুরাণগুলিতে দেওয়া সুবিন্যস্ত বংশতালিকা ও কালপর্যায় অগ্রাহ্য না করলে বলতে হয় যে, মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব সাড়ে ছয় হাজার বছরের মতো প্রাচীন। তাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা খুব বেশি আপত্তি না করলেও ভারতের আর্য জাতি তথা আর্য ভাষা ও সংস্কৃতিও যে অতটা প্রাচীন, এ কথা মানতে তাঁরা অনেকে কুণ্ঠিত হন। অবশ্য H. Jacobi-র মতে, on the date of Regvbeda গ্রন্থে লিখিত তাঁর উপপত্তি অনুসারে, ঋগ্বেদীয় সভ্যতার কাল ২৪০০—৪ ০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। বস্তুত ভারতীয়-আর্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনিসম্ভারের উৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে উৎপত্তিকাল খুঁজলে ভারতের ইতিহাসের গুরুতর ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। বেদ-বিভাগের থেকে আরো পেছনের দিকে না তাকালে ভারত-ইতিহাসের উজ্জ্বল দিগ্‌দর্শনগুলিকে অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করা হয়।

ভারত-হিত্তি ভাষাগোষ্ঠীর মূল ভাষায় বা মূল ভারত-ইউরোপীয় ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনিগুলো ছিল না—এই উপপত্তি ভুলও হতে পারে, এমন চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হ'লে কি সিদ্ধান্তের আভাস পাওয়া যায়, দেখা যাক। টিউটন ও ভারতীয়-আর্য ভাষায় তুলনামূলক আলোচনা থেকে এটাই মনে হয় যে, আর্য ভাষায় তো বটেই, মূল ভারত-হিত্তি বা ভারত-ইউরোপীয় ভাষায় অন্তত একেবারে প্রথম স্তরে মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি ছিল। আর্য বা ভারত-ইরানীয় গোষ্ঠী ও টিউটনেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর আদিম আর্য বা মূল ভারত-ইউরোপীয় ভাষা যে ভাবে বিবর্তিত হয়, তার ফলে পরবর্তী যুগে বিচ্ছিন্ন অন্যান্য ভারত-ইউরোপীয় ভাষায় আর মূর্ধন্য ধ্বনিগুলো দেখা যায় নি।

ভারতীয়-আর্য আর টিউটন—দুটি ভাষাগোষ্ঠীতেই মূর্ধন্য ধ্বনি এখন দেখা যায়। লক্ষ্য করা যায় যে, টিউটন ভাষাগুলিতে কোন কোন উপশাখায় মূর্ধন্য ধ্বনি লোপ পেয়ে যায়। বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই এটা হয়েছে। ভারতীয়-আর্য ভাষার বৈদিক স্তরের মূর্ধন্য ল, দীর্ঘ ৠ, দীর্ঘ ৡ-ও ক্রমশঃ লোপ পেয়েছে। ঠিক সেই ভাবে ভারতীয়-আর্য ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাচীন ইরানীয় ভাষাও মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি বর্জন করেছিল। ঐ বিচ্ছেদের কাজটা বেদ-বিভাগ হবার আগে বা পরে যখনই হোক না, মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির আগমন-নির্গমনে তাতে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নি। দ্রাবিড় সান্নিধ্য ব্যতীত আর্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি আসা সম্ভব না হ'লে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ভাষাগুলিতে আসে কি ক'রে সেটা ভেবে দেখা উচিত। তা ছাড়া, উত্তরোত্তর দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক সান্নিধ্য বৃদ্ধি পেলেও ভারতীয়-আর্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি ক্রমশ ক'মে যাবারও কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষান্তরেই এই হ্রাস পরিলক্ষিত হয়েছিল সে-কথা সর্বদা স্মরণীয়।

সমস্ত আধুনিক ভারত-ইউরোপীয় ভাষা আলোচনা করলে দেখা যায় যে বর্তমানে উত্তর-টিউটন আর ভারতীয় আর্য—মাত্র দুটি গোষ্ঠীর ভাষায় ট-প্রভৃতি ধ্বনিগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। এর কারণ, দুটি ভাষাগোষ্ঠী এক সময়ে মূল ভারত-ইউরোপীয় ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, যখন

ঐ মূল ভাষায় কেন্তম্ ও সতম্ দুই গুচ্ছেই মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি ছিল। পরে বিবর্তনের বিশিষ্ট ধারায় ভারতীয়-আর্য গোষ্ঠীতে মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি ক্রমশঃ কমে আসে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক সান্নিধ্য সত্ত্বেও। উত্তর টিউটন ব্যতীত টিউটন গোষ্ঠীর অন্যান্য শাখার ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনিগু'ল মোটামুটি লোপ পায় বা দন্ত্যমূলীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়। দ্রাবিড় সান্নিধ্যের ওপর খুব বেশি জোর দেওয়া মুশ্‌কিল।

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ভারতীয়-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রথম উদ্ভবের কাল অন্বেষণ করলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যে, স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় আর্য জাতি ব্রহ্মাবর্ত দেশে বা বর্তমান পশ্চিম পাকিস্থান ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বাস ক'রে আসছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতকে প্রথম বেদগ্রন্থ সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হলে লৈখিক আকারে বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম হ'ল ব'লে ধরা যায়। বৈদিক আর্যরা প্রথমে প্রচীন ইরান দেশে বাস করতেন যদিও মূল আর্য বা আদিম আর্য জাতির বাসস্থান অবশ্যই সেখানে নয়—ইরান আর্যদের চলার পথে একটি সরণী মাত্র। বৈদিক আর্যরা আদি বাসভূমি থেকে ভারতে প্রবেশ করার আগে প্রথমে ইরানে যান। সেখান থেকে তাঁরা ভারতে প্রবেশ ক'রে অনেক দিন মাত্র সপ্তসিন্ধু-বিধৌত দেশে বাস করতেন। সেখান থেকে দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্বে বিস্তার লাভ করতে তাঁদের অনেক বিলম্ব হয়েছিল। সম্ভবত সিন্ধু সৌবীর জাতির প্রাধান্যের জন্যে তাঁরা পাঞ্জাবের দক্ষিণে প্রসার লাভ করতে সময় নিয়েছিলেন। দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক প্রাধান্যে তাঁরা দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তার লাভে বিলম্ব করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু পঞ্চবিংশ খ্রীষ্টপূর্ব শতকে প্রথম বেদ বিভাগের সময়ে তাঁরা সমগ্র আর্যাবর্তে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন। এই সময় থেকে ভারতীয় আর্য জাতি ও আর্য ভাষার সমস্ত ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। ইরান থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এই সময়ের আগে ঋগ্বেদীয় ভাষা ও সভ্যতা কি ভাবে গ'ড়ে ওঠে তার নিখুঁত কালানুক্রমিক আধুনিক অর্থসম্মত ইতিহাস পাওয়া না গেলে পুরাণগুলি থেকে তারও একটা মোটামুটি বিবরণ গঠন করা যায়। আর, ঋগ্বেদীয় সভ্যতা যখন যজুর্বেদীয় সভ্যতায় পরিণত হল অর্থাৎ পুরোপুরি যাজ্ঞিক বৈদিক সভ্যতা সারা আর্যাবর্তে ছড়িয়ে পড়্‌ল, তখন থেকে ইতিহাস পাঠে কোন অসুবিধে নেই। আমরা কতকটা ইচ্ছা ও উদ্যমের অভাবে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়ের ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে নীরব ও অজ্ঞ হয়ে আছি।

অথর্ব বেদের শেষ উপনিষৎ প্রভৃতি যখনকার রচনা এবং যত আধুনিক হোক না, অথর্ব বেদের সঙ্কলনকার্য খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে সমাপ্ত হয়েছিল। তার প্রমাণ, মহাভারতে অথর্ব বেদের কথা আছে। অথর্ব বেদের প্রকৃত বৈদিক অংশ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সঙ্কলন করেন। ২৪৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যজুর্বেদ পর্যন্ত সঙ্কলিত হয় এবং প্রথমবার বেদ-বিভাগ সম্পন্ন হয়। ব্যাস উপাধিধারী বৈদিক পণ্ডিত বা বেদব্যাস ঐ কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি প্রথম বা জ্যেষ্ঠ ব্যাস হলেও খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে কনিষ্ঠ ব্যাস অথর্ব বেদ পর্যন্ত সম্পাদনা ক'রে শেষবারের মতো বেদ-বিভাগ করেন। বেদ সঙ্কলন কর্ম চূড়ান্তভাবে শেষ করেন ব'লে তৎকালীন সমাজে তিনি বেদব্যাস ব'লে অভিহিত হন; ইনিই ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের পিতা; ইনি যজুর্বেদ-সম্পাদক ব্যাসকে অতিক্রম করেন চতুর্থ ও পঞ্চম বেদ প্রণয়নের জোরে; অথর্ব বেদ-সঙ্কলন এবং মহাভারত-রচনার দুর্লভ খ্যাতির অধিকারী এই ব্যাসই এখন "বেদব্যাস" খ্যাতির একমাত্র অধিকারী। যে-শ্রেণীর বেদবিৎ পণ্ডিতকে ব্যাস বলা হত, পরবর্তী যুগে সেই শ্রেণীর বিভিন্ন "ব্যাস" ভাগবত সমেত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যগুলি রচনা করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাত্র একখানি পুরাণ রচনা করেন; কিন্তু সেটিই সম্ভবত কাব্যাংশে সর্বোত্তম; তার নাম ভাগবত। অথর্ব বেদ সঙ্কলন আর মহাভারত ও ভাগবত রচনার মতো মহৎ সাহিত্যিক কর্ম সম্পাদনের জন্যে তিনি অন্য সব ব্যাসের খ্যাতি একাকী গ্রাস করতে পেরেছিলেন। রামচন্দ্রের সময়ে মহাভারতকার বেদব্যাস ছিলেন না ব'লেই রামায়ণে কোথাও বেদ-ব্যাসের নাম নেই। প্রভূত খ্যাতির অধিকারী যে বেদব্যাস, তিনি যজুর্বেদ সঙ্কলক ব্যাস নন ব'লেই রামায়ণে কোথাও কোন প্রসঙ্গে তাঁর কৃতিত্বের উল্লেখমাত্র নেই।

ভাষা, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ যে কোন দিক দিয়ে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ মহাগ্রন্থ মহাভারত থেকে কেবল

যে আলেকজান্দরের অভিযানের পূর্ববর্তী কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস ধারণা করা যায় তা নয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ববর্তী দীর্ঘকালের ইতিহাসও অনেকটা গঠন ক'রে নেওয়া যায়। সুতরাং ভারতের ইতিহাসের শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা আরম্ভ হবে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে তো বটেই, পঞ্চাদশ-শতাব্দী থেকেও বটে। সেমীয় বাবিলোনীয় আসুরীয় জাতির ইতিহাসের তুলনায় ভারতীয় আর্যজাতির সুপ্রমাণিত ইতিহাসকে এ-ব্যাপারে ন্যায্য প্রাধান্য দিতে হবে, কবিকথন বা গালগল্প ব'লে উপেক্ষা করলে চলবে না। সত্যনিষ্ঠ পাঠকের কাছে মহাভারতের ঐতিহাসিক মূল্য উপেক্ষা করা পাগলের কাজ ব'লেই মনে হবে।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ১৪৪১—৬২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়টা পৌরাণিক ভারতের যুগ; ৬২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে বৌদ্ধ ভারতের আয়ুষ্কাল গণনা করা যেতে পারে।

১৪৪২ খ্রীষ্টপূর্ব সালে মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে বৈদিক ব্রহ্মণ্য সভ্যতার নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছিল; ব্রাহ্মণরা সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্যে কৃষ্ণের সহায়তা গ্রহণ করেন; কৃষ্ণের সাহায্যে ভারতের আর্যদের বহু প্রসিদ্ধ ক্ষাত্রশক্তি অন্তত সহস্র বৎসরের জন্যে চূর্ণবিচূর্ণ হয়। তখনকার অধঃপতিত ব্রাহ্মণরা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে কোন কুকার্য সাধনে প্রস্তুত ছিলেন। সে-সময়ে পাণ্ডব পক্ষীয় ব্যাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের নীতিবুদ্ধি নিতান্ত কলুষিত ছিল। ঔরস পুত্র অপেক্ষা ক্ষেত্রজ পুত্র যে বেশি বাঞ্ছনীয়, এই ধরণের উক্তি একদিকে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য রক্ষার অভিসন্ধি, অন্যদিকে পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়কে খুশি করার চেষ্টা। মহাভারতের যুগ বৈদিক সভ্যতার অবক্ষয় বা ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার যুগ। অনুরূপভাবে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-যুগ বৈদিকোত্তর পৌরাণিক ব্রহ্মণ্য সভ্যতার অবক্ষয়ের যুগ। ২৪৪৯—১৪৪১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত সহস্র বর্ষব্যাপী সময়টা বৈদিক সভ্যতার সুপ্রতিষ্ঠার যুগ। তার আগে সমগ্র বেদ যজুর্বেদ নামে পরিচিত ছিল। ২৪৪৯ সালে বেদ "ত্রয়ী" নামে অভিহিত হয়; অথর্ববেদ তখন তার অন্তর্গত ছিল, তার কোন পৃথক সত্তা ছিল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কতকগুলি সূক্তকে পৃথক ক'রে অথর্ববেদ সঙ্কলন করেন। তাঁর সময় পর্যন্ত সহস্রবর্ষ প্রসারিত যুগে বৈদিক ভারতে আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছিল।

বাস্তবিক পক্ষে সুযোধন বা দুর্যোধনের পতনের পর ভারতে আর্যভাষা গুলিকে আরও সম্প্রসারিত ক'রে দেবার মতো ক্ষাত্রশক্তি বৈদিক আর্যদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। কৃষ্ণ এই দুরবস্থার জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিলেন; তিনি ইচ্ছা ক'রে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বাধতে দিয়েছিলেন; তাঁর অসাধু মনোবৃত্তি কঠোরভাবে সমালোচনার যোগ্য। (কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত—দ্রোণপর্ব, ১৬৯-৭৪ পৃষ্ঠা সাধারণ বাঙালি পাঠককে পূর্বসংস্কারবর্জিত মনে পড়তে অনুরোধ করা হ'ল।) ১৪০০—৬০০ খ্রীষ্ট পূর্ব অব্দে অসুরদের প্রবল পরাক্রান্ত থাকার সময়ে কৃষ্ণের দুর্বুদ্ধির দোষে ভারতীয় আর্যদের সামরিক দৌর্বল্য সংঘটিত হয়। সম্ভবত ঐ সময়ে ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তিতে বীতশ্রদ্ধ ইরানীয় আর্যরা অসুরসামর্থ্যে মুগ্ধ হয়ে বিপথে ধাবিত হয়ে আলাদা হয়ে যায়। ১৪৪১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সময় অরাজকতা, অনাচার, বিশৃঙ্খলা, আচারমূলক ধর্ম ও অসুর প্রাধান্যের যুগ। কৃষ্ণের কুবুদ্ধির জন্যে ভারতীয় আর্যভাষীরা ১১১৫ বছরের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। কৃষ্ণ একদিকে সুযোধন বা প্রকৃত কৌরব পক্ষের সঙ্গে অন্যদিকে পাঞ্চাল-পাণ্ডবদের যুদ্ধ বাধিয়ে দেন। মহাভারতের যুদ্ধকে ধার্তরাষ্ট্র বনাম পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ বলা যায়। যুদ্ধ শেষে পুরোনো কুরু বা পুরু বংশ প্রায় লুপ্ত হল এবং যদু বংশের অতিবৃদ্ধি ঘটল সাময়িকভাবে; যযাতির পুত্র পুরু নির্বংশ-প্রায় হন; কিন্তু যযাতির অন্যতম পুত্র যদুর বংশ অর্থাৎ যাদবরা প্রভূত বৃদ্ধি লাভ করে। আত্মঘাতী কলহে যাদবরা মারা যাওয়ায় কৃষ্ণের প্রাধান্য বিস্তারের পরিকল্পনা ধ্বংস হয়। তিনি ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদের মধ্যে যে আত্মঘাতী যুদ্ধ কু-পরামর্শের দ্বারা বাধিয়ে দিয়ে নিজের বংশের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন, সেই একই আত্মঘাত তাঁর নিজের বংশের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার ব্যর্থতা ও অন্তঃসার শূন্যতার সঙ্গে গান্ধারীর অভিশাপের সত্যতা প্রতিপন্ন হল। কৃষ্ণ কর্ণের প্রকৃত পরিচয় দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রকাশ ক'রে দিয়ে এক কথায় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ থামিয়ে দিতে পারতেন; তা না ক'রে তিনি

কর্ণকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও পরবর্তী কালে তাঁর ভারতে অবতার ও মহাপুরুষ রূপে পূজিত হবার কারণ, ব্রাহ্মণ কথক ঠাকুরদের বিপুল প্রচার। ব্রাহ্মণদের কায়েমী স্বার্থরক্ষায় তিনি যত্নবান্ ছিলেন মনে ক'রে ব্রাহ্মণরা তাঁর লীলা মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে যথাসাধ্য করেছিলেন। অবশ্য তাঁর ধূর্ত ও শঠ রাজনীতি চর্চার পরিণামে ব্রাহ্মণরাই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। ভারতে রাম ও কৃষ্ণের এত আদরের কারণ, ব্রাহ্মণরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা দুজনেই ব্রহ্মণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন। রাম সম্পর্কে এ ধারণা কতকটা সত্যও বটে। কিন্তু কৃষ্ণের প্রচেষ্টায় ভারতে ব্রাহ্মণদের কল্যাণ হওয়া দূরে থাক, পরে এমন ঘোর অকল্যাণ হয়েছিল যা চাণক্যের আবির্ভাবের আগে বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নি কোন ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে। কৃষ্ণ-কৃত অকল্যাণ চাণক্য দূর করেন ভারতে ব্রহ্মণ্য ও ক্ষাত্রশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে।

[ক্রমশঃ

বিদায়ের গান

শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখিতে লিখিতে পাতা শেষ হ'লো
আর ত নাহিক স্থান।
দেখিতে দেখিতে বসুমতী মোরে
বিদায় করিতে চান॥
বলেন, খাতার যেমন পূর্ণ হ'লো
কলমের লেখা গুলি।
পূর্ণ হয়েছে জীবনের খেলা
এই বেলা চল চলি॥
সত্যই দেখি তাই।
এ যুক্তি তর্ক খণ্ডতে মোর
কোনই শকতি নাই॥
দন্তগুলি ল'য়েছে বিদায়
কর্ণ বধির প্রায়।
নাসিকা যন্ত্র বিদায় মন্ত্র
গাহিতেছে দেখি হায়
চক্ষু বলে ওরে, আর পারি না রে
বদ্ধ হ'তে না চাই।
ধান শুনিতে কান শুনিতেছে
সুপটু কর্ণ ভাই॥
জিহ্বা বলিতেছে, আস্বাদনে মোর
আসে নাক ভাল কিছু
ত্বক্ বলিতেছে, অনুভবে মোর
আর ছুটো নাক পিছু॥
সবাই আজ বিদ্রোহী হ'লো
যারা ছিল মোর বশে।
সত্যই খাতা পূর্ণ হ'য়েছে
বসুমতী মৃদু হাসে॥
হাসিছেন আর গাহিছেন বসি
মোর বিদায়ের গান।
ভুলের মাঝারে এনেছিনু তোরে
ভুলে হ'লো অবসান॥

প্রত্যাবর্তন

কথা, সুর ও স্বরলিপি : : গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মেঘলা মাখানো এ ঘরে আমার আলোক-দরোজা ঠেলে,
মাঝখানে এসে দাঁড়ালে আবার শরৎ হাসিটি মেলে ॥
তাই বুঝি আজ ভোর না হতেই মন উঠেছিল গেয়ে,
কি যেন হারানো হৃদয়ের ধন সহসাই যাব পেয়ে,
কত দিন আহা দেখিনি তোমারে, কত দিন পরে এলে ॥

চেনা চরণের আগমনী শুনে আঁখি তুলে আবাহনে,
নয়নে কি লেখা পড়েছি তোমার নীরব সম্ভাষণে।
ছিল যদি জানা কাঁদাবে যত না তারও চেয়ে বেশী কেঁদে,
ফিরবে আবার বেদনার ডোরে জড়াবে নিজেই সেধে,
কেন ভুল বুঝে দূরে গিয়ে আহা অকারণে ব্যথা পেলে ॥

II স র গ ম গ র I স স ন্ ধন্ ন ধ ৗ I প - ম গ রগ র I স - - - - - I
মে ঘ্ লা ০ মা খা নো ০ ০ ০০ ০ ০ এ ০ ঘ রে ০০ আ মা ০ র্ ০ ০ ০
স র গ গ গ গ I গ ম গ র গ গ I গ ম প ম ম গ I র গ - - - - I
মে ঘ্ লা মা খা নো এ ঘ রে আ মা র আ লো ক দ রো জা ঠে লে ০ ০ ০ ০
স স র র র র I র র র র গম মপ I প প র্ম গ গ র I রস গ. - - - - I
মা ঝ খা নে এ সে দাঁ ড়া লে আ বা ০ র শ র ত হা সি টি মে০ লে ০ ০ ০ ০

[র্ র্]
II র্সা র্স র্স র্স র্স র্স I ন ন ন ধ ন ধ I পধ পধ প ম গ গ I ম ধ - - - - I
তা ই বু ঝি আ জ ভো র না হ তে ই ম০ ০ন্ উ ঠে ছি ল গে য়ে ০ ০ ০ ০
প ধ ন ধ ন ধ I প ধ ম প ম গ I র র র র গ প I ম ম গ - - - I
কি যে ন হা রা নো হৃ দ য়ে র ধ ন স হ সা ই যা ব পে ০ য়ে ০ ০ ০
স স স ন্ ধ্ স I ম - - - - - I ম ম ম গ রগ র I প - - - - - I
ক ত দি ন ০ আ হা ০ ০ ০ ০ দে খি নি ০ তো মা তো ০ ০ ০ ০ ০
ধ ন প ধ প ম I র - প - - - II
ক ত দি ন প রে এ ০ লে ০ ০ ০

II স স স ন্ ধ্ ন্ I স র র র র র I স গ র গ - - I র প ম গ - - I
চে না চ র ণে র আ গ ম নী শু নে আঁ খি তু লে ০ ০ আ বা হ নে ০ ০
ক্ষা ক্ষা ক্ষা ক্ষা ক্ষা ক্ষা I ক্ষা প ধ ক্ষা প প I ন ধ প - - - I স স স স ন ধ্ I
ন য় নে কি লে খা প ড়ে ছি তো মা র প ড়ে ছি ০ ০ ০ নী র ব স ম্ ভা
ন্ র র - - - I প প ম গ গ র I রস গ - - - - I
ষ ণে ০ ০ ০ ০ নী র ব স ম্ ভা ষ০ ণে ০ ০ ০ ০

[র্গ র্গ]
র্স র্স র্গ র্র র্র র্স I র্র র্র র্র র্স র্স ন I ন ন ধ পধ ম গ I ম ধ - - - - I
ছি ল য দি জা না কাঁ দা বে য ত না তা র৫ চে য়ে০ বে শী কেঁ দে ০ ০ ০ ০
প পন ন ন ধ ন I প ধ ম প ম গ I র র র র গ প I ম ম গ - - - I
ফি ০র্ বে আ বা র বে দ না র ডো রে জ ড়া বে নি জে ই সে ০ ধে ০ ০ ০
স স স ন্ ধ্ স I ম - - - - - I ম ম ম গ রগ র I প - - - - - I
কে ন ০ ভু ল বু ঝে ০ ০ ০ ০ ০ দূ রে গি য়ে ০০ আ হা ০ ০ ০ ০ ০
ধ ন প ধ প ম I র - প - - - II II
অ কা র ণে ব্য থা পে ০ লে ০ ০ ০

প্রতিক্রিয়া

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

"বিবেক সে শব্দটা লোকে আর ব্যবহার করে না আজকাল," বলেন লাসিনা, "ওটাকে বলা হয় অবদমন। কিন্তু বিবেক বলতে যা বোঝায় তার তিন ভাগের এক ভাগও প্রকাশ পায় না ঐ নতুন শব্দটির মাধ্যমে। ফ্যাক্টরীর মালিক গিয়ের্কএর কথা তোমাদের কারও মনে আছে কিনা জানি না। গিয়ের্ক ছিল বেশ অর্থবান, আচার ব্যবহারে অমায়িক আর দেখতেও সুপুরুষ। শোনা যেত গিয়ের্ক নাকি বিপত্নীক, কিন্তু ওর বেশী আর কিছুই লোকে জানত না তার সম্বন্ধে। তার স্বভাবটা ছিল চাপা। বয়স যখন তার চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চাশের কাছাকাছি সেই সময় এক তরুণীর প্রেমে পড়ে সে। মেয়েটির বয়স তখন মাত্র সতেরো আর তার রূপের জৌলুস ছিল এমনি যে তার দিকে একবার তাকালে তোমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠবে। সত্যিকার সৌন্দর্য্য মানুষের মনে এমন একটা বেদনা বা মমতার অনুভূতি সৃষ্টি করে যা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই মেয়েটিকে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করল গিয়ের্ক, যেহেতু অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে যার, বিয়ের ব্যাপারে তার সাফল্য অনিবার্য্য।

মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে ওরা গেল ইতালীতে এবং সেখানে যা ঘটল তা এই: ভিনিসের প্রসিদ্ধ কাম্পানিল পাহাড়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে ওরা উঠল ঐ পাহাড়ে এবং সেখান থেকে গিয়ের্ক যখন তাকাল নীচের দিকে—সবাই বলে ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি অপরূপ মনোরম—তখন তার মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাশে, তরুণী স্ত্রীর দিকে ফিরে হঠাৎ পড়ল মাটিতে—মনে হল কে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে। গিয়ের্ক এমনিতেই ছিল গম্ভীর, এই ঘটনার পর সে আরও গম্ভীর হয়ে গেল। সে অবশ্য এমন একটা ভাব দেখাবার চেষ্টা করল যেন কিছুই হয়নি তার, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন চঞ্চল, উদভ্রান্ত হয়ে উঠল। এ ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক, তার স্ত্রী অত্যন্ত ভয় পেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনল বাড়িতে। পার্কের ধারে ওদের সুরম্য বাড়ি—দামী আসবাবপত্রে সাজানো। আর ঐখানেই গিয়ের্কএর অদ্ভুত ব্যাধিটা দিনে দিনে জটিল হয়ে উঠল। বাড়ির প্রতিটি জানালা সে পরীক্ষা করে দেখত যথারীতি সেটা বন্ধ আছে কিনা এবং পরীক্ষা শেষ করে এসে বসতে না বসতেই আবার উঠে পড়ত চঞ্চলভাবে জানলাগুলো পুনরায় দেখে আসার জন্য। এমন কি রাত্রেও বিছানা থেকে উঠে সারা বাড়ি নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াত প্রেতের মত। তার এই অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অস্পষ্টস্বরে সে শুধু বলত, তার মাথাটা দিবারাত্র ঘুরছে এবং তার ভয় হয় জানলাগুলো বন্ধ করা না হলে সে হয়তো জানলা দিয়ে পড়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্ত্তে। সুতরাং জানলাগুলিতে লোহার গরাদে লাগাবার ব্যবস্থা করলে তার স্ত্রী—যাতে ঐ অহেতুক ভয়টার হাত থেকে নিষ্কৃতি সে পায়। দিন কতক এ ব্যবস্থায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল। গিয়ের্কএর অস্থিরতা কমে গেল অনেকটা, মনে হল যেন সে সুস্থ হয়ে উঠছে। কিন্তু আবার রোগের লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠল। আবার সে জানলায় জানলায় ঘোরাঘুরি শুরু করল। গরাদেগুলো নাড়া দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল ওগুলো মজবুত কিনা। এর পর ইস্পাতের খড়খড়ি এনে বসানো হল জানলায় এবং তার অন্তরালে ওরা দিন কাটাতে লাগল

কয়েদীদের মত। এ অবস্থায় গিয়ের্ক অবশ্য একটু শান্তি লাভ করল, কিন্তু এখন আবার অন্য রকম উপসর্গ দেখা দিল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় গিয়ের্কএর মাথা ঘুরতে লাগল। কাজেই যখন সে উপরে আসত বা নীচে নামত তখন কেউ তার হাতটা ধরত শক্ত করে যেমন ধরতে হয় পঙ্গুকে। কিন্তু হাত ধরা সত্ত্বেও সে কাঁপত থরথর করে এবং ঘামে তার সর্বাঙ্গ যেত ভিজে। মাঝে মাঝে সে বসে পড়ত সিঁড়ির মাঝপথে এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করত এমনি ভয়ঙ্কর আতঙ্ক হয়েছিল তার।

অবশ্য এ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া হতে লাগল এবং এসব ব্যাপারে সচরাচর যা ঘটে, বিভিন্ন চিকিৎসক বিভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। একজন বললেন, মাথা ঘোরার কারণটা হচ্ছে অতিরিক্ত পরিশ্রম, আরেকজন বললেন, এটা একরকমের ব্যাধি, নাম ল্যাবরিন্থাইটিস্, তৃতীয়জন বললেন, এটার উৎপত্তি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে এবং চতুর্থজনের ধারণা মস্তিষ্কে রক্তের স্বল্পতাই এর কারণ। আমি লক্ষ্য করেছি, যখনই কেউ বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন তখনই এক অজ্ঞাত মানসিক প্রক্রিয়ার ফলে তাঁর মধ্যে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। ঐ ধরণের একজন বিশেষজ্ঞ বলবেন, আমার মতে ব্যাপারটা হল এই রকম; আরেকজন আপত্তি তুলে বলবেন, না, ওটা ঠিক নয়, আমার মত হচ্ছে ঠিক উল্টো। আমি বলি কি, রোগী দেখার সময় ঐসব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী প্রবেশ দ্বারে ফেলে আসতে হবে—টুপী আর ছড়ির মত। যখনই ঐ রকম দৃষ্টিভঙ্গীওয়ালা কোন বিশেষজ্ঞকে তুমি চিকিৎসার সুযোগ দেবে তখনই সে নির্ঘাৎ কোন অনিষ্ট করে বসবে নয়তো প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে তার মতভেদ ঘটবে। কিন্তু সে কথা থাক, গিয়ের্কের কথায় এখন ফিরে আসি। প্রতি মাসেই একজন নতুন নাম-করা বিশেষজ্ঞ এসে গিয়ের্কএর চিকিৎসার ভার নিয়ে তার ওপর উৎপীড়ন চালিয়ে যেতে যেতে লাগলেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী। গিয়ের্ক অবশ্য বেশ বলিষ্ঠ ছিল বলেই এই সব চিকিৎসার অত্যাচার সহ্য করতে পেরেছিল। কিন্তু শেষটা সে রোগে এমনি কাতর হয়ে পড়ল যে আর উঠতে পারত না চেয়ার থেকে, কারণ মাটির দিকে তাকালেই মাথাটা ঘুরত তার। কাজেই চুপচাপ বসে সে তাকিয়ে থাকত শূন্যের পানে—কেবল মাঝে মাঝে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠত থরথর করে আর ঐ কাঁপুনিটা আসত যখন সে কাঁদত।

এই অবস্থায় একজন নতুন চিকিৎসক—স্নায়ুবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী—তার চিকিৎসা শুরু করলেন। নাম তাঁর স্পিটস্। ডাক্তার স্পিটস্ একেবারে ভেলকি দেখিয়ে দিলেন। তাঁর চিকিৎসা প্রণালী ছিল মনোবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, প্রত্যেকেরই অবচেতন মনে নানা রকমের ভয়ঙ্কর চিন্তা, স্মৃতি বা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যা সে প্রবল চেষ্টায় দমন করে রাখে, কারণ ঐগুলো সম্বন্ধে একটা নিদারুণ ভয় আছে তার। আর ঐ অবদমিত চিন্তা মানুষের মনের মধ্যে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করে যা থেকে স্নায়বিক বিকার দেখা দেয়। যখন কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষ পর্যবেক্ষণের ফলে ঐ নিরুদ্ধ স্মৃতি বা কামনাকে তার মনের গোপন কন্দর থেকে বাইরে টেনে আনেন তখন রোগীর যাতনার উপশম হয় এবং আরোগ্য লাভ করে সে। কিন্তু মনঃ-সমীক্ষার সাহায্যে যিনি চিকিৎসা করেন তাঁকে গোড়ায় রোগীর বিশ্বাস অর্জন করতে হবে যাতে রোগী সব কিছুই অকপটে ব্যক্ত করে তাঁর কাছে—রাত্রে সে কী স্বপ্ন দেখে, শৈশবের কী কী ঘটনা তার স্মরণে আছে ইত্যাদি। সব কিছু জানার পর চিকিৎসক রোগীকে বলবেন, "দেখুন, বহু বৎসর পূর্বে আপনার এই ধরণের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল—ব্যাপারটা খুবই কলঙ্কজনক, আপনি সেটা ভুলে থাকতে চান, কিন্তু ভুলতে পারেন না—আপনার অবচেতন মনে আশ্রয় নিয়েছে সেটা। এটাকে আমরা বলি সাইকিক ট্রোমা। কিন্তু এখন ওর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন আপনি, আপনার আর কোন ব্যাধি নেই—আপনি সুস্থ।" এই হল ঐ চিকিৎসার গূঢ় রহস্য।

সত্যিই ডাক্তার স্পিটস্এর চিকিৎসা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। ধনী লোকদের যে কতরকমের অবদমিত স্মৃতি আছে তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। গরীব লোকেরা সচরাচর এই সব যাতনা থেকে মুক্ত। ডাক্তার স্পিটসএর পসার ছিল খুব। সমস্ত বড় বড় চিকিৎসক গিয়ের্কএর চিকিৎসায় যখন বিফল হলেন তখন ডাকা হল ডাক্তার স্পিটস্কে। স্পিটস্ রোগী পরীক্ষা করেই বললেন, ঐ মাথাঘোরা ব্যাপারটা স্নায়ুঘটিত এবং ঐ

ব্যাধি থেকে রোগীকে মুক্ত করার ক্ষমতা তিনি রাখেন। কিন্তু মুস্কিল হল একটা বিষয়ে। গিয়ের্ক কথা ব'লত খুব কম। ডাক্তার স্পিটস্ যে সব প্রশ্ন করতেন তার উত্তরে সামান্য দু'একটা কথা বলেই চুপ করে যেত গিয়ের্ক। শেষটা ডাক্তার স্পিটস্‌কে বিদায় নিতে বলত গিয়ের্ক—বিরক্তি চাপতে না পেরে। ডাক্তার স্পিটস্ নিরাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু ডাক্তারী ব্যবসায়ে সুনাম অর্জন করতে হলে এ ধরণের অদ্ভুত রোগীকে ছেড়ে দেওয়া চলে না। স্নায়বিক বিকারের এ রকম কেস বড় একটা হাতে আসে না। তা ছাড়া ইর্মা অর্থাৎ গিয়ের্কএর হতভাগিনী সুন্দরী স্ত্রীর কথাটাও না ভেবে পারা যায় না। কাজেই ডাক্তার স্পিটস্এর পক্ষে কেস ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হল না, বরং আরও উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে মন দিলেন পর্যবেক্ষণের কাজে।

"গিয়ের্কের রোগের মূল—তার অবদমিত স্মৃতিটা—আমি আবিষ্কার করবই," উত্তেজিতভাবে বলেন ডাক্তার স্পিটস্, "যদি না পারি, চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে দর্জির দোকানে কাজ নেব আমি।"

এরপর স্পিটস মনোবিকলনের এক নতুন পদ্ধতি নিয়ে অগ্রসর হলেন। প্রথমটা তিনি গিয়ের্ক'এর বয়স্ক আত্মীয় ও আত্মীয়াদের সন্ধান করলেন, তারপর তাদের বিশ্বাস অর্জন করবার চেষ্টা করলেন যাতে তারা সব কথাই তাঁর কাছে ব্যক্ত করে অকপটে। চিকিৎসককে গোড়াতেই যে বিষয়গুলি শিখতে হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে অপরের কথা ধীরভাবে শোনা—ধৈর্যই হল তাঁর প্রথম পাঠ। গিয়ের্ক'এর আত্মীয়স্বজন খুবই খুশি হলেন স্পিটসএর আচরণে। প্রত্যেকের কথাই তিনি শুনতেন বিশেষ শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্পিটস্এর আশা ফলবতী হল না এবং উপায়ান্তর না দেখে এক গোপন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের শরণার্থী হলেন তিনি। তারা দুজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠাল এক অজ্ঞাত স্থানে। ওরা যখন ফিরে এল, তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে স্পিটস্ সোজা চলে গেলেন গিয়ের্ক'এর কাছে। গিয়ের্ক তখন একটি অন্ধকার কক্ষে চুপ করে বসেছিল একটা চেয়ারে। এখন সে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে, হাত-পা নাড়াতেও যেন কষ্ট হয় তার।

"মিঃ গিয়ের্ক," ডাক্তার স্পিটস্ বললেন কোমলকণ্ঠে "আপনাকে বিরক্ত করব না আমি। আমার কোন কথারই জবাব আপনাকে দিতে হবে না। কোনো বিষয়েই আপনাকে কোন প্রশ্ন করবো না আমি। আমি যা করতে চাই তা হচ্ছে আপনার ঐ মাথা ঘোরার কারণটা দূর করা। আপনি ওটাকে ঠেলে দিয়েছেন অবচেতনার মধ্যে, কিন্তু ঐ অবদমিত স্মৃতিটা এত প্রবল যে ওটা ঘোর বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করেছে···

"আপনাকে আমি ডেকে পাঠাইনি, ডাক্তার," বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে গিয়ের্ক বলে এবং হাতটা বাড়ায় হ্যাণ্ড্-বেলের দিকে।

"তা আমি জানি," ধীরস্বরে জবাব দেন ডাক্তার স্পিটস্, "কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন। প্রথম যখন ভিলিস কাম্পানিল পাহাড়ের ওপর আপনার এই মাথা-ঘোরা শুরু হয় তখন আপনার মনের মধ্যে কী অনুভূতি জেগেছিল তা একবার স্মরণ করার চেষ্টা করুন।"

হ্যাণ্ড্‌বেলের উপর আঙুলটা রেখে নিস্পন্দভাবে বসে থাকে গিয়ের্ক।

"আপনার মনে তখন একটা তীব্র অনুভূতি জেগে-ছিল," স্পিটস্ বলতে থাকেন ধীরকণ্ঠে, "হ্যাঁ, একটা ভয়ঙ্কর দুর্নিবার বাসনা জেগেছিল আপনার সুন্দরী স্ত্রীটিকে ঘণ্টাঘর থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেবার জন্য। কিন্তু যে হেতু ওঁর প্রতি আপনার অনুরাগ ছিল প্রচণ্ড রকমের, সে জন্য একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় আপনার মনে এবং সেই দ্বন্দ্ব আপনাকে এত বিপর্যস্ত করে তোলে যে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান আপনি।"

গিয়ের্ক একেবারে স্তব্ধ। হ্যাণ্ড্‌বেলের দিকে যে হাতটা বাড়ানো ছিল সেটা টেবিলের ওপর নেতিয়ে পড়ে অবশভাবে।

"তার পর থেকেই," ডাক্তার স্পিটস্ বলে চলেন, "এই মাথা ঘোরাটা, অতলে পড়ে যাওয়ার এই ভয় আপনার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। সেই থেকে জানলাগুলো আপনি বন্ধ করে রেখেছেন এবং উঁচু জায়গা থেকে নীচের দিকে তাকানো আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে যেহেতু একসময় আপনার মনের মধ্যে

একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছা পেয়েছিল মিসেস্ গিয়ের্ককে ঠেলে নীচে ফেলে দেবার জন্য…

গিয়ের্ক একটা আর্ত্তনাদ করে ওঠে যা অত্যন্ত অস্বাভাবিক শোনায়।

"হ্যাঁ," ডাক্তার স্পিটস্ পুনরায় বলতে থাকেন, "এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে অস্বাভাবিক ভয় এটা এল কোথা থেকে? মিঃ গিয়ের্ক, আপনার প্রথম বিবাহ হয়েছিল আঠারো বছর আগে। আপনার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে আল্‌্‌স্ পর্ব্বতাঞ্চলে ভ্রমণের সময়। হো হে ওয়ান্ড এর ওপর ওঠবার সময় তিনি হঠাৎ পড়ে যান নীচে হ্রদের মধ্যে এবং তাঁর সম্পত্তি আপনি পান উত্তরাধিকারী হিসাবে।"

গিয়েক´এর দ্রুত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। গিয়েক´ যেন কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছে।

"গিয়েক´," গম্ভীরকণ্ঠে বলেন ডাক্তার স্পিটস্, "তোমার প্রথমা স্ত্রীকে হত্যা করেছিলে তুমি। তুমিই তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলে পাহাড় থেকে। আর সেই কারণেই—হ্যাঁ, আমি বলছি সেই কারণেই তোমার মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, দ্বিতীয়া স্ত্রীকেও তোমায় হত্যা করতে হবে—যার ওপর তোমার সত্যকার দরদ আছে। সেই জন্যেই উঁচু জায়গায় উঠতে ভয় হয় তোমার—সেই জন্যেই তোমার ঐ মাথাঘোরা…"

"ডাক্তার," কাতরকণ্ঠে বলে গিয়েক´ "ডাক্তার, আমি কী করবো এখন? কী করলে এই মাথাঘোরা বন্ধ হবে?"

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন ডাক্তার স্পিটস্।

"মিঃ গিয়েক´," স্পিটস্ বলেন, "আমি যদি ধর্ম্মযাজক হতাম, তাহলে আপনাকে উপদেশ দিতাম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাতে ভগবান আপনার ওপর করুণা করেন। কিন্তু আমরা- ডাক্তারেরা—ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিনা। এখন আপনার কী করা কর্ত্তব্য সেটা আপনাকেই নির্দ্ধারণ করতে হবে। কিন্তু ডাক্তারী মতে আপনি যে মুক্ত লাভ করেছেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। উঠে দাঁড়ান, মিঃ গিয়ের্ক।"

গিয়ের্ক উঠে দাঁড়ায়—মুখখানা কাগজের মত শাদা।

"বলুন দেখি, এবার আপনার মাথা ঘুরছে কি না?" স্পিটস্ জিজ্ঞাসা করেন শান্তস্বরে।

"না," গিয়ের্ক জবাব দেয় মাথা নেড়ে।

"এখন তাহলে আপনি রোগমুক্ত;" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন স্পিটস্, "অন্য সব উপসর্গও শীঘ্রই চলে যাবে। ঐ মাথা ঘোরাটা ছিল অবদমনের ফল। এখন ওটা থেকে মুক্ত হয়েছেন যখন, তখন শীঘ্রই আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। জানলা দিয়ে এখন বাইরে তাকাতে পারেন কি? মাথা ঘুরছে না তো? বেশ, তাহলে আর কোন ভয় নেই। এখন আপনার মনে হচ্ছে যেন রোগটাকে ঝেড়ে দিয়েছেন, কেমন? একটুকুও মাথাঘোরা নেই? মিঃ গিয়ের্ক আজ পর্য্যন্ত যত কেস্ পেয়েছি তার মধ্যে আপনারটাই হচ্ছে সব চেয়ে চমৎকার!" আনন্দে ডাক্তার স্পিটস্ হাত দুখানা যুক্ত করে ঘষতে থাকেন।

"এখন আপনি সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত। আমি কি মিসেস গিয়ের্ককে ডেকে পাঠাতে পারি? না? ও, বুঝেছি, আপনি নিজেই ওঁকে অবাক করে দিতে চান। আপনাকে চলাফেরা করতে দেখলে কী খুশিই না হবেন উনি। বিজ্ঞান কী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটাতে পারে তা একবার ভেবে দেখুন, গিয়ের্ক।"

নিজের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে ডাক্তার স্পিটস্ হয়তো ঘণ্টা দুই এই রকম বকে যেতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল গিয়ের্কএর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন, তাই ব্রোমাইড্‌এর ব্যবস্থা করে বিদায় নিলেন তিনি।

"চলুন, ডাক্তার, আমি আপনাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি," গিয়ের্ক বলে নম্রভাবে এবং সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় ডাক্তারের সঙ্গে।

"খুবই আশ্চর্য্য ব্যাপার, মাথাঘোরার কোন লক্ষণই আর নেই," ডাক্তার স্পিটস্ বলেন উচ্ছ্বসিত ভাবে, "আমার চেষ্টা তা হলে সার্থক হয়েছে। আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ তো?"

"হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ," মৃদুস্বরে বলে গিয়ের্ক এবং ডাক্তার যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকেন, ধীরভাবে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। সদর দরজা যখন সশব্দে বন্ধ হল ঠিক সেই সময় কী একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ শোনা গেল।

কিছুক্ষণ পরে গিয়েক´এর দেহ দেখতে পাওয়া গেল

সিঁড়ির নীচে। তার দেহে তখন প্রাণ নেই, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কয়েক স্থানে থেঁতলে গেছে সিঁড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে।

ডাক্তার স্পিৎসকে যখন খবরটা দেওয়া হল, তিনি আপনমনে শিস দিয়ে মুখটা বিকৃত করলেন। তারপর একখানা মোটা খাতা বের করলেন যার মধ্যে রোগীদের নাম লেখা হত এবং পিয়ের্কের নামের পাশে তার মৃত্যুর তারিখটা লিখে একটি শব্দ যুক্ত করে দিলেন—'সুইসাইডাল'। ওর মানে কী তা তুমি অনায়াসেই অনুমান করতে পারো, মিঃ ডাউনিস্।" *

* চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রখ্যাত কথাশিল্পী কারেল চাপেক্ হইতে।

বহু আলো স্বপ্ন ছিল

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বহু আলো স্বপ্ন ছিল এখানে একদা।
　　আজ নেই। আজ নীরবতা
আমাদের গ্রাস করছে, ভয়াবহ মৌন মরুতা
কী করুণ। আজ নেই কিছু তার নেই।
সে স্বপ্নের সে আলোর কিছু নেই আর।
　　অন্তহীন কেবল আঁধার।

অথচ এখনো সূর্য আকাশের পথ পেরিয়েই
　　রোজ ভোরে ফিরে আসে।
মাঠে মাঠে বীজ বুনি বৃষ্টির বিশ্বাসে।
কিন্তু তবু সে পৃথিবী কেন আর নেই?
অনেক ভেবেছি আমি আমি তা জানি না—
　　শুভ কাজ জানি সব মানা মলমাসে।
এবং আমিও আর বাজাতে পারি না
আমার রক্তাক্ত হাতে বিশুদ্ধির একটিও বীণা।
অদৃশ্য হাতের বিষ আমাদের সমস্ত নিঃশ্বাসে
　　আমাদের সমস্ত বিশ্বাসে
কার যেন নষ্ট হাত—তাকে আমরা কেহই চিনি না

বৈচিত্র্য

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগতের প্রত্যেক মানুষের বহিরাকৃতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন ধরণের তেমনি মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাবও যদি ব্যষ্টিগত হত, তবে এই পৃথিবীর দেড়শ' কোটি নরনারীর অন্ততঃ একশ' কোটি স্বভাবের তালিকা মনস্তাত্ত্বিক অভিধানে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকত। কিন্তু স্বভাব বা প্রকৃতি ব্যষ্টিগত নয় সমষ্টিগত। কারণ একই প্রকৃতির লোক ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্তমান। যেমন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান বা তৃষ্ণার্তকে জলদান এই উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় স্বভাব শুধু সভ্যদেশে, সভ্য জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, যাদের আমরা অসভ্য বলি, অশিক্ষিত বলি, বর্বর বলি তাদের মধ্যেও বর্তমান।

এই স্বভাব দুই ধরণের হতে পারে—সৎ বা অসৎ, প্রশংসনীয় বা নিন্দার্হ, সংকীর্ণ বা উদার। সৎ, প্রশংসার্হ ও উদার স্বভাব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, দৃষ্টান্ত দেখলে মাথা নোয়ায় মাত্র। কিন্তু অসৎ, অনুদার ও নিন্দার্হ স্বভাবই সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়ে থাকে। ইংরাজীতে, সংস্কৃতে ও বাংলাতে যে সব প্রবাদ বাক্য আছে সেগুলির অধিকাংশ কুৎসিত ও সংকীর্ণ স্বভাবের সমালোচনা এবং বিদ্রূপাত্মক পরামর্শ দান। এই সব প্রবাদ বাক্য বিশ্লেষণ করলে কত ধরণের বিদ্ঘুটে হাস্যোদ্দীপক বোকামী পূর্ণ স্বভাবই না চোখে পড়ে যায়। আমাদের মত যাঁরা জীবনের যাত্রাপথে বহুদূর এগিয়েছেন, তাঁরা প্রবাদবাক্য সংকলিত বিচিত্র ধরণের স্বভাব সমূহের যাথার্থ্য ও মর্মার্থ অনেকটা উপলব্ধি করতে পারবেন। যে সব প্রকৃতি বা স্বভাব আইন অনুযায়ী দণ্ডার্হ যেমন, গুণ্ডামী, পরস্বাপহরণ, পরস্ত্রী ধর্ষণ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা প্রবণতা, বাচালতা, উশৃঙ্খলতা, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি তাদের আলোচনা এখানে করছিনা, পরন্তু যে সব মন্দ স্বভাব ঘরে-ঘরে, পথে পথে, পাড়ায় পাড়ায় বর্তমান এবং যারা বাহ্যতঃ নিরীহ হলেও সর্বদা সংসারে দুঃখ, দুর্দশা ও অশান্তির কারণ হয়ে থাকে সেরূপ গোটাকতক বিচিত্র ধরণের প্রকৃতি নিয়েই এই প্রবন্ধ রচনা করতে লেগে গেছি। এই সব নিকৃষ্ট ও বোকামীভরা স্বভাব কিসে সমাজদেহ হতে, গৃহস্থের অঙ্গন হতে, নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান হতে বিতাড়িত হয়, সে নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছিনা, কারণ এরা দুরন্তপণের বলেই প্রবাদ বাক্যের আশ্রয় নিয়ে স্থায়িত্ব-লাভ করেছে। তবে এই সব প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সংসারী মানুষ যাতে সাবধান হতে পারে এইরূপ সদিচ্ছা নিয়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে Dog in the manger। অর্থাৎ নিজেও খাবনা, অপরকেও খেতে দেবনা।

এরূপ বিকৃত স্বভাবের ছেলে, বুড়া, পুরুষ, নারী সর্বত্রই দেখা যায়। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এই স্বভাবের অভিব্যক্তি খুবই বেশী, নিজেও পড়বনা, পাশের ছেলেদেরও পড়তে দেবনা, নিজেও মাষ্টারের কথা শুনব না, অপর ছেলেদেরও শুনতে দেবনা। শুধু স্কুলের ছেলে বলি কেন, গৃহস্থ বাটীর মধ্যেও এই প্রকৃতির লোক আকছার দৃষ্ট হয়। প্রায়ই দেখা যায় এক বাড়ীর দুই শরিকের মধ্যে এক শরিক কলিকাতায় বা বিদেশে স্থায়ী ভাবে বাস করে, আর এক শরিক সংসার নিয়ে গ্রামের বাটীতেই দিন যাপন করে। যে শরিক কলিকাতায় বা অন্য কোথাও বাস করে তার পোড়ো অংশ বন-জঙ্গলে, সাপ-খোপে ভর্তি হয়ে দ্বিতীয় শরিকের নানা বিপদ, নানা অসুবিধার কারণ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় শরিক যদি প্রথম শরিককে গলায় কাপড় দিয়েও অনুনয় করে "তোমার অংশ আমায় বিক্রী কর কিম্বা পরিষ্কার করতে দাও" তবুও প্রথম শরিকের নাগরিক চেতনা দেখা দেবে না—সে তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দেবে—"না, থাক, আমার যখন সুবিধে হবে তখন সাফ করব" ইত্যাদি। এরূপ প্রকৃতি

ঠিক স্বার্থপর নয়, কারণ তারা নিজের সুবিধাও বোঝে না, পরের সুবিধাও বোঝে না. তারা কেবল হৃদয়হীন খেয়ালের দাসত্ব করে।

সংস্কৃতে একটা বুকনী আছে—আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি। কি কাপুরুষতাপূর্ণ, স্বার্থপরতাপূর্ণ জঘন্য প্রকৃতি! (এটা পঞ্চতন্ত্রের একটা নিকৃষ্ট পশুর উক্তি, শাস্ত্রের বচন নয়)। ধনের বিনিময়ে নিজের জীবন রক্ষা অধর্ম নয়, কাপুরুষতাও নয় কিন্তু স্ত্রী বিলিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণরক্ষা করা—এর চেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতি আর কি হতে পারে? যে সব সৈন্য শত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হতে দেখেও যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে বা স্বেচ্ছায় শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করে তারা এই ধরণের প্রকৃতিবিশিষ্ট। অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল, কিন্তু পূর্ববঙ্গের দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়, আমরা সংবাদ পত্রে পড়েছি, যেন কেউ কেউ স্ত্রীকে বাড়ীতে ফেলে রেখে বাড়ী হতে পালিয়েছিল।

যাক্ ইংরাজী ও সংস্কৃতের কথা। এখানে বাঙলা প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে বাঙলা ঘরের ছেলে-মেয়ে, পুরুষ নারী, বালক বৃদ্ধের দুচারটে বিটকেল প্রকৃতির বিশ্লেষণ করি। এই সব প্রবাদ বাক্যকে চলতি কথায় ছড়া বলা হয়।

১। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

এ-এক বিচিত্র চরিত্রের জলন্ত দৃষ্টান্ত! বস্তুবিক এক একটা লোকের অপর একজন লোকের উপর, বিশেষ করে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের উপর এমন একটা বদ্ধমূল বিদ্বেষ থাকে যে বিদ্বেষ্টা প্রত্যেক কাজে বিদ্বিষ্টের একটা না একটা ছল ধরে তাকে বাক্যবাণবিদ্ধ করে মারবেই। একে বলে অকারণ বৈরিতা। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে এরূপ একজন বিদ্বেষের বলি দেখতে পাওয়া যায়। সেই বাড়ীর কোন-একটা লোকের, বিশেষ করে পতিপুত্র-হীনা প্রৌঢ়া বিধবার বিরাক্ত দৃষ্টি সেই হতভাগ্য ছেলেটার বা মেয়েটার দিকে পড়েই থাকবে। কেউ যার দোষ দেখতে পায় না, ঠিক্ঠ্ঠা নারী (নরও হতে পারে) তার সহস্র দোষ দেখবেই—কেবল তার প্রতি মুখ বেঁকানো, কেবল তার ছল ধরা, কেবল তাকে পাঁচজনের কাছে হেয় করবার অপপ্রয়াস! স্কুলে মাষ্টারী করবার সময় এরূপ দৃষ্টান্ত ভুরিভুরি চোখে পড়তো। এক একজন শিক্ষকের কোন ছাত্র বিশেষের উপর যেন পূর্ব জন্মার্জিত আক্রোশ! গোবেচারা ছাত্রের দৈনিক বিড়ম্বনা ত আছেই তার উপর সুদূরপ্রসারী কলভোগ তাকে করতে হতো প্রমোশনের সময় ঐ সংকীর্ণচেতা শিক্ষকের ষড়যন্ত্রে পড়ে অর্থাৎ ছেলেটার বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের উপর প্রভাব-বিস্তারের ফলে ছেলেটার প্রমোশন বন্ধ হয়ে যেতো।

শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'রামের সুমতির' বালক রাম, এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রামের বৌদিদি নারায়ণীর মা দিগম্বরীকে স্মরণ করুন। হিংসুটে কুচুটে, সংকীর্ণহৃদয়া, অপর সংসার হতে উড়ে এসে জুড়ে বসা, দিগম্বরী বাড়ীর ও বিষয় আশয়ের অংশীদার, সরল হৃদয় বালকের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

২। নাচতে না জানলে উঠনের দোষ।

এরূপ বিদঘুটে স্বভাবের ছেলেমেয়ে বা বৌ-ঝি ঘরে ঘরে বর্তমান। এটা যে নিকৃষ্ট বা সংকীর্ণ স্বভাবের পরিচায়ক এমন নাও হতে পারে কিন্তু প্রকৃতিটা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। এই নিয়ে সংসারে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। এটা বেশীর ভাগ স্ত্রী চরিত্র কিন্তু পুরুষের মধ্যে এমন প্রকৃতি বিরল নয়। বাড়ীর এমন সব বৌ-ঝি, ছেলে মেয়ে আছে যে তারা কখনো নিজের ভুল বা নিজের দোষ বা নিজের অন্যায় স্বীকার করবে না। তাদের ভুল বা দোষ ধরিয়ে দিলে নিজেদের প্রত্যুৎপন্নমতি স্বর সাহায্যে এমন একটা গুজব বাহির করবে যেন তাদের ভুল কাজের জন্য তারা দায়ী নয়, অপর একটা 'এজেন্ট' (agent) দায়ী।

আমার সংসার হতেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি। আমি বিপত্নীক বলে আজ ১২ বছর ধরে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ আমার সংসারে গৃহিণীত্ব করছে। রান্না-বান্না এবং সকলের মুখে অন্ন তুলে ধরার ভার তারই উপর। সুতরাং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি এবং তর্কবিতর্ক হওয়া আমার অসম্ভব নয়। সব নবীনা গৃহকর্ত্রী যেমন ভুল করে, দোষ করে, অন্যায় করে, সেও তেমনি করে থাকে। কিন্তু কখনো যুক্তির দ্বারা, অকাট্য প্রমাণ দেখিয়ে বা অঙ্গুলী নির্দেশ করে তাকে তার ভুল অন্যায় দোষ ধরিয়ে দিতে পারলুম না। সে নিজের দোষ-ত্রুটি এজেন্টের ঘাড়ে চাপাবেই

সেই এজেণ্ট প্রাণীও হতে পারে, অপ্রাণীও হতে পারে, আবার দৈবও হতে পারে।

রান্নাঘরে ঢুকে খেতে বসে যদি দেখি ডাল (বা আলু) আধ-সিদ্ধ আর যদি তাকে তা জানাই, সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠবে ডাল-আলু ভারি খারাপ! একঘণ্টা ধরে আগুনে ফুটিয়েও কিছুতে সেদ্ধ হয়নি। আসলে হয়ত উনুন চাপান ছিল ১৫ মিনিট! হস্তশিল্পী মাত্রেই এইরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট। নূতন গৃহ নির্মাণের পরই ছাদ গেল ফেটে। রাজমিস্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ চাও। সে চূণ সুরকীর দোষ দেবে। তেমন ছুতোর মিস্ত্রী কাঠের দোষ দিয়ে আর দর্জি জামার কাপড়ের দোষ দিয়ে নিজ নিজ ভুল ত্রুটি ঢাকবার চেষ্টা করবে। স্কুলের ছাত্ররাও এ দোষ হতে মুক্ত নয়। ক্লাসে পড়া দিতে না পারলে বলব, মা কেবল দোকান বাজারে পাঠায় তাই পড়া করবার সময় পাইনে আর প্রমোশন না পেলে বাপকে বলচে মাষ্টাররা ইচ্ছে করে তাকে ফেল করাচ্ছে।

৩। খাচ্ছিলি তাঁতি তাঁত বুনে কাল হল হুটো হেলে গরু কিনে।

এই ধরণের আত্মনাশা চরিত্রের লোক প্রায় ঘরে ঘরে। তাঁতীর বুদ্ধি! বাপ-ঠাকুরদার ব্যবসা চালিয়ে কোনরকমে সংসার চালাচ্ছিল। প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ মাথায় ভূত চাপল। কোন বাক্তি বিশেষের পরামর্শে, বা কোন প্রতিবেশী চাষীর স্বচ্ছল সংসার দেখে, তাঁতের সরঞ্জাম, আর তার সঙ্গে বাসন-কোসন, আসবাবপত্র বিক্রী করে একজোড়া হেলে গরু আর একখানা লাঙ্গল কিনে নিজের পতিত, অনুর্বর জমীতে চাষ করতে লেগে গেল—একটা মুলো বা একটা কপি, বিক্রয়ের উপযোগী করে ফলাতে পারলেনা। শেষে একুল-ওকুল দুকুল হারালে! অনেক যুবকের মধ্যে এই স্বভাব বর্তমান। হাতের চাকরী ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করা, ব্যবসায়ে ফেল করে আবার চাকরীর জন্য ঘোরাঘুরি, উমেদারী করা, একটা চাকরী ছেড়ে দিয়ে আর একটা মোটা মাহিনার চাকরীর জন্য ধরপাকড় করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা এই সব কারণে অনেক যুবক উৎসন্ন যেতে বসেছে। আবার দুই পুত্রই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। বেশী উপার্জনের মোহে স্থায়ী চাকরীতে জলাঞ্জলি দিয়ে বাপের জমী-জমা বিক্রী করে, কারবার ফেঁদে, সেই কারবারে সর্বস্বান্ত হয়ে দুজনেই এখন হাত গুটিয়ে বসে আছে।

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নষ্টানি অধ্রুবং নষ্টমেব চ॥

এরূপ হতভাগা ঘরে ঘরে বর্তমান।

৪। ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

এও এক বিচিত্র প্রকৃতির পরিচয়! এতে দুর্নীতি বা সমাজদ্রোহিতার কোন প্রশ্রয় নেই বটে, কিন্তু ঢেঁকীর ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়ে যায়। অনেক পুরুষ নারী জীবন যাত্রার আদিতে অসম্মানকর ছোট কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরবর্তী জীবনে সম্মানজনক জীবনযাত্রার সুযোগ পেয়েও অনেক স্ত্রী বা পুরুষ আগেকার নীচ কাজকেই আঁকড়ে থাকে। তাদের স্বভাব এই ঢেঁকীর স্বভাবের মত। আমার জানা এক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এক নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক জীবনের প্রথম বয়স থেকেই পরিচারিকাবৃত্তি গ্রহণ করেছিল। তখন তার দুটি পুত্র শিশু ছিল। সেই পুত্রদ্বয় বর্তমানে উপার্জনশীল হয়ে উঠেছে। তারা শ্রমিক বৃত্তি অবলম্বন করে দিন প্রায় পাঁচ-ছয় টাকা উপার্জন করে। কিন্তু তাদের মা তাদের সহস্র অনুরোধেও দাসীগিরি ছাড়তে পাচ্ছেনা। সেই পরের বাড়ীতে নোংরা কাজ, বাসনমাজা, সকলের এঁটো কাপড় কাচা, অপবিত্র নোংরা সাফ করা আর বড়লোক সকলের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করা—এই শোচনীয় অবস্থা হতে সে কিছুতেই মুখ ফেরাতে পারছেনা। অনেক বৃদ্ধ কৃষকের অবস্থাও এই ঢেঁকীর মত। ছেলে লেখাপড়া শিখে বড় অফিসে ৫০০ টাকার মাইনেতে চাকরী করছে আর বুড়ো বাপ এখনো বাজরা মাথায় নিয়ে হাটে গিয়ে আলু-টমেটো বিক্রী করছে আর সন্ধ্যার সময় এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে বাড়ীতে ফিরে আসছে। ছেলে তখন অফিস হতে এসে বৈঠকখানায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। এই ধরণের চরিত্র অনুকরণীয় বা অপাকরণীয় তা বলছিনা, কিন্তু শোচনীয়ত বটেই। যে পুরুষ বা নারী চিত্ত অনুশীলনের বা ঈশ্বরচিন্তার সুযোগ পেয়েও উৎকট স্বভাবের বশে ভাল হতে বা আলো হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়—তার প্রকৃতি অদ্ভুত নয় কি?

৫। নিতে পারি খেতে পারি দিতে দিতে পারি না।

হ্যাঁ, এও এক ধরণের বিচিত্র প্রকৃতি বৈ কি! তোমার কাছে হাত পেতে নেবো কিন্তু তোমায় কিছু দেবনা, তোমার জিনিষ খাবো কিন্তু তোমায় কিছু খাওয়াবো না। স্বার্থপরতার জীবন্ত উদাহরণ! এটা স্ত্রী প্রকৃতি বলেই গণ্য করা যায়। নিজের ছেলে মেয়ে পাড়া-পড়শীর বাড়ী হতে খেয়ে আসবে, তাতে ছেলে মেয়ের মা খুব খুশী! কিন্তু পাড়া হতে কোন ছেলে-মেয়ে নিজের ছেলে মেয়ের সঙ্গে খেলাতে এলে তাকে কোন-কিছু খেতে দেবনা, তার হাতে একগাল মুড়ীও দেবনা—এরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোক অ কৃত্যার দৃষ্ট হয়। পাড়া হতে কোন তত্ত্বাংশের উপহার এলে তা সমুখে খালাপেতে নেবো কিন্তু নিজের ছেলের শ্বশুর বাড়ী হতে তত্ত্ব-তাবাস এলে একদম লুকিয়ে ফেলব এরূপ ঘটনা অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে।

আমার চোখে দেখা একটা ঘটনার কথা বলি। একটি যুবক তার এক দূরসম্পর্কীয় দাদার বাড়ীতে বাস করত। যুবক অবিবাহিত কিন্তু রোজগেরে। সে বৌদির হাতে ত পুরো খাই-খরচ তুলে দিতই তার সঙ্গে নানা খাদ্য সামগ্রী কিনে এনে বৌদিকে উপহার দিত। বৌদিও আদর সোহাগ দেখিয়ে উপহারগুলি লুফে নিত। সেই যুবকের একবার কঠিন পীড়া হয়েছিল। এক মাসধরে সে বিছনায় পড়েছিল কিন্তু সেই শয্যাশায়ী অবস্থায় সে ভাল করে পথ্য খেতে পায় নি। অসুস্থতা সারবার পর সে মনে মনে বৌদিকে একটা গড় করে অন্যত্র বাসা বদল করল।

ছড়াটির দ্বিতীয়ার্ধ হচ্ছে—বলতে পারি কৈতে পারি সৈতে পারি না। উভয় প্রকৃতিই এক ধরণের হওয়ায়, এ নিয়ে আর আলোচনা করলুম না। শিক্ষকতাকালে এমন স্বভাবের অনেক ছাত্র দেখেছি যাকে তাকে যা তা বলে গাল দেবে, কিন্তু কেউ যদি ইটটির বদলে পাটকেলটি ছোঁড় অমনি—"স্যার, যোদো আমায় বাপ তুলে গালাগাল দিচ্ছে, বলতে বলতে আরো মুখছোটাতে থাকবে।

৬। লাথীর ঢেঁকী চড়ে ওঠেনা।

একটা বেয়াড়া, হাস্যোদ্দীপক, কুৎসিত স্বভাব বৈকি! এরূপ প্রকৃতি সাধারাচর অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়। যারা বাল্যকালে এই স্বভাবের বশীভূত হয় তারা আজীবন এটাকে আঁকড়ে থাকে অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তিতে।

'এখানে আয়', বললে আসবেনা, 'করিস্‌নি' বললে করবেই, 'পড়' বললে পড়বে না, 'দোকানে যা' বললে যাবে না। যত আদর করে খোসামোদ করে একটা কাজ করতে বল কিছুতেই করবে না। তার পর চুলের ঝুঁটি ধরে পিটতে থাক, তখন কথা শুনবে, কাজ করবে, 'এই যে করছি, মা' বলে চোখের জলে কাজে হাত দেবে, বা নিবার্যমান কাজ হতে হাত গুটাবে। উপমেয়টা একটু বুঝিয়ে বলি। সচরাচর শক্ত, গাঁটযুক্ত, ভারি কাঠ দিয়ে ঢেঁকী তৈরী হয়। দু'জন শক্তসমর্থ স্ত্রলোক দু'দিক থেকে ঢেঁকীর পুচ্ছে সজোরে পদাঘাত করলে তবে ঢেঁকী মুখ উঁচু করবে। কিন্তু দুজনের পরিবর্তে চার জনও যদি ঢেঁকীর পুচ্ছে হাত বুলোয়, মানে হাতের চাপে তার মুখ তোলাতে চায়, তবে সে কিছুতেই মুখ তুলতে রাজী হবেনা। ঢেঁকী শক্তের ভক্ত, বাবু বাছা, আদর যত্নের কেউ নয়। ঢেঁকীর উপমাটি চমৎকার, মেয়েলী ছড়া হলেও উদ্ভাবনী শক্তি আছে। পাঠশালের গুরুমশাইরা এবিষয়ে খুবই ভুক্তভোগী। এক এক পড়ুয়া আছে যাকে আদর যত্ন দেখিয়ে, পিঠে হাত বুলিয়ে, এমনকি দাড়ী ধরে চুমু খেয়েও কিছুতেই 'ক' অক্ষর মুখ দিয়ে বাহির করাতে পারবে না। তারপর যখন পিঠে গুম্‌গুম্ কিল, সপা-সপ্ বেত পড়বে, কিম্বা গালে চটাচট থাপড় পড়বে, তখন কাঁদতে কাঁদতে বলবে, 'ক-অ-অ অ।'

যে সব মেয়ে বিবাহের পর শ্বশুরঘর করতে এসে, শাশুড়ী-ননদ এমনকি স্বামীরও বিরাগভাজন হয়, সেই সব নবোঢ়া বধূ ঢেঁকির স্বভাব পেয়েছে বলে বুঝতে হবে। শাশুড়ী ননদই বল আর স্বামীই বল, যতই মিষ্টি কথায় অনুরোধ করবে, অমুক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করোনা, বা অমুকদের বাড়ী যেওন, কিছুতেই কান দেবেনা. তার পর যখন পিঠে ঝাঁটা পড়বে তা সে শাশুড়ীর হাতেই হোক বা স্বামীর হাতেই হোক, তখন অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে মেশা বা দহরম মহরম করা বন্ধ করতে বাধ্য হবে। অনেক কু-পুত্রের পিতাকে ঢেঁকী-চরিত্র পুত্রের সঙ্গে এইভাবে মোকাবিলা করতে হয়। বাপ যতই স্নেহের স্বরে, মিষ্টি কথায় ছেলেকে একটা কাজ হতে প্রতিনিবৃত্ত করবার

চেষ্টা করবে ছেলে ততই অবাধ্যতা প্রকাশ করবে, তার পর বাপ যখন ধৈর্য হারিয়ে পিঠে ধপাধপ্ করে খড়ম পিটতে থাকবে, তখন ছেলের হুঁশ আপনি এসে দেখা দিবে।

৭। গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল।

কল্পনাবিলাসীর প্রকৃতি বা স্বভাব। কবে তার গাছের কাঁটাল পাকবে, তারপর বাড়ী আসবে, তারপর তার স্ত্রী বা কন্যা সেই কাঁটাল ভেঙ্গে দু'চার কোষ কাঁটাল রেকাবী করে তার সুমুখে ধরে দেবে। তখন যদি তার গোঁফে আটা লাগে সুতরাং এখন হতেই গোঁফে তেল মাখিয়ে রাখা যাক্। কিন্তু কাঁটাল যে চুরি যেতে পারে, বাড়ীতে এনেও পচে যেতে পারে, আবার তাতে আটা নাও থাকতে পারে, সে দিকে হুঁশ নেই। সংসারে যে কিরূপ ভাঙ্গাগড়া চলেছে, কোন জিনিষ হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও কি ভাবে উধাও হয়ে যেতে পারে, সে বিষয়ে কোন খেয়ালই নেই। এদের হুঁশ করিয়ে দেবার জন্য ইংরাজীতে, সংস্কৃতে কত বাণী আছে, কত জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ আছে কে সে সব পড়ে দেখে বা কানে শোনে? There is many a slip between the cup and the lip কিম্বা Man proposes god disposes ইংরাজীতে। আবার সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্ সংস্কৃতে—এদের কানে কানে কত পরামর্শ দেয় কিন্তু কে কার হিতোপদেশ শোনে! এরা আগে হতে গোঁফে তেল মাখিয়ে বসে থাকবেই।

পৃথিবীর অনেক নামকরা বৈজ্ঞানিকও এইরূপ ভাবে আগে হতে গোঁফে তেল মাখিয়ে থাকেন। এক হাজার বছর পরে পৃথিবীটা লোকে লোকারণ্য হয়ে মানুষের পদ-ভরে রসাতলে সেঁধিয়ে যেতে পারে—সুতরাং এখন হতে গর্ভনিরোধ প্রতিযোগিতা দেশে দেশে আরম্ভ করে দাও। এই ধরণের আশাবাদীরা অঘটন ঘটন-পটীয়সী বলে যে এক অদৃশ্য শক্তি বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করে আছে তা স্বীকারই করে না।

বড় কথা থাক্। অনেক যুবক চাকরীর জন্য কোন অফিসে দরখাস্ত করেই অফিস যাবার উপযুক্ত এক-সেট জামা কাপড়-জুতো কিনে রাখে, কারণ তার মুরুব্বির জোর আছে। অনেকে গণৎকারকে হাত দেখালে গণৎকার যদি বলে, একলাখ টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে, অমনি হাতের চাকরী ছেড়ে কোথায় কোন জমী বিক্রীর জন্য আছে তা খোঁজা-খুঁজি করতে থাকে। কমবেশী এই প্রকৃতির লোক প্রায় সব বাড়ীতেই বর্ত্তমান।

৮। ঘরে নেই অষ্ট-রম্ভা লোকের কাছে কাঁছা-লম্বা।

পল্লীগ্রামে গৃহসংলগ্ন পতিত জমীতে অনেক গৃহস্থই দু'চারটে কলা গাছ বসিয়ে দেয়। ভাত-রুটি না থাক, গোটাকতক কলা খেতে পেলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু যার বাড়ীতে পেটের ক্ষুধা দূর করবার জন্য আটটা কলাও জোটে না, সে বাহিরে লম্বা কাঁছা (কোছা) ঝুলিয়ে বড় লোকের চাল দেখালে ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র হয় বৈকি! এই প্রকৃতি বা স্বভাব শতকরা পঞ্চাশ জনের মধ্যেই দেখা যায়। যুবক-যুবতীদের এই স্বভাব একেবারে মারাত্মক। গ্রামের প্রত্যেক পাড়া ধনী ও দরিদ্রে মেশান। ধনীরা দৈবের আনুকূল্যে ধনী হয়েছে কি নিজের পুরুষকারের দ্বারা ধনী হয়েছে, সে কথা স্বতন্ত্র। আবার দরিদ্ররা পূর্বজন্মের কর্মফলের দ্বারা দরিদ্র হয়েছে, বা অলসতা ও অকর্মণ্যতার জন্য, ভ্রান্তমার্গ অবলম্বনের জন্য, অরাজকতার জন্য, শাসনযন্ত্রের বিকলতার জন্য দরিদ্র হয়েছে সেদিক দিয়ে বিচার করে লাভ নেই। সুতরাং যার যা অবস্থা সেটা সর্বসাধারণের গোচরীভূত করতে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে উপোষ দিয়ে বাহিরে বড় মানুষী চাল দেখান বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের এক সুট জামাকাপড়, একসুট পেণ্টালুন বই আর কিছু নেই তারা ধোপার বাড়ীর কাচা ও ইস্তরী করা কাপড় পড়েছি সোমবার, এই চাল দেখাবার জন্য প্রতি রবিবার বাড়ীটাকে দস্তুরমত ধোপার বাড়ী করে ফেলে। বাড়ীর সকলকেই এই ধোপাগিরি করতে হয়, সারাদিন ধরে। কেউ কাপড় জামা পেণ্টালুন উনুনে কড়া বসিয়ে ফোটাচ্ছে, কেউ পুকুরে গিয়ে কেচে আনছে কেউ রৌদ্রে শুষ্ক করতে দিচ্ছে, কেউ তুলে এক জায়গায় জড় করছে, কেউ বাড়ীতে ইস্ত্রি যন্ত্র থাকলে ইস্ত্রীকর্মে লেগে গেছে, বা যন্ত্র না থাকলে, বস্তা মাথায় নিয়ে ধোপার বাড়ী হতে ইস্ত্রী করিয়ে আনছে, আর কত বলব? আমি বলছি না স্বাস্থ্যের হানিকর মলিনতা পরিহার্য নয়, তবে প্রতি সোমবার ধোপার বাড়ী হতে কেচে আনা কাপড় পরছি, এই চাল দেখাবার জন্য ফর্সা জামা কাপড় পেণ্টলন প্রতি রবিবার সাবানে ফোটাতে দেখেছি বলেই উল্লেখ করছি।

প্রবন্ধ স্ফীতির ভয়ে এইখানেই কলম ছাড়লুম। আরো কত যে স্বভাবগত বৈচিত্র্যের উল্লেখ আছে, পাঠকগণ প্রবাদবাক্যগুলি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই দেখতে পাবেন।

ক্ষণ বসন্ত

শৈলেন রায়

নীল চিরদিনই আমাকে আকর্ষণ করে।

মহাসমুদ্রের বুকে ভেসে চলেছি। উন্মুক্ত আকাশের নীচে মহাশূন্যের পর্দ্দায় একটা নাটক দেখে চলেছি আমি। পেছনে ফেলে আসা অতীতটা বার বার আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ইচ্ছে না থাকলেও দু চোখ মেলে আমি তাই দেখে চলেছি।

হিমালয়ের বুকে ছোট সাজান সহর, কালিম্পং। বেড়াতে এসেছিলাম। তখন আমার বয়স চব্বিশ। আর তোমার আঠেরো। যাকগে সে কথা। বয়স নিয়ে মাথা ঘামাবার মনের অবস্থা নয় আমার। আমার চোখের সামনে কাঁপছে একটা পুরানো ছবি।

লাল রংএর টাউন হল। কিছু উৎসব-টুৎসব উপলক্ষে নাচগান হবে। হাতে প্রচুর সময়। সন্ধ্যে নাগাদ গিয়ে হাজির হ'লাম, এ সব ফাংসানের রীতি নীতি আমি জানি। বে-সুরো গান, অহেতুক নাটকীয় ছন্দে রবীন্দ্র-নাথের কবিতা আবৃত্তি দু চারটে হাস্যকৌতুকও থাকতে পারে বা ছোট মেয়েদের 'জল-ভরা' বা মান-ভঞ্জন' জাতীয় কোন নৃত্যকলা। এ সব আমাদের প্রায় সবারই জানা। তাই দেখার কথা হিসাবেই দেখে যাচ্ছিলাম।

অনেক ক'টা আইটেম শেষ হ'য়ে গেছে। দর্শকদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেলো, সবাই যেন কি দেখবার আশায় উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। ধপরে ধপরে পর্দ্দা উঠে গেলো। সমস্ত ষ্টেজটা অন্ধকার। শুধু একটা আলোর রশ্মি খানিকটা জায়গা আলো করে রেখেছে। আলোর একটা গোলাকার বৃত্ত ষ্টেজের ঠিক মাঝখানটায় এসে দাঁড়িয়ে গেলো। নীল শাড়ি পরনে, মুখে ওড়না। ধপরে ধপরে বাদ্যযন্ত্র বাজতে শুরু করলো, আর তালে তালে পায়ের নূপুর। ওড়না সড়ে গেলো স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঠিক ঠিক আমার মুখোমুখি—তুমি! তোমার গায়ে নীল, মাথার ওড়না নীল। তোমার চোখ দু'টো, উজ্জ্বল আলোতে দেখলাম—তাও নীল।

নীল সমুদ্রে ডুব দিয়ে একদিন ঝিনুক তুলে তার মধ্য থেকে মুক্তো বার করলাম। তুমি বলতে কেরামতি নাকি ডুবুরির নয়-মুক্তোর যেহেতু সে-ই নাকি ইচ্ছে করে হাতে উঠে এসেছিল। তাই হবে হয়তো।

ফলের মধ্যে মাকাল কোন কাজেই আসে না। বাইরেই শুধু রূপ—ভেতর ফাঁকা। ঠাট্টা করে একদিন যা বলেছিলে, কে জানতো একদিন এমন ভাবে তা সত্যি হ'য়ে উঠবে? কোনো কাজেই লাগলাম না। একেবারে ফাঁকা রয়ে গেলাম।

আর তুমি! মৃত অতীতকে কাঁধে নিয়ে প্রলয়ের খেলায় মেতে উঠলে একদিন।

অফিস থেকে সবে ফিরেছি। সন্ধ্যা হয় হয়। এই সময় গা ধুয়ে রোজই তুমি চেয়ার নিয়ে জানালার পাশে বসে থাক, আজ ছিলে না। এঘর ও ঘর খুঁজে শেষ পর্য্যন্ত শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম আপদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়ে তুমি শুয়ে আছ। ভাবলাম হয়তো শরীর খারাপ, চাদর সরিয়ে কপালে হাত দিলাম। কপাল ঠাণ্ডা, তবে? প্রশ্ন করতেই তুমি পাল্টা প্রশ্ন করলে—রাধা কে?

থতমত খেয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম—কোন্ রাধা?

ধমকে উঠলে তুমি—তোমার রাধা।

—আমার রাধা?

—কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো না, সন্তু। বলো রাধা কে ? তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ?

কথা বলে তুমি হাঁপাচ্ছিলে, যেন অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছো, বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথাই বলেছিলাম। তুমি বিশ্বাস করনি, সেদিনও করনি আর কোনদিনও করনি। শুধু বার বার এক প্রশ্নই করেছো, রাধা কে ? তোমার চেয়েও তাকে বেশী ভাল বাসতাম কিনা ? কোথায় কবে আমাদের প্রথম আলাপ ?

…সে দিনটা রবিবার শীতের নরম রোদ্দুরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পরলাম দুই বন্ধু আমি আর সুবীর। সুবীরকে তুমি চেনো। আমাদের অফিসেই কাজ করে। কতবার এসেছে বিয়ের পরও।

খড়্গপুর লোকো সেডে এ্যাপ্রেণ্টিসের কাজ জুটে গেছে কয়েকদিন হ'ল, সহর দেখতে বেরিয়েছি। গল্প করতে করতে চলেছি। বেশ মজার কথা বলতে পারে সুবীর। হাসতে হাসতে সাইকেল চালাচ্ছি। হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। অপরদিক থেকে যে সাইকেল আসছিল তাকে যতখানি জায়গা ছেড়ে দেবার কথা তা দেওয়া হয় নি। ফলে সামনা সামনি সংঘর্ষ !

গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে চক্ষুস্থির ! ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে একটি মেয়ে আর পাশে পরে রয়েছে তার সাইকেল। সুবীর গিয়ে মেয়েটিকে তুলে ওঠাতেই দাঁতে দাঁত চেপে গর্জ্জে উঠলো সে—'ব্রুট, সাইকেল চালাতে জানো না !' দোষ করেছি, তাই মেয়ের মুখ থেকে এরকম একটা জোড়ালো গালি শুনেও চুপ করে রইলাম। রাগ কিন্তু তাতেও পড়লো না তার। সামনে এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে মেয়েটি বললো—'আসুন' একরকম জোড় করেই সে আমাকে টানতে টানতে এগুতে লাগলো রাস্তার পাশেই বিরাট কম্পাউণ্ডওয়ালা একটা বাড়ীর দিকে। বেগতিক দেখে সুবীর দু'টো সাইকল দুহাতে নিয়ে ধীরে ধীরে উল্টো দিকে পা বাড়ালো।

সে দিন তার বিশ্বাসঘাতকতায় কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। এখন মনে হয় যতটা ছোট তাকে মনে করেছিলাম হয়তো সে তা ছিলনা। ইচ্ছে ক রলে আমার সাইকেলটা ও তো ফেলে যেতে পারত।

কম্পাউণ্ডে ঢুকেই মেয়েটি ডাকলো—'মালী, সামনে রাস্তায় আমার সাইকেল পড়ে আছে, নিয়ে এসো।' তারপর গলা ছেড়ে ডেকে উঠলো—'মা, এদিকে এসো একবার। দেখে যাও।' ঘর থেকে মাঝ বয়সী একটি মহিলা বেরিয়ে এলেন।

তখনও আমার হাতধরা। যেন চোর ধরা পড়েছে ! মেয়েটি ফেটে পরলে – দেখ, কী রকম অসভ্য এই লোকটা, আমাকে সাইকেলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে তার জন্য একটুও দুঃখিত নয় বা একবার মাপও চাইল না। বলতে ইচ্ছে হ'ল, সে সুযোগ পেলাম কোথায়।

দাঁতে দাঁত চেপে আবার গর্জ্জে উঠলো সে—'আমি একে পুলিসে দেবো' এক্ষুণি ফোন করে দিচ্ছি। দেখুক মজা।' আমার দিকে এক ঝলক আগুন ছুটিয়ে সে সত্যি সত্যিই বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল। হঠাৎ চেনা গাড়ীর হর্ণের আওয়াজে থমকে দাঁড়াল। মুখের মেঘ নিমেষে যেন কেটে গেল—'বাপি এসেছে।'

গাড়ী নিয়ে যিনি ঢুকলেন, তাকে দেখে তো আমার চক্ষু স্থির ! এর চেয়ে যে পুলিসের হাতে পরাও ভাল ছিল ! স্বয়ং বড় সাহেব ! সুবীর যে কেন পালিয়েছে তা বুঝতে পারলাম। সে আমার মত নতুন আসে নি এখানে।

ভদ্রলোক বারান্দায় পা দিতেই মুখ খুললেন মা—দেখো, কী অবস্থা করেছে মেয়ের ! এই ছেলেটি- বাবা ততক্ষণে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছি—প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হবার আতঙ্ক নিয়ে। তিনি দাঁড়ালেন আমার সামনা সামনি, মনোযোগ দিয়ে দেখছেন আমাকে। তারপর বললেন—তুমি ওয়াগন সেকসনে কাজ করনা ? মুখ দিয়ে জবাব বের হয় নি, শুধু ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানালাম !

মেয়েটি আবার ফেটে পড়লো…জান বাপি, রং সাইডে এসে আমাকে ধাক্কা মেরে—

কথার মাঝেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন—তা তো বুঝলাম, কিন্তু শাস্তিটাও তো দেখ। বলেই আমার হাঁটুর ওপর প্যান্টা গুটিয়ে তুলে ধরলেন, ঝর ঝর করে রক্ত পরছে সেখান থেকে। মেয়েটি কি রকম অপ্রস্তুত হয়ে গেল, কিন্তু হারবার পাত্রী নয়, বারান্দা ছেড়ে যেতে যেতে একবার আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে

বললো—অন্যায় করলে ফল হাতে হাতেই পেতে হয়। একটু পরেই আবার ফিরে এলো, হাতে টিংচার আইওডিন ও তুলো।

এই রাধা, হ্যাঁ, আমার রাধা। এক বৃন্তে দু'টি ফুল, দু'টিই আমার কিন্তু কোনটিই আমার রইল না!

সহযাত্রী গুজরাটী মেয়েটি এসে পাশেই রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়াল। কাছে তুমি নেই। তাই সংকোচ করবার দরকারও নেই। একবার দেখে নিয়ে আবার লিখতে শুরু করলাম, ওর মনের ভাব যেন বুঝতে পেরেছি আমি। আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় ও। এই চেহারাটাই হয়েছে আমার কাল। একদিন এই রূপের প্রশংসায় মন ময়ূরের মত আনন্দে নেচে উঠতো। আর আজ? ও রূপ যদি আমার না থাকত তা হলে হয়তো এমন হ'ত না। তুমিও হয়তো রজ্জুতে সর্প দেখতে না। আর রাধা—! থাক্, তার কথা। তার আত্মার শান্তি হোক— এর চেয়ে বড় কামনা আজ আর আমার কিছু নেই।

জীবনে যা চেয়েছি সবই তো পেয়েছিলাম। কিন্তু ফুটো পাত্রে জল রাখবার মত কিছুই তো অবশিষ্ট রইল না। সবই চুঁইয়ে নিঃশেষ হ'য়ে গেল। আজ যেন ঘরের কোণে ফাটা কলসিটার ব্যথা আমি বুঝতে পারি। একদিন তো পূর্ণতায় সে টলমল করতো! কিন্তু এই শূন্যতা নিয়ে বরাবর সে চলবে কি করে? অতীতের স্মৃতি কি তার বর্তমানের শূন্যতার কিছুটাও পূরণ করতে পারবে না! যে শূন্য হয়ে যায়, যে ফুরিয়ে যায়, দিনের পর দিন তার বেঁচে থাকা যে কত বড় অভিশাপ আমার চেয়ে আর বেশী কে জানে!

সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলে পরেছে। আকাশটা ভীষণ ভাবে লাল হয়ে গেছে, তার ছোঁয়ায় নীল জল যেন ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে। যেমন হ'য়েছিল তোমার চোখ দু'টি, সে দিন।

যেদিন হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই এসে হাজির হ'লে তুমি। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। কলিংবেলের আওয়াজ হতেই দরজা খুলে দিলাম আমি, সর্ব্বাঙ্গে জল সপ্‌সপ্‌ করছে তোমার। হাসতে হাসতে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছ তুমি,— খুব অবাক করে দিলাম তো চিঠি না দিয়ে এসে? আরও কি বলতে যাচ্ছিলে। হঠাৎ ঘরের কোণে সোফায় নজর পরতেই চমকে উঠলে—কে? কে ওখানে? তোমার কথায় মুখ তুলে তাকাল যে তাকে তুমি ভাল করেই চেনো। দু'বছর আগে দিল্লীর পথে তোমার সঙ্গে আলাপও হয়েছিল তার।

চোখের নীল ছড়িয়ে পরেছে তখন তোমার সারা মুখে, হিংস্র বাঘিনী দেখেছিলাম সেদিন আমার সামনে। আঁচড়ে কামড়ে আমার হাতের বাইরে ছিটকে চলে গেলে তুমি। শুধু একটি মূহুর্ত্ত। দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসেই ছুটে চলে গেলে। চলে গেলে বহুদূরে – এত দূরে যেখান থেকে আর কাছে আসতে পারলে না আমার। আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বজ্রাহত একটা অনড় জড় পদার্থের মত!

ছেলেবেলাটা আমার খুব প্রিয়। এই সময়টাই যেন আমার একান্ত আপনার। মার সঙ্গে সঙ্গেই কেটেছে আমার এই সময়টা, বাবা কিছু বললে মা বাধা দিতেন।

—'থাক, ওকে আর বিরক্ত ক'রো না পড়া পড়া করে।' আমাকে কাছে টেনে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতেন 'সন্তু আমার মেয়ে, তারপর দাদার দিকে তাকিয়ে বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন...' তোমার ঐ দামাল ছেলেকে বরং শাসন করগে। বাবার দিকে অবজ্ঞা-ভরে তাকিয়ে হেঁটে চলে যেতাম। বাবাও আমাকে বিশেষ কিছু বলতেন না। মার স্নেহ ছায়া ধীরে ধীরে মেয়ের মত বাড়তে লাগলাম, বেশ খানিকটা বয়স পর্যান্ত মা সখ করে ফ্রক পরাতেন। গলায় হার। সে তো বিয়ের পরও দেখেছ তুমি। সরু সোনার হার...মা সখ করে একদিন পরিয়েছিলেন। আজও ত আমার গলায় আছে। এই হারটা কিছুতেই খুলতে পারি নি। মাকে যেন—কাছাকাছি পাই এ হারটার মধ্যে।

বিয়ের পরই তোমার নজর পরেছিল হারটার ওপর। তুমি খিল খিল করে হেসে উঠেছিলে—'ওমা, এযে একটা মেয়েকে বিয়ে করলাম।'

কি রকম অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। কোন কথাই মুখে আসছিল না, শুধু কাচুমাচু মুখে জবাব দিয়েছিলাম— 'এটা আমার মার দেওয়া। তুমি আমার কথা বুঝেছিলে। হাসি তোমার বন্ধ হ'য়ে গেল। আমার হাত দু'টো

নিজের হাতে তুলে নিয়ে কি রকম করে তাকিয়ে রইলে আমার মুখের দিকে, তারপর দুহাত দিয়ে হারটা খুলে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে আবার পরিয়ে দিলে। আর কোন দিন হার পরতে দেখে হাসনি তুমি।

তুমি আমাকে সামান্য ছোট ছেলের মত আগলে আগলে রাখতে শুরু করলে। হয়তো ভেবেছিলে, যে লোকটা এই বয়সেও মেয়েদের মত হার পরে ঘুড়ে বেড়াতে পারে, তাকে সাবালক ভেবে অসাবধান হওয়া চলে না। চলা ফেরা খাওয়া ঘুমানো সবই তোমার ইচ্ছামত চলতে লাগল। প্রথমটা হয়তো ভালই লাগত কিন্তু ধীরে ধীরে কোথায় যেন অসন্তোষের মেঘ জমে উঠতে শুরু করলো আমার মধ্যে। আমি যেন নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলতে বসেছি। আহত পৌরুষ এক এক সময় মাথা উঁচিয়ে উঠতে চাইত, কিন্তু পারতাম না, কেমন যেন একটা দুর্বলতা গ্রাস করে ফেলতো আমাকে। আজ মনে হয় এর জন্যে দায়ী আমার মা। যে লতা বরাবর কোন গাছকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠেছে, তাকে হঠাৎ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে উঠতে বললে চলবে কেন?

জাহাজ বেশ দুলছে। হাওয়া যেন একটু জোড়ে বইতে শুরু করেছে। গুজরাটী মেয়েটির আর ধৈর্য্য থাকছে না হ'ত। পাশের ডেক চেয়ারে এসে বসল। একটু ইতস্তত: করে প্রশ্ন করলে—'চিঠি লিখছেন বুঝি?' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে আবার প্রশ্ন হ'ল—'বউকে বুঝি?' তার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলাম—'হ্যাঁ, বউকে।'

বউ! এই নামে তোমার কানে কানে ডাকলে তুমি কত না আদর করতে আমাকে! ছোট দুটো কথা, কিন্তু কি মিষ্টি, কি আপন! তুমি যখন রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে, পাঁজকোলা করে তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতাম—'বউ কথা কও।' তোমার রাগ ধুয়ে জল হয়ে যেতো, আমার বুকে মুখ গুঁজে পরে থাকতে তুমি। কতক্ষণ? কে তার হিসাব রাখে! তুমিও রাখনি হয়ত! এক সময় ফিস্ ফিস্ করে বলতে,—এত সুখ আমার সহ্য হ'লে হয়। জান, আমার যা ভয় হয়—। 'আরও নিবিড় করে তোমার মাথা বুকে চেপে ধরে বলতাম—'ভয় কি? আমি তো থাকবো তোমার পাশে পাশে।' কদিন আগের কথাইবা! তখনও তোমার মাথায় রাধার বিষ ছড়িয়ে পড়েনি।

বিষ যেদিন ছড়ালো, সেদিন থেকে আর যেন কিছুই রইলো না তোমার জীবনে। রাধাময় জগৎ হয়ে গেলো তোমার, থেকে থেকেই প্রশ্ন করতে, রাধাকে কেন বিয়ে করিনি। প্রথমত তখন মা বেঁচে। ইচ্ছে মত বিয়ে করে মাকে এসে বলবো বউ নিয়ে এলাম, তা যেন ঠিক মনোমত ছিল না। আর তা ছাড়া আমার মত এ্যাপ্রেন্টিসের হাতে রাধার মত মেয়েকে দেবার কথা ভাবতেই পারেননি রাধার মা, তার চেয়ে হাত পা বেঁধে মেয়েকে জলে ফেলে দেওয়াও যে অনেক ভাল!

তারপর চাকুরী পাকা হ'ল, বদলী হয়ে গেলাম, আজ এ জায়গা, কাল ও জায়গা বদলীর চাকরী। কত দেশ, কত বিচিত্র মানুষ! রাধা কোথায় হারিয়ে গেল।

পরে শুনেছিলাম, খুব ধুমধাম করে রাধার বিয়ে হয়েছে, বড় ঘর বড় বর। বড় বলতে বরের নাকি বয়স হয়েছে একটু, রাধার নাকি বর পছন্দ হয় নি অবিশ্যি এটা আমার শোনা কথা, রাধা একথা বলেনি কোনদিন আমাকে। আর দেখাই বা হয়েছে কবে তার সঙ্গে? সেই একবার দিল্লীর রাস্তায়, আর যেদিন তুমি বাপের বাড়ী থেকে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই হট্ করে এসে হাজির হ'লো, সেদিন।

সকাল থেকেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ছুটির দিন, তুমিও নেই, ক'দিনের জন্য বাপের বাড়ী গেছো।

ভাবলাম সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে লম্বা একটা ঘুম দেওয়া যাবে। সামনের ঘরে বসে একটা বই পড়ছি, এমন সময় কলিঙ্ বেলের আওয়াজ, দরজা খুলতে বিস্ময়ে থমকে গেলাম। রেইনকোট গায়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাধা।

রাধাই প্রথমে কথা বললো—'কি চিনতে পারছ?' হ্যাঁ না কিছু জবাব দেবার আগেই ট্যাক্সি ড্রাইভার একটা স্যুটকেশ নামিয়ে দিয়ে তার ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

রাধা আর আমি। সমস্ত বাড়ীতে আমরা দু'জন, চাকরটিও বেরিয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া সেরে।

ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলাম—'এভাবে?'

তার চোখ দু'টো আমার চোখের ওপর রেখে রাধা পাল্টা প্রশ্ন করলো—'বউ কোথায় ?'

—'বাপের বাড়ী, শরীরটা বিশেষ ভাল নেই—'

—ছেলেপুলে হবে নাকি ?' রাধার কণ্ঠে কৌতুক।

—'না। নার্ভের অসুখে ভুগছে।'

—'নার্ভের অসুখ। কেন ?'

—'অসুখের কি কেন আছে ?'

একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রাধা বলেছিল—'তা বটে। তার-পর আছ কেমন ?'

—ভালই।

—'হুঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি, বেশ মোটা হয়ে গেছ সন্তু।

বহুদিন পর রাধার মুখে এই নাম শুনে চমকে উঠে-ছিলাম। রাধার চোখও এড়ায় নি। হাসি মুখে বললো—'চমকে উঠেছিলে আমাকে দেখে, তাই না ?'

—'হ্যাঁ, তা কতদিন হ'ল—

—থাক, আর হিসেব করতে হবে না। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, কি খেতে দেবে বল ?'

খাওয়া দাওয়া সেরে সামনের ঘরে এসে বসলাম। রাধা যেন কেমন অন্যমনস্ক।

এক সময় ধীরে ধীরে বললো—'তোমার ঠিকানা যোগাড় করেছি বহু কষ্টে, এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে এসে বসে আছ! তোমাদের হেড্ অফিস থেকে সেই খবর নিয়ে আসছি।'

বললাম—তুমিও খুব পাল্টে গেছ রাধা, আগে কিন্তু এত গম্ভীর ছিলে না। ম্লান হেসে সে জবাব দিয়েছিল···'তা বয়স তো আর কম হ'ল না। আর তা ছাড়া কত সুখে আছি'—বলতে বলতে রাধার দুচোখে জল টল টল করে উঠল।

আর থাকতে পারি নি, সরে এসে তার হাত দুটো ধরে বলেছিলাম,—'শুনেছি তোমার খুব ভাল বিয়ে হয়েছে—'

কথার মাঝখানেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল রাধা—'খুব ভাল আছি সন্তু, খুব ভাল আছি, এই দেখ—' বলেই হঠাৎ টান দিয়ে ব্লাউজ খুলে তার নগ্ন পিঠ আমার চোখের সামনে খুলে ধরল। অসংখ্য সাপের মত কালো কালো দাগ সারা পিঠ জুড়ে।

চমকে উঠলাম—'এ কী, এ যে চাবুকের দাগ।'

কথার মাঝখানেই হেসে উঠল রাধা—'পুরুষের পৌরুষ! তোমার মত ভীতু নয় তো সে ?' তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল সে। একটু পরে অশ্রুবিকৃত স্বরে আবার বলতে শুরু করলো—'তোমার কথা সবই জেনে গেছে। লুকোনো চিঠিও দেখে ফেলেছে সেই লম্পট মাতালটা। তার পর থেকেই শুরু হয়েছে—' কান্নার আবেগে তার গলা বুঁজে এলো। আমার কোলে মাথা রেখে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে রাধা, আর ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম, এমন সময় কলিংবেলের আওয়াজ।

দরজা খুলে দিতেই দেখলাম তুমি। তারপর—

তুমি চলে যেতেই রাধা উঠে দাঁড়ালো, বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম, রাধা যেন নিজের মনেই ফিসফিসিয়ে বললো,—

—এ ভাবে আসা উচিত হয় নি। বিশ্বাস করো, একবার তোমাকে দেখেই চলে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা আর হ'লো না, সব গোলমাল হ'য়ে গেলো পার তো, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো সন্তু।'

রাধা চলে গেলো। সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেলো সে।

···এই অভিশপ্ত জীবনটাকে বয়ে বেড়াতে হয়তো ক্লান্তি আসবে, দু'টি ফুলের মত জীবন নষ্ট করে দেবার গ্লানি গিয়ে কি করে দিনের পর দিন বেঁচে থাকবো জানি না।

রাধা বলতো আমি ভীতু—তুমিও তাই বলতে, তাই ভীতুর মত মরতে আমি চাইনে, সামনের দিকে তাকিয়ে পথ চলবার সাহস সঞ্চয় করছি মনে মনে। কে জানে সফল হব কিনা।

মাথার ওপর নক্ষত্র খচিত আকাশ। রাধা বলতো, যেদিন সে এই পৃথিবীতে আর থাকবে না, আকাশে তারা হয়ে ফুটে থাকবে।

তার পর চোখ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করি, কোথায় লুকিয়ে আছে রাধা।

আমার রাধা···।
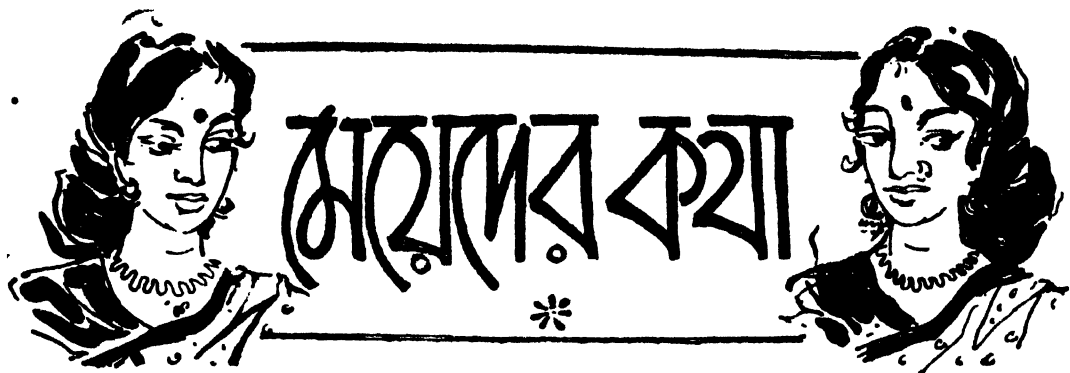
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কবির জীবনে প্রেম আর পূজা সর্বত্র এক হ'য়ে মিশে গেছে। সে মিলন এমন মধুর এমন উদার যে তাকে গংগা-যমুনার সংগমের সংগেই তুলনা করা চলে। গংগার পুণ্যধারা যেন এসে মিশেছে যমুনার নীল জলধারে।

কিশোর কবির চিত্তকে দোলা দিয়েছে নরনারীর মিলনের মাধুরী। তাই কবি যুগলমিলনের ঝুলনের দৃশ্য দেখেছেন তাঁর স্বপ্ন।

"দুজনে বসে সে দোলে
ঘেঁষে আসে বুকে বুকে
মিলায়ে মুখে মুখে
বাহুতে বাঁধি বাহুপাশ।"

নরনারীর মিলনের এই ঝুলনা দুলেছে কবির নিজেরই বুকে। এই যুগল দোলনের বর্ণনা বাইরের জগতের নয়, এ তাঁর মনোজগতের একটি দৃশ্য।

কখনো বা প্রেমের নিবিড় অনুভূতি কবিকে নিয়ে গেছে যেন কোন আকাশ পারে—এই সংসার সীমার বাইরে। প্রেমের মধ্যে কবি পেয়েছেন অসীমের অনুভূতি।

"মাঝে মাঝে থেকে থেকে
আকাশেতে চেয়ে দেখে
গাছের আড়ালে দুটি তারা
প্রাণ কোথা উড়ে যায়
সেই তারা পানে ধায়
আকাশের মাঝে হয় হারা।
পৃথিবী ছাড়িয়া যেন তারা
দুটিতে রয়েছে দুটি তারা।"

বিরহিণী বিষাদিনী ম্লানমুখী নারী কবি চিত্তকে নিবিড় স্পর্শে সচেতন ক'রে তুলেছে। কবি বিরহিণী, বিচ্ছেদ কাতরা নারীর একটি ছবি এঁকেছেন—

"গেল রে কে চ'লে গেল, ধীরে ধীরে চ'লে গেল
কী কথা সে ব'লে গেল হায়
অতিদূর আকাশের ছায়ে মিলায়ে কে চ'লে গেল রে
রমণী দাঁড়ায়ে জোছনায়।
সীমাহীন জগতের মাঝে আশা তার হারায়ে গেল
আজি এই গভীর নিশীথে
ছোট ছোট মেঘগুলি সাদা সাদা পাখা তুলি
চলে যায় চাঁদের চুমো নিয়ে
আঁধার গাছের ছায় ডুবু ডুবু জোছনায়
ম্লানমুখী রমণী দাঁড়িয়ে।"

(বিদায়, ছবি ও গান)

কিশোর কবির কাছে নারী আধো জানা আধো অজানা। কবি চারিদিকে নারীর আবির্ভাব উপলব্ধি

করেছেন কিন্তু নারী তখনো তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ধরা দেয়নি, কেবল যেন ছায়ার মত তারা কবির চারপাশে ফিরেছে। কবি বোঝেন নি তারা তাঁর গান শুনেছে কি শোনে নি, তাঁকে ভালোবেসেছে কি বাসেনি, তাঁর প্রাণে প্রাণ মিলিয়েছে কি মেলায় নি। কখনো কবির মনে হয়েছে যেন তারা ভালোবেসে কবির কাছে এসে ডেকে গেল, কখনো মনে হ'ত তারা কবির প্রতি উদাসীন, অন্যমনা।

> "কাছে আমি যাইতাম
> গানগুলি গাইতাম
> সাথে সাথে যাইতাম পিছু
> তারা যেন অন্যমনা
> শুনিত কি শুনিত না—
> বুঝিবারে নারিতাম কিছু।
> … … …
> আমার তরুণ প্রাণে
> তাদের হৃদয়খানি
> আধো জানা, আধেক অজানা।"

কিন্তু কবির যত বয়স বাড়তে লাগল, তখন এই আবছায়া নারীরূপ তাঁর কাছ থেকে যেন দূরে চ'লে যেতে লাগল। সেই কিশোর দিনের স্বপ্নগুলির প্রতি কবির মমতা, তাই কবি যেন কৈশোর অতিক্রম করার দিনে নিঃশ্বাস ফেলে বলছেন,—

> "আলোতে ছায়াতে ঘেরা
> জাগরণ স্বপনেরা—
> আশে পাশে করিতরে খেলা—
> একে একে পলাইল
> শূন্যে যেন মিলাইল
> বাড়িতে লাগিল যত বেলা।"

ধীরে ধীরে কবির দৃষ্টি কৈশোরের স্বপ্নের আবেশ অতিক্রম করে যৌবন-স্বপ্নের রাজ্যে এসে পৌছল। তখন কবি নারীর রূপে মুগ্ধ। যা ছিল স্বপ্ন তা হ'ল প্রত্যক্ষ রূপের নিবিড় অনুভূতি। যৌবনে কবি নারীকে দেখেছেন যেন সে আপন রূপের মধ্যে আপনি প্রচ্ছন্ন। যেন রূপের আবরণ ভেদ ক'রে তাকে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। যেখানে তার পা পড়ে সেখানে যেন উদ্বেলিত সৌন্দর্য্য-তরংগ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

> "যেথা চলে স্বর্গ হ'তে অবিরাম পড়ে যেন
> লাবণ্যের পুষ্প বারি ধারা
> ধরণীরে ছুঁয়ে যেন পা দুখানি ভেসে যায়
> কুসুমের স্রোত বহে যায়।"

এই সৌন্দর্যের অন্তরাল ভেদ ক'রে নারীকে তার স্বরূপে দেখবার জন্যে কবির চিত্ত ব্যাকুল।

> সৌন্দর্য কোরক টুটে এসো গো বাহির হ'য়ে
> অনুপম সৌরভের প্রায়
> আমি তাহে ডুবে যাব, সাথে সাথে বহে যাব
> উদাসীন বসন্তের বায়।"

পরিণত বয়সে কবি নারীকে তার সৌন্দর্য্য কোরকের আবরণ ভেদ ক'রেই দেখেছেন, তার অন্তরের সৌরভ তখন কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছে। এই কবিতায় সেই পরিণতিরই সূচনা। যৌবনে কবির মুগ্ধ চোখে নারীর প্রতিটি অংগের প্রতিটি চেষ্টার ভংগিমা অপরূপ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। নারীর কথা বলবার অতুল ভংগিমার কথা বর্ণনা ক'রে কবি লিখেছেন—

> "ওরে কিছু শুধাইলে বুঝিরে নয়ন মেলি
> দু দণ্ড নীরবে চেয়ে রবে
> অতুল অধর দুটি ঈষৎ টুটিবে বুঝি
> অতি ধীরে দুটি কথা কবে।"

নারীর ভাষা যেন সে কীসের প্রতিধ্বনি, তাই যেন কবি তার অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারেন না। এ যেন স্পষ্ট কথা নয়, এ যেন শুধুই যেটুকু বলে সেটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যেখানে নারীর হৃদয় আপন সৌন্দর্য্যের অন্তঃপুরে গোপন আছে, নারীর কথা যেন সেই দূর থেকে আসে বলেই তার স্বর এমন মৃদু শোনায়। কবি নারীর সেই প্রাণের গোপন অন্তঃপুরের পরিচয় পাবার জন্যে ব্যাকুল। বাইরের এত রূপ, নারীর প্রাণের অতুলন রূপের আভাসই বয়ে আনে। সেই অতুল সুন্দর প্রাণের বিকাশ দেখবার জন্যেই কবিচিত্তের আকুলতা। কবি নারীর বাইরের রূপ নিয়েই খুশী নন। তাই আমরা দেখি কবির প্রথম যৌবনের রচনায় নারীর বাইরের রূপ বর্ণনার প্রাধান্য থাকলেও তার মধ্যে নারীর অন্তরের রূপ দেখবার জন্য আকুলতা। পরবর্তী রচনায় কবি যেখানে নারীর কথা বলেছেন, সেখানে তার এই অন্তর্লোকের রূপেরই আভাস

বয়ে আনে। যেখানে অন্তরের রূপ কুরূপ, সেখানে বাইরের রূপ ব্যর্থ, পরবর্তী রচনায় কবি এই কথাই বলেছেন।

কিশোর কবি লিখেছেন—

"ওদের আড়াল থেকে আবছায়া দেখা যায়
অতুলন প্রাণের বিকাশ
সোনার মেঘের মাঝে কচি উষা ফোটে ফোটে
পূরবেতে তাহারি আভাস।"

কবিচিত্তের পূর্বদিগন্তে নারী রূপের রঙীন কুয়াশা কেটে গিয়ে তার আসল রূপের সূর্য্য ফুটে উঠবে, এই আভাসই কৈশোর কাব্যে দেখা দিয়েছে।

নারীর হৃদয়াবেগকম্পিত ভাষাকে কবি তুলনা করেছেন বাতাসের হিল্লোলে থরথর কম্পিত আকুল কুমুদ ফুলের সংগে। (আচ্ছন্ন—ছবি ও গান) কবির মধ্যাহ্নের অলস মুহূর্ত্ত নারীর স্বপ্নে ভরা। মধ্যাহ্নে গাছের ছায়ায় ব'সে কবি সেই সুদূরের অভিসারিকার স্বপ্ন দেখেছেন,—

"সে যেন কোথায় আছে, সুদূর বনের পাছে
কত নদী সমুদ্রের পারে।"

অবশেষে একদিন কোন শুভ মুহূর্ত্তে সেই দূরের স্বপ্ন কবির প্রাণে আপন প্রাণ সহসা মিলিয়ে দেবে। সেদিন

"বাঁধিবে সে বাহুপাশে
চোখে তার স্বপ্ন ভাসে
মুখে তার হাসির মুকুল
কে জানে বুকের কাছে
আঁচল আছে না আছে
পিঠেতে পড়েছে এলোচুল।"

সে নারীর ভাষা, অর্ধেক তার কথায়, অর্ধেক চোখে, অর্ধেক হাসিতে জড়ানো। কিশোর কবির কাছে তখন নারীর সৌন্দর্য্য একটা দূরের নেশা, তার মধ্যে রয়েছে একটা অস্পষ্টতার মোহ। সে স্পষ্ট নয় ব'লেই মায়াময়, মোহময়।

"মুখে আধখানি কথা—
চোখে আধখানি কথা—
আধখানি হাসিতে জড়ানো।"

দুষ্যন্ত যেমন গাছের আড়াল থেকে ঋষিকন্যাদের লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কবিরও মধ্যাহ্ন স্বপ্নে যেন সেই নবযৌবনা লাবণ্যের ছবি কবির চোখে ফুটে ওঠে।

"কত ছবি মনে আসে
পরাণের আশে পাশে
কল্পনা কত যে করে খেলা।"

(মধ্যাহ্নে,—ছবি ও গান।)

কিশোর কবির চোখে যদিও নারীর রূপের স্বপ্নের ঘোর, তবু সেই স্বপ্নেরই মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সত্য। কবি ক্ষণে ক্ষণে নারীচিত্তের সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' কবির অল্প বয়সের কাঁচা লেখা। কিন্তু এই লেখার মধ্যেও ফুটে উঠেছে নারীর অন্তর সত্যের নিবিড় উপলব্ধি। কবি দেখেছেন, সংসারে পুরুষে পুরুষে যখন হানাহানি বাধে, তখন তার আঘাত ভোগ করে নারী, নিষ্ঠুর পুরুষ পরস্পরের প্রতি যখন প্রতিশোধ নিতে চায়, তখন মমতাময়ী নারী তার সমস্ত আঘাত ও অপমান সহ্য করে। যাদের প্রাণ কঠিন, আঘাত তাদের বাজে না। যার প্রাণে ভালোবাসা, আঘাতের সমস্ত বেদনা সেই পায়। প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায়ের মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা তার সমস্ত আঘাত পেল রাজকুমারী বিভা আর তার মা। অথচ তাদের নিজেদের কোনখানে কোন অপরাধই ছিল না। কাপুরুষ চিরদিন এমনি ক'রে নারীকে দুঃখ দেয়। বিনা দোষে তাকে শাস্তি দেয়। বাপ এবং স্বামী দুদিকেরই সমস্ত আঘাত একা সহ্য করতে হ'ল একটি কোমল সুকুমার বেদনা-কাতর নারী হৃদয়কে।

কবির যৌবন নারীর স্বপ্নে বিভোর। বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মাঝে নারীর রূপ, তার স্পর্শ, তার বিরহের দীর্ঘশ্বাসের আভাস পেয়ে কবির দিন ও রাত আকুল হ'য়ে ওঠে।

"আমার যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে
বিশ্বের আকাশ
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে
রূপসীর পরশের মত।
... ...
প্রতিদিন ঘুমাই যখন, পাশে এসে বসে যেন কেহ
যেন তার আঁচলের বায় যায় পরশি উষায় দেহ।
... ...
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে উঠে বকুল মুকুলে

কে আমারে করেছে পাগল শূন্যে কেন চাই আঁখি
তুলে
যেন কোন উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের
মাঝে।"

(যৌবন স্বপ্ন—কড়ি ও কোমল।)

নারী দেহের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ভাবুক কবির চোখে কামনার বস্তু ব'লে মনে হয় না। তাকে মনে হয় পূজার জিনিষ ব'লে। আর্টিষ্ট সৌন্দর্য্যকে যে চোখে দেখে তা সাধারণ মানুষের দেখার থেকে আলাদা। এই জন্যেই সাধারণ মানুষ অনেক সময় শিল্পীর আর্টের মধ্যে শ্লীলতার অভাব দেখতে পায়। শিল্পী যখন নারী দেহের নগ্ন সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলে তখন সে তার মধ্যে কামনাকে দেখে না, দেখে তার সৌন্দর্য্যের পবিত্রতাকে। শিল্পীর চোখে যা সুন্দর তাই পবিত্র। শিল্পীর চোখে সত্যই সুন্দর আর সুন্দরই পবিত্র। কবি কীট্‌সের একথা সবাই জানেন। "সত্যই সুন্দর আর সুন্দরই সত্য।" ইংরাজ লেখক সমারসেট মমের একটা উপন্যাসে শিল্পী ও অসংস্কৃত মানুষের দৃষ্টির পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে। কোন এক শিল্পী প্রেমে পড়েছে এক হীন চরিত্র মেয়ের সংগে। সেই মেয়ের মন শিল্পী-মনের স্তরের অনেক নীচুতে। শিল্পীর ঘরে দেয়ালে নগ্ন নারীর ছবি দেখে সেই মেয়ে বলে—আমি লজ্জায় কোন দিকে যে তাকাব তা ভেবে পাইনে। অসংস্কৃত বর্বর মন নগ্নতার মধ্যে কামনার পংক ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু শিল্পীর মন কামনার উর্দ্ধলোকে সৌন্দর্য্যের পবিত্রতাকেই দেখতে পায়। অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শিল্পের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই নারীর বুকের অনাবৃত রূপ। সাধারণ মানুষের মনে নারীর স্তন কামনার বস্তু ব'লেই মনে হবে। কিন্তু শিল্পী নারীচিত্তের কোমলতাকেই তার দুটি কোমল সুন্দর স্তনের মধ্যে দেখে। তার হৃদয়ের উদ্বেল স্নেহই ফুটে ওঠে তার দুটি উদ্বেলিত সুকুমার স্তনে। শিল্পীর মনের কথা এই উদ্বেল স্নেহকেই ফুটিয়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথ নারীর স্তনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মনোভাবকেই ব্যক্ত করেছেন।

"মরমের কোমলতা তরংগ তরল
উথলি উঠিছে যেন হৃদয়ের তীরে
কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেম
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে
সরমে মরিতে চায় অঞ্চল আড়ালে
প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।"

শিল্পীর চোখে সৌন্দর্য্য ভোগের বস্তু নয়। শিল্পী সৌন্দর্য্য ও আপনার মাঝখানে একটা দূরত্ব, একটা ব্যবধান, একটা ভয় দেখতে পায়। তাই বার্ণার্ডশ লিখেছেন ক্যানডিডার হাতে যে আগুন চালিয়ে দেবার লোহার শিক, তা দেখে তরুণ কবির মনে হয় ও যেন কোন অদৃশ্য তরবারি। সেই বাধা ডিঙিয়ে, ভয় কাটিয়ে, ক্যানডিডার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যেতে কবি অক্ষম। বার্ণার্ডশ' কবি মানসের যে একান্ত সত্য বিশ্লেষণ করেছেন তা আমরা দেখতে পাই নারীর প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবে। নারীর প্রতি কবির প্রেম পূজারই নামান্তর, এতে কবির আত্মার বন্ধন ঘটায়নি, মুক্তি এনে দিয়েছে।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ—।
... ...
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

নারীর প্রতি কবির যে প্রেম, তারও বেলাতে এই কথা খাটে। এই প্রেমেই কবির ভক্তি, এই মোহেই কবির মুক্তি।

"বিজয়িনী" কবিতায় কবির এই মনোভাবই ফুটে উঠেছে যে নারীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য কামনার লালসাকে নিবৃত্ত ক'রে দিয়ে তাকে পূজায় পরিণত ক'রে আনে। সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রতিমার দিকে তাকিয়ে কামনার হাতের তীর ও ধনু মাটিতে তার পায়ের তলায় খ'সে প'ড়ে যায়। তখন কামনা এই সৌন্দর্য্যের পায়ে প্রণাম জানায়।

"পরক্ষণে ভূমিপরে
জানুপাতি বসি নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্প শরভার
সমর্পিল পাদপ্রান্তে পূজা উপাচার

তৃণশূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।"

রূপমুগ্ধ পুরুষ যেদিন নারীকে পূজা নিবেদন করে, তখন ভক্তের সেই দৃষ্টি নারীকে লজ্জিত, ব্যথিত করে না। দেবতা যেমন প্রসন্ন চিত্তে ভক্তের উপহার গ্রহণ করেন, নারীও তেমনি পুরুষের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে তাকে পুরস্কৃত ক'রে, তার পূজা গ্রহণ করে। কবির এই মনোভাবই দেখতে পাই 'বিবসনা' কবিতায়।

"অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।"
(বিবসনা—কড়ি ও কোমল)

নারীর দুটি বাহু কবিকে মুগ্ধ করেছে। নারীর দুটি বাহু যেন করুণ মিনতি, প্রিয়জনকে কাছে ধ'রে রাখবার জন্যে। ও যেন যৌবনের মালা, দুটি আংগুলে ধ'রে আপন কণ্ঠ হ'তে প্রিয়জনের কণ্ঠে পরিয়ে দেওয়া। নারীর অন্তরের স্নেহ যেন ব্যক্ত হয় তার দুটি বাহুতে।

"দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।"

বাহু দুটির বাণী যেন আত্মনিবেদনের বাণী। কবি নারীকে দেখেছেন ভাবরূপে। তার প্রতি অংগের নিবিড় ব্যঞ্জনা কবিকে মুগ্ধ করেছে। নারীর দুটি চরণ কবির মনকে বারে বারে টেনেছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখি কুমুর দুটি পা দেখে মুগ্ধ হ'য়েছে তার দেওর নবীন। সে বলছে যারা অমন দুটি পায়ে জুতোমোজা প'রে তাকে আড়াল ক'রে রাখে তারা মানুষকে যে কী বঞ্চিত করে! নবীন বলছে—লক্ষ্মণ যে কী ক'রে সীতার পায়ের দিকে চোখ রেখে ১৪টা বছর কাটিয়ে দিল, এ দেশের দেওররা তার অর্থ বোঝে। যেখানে ভালোবাসার মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য সেখানেই ভক্ত পুরুষের দৃষ্টি পড়ে নারীর দুটি পদ পল্লবে। পুরাণো সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রেমের শাস্ত্রে নারীর দুটি পায়ের মূল্য গৌণ নয়। প্রেমিক প্রণয়িনীর দুটি পা কখনো মাথায় রাখে, কখনো কোলে তুলে নেয়। প্রেমিক দুষ্যন্ত প্রথম মিলনের ক্ষণে শকুন্তলার চরণ সেবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

"অংকে নিধায় করভোরু যথা সুখম্ তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ।"

জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলছেন,—

"স্মর গরল খণ্ডনম্
মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

নারীর উদার সুন্দর দুটি পদপল্লব প্রেমিক কবির চোখে মাথায় তুলে নিয়ে শিরোভূষণ করবার যোগ্য। নারীর দুটি পা ঘিরে শাড়ীর পাড়টি প'ড়ে যে শোভা সৃষ্টি করে, তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের রচনায় বারে বারে পেয়েছি। 'মালঞ্চ' বইয়ে কবি বর্ণনা করেছেন, সুন্দরী নারী পুকুরের ঘাটে বসে আছে। তার দুটি পা ঘাটের সোপানে। শাড়ীর কালো পাড়টি গৌরবর্ণ দুটি পা ঘিরে লুটিয়ে পড়েছে। যৌবন দিনের প্রিয় সংগিনীর দূরস্মৃতি যেদিন পরিণত বয়সে কবির মনে পড়ে, সেদিনও কবির মনে পড়ে যায় তার দুটি সুন্দর চরণের শোভার স্মৃতি।

"গৌর বরণ তোমার চরণ দুটি
ফালসা বরণ শাড়িটি ঘেরিবে ভাল।

'কড়ি ও কোমলের' 'চরণ' কবিতায় কবি লিখেছেন মাটির উপরে যখন নারীর দুটি সুন্দর চরণ পাত হয়, তখন যেন পৃথিবী আনন্দে আকুল হ'য়ে ওঠে। তার যেন শত বসন্তের সুখের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। পৃথিবী,—যে শত লক্ষ বছর ধ'রে বসন্তে ঝরা ফুলের স্পর্শে আনন্দিত হয়েছে নারীর, দুটি চরণ পাতের আনন্দ যেন সেই আনন্দের স্বপ্নকেই মনে নিয়ে আসে।

"শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়ে—
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্য়ালোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণ ছায়ায়
যৌবন সংগীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে
নূপুর সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।

রবীন্দ্রনাথের একটা খেয়ালী এই যে জগতে যা কিছু সুন্দর তা অন্তরে একই, তা এক রূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হ'তে পারে। তাই এই কবিতায় কবি দেখেছেন যেন ঝরা অশোকের রক্তিমা আর প্রভাত ও সন্ধ্যা রক্তিম আলোকের কোমল ছটা নারীর দুটি আরক্ত পা পল্লবের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। সৌন্দর্যের বিনাশ নেই

যা ছিল এক রূপে তাই দেখা দিল অন্যরূপে। যে অশোক ঝরে গেছে তার রক্তিমা কোথায় গেল, প্রভাত ও সন্ধ্যায় পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে যে কোমল রক্তিমা তা যখন মিলিয়ে গেল, তখন তা কোথায় গেল? সেই রক্তিমাই যেন ফুটে উঠেছে নারীর দুটি রক্ত কমল চরণে।

কবি-চিত্তের কামনা নারীর দুটি চরণ ঘিরে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। কবি বলছেন নারী তা'র দুটি পা এই কঠিন মাটিতে না ফেলে তার সলজ্জ কামনার রঙে রাঙা ব্যথিত চিত্তের রক্তপদ্মের উপরেই যেন রাখে।

(চরণ—কড়ি ও কোমল)

(ক্রমশঃ)

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় 'কৌচিং (couching) রীতিতে বিচিত্র অভিনব সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে অপরূপ উপায়ে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের নানা রকম সৌখিন সুন্দর নকশা রচনা করে সূতী রেশমী ও পশমী কাপড়ের বিভিন্ন সামগ্রী বানানোর মোটামুটি হদিশ দেওয়া হয়েছে। সূচীশিল্পানুরাগিণীদের সুবিধার্থে, এবারেও উপরোক্ত 'কৌচিং' রীতি অনুসরণে আরেক ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার সচিত্র পরিচয় প্রকাশ করা হলো। আলোচ্য 'কৌচিং' সূচীশিল্প পদ্ধতিটি অবশ্য ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত রীতিগুলির চেয়েও অপেক্ষাকৃত আয়াস ও দক্ষতা সাপেক্ষ—পাশের 'গ'-চিহ্নিত চিত্রে দেখানো নকশা নমুনাটিতে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাবে।

গ
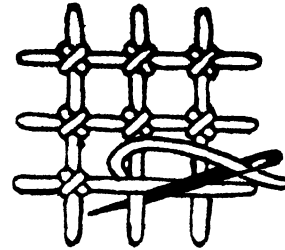
উপরের নকশা নমুনাটিতে চৌখুপী ছাঁদে রচিত শাদা রঙের সুতোর সারিগুলির সংযোগস্থলে ভিন্ন রঙের সুতোর 'বন্ধনী' দিয়ে যে রীতিতে সুষ্ঠু-সুন্দর ও সৌখিন সেলাইয়ের ফোঁড় তোলা হয়েছে—এটিই এমনি-ধরণের 'কৌচিং' সূচী শিল্প পদ্ধতির বিশেষত্ব। এ-ধরণের 'কৌচিং' সূচীশিল্প-পদ্ধতি অনুসারে সৌখিন সুন্দর উপায়ে সুতী, রেশমী এবং পশমী কাপড়ের উপর হরেক রঙের সুতোর সাহায্যে পরিপাটি ছাঁদে সেলাইয়ের কাজ করা, খুব একটা শ্রম-সাপেক্ষ বা কঠিন সাধ্য ব্যাপার নয়। অভিনবত্ব এবং মনোহারিত্বের দিক দিয়েও এই ধরণের 'কৌচিং' সূচী-শিল্পানুরাগিণী যে সব মহিলা সচরাচর নিজের হাতে অল্প বিস্তর সেলাইয়ের কাজকর্ম্ম করে থাকেন, তাঁদের পক্ষে সুতী, রেশমী বা পশমী কাপড় ও সুতোর গুণাগুণ এবং নক্সা-রচনার বিশেষত্ব বিচার করে এমনি ধরণের 'কৌচিং' রীতি অনুসরণে বিচিত্র মনোরম এমব্রয়ডারী সূচীশিল্প সামগ্রী বানানো বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। উপরোক্ত 'কৌচিং' পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে কি ধরণের নক্সা রচনা করা যেতে পারে, শিক্ষার্থীদের সুবিধার উদ্দেশ্যে নীচের 'ঘ' চিহ্নিত চিত্রে তারও একটি সহজ সরল নমুনা দেওয়া হলো।

ঘ
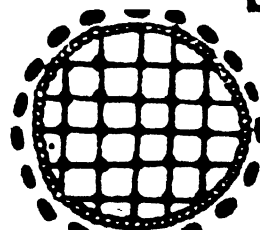
'ঘ' চিহ্নিত ছবিতে দেখানো 'আলঙ্কারিক নক্সার' নমুনাটি অনায়াসেই সুতী রেশমী বা পশমী কাপড়ের সৌখিন ব্লাউশ, স্কার্ফ, টেবিল-ক্লথ, পর্দা, কুশন-কভার, হাত-ব্যাগ, বটুয়া-থলি, টি-কোজি, টেবিল-ম্যাট প্রভৃতি নানারকম নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রীকে সূচীশিল্প শ্রীমণ্ডিত করে তোলার কাজে বিশেষ উপযোগী হবে।

সৌখিন সুন্দর বিবিধ সূচীশিল্প সামগ্রী অলঙ্করণের উপযোগী 'কৌচিং' সেলাইয়ের আরো কয়েকটি সহজ-সরল ও বিচিত্র নক্সা নমুনার পরিচয় দেবার বাসনা ছিল, স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ, সম্ভব হলো না। আগামী সংখ্যায় 'কৌচিং' সূচীশিল্প পদ্ধতির উপযোগী সহজ সরল নতুন ধরণের আরো কয়েকটি নক্সা-নমুনার হদিশ দেবার চেষ্টা করবো।

সুপর্ণা দেবী

রূপচর্চ্চার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বিচিত্র রত্ন-মণি-মাণিক্য ও মুক্তা প্রবাল-গজদন্ত খচিত সোনা-রূপা-তামা-পিতল প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুনির্ম্মিত সুদৃশ্য মূল্যবান্ ও অভিনব সৌখিন নানা রকমের যে সব অলঙ্কার ব্যবহারের বহুল রীতি প্রচলিত ছিল, তৎকালীন ভাস্কর্য্য চিত্রে, কাব্য নাটক সাহিত্য ইতিহাস ও বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে তার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে মোটামুটি পরিচয়ও দিয়েছি যৎকিঞ্চিৎ।

আগেই বলেছি—সুপ্রাচীন বৈদিক যুগেই ভারতে অলঙ্কারাদি ব্যবহারের বিশেষ বাহুল্য ও প্রচলন হয়েছিল। ভারতের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ 'অমরকোষে' উল্লিখিত তৎকালীন সমাজের নরনারীদের অঙ্গশোভার উপযোগী নানাবিধ অলঙ্কারাদির তালিকা ছাড়াও, মৌর্য্য-যুগের সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার কৌটিল্য বা চাণক্য-পণ্ডিত রচিত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে যে সব তথ্য বিবরণ মেলে, সে প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তন্ত্রোক্তকালের বিভিন্ন গ্রন্থে সমসাময়িক সমাজের বিলাসী নরনারীদের মধ্যে যে সব বিচিত্র অঙ্গাভরণ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল, আপাততঃ তারই মোটামুটি পরিচয় দিই। প্রাচীন 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে উল্লিখিত ৬৪ উপচারের তালিকায় তৎকালীন সমাজে ব্যবহৃত যে সব অলঙ্কারের নাম নজরে পড়ে, একালের অনুসন্ধিৎসু অনুরাগীদের অবগতির উদ্দেশ্যে, নীচে সে প্রসঙ্গে মোটামুটি বিবরণ প্রকাশ করা হলো।

যেমন :—

১। নবরত্নমুকুটম্—নব-রত্ন খচিত শিরোভূষণ মুকুট ;

২। চন্দ্রশকলম্—

৩। কর্ণপালি যুগলম্—দুই কর্ণের শোভাবর্দ্ধনের উপযোগী কানবালা জাতীয় অলঙ্কার ;

৪। নাসাভরণম্—নাসিকায় পরিধানের উপযোগী অলঙ্কার ;

৫। কনকচিত্রপদকম্—গ্রীবাদেশ ও বক্ষঃস্থল শোভনের উপযোগী আধুনিক যুগের 'লকেট' (Locket) 'ব্রুচ' (Brooch) 'মেডেল' (Medel) জাতীয় অলঙ্কার ;

৬। মহাপদকম্—উপরোক্ত-ধরণেরই আরেক ছাঁদের অলঙ্কার ;

৭। মুক্তাবলীম্—কণ্ঠভূষণের উপযোগী মুক্তার মালা ;

৮। কনকাবলীম্—উপরোক্ত ধরণেরই সোনার মালা ;

৯। দেহচ্ছন্দকম্—সম্ভবতঃ, বিশেষ ধরণের কণ্ঠমালা বা হার ;

১০। গ্রথনভূষণম্—অজ্ঞাত…সম্ভবতঃ, তৎকালীন সমাজে ব্যবহৃত বিশেষ ধরণের কোনো অলঙ্কার ;

১১। তিলকরত্নম্—ললাট-শোভন উ°যোগী রত্ন-খচিত তিলক-বিশেষ ;

১২। কেয়ূরযুগলচতুষ্কম্—কেয়ূর জাতীয় অঙ্গকার ;

১৩। বলয়াবলীম্—হাতে পরিধানের উপযোগী বালা জাতীয় অলঙ্কার ;

১৪। ঊর্মিকাবলীম্—আঙুলে পরিধানের উপযোগী আংটী জাতীয় অলঙ্কার ,

১৫। কাঞ্চীদামকটিসূত্রম্—কোমরের শোভাবর্দ্ধনের উপযোগী আধুনিক আমলের 'গোট' জাতীয় অলঙ্কার ;

১৬। শোভাখ্যাভরণম্—অজ্ঞাতনমা—তৎকালীন সমাজের বিশেষ ধরণের কোনো অলঙ্কার ;

১৭। পাদকটকম্—পদশোভার উপযোগী 'পায়জো'র জাতীয় অলঙ্কার ;

১৮। রত্ননূপুরম্—পদশোভা বর্দ্ধনের উপযোগী 'ঘুঙুর' জাতীয় অলঙ্কার ;

১৯। পাদাঙ্গুরীয়কম্—পদাঙ্গুলী শোভনের উপযোগী 'চুট্‌কী' জাতীয় অলঙ্কার ;

২০। শ্রীমন্মাণিক্য পাদুকা—চরণ শোভাবর্দ্ধনের উপযোগী মণি-মাণিক্য খচিত বিশেষ ধরণের পাদুকা ;

প্রাচীন ভারতের সৌখীন-বিলাসী নরনারীদের অলঙ্কার ব্যবহারের মোটামুটি পরিচয় দিয়ে আপাততঃ আমাদের প্রসঙ্গালোচনা শেষ করছি। বারান্তরে সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে পুরোনো যুগের নরনারীদের রূপচর্চ্চা প্রসাধন আরো কিছু বিচিত্র অভিনব তথ্য-বিবরণ প্রকাশ করার বাসনা রইলো।

যায় নাই

শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা ওরে যায় নাই।
আমি ত্রিসত্য করিয়া ব'লিতে পারি
মা ওরে যায় নাই॥
দেউল হইতে হৃদয়ে গিয়েছে
সেথা গিয়ে পুনঃ দীপ যে জ্বেলেছে
ঘৃত প্রদীপ দেউলে নিভেছে
হৃদয়ে নেভেনি ভাই॥
মধুরে মধুরে সে দীপ জ্বলিছে
সে দীপ হইতে মধু যে ঝরিছে
প্রাণ ভরিয়ে অন্তর্দৃষ্টি
একবার দেখে তাই॥
দীপ শিখা সেথা অনির্ব্বাণ জ্বলে,
অবিমুক্ত কাশী শিব শিবা মিলে,
খোল অন্ধ আঁখি, বেলা নাহি বাকি
এসো মাতৃ নাম গাই॥
হতাশ বক্ষে সজল চক্ষে
থেকো নাক ভাই স্ব স্ব কক্ষে
বাহিরে নিভেছে বাহিরের আলো
ভিতরে ত নিভে নাই।
আনন্দময়ী আনন্দ নগরে
ব'সে আছে যায় নাই।

ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ

সবিনয় নিবেদন,

সম্প্রতি আপনার পত্রিকায় 'ভাদ্র' সংখ্যা পত্রলেখা বিভাগে গায়ত্রীর অর্থ নিয়ে বেশ মনোজ্ঞ বাদানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ইহাতে ধর্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেই যে উৎসাহ বোধ করেছেন তা তো নিঃসন্দেহে বলা যায়। গায়ত্রীর অর্থ বিভিন্ন ঋষি মনীষী বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের যে সব আমার জানার সৌভাগ্য হয়েছে তার মধ্যে ৺রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যা আমার সব চেয়ে ভালো লেগেছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করছি—

"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময় হয়েন। সূর্যদেবের অন্তর্যামী সেই প্রার্থনীয় সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্যামিরূপে আমরা চিন্তা করি। যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন।..."

আশা করি এব্যাখ্যা থেকে অনেকেই ব্রহ্মগায়ত্রী ধ্যানের অনুপ্রেরণা পাবেন।

বিনীত—
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য
আগড়পাড়া

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকায় পাঠক-পাঠিকাদের চিঠিপত্র প্রকাশ করে যে সকলকে নানা বিষয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন, আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিচ্ছেন তার জন্য প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার বর্তমান পত্রের বিষয় কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা নয়। আমি ভারতবর্ষ পত্রিকার সমস্যা নিয়েই আলোচনা করতে চাই। "ভারতবর্ষ" জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের জন্যে চিরকালই বিখ্যাত। কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করছি ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধের এমনকি গল্পেরও খুব বাড়াবাড়ি চলছে। কয়েকজন লেখক তাঁদের গুরুদের মাহাত্ম্য কীর্তনে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় দিতে ও ভক্তির বিজ্ঞাপন করতেও কসুর করছেন না। হয়ত তাঁরা 'আপনি আচরি ধর্ম পরের শেখায়' রীতির অনুসরণ করছেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হয়ত আরও অনেকে ভক্তিলাভ, গুরুলাভ করতে পারেন, কিন্তু দেশের কি লাভ হবে তাতে? দেশের তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীরা যে উৎসন্নে যাচ্ছে সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি আছে কি? তাঁরা কি এমন কিছু বলতে বা লিখতে পারেন না যাতে দেশের তরুণ সম্প্রদায় দেশপ্রেমে, চরিত্র গঠনে, শিল্প-সাহিত্যে প্রেরণা পেতে পারে? এককালে 'ভারতবর্ষ' দেশপ্রেম প্রচার করত। এখন কতকগুলি সম্প্রদায়ের গুরুবাদ প্রচারের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন ইহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। বলতে পারেন, ধর্মভাব প্রচার করলে মানুষেরা ধ্যান পরায়ণ হবেন, তাঁরা শান্তিলাভ করবেন। কিন্তু সে-শান্তি কতখানি হবে, তার মূল্যই বা কতখানি তা চিন্তার বিষয়। আর যদিও বা এ সকল প্রবন্ধ বা গল্প পাঠ করে লোকেরা ধ্যানমগ্ন হয়ে যায় তাতেও কোন সুফল হবে না। ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁর এক সাহেব বন্ধু যা বলেছিলেন তা উপহাসচ্ছলে কথিত হলেও তার বিশেষ মূল্য রয়েছে। সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"—শাস্ত্রী, তোমার ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আমি

ভাবছিলুম তোমাদের সমগ্র জাতিটা যখন ধ্যানে মগ্ন ছিল, আমরা তখন ছোঁ-মেরে তোমাদের দেশটা কেড়ে নিয়েছি।” এখনও তাই হচ্ছে, 'ভারতবর্ষ'-র প্রখ্যাত লেখকেরা যখন ভক্তিরসে হাবুডুবু খাচ্ছেন বাঙলাদেশের ছেলে মেয়েগুলি তখন গোল্লায় যাচ্ছে। “ভারতবর্ষ”-র লেখক-লেখিকাদের এসম্বন্ধে অবহিত করলে বাধিত হব।

বিনীত—

শ্রীনিত্যানন্দ কোনার

খড়দহ

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের দেশের খাদ্য সমস্যা যে ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে, একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কোন নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গেলে ত মনে হয় না। গৃহ-কর্ত্তারা বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত অতিথিদের নানারকম খাদ্য ভোজন করিয়ে আপ্যায়িত করেন। তখন মনে পড়ে না, যে দেশের অগণিত মানুষ অর্ধাহারে, নয় তো অনাহারে রয়েছে। মনে পড়ে না ক্ষুধায় পীড়িত ও ক্রন্দনরত ছোট ছোট ভাই-বোনদের কথা!

বর্ত্তমানে আমাদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করতে হবে। পূর্বের মত অতিথিদের তৃপ্তিভোজ করানো উচিত নয়। দেশের অগণিত ক্ষুধার্ত্ত মানুষের দিকে আমাদের তাকানো উচিত। উৎসবাদিতে খাদ্যের প্রচুর অপচয় হয়। অতিথিদের যদি খাদ্যের দ্বারা আপ্যায়িত না করা হয়, তাহলে খাদ্যের অপচয় বন্ধ হবে, দেশের ক্ষুধার্ত্তদের মধ্যে কিয়দংশ ক্ষুধার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। তাদের মুখে ফুটে উঠবে হাসি।

বিনীত—

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়।

১৪, লোকনাথ চ্যাটার্জী লেন,

শিবপুর। হাওড়া—২

জবাই

শ্রীভাগবতদাস বরাট

গৃহ মাঝে ধূলা বালি আর কুটো খড়
রত্ন সম যত্নে রাখে বণিক প্রবর।
সবিস্ময়ে বালি কয় একি কর ভাই,
ত্রিভুবনে আমাদের নাই যে হে ঠাঁই।
উত্তরে বণিক কয়, এ কি বল মিতা,
এখনো কি রবে দুঃখী শ্রীরামের সীতা?
স্বাধীন দেশেতে নাই ভেদাভেদ প্রথা,
মনে বড় দুঃখ পাই শুনে তব কথা।
বসুধা হাসিয়া কয় ওরে আবর্জ্জনা,
তুই যে রে ভক্ষ্য বস্তু ভেজালের কণা।

বোধন

অনুবাদ—শ্রীদিলীপকুমার রায়

—ইন্দিরা দেবী

(হরি! মৈ) মাকে দ্বারে জাউঁ।
শঙ্খ বজাউঁ দীপ জলাউঁ "জয় জয় দুর্গে" গাউঁ॥
লাখ সহী হৈ তেরী কনহাঈ! তেরী প্রীত বড়ী দুখদায়ী!
কৈসী হম সঙ্গ লগন লাগঈ! তুম ন মিলাও ছুটে নাহী!
অব মৈ ধ্যান ধরূঙ্গী মা-কা, মন্দির নয়া বনাউঁ।
(মৈ) মাকে দ্বারে জাউঁ।
হে সুন্দর! তুম মন হর জাও, অপনা বনাকে পাস
ন আও,
কর অসহায়ে ক্যা সুখ পাও? মৈ ব্যাকুল, তুম মুরলি
বজাও!
মা সব পাপী কণ্ঠ লগায়ে—সব মৈ 'মা মা' বুলাউঁ।
(মৈ) মাকে দ্বারে জাউঁ।
কহতী মীরা: "ক্যা অন্যায়ে! শ্যাম রূপ ধর দুর্গে আয়ে!
শঙ্খচক্র তজ মুরলি বজায়ে! সিংহ ছোড় মা ধেনু চরায়ে!
"দুর্গে দুর্গে" মৈ তো পুকারূঁ "হরি হরি" ক্যুঁ সুন পাউঁ?

শ্যাম, যাব আমি শ্যামা মায়ের কাছে।
বাজাব শঙ্খ, জ্বালাব প্রদীপ, গেয়ে "জয় জয় মা
তো আছে।"
যাব আমি যাব মায়ের কাছে।"

মিলে শ্যাম, তুমি দুঃখ কতনা! তোমার প্রণয়ে
শুধুই বেদনা!
এ কেমন প্রেম-বিহার বলো না? পাই ব্যথা
তবু চাই সে-যাতনা!
আজ আমি ধ্যান ধরিব শ্যামার, গড়ি' মন্দির প্রাণের
মাঝে।
যাব আমি যাব মায়ের কাছে॥
চুরি ক'রে মন মোহন, লুকাও! কাছে ডেকে কাছে
আসিতে না চাও!
ক'রে অসহায় কী বা সুখ পাও? আমি কাঁদি,
তুমি মুরলি বাজাও!
ব্যথিতে মা টেনে নেয় বুকে তার, ডাকিব "মা মা"
সকালে সাঁঝে।
যাব আমি যাব মায়ের কাছে।
মীরা গায়: "ছি ছি, এ কী অন্যায়! শ্যামরূপ ধ'রে
শ্যামা দেখা দেয়!
চক্র ত্যজিয়া বাঁশরী বাজায়! সিংহবাহিনী মা
ধেনু চরায়!
"দুর্গা দুর্গা" গাই আমি—শুনি শুধু "হরি হরি"
মূর্ছনা যে!"

ক্রিকেটের কর্ণেল

শ্রীজ্ঞান

'হাতে যখন ব্যাট রয়েছে তখন বলকে ভয় পাব কেন? সে বল যত জোরেই হোক না কেন, আর উইকেট যত খারাপই হোক না কেন।' এই ছিল "বাম্পার" ও "বিমার" বল সম্বন্ধে ভারতীয় ক্রিকেটের 'জনক' কর্ণেল কোট্টারি কানকাইয়া নাইডুর মত, যিনি সি, কে, নাইডু নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতীয় ক্রিকেটের এই দিক্‌পাল খেলোয়াড় ১৯১৬ সাল থেকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অংশ গ্রহণ করে এসেছেন এবং ১৯৩২ সালে প্রথম বিদেশ সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে ইংলণ্ড সফর করেন। ১৯৩৬ সালেও তিনি ভারতীয় দলের হয়ে ইংলণ্ড সফর করেন। ১৯ ২ সালের সফরকারী দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন পোরবন্দরের মহারাজা। কিন্তু মহারাজা নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করেই বোধ হয় সি, কে, নাইডুর উপরই টেষ্ট ম্যাচে দল পরিচালনার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি যে বুদ্ধিমানের মতনই কাজ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৩৬ সালের দলের অধিনায়ক বিজয়নগরের মহারাজা (ভি, জি) সি, কে-র হাতে টেষ্ট ম্যাচে দল পরিচালনার ভার ছেড়ে না দিয়ে নিজেই অধিনায়কত্ব করেন, এবং তাতে অনেক গণ্ডগোল হয়। ১৯৩২ সালের সফরে সি, কে, প্রথম শ্রেণীর খেলায় ছয়টি সেঞ্চুরী সমেত ১৬১৮ রাণ করেছিলেন। এই রাণ সংখ্যার মধ্যের অনেকগুলি রাণ সংগ্রহ করেছিলেন শুধু "ছয়" বা "ওভার বাউণ্ডারী" মেরে! তাই সফর শেষে ক্রিকেটের পত্রিকা "উইজডেন" তাঁকে দলের সেরা ব্যাটস্‌ম্যান বলে অভিহিত করেন ও তাঁর দল পরিচালনারও বিশেষ প্রশংসা করেন।

সি, কে,-র খেলা ছিল আক্রমণাত্মক বা aggressive. প্রচণ্ড জোর বল বা মারাত্মক স্পিন বল কিছুকেই তিনি ভয় করতেন না। তখনকারকালের "পীচ" এখনকার কালের "ব্রাথোন" উইকেটের মতন ব্যাটস্‌ম্যান-সহায়কও ছিল না। তখন রাণ তোলা ব্যাটস্‌ম্যানদের পক্ষে রীতিমত কষ্টকর ছিল। কিন্তু সি, কে, যখন খেলতে নামতেন তখন রাণ-এর যেন ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিতেন। তাঁর হাতের ব্যাট যেন হাতুড়ির মতন পড়ত বলের ওপর, আর বলও ছুটে চলত মাঠের সীমানার দিকে, কখনও বা ভীমবেগে বোলারের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যেত মাঠের বাইরে! রক্ষণমূলক বা Defensive ব্যাটিং-এর বড় একটা ধার ধারতেন না সি, কে। অনেক সময়ে "অফ ষ্টাম্প"-এর বাইরের বল ঘুরিয়ে মারতেন "লেগ"এর দিকে। সি, কে, নাইডুর সুযোগ্য শিষ্য মাস্তাক আলিও এই রকম মারে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। মাস্তাক আলির খেলা যদি তোমাদের মধ্যে কেউ দেখে থাক তাহলে আমার কথা বুঝবে। সি, কে-র শিষ্য মাস্তাকও বল ঠেকাতে ছিলেন ওস্তাদ। মাস্তাক যতক্ষণ উইকেট-এ থাকতেন ততক্ষণ ঠিক সি,

কে-এর মতনই নয়নাভিরাম মার মেরে দর্শকদের চমৎকৃত করে রাখতেন। সি, কে, ছাড়া তাঁর মতন অমন সাবলীল ভঙ্গীতে দুরূহ মার মারতে আর কোনও ব্যাটস্‌ম্যানকেই দেখি নি।

ভারতীয় দলের হয়ে এবং পরে হোলকার দলের অধিনায়ক রূপে সি, কে, নাইডুর খেলা আমরা অনেকবার দেখেছি এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্যও হয়েছে। দলপতি রূপে তিনি যেমন ছিলেন কঠোর, খেলার মাঠের বাইরে তাঁর ব্যবহার ছিল তেমনি অমায়িক। একবার এক নৈশ ভোজের আসরে সি, কে-কে জিগ্যেস করেছিলাম আজকালকার ফাষ্ট বোলারদের, বিশেষ করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বোলারদের "বিমার"-এর মতন বল তখনকার কালেও দেওয়া হত কি না? উত্তরে মৃদু হেসে সি, কে, বলেছিলেন—আমরা 'বম্পার' বা 'বীমার' নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। বল গায়ের ওপরই আসুক বা মাথার দিকেই আসুক আমরা হাতের ব্যাট দিয়ে তাকে সজোরে মেরে বাউণ্ডারীর দিকে পাঠাবার চেষ্টা করতাম। সি, কে-র এই কথার থেকেই বোঝা যায় তাঁর ক্রীড়ার ধারা। ব্যাটিং ছাড়া বোলিং ও ফিল্ডিং-এও তিনি ছিলেন অসাধারণ। তিনি নানা ধরনের বল দক্ষতার সংগে দিতে পারতেন, আর ফিল্ডিং-এ তাঁর পটুত্ব ছিল অসাধারণ।

তোমরা, যারা ক্রিকেট খেলা ভালবাস বা যারা খেলে থাক, তারা কর্ণেল সি,কে, নাইডুর খেলা দেখতে পেলে না। আমরা যারা তাঁর খেলা দেখেছি আজ তাঁর সেই সব চমকপ্রদ মার, সুদক্ষ বোলিং (এক ওভারে তিনি প্রায় ছ'টা বল ছ'রকমের দিতে পারতেন) ও অনবদ্য ফিল্ডিং যেন চোখের ওপর ভাসছে। আর যেন দেখতে পাচ্ছি সুদীর্ঘ সুঠাম দেহী অধিনায়ক কর্ণেল সি, কে, নাইডু তাঁর স্বভাব সুলভ স্মিতহাস্য মুখে ইডেনের বুকে দৃপ্ত ভঙ্গীতে, দৃঢ় পদে এগিয়ে চলেছেন দলের পুরোভাগে!

কর্ণেল সি, কে, নাইডু আর ইহজগতে নেই। গত ১৪ই নভেম্বর ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান্ ও অধিনায়ক বিশ্বের ক্রীড়াজগৎ থেকে চির অবসর গ্রহণ করেছেন!

চিত্রগুপ্ত
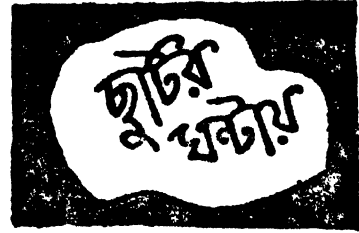
বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যময় প্রক্রিয়ার ফলে, টুকিটাকি নানারকম রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে আজব উপায়ে রঙ-বেরঙের উজ্জ্বল আলোর আভা ফুটিয়ে তোলার কায়দা কৌশল সম্বন্ধে তোমাদের ইতিপূর্বেই যেমন হদিশ দিয়েছি, এবারেও বলছি—তেমনি মজার আরেকটি অভিনব কথা। এ খেলাটির নাম—"রঙীন আলোর জ্বলন্ত ফোয়ারা"।

অল্প কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম আর রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে ছুটির দিনে বাড়ীতে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আজব মজার এই "রঙীন আলোর জ্বলন্ত ফোয়ারার" বিচিত্র কশরৎ দেখিয়ে খুব সহজেই তোমরা তাঁদের সবাইকে শুধু আনন্দই নয়—উপরন্তু রীতিমত তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। তবে গোড়াতেই বলে রাখি—এ খেলাটি দেখাতে হবে কিন্তু অন্ধকার ঘরে। কারণ, খেলা দেখানোর আসরটি আগাগোড়া অন্ধকার না রাখা হলে, জ্বলন্ত ফোয়ারার রঙীন আলোর আভা ফুটবে না ভালোভাবে এবং মজাও জমবে না তেমন বেশী। কাজেই এ বিষয়ে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন।

তাছাড়া আসরে দর্শকদের সামনে আজব-মজার এই খেলাটির কশরৎ দেখানোর আগেই যদি নেপথ্যে সবাইকার দৃষ্টির অগোচরে উদ্যোগ-পর্বের কয়েকটি ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সেরে রাখতে পারো, তাহলে মজা আরো বেশী এবং কাজের সুবিধা হবে অনেকখানি। অর্থাৎ, আসরে খেলা দেখানোর কিছুক্ষণ আগে স্বচ্ছ-পরিষ্কার একটি কাঁচের গেলাসে খুব মিহি ধরণের চূর্ণ করা ১৫ গ্রেণ 'জিঙ্ক' (finely granulated Zinc) বা 'দস্তা' এবং ৬ গ্রেণ

'ফস্‌ফরাসের' (Phosphours cut into very small pieces) গুঁড়ো জলে মিশিয়ে আগাগোড়া ভালোভাবে গুলে রাখো। এবারে আরেকটি কাঁচের গেলাসে খুব সাবধানে মিশিয়ে নাও—২ ড্রাম জলের সঙ্গে ১ ড্রাম 'সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড' (One drum of Sulphuric Acid)। তবে দ্বিতীয় গেলাসে এই 'মিশ্রণটি' (Solution) বানানোর সময় কিন্তু খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করা দরকার। কারণ, সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড' খুবই সাংঘাতিক এবং বিপদজনক রাসায়নিক পদার্থ... অসাবধানতার ফলে, দেহের কোন অংশে এ অ্যাসিডের ছিটেফোঁটা পড়লেই শুধু দহন জ্বালা আর ফোস্কাই নয়—ক্ষত দেখা দেবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কাজেই খুব সাবধানে এ সব মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজকর্ম ঘাঁটাঘাটি ক'রো।—নাহলে মজার বদলে, শেষ পর্যন্ত কোনো বিপদ বাধিয়ে তুলতে পারো। এমন বিপদের সম্ভাবনা আছে বলেই এ কাজটুকু বাড়ীর বড়দের কাকেও সুমুখে রেখে একান্ত হুঁশিয়ার হয়েই সুষ্ঠুভাবে সেরে নেওয়াই ভালো।

এ-পর্বের কাজ সারবার পর, আসরে দর্শকদের সামনে সাবধানে আলাদা আলাদা ভাবে রাসায়নিক মিশ্রণ ভর্তি এই গেলাস দুটি এনে, সমতল একটি টেবিলের উপর পাশাপাশি সাজিয়ে রাখো। তারপর প্রথম গেলাসের 'জিঙ্ক' আর 'ফস্‌ফরাস' মেশানো জলের সঙ্গে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে ঢেলে মিশিয়ে দাও—দ্বিতীয় গেলাসের 'সালফিউরিক অ্যাসিড' মিশ্রিত জলটুকু। এ দুটি রাসায়নিক-পদার্থের সংমিশ্রণে দেখবে—কাঁচের গেলাসের তরল অংশ থেকে ক্রমশঃ ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে সুরু করেছে। এবারে নির্ভয়ে দাও খেলার আসরের আলো...নিবিড় অন্ধকারে ঘরটি আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে—টেবিলের উপরে সযত্নে সাজিয়ে রাখা আজব রাসায়নিক-মিশ্রণ-ভর্তি কাঁচের গেলাসটির ভিতর থেকে ক্রমেই আবির্ভাব ঘটছে অপরূপ নীলাভ রঙের আজব আলোর উজ্জ্বল আভা আর বিচিত্র বর্ণের ধোঁয়ার কুণ্ডলী...আলোকচ্ছটার গতি অনেকটা ঠিক উজ্জ্বল ফোয়ারার উর্দ্ধমুখী জলধারারই মতো।

এবারের আজব মজার খেলাটির এই হলো মোটামুটি পরিচয়। আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞানের আরেকটি অভিনব বিচিত্র কারসাজির হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। খুড়োর উইলের হেঁয়ালী :

চারু খুড়োর ছিল ১১৯০ টাকা...মৃত্যুকালে উইল করে গেলেন—তিন ভাইপো আর তাদের তিনটি বৌ—এরা ছয়জনে সে টাকা পাবে। তিন বৌ মিলে যে টাকা পেলো, তা যোগ করলে হয় ৭১২৲ টাকা। বেলা-বৌ যে টাকা পেলো, ইলা-বৌ পেলো তার চেয়ে ২০৲ টাকা বেশী এবং লীলা-বৌ যা পেলো, সেটি হলো ইলা-বৌয়ের চেয়ে ২০৲ টাকা বেশী। ভাইপো জ্যোতির্ময় আর জ্যোতির বৌ পেলো সমান-সমান টাকা, শ্যাম পেলো শ্যামের বৌ যে টাকা পেলো—তার অর্দ্ধেক এবং বিনয় ভাইপো পেলো—বিনয়ের বৌ যা পেলো, তার অর্দ্ধেক। বলো দিকিনি, কে কার বৌ ?

বৈকুণ্ঠ দেবশর্ম্মা

'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

তিন অক্ষরে নাম মোর—
শিরোধার্য্য ভ্রম...
সবার নীচেতে থাকি
ছাড়িলে মধ্যম।
কুচ্ করে ছেঁটে ফেলো
যদি মোর শির,
প্রাণ ভরসা হই
রেল-কোম্পানীর !

রচনা : শান্তনু মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গত মাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালির উত্তর :

১। ১২ দিন

২। আলতা

৩। ধার

গত মাসের ৩টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সুনীরা, সঞ্জীব, পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), দোলন, পিণ্টু ও ফণী সাহা (কলিকাতা), রবি, পল্লব, কানিকা, কুসুমিকা, বাসবী, মানসী ও বাবুয়া রায় (কানপুর), দীপিকা, নীহাররঞ্জন, সোমদেব, বাসুদেব ও প্রণব সেনগুপ্ত (কলিকাতা), হরিদাস, অজয়, রাণা, প্রশান্ত, অমিয়, কৃষ্ণলাল, সুনীত, ভাস্কর, চিন্ময়, শুভেন্দু, গিরিজাকান্ত, হেমেন্দ্র, প্রেমেন্দ্র, ও নিহারাণী দত্ত(মধুপুর), কাকলী, মেখলা, নীলাঞ্জনা ও বাহাদুর সরকার (গড়িয়া), নিকুঞ্জ, মহেন্দ্র, বচেন্দ্র, তপতী, তাপসী, পণ্টু বিণ্টু, খোকন ও অরুণা গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা), অমিত, কবি ও অধীশ হালদার (লক্ষ্ণৌ), কুলু মিত্র (কলিকাতা), রিনি, ঝনি ও আরতি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), বুজু ও বিজু ভাদুড়ী (কলিকাতা), রাজা, ভুটিন ও পুপু (কলিকাতা)।

গত মাসের ২টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

প্রিয়ংবদা, অনসূয়া, চৈতালী, মধুচ্ছন্দা, গীতা, সীতা নবনীতা ও রাজীব গঙ্গোপাধ্যায় (জয়পুর), চন্দ্রিমা, নাটু, ছোট্টু, খাথা, মতি ও লতিকা রায় (কলিকাতা), জ্যোতিপ্রসাদ, সূর্য্যকিঙ্কর, কালিদাস, আশুতোষ, পৃথ্বীশ, আশীষ ও চৈতন্যদেব কুণ্ডু (শ্রীরামপুর), বিজয়েন্দ্রকুমার, বিনয়েন্দ্রকুমার, অজয়েন্দ্রকুমার সিংহ (হাজারীবাগ), সুধীশ, কল্যাণ, ইন্দ্রসেন, রঞ্জত, বিশ্বতোষ, শৈলেন, শচীন ও অমিতাভ হাজরা (কলিকাতা), সতী, মাণিক, পিণ্টু, তিনকড়ি, মানস, সরোজ, সলিল ও যমুনা বটব্যাল (ক্যানিং), তারা, মায়া, হাসি ও বিচিত্রা তালুকদার (কলিকাতা)।

গত মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), রেণু, সতী, গায়ত্রী, বীণা, উমানাথ, দীপঙ্কর ও জ্ঞানদারঞ্জন বসু (কলিকাতা), সত্যেন, লক্ষ্মী, নমিতা, সুনীল, মুরারি ও সঞ্জয় (ভিলাই), পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তা, মোহনলাল, মদনমঞ্জরী ও শোভনা গুহরায় (রাঁচী), দ্বিজেন্দ্র, রথীন্দ্র, রবীন্দ্র, রণেন্দ্র, দীনেন্দ্র ও দেবলীনা চৌধুরী (কলিকাতা), অনিল, সুরেন্দ্র, ব্রজনাথ, উপেন্দ্র, বনমালী, বকুল, কেয়া, মালতী ও অনাবিল চক্রবর্ত্তী (বর্দ্ধমান), কামিনী, সাধন, গোবর্দ্ধন, মানসী ও চিত্রাঙ্গী ঘোষ (কলিকাতা), শ্যামলী, কাজরী, রাজকুমার, দেবকুমার ও নিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কাঁকিনাড়া), প্রহ্লাদ, পরীক্ষিৎ, মধুমতী ও নবকিশোর পাল (কলিকাতা)।

প্রধান মন্ত্রীর বিদেশ সফর—

প্রধান মন্ত্রী প্রথমে কয়েকদিনের জন্ত কলম্বো গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিবার পরই ইউরোপ ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তিনি রাশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে সামরিক সাহায্যের জন্ত আবেদন করিয়া আসিয়াছেন।

স্বাধীনতা পাইবার পর ২০ বৎসর তাহার ভিতরের উন্নতিতে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। রাস্তা, রেল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিমান ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে অধিক অর্থ ব্যয় করায় সামরিক উন্নতিতে তত মনোযোগ দেয় নাই। গত কয়েক বৎসরে চীনের আক্রমণ ও পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধ ভারতকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ-প্রতিযোধের ব্যবস্থা এত ব্যয় বহুল যে অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নহে। সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া শ্রীমতী গান্ধী সাহায্যের জন্ত বন্ধু-দেশগুলির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হঠাৎ আক্রান্ত হইলে যাহাতে ভারত বিপন্ন না হয় তিনি সেজন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন।

ভারতবর্ষ আজ চারিদিকে বিপদের মধ্যে আছে। রাজনীতিক দলাদলি, অর্থাভাব, খাদ্যাভাব, সীমান্তে গণ্ডগোল, বিদেশী আক্রমণের আশঙ্কা এখন বাড়িয়া চলিয়াছে। সেজন্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিদেশ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আশান্বিত হইয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস প্রয়োজনকালে তিনি বিদেশের উপযুক্ত সাহায্য পাইবেন।

শ্রীমোরারজী দেশাই-এর বিদেশ সফর—

ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি ভারতের বাহিরে যাইয়া কয়েকটি দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ভারতের বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্নততর করার জন্ত রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রনায়ক ও ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।

ভারতে এখন প্রচুর কাঁচা মাল আছে। সেই কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানী করিলে ভারত বেশী লাভবান হয় না, এদেশে কলকারখানা নির্ম্মাণ করিয়া তৈরী মাল বিদেশে পাঠাইতে পারিলে একদিক দিয়া দেশের কোটি কোটি বেকার লোকের অন্নের ব্যবস্থা হয়, আর একদিকে বিদেশে সেই মাল বিক্রয় করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ভারত বিদেশ হইতে বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানি করিতে পারে। কিন্তু নূতন কারখানা করিতে হইলে যে মূলধনের প্রয়োজন তাহাও ভারতের নাই। কাজেই বিদেশ হইতে টাকা ধার করা দরকার। এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্ত শ্রীদেশাই বিদেশ গিয়াছিলেন।

এখন আরও কত বৎসর ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে চাল, গম প্রভৃতি আমদানী করিতে হইবে তাহা বলা যায় না। কেননা ভারতে যে পরিমাণে লোক সংখ্যা বাড়িতেছে সে পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে না। এ বিষয়েও বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন। বিদেশ হইতে অভিজ্ঞ লোক আনিয়া ও টাকা ধার করিয়া ভারতে অধিক খাদ্য উৎপাদন করাও শ্রীমোরারজীর বিদেশ ভ্রমণের অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল। দেখা যাউক তাঁহার চেষ্টা কতটা ফলবতী হয়।

সকল বিষয়েই দেশবাসীর সহযোগিতা ও সাহায্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, কিন্তু দুঃখের কথা দেশের লোক এ বিষয়ে চিন্তা করে বলিয়া মনে হয় না।

দলত্যাগ লইয়া সমস্যা—

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিধান সভার সদস্যরা বিধান সভায় মাঝে মাঝে একটি দল ত্যাগ করিয়া অপর দলে যোগদান করিতেছেন। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্য-ভারত প্রভৃতি রাজ্যে অবস্থা ক্রমে অচল হইয়া পড়িতেছে। একদলের সমর্থনে আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আইন সভা হইতে পদত্যাগ না করিয়া সেই দল ত্যাগ করিবার অধিকার সদস্যগণের আছে কিনা এই সমস্যা

সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত সকল রাজ্যের আইন সভার সভাপতিরা এক সম্মেলনে মিলিত হন। তাঁহারা এ বিষয়ে কঠোর আইন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহার ফলে নিত্য দল ত্যাগের ব্যবস্থা বন্ধ হইবে, দল ত্যাগের পূর্ব্বে আইনসভা হইতে পদত্যাগ করিলেই সদস্যদিগকে নূতন নির্ব্বাচনের সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহা সহজ ব্যাপার নহে।

ভাষা সমস্যা—

সর্ব্বভারতীয় ভাষা সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই। ভারতের বহু রাজ্যের লোক হিন্দীকে সর্ব্বভারতীয় ভাষা রূপে স্বীকার করিতে চাহে না। অথচ কেন জানি না প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী হিন্দীকে সর্ব্বভারতীয় ভাষা করার পক্ষপাতী। এই বিষয় লইয়া প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা পদত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনও এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন না। অথচ সমস্যাটির সত্বর সমাধান হওয়ার প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে কয়েকশত বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার বাহন স্থির না হইলে ছাত্রদের বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অবশ্য ইংরাজীতেই বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বত্র শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কেন যে এ বিষয়ে কোন শেষ মীমাংসা হইতেছে না তাহা বুঝা যায় না। আমরাও বহুবার বলিয়াছি সংস্কৃত ভাষাকে সর্ব্বভারতীয় ভাষা করিলে এই সমস্যার সমাধান হইবে।

ডাঃ রামমোহন লোহিয়া—

ভারতের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও নেতা ডাঃ রামমোহন লোহিয়া গত ১২ই অক্টোবর মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে দিল্লীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সমাজতন্ত্রবাদী হইলেও ভারতের লোক তাঁহাকে তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্ম শ্রদ্ধা করিত। তিনি মন্ত্রী না হইলেও কেন্দ্রীয় নেতারা সকল সময়ে তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং সারা জীবন স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া গিয়াছেন।

ধান আদায় সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইলে ধান উঠিবার সময় হইতে সরকারকে ধান সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যাভাব ও অশান্তির ফলে এ বৎসর চাষীদের নিকট হইতে ধান আদায় করা এক সমস্যা হইয়াছে। ইহার উপর শুনা যাইতেছে একদল নেতা গোপনে চাষীদিগকে পরামর্শ দিতেছে যে সকলে যেন ধান লুকাইয়া রাখে, সরকারকে যেন ধান বিক্রয় না করে। মানুষকে এইভাবে শুভবুদ্ধি হইতে বঞ্চিত করা হইলে দেশে অরাজকতা আসা স্বাভাবিক। এমনিতেই মানুষ সরকারের কার্য্যে সন্তুষ্ট নহে। তাহার উপর সরকারের কার্য্যে বাধা দিবার জন্য তাহাদের পরামর্শ দিলে দেশে অরাজকতা বাড়িয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল অঞ্চলে রেশনিং প্রথা চালু আছে যে সকল অঞ্চলে ধান উৎপন্ন হয় না। বিষয়টি লইয়া সরকার কঠোর ব্যবস্থায় মন দিয়াছেন। কিন্তু পুলিশ ও সৈন্যদলের সাহায্য লইয়া গ্রাম হইতে ধান সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রাক্তন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভায় বিষয়টি লইয়া কয়েক-দিন ধরিয়া আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। এই সঙ্কটজনক অবস্থার সমাধানের উপায় কি তাহাও ভাবিয়া পাই না।

নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব মহাসম্মেলন—

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ১লা অক্টোবর চারদিন ২৪ পরগণা জেলার খড়দহে শ্যামসুন্দর মন্দিরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্র খড়দহের গোস্বামী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীরভদ্রদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণব সম্মেলন হইয়াছিল। প্রথম তিন দিন গান, কীর্তন, ভজন, পূজা প্রভৃতির পর চতুর্থ দিনে বিকালে এক সভা হয় এবং তাহাতে প্রায় এক সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। পুরুলিয়া হইতে স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী আসিয়া সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন, এবং [illegible] গ্রাম্য যোগাশ্রমের শ্রীমৎ যোগেশ [illegible] সভার উদ্বোধন করেন। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর সভায় উপস্থিত থাকিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বাংলার বৈষ্ণব সম্মেলন, তাহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের কথা বিবৃত করেন। সভায় ভারতসেবাশ্রমের স্বামী বেদানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সন্তোষানন্দ প্রভৃতি যোগদান করেন। এই উপলক্ষে বীর-ভদ্রদেবের জীবনী সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রকাশ

করা হইয়াছে। সভাশেষে সম্মেলনের পক্ষ হইতে নবদ্বীপের পণ্ডিত গোপীন্দ্রভূষণ সাঙ্খ্যতীর্থ এবং স্থানীয় শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দুইখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের কথা উভয়েই অসুস্থতাবশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

বীরভদ্রদেবের একটি আবক্ষ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাহা খড়দহ কুঞ্জবাটীতে গৌর-নিতাই মূর্ত্তির নিকট রাখা হইয়াছে। উৎসবের প্রধান কর্ম্মী ছিলেন শ্রীতারাপতি ভট্টাচার্য্য।

এত অধিক জাঁকজমকের সহিত মন্দিরে ইতিপূর্ব্বে আর কোন উৎসব হয় নাই।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর উদ্যোগে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ১লা অক্টোবর সকালে তাঁহার গৃহে বহু সাহিত্যিক সমাগম হইয়াছিল। ৫০ জন সাহিত্যিক বহু পুষ্পমালা ও উপহার দ্রব্য লইয়া তাঁহার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, কবি বিষ্ণু সরস্বতী, কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য, গোপাল ভৌমিক, কালিপদ ভট্টাচার্য্য, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগান্তরের রাজেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণনগরের শ্রীমুরারি মোহন মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় সকলের সাদর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক দুরবস্থা—

যে কারণেই হউক কলিকাতা কর্পোরেশনের দারুণ আর্থিক দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার পথঘাটে এত অধিক গভীর গর্ত্ত হইয়াছে যে প্রায়ই মটর গাড়ী গর্ত্তে পড়িয়া অচল হইয়া যাইতেছে। কয়েকটি স্থানে বাস গাড়ীও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ফলে যাত্রী সাধারণের দুরবস্থার সীমা নাই। টাকার অভাবে কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের বেতন দান করারও অসুবিধা হইতেছে। ফলে অনেক সময় ঠিকমত ময়লা পরিষ্কার হইতেছে না। বিরাট শহরে এক বেলা ময়লা পরিষ্কার না করিলে লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এ-অবস্থায় শহরবাসীর অসুবিধা ও কষ্টের শেষ নাই। প্রায়ই কোন না কোন পল্লীতে জল সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায় এবং পাইপ মেরামতের জন্য কোন কোন পল্লীতে জল সরবরাহ দুই তিন দিন বন্ধ থাকে। ট্রাম ও বাস চলাচল ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট খারাপ থাকার জন্য প্রায় প্রত্যহ কোন কোন পল্লীতে বাধা প্রাপ্ত হয়।

কর্পোরেশনের এই অব্যবস্থার প্রতিকার যে কি করিয়া হইবে তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না।

ভারত নেপালের বন্ধুত্ব—

সম্প্রতি ভারতের সহিত নেপালের যে নূতন বন্ধুত্ব চুক্তি হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ। নেপাল বর্ত্তমান চীন সীমান্তে অবস্থিত। তিব্বত এখন প্রায় চীনের অধীন। কাজেই নেপালের উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থা না করিলে তিব্বত হইতে নেপালের মধ্য দিয়া চীন ভারত আক্রমণ করিবে। সেই সম্ভাবনা দেখিয়া নেপাল ভারতের সহিত বন্ধুত্ব বাড়াইবার যে চেষ্টা করিতেছে তাহা ভারতের পক্ষে সুসংবাদ।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—

নদীয়া জেলার খ্যাতনামা নেতা, দিল্লীর লোকসভার সদস্য হরিপদ চট্টোপাধ্যায় গত ১১ই নভেম্বর শনিবার সকালে দিল্লীতে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব দিন সন্ধ্যায় নদীয়া হইতে দিল্লী গিয়া পৌছিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। যৌবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররূপে এম, এ তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াও তিনি ১৯২১ সালে গান্ধীজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সারাজীবন দেশের কাজে কাটাইয়া গিয়াছেন। সেজন্য বহুবৎসর তাঁহাকে জেলে থাকিতে হইয়াছে। এক সময়ে তিনি নদীয়া জেলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। বহুবার তিনি পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং গত দুইটি নির্ব্বাচনে লোকসভার সদস্য হইয়াছিলেন। গান্ধীজির আদর্শে তিনি সারাজীবন নদীয়ার পল্লীগ্রামে জনসেবা

করিয়াছেন। পরিণত বয়সে তিনি বিবাহ করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার একমাত্র সন্তান—পুত্র অভীজিৎ গত পাকিস্থান ভারত যুদ্ধে সৈনিক রূপে নিহত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী, পুত্রবধূ ও একমাত্র পৌত্র বর্ত্তমান।

শেষদিকে তিনি কংগ্রেস ছাড়িয়া ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী, ও ত্যাগী দেশপ্রেমিক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

শচীন্দ্র নাথ মল্লিক—

নদীয়া রাণাঘাট নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দেশকর্ম্মী শচীন্দ্রনাথ মল্লিক ৬৪ বৎসর বয়সে গত ৫ই অক্টোবর পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তাঁহার পিতা 'নদীয়া কাহিনী' প্রণেতা রায় 'বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক ভারতবর্ষের লেখক ও বন্ধু ছিলেন। নদীয়া জেলার ইতিহাস লিখিয়া তিনি সেকালে খ্যাতিলাভ করিয়া ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কৃষিকার্যের প্রতি তাঁহার একাগ্রতা ও অনুরাগ সকলকে বিস্মিতকরিত। শচীন্দ্রনাথ পিতার মত জনসেবা করিয়া সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। আমরা শচীন্দ্রনাথের আত্মার শান্তি কামনা করি।

মেলা

শক্তি মুখোপাধ্যায়

অসংখ্য মানুষের কোলাহলে আজ মুখরিত
এ স্থান; শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতীর
একত্র সমাবেশ। রঙিন স্বপ্নের দৃষ্টিতে
আশ্চর্য ভাবালুতা। ঈশ্বরের ঘরে
ভক্তেরা করেছে ভিড়; আকাশের নিচে
বিপনি বিভিন্ন সাজে সুসজ্জিত,—ক্রেতা
বিলাসী দ্রব্য কেনে; কোথাও কাঠের ঘোড়া, বাঁশি।

হৃদয় উন্মুক্ত করে এখানে এসেছে কত লোক
অস্থায়ী চঞ্চল ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে
সকলেই নিতে চায় এ জীবনে শুধু
ক্ষণিকের বিচিত্র স্বাদ।

এ মেলা ফুরোবে কাল; নিবিড় নিস্তব্ধ হয়ে গেলে
সকলেই ফিরে যাবে নিজেদের নিশ্চিন্ত ঘরে।
ভেবেছে কি তারা কেউ এই পৃথিবীতে
চলছে বারোমাস এক জীবনের মেলা!

সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, বিরহ মিলন
মৃত্যু শোকাবহ দৃশ্যগুলি, বিচ্ছেদে কাতর—
সুখী ও অসুখী মন নিয়ে
এ এক জীবনের মেলা!
স্নেহ মায়া, ভালোবাসা বিস্মৃতির দ্বারে
স্তব্ধ হবে; দুদিনের পরিচিত মুখ
বিষণ্ণ আঁধারে ঘন কুয়াশায় নেমে
খুঁজে ফিরবে পুনরায় জন্মের বন্ধন।

এ মেলা ফুরোবে; এই নাতিদীর্ঘ জীবনের মেলা।
কিছু পাওয়া কিছুও বা না পাওয়ার ব্যথা
বুকের ভিতর উগ্র ব্যাধি
অবকাশে স্তব্ধ হবে—পরবর্তী দৃশ্যের গভীরে—
অতলান্ত চেতনা গভীরে
অবসন্ন অন্ধকার ঘোষণা করবো কাল সূর্য-সকালে
প্রতি সমাপ্তির পরে অন্য এক জীবনের শুরু।

জানালা

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

ওদের বাড়ীর জানালাটা আজ হঠাৎ খোলা।

হাত পাখাটা টানতে টানতে মালতী দেখলো। দারুণ গরম। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। একটি মাত্র কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছিলো মালতী। রাত তখন আর কতই বা হবে? আটটা কি সাড়ে আটটার বেশী নয়।

রোজই এই সময়টাতে ছেলেকে খাইয়ে দিয়ে ঘুম পাড়ায় মালতী। হাত পাখাটা টানতে টানতে কখন বা সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ে।

স্বামী কল্যাণ আসে রাত প্রায় ন'টার কাছাকাছি। কোন কোনদিন আবার সাড়ে ন'টা এমন কি দশটাও বেজে যায়। এসেই দরজায় কড়া নাড়ে। আচমকা ঘুম ভেঙে যায় মালতীর। বিরক্তির সঙ্গেই তাকে যেন উঠতে হয়। দরজাটা খুলে দিয়েই আবার সে বিছানায় একটু গড়িয়ে নেয়। ঘুমের রেশটা একটু কাটিয়ে নেয়।

কল্যাণ হয়তো এসেই প্রশ্ন করে, তুমি খেয়েছো মালতী?

না—মালতী জবাব দেয়, রোজ রোজ এক কথা জিগ্যেস করো কেন বলো তো? কোন মেয়ে তার স্বামীকে না খাইয়ে নিজে আগে ভাগে খেয়ে নেয় নাকি? এমন নজির দেখেছো কোন কালে?

রোজই তো আমি তোমাকে খেয়ে নিতে বলে যাই মালতী—কল্যাণ বলে, আমাদের কলকারখানার কাজ করতে হয়। তুমি তো আর কারখানার শ্রমিক নও। তুমি কেন শুধু শুধু রাত করে বসে থাকো বলো তো?

না, আমাকে তুমি রাজরানী করে রেখেছো আর কি! বাবা আমাকে কোন অফিসারের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারতেন তো আমিও সকাল সকাল খেয়ে নিতে পারতাম। কথায় বলে না যে, 'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে তার সাথে।'

একটু থেমে মালতী আবার বলে, সে বলতে পারে ওদের বাড়ীর সংবাদ। স্বামী বেলা দশ। বাজতে না বাজতেই নেকটাই, কোট, প্যান্ট পরে অফিসে বেরিয়ে যান……

মালতী হয়তো আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু কল্যাণ বলে, সুব্রতবাবু হচ্ছেন অফিসার মানুষ। একটা সওদাগরী অফিসের কর্তা। তোমার সরমাদি হচ্ছেন তাঁর স্ত্রী। ওদের সঙ্গে তুমি আমাদের তুলনা করো মালতী?

ঘরের জানালার একটা কপাটে রাখা গামছাটাকে টেনে নিয়ে কল্যাণ আরো বলে, আমরা কারখানার শ্রমিক, ওঁদের সঙ্গে তুমি আমার তুলনা করে আমাকেই শুধু শুধু দুঃখ দাও মালতী।

তা'হলে দুঃখ তোমার হয়?

হয় না?

তবু ভাল—মালতী বলে, ভাবতাম বুঝি সুখ দুঃখের বালাই বলতে তোমার শরীরে নেই।

কল্যাণ জবাব দেয়, মানুষ মাত্রেরই তো সুখ দুঃখের অনুভূতি থাকে মালতী। আর তাই এতদিনে বুঝলাম যে তুমি আমাকে একটা অমানুষ বলেই মনে করো।

মালতী চুপ করে থাকে।

কল্যাণ আরো বলে, তুমি বিশ্বাস করো মালতী, তোমার দুর্ভাগ্যের জন্যে আমিও দুঃখিত। কিন্তু কি করবো! তোমার বাবা তো জেনে শুনেই তোমাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের আগেও আমি যা ছিলাম এখনো তাই আছি।

ঘুমন্ত ছেলেটা একটু পাশ ফিরলো।

মালতী আরো জোরে জোরে পাখা টানতে লাগলো। পাছে ছেলেটা ঘুম ভেঙে এখনি কান্নাকাটি শুরু করে দেয়।

মালতীর আজকাল যেন আর কিছু ভাল লাগে না। এমন কি এই একটি মাত্র শিশু পুত্রের স্বভাবসুলভ কান্না-টুকুও না। সব কিছুতেই তার যেন বিতৃষ্ণা।

কল্যাণ বুঝতে পারে যে, সংসারিক অস্বচ্ছলতাই এর একমাত্র কারণ। রাতদিন সে সরমাদির কথাই শোনে তার মুখে। শুধু সরমাদি আর সরমাদি। সরমাদি এ করে; সরমাদি তা করে। সরমাদির এটা ভাল, সরমাদির ওটা ভাল। আর যত কিছু দোষ ত্রুটি তা সবই কল্যাণের।

কল্যাণের দুঃখ যে, তার মালতী একটা সহজ কথা কিছুতেই বোঝে না। বুঝবার চেষ্টাও করে না। কথাটা হচ্ছে যে, ভাগ্য কি কল্যাণের হাতের মুঠোয়?

সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বাড়ী এসে কল্যাণ মালতীর একটু হাসিমুখ দেখতেই পায় না আজকাল। কী যেন এক নির্লজ্জ অসন্তোষ তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে।

কল্যাণ কিন্তু সেজন্য কোন অভিযোগও করে না। আর্থিক অস্বচ্ছলতার মত এটাকেও সে দুর্ভাগ্যের একটা অংশ বলেই মনে করে।

কল্যাণ সে রাতে আর বিশেষ কিছুই বলে না। গামছাটা হাতে নিয়ে হাত-মুখ ধুতে বাইরে চলে যায়।

মালতীও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে।

স্বামীর ভাত বাড়ার জন্যে ল্যাম্পটা জেলে নিয়ে রান্না-ঘরের দিকে যায়।

ছেলেটা বিছানাতেই ঘুমিয়ে থাকে।

কল্যাণ কোন কোনদিন হাত মুখ ধুয়ে মুছে গামছা-টাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে এক ফাঁকে বিছানায় গিয়ে ওঠে। আদর করে ঘুমন্ত ছেলেটিকে।

তারপর মালতীর ডাকে তাকেও এক সময় রান্নাঘরের দিকে যেতে হয়।

ভাঁটার চচ্চড়ি আর ডাল। পাতলা জলের মত ডাল। খুব বেশী কিছু হলে তার সঙ্গে একটু নটে শাক ভাজা। আর সময়টা যদি সস্তা পটলের দিন হয় তবে দুটুকরো পটল ভাজাও যে পাতে না এসে পড়ে তা নয়। অধিকাংশ দিন এই সব উপকরণ দিয়েই কল্যাণকে খেতে হয়। খেতে হয় মালতীকেও।

এমনি করেই ওদের দিন কাটে।

শান্তি বলে বস্তুটি যেন ওদের সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে। মালতী যদি সহ্য করতো সংসারের তুচ্ছ অভাব অনটনগুলোকে! অল্পেই সে যদি খুশী থাকতে পারতো; তাহলে তো কোন অশান্তিই থাকতো না ওদের সংসারে।

কিন্তু মালতী তা পারে না।

সে হিংসা করে পাশের বাড়ীর সরমাদিকে।

ওদের অবস্থা কত স্বচ্ছল। গোটা বাড়ীটাই ওরা ভাড়া করে আছে। তার ওপর আবার ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখা।

আর মালতীদের একটা ছোট ঘর। টিনের চাল। তাও আবার অক্ষত নয়। বৃষ্টিতে বাইরের চেয়ে যেন ভেতরটাই বেশী করে ভেসে যায়। অন্ততঃ মালতীর তো তাই মনে হয়। আর গরমকালের দুপুর বেলাটাতে তো একেবারে যেন অগ্নিবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। শীতকালেও প্রচণ্ড শীত। সুখ কোনকালেই আছে বলে তো মালতীর মনে হয় না।

কিন্তু কল্যাণ জানে, সুখ না থাকলেও সুবিধা আছে অনেক। তা হচ্ছে, তাদের টাকার অঙ্কটা নেহাৎই কম।

* * *

মালতী কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, স্বামী আসার সময় হলেই সরমাদি এদিককার জানালাটা বন্ধ করে দেয় কেন?

মনে মনে অনেক ভেবেও তার একটা সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় নি মালতী। কি শীত, কি গরম—কোন কালেই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি।

নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে শুধু আজ।

মালতী দেখলো, ওদের বাড়ীর জানালাটা আজ হঠাৎ খোলা।

রাত তখন আটটা কি সাড়ে আটটাই হবে।

কিন্তু ওকি?

মালতী দেখলো, একটা গোলটেবিলের সামনে বেতের চেয়ারে বসে রয়েছেন সরমাদির স্বামী সুব্রতবাবু।

সরমা! সুব্রতবাবুর তীব্র কণ্ঠস্বর মালতীর কানে এলো, এখনো দেরী হচ্ছে কেন? কুইক্‌।

জানালাটা আজ খোলা।

তাই মালতী ওদের কথাবার্তাগুলো বেশ শুনতে

পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে ওদের দুজনকেই

সুব্রতবাবু আর একবার যেন বজ্রকণ্ঠে ডাকলেন, সরমা! কী হচ্ছে তোমার ও ঘরে? কী এমন কাজ পড়ে গেল হটাৎ? আমি অফিস থেকে আসার আগে ও-সবগুলো সেরে রাখা যায় না? যত কাজের ধুম লেগে যায় আমি অফিস থেকে এলে?

সরমা এলো।

দুরু দুরু বুকে ও ভীরু ভীরু পায়ে সরমা এলো।

হাতে তার একটা বোতল আর একটা কাঁচের গ্লাস।

গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে বোতলের ছিপিটা খুলে ফেলে সরমা। বোতল থেকে কী যেন এক তরল পদার্থ ঢালতে থাকে কাঁচের গ্লাসে।

তারপর খুব সন্তর্পণে কাঁচের গ্লাসটাকে সরমা তুলে ধরে স্বামীর মুখে।

সুব্রতবাবু চুমুক দিয়ে কাঁচের গ্লাসটার তরল পদার্থটুকু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিঃশেষ করে ফেলেন।

মদ? মালতী নিজের মনেই বলে, ছিঃ ছিঃ, সুব্রতবাবু তাহলে মাতাল?

মুহূর্তের মধ্যে একটা চাপা ঘৃণায় মালতীর মনটা যেন বিষিয়ে ওঠে।

সরমাদিকে তাহলে রোজ রাতে এমনি করে নিজের হাতে স্বামীর মুখে মদের গ্লাস তুলে ধরতে হয়?

না, এ জ্বালা অবশ্য মালতীর নেই।

মালতী আজ বুঝতে পারলো যে, রোজ সন্ধ্যা না হতেই ও-বাড়ীর এদিককার জানালাটা কেন বন্ধ হয়ে যায়। ঘরের ভিতরকার প্রাত্যহিক এই বিশ্রী আবহাওয়াটুকু যাতে বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ না পায় সম্ভবতঃ সরমাদি সেই জন্যেই এদিককার জানালাটা রোজ বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু আজ হয়তো সরমা ভুলেই গেছে জানালাটা বন্ধ করে দিতে।

মালতী এবার বিছানাতে উঠে বসে ওদের বাড়ীর জানালাটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

জানালা থেকে যতটুকু দেখা যায় তাতেই সে দেখলো, সরমা বোতলটাকে নিঃশেষ করে স্বামীকে পান করালো।

সুব্রতবাবুর আশা তবুও মেটে না।

আরো চাই। আরো! আরো!

সরমা জানায়, আর নেই।

নেই?—সুব্রতবাবু যেন গর্জন করে উঠলেন। বললেন, কেন থাকে না? সময় মত বেশী করে আনিয়ে রাখতে পার না?

সরমা বলে, ঐ ছাই পাঁশগুলো না খেলেই কি নয়? তা'ছাড়া……

সরমা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু সুব্রতবাবু কাঁচের গ্লাসটা সজোরে ছুঁড়ে মারলেন, সরমার গায়ে নয়, সামনের দেওয়ালে।

কিন্তু তারই এক টুকরো কাঁচ সজোরে এসে লাগলো সরমার কপালে।

রক্ত ঝরতে লাগলো সরমার কপাল থেকে।

উঃ…

চাপা আর্তনাদটা সরমার নয়, মালতীর। কাঁচের টুকরোটা যেন তার কপালেই লেগেছে।

এ দৃশ্য আর বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না মালতী।

সজোরে সে নিজের জানালাটাকেই বন্ধ করে দেয়।

এতদিন সে সরমাদিকে কতই না সুখী মনে করতো। সে ভুল যেন ভাঙলো আজ। আজ সে বুঝতে পেরেছে যে, তার চেয়ে সে নিজেই বেশী সুখী।

কল্যাণ অপদার্থ মাতাল নয়। স্বামীর মত স্বামী সে।

মালতী আজ অনুতপ্ত। এমন স্বামীর মনে সে মিছিমিছি কতই না কষ্ট দিয়েছে।

মালতীর ইচ্ছা হলো, কল্যাণ আজ বাড়ী এলেই তার পা দুটো জড়িয়ে ধরবে। কাঁদবে। ক্ষমা চাইবে সে তার কাছে।

রাত প্রায় ন'টা বাজলো।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

মালতী বুঝতে পারে যে, কল্যাণ এসেছে। তাই খুশী খুশী মনে দরজাটা খুলে দিতে আজ এগিয়ে গেল।

ওদের বাড়ীর এদিককার জানালাটা আজ হঠাৎ খোলা ছিল। তাই মালতীর মনের জানালাটা আজ হঠাৎ খুলে গেল।

বুড়ো শিবতলার মন্দিরচিত্র

শ্রীদুর্গাচরণ সরকার ও শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার

লোকালয়ের একপ্রান্তে নির্জন বনচ্ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো শিবতলার ভগ্ন দেবালয়। অবহেলায় সে আজ ম্লান, অনাদরে ভগ্নোন্মুখ। কিন্তু অপূর্ব কারুকার্য-মণ্ডিত হয়ে সে আজও দণ্ডায়মান আপন মহিমায়। মন্দির-গাত্রে যে সুচারু সুন্দর শিল্পনিদর্শন খোদিত রয়েছে—তা দেখলে যে কোন শিল্পরসিকই মুগ্ধ হয়ে যাবেন। পোড়া-মাটির ইটের ওপর এই মূর্তিগুলি খোদিত। এই ধরনের স্থাপত্য শিল্পকে সাধারণতঃ টেরাকোটা শিল্প বলা হয়। কাঁচা-মাটির ইটের ওপর বিভিন্ন মূর্তির ছাঁচ তুলে ইটগুলি পুড়িয়ে নেওয়া হয়। অনেক সময় আবার কাঁচা ইটের গায়ে নরুণ দিয়ে খোদাই করতেও দেখা যায়। তারপর ছোট ছোট ইটগুলি পর পর সাজিয়ে গড়ে ওঠে মন্দিরের স্থাপত্য সৌন্দর্য্য। টেরাকোটা শিল্প বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যময় শিল্প। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পী যখন তার সৃষ্টিকে রূপায়িত করেন পাথরের বুকে, বাংলার শিল্পী তখন পাথরের অভাবে পোড়ামাটির ওপরই স্বাক্ষর রেখে যান তাঁর শিল্প প্রতিভার। বুড়ো শিবতলার মন্দির চিত্রও তাই বাংলার এই বিশিষ্ট শিল্পরীতিতেই রূপায়িত হয়েছে। মন্দির গাত্রে প্রধানতঃ দেবদেবীর মূর্তিই অঙ্কিত দেখা যায়। দুর্গা কালী ইত্যাদি মূর্তিগুলি নিখুঁত পরিস্ফুটনে, সুচারু রেখা বৈশিষ্ট্যে, চিক্কন সজীবতায় অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি। এ ছাড়াও আনুষঙ্গিক যে সকল চিত্র খোদিত হয়েছে সেগুলি আরও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধরণের মানুমূর্তি, পক্ষীর ছবি, অশ্বারোহী সৈনিক, বাঘ, সিংহ ইত্যাদির প্রতিকৃতি-গুলি বেশ সুন্দর। কিন্তু সব থেকে যা লক্ষ্যণীয় তা হল বন্দুকধারী একসারি গোরা সৈন্যের ছবি। এক দল টুপি পরে, বন্দুক নিয়ে মার্চ করে চলেছে—এ চিত্রটি আমাদের সকৌতুক আগ্রহ সৃষ্টি করে। শিল্পী নিজেকে কেবল গতানুগতিক কতকগুলি পৌরাণিক চিত্র ও মানুষী ধরণের মধ্যে নিজের শিল্পসৃষ্টির পরিধিকে সীমাবদ্ধ না রেখে অতি আধুনিক কালের এক রাজনৈতিক ঘটনাকেও চিত্রায়িত করবার প্রয়াস পেয়েছেন দেখে আমরা প্রশংসা না করে পারি না। এর থেকেই বোঝা যায় বাঙালী শিল্পী কেবল কল্পনার অলীক রাজ্যেই ভ্রমণ করেনা চারি-পাশের সমাজ ও বাস্তব জীবনও তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মন্দিরটি যে সময় রচিত হচ্ছিল ইংরেজরা নিশ্চয়ই সে সময় ভারতে আসতে শুরু করেছে আর গ্রাম্য-শিল্পী নিশ্চয়ই নিকটবর্তী বৃটিশ চন্দননগর কিংবা হুগলিতে গোরা সৈন্য দেখে থাকবে—ফলে আশ্চর্য্যজনক ভাবে সমসাময়িক ইতিহাসের এক বিখ্যাত ঘটনার ছোট্ট ছাপ থেকে গেল এক অখ্যাত মন্দিরগাত্রে।

মন্দিরচিত্রে এধরণের ধর্মবহির্ভূত ছবি সঙ্গত কিনা এ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। আমরা কেবল তাকে শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিচার করবো, এবং তার জন্য অজানা শিল্পীকে সপ্রশংস অভিনন্দনও জানাবো। প্রসঙ্গত আমরা অন্য একটি মন্দিরের কথাও উল্লেখ করতে পারি—সেটি হল বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দির। এর একটি চিত্রে: একটি জাহাজ ভাসতে ভাসতে আসছে, তাতে টুপিপরা কয়েকটি সাহেব জাহাজের কামরার মধ্যে রয়েছে, অন্য একটি সাহেব—আঙ্গুল দিয়ে দূরের তীরভূমির দিকে দেখাচ্ছে এই ভঙ্গীটি অপূর্ব সুন্দর রূপে বাঙ্ময় হয়েছে। ইংরেজের ভারত আগমনের কাহিনী এক নগণ্য ইষ্টক ফলকে এত সুন্দর উৎকীর্ণ—সত্যই বিস্ময়জনক। বুড়ো শিবতলার মন্দির-চিত্র দেখে সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রাঙ্গণে সেই শিবমন্দিরের চিত্রটির কথাই মনে পড়ে যায়। বাংলার খুব কম মন্দিরেই ঐতিহাসিক ঘটনার এমন বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। বুড়ো শিবতলার অবহেলিত প্রাচীন মন্দির তাই শুধু ঐতিহ্যের দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যময়। পুরাতন কারু-কার্য্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাই এর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যাবশ্যক।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩/১/১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩৭৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

জন্মান্তর

শ্রীরাধাবল্লভ দে

জীবাত্মার জন্ম মৃত্যু, উৎপত্তি বিনাশ নাই। দেহের সহিত পুনঃ পুনঃ তাহার সংযোগ বিয়োগ ঘটে। ইহার নামই জন্মান্তর। জীব মাত্রেরই পূর্ব্বেও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে আবার প রও বহু জন্ম উপস্থিত হইবে। সে· যেমন কর্ম করিতেছে, তেমনি ফল পাইতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে জন্মান্তর বাদের সহিত কর্মবাদের একটি গভীর সম্পর্ক আছে। তবে কর্ম বলতে শুধু মাত্র চেষ্টাকে বুঝায় না। কর্ম ত্রিবিধ—ভাবনা, বাসনা-কামনা এবং চেষ্টা। জীব ভাবনাত্মক, অর্থাৎ ইহজন্মে সে যেরূপ ভাবনা ভাবে, দেহান্তে সে সেইরূপ হয়, অর্থাৎ যদি কু বিষয় ভাবে তবে কু হয়, সু বিষয় ভাবে তবে সু হয়। সুতরাং ইহজন্মে আমরা যে চরিত্র ও মানসিক প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করি তাহা পূর্ব্বজন্মের ভাবনার ফল। দ্বিতীয় বাসনা-কামনা – জীব যাহা কামনা করে, যেখানে সেই কামনার বস্তু সেইখানে তাহাকে যাইতে হয়। অর্থাৎ যাহার প্রতি তাহার প্রবল অনুরাগ বা প্রবল বিরাগ,—তাহার সহিত পরজন্মে তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তৃতীয় চেষ্টা অর্থাৎ জীব যেমন কর্ম করে, তেমনি ফল পায়। জীবের যেমন কর্ম, যেমন আচরণ, সেইরূপ গতি হয়। তবে পৃথিবীতে যেরূপ বীজ বপন করিলে তাহা সম্ভ

সবই বলবান হয় না, কিন্তু কাল অনুসারে সেই বীজ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, পুষ্পিত, মুকুলিত হইয়া পরে ফল প্রসব করে, কর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। অর্থাৎ কর্মের ফল সাধারণতঃ ইহজন্মে ফলে না, পরজন্মে ফলিয়া থাকে। তবে কর্ম যদি উৎকট হয়, তবে তাহার ফল ইহজন্মেই ভুগিতে হয়—তা সে কর্ম পুণ্যই হউক আর পাপই হউক। সাধারণতঃ বলিতে গেলে জীব কোন্ দেশে কাহার গৃহে জন্মাইবে, কত দিন তাহার আয়ু হইবে, তাহার ভোগ কিরূপ হইবে, দেহের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য কত দূর লাভ হইবে—এ সমস্তই পূর্ব্ব জন্মের কর্মের উপর নির্ভর করে। ইহাই জন্মান্তর বাদের স্থূল কথা। জগতের বৈষম্য বুঝাইবার পক্ষে এরূপ সমীচীন মত আর দ্বিতীয় নাই।

এখন প্রশ্ন ওঠে এই জন্মান্তরের কি কিছু প্রমাণ আছে? প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। আগম—বলিতে তত্ত্বদর্শী আপ্ত ব্যক্তির শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ বাণীকে বুঝায়। গীতা, বেদ, প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁহাদের উপলব্ধি শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ গীতার বাণীই নেওয়া যাক্। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতায় বলিয়াছেন, হে অর্জুন, আমার এবং তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে। জন্মান্তর সম্পর্কে অবতারের এ আপ্ত বাক্য স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। ইহাতে কোন দ্বিধা, কোন সঙ্কোচ উত্থাপিত হইতে পারে না।

এবার যুক্তি দ্বারা অনুমানের সাহায্যে জন্মান্তর প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইব। প্রত্যেক জীবের চিত্ত পঞ্চবিধ সংজাত ক্লেশ সংস্কাররূপে নিহিত দেখা যায়। ইহাদের নাম অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। এ সহজাত সংস্কার জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের অভ্যাস জনিত দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে। আমরা আরও অনেক উদাহরণ পাই, যেমন সদ্যোজাত বৎসের স্তন্য পানের প্রবৃত্তি, জন্ম-সিদ্ধ রাগ-দ্বেষের প্রবৃত্তি। আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাই ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার কয়েক সেকেণ্ড পরেই সদ্যঃপ্রসূত হংস শিশু জল পাত্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বানর শিশু মাকে আঁকড়াইয়া ধরে, মোরগ শিশু খাদ্য খুঁটিয়া খায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

জন্মান্তরের স্বপক্ষে আমি ধর্ম শাস্ত্রের আগম প্রমাণ তৎপর যুক্তি সিদ্ধ অনুমান প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছি। এবার আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ উল্লিখিত করি। আবার বক্তব্য শেষ করিব। কখনও কখনও এরূপ দেখা যায় যে, দুই মনুষ্যের মধ্যে প্রথম মিলনেই সখ্য বা শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়া যায়। ইহা পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সংস্কারের উদ্বোধনের ফল। যাঁহারা জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি অবতারদের ন্যায় অনেক জাতিস্মরের সাক্ষাৎ সংস্কারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন সকল শিশু দেখা গিয়াছে যাহারা বিনা শিক্ষায় সঙ্গীতজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, স্বভাবকবি ইত্যাদি। তারপর কেহ মেধাবী, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র। এই যে মানুষে মানুষে বৈষম্য, অবস্থার এবং ভোগের প্রভেদ, প্রবৃত্তির, প্রকৃতির এবং সুযোগের প্রভেদ, জন্মান্তর না স্বীকার করিলে ইহার সুসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপরোক্ত ঘটনাগুলি জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রেমল বৈরাগী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অসিত চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রণবকে তার করেছিল যে, সম্ভবতঃ ৮ই ভাদ্র আলমোরায় অভ্যুদিত হবে। পরদিনই প্রেমলের তার পেল: "প্রণবের জ্বর. তুমি সোজা আমাদের বৈজ্ঞানিক বন্ধু শ্রীসুরথ গুপ্তর ওখানে গিয়ে হানা দেবে। তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, কোনো ভাবনা নেই। নিশ্চয় এসো। আমরা সবাই দিন গুণছি।"

কাঠগুদাম থেকে বাসে আলমোরা উঠতে সাড়ে চার ঘণ্টা লাগল। এতক্ষণ ঘোরানো রাস্তায় উঠে অসিত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বৈকি। শ্রীসুরথ গুপ্তর নাম শুনেছিল—আলমোরার বিখ্যাত বাসিন্দা—বৈজ্ঞানিক, রসিক, ভক্ত একধারে। তার উপর, প্রেমলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাশীতে প্রেমল তাঁর নানা গুণের কথা ফলিয়েই বলেছিল। ললিতা তার উপর জুড়ে দিয়েছিল: "কিন্তু সুরথদার সবচেয়ে বড় গুণ—রসিক। রসে-ভরা একেবারে টস্ টস্ করছেন।" প্রেমল বলেছিল: "সুরথদা আমাদের যে কত বড় আশ্রয়, দরদী—হাঁ করবার আগে বুঝে নেন কী বলতে যাচ্ছি। চাইবার আগেই পাওয়া। এ হেন বন্ধু বিধাতার দানই বলব। আমরা এখান থেকে কাঠগুদাম নামার পথে প্রায়ই ওঁর ওখানে দুচারদিন কাটিয়ে যাই। রস ও রসদ দুয়েরই সংস্থান হয়। তাছাড়া আলমোরায় ওঁর চমৎকার আরাম নিলয়ে আমরা থাকি রাজার হালে—অকিঞ্চনের পক্ষে এ একটা কম লাভ নয় তো"—ইত্যাদি।

কাঠগুদামে সরকারী বাস যেখানে থামে সেখানে নামতেই এক প্রৌঢ় দীর্ঘকায় সুদর্শন বাঙালী দৌড়ে এসে ওকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, প্রথম সম্ভাষণ: "প্রণবের মুখ চেয়ে থাকবেন কী দুঃখে মশাই, আলমোরার বনেদী বাসিন্দা শ্রীল শ্রীযুক্ত সুরথ গুপ্ত থাকতে? চলুন। তবে আজ বিকেলে রওনা হ'লে চলবে না। ভাওয়ালিতে অন্ততঃ ছঘণ্টা লাগবে। কাল সকালে সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব। আজ রাতে, মানে অধীনের ওখানেই পায়ের ধুলো।"

অসিত (ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে): এ কী বলছেন? শুনেছি আপনি প্রেমলের অন্তরঙ্গ বন্ধু—

সুরথ (হেসে): ও একটা কথার কথা মশাই—সাদা বাংলায় যাকে বলে cliché, flapdoodle, figure of speech—এও বুঝলেন না? প্রেমলের বন্ধু হওয়া কি চাট্টিখানি কথা মশাই? তবে ও ভালোবাসে সবাইকেই, তাই কাউকেই তার নিজের নামে ডেকে কাবু করে না—কাছে টেনে পাশে বসিয়ে বাবু বানিয়ে দেয়। যে ভগবানের জন্যে সব ছেড়েছে তার বন্ধু হ'তে পারেন কেবল তাঁরা যাঁরা অনেক কিছুই ছেড়েছেন কিম্বা ছাড়ব ছাড়ব করছেন। সংসারের মাটি কামড়ে যারা পড়ে থাকে তারা ওর মতন ত্যাগীর হ'তে পারে বড় জোর বাহন, সেবায়েৎ, বা হুকুমবরদার—যাই বলুন। হ্যাঁ ব'লে রাখি—আমার ওখানে একটু ভজন করতে হবে কিন্তু। অনেককে শাসিয়ে রেখেছি—আসতেই হবে। সবাই নিমরাজী—এমনকি রামকৃষ্ণ মিশনের দু একজন সাধুও আসবেন।

অসিত (উৎফুল্ল): এখনকার রামকৃষ্ণ মিশনের?

সুরথ (একগাল হেসে): নয়ত কি মাভাগাস্কারের, মশাই? নিন, চলুন এবার—আপনার বিছানা বাক্স সবই উঠেছে আমার মোটরে। কেবল আপনি উঠলেই ষোলোকলা সম্পূর্ণ হয়।

অসিত (সরল হৃদ্যতায় মুগ্ধ হ'য়ে): এখন বুঝেছি—কেন প্রেমল আপনাকে তার "মস্ত আশ্রয়" উপাধি দিয়ে ভালবেসে ফেলেছে। আপনি প্রেমিক পুরুষ, 'বসুধৈব-কুটুম্বক' তো! তাই 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ'—বলে না?

সুরথ (মোটরে উঠে ব'সে জিভ কেটে): অমন কথা বলতে নেই। তার যোগ্য আমি—বলেন কি? এ যে স্রেফ ব্লাসফেমি মশাই, গ্রেয়ারিং ব্লাসফেমি! তবে ওকে আমি একটুও যে চিনতে পেরেছি এতে আমি সত্যিই খুশী। কারণ বেশি লোক চিনতে পারে নি আজও—ভাবে ও আর পাঁচটার মতন একটি 'গোলে হরিবোল' সাধু। (চেয়ে মুখকে হেসে) কিন্তু ও যে ক্ষণজন্মা মশাই! সাহেব পুরাণে বলে না—"Only a Christ can spot a Christ?" সেই নজিরে আমিও বলতে পারি—নেটিভ পুরাণে এর তর্জমা ক'রে—যে, যাদৃশ বহুজন্মাও তাদৃশ ক্ষণজন্মাকে চিনতে পেরে রাতারাতি হ'য়ে দাঁড়ালো ক্ষণজন্মা। 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি'—হা হা হা!

অসিত (হেসে): আপনি যে ক্ষণজন্মা তা কি আর বলতে হবে দাদা, মার্কিন বিদুষীর গলায় মালা দিয়ে—

সুরথ: শুধু যে বিদূষক বনেছি তাই নয়, এই বিদুষীকেই ক্ষণজন্মার তেল নুন লকড়ির ব্যবস্থা করতে বাধ্য করেছি—এই না? হাঁ দাদা, আমার বিদুষী সত্যিই আমাদের বেহিসেবি সংসার-সংকট সমানে হিসেব ক'রে চালাচ্ছেন আজ বিশ বৎসর। প্রেমল ওকে যে কী খাতির করে জানেন না। (গম্ভীর) কিন্তু আর প্রগল্‌ভতা নয়, সত্যিই প্রেমলের মতন আত্মজ্যোতি পুরুষকে চিনতে পারা যে কোনো দিশাহারার পক্ষেই একটা মস্ত সৌভাগ্য। তাই তো আপনাকেও ভাগ্যবান্‌ ব'লে সনাক্ত ক'রে এত পেয়ার করছি মশাই, যে, আপনিও ওকে চিনে নিয়েছেন এক আঁচড়ে।

অসিত: কিন্তু চিনেই যে ফ্যাসাদে পড়েছি দাদা—আপনাকে দাদা ডাকলে রাগ করবেন না তো?

সুরথ [অসিতের কাঁধে চাপড় মেরে]: রাগ? আমিও তো এইই চাই ভাই। মশাই-টশায় বলতে আমার কেমন যেন জিব উল্টে সমাধি হবার জো হয়। প্রেমলের সঙ্গে বনেও তো এই জন্যেই। ও ও আমাকে দাদা বলে, ওঁকে বৌদি। তুমিও ওঁকে বৌদি বোলো কেমন? উনি খুব খুশী হবেন।

অসিত: আপনি যখন দাদা তখন দাদার জায়া যে বৌদি হবেন এ তো দুই আর দুইয়ে চার-এর হিসেব দাদা। আর আপনি যখন ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক তখন আপনার কাছে এসে পাটীগণিতে ভুল করলে চলবে কেন?

সুরথ: বেশ বেশ ভাই—তোফা! এখন বুঝেছি কেন প্রেমল তোমাকে বরণমালা দিয়েছে।

অসিত [সাগ্রহে]: দিয়েছে, সত্যি?

সুরথ: সন্দেহের হেতু কি শুনতে পাই?

অসিত: সে দুঃখের কথা আর কী বলব দাদা? ও চায় মন্ত্রগুপ্তি, আমি চাই মন্ত্র প্রকাশ। অর্থাৎ ও চায় আমি ওর কথা কাকপক্ষীকেও না বলি। কিন্তু বলুন তো দাদা, এ কি একটা কথা হ'ল? এমন একটা সাধুর মতন সাধু—এ গিলটির রাজ্যে এমন গিনিসোনা—এর খবর পেয়েও কাউকে জানাব না? আমার অকালমৃত্যু হবে যে পেট ফুলে! আমার মনে পড়ে আরবদেশের এক কথিকা, শুনবেন?

সুরথ: শুনব না? বাঃ। বলো বলো। আমি সেই ল্যাটিন মনীষীকে সাধু সাধু ব'লে এসেছি তোমার জন্মাবারও আগে ভাই—তিনি বলেছিলেন:

Homo sum; humani nil a me alienum puto এ-ও প্রেমলের কাছে শুনে মুখস্থ ক'রে রেখেছি আওড়ে জনগণকে ভড়কে দিয়ে তাদের অধিনায়ক হ'তে। তুমি নানাভাষাবিদ লাতিন জানো নিশ্চয়ই।

অসিত: এবার আমাকে লজ্জা দিলেন দাদা, লাতিন শেখার আমার সুযোগ হয় নি। তাই বলুন ওর মানে আগে—তারপর বলব আপনাকে আরবী প্যারাবল্‌।

সুরথ: ওর মানে ভাই এই যে, আমি মানুষ বলেই অমানুষিক হ'তে নারাজ—তাই মানুষ যা কিছু করেছে ভেবেছে জিতেছে হেরেছে সব জেনে সবজান্তা হ'তে। না দাদা, অঙ্গীকারটি ঠাট্টা নয়। কারণ আমরা যতই বলি না কেন, মানুষ হ'য়ে মানুষের কীর্তিকলাপের খবর না রাখলে লোকে যে গায়ে থুথু দেবে, ডি, এল, রায়ের ভাষায় বলবে: "তুই কি একটা মানুষ? তুই তো পশুপক্ষী

মৎস্য লাটিম্ কিম্বা ফানুষ?" হা হা হা। কিন্তু এবার বলো তোমার আরবী মানুষের পেটফোলার কাহিনী। কী করেছিল সে? বেশি খেজুর খেয়েছিল বুঝি?

অসিত: না দাদা। হয়েছিল কি, প্রেমল ওর কথা একটি পত্র প্রবন্ধে লিখে কোনো পত্রিকায় ছাপানোর জন্যে বিষম ধমকে দেয় আমায়। তাই ওকে ভুড়ে শুনিয়ে দেই ব'লে পাটনায় কথিকাটি লিখেছি এক প্রগল্‌ভ ছড়ায়। শুনুন (পকেট ডায়রি বের ক'রে পড়ে)

বব্বন বলে: "চব্বন দাদা চুপি চুপি তোকে বলি—
(বড় গোপনীয় কিন্তু, কাউকে বলিস নি, সাবধান!
মন্ত্রগুপ্তি বিনা তো সিদ্ধি সে-ই জানে ভগবান):
পাছে জল যায় বেরিয়ে রে—তাই করেছিনু অঞ্জলি
বজ্রমুঠিতে—তবু কেন হায় সব জল গেল গলি'—
কোন ফাঁক দিয়ে পালালো বন্দী, কি ফন্দীতে কে জানে?
ধাঁধা লাগে দাদা ভাবতেও! তুই জানিস কি এর মানে?
তোরও ধাঁধা লাগে? নিরুপায়! শুধু জপিস রে মনে
মনে:
এ-কথাটি অতি গোপন, রাখব চেপে আমি প্রাণপণে।"
চব্বন ভায়া পড়ল ফাঁপরে! কেন যে সে দিল কথা!
কিন্তু দিয়েছে কথা সে যখন—সাজে কি খেলাপ করা?
মরদকি বাত যে হা'তীর দাঁত! মনে মনে সর্বদা
জপ করে: 'না না, এ গোপন কথা কাউকে বলব না।'"

"কী হে চব্বন? কী জপ করছ দিনরাত উন্মনা?"
"না না, বব্বন—ঐ দেখ"—ছুটে পালায় চমকে ত্বরা।
কাছে এসে তার স্বজন বন্ধু—শুধায় তাকে, সে রেগে
ক্ষেপে ছুটে হয় উধাও—দন্তে ঠোঁট চেপে বায়ুবেগে।
ফকির হাকিম ওঝা দলে দলে এসে হার মানে সবে।
একদা নিশীথে চব্বন ছুটে গিয়ে সাহারার মাঝে
মস্ত গর্ত খুঁড়ে নেমে হেঁটমুণ্ডে হাঁকল তবে:
"হে মিতা পাতাল! শোনো—যে কথাটা বলি নি
কাউকে ভবে:
বব্বন ভাই দিলো যে দিব্যি, তাই তো বলতে বাজে:
মুঠো থেকে তার কোন্ ফাঁকে জল পালালো—সে জানে
না যে!

সুরথ (হো হো ক'রে হেসে): প্রেমলকে খুব এক হাত নিয়েছ ভাই! তাকে শোনাবে তো?

অসিত (দোমনা): শোনাব? যদি সে কিছু মনে করে?

সুরথ: ক্ষেপেছ? তাকে নিয়ে হাসলে সে-ই করে সবচে তেজী অট্টহাস্য—he will outlaugh us all, I tell you: বিশ্বাস না হয় তোমার বৌ'দিকে জিজ্ঞাসা কোরো। (মোটর গেটে ঢুকতেই) এই যে সামনেই পতিপরায়ণা সতী সারথির পথ চেয়ে—যেহেতু এখানে পতি—সারথি, এও বুঝলে না?—হা হা হা।

দুই

অসিত স্নান সেরে ধ্যানে ব'সে হাজার চেষ্টা ক'রেও মন বসাতে পারল না কৃষ্ণ মূর্তিতে। কেবলই মনে হয় সুরথদার কথা। তার বিচিত্র জীবনে রকমারি চরিত্র দেখেছে সে, কিন্তু সুরথদা যেন একমেবাদ্বিতীয়ম্। ছড়া কাটা চলে: "যেমন পটু হাসতে তেমনি ভালোবাসতে!" এক মুহূর্তে পরকে আপন ক'রে নেন কেমন ক'রে—শুধু নিজেকে পরিবেষণ ক'রে নয়, ঐ সঙ্গে বিদেশিনী "বৌদি"-কেও হাতছানি দিয়ে অপরিচিতকে "ভাই" ব'লে ডাকার দীক্ষা দিতে। অসিত সুরথদার আতিথেয়তার নামডাক শুনেছিল অনেকদিন থেকেই, কিন্তু এমন রসাল আতিথেয়-তার পাঠ পেলেন তিনি কোন্ সদ্‌গুরুর কাছ থেকে! অপিচ ফ্লোরা বৌদিও কী চমৎকার গৃহিণী। যেমন বিদুষী, তেম্নি সরলা! তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা New Light সে আগেই পড়েছিল। তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধও ভালো লেগেছিল। কিন্তু এমন বিদুষী যে স্নেহময়ীও হ'তে পারেন—তা আবার এক বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এমার্সনের পৌত্রী হ'য়ে—এ কি ভাবা যায় সত্যি? ললিতা ও প্রেমলের কাছে শুনেছিল "সুরথদা আনন্দময় পুরুষ।" কিন্তু কখনো মনে হয় নি—তাঁর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে যাবে। তবে এও হয়েছে প্রেমলের ঘটকালিতেই তো। "সে-ই হ'ল catalytic agent"—বলেছি'লন সুরথদা হেসে। অর্থাৎ যে শুধু উপস্থিতির যাদুতে অঘটন ঘটায় এর সঙ্গে ওকে মিলনের সূত্রে বেঁধে। প্রেমল বলেছিল—কত রকম লোকই যে তাঁদের কাছে আসে ও এসেই প'ড়ে যায় তাঁদের প্রীতির জালে—আর বেরুতে পারে না।

"আমি যে আমি অসিত—স্বভাব বৈরাগী—" বলেছিল সে—"সেই আমাকেও কিনা আটকে রেখে দেন তাঁদের স্নেহনিলয়ে পাঁচ সাত দশ দিন ধ'রে! আলমোরায় আমাদের বিজন আশ্রম থেকে যখনই বেরোই—সুরথদার আনন্দ নিলয় হয় আমাদের half-way house—সংসার ও অরণ্যের মধ্যে। আর তার কারণ কী জানো? উনি বাইরে বৈজ্ঞানিক হ'লেও অন্তরে সত্যি ভক্ত পূজারী। ওঁর ঠাকুরঘরে পরমহংসদেব, স্বামীজি, রাজা মহারাজ, গিরিশ ঘোষ আরও কত সাধু সন্ত পরম ভাগবতের ছবি! রামকৃষ্ণ মিশনেরও উনি মহাভক্ত—তারাও ওঁকে আপনার লোক মনে করে। ওঁকে 'অজাতশত্রু' নাম দিয়েছি আমি। সত্যি, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এমন সহজ বিশ্বাসী খাঁটি ভক্ত বোধ হয় আর দুটি নেই।..."

একথার প্রমাণ মিলল একেবারে হাতে হাতে—কয়েক ঘণ্টা বাদে বৈকালিক চা-পর্বের পরেই। কত জাতের লোক যে এল ওর ভজন শুনতে! রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুও দুজন। তা ছাড়া আলমোরার অধিবাসী আমেরিকান্, বাঙালী, জর্মন, কাশ্মীরী এমন কি একজন তিব্বতীও ছিলেন। "না লামা-টামা নন" বলেছিলেন সুরথদা হেসে অসিতের কাছে তাঁকে পেশ ক'রে। "জানো, বিদেশে আমি যেখানেই যেতাম সবাই ভাবত বেদবেদান্ত আমার নখদর্পণে—নাক টিপে কুম্ভক ক'রে নিশ্চয়ই আমি রামঠাকুরের মতন নিশুত রাতে চোরা গোপ্তা মশারির মধ্যে শূন্যে উঠে সমাধিতে বুঁদ হ'য়ে থাকি—হা হা হা! কিন্তু ওদের একথা বোঝাতে গিয়ে একেবারে চোখের জলে নাকের জলে—যে ভারতীয় মাত্রেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী বা মধুসূদন সরস্বতী নয়। যেমন তিব্বতী মাত্রই রিমপোশে বা মিলারেপা নয়। হা হা হা!"

'হয়েছে, এবার ওঁকে গাইতে দাও" টুকলেন বৌদি।

স্বামী প্রবীরানন্দ: হ্যাঁ হ্যাঁ অসিতবাবু! এবার সুরু করুন। বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু কখন যে ফের নামবে বলা যায় না তো—ভাদ্রের আকাশ তার উপর পাহাড়ে মেঘ, জানেনই তো—

সুরথদা: মা ভৈঃ, স্বামীজি! আপনাকে হেঁটে ঘরে ফিরতে হবে না, বিজ্ঞানীর রথ জ্ঞানীর পায়ের ধুলো পেয়ে ধন্য হবে।

তিব্বতী: এক গানা সুনাইয়ে—সংস্কৃত গানা জী!

অসিত (সুরথকে): সংস্কৃত? এখানে কজন বুঝবেন?

সুরথদা: এক কাজ করো—নামকীর্তন ধরো—দেবভাষাও হবে—সর্ববোধ্যও হবে। (তিব্বতীকে) উনি একটি ঠাকুরের নাম শোনাবেন। গাও ভাই গাও।

অসিত (খুশী): বাঁচালেন সুরথদা! (ব'লেই ধ'রে দেয়)

হরি গাও...হরি গাও।
জয় রাম সিয়াপতি রাম সিয়াপতি ধ্যাও!
জো রাম নাম সব সংকট কাটে,
সখি, রাম রো ক্যোঁ বিসরাও?
জয় দশরথনন্দন দুখভঞ্জন রঘুরাঈ!
জয় সীতাবল্লভ ভবভয়হারণ রাম সদা সুখদায়ী;
জয় রাম সিয়াপতি রাম সিয়াপতি রাম সিয়াপতি ধ্যাও!
জয় রাম রাম সিরি রাম রাম নিত গাও!
হরি গাও...হরি গাও।
হরি নাম মধুর হরিনাম মধুর হরি ধ্যাও॥

জয় মাধব মুকুন্দ মোহন মুরলীধারী!
জয় গিরি গোবর্ধন গোকুলচারী রাধানাথ মুরারি!
জয় রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ গাও!
জয় রাধে রাধে রাধে রাধে রাধে শ্যাম ধিয়াও।
হরি গাও...হরি গাও!
হরি নাম মধুর হরিনাম মধুর হরি ধ্যাও!

জয় মহাদেব শিব শম্ভু ত্রিশূলধারী!
জয় উমামনোহর জয় যোগেশ্বর গঙ্গাধর ত্রিপুরারি!
জয় হর হর হর হর জয় শিব শঙ্কর জয় জগদীশ্বর ধ্যাও!
জয় হর হর ভোলা হর হর ভোলা হর হর ভোলা গাও?
হরি গাও...হরি গাও...
হরি নাম মধুর হরি নাম মধুর হরি ধ্যাও!

জয় জয় দুখহারিণি দুর্গা গৌরী মৈয়া?
জয় জয় ভবতারিণি কালী মাতা জয় জয় গঙ্গা দৈয়া?

জয় সদ্‌গুরু গোবিন্দ এক সখী রী, জয় গুরু জয়
গুরু গাও ?
সখি সদ্‌গুরু বিন গতি নহী জগতমে, সদ্‌গুরু
নাম ধিয়াও ?
হরি গাও...হরি গাও।
হরি নাম মধুর হরিনাম মধুর হরি ধ্যাও!

গানের শেষে অসিতের চোখের সামনে কেবলই ভেসে উঠছিল মা-র ভাবোজ্জ্বল মুখ, ললিতার জলভরা চোখ আর প্রেমলের ঋজু দেহ ও স্থিরদৃষ্টি—যেন সে কী দেখছে। কতবার ও জিজ্ঞাসা করেছে···প্রেমল কিছু দেখেছে কি না, কিন্তু সে মৃদু হেসে পাশ কাটিয়ে গেছে।···

গানের শেষে সবাই একে একে বিদায় নেওয়ার পরে সুরথদা ওকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঠাকুরঘরে—যার কথা প্রেমল বলেছিল।

সুরথদা ব'লে চললেন সোচ্ছ্বাসে: "আহা, কী নামগানই গাইল ভাই। প্রেমল ও ললিতা দুজনেই আমাকে বলেছিল তোমার নাম গানের কথা। আর সেই সঙ্গে" (চোখ মিট মিট ক'রে) "ও একটা কথা বলেছিল—কিন্তু কাউকে বলতে পই পই ক'রে মানা ক'রে—"

অসিত (বাধা দিয়ে): জানি দাদা, কিন্তু আপনি কি এবিষয়ে খানিকটা আমরাই সমানধর্মী নন ? অর্থাৎ মানা যারা মানে তাদের জাতই আলাদা নয় কি ?

সুরথ (এক গাল হেসে): যা বলেছ ভাই। তবে he has a case, you must admit! ওকে কী যে বিরক্ত করে ওর গুরুভাইরাই নয়—ওর নানা ভক্ত—fan-এর দল—(ফের হেসে) তবে ও যতই চেষ্টা করুক না কেন ভাই, আলো দেখলে পতঙ্গের দল ছুটে আসবেই তো। তাই তো ও চায় সে-আলোকে একটু আড়ালে অবডালে রাখতে এই আর কি।

অসিত: কিন্তু দাদা, পতঙ্গ—মানে the moths, too, have a case: দিনের পর দিন তারা অন্ধকারেই ঘুরে মরেছে। কে বুঝতে পারে আলোর ডাকে আগুনের চিতায় পুড়ে মুক্তিই তাদের ভবিতব্য নয় ? দাদা, যুগে যুগে সাধু মহাত্মা দের সবাইকেই অজ্ঞান অবোধ অশান্তদের জ্বালায় "পালাই পালাই" ডাক ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু পালিয়ে যাবার পরে তাঁরা কি ফের ফিরে আসেন তাদেরই কাছে ? চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বলেছিলেন: "সংসারী জীবের কোনো গতি নাই।" কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ সময় কেটে ছিল এই পাপী তাপী সংসারীদের নিয়েই নয় কি ? অতদূরে যাবারই বা দরকার কি, আপনি তো শুনি রাজা মহারাজের মানসপুত্র। তিনি অতবড় বৈরাগী হ'য়েও কতদিন গৃহী শিষ্যদেরই বল ভরসা দিতেন না কি তাঁর কথায়, লেখায়, ভাষণে, আশীর্বাদে ?

সুরথ: তোমার এ কথা কাটাবে কে ভাই ? তবে কি জানো ? পতঙ্গরা যখন বড় বেশি ভন ভন করে—না; তারপর কুটুস্ কাটুস্ করে কামড়াতেও ছাড়ে না—যার ফলে জ্বলে খুবই—তখন মহাত্মাদেরও কান্নাকাটি ক'রে বলতে হয়: "মায়াময়মিদম্ অখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা"—কাজ নেই এত ঝঞ্ঝাটে—বনে জঙ্গলে চম্পট দিয়ে মায়া ছেড়ে মায়েশের মধ্যে ডুব দেওয়াই পন্থা। বুদ্ধ যে বুদ্ধ--তিনি করুণার প্রতিমূর্তি হ'য়েও দুশ্চর তপস্যা ক'রে অন্তিমে "তনহা" তৃষ্ণা কে জয় করার ব্যবস্থা দেন নি কি—বলেন নি কি—জন্ম মানেই দুঃখ, কাজেই দুঃখনিবৃত্তির একটি মাত্র উপায় আছে দুর্দান্ত ঘুরন্ত জন্মচক্রকে থেকে targent এর মতন ছিটকে বেরিয়ে পড়া—যদিও বেরিয়ে যে পড়ব কোথায়—তার কোনো হদিশই দেন নি তিনি। কিন্তু যেতে দাও ভাই এসব বৈরিগিদের কথা। ঠাকুরের জয় হোক, তোমাকে আমাকে অন্ততঃ তিনি বৈরিগির রক্তমাংস দিয়ে গড়েন নি।

অসিত: কিন্তু প্রেমলের মতন প্রেমিক পুরুষকে ?

সুরথ: আমার কি মনে হয় জানো দাদা ? ও য়ুরোপের সভ্যতার নানা হীনতা ও নিষ্ঠুরতায় বড় ঘা খেয়েছে। আমার আরো কয়েকটি ইংরেজ জর্মন ও ফরাসী বন্ধু আছে তাদেরও প্রায় এই একই অবস্থা। অবশ্য তাদের মধ্যে কেউই ওর মতন মস্ত আধার নয়। কিন্তু তাদের সবাই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে ওদেশের বস্তুতান্ত্রিকতার শূন্যতায় ও বুদ্ধিবাদের বিড়ম্বনায় কিন্তু এর নাম reaction—মানে ধাক্কা খেয়ে মুখ ঘোরানো। আসলে তুমি ঠিকই ধরেছ ও প্রেমিক পুরুষই বটে—প্রেমল নাম ওর সার্থক। তাই—দেখো তুমি মিলিয়ে নিও পরে—ও ক্রমশঃ যত পাকবে

ততই নরম হ'য়ে ঝুঁকবে না'র দিক থেকে ফিরে হাঁ-র দিকে—যাকে দার্শনিক শ্বাইৎজার (Schweitzer) বলেন ওয়র্লড-অ্যাফার্মেশন। এ কথা আমার আরো মনে হয় পরমহংসদেবের উত্তরজীবনের পরিণতি দেখে। প্রথম দিকে কি তিনি সবছেড়ে বৈরাগ্যের দিকেই ঝোঁকেন নি? কিন্তু পরে কী হ'ল বলো তো? মা কালীর আদেশ পাবার পরে কি আমাদের মত 'অখাদ্য'-দের সঙ্গেই দহরম-মহরম ক'রে কাটান নি? আর কী দারুণ অখাদ্য ভাবো তো—যার জন্যে তাঁকে মা'র কাছে কেঁদেকেটে নালিশ করতে হয়েছিল: "মা, এ কাদের পাঠাস আমার কাছে? এক সের দুধে চার সের জল—কত জ্বাল দেব মা—শুধু উনুনের ধোঁয়ায় চোখ গেল—এ আমি পারব নি।" পড়েছ তো কথামৃতে—বলতেন তিনি ঘড়িঘড়ি: "আমি নিত্যে পৌঁছে লীলায় ফিরে আসি?"

অসিত [খুশী]: আপনার কথায় বড় ভরসা পেলাম দাদা। এ যুগের ঋষি শ্রীঅরবিন্দও তাঁর সাবিত্রীতে ঠিক এই কথাই বলেছেন—নির্জনবাসের পরে:

Earth is the chosen place of the mightiest souls
Earth is the heroic spirits' battlefield.†

সুরথ (উদ্দেশে নমস্কার ক'রে): তাঁর লেখা যতটুকু পড়েছি তাতেই মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে মনে মনে প্রণাম করেছি ভাই। তাঁর সাবিত্রীতে আমিও একটি শ্লোক পড়েছিলাম—যখনই আমার মন খারাপ হয় শ্লোকটি আওড়াই:

God must be born on earth and be as man,
That man, being human, may grow even as God.*

মহাজন মহানুভব মহাত্মা মহর্ষি—এঁদের কাছে তো এই বাণীই চাইব—পাপী-তাপীদের জন্যে। তাঁরা ভগবানকে চাইবেন কি শুধু নিজে সমাধিতে বুঁদ হ'য়ে বসে থাকতে? কখনই না। দেখ না শ্রীচৈতন্যদেবকে—সর্বদা থাকতেন দীন হীনের সঙ্গেই নয় কি? স্বামীজি নিজে? দরিদ্রের জন্যেই তাঁর প্রাণ কাঁদত না কি অষ্টপ্রহর। বলতেন না কি উঠতে বসতে: "কী হবে মুক্তি-ফুক্তি নিয়ে! চুলোতে যাক মোক্ষ কৈবল্য!

বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

অসিত: একথা খুবই ঠিক। কিন্তু সেইজন্যেই তো সাধুসন্তদের মধ্যেও বেশি আচারিপনা দেখলে আমার মন খারাপ হয়।

সুরথ: আমি বুঝেছি তুমি কী বলতে চাইছ ভাই। কিন্তু মানুষের মধ্যে যাঁরা সত্যি বড়, সাধু এ-আচারিপনা তাঁরা কাটিয়ে ওঠেনই ওঠেন—কারণ যেটা আমরাও দেখতে পাচ্ছি চর্মচক্ষে তাঁরা দিব্যচক্ষেও দেখতে পান না এ কি কখনো হ'তে পারে? তবে কি জানো ভাই; আমার মনে হয় আচারিপনার মধ্যে কিছু কিঞ্চিৎ গতানুগতিকতার আমেজ থাকলেও একটা বড় দিকও আছে—যেমন ধরো, প্রেমলের মুখেই শুনেছি যে, আচারবিচার মেনে চললে—বিশেষ করে গুরুর কথায়—আমাদের মনকে বাগ মানানো একটু সহজ হয়ে আসে—যার ফলে স্বেচ্ছাবিহারকে ছাড়তে আর তত বাজে না। উঠতে বসতে সাধনায় আত্মাভিমানকে জয় করার কথা বলি। কিন্তু বললেই তো সে পোষ মানে না। আচার মেনে চলতে তাকে বলা যায়—চোপরাও! যা ইচ্ছে তা চাইতে পারবি নি, এখন থেকে তোকে গুরুর কথা মেনে চলতেই হবে। এক কথায়, সে-যমের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা হ'ল আচার মেনে চলা।

অসিত: কিন্তু দাদা, এর ফল কী হয় দেখতে পাই না কি প্রায়ই? যাঁরা আচার মেনে চলেন তাঁরা কি সত্যিই রাতারাতি মহানুভব হ'য়ে ওঠেন? বরং অনেক সময়ে খুঁৎখুতে শুচিবেয়ে হ'য়ে আরো ছোট হ'য়েই যান না কি?

সুরথ: কি জানো ভাই, এসব যুক্তি হ'ল শাঁকের করাত—দুদিকেই কাটে। কারণ একদিকে যেমন আচার মানতে মানতে মানুষ অনহিষ্ণু শুচিবেয়ে হ'য়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি দেখবে—সব আচারবিচারকে নস্যাৎ

---

† মহান্ আধার যাঁরা পৃথিবীতে করেন বরণ,
মহাবীর যাঁরা—রণাঙ্গন তাঁহাদের বসুন্ধরা।

* শিবেরে জন্মিতে হবে এ-ধরার জীবরূপে—যাঁর ঐশ্বরিক আকর্ষণে লভিবে সালোক্য জীব তাঁর।

ক'রে দিয়ে মানুষ শেষে হ'য়ে ওঠে নিছিলিষ্ট, কালাপাহাড়। তাছাড়া রুখে উঠে ক্রমাগত নিজের মতিগতিকেই গুরুবরণ করার ফলে অনেক সময়েই কি অনাচারীরা মনে ক'রে বসেন না যে, দুরাচার হওয়াটাই হ'ল বাহাদুরি—স্বাধীনচিন্তা। আমি আথাল পাথাল ভেবে কূলকিনারা না পেয়ে শেষটা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ভাই যে, সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্—কোনো কিছুরই বেশি বাড়াবাড়ি ভালো না—যাকে বুদ্ধদেব বলতেন : the golden middle path—সাবাস্! আরো একটা কথা : যাঁরা সত্যিই মহাজন তাঁরা সাধনার একটা স্টেজে আচারী হ'লেও দেখবে—যতই ওঠেন ততই মুক্তি পান আচারিপনার কবল থেকে। ঐ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনই দেখ না কেন! প্রথমদিকে কী আচারীই ছিলেন তিনি! বলতেন কেঁদে : "মা! শেষে কিনা কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি!" কিন্তু পরে কী হ'ল ?—সকলের ওখানেই তো খেতেন। আমার সত্যি মনে হয় কী জানো ভাই ? মনে হয়—তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশ একটু সমঝে দেখতে চাইলে শুধু আচারিপনাই নয়, এ-দিন দুর্নীতি'র অনেক দুরাচারিপনার গাঢ় সমস্যাও ফর্সা হ'য়ে যায়। তাই তো আমার মনপ্রাণ যৌবনেই সাধু-সন্তদের পায়ে বিকিয়ে দিয়েছি ভাই! আমি যে দেখতে পেয়েছি—সাধুসন্তরাই হ'লেন salt of the earth! শিখদের এক গুরুবাণীতে আছে : "সন্ত জো না হোতে জগমে তো জল জাতে সংসার"—অর্থাৎ সাধুসন্তরা এ-জগতে জন্মান ব'লেই আজো জগৎ আছে নৈলে কবে জ্ব'লে পুড়ে ছাই হয়ে যেত—যেমন আজ ফের যেতে বসেছে সাধুকে ছেড়ে আমরা পলিটিশিয়ানকে গুরুবরণ করেছি ব'লে। ডিক্টেটর, প্রেসিডেন্ট, পলিটিশান—গুরু দিশারি! হা অদৃষ্ট! দেখছ না তাঁরা কী উঠে পড়ে লেগেছেন আটম বোমার পাহাড় তুলতে—এর ফল কি ছাই ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে দাদা ?

অসিত (হেসে) : কিন্তু আপনি বৈজ্ঞানিক হ'য়েও সাধুসন্তদের পায়ে মন প্রাণ বিলিয়ে দিলেন কেমন ক'রে ?

সুরথ : বাঃ! বৈজ্ঞানিক ব'লে সাধুসন্তকে দণ্ডবৎ পটিয়ে খ্রীষ্টান করলেন তো পাদ্রিপুঙ্গবেরা। ভাবলেন, কী সেবাই না করলেন খ্রীষ্টদেবের। ওমা, একদিন তাদের ডেরায় গিয়ে দেখেন কি—সাঁওতাল খ্রীষ্টানরা মহা ধুমধাম ক'রে মা কালীর মূর্তির পায়ে ফুল দিচ্ছে। তাদের হুকার দিয়ে ধমকাতে তারা জবাব দিল হু-হুকারে : "সায়েব, বলিস কী তুই ? খ্রীষ্টান হয়েছি ব'লে কি ধর্ম ছাড়ব ?" হা হা হা। (গম্ভীর হ'য়ে) কিন্তু এ সত্যি হাসির কথা নয় ভাই। তাই বলি—বিজ্ঞানের চর্চা করলে সাধুসন্তের মহিমায় বিশ্বাস উবে যাবে কী দুঃখে ?

অসিত : কারণ এ হ'ল অন্ধ বিশ্বাস—বলেন নাকি বুদ্ধিবাদীরা উঠতে বসতে ?

সুরথ : শোনো ভাই, আমি প্রেমলের কাছে একটি ভারি চমৎকার কথা শিখেছি : faith আর belief এর তফাৎ। সে বলে—বিশ্বাস আমাদের মনকে শক্তি জোগায় যার ভিৎ-এ আমরা খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারি—অর্থাৎ কি না, সে আমাদের জোর দেয় লড়তে। আর befief—ধারণা—নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, তাকে খাড়া ক'রে রাখতে হয় আমাদের মনের রোখ বা প্রাণের ঝোঁক দিয়ে। এক একটা কথা এমনি মন্ত্রবাণীর সুরেই বেজে ওঠে যেন : "My faith supports me, whereas my beliefs have to be supported by me." কেমন aphorism, বলো তো ? "সাবাস্" বলতে ইচ্ছে হয় না ?

অসিত (সায় দিয়ে) : একশোবার। এ-aphorism-টি ও আমাকে কাশীতে বলেছিল একদিন। আমার এত ভালো লেগেছিল যে, আমি আমার ডায়রিতে টুকে নিয়েছিলাম।

সুরথ : খুব ভালো করেছিলে। ওর অনেক কথা আমিও আমার পকেটবুকে টুকে নিয়েছি ওকে না জানিয়ে। আর তাই তো আমি বেশি ভাবি না ওর আচারিপনার জন্যে। মহাভারতে বলেছে : "সর্বং বলবতাং পথ্যম্"—বলিষ্ঠ মহাপুরুষ সব রকম পথ্য থেকেই বল পেতে পারেন। আমি তাই বলি—ও করে করুক না দুদিন এই ছোঁওয়া-ছুঁয়ি নিয়ে ছেলেখেলা।" মনে আছে কি তোমার পরমহংসদেব গিরিশ ঘোষ মদ খায় শুনে কী

আমিও তাঁর দোয়ার দিই এই ব'লে: "প্রেমল আচার বিচার নিয়ে যদি একটু বাড়াবাড়িও করে করুক না—ক'দিন করবে? ভালোবাসতে যে শিখেছে তার আর ভয় কী? Everything can be grist to love's mill—আর কারণ কী বলব?—কারণ প্রেম তো শুধু রক্ষাকবচই নয় ভাই—সে যে আকাশগঙ্গার ঢল, এ-ধুলোবালির জীবনে যখন নাবে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—শাস্ত্র শাস্ত্রী মন্ত্র তন্ত্র আচার বিচার—সব।

অসিত: আপনি এমন চমৎকার কথা বলতে শিখলেন কোত্থেকে দাদা?

সুরথ: ঐ একই আকাশগঙ্গার জলতরং থেকে ভাই—যার একটি নাম—কৃপা। তবে আমি এ কৃপার বর পেয়েছি ঠিক প্রেম থেকে নয়। পেয়েছি—সাধুসন্তদের অন্তরঙ্গ ছোঁয়াচ থেকে: শ্রীমা সারদামণি, রাজা মহারাজ, গিরিশবাবু—এঁদের আশীর্বাদই আলো ধরেছে আমার তীর্থপথে। তার পরে এল প্রেমল।

অসিত (খুশি হ'য়ে): ওর একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন ও বৃন্দাবনে বলেছিল: বুদ্ধি সব জেনেও কিছুই জানে না, কারণ ভগবৎকৃপাকে জানার মতন ক'রে না জানতে পারলে এ-জীবনযাত্রা হ'য়ে দাঁড়ায় একটা দৃষ্টিহীন শক্তির খামখেয়ালী বুদ্বুদবাজি: an arbitrary bubble-play of purblind energy." ও এক একটা কথা বলে সত্যি ভোলা যায় না দাদা—Jewelled sayings, যাকে বলে!

সুরথ (হাত বাড়িয়ে): হাত মেলাও দাদা—একেবারে bull's eye! হয়েছে কি জানো! ও সব কিছুতেই তলিয়ে দেখে ওর আশ্চর্য মনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে—যাকে বেদে বলেছে—"আবৃত্তচক্ষু"। নৈলে কি ওর মুখে এরকম অবিস্মরণীয় কথার খই ফুটতে পারত? কৃপার কথা বলছিলাম না? একদিন ও কৃপার কী ডেফিনিশন দিল শুনবে? বলল এমনিই ধাঁ ক'রে: "এজগতে কেউ ভগবানের অগ্নিযজ্ঞে আত্মাহুতি দিলে তার ফলে যে-বিস্ফোরণ হয় তারই নাম কৃপা: "In this world whenever anybody immolates his self in the Fire of the Divine, there is an explosion which is Grace. ওকে খ্যাপাতে চেয়ে আমি টুকলাম: "কিন্তু নিজের প্রিয়তম আমি-টিকে আহুতি দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা ভাই।

ও পিট পিট জবাব দিল: "কিন্তু করুণাই কি চাট্টিখানি কথা সুরথদা যে, আয় চাঁদ আয় ব'লে ডাকতে না ডাকতে হাতে চাঁদ আসবে।" এর উত্তরে আমি ওকে জেরা করা সুরু করলাম, বললাম: "তার মানে তুমি বলছ বুদ্ধের সুরে সুর মিলিয়েও যে শুধু তপস্যাই মুক্তিদাতা—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—এই তো? কিন্তু বৈষ্ণবেরা ঠিক একথা বলেন না।"

ও বলল: "সুরথদা, এমন একটি বৈষ্ণবও কি চাক্ষুষ করেছ যে সবছাড়ার তপস্যা না ক'রেও কৃপা পেয়েছে? ভাই, উপনিষদে কি অকারণ বলেছে যে, এ-পথ সবচেয়ে কঠিন দুরত্যয়—যেন ক্ষুরের উপরে চলতে হয়—rope-dancer এর মতন?"

আমি বললাম: "কিন্তু ঠাকুর তো বলতেন আত্মসমর্পণ হ'লে কৃপা মিলবেই মিলবে?"

ও বলল: "তাতে কি ব্যাপারটা একটুও সহজ হ'য়ে এল না কি? আত্মসমর্পণ মানে কি দুটো ফুল ঠাকুরের নামে ছুঁড়ে দিয়ে বলা: ত্বদীয়োহং—আমি তোমার, আর অমনি ঠাকুর পিঠ পিঠ বলতেন একগাল হেসে মায়েব স্বং···তুমিও আমার। আর যাই করো না কেন, করুণাকে মাড়োয়ারিদের সস্তা নামজপের মতন ছেলেখেলা দাঁড় কোরো না। আমি করুণা পেয়েছি সুরথদা, তাই বলতে পারবে না আমি শোনা কথা বা পুঁথির বুলি আওড়াচ্ছি। কিন্তু পেয়েছি ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন বলেই যে, প্রতিপদে স্বেচ্ছাবিহার ছেড়ে সাধনাকে গুরুমুখী করলে তবেই করুণাকে মিলতে পারে, নৈলে নয়। সব অভিমান, আত্মার কামনাবাসনা কাড়াকাড়ি, প্রিয়পরিজন, আসক্তি, মমতা, প্রত্যাশা সব জলাঞ্জলি না দিলে কি কৃপা আসেন? বড় জোর উঁকি দিয়ে "টু" ব'লেই ফের গাঢাকা দেন। আর তখন কী হয় বলো তো? ভাগবতে নারদের কাহিনী স্মরণ করো: নারায়ণের কৃপা ওঁর হৃদয়ে এসে কিছুক্ষণ থেকেই অদৃশ্য। নারদের মন তেমনি ব্যাকুল হ'য়ে উঠল—ব্যাকুল যেমন হয় স্তনন্ধয় শিশু তাকে মায় বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে। আর তার জন্যেই তো দরকার। যখন কৃপা তার দাম দিয়ে ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে

দেয় তখন কেবল গুরুই আশ্বাস দিতে পারেন যে হারানিধি ফিরে পাবেই পাবে—তবে আপ্রাণ সাধনা করলে তবেই, নৈলে নয়। সে শূন্য মুহূর্তে এ সাধনায় শক্তি দিতেও আর কে আছে গুরু ছাড়া? আত্মসমর্পণ বলছ, কিন্তু কার কাছে? ভগবান যার কাছে কথার কথা—একটা গুজব মাত্র সে কেমন ক'রে তাঁকে বলবে তবৈবাহম্? তাই এলেন গুরু তাঁর প্রতিনিধি—double হয়ে। বললেন যে গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্ট—তাঁর প্রসন্ন হওয়া মানেই ইষ্টের প্রসন্ন হওয়া। গুরু কৃষ্ণ যে অভিন্ন এ তো আর মুখের কথা নয় দাদা—এই-ই হ'ল সত্যাস্ত সত্যম্। তাই গুরু যদি বাঘের মুখেও পাঠান যেতে হবে নির্ভয়ে। কারণ জেনো—তিনি বাঘের মুখে পাঠাবেন কেবল তখনই যখন বাঘের মুখ থেকে তুমি হাসতে হাসতে ফিরে আসতে পারবে।

অসিত: কিন্তু সুরথদা, একথায় সে মানুষ বল পাবে কী ক'রে যার গুরু করণই হয় নি?

সুরথ: কেন? সাধুরা আছেন কী ঘাস কাটতে? না ভাই, আমারও এ কথার কথা নয়। প্রেমল যেমন পেয়েছে গুরুর কৃপা এ শর্মা তেমনি পেয়ে ব'সে আছে সাধুদের কৃপা। ওর মতন পাইনি অবশ্য। জালায় যতটা ধরে ঘটিতে ততটা ধরবে কেমন ক'রে বলো? কিন্তু তবু ঘটি টইটুম্বুর হ'লেই তো ঘটির তৃষ্ণা মিটল, কেল্লা ফতে! ঠাকুর বলতেন না কি—শুঁড়িখানায় ক'হাজার বোতল মদ আছে সে খবরে আমার কাজ কি? আমি এক বোতলেই মাতাল হই—তার বেশি হাতিয়ে নিয়ে করব কী? আমাকে যে মাতাল করেছেন সাধুরা তাঁদের কৃপার মোমরসে দাদা—আর একবার তো নয় যে নাস্তিকদের কথা মেনে নেব—মনের ভুল ব'লে? আরে! সাক্ষাৎ পেয়েছি, দেখেছি, চেখেছি, তবু কান দেব ঐ দেউলে কানা কালাদের কথায়! কতবার অবসাদে মনঃকষ্টে চোখের আলো কালো হ'য়ে গেছে—তারপরেই রাখাল মহারাজের তামাক সাজতেই বা গিরিশবাবুর পা টিপতে না টিপতে ও মা, কী ফুরতি! প্রত্যক্ষ ভাই প্রত্যক্ষ—একেবারে জলজ্যান্ত চোখে দেখা যাকে বলে। কী? হাসছ! বৈজ্ঞানিকের মুখে কৃপার কীর্তন শুনে? (চুপি চুপি) হয়েছে কি জানো? ঠাকুরের লীলা বিচিত্র তো! তাই আমাকে দিয়ে তিনি এক নয়া খেল খেললেন—"দেখ রে বেটারা! ভূতের মুখে রামনাম—বৈজ্ঞানিকের মুখে সাধুসন্তের কৃপার জয়গান!" কিন্তু দাদা, এই কৃপা পাওয়ার ফল হ'ল সঙিন! বুকে জেগে উঠল প্রার্থনা—আপনা আপনি। তারপর ঘটল এক অঘটন। (হেসে) অঘটন ব'লে অঘটন দাদা? ধ্যানে বসতেই—পা ছুঁয়ে বলছি ভাই, কে যেন প্রার্থনা করিয়ে নিল, বলিয়ে নিল যা বলবার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি দুদিন আগে।

অসিত: কী বললে বলুন না।

সুরথ: তুমি যে মুখ হলসা—

অসিত। তবু বলুন। যে কৃপা পেয়েছে তার কি কৃপাল না হ'লে চলে?

সুরথ: হা হা হা। কী কথাই বলছ ভাই: তোমারও দেখছি খাসা কথার বাঁধুনি আছে। নৈলে কি প্রেমল-হেন-প্রেমল—তোমাকে hate করতে চেয়েও না পেরে হার মানে? তাই ব'লেই কেলি দুর্গা ব'লে যা থাকে কুল কপালে। কী প্রার্থনা সে করিয়ে নিলো জানো? "দেখ ঠাকুর, তুমি অন্তর্যামী, জানোই তো আমি কী বস্তু। আর তুমিই বলেছ গীতায় যে যার যেমন স্বভাব সে তেমনি ছন্দ বলবেই বলবে। কাজেই আমি—হাজার কামনা বাসনার হাতের পুতুল—তোমার কাছে চাইবই তো এ ও তা সাত সতেরো। তাই শেষ কথা তোমাকে ব'লে রাখছি—once and for all ঠাকুর!—যে, আমি যা যা চাইব সবই যেন দিয়ে বোসো না। তুমি জানো—কী কী আমার পক্ষে ভালো। আমি যদি জানতাম তবে তো জ্ঞানীই হ'তাম। কিন্তু আমি হাপোষা, অসহায় বৈজ্ঞানিক, ঠাকুর! জ্ঞানের কী জানি বলো! তাই আমি তো চাইবই ভুল ক'রে কাঁটা, আগাছা, ধুলো, কাদা, কত কী—এমন কি বিষও হয়ত চাইতে পারি তাকে অমৃত ভেবে। কিন্তু তুমি যেন তাই ব'লে এ-সব অবস্তু দিয়ে আমাকে দফায় মজিও না। ঠাকুরও কল্পতরু তো—কথা শোনেন, আমার এ-প্রার্থনা শুনবামাত্র বললেন: "বহুৎ আচ্ছা—তোকে দেব না রে যা চাস—নৈলে আর কৃপা বলেছে কেন? হা হা হা!"

[ক্রমশঃ]

প্রাচ্যবাণীর সাংস্কৃতিক সফর

পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীভগবানের অশেষ কৃপায় এবং আমাদের প্রাণ-প্রতিম ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের শুভাশীর্বাদে, তাঁহারই প্রাণ-প্রিয় "প্রাচ্যবাণী"র বিজয়দুন্দুভি আজ সর্বত্রই পূর্ববৎ সগৌরবে নিনাদিত তাঁহারই দ্বিতীয়-জীবন সুযোগ্যা সহধর্মিণী অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরীর সুপরিচালনায়।

সকলেই জানেন যে, ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের জীবনব্রত ছিল সংস্কৃতকে জনপ্রিয়, সার্বজনীন ভাষা রূপে পুনঃ-স্থাপিত করা। এই জন্য, তিনি বহু সংস্কৃত গবেষণা গ্রন্থ, মৌলিক সংস্কৃত রচনা, নাটক, সঙ্গীত, কবিতাবলী প্রভৃতি প্রকাশিত করিয়াছিলেন; এবং দেশে ও বিদেশে আধুনিক সংস্কৃত নাট্যাভিনয়, সংস্কৃত সঙ্গীতানুষ্ঠান, সংস্কৃত ভাষণ দান প্রভৃতি উপায়ের মাধ্যমে সংস্কৃত প্রচারে ব্রতী ছিলেন। প্রত্যেক বৎসরই তিনি 'প্রাচ্য-বাণী সঙ্ঘের" সংস্কৃত পালি নাট্য সভ্যসভ্যাগণসহ সাংস্কৃতিক সফরে বাহির হইতেন সানন্দে এবং সকলকেই জয় করিয়া ফিরিয়া আসিতেন সগৌরবে।

তাঁহার আকস্মিক মহাপ্রয়াণের পরও তাঁহার সমান-ধর্মা সহধর্মিণী ডক্টর রমা এই ধারাটী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, প্রাণপণে সযত্নে। তাঁহারই সুপরিচালনায় এই বৎসরও পূজাবকাশের সময়ে আমরা দেওঘর, কাণপুর, দিল্লী, আগ্রা ও বারাণসীতে তাঁহারই বিরচিত অভিনব সংস্কৃত নাটক দশবার অভিনয় করিয়া ঈশ্বর কৃপায় প্রভূত যশ অর্জন করিতে পারিয়াছি। কি পরম সৌভাগ্য আমাদের!

দেওঘরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

গতবারের ন্যায়, এইবারও আমাদের পুণ্য সাংস্কৃতিক সফর আরম্ভ হয় দেওঘরের সুবিখ্যাত "দেব-সঙ্ঘের" সুপবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণে। অশেষ স্নেহময় শ্রীশ্রীবাবার সাদর আহ্বানে আমরা তাঁহার আশ্রমের পরমসুন্দর মন্দির মধ্যে বহু ভক্তজন সম্মুখে ডাঃ রমা চৌধুরী বিরচিত দুইটি ভাবঘন, রসমধুর সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়া পরম ধন্য হইলাম। এই জনপ্রিয়, বহু-বার অভিনীত সংস্কৃত নাটক দুইটী হইল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অপরূপ লীলামূলক "যুগজীবনম্" ও ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীতুলসীদাসের পুণ্য জীবনীমূলক "রামচরিত-মানসম্"। এই দুইটি অভিনীত হইল যথাক্রমে ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৭।

"যুগজীবনম্" সর্বপ্রথম অভিনীত হয় ডক্টর যতীন্দ্র-বিমলের তিরোধান সভায় ১০ই জুলাই ১৯৬৬। এই পুণ্য সভায় সানুগ্রহে পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট পরম শ্রদ্ধেয় মহারাজ শ্রীমৎস্বামী শ্রীবীরেশ্বরানন্দ। তিনি সানুগ্রহে পূর্ণ তিনঘণ্টাকাল উপস্থিত থাকিয়া অভিনয়টী শেষ পর্যন্ত দর্শন করেন, এবং বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই পবিত্র সভায় আরো বহু সন্ন্যাসী ও প্রব্রাজিকা সানুগ্রহে উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই এই নাটকটীর বিশেষ প্রশংসা করেন। তাহার পর হইতে এই সময়োপযোগী, সুন্দর সংস্কৃত নাটকটী বহুবার বহু স্থানে অভিনীত হইয়া সকলকেই গভীর আনন্দ দান করে। "রামচরিত মানসম্" নাটকটীও অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। উভয় নাটকেরই সংস্কৃতে রূপায়িত রাম-প্রসাদী সঙ্গীত, তুলসীদাসের ভজন এবং অন্যান্য সংস্কৃত সঙ্গীত সকলের বিশেষ উপভোগ্য হয়।

দেওঘরেও এই দুইটী সংস্কৃত নাটকাভিনয় সমবেত সকলের বিশেষ সন্তোষ বিধান করে ইহাতে আমরা পরম কৃতার্থ বোধ করিলাম। শ্রীশ্রীবাবার সানুগ্রহ উপস্থিতিও আমাদের পরম আনন্দের কারণ হইল। আমাদের পরমাত্মীয়তুল্য, অক্লান্তকর্মী শ্রীসুধীর চক্রবর্তী ও তাঁহার সহকর্মীগণ পূর্ববৎ বিশেষ যত্নের সহিত আমাদের অভিনয় এবং খাওয়া-থাকা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা এবং তাঁহাদের ঋণ সত্যই অপরিশোধ্য।

কাণপুরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

এইবারে কাণপুরে আমাদের একটা অভিনব আশ্চর্য-

অভিজ্ঞতা হইল। আমাদের পূর্বতন বন্ধু শ্রীকৃষ্ণলাল শেঠী মহাশয় এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। শ্রীশেঠী মহাশয় কাণপুরের সুবিখ্যাত "এল্‌গিন্ মিলের" একজন অতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদের পবিত্র পূর্ণকুম্ভযোগ উপলক্ষ্যে আহূত বিশ্বসম্মেলনে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল বিরচিত আমাদের সুবিখ্যাত "ভারত বিবেকম্" সংস্কৃত নাটকটীর অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া "সর্বভারতীয় বিবেকানন্দ-শিলা স্মারক সমিতির" পক্ষ হইতে আমাদের সাদরে আহ্বান করিয়া কাণপুর, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রায় পাঁচবার ঐ নাটকটীই অভিনয় করান মহাসমারোহে অর্থসংগ্রহের জন্য। এইবারও তিনি পূর্ববৎ সাহস ভরে ডাঃ রমা বিরচিত দুইটি সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন তাঁহাদের সুবিখ্যাত British Indian Corporotion Clubএ। এই ক্লাবটী অতি ধনী, মানী, উন্নাসিক, কাণপুরের সুবিখ্যাত কাপড়ের কলগুলির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ক্লাব। তাহারা জীবনে সংস্কৃত নাটক দেখেন নাই, ভারতীয় সংস্কৃতির নামগন্ধও জানেন না। অথচ পরম সাহসী, দূরদর্শী শ্রীশেঠী মহাশয় তাহাদের ধরিয়া আনিয়া আমাদের দুইটী সংস্কৃত নাটকাভিনয় দেখাইয়া বিশেষ মুগ্ধ করিলেন। এই দুইটী নাটক হইল ১৭ই ও ১৮ই অক্টোবর, ১৯৬৭—ডাঃ রমা বিরচিত সর্বজনপ্রিয় "রাম-চরিত মানসম্" ও "শঙ্কর-শঙ্করম্। যাঁহারাই এই দুইটী নাটকাভিনয় দেখিলেন, তাহারাই ধন্য ধন্য করিয়া আমাদের পরম কৃতার্থ করিলেন। সত্যই শ্রীভগবানের আশীর্বাদে এইভাবে সম্পূর্ণ নূতন, বিরুদ্ধ পরিবেশেও আমাদের সংস্কৃত নাটকাভিনয় সার্থকতম হইল। ইহার জন্য মধুর-স্বভাব, সহৃদয় সজ্জন শ্রীশেঠী বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

দিল্লীতে সংস্কৃত নাটকাভিনয়

কাণপুর হইতে আমরা গেলাম দিল্লীতে "প্রাচ্যবাণী"র দিল্লিশাখাস্থ সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমধুসূদন নন্দীর সাদর আমন্ত্রণে তাঁহাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য। দিল্লীতে প্রথম দুইদিন (১৯শে ও ২০শে অক্টোবর, ১৯৬৭) 'পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ' হলে এবং শেষদিনে (২১শে অক্টোবর, ১৯৬৭) 'রামকৃষ্ণ মিশন' হলে আমরা ডাঃ রমা বিরচিত সংস্কৃত নাটক "রাম-চরিত-মানসম্", "নিবেদিত-নিবেদিতম্" ও "যুগজীবনম্" সাফল্যের সহিত অভিনয় করি ঈশ্বর কৃপায়। শেষদিনে হইল সর্বাপেক্ষা জনসমাগম ; লোকে লোকারণ্য!

আগ্রায় সংস্কৃত নাটকাভিনয়

ইহার পরে আমরা গেলাম আগ্রাতে "নিবেদিতা-জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব-সমিতির" সাদর আমন্ত্রণে। সেখানে সুবিখ্যাত আগ্রা কলেজের সুবৃহৎ হলে ২২শে অক্টোবর, ১৯৬৭, ডাঃ রমা বিরচিত সংস্কৃত নাটক "নিবেদিত-নিবেদিতম্" সুবিশাল দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনীত হইয়া সকলকেই অতি পরিতৃপ্ত করিল ঈশ্বর প্রসাদে। ইহার জন্য সম্পাদক শ্রীলজ্জারাম তোমার এবং তাঁহার উৎসাহী সহকারিবৃন্দ বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

বারাণসীতে সংস্কৃত নাটকাভিনয়

আমাদের সর্বশেষ, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকাভিনয় হইল বারাণসীস্থ রামকৃষ্ণ মিশন অদ্বৈতাশ্রমে ২৪শে ও ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬৭। অদ্বৈতাশ্রমের অতি সুন্দর বিস্তৃত মাঠে প্রায় তিন হাজার ভক্তমণ্ডলী স্থির হইয়া আড়াই ঘণ্টা বসিয়া "যুগ জীবনম্" ও "রাম-চরিত-মানসম্"র নাট্যরস পান করিলেন সানন্দে—তাহা সত্যই এক অপূর্ব দৃশ্য। সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সাধু-সন্ন্যাসী, বৌদ্ধলামা প্রভৃতি সানুগ্রহে উপস্থিত হইয়া আমাদের বিশেষ উৎসাহ বর্ধন করেন, এবং সকলেই একবাক্যে অভিনয়ের উচ্চপ্রশংসা করেন। পরমেশ্বরের কি অসীম করুণা!

রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের অক্লান্তকর্মী, সুযোগ্য সম্পাদক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী অপর্বানন্দ মহারাজের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নাই। তাঁহার সংস্কৃতপ্রীতি ও সংস্কৃত প্রচার-প্রসার প্রচেষ্টা সত্যই অতুলনীয়। তিনি এরূপ উচ্চকোটীর অসংখ্য দর্শক-পরিপূর্ণ ভাবগর্ভ সভার সুবন্দোবস্ত করিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সুনিশ্চিত।

উপসংহার

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও আমাদের সাংস্কৃতিক সফর পরিপূর্ণভাবেই সার্থকতম হইল শ্রীভগবানের কৃপায় ও ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের শুভাশীর্বাদে। প্রত্যেক স্থানেই ডাঃ

রমার স্বভাবসুলভ, সুমিষ্ট সুললিত ইংরাজী ও বাংলা ভাষণ সকলকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে। সকল স্থানেই আমরা লাভ করিলাম বহু নূতন পরমাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব। ইহাও আমাদের পরম সৌভাগ্য।

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন—সর্বশ্রী পণ্ডিত অনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, সুনীল দাস, অনিলকান্তি দত্ত, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর রায়, শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তী, রমা চক্রবর্তী ও অলকা বসু। সঙ্গীতাংশে ছিলেন শ্রীপূর্ণেন্দু রায় ও রূপসজ্জায় শ্রীদিলীপ ঘোষ।

সংস্কৃত অভিনয়ের মাধ্যমে সংস্কৃতকে জনপ্রিয় করিবার সাধুপ্রচেষ্টা যে কতদূর সার্থক হইতে পারে, তাহা সর্বভারত ভ্রমণ করিয়া আমরা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। সংস্কৃত সেবায় দত্তপ্রাণ ডাঃ যতীন্দ্রবিমলের দূরদৃষ্টিপ্রসূত এই শুভ প্রচেষ্টা যে আজ তাঁহারই প্রাণপ্রতিম "প্রাচ্য বাণীর" মাধ্যমে দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর সার্থক হইয়া উঠিতেছে—ইহার অপেক্ষা অধিক আনন্দের আর কি হইতে পারে?

বাঁশির সুর

শ্রীমতী শান্তি বসু

গগন বিহারী মেঘ হল স্থির
শুনে সে বাঁশির সুর
সে সুর লইয়া, চলিল বহিয়া
বাতাস মন্দ মধুর।

ময়ূরের দল নৃত্য মুখর
হরিণীরা চঞ্চল
তরুলতা সব, হইল নিথর
স্তব্ধ, যমুনা জল।

শ্যামলী ধবলী শুনিল বাঁশিতে
আপন, আপন নাম
ব্রজবালাগণ, বাহিরিয়া পথে
রাই, কোথা ঘনশ্যাম।
যশোমতী শোনে, তার কানুধনে
বলে, ননী দাও ননী
মুরলী মধুর, আনন্দ বিধুর
রাই বলে, চিনি চিনি।

তিন অঙ্ক

জ্যোতির্ময়ী দেবী

১

একরাশ ছোট বড় হাঁড়িকুঁড়ি আর হাতাবেড়ী
কিছু কুটনোর খোসা ফেলে দেওয়া শাক পাতা আর
কুড়ায়ে কুড়ায়ে খুকু তার খেলাঘর বাঁধে
উনুনে চড়ায় হাঁড়ী বিনানুনে তরকারী রাঁধে
কাঁকরের সুরকীর রাঁধা হয় ডাল আর ভাত।
পরেনি সিঁদুর টীপ মায়মত শাঁখা আর চুড়ী
ভরে দুই হাত।

নাই নাই ঘোমটা মাথায়। ফ্রক তার আঁচল কোথায়।
নেইকো চাবীর গোছা আঁচলেও তাই ভারি ভারি।
যদিও মনে সাধ মার মত সাজিবার ভারী।
তা না হোক—তবু খেলা ঘর পাট
হয়েছে জমাট।

এ বেলা ও বেলা ভরে খাবে যত বোন ভাই।
পুতুল খায় না ভাত। খুকুর তো ছেলে হয় নাই!

২

চোখে ভয় কৌতুহল। কান্না ও হাসি ভরা মুখ
অচেনা আরেক ঘরে আসিল সে
দুরু দুরু করিতেছে বুক।

এবারে পেয়েছে হাতাবেড়ী আর বড় বড় হাঁড়ী।
খোলা নয় খোসা নয় সত্যিই ভালো তরকারী।
উনুনে আগুন জলে। মাথায় ঘোমটা নেয় ঢাকা।
আঁচলে ঝুলেছে চাবী। সিঁথিতে সিঁদুর হয় আঁকা।
টুংটাং বাজে হাতে চুড়ী লোহা বালা আর শাঁখা
চারদিকে ঘোরে ফেরে নতুন ঘরের পরিজন।
পুতুল এসেছে ফেলে সেই ঘরে পুরাতন।
এ সংসারে আপন কোণে প্রাণময় নতুন জীবন।
সাধ কি মিটেছে? ভাবিবার সময় কখন।

৩

[illegible] জীর্ণদেহ শীর্ণ দুটী কর।
হাতে নিতে কোনো কাজ হাত দুটি কাঁপে থর থর।
কম্পমান কর হতে ছড়ায়ে ছড়ায়ে গেছে হাতে ধরা
সব ক্রীড়নক।

মানুষ হয়েছে তারা সেই তার শিশু মানবক।
পারে না ধরিতে কারে। ক্ষীণ দৃষ্টি হেরিছে কি
দেওয়ালে লিখন?

খেলা আর ঠাঁই নাই অন্য অঙ্কে ফিরিবার সময় এখন!
থমকি দাঁড়ায় হেথা হোথা সেদিকের দুয়ার খুঁজি খুঁজি,
সমুখে মেলে না বটে। হায় কবে ভেঙে গেছে ছবি।
সাথীরা ফিরিছে ঘরে
ডাকে নাই, বলে নাই, আসিয়াছে ফিরিবার ক্ষণ।
সূর্য্য বসে পাটে। খেয়া তরী লাগিতেছে ঘাটে যখন তখন।
যাত্রী দল সেই পথে অন্ধকার ভেদি
কোথা যেন যায় অবিরাম।

সে ভাবিছে ক্ষণে ক্ষণে
কেহ তারে সমুখে পিছনে ডাকে ধরে নাম।
কেহ নাহি ডাকে।
যাত্রী দল মিলাইয়া যায় পথের বাঁকে বাঁকে।

———

বিশ্বভাষা-পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দীর আগের যুগকে ঋগ্বেদীয় সভ্যতার যুগ বলা যায়। এই যুগ আরো বহুকাল আগে থেকে সুরু হয়, তার নিখুঁত সাল-তামামি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বিদ্যানিধি জ্যোতির্বিদ্যা ও গিরীন্দ্রশেখর পুরাণের দ্বারা সে-যুগের সন-তারিখ খানিকটা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সূক্ষ্ম কোন হিসেব দেওয়া না গেলেও মোটামুটি একটা সময়ের অন্দাজ তাঁদের রচনায় পাওয়া যায়। তা থেকে বোঝা যায়, ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন ঋগ্বেদের একেবারে প্রথম ঋকগুলি মুখে মুখে রচিত হয় বেদ-বিভাগের বহু সহস্র বছর আগে; ঋগ্বেদের ভাষা যত প্রাচীন, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন ঋগ্বেদে উল্লিখিত ঘটনাবলীর কাল। কিন্তু সে-আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গের পক্ষে অবান্তর।

আমরা এটা বেশ বুঝতে পারি যে, ভাষার দিক দিয়ে বৈদিক সাহিত্যের প্রথম লিখিত আবির্ভাব প্রথম বেদ-বিভাগের সময়ে ব'লে ধরাই প্রশস্ত এবং সে-সময়টা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতাব্দী। বিদ্যানিধির মতে, বেদ-বিভাগের অনেক আগে ঋকবেদ একটু একটু ক'রে ছয় সাত হাজার বছরে সম্পূর্ণ রচিত হয়েছিল। সেই ভাষা-গত বিবর্তনের কোন লৈখিক নিদর্শন ছিল কিনা এবং সেই বিবর্তন কোন্ স্তরপরম্পরাক্রমে সাধিত হয়েছিল, তার আলোচনা আমাদের বিষয় পরিধি বহির্ভূত। তবে আর্যদের ভারতে প্রবেশ-কাল এবং তার আগের বাস-স্থান সম্বন্ধে যা জানা যায়, সংক্ষেপে তার কথা বলা যেতে পারে ভাষাভিত্তিক দিখে বিশেষ ক'রে ভারতীয় আর্যভাষার পরিক্রমা-পথ বুঝবার জন্যে। এ-সব ব্যাপারে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যাগত ভৌগোলিক প্রমাণ-সমূহ অত্যন্ত মূল্যবান্। জ্যোতির্বিদ্যার প্রমাণ অখণ্ডনীয়—চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।

অনেকের ধারণা, ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ফলিত জ্যোতিষের চর্চা হিন্দুদের সঙ্গে গ্রিকদের পরিচয়ের পরে সুরু হয়। "যবন" শব্দে এক সময়ে শুধু "গ্রিক" বোঝাত, কিন্তু পরে অন্য বহু সময়ে পশ্চিম দেশাগত যে কোন জাতি বোঝাত। ঠিক যেমন "অসুর" শব্দের দ্বারা শুধু সেমীয় আসুরিয়া-বাসীদের বোঝাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে ভুল ক'রে দৈত্য, দানব প্রভৃতিদেরও বোঝানো হত। দীর্ঘকাল যাবৎ ইরাণীয় আর্যভাষীদেরও অসুর আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় আর্যরা যবনদের কাছে জ্যোতিঃশাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন মানেই এ নয় যে, তাঁরা গ্রিকদের কাছে জ্যোতির্বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করেছিলেন। আবার, সে-গ্রিকরা যে আলেক-সান্দরের সময়ে প্রথম ভারতের হিন্দুদের কাছে জ্যোতি-র্বিজ্ঞান ও ফলিত জ্যোতিষের বার্তা নিয়ে আসে, এমন মনে করারও দরকার নেই। গ্রিকদের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরো বহু প্রাচীন কালের হবার কথা।

বেদে চোদ্দটি গ্রহের নাম উল্লিখিত আছে। বাপুদেব শাস্ত্রী প্রথম এ-বিষয়টির দিকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিখ্যাত জ্যোতিষসাহিত্যস্রষ্টা জ্যোতি বাচস্পতি বা যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে ১৯৪১ সালে "বিবাহে জ্যোতিষ" গ্রন্থে লিখেছিলেন, "সাধারণত ন'টি গ্রহের কথাই আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত হলেও বেদে চতুর্দশ গ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রজাপতি, বরুণ ও রুদ্র—এই তিনটি গ্রহ পাশ্চাত্যেরা পুনরাবিষ্কার করেছেন। সম্ভবত পরে আরো দুটি গ্রহ পুনরাবিষ্কৃত হবে—এবং তা হলেই বেদে লিখিত চতুর্দশ গ্রহ পূর্ণ হবে।"

বর্তমান নিবন্ধের পাঠকদের জানা চাই যে, যে-

বারোটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্তত চারটি জ্যোতির্বিজ্ঞানমতে গ্রহ নয়—রবি, চন্দ্র, রাহু ও কেতু—এই চারিটি নিতান্তই ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রমতে গ্রহরূপে ধার্য। অর্থাৎ মানুষের ভাগ্যগণনার সময়ে এদের কথা বিচার ও হিসেব করা হয়। সুতরাং বেদে এদের উল্লেখ থাকার অর্থ, বেদ-গ্রন্থনের সময়ে ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা তো বটেই, ফলিত জ্যোতিষও মোটেই অপরিচিত ছিল না। বারো চোদ্দটি গ্রহের মধ্যে জ্যোতিষিক গ্রহ ও গাণিতিক বিন্দুর অস্তিত্বই নিঃসংশয়ে সে সত্য প্রমাণিত করছে। যে দুটি গ্রহ এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত, সে দুটি ভাল্কান ও গ্রহাণুপুঞ্জ হতে পারে কিংবা প্লুটো বা রুদ্রেরও পরপারে থাকতে পারে।

বেদাঙ্গ গ্রন্থগুলির মধ্যে জ্যোতিষ আছে। এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রাপ্ত পুঁথির ভাষা খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর হতে পারে। কিন্তু পুঁথিতে বর্ণিত বিষয়ের কাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দী। বেদের যজ্ঞদিনের হিসেবে বা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে দেখা যায় যে, অশ্লেষা নক্ষত্রের অর্ধে দক্ষিণায়ন এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হত। সুতরাং অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৭২ সাল বৈদিক যজ্ঞ-দিন গণনায় রেওয়াজ প্রচলিত ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১০ সালে নক্ষত্রবিদ্যা ভারতে প্রচলিত হয়। চন্দ্রের সমগ্র গতিপথটি ২৭টি নক্ষত্রে বিভক্ত হয়। রোহিণী নক্ষত্রে তখন বাসন্ত-বিষুব (Vernal Equinox) হত। বিদ্যানিধির মতে, তার অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং রাশিচক্র খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫০ সালে পরিকল্পিত হয়েছিল। সেই জন্যে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির কোষ্ঠী পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

যাঁদের সংশয় কিছুতেই ঘুচতে চায় না তাঁদের অনুধাবন করা দরকার যে, কৃত্তিকা-প্রমুখ ২৭টি নক্ষত্রের নাম থেকে অশ্বিনীর পরিবর্তে কৃত্তিকার প্রাধান্য সূচিত হচ্ছে; তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই প্রাধান্য দ্রষ্টব্য; অতএব, কৃত্তিকায় বিষুবপাত হওয়ার সময়ে ঐ সংহিতায় রচনা এবং বিষুবপাতের জন্যেই ঐ সংহিতায় কৃত্তিকার প্রাধান্য। এটা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাবিংশ শতাব্দীর সমসাময়িক ঘটনা। অতএব, তৈত্তিরীয় সংহিতার প্রথম রচনা খ্রীষ্ট জন্মের বাইশ শতাব্দী আগে। তৈত্তিরীয় সংহিতা কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত। সুতরাং তৈত্তিরীয় সংহিতার রচনাকাল বেদ-বিভাগের সময়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় কৃত্তিকা O° অংশে, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে ১২° অংশে। এই ১২ অংশ অতিক্রম করতে অন্ততঃ ৮০০ বছর লাগার কথা। সেই জন্যে তৈত্তিরীয় সংহিতার রচনা-কাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাবিংশ শতাব্দী ধরতে হয়। দেবাসুর-সংগ্রামে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় এই সময়ের লোক হতে পারেন।

Orion গ্রন্থে দ্রষ্টব্য লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের মতে, ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হত; অনুরূপ ভাবে, চিত্রা পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হত ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। কিন্তু নিধির মতে, পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রথম যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেন অঙ্গিরস, অথর্বন্, ভৃগু প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ, যাঁরা পিতৃনামধেয়। তখন সময় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম কি নবম সহস্রক। বৈদিক সভ্যতার গোড়াপত্তন তা হলে ভারতে হয় ঐ সময়ে। টিলকের মতও তাই। বিদ্যানিধির মতে, বেদের বিভাগ প্রথম হতে সুরু করে ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব সাল থেকে; ৩৫০০—২৫০০ সালের মধ্যে ঋগ্বেদ সংগ্রথিত হয়। লিখিত আকারে ঋক্‌সমূহ ৪৫০০ সাল নাগাদ রচিত হতে থাকে। ঋক্‌মন্ত্রের মৌখিক রচনা আরো আগের। বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ আরো আগের। ৩২৫৬ খ্রীষ্টপূর্ব সাল বৈবস্বত মনুর মন্বন্তরের সময়; প্রিয়ব্রত রাজার বংশধর ভরতের নামে ভারতবর্ষ নাম হয় ৭৫০০—৬১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

গিরীন্দ্রশেখরের মতে, আদিম আর্য জাতি বা মূল ভারত-হিত্তি জাতির ইতবৃত্ত খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০০ সালের মতো পুরোনো। ৫০০০ বছর আর্য জাতি ভারতবর্ষের উত্তরস্থ ইলাবৃতবর্ষ প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করতেন। ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারতীয় আর্য সভ্যতার সূচনা।

বিদ্যানিধি, গিরীন্দ্রশেখর এবং পুরাণবিৎ পণ্ডিতদের মতে, আর্যরা ভারতে এসেছিলেন ভূস্বর্গ থেকে। এঁদের মতে এই ভূস্বর্গ কাশ্মীর নয়। বিদ্যানিধির মত পণ্ডিতরা মেনে নিয়েছেন। তাঁর মতে, তিএন্‌শান্ পর্বত পৃথিবীর নাভি এবং মেরু পর্বত; তার পশ্চিমের এলাকা ভূস্বর্গ এবং ভারত-ইউরোপীয় বা আদিম আর্য জাতির আদি নিবাস, বৈদিক আর্যদের পূর্ব নিবাস। শেষ হিমপ্রলয়ের পর

আদিম আর্য জাতি শাক বা শক দ্বীপে বাস করতেন। এই অঞ্চল বর্তমানে বলখাস্‌ ও আরাল হ্রদের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড। এখান থেকে সুপ্রাচীন কালে ভারতে ব্রাহ্মণ এসে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়েছিলেন, এই হল বিদ্যানিধির মত। পাশ্চাত্য আর্যরা এখান থেকে পশ্চিমে ককেশাস্‌ পর্বতের পথে এশিয়া মাইনর ও ইউরোপে যান। স্লভ জাতি কাস্‌পিআন হ্রদ অতিক্রম ক'রে পাশ কাটিয়ে ভল্‌গা নদীর তীরে উপনীত হয়, প্রাচ্য আর্যরা দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্বে যাত্রা ক'রে প্রথমে ইরানে ও পরে পাঞ্জাবে এসে উপস্থিত হন। সুনীতিবাবুরও মত এই রকম :—

"উরাল পর্বতের দক্ষিণে কাস্‌পিআন ও আরাল হ্রদদ্বয়ের উত্তরে এখনকার কালে তুর্কিভাষী কির্‌ঘিজ ও কাজাক জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ভূখণ্ডে আদি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেরা বাস করিত।" (এশিয়া খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব।)

ভারতীয় আর্যদের সব পূর্বপুরুষ একত্র ভারতে আসেন নি। তাঁরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দফায় দফায় এসেছিলেন। তাঁদের গায়ের রং নানা রকম ছিল ব'লেই বর্ণভেদের উৎপত্তি। দেহের বর্ণভেদ থেকে প্রকৃতির অনুকরণে গুণগত বর্ণভেদ এবং তা থেকে পরে কুলক্রমাগত জন্মগত বর্ণভেদের উৎপত্তি। ব্রাহ্মণ শুভ্র, ক্ষত্রিয় রক্ত, বৈশ্য পীত, এবং শূদ্র নীল বর্ণ। এই বর্ণভেদ-সম্পর্কিত মতবাদ কেবল বিদ্যানিধির স্বকপোলকল্পিত ধারণা নয়, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ত্রয়ী Boak Slosson Anderson ও এই মতবাদ সমর্থন করেন। বৈদিক আর্য শ্বেতকায় এবং জ্ঞানযোগী। এরাই ভারতে এসে ঋগ্বেদীয় সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধন করে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

তার পর যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাবল্যময় কঠোর ব্রাহ্মণ্য শাসন আরম্ভ হয় ২১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ, ঠিক ভাবে ধরতে গেলে ২৪৪৯ সাল থেকে। এর পর হাজার বছর যজুর্বেদের প্রাধান্যময় সভ্যতা স্থায়ী হয়। তারপর বৈদিক আর্য সভ্যতার পরিবর্তে মিশ্রণজাত হিন্দু সভ্যতার সূচনা হয় পৌরাণিক যুগে। এই সভ্যতা আগের চেয়ে অনেক বেশি উদার হলেও গুণগত বিচারে অপকৃষ্ট।

জার্মান পণ্ডিতদের ধারণায় ঋগ্বেদের রচনাক্ষেত্রেই ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক যুক্তিতে ভারত-জার্মান আর্য জাতির আদি নিবাস। বিখ্যাত ফরাসি মনীষী রোমাঁ রোলাঁ-ও দিলীপকুমারকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন (অক্টোবর, ১৯২৪) :—

"I beleive that there is some direct family affinity between an Aryan of the Occident and an Aryan of the Orient. And I am convineed, Friend Ray, that it was I who must have descended down the slopes of the Himalayas along with those victorious Aryans. I have their blue blood flowing in my veins."

"আমি বিশ্বাস করি যে, পাশ্চাত্য আর্যের সঙ্গে প্রাচ্য আর্যের কোন প্রত্যক্ষ পারিবারিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আর, বন্ধু রায়! আমি নিশ্চিত যে, আমি অবশ্যই সেই সব বিজয়ী আর্যদের সঙ্গে হিমালয় পর্বতমালার ঢাল দিয়ে নেমে এসেছি। তাদের অভিজাত শোণিত আমার ধমনীতে প্রবাহিত।"

কিন্তু আদি আর্যস্থান আজ সম্পূর্ণরূপে শত্রু কবলিত। স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট। স্বর্গভূমি বা সোভিয়েট ও চৈনিক মধ্য এশিয়া আর পশ্চিম পাকিস্থান সহ সমগ্র ইরানভূমি এখন মুসলিম বা সেমীয় ধর্মাবলম্বী। আদি আর্যভূমিতে এখন কাজাক, কিরগিজ, উজবেক, তুর্কমান, তাজিক, কুর্দ, পারসিক, আফগান, বালুচ, পাঠান, কাশ্মীরি, পাক-পাঞ্জাবি, সিন্ধি—এই তেরোটি জাতির বাস। প্রথম চারটি জাতি তুর্কিভাষী তাতার গোষ্ঠীর লোক, বাকি নয়টি জাতিই আর্যগোষ্ঠীর ভাষাভাষী। কিন্তু তেরোটি জাতির প্রায় সবাই সেমীয় মুসলিম ধর্মাবলম্বী। এদের মধ্যে শোণিত মিশ্রণের পরিমাণ অন্তহীন। তার ফলে বর্তমানে এই অঞ্চলে সভ্যতার মানও অতি নিকৃষ্টস্তরের। রুশ নিয়ন্ত্রণে যে-সব তুর্ক-তাতার জাতি আছে তাদের সভ্যতার যা কিছু উৎকর্ষ, সবই রুশের দান। বাদ বাকি জাতিগুলির সম্বন্ধে প্রশংসা করার মতো কিছু পাওয়া দুষ্কর।

পুরাণে দেখা যাচ্ছে যে, মহাদেব আর্য; কিন্তু তিনি সমাজ ত্যাগী, সমাজচ্যুত, অনার্য অনুচর পরিবেষ্টিত

আর্য এলাকা থেকে একটু দূরে তাঁর বাসস্থান ; কৈলাস পর্বতের কাছে তিনি বাস করতেন। অদূরে মানস সরোবরে ব্রহ্মার বাসস্থান ছিল। স্বর্গে বা বর্তমান রুশ-চীন তুর্কিস্থানে "ইন্দ্র" উপাধিধারী আর্য নায়ক বাস করতেন। কাজাকস্থান, কির্গিজিয়া, তুর্কোমান প্রজাতন্ত্র, উজবেকিস্থান, তাজিকিস্থান, সিনকিয়াং এবং কাশ্মীর মিলিতভাবে তৎকালীন "স্বর্গ" এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাশ্মীর বাদে অবশিষ্ট সমস্ত এলাকায় তুখার বা তুষার বা ঋষিক জাতির মানুষেরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বাস করেছে। এরা নিজেদের জ্ঞাতি ভারতীয় আর্যদের সঙ্গে অনির্দেশ সময়েও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমশ স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট হওয়ায় দেবতারা স্থানচ্যুত হয়ে পড়েন।

দেবজাতি বা আদিম আর্য দল বা ঋক্‌বেদীয় আর্যদের সম্রাটের উপাধি ছিল "ইন্দ্র"। ইন্দ্র যে এক নন, বহু, সে-কথা পুরাণে স্পষ্ট বলা আছে। ইন্দ্র ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, ইন্দ্রত্ব একটি পদরূপে উল্লিখিত। মহাদেব, ব্রহ্মা বিষ্ণু আর্যদের অধিকতর সম্মানিত ও প্রাচীনতর দেবতা। ইন্দ্রের মর্যাদা বৈদিক যুগে খুব বেশি থাকলেও পৌরাণিক যুগে ক্রমশ কমে গিয়ে একেবারে লুপ্ত হয়। বৈদিক আর্যদেরও উদ্ভবের আগে মূল ভারত-ইউ-রোপীয় জাতির মধ্যে পূর্বোক্ত দেবতাদের এবং দ্যৌ-এর প্রাধান্য ছিল। স্বর্গভূমির আর এক নাম ছিল দ্যুলোক বা দ্যু-র বাসস্থান বা আকাশভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচুঁতে অবস্থিত হওয়ার জন্যে পামির মালভূমি-সন্নিহিত ঐ এলাকার এ-রকম নাম হয়ে থাকবে। আরাল সাগরের উত্তর-পশ্চিমে বা বায়ু কোণে কিম্পুরুষ রাজ্য ছিল।

দ্যৌ বা দ্যুঃ বা দিউস্ মূল আর্য জাতির আদি দেবতা। সমস্ত আর্য একত্র থাকার সময়ে ইনি মূল দেব জাতির (ভারতীয় বৈদিক বা অ-বৈদিক কোন আর্য জাতির একার নয়) আরাধ্য ছিলেন। সম্ভবত তিনি আরাধ্য থাকার সময়েই গ্রিক, লিথুআনীয়, স্লাভ প্রভৃতি কোন পাশ্চাত্য আর্য জাতি স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে আত্তিকা, বাল্‌তিক সাগর, স্তারকশ্‌স্কি বা ষ্টারায়া রাশা প্রভৃতি এলাকায় বসতি স্থাপন করে। জিউস, দ্যুপিতৃ বা জুপিটার প্রভৃতি এই সময়ের গ্রিক-রোমক দেবতা। ক্রমবিকাশের পরবর্তী অধ্যায়ে "ইন্দ্র" উপাধিবিশিষ্ট শাসক কাজাকস্থান এলাকার মূল দেবজাতির অধিপতি হন। ইনি আরাল সাগর বা হ্রদ থেকে আরব সাগর, তিএন্‌শান্ পর্বত থেকে তিগ্রিস নদী পর্যন্ত সমস্ত তুর্কিস্থান বা তুরান, ইরাণভূমি আর উত্তর পশ্চিম ভারতের বিরাট ভূখণ্ড শাসন করতেন। আমুদরিয়া বা সিরদরিয়া নদী দুটির কোন একটির তীরে সমরকন্দ, বুখারা বা তাদের কাছাকাছি কোন নগরে তাঁর রাজধানী ছিল ; সম্ভবত তার নাম বৈজয়ন্ত পরে বিজান্তিউম্ রূপে পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানীর নামের দ্বারা অনুকৃত হয়েছিল।

"ইন্দ্র" উপাধিধারী শাসকেরা ভারতের বৈদিক-আর্য এলাকারও সর্বোচ্চ শাসকপ্রভু ছিলেন এবং ব্রহ্মাবর্ত প্রভৃতি দেশ তাঁদের আজ্ঞাবাহী ও কৃপাভাজন ছিল। প্রায় ৫০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বেণ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারত-রাজ বেণ তাতে অকৃতকার্য হন। প্রথম স্বাধীন ভারত সম্রাট হন পৃথু। তিনি বেণের অল্পদিন পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার পর থেকে ভারতে যাতে কোন শক্তিশালী সম্রাটের অভ্যুদয় হতে না পারে, সেটা দেখা ইন্দ্র বা Caesar এর একটি মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যেই ইন্দ্র বা দেব জাতির Kaiser মানব বা মনুস্মৃতির শাসনাধীন ভারতীয় আর্য রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া চুরি ও যজ্ঞ পণ্ড করার তথা নানা মুনির তপোভঙ্গের চেষ্টা করতেন। আগে দীর্ঘকাল ভারতের বৈদিক আর্যরা মেরু পর্বতের নিকটস্থ আদি আর্য জাতির নায়কের দ্বারা শাসিত হতেন। স্বর্গ ও ভারতের সম্বন্ধটা ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়নের সম্বন্ধের মতো ছিল।

কিছুদিন পরে ভারত পুনর্দখলের চেষ্টা ব্যর্থ বুঝে 'দেব' জাতি ও তাদের শাসক "ইন্দ্র" ব্রিটেন কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণের মতো বিপদে পড়লে বিভিন্ন ভারতীয় আর্য রাজার সাহায্য প্রার্থনা আরম্ভ করেন। পর টীকালে তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্জুন পাণ্ডব নামে মহাভারতে উল্লিখিত হলেও সম্ভবত ঐ রকম কোন ইন্দ্রের অবৈধ সন্তান ছিলেন।

ইন্দ্র অচিরে শাসক থেকে দেবতার পদবীতে উন্নীত

হন ভারতীয় আর্যদের কাছে। শাসক বা নেতাকে দেবতা ভাবতে ভারতীয়রা বরাবরই বেশ পটু। কিন্তু ২৪৪৯ সালে বেদ-বিভাগের পরে, বিশেষত শিব কর্তৃক তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়নের পর থেকে, ইন্দ্রের পূজা ক'মে যেতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকেও ইন্দ্র ভারতীয় রাজার সাহায্য ভিক্ষা করেছেন। কিন্তু তখন দেবতারূপে পূজা লুপ্ত প্রায়। কৃষ্ণ ইন্দ্রপূজার প্রবল বিরোধী ছিলেন। ইন্দ্রের পরিবর্তে কৃষ্ণ পূজা প্রচলনের চেষ্টা হয়। কৃষ্ণের বংশধর বজ্র এবং পরীক্ষিতের আমলে ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর অঞ্চলে এই চেষ্টা কার্যকরী হয়। দিল্লি বজ্রের হাতে ছিল; ব্রজমণ্ডলে কৃষ্ণ পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। কিন্তু পরীক্ষিৎ কৃষ্ণের ভাগিনেয় বংশজাত হলেও খুব বেশি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন ব'লে মনে হয় না। বজ্রের সঙ্গে তাঁর রেষারেষি থাকা স্বাভাবিক ছিল। যে কারণেই হোক, পরবর্তী যুগে হস্তিনাপুর-কোশল—মগধে কৃষ্ণের চেয়ে রামের পূজা অনেক বেশি হয়।

কালিদাস বিরচিত রঘুবংশ প্রমাণ করে যে শৌরসেনী এলাকায় রঘুবংশের মর্যাদা পুরু ও যদু বংশের চেয়ে বেশি ছিল। রঘুবংশ কুরুক্ষেত্রে সুযোধনকে সমর্থন করেছিল, তথাকথিত পাণ্ডব নামাঙ্কিত জারজপঞ্চককে নয়। পৌরাণিক যুগে রাম-কৃষ্ণ-শিব-দুর্গা প্রভৃতির পূজা প্রাধান্য লাভ করেছে।

রাজা পৃথুর সময় থেকে সূত বা ইতবৃত্তসংগ্রাহক নিয়োগের প্রথা প্রচলিত হয়। তার জন্যেই বর্ণিত ইতিহাস সংগৃহীত হতে পেরেছে। পৃথুর পূর্ববর্তী কালে রচিত ঋক্‌গুলিতে ইন্দ্র অলৌকিক দেবতা রূপে নন, শক্রস্বরূপে পরিচিত। পৃথুর পরের যুগে তিনি বাস্তবে সর্বদা-শক্র-আক্রমণে-বিব্রত সন্ত্রস্ত তুর্কিস্থানের সম্রাট, কল্পনায় অধরার দেবতা। ঋগ্বেদ রচনার সময়ে দ্যুঃ গৌণ দেবতা, ইন্দ্র ঋগ্বেদের মুখ্য দেবতা। দ্যুঃ-কে ইন্দ্রের পিতা ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। তার কারণ, আকাশেই ঝড় বৃষ্টি মেঘের জন্ম। আগে দ্যুঃ, পরে ইন্দ্র দেবতা হন ব'লেও পিতাপুত্র সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। দ্যুঃ আর্যদের সমাজের আদি পুরুষ যখন উন্মুক্ত আকাশের নিচে আর্যরা সমষ্টিবদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হন; ইন্দ্র অনেক পরে সুগঠিত আর্য বসতির ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। ঋগ্বেদ প্রধানত বৃষ্টিপ্রবল কৃষিবহুল ভারতের রচনা; ইন্দ্র বা বৃষ্টির দেবতা স্বাভাবিক নিয়মে তাতে প্রাধান্য লাভ করেছেন। দ্যুঃ আকাশের নিচে উন্মুক্ত প্রান্তরে বিচরণরত যাযাবর ভারত-ইউরোপীয় আদিজাতির মুখ্য দেবতা। ঋগ্বেদ থেকে বৈদিক আর্য ভাষা সুরু হল। দ্যু দেবতার মুখ্যত্বঘোষক রচনা আদি ভারত ইউরোপীয় ভাষায় ছিল। দিউস, জিউস, ৎসিও, ইউ, তিউ, ৎসু—শব্দগুলি দ্যুঃ যে এককালে সমস্ত ভারত-ইউরোপীয় জাতির দেবতা ছিলেন, তার প্রমাণ বহন করছে। এমন সব শব্দ আরো আছে।

হিন্দু পুরাণের সব কথা এক কথায় গাঁজাখুরি বা কবিকল্পনা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তার প্রমাণ, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে গ্রিক দার্শনিক প্লাতোন্ বা প্লেটো কতকগুলি সংবাদ উপস্থাপিত করছেন যা নিঃসংশয়ে পৌরাণিক সিদ্ধান্তের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়, খুব সংক্ষেপে সেগুলি আলোচনা করা যাক।

জিব্রালটার প্রণালীর পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহা-মহাসমুদ্রে একদা আটলান্টিস নামে এক মহাদেশ ছিল, যা অধুনালুপ্ত। প্রবল সামুদ্রিক প্লাবনে ঐ মহাদেশ একটু একটু ক'রে নিমজ্জিত হচ্ছিল। শেষে এক প্রচণ্ড প্লাবনে অবশিষ্ট মহাদেশ চিরতরে নিঃশেষে নিমজ্জিত হয়। ঐ মহাদেশের উদ্বাস্তু অধিবাসীরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। আটলান্টিসের নানা ব্যাপার নিয়ে গবেষণা ক'রে শত শত বই লেখা হয়েছে, বহু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। লুপ্ত হয়েও ঐ মহাদেশ এখন বিশ্বে সুপরিচিত। তার মানচিত্রও ভূতাত্ত্বিক গবেষকেরা প্রস্তুত করেছেন। তাঁরা লেমুরিয়া বা গণ্ডোআনাল্যাণ্ড মহাদেশেরও মানচিত্র প্রস্তুত করেছেন। ঐ মহাদেশটি আটলান্টিসেরও আগে সাগর-গর্ভে বিশ্লিষ্ট হয়েছে। যে-সব ভাষার লোকদের কোন বিশেষ গোষ্ঠীতে ফেলা যায় না, তাদের কোন কোনটি হয় তো আটলান্টিস মহাদেশ থেকে এসে থাকবে।

প্লাতোন্ তাঁর তিমাইউস্ (Timaeus) ও ক্রিতিআস (Critias) গ্রন্থ দুটিতে এক বিস্তৃত আলোচনায় লিখেছেন যে, বিখ্যাত গ্রিক মনীষী সোলনের আবির্ভাবের নয় হাজার বছর আগে গ্রিক (আথেনীয়) জাতি ও অতলান্ত মহাদেশীয় জাতি দুটির মধ্যে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সেই যুগে

এশেলের ভারত-ইউরোপীয় জাতি গ্রিকেরা বীরের মতো লড়াই ক'রে স্বাধীনতা রক্ষা করে। তার পরও অতলান্ত মহাদেশীয়রা বার বার আক্রমণ করতে থাকে। প্রায় সমস্ত ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা তাদের দখলে এসে গিয়েছিল। কেবল এথেন্স স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে চলতে সমর্থ হয়। ঐ প্রচণ্ড যুদ্ধের পর গ্রিকরা কত দিন স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারত, বলা কঠিন। কিন্তু তার পরই এক প্রলয়প্লাবন সুরু হয়। তাতে আটলান্টিস মহাদেশ আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যায়। অন্যান্য সব দেশ ভেসে যায়। প্লাতোনের হিসেবে সেই মহাপ্লাবনের পরে এখন থেকে এগারো হাজার বছরেরও বেশি আগে এথেন্‌স্ নগরের পুনঃপত্তন হয়। সোলন আবির্ভূত হবার ৯০০০ বছর আগে এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ সমাধা হয়। তাঁর ৮০০০ বছর আগে মিশরে নীল নদের অববাহিকায় সাইস নামক ক্ষুদ্র রাজ্যে সাইস নগরের পত্তন হয়। প্লেটোর মতে, প্রাচীন মিশরীয়রা এশীয় জাতি ছিল; এক মিশরীয় পুরোহিত সোলনকে আটলান্টিসের কাহিনী শোনায়; সে নিজেকে এশীয় এবং গ্রিকদের জাতি ব'লেই জানিয়েছিল।

দুটি সময় পাওয়া যাচ্ছে: সোলনের ৯ হাজার বছর আগে গ্রিক-অতলান্তী যুদ্ধ হয়, মহাপ্লাবন হয়, তার পর নতুন এথেন্‌স্ নগরের পত্তন হয়। আর, সোলনের ৮ হাজার বছর আগে এশিয়া থেকে গ্রিকদের জাতি এক জাতি গিয়ে আলেক্‌সান্দ্রিআর কাছে সাইস বা সিকে রাজ্য স্থাপন করে। এরা নিশ্চয়ই ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোক ছিল। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ১০।১২ হাজার বছর আগেও ভারত-ইউরোপীয় ভাষাব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর লোক-চলাচল বা গণ-অভিপ্রয়াণ অব্যাহত ছিল।

সোলন তথা ক্রিতিআস তথা প্লাতোন্-বর্ণিত মিশরীয় পুরোহিতের মতে, সোলনের নয় হাজার বছর আগে যে মহাপ্লাবন হয়, তা তৃতীয় বা শেষ মহাপ্লাবন; সে রকম দুটি বড় মহাপ্লাবন আরো আগে হয়েছিল। ছোট ছোট প্লাবন তো হয়েছেই অসংখ্যবার। প্লেটোর মতে, শেষ মহাপ্লাবনের আগেও এথেন্‌সে হেলেনীয় জাতি বাস করত। তিনি আত্তিকা এবং প্লাবন পূর্ববর্তী এথেন্‌সের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। ঐ প্লাবনের ঠিক তারিখ হচ্ছে রোম নগর স্থাপনার ঠিক ৯০০০ বছর আগে। সোলন আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের লোক আর রোমের প্রতিষ্ঠাবৎসর হচ্ছে ৭৫২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব ৯৭৫২ সালে মহা-প্লাবন হয় আর প্রায় ৯৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব সালে প্লাবন পরবর্তী এথেন্‌স্ নগরের পুনঃস্থাপনা হয়।

বেদের প্রথম উদ্ভব ঐ মহাপ্রলয়ের অব্যবহিত আগে; বিস্ময়ের বিষয়, প্লেটোও গ্রিকদের রাজধানীর প্রথম পত্তন সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন।

মীন রাশি আকাশে সুমেরু পর্বত বা তিএন্‌শান্ পর্বতমালা থেকে একটা বিশিষ্ট অবস্থানে যখন দেখা যাচ্ছিল, তখন বেদ উদ্ধার লাভ করে। অর্থাৎ প্রলয়-কালে বৈদিক বা বেদ জাতির লোকরা জলে ভেসে যাচ্ছিল, বলাই বাহুল্য তাদের লিখিত বা অ-লিখিত শাস্ত্রসমেত; আকাশে মীন রাশির উদয়ের সময়ে তারা রক্ষা পায়। মীন অবতারের অর্থ, আকাশে মীন রাশির নক্ষত্রপুঞ্জের বিশিষ্ট অবস্থান।

মীন, কূর্ম এবং বরাহ—তিনটি অবতার প্রলয়-কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিদ্যানিধির মতে, আকাশে বরাহের উদয় ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব সালে। তখন অবশ্য বেদের কোন বিভাগ হয় নি, অবিভক্ত বেদ প্রচলিত ছিল। বরাহ অবতারের সময়ে পৃথিবীতে অর্থাৎ ভারতে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের প্রাধান্য ছিল এবং পাতালে দৈত্যরাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। এই পাতাল সিন্ধু-সরস্বতী অথবা টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস মোহনার নিকটবর্তী রাজ্য—খুব সম্ভবত মহেঞ্জোদড়ো বা তার সন্নিহিত এলাকা। ভারতে প্রথম বৈদিক যজ্ঞ ৮ম।৯ম সহস্রক খ্রীষ্টপূর্ব সালের; আর, প্লেটো-বর্ণিত মহাপ্লাবন ১০ম সহস্রক খ্রীষ্টপূর্বাব্দের।

মহাপ্লাবনের পর জলরাশি স'রে গেলে মূল ভারত-হিত্তি আদি জাতির বিভিন্ন শাখা তাদের আদি বাসস্থান থেকে উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে, দক্ষিণ-পশ্চিমে, দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে প্রায় দশম সহস্রক খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ। ভারত-ইউরোপীয় বা আদি আর্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির পুরাণে এই মত সমর্থিত হয় প্লাতোন্ বা প্লেটোর রচনাও একই সাক্ষ্য দেয়। ভৌগোলিক ভারতে আদি বৈদিক জাতি প্রবেশ করে নবম সহস্রক খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এ-সিদ্ধান্ত জ্যোতির্বিদ্যাগত প্রমাণে স্বীকৃত

নয়। মহাপ্লাবনের আগেও ভারত-ইউরোপীয় জাতির গ্রিক শাখা অভিপ্রয়াণের দ্বারা আত্তিকা বা ভূমধ্যসাগর-তীরে উপস্থিত ছিল। প্রায় ৮৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারত-ইউরোপীয়েরা মিশরে উপনিবেশ স্থাপন করে।

আদিম আর্যরা ৭৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব সাল নাগাদ সপ্ত দ্বীপেই রাজত্ব করতেন, এ-বিষয়ে পুরাণ সমূহ এবং বিভিন্ন মনীষীর রচনা পাঠের পর কোন সংশয় পোষণ করা চলে না। রুশ ও চৈনিক তুর্কিস্থান, সমগ্র উত্তরাপথ, ইরানভূমি, ককেশাস অঞ্চল, ইরাক, এশিয়া মাইনর সমেত তুরস্ক, লেভাঁ এবং নীলনদের তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় আর্যদের প্রভুত্ব মহাপ্লাবনের পরেই প্রসার লাভ করে। হয় তো প্লাবনের আগেই তারা গ্রিস ছাড়াও ইউরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে যেতে থাকে। তবে সেখানে তাদের আধিপত্য স্থাপিত হয় আটলান্টিস ধ্বংসের পরে। সেমীয় নরগোষ্ঠীর বিশেষ ক'রে অসুরদের অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত আর্যদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

মিশরে ভারতীয় আর্যভাষী জাতির উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মশাই লিখেছেন :—

"প্রাচীন মিশর মহামানবের মিলন-ক্ষেত্র। কত দেশের কত বিভিন্ন জাতি আসিয়া যে এদেশে বাস করিয়াছিলেন, সে কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে-দেশের সভ্যতা সাত আট হাজার বৎসর পূর্বে সুপ্রতিষ্ঠ ছিল, সে-দেশের লোক কোথা হইতে প্রথমত এদেশে আসিয়া বাস করে, এদেশের আদি অধিবাসী কোন্ দেশের কোন্ জাতি, সে-কথা বলা কিন্তু নিতান্ত সহজ নহে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতবর্ষের এক রাজা মিশর দেশ জয় করিয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন সে রাজার নাম দেবনহুষ।" (মিশর।)

ভূপ্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে আটলান্টিস মহাদেশ ডুবে যাওয়ায় সেখানকার বিচিত্র অজানা সভ্যতার মোটামুটি বিলুপ্তি ঘটে। সেখানকার পলাতক রক্ষাপ্রাপ্ত উদ্বাস্তু জাতি বা জাতিরা বহু আয়াসে আমেরিকা ও আফ্রিকায় সভ্যতার পুনঃস্থাপন করে। আমেরিকার লাল মানুষ, আশিয়ার তুরানীয় বা মঙ্গোলীয় এবং আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলের হামীয় জাতির লোকেরা সম্ভবত তাদের বংশধর। বাস্কদের সম্বন্ধেও অনেকে এই রকম অনুমান করেন।

ইউরোপে বাস্ক্ জাতি ছাড়া একদা সমৃদ্ধ অধুনালুপ্ত মুকেনাই সভ্যতাও আটলান্টিসের উদ্বাস্তুদের দ্বারা গঠিত হয়ে থাকবে। বিখ্যাত ক্রিটদ্বীপীয় সভ্যতা ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা রচিত হয় নি। অনেকে এমন অনুমানও করেন যে, ঐ মুকেনাই বা ক্রিট দ্বীপের সভ্যতাকেই প্লেটো ভুল করে আটলান্টিসের সভ্যতা নামে উল্লেখ করেছিলেন। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা প্রায় দশ হাজার বছর আগে মিশর বা ইজিপ্ট বা এগুপ্ত্ বা অগুপ্ত দেশবাসী ভারতীয় আর্যজাতি এবং আটলাস পর্বত থেকে লিবিয়ার মরুভূমি পার-হয়ে-আসা আটলান্টিসের উদ্বাস্তু ক্রো-ম্যাগ্নন বা ক্রোম'ঞ মানুষদের মিশ্রণে গড়ে ওঠে। বহু মিশ্রণে গঠিত মিশরীয় জাতির সঙ্গে আখেনাটনের সময়েও ভারতীয় আর্য সভ্যতা ও জাতির যোগাযোগ ছিল। তবে, বৈদিক আর্যরা বর্ণসঙ্করের অত্যন্ত বিরোধী হওয়ায় পরে ভারতের আর্যদের সঙ্গে মিশরের লোকদের বিশেষ মাখামাখি ছিল না।

মাইকেল রিডলি (Michael Ridley) লিখিত The Seal of Aetea and the Minoan Scripts গ্রন্থে দেখা যায়, পশ্চিম বঙ্গের অজয় নদের অববাহিকায় বর্ধমান জেলায় পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত আইতেআ-প্রত্নলেখগুলি প্রমাণ করে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ক্রিটসভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রিডলির নিজের ভাষায় :—

This seal together writh Minoan Type vase, terra Cotta boat and other finds from Pandu Rajar Dhibi to a strong link between India and Crete during the middle of the second millenium B. C."

"এই নামমুদ্রা মিনোআন ধরনের অলঙ্কৃত পাত্র, পোড়ামাটির নৌকা এবং অন্যান্য পাণ্ডুরাজার ঢিবি-লব্ধ আবিষ্কার সমষ্টিসমেত দেখিয়ে দেয় যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি সময়ে ভারত এবং ক্রিটের মধ্যে সুদৃঢ় সংযোগ ছিল।"

এই সব প্রমাণ নিঃসংশয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, আজ

থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে পশ্চিম বঙ্গেও শক্তিশালী সভ্যতা বর্তমান ছিল যার সঙ্গে বাইরের অতি বিখ্যাত সভ্যতার আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ছিল। পশ্চিম-বঙ্গের ঐ সভ্যতা আর্য সভ্যতা হয়ে থাকলে ভারতে আর্যপ্রবেশ মাত্র খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের, এই মত অতি অশ্রদ্ধেয় ব'লে পরিগণিত হবে। বরং রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদির সাক্ষ্যই সত্য যে, ঐ সময়ে বাংলা দেশে আর্য ভাষা ও সভ্যতা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলা দেশে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও ভোট-চীন—যত বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর শোণিত-মিশ্রণ সাধিত হয়ে থাক না কেন, আজ যে সকলেই বাংলাভাষী, এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, বহুদিন ধরে এখানে আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিপুল আধিপত্য করে এসেছে, যা সমস্ত উপাদানের দ্বারা অঙ্গীকৃত হয়েছে।

"এশিয়া খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব" প্রবন্ধে. সুনীতিকুমারও ভারত-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠির অপেক্ষাকৃত বেশি প্রাচীনতা স্বীকার ক'রে লিখেছেন:—

"এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে আদি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেরা বাস করিত। ইহাদের একটি দল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২২০০র দিকে উত্তর পশ্চিম ইরানে প্রথম দেখা দেয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ এর দিকে আর্যগণ উত্তর ইরাকে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। ইহাদের হিত্তি বা কনীসীয় শাখায় জাতিগণ এশিয়া মাইনরে একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতিরূপে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ এর দিক হইতে আর্য ভাষায় শব্দ ও নাম অসুর বাবিলদের ভাষায় উৎকীর্ণ লেখ-মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। মিতান্নি, কাশি, হারুরি বা আরুর—আর্য? নামক এই সব আর্য বংশ ক্রমে নিজেদের আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া যায় ও স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া নিজ পৃথক্ জাতিসত্তা হারাইয়া ফেলে। ধীরে ধীরে এই ব্যাপার ঘটে।"

নোআর কাহিনী অবশ্যই ইহুদি জাতি কর্তৃক বৈদিক আর্যের জলপ্লাবনের কাহিনী থেকে গৃহীত। ইহুদিরা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন জাতি; তারা যে-সেমীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত, সেই সেমীয়ভাষী আদি জাতি মহাপ্লাবনের পর দশম সহস্রক খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথমে পাতালে বাস করত। পরে এদের অসুর শাখা আজের বাইজান বা অসুরিয়ার বাসা বাঁধে। তিগ্রিস ইউফ্রাতেস নদী-যুগলের মোহানার নিকটবর্তী ভূমিই পাতাল বা নিম্নভূমি বা Lowland।

পুরালোকতাত্ত্বিকদেরও মতে, অতলান্তদেশীয় সভ্যতার বিলোপের পরই ভারত ইউরোপীয় সভ্যতার উদ্ভব ও প্রসার।

[ক্রমশঃ
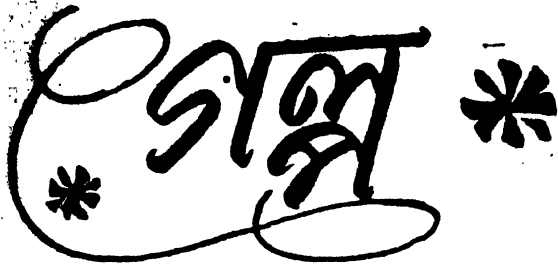
আকাশ প্রদীপ

অরুণ দে

আতঙ্কে শিউরে উঠল নন্দিতা। তার ছোটভাই রথীন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

ডাঃ নীলাদ্রি বোস নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "বিপদে ধৈর্য হারাতে নেই। যা সত্যি আমি তাই বলেছি।" ডাঃ বোস এইমাত্র যে ভয়ঙ্কর সত্যকথাটা উচ্চারণ করেছে তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না নন্দিতা। যার সম্বন্ধে ডাঃ বোস তার শেষ রায় দিলেন তার ঘরের দিকে তাকাল নন্দিতা। দেখল তার বাবা মিহিরবাবু শক্ত মুঠিতে ঘরের জানালার দিকে দুটো ধরে হিংস্র দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘরের দরজা বন্ধ না থাকলে হয় তো তিনি এখনই বেড়িয়ে আসতেন। ডাঃ বোস আবার বলল, "দেরী করলে বিপদ বেড়ে যাবে। মিহিরবাবুকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন উন্মাদ আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। ঠিকমত চিকিৎসা হলে হয়ত সেরে যাবেন। প্রথম ষ্টেজ, এখনও ভাল হবার আশা আছে।"

ডাঃ বোস চলে গেলেন। রথীন ছুটে এসে তার দিদি নন্দিতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ডাক্তারবাবু কি বললেন? বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছেন—সত্যি?"

'স—ত্যি'—কথাট কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারল। না নন্দিতা। নীরবে সে কিছুক্ষণ মাথানীচু করে থাকল তারপর মুখ তুলে আবার তার বাবার দিকে তাকাল।

মিহিরবাবু আগের মত জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

নিজেকে বড় অসহায় মনে হল নন্দিতার—। কি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন। মা সেই কোন্ কালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। রথীন তখন পাঁচ বছরের ছেলে। নন্দিতার বা তখন এমন কি বয়স। ক্লাশ পরে স্কুলে যেত। মা-র মৃত্যুর পর সংসারের তরী যেন হঠাৎ ডুবে যাবার উপক্রম হল। শক্ত মুঠিতে বাবা সংসারের হাল ধরলেন। অনেক কষ্টের স্রোত—অনেক দারিদ্র্যের ঝড় পেরিয়ে তারা এগিয়ে চলল। আজ বাবার কোথা থেকে এমন সর্বনাশ হল কে জানে।...

"জোচ্চোর সব জোচ্চোর—সবাই মুখোস পরা শয়তান"—ঘরের ভেতর হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন মিহিরবাবু। কি একটা জিনিষ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার শব্দ এল তার ঘর থেকে।

ঘরের জানালার কাছে এগিয়ে গেল নন্দিতা। তাকে দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন মিহিরবাবু। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, "ঐ ডাক্তারটা কেন এসেছিল? কি চায় ঐ শয়তানটা?"

"কি আবার চাইবেন? উনি তো তোমার অনেক দিনের পরিচিত। এমনি বেড়াতে এসেছিলেন।" বলল নন্দিতা।

"ইডিয়ট", চীৎকার করলেন মিহিরবাবু, "আমি সব বুঝি। ঐ ডাক্তার আমাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে তোমায় একা পেয়ে গ্রাস করতে চায়। ও একটা শ-য়-তা-ন।"

"—কি যে বল। ডাক্তারবাবু খুব ভাল লোক।"

—"ভাল? কে?...কে আমাকে ডাকছে?...অমন করে, কে কাঁদছে? শুনতে পাচ্ছিস নন্দিতা? কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! শুনতে পাচ্ছিস? ঐ আবার আমায় ডাকছে। একি তুই কেন কাঁদছিস নন্দিতা—আমি তো তোকে কিছু বলি নাই।"

—"তুমি চুপ করে বিছানায় শুয়ে পড় বাবা! তোমার শরীর বোধ হয় ভাল নেই!"

—"শুয়ে থাকব? বেশ-যাই! যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে..."

নন্দিতা জানালার কাছ থেকে সরে এসে দেখল রথীন মাটির উপর বসে পড়েছে। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। পরিষ্কার আকাশে যেন হঠাৎ মেঘ থম থম করছে। এত

যে দুষ্টু ছেলে রথীন সেও যেন আকস্মিক দুঃসংবাদের—আঘাতে নিথর নিস্পন্দ।

ওর দিকে এগিয়ে এল নন্দিতা। বলল, "কি হল? এমন মুখ কাল করে বসে আছিস কেন? অসুখ কি কারো হয় না। উন্মাদ আশ্রমে থাকলে বাবা দুদিনেই ভাল হয়ে যাবেন।"

তবু রথীনের দিক থেকে কোন উত্তর এল না। নন্দিতা আবার বলল, "ওঠ রথীন, তোর স্কুলের দেরী হয়ে যাবে। যা, স্নান করে আয়। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।"

'আমি আজ স্কুলে যাব না দিদি,' বলল রথীন। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল নন্দিতা। যে দুষ্টু ছেলেটা এক মূহুর্ত বাড়ী থাকতে চায় না সারাদিন মাঠে খেলে বেড়ায় তার মুখে আজ একি কথা!

"বাবাকে কি আজই উন্মাদ আশ্রমে পাঠান হবে? আমরা কি করে একা থাকব?"—প্রশ্ন করল রথীন।

"কেন ভয় কিসের? আমি আছি"—কথাটা বলতে গিয়ে নন্দিতার গলা কেঁপে উঠল। কি করে বাবাকে ছেড়ে সে একা থাকবে তা ভেবে নন্দিতা নিজেই আতঙ্কিত হল। কি করেই বা সংসারের খরচ চলবে তাও সে ভেবে পেল না। এর পর নিশ্চয়ই মিহিরবাবুর চাকরী থাকবে না, তখন কোথা থেকে খরচের টাকা আসবে তাও সে ভেবে পেল না। তবু ছোট ভাইকে সাহস দিয়ে সে বলল "আমি থাকতে তুই কেন ভাবছিস? এখন ওঠ তোর স্কুলের যে সত্যি দেরী হয়ে গেল।"

রথীনকে স্কুলে পাঠিয়ে নন্দিতা ডাক্তারের বাড়ী গেল। ডাঃ বোস নন্দিতাকে দেখে বলল, "এই যে, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। আমি এই মাত্র উন্মাদ আশ্রমে ফোন করেছিলাম। আগামীকাল সন্ধ্যায় মিহির-বাবুকে ওখানে রেখে আসতে হবে।" নন্দিতা বলল, "বাড়ীতে চিকিৎসার কি কোন ব্যবস্থা করা যায় না?"

—"না।"

—"কিন্তু—"

—"বেশ তবে অন্য ডাক্তার দেখাও। কিন্তু মনে রেখ চিকিৎসায় দেরী হয়ে গেলে মিহিরবাবু জন্মেও ভাল হবেন না। তুমি কি চাও উনি চিরকালের জন্য পাগল হয়ে যান?"

নন্দিতা ছল ছল চোখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ডাঃ বোস আবার বলল, "ওনাকে পাগলাগারদে ফেলে রেখে আসতে তোমার থেকে আমার কম কষ্ট হবে না নন্দিতা! কিন্তু আমি ডাক্তার, আমাদের সেন্টিমেন্টাল হলে চলে না।"

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় মিহিরবাবুকে উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি করে দিয়ে বাড়ী ফিরে এল নন্দিতা। বাবার ফেলে যাওয়া বিছানার উপর সে আছড়ে পড়ল। মনে হল তার ভবিষ্যৎ জীবন যেন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দৈত্যের মত তাকে গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছে। নিজেকে তার বড় অসহায় মনে হল। এই পঁচিশ বছরের জীবনে এমন কঠোর আঘাত এর আগে সে কোনদিন পায় নি। জীবনের বাস্তব দিকটার সঙ্গে কোন পরিচয়ই তার হয় নি। নিজের জন্য নিজে ভাবে নি কোনদিন। বাবার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল! হঠাৎ কে যেন তাকে গৃহকোণের স্নিগ্ধছায়া থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঊষর মরুভূমির বুকে। এবার একাই তাকে পথ চলতে হবে।

• • •

সুখের থেকে দুঃখ অল্পস্থায়ী। দুঃখ শত তিক্ততা নিয়েই আসুক, মানুষ স্বভাব ধর্মেই তাকে ভুলে যায়। তার তীব্রতা দিনে দিনে ম্লান হয়ে যায়। সুখের স্মৃতিগুলি মানুষ দুঃখের দিন থেকে অনেক বেশী মনে রাখে। দুঃখ যখন আসে তখন মনে হয় সেই বুঝি জীবনের একমাত্র নিষ্ঠুর সত্য। বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন হয়ে ওঠে। তারপর সময়ের স্রোত বয়ে যায়—কাল হরণ করে সেই দুঃখ। নতুন করে আবার বাঁচার চেষ্টা করে মানুষ।

মিহিরবাবুকে পাগলা গারদে রেখে আসার পর নন্দিতার জীবনও দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। অসহ্য যন্ত্রনায় সে ছটফট করেছে কিছুকাল। তারপর ধীরে ধীরে সেই দুঃখের তীব্রতা ম্লান হয়ে এল। ছোটভাই রথীনকে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা বোর্ডিং-এ থেকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করল সে। তারপর নিজের চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠাতে লাগল। বি, এ পাশ করেছিল সে। বাঁচতে হলে একটা জীবিকার প্রয়োজন।

ঘরে একা বসে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল

নন্দিতা, এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। এই অসময়ে কে এল? হয়ত বাড়ীওয়ালার সেই বখাটে ছেলেটা হবে। মিহিরবাবু উন্মাদ আশ্রমে চলে যাওয়ার পর থেকেই ছেলেটা নন্দিতার পেছনে লেগেছে।

যখন তখন তাকে দেখলে অসভ্যের মত চেয়ে থাকে, শিস দেয় কিংবা গান ধরে—

"থৈ থৈ করে রূপের বন্যা পরাণ রাখা দায়

কুচ বরণ কন্যা তোমার আগুন লাগছে গায়।"

উঠে পড়ল নন্দিতা। ছেলেটাকে কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে দিতে হবে। আর সহ্য করা যায় না। দরকার হলে পুলিশের ভয় দেখাবো।

দরজা খুলে বিস্মিত হল নন্দিতা। বাড়ীওয়ালার ছেলে নয়, ডাঃ নীলাদ্রি বোস দাঁড়িয়ে আছেন।

"কেমন আছেন?"—প্রশ্ন করল নীলাদ্রি।

"বেঁচে আছি।" বলল নন্দিতা।

"মিহিরবাবুর কোন খবর পেলেন?"

"হ্যাঁ। বছর খানেকের আগে ভাল হবার আশা নেই।"

"তাই নাকি?"

"ভেতরে আসবেন না?"

"—আজ থাক। আপনি একা। তাছাড়া একটা কাজে বেরিয়েছি। এপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই একবার খোঁজ নিয়ে গেলাম।

"—ও!"

"—একটা কথা বলব!"

"বলুন!"

"—শুনেছি বহরমপুরে আপনার নাকি এক আত্মীয় থাকেন সেখানে চলে যান। একা এ বাড়ীতে কুমারী মেয়ের থাকার হয়ত অসুবিধে হবে। তা ছাড়া নিজেরও তো একটা খরচ আছে। টাকার দরকার।"

"জানি। চাকরী খুঁজছি।"

"তাহলে নার্সিং শিখে ফেলুন। আমার একজন এসিষ্টেন্ট দরকার।"

"মাপ করবেন।"

"ও। চলি।"

চলে গেল নীলাদ্রি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন ভাবল নন্দিতা। তারপর ঘরে ঢুকে নিজের কাজে মন দিল। পরদিন চাকরীর ব্যাপারে একটা ইণ্টারভিউ দেবার জন্য চিঠি পেল নন্দিতা। আনন্দে তার মন নেচে উঠল। এ যেন ইণ্টারভিউ লেটার নয়, বাঁচবার ছাড় পত্র। একজন বড় ব্যবসায়ীর সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করতে হবে।

মাইনে মন্দ নয়। ব্যবসায়ীর বাড়ীতেই খাওয়া থাকার ব্যবস্থা থাকবে। চাকরী আর নিশ্চিন্ত আশ্রয় দুটো যেন একসঙ্গে পেয়ে গেছে এমনভাবে সে চিঠিটা বুকে চেপে ধরল। পরক্ষণেই তার ভয় হল হয়ত সে চাকরীদাতার মনোনীত হবে না। এর আগেও সে দু-একটা ইণ্টারভিউ দিয়েছে কিন্তু চাকরী হয় নি। বি, এ, পাশ করা ছাড়া চাকুরী পাবার আর কোন গুণ তো তার নেই। গুণ না থাক, রূপ? আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল নন্দিতা। রূপের দিক থেকেও বিধাতা তাকে কার্পণ্য করেছেন। লম্বাটে গড়ন, নারী সুলভ কোমলতার বদলে কেমন যেন পুরুষালি কঠোরতা। রঙটা খুব কালো না হলেও ফর্সা নয়। কিন্তু তার চাকরীর যে বড় প্রয়োজন। ভগবান কি মুখ তুলে তাকাবেন না? অতবড় ব্যবসায়ী গরীবের উপর দয়া করবে না?

নন্দিতার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। তার ঘরের জানালার কাছে কে যেন গান ধরেছে—

"পরাণ বন্ধু কই গো আমার, কোথায় গেলে পাই—

চাতক যেমন বারি যাচে, আমি তারে চাই।"

নিশ্চয়ই সেই বাড়ীওয়ালার ছেলেটা। নন্দিতা জানালাটা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গেল। তাকে দেখে একগাল হেসে ছেলেটা হাত তুলে বলল, "এই যে নমস্কার।"

"জানোয়ার।" বলে ধপাস করে জানালা বন্ধ করে দিল নন্দিতা। ছেলেটা তবু চীৎকার করে বলল. "জানোয়ারই ভাল। পোষ মানে। মানুষের মত ঘরে বৌ রেখে সুযোগ পেলে অন্য মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে না। বুঝলেন?"

অসহ্য! নিজের কাণে আঙ্গুল দিয়ে বসে রইল নন্দিতা। কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল ছেলেটা আপন মনে গজ গজ করতে করতে চলে গেল। উঠে দাঁড়াল নন্দিতা। ভাবল ইণ্টারভিউ এর নির্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা না করে আজই

সে নিজে গিয়ে সেই ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করবে। আর দেরী নয়। এর আগে নির্দিষ্ট দিনে কয়েক জায়গায় ইণ্ট র-ভিউ দিয়ে দেখেছে যে কোন ফল হয় নি। এবার একটু বাঁকা পথে যাবে। আগে থেকে তদ্বির করবে।

বেরিয়ে পড়ল নন্দিতা। যেতে যেতে পথে আর একবার ইণ্টারভিউ লেটারের ঠিকানাটা পড়ল। জ্যোতির্ময় এণ্ড কোং, মায়ানগর, কলিকাতা –৩০।

পথচলার অভ্যাস নেই নন্দিতার। অনেক কষ্টে মায়ানগর খুঁজে বের করল।

রিক্সা করে এসে নামল "জ্যোতির্ময় এণ্ড কোং"-এর দরজায়। একটা বিরাট কারখানা। তার পাশে ছোট একটা সাজান বাড়ী। ভীরু পদক্ষেপে কারখানার ভেতরে ঢুকল নন্দিতা।

"কা'কে চান?"—কে একজন প্রশ্ন করল।

"জ্যো—জ্যোতির্ময়বাবু আছেন?" থতমত খেয়ে বলল নন্দিতা।

"জ্যোতির্ময়বাবু! তিনি তো অনেকদিন মারা গেছেন। এখন তার ছেলে নির্মলবাবুই মালিক।"

—"ও—মানে—নির্মলবাবুর সঙ্গেই দেখা করতে চাই।"

—"ঐ ঘরটায় বসুন। খোঁজ দিচ্ছি। এই স্লিপটা ভর্তি করুন। নাম, ঠিকানা ইত্যাদি লিখুন।"

স্লিপটা লিখে ফেরৎ দিল নন্দিতা। লোকটা সেটা পরীক্ষা করে বলল, "কি উদ্দেশ্যে দেখা করতে চান সেটা লিখতে হবে।"

—"উদ্দেশ্য! মানে—ব্যক্তিগত···।"

—"বেশ—তাই বলব।"

চলে গেল লোকটা। ভয়ে গলা শুকিয়ে এল নন্দিতার। কি জানি এতবড় কোম্পানির মালিক কি মনে করবে! সে কাঠ হয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে লোকটা ফিরে এল। বলল, "চলুন।"

খোদ মালিকের কামরার কাছে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল লোকটা।

ভীরু পায়ে ঘরে ঢুকল নন্দিতা। একজন মাঝবয়েসী লোক বড় টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি সব কাগজপত্র দেখছে। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নিজের কাজেই মগ্ন। নন্দিতার দিকে চোখ তুলেও দেখল না। সাহস সঞ্চয় করে নন্দিতা বলল, "আপনি কি নির্মলবাবু?"

"হ্যাঁ—কি চান?"—তাকাল লোকটা।

সংক্ষেপে নিজের আসবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল নন্দিতা।

নির্মল রুক্ষস্বরে উত্তর দিল, "আজ কেন এসেছেন? আজ তো ইণ্টারভিউ-এর তারিখ নয়।"

—"না—মানে-আমার বড় বিপদ চাকরীটা না পেলে···"

—"এটা বিপদ-তাড়ন অফিস নয়। ব্যবসাক্ষেত্র।"

—"যদি দয়া না করেন তবে আমি বড় অসহায় অবস্থায়··"

—"আমি কাউকে দয়া করি না। যোগ্যতা দেখে লোক নির্বাচন করি। ব্যবসার সেটাই নিয়ম। বিরক্ত করবেন না। আমার কাজ আছে।"

নির্মল আবার কাগজপত্রে ডুব দিল।

অনেক আশা নিয়ে এসেছিল নন্দিতা। এতটা নিষ্ঠুর ব্যবহার কল্পনাও করে নি। জীবনের বাস্তবতার পথে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা নন্দিতার চোখে জল এল। সজল চোখে সে আবার লোকটার দিকে তাকাল।

মুখ না তুলেই নির্মল বলল, "কি হল? দাঁড়িয়ে রইলেন যে? তোষামদে কোন ফল হবে না।"···নন্দিতার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে কিছুক্ষণ পর মুখ তুলল নির্মল। বিস্মিত হয়ে বলল, "এ কি! কাঁদছেন? এঃ, আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ। যান, ইণ্টারভিউ এর তারিখে আসবেন। বিবেচনা করে দেখব।"

আর দাঁড়াল না নন্দিতা। লজ্জায় অপমানে মালিকের কামরা থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল।

* * *

নন্দিতা ভেবেছিল সে আর কোনদিন "জ্যোতির্ময় এণ্ড কোং" এর দুয়ারে যাবে না। কিন্তু ইণ্টারভিউ এর নির্দিষ্ট দিনে আবার তাকে যেতেই হল। কে যেন তাকে জোর করে পাঠাল এবং তাকেই সেক্রেটারী হিসাবে নির্বাচন করল নির্মল।

চাকুরীর চুক্তি অনুযায়ী নন্দিতা তার সামান্য জিনিষ-

পথ নিয়ে উঠে এল নির্মলের বাড়ী। সুন্দর সাজান বাড়ীতে থাকবার ভাগ্য এর আগে তার কখনও হয় নি। কারখানা সংলগ্ন দোতলা বাড়ী। সামনে ফুলের বাগান। ঘরের আসবাবপত্র মালিকের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের পরিচয় বহন করছে।

নন্দিতার জন্ত একতলায় একটা ঘর নির্দিষ্ট হল। সেখানেই তাকে থাকতে হবে। ঘরের সামনে ছোট একটা বারান্দা। ঘরের জানালায় রঙীন পর্দা টানান। কয়েকটা ফার্নিচার।

ঘরটা পছন্দ হল নন্দিতার। নিজ হাতে ঘরটা গুছিয়ে নিয়ে সে জানালার কাছে এসে বসল। আজ তার বিশ্রামের দিন। পরদিন থেকে অফিসের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

জানালায় বসে নিজের অজানা ভবিষ্যতের দিকে তাকাল নন্দিতা। অফিসের কাজের কোন অভিজ্ঞতা তার নেই। মালিককে খুসী করে চাকরীটা বজায় রাখতে পারবে কি না কে জানে। এ বাড়ীর লোকজন কেমন তাও তার জানা নেই। একটা অজানা আশঙ্কায় নন্দিতার মন ভরে উঠল। কি জানি কি আছে ভাগ্যে।···

দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। "কে?"—দরজার দিকে এগিয়ে গেল নন্দিতা। একজন বৃদ্ধা মহিলা ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "তুমিই বুঝি নতুন এলে?"

"হ্যাঁ।"

"আমি নির্মলের পিসীমা। এই বাড়ীতেই থাকি।"

"বসুন।···আচ্ছা উনি কি খুব রাগী?"

"না তবে খুসী করা শক্ত। বিয়ে না করলে পুরুষ মানুষের মেজাজ ঐরকমই হয়। আগে যে সেক্রেটারী ছিল সে কাজে একটা ভুল করায় এক কথায় তাড়িয়ে দিয়েছিল।"

"ও।"

"যেকথা বলতে এসেছি তা আগে বলে নি। রাতে ঠিক নটার সময় আমরা খেতে বসি। সে সময় তুমি দোতলায় ডাইনিং হলে চলে এস। দেরী হয় না যেন বুঝলে?"

"—আচ্ছা···"

পিসীমার কথাবার্তা থেকে নন্দিতা কয়েকটা সংবাদ পেল। এ বাড়ীর লোকসংখ্যা বেশি নয়। জনকয়েক দাস-দাসী, পিসীমা, নির্মল নিজে আর তার ম্যানেজার মিঃ নন্দী।

রাত্রে খেতে বসে সকলের সঙ্গে পরিচয় হল নন্দিতার। শুধু নির্মলকে সে খাবার ঘরে দেখতে পেল না। শুনল, নির্মলের খাবার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। অনেক রাত পর্যন্ত সে কারখানার কাজে ব্যস্ত থাকে।

* * *

মাস খানেক পর। ঘরের সামনের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসেছিল নন্দিতা। সন্ধ্যা বেলার অস্তগামী সূর্যের দিকে আনমনে তাকিয়েছিল। এমন সময় বাড়ীতে ঢুকলে নির্মল। বারান্দায় তাকে বসে থাকতে দেখে এক মিনিট দাঁড়াল। তারপর হেসে বলল, "আকাশের দিকে তাকিয়ে অমন করে কি দেখছেন? আপনি কবি নাকি?" সলজ্জ বিস্মিত দৃষ্টিতে নির্মলের দিকে তাকাল নন্দিতা। অফিসে যে লোকটা সারাদিন গম্ভীর হয়ে থাকে সে যে এমন করে হাসি মুখে কথা বলতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না। নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে নন্দিতা বলল, "বসুন।"

নির্মল সে চেয়ারে না বসে পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নন্দিতাকে বসতে ইঙ্গিত করল। দুজনে বসল পাশাপাশি। নির্মল বলল, "তারপর, এখানে আপনার কেমন লাগছে বলুন?"

"—ভালই।"

"সত্যি?

"মিথ্যে বলব কেন?"

"তাহলে অমন মুখ গোমরা করে বসে ছিলেন কেন? প্রাণখুলে হাসতে পারেন না?"

"এই—তো—হাসছি।"

"বাড়ীতে আপনার কে আছেন? মা, বাবা—"

"মা নেই। বাবা পাগল হয়ে গেছেন।

"সে কি!"

নন্দিতা নিজের জীবনের সব ঘটনা বলে গেল। সহানুভূতির সঙ্গে সব কথা শুনে নির্মল তাকে নানা ভাষায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। তার কণ্ঠে—একটা অন্তরঙ্গতার সুর বাজল।···

দিন কয়েক পর।

অফিসের পর ঘরে বসে মৃদুস্বরে গুন গুন করে গান গাইছিল নন্দিতা। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে থেমে গেল।

"আসতে পারি?" বাইরে নির্মলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"নিশ্চয়ই।" বলল নন্দিতা।

"বাঃ, আপনার গানের গলা তো বেশ মিষ্টি—"

"আপনি গান ভালবাসেন নাকি?"

"কে যেন একজন কবি নাকি বলেছেন, যে লোক গান ভালবাসে না সে খুন করতে পারে। আমি খুনী নাকি?—"

"আমি কি তাই বলেছি?"

"তবে আরম্ভ করুন, আমি শুনব।"

"ছেলে বেলায় গান শিখেছিলাম, সে এখন আর কাউকে শোনাবার মত নয়।"

"ও সব শুনছি না, ধরুন"

"আজ থাক।"

"থাকলেই হল? সুরু করুন বলছি।"

মনিবের আদেশ শেষ পর্যন্ত অমান্য করতে পারল না নন্দিতা। গান ধরল—

"কে আবার বাজায় বাঁশী—
এ—ভাঙ্গা কুঞ্জবনে…"

গান শেষ হলে নির্মল বলল, "দেখুন, গানে তন্ময় হয়ে যে জন্য এসেছিলাম সেই আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।"

"বলুন।"

"আপনি সেদিন বলেছিলেন যে আপনার বাবাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। চলুন কাল আপনাকে উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে যাব।"

"—কিন্তু ওরা কি আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেবে?"

"আমার জানাশোনা আছে, সে ব্যবস্থা করেছি—না হলে আপনাকে বলব কেন? কালই যাবেন তো?"

"নিশ্চয়ই।"

নন্দিতার চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ল। হাসি মুখে বিদায় নিল নির্মল। কঠোরে কোমলে মেশানো ঐ অদ্ভুত মানুষটার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করল নন্দিতা। একটা অপরিচিত আনন্দে শিহরিত হল তার দেহ। অকারণ পুলকে ভরে উঠল তার মন।

পরদিন নিজের গাড়ীতে করে নির্মল নন্দিতাকে উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে গেল।

নির্দিষ্ট সেলের ভেতর থেকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মিহিরবাবু, তারপর হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। নন্দিতা ভাবল তার বাবা তাকে বুঝি চিনতে পেরেছেন। সে ভেজা গলায় ডাকল, "বাবা"

"কে!"— ঘৃণা পিছিয়ে গেলেন মিহিরবাবু।

"আমি নন্দিতা—তোমার মেয়ে।"

"তোমার সঙ্গে ঐ লোকটি কে? ডাক্তার?"

"না। উনি একজন ব্যবসায়ী।"

আঁৎকে উঠলেন মিহিরবাবু। চোখ পাকিয়ে চীৎকার করে বললেন,

স-র্ব-না-শ। ব্যবসায়ী?"

"কেন? কি হল বাবা?"—

"ওরে, একটা ডাকাতকে তবু বিশ্বাস করা যায় কিন্তু ব্যবসায়ীকে কখনও নয়। ডাকাত তবু খুন করে জিনিষ কেড়ে নেয় কিন্তু ব্যবসায়ী চুপি চুপি তোমার সর্বস্ব লুট করে নেবে কিন্তু তুমি টেরও পাবে না। পালাও—ওর কাছ থেকে পালাও। ওরা সবকিছুতে ভেজাল চালায়। পালাও…"

হঠাৎ থেমে গেলেন মিহিরবাবু। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন,

"আমি ভাল হয়ে গেছি। নাচ শিখেছি, দেখবি?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল নন্দিতা। মিহিরবাবু হঠাৎ পরনের কাপড়টা ফেলে দিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করলেন। নিজের চোখে হাত চাপা দিল নন্দিতা। নির্মল তাকে টেনে সরিয়ে এনে বলল, "চলুন, ফেরা যাক।"

* * *

একদিন নন্দিতা অফিসে এসে দেখল নির্মল আসে নি। প্রতিদিন নির্মল নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই কারখানায় আসে। আজকে তার কি হয়েছে কে জানে!

নিজের কাজে মন দিল নন্দিতা। বেলা যখন প্রায় একটা তখনও নির্মলকে তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে খুঁজে না পেয়ে চিন্তিত হল নন্দিতা। একবার তার মনে হল হয়ত

নির্মল কারখানায় অন্ত কোন বিভাগে কাজ পরিদর্শন করছে। অ জকে তার নিজের অফিস ঘরে ফিরতে দেরী হবে। কিন্তু বেলা তিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন নির্মলের দেখা পেল না তখন আর সে স্থির থাকতে পারল না। ম্যানেজার মিঃ নন্দীকে জিজ্ঞাসা করল, "আজ কি বড় সাহেব আসেন নি ?

"না। কাল রাত থেকে জর হয়েছে তাই ঘরেই আছেন। বোধহয় আজ আর কারখানায় আসবেন না।"

নন্দিতা নির্মলের অসুস্থতার কথা কিছুই জানত না। অফিসের কাগজপত্র গুটিয়ে রেখে সে ছুটল বাড়ীর দিকে। অসুস্থ মানুষটা হয়ত একা ছটফট করছে। তাকে একটা খবর পর্যন্ত দেয় নি!

বাড়ীর দোতলায় নির্মলের ঘরের কাছে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল নন্দিতা। শাড়ীটা ঠিক করে নিল। তারপর নির্মলের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, "ভেতরে আসতে পারি ?"

ঘরে ঢুকে নন্দিতা দেখল নির্মল অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বসে আছে। সে বিরক্তির সঙ্গে বলল, "কি জন্তে এসেছেন ?"

"—শুনলাম আপনার জর হয়েছে—তাই।" বলল নন্দিতা।

"আপনি কি ডাক্তার? জর পরীক্ষা করবেন ? অফিসের কাজ ফেলে এ সময়ে আপনাকে কে আসতে বলেছে ?"

"কেউ বলেনি। আমি ভাবলাম—"

"থামুন, আপনি কি ভাবছেন তা আমি জানি। মিথ্যে দরদ দেখাবেন না, কোন লাভ হবে না। আমার অসুস্থতার জন্য যার আসবার দরকার তাকে খবর পাঠিয়েছি। আপনাকে অফিসের কাজের জন্ত রেখেছি—আমাকে—দেখবার জন্ত নয়।'

"—ও।"

"দাঁড়িয়ে রইলেন যে ?

"আপনার কোন সেবায় আমার কি প্রয়োজন নেই ?

"—না অফিসের কোন কাগজ যদি আমাকে দিয়ে সই করাবার থাকে নিয়ে আসুন।"

"যাচ্ছি।"

"শুনুন।'

"কি ?'

"আপনার আগে যে মেয়েটি আমার সেক্রেটারী ছিল তাকে কেন তাড়িয়ে দিয়েছিলাম জানেন ?"

"না।"

"আমার গাড়ী বাড়ী ঐশ্বর্য দেখে সেই গরীবের মেয়েটার আমার জন্ত হঠাৎ দরদ উথলে উঠেছিল। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার জন্ত হাত বাড়িয়েছিল, তাই বিদায় করে দিয়েছিলাম।"

"ও।"

"যান। অনর্থক দাঁড়িয়ে থাকবেন না। অফিসের কোন দরকারী কাজ আছে কি? কিছু সই করার আছে ?"

"আছে।"

"নিয়ে আসুন।"

ঘরের বাইরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল নন্দিতা। দেখল একজন সুসজ্জিতা রূপসী মহিলা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছেন। মহিলাটি নন্দিতাকে দেখে এ টু দাঁড়াল। বলল, "আপনি ? ও! নতুন সেক্রেটারী বুঝি ?"

"হাঁ।"

"নির্মল কেন আমার আসার জন্ত ফোন করেছে জানেন ?"

"উনি অসুস্থ।"

—মহিলাটি আর কোন কথা না বলে নির্মলের ঘরে ঢুকে গেল। অনেকক্ষণ পর অফিসের কয়েকটা কাগজ হাতে ফিরে এল নন্দিতা। নির্মলের ঘরে যাওয়ার পথে পিসীমার সঙ্গে দেখা হল। পিসীমা বললেন, "কোথায় যাচ্ছ ?"

"এই কাগজটা বড়সাহেবকে দিয়ে সই করাতে হবে।"

"ও ঘরে এখন যেও না, মহুয়া আছে।"

"কে মহুয়া ?"

"মহুয়া মিত্র তুমি চেননা বুঝি ?—নির্মলের পুরাণ বান্ধবী। দু'টিতে খুব ভাব। ওর সঙ্গেই তো নির্মলের বিয়ে হবার কথা।"

"আমাকে উনি কাগজ নিয়ে আসতে বলেছিলেন।"

নির্মলের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল নন্দিতা। ভেতর

থেকে মহুয়া মিত্রের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ভেসে এল "ঐ মেয়েটার বাবা শুধু পাগল নয় ওর নিজের মাথায়ও নিশ্চয়ই ছিট আছে। তা না হলে তোমার ভদ্রতাকে ও তোমার দুর্বলতা কল্পনা করে ভুল করবে কেন? তোমার উদারতাকে কেউ যদি গোপন প্রেম মনে করে তবে সেই বোকা মেয়ের মাথায় নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে।" ঘরে উঁকি দিল নন্দিতা। মহুয়ার কোলে মাথা রেখে নির্মল শুয়ে আছে। মহুয়া তার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে কথা বলছে।

"আসতে পারি?"

"আ-সু-ন।"

নির্মলের সামনে অফিসের কাগজ সই করাবার জন্য খুলে ধরল নন্দিতা। কাগজটা সই করে ফিরিয়ে দিল নির্মল। কেউ কোন কথা বলল না। মহুয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নন্দিতার দিকে। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল নন্দিতা। দরজার বাইরে আসতেই শুনল মহুয়ার কণ্ঠস্বর—"ভেজা বেড়াল।" সঙ্গে কলকণ্ঠে উচ্চহাসি। সে হাসি তীক্ষ্ণ তীরের মত বিদ্ধ হল নন্দিতার হৃদয়ে।

* * *

এ সংসারে সব জিনিস সকলের জন্য নয়। সব আশার মুকুল ফুলে ফলে বিকশিত হয় না, সব অন্ধকার পায় না আলোর স্পর্শ। আলো ভেবে ছুটে গিয়ে দেখা মেলে আলেয়ার, হীরের টুকরো মনে করে কাঁচ তুলে নিয়ে মোহভঙ্গ হয়। নন্দিতারও বুঝি সেরকমই কিছু হয়েছিল!

রাত্রির উজ্জ্বল তারাকে ভোরের আকাশে যেমন দ্যুতিহীন নিষ্প্রাণ মনে হয় নন্দিতাকেও দিনকয়েক তেমনই মনে হল। যন্ত্রের মত সে তার নিত্যকর্ম করে যেতে লাগল। কিন্তু ক্লান্তি আর এক দুর্বোধ শূন্যতায় তার হৃদয় ভরে উঠল।

মহুয়া কয়েকদিন এ বাড়ীতে থেকে গেল।

দূর থেকে নন্দিতা শুনতে পেল নির্মল আর মহুয়ার আনন্দ কলরব। আর সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস বার বার তাকে মনে করিয়ে দিল যে তার প্রতি নির্মল যে মধুর ব্যবহার কিছুকাল করেছিল তা স্নেহ নয়, প্রীতি নয়—শুধু দয়া; শুধু অনুকম্পা, শুধু নিষ্ঠুর উদারতা।

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে বসেছিল নন্দিতা। হঠাৎ মহুয়া প্রবেশ করল। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নন্দিতা বলল, "আপনি?"

মহুয়া বলল, "এমনি এলাম। নির্মলের সঙ্গে সিনেমা দেখে ফিরলাম, হঠাৎ কি খেয়াল হল ভাবলাম আপনার ঘরটা দেখে যাই।"

—"ও। বসুন।"

—"বেশ সুন্দর ঘর সাজিয়েছেন তো, যেন এটা আপনার নিজেরই ঘর। কেউ যে দুদিন আপনাকে শুধু থাকতে দিয়েছে তা দেখে মনে হয় না।"

চুপ করে শোনে নন্দিতা।

—"আচ্ছা, এর আগে কোথায় ছিলেন? আপনাদের নিজের বাড়ী ছিল?"

"—না, ভাড়াটে বাড়ীতে থাকতাম।"

—"ভাড়াটে বাড়ী? কোথায়? বস্তিতে?"

—"না, ভদ্রপাড়াতেই। কিন্তু আপনি যে এখনও বসলেন না? বসুন।"

—"বসবার কি উপায় আছে? সেদিন আপনার কথা তুলতে নির্মল আমায় বলল যার তার সঙ্গে পরিচয় করে কি লাভ?"

—"তা বটে।"

—"চলি।"

ঐশ্বর্য আর রূপের ঢেউ তুলে মহুয়া চলে গেল।

মেয়েরা প্রয়োজন হলে জীবনের সব দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে কিন্তু ভালবাসার ক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাদের পক্ষে একেবারে অসহ্য। এমন কি সে প্রতিদ্বন্দ্বিনী যদি কোন কল্পিতা নারীও হয় তবু তাকে মেয়েরা দুচোখের বিষ মনে করে।

মহুয়া যাওয়ার পর ক্লান্ত পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল নন্দিতা। আনমনে সামনের সরু লালপথের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল নির্মল সেই পথ দিয়ে বাড়ীর দিকেই আসছে। তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে চলে যাবার চেষ্টা করছিল নন্দিতা কিন্তু ততক্ষণে নির্মল কাছে এসে গেছে। সে বলল, "আপনি যে এত নিষ্ঠুর তা কল্পনাও করতে পারি নি। অসুস্থ মানুষটা কেমন আছে—বাঁচল কি মরল—তা একবার খোঁজও নিলেন না।"

একথার কোন উত্তর দিতে পারল না নন্দিতা, শুধু তার দু'চোখ জলে ভরে এল। কিছুক্ষণ পর নির্মল আবার বলল, "আমি পর, আমার খোঁজ না হয় না রাখলেন কিন্তু অফিসের নতুন খবর শুনেছেন তো ?"

—"কি ?"—বলল নন্দিতা।

—"আমাদের বিজনেস প্রায় চারগুণ বাড়ছে। ভারতবর্ষের কয়েকজায়গায় ব্রাঞ্চ খোলা হবে। খুব উন্নতির আশা করছি। আপনি আমার পর ভাগ্য ফিরছে। আপনার দয়া আছে বলতে হবে।"

—'আমার দয়া ? কি যে বলেন।"

—'জানেন, ছেলেবেলা থেকে আমার স্বপ্ন ছিল আমি টাটা-বিড়লার মত বড় বিজনেস্‌ম্যান্‌ হব। এবার সুযোগ প্রায় হাতের মুঠোয়।"

—"সুযোগ ? হঠাৎ কি করে সুযোগ পেলেন ?"

—"ভাগ্য, সবই ভাগ্য। রাজত্ব আর রাজকন্যা একই সঙ্গে পাচ্ছি। মহুয়ার বাবার যে বিরাট কয়লার খনি আছে তা তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ে মহুয়ার স্বামীকেই যৌতুক হিসাবে দেবেন। এসব আমার সৌভাগ্য কিনা বলুন।"

—"সৌভাগ্য বৈ কি।"

—"ভাবছি এবার আপনারও একটা প্রমোশন দিয়ে দেব।"

—"আমাকে দয়া করে কি হবে।"

—"দেখুন, আপনার প্রমোশন হওয়া মহুয়ার খুব ইচ্ছা। সে বলেছে আপনাকে প্রমোশন দিয়ে এলাহাবাদের ব্রাঞ্চ অফিসে পাঠিয়ে দিতে।'

—"আমি প্রমোশন চাই না।"

—"চান না ?"

—"না।"

—"তবে কি চান ?"

কোথা থেকে ছুটে এল মহুয়া। নির্মলের হাত ধরে আদুরে গলায় বলল, "তুমি যেন কি। আমি সেই থেকে তোমার জন্য উপরে বসে আছি আর তুমি এখানে বাজে সময় নষ্ট করছ। চ-ল।

নির্মলকে নিয়ে গেল মহুয়া। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নন্দিতা। একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল।

অফিসের পর একা নিজের ঘরে বসেছিল নন্দিতা। কিছুক্ষণ পর দেখল নির্মলের পিসীমা তার দিকে এগিয়ে আসছেন।

পিসীমা বললেন, "কি হয়েছে নন্দিতা ? তোমার মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

পিসীমা বললেন, "তোমাকে একটা খবর দিতে এলাম। আজ দুপুরে তুমি যখন অফিসে গিয়েছিলে তখন তোমার খোঁজে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন।"

—"আমার খোঁজে ? কে ?'

—তিনি বললেন তুমি যে বাড়ীতে আগে থাকতে তিনি সে বাড়ীর মালিকের ছেলে। তোমার ভাই এর কাছ থেকে কি একটা চিঠি নাকি ও বাড়ীতে এসেছে। তুমি একদিন গিয়ে চিঠিটা নিয়ে এস।

—"আর কিছু বলেন নি ? আমার ভাই ভাল আছে তো ?"

—"তা জানি না। ভদ্রলোক বললেন চিঠিটা জরুরী। ও বাড়ীতে যাওয়া তোমার দরকার।

ছোটভাই রথীনের কচি মুখটা মনে পড়ল নন্দিতার। কতকাল তার সঙ্গে দেখা হয় নি। না জানি বোর্ডিংএ কত কষ্টেই সে আছে! কি জন্যে সে চিঠিটা লিখেছে কে জানে। হয়ত তার কোন অসুখ…হয়ত সে—আর ভাবতে পারল না নন্দিতা, পুরান বাসস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সেখানে যখন পৌছল তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

বাড়ীওয়ালার ছেলে চিত্ত নিজের ঘরেই ছিল। সে জানত ভাই এর খবর পেয়ে নন্দিতা না এসে পারবে না।

নন্দিতাকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, "মহারাণীর আসতে আজ্ঞা হোক।" তার বলার ভঙ্গী দেখে নন্দিতা হেসে ফেলে বলল, "থাক, অত অভ্যর্থনার আমি যোগ্য নই। আমার চিঠিটা দিন।"

"—চিঠি ? হ্যাঁ চিঠি তো দেবই। কিন্তু তার আগে একটু বোসো। দুটো সুখ দুঃখের কথা কই। কতকাল পরে এলে।

"রাত হয়ে যাবে, চিঠিটা দিন। রথীন ভাল আছে তো ?"

—"আলবৎ। খারাপ থাকার ছেলেই সে নয়।"

বলে না। নন্দিতা যুক্তি দিয়ে অনেকবার নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে এই স্বাভাবিক। বোঝাতে চেয়েছে যে—সে এ বাড়ীর মালিকের একজন কর্মচারী মাত্র, আর কিছু নয়, আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু হৃদয় তো যুক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থ নয়, অবুঝ হৃদয় বার বার অভিমানে অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। বলে, কই আগে তো এত উপেক্ষা ছিল না। নন্দিতা নামে বোকা মেয়েটার সুখদুঃখের প্রতি এত ঔদাসিন্য আগে তো কখনও দেখিনি। যেখানে সোনার সুতায় মিলনের মালা রচিত হয় সেখানে শুধু ভাবে ভরা হৃদয়ের মূল্য কতটুকু ?

একদিন মহুয়ার দুই বন্ধু এ বাড়ীতে এল। নন্দিতা দেখল দূর থেকে তার দিকে নির্দেশ করে সেই দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। ওদের মধ্যে একজন হো হো করে হেসে উঠল।

নন্দিতা এবার ওদের মুখোমুখি তাকাল। ওরা নীরবে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। নন্দিতা বারান্দা থেকে ঘরে চলে এল। দরজা বন্ধ করতেই আবার সেই হাসি শুনতে পেল। ওরা বুঝি নন্দিতাকেই উপহাস করছে!

সে রাত্রে নন্দিতার কি হল কে জানে। একটা দৃঢ় সংকল্পে সে যেন নতুন করে জেগে উঠল। সে স্থির করল সে আর এমন চুপ করে বসে থাকবে না। নির্মলের কাছে করবে আত্মসমর্পণ, জানাবে কি দুঃসহ জ্বালায় সে পুড়ে মরছে, বলবে সে অর্থ চায় না, বিলাসের উপকরণে তার লোভ নেই, শুধু চায় নিজের হৃদয়ের স্বীকৃতি। চায় নিঃস্বার্থ ভালবাসা, প্রিয়জনকে আপন করে নেবার অধিকার। সে নির্মলের কেউ না—এ চিন্তা দুঃসহ।

নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে নন্দিতা নির্মলের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। রাত তখন প্রায় দশটা। শীতের রাত্রি। খাওয়া দাওয়া শেষ করে যে যার ঘরে বিশ্রাম করছে। নির্মল বিছানায় শুয়ে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। নন্দিতাকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসল। নন্দিতা কি এক আবেগের তাড়নায় ছুটে এসেছিল তার হৃদয় উন্মুক্ত করতে কিন্তু নির্মলের মুখোমুখি এসেই থমকে দাঁড়াল, কি বলবে ভেবে পেল না। নির্মল হেসে বলল, "আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। আমি নিজেই আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম।"

"কেন?" বলল নন্দিতা।

"আপনার জন্য একটা সুখবর আছে।"

"সুখবর?"

"হ্যাঁ, দাঁড়ান দেখাচ্ছি," বলে নির্মল তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কাগজ বের করল। তারপর একটু থেমে আবার বলল, "আমি এটা নিয়ে নিজেই আপনার ঘরে সকালে যাব ভেবেছিলাম! সুখবরের জন্য আমাকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু।"

কাগজ হাতে নিয়ে নন্দিতা বলল, "এটা কি?"

"আপনার প্রমোশনের অর্ডার" হাসল নির্মল।

"প্রমোশন?"

"হ্যাঁ, আপনার পদোন্নতির জন্য আপনি প্রায় একশ টাকা মাইনে বেশী পাবেন।"

—"আর কিছু পাব না?"

—"পাবেন বৈকি। নতুন পদের সঙ্গে আপনার বদলীও হল। এবার থেকে এলাহাবাদে আমাদের ব্রাঞ্চ অফিসে আপনি কাজ করবেন। সেখানে নিজস্ব ঘর, ফার্নিচার, একটা গাড়ী সব কিছুই পাবেন। এখান থেকে অনেক বেশী সুখে থাকবেন। খুসী তো?"

—"হ্যাঁ।"

নন্দিতা যা বলবে বলে এসেছিল তার একটা শব্দও উচ্চারণ করা হল না। কম্পিত হস্তে সে সেই প্রমোশনের অর্ডারটা ধরল। কামড়ে ধরল নিজের নীচের ঠোঁটটা তারপর ছুটে চলে এল একতলায় নিজের ঘরে।

পরদিন ঘুম থেকে কেউ ওঠবার আগেই এ বাড়ী থেকে নন্দিতা বেরিয়ে পড়ল, যাত্রা করল নিজের ভাই রথীনের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে বসিরহাটে।

* * *

আনন্দে দিদিকে বুকে জড়িয়ে ধরল রথীন। সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। ছেলেবেলায় রথীন মাকে হারিয়েছে, নন্দিতাই তাকে মায়ের মত মানুষ করেছে। প্রায় দুবছর পরে ভাইবোনের দেখা হল।

"ইস্, তুমি কত রোগা হয়ে গেছ দিদি" রথীন বলল।

"তোরও যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। কত

বড় হয়ে গেছিস! ওমা একি! তোর যে গোঁফ উঠেছে"—হাসল নন্দিতা।

"জান দিদি, ভেবেছিলাম কলকাতায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। তোমার জন্য কত কি কিনেছি দেখবে?" বলে রথীন একটা বাক্স থেকে কয়েকটা শাড়ী বের করল।

আরও কি সব বার করতে যাচ্ছিল রথীন।

নন্দিতা বলল, "তুই এত টাকা কোথায় পেলি?"

রথীন উত্তর করল, "বা রে, আমি যে ব্যবসা করি। আমি সেই ছোট্ট রথী আছি নাকি? এই দেখ ডালমুট, তুমি খেতে খুব ভালবাসতে তাই কিনেছিলাম। নাও, মুঠো খোল।"

হাত পাতল নন্দিতা। এ তো শুধু ডালমুট নয়, এ যে মুঠো ভরা স্নেহ আর মমতা।

"বাবা কেমন আছেন জান?" প্রশ্ন করল রথীন।

"ভাল নেই।"—কাঁদ কাঁদ মুখে বলল নন্দিতা।

"ভাল একদিন হবেই সেজন্য তুমি দুঃখ কোর না।"

"না প্রথম দিকে কষ্ট হত এখন সয়ে গেছে।"

"জান দিদি, দুঃখটা এমন পাজী জিনিষ যে তুমি যদি তাকে ভয় পাও তবে সে তোমার ঘাড়ে চেপে আরও কষ্ট দেবে, আর যদি হেসে উড়িয়ে দাও তবে সে নিজেই ভয়ে পালাবে।"

"তুই এত কথা কোথা থেকে শিখলি?"

"বড় হয়েছি যে! যাই একবার বাজার থেকে ঘুরে আসি। তুমি মুখ হাত ধুয়ে নাও।"

লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল রথীন।

রথীনের ঘরের দিকে এবার ভাল করে তাকাল নন্দিতা। ছোট একটা আলমারী, একটা খাট, কয়েকটা চেয়ার, মাঝখানে টেবিল ইত্যাদি নানা জিনিষে ঘরটা সাজান রয়েছে। দুটো ঘর ভাড়া নিয়েছে রথীন। পাশের ঘরটায় তালাচাবি দেওয়া। ওঘরে নাকি রথীনের ব্যবসার মালপত্র থাকে।

সব দেখে নন্দিতা আনন্দিত হল। তার মনে হল রথীন মোটামুটি ভাল উপার্জন করে, সুখেই আছে। একা থাকলেও ঘরটা বেশ সুন্দর করে সাজিয়েছে।

রাত্রে খাওয়ার পর ভাইবোনে অনেকক্ষণ গল্প করল। একবার নন্দিতা বলল, "পড়াশুনা ছেড়ে দিলি কেন?"

রথীন বলল, "জানই তো দিদি বই মুখস্ত করতে কোনকালেই আমার ভাল লাগত না। ব্যবসায় একটা লাইন পেয়ে গেলাম—বেশ আছি।"

—"কিসের ব্যবসা করিস?"

—"সে অনেক কিছু, তুমি বুঝবে না।"

—"তবু শুনি।"

—"আর একদিন বলব। জান দিদি, আমি কিন্তু তোমাকে আর চাকরী করতে দেব না। আমি যা টাকা পাই তাতে দুজনের বেশ চলে যাবে।"

"দূর পাগল, আমি চিরকাল তোর ঘাড়ে বসে খাব নাকি?"

—"বা রে—তাতে কি হয়েছে। তুমি যে আমার দিদি।"

—"তুই এখন যা লম্বা হয়েছিস, দেখলে মনে হয় আমি ছোট বোন আর তুই আমার দাদা।"

—"তাহলে তুমি আর আমায় ছোটবেলার মত বকবে না তো?"

—"না।"

—"তাহলে আমার কথা শোন। চাকরীটা ছেড়ে দাও।... এই দেখ, গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ কেন? বেশ না ছাড়বে তো একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও—খুব লম্বা ছুটি। আমি কাগজ কলম নিয়ে আসি।"

কাগজ কলমের সঙ্গে একটা বই নিয়ে এল রথীন। তারপর সেই বই থেকে অনুকরণ করে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে দিদিকে বলল, "নাও সই কর। আমি কাল সকালে চিঠিটা পাঠিয়ে দেব।"

নন্দিতা কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। সে চাকরীটা রেখেও আসে নি, ছেড়েও আসে নি। হঠাৎ চলে এসেছে।

...রথীন আবার বলল, "নাও সই কর। চুপ করে বসে রইলে যে? জান দিদি, ভাইকে পর ভাবতে বোনের কখনও দ্বিধা হয় না। অথচ সংসারে খোঁজ নিয়ে দেখ ভাই ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, মামলা পর্যন্ত করে কিন্তু বোনের সঙ্গে কখনও নয়। সই কর না

—"তবে ?"

—" সব বলছি, বান্দা তোমার সেবার জন্ত হাজির। তুমি চলে যাওয়ার পর আমার বুকের মধ্যে যে কি হাহাকার, কি যন্ত্রণা, কি জালা—

—"থামুন।"

"থামব ? এবুকের জালা যদি বুঝতে বুলবুলি আমার। কি দাগা যে দিয়েছ ! তুমি চলে গেলে যেন আমার—

—"কি হয়েছে আপনার ? আমি গেছি তো আপনার কি ?"

—"আমার কি ? হায়—সে কথা যদি জানতে শোন তবে গানের সুরে বলি—

"পরাণের পাখী আমার পরাণ লইয়া গেলা
পাষাণে বান্ধিয়া বুক থাকলাম একেলা।"

—"এই সব শোনাবার জন্য কি আমায় ডেকেছেন ?"

—"রাগ কর কেন—শোনই না—

"সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমর পাগল।"

কি করবে ভেবে পেল না নন্দিতা। সে রথীনের খবর পাওয়ার আশায় এসেছিল কিন্তু এখন তার সন্দেহ হল লোকটা মিথ্যা বলে তাকে ডাকিয়েছে।

নিজের বাসস্থানে ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে দরজার দিকে এগিয়ে গেল নন্দিতা। চিত্ত গান থামিয়ে চীৎকার করে বলল,

"আরে একি! কোথায় চললে ? রথীনের চিঠিটা নিয়ে যাও।" নন্দিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "মিথ্যে কথা বলে আমায় আটকাবেন না।"

—"মিথ্যে কথা ? আচ্ছা দাঁড়াও দেখাচ্ছি" বলে চিত্ত তার পকেট থেকে সত্যি একটা চিঠি বার করল। চিঠিটা প্রায় কেড়ে নিল নন্দিতা। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় এসে চিঠিটা খুলল নন্দিতা। রথীন লিখেছে—

দিদি,

আমি নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছি। একবার এখানে এসো, দেখে যাও। বাবার খবর কিছু জান কি ?

পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু তাতে ঠকি নি, জীবনের ধারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে।...তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে। তুমি ছাড়া আমার আপনজন পৃথিবীতে কেউ নেই। ছোটভাইকে এমন করে দূরে পাঠিয়ে তুমি কি করে সুখে আছ ? একবার এসো। বেশি দেরি করলে আমার সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না। তুমি কেমন আছ ? তোমার জন্য খুব ভাবনা হয় ;......

ইতি
রথীন

চিঠিটায় সব কথা ভাল করে বুঝল না নন্দিতা তবু আনন্দে তার বুক ভরে উঠল। চিঠিটার মধ্যে যে নতুন ঠিকানা লেখা আছে তা বার বার পড়ল নন্দিতা। সে ভেবে পেল না বোর্ডিং থেকে এই নতুন ঠিকানায় কেমন করে গেল রথীন। পড়াশুনা ছেড়ে ছেলেটা এখন কি করছে তাও সে ঠিকমত বুঝতে পারল না। রথীনকে দেখার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করল।

রথীনের কথা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফেরার জন্য ট্রাম ধরার উদ্দেশ্যে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল নন্দিতা। হঠাৎ পেছনে জোরে গাড়ীর হর্ণ বাজতে শুনে চমকে উঠে পিছনে তাকাল। দেখল, গাড়ীর চালকের আসনে নির্মল বসে আছে।

"কোথায় যাবেন ? উঠে আসুন", বলে গাড়ীর দরজাটা খুলে ধরল নির্মল।

"বাড়ী যাচ্ছি। আমি ট্রামে যেতে পারব।" বলল নন্দিতা।

"উঠুন, কি ভাবছেন, গাড়ীর ভেতরে ঢুকুন"—হাসল নির্মল।

আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ীতে উঠল নন্দিতা। নির্মলের পাশের আসনে বসল। গাড়ী ষ্টার্ট দিল নির্মল।

গাড়ীটা কিছুদূর এগোবার পর নন্দিতা বলল, "এ কি ? কোথায় চললেন ? এ তো বাড়ীর পথ নয়।"

—"এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে কি করবেন ? চলুন, একটু ঘুরে আসি।"

—"বেড়াবেন যদি তবে মহুয়াদেবীকে সঙ্গে নিলেই পারতেন।"

—"আজ সন্ধ্যায় সে তার বাবার কাছে ফিরে গেছে।"

গাড়ীটা একটা নির্জন পথ ধরল।

নির্মল ধীরে ধীরে গাড়ী চালাচ্ছিল। পথের দুপাশে

গাছের সারি। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

নির্মল বলল, "একটা কথা বলব ?"

নন্দিতা তাকাল—"কি ?"

—"আজকাল আমাকে এমন এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ান কেন ?"

—"কই, না তো।"

—"হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পারি আপনি দূরে সরে থাকার চেষ্টা করেন।"

—"আপনি ত তাই চান।"

—"কি করে বুঝলেন ?"

নন্দিতা কোন উত্তর দিতে পারল না। তার বুক থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল।

"কি হল ?" নির্মল তার মুখের দিকে একবার দেখল।

"কিছু না।"—উত্তর দিল নন্দিতা।

গাড়ীটা আরও কিছুদূর এগোবার পর নির্মল হঠাৎ প্রশ্ন করল,

"মহুয়াকে আপনার কেমন লাগে ?

"ভাল"—ছোট করে জবাব দিল নন্দিতা।

"শুধু ভাল ?"

"সে ধনী, সে বুদ্ধিমতী, সে রূপসী…"

"কিন্তু আপনার মত নরম সুন্দর মন তার নেই।"

"কিন্তু সে তো আপনার মনের মত।"

"দেখুন, জীবনটা ভাববিলাসের ক্ষেত্র নয়। বাস্তব জীবনে পুরুষের সে পথেই চলা উচিত যে পথে তার ভবিষ্যতের উন্নতির আশা আছে। নয় কি ? আপনি কি বলেন!"

"আমার রূপ নেই, ঐশ্বর্য নেই—কিছু বলার কোন অধিকার আমার আছে কি ? গাড়ী ফেরান, বাসায় যাব।"

"আর একটু বেড়াই, বেশ লাগছে।"

নন্দিতা চুপ করে বসে রইল। তার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করল নির্মল। কিন্তু নন্দিতা সংক্ষেপে হ্যাঁ বা না ছাড়া বিশেষ কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পর নির্মল বাড়ীর দিকে গাড়ী ফেরাল। বাড়ীর কাছে এসে নির্মল আবার বলল, "মাস তিনেক পর আমাদের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে—জানেন তো ?"

নন্দিতা বলল, "জানি। সেদিন আমি আপনার বাড়ীতে থাকতে পারব না।"

—"কেন ?"

—"এমনি।"

—"সে কি কখনও হয়! আপনাকে থাকতেই হবে।"

নন্দিতা কোন উত্তর দিল না। গাড়ী থেকে নেমে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল।

* * *

জীবনে প্রেম আসে অত্যন্ত চুপিসাড়ে। তার নিঃশব্দ পদক্ষেপ প্রথমে শুনতে পাওয়া যায় না। নন্দিতার ক্ষেত্রেও বোধ হয় তাই হয়েছিল। নির্মলকে ঘিরে যে নিবিড় মমত্ববোধ তার হৃদয়ে বিকশিত হচ্ছিল তা সে বুঝতে পারেনি প্রথমে। এর পরিণতির কথা সেদিন সে ভাবেনি। পিসীমা একবার তাকে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে ফল হয় নি। বাধা পেলে হৃদয়ের স্রোত আরো ফুঁসে ওঠে, আরো দুর্বার হয়। বাধা পেলে সমাজের নীতিশাস্ত্র জগতের সুখসুবিধা কোনটাই প্রেম পরোয়া করে না। কিন্তু দূর থেকে শুধু বুক ভরে ভালবাসলেই তো প্রিয়জনকে পাওয়া যায় না। এ সংসারে যে দাবী জানাতে জানে, যে কেড়ে নিতে পারে সেই পায় আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। কিন্তু নন্দিতার মধ্যে সেই দাবী জানাবার শক্তিরই ছিল একান্ত অভাব।

বাড়ীতে বিয়ের আয়োজন চলতে লাগল। নন্দিতা দেখল নববধূর জন্য এল কত অলঙ্কার, কত রঙ বেরঙের শাড়ী, কত তৈজসপত্র। সমস্ত বাড়ীটা নতুন করে সাজান হল। ঘরের প্রতিটা জিনিষ ঝকঝকে করে পরিষ্কার করা হল। বাড়ীর দেওয়ালে লাগল নতুন রঙ। একে একে এল আত্মীয় স্বজনের দল। নন্দিতার মনে হল এই উৎসব মুখরিত বাড়ীতে একমাত্র সেই উপেক্ষিত। তাকে একটা পুরাণ আসবাব-পত্রের মত যেন বাড়ীর এককোণে ঠাঁই দিয়ে যে যার কাজে মগ্ন হয়ে রয়েছে। নির্মলের উপেক্ষাই সবচেয়ে বেশী করে নন্দিতার বুকে বাজল। সে নিতান্ত প্রয়োজনে আফিসের কাজের বাইরে আর কোন কথাই

আমি যখন গরীব ছিলাম কে আমায় দেখত? আজ সবাই আমাকে তোষামোদ করে।"

"এই লোক-ঠকান ব্যবসা করার জন্য তুই লেখাপড়া ছেড়েছিস? এসব জানার আগে আমার মরণ হল না?"

"জান দিদি, আমি ইচ্ছে করে লেখাপড়া ছাড়িনি। হঠাৎ অসুখ হওয়ায় কয়েকমাস স্কুলের মাইনে বাকী পড়েছিল। তোমার পাঠান টাকা অসুখে খরচ হয়ে গিয়েছিল। মাইনে না দিতে পারায় স্কুল থেকে আমার নাম কেটে দিয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আবেদন করলাম, বললাম আমি সত্যি গরীব, আমার বাবা পাগল আমাকে দয়া করুন, কিন্তু শুনল না, গরীবের কথায় কেউ কান দিল না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল।"

"তারপর?"

"তারপর কিছুদিন চাকরী খুঁজলাম। কিন্তু কোথায় চাকরী পাব। বড়লোকের মামা কাকা কেউ নেই যে ব্যাকিংএ চাকরী হবে। না খেয়ে দিনকয়েক পড়ে রইলাম।"

"আমাকে জানালি না কেন?"

"লজ্জায়। তোমার অবস্থা তখন তো ভাল নয়, তা ছাড়া আত্মসম্মানে বাধল। ভাবলাম বড় হয়েছি যেমন করে পারি নিজের পেট নিজে চালাব। এমন সময় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল চিত্তদার সঙ্গে। তিনি কি একটা যাত্রা পার্টির সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। তিনিই লাইনটা বাতলে দিলেন। বললেন, কলকাতায় চাল ডালের বড় অভাব। এখানের গ্রাম থেকে চাল সংগ্রহ করে কলকাতায় নিয়ে যেতে লাগলাম। ভাগ্য ফিরে গেল। চিত্তদার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

"কে চিত্তদা?"

"সেই যে আমাদের বাড়ীওয়ালার ছেলে। মদ খায়, যাত্রাদলে গান গায় কিন্তু লোকটার মনটা ভাল।"

"আমি না খেয়ে মাথাকুটে মরব রথীন কিন্তু তোর দেওয়া ভাত মুখে তুলতে পারব না। তোকে জেলে নিয়ে গেলে আমার বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকুও যে হারিয়ে যাবে রথীন! তোকে যে পুলিশে ধরবে।"

"কি যে বল দিদি।"

"শোন্ রথীন।"

"পরে শুনব। এখন বড্ড খিদে পেয়েছে দিদি। আমি স্নান করতে চললাম তুমি ভাত বাড়।"

একটা গামছা টেনে নিয়ে রথীন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একা ঘরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল নন্দিতা। সে রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম এল না নন্দিতার। রথীনের জন্য দুশ্চিন্তায় তার মন ভরে উঠল।

নিজের জীবনের দিকে তাকাল সে। রথীনকে ঘিরে একটু আলোর রেখা যেন দেখা দিচ্ছিল তা আবার ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাঁচতে হলে চাই অবলম্বন, চাই বেঁচে থাকার অর্থ। নন্দিতার কাছে তার সমস্ত জীবনটা একটা অন্ধকারময় প্রহেলিকার মত মনে হল। বেঁচে থাকার কোন অর্থ সে খুঁজে পেল না। ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তা সে নিজেই জানত না। স্বপ্নে দেখল সে যেন একটা মরুভূমির মধ্য দিয়ে আলেয়ার আলো দেখে দিশাহারা হয়ে ছুটছে। তার পেছনে তাকে ধরার জন্য ছুটছে নির্মল। কিন্তু নির্মল তাকে ধরতে পারছে না। বার বার নাম ধরে ডাকছে নির্মল। আর সেই ডাক শূন্য মরুভূমির বিরাট প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হঠাৎ দেখল সে ছুটতে ছুটতে পড়ে গেল। নির্মল তাকে হাত ধরে তুলে বুকে টেনে নিয়ে বলল, "আমাকে একা ফেলে এমন করে কেন চলে এলে নন্দিতা।" নন্দিতা কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল হঠাৎ মাথার উপর আকাশ বিরাট গর্জন করে ভেঙে পড়ল। ...ঘুম ভেঙে গেল নন্দিতার। বিছানায় উঠে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইল। তারপর তার খেয়াল হল অনেক বেলা হয়েছে। জানলা দিয়ে ঘরে রোদ এসে পড়েছে। ঘরের চারিদিকে তাকাল নন্দিতা রথীনকে কোথাও দেখতে পেল না ঘড়িটা দেখল আটটা বেজে গেছে। ইস এত বেলা হয়ে গেছে। কিন্তু রথীন কোথায় গেল? রথীনের নাম ধরে বার কয়েক ডাকল নন্দিতা কিন্তু কোন উত্তর এল না। সকাল সাতটার মধ্যে রথীন চা জলখাবার খেয়ে কাজে বেরিয়ে যায়। রোজ খুব ভোরে উঠে এতদিন নন্দিতা তার খাওয়ার ব্যবস্থা করত। আজ তার উঠতে দেরী দেখে সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে। দিদি ঘুমুচ্ছে দেখে তাকে ডাকে নি।

এত দেরী করে ঘুম থেকে ওঠার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল নন্দিতা। ঘরের কাজ কর্ম সেরে রথীনের ফেরার পথ চেয়ে বসে রইল। দুপুর পেরিয়ে বিকেল গড়িয়ে এল। তবু রথীন ফিরল না। সন্ধ্যা যখন হয় হয় তখন নানা আশংকায় অস্থির হয়ে উঠল নন্দিতা। ভাবল রথীন নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এখান থেকে কলকাতায় চাল নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ সে কথা জানে নন্দিতা। এতক্ষণে রথীন হয়ত জেলের গারদে। আর ঘরে বসে থাকতে পারল না নন্দিতা। ঘর বন্ধ করে থানার উদ্দেশ্যে বেরল। থানায় দেখা হল সেই পুলিশের সঙ্গে যে একবার রথীনের ঘরে এসেছিল। সে বলল, "না, রথীন এ থানায় নেই। হয়ত কলকাতার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। সেখানে খোঁজ নিন।"

অতবড় কলকাতা শহরে কোথায় রথীনের খোঁজ নেবে কিছুই ভেবে পেল না নন্দিতা। একবার তার মনে হল সে ঘর থেকে অনেকক্ষণ বেরিয়েছে হয়ত এতক্ষণে রথীন ঘরে ফিরে তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

কথাটা মনে হতেই বাড়ী ফিরে গেল নন্দিতা। দেখল দরজায় সে যেমন তালাবন্ধ করে গিয়েছিল তেমনই তালা ঝুলছে। আশেপাশের লোকজনকে সে রথীনের কথা জিজ্ঞাসা করল। কেউ কোন খোঁজ দিতে পারল না।

নন্দিতার আর সন্দেহ রইল না যে রথীন চালসমেত পুলিশের হাতে কলকাতায় ধরা পড়েছে। সে কলকাতার একটা টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসল। রাত্রি তখন প্রায় আটটা।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে দিশেহারা হয়ে নানাস্থানে তাইকে খুঁজে বেড়াল নন্দিতা। কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ পেল না।

হঠাৎ তার খেয়াল হল রাত অনেক হয়েছে। রাস্তার একটা ঘড়িতে দেখল, দশটা বাজে। পথে যেতে যেতে একবার তার মনে হল যে তাদের পুরাণ বাড়ীওয়ালার ছেলে চিত্ত হয়ত রথীনের খোঁজ দিতে পারবে। রথীন একবার বলেছিল যে সে কলকাতায় এলে চিত্তদার সঙ্গে দেখা করে যায়। কথাটা মনে হতেই নন্দিতা তার পুরাণ বাসস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

চিত্তর ঘরের কাছে এসে উঁকি দিল নন্দিতা। ঘর খালি, কেউ নেই দরজা খোলা। সে ভাবল, হয়ত চিত্ত কাছেই কোথাও গেছে, এখনই ফিরবে। ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

কিছুক্ষণ পর চিত্তকে বারান্দায় দেখা গেল। তার পা টলছে, ধীরে ধীরে গান করতে করতে সে ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। গানটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—

পিরিতবি বাবলা-কাঁটা
বিঁধল বুকেতে
কাঁদে আমার প্রাণ পাখী হায়,
এ কোন্ সুখেতে।..."

নন্দিতাকে দেখে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল চিত্ত। তারপর বলল, "কে এ-এ? প্রাণেশ্বরী নন্দিতা? এ যে একেবারে বাঘের গর্তে রাত করে ঢুকে পড়েছ সুন্দরী। কি চাই?"

চিত্তর মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নন্দিতা।

"চিত্তদা" বলে হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল নন্দিতা।

চিত্ত বলল, "এই মরেছে। আবার কাঁদতে লাগল কেন?"

নন্দিতা সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সব বলে গেল। জিজ্ঞাসা করল রথীনের কোন খবর চিত্ত জানে কিনা।

চিত্ত একগাল হেসে বলল, "সে ছোঁড়া এতক্ষণে লুচিমণ্ডা গিলছে আর তুমি ভেবে মরছ।"

"তার মানে?" বলল নন্দিতা।

"মানে? বুঝলে কিনা, আজ সকালে এক বিয়ে বাড়ীতে রথীন চাল সাপ্লাই দিয়েছে। সে বাড়ীতে ওর নেমন্তন্ন। বিরাট বড়লোকের বাড়ী। আমার সঙ্গে রথীনের দেখা হয়েছিল। সে বলেছে লুচিমণ্ডা গিলে তবে রাত্রে বাড়ী ফিরবে।"

"সত্যি?"

"আমি ইয়ার্কি করছি নাকি? সে ওস্তাদ ছেলে— বহাল তবিয়তে আছে। এই রেশনের বাজারে নেমন্তন্ন কেউ ছাড়ে?"

"কাদের বাড়ী বিয়ে?"

"মিত্তির সাহেবের বাড়ী। কলকাতার নামকরা বড়

দিদি—দেখি হাতটা…"

যন্ত্র চালিতের মত সই করল নন্দিতা। দরখাস্তটা পকেটে রেখে রথীন বলল, "লিখে দিলাম তোমার ভয়ানক অসুখ। অন্তত ছয় মাস ছুটি চাই।"

* * *

মাসখানেক ভালই কাটল নন্দিতার। নতুন পরিবেশে এসে রথীনকে কেন্দ্র করে সে যেন বেঁচে থাকার নতুন আস্বাদ পেল। রথীন ভোর বেলায় বেরিয়ে যায়। কয়েকটা থলি ভর্তি করে সে কি যেন নিয়ে যায়। ফেরে দুপুরে। আবার খেয়ে দেয়ে বিকেলে ট্রেনে করে মালপত্র নিয়ে কলকাতায় যায়। অনেক রাত্রি করে বাড়ী ফেরে। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে রথীন, আর রাত্রে দু'পকেট ভর্তি করে টাকা নিয়ে ফেরে। নন্দিতা তাকে এত পরিশ্রম করতে কয়েকবার নিষেধ করেছে। কিন্তু রথীন শোনে না। হেসে বলে, "এ সুযোগ হারালে ব্যবসার ক্ষতি হবে। টাকা পকেটে এলে পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলে মনেই হয় না।"…

মাঝে মাঝে নিজের চাকরী জীবনের কথা মনে পড়ে নন্দিতার। একদিন রাত্রে সে স্বপ্ন দেখল তার যেন সত্যি খুব অসুখ হয়েছে আর সে সংবাদ পেয়ে নির্মল কলকাতা থেকে ছুটে এসেছে। তাকে নিয়ে যাবার জন্ম পীড়াপীড়ি করছে কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাইছে না। সে বলছে, "আমি তো আপনার কেউ নই। আমি মরে গেলে আপনার ক্ষতি কি?" নির্মল যেন বলল, "সে আপনি বুঝবেন না। উঠুন। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।"

নির্মল যেন তার হাত ধরে টানছে। সেই টানেই হঠাৎ যেন নন্দিতার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় চোখ খুলে দেখল রথীন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, "ওঠ, শিগগীর ওঠ দিদি। সাইরেন বাজছে। শুনতে পাচ্ছ না? ওঠ।"

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল নন্দিতা। একটানা সাইরেন বেজে চলেছে!

"কি ব্যাপার বল তো—সত্যি সাইরেন?"

"—সত্যি নয় তো কি? তুমি কিছুই খোঁজ রাখ না দেখছি। ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানে যুদ্ধ লেগেছে। ওদিকে চীন হুমকি দিচ্ছে।"

—"যুদ্ধের কথা শুনি বটে কিন্তু—"

—"আর দেরী নয় দিদি, এখনই একটা নিরাপদ জায়গায় যাওয়া দরকার।"

নন্দিতা তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর ভাইবোনে বাড়ীর সিঁড়ির নীচে একটা মোটা দেওয়ালের পাশে আশ্রয় নিল।

আকাশে বোমারু বিমানের গর্জন শোনা গেল।

নন্দিতা বলল—"এ সর্বনেশে যুদ্ধ কতকাল চলবে?"

রথীন বলল, "যতদিন চলে ততদিনই ভাল।"

"তার মানে?"

"জান দিদি, আমাদের মত ব্যবসায়ীর কাছে এ যুদ্ধ হল আশীর্বাদ। হু হু করে জিনিসের দাম বাড়ছে—এই তো সুযোগ।"

"কি যে বলিস! কোন অন্যায় কিছু করছিস না তো?"

"এই যুদ্ধের বাজারে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই।"

"খুব যে বড় বড় কথা শিখেছিস। আচ্ছা রথীন, চারদিকে এত অভাব অনটন—শুনতে পাই সব জিনিষের দাম সাধারণ লোকের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সব সত্যি?"

—"হ্যাঁ দিদি, দু'বেলা দুমুঠো ভাত পর্যন্ত লোকে পাচ্ছে না।" বাজারে চাল তেল সব উধাও হয়েছে।"

—"তবে তুই এত চাল পাচ্ছিস কোথা থেকে?"

—"আমার কথা আলাদা। ও সব তুমি বুঝবে না। শোন অলক্লিয়ার সাইরেন বাজছে। যাক, আজ তাহলে বোম্বিং হল না।"

ভাইবোন আবার নিজেদের ঘরে ফিরে এল। রথীন কিছুক্ষণ পর নিজের কাজে চলে গেল।

সেদিন দুপুর বেলা রান্নার শেষে স্নান করে নন্দিতা রথীনের জন্ম অপেক্ষা করছিল। রোজই রথীন ফিরলে ভাইবোন একসঙ্গে খেতে বসে। রথীনকে আগে খাওয়াবার চেষ্টা করলে সে কিছুতেই রাজী হয় না। দিদিকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে। বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে অথচ রথীন এখনও ফিরছে না দেখে চিন্তিত হল নন্দিতা। অন্য কোনদিন তো রথীন এত দেরী করে ফেরে না। রোজই সকালে সে কলকাতায় যায়। ব্যবসার কাজ কর্ম

শেষ করে ফেরে প্রায় ছুটোর সময়। কিন্তু আজ তার কি হল? ঘড়ি দেখল নন্দিতা, প্রায় চারটা। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না নন্দিতা। অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিল। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলল নন্দিতা। রথীন নয়, জন দুই পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

"এখানে রথীনবাবু থাকেন?" একজন পুলিশ জিজ্ঞাসা করল।

"হুঁ।"—বলল নন্দিতা।

"আমরা বাড়ী সার্চ করব।"

"কেন?"

"ন্যাকা কিছু জানেন না? এ বাড়ীতে বস্তা বস্তা চাল লুকানো আছে। রথীনবাবু চালের ব্লাকমার্কেট করে বড়লোক হচ্ছে আর আপনি বুঝি কিছু জানেন না?"

"—আমার ভাই কালো বাজারী করতেই পারে না। সে সেরকম ছেলেই নয়।"

"বেশী চালাকি করবেন না। পাশের ছোটঘরটা খুলুন।"

"আপনার সব কথা বুঝতে পারছি না। রথীন আসুক তারপর না হয়—"

"থামুন। দশআনা কিলো চাল জমিয়ে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আপনার ভাই তিন টাকা কিলোয় ব্লাকে বেচছে আর আপনি জানেন না? ন্যাকামি ছাড়ুন। ও আমরা ঢের দেখেছি।"

"একি! ঘরে ঢুকছেন কেন? আমি একা মেয়ে মানুষ।" একজন পুলিশ মুখ ভ্যেংচিয়ে কি একটা বিশ্রী কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ছুটতে ছুটতে রথীন এল।

"কি হয়েছে, এত চীৎকার কিসের?" বলল রথীন। একজন পুলিশ খপ করে রথীনের হাত ধরে বলল, "এই যে বাছাধনকে পাওয়া গেছে। চালগুলো বের করে দিন।"

"মাইরি নাকি?" বলল রথীন, কোথায় চাল দেখলেন?"

"সে জবাবটা থানায় গিয়ে দেবেন। দুদিন শ্রীঘরে বাস করলে কালোবাজারীর মজাটা টের পাবে বাছাধন।"

এক মিনিট রথীন কি যেন ভাবল তারপর বলল, "মিছে কেন ঝামেলা করছ দাদা, কত চাই বল না। ...কুড়ি? বিশ?"

"বাজে না বকে শ্রীঘরে চল আর চালের বস্তাগুলো বের করে দাও। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আমরা ডাণ্ডায় ঠাণ্ডা করব।" আতঙ্কে শিউরে উঠল নন্দিতা। রথীন বলল, "দিদি তুমি ভেতরে যাও। আমি এখনই আসছি। চলুন মশায় কোথায় যেতে হবে চলুন।"

"না রথীন তুই একা যাস না। আমি তোর সঙ্গে যাব" আর্ত চীৎকার করে উঠল নন্দিতা।

পুলিশ দুজন রথীনের ইসারায় বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। রথীন হেসে দিদিকে বলল, "এ দুনিয়ার হালচাল তুমি কিছু জান না দিদি, মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। আমার বালিশের তলা থেকে পাঁচটা দশ টাকার নোট দাও তো। আমি এখনই আসছি।"

টাকাটা বের করে রথীনের হাতে দিল নন্দিতা। রথীন চলে গেল। ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি দিল নন্দিতা। রথীন পুলিশদের সঙ্গে হাত নেড়ে চাপা গলায় কি যেন কথা বলছে। কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে ফিরে এল রথীন।

গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল নন্দিতা। রথীন কি সব বলতে যাচ্ছিল, দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল।

নন্দিতা বলল, "তুই দেখছি একজন ছোট খাট-ব্লাক মার্কেটিয়ার।" রথীন গর্বের সঙ্গে বলল, "এর নাম ব্যবসা এই যুদ্ধের বাজারে খোলাবাজারে কিছু পাওয়া যায় না কিন্তু আমার ছোট ঘরটা খুলে দেখ সব মজুত আছে দ্বিগুণ তিনগুণ দামে বিক্রি করি আর তাই পাবার জন্য লোকে আমার কত সাধ্য সাধনা করে। তুমি দেখে নিও দিদি, যুদ্ধ যদি আর দশবছর চলে আমি কলকাতায় বাড়ি করে ফেলব।"

"ছি রথীন তুই এত নীচে নেমে গেছিস? ক লোককে পথে বসিয়ে তুই বড়লোক হচ্ছিস জানিস? এ অন্যায়, এ যে মহাপাপ।"

"পাপ? পৃথিবীতে দারিদ্র্যই একমাত্র পাপ। দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পাবার যে কোন চেষ্টাই পুণ্য বাদ

বড়লোক। কয়েকটা কয়লাখনির মালিক। তার মেয়ের বিয়ে।"

"মেয়েটার কি নাম ?"

"সে আমি কোথা থেকে জানব !"

কি জানি কেন, নন্দিতার হঠাৎ মহুয়া মিত্রের নামটা মনে পড়ল।

চিত্ত আবার বলল, "রাত অনেক হল এবার বিছানায় শুয়ে পড়। আজকাল আমিও কালোবাজার আলো করে আছি, তোমায় রাজরাণী করে রাখব।"

কথাশুনে শিউরে উঠল নন্দিতা। চিত্ত টলতে টলতে ঘরের বাইরে যাচ্ছিল। নন্দিতা বলল, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

"আর একটা বোতল নিয়ে আসি নইলে সভা জমবে না—" বলে একগাল হাসল চিত্ত।

কিছুটা গিয়ে চিত্ত আবার ফিরে এসে বলল, "একটা কথা মনে পড়ল। তুমি যে অফিসে চাকরী করতে তার বড়-সাহেব দিন কয়েক তোমার খোঁজে এ বাড়ীতে এসেছিল। তোমার পাত্তা না পেয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। কোনদিন দেখা হলে তোমাকে চিঠিটা দিতে বলেছে।"

"কোথায় সে চিঠি ?"

"ঐ আমার বিছানার তলাতেই আছে। পড়। আমি আসছি", বলে চিত্ত গান করতে করতে বেরিয়ে গেল—

সাপে যেমন পাইল মণি, পিয়াসী পাইল জল
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল।...

উদ্বেল হৃদয়ে চিঠিটা খুঁজে বের করল নন্দিতা। এমনভাবে সেটা বুকে চেপে ধরল যেন সে সাতরাজার ধন হাতে পেয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে চিঠিটা খুলে সে পড়তে আরম্ভ করল।

সুচরিতাসু,

আপনি হঠাৎ না বলে কেন চলে গেলেন জানি না। কিন্তু আপনি চলে যাবার পর বুঝতে পেরেছি আমার হৃদয়ে কতটা অধিকার করে ছিলেন। আপনার মুখ সর্বদা আমার বুকে ভাসে। মনে হয় বুঝি, জীবনে সব হারিয়ে বসে আছি। আজ বুঝতে পারছি এতদিন আমি মনে মনে আপনাকেই কামনা করে এসেছি।...ফিরে আসুন, একটিবার ফিরে আসুন। আমার কিছু বলার আছে—সেকথা শোনার পর যদি ইচ্ছে হয় চলে যাবেন। আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।...

চিঠিটা পড়ার পর এক আনন্দের স্রোত নন্দিতার হৃদয় উদ্বেলিত করে তুলল। সে আর স্থির হয়ে বসতে পারছিল না।

বাইরে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল নন্দিতা। ড্রাইভারকে নির্মলের বাড়ীর ঠিকানা বলল।

"জ্যোতির্ময় এণ্ড কোং"-এর সামনে এসে গাড়ী যখন থামল তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। তারায় ভরা আকাশ। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। গাড়ী থেকে নামতেই নন্দিতার কানে এল—"এ কি ! আপনি ?"

ফিরে তাকাল নন্দিতা। কারখানার ম্যানেজার মিষ্টার নন্দী তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"আমি নির্মলবাবুর সঙ্গে এখনই দেখা করতে চাই। আমার বিশেষ দরকার।" বলল নন্দিতা।

মিষ্টার নন্দী হেসে বললেন, "তাকে এখন কোথায় পাবেন ? এই মাত্র আমি বিয়ে বাড়ী থেকে ফিরছি। আজ সন্ধ্যার লগ্নে মহুয়াদেবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি এখন নতুন শ্বশুরবাড়ীতেই আছেন সেখানে গেলে দেখা হতে পারে।"

শক্ত মুঠিতে ট্যাক্সির দরজাটা চেপে ধরল নন্দিতা। মনে হল তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।...

দূরের আকাশে উজ্জ্বল তারাগুলি তখন চাঁদকে ঘিরে মিটমিট করে হাসছে।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য)

এই জীব এই শরীর হইতে উঠিয়া যখন যায়
পরম জ্যোতিসে আপন স্বরূপ দেখিবারে তবে পায়
এ জ্যোতি সূর্য্য নহে নিশ্চয়
তাই দরশন বলিয়া বুঝায়।

আকাশো হ বৈ নাম রূপয়োর্নির্বহিতা (৪১)

আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা
তেষাং যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা।

আকাশ নাম ও রূপেরে বুঝায়ে জেন ইহা নিশ্চয়
নাম্ রূপ যাহে দুই নিমগন আত্মা অমৃত হয়
জগতের মাঝে নাম রূপ ধরি সকলেই রয় দেখি
অরূপ ব্রহ্ম রূপের আধার সব রূপ সেথা ফাঁকি
নাম রূপ দুই মানে পরাজয় রূপাতীত সেই জন
আকাশের মত সবের উর্দ্ধে বর্ণনাতীত হন।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন (৪২)

ঘুম ও মৃত্যু সময়ে শুনেছি ঈশ্বর ছাড়ে দেহ
পরমেশ্বর দেন দরশন পুণ্যবান যে সেহ

কতম্ আত্মা ইতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদন্তঃ জ্যোতিঃ পুরুষঃ (বৃহদারণ্যক)

প্রশ্ন হেথায় আত্মা কে হয় অন্তর মাঝে যিনি
বিজ্ঞানময় পরম পুরুষ প্রাণের মাঝারে তিনি
সংসার হতে মুক্ত সেজন
ব্রহ্মের মাঝে বাহ্য বন্ধন
বাহ্য বিষয় হতে অচেতন অন্তর নাহি জানে
অমৃতের মাঝে মগন যেজন অমৃত ভরা সে প্রাণে।

পত্যাদি শব্দেভ্যঃ (৪৩)

পতি শব্দেতে বোঝা যায় ইহা ব্রহ্মের কথা হয়
শ্রুতি বাক্যেতে উদ্ধৃত করি শঙ্কর তাহা কয়

"সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ

নিখিল জগৎ যার বশে রয়
সকলের সেই প্রভু নিশ্চয়
আত্মা জানিও সংসারী কভু নয়
শ্রুতির বাক্য মিথ্যা এ নয়
আত্মা সত্য অমৃত ময়
তাই দেহ ছাড়ি অমৃতে মগন হয়।

প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পাদ

আনুমানিকম্ অপি একেষাম্ ইতি চেৎ শরীররূপক-বিন্যস্তগৃহীতে দর্শয়তি চ (১)

সাংখ্য দর্শনোক্ত প্রকৃতিও যদি ইহা বলা যায়
তাহার কারণ শরীরে লইয়া তবে ঈশ্বর পায়—"

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ
মনসস্ত পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। কঠোপনিষদ

ইন্দ্রিয় হতে বিষয় শ্রেষ্ঠ বিষয় হইতে মন
মন হতে বড় বুদ্ধি জানিও বুদ্ধি হইতে হন
আত্মা সে বড় আত্মা হইতে অব্যক্ত বড় হয়
অব্যক্ত হতে ব্রহ্ম যে বড় গতি সেই নিশ্চয়।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ (কঠ)

আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে শরীর রথ যে হয়
বুদ্ধি সারথি মন যে লাগাম ইন্দ্রিয় অশ্বচয়
বাহ্য জগৎ পথ হয়ে রয়
ভোক্তা দেহের ইন্দ্রিয় চয়।

[ক্রমশঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

স্যানফ্রান্সিস্‌কো

আজ শনিবার। তবুও নিজের অফিস ব'লে হার্ভে অফিসের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে গেল ও ভার দিয়ে গেল আমায় বিমান বন্দরে পৌঁছে দেবার মেম সাহেবকে। বিদায় করমর্দন ও শেষ প্রীতির বাণী বিনিময় ক'রে সে আগেই চলে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আমরাও উঠে পড়লাম,—পথে কিছু দ্রষ্টব্য দেখে নেওয়া ও সম্ভব হ'লে আমায় একটা সস্তায় স্যুট কেনা। দেশ থেকে আমি সামান্তই জামা কাপড় সংগে এনেছি। বেলা সওয়া বারোটায় আমার বিমান। দীর্ঘপথ যেতে যেতে আমাদের দুটী পুরুষ ও নারীর পৃথক্ পৃথক্ সংসারের কত গোপনীয় ও জ্ঞাতব্য কথা হ'ল তাতে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল না থাকারই কথা।

আমি এক ফাঁকে শ্রীমতী হার্ভেকে বলেছিলাম যে দু'রাত্তির কাটাবার পর রোজই খাবার টেবিলে বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে আমায় একটা হোটেলে দিয়ে এস। বার বার সেকথা বলতে গিয়ে বলতে পারিনি। দিনের পর দিন সৌহার্দের গভীরতা যেন বেড়েই চলেছে। একদিন যখন বাইরে যাবার সময় হার্ভে বলে গেল, তুমিই বাড়ীর মধ্যে বড় অর্থাৎ বাড়ীর তুমিই কর্তা, তোমার হুকুমেই কাজ হবে। স্বাধীন দেশে সবাই স্বাধীন। তার বিনয়াপ্লুত উক্তি কানে শোনায় ভালো। নিজের দেশে আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে অর্থব্যয় করেও দিনপাতের সংগে অনেক ক্ষেত্রে আন্তরিকতার মাত্রা কিছু হ্রস্বিত হয়। তাই পারত পক্ষে বিভূঁয়ে—হোটেলে থাকাই শ্রেয়স্কর মনে করি।

শ্রীমতী বলল যে তার বড়ো মেয়ে ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। সম্ভব হয়ত তার সংগে দেখা করলে সুখী হবে।

—সম্ভব হ'লে ত্রুটী হবে না। ওখানে আমার কর্মসূচী অনুযায়ী ডন এণ্ডারসনের সুবিধের সংগে আমি বাঁধা পড়ে যাবো। তাকে বললে সে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থ করবে।

বিমান বন্দরে পৌঁছে গেলাম প্রায় সওয়া এগারোটায়। বিরাট বিশ্রাম হলে খানিকক্ষণ ব'সে খবর নিলাম, বিমান প্রবেশের কত নম্বর সুড়ঙ্গ পথে আমায় বিমানে উঠতে হবে। করিডর ট্রেনের মত এখানে কতকটা বিমানে চড়ার ব্যবস্থা। এখানে বিমানে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় না। দোতলা যাত্রী বসার হল ঘর থেকে সোজা হেঁটে একেবারে বিমানে যাওয়া যায়। এ সুড়ঙ্গ পথের শেষ অংশটার কিছুটা সকল দিক দিয়েই সচল। বিমানের দরজার মুখে এ সুড়ঙ্গটী ভিড়ে যায়। সামনের অংশটীতে এরোপ্লেনের চাকার মত চাকা লাগানো। সুইচ টিপে ডাইনে-বাঁয়ে—, সামনে—পেছনে, ওপর—নীচে করা যায়। তুষার পাত, ঝঞ্ঝাবাত, ও বৃষ্টিপাতের সময় যেন কোন কষ্ট করতে না হয় বিমান যাত্রীদের।

দুপুর বারোটায় গেট খুলতেই টিকিট দিয়ে বিমানে সোজা চলে এলাম। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর বিমান লস্-এঞ্জেলিস্ ও স্যান্ ফ্রান্‌সিস্‌কোয় যাতায়াত করে। মাত্র ঘণ্টাখানেকের ওড়ার পথ। বিমান চলছে সমুদ্রের ধার ঘেঁসে। তলায় পর্বতশ্রেণী। পর্বতের শ্রেণী বেয়ে সৃষ্টি হ'য়েছে নদ নদী। নীচে ছোট ছোট সহর ও গ্রাম পরিষ্কার দেখা যায়। মাঝে মাঝে সজল-জলদজাল দৃষ্টি পথে পর্দা টেনে দেয়। হঠাৎ বায়ু আবর্তে পড়ে কখন বা বিমানে সামান্ত দোলা লাগে। এই

একঘণ্টা ওড়ার পথে বিমান কোম্পানীর খরচে কোন আহারের ব্যবস্থা নেই—সামান্ত কোকাকোলা বা জল বা দু'টুকরো লজেন্স।

বিমান বন্দরে নামতেই এক বিরাট বপু ও সংগে—এক খর্বকার—পেবিতনামা চীনা আমার দিকে এগিয়ে আসছেন।

—'আমি ডন এণ্ডারসন, আপনি কি মিষ্টার চ্যাটার্জী?'

—'ঠিকই ধরেছেন।'

সানফ্রান্সিসকো সংলগ্ন অঞ্চল

—'ইনি আমার সহকর্মী ডাঃ উ। আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের তরফ থেকে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি। চলুন, আমাদের সংগে, বলে আমার বড় ব্যাগটা নিয়ে চলতে সুরু করল। আমি নিলাম আমার ব্রীফ্ কেস্টা।

আমরা মেট্রোপলিটান ওকল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে নিমিংস্ ফ্রি ওয়ে ধরে ওকল্যাণ্ডের দিকে চললাম। যেহেতু মধ্যাহ্নের আহার কারুরই হয় নি, তাই আমরা এক জায়গায় গাড়ী থামি ওকল্যাণ্ড সহরেরই এক রেস্তোঁরায় আহারাদি পর্ব কিছু ক্ষণের মধ্যে সেরে নিলাম। বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল তারপর চলেছি আমার রাতের আস্তানার দিকে। সেখা মালপত্র রাখার আগে 'ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের' অফিস একবার দেখে আসতে চাই। অফিসে অনেকেই চলে গে ও অনেকে আসেনি। কর্তা রাল্‌ফ ক্যার্টার শু আমাদের জন্য অফিসে অপেক্ষা করছিল, আর অপে করছিলেন সেই সুন্দরী টেবিলের সম্বর্ধিকা মেয়েটি।
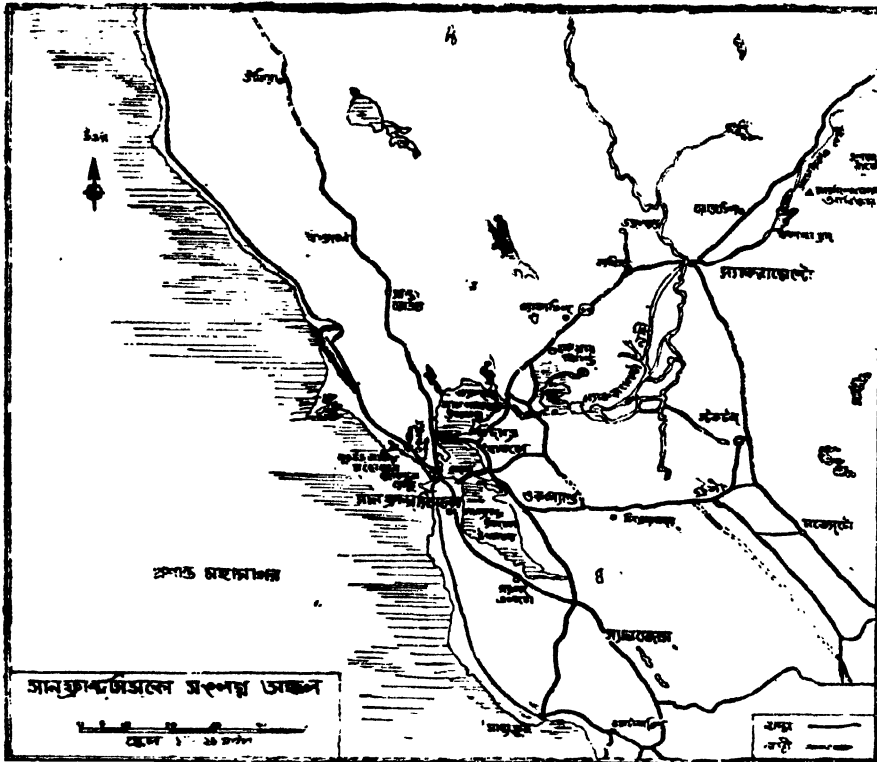
আমায় পৌঁছে দি গেল 'Sleepy Hollo মোটেলে' এণ্ডারসন ডাঃ উকে ব'লে গে আজ তার বাড়ী সন্ধ্যায় একটা পা আছে তাতে আমি যে আসি। ডাঃ উ আম সেখানে নিয়ে যাবে আমি ডাঃ উ বললাম—

—যদি তুমি এব আগে আসো তা হ' আমি সহরটা দেখে সন্ধ্যার ঝোঁকে। তু করে নিতে পারবো আ থেকে আঠারো ব আগের সানফ্রানসিসকো র সংগে, যেখানে আ আঠারো বছর আগে হংকং থেকে জাহাজে এসে পা দি। সে আনন্দে রাজী হ'ল।

মোটেলে সই-সাবুদ করে সামনের কাঠের সিঁড়ি দি ঢালা বারান্দা দিয়ে একটু গিয়ে বাঁ-হাতি ২৪ নং ঘ এখানে মোটর থাকতে পারে বলে এই হোটেল "মোটেল" বলে। (মো[টর+হো]টেল)। দরজ চাবি খুলে ভেতরে ঢুকতে দেখি মেঝেতে মোটা উ কার্পেট পাতা ও ডবল বেডের খাট। ঢুকবার দিকে

ভারী পর্দা দেওয়া বড় একটা কাচের জানালা। ঘরের মাপ 'ষোল-বিশ' হবে। তার সংলগ্ন খানিকটায় স্নানঘর ও পায়খানা। আর খানিকটায় প্রসাধন কক্ষ। ঘরে তিনটে ষ্ট্যাণ্ডে তিনটে আলো। দেওয়ালে আঁটা ফুল্ল আলো দুটো। ঘর গরম করবার ইলেকট্রিক্ হিটার। চেয়ার তিনটে, টেবিল দুটো, মালপত্র রাখার দুটো চওড়া টুল। টেবিলের ওপর খাম, লেখার কাগজ ও টেলিফোন। ঘরে টেলিভিশন সেট—Video Service Cenetre (Packard Bell)।

খাটের সংগে লাগানো একটি যন্ত্র। এটি এক কোম্পানী লাগিয়ে রেখেছে তার নাম Magic Finger-massaging Assembly, এর ফোঁকরে ২৫ সেণ্ট ফেললে তবে তিনি চলবেন পনেরো মিনিট ধরে। ক্লান্ত দেহে চারু হস্তের দলাই মলাই বা সুড়সুড়নি চললো। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে It carries you into the land of tingling, relaxation and ease. এণ্ডারসন একটি সিকি অর্থাৎ ২৫সেণ্ট ফেলে দিয়ে বিরাট বপু নিয়ে শুয়ে পড়লো। কাঁপুনি সুরু হ'য়ে গেছে। আমিও জুতো সুদ্ধই শুয়ে পড়লাম। কাঁপুনি চললো ঐ স্প্রিং-এর ঘ'টে।

ঘরের ব্যবস্থা বুঝে নিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে, স্নান সেরে বিনাব্যয়ে ঘরে-রাখা, সিলকরা কাগজের ঠোঙায় মোড়া কাপ ও ছোট ছোট খামে কফি, গুঁড়া দুধ ও চিনি দিয়ে এককাপ কফি তৈরী করে খেয়ে নিলাম। তারপর বিছানায় শুয়ে টেলিফোনের ডাইরেক্টরীখানা নিয়ে নাড়া চাড়া করে খুঁজতে লাগলাম 'রামকৃষ্ণ' 'বিবেকানন্দ' পরে 'বেদান্ত সোসাইটীকে।' পেলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ধান। ঠিক করলাম ডাঃ উ এলে ঘুরে আসা যাবে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার থেকে ও ডাইনে বাঁয়ে নানা দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখে আসা যাবে বিশেষ করে সবে যুদ্ধোত্তর সানফ্রান্সিসকো আর আজকের সানফ্রান্সিসকো। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কাজের চাপে কিছু দেখা হবেনা। তাই শনিবার সন্ধ্যায় ও রবিবার যা' দেখা যায় দেখে নেওয়া যাবে ও তুলনামূলক উন্নতির মানের একটা সন্ধান পাওয়া যাবে। এদিকে কয়েকটি য়ুরোপের দেশের ভিসা করিয়ে নেওয়া দরকার। তারও বন্দোবস্ত সোমবার ওদের অফিস থেকেই করে নেবো।

সন্ধ্যা নয়, প্রকৃতপক্ষে বিকেল পাঁচটায় ডাঃ উ আসতে আমরা 'স্লিপি হলো মোটেল' থেকে বেরিয়ে ফেয়ার ফ্লাক্স ষ্ট্রীট থেকে হাট ষ্ট্রীট ধরে ম্যাক্আর্থার ফ্রিওয়ে ধরে দোতালা বে সেতুর দিকে চলতে লাগলাম। বে-সেতু পার হলে তবে স্যানফ্রান্সিসকো। নিমিৎস্ ফ্রীওয়ে ও ম্যাকআর্থার ফ্রীওয়ে বে-সেতুর গোড়ায় মিশেছে। সেখান থেকে ইষ্ট শোর (East shore) ফ্রীওয়ে স্যানফ্রান্সিসকো উপসাগর ও সেবলো উপসাগরের ধার দিয়ে কিছুটা গিয়ে ভেলোহার মধ্য দিয়ে উত্তর মুখে চলে গেছে। স্যান পেবলো উপসাগরকে বেড় দিয়ে আর এক রাস্তায় ভেলোহা থেকে 'নেপা' নদী পার হয়ে সীয়ার্স পয়েণ্ট রাস্তা ধরে, 'রেড়উড হাইওয়ে' ধরে স্যান র‍্যাফেল পার হ'য়ে 'মিল' ভ্যালীর ভেতর দিয়ে, স্বর্ণ তোরণ 'সেতু' পার হয়ে স্যানফ্রানসিস্কো যাওয়া যায়। স্যান র‍্যাফেলের কাছে একটা নতুন সেতু হয়েছে। আমরা গাড়ী থেকে বসেই ২৫সেণ্ট টোল দিয়ে দিলাম ও তার রসিদ নিলাম। কেননা ডঃ উ এই ব্যয় অ দায় করবে কোম্পানীর ঘাড় থেকে। এখানে সতেরোটি টোল আদায় করার গবাক্ষ। যাওয়া আসায় দুধারের গাড়ীর টোলই একই জায়গায় নেওয়া হয়। যারা রসিদ নেবে তাদের একটি বিশেষ গবাক্ষে যেতে হবে। অন্যগুলোতে দাঁড়াতে দেবেনা। আগে এই বে-সেতুর একতলায় ট্রেন চলতো। আজ তাতে শুধু মোটর চলে। এখানে ফ্রীওয়ে ও সুড়ঙ্গ পথ জলের নীচে, মাটির নীচে, পাহাড়ের নীচে রয়েছে ফ্রীওয়ে দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। বেদান্ত সোসাইটীর পুরানোর মন্দির হ'ল ২৯৬৩ ওয়েবষ্টার ষ্ট্রীট। মুখ্য প্রার্থনা গৃহ হ'ল ২৩২৩ ভেলোহা ষ্ট্রীট। মন্দির সংলগ্ন জনসমাবৃত আধুনিক আশ্রমে স্বামী অশোকানন্দের সংগে দেখা করতে গেলাম। ওঁর সহকারী মার্কিন কোট প্যাণ্ট পরা সাধু শান্ত-স্বরূপানন্দ ও শ্রদ্ধানন্দ, স্বামীজীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য দেখা করতে দিলেন না কিন্তু বলে দিলেন আগামী কাল প্রার্থনা সভায় তিনি বক্তৃতা করবেন। সেখানে যেন কাল এগারটায় যাই। আমি প্রশ্ন করিনি যিনি এত অসুস্থ তিনি কেমন করে কাল বক্তৃতা করবেন। আমার বিদেশী বন্ধুর কাছে অপ্রকাশিত রাখলাম স্বদেশবাসীর এই অশালীন আচরণ।

এখান থেকে সহরের প্রধান রাজপথ দিয়ে যাবার সময় একটা হোটেলে আহারাদি সেরে আমরা এণ্ডারসনের বাড়ীর দিকে ছোট্ট একটা ঘরোয়া পার্টিতে যোগ দিতে চলেছি। তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। স্ত্রী ছিপছিপে। নতুন বাড়ী ক'রে উঠে গেছে সহর থেকে খানিকটা দূরে। বাড়ীতে বিরাট একটা এ্যালশেশিয়ান কুকুর। এণ্ডারসনের তরুণ বন্ধু ও বান্ধবীরা এসেছিলেন। সেখানেও টুকিটাকি খাওয়া দাওয়া হল। বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল। আগামী কালের প্রোগ্রাম সেখানেই ঠিক হল; যদি ধর্মীয় ব্যাপারে কিছু রস পাই তা হ'লে সে এসে আমায় নিয়ে যাবে New Sphere এর ষ্ট্যানফোর্ডের কাছে এক সভায়। সেখানে ধর্ম না ব'লে 'মানবধর্ম' বিষয়ে সভা হবে বললে ঠিক হবে। কেননা এখানে খৃষ্টানীর রোম'ন ক্যাথলিক কি প্রোটেষ্টেণ্ট ইত্যাদির গোঁড়ামি নিয়ে সভা নয়। যে কোন লোক, যে কোন ধর্মের হ'ক না কেন, যোগ দিতে পারেন। কতকটা MRA (Moral Re-armament) এর মত। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ বিষয়ের উপর প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে 'Religion of man' ব'লে এক বক্তৃতা মালা দিয়েছিলেন। আমি রাজী হলাম। ভাবলাম সকালে বেদান্ত সমিতির সভা, বৈকালে 'নিউ-স্ফীয়ারে'র সভা। মন্দ কি ! ধর্মীয় বাতাবরণে স্যানফ্রান-সিস্কোর 'রবিবাসর' কাটবে। কলকাতায় আমাদের "রবিবাসরে"-এর সভায় অনুপস্থিত হ'য়ে চলেছি। ঠিক হ'ল রবিবার বেলা দেড়টা নাগাদ তাঁরা যাবার পথে আমায় নিয়ে যাবেন। শনিবার রাতের বেলা এ্যাণ্ডারসনের বাড়ী থেকে ফেরার সময় আমার অভীপ্সা ডাঃ উঃ-কে বললাম সে যেন সকাল সাতটায় আমার হোটেলে আসে। আমরা সকালে স্যান ফ্রান্সিসকো ও সহরতলীর দ্রষ্টব্য বস্তুসম্ভার দেখে বেদান্ত সোসাইটির সভায় যাব। সেখান থেকে ফিরে আহারাদি ক'রে 'নিউস্ফীয়ারের' সভায় যাব। নিউ-স্ফীয়ারের সভা অন্তে পরিচিত বেশ কয়েকজন মিলে একজনের বাড়ী যাওয়া হ'বে ও সেখানে রাতের আহারও সমাধা করা যাবে। সেখানেই একটা বিশেষ কর্মপন্থাও গ্রহণ করা হবে।

রবিবার সকালে স্নানাদি পর্ব শেষ ক'রে কয়েক-খানা চিঠি লিখছি এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

—'ভিতরে আসুন' ব'লে দরজা খুলে দিলাম।

ডাঃ উঃ ভিতরে এলেন। চিঠিলেখা বন্ধ ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গতকাল একটা পেট্রোল কোম্পানীর দুখানি সহরের নক্সা জোগাড় ক'রেছিলাম। সে দুটোই সঙ্গে নিলাম। আর নিলাম রোলিফ্লেক্স ক্যামারাটাও। ঠিক হ'ল প্রথমে আমরা রেডউডের বনে যাব কারণ সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খোলা। সহরের দ্রষ্টব্য কেউ বা বেলা আটটা, কেউ ন'টা কোথাও বা দশটায় খোলা।

আমরা বেরিয়ে 'ইষ্টশোর ফ্রীওয়ে' ধরে এমারভিল, বার্কলে, এলবানী, রিচমণ্ড পার হ'য়ে নতুন রিচমণ্ড স্যান্ র‍্যাফেল সেতুর দিকে চললাম। রিচমণ্ডের বিরাট তৈল শোধনাগার ও বহু বিরাট জর্দার কৌটোর মত তৈলাধার যাবার পথের ডানদিকে দেখা যায়। কাছেই প্রাদেশিক সরকারের কারাগার। এটী ম্যান্ প্যাবলো প্রণালীকে অতিক্রম করেছে। এই সেতুটীর বৈশিষ্ট্য এই যে সেতুটীর কেন্দ্রের অংশটী সমভূমিক নয়। গভীর জল যেখানে সেখানে জল ও সেতুর তলের ব্যবধান যথেষ্ট। তীরের দিকে সেতু ঢালে উঠেছে ও ঢালে নেমেছে। এতে অর্থব্যয় হয়েছে কম। তীরস্তম্ভ বা জলস্তম্ভ ওঠাতে হয়েছেও কম। ইডেন গার্ডেনের ইটের অতি সামান্য খিলেন সেতুটী ঐ রকমের। এটী দোতলা সেতু কিন্তু চওড়া বেশ কম—'বে-সেতু' বা 'গোল্ডেন গেট' সেতুর মত নয়। এ সেতুটী না থাকলে আমাদের বহুদূর ঘুরে 'ভ্যালেহো', 'নোভাহো' হ'য়ে আসতে হ'ত। ঐ নতুন সেতুর 'পারানীর কড়ি বা উপশুল্ক হ'ল ৭৫ সেণ্ট। সেতু পার হ'য়ে রেডউড হাইওয়ে ধ'রে দক্ষিণমুখো আসতে লাগলাম। সেখান থেকে মুখ্য পথ ছেড়ে 'মিলভ্যালী'র ভেতর দিয়ে 'মুর উডস' জাতীয় মনুমেণ্টের পথে চলেছি। সাপের মত এঁকেবেঁকে সেফটিপিন পাক মোচন ক'রে উপরের দিকে উঠেই চলেছে।

মুর উড্স জাতীয় মহোদ্যান : (Muir woods)

'মেরিন কাউণ্টি'র কংগ্রেসম্যান 'উইলিয়াম কেণ্ট' এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, বিটপীশ্রেণীর অসামান্যতায় মুগ্ধ এবং ঐগুলি সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই এ সম্পত্তি জাতীয় সরকারকে দান

করেন—"জনগণহিতায়"। আর অনুরোধ করেন যে বিখ্যাত সাহিত্যিক, নিসর্গী ও স্থিতিবিৎ জন মুরের (১৮৩৮—১৯১৪) স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে নামকরণ ও সংরক্ষিত হ'ক।
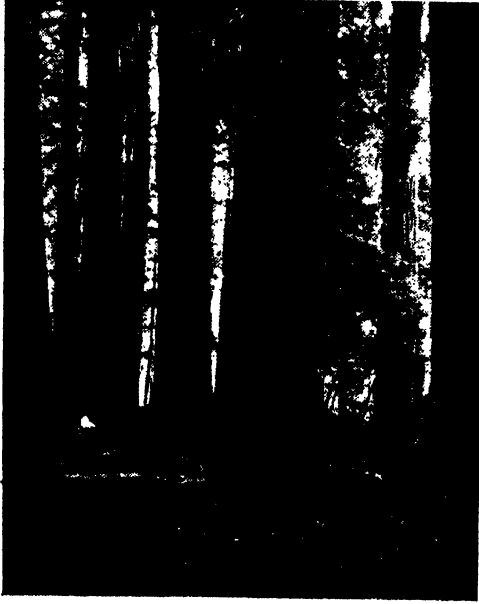
ক্যালিফোনিয়ার রেড্উড্ বন

গাছগুলো ছশো ফিটেরও বেশী লম্বা। রেডউডের তলা যেমন সেঁতসেঁতে তেমনি ঠাণ্ডা। প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা-বিশারদেরা মনে করেন 'রেডউড' জাতীয় বৃক্ষ ১৪০০ লক্ষ বছর ধ'রে পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তে ৩০ মাইল চওড়া ও ৫৪০ মাইল লম্বা ভূভাগ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর অন্য কোন জায়গায় এর সন্ধান পাওয়া যায় না। আর্দ্রতা, ও শৈত্য এবং সমুদ্রকূলের কুয়াশা এই বৃক্ষ জন্মাবার উপযুক্ত স্থান। উত্তর কেলিফোর্নিয়ার 'হাম' কাউন্টিতে দুটী ৩৬৭´ (১১২ মিটার) উঁচু রেডউড দাঁড়িয়ে আছে। মুর উডসে ২৪০ ফুট উঁচু পর্যন্ত গাছ আছে। এর সমগোত্রীয় দৈত্য সিকোয়াইয়া জাইগেণশিয়া (Sequoia Gigantea) 'সিয়ারা নিবেডার' পশ্চিম ঢালে গজিয়ে উঠেছে। সাধারণতঃ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৮০০০ ফুট উঁচুই এদের গ'ড়ে ওঠার অনুকূল স্থান।

গেছে। কারুর বয়স প্রায় ৩২০০ বছর অনুমান করা যেতে পারে। অর্থাৎ জন্ম সময় হল বুদ্ধ জন্মেরও প্রায় ১০০ বছর আগে। গাছগুলি সংরক্ষণের জন্য একে পোকামাকড় ও ছত্রাক থেকে মুক্ত রাখতে হয়। এটা more than a collection of trees; it is a community of plants living together as a unit, from the tallest to the smallest, each dependent upon the other.

ছায়াপ্রিয় ছোট গুল্ম গজিয়ে উঠেছে এর তলায়। ফুটেছে তাদের ছোট্ট ডালে নানারকমের ফুল। বেক্রয়ারিতে দেখা যাবে অক্সালিস (Oxalis), ট্রিলিয়াম (Trillium), বুনো আদা (Wild ginger)। এখানের জঙ্গলে হিংস্র বৃহৎ বন্য পশু নেই। বিরাট স্যালেমাণ্ডার, খরগোস, হরিণ, বীবর প্রভৃতি জন্তু আছে। রজত-স্যামন ও ষ্টীলহেড ট্রাউট (Steel-head trout) এর খরস্রোতা নদীতে উজানে উঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। সত্যিই এই বন বৃক্ষশ্রেণীর সমাহার ছাড়াও আরও কিছু...। এরা কি শুধু সুদূরস্পর্শী মহাকালের ইতিহাসের নিশ্চল ও নীরব সাক্ষ্য নয়?

সত্যিই 'মুর উডস্' একটি জীবন্ত উন্মুক্ত সংগ্রহশালা (Muir Woods is a living outdoor museum) এটী স্যানফ্রান্সিস্কো থেকে ১৭ মাইল দূরে। নানাভাবে যাওয়া যায় এখানে। এখানে চড়ুই ভাতির জায়গা নেই। কারণ প্রাচীন বনে আগুন লেগে যেতে পারে, যার ফলে প্রভূত ঐতিহাসিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। এটী ১৯০৮ সালে ৯ই জানুয়ারি ৫০০ একর জমির উপর স্থাপিত হয়। এটীর পরিচালনায় ভার Dept. of Interior-এর National Park Service-এর উপর ন্যস্ত।

এই জাতীয় মহোদ্যানের কাছে মাউণ্ট তমালপাস (Mt. Tamalpais) প্রাদেশিক মহোদ্যান। এই মহোদ্যানের আরও উত্তরে Samuel. P. Taylor প্রাদেশিক মহোদ্যান।

'মুর উডস্' ছেড়ে দক্ষিণ মুখে আমরা এলাম ও 'স্বর্ণ তোরণ' সেতুতে (Golden Gate) উপসাগর দিয়ে পার হ'য়ে সিধে চ'লে গেলাম Golden Gate Park-এ।

ফুলটন ষ্ট্রীট, ফুলটন ষ্ট্রীট ও Stauyan St এর মোড় থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত চলে গেছে। আর দক্ষিণে Lincoln St Stauyan St এর মোড় থেকেও প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। প্রায় চার মাইল লম্বা ও সিকি মাইল চওড়া এই বিরাট অঞ্চলটি সহরের মধ্যে একটা ব্যতিক্রম। যেখানে প্রায় একশো বছর আগে a dreary toaste of shifting sand hills where a blade of grass cannot be raised without four posts to support it and keep it from blowing away আজ তা' সবুজ শ্যামল তৃণে আবৃত, যেখানে পদ্মদীঘিতে পদ্ম ও শালুক ফুল ফোটে, যেখানে ভেড়া আরামে ঢেউ-খেলানো মাঠে চরে; কাঠবেড়ালী কিচির মিচির করে, খরগোসেরা কান খাড়া ক'রে এদিক ওদিক চেয়ে ছুটে পালায়, নাম-না-জানা নানারকমের পাখীর কাকলী-কূজনে মুখরিত হয়ে ওঠে উদ্যান। হাজার হাজার লোক ছুটীর দিনে অবসরবিনোদনে আসে; ছেলেরা এসে খেলা শুরু করে; বুড়োরা ব'সে ব্যাণ্ড কনসার্টের সুর শোনে। ওখানে আছে 'ষ্টেডিয়াম্', 'গোল্ডেন টেম্পল অব্ মিউজিক্', 'মরিসন্ প্ল্যানেটরিয়ম', 'ষ্টাইনহার্ট মীনাগার', পদ্মপুকুর, টেনিস্‌কোর্ট, বেস্‌বল মেডো'স্, 'ক্যালিফোর্নিয়া একেডামী অফ সায়েন্স, গল্‌ফ্-কোর্স, উইণ্ডমিল্, ষ্ট্রাইবিং আর্বোরিয়াম্ প্রভৃতি।

এখান থেকে বেরিয়ে চললাম 'কোয়েট টাওয়ারে'র দিকে। যখন পৌঁছলাম, তখন সাড়ে ন'টা। কিছু দর্শক এসে গেছেন; দরজা খুলবে দশটায়। তাই ঘুরে এলাম। পথে আসতে ইচ্ছে করেই আমরা লোম্বার্ড ষ্ট্রীট দিয়ে 'S-এর মত হিলিবিলি পথে ব্রেক চেপে চেপে নেমে এলাম। এখান থেকে নগরীর অপূর্ব শোভা দেখা যায়। এটাকে 'The crookedest street in the world' বলা হয়। এর ঢাল এক জায়গায় মেপে দেখ'লাম ১ : ৪ অর্থাৎ এক খাড়াই উঠতে চার সমভূমিক যেতে হয়। রাস্তার সাধারণতঃ ১ : ২৪ কি ১ : ৩০ ঢাল হবার নিয়ম। এই এঁকে বেঁকে নামার পথে রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে ত্রিভুজে ফুলের কেয়ারি। এখানে এখনও সহরে ট্রাম চলে। এরা একটু প্রাচীনকে জড়িয়ে রাখতে চায়; তা' ব'লে নতুনও গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ নয়। এখানে অজস্র বাস্ আছে, ট্রলি বাস্ আছে। নতুন সেতু তৈরী হচ্ছে, ফ্রী-ওয়ে গ'ড়ে উঠছে। তবু সেই প্রাচীন কালের ফিসারম্যানস্ হোয়ার্ফ (Fisherman's Wharf) আজও সেই জায়গায়; আগের মতই ঝুড়িতে চিংড়ি, কাঁকড়া, গেঁড়ি, স্যামন, বা কালবোস প্রভৃতি মাছ রয়েছে। যাঁরা ইলিশমাছের বিশেষ অনুরাগী তাঁদের কাটা স্যামনের লালচে রংয়ে জিভে জল আসতে পারে। হুকুম করুন, এক্ষুনি ওরা ভেজে দেবে চোখের সামনে। 'ফিসারম্যান হোয়ার্ফ' থেকে সমুদ্র বিহারে ছোট ছোট জাহাজ জলযাত্রী নিয়ে চলেছে। যাত্রীদের নামা উঠা দেখে ফিরলাম লোম্বার্ড ষ্ট্রীট হ'য়ে— কোয়েট টাওয়ারে। ওখানে ২৫ সেণ্ট উপশুল্ক দিয়ে লিফ্‌টে ক'রে চুড়োয় চড়লাম। লিফ্‌টের পরও একতলা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। এর মাথা ফাঁকা, চারিপাশ কাচ দিয়ে ঘেরা। দূরে দেখা যাবে কিন্তু হাত বাড়ানো যাবে না আর যাবে না আত্মঘাতী হওয়া। রঙিন ছবি কয়েকটা তুলে নিলাম সহরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের।
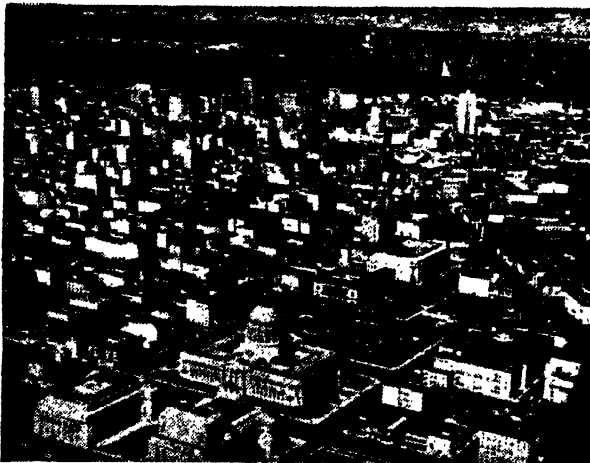
সান্‌ফ্রান্সিস্কোর নগরকেন্দ্র

বেদান্ত সেণ্টার :—

বেলা এগারটা বাজতে প্রায় পাঁচ মিনিট নাগাদ 'কোয়েট টাওয়ার' থেকে বের হ'য়ে ভেলেহো ষ্ট্রীটের 'বেদান্ত সেণ্টারে' এঁদের নতুন হল ঘরে এলাম। প্রায় শ' আড়াই লোক বসতে পারে এই হলঘরে। অনেকে এসে গেছেন ও অপেক্ষা করছেন স্বামীজির

জন্যে। মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে কিছু বেশী। দোতলায়ও বসার জায়গা আছে। আজকের বক্তৃতার বিষয় হ'ল—Proof of the existence of God। এর আগে অনুরূপ প্রসঙ্গের বক্তৃতা হয়েছিল, যেমন—

১। Buddha, the light of Asia.

২। We see God but we donot know him.

৩। Simple Facts about Meditation.

আগামী কয়েক সপ্তাহ ধ'রে যে বক্তৃতা হবে তারও কিছু কর্মসূচী প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন—

১। Man, the Measure of all things.

২। The Axis of Higher consciousness of the Invissible Worlds.

৩। Relig'on ruins its Evils.

৪। Can we control our Future ? প্রভৃতি।

হলঘরের পাদপীঠের পেছনে আছে পঞ্চমূর্তির প্রতিকৃতি। কেন্দ্রে আসীন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বাঁয়ে শ্রীশ্রীমা ও বুদ্ধদেব ; ডাইনে স্বামী বিবেকানন্দ ও যীশুখ্রীষ্ট।

আজকের বক্তৃতার বিষয় বেশ কঠিন ও জটিল। স্বামী অশোকানন্দ তাঁর বাঙালী উচ্চারণে এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ক'রে সকলকে প্রায় ঝাড়া দেড় ঘণ্টা বুঝিয়ে গেলেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ তিন রকমের হ'তে পারে বলে শুরু করলেন। যথা—১। অণ্টোলজিক্যাল ২। কসমোলজিক্যাল। ৩। টেলিওলজিক্যাল।

সোজা কথা গভীর অনুভূতি দিয়ে, নিবিড় নিদিধ্যাসন দিয়ে যাঁরা ঈশ্বরের বিভূতি, ঐশ্বর্য উপলব্ধি করেছেন তাঁদের কথায় আস্থা স্থাপন করতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। মানুষের মনই হ'ল দেবতার পূজার মন্দির। সেখানেই ভগবান্ অধিষ্ঠিত হ'ন। তিনি দেবেন মজুমদারের জীবনের ঘটনা উল্লেখ করলেন। সামান্য এক প্রাচীন ঘটনা থেকে কেমন ক'রে ক্রূর হৃদয়ে ঈশ্বর-বিশ্বাসের অঙ্কুর জন্মেছিল—সে কথা বললেন। একবার বনপথে তিনি যাচ্ছিলেন তখন পথে দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হন। সাধুর কি বা ধন দৌলত সঙ্গে থাকে ? তবুও দস্যুরা তাঁকে হত্যা করবে। তিনি দস্যুদের কাছে এই শেষ মিনতি জানালেন যে তোমরা আমায় হত্যা ক'রো কিন্তু তার আগে আমাকে আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে দাও। তারা স্বীকার করল, কেননা কতক্ষণইবা বিলম্ব হবে। দেবেন মজুমদার অতি কাতর মধুর কণ্ঠে ভগবানের কাছে জীবনের শেষ প্রার্থনা জানালেন। মধুর কণ্ঠে ভগবানের স্তুতি গেয়ে উঠলেন গান শেষ হ'ল। দস্যুদলের চোখেও জল।

দস্যুরা বল্‌ল 'যা, চলে যা। তোকে আর মারবো না।'

এই সামান্য ঘটনার মধ্যদিয়ে ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ পেলেন দেবেন মজুমদার। আর এই সামান্য সময়ে ঐশীশক্তির প্রভাব পেল দস্যুরা। আর পেল না কেউ ? এ কাহিনী তো প্রায় সাধনমার্গের সকলেরই জানা।

এমনি ঘটনা ঘটেছিল পাঁচশো বছর আগে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে জগাই মাধাই উদ্ধারে। মদ্যপের কলসীর আঘাতে কপাল দিয়ে দরদর ধারায় শোণিত স্রোত ব'য়ে চলেছে। ভ্রূক্ষেপ নেই মহাপ্রভুর। তিনি গেয়ে চলেছেন—

"মেরেছ কলসীর কানা।
তাই ব'লে কি প্রেম দেব না॥"

মাতাল জগাই মাধাই হ'য়ে গেল উত্তর কালে পরম বৈষ্ণব। জীবনের মোড় এমনি ক'রেই ঘু'রে যায়। এমনি কতজনেরই জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে তার ইতিহাস আজও লেখা হয়নি ও হবেনা। অতীতের মহান্ ঘটনা মহাকালের অক্ষরেখায় চিরতরে মুছে গেছে।

বক্তৃতা অন্তে তিনি দরজার কাছে চ'লে গেলেন। এদিক চেলারা ছোট বেতের ধামাতে কিছু দান গ্রহণ করলেন যার যেমন সামর্থ্য। শ্রোতারা বেরিয়ে যাবার সময় করমর্দন ক'রে চ'লে যাচ্ছেন।

শ্রীমতী বাকে।

এই সভায় যোগদেবার আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল শ্রীমতী বাকের সঙ্গে পরিচিত হবার লোভ। শ্রীমতী বাকে স্বামীজীর জীবনের মার্কিণ ইতিহাসের এক অবলুপ্ত কাহিনী বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর অসামান্য পরিশ্রম ভারতবাসীর প্রতি প্রেম ও প্রীতির মাধুর্যে। তাঁর অসাধারণ কাজের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। তাঁকে প্রশ্ন করলাম।

—কেন আপনি এই পুস্তক রচনায় মহাব্রতে ব্রতী হ'লেন ?

—এই এমনি।

—এটা কেমন ক'রে হবে ? প্রতি কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ আছে।

আপনি একটু পরিষ্কার ক'রে গোপন তত্ত্বটা বলুন।

—তখন, সত্যি বলতে কি, আমার হাতে কাজ ছিল না তেমন। সেই জন্য এই কাজটা নিলাম। সংগ্রহ করলাম নানা স্থান থেকে নানা লাইব্রেরী থেকে নানা তথ্য। এমনি ভাবেই চল্‌ল কাজ।

—সব জায়গায় নিজে গিয়ে অনুসন্ধান করলেন ? আমার তরুণ বন্ধু শঙ্করী বসুর সঙ্গে কলকাতা থেকে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে মহারাষ্ট্রের মুখ্য ঐতিহাসিক সহর পুনায় দেখা হ'তে তাঁকে ওখানে আসার কারণ জিগ্যেস করায় তিনি বললেন 'মহাপণ্ডিত বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের অতি প্রিয় বন্ধু। তাঁর সম্পাদিত কাগজ 'কেশরী'তে স্বামীজি সম্বন্ধে কি কি লেখা সে সময়ে বেরিয়েছিল তারই সরজমিনে পরীক্ষা ও গ্রহণ ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন।'

শ্রীমতী বাকে বিনয় নম্র কণ্ঠে একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে বললেন—

—আমায় সব জায়গায় নিজেকে যেতে হয়নি। আমি লাইব্রেরীতে লিখে পাঠাতাম, আমার কি চাই। তাঁরা সেগুলি সংগ্রহ করে ফটোষ্ট্যাট ক'রে পাঠিয়ে দিতেন আমার কাছে।

—আপনাকে কত যে লক্ষ ধন্যবাদ দেব ও আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব, জানিনা। এখন কি করছেন ? আপনি তো ব'সে থাকার পাত্রী নন।

—দ্বিতীয়ভাগের পাণ্ডুলিপি তৈরী হচ্ছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে বাকী অংশটুকুর সন্ধানে লিপ্ত আছি।

—আপনার এ প্রচেষ্টা জয় যুক্ত হ'ক এই আমার আন্তরিক কামনা। সমগ্র ভারতবাসী আপনার এই মহান কাজের জন্য চিরঋণী থাকবে।

—এমন কিছু নয়। এত বলবেন না। আমি এত সম্মানের পাত্রী নই। আমি একজন বিনীত সেবিকা। আমার ভাল লেগেছিল, তাই আমি এ কাজ করেছি। তখন আমার হাতে কাজও ছিল না। তখন আমার মনে হ'ল আমার অনুসন্ধানের ফল অন্যরাও জানুক। তাই এটি প্রকাশিত করা হয়েছে।

জনান্তিকে বললাম—'এ শুধু আপনার বিনয়; আমার মন সায় দিচ্ছেনা। অনুপ্রাণিত না হ'লে এ সংকল্প কেউ গ্রহণ করেনা।' তাঁর সংগে করমর্দন ক'রে ডাঃ উ ও আমি বেরিয়ে পড়লাম। তখন বেলা পৌনে একটা। মোটেলে ফিরলাম। এগুারসনরা আসেনি। এই অবসরে আমরা দুজনে দুপুরের আহার সারতে গেলাম ও মোটেলের ম্যানেজারকে অনুরোধ করে গেলাম যদি কেউ আমার সন্ধান নিতে আসেন তাঁদের একটু অপেক্ষা করতে বলবেন। আমরা দুপুরের আহার সেরে এক্ষুনি আসছি। এসে দেখি এগু'রসনের দল (মহিলাই বেশী) এসে ঘুরে গেছেন এবং বলে গেছেন অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা আবার আসছেন। আমরা দুজনে আমার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। টেলিভিসন চালিয়ে ঘরের জানলায় ভারী পর্দাটা টেনে দিয়ে (নইলে দিনের আলোয় ছবি দেখা যাবেনা) বসলাম। ওরা আসতে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। তখন বেলা প্রায় দুটো।

প্রায় মাইল চল্লিশের পথ ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে "প্যালো আলটো' জুনিয়ার স্কুল। এই স্কুলের বড় হলে প্রায় একহাজার দর্শক বসতে পারে। দাঁড়ালে আর কোন না শ' দুয়েক বাড়বে। পৌছতে তিনটে বেজে গেল, বিশেষ করে স্কুলটা খুঁজে বের করতে। মোটর গাড়ীতে ভ'রে গেছে স্কুলের মাঠ। আর লোকে ভরে গেছে সভাগৃহ। একসংগে সবার বসার জায়গা হ'লনা। যে যেমন সুবিধে পেল এক একটা ফাঁকে বসে পড়ল সাতজনের পর পর বক্তৃতা। একজনের বক্তৃতা হয়ে গেছে। তাতে কোন ক্ষতি নেই, কেমনা বোঝার কোন অসুবিধে নেই। মুখ্য বিষয়বস্তু হ'ল কেমন ক'রে পারস্পরিক মানুষের সম্বন্ধ যাতে প্রীতিময় ও আরও মধুর হয় তারই অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা। পরস্পর পরস্পরের কাছে যাতে অন্তরের গ্রন্থি মোচন করতে পারে তার মধুময় আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

New Sphereএর বক্তৃতার কর্মসূচী ছিল—

বক্তব্য বিষয় বক্তার নাম

1. Introduction—Allen Brown
2. Elements of the Crisis—Winston Boone
3. Promise of Man's Evolution—Bill Luring
4. Condition of Growth—Jim Shoobery
5. The need for community—Jim Burch
6. Education and Motivation—Don Fitton
7. The Goal—Harry Rathbun Prof of (Emeritus), Stanford University.

সবাই নিস্তব্ধ হ'য়ে প্রায় দুঘণ্টা বক্তৃতা শুনলো। ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অফিসের সেক্রেটারী সুন্দরী তরুণীটি একজন মহা উদ্যোক্তা। মনে হ'ল হয় বিয়ে হয়নি, নয় স্বামী কর্তৃক নির্বাসিতা বা উপেক্ষিতা। ফেরার পথে মেয়েটি ডাঃ উ-এর গাড়ীতে উঠল। সে যাবার সময় পথে তার বাসা পড়বে আমরা যদি একটু থামি তো সে তার ছেলেকে দেখে ও তার রাতের আহারের ব্যবস্থা করে যেতে পারে, তার সম্ভাবনা আছে কিনা অনুরোধ জানালো, কী এমন আমাদের ব্যস্ততা যে রমণীহৃদয়ে মাতৃসুধা নির্ঝরে বাধা দিয়ে অকারণ বিদেশ বেদনা দিতে যাব? কেন না অপেক্ষা করা হবে, কি হবে না বলার ভার আমার উপর। আমি বললাম—'আনন্দের সঙ্গে অপেক্ষা করব।' সে দৌড়ে গাড়ীর দরজা খুলে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তরুণী কুমারী মেরী সম্বন্ধে আরও ব্যক্তিগত আলোচনা করতে লাগল।

—আমার এখানে সহজ প্রশ্নের উত্তরটা না জানা থাকায় তাকে জিগ্যেস করলাম 'তোমার ছেলে বলছ, অথচ তোমায় সবাই ডাকছে মিস্ মেরী ব'লে, তোমার বোনের কি ভায়ের ছেলে নাকি, যাকে পোষ্য নিয়েছ?

—নাঃ আমারই। আমি যে ডিভোর্সড (Divorced) তাই আমি এখন কুমারী নাম নিয়েছি।

—আমি ভারী দুঃখিত। মনে মনে বললাম 'এও যে হতে পারে আমার মাথায় আসেনি। আমাদের সমাজে এরকম প্রথা চালু নেই। বর্তমানে কিছু কিছু হচ্ছে, বিশেষ ক'রে তথাকথিত ভদ্রসমাজে।

—তুমি কেন দুঃখিত হ'তে যাবে? আমাদের যে অনেক কথা।

—থাক মিস্ মেরী, আজ এই প্রীতি ও ধর্মের উন্নত আবহাওয়ায় তোমার ফেলে-আসা জীবনের ব্যথার ক্ষতে ঘা দিতে চাই না। অন্য কোন সময়ে শুনবো, আমার সকল সহানুভূতি দিয়ে। এত ভাল খুকীকেই অন্তরে এত ব্যথা দিতে পারে, তা আমার স্বপ্নের অতীত।

—অসংখ্য ধন্যবাদ তোমার সহানুভূতিতে।

পরের দিন সে আমার কয়েকটি দেশের ভিসা করিয়ে আনিয়ে দিয়েছিল। কাজে বেশ পাকা। টেলিফোন দেখে, টাইপ করে ও সেই সংগে আগন্তুকদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। চিঠিপত্র নেওয়া ও পোষ্ট অফিসে ফেলার ব্যবস্থাও করে।

—আমাদের এখানে কচিৎ কোন সাহেবী অফিসে এর কোন ক্ষুদ্র সংস্করণের সন্ধান পাওয়া হয়ত যেতে পারে।

ফিরে আমরা 'ডনের' এক বন্ধুর বাড়ী গেলাম। সেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। আমি বললাম 'উদ্দেশ্য অতি সাধু। এর কৃতকৃত্যতার ওপর জগতের মঙ্গল ও শান্তি নির্ভর করছে। তবে আমার সাতদিনের আয়ু এই স্যানফ্রানসিস্‌কো সহরে। অতএব আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতি তোমাদের আগামী সম্মেলনে সম্ভব হবে না। তবে জেনো, আমার মন তোমাদের আন্তরিক পরিবেশের মধুর অভিজ্ঞান স্বরূপ তোমাদের কাছেই পড়ে থাকবে। যখন ব'লেছিলাম তখন সেটী পূর্ণ সত্য ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজের ভারে প্রাচীন স্মৃতির বহুকিছু বিস্মরণ হয়েছে। জানি না, এও কোনদিন হবে কিনা?

আজ সোমবার স্যানফ্রানসিসকো সহরের নগর বাস্তুকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আমায় পৌঁছে দিয়ে এল ডন এণ্ডারসন। ঘন্টাখানেকের জন্য ও নিজের অফিস দিয়ে ঘুরে আসতে গেল ও বলে গেল মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সে এসে হাজির হবে। নগর বাস্তুকার মিঃ ক্লিফোর্ড জে গিরৎজেক (Clifford J. Geertz) যাকে পরিচিতেরা গিল

আমাদের মহানগরীর জল সরবরাহ ও ব্যবহৃত জল নিকাশের সমস্যা নিয়ে নানা আলোচনা হল। তাদের ওখানেও কত হাঙ্গামা চলেছে তার আলোচনা হল। ওখানেও একই নল দিয়ে বর্ষার জল ও ময়লা জল নিয়ে যাওয়া হয়। নগরের কাহিনীও ভদ্রলোক বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ব'লে গেলেন মধ্যাহ্ন ভোজের সময়।

ইতিহাস :

আমেরিকা তখনও নিজেদের 'Nation' ব'লে অভিহিত করেনি, তারই সাতদিন আগে ১৭৭৬ সালের ২৭শে জুন লেপ্টনেন্ট জস্ জোয়াকিটএর অধিনায়কত্বে কিছু উপনিবেশকারী অতলান্তিক উপকূল থেকে তিন হাজার মাইল দূরে এই নির্জন প্রান্তে 'যারবা বুয়েনা'র (Yerba Buena) এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। এ ইতিহাসেরও আগের ইতিহাস আছে। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর পর্তুগীজ পর্যটক 'জুয়ান রোডরিগস্ ক্যাব্রিলো (Juan Rodriges Cabrillo) 'গোল্ডেন গেটে'র বাইরের উপসাগরে নোঙ্গর করেন ও 'ফ্যারালন' (Farallon) দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত ইংরাজ নাবিক 'ফ্রান্সিস্ ড্রেক্' বর্তমানে যাকে মেরিন কাউন্টি বলা হয় সেখানে নোঙ্গর ফেলেছিলেন ও রাণী প্রথম এলিজাবেথের জন্য এ জায়গাটীর নাম দেন 'নিউ এলিবিয়ন'। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সিবাষ্টিয়ান রোড্রিগস্ সারমেনো' (Cermeno) 'ড্রেক-উপসাগরে' প্রবেশ করেন ও আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের স্মরণে সানফ্রানসিস্কো উপসাগর নাম দেন। এর পর্তুগীজে নাম হ'ল—La Bahia de San Francisco। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট প্রথম আমেরিকান নৌজাহাজ (Eliza) 'এলিজা' ক্যাপ্টেন 'জেমস রোয়ানে'র অধিনায়কত্বে প্রথম বন্দরে প্রবেশ করে।

কাউন্ট নিকোলাই রেজানভ 'সিৎকা'র উপনিবেশে বুভুক্ষু ঔপনিবেশিকদের জন্য খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতে আসেন। এর প্রায় বিশ বছর বাদে ক্যালিফোর্নিয়া মেক্সিকোর গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় ও স্যানফ্রানসিস্কোয় (Presidio) প্রেসিডিয়োকে মেক্সিকো গণতন্ত্রভুক্তির শপথ গ্রহণ করতে হয়। ১৮৪১ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের জল-সমীক্ষার কাজ লেপ্টনেন্ট চার্লস্ উইলকসের অধিনায়কত্বে সুরু হয়। সিপাহী বিদ্রোহের এগার বছর আগে আমেরিকান্ ঔপনিবেশিকেরা 'সানোমা'র ক্যালিফোর্নিয়া গণতন্ত্রের খাক লাঞ্ছিত পতাকা উত্তোলন করেন। এক বছর পরে সান্তাক্লারার যুদ্ধ বিজয়ে উত্তর কেলিফেনিয়ার ইয়াংকি অধীনে আসে। ঐ বছরই 'ক্যালিফোর্নিয়া ষ্টার' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং 'যারবা বুয়েনা'কে 'স্যানফ্রানসিস্কো' নাম দেওয়া হয়।

হঠাৎ ১৮৪৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী জেমস্ মার্সেল আমেরিকান নদীর ধারে 'জন, এ, সুটারের' করাতকলের পাশে সোনা আবিষ্কার ক'রেন। এর পর চললো—বিরাট অভিযান—যাকে ব'লে (Gold Rush) 'গোল্ড'রাস্ এই নিয়ে নানা ইতিহাস, নানা উপন্যাস, নানা রম্যন্যাস রচনা হয়েছে ও রচিত হ'য়ে চলেছে। ১৮৪৯ সালে ২৪শে ডিসেম্বর প্রথম অগ্নিলীলা সুরু হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তখনকার দিনে সাড়ে বারো লক্ষ ডলার অনুমিত হ'য়েছিল (১,২৫০,০০০ ডলার)। ১৮৫০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫১ সালে পঞ্চম অগ্নিলীলায় বাংশটি ব্লক ভস্মীভূত হয় ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এককোটী বিশলক্ষ ডলার অনুমিত হয়। ১৮৫৫ সালে 'ক্যালিফোর্নিয়া কলেজ' স্থাপিত হয় ও পরে তা 'ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হয় তেরো বছর বাদে ১৮৬৮ সালে। ১৮৭৫ সালে 'ব্যাঙ্ক অব ক্যালিফোর্নিয়া' ফেল হওয়ায় ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট (W. C. Ralstan) রলষ্টন সাগরের জলে ডুবে আত্মবিসর্জন করেন।

সবচেয়ে বড় ক্ষয় ক্ষতি হয় ১৯০৬ সালের ১৮ই এপ্রিল। সেদিন স্যানফ্রানসিসকোবাসীর এক মহা দুর্যোগের দিন। মুহুর্মুহু ভূকম্পন সুরু হ'ল। সমুদ্রের উপকূলের সাগরতল ব'সে যাবার ফলে উপকূলের ভাঙ্গন ওপরে উঠতে থাকে। যেখানে ভূতাত্ত্বিক গলদ (Fault) ছিল সে স্থানটী আট (৮') ফুট বসে যায়। এরকম মাটী ও সাগরতলের নড়াচাড়ায় ভূ-ভাগের সামান্য নড়চড় হয়, যার সাধারণ পরিমাণ এক ইঞ্চির পাঁচ ভাগের একভাগ। হুড়মুড় ক'রে বাড়ী ঘরদোর পড়তে থাকে। চারিদিকে ধুলোয় ধুলোময়। নানা জলন্ত উনুন থেকে সারা সহরে আগুন ধরে যায়। এই ক্ষয়ের পরিমাণ অর্থমূল্য ৩০ কোটী ডলার। কত যে জীবজন্তু মৃত ও আহত হয়েছিল তার সীমা পরিসীমা ছিল না।

ফ্রিস্কোর সেতু :—

এখানেই পৃথিবীর দীর্ঘতম ও উচ্চতম সেতু নির্মিত হয়। 'গোল্ডেন গেট' সেতু হ'ল উচ্চতম সেতু; এটির তীরস্তম্ভ সমুদ্রপৃষ্ঠের লেভেল থেকে ৭৪৬ ফুট উঁচু এবং দুই তীর থেকে ঝোলানো দুটা তারে আবদ্ধ গাড়ী ও মানুষ চলার পাটাতন। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এই পাটাতন ২২০ ফুট উঁচুতে। দুটী তীরস্তম্ভের ব্যবধান ৪২০০ ফীট ও মোট দৈর্ঘ্য হ'ল ৮৯৪০ ফীট। সমস্ত ভারগ্রাহী 'কেবল' (Cable) তৈরী হয়েছিল ২৭,৫৭২টী তার পাকিয়ে। এটীর তীরস্তম্ভ মাথা চাপে ও তাপে সাতফুট হেলতে পারে। ১৯৩৩ সালের ৫ই জানুয়ারী কাজ সুরু হয় ও ১৯৩৭ সালের ২৭মে এটি যান চলাচলের জন্য খোলা হয়। এই সেতুর উপর চলাচলের জন্য ৫০ সেণ্ট উপশুল্ক লাগে।
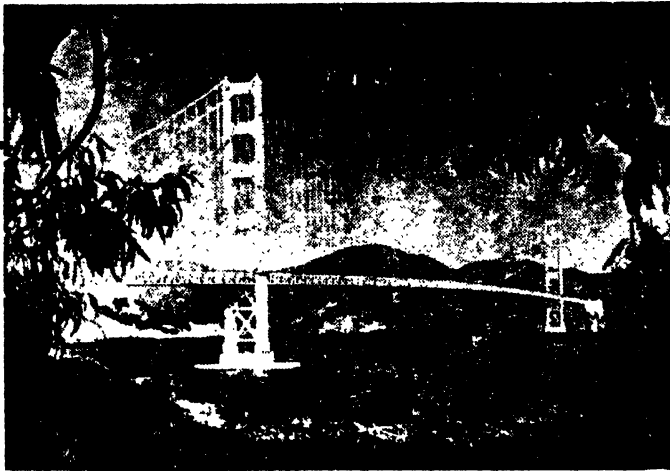
পৃথিবীর উচ্চতম সেতু বিরাট "গোল্ডেন ব্রীজ"

স্যানফ্রানসিসকো—'ওকল্যাণ্ড বে-ব্রীজ' ছোট কথায় 'বে ব্রীজ' বলা হয়, সেটি লম্বায় প্রায় ১২ মাইল। গভীর জলের অংশে সেতুর তলের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সবচেয়ে বেশী হ'ল ২১৬ ফীট। এর মাঝের অংশে একটি বৃহৎ সুড়ঙ্গ আছে—সেটি ৭৬ ফুট চওড়া ও ৫৮ ফুট উঁচু। এর নির্মাণ সুরু হয় ৯ই জুলাই, ১৯৩৩ ও শেষ হয় ১৯৩৬ সালের ১২ই নভেম্বর। এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম সেতু।

আবহাওয়া ও জনসংখ্যা :—

এখানের আবহাওয়া একটু বিচিত্র। যখন তখন ঘন কুয়াশায় এর দিঙ্‌মণ্ডল ছেয়ে ফেলে। এখানে বারিপাতও বেজায় খামখেয়ালী ধরণের। মেরিন কাউণ্টিতে বছরে ৪৫ ইঞ্চি গড়ে বৃষ্টিপাত। আবার মূল স্যানফ্রানসিস্‌কোতে বছরে ২২ ইঞ্চি গড় বৃষ্টিপাত। উপকূল অঞ্চলে শীত না থাকায় প্রধান ঋতু হ'ল দুটী—গ্রীষ্ম ও বর্ষা। বর্ষা হয় অক্টোবর থেকে মে মাস পর্যন্ত। স্যানফ্রানসিস্‌কোর লোকসংখ্যা কি রকম ভাবে 'গোল্ড রাসে'র সময় থেকে বেড়ে চলেছে তারই পরিচয় নীচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে :

১৮৫০— ৩৪,৭৭৬
১৮৬০— ৫৬,৮০২
১৮৭০—১৪৯,৪৭৩
১৮৮০—২৩৩,৯৫৯
১৮৯০—২৯৮,৯৯৭
১৯০০—৩৪২,৭৮২
১৯১০—৪১৬,১১২
১৯২০—৫০৬,৬৭৬
১৯৩০—৬৩৪,৩৯৪
১৯৪০—৬৩৪,৬৩৬
১৯৫০—৭৭৫,৩৫৭
১৯৬০—৭৪২,৮৫৫
১৯৬৫—৭৪৫,০০০ (আনুমানিক)

১৯৬০ সালে লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়া একটু বিস্ময়কর। নতুন যাঁরা তাঁরা ফ্রিস্কো ছেড়ে সংলগ্ন ওকল্যাণ্ড, বার্কলে প্রভৃতি জায়গায় উঠে গেছেন ও যুদ্ধোত্তরকালে সামরিক চঞ্চলতা হ্রাস পাওয়ায় লোক সংখ্যাও কিছু হ্রাস পেয়েছে।

মুখ্য বাস্তুকার আমায় কতকগুলি রিপোর্ট ও বই দিলেন তা' ডন এণ্ডারসনকে পোষ্টাপিসের মারফৎ কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে বললাম। আহারাদি পর্ব সেরে বেলা একটা নাগাদ আমরা ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের রাজধানী স্যাক্রো-ম্যাণ্টোর (Sacromanto) পথে রওনা হ'লাম। ওখানে আমাদের দুটো কাজ। একটি হ'ল সেনেটর ডাঃ টীল (Senator Dr teale) এর সংগে সাক্ষাৎ ও 'ফলসম হ্রদ উন্নয়ন পরিকল্পনা'র একটা খসড়া (Eldorado) এল-ডোরাডো কাউন্টি ওয়াটার এজেন্সীর কাছে পেশ করা।

স্যানফ্রানসিসকো থেকে যে সেতু পার হ'য়ে উত্তর মুখে ৮০ নং রাজপথ ধরে চলতে লাগলাম। নতুন হাওড়া সেতুর ক্ষুদ্র সংস্করণ সেক্রোম্যানটা নদীর উপর 'কারকুইনেজ সেতু' পার হয়ে 'ভেলেহো' সহরের মধ্যদিয়ে আমাদের মোটর চলল, চালক ডন এণ্ডারসন। সেক্রোমানটো নদী গত দ্বিতীয় মহাসমরের যুদ্ধ জাহাজে ঠাসা। সারি সারি সাজানো রয়েছে, নদীর বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে। ভেলেহো এক সময় এই অঞ্চলের রাজধানী ছিল। এটা

পৃথিবীর দীর্ঘতম সেতু "বে ব্রীজ"

সামরিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ভেলেহো ছেড়ে 'ফেয়ারফিল্ড', 'ভ্যাকোভিল' 'ডেভিস' পার হ'য়ে সেক্রোমেণ্টোয় এলাম। স্যানফ্রানসিসকো থেকে সাক্রে-ম্যাণ্টো ৮৫ মাইল পথ। প্রথমেই আমরা বিধান সভায় চললাম সেনেটর ডঃ টীলের সন্ধানে। কার্ড পাঠানো হ'ল ও অমনি তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। 'ফলসন-হ্রদের উন্নয়ন' সম্বন্ধে তাঁর সংগে কিছু আলোচনাও হ'ল। তিনি আমাদের বিধান সভার কক্ষে মাননীয় অতিথির আসনে এনে বসালেন। তখন বিধান সভার কাজ চলেছে। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ছিলেন ডাক্তার টীলর্ এলেন দেখা করতে। তাঁর ভারতের সংগে পরিচয়ের ইতিহাস বললেন। জিগ্যেস করলেন—কেমন দেখছেন আমাদের বিধান সভার কাজ?

—সুন্দর।

—আপনাদের দেশে মেয়েদের ভোট আছে?

—ভোটতো আছেই—

—বিধানসভায় সভ্য নির্বাচনে জনগণ, বিশেষ ক'রে মেয়েরা—মতামত কতটা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে?

—এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না কি যে বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হ'লেন একজন মহিলা। আর আপনাদের দেশে রাষ্ট্রদূতরূপেও আমরা একজন মহিলাকে পাঠিয়েছিলাম; যদিও সবাই নেহরুর সংগে রক্তের সম্বন্ধে একজন মেয়ে অপর জন ভগিনী। তা ছাড়া বাংলাদেশে দু'জন মহিলা মন্ত্রী: তা ছাড়া প্রতিনিধি তো রয়েছেই। আপনাদের এখানে কজন মহিলা প্রতিনিধি?

—কি, কৈ, কারুর কথাতো মনে পড়ছে না! অন্তত এবার একজনও নয়।

সেনেটর লুনাডি এসে করমর্দন ক'রে কুশল জেনে গেলেন। তারপর এলেন সেন প্যাটারসন। বিধানসভার কক্ষ থেকে বেরিয়ে বেলা সাড়ে চারটা নাগাদ গেলাম রাজ্যসরকারের প্রধান স্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে। তিনিও আমাকে কয়েকটা ভারী ভারী কাজের বই দিলেন। উনি আমাদের সঙ্গে যাবেন নৈশ ভোজে। আমাদের 'ফলসন হ্রদের উন্নয়ন' প্রস্তাব, পেশ করতে হবে রাত সাড়ে আটটায়। আহারাদি সারতে সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। আমাদের এর পর সহরের দ্রষ্টব্য অট্টালিকাগুলি গাড়ী চ'ড়ে চলতে চলতে দেখে নিলাম ও সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ চললাম ফলসন হ্রদের কাছে এলডোরাডো কাউন্টি ওয়াটার এজেন্সির হ্যারি ডানলাপের সঙ্গে দেখা করতে। প্রায় মাইল চল্লিশ পথ অতিক্রম করে চ'লে এলাম এঁদের অফিসে। অফিসটি স্থানীয় জলকলের সংলগ্ন। বরানগর, কামারহাটি জলকলের মতই ছোট খাটো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই জলকল। ওঁদের আজকের সভায় কর্মসূচী অনুযায়ী অন্যান্য প্রস্তাব ছিল যা নিয়ে প্রথম আলোচনা হ'ল ও সবশেষে ডন এণ্ডারসন ওঁদের শেষ কর্মসূচী অনুযায়ী তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন। আমি বহিরাগত ও ডনের সহযাত্রী। ডন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বিরাট মানচিত্র খুলে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করার কাগজপত্র তৈরি ক'রে দেবার ও অনুসন্ধানের ভার নেবে ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স। ও'টি হ'ল মক্কেল ধরার এক ফিকির। আমরা সমস্ত প্রস্তাব শুনলাম। তারা শুনবার পর আমায় অভিমত দিতে বললেন। আমি তখন বললাম যে এ'টির ব্যয়ভার মুখ্যতঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকার বইবেন। এতে রয়েছে ছোট একটি সম্প্রদায়ের গভীর দূরদর্শিতার দৃষ্টিভঙ্গী; কেননা উন্নতিশীল সমাজে নাগরিকতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। নাগরিকদের অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে মুখ্যতঃ শিল্পে। শিল্পসামগ্রী উৎপাদনে জলের প্রয়োজন ও নাগরিক জীবনে বিশেষ ক'রে এদেশে জলের প্রচুর প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে আপনাদের এলাকা সংলগ্ন ফলসন হ্রদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সেই জলকে যাতে দূষিত হ'তে না দেওয়া হয় ও উচ্চমানের জল সরবরাহের উৎস যাতে করা যায় তারই কথা বলা হয়েছে। এই শুধু প্রস্তাবে রয়েছে দূরদর্শনের পরিচয়। আপনারা হবেন এ নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পথিকৃৎ, আপনাদের উত্তরপুরুষদের শ্রদ্ধাভাজন ও ধন্যবাদের পাত্র। সরকারী দপ্তরে তদ্বির তদারকের ভার ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের। প্রায় বিনা মূল্যেই যদি স্থানীয় উন্নতিরও সূচনা হয় কোন্ না বুদ্ধিমান নাগরিক তা' না গ্রহণ করবেন।"

বোঝা গেল ভদ্রলোকেরা বিশেষ খুশী হয়েছেন। ফেরার সময় ডন এণ্ডারসন বলল যে তুমি আমাদের কোম্পানীর উকীলের কাজ করেছ। এণ্ডারসনকে তামাসা করে বললাম—'বিনা পয়সায় গাড়ী চড়ানোর মূল্য দিলাম।'

কাজ শেষ হ'তে রাত প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেছে। ফিরতে হ'বে প্রায় দেড়শো মাইল পথ। এণ্ডারসনের বাড়ী থেকে আমার মোটেল প্রায় ১৫ মাইল। ডনকেই আমায় পৌছে আবার ফিরতে হবে। তাতেও লাগবে কোন না আরও এক ঘণ্টা। তাই সে প্রস্তাব করল

—তুমি যদি কিছু মনে না কর, আজ রাতটা আমাদের বাসায় শুয়ে গেলে চলেনা? তা' হ'লে দুজনেই ঘুমোবার সময় পাব। ফিরতে প্রায় রাত দেড়টা দুটো হবে।

—তোমার যদি সুবিধে হয় তো আমার আপত্তি কি?

—আমার অত্যন্ত সুবিধে হবে। কাল সকালে আবার আমাদের বেরুতে হবে তার জন্য রাতে একটু ঘুমেরও প্রয়োজন।

—তোমার বাড়ীতে কি বাড়তি বিছানা আছে? রাত্তির বেলায় কেন ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করবে?

—বিরক্ত মোটেই নয়। তিনি আমাদের জন্য জেগে থাকবেন না।

তা হ'লে তুমি কেমন করে ঘরে ঢুকবে?

—আমার কাছে চাবি আছে। সেই চাবি খুলে আমি ঘরে ঢুকবো তবে টেলিফোনে আমায় বলে দিতে হবে মিসেস্‌কে তোমার জন্য একটা বিছানা অতিথিদের থাকার ঘরে ঠিক ক'রে রাখতে। আমি রাজি হ'তে একটা জায়গায় গাড়ী থামিয়ে সে বাড়ীতে টেলিফোন করলো ও আমার বিছানা তৈরি ক'রে রাখতে বলল। আমরা দোকানে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেট্রোল নিয়ে নিলাম ও সংলগ্ন একটা 'স্ন্যাক্ বারে' দুটো 'আইস ক্রীমের কোন' কিনে খেলাম। ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো খিদে পেতোনা। জেগে থাকার জন্য খিদে যে সামান্য পায়নি একথা শপথ ক'রে বলতে পারবো না।

রাত দেড়টা নাগাদ ওদের বাড়ী এসে আমার জন্য তৈরি বিছানায় লেপের তলায় শুয়ে পড়লাম। আমার বিছানা দেখিয়ে ডন নিজেও আপন ঘরে চ'লে গেল। ভোর হ'তে না হ'তেই ঘুম ভেঙে দেখি কাচের জানালায় গায়ে একটা বিরাট এলশেশিয়ান। দরজ'টা মজবুদ ক'রে বন্ধ করে দিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না ডন এসে আমায় প্রাতরাশের জন্য ডাকে। আমার ইংরিজি ডায়েরিটার অসমাপ্ত অংশটি শেষ করে নিতে লাগলাম।

সকালে শ্রীমতীর সঙ্গে আবার আলাপ হ'ল। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবার জন্য আহারাদি করার টিফিন নিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো। তারপর আমরা তিনজনে ব'সে প্রাতরাশ সেরে অফিসের দিকে বেরুলাম। প্রচুর অবকাশে আমি এখানেই প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি পর্ব সেরে নিলাম।

পরের দিন ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অফিসে এসে এদের

কর্পোরেশনে'র এক রাসায়নিক কারখানা থেকে যে ব্যবহৃত জল বেরোয় তাঁর ফলে উপসাগরের জলে যে প্রতিক্রিয়া হয় নৌকার এবং জলযানের ইস্পাত ও পেতলের হাল, পেরেক ও 'ইম্‌পেলার' ইত্যাদি ক্ষয়ে যায় তার জন্য রাজ্যসরকারও কাইজার কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মাছধরা ও সৌখিন লঞ্চের মালিকরা আদালতে এক অভিযোগ আনেন ও সেই বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সকে গবেষণা চালাতে বলে। পরীক্ষা ও গবেষণায় দেখা গেল যে কাইজার কর্পোরেশনের রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের ধৌত জলই দায়ী। এখন মোকদ্দমায় জজসাহেব ক্ষতির পরিমাণ কত নির্ণয় করবেন তা' দেখা যাবে। এরা একটি পরীক্ষায় উঁচলা চাপা-পড়া জায়গা থেকে কী রকম ও কত গ্যাস উৎপন্ন হ'য় ও কেমন করে তা সংলগ্ন মাটিতে কতদূর পর্যন্ত চলে যায় তারই নির্ণয় পর্ব চালিয়েছেন। এদের উপদেষ্টা হ'লেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড পিয়ারসন। 'রালফ কার্টার' নিয়ে গেল আমায় ড. পিয়ারসনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। তাঁর সঙ্গে সামান্য আলোচনা ক'রে আমরা গেলাম মধ্যাহ্ন ভোজের টেবিলে। সেখানে চলেছে এক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনাচক্র। সেখানে ইস্‌রাইলি, জারমান, বৃটিশ, ফিলিপিনো ও নানা দেশের অধ্যাপকেরা আহারের টেবিলে মিলিত। এখানে চ'লে রাজনীতির মুক্তচর্চা। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যা কিছু করুন না কেন প্রশান্ত মহাসাগরের পুর্ব উপকূল থেকে তখনই তার প্রতিবাদ উঠবেই। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সমরসচিব 'ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ নিয়ে তীব্র সমালোচনা, ও বিরুদ্ধ মত, T. V-র মাধ্যমে প্রচার ক'রে চলেছে। এখানে 'বীটোরদলের কিছু বেশী প্রাদুর্ভাব। আমি এদের বলি 'বিটলে'। চুল বড় ক'রে রাখা, জুতো অপরিষ্কার ক'রে পরা, বে একেলে রকমের দাড়ি, চুলের উপর যত্ন ক'রে অযত্ন ভাব (Carefully carelessness) দেখানো। মেয়েরাও খালি শুভ্র পদে পথ হেঁটে চলেছেন কোলের ছেলেটাকে টানতে টানতে নিয়ে। পায়ে নেই উরু পর্যন্ত বেরকরা নাইলনের মোজা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই এখানে ছাত্র সমাবেশ হয়।

বৈকালে সহকারী ডিরেক্টর ডঃ ফুয়ার-ষ্টিনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচমণ্ডের পরীক্ষাগারের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখতে গেলাম। রেডিও একটিভ্ বিষয়ে গবেষণা, নোনাজলকে মিঠে জলে পরিণত করার
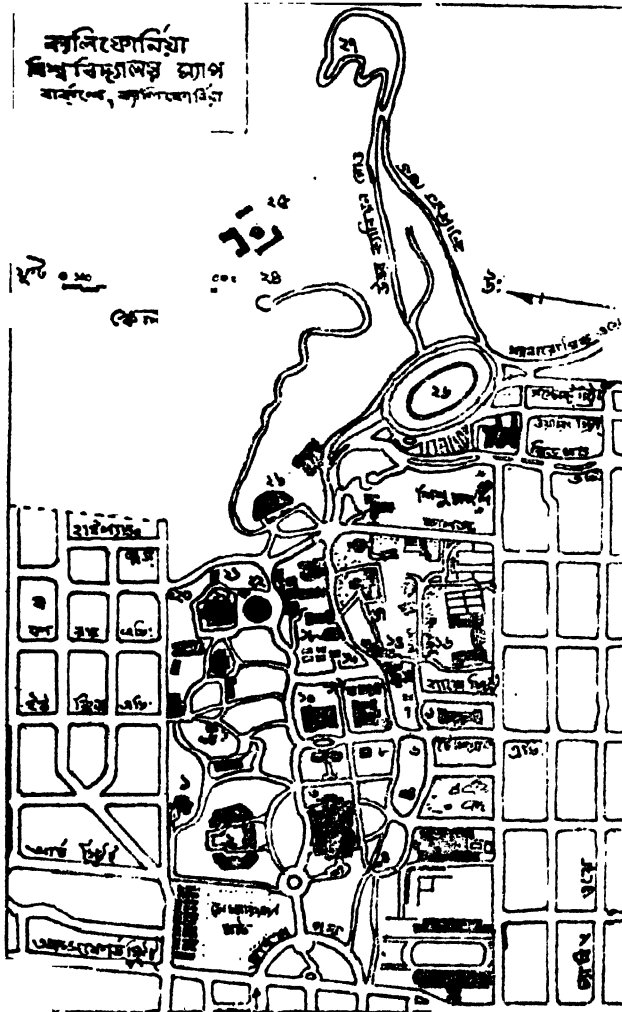
পরীক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চলছে। সেখান থেকে ফিরে এলাম ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের অফিসে।

চায়না টাউন : আজ সন্ধ্যায় নিয়ে যাবে অফিসের অন্তবন্ধুরা ও ডঃ উ আমাকে 'চায়না টাউনে'র এক বিখ্যাত হোটেলে। সহরের মধ্যে সহর দেখতে চান তো চলে আসুন স্যানফ্রানসিসকোর 'চায়না টাউনে"। মনে হবে, হয় পিকিং, নয় কুওমিং, নয় ক্যান্টনে এসে হাজির। এই সহরের ভেতরে সহরের এক বৈশিষ্ট আছে। জনস্বাস্থ্য গণশিক্ষা ও আরক্ষ ব্যবস্থা ছাড়া ওরা নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই সমাধা করে এক শক্তিশালী "Chinese Six Company"র মাধ্যমে। রাস্তায় নিয়ন্‌সাইন জ্বালানো। চীনা হরফে লেখা সাইনবোর্ড বহু দোকানে দোকানে। প্রাচীন চীনা আহার্যের মহাসমারোহ। শুকনো নুন দেওয়া শুঁটকী মাছ, রাস্তার ধারে টবে ভেজানো গুগ্‌লি, শামুক, ভাতে ভর্তি রোষ্টকরা হাঁস; কোথাও বাঁশের কোঁড়, পাৎলা বীণ, মটরশুঁটি, তরমুজ, আরও কত কী। চীনা প্রাচীন দ্রব্য-সম্ভার (Curio) পর্যটকদের সংগ্রহ করার আকাঙ্খা উন্মেষিত করে। গ্র্যান্ট অভিন্যু হ'ল এর মুখ্য রাজপথ। চলে গেছে চীনা পল্লীর মধ্যদিয়ে বুশ ষ্ট্রীট পর্যন্ত। এদের একটি চীনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আছে। সেখানে চীনা ভাষায় কথা কওয়া হয়। এখানে আবার চীনা YMCA ও YWCA চীনা আগন্তুকদের বড়ই সাহায্য করে। এখানে চীনা নববর্ষের এক বিরাট উৎসব হয়। আগের দিন ঘরদোর পরিষ্কার করা হয় কেননা পরের দিন ঝাড়াঝুড়ো ক'রে ময়লা বাইরে ফেললে ভাগ্যও নতুন বছরের সঙ্গে সঙ্গে চ'লে যাবে এমনিই তাদের সংস্কার। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও সেদিন রাত্তির দুটো তিনটে পর্যন্ত জেগে থাকে। নববর্ষের প্রথম দিনে (অর্থাৎ কনফুউসিয়াসের জন্মদিনে) নিরামিষ ঝোল (গাইগাম) ও কমলালেবু দেওয়া হয়; তাও বেলা একটার পর। দ্বিতীয় দিনেও নিরামিষ আহার। তৃতীয় দিন থেকেই নানান রকমের আমিষ আহারের ব্যবস্থা। সপ্তমদিনে ড্রাগন নৃত্য দিয়ে উৎসব শেষ।

'চায়নাটাউনে' লিটল পীটের 'গাই সিন সীয়ারের (Gi Sin Seer) দলের সঙ্গে বিপক্ষদলের লড়াই ও খুনোখুনি হয় যার ফলে বাটটি জীবন বিনষ্ট হয়েছিল। এ দ্বন্দ্ব চলে প্রায় সাত বছর ধ'রে 'ওয়ান লেন' বা Lily Foot' নামে ক্রীতদাসীদের রানীকে কেন্দ্র ক'রে। লিটল পীটেকে 'বো সিন সীয়ারের' (Bo Sin Seer) এর দল হত্যা ক'রে। হাজার হাজার পা-বাঁধা ক্রীতদাসীদের গণিকালয়ের নারকীয় জীবন যাপন করতে হ'ত। একসময় এটা একটা গুণ্ডামি, বদমায়েসী, জুয়ার আড্ডা ছিল। আগে কলকাতায় যেমন 'ফীয়ার্স লেনে' যে কাণ্ড চলতো। 'সেন্ট মেরীর স্কোয়ারে সান ইয়াৎ সেনের এক লাল গ্র্যাণাইটের প্রস্তরমূর্তি। পূর্বে চীনের দিকে হাতবাড়িয়ে ষ্টেনলেস ষ্টিলের জামা পরে দাঁড়িয়ে আছেন তলায় ইস্পাত ফলকে লেখা আছে :

Father of Chinese Republic and First President····· Champion of Democracy··· Preponent of peace and Friendship among Nations."

অন ব্রডওয়ে থিয়েটার :—

আহারের পর ৪৩৫ নং ব্রডওয়েতে, 'On Broadway Theatre'এ আমরা 'জন ও' হারা' (John O' Hara) রচিত এক মিলনাত্মক হাস্যোদ্দীপক 'Once over Nightly' নামক নাটক দেখতে গেলাম। এটি কীথ্‌ রকওয়েলের (Keith Rockwell) প্রযোজনায় অভিনীত হচ্ছে। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন রাত সাড়ে আটটায় অভিনয় সুরু হয়। শনিবার দুবার রাত ৭।। টায় ও রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে। নির্দেশন দিয়েছেন মাইকেল ফ্যারেল, দৃশ্যপটে গান স্নাইডার, আলোক সজ্জায় 'এলেন কোল' ও 'ব্রূস লাভলেভী' আছেন। অভিনয়ের সময়ে মদ দেবার ব্যবস্থা আছে। ককটেলের জন্য ১ ডলার ৫ সেণ্ট, বীয়ারের জন্য ৭৫ সেণ্ট, মিষ্টি জলের জন্য ৫০ সেণ্ট। অভিনয়ের পর অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা ষ্টেজ থেকে নেমে এসে দর্শকদের সংগে আলাপ পরিচয় করেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রত্যেকেই বহু রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন, যেমন 'গ্র্যান্ট সুলিভ্যান,' 'মেরিয়াম ওয়ালটন্স', 'রাস বেভার,' 'পীটার হ্যারিস', 'কেবিন হক', 'মেলেভীত্রীটঃ, 'বাক কেসী', 'জেলেন পুনিস' প্রভৃতি। নাট্যকার এই পঞ্চম নাটকের

পর তাঁর ষষ্ঠ নাটক Twice Yearly, Darling সম্প্রতি শেষ করেছেন।

এখানের রঙ্গমঞ্চটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দুই বাহুর মধ্যে অর্থাৎ এক কোণে অবস্থিত। দর্শকদের বসতে হয় চতুর্ভুজের কর্ণের সমান্তরাল হ'য়ে। সাধারণ নিয়মানুযায়ী যদি বাহুর সমান্তরাল হ'য়ে দর্শকদের বসতে হত তো পূর্ণ মঞ্চটি ভাল করে সবাই একসঙ্গে দেখতে পেতেন না। অভিনয় শেষ হ'ল রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায়। বহুদিন ধ'রে চলার জন্য বিশেষ ভিড় হয়নি আজকের অভিনয়ে। তবে ক'লকাতার মত এত রঙ্গমঞ্চ পৃথিবীর কোন সহরে নেই যেখানের সারা বছর ধ'রে নিয়মিত অভিনয় হয়।

প্লেবয় ক্লাব :—

এখানে স্তনোচ্ছলতা ও নগ্নতার মাত্রা অত্যধিক। আরও বেশী বাড়াবাড়ি চলেছে Toplessরা মোকদ্দমায় জিতে। Topless হয়ে বেরুনো আইন সিদ্ধ কিনা। এই মোকদ্দমায় কারুর ব্যক্তিগত জীবনে তার রুচিমত চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করা তার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা কি না? এই সব বিষয়ে আদালত রায় দিয়েছেন যারা যেমন খুশী তারা তেমন চলতে পারেন। ব্যক্তিস্বাধীনতায় 'প্রদেশের আইন' হাত দিতে পারেনা। এরকম নাইট ক্লাবে রায়ের প্রয়োজনীয় অংশের নকল ও অনাবৃত অঙ্গ শোভা প্রকাশ করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গবাক্ষে টাঙ্গানো রয়েছে।...

আজ বুধবার রাত্রে নিয়ে যাবে এণ্ডারসন ডিনারে তার PLAYBOY CLUBএ। আমি ব'লেছিলাম সম্ভব হ'লে হার্ভের মেয়ে 'লীন'কে ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নেমন্তন্ন করতে; তাকে একবার দেখবো। এণ্ডারসন তাকে আসতে বলেছিল। সেও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল ও বলেছিল তার 'বয়ফ্রেণ্ডকে' নিয়ে আসবে। লীন 'বালকসখা'কে নিয়ে তার ছোট গাড়ীটা চেপে চ'লে এল 'প্লে-বয় ক্লাবে'।

সভ্য বা সভ্যাদের বন্ধুবান্ধব ছাড়া ওখানে প্রবেশ নিষেধ। ক্লাবের দরজার চাবি প্রত্যেক সভ্যের কাছে থাকে। ক্লাবের বার্ষিক চাঁদা একশো ডলার। এরা PLAY BOY নামে রঙিন সচিত্র মাসিক পত্রিকা বের ক'রে। বহুলোক কেনে শুনেছি। চাবি না দেখালে ঢুকতে দেবে না। দরজা একটু ভেজানো ছিল। আমরা বাইরে রোয়াকে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধুকন্যা ও তার বালকসখার জন্য অপেক্ষা করছি। তার বালক সখা (যাঁরা ভবিষ্যতে সখা থেকে স্বামিত্বে উন্নীত হন) ও লীন এসে হাজির।

—হ্যালো, গুড ইভনিং।

—গুড ইভনিং ডারলিং! আমার সঙ্গে কয়েকদিন তোমার বাবা মার বদলে টেলিফোনে কথা-হয়েছিল। যে সময় তোমার বাব-মা বেরিয়ে যান, আমি তোমাদের বাড়ীর কর্তা হ'য়ে বাড়ী আগলাই। তুমি যে সংবাদ দিয়েছিলে সে কথা তোমার বাবা-মাকে পরের দিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে বলি।

সে হাসে। আমরা চারজনে এণ্ডারসন ক্লাবের চাবি দেখাতে ঘরে ঢুকতে দিল। প্রায় মুক্তস্তনী বিবসনা সুন্দরী সেবিকা এসে ডনের নাম লিখে নিল। ঐ নাম আজ ক্লাবের বোর্ডে উঠবে কোন্ কোন্ সভ্য আজ হাজির আছেন জানাতে। এখানের সেবিকারা সত্যি কিশোরী, যুবতী ও সুন্দরী। অনেকেই অতি ভদ্রঘরের। তাদের নিজের বাড়ীর ঠিকানা বা টেলিফোন নম্বর কোন সভ্যদের দেওয়া নিষেধ। যদি জানা যায় তো কর্তৃপক্ষ বিরূপ হ'য়ে তাদের এখানে প্রবেশ নিষেধ ক'রে দিতেও পারেন। এদের বিশেষ খরগোসের মত সাজ। মাথায় তাদের খরগোসের মত কান বাঁধা ও পাছায় পাউডারের পাফের মত সাদা থোবনা। বুকের খানিকটা আবৃত ক'রে রংমেলানো কাঁচুলি। ঘাড়ের উপরে এসে মিষ্টি গলায় কী পানীয় দিতে হ'বে তারই অর্ডার নিয়ে যাচ্ছে। মদ বেচেই এই ক্লাবের বেশী খরচ ওঠে। বিক্রীর কমিশনে এই মেয়েদের মাইনে দেওয়া হয়।

এইসব মিষ্টি মেয়েদের জন্য আমার বড় করুণা হয়। আবার ভাবি বিয়ের দায়িত্ব তো বাপ মায়ের নয়। এতো যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে যেমন বর জোটাবে তার তেমনি বিয়ে হবে। একটা টেবিলে আমরা চারজনে ব'সে একটু নরম ও কড়া পানীয় যে যার মত নিচ্ছিলাম। ডনের একটু কড়া পানীয় চাই।

লীনের বালকসখাকে নানা ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করছিলাম। গাড়ীতে বাড়ী ফেরার সময় শুনলাম এ'দিকে 'লীন' ডন এণ্ডারসনের সঙ্গে বিবাহের আগে যৌন-সম্ভোগ হওয়া উচিত কিনা এই সব নীতিবাদ ও যৌন-বিজ্ঞানের আলোচনা করছিল। ডনকে বললাম 'চেহারার তুলনায় মেয়ে ত বেশী পাকা মনে হচ্ছিল।' ডন রোমান ক্যাথলিক। তার নীতিতে বাধছে। তাই সে আর একদিন হার্ভের মেয়ে লীনকে তার নিজের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করলো যাতে তাকে কিছু নীতি ও ধর্মের উপদেশ দেওয়া যায়। উপদেশ নেবে কে? তবু আমি বললাম 'যেহেতু তুমি New Sphere আন্দোলনের এক কর্মিষ্ঠ মহাপাণ্ডা, তোমার এ বিষয়ে কিছু করা উচিত। আচ্ছা ডন, এ ছেলেটাও তো লীনের প্রায় সঙ্গেই পড়ে। বিয়ে করলে খাওয়াবে কি?

ডন বললে—আমি জানি না, তবে রকমসকম ভাল নয়।

একবছর বাদে ওর বাবা-মা ওদের বিয়ের সংবাদ দিয়ে নেমন্তন্ন পত্র পাঠিয়েছিলেন।

Dr. & Mrs. Harvey, F, Ludwig request the honour of your presence at the marriage of their daughter Lynne Diane to Mr. James Burton Roe on wednesday, the fourteenth of June, nineteen hundred and sixtyseven at eight thirty O' clock in the evening Stanford University Chapel, Stanford, California.

হার্ভে যখন অল্পদিন আগে কলকাতায় এসেছিল, তখন আমি জিগ্যেস করেছিলাম—

—বিয়ে তো দিচ্ছ। দুটাই ছাত্র। কেউই রোজগার করে না। খাওয়াবে কে?

—তাদের বাপেরা।

—অর্থাৎ তুমি।

—আমি আমার মেয়ের খরচ দেবো; ছেলের বাপ ছেলের। হার্ভের মারফৎ তাকে বিয়ের উপহার পাঠিয়ে দিলাম। আমরা খানিকক্ষণ ক্লাবে বসে Floor show দেখলাম 'অতি নিম্নমার্গের মস্করা। তিনতলায় উঠে নিজের পছন্দমত প্রচুর আহার নিয়ে নৈশভোজ সমাপ্ত করলাম।

বুধ আর বিষ্যুৎবার আমার East Bay Municipal District-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও পরিদর্শন ক'রে কাটলো। দেখলাম, ওঁরা হ্রদ থেকে জলের নমুনা হেলিকপ্টারে ক'রে তুলে নিয়ে আসেন। ভাড়া করা এই হেলিকপ্টার। এঁরা আমাকে প্রচুর রিপোর্ট ও নক্সাপাতি দিলেন ও ওদের প্রকাশিত বহু বই দিলেন। সেইসব দাহ্যপদার্থগুলি 'ডনে'র স্কন্ধে জাহাজে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে বললাম।

বৃহস্পতিবার রাত্রে 'রাল্‌ফ কার্টার' তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির—আমায় ওকল্যাণ্ড থেকে স্যানফ্রান্সিসকোর ফিসারম্যা'ন হোয়ার্ফের কাছে কোন এক প্রসিদ্ধ হোটেলে নিয়ে যাবেন। শ্রীমতী কার্টার অতি শান্ত প্রকৃতির মহিলা, উচ্ছৃঙ্খলতা কিছু কম, নম্রতাই বেশী। আমরা তিনজনে 'বে সেতু' পার হ'য়ে চ'লে গেলাম এক হোটেলে, যেখানে পুরোনো মরচে ধরা নঙর দরজার দুপাশে রাখা আছে আর রয়েছে পুরোনো হাল। সেখানে মৃদু আলোয় আমরা সামুদ্রিক মাছের একই মূল্যের ডিসের অর্ডার একসঙ্গে সবাই দিলাম। আজ আর থিয়েটার কি বায়স্কোপ নয়। আজ রাতের স্যানফ্রান্সিস্‌কো ও ওকল্যাণ্ড দেখে আসা। দূরে দেখা গেল নবনির্মিত বর্তমান স্থাপত্যের সরলরেখার সমন্বয়ে গঠিত 'মারমন মন্দির'টী। তলা থেকে আলোর প্লাবনে উদ্ভাসিত এই মন্দিরটীর এক গভীর আবেদন রয়েছে। আমি বললাম 'চলো দেখে আসি'।

সেখানে গিয়ে তাদের সদ্য সমাপ্ত মন্দিরটার প্রাঙ্গণে কিছু ঘুরে ও মন্দির দেখে ফিরলাম। আমাকে আপ্যায়নের জন্য অশেষ ধন্যবাদ দিলাম কার্টার দম্পতিকে।

পরের দিন শুক্রবার সকালে আমায় বিমানে চড়িয়ে দেবার ভার ডন এণ্ডারসনের। টিকিটতো কলকাতা পর্যন্ত কাটা আছে তাও আবার গোটা ছয়েক টিকিটের বইয়ে।

স্যানফ্রানসিসকো সহরের এক বিশেষ আবেদন আছে ভারতবাসীর কাছে।

১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল থেকে ২৬শে জুন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক এক মহাসম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে বিশ্বজাতি সংস্থার কার্যসূচী ও নিয়মাবলীর খসড়া প্রণয়ন

করা হয়। এইখানেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতের বাইরে যে আন্দোলন হয় তার মধ্যে লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে 'গদর পার্টির' অভ্যুত্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে 'গদর পার্টির' হেডকোয়ার্টার ছিল 'উড স্ট্রীটে'। ভারতীয়দের জমির মালিকানা ও মার্কিণ কন্যা বধূরূপে নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৪৮ সালে 'গদর পার্টি'র সমস্ত দলিল-দস্তাবৎ স্বাধীন ভারত সরকারকে দেওয়া হয়। আজ তা' দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। গোবিন্দ-বিহারীর আত্মচরিতে গদর পার্টির বহু গোপন তথ্য প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা। গদর পার্টির সভ্যরা অধিকাংশই পাঞ্জাব থেকে গিয়েছিলেন।

আবার এইখানেই স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মীয় প্রচার কার্য চালান। বর্তমানে ওকল্যাণ্ড ও স্যানফ্রান্সিসকোতে রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি প্রচার কেন্দ্র রয়েছে। স্যানফ্রানসিসকো বেদান্ত সোসাইটির আশ্রমটীর উপর এক তথ্যবহুল পুস্তক San Francisco—The Bay and the Cities নামক পুস্তকে নিম্নরূপ বিবরণ আছে। যথা—

193. Of polyglot design, the HINDU TEMPLE (open Wed. 8 p. m.), SW. corner Filbert Webster Sts., rears from its third story a bewildering array of minarets, cupolas, and towers of Gothic, Hindu, Shiva, and Moslem design. The upward-pointing architectural features of the temple, headquarters of the Vedanta Society, are intended to symbolize the goal of Vedanta teachings, ultimate perfection. To each of the six towers is attached a symbolic meaning: one, decorated with crescent, sun, and trident, symbolizes the path to knowledge through devotion and work. In the chapel and auditorium on the first floor above the altar hang two life-size portraits, one of Ramakrishna, patron saint of the Vedanta movement, the other of Swami Trigunatita, head of the temple at the time of its completion in 1904. Beside the platform is a large portrait of Swami Vivekananda, who brought Hinduism to the West and under whose guidance the temple was founded.

এই স্যানফ্রানসিসকোর বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় শতাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। স্যানফ্রানসিসকোকে Emporium of a New World বলে। এইখানেই এক অধ্যাপক ওপেন হাইমার বের করেছিলেন আণবিক বোমা ও এইখানেরই অধ্যাপকবিশেষ আলোচনা করেছিলেন শ্রীমদ্ভাগবৎগীতার। ইঞ্জিনিয়ারিং কৃতিত্বের ও উচ্চমার্গের পঠন পাঠনেরও এটি একটি কেন্দ্রস্থল, পূর্ব উপকূলের বৃহত্তম কেন্দ্রস্থল।

উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রকৃতিচেতনা

অধ্যাপক দেবনাথ দাঁ

নিসর্গ সংসারের রূপমাধুরীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্য শিল্পের নন্দনলোকে কি ভাবে রাজসিংহাসন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারো অবিদিত নয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যাঁহাদের কবিকল্পনা প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়াছিল, বঙ্কিম তাঁহাদের অন্যতম। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক আবেদন না থাকিলেও তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা কবিতায় প্রকৃতিকে অকুণ্ঠিত আসন দিয়া গিয়াছেন। তারপর বাংলা কবিতায় প্রকৃতিকে দেখা যায় বিচিত্র রূপে। উনিশ শতকের গোড়ার দিক হইতে ফরাসী এবং ইংরাজী সাহিত্যে যে নূতন রোমান্টিক নিসর্গ-চেতনা জন্মলাভ করে, তাহারই প্রোজ্জ্বল ছায়াসম্পাত দেখি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কবিতায়। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বিহারীলালের সাহিত্যকর্মে প্রকৃতি কখনো প্রেমময়ী রমণীর সঙ্গে উপমিত (প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে—বিহারীলাল), কখনো মানবহৃদয়ের অমূর্ত ভাবের মূর্ত সিম্বল (মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের সমুদ্রের ওই বিশালতা ও ধ্যানগম্ভীর মৌন মহিমা আসলে রাবণের তৎকালীন হৃদয়ের প্রতীক), কখনো মানুষের আত্মার আত্মীয় রূপে কল্পিত (হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি'—হেমচন্দ্র)। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়েই তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার অমৃত-বর্ষী সোনার লেখনী। কিন্তু প্রকৃতিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনি যে অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে বোধহয় সমকালীন কবি শিল্পীদের তুলনা চলে না। বঙ্কিমের নিসর্গচেতনা হেমচন্দ্রের মতো শুধুমাত্র বিদেশী সাহিত্যপাঠের পথে আসে নাই, বিহারীলালের মতো একান্তভাবে আত্মলীন নয়। লোকোত্তর কবিপ্রতিভার অধিকারী মধুসূদনের কাব্য সাহিত্যে প্রকৃতি কল্পনার মৌলিকতা কোথাও কোথাও অপূর্ব সুন্দর হইলেও একথা স্বীকার করিবার উপায় নাই, তাঁহার সাহিত্যে মানব জীবনের বর্ণোজ্জ্বল আলেখ্যের কাছে প্রকৃতির স্থান নিতান্ত সঙ্কুচিত। কিন্তু বঙ্কিমের নিসর্গচিন্তা কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের মতোই অতি স্পষ্ট, লক্ষণীয় স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের এই অঞ্চলে বঙ্কিম রাজাধিরাজ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর এখানে-ওখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা থাকিলেও সেখানে তিনি বিশেষ কোনো প্রকৃতিদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই। অনতিরূঢ় যৌবন তিলোত্তমার সলজ্জ হৃদয় মাধুরী, আত্মসমাহিতচিত্ত আয়েষার ধীর মহিমা সেখানে আমাদের সমস্ত হৃদয়কে নেয় লুট করিয়া। কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলাতে পাই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় একাত্মতার অতুলনীয় পরিচয়। তরঙ্গাঘাত মুখর যে-জনহীন বনপ্রকৃতির মধ্যে কপালকুণ্ডলা আবাল্য লালিত, তাহার সঙ্গে তাহার অন্তঃকরণের ভাবাত্মক যোগ কাহারো দৃষ্টি এড়াইবার নয়। এই দিক দিয়া বঙ্কিমের সঙ্গে তুলনা চলে সংস্কৃত কবি কালিদাসের। শকুন্তলার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন, "তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত" (শকুন্তলা), কপালকুণ্ডলাও তেমনি তাহার আশৈশব ধাত্রীভূমির সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত। আরণ্য প্রকৃতির সেই গভীর ঔদাসীন্য, সেই অকৃত্রিম আদিমতা; সেই বন্ধন-অসহিষ্ণু মুক্ত প্রাণৈশ্বর্য কপালকুণ্ডলার চরিত্রে কি ভাবেই না মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামাসুন্দরী কথা-প্রসঙ্গে তাহাকে সুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, "বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" এই চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিম দেখাইলেন, সমুদ্রতীরের বনচারী পাখি গৃহস্থের সোনার খাঁচায় পোষ মানে না। পারিবারিক জীবনের নিয়মশৃঙ্খলা, স্বামীর অপরিমিত ভালোবাসাও তাহার নয়ন হইতে বনপ্রকৃতির সবুজ স্বপ্নঘোর ঘুচাইতে পারে নাই। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে যদি বাংলাসাহিত্যের আর কোনো চরিত্রের তুলনা করিতে

হয়, তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের তারাপদ কিংবা সুভা।

কপালকুণ্ডলাতে দেখিলাম নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির ভাবাত্মক একাত্মতা। তাঁহার বিষবৃক্ষে কৃষ্ণকান্তের উইলে দেখা যাইবে মানব মনের উপর নিসর্গসংসারের অনপনেয় প্রভাবের আশ্চর্য রহস্যচ্ছবি। প্রদোষকালীন বাপীতীরের অনির্বচনীয় রূপশোভা বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর প্রেমবেদনাকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ ঝরা পুষ্পদল, ঐ মর্মরশুভ্র সোপান, সন্ধ্যার ঐ প্রশান্ত পরিবেশ, সম্মুখের ঐ কানায় কানায় উপচাইয়া-পড়া দীঘির জল যদি কুন্দের সামনে না থাকিত, তবে প্রণয়াস্পদের জন্য সে এমন করিয়া পাগলই হইত না। অর্থাৎ এখানে প্রকৃতিকে পাইতেছি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের ভাষায় উদ্দীপনবিভাব রূপে। উদ্দীপনবিভাবরূপে বঙ্কিমের সর্বাপেক্ষা সুন্দর নিসর্গ বর্ণনা বোধহয় কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি। বৈকালে অন্যান্য কাজ শেষ হইলে রোহিণী বাবুদের পুকুরে জল আনিতে যায়। বারুণীর অগাধ বারিরাশি, তাহার চারিপাশের কুসুমিত কুঞ্জবন, সেখানকার ভ্রমরগণের মধুগুঞ্জরণ, বনান্তরাল হইতে ভাসিয়া আসা কোকিলের কুহুধ্বনি তাহার অন্তরলোকে কিসের যেন যাদুস্পর্শ বুলাইয়া দেয়। রোহিণী জলে কলসী ভাসাইয়া কাঁদিতে বসে। কেন? "কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি, যেন তাই হারাইয়া জীবনসর্বস্ব আমার অসার হইয়া পড়িয়াছে, যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি। কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল, সুখের মাত্রা যেন পূরিল না। যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য কিছুই ভোগ করা হইল না।" অকাল বসন্তের সমাগমে যৌবনরাগরক্ত বনস্থলী যোগীশ্বরের চিত্তে যাহা করিয়াছে, রোহিণীর মনে তাহা করিয়াছে, কোকিলের পঞ্চম স্বরে-বাঁধা বারুণীতীরের বিশ্বপ্রকৃতি। কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এমন অত্যাশ্চর্য বর্ণনা এবং মানবমনের উপর তাহার এই অনপনেয় প্রভাবের রহস্যচিত্র অন্যত্র দুর্লভ।

নিছক প্রকৃতি-অনুরাগের বশবর্তী হইয়া বঙ্কিম তাঁহার কথাসাহিত্যে প্রকৃতির বর্ণনা আনয়ন করেন নাই। তাঁহার প্রকৃতি বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব-মনের অমূর্ত ভাবের মূর্ত বহিঃপ্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এক জায়গায় বলিয়াছেন, "য ন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়ার সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনি সুকবি" (বিদ্যাপতি ও জয়দেব)। এই দৃষ্টি-প্রদীপের আলোকে বিচার করিলে দেখা যাইবে বঙ্কিম একজন সুকবি। সূর্যমুখীর সঙ্গে মিলনের প্রাক্কালে নগেন্দ্রের নিদারুণ অন্তর্বিপ্লবের সঙ্গে বাহিরের দুর্যোগময়ী নিশীথের কিংবা অন্ধকার গুহাভ্যন্তরে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির উন্মাদ প্রলয়ঝঞ্ঝার একটা আশ্চর্যসুন্দর ঐক্য বর্তমান। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিম চন্দ্রালোকে বর্ষাস্ফীত ত্রিস্রোতার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা একবার পড়িলে আর ভোলা যায় না; "বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মতো। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলেকূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথায় জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি, কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি।" কিন্তু ইহা কেবল লেখকের বর্ণনাশক্তির পরিচয় দেয় না। প্রফুল্লের উদ্বেল প্রণয়োচ্ছ্বাস, তাহার পরিণত যৌবনের অপর্যাপ্ত রূপলাবণ্য ঐ আলো-অন্ধকার মিশ্রিত তন্দ্রালোকের তলে প্রবাহিত ত্রিস্রোতার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যায়। ধাত্রীভূমির স্তন্যরসে আশৈশব লালিত হইয়া কপালকুণ্ডলার মতো আর কোন চরিত্র বাংলা উপন্যাসে সৃষ্ট হয় নাই, নরনারীর অবচেতন মনোরাজ্যে বিশ্বপ্রকৃতির অনিবার্য প্রভাবের কথাটিও আমাদের উপন্যাসে অল্প। কিন্তু বাহিরের প্রকৃতিকে মানুষের হৃদয়ের সিম্বলরূপে রূপায়ণ বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথ ত আছেনই, শরৎচন্দ্র প্রমুখ কথাশিল্পীদের রচনাতেও প্রকৃতিকে মানব হৃদয়ের সিম্বলরূপে দেখা যাইবে।

উপন্যাসে বঙ্কিম যে নিসর্গ দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আগেই বলিয়াছি—সমকালীন কবিদের রচনায় দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রকৃতিকল্পনায় একটা স্বতন্ত্র শিল্পমূল্য, একটা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক আবেদন আছে। বঙ্কিমের প্রকৃতিচিন্তায় পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা গৌণ, ইহা তাঁহার ভারতীয় শিল্পীমানস হইতে উৎসারিত। প্রকৃতিপ্রীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা চলে, এমন সাহিত্যিকের প্রাচ্য কি পাশ্চাত্যের—নাম করা কঠিন। কিন্তু কেবলমাত্র উপন্যাস ধরিয়া আলোচনা করিতে গেলে বঙ্কিমের আসন একেবারে রবীন্দ্রনাথের পাশেই। বর্ণনার সৌন্দর্যে ও সূক্ষ্মতায়, প্রসঙ্গের সঙ্গে ঔচিত্য রক্ষায় বঙ্কিমের প্রতিভা এই অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কোনো অংশে ম্লান নয়।

———

ধ্বনি

অধীর সরকার

সূর্য-গলা সোনার বিকেলে
তুমি এলে—
হঠাৎ যেন ভরল আমার বুক ;
তোমার জন্যে হৃদয় আমার নিতান্ত উৎসুক।

তবু জানি দুদণ্ড সময়
তার বেশি তো নয়—
সঙ্গসুধা পাব জানি মনে ;
তারপরে তো হারিয়ে যাব কোন্‌খানে দুজনে।

রাত্রি হবে দীর্ঘতর, আকাশ ভরা তারা
কে বা জানায় কাকে কোথায় আলোর ইশারা ?
হালকা ঘুমের মধ্যে বাজে রণরণি—
বাজে আমার কানের ভিতর, বুকে কিসের গুঞ্জরণী
যাচ্ছ চলে ? আসছ নাকি ?—বাজে তোমার চরণধ্বনি
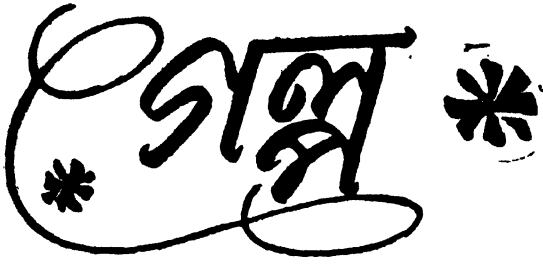
একটি আশ্চর্য খেলা

সমীর চট্টোপাধ্যায়

খাবারের দোকানের মালিকই প্রথমে লোকটাকে দেখল। সকালে যথারীতি দোকান খুলে ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিল সে। একবার বাইরে এসেছিল ট্রেণের শব্দ শুনে। ফার্ষ্ট বর্দ্ধমান লোকাল এসে লেগেছে ষ্টেশানে। এইটাই দিনের প্রথম ডাউন ট্রেণ। গাড়ীতে জিনিসপত্র নিয়ে ব্যবসায়ীরা আসে। ষ্টেশানের পাশেই যে বাজার, সেখানে ওদের দোকান আছে। তারা সবাই এসে এই দোকানে চা, খাবার খাবে।

দোকানের মালিকের নাম শশিপদ। সে একজন কর্ম্মচারীর উদ্দেশে হাঁক দিল,—বিষ্টু, ওরে বিষ্টু, তেলের কড়াটা চাপিয়ে চপের আলুগুলো আর বেসনের গোলাটা রেডি কর। কথাটা বলতে বলতে আর একবার সামনের রাস্তাটার দিকে দেখল সে। বিশেশ্বরবাবুর আসার কথা আছে আজ। এ' অঞ্চলের নামকরা ধনী বিশেশ্বর রায়। একটা প্রকাণ্ড শেভ্রলে গাড়ী চালিয়ে মাঝে মাঝে আসেন তিনি শশিপদর দোকানে। আজও তাঁর আসার কথা।

বিষ্টুকে ফরমায়েস দিয়ে বাইরে এল শশিপদ। কিন্তু এসে যা দেখল তাতে সকাল বেলাতেই তার মেজাজ বিগড়ে গেল। দোকানের সামনে খদ্দেরদের বসার জন্য যে কাঠের বেঞ্চটা পাতা আছে, তার ওপর খোস্ মেজাজে বসে আছেন, কোথাকার কোন এক নবাব বাহাদুর।

লোকটা যে ক্রেতা নয়, এ ধারণা তাকে প্রথমে দেখেই বুঝতে পারল সে। পোষাকে-আষাকে আধপাগলা গোছের। অত্যন্ত নোংরা চেহারা। দেহের চারিদিকে ধুলো—ময়লা। এক মাথা রুক্ষ চুল। খোঁচাখোঁচা দাড়ি চাপা কোট। গলায় একটা তেলচিটে পুরানো নেকটাই। গলার ওপর সে'া বাঁধা আছে। কোটের পকেটে দুটো বড় বড় টিনের কৌটো।

শশিপদর মন স্বভাবতঃই বিশেষ ভাল নয়। জিনিস-পত্রের অভাবে খাবারের দোকানের নাভি-শ্বাস ওঠার অবস্থা। চিনি মেলে না, মিষ্টি তৈরী বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। আটা ময়দার অভাবে নোন্‌তা খাবারও সম্ভব হয় না। তাই এটা সেটা করে চালাতে হয় শশিপদকে। বাজারে জিনিষের দামও একেবারে গগনস্পর্শী। চাল পাওয়া যায় না। যদিও বা যায় ত সেদিকে কেউ হাত বাড়াতে পারে না। দাম শুনে হাত গুটিয়ে সরে পড়ে। চালকে কেন্দ্র করে অন্যান্য জিনিষের দামও অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে।

শশিপদর মনে একটা উদ্বেগ সর্ব্বদা দানা বেঁধে আছে। সেটা অবশ্য থাকবে যতক্ষণ না মালটার একটা সুব্যবস্থা করা যায়। কাজটা সে ন্যায় পথে করছে না একথা সে জানে, তাই যতক্ষণ না সেটা সিদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ একটা বিষাক্ত ফোড়ার মত ক্রমাগত তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। সেই যন্ত্রণায় কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে পারছে না সে।

খাবার বেচে রোজগার হয় না। পথ বদলেছে তাই শশিপদ। অবশ্য তাতে বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় খুব। তাই সন্দেহজনক কোন লোক দেখলেই তার বুক কেঁপে ওঠে। বেশ কিছু পরিমাণ চাল সে লুকিয়ে রেখেছে দোকানের মধ্যে।

আপাতদৃষ্টিতে শশিপদকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। এ অঞ্চলে সে নামকরা মিষ্টির কারিগর। বড় ছোট মিশিয়ে সবাই তার খদ্দের। তার খাবার খায় না, এমন লোক এ অঞ্চলে কেউ নেই বোধহয়। দেখা হলেই দোকানে বসে মিষ্টি হাঁসি দিয়ে সকলকে অভ্যর্থনা করে শশিপদ। খদ্দেররা বলে শশির হাঁসি চাঁদের রাশি। অর্থাৎ শশির হাসি একরাশ চাঁদের আলোর মত সর্ব্বদাই ঝরছে।

ছুটির দিনে শশিপদর বড় বড় খদ্দেররা আসেন। কেউ আসেন মোটারে চড়ে। ষ্টেশানের বুক চিরে যে রাস্তাটা চলে গেছে শহরতলির দিকে সেখানে তাঁদের বাগানবাড়ী.

আছে। ছুটির দিনে সেই বাগানে গার্ডেন পার্টি হয়। শশিপদর খাবার যায় সেই পার্টিতে। চপ,, সিঙ্গাড়া থেকে নানা রকমের মিষ্টি।

আজ রবিবার। সামনের বাজার গরম। ছুটির দিন বলে লোক সমাগম বেশীই হবে। বাবুরাও বাগান বাড়ীতে যাবেন তাদের মোটারে চড়ে।

লুকানো চালের বস্তার কথা ভাবতে ভাবতে আড়-চোখে আর একবার লোকটির দিকে চাইল শশিপদ। কি জানি দিনকাল বড়ই খারাপ। কার মনে কি সন্দেহ আছে। সি আই ডির লোক নয় ত! অজানা মুখ দেখলে আজকাল বড়ই অশান্তি বোধ করে সে।

সামনের রাস্তায় লোক আনাগোনা সুরু হয়েছে। সকলেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে লোকটাকে। তার সর্বাঙ্গ জুড়ে যে বৈচিত্র্য আছে সেটাই তাদের দ্রষ্টব্য বিষয়। আপাতঃদৃষ্টিতে ভিখারী বলে মনে হলেও সাজ পোষাক কিছু বিচিত্র। কারণ তার গলায় একটা টাই আর মাথায় ছেঁড়া একটা শোলার হ্যাট।

দোকানের খদ্দেররা এসে লোকটার দিকে কৌতূহলি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। তারা সবাই বলাবলি করছে, এটা আবার জুটল কোন চুলো থেকে।

একজন বলল, ব্যাটার মতলব কি বল দেখি?

শশিপদ বলল,—কি আবার? কি রকম চাউনী দেখছেন? ঝোপ বুঝে কোপ মারবে, বসে বসে তাই ভাবছে হয়ত।

একজন মন্তব্য করল. যা বলেছ শশি। দেখেছ ব্যাটার সাজের ঘটা? পকেটে আবার দুটো বড় বড় কৌটো।

—বামাল সংগ্রহ করে রাখবে আর কি? অন্যজন বলল।

লোকটিকে কেন্দ্র করে এমনই সব আলোচনা। ক্রমে ক্রমে আরও লোক এসে জমছে দোকানের সামনে।

এবার একজন খদ্দের এগিয়ে গেল লোকটার সামনে, বলল,—এই কি চাই? ভাগ এখান থেকে।

শশিপদ বলল, দেখুন দেখি ব্যাটার কাণ্ড। এক গা নোংরা ধুলো মেখে বসে আছে। শেষে কি আমার খদ্দের ভাঙাবার মতলব নাকি?

এবার তাকে ধমক দিয়ে একজন বলল, ভাগ এখান থেকে, নইলে পুলিশ ডেকে দেব হাজতে পুরে।

পুলিশের ভয়ে কি না কে জানে লোকটা এবার উঠে দাঁড়িয়ে গুটি গুটি করে এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে। ঠিক সেই সময়ে সাঁ করে একখানা শেভ্রলে গাড়ী এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা সোরগোল তুলে সকলে সেই গাড়ীর চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল, এই যে বিশ্বেশ্বরবাবু এসে পড়েছেন! শশিপদও দোকান ছেড়ে অতি ব্যস্তে উঠে এল,—আসুন—আসুন রায় মশাই!

গাড়ী থেকে নামলেন বিশ্বেশ্বরবাবু। শশিপদ বিশিষ্ট অতিথির মত তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসছে তার দোকানে। একবার সুযোগমত চাপা স্বরে বলল,—আপনার মাল তো রেডি। কিন্তু এই লোকগুলো না সরলে মহা মুস্কিল।

মুচকে হেসে বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন—কোয়ালিটি কেমন? আগেরবারের মত হবে?

—আজ্ঞে সেটা আপনি নিজেই বিচার করবেন।

—দামটা শুনি?

—আগে যেমন দিয়েছিলেন—ঐ চারটাকা কিলো দরেই—

কথার ফাঁকে বাইরের সেই লোকটার দিকে দেখছেন বিশ্বেশ্বরবাবু। কারণ তখন জনতা আবার তার দিকে মনোযোগ দিয়েছে।

এবার বিশ্বেশ্বরবাবুরও কৌতূহল জেগেছে। ব্যাপার কি? কে ঐ লোকটা? কি চায়? তিনি ভারিক্কি চালে এগিয়ে গেলেন সেই দিকে।

শশিপদর সাহস একটু বেড়েছে বিশ্বেশ্বরবাবুর উপ-স্থিতিতে। মালটা তাহলে আজই পাচার করতে পারবে সে। সে বলল, দেখুন দেখি রায়মশাই! সকাল থেকে এখানে আড্ডা গেড়ে বসেছে! চোর-ছ্যাঁচোড় কি না তারই বা ঠিক কি!

এবার বিশ্বেশ্বরবাবু ডাকলেন লোকটাকে, এই শোন।

গুটি গুটি করে এগিয়ে এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যালুটের ভঙ্গি করে লোকটা দাঁড়াল তাঁর সামনে।

বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন,—কি জন্ত এখানে বসে আছিস?

লোকটা আঙুল তুলে কাঁচের শোকেসে সাজান খাবারের দিকে দেখিয়ে বলল,—দয়া করে যদি কিছু খাওয়ান স্যার :—বড্ড খিদে পেয়েছে। আজ দুদিন ধরে একদম কিছু খাইনি।

শশিপদ খিঁচিয়ে উঠল—ইস্। ব্যাটা নদের চাঁদ এলেন! এটা কি ধর্মশালা নাকি? যা—যা ভাগ এখান থেকে। কিন্তু লোকটার কাতর ভাব দেখে বিশ্বেশ্বরবাবুর মেজাজ ভুলে উঠেছে, তিনি বললেন,—দাঁড়া,—পরে শশিপদকে বললেন,—শশি, ওকে কিছু খাবার দাও ত, আমি দাম দিয়ে দেব।

অপ্রসন্ন মুখে বিশ্বেশ্বরবাবুর আদেশ পালন করল শশিপদ। তারপর বলল,—আপনিও ওদের সঙ্গে ক্ষেপে উঠলেন রায়বাবু। তাড়াতাড়ি মালটা নিয়ে সরে পড়ুন!

খাবারটুকু গোগ্রাসে খেল লোকটা। খাওয়া হলে সে কিন্তু গেল না চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

শশিপদ বলল,—দাঁড়িয়ে রইলি কেন? য', চলে যা। আর কিছু হবে না।

লোকটা এবার বিশ্বেশ্বরবাবুকে বলল, স্যার আপনি যদি দুটো রসগোল্লা দেন, তাহলে আমি একটা খেলা দেখাতে পারি।

স্নেহভরে বললেন বিশ্বেশ্বরবাবু, তুই আবার কি খেলা দেখাবি?

শশিপদ বলল,—রায়বাবু বেশী নাই দেবেন না, একেবারে মাথায় চড়ে বসবে।

ততক্ষণে লোকটার দিকে এগিয়ে এসেছে অনেকে। শশিপদর কথা কানে তুলল না কেউ।

বিশ্বেশ্বরবাবুরও মন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। শশিপদর কথা ভুলে গেছেন, বললেন—কি খেলা দেখাবি তুই?

লোকটা বলল,—সে অনেক রকম খেলা। কাঁচ খাবো, আস্ত একখানা ব্লেড কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবো—আপনি যদি দুটো রসগোল্লা দেন।

একজন জিজ্ঞেস করল, আর কি খেলা জানিস্?

লোকটা বলল,—আরও অনেক জানি—সে বড় ভীষণ খেলা। নররাক্ষসের খেলা।

—সেটা আবার কি রকম? সকলে আগ্রহভরে লোকটাকে ঘিরে ধরেছে।

লোকটা এবার উচ্চকণ্ঠে ছড়া কাটার মত বলতে লাগল—রাক্ষসের খেলা···খিদের জ্বালায় মানুষ রাক্ষস হ'য়ে যায়···তারপর সে যা পায় তাই খায়—গাছের পাতা···পোকা মাকড়···পাখী পক্ষী···জন্তু জানোয়ার···। দেখবেন, দেখবেন···আপনারা দেখবেন সেই খেলা।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াল সে, পরে বলল, আগে দেখুন কাঁচ আর ব্লেড খাওয়া। স্যার দুটো রসগোল্লা দিন তাহলে?

একজন ভাঁড়ে করে দুটো রসগোল্লা রাখল লোকটার সামনে। লোকটা তার কৌটো দুটো দেখিয়ে বলল, এতে জল দিন।

জল দেওয়া হল তাকে।

কোটের পকেট থেকে একটুকরো কাঁচ আর একটা আস্ত ব্লেড বার করে সবাইকে দেখাল সে। সকলে বলল, ঠিক আছে, তুই খেলা শুরু কর। লোকটা প্রথমে কাঁচটা কড়মড় করে চিবিয়ে খেল ঠিক মিছরির মত। তারপর জল খেল কিছু। পরে আস্ত ব্লেডটা চিবোতে লাগল। আবার কিছু পরিমাণ জল মুখে নিয়ে কোঁৎ করে একটা শব্দ তুলে গিলে ফেলল সবটুকু। সবশেষে রসগোল্লার ভাঁড় নিয়ে পরম আনন্দে খেতে লাগল সে।

প্রথম খেলাতেই সকলকে চমক্ ধরিয়ে দিয়েছে লোকটা। শশিপদর চোখ কপালে উঠে গেছে। সে বলল, বড় জব্বর বিদ্যে শিখেছে কিন্তু—!

একজন মন্তব্য করল—হ্যাঁ শিখে রাখলে উপকার হবে। আজকাল খাবার জিনিসে যা ভেজাল চলছে।

বিশ্বেশ্বরবাবুর চোখ কপালে উঠেছে! জিনিয়াস্! এ যে কাঁচের মধ্যে হীরে।

সকলকে খেলার নেশায় পেয়ে বসেছে।

—এবার সেই রাক্ষসের খেলা সুরু হোক, সকলে বলল। লোকটা তার টিনের কৌটো থেকে জল খেয়ে বলল,

'—সে খেলা আমি দেখাব, কিন্তু—'

—কিন্তু কেন? সুরু কর—সকলে সমস্বরে বলল। লোকটা বলল,—রাক্ষসের খেলা,—জ্যান্ত পাঁঠা, হাঁস—মুরগী কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খায়। রক্ত শুষে নেয়,—বল'র সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে চুক্ চুক্ করে শব্দ করল সে।

—ওসব এখন কোথায় পাওয়া যাবে? একজন প্রশ্ন করল।

লোকটা বলল,—বেশ, তাহলে অনেক খাবার দিন।

সকলে বলল,—খাবার দেব,—যত লাগবে, তুই খেলা সুরু কর।

লোকটা বলল,—দেবেন ত ঠিক? নাহলে কিন্তু খেলা হবে না। ভীষণ কসরৎ করতে হয়।

কিছু খাবার রাখা হল লোকটার সামনে।

সে বলল,—এগুলো ফুরিয়ে গেলে সময় মত আরও দেবেন ঠিক, নাহলে একটা বিপদ ঘটতে পারে। সকলে বলল,—তুই খেলা সুরু করে দে। আমরা আছি, কিছু ভাবনা নেই।

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। গায়ের কোটটা আর মাথার টুপিটা খুলে রাখল মাটিতে। একপাশে টিনের কৌটো দুটো রাখল। বেলা বেড়ে গেছে। চড়া রোদে চারদিক তেতে উঠেছে। সেই রোদের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ। তারপর থর থর করে কাঁপতে লাগল তার দেহ। চীৎকার করে বলতে সুরু করল,—দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছে···কেউ দুবেলা খেতে পাচ্ছে না। গরীবের একবেলাও খাওয়া জোটে না। ক্ষিদের জ্বালায় অখাদ্য কুখাদ্য খায়.—একরাশ গাছের পাতা ভেঙে কচ্‌মচ্‌ করে চিবোতে লাগল সে। আবার বলল,—অনাহারে থেকে মানুষ রাক্ষস হয়ে যাবে। দেখুন রাক্ষসটা খাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করবে। গাঁ—গাঁ করে গর্জন করবে। ধুলোয় পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি খাবে। হঠাৎ লোকটা আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল। ধুলোয় পড়ে পাক খেতে লাগল চরকির মত। মুখ দিয়ে বিকট শব্দ সুরু করল,—গাঁ— গাঁ— গাঁ—।

আরও কিছু খাবার দেয়া হল। রাক্ষস গোগ্রাসে চিবিয়ে শেষ করল সেটুকু এক মুহূর্তে। শশিপদ অস্বস্তি বোধ করছে কেবলই। দোকানের সামনে মেলা ঝঞ্ঝাট এসে জুটেছে! এদিকে লোকগুলোর জন্য নিজের কাজ শেষ করতে অসুবিধা হচ্ছে। মালটা রায় মশায়ের হাতে তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় সে। তা নয় কোথা থেকে এক আপদ এসে জুটলো। রাক্ষসের খেলা না ছাই! যতসব খাবার ফিকির!

এবার মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল রাক্ষস। এখন তার মুখের দিকে চাইলে রীতিমত ভয় হয়। কী ভীষণ সে রূপ। মুখটা সিঁদুরের মত লাল। চোখ দুটো আগুনের ডেলার মত হয়ে ঘুরছে। পেটটা ঢুকে গেছে গর্তে। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে রাক্ষস। সেই সঙ্গে বুকটা দ্রুততালে উঠছে নামছে। সকলে বলল,—আরও খাবার চাই। নাহলে কি বিপদ হয় কে জানে। সকলকে খেলার মাদকতায় মজিয়ে দিয়েছে।

শশিপদ রাগে গস্‌গস্‌ করে বলছে,—রাক্ষস না কচু। যত সব বুজরুকী? রাক্ষসের খেলা। কত রকমের যে জুয়াচুরি চলছে বাজারে! জনতার মধ্যে একজন এবার রুখে উঠল,—কি বললেন? বুজরুকী? আপনি পারেন দেখাতে? পারেন কড়মড় করে কাঁচ আর ব্লেড চিবিয়ে খেতে?

আবার রাক্ষস বিকট গর্জন করে উঠল,—গাঁ—গাঁ—গাঁ—।

একজন বলল,—আরো খাবার চাইছে রাক্ষস।

শশিপদ বলল,—রাক্ষসকে খাবার জোগাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আর খাবার দিতে পারব না। আপনার আমার বাকি দাম মিটিয়ে দিন।

কয়েকজন অসন্তুষ্ট হয়েছে শশিপদর কথায়।

—আপনার পয়সা আমরা মিটিয়ে দেব। ভদ্রভাবে কথা বলুন।

চুপ করে গেল শশিপদ। জনতাকে বিশ্বাস নেই আজকাল। হঠাৎ একটা হামলা বাঁধালেই হল। শেষে যদি তার দোকান লুঠ পাঠ শুরু করে, তখন—।

হঠাৎ রাক্ষসটা মাটিতে পড়ে কাতরাতে সুরু করল। তারপর একটা দৃশ্য দেখে সকলে শিউরে উঠল। রাক্ষসের মুখ থেকে বেরিয়ে এল এক ঝলক তাজা রক্ত। বুকটা দুহাতে চেপে ধরল রাক্ষস। তার দেহটা এঁকে বেঁকে সাপের মত হয়ে যেতে লাগল।

—রাক্ষসের মুখে রক্ত! রাক্ষসের মুখে রক্ত! চারি-

দিকে একটা গোলমাল পড়ে গেছে। সকলে ঘিরে ধরেছে রাক্ষসকে।

একজন বলল,—নিশ্চয় আগে কোথাও আস্ত পাঁঠা কিম্বা হাঁস—মুরগী খেয়ে ছিল, এ তারই রক্ত, এখন পেট থেকে বার করছে।

আর একজন বলল,—সে রক্ত হতে যাবে কেন? নিশ্চয় ঠিক সময় মত খাবার পায়নি তাই—।

রাক্ষসকে ঘিরে সকলে জটলা করছে। দোকানের সামনের লোকগুলোও দূরে সরে গেছে।

দু'একজন বেগতিক দেখে সরে পড়েছে।

শশিপদ ভাবল; এই সুযোগে কাজ হাঁসিল করতে হবে। নাহলে আবার নতুন করে কি গণ্ডগোল বাধবে কে জানে। সে বিশ্বেশ্বরবাবুর কাছে এসে চাপাস্বরে বলল,—রায় মশাই, আর দেরি ন..—আমার লোক চালের ব্যাগটা আপনার গাড়ীতে তুলে দিক। আপনি ওটা নিয়ে সরে পড়ুন। আমিও দোকান বন্ধ করে দিই।

তারপর দোকানের মধ্যে থেকে কখন যে খাবারের ঝুড়ির মধ্যে লুকানো চালের ব্যাগটা বিশ্বেশ্বরবাবুর গাড়ীতে পাচার হয়ে গেল ম্যাজিকের মত, সে খবর কেউ জানতে পারল না। কারণ সকলেই তখন রাক্ষসকে ঘিরে জটলা করছে।

রাক্ষস আর নড়ছে না, স্থির হয়ে পড়ে আছে। তার চারদিকে কিছু খাবার রয়েছে তখনও। সকলে দেখছে তাকে, কিন্তু কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না কেউ।

একজন সাহস করে গুটি গুটি এগিয়ে গেল কিছুটা, রাক্ষসের কোন সাড়া নেই। লোকটা আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে খুব ভাল করে দেখে বলল,

—মরে গেছে!

—মরে গেছে! রাক্ষস মরে গেছে! জনতা ঘিরে ধরল রাক্ষসকে। খুব কাছে গিয়ে সকলে দেখতে লাগল ভাল করে। কিন্তু ঐ নিস্তেজ মরদেহটার মধ্যে তারা আর সেই রাক্ষসকে খুঁজে পেল না। পরিবর্তে সেটা ক্রমেই তাদের মনে একটা মানুষের রূপ নিতে লাগল। একজন ক্ষুধার্ত মানুষ; কিছু খেতে পাওয়ার জন্য সে রাক্ষস হয়েছিল। এখন সে আর নেই, মানুষে রূপান্তরিত হয়ে একটা মরা টিকটিকির মত পড়ে আছে রাস্তার ওপর।

বিশ্বেশ্বরবাবুর পেট্রলে চলে গেছে। শশিপদ এখন আর দোকান খুলবে না।

আকাঙ্ক্ষা আ-মৃত্যু

প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

রক্তে রক্তে প্রবীণ সূর্য নিঃশব্দ পদসঞ্চারে
বিভ্রম মুহূর্তগুলি অতি যত্নে খুঁটে খুঁটে রাখে
তুলে কুলুঙ্গীতে, দগ্ধ কাহ্নসে স্মৃতির ধুলা ওড়ে
ইচ্ছা-রৌদ্র আফ্রিকার অন্ধ ইতিহাসে মুখ ঢাকে।

বারেবারে সোচ্চারে ঘোষণা করি, কানে কানে বলি
ওরে ও পিয়াসী হৃদয়, মিঠে জলের হাহাকারে
কি বা লাভ? শোনে না কথা বলে, তোমার কথাকলি
থাক থাক; আ-মৃত্যু বাড়াবো হাত অগ্নিক্ষু আঁধারে।

তবু, ফিরাতে চাই, বলি—কোথায় কে-বা সাথী তো'র;
অগ্নিদগ্ধ বালুকাবেলায় ঝরের শব্দ শোন নি
কি? শোন নি কি নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ মরণের দোর
খোলার শব্দ? হিসাবের কাল কি এখনো গোন নি।

রক্তবর্ণ হৃদয় একই কথা বলে বারেবারে
—থাক্ থাক্, আ-মৃত্যু বাড়াবো হাত অগ্নিক্ষু আঁধারে।

———
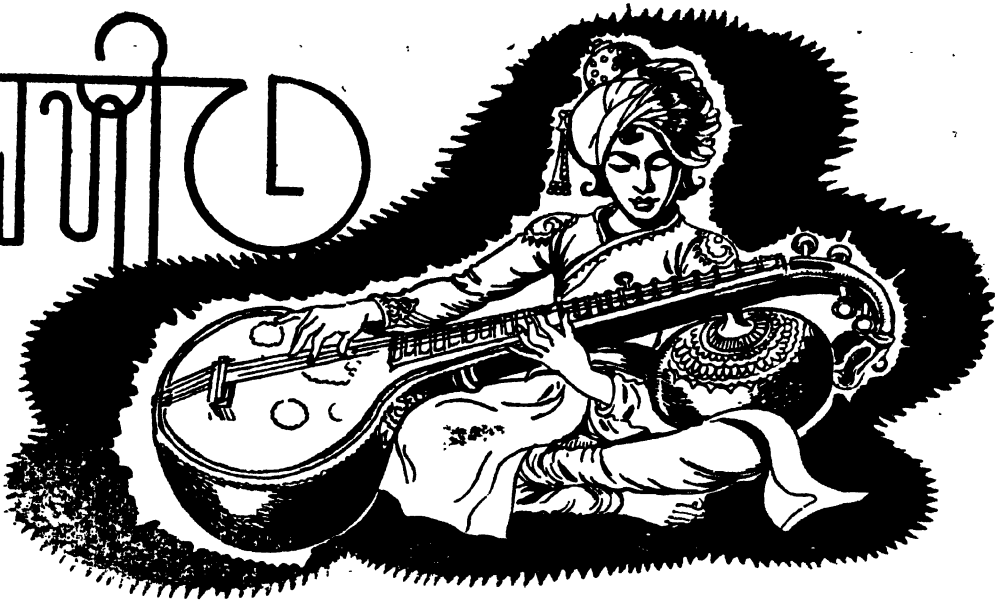
স্বরলিপি

(পল্লীগীতি)

কথা—অখিল নিয়োগী। | সুর ও স্বরলিপি—ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

এ পার ওপার কাইন্দা মরে,
চকা-চকীটা
মন-মাঝি তোর বৈঠা নিয়া
এবার ভাসা না।
আমন-ধানে হাত বাড়াইলো
জংলা বাতাস কি গান গাইলো
মিছেই পাতায় খস্‌খসানি
সেতো আইলো না।

চোখ্ ইশারায় কইয়াছিল
সজ্‌না তলাতে
আবার দোঁহার হবে দেখা
পথের চলাতে
গাঙ্-শালিকে কান-কথা কয়
সাঁঝের পিদীম পথ চাইয়া রয়
লক্ষীপেঁচা ফিরলো নীড়ে
সে তো আইলো না।

II সা -া -া ধা | সা সা সা রা I গা গা গা মা | পা ধা পধা পমা I
• • এ পা র্ ও পা র্ কা ই ন্দা • ম • রে •

গা -া গা গা | পা মা গা গা I রা গা গা গা | রা গা -া -া I
• • চ কা • চ কী • টা • • • • • • •

-া গা গা মা | পা পা পা পা I পা ধা মা পা | গা গা সা মা I
• ম ন্ মা ঝি • তো র্ বৈ ই ঠা • • নি য়া •

জ্ঞা -া মা জ্ঞমা | জ্ঞা রা সা -া I গরা সা গা গা | -া -া -া -া II
০ ০ এ বা . র্ ভা সা ০ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা পা ধা ণণা | র্সণা ধা পা পা I -া ধা র্সা র্সা | র্সা র্রা র্রা র্জ্ঞা I
০ ০ আ ম ন্ খা নে ০ ০ হঃ ত্ বা বা ই লো ০

র্জ্ঞর্রা র্সর্রা র্সা -া | র্সা -া -া -া I -া র্সা র্রা র্মা | র্গমা র্গরা র্রজ্ঞা র্রসা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জ ং লা বা ০ তা স্

র্সা -া র্রা র্সা | না ধা ধা ণা I ণধা পধা পা -া | -া -া -া -া I
০ ০ কি গা ন গা ই ০. লো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা -া ধা ধা | ণা ধা পা পা I পা ধা ধা মা | মা পা পা -া I
০ ০ মি ছে ই পা তা র্ খ ০ স খ সা ০ নি ০

পা -া ধা র্সা | র্সা র্রা র্রা র্জ্ঞা I র্জ্ঞর্রা র্সর্রা র্সা -া | -া -া -া -া II
০ ০ সে তো ০ আ ই লো না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মন মাঝি তোর ইত্যাদি···।

II সা -া গা গা | গা মা পা পা I ধা ধা ধণা র্সণা | না ধা পা -া I
০ ০ চোখ্ ই ই শা রা য় ক ই য়া ০ ০ ছি লো ০

পা ধা ধণা ধপা | পা পা ধা পা I ধপা মা -া -া | মপা মগা গা -া I
স জ না ০ ০ ত লা ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-া -া গা গা | গা মা পা পা I পা ধা মা পা | গা গা গা সা I
০ ০ আ বা র্ দোঁ হা র্ হ ০ বে ০ ০ দে খা ০

রা -া গা মা | গা রা গরা সা I গরা সা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ প থে র্ চ লা ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা ধা ধা ধা | ধণা র্সণা ধা পা I -া ধা র্সা র্সা | র্সা র্রা র্রা র্জ্ঞা I
০ গা ঙ্ শা লি ০ কে ·০ ০ কা ন্ ক থা ০ ০ ০

র্জ্ঞর্রা র্সর্রা র্সা র্সা | র্সা -া -া -া I -া -া র্সা র্রা | র্রা র্মা র্গা র্রা I
ক ০ র্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সাঁ ঝে র্ পি দী ম্

র্রা র্গা র্গা র্রা | র্সা না ধা ণা I ণধা পধা পা -া | -া -া -া -া I
প ০ থ চাই য়া ০ ০ ০ র ০ র্ ০ ০ ০ ০ ০

-া -া গা গা | গা মা পা পা I পা ধা মা পা | গা গা গা -া I
০ ০ ল ক্ষী ০ পে চা ০ ফি . র লো ০ ০ নী ড়ে ০

-া -া গা মা | গা রা সা সা I গরা সা গা -া | -া -া -া -া IIII
০ ০ সে তো ০ আ ই লো না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মন মাঝি তোর ইত্যাদি···।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নারীর হৃদয়ের মধ্যে কবি দেখেছেন অসীম আকাশের মুক্তি, স্তব্ধতা ও শান্তি। নারীর অশ্রু যেন স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারা, তার হাসি যেন চাঁদের আলো। তার চোখের তারা যেন আকাশের তারারই মত সুদূরের নির্জনের ধন। নারীর দুটি আঁখি পল্লবের তলায় যেন কোন রহস্য ঢাকা আছে। তার হাসিতে যেন কোন ভোরের আলোর আভাস ফুটে ওঠে। কবির সাধ তাঁর প্রণয়ের সোনার রঙে রঙিন দুখানি পাখা মেলে তিনি নারীর হৃদয়-আকাশের শান্ত বিজন নীলিমার মাঝে বাস করবেন। চাতক হ'য়ে তার চোখের জলের প্রসাদ চাইবেন। চকোর হ'য়ে তার হাসির আলো—পান করবেন। (হৃদয়-আকাশ,—কড়ি ও কোমল)

নারীর অঞ্চলের চকিত স্পর্শের আভাস যেন কবির কাছে কোন অজানা অরণ্যের উদাসী দক্ষিণ-হাওয়া। এই হাওয়াতে যেন একখানি কামনাকাতর উদাসী প্রাণের বার্তা বয়ে নিয়ে এল। এই হাওয়া যেন তরুণীর সর্বাংগের আকুল নিঃশ্বাসের মত কবির সর্বাংগকে স্পর্শ ক'রে গেল। সে যেন কবির সর্বাংগের কানে কানে কথা ব'লে গেল। তরুণীর অঞ্চল বীজন যেন কবির সমস্ত প্রাণকে পুলকিত, সজাগ, সচেতন ক'রে দিয়ে গেল।

(অঞ্চলের বাতাস—কড়ি ও কোমল।)

তরুণ কবি-আকাংক্ষা করেছেন, নারীর দেহের মিলনকে। কবির চোখে দেহ আর মন দুই আলাদা বস্তু নয়। দেহ মনকেই প্রকাশ করছে। বৈষ্ণব কবি বলেছেন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর
প্রতি অংগ লাগি কাঁদে
প্রতি অংগ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি
হিয়া—মোর কাঁদে
পরাণ পুতলি বিনা—
থির নাহি বান্ধে।"

রূপ আর গুণ, হৃদয় আর দেহ দুইই এক। এই কথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ—

"প্রতি অংগে কাঁদে তব প্রতি অংগ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ, হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।"

দেহ যে হৃদয় দিয়েই গড়া। হৃদয় দিয়েই আচ্ছন্ন, তাই হৃদয় যখন মিলনের কামনায় উদ্বেল হয় ওঠে তখন সে দেহ নিয়ে প্রিয়ার দেহের পরেই ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চায়।

দেহের মিলনকে কবি অপবিত্র বলেন নি। দেহ তো হৃদয়েরই অভিব্যক্তি। হৃদয় তো চোখে দেখা

যায় না। তাই চোখে দেখার তৃষ্ণা দেহের মধ্যেই মেটাতে হয়। তাই নয়নের পানে নয়ন ধায়। অধর অধরের মধ্যে মধুর মৃত্যু কামনা ক'রে, বিলীন হ'তে চায়। কবির পিপাসিত চিত্ত প্রণয়িনী—নারীকে সর্বাংগ দিয়ে স্পর্শ ক'রে তাকে দর্শন করতে চায়। হৃদয় দেহ-সাগরের মধ্যেই লুকানো আছে। প্রেমিক কবির প্রাণ সেই সাগরের তীরে ব'সে কাঁদছে। আজ কবি সেই দেহ-সাগরের মাঝে ঝাঁপ দেবেন হৃদয়ের সন্ধানে। দেহের মিলনের মধ্যেই প্রিয়ার হৃদয় রহস্য তিনি বুঝবেন, এই তার আশা। (দেহের মিলন, কড়ি ও কোমল।)

তরুণীর তনুর লাবণ্যে কবি মুগ্ধ। পঞ্চদশী তরুণীর তনুকে কবি বলেছেন—পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা যেন প্রতি বসন্তে একটি ক'রে সৌন্দর্য কুসুম ফুটে ওঠে আজ এই পূর্ণ পরিণত মালা গাছি গাঁথা সারা হয়েছে। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে কবির প্রাণ আত্মহারা উদাসী হয়েছে। কবির মনে হয়েছে যেন সমস্ত জগৎ এই পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্যের চারিদিকে মধুলোভী ভ্রমরের মত গুঞ্জন ক'রে ফিরছে। কিন্তু কবির সবচেয়ে লোভ সেই তনু ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয় খানির নিভৃত মাধুরী প্রতি। পরিণত বয়সে কবির এই কথাটাই আরও স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে। সৌন্দর্যের চরম সার্থকতা তার হৃদয়ের ঐশ্বর্যে। সুন্দর দেহের অন্তরালে স্নেহে প্রেমে ভরা যে সুন্দর প্রাণখানি গোপন রয়েছে তার কথা কবি বলছেন—

> "মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়
> কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিঃশ্বাস
> তনু ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়।"
>
> (তনু—কড়ি ও কোমল)

দেহের রূপে মুগ্ধ কবি কেবলি দেহাতীতের সন্ধান করেছেন। কবির কাব্যে প্রথম থেকেই এই দেহাতীতের সুর বেজে উঠেছে। দেহের মাঝে দেহাতীত, সেই হ'ল সীমার মাঝে অসীম। সীমার মাঝে অসীমকে দেখাই কবির অন্তরের স্বভাব। কবি এই সৃষ্টির সর্বত্রই সীমার মাঝেই অসীমকে দেখেছেন। অসীমের প্রকাশ হয়েছে ব'লেই সীমা এমন সুন্দর হ'য়ে উঠেছে।

> "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
> আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

ঠিক তেমনি কবি নারীরও দেহের সীমার মধ্যে তার প্রেমের অসীমকে দেখেছেন বলেই নারী যে তাঁর চোখে অমন সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছে একথা কবি বার বার বলেছেন। নারী দেহের যৌবন-সৌন্দর্য কবিকে কেবলি ইংগিত করেছে তার প্রাণের স্নেহপ্রেমে ভরা—কোমল সৌন্দর্যের দিকে। কবি যে প্রিয়ার দেহকে ভালোবাসেন সে ঐ দেহের অন্তরালে লুকানো প্রেমের মধুকোষের মধুবিন্দুর জন্যে। প্রিয়ার দেহ, তার দুটি স্তন, কবিকে লুব্ধ করে এই জন্যে যে সে প্রিয়ার কোমল সুন্দর হৃদয়-খানিকেই ব্যক্ত করে। নারীর কোমল দুটি স্তন তার অন্তরের স্নেহেরই বাইরের রূপ। কবির আশা সেই কোমল দুটি স্তনের স্নেহচ্ছায়ায় বাসা বেঁধে থাকা।

> "সেই নিরালায় সেই কোমল আসনে
> দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়
> কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষ কিরণে
> আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়।"

প্রিয়ার দেহের মধ্যে কবি দেহাতীত সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন। তার হৃদয়ের আশা আকাংক্ষা, তার বিজন কল্পনা, তার নিভৃত রজনীর চোখের জল, তার প্রণয় স্বপ্ন এই সমস্ত রহস্য কবির চিত্তকে প্রলুব্ধ ক'রে তুলেছে, সেই সব কিছুর মাঝখানে প্রিয়ার হৃদয় আসনে ঠাঁই পেতে। কবির চোখে দেহ মূল্যবান এই জন্যেই যে সেই দেহ দেহাতীতের সন্ধান। দেহের সৌন্দর্য দেহাতীত মানস লোকেরই ইংগিতবাহী। (হৃদয় আসন, কড়ি ও কোমল)

নারী-চিত্তের কতনা বিজন কল্পনা, নারী-হৃদয়ের কতনা রহস্য প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, পূর্ণিমায়, জ্যোৎস্নারাতে তার অন্তরে ফুটে ওঠে। এই সমস্ত কল্পনার সংগে নারী কি কবিকে তার মনে স্থান দেয়, কবির কথা কি তার মনে পড়ে? কবির সাধ যায় নারীর এই সব উদাস কল্পনার সাথী হ'তে।

> "মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে ব'সে
> নয়ন মিলাতে চায় সুদূর আকাশে
> কখন আঁচল খানি পড়ে যায় খসে—
> কখন হৃদয় হ'তে ওঠে দীর্ঘশ্বাস
> কখন অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে
> তখন আমি কি সখী থাকি তব সাথে?"

সেই অশ্রু, সেই দীর্ঘশ্বাস, সেই দূর আকাশের পানে চোখ মেলে ব'সে থাকা, সে কি কবিকেই মনে ক'রে?

(কল্পনার সাথী,—কড়ি ও কোমল)

নারীর সৌন্দর্য যেন কবিকে কোন দূর অতীতের কথা বলে। সে যেন তাকে বর্তমানের সীমা পার ক'রে নিয়ে যায়। নারীর দেহ যেন কত অতীত যুগের সুখ দুঃখ, বিরহ মিলনের স্মৃতিকে কবির মনে জাগিয়ে তোলে। যুগ-যুগান্তরে লোকে লোকান্তরে কবি যত কিছু সৌন্দর্যের দেখা পেয়েছেন সেই সমস্ত ফুলবন, চাঁদের আলোর স্মৃতি দিয়ে যেন প্রিয়ার দেহখানি গড়া। কবির যুগ যুগান্তের বিরহ, প্রণয়, হাসি ও অশ্রু—সব যেন রূপ নিয়েছে প্রিয়ার দেহ সৌন্দর্যে। তাই প্রিয়ার রূপ কবিকে সীমাহারা কালের দিকে নিয়ে যায়।—

"তোমার মুখেতে চেয়ে তাই চিরদিন
জীবন সুদূরে যেন হ'তেছে বিলীন।"

এইজন্যই কবি নারীকে বলেছেন অসীমের দূতী। (স্মৃতি—কড়ি ও কোমল।)

কবি নানারূপে নারীকে দেখে মুগ্ধ হ'য়েছেন। নিদ্রিতা নারীর রূপ কবির চোখে অপূর্ব সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। নিদ্রিতা নারী যেন একখানি সুন্দর ছবি। ছবিতে আঁকা সৌন্দর্যে যেমন গতি নেই, রূপান্তর নেই, ক্ষণে ক্ষণে তার কোন পরিবর্তনের চঞ্চলতা নেই, তেমনি এই নিত্য গতিমান জাগ্রত জগতের মধ্যখানে নিদ্রিতা নারীর ছবি কবির চোখে একটি অচঞ্চল সৌন্দর্যকে প্রকাশ করছে। ঐ ঘুমন্ত স্তব্ধতা যেন সন্ধ্যার নিগূঢ় অন্ধকার কোন মায়াতে বাঁধা প'ড়ে আছে। এ যেন ছবিতে আঁকা অস্তবিহীন সন্ধ্যাতারা আকাশের কোণায় থেমে আছে। কিন্তু ওর মধ্যে প্রাণের প্রবাহ থেমে নেই। সে বয়ে চলেছে। তা শুধু ঘুমের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে আছে। সেই প্রাণ-নির্ঝরিণীর প্রবাহ এখন ঘুমের অন্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে ঝর্ঝর গানে ঝ'রে পড়ছে। যেন মর্মভূমির নিত্য মর্মরিত ধ্বনি নীরবতার আড়ালে আত্ম-গোপন ক'রে আছে। এখন ঘুমের ঘোরে নিদ্রিতার বুকের অঞ্চলখানি স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু লজ্জা নারীর চির সাথী। ও যেমনি জেগে উঠবে অমনি লজ্জায় ম'রে গিয়ে খ'সে-পড়া আঁচলখানি বুকে টেনে নেবে। (নিদ্রিতার চিত্র, কড়ি ও কোমল)।

নারীর প্রেমে কবির চোখ, এই ধরণীর ধূলির অন্তরে, পরম সৌন্দর্য্যকে দেখেছে। নারীর প্রেমে এই পৃথিবী কবির চোখে তরুণী হ'য়ে দেখা দিয়েছে। নারীর প্রেমে সমস্ত জগৎ এসে কবির কাছে ধরা দিয়েছে, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য ঝরণাধারার মত কবির মাথায় যেন ঝ'রে পড়ছে। প্রণয়িণীর বাণী কবির কাছে বিশ্বের সমস্ত বাণীর বাহন হ'য়ে এসেছে। সে না হ'লে এই বিশ্ব যেন কবির কাছে বোবা হ'য়ে থাকৃত, তার বাণী কবির অন্তরে পৌঁছত না।

(শূন্য হৃদয়ের আকাংক্ষা—মানসী)

প্রেমের মধ্যে রয়েছে দুই বিপরীতের সমন্বয়। একদিকে সে বিশ্বের সংগে কবির চিত্তকে যুক্ত ক'রে দেয়, অন্যদিকে সে সজনতার মাঝখানে রচনা ক'রে রাখে বিজনতার নীড়। আবার প্রেমিক যখন একা থাকে, তখনও সে একা নয়। প্রিয়া সর্বদা বিরাজ করে তার হৃদয়ে। প্রেম সজনতার মাঝখানে সঞ্চার করে বিজনতার শান্তি, আবার নিঃসংগতার মাঝখানে এনে দেয় সংগের আনন্দ।

"লোকালয় মাঝে আমি রব তপোবনে
একেলা থেকেও তবু রব সাথী সনে।"

নারীর হৃদয় কবি আপনার অন্তরের মাঝখানে রেখে দেখেছেন। তাই তার যত ব্যথা তা কবি যেন নিজের বুকের মধ্যেই বুঝতে পেরেছেন। পল্লীর বালিকা নব বধূ হ'য়ে শহরে এসেছে, এমন ঘটনা সংসারে নিয়ত ঘটে থাকে। এর মধ্যে বালিকার যে হৃদয় বেদনা, কবি নিজের অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করেছেন। পল্লীর উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে মানুষ, সে শহরের রুদ্ধদ্বার গৃহে যে কেমন ক'রে সারাদিন কাটায়, সেই বেদনা কবি অনুভব করেছেন। পল্লী প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত ভাব সেখানকার মানুষের চিত্তে সঞ্চারিত হ'য়ে যায়। তাই তাদের প্রাণে আছে স্নেহ, প্রেম। আর শহরের সংকীর্ণ আকাশ আর রুদ্ধ বাতাস মানুষের মনকেও অনুদার, সংকীর্ণ ক'রে তোলে। তাই পল্লীর বালিকা শহরের নির্মমতার মাঝখানে এসে ব্যাকুল হ'য়ে পড়ে। এই ব্যাকুলতার কথা বুঝতে পারেন কবি। মেয়েদের জীবনের যত রকম দুঃখ

তার নিবিড় উপলব্ধি কবিকে মর্মবেদনায় ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। নিকরুণ প্রতিবেশিনীরা যখন নব বধূর রূপ যাচাই ক'রে দেখে, তখন সেই স্নেহহীন পাষাণ পুরীর মাঝে, নির্মম পরীক্ষকের দৃষ্টির সম্মুখে, নব বধূর দেহমন যে কী ব্যাকুলতায় সংকুচিত হ'য়ে ওঠে, কবি তার সমস্ত বেদনা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বালিকার অন্তর একগাছি ফুলের মালার মতই কোমল, স্পর্শকাতর। স্নেহহীন দৃষ্টির কঠোর স্পর্শে সে ফুলের মালাগাছির মতই ঝ'রে যেতে চায়।

'ব্যক্ত প্রেম' কবিতায় কবি পুরুষের পরিত্যক্তা নারীর জীবনের কাহিনী গভীর দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। নারী পুরুষকে ভালোবাসে। কিন্তু যতদিন সে ভালোবাসা গোপন থাকে ততদিন সে অন্য সবার সংগে মিলে মিশে তার আপন অন্তরের সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। সংসারের কাজে তার দিন কেটে যায়। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখে সখীদের সংগে কাজে ও খেলায় তার জীবন কেটে যায়। প্রাণের গোপন ভালোবাসা একটি পরম পবিত্র জিনিষ, কিন্তু সেই ভালোবাসার কথা যখন সংসারের সবাই জানতে পায়, তখন সংসারের চোখে সেটা কলংকের মত হ'য়ে ওঠে। আর পুরুষ যখন নারীকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যায় তখন সেই নারী বিশাল সংসারের মধ্যে সকলেরই পরিত্যাজ্য হয়। সমাজ তাকে ত্যাগ করে। তার গোপন ভালোবাসা তখন সংসারের নিষ্ঠুর দৃষ্টির সামনে অনাবৃত হ'য়ে পড়ে। নারী যে সংসারের অন্তরালে ছিল, অন্য সবার সংগে ছিল, তাকে তার সেই আশ্রয় থেকে ছিন্ন ক'রে এনে পুরুষ তাকে পথের মাঝখানে ফেলে চ'লে যায়। যেন পাতার আড়াল থেকে ছিঁড়ে এনে একটি ফুলকে রাজপথের ধুলোয় ফেলে দেওয়া। এতে পুরুষের কোন ক্ষতি হয় না। সমাজে দুদিন হয়ত' লোকে তাকে নিন্দা করে, কিন্তু দুদিন পরেই সমাজ তাকে ক্ষমা করে। কিন্তু নারীকে সমাজ তার প্রেমের কলংকের জন্য কোনদিন ক্ষমা করে না। সে চিরজীবনের মত সমাজচ্যুত। নারীর হ'য়ে কবি নিষ্ঠুরচিত্ত পুরুষকে এই প্রশ্ন করছেন—সে যদি নারীকে চিরদিন ভালোবাসতে না পারে, তবে সে নারী হৃদয়ের গোপন ভালোবাসাকে এমন ক'রে অনাবৃত কেন করে? নারীর লজ্জা সে কেন কেড়ে নেয়? গায়ের কাপড় কেড়ে নিয়ে কোন মেয়েকে যদি পথে বের ক'রে দেওয়া হয়, সে যেমন নিদারুণ নিষ্ঠুরতা, তেমনি নারীর প্রেমের কথা সংসারে প্রচার ক'রে দিয়ে তাকে ত্যাগ করাও তার প্রতি তেমনি নিষ্ঠুরতা।

(ব্যক্ত প্রেম,—মানসী)

'গুপ্ত প্রেম' কবিতায় কবি রূপহীনা নারীর মনের প্রেমের আকুতির কথা গভীর দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কবির দরদী দৃষ্টি নারী-হৃদয়ের বেদনাকাতর গোপন মর্মমূলে গিয়ে পৌঁছেছে। যে নারী রূপসী নয়, তারও মনে প্রেমের রূপ তো সুন্দর। প্রেম তো স্বর্গের জিনিষ, অমরাবতীর ধন। কুরূপ দেহের মধ্যে পাছে প্রেমকেও দেখতে কুরূপ হ'য়ে ওঠে এই ভয়ে রূপহীনা আপন মনের প্রেম জানাতে সাহস পায় না। সে দূরে দূরে পালিয়ে বেড়ায়। তার মনে আকাংক্ষা যে যদি সে তার প্রেমের পাত্রকে তার দেহের অন্তরালে যেখানে প্রেম তার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিরাজ করছে, সেই হৃদয়-মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারত! রূপহীনা নারীর মনের প্রেম তার পক্ষে এক পরম বিড়ম্বনা। রূপ না হ'লে যে প্রেম প্রকাশ পায় না। বন তার মনের ভালোবাসা ফুলে ফুলে ফুটিয়ে তোলে, তারা তার প্রাণের কথা তার আলোর অক্ষরে লিখে দেয়। কিন্তু রূপহীনার প্রেম কুরূপের অন্ধকারেই থেকে যায়। তাকে বাইরে প্রকাশ করবার উপায় তার হাতে নেই। নারীর এই প্রকাশহীন প্রেমের বেদনা উপলব্ধি ক'রে কবি প্রশ্ন করছেন নির্দয় বিধাতাকে—যাকে রূপ দাওনি তাকে প্রেমের বেদনা কেন দিলে? (গুপ্ত প্রেম, মানসী)।

'গোড়ায় গলদ' উপন্যাসে কবি লিখেছেন কেমন ক'রে মেয়েরা বিয়ের মন্ত্রের সংগে সংগেই স্বামীকে চিরচেনা-জনের মত ভালোবাসতে পারে। পুরুষমানুষ কিন্তু এমন ক'রে ভালোবাসতে পারে না। বিনোদবিহারী যখন কমলমুখীকে ত্যাগ করেছে, তখন স্বামীর পক্ষ নিয়ে কমল বলছে—"তুই বুঝিসনে ইন্দু ওরা যে পুরুষ মানুষ। আমাদের একভাব, ওদের আর এক ভাব। জানিস নে মার কোলে ছেলেটি হওয়া মাত্রই সে কালোই হ'ক আর সুন্দরই হ'ক—তাকে সেই মুহূর্ত থেকে ভালোবাসতে না পারলে এ সংসার চলে না।" তেমনি স্ত্রীর অদৃষ্টে যে স্বামীই জোটে তখুনি যদি সে তাকে ভালোবাসতে না পারে, তা হ'লে সে স্ত্রীরই বা কী দশা হবে আর এই পৃথিবীরই বা

টেঁকে কী ক'রে ? মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না। বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ মানুষ র'য়ে ব'সে অনেক ঠেকে, অনেক ঘা খেয়ে খেয়ে তার পরে ভালোবাসতে শেখে, ততদিন মেয়েরা পৃথিবী মধুর ক'রে রাখে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

মেয়ে মানুষ পুরুষ মানুষকে কেন ভালোবাসে, কেন তাকে চায় এ কথার উত্তর কবি দিয়েছেন কমলমুখীর মুখে। ইন্দু বল্‌ছে কমলকে পুরুষ মানুষ না হ'লে মেয়েমানুষের কী চলে না যে মেয়েরা পুরুষের পায়ে এমন ক'রে নিজেদের বিলিয়ে দেবে ? ইন্দু কমলকে বল্‌ছে তোরা ঐ রকম করিস ব'লেই তো পুরুষগুলোর দেমাক বেড়ে যায়, নইলে তাদের আছে কি ? যেমন মূর্ত্তি, তেমনি স্বভাব। সাধে তাদের পায়া ভারী হয়, তেদের যে সেই পায়ে তেল দিতে একদণ্ড তর সয় না। ঐ দাড়ি মুখগুলো না হ'লে কি আমাদের একেবারে চলে না ? উত্তরে কমল বল্‌ছে —"আসলে জানিস্ ইন্দু, ওদের না হ'লে আমাদের চলতে পারে, কিন্তু আমাদের না হ'লে পুরুষ মানুষের চলে না। সেই জন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি। ওরা নিজের যত্ন নিজে করতে জানে না, ওদের সর্বদা সামলে রাখবার এবং দেখবার লোক একজন চাই। মনে হয় যেন আমাদের চেয়ে ওদের ঢের বেশি জিনিষের দরকার। ওদের মস্ত শরীর, মস্ত খিদে, মস্ত আব্‌দার। আমাদের সব তাতেই চ'লে যায়। ওদের একটু কিছু হ'লেই একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়ে, আমাদের মত ওদের এমন মনের জোর নেই, ওরা এত সহ্য করতে পারে না। সেইজন্যেই তো ওদের এতটা ভালোবাসতে হয়, নইলে ওদের কী দশা হ'ত ? এই কথাই শরৎচন্দ্র ব'লেছেন তার সমস্ত নারী চরিত্রের মধ্যে। যেখানে আত্মদানের অবকাশ যত বেশি সেইখানেই নারীর প্রেম। ভোলা পুরুষমানুষ যে নিজের যত্ন নিজে করতেই জানে না, এই ত্রুটি, এই অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা দিয়েই সে নারীচিত্তকে জয় করেছে। 'দত্তা' বইতে বিজয়া যখন শুন্‌ল যে নরেনের বাসা-বাড়ীতে তাকে খাওয়াবার, তাকে যত্ন করবার কেউ নেই, কোনদিন বা ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে দেয়, এক একদিন খিদের সময় তার কী রকম অসহ্য বোধ হয়, তখনি নরেনের প্রতি বিজয়ার স্নেহ উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌ল। রমেশের জন্য রমার, সতীশের জন্যে সাবিত্রীর, সুরেন্দ্রনাথের জন্যে 'বড়দিদির', দেবদাসের জন্যে চন্দ্রমুখীর ভালোবাসা এই কারণে। নিজের এই দুর্বলতা দিয়েই পুরুষ নারীকে প্রবলভাবে আপনার দিকে টানে,—ঠিক যেমন ক'রে তাকে টানে অসহায় দুর্বল শিশু। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা সবাই নারী চরিত্রের এই বিশ্লেষণে সহমত। শ্রেষ্ঠ ইংরাজ লেখক বার্ণাড শ' এই কথাই বলেছেন 'ক্যানডিডা' বইতে। যে পুরুষ যতখানি দুর্বল, দুঃখ সহ্য করবার শক্তি যার যত কম, যার জন্যে নারীর সেবার অবকাশ যত বেশি, সেই নারীর পক্ষে অত্যাজ্য। পুরুষ মানুষকে আপাতদৃষ্টিতে বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, যেন তার কত শক্তি, যেন সেই নারীর আশ্রয়দাতা। কিন্তু অন্তর্দ্রষ্টা লেখক দেখিয়েছেন যে আসলে পুরুষেরই অবলম্বন হ'ল নারী। পুরুষের দৈহিক শক্তি আছে বটে কিন্তু মনের দিক থেকে সে পরম দুর্বল। সংসার ও জীবনের ঝামেলা সহ্য করবার শক্তি তার নেই, দুঃখ ও নিরাশা সহ্য করতে সে অক্ষম। ক্যানডিডা তার স্বামীর সংসারের সমস্ত অভাব, অস্বচ্ছলতার দায় নিজে গ্রহণ ক'রে স্বামীকে সমস্ত দুঃখ ও বিরক্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, পাওনাদারদের ঠেকিয়ে রাখে সেই। স্বল্প আয়ে সংসার চালাবার সমস্ত দুঃখ সে একা সহ্য করে। 'শ' দেখিয়েছেন যেখানে পুরুষ নারীর গুণমুগ্ধ, যেখানে সে তাকে আন্তরিক ভালবাসে, সেখানেই বা পুরুষ কাজে নারীর জন্য কী করতে পারে ? তার সেবা পাওয়াই স্বভাব, সেবা করা তার ধর্ম নয়। ক্যানডিডা যেদিন বাইরে থেকে ফিরে এল, সেদিন তার স্বামী ঠিক সময়ে তাকে আন্‌বার জন্য ষ্টেশনে যেতেই ভুলে গেল। ক্যানডিডাকে তার মালপত্র নিয়ে একাই আসতে হ'ত, যদি না তরুণ কবি এসে তাকে সাহায্য করত। তরুণ কবি ও ক্যানডিডার ধর্মযাজক স্বামী যখন ক্যানডিডার ভালোবাসার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হ'ল তখন ক্যানডিডা বল্‌ল, যে বেশি দুর্বল আমি তারই। কবি বাইরে থেকে দেখতে দুর্বল কিন্তু অন্তরে সেই সবল। তার জন্যে ক্যানডিডা চিন্তিত নয়। ক্যানডিড বলে—"ও জানে সুখ বিনা কী ক'রে বাঁচতে হয়।" কিন্তু সাধারণভাবে পুরুষ মানুষ সুখ বিনা বাঁচতে শেখে নি। সুখে তার একান্ত

দরকার। সুখ না হ'লে সেবা না হ'লে তার চলে না। তাই যে পুরুষের তাকে না হ'লে চলে না, তারই পায়ে নারীর আত্মোৎসর্গ। বরনারীর এই স্বভাব। নারী চরিত্র যেখানে শ্রেষ্ঠতর উপাদানে গড়া, যেখানে সে সম্পূর্ণ অবিকৃত, নির্মল, সেখানে বার্ণার্ড শ' নারীর এই প্রকৃতি দেখিয়েছেন। তাই তিনি এই শ্রেণীর বরনারীর প্রতিনিধিকে নাম দিয়েছেন ক্যানডিডা বা অবিকৃতা নারী স্বরূপ।

পুরুষ মানুষেরও দুই জাত আছে—কবি আর অকবি। যে অকবি সে নারীর কাছে সেবা চায়, প্রতিদানে তাকে বেশী কিছু দেয় না। কিন্তু যে কবি সে চায় নারীর জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ ক'রে দিতে। সে চায় নারীর জন্য দুরূহ, দুর্গম, কঠিন কোন কিছু করতে। তরুণ কবি ক্যানডিডার প্রেমে তার গৃহস্থালীর হীন কাজ, বিরক্তিকর কাজগুলোও করতে পেয়ে পুলকিত হ'য়ে ওঠে। নারীর পূজায় সে আনন্দিত। এই পূজার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে পেলে সে খুশী। নারীর প্রতি কবির মনোভাবের যে বর্ণনা শ' দিয়েছেন এই বই'তে, তাই আমরা দেখতে পাই কবি রবীন্দ্রনাথের রচনায় এবং তাঁর জীবনে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি শ'র অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর ছিল। নারীকে এবং কবিকে এবং তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাকে শ' সত্যরূপে দেখেছেন। আর অকবি পুরুষের স্বভাবও তিনি সত্যরূপে উপলব্ধি করেছেন। ধর্মযাজকদের প্রতি শ' খুশী ছিলেন না। তাই অকবি পুরুষের প্রতিনিধিকে তিনি ধর্মযাজকরূপে দেখিয়েছেন। স্থূল, মাংসল সবল যেমন তার দেহ, তেমনি তারই অনুরূপ তার মানসিক স্থূলতা। নারীর ওপরে সে একান্ত নির্ভরশীল, অথচ তার স্থূল বুদ্ধি নিয়ে সে জানে যে সেই নারীর আশ্রয়দাতা। স্থূলবুদ্ধি না হ'লে কেউ ধর্মযাজকতা করতে পারে না, এই ছিল 'শ'র বিশ্বাস। তাই সূক্ষ্ম সংবেদনময় অনুভূতিশীল কবিমানসের সংগে বৈপরীত্য দেখাবার জন্য শ, ধর্মযাজককে তার পাশে রেখে দেখিয়েছেন। ধর্মযাজক, অকবি পুরুষ-সাধারণের প্রতিনিধি।

[ক্রমশঃ]

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সংসারের নানা কাজে, অভাব-অভিযোগের দুশ্চিন্তায় আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের মনে শান্তি-সুখ নেই ...দৈনন্দিন জীবন তাঁদের নানান সমস্যায় ভারাক্রান্ত ...আরাম-বিরাম প্রায় স্বপ্নে পরিণত হয়ে উঠেছে। তার উপর সংসারে স্বচ্ছলতা-সম্পাদনের জন্য বহু মেয়েকেই আজ অফিসে, কারখানায়, স্কুলে-কলেজে-হাসপাতালে ও আরো নানা ধরণের কর্মক্ষেত্রে নামতে হয়েছে। এ জন্য অবশ্য অনুযোগ চলে না। কারণ, যুগের ও সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের এবং দৃষ্টিভঙ্গীরও আজকাল যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তাই সাংসারিক দারিদ্র্য-দুঃখ ঘোচানোর উদ্দেশ্যে ইদানীং-যুগের মেয়েরা যদি নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করে কর্ম্মক্ষেত্রে নামেন, তাতে লজ্জা নেই। বরং অন্ন-বস্ত্রের জন্য নিরুপায় হয়ে, দাসী-বাঁদীর মত পরের আশ্রয়ে পড়ে থাকাতেই লজ্জা-গ্লানি—তাতে নারীত্বের অমর্য্যাদা হয়, মনুষ্যত্বও লোপ পায়। সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব অধুনাকালে আদৌ দোষের বলে মনে করি না।

আসল কথা হলো—কর্ম্মক্ষেত্রে নামলেও, মেয়েরা কিন্তু মেয়ে থাকুন চাল-চলনে...পুরুষালি ছাঁদে নিজেদের প্রকৃতিগত লালিত্য-মাধুর্য্য, কমনীয়তা, স্নেহ-মায়া মমতা লাজ-লজ্জা সৌজন্য-সজীবতা প্রভৃতি বিসর্জন দিয়ে নিজেদের না গড়ে তোলেন। উন্নত-প্রগতিশীল পাশ্চাত্য-দেশে মেয়েরা আজ নানা কাজ করছেন—কল-কারখানা

অফিস-আদালত, হাসপাতাল স্কুল-কলেজ, সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্র-অভিনয়—এমন কি, রেল ষ্টীমার, উড়ো-জাহাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি আরো কত সব কর্মক্ষেত্রে লিপ্ত রয়েছেন—তবু রমণী সুলভ রূপশ্রী-লালিত্য মানসিক সৌকুমার্য্যটুকু বজায় রাখতে তাঁদের বিন্দুমাত্র ঔদাস্য নেই। অথচ আমাদের দেশে এই অল্প দিনেই যে সব মেয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমে জীবিকার্জ্জন করছেন তাঁদের রূপশ্রীহীনতা পাণ্ডুবর্ণ, অস্থিসার দেহ, মলিন মুখ আর অকাল-জীর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য দেখে মন ক্ষোভে-দুঃখে ভরে ওঠে। আধুনিক জীবন-ধারায় গৃহস্থালীর নিত্যনৈমিত্তিক-কাজকর্ম ছাড়াও পুরুষালী-ধাঁচের আরো নানান্ পেশায় লিপ্ত থাকলেও, নিজেদের শারীরিক ও মানসিক শ্রী সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য বজায় রাখার দিকে এমন ঔদাস্য-ভাব পোষণও আদৌ সমীচীন নয়—প্রকারান্তরে, এ তো আত্মহত্যারই সামিল! প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশেরই মেয়ে মহলে সুপ্রচলিত বিশেষ একটি অভিমত—"যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না?" স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অতএব যত কাজ এবং যত পরিশ্রমই করুন, আমাদের দেশের মেয়েদের অন্যতম কর্ত্তব্য হলো—নিজেদের দেহটিকে যথাযথভাবে বজায় রাখা—শারীরিক স্বাস্থ্য আর মানসিক সজীবতা যেন এতটুকু ম্লান বা অযথা নষ্ট না হয়। তাছাড়া সর্ব্বোপরি নারীর যা একান্ত সম্পদ—রূপশ্রী এবং কোমল লালিত্য, সেটুকু অটুট-অক্ষুণ্ণ ও সমুজ্জ্বল রাখা চাই।

সে জন্য চাই—প্রত্যহ দিনের সুরুতে কিম্বা কাজের শেষে অবসরকালে নিয়মিত ভাবে কিছুক্ষণ ব্যায়াম প্রসাধন আর রূপচর্চ্চা। আপাততঃ, সেই ব্যায়াম প্রসাধনেরই কয়েকটি সহজ সরল অনায়াস-সাধ্য পদ্ধতি অনুশীলনের মোটামুটি হদিশ দিই। সাংসারিক কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে এবং সময়াভাবের ফলে, কর্মজীবিনী মহিলাদের, যাঁদের পক্ষে দিনের সুরুতে এ সব ব্যায়াম-প্রসাধন অনুশীলন সম্ভবপর হয়ে উঠবে না, তাঁরা রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বেও নিত্য নিয়মিতভাবে সহজ সরল এই ব্যায়াম প্রসাধনগুলি অনুশীলন করতে পারেন।

১। প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর কিম্বা রাত্রে শয্যাগ্রহণের আগে (সম্ভবপর হলে, প্রাতে এবং রাত্রে—দু'বেলাতেই) ঈষৎ উষ্ণ (Tepid-warm) সাবান জলে মুখ হাত, গলা ঘাড় প্রভৃতি দেহভাগ বেশ ভালো করে ধুয়ে ফেলবেন। আজকাল বাজারে ছোট সাইজের যে তোয়ালে-রুমাল পাওয়া যায়, সেই তোয়ালে-রুমাল জলে ভিজিয়ে, তাইতে ভালো সাবান মাখিয়ে মুখে, গালে, কপালে, ঘাড়ে, গলায়, মৃদু-চাপ দিয়ে বার কয়েক বেশ জোরে জোরে ঘষুন। এভাবে ঘর্ষণ মর্দ্দনের ফলে, মুখে, গালে রক্তচলাচল ক্রিয়া বেশ সজীব ও অব্যাহত থাকবে। উপরন্তু, শ্রম আর অবসাদজনিত সব ক্লেদ গ্লানিও দূর হবে। সাবান মাখা জলে, ঈষৎ উষ্ণ জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ, ঘাড় প্রভৃতি দেহাংশ আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবেন। তারপর আবার ঠাণ্ডা জল ব্যবহার ক'রে মুখ, কপাল, ঘাড়, গলা প্রভৃতি দেহের অংশগুলি ধুয়ে নিতে হবে। এ ব্যবস্থার ফলে, লোমকূপগুলি ক্লেদমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং মুখের ত্বক্ সজীব, উজ্জ্বল ও লালিত্যময় হয়ে উঠবে। তাছাড়া মুখে গালে কপালের কোথাও অকালে অস্বাস্থ্যকর জরাজীর্ণতার রেখা-চিহ্ন প্রকাশের সম্ভাবনা থাকবে না। রূপশ্রী লালিত্যও মনোরম এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠবে নিয়মিত ভাবে এই প্রসাধন রীতি অনুশীলনের দৌলতে।

২। উপরোক্ত রীতিতে মুখ ধোওয়ার পর, শুকনো নরম গামছা বা তোয়ালে ঘষে মুখের জলটুকু আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে মুছে ফেলবেন। শুকনো তোয়াল দিয়ে এভাবে ঘর্ষণ-মর্দ্দনের ফলে, মুখের পেশীসমূহ সজীব, লোমকূপ ক্লেদমুক্ত এবং রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া সুস্থ সবল ও সুন্দর থাকবে।

৩। এমনিভাবে মুখটি আগাগোড়া বেশ মুছে ফেলবার পর বিশেষ ধরণের একটি 'প্রসাধনী-মিশ্রণ' মাখার পালা। এ 'মিশ্রণটি' বানাতে হবে—এক আউন্স পরিমাণ বিশুদ্ধ গোলাপ জলে ২০ ফোঁটা আন্দাজ গ্লিসারিন মিশিয়ে। বিশেষ ধরণের এই 'প্রসাধনী লোশনটি' (toilet-lotion) বানিয়ে পরিচ্ছন্ন একটি শিশিতে ভরে ছিপি এঁটে রাখবেন—নিত্যনিয়মিতভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। সুষ্ঠুভাবে ছিপি আঁটা শিশিতে সযত্নে রাখলে, এ 'লোশনটি' চট্ করে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই—অনায়াসেই ৮।১০ দিন ব্যবহার করা চলবে। প্রত্যহ সাবান জলে মুখ ধোওয়া এবং শুকনো

লোশনকে দিয়ে মুখ ধোয়ার পর, এই লোশনের কয়েক ফোঁটা হাতের তালুতে রেখে, আঙুলের সাহায্যে ধীরে ধীরে এবং মৃদু চাপ দিয়ে মুখে গালে কপালে ঘাড়ে সর্বত্র বেশ ভালোভাবে ঘষবেন। মুখে এভাবে 'লোশন' ঘষবার সময়, চোখের উপরের পাতা ও নীচের অংশটুকুও বাদ দেবেন না। এ সব অংশেও আগের মতো ভাবেই হাতের দুই আঙুলে কয়েক ফোঁটা 'লোশন' নিয়ে ধীরে ধীরে আঙুলের মৃদু চাপ দিয়ে চোখের পাতা এবং নীচের অংশে বার কয়েক 'তোলা-নামা' করে ঘষবেন—অন্ততঃ-পক্ষে প্রায় মিনিট ৩.৪ সময়।

'প্রসাধনী লোশন' ব্যবহারে এভাবে ঘর্ষণ-মর্দ্দনের ফলে চোখের পাতা এবং নিম্নাংশ যে শুধু সজীব ও শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে তাই নয়, চোখের দৃষ্টিশক্তিও অটুট-অক্ষুন্ন থাকবে দীর্ঘকাল। তবে খেয়াল রাখবেন—চোখের উপর ও নিম্নাংশে এভাবে 'লোশন' ঘষবার সময় অসাবধানতা বশে চোখের ভিতর যেন এতটুকু ফোঁটাও না প্রবেশ করে। এ 'লোশন' চোখের ভিতরে সেঁধুলে সামান্য জ্বালা আর ক্ষণেক অস্বস্তি বোধ করবেন · তবে ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই। কাজেই চোখের অংশে 'লোশন' ঘষবার সময় চোখটি মুদ্রিত রাখাই ভালো।

স্থানাভাবের কারণে আপাততঃ এই পর্য্যন্তই হদিশ দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে আরো আলোচনা করা যাবে। (ক্রমশঃ)

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

গত সংখ্যায় 'কৌচিং' (Couching) রীতিতে বিচিত্র ছাঁদে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে অভিনব-উপায়ে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের নানা রকম সৌখিন-সুন্দর নক্শা রচনা করে সূতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ের বিভিন্ন সামগ্রী বানানোর মোটামুটি পরিচয় ও নমুনা দিয়েছি। একারেও তেমনি ধরণের আরো কয়েকটি সূচীশিল্প-পদ্ধতির হদিশ দেওয়া হলো।
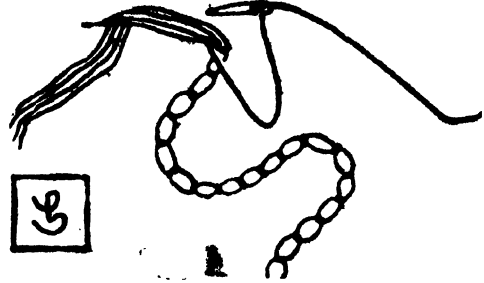
উপরের 'ঙ'-চিহ্নিত চিত্রে 'কৌচিং' রীতিতে বিশেষ-ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার যে পদ্ধতিটি দেখানো হয়েছে, সেটির সাহায্যে সহজেই সূতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ের উপর ব্লাউজ, স্কার্ফ, টেবিল-ক্লথ, পর্দা, কুশন-কভার, হাত-ব্যাগ, বটুয়া-থলি, টি-কোজি, টেবিল-ম্যাট, ন্যাপকিন, ছোট ছেলেমেয়েদের রম্পার, এ্যাপ্রন, বিব-ক্লথ, প্রভৃতি নানা রকমের সৌখিন-সুন্দর সূচীশিল্প-সামগ্রী অলঙ্করণের কাজ করা যাবে। বিবিধ-ধরণের 'আলঙ্কারিক-নক্সা' রচনার উপযোগী সহজ-সরল এই 'কৌচিং' সেলাইয়ের ফোঁড় কি উপায়ে সূতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ে তোলা যাবে, তার মোটামুটি পরিচয় উপরের 'ঙ'-চিহ্নিত নক্সা-নমুনাটি দেখলেই সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।

এই ধরণের 'কৌচিং' সূচীশিল্প-পদ্ধতি অনুসারে সরল-সুন্দর ছাঁদের যে সব বিচিত্র-অভিনব 'আলঙ্কারিক-নক্সা' রচনা করা সম্ভব শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আপাততঃ তারই একটি সহজ-নমুনা নীচে প্রকাশ করা হলো।
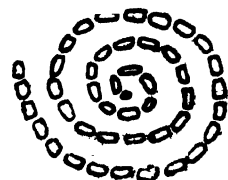
সূচীশিল্পানুরাগিণীদের রুচি এবং প্রয়োজনানুসারে উপরের সরল-সুন্দর আলপনা-ছাঁদের নক্সা নমুনাটি বিবিধ সামগ্রী অলঙ্করণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সৌখিন-সুন্দর এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের উপযোগী 'কৌচিং'-রীতির এমনি ধরণের সহজ-সরল আরো কয়েকটি বিচিত্র অভিনব 'আলঙ্কারিক নক্সার' নমুনা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করার বাসনা রইলো। আলোচ্য 'কৌচিং-রীতিতে সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড়ের উপর হরেক-রঙের সুতোর সাহায্যে এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের মনোরম-সুন্দর 'আলঙ্কারিক-নক্সা' রচনা করা খুব একটা শ্রমসাপেক্ষ বা দুঃসাধ্য কাজ নয়। তাছাড়া অভিনবত্ব এবং মনোহারিতার দিক দিয়েও এই ধরণের 'কৌচিং'-সেলাইয়ের কাজ করা বিচিত্র-নক্সাদার বিভিন্ন সূচীশিল্প সামগ্রীগুলি যে সহজেই ছোট-বড় সকল বয়সের লোকজনেরই প্রিয় হয়ে উঠবে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

কেন তুমি এলে

আইভি রাহা

কেন বল ; কেন তুমি এলে—
নিরুদ্বিগ্ন আশ্বাসের ক্ষীণ দীপ মোর পথে জ্বেলে ?
বঞ্চনার যন্ত্রণায় আশাহত উদ্দেশ্য বিহীন—
রাশি রাশি ভাবনার অতলেতে ছিনু শুধু একা উদাসীন।
মনের গভীরে রেখে বেদনার ভার আর
এক রাশ এলো মেলো কথা
কোথা আলো। উত্তপ্ত আশ্রয়ের
নিশ্চিন্ত সুনিবিড় শান্ত নির্ভরতা—
আর তো খোঁজেনি মন নিরাশার ঢেউ ঠেলে ঠেলে।
চাহিনি, চাহিনি আমি তোমার ও দয়া দিয়ে ধোয়া
রক্ত গোলাপের মৃত শেষ রক্তিমতা ;
কি হবে ? থাক না ব্যথা। থাক শোক।
কান্না দিয়ে ঘেরা নীরবতা।
জানি তো দেবে না কিছু—
বিক্ষত জীবনের নির্মোক ছিঁড়ে খুলে ফেলে
তবু ভাবি—অনুদার, নির্মম
কঠিনের সীমা অবহেলে ;
নিভন্ত বিকেলের ছায়াপথে,
কেন মিছে—কেন তুমি এলে ?

মানব সেবায় স্বামী হরিহরানন্দ গিরি

জয়শ্রী চক্রবর্তী

একদিন অনির্দিষ্ট যাত্রা সুরু হয়েছিল, স্বামী হরিহরানন্দ গিরির জীবনে। এক অনন্ত পথের দিশারী রূপে যিনি বিশ্ব ভুবনের নেপথ্য থেকে অদৃশ্য আকর্ষণে আহ্বান করেছিলেন, বোধকরি, সেই বিশ্ববোধ সত্বার নির্দেশেই—স্বামীজী এসে পৌঁছলেন—বিন্দুবাসিনী মায়ের মন্দিরে। উনিশশো একষট্টি সাল। স্মরণীয় সেই বছর।

তারও আগের ইতিহাস, কোনদিনের এক প্রখরপুষ্ট বেলা দ্বিপ্রহরে পাকুর থেকে যে গাড়ীটা যাচ্ছিল—হিরণপুরের দিকে, সেই গাড়ীতে কতকটা অজানিত কারণেই তিনি উঠে বসলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন বা কতদূরে শেষ হবে সেই পথ; কিছুই তাঁর জানা ছিল না। জীবন-দেবতার বিচিত্র আকর্ষণে বুঝি ভরে উঠেছিল—এই উদ্দেশ্যহীন পথযাত্রা।

অবশেষে হিরণপুরেই তিনি নেমে ছিলেন—এক জনহীন নির্জন পথ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তিনি খুঁজছিলেন—সামান্য আশ্রয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে, দৃষ্টি গোচরিত হোল, প্রাবৃট বৃক্ষতলে জটাজাল শাখা সমাবেশে শিলা-শিবের প্রতিষ্ঠিত চত্বর! সেখানেই তিনি তাঁর অবসন্ন দেহটিকে বিছিয়ে দিয়ে—পরমানন্দে নিঃশ্বাস ফেললেন।

সে সময় নিদারুণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এই পার্থিব চেতনাময় দেহ খুবই ক্লান্ত শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। সেই সময়-সন্ধিক্ষণে তিনি এমনই একজনকে খুঁজছিলেন,—যে তাঁকে দেবে ক্ষুধার খাবার, তৃষ্ণায় জল। কিন্তু পরমুহূর্তে, তিনি আশ্চর্য হ'য়ে দেখলেন—একজন অপরিচিত ধর্মাভিলাষী আগন্তুক এসে করজোড়ে নিবেদন করলো—"আপনার সেবা করতে চাই।" অর্থাৎ সে তার সাধুসেবার সাধ মেটাতে চায়।

অচিরাৎ এই আশা তার পূর্ণ হোল। সেদিনটা স্বামী হরিহরানন্দ গিরির জীবনে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তকাল। সেদিনটা কেটে গেল হিরণপুরেই। কেটে গেল সেই রাতও। আবার পরের দিন প্রভাতে যাত্রা সুরু করলেন তিনি। এগিয়ে চললেন—সাঁওতাল পরগণা বিহারের অন্তর্গত—বারহারোয়া ষ্টেশনের দিকে।

পথ চলতে চলতে আর একবার তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে পড়লেন। পথিমধ্যে এক গৃহস্থ বাড়ীর দ্বার প্রান্তে গিয়ে গৃহস্বামীকে উদ্দেশ্য করে—কিছু খাওয়ার কথা জানালেন। কিন্তু সেই বাড়ীর গৃহিণী—গৃহান্তরাল থেকে রূঢ় স্বরে জানালেন—'হাত জোড়া আছে—এখন কিছু মিলবে না।'

একথা শুনে বড় সকরুণ ভাবে হাসলেন স্বামীজী। 'মাগো হাত জোড়া বললে তো হবেনা, একটু জল বাতাসাও আমাকে দাও।' কিন্তু এরপরে যা ঘটলো, তা অভাবনীয়! একজন ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্তের সামনে—গৃহস্থ বাড়ীর সেই খোলা দ্বার দুটি সহসা রুদ্ধ হ'য়ে গেল।' একজন সর্বত্যাগী, ঈশ্বরের একনিষ্ঠ ভক্তকেও এরা—সামান্য একদিনের দয়া দেখাতে পারল না!

তবু ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ এই লীলা মাধুর্যকে, সেই তৃষিত ক্ষুধিত অন্তরেই, মহিমান্বিত করে তুললেন স্বামীজী। আর একবার অনন্ত জীবময় সত্বাময় পৃথিবীর দিকে চেয়ে বড় সকরুণ ভাবে হাসলেন। হৃদয় যেন এমনি করে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে চলেছে। এই জীবরহস্যের সূত্রধর—প্রেমানন্দের প্রাণময় স্পর্শে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

কিন্তু সামনের পথ—আদিগন্ত প্রসারিত। আবার ক্লান্ত পথিকের মত পথ হাঁটেন। বারহারোয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হতে, একজন জানালো—ষ্টেশন থেকে মাইল দেড়েক দূরে—পর্বত শীর্ষে বিন্দুবাসিনী মায়ের মন্দির। বহু পুরাতন ইতিহাসের অনাক্ষরিত—অধ্যায়ে—দেবী মাতার জাগ্রত সত্বা সমুজ্জ্বল।...

শুনে দিশেহারা হয়ে গেলেন স্বামীজী। এতক্ষণ পর যেন তাঁর গন্তব্যস্থান এবং ঠিকানা তিনি খুঁজে পেলেন। মহানন্দের প্রস্রবণ ধারায়—এই পার্থিব ইন্দ্রিয়াসক্ত দেহমন প্লাবিত হয়ে উঠলো। চির করুণা নির্বাণের—করুণা

বর্ষণে, সহসা আনন্দেই যেন চোখে জল এলো স্বামীজীর। মনে মনে যেন অভিমানে বলে উঠলেন—"কোথায় তুমি ছিলে—দয়াময়ী মা আমার ?"

অবশেষে, বিন্দুবাসিনী মা'ই যেন—তাঁর আদরের ছেলেটিকে বুকে তুলে নিলেন। এক অপার মাতৃসত্তা ভাবে—বিভোর হয়ে—স্বামিজী এসে হাজির হ'লেন—বিন্দুবাসিনী মায়ের মন্দিরে। এখানে এসে তাঁর অনেক ক্ষুধা, অনেক তৃষ্ণা, অনেক ক্লান্তির হোল অবসান। মনে মনে ভাবলেন কি অসীম করুণাময়ী এই বিন্দু মা।

কিন্তু সেদিনের—অর্থাৎ উনিশ শো একষট্টি সালের এই পাহাড়িয়া সীমানার রূপ ছিল অন্য। আজ তার যথেষ্ট রূপান্তর ঘটেছে। আজ এর ব্যাপ্তি, বিশালতা, কর্ম কোলাহল, জন সমাগম অভূতপূর্ব! বিন্দুবাসিনী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে—আজ জন সমুদ্রের স্রোত বয়ে যায়। স্বামীজীর স্বল্পকালের প্রতিষ্ঠিত 'যোগাশ্রমে' আজ ভক্ত শিষ্যের অভাব নেই। কোথাকার মানুষ কোথা থেকেই না আসে যায়! অভাবনীয় এই জন মিলনের দৃশ্য !

কিন্তু সেদিন ? যেদিন ছিলনা, এত জনতার ভিড়, এত মানুষ মিলনের দৃশ্য, এত ভক্ত, এত শিষ্য, এত কর্মী, এত সেবকের দল ! সেদিন মায়ের মন্দির তলে ছিল, একজনই ভক্ত, একজনই সেবক, একজনই কর্মী, তিনি স্বামী হরিহরানন্দ গিরি।

সেদিনের সেই বিস্তীর্ণ নির্জন এলাকা জুড়ে এক ভয়াবহ শূন্যতা বিরাজ করতো। চতুর্দিকে পর্বত মালায় অসমতল প্রান্তর। দূরে দূরে থাকতো কিছু আদিবাসী। গোদাবরী, বরুণা, ঘোড়াঘাটি, মাক্কা পাহাড় থেকে তারা কখনো কোন সময়ে প্রয়োজনে নাবতো সমতল ভূমিতে।

এদিকে নাগ-নাগিনীদের অবাধ বিচরণ অহরহ। তা ছাড়া ভয়ঙ্কর বৃশ্চিককুলের অনায়াস রাজত্ব। আর এরই মধ্যে নির্ভয়ে নিঃশঙ্কয়ে বাস করতেন স্বামীজী। প্রাণময়ী জীবনময়ী, রক্ষাময়ী—বিন্দুবাসিনী মা ছিলেন তাঁর একমাত্র পার্শ্বচারিণী, সহায়রূপিণী—সর্বক্ষণের সঙ্গিনী !

বারহারোয়ার স্থানীয় অধিবাসী—ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শিরোমণিরা তখন আসতো বিন্দুবাসিনী মায়ের মন্দিরে পূজো মানৎ করতে। স্বামী হরিহরানন্দ গিরির আগমনের পূর্বে একজন 'নগিন সাধু' নামে পরিচিত ব্যক্তি বাস করতেন মন্দির প্রাঙ্গণে। শোনা যায় তাঁর অসাধুতা ছিল বহুল পরিমাণে। এই কারণে—স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তিনি নাকি অচিরেই বিরাগ ভাজন হন এবং এদেরই চেষ্টায় নগিন সাধু বিতাড়িত হন। কিন্তু স্বামীজী এসব শুনে বড় ব্যথিত হয়ে সকলকে বললেন—মায়ের কাছে ওরে সবাই থাকবে। ভালও যেমন থাকবে তেমন মন্দও। ভাল ছেলেরাও যেমন মায়ের ছেলে, আবার মন্দ ছেলেরাও মায়েরই ছেলে।—মায়ের কাছ থেকে কাউকে তাড়াতে নেই।"

কিন্তু 'নগিন সাধুকে' কেউ আর অন্তরে গ্রহণ করতে চাইল না। ফলে তার প্রভাব কমে গেল—এবং তিনি নিজেই অন্যত্র যাত্রা করলেন। তার পর ধীরে ধীরে—স্বামী হরিহরানন্দ গিরি তাঁর সাধনভূমি হিসেবে গড়ে তুললেন এই স্থানটিকে। জীবনের শেষ ধর্মপাঠ বুঝি এখান থেকেই সুরু হোল তাঁর।

লোকালয়হীন সেই নির্জন পাহাড়ভূমিতে সমস্ত রাত ধরে তিনি ধ্যান করতেন—কখনো কেন্দ গাছের গভীর জঙ্গলে, নয় মন্দির প্রাঙ্গণের বটবৃক্ষতলে। ধীরে ধীরে এই সাধনস্তরের বিভিন্ন মার্গে উন্নীত হ'তে থাকলেন তিনি যোগমার্গে। ক্রমে সম্যক্ দর্শন লাভ করলেন কর্মযোগের। কর্ম চাঞ্চল্যে রয়েছে প্রাণময়ের সাড়া। এই বিশ্বসত্তার যাবতীয় জড়ত্ব স্পন্দনে, জীবনে, প্রাণনে, মননে বিকশিত করে তুলতে হবে।

জীবস্রষ্টার প্রাণস্রষ্টার বোধসত্তার একটি সচল উদ্দীপ্ত প্রজ্ঞান থাকা দরকার। চেতন ও অচেতন যোগ-রহস্যের সূত্র বাঁধতে পারলে—পরমানন্দের প্রেরণা লাভ সম্ভব হবে। ঠিক এই সময় আত্মসমীক্ষা আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্মদর্শনের যে সম্যক উপলব্ধি লাভ করলেন—অচিরাৎ তাকে কর্ম তালিকায় বাঁধতে চাইলেন।

জীবের সেবাই হবে সেই কর্মকেন্দ্রের একমাত্র মুখ্য পাথেয়। এই অন্তর ভাবসত্তার সত্য দর্শনের পরই তিনি কাজে নামলেন। মানব সেবার প্রথম পীঠস্থান

রূপে যোগাশ্রমের প্রথম ভিৎ রচনা করলেন তিনি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক মহামিলনের ক্ষেত্র ভূমি হিসেবে রচনা করলেন 'যোগাশ্রম'। প্রত্যেক মানুষের সুখের প্রয়োজনই এই আশ্রমের প্রয়োজন।

প্রত্যেক মানুষের সংগে মানুষের অন্তরের যোগ, ভাবের যোগ, ভালবাসার যোগই হোল যোগাশ্রমের মূলতঃ নীতি। আর এখানেই তো এই 'যোগ' তীর্থে পরমানন্দের প্রকৃত রূপদর্শন।

যেটাকে স্বামীজী বলেছেন, "প্র্যাকৃটিক্যাল ডিমনষ্ট্রেশন অফ ফিলজফি।" যার সত্যকার সহজিয়া রূপটাকে একমাত্র কর্মমাধ্যমে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথাই হোল—গণদর্শনের রূপ। গণ মিলনেই—মিলনানন্দের পরমময় প্রকাশ। একমাত্র গণচেতনার মধ্যেই—রয়েছে জীবময়—প্রাণময়—সর্বময়ের বিকাশ।

তিনি বলেছেন, আমি প্রত্যেকটি অস্তিত্বকে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করি। যার জন্যে তন্ত্র আমার ভাল লাগে। তন্ত্র, পশুভাবসত্বা ও দেবসত্বা ভাবকে—সমান স্বীকৃতি দিয়েছে। দুটি ভাবের যোগ নিয়েই তো সম্পূর্ণানন্দময় পরিপূর্ণানন্দময় বিরাজিত এই ত্রিভুবনলোকে। স্বামীজী বললেন, এক আনা দু'আনা করে ষোল আনাকে যেমন পূর্ণ করা হয়—ষোল কলা পূর্ণ হয়, তেমনি এ ক্ষেত্রেও সর্ব ভাবসত্বার যোগচয়নে রয়েছে পরিপূর্ণতার সত্য দর্শন!

সমভাবাপন্নতা ও সম মিলনের, সম প্রার্থনার যোগাশ্রমের আদর্শকে এইভাবে তিনি লালন করে চলেছেন। এখানকার সেবাধর্মের মধ্যে রয়েছে এই নীতিরই মুখ্য কার্যকলাপ।

সেবার এক উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা দেখলাম স্বামীজীর জীবনে। তিনি ক্ষুধার্তের পরম বন্ধু. আর্তের সেবক, পীড়িতের পার্শ্বচর। তাঁর যোগাশ্রমে শত শত মানুষ প্রতিনিয়তই আসে। যাদের দুঃখ অভাব অভিযোগ প্রতিনিয়ত—স্বামীজী শুনতে চান। প্রতিকার করতে চান। কাউকে তিনি একদিনের জন্যেও ফেরান না। গভীর রাত পর্যন্ত শুধু এদেরই প্রয়োজনে তিনি জেগে থাকেন। নিজের আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে সেবার আনন্দে তিনি সর্বদা নিজেকে আপ্লুত রাখেন।

বহু দরিদ্র ছাত্রকে নিয়মিত শিক্ষার খরচ দিয়ে তাদের সুশিক্ষিত করে তোলার কাজ আজও তাঁর শেষ হয়নি। আজও তাঁর শেষ হয়নি মাতৃ সেবার কাজ। বহু অসহায় সর্বহারা অনাথা নারীর জীবনে দিয়েছেন আলো বেঁচে থাকবার জন্য। মাতৃ জাতির দুঃখ কষ্ট দেখলে আজও তিনি চোখের জল ফেলেন। কি আশ্চর্য এই মাতৃ সেবাপরায়ণ হৃদয়!

মনে হোল সত্যিকারের একজন মানব সেবককে যেন ওই বিন্দুবাসিনী মায়ের মন্দিরেই খুঁজে পাওয়া যায়। আর কোথাও যেন এমনটি মেলে না। এমন মানব সেবার তীর্থমণিকে—তাই দেখলাম অপার বিস্ময়ে।

তাঁর সাধক জীবনের সামান্য তথ্য জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। যেদিন উপবীত হয় সেদিন থেকেই তাঁর সাধক জীবন সুরু। সন্ত মতে আচার্য হন বাবা অটলের কাছে। সন্ত মতে বাবা মিহিরদারও তাঁর আচার্য।

এইভাবে শিক্ষা গুরু হিসেবে অনেককেই তিনি পান। যেমন পাঞ্জাবের তরণতারণের দরবেশ সাহেব। বসিরহাটের তারা ক্ষ্যাপা। আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়। স্বামী সত্যানন্দ গিরিজী মহারাজ এবং ভারতবর্ষের অনেক লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক গৃহী সাধকও এঁকে প্রভাবিত করেন।

সন্ন্যাস জীবনের দীক্ষাগুরু হিসেবে ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরি। এ' ছাড়া লাহিড়ী বাবার সার্বিক প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে বেশী।

তাঁর সাধনার পীঠস্থান হিসেবে উজ্জয়িনীর মহাশ্মশান, শ্রীনগরের অমরনাথ। আর বশিষ্ঠ-আরাধিত তারাপীঠে হয় তাঁর অন্তরভাব সাধনা। বিন্দুবাসিনী মায়ের মন্দিরে শেষ ধর্মপাঠ সুরু হয়।

এখন তিনি সেখানেই আছেন।

একই নদী বহে ধীরে

জ্যোৎস্না গুহ

'সরমা, সরমা—' শয়নকক্ষের থেকে ত্রস্তপদে বেরিয়ে এসে সরমা বলল 'ব্যাপার কি বল তো? অফিস থেকে এসেই জোর তলব।' নিরঞ্জন দত্ত ঢালোয়া গলায় বললেন 'ভারী সুখবর, জলদী চা বানাও। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বসিয়ে বসিয়ে বলবো।' সরমা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলল, 'কেন এখন বলা যায় না।' 'যাবে না কেন, একটু ট্রিফট করে নাও।' উষ্মা প্রকাশ পায় সরমার গলায়, 'তবে এসেই এত চেঁচাচ্ছিলে কেন?' বেশ ভারী মুখে সরমা গিয়ে শয়ন কক্ষে ঢুকলো—পেছনে নিরঞ্জনও। সরমার বেশ মস্ত বড় খোঁপাটি লক্ষ্য করে বললেন 'শুনলে তোমার গাল ভারী থাকবে না। তখন তোমার খুশীর রসদ যোগাতে আমার পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে টানাটানি পরবে।' অভিমানের ভিত নড়ে উঠে সরমার, 'বলই না, এত দগ্ধাচ্ছ কেন।' কিন্তু ওদিক থেকে কোন ব্যস্ততা প্রকাশ পায় না। আস্তে সুস্থে জামা জুতো খোলে নিরঞ্জন। 'অসহ্য' বলে ঝটকা মেরে সরমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে, স্বগতোক্তি করে 'আরো মিনিট কয়েক ব্যাস! তার পরের সরমার মুখের অবস্থাটা আমি বেশ অনুমান করতে পারি। উপভোগ্য বটে দৃশ্যটি।' নিঃসন্তান দম্পতীর জীবনে ছিঁটে ফোঁটা বৈচিত্র্য এলেও, ফেনিয়ে ফেনিয়ে উপভোগ করে আনন্দ পায়। এখনও যেন ছেলে-মানুষী স্বভাব গেলনা ওদের।—আর যাবেই বা কি করে? ছেলে না হলে কখনও ছেলে মানষী যায়! সে কি আজকের কথা, প্রায় দশ বছর আগে যখন, আঠারো উনিশ বছরের সুন্দরী শিক্ষিতা সরমাকে বিয়ে করে, একেবারে সঙ্গে করে নিরঞ্জন নিয়ে এল চাকুরীস্থল দিল্লীতে। সেক্রেটারিয়েটে ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের অফিসার, কাজেই অর্থ এবং বাসস্থানের চিন্তা নেই। মন তখন নানা রম্য আশায় প্রলুব্ধ, চোখে স্বপ্নের আমেজ। কিন্তু আজ, একটি শিশুর অভাবে, জীবন ঊষর মরুভূমির মত শুষ্ক নীরস। তাই ছোট্ট এক টুকরো আনন্দ ওদের কাছে অনেকখানি। এখন নিরঞ্জন দত্তের মাইনে হাজারের কাছ ঘেঁষে। আরাম আয়েসের পরিধি আকাঙ্ক্ষার সীমাকেও ছাড়িয়ে চলেছে, কিন্তু সরমার মনের সরস স্নিগ্ধতা ক্রমশঃ যাচ্ছে হারিয়ে। তাই চল্লিশের সীমানার নিকটবর্তী হয়েও নিরঞ্জনকে কিছু ছেলেমানষী করতে হয়। আহা! যদি সরমা একটু সুখ পায়! এই সূক্ষ্ম অনুভূতিটাই নিরঞ্জনবাবুকে করেছে কিছুটা চপল। ঝি, চাকর, পাচক ইত্যাদির অভাব নেই ওদের কিন্তু সরমা স্বামীর সব কিছু কাজ নিজের হাতে করে শান্তি পায়। অনেক বলেছে এজন্য নিরঞ্জন—কিন্তু কোন ফল হয়নি। একদিন একটু বিরক্তিপূর্ণ স্বরেই বলল নিরঞ্জন 'তুমিই যদি রাত দিন এত পরিশ্রম কর, তবে খামখো এতগুলো লোক পোষা কেন।' সরমার মুখ সরমে রাঙ্গা। যেন নিরঞ্জন এত গোপনতা সত্বেও গোপন খবরটি জেনে নিয়েছে। আরক্ত মুখে নীচু গলায় বলল, 'আমার যে তোমার কাজ করতে ভাল লাগে গো।' এর পরে নিরঞ্জনের আর কি বলা চলে।

একটি রবিবারের সামান্য একটি ঘটনায়, নিরঞ্জনকে বেশ চঞ্চল করে তুলেছিলো। ছুটির দিন সময়ের হিসেব সকলের কাছেই ঢালোয়া। বেশ একটু বেলায় নিরঞ্জন আড্ডাদিয়ে বাড়ী এসে সরমাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে, সম্মুখে দণ্ডায়মান বেয়ারাকে প্রশ্ন করে 'মাইজী কাঁহা?' অপরাধী দৃষ্টি প্রভুর পায়ের জুতোয় ন্যস্ত করে বিনীত গলায় বলল 'মাইজী, আপকো গেঞ্জিমে সাবুন লাগাতা।' 'সাবুন লাগাতা মাইজী—আর তুই হতভাগা দাঁড়িয়ে তাই দেখছিস?' ক্রোধে অধীর হয়ে পড়ে

নিরঞ্জন। 'অসহ্য! অসহ্য! সব ক'টাকে ছাড়িয়ে দেব আজই।' অধীর পায়ে ঢুকে পড়ে বাথরুমে। কিন্তু দৃশ্যটি দেখে করুণায় বাষ্পাকুল হয়ে এল চোখ। গেঞ্জি-টিকে বার বার ধুয়েও যেন সাধ মিটছে না সরমার। পিছন থেকে গম্ভীর গলায় ডাকলে—'সরমা।' যেন ধ্যান ভেঙে গেল। পেছন ফিরে লাজুক সুরে বলল, 'তুমি আবার এখানে কেন।' বকা আর হলো না। ব্যথিত দৃষ্টি মেলে বলল আবার তুমি এ সব কাজ নিজে করছো। উঠে এস লক্ষ্মীটি! দিনকে দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ তুমি কি তা বুঝতে পারো। স্বামীর সস্নেহ আহ্বান তার বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠে। বিবর্ণ মুখে কৈফিয়তের সুরে সরমা বলে 'কি করবো ওরা যে রকম হেলাফেলা কোরে জামা কাচে, তা আমি সইতে পারি না।' নিরঞ্জন স্ত্রীর ছলনা বুঝে ওর হাতে আস্তে একটু চাপ দেয়। এখনও সরমার এইটুকু আদরে আরক্ত হয়ে উঠে মুখ। দেহা-ভ্যন্তরের তন্ত্রীগুলোতে মৃদু শিহরণ খেলে যায় যথা নিয়মে। কি করবে, নিরঞ্জন সবই বোঝে—সরমার কোথায় ব্যথা। স্বামীর সেবার মধ্য দিয়ে সন্তানবঞ্চিতা নারী তার মাতৃধর্ম সার্থক করতে চায়। এরকম কত ঘটনায় নিরঞ্জনের স্মৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে আছে। কোনটা ব্যথায় রাঙা, কোনটা কৌতুকে আবিল।

সরমা নিরঞ্জনের সামনে চা এবং নানা উপাদেয় রসনা তৃপ্তিকর খাবার সাজিয়ে দিয়ে বলল 'সরভাজা ক'খানা খেয়ে দেখতো, কেমন হয়েছে। আমার মনে হয় কলকাতার সরভাজার মত নরম হয় নি। আর হবেই বা কি করে! বাংলাদেশের দুধের সর কেমন হলদে হয়। আর তার সুঘ্রাণইবা কি। এখানের দুধ তো নাক টিপে খেতে হয়। কি বিটকেল গন্ধ যেমন গয়লা ব্যাটাদের গায়ে, তেমনই দুধে।' নিরঞ্জনবাবু স্ত্রীর মুখে এখানের দুধ এবং সরের এত নিন্দা শুনেও এক সঙ্গে খানকতক মুখে পুরে বলল 'আরো খান কতক দাও, তবে তো বুঝতে পারবো তফাৎটা কত খানি। সরমা তৎপর হয়ে ওঠে সরভাজাটা পরিবেশনে। খাদ্য-রসিক নিরঞ্জনের সরভাজার মধুর রসের আমেজে চক্ষু অর্ধনিমিলিত হয়ে আসে। 'আঃ! এখানের সরভাজাও যথেষ্ট রসনা তৃপ্তিকর। সরমা একখানা চেখে দেখ, তারপরে আর স্থিমত থাকবে না।' 'না, মিষ্টি আমার তেমন পছন্দ নয়।' 'হায় নারী! মধুর রস তোমার কাছে উপেক্ষণীয়।' নিরঞ্জনকে যাত্রার দলের মত এ্যাকেটিং করতে দেখে হেসে ফেলে সরমা।

খাবারের প্লেট সরিয়ে নিরঞ্জন যখন ধূমায়িত চায়ের কাপটি কোলের কাছে টেনে নিল, তখন সরমার কাছ থেকে অনুরোধ এল, 'বল না লক্ষ্মীটি কি সুখবর?'

নিরঞ্জন এক চুমুক চা গলাধঃকরণ করে বলল 'আচ্ছা এবারে বলা যেতে পারে। এক, দুই, তিন—রেডি!' সহাস্যে সরমা বলল 'রেডি।'

'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্' শোন, আজ অর্ডার এসেছে এক মাসের জন্য সিমলা যাওয়ার। খবরটা তোমার কি রকম মনে হয়?' স্মিত হাস্যে সরমা বলল 'অতি আনন্দের।'

সেখানে আছে ছোট বোন সুমিত্রা। সরমার মনের কোণে ভেসে উঠে, সুমির তিনটি শিশুর মুখ। ভগ্নীপতি নরেন সিমলার সরকারী অফিসে কেরানী। কাজেই তেমন সচ্ছল নয় সংসার। সিমলা পাহাড়ে সরকারী দাক্ষিণ্য যাদের সীমিত, তাদের পক্ষে স্থানটি তেমন আরামপ্রদ নয়। দিল্লীর তুলনায় সংসার যাত্রা নির্বাহের খরচ প্রায় ডবল। তবে অ্যালাউন্স কিছু পায়। তবুও সিমলার মতন ব্যয়-বহুল জায়গায় নরেন তিনটি ছেলে মেয়ে সংসার নিয়ে সংসার চালাতে হিমসীম খাচ্ছে। ধার দেনাও যে না হচ্ছে, তা নয়। আর নিরঞ্জন ব্যয় করার একটা উপলক্ষ্য পেলে বেঁচে যায়। বিচিত্র সৃষ্টির এই লীলারহস্য! হাসি আর কান্নায় সৌরজগৎ মোহময়। এই বৈষম্যের জন্যই মানুষ ভগবানের বিধানের উপরে বিদ্রোহ করে। চায় তুলে নিতে, নিজের হাতে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার। অন্ধ আক্রোশে পীড়ন করে ভাগ্যকে।

সরমা চা টুকু নিঃশেষ করে বলল 'চল কনট প্লেসে, সুমিদের জন্যে কিছু কিনে নিয়ে আসি।' সরল কণ্ঠস্বরে নিরঞ্জন খুশী হয়ে উঠে।

আজ প্রসাধনে সরমা অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী সময় নিল। হালকা গোলাপী রংয়ের শাড়ীর সঙ্গে কালো ব্লাউজ, উঁচু খোপায় ফুলের গুচ্ছ, ভাবালু চোখে

বন্ধন হীন চশমা, পায়ে হাইহিল জুতো। ওর ফর্সা দীঘল দেহখানাকে অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। কাঁচের ভিতর দিয়ে স্বপ্নালু দু'টি চোখের দৃষ্টি মুগ্ধ করে সকলকে। উন্নত নাসিকায় আর চাপ চিবুকে ব্যক্তিত্বের অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা।

কিছু কিছু চুল শাসন উপেক্ষা করে খেলা করছে আপন খেয়ালে। শেষ কালে সৃষ্টিকর্ত্তা বামগণ্ডে একটি তিল বসিয়ে নিখুঁত করেছে ওকে। কিন্তু সব কিছু দিয়েও শেষ পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে পরিহাসই করেছেন। নারীর সব চেয়ে পরম এবং চরম রূপ হলো তার মাতৃত্বে। তাই সব কিছু থেকেও সরমা বন্ধ্যা পরিণামহীনা নারী মাত্র। সমাজের অনুকম্পার পাত্রী। এমন কি নিরঞ্জনের নিকটেও। আজ ওর এত উৎসাহের তলায় লুকিয়ে আছে, সুমিতার সন্তানদের কাছে মাতৃত্বের দাবী। আজ কিনবে ওদের জন্য মনভোলানো খেলনা, জামা, জুতো, রাঙা-ছবির বই। না, সুমিতা নরেনের জন্যও কিছু কিনবে বৈকি। তাই মানিব্যাগটি বেশ স্ফীতোদর করে নিতে হলো। খুট খুট জুতোর শব্দে নিরঞ্জন বই থেকে চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। নাঃ, সরমার এমন উজ্জ্বল সাজসজ্জা এবং চোখের দৃষ্টি নিরঞ্জন অনেকদিন দেখেনি। ইদানীং কিছুতেই উৎসাহ ছিল না তার।

'বাঃ, এমনি করে রোজ সাজলেই তো পারো। আমাদের মত অভাজনরা দর্শনে আনন্দ পায়।' একথা বলে নিরঞ্জন হাসতে থাকে।

সরমা আরক্ত হয়ে বলে 'আঃ, কি ছেলেমানষি করছ বল তো। চল দেরী হয়ে যাবে শেষ কালে। ক্ষুদে শয়তানদের জিনিষ কিনতে সময় লাগবে তো।'

স্রোতহীন নদীতে যেন হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস। গলার স্বরটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ. নিরঞ্জনের কাছেও তা ধরা পড়ে যায়। মনের গভীরে একটু বিষণ্ণ আক্ষেপ।

ওরা যেতেই ড্রাইভার দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো। নতুন কেনা পনটিয়াক গাড়ীখানা সগর্বে শব্দ বিহীন দ্রুতগতিতে সাঁ করে বেরিয়ে যায়। দু'জনে যদিও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে কিন্ত, চিন্তার ধারা বিপরীত মুখী। নিরঞ্জনের ভাবনা অফিসের কয়েকটি জটিল সমস্যা নিয়ে।

দিনগুলির কথা। গাড়ীর সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে ছুটে চললো অতীত। নাঃ, মার মুখখানা মনেই পড়ে না। একখানা যে অস্পষ্ট মুখ মনে ভেসে উঠে, তা অনেকটাই আমার নিজের কল্পনা। আর কি করেই বা মনে পড়বে! পাঁচ বছর বয়সের কথা কি কারুর মনে থাকে। মা যখন মারা গেলেন, দিদির বয়স ছিল দশ, দাদা আট, সুমি তো মোটে তিন বছরের ছিল। বাবার উপর পড়লো আমাদের সকলের ভার। তাই বাবার মধ্যেই আমরা পেয়েছিলাম পিতামাতা দু'জনকে। তাঁর উদার বক্ষে আমাদের জন্য কি অপরিসীম ভালবাসাই না ছিল সঞ্চিত। তাই মনের সবখানি জুড়েই বাবার মহিমময় স্মৃতি। তবে জীবনের মাঝে মাঝে মার কল্পিত মুখখানা যে না উঁকি দেয় তা নয়। বিশেষ কোন অসুখ হলে তো নিশ্চয়ই অনুভব করি তাঁর শীতল হাতের স্পর্শ, কাতর দৃষ্টি। চোখ বুঁজলেই মনে হয়, মা মাথার কাছে বসে তাঁর ঠাণ্ডা উষ্ণিগ্ধ হাতখানা আমার অসুস্থ কপালে রেখেছেন। কি যে শান্তি সেই অনুভবে! বাবা খুব সাধারণ চাকুরী করতেন। তাই আমরা ছোট বেলায় খুব আরাম আয়েসে মানুষ হইনি। তবে বাবা অর্থ দিয়ে যেটুকু পুরণ করতে না পারতেন—ভালবাসা দিয়ে তা পূর্ণ করে দিতেন। সে ভালবাসা যেন মহাসাগরের সঙ্গেই তুলনীয়। কেবল যে তিনি সন্তানের নিকটই মাননীয় ছিলেন, তা নয়। মার্চেন্ট অফিসের সামান্য কেরানী ছিলেন; কিন্তু তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠা এবং সততার বড়বাবু থেকে চাপরাসী সকলেই ভালবাসতো এবং শ্রদ্ধা করতো। দাদা এক চান্সেই বি, এ পাশ করে গেল। বাবা বড় সাহেবকে ধরে ঢুকিয়ে দিলেন ঐ অফিসে। অবশ্য দাদা এখন অফিসার হয়ে গেছে, সুখেই আছে।

আর রূপের জোরে আমি আর দিদি এলাম বড় লোকের ঘরে। বেচারী সুমিতা। বাপের বিত্ত এবং নিজের রূপের অভাবে পড়লো গিয়ে ছাপোষা কেরানীর হাতে। অথচ মা এবং বাবা আমাদের দু'জনই সুন্দর ছিলেন। আমারা তিন ভাই বোন স্বাভাবিক নিয়মেই সুন্দর হলাম। সুমিতার ভাগ্য নিয়ে গেল এক পুরুষ এগিয়ে আমার ঠাকুমার কুরূপের উত্তরাধিকার

ও যেন আমাদের ভাই বোনদের ভাগ্যের প্রতিবাদ। নেই নামে মিল, নেই স্বভাবে। নিজের দরিদ্রতাকে যেন গর্ব ভরে বহন করে বেড়াচ্ছে। অনুকম্পার হস্ত কোন দিক থেকে এগিয়ে এলেই, নিজেকে শত হস্ত দূরে সরিয়ে নেয়। নিজের কুরূপ নিয়েও কখন সঙ্কুচিত নয়। বিধাতাকে সে ব্যঙ্গ করে চলে। কিন্তু এক দিকে তুমি আমাদের সকলের চেয়েই ভাগ্যবতী। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। দিদি সুরমার একটি মাত্র ছেলে, তাও হাবা মতন।

দাদার মেয়েটি অবশ্য ভালই। কিন্তু ঐ একটি মেয়ে, ছেলে হলো না। বেশ বড় হয়ে গেছে বাসু, আর হবে বলে মনে হয় না বৌদির। আমাদের ঐ একটা মাত্র ভাই, দাদার অবর্তমানে বংশ লোপ পেয়ে যাবে।

নরেন কিন্তু চাকরী বড় না করলেও সুপুরুষ এবং চরিত্রবান্। ছেলে মেয়ে তিনটি হয়েছে তেমনি সুন্দর। ছেলে দু'টির থেকে মেয়েটি আরো সুন্দর হয়েছে। বছর খানেক আগে যে সিমলা গিয়ে গিয়েছিলাম—রিনিকে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি না। তখন তো কত ছোট ছিল। এখন তো দু'বছরেরটি হলো, নিশ্চয় অনেক কথা বলতে শিখেছে। সুন্দর জামা পরলে যা মানায়। কিন্তু তুমির পক্ষে তো তা পরানো সম্ভব নয়।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস অতর্কিতে বেরিয়ে যায় সরমার। নিরঞ্জন ঘাড় ফিরিয়ে বলল 'কি হলো?' সরমা বিষণ্ণ স্বরে বলল 'কিছু নয়।' স্বগতোক্তি করে নিরঞ্জন, খুশীকে যেন দণ্ডও ধরে রাখা যায় না। গাড়ী এসে নির্দেশ অনুসারে একটা খেলনার দোকানের সম্মুখে থেমে পড়ে। সরমার চোখে মুখে এসে পড়লো আলোর ঝলকানি। কেনাকাটার আকাঙ্ক্ষায় মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। হারিয়ে গেল একটু আগের শৈশব যৌবনের চিন্তা। কেবল কচি কোমল তিনটি মুখ আপন সত্তায় উদ্ভাসিত হয়ে রইলো। নিরঞ্জনের বলিষ্ঠ হাতের চাপে গাড়ীর দরজা খুলে গেল। নেমে পড়লো দুজনে।

বিজ্ঞানের অবদান—বিদ্যুৎকে কেন্দ্রীভূত করে কত মন ভোলানই চলছে। বিজ্ঞাপনগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তড়িতের বিবিধ ছলাকলায়। আকৃষ্ট করছে ক্রেতাদের। পথিকের দৃষ্টি বন্দী হচ্ছে বিশেষ কোন বিজ্ঞাপনে।

সরমা খেলনা দেখে মৃদু হেসে নিরঞ্জনকে বলল 'সবগুলি কিনতে ইচ্ছা করছে।' 'কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন নিরঞ্জন শর্ম্মার ট্যাঁক বুঝে যা-ইচ্ছে কিনে নাও।' পুতুলগুলি ব্যাটারির সাহায্যে নানা অঙ্গভঙ্গী করছে। সরমা থমকে দাঁড়িয়ে দেখলো। 'বাঃ, বেশ তো, দম দিলেই ছোট্ট আরশিটির সহায়তায় পাউডারের পাফ্‌টি মুখে বোলানো হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত রিনির জন্য ঐটিই কিনলো। দক্ষিণাটি বেশ চমকপ্রদ। তা হোক—সরমা তো খুশী হলো।

আর বড় ছেলে পল্টু—সে কিসে খুশী হবে? 'না, লাইনের উপর রেলগাড়ী অবিরাম ঘুরে চলেছে, এটাই কেনা যাক।' একটু কোমল হাসি সরমার মুখে। মিন্টু যে রকম জীবজন্তু ভালবাসে, ওর জন্য এই সিংহটা নিলে খুব মজা পাবে। তা ছাড়া পশুরাজের মুখে আবার হাঁ করলে আলো জলে উঠছে, মুখটি বন্ধ হলেই অহিংস নিরীহ ব'নে যাচ্ছে।' তারপর আরো অনেক ঘোরাঘুরি করলো, এ দোকান ও দোকান। গাড়ীতে যখন উঠলো, মনিব্যাগের পেটটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের মত হলো, কিন্তু গাড়ীতে স্থান সংকুলান হওয়া কষ্টকর হলো। সরমার সজাগ দৃষ্টি, কোন হালকা প্যাকেট ভারী প্যাকেটের তলায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আজ যেন কোন যাদুকাঠির স্পর্শে জেগে উঠেছে সুপ্ত মাতৃত্ব। তার ছোঁয়ায় উজ্জ্বল সরমা।

ছোট গাড়ীখানা সিমলা এসে যখন তার গন্তব্য শেষ করলো, আকাশ তখন প্রসন্ন ছিল না। মেঘের আনাগোনা দিগন্তে। ছলনাময়ী কুয়াশা জাল বিস্তার করে পথিককে বিভ্রান্ত করেছে।

নিরঞ্জন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুচকী হেসে বলল 'ব্রাদার টাইমলি এসে গেছে দেখছি।' নরেন একটু হাঁপাচ্ছিল। আর একটু দেরী হলেই মুস্কিল হতো। নিরঞ্জন দরাজ গলায় বলল 'কিছু মুস্কিল হতো না। নিরঞ্জন দত্ত, একাই একশো। তুমি যে বড় হাঁপাচ্ছ ভায়া। তুমি বুঝি খুব তাড়া লাগিয়েছে?' নরেন নিরঞ্জন এবং সরমাকে প্রণাম করে বলল—

পাহাড়ে রাস্তা, একটুতেই হাঁপ ধরে যায়।

সরমা খপ করে ওর হাতটি ধরে বলল—'হয়েছে, আর প্রণাম করতে হবে না। তারপরে খবর সব ভাল তো? নরেন আমতা আমতা করে বলল, 'ভালই তো ছিল কিন্তু, আপনারা আসছেন শুনে, তুমি এবং তার সন্তানদের যে রকম অবস্থা দেখছি, তাতে মস্তিষ্ক ঠিক আছে কিনা সন্দেহ হচ্ছে। 'এই কথা! আমি এতক্ষণ কত বিভীষিকার কথাই না চিন্তা করেছি! কি জানি পাহাড়ে রাস্তা পড়ে-টরে গিয়ে একটা কিছু—' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আরো অনেক কিছু যে ভেবেছ, তার সাক্ষী এই নিরঞ্জন দত্ত। নির্ভয়ে বলে যাও দেবী মুহূর্তের মধ্যে কত অঘটন চিন্তা তোমার মনে এসে গেছে।' কোপকটাক্ষে সরমা যা বলল তা এই 'তুমি থামবে কি না বল? ষ্টেশনে লোকগুলো কি ভাববে বলতো?' 'আমি যে তোমার অনেক কালকূট চিন্তার খবর রাখি এই মাত্র।' 'নাঃ, তোমার সঙ্গে আর পারা গেল না।' নরেন স্মিতহাস্যে বলল 'রিক্সা নেব দিদি?' সিমলায় কোন ট্যাক্সি কিংবা প্রাইভেট গাড়ী চলে না, এ বোধ হয় অনেকেই জানেন। যাদের নিজের পায়ের উপর ভরসা নেই, তারা চারজনে টানা রিক্সায় উঠেন। ভারসাম্যের জন্য চারজনের দরকার হয়, এটাও সকলের বিদিত। তবে এ রিক্সায় চড়া মোটেই সুখের নয়। 'না, ভাই তোমাদের সিমলার এই যানটি চড়ার মত মনের জোর আর এখন নেই। অল্প বয়সে একবার চড়েছিলুম, কি যে অমানুষিক উদ্বেগ আমার জানা আছে। 'দিদির তা হলে এ অভিজ্ঞতা আছে' বলে নরেন একটু হাসলো। মালপত্র কুলির জিম্মা করে দিয়ে ওরা হেঁটেই রওনা হলো। শীতের দেশ গরমের কষ্ট নেই কিন্তু, চড়াই-উৎড়াইর শ্রম কে নেবে। সরমার মুখ আরক্ত হলো, বক্ষের স্পন্দন হলো দ্রুত।

নিরঞ্জন একটু মোটা মানুষ অল্প পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে পড়ল। তিনি হাঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস টেনে, লাটির খোঁচা মেরে উঠতে লাগলেন।—'নাঃ, নরেন আমাদের দিল্লীই ভাল তোমাদের এ স্বর্গ আমাদের মত পাপীর জন্য নয়।' 'এই যে এসে গেছি দাদা, আর বেশী দেরী নেই।' 'বাঁচালে নরেন, আমার কিন্তু দম ফুরিয়ে এসেছে। পেটেও রাবণের চিতা জ্বলে উঠেছে। দেশটা সব রকমেই বড় পীড়াদায়ক। এমন বর্বরোচিত খিদে কিন্তু দিল্লীতে হয় না।' 'এবার মোটা হয়ে তুমি বেশ বেকায়-দায় পড়ে গেছ। সেই প্রথম বারে যখন এলাম, জান নরেন, ইনি তখন বেশ ছিপছিপে ছিলেন। আমাকে আদর করে রিক্সায় চড়িয়ে নিজে আরাম করে হেঁটে চললেন। পিছন ফিরে তাকিয়ে আমার মুখের অবস্থা দেখে, কি হাসি! আমার এ্যায়সা রাগ হয়েছিল কি বলবো!' নিরঞ্জন বেশ কিছু হাওয়া টেনে নিয়ে বলল, 'আহা সেতো তোমার কষ্ট লাঘবের জন্যেই।' কিন্তু কখন যে ওরা বাড়ীর এত নিকটে এসে গেছে বুঝতেই পারে নি। তিনটি শিশু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো সরমাকে। কচিহাতের কোমল অবেষ্টনে সরমার সর্বাঙ্গে মধুর অনুভূতির শিহরণ খেলে গেল। স্নেহকোষে বহু আকাঙ্ক্ষিত আবেশ অনুভূত হলো। কোলে তুলে নিল মিনিকে। 'কি মিষ্টি হয়েছে মেয়েটা দেখতে!' বুকে চেপে ধরলো। মিনি মাসীর বক্ষে মুখ লুকিয়ে রইলো। পল্টু এবং মিণ্টু বিজয়ীর মত মাসীর হাত ধরে বাড়ীতে নিয়ে এল। সুমিত্রা নিরঞ্জনকে প্রণাম করে বলল 'জামাইবাবু, খুব বেশ কষ্ট হয়েছে মনে হচ্ছে।' 'তা একটু হয়েছে, এখন কি আর হাঁটতে পারি! যান বাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পায়ের কাজ তো অনেক কমে গেছে। বেচারা বেতো ঘোড়ার মত সময় কালে কাজ দেয় না। কিন্তু উদর তা পুষিয়ে দিয়েছে।'

সুমিত্রা লজ্জিত হয়ে উঠে। তাইতো আমি গল্প করেই যাচ্ছি। আসুন, আমি গরম জল-টল সব ঠিক করে রেখেছি।'

টুটিকাণ্ডির একখানা বাড়ীর একতলায় সুমিত্রা থাকে। ভাড়া অনুপাতে বাড়ীখানা মন্দ নয়। তবে দিল্লীর নিরঞ্জনের বাড়ীর তুলনায় কিছুই নয়। বাচ্চারা বাড়ী ঘর সব সময়ই অগোছাল করে দেয়। সুমি পল্টুর দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলল 'হুটোপুটি করে বিছানা কি করেছিস বলতো? সত্যি দিদি আমি আর ওদের নিয়ে পারি না।' আবার ক্ষিপ্রহস্তে এটা সেটা গুছিয়ে রাখে। সরমা কিন্তু এই অগোছালের মধ্যেই নতুন জীবন খুঁজে পায়, মগ্ন হয়ে থাকে শিশু তিনটির [illegible]

জানিয়ে নিচ্ছে হাসে। পল্টু মিন্টুর অর্থহীন প্রশ্নের উত্তর ক্লান্তহীন ভাবে দিয়ে যায়। তিন্নীর আনা খেলনাগুলি নিয়ে ওদের সঙ্গে সমানে খেলা করে। নিরঞ্জন দেখে ভাবে, একি সেই সরমা! যাকে খুশী করতে নিরঞ্জনের কতই কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়!

সুস্মিতা ছেলেদের ধমক দিয়ে বলল 'মাসীকে একটু বিশ্রাম করতে দে। তিনটেতে মিলে ছিঁড়ে খাচ্ছিস।' বালক দুটি মার ধমকে একটু অপ্রস্তুত হয়। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। অসম বয়সী খেলার সাথি মাসীর গোপনইচ্ছা ওদের কাছে গোপন নেই।

সুটকেস থেকে শাল খানা নিয়ে সরমা সুস্মিতাকে বলল—'সুমি ভাখতো এটা তোর পছন্দ হয়? নিশ্চয় হচ্ছে কিন্তু আবার আমার জন্যে কিনতে গেলে কেন? বাচ্চাদের জন্যেতো এক কাঁড়ি জিনিষ এনেছো।' 'ছোট বোনকে দিতে ইচ্ছে হওয়াটা কি খুব বেশী কিছু!' সুমি আহত সরমার মুখের দিকে চেয়ে বলল না, না সে কথা বলছিনা—সেবারও তো দামী একটা কার্ডিগান দিয়ে গেছো।' 'ছাখ তো নরেনের সুটের কাপড়টা কেমন হয়েছে।' 'এটা কিন্তু আমার পছন্দ, নিরঞ্জন হেঁকে বলে।' 'মোটেই না মশাই। আগে আমিই দেখেছি।' সুস্মিতা হেসে বলল 'তোমাদের দু'জনের পছন্দ করা জিনিষ আমাদের দু'জনেরও পছন্দ হয়েছে।' নরেন কিন্তু সরমাকেই পছন্দের সবটুকু কৃতিত্ব দিল। 'নাঃ, দিদি আপনার পছন্দকে তারিফ করতে হয়।'

বাচ্চাদের কিন্তু জামা জুতোর দিকে লক্ষ্য নেই। খেলনা নিয়েই ব্যস্ত। পল্টুর রেলগাড়ী অনির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে ছুটেই চলেছে:—আর মিন্টুর পক্ষীরাজের চোঁয়ালে খিল ধরে গেছে, হাঁ করে। তিনির মেম সাহেবের প্রসাধন অবশ্য নির্ভর করে অন্যের মর্জির উপর। তাই ইচ্ছা থাকলেও তার পরিমিত প্রসাধন।

খেতে বসে নিরঞ্জন সুস্মিতাকে বলল 'সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আমার রসিকতারই। তাই বলে সাত জনের খাবার সামনে দিয়ে একি নিষ্ঠুর রসিকতা করছো দেবী? এ যদি কেউ খেতে পারে তাকে তো আর সভ্য সমাজে বাস করতে হয় না—তার জন্যে হয় অরণ্য, অগত্যা পক্ষে চিড়িয়াখানা। তোলো তোলো অনেক তুলে নাও।' —'কেন, উদরের কাজ এখনে নাকি খুবই ক্লান্ত, তবে ভুল ত বলছেন কেন?' 'আরে বাব্বা! তাই বলে এত!'

নরেন নাকে মুখে গুঁজে অফিসে চলে গেছে অনেকক্ষণ। ওরা তিনজনে হাসি গল্পের ভিতর দিয়ে খাওয়াপর্ব শেষ করলো।

সামার হিল বাড়ী পেয়ে যে দিন নিরঞ্জনরা চলে গেল সেদিন সুমি এবং বাচ্চা তিনটির খুবই কষ্ট হলো। যেন হঠাৎ আনন্দের জোয়ারে ভাটা পরে গেল। স্তিমিত হয়ে গেল বাড়ীখানা। তবে মাসীর যাত্রাকালীন করুণ মুখে দেখে, পল্টু, মিন্টু এবং তিনি তিনজনেই আশ্বাস দিয়েছে, কালই তারা যাবে। মাসী যেন কাঁদে না।

সরমা ঘুরে ঘুরে দেখলো, মস্ত বড় বাড়ী। একজন সাহেব নাকি এর আগে থাকতেন। বাগানের শোভা দেখলেই, পূর্ব মালিকের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আপেল ন্যাসপাতির গাছ, ফল ভারে নত হয়ে পড়েছে। ডালিয়ার বর্ণাঢ্যতায় বাগান ঝলমল করছে। আরো অনেক নাম জানা, না জানা ফুলের শোভায় বাগানটি সুশোভিত। সরমার বড় ভাল লাগে। অধিকাংশ সময় কাটে ওর বাগানে। পাহাড়ি বুড়ো মালি, শোনায় সিমলা পাহাড়ের গোপন ইতিহাস। সরমা শোনে গভীর মনোযোগে। কখনও হাসিতে উদ্বেল হয়ে উঠে, কখনও ব্যথায় বিষণ্ণ। দিনগুলি কাটছে মন্দ নয়। পাচক এবং আয়া পেয়েছে বিশ্বস্ত। তবে বাড়ীটির নির্জনতা ওকে সব সময়ই বন্ধ্যাত্বের গ্লানি স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজেকে মনে করে নারীর ব্যতিক্রম। তাই লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে সুস্মিতাকে—আরো অনেক মাকে। তাদের মাতৃত্বের কাছে নিজেকে বড় ম্লান মনে হয়।

নিরঞ্জন পুরুষ মানুষ, কাজই তার বড় সঙ্গী। কর্মের মধ্যেই আছে তার জীবনের পূর্ণতা। কেবল বাড়ীতে কিছু সময় পীড়া দিয়ে তাকে পত্নীর নীরস সঙ্গ। একটি সন্তানের জন্য তখন তার মনে জাগে ব্যাকুল কামনা।

আজ দুপুরে সুমি ছেলে মেয়ে নিয়ে সরমার বাড়ী এসেছে। তিনটি শিশুর কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠেছে বাড়ী। ফুলের পাঁপড়ি ছিঁড়ে, আপেল ন্যাসপাতির ছিবড়ে ফেলে, কয়েক ঘন্টার ভেতর বাড়ীখানাকে যথেষ্ট নোংরা করে ফেলেছে। সুস্মিতা লজ্জিত হয়ে উঠে 'দেখলে দিদি, এই

টুকু সময়ের মধ্যে এমন ঝকঝকে বাড়ীখানাকে কি নোংড়া করে ফেলেছে।'

সরমা উদাস কণ্ঠে বলে 'এ নোংড়ার ভেতরে যে কি সৌন্দর্য্য লুকিয়ে আছে, তা তোদের চোখে ধরা পরে না। তোদের পরিচ্ছন্নতায় আমার মনে জ্বালা ধরে। বাড়ী নয় তো— যেন একটা মন্দির। মানুষের পক্ষে বাস যোগ্য নয়।

সুমিতার চোখ সজল হয়ে উঠে। জানে বোনের কোথায় ব্যথা। সময়টুকু সকলের চোখের উপর দিয়ে শেষ হয়ে এলো।

সরমা ওদের খেতে দেয়। রিনিকে নিজেই খাইয়ে দেয়। কেক খাওয়ার সময় মাসীর আঙুল কুট করে নতুন দাঁতে কামড়ে দেয়। 'উঃ, কামড়ে দিলি দুষ্টু মেয়ে?' দাঁতের উপর আঙুল দিয়ে টোকা দেয়। শিশুর দাঁতের কামড়ে যে এত আনন্দ, সরমা এর আগে আর কবে অনুভব করেছে? মাসীকে কামড়ে রিনি খিল খিল করে হাসে। 'ভেবেছে বোয়' বলে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে। রিনি মাসীর ছলনা ধরে ফেলে, হাঁ করে আবার কামড়াতে আসে। পল্টু মিন্টুর কি হাসি। দিনটি কাটলো সরমার অভূতপূর্ব ঘোরের মধ্য দিয়ে। সন্ধ্যার আগেই সুমি বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেল। 'যাই দিদি পাহাড়ি রাস্তা যেতে তো সময় লাগবে।' ওরা চলে গেলে সরমা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। যতক্ষণ ওদের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত দেখা যায় তাকিয়ে রইলো। ফিরে ফিরে ওরাও তাকাতে লাগলো। এক এক সময় পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে যায়, আবার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠে। অস্তসূর্য্যের রক্তরাঙা ছায়া পড়ে সরমার মুখে।

একটু পরেই অফিস থেকে ফিরলো নিরঞ্জন। বাড়ীতে ঢুকেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ফুল পাতা ইত্যাদি দেখে হেসে সরমাকে বলল 'সুমি এসেছিলো বুঝি?' 'বুঝলে কি করে?' 'আরে শিশু ভোলানাথেরা যে অনেক কিছু নিদর্শন রেখে গেছে।' '—বা—ঃ বুঝ্ট হয়েছে।' কণ্ঠে সরমার স্নেহ সিক্ত সোনায়। 'একটুর জন্যে মিস করলাম।' আপসোস করে নিরঞ্জন। সরমা এগিয়ে এসে আঙুলটা দেখিয়ে সকৌতুকে বলল 'দেখেছ কি রকম কামড়ে দিয়েছে আঙুলটা।' নিরঞ্জন আভভূত হয়ে যায় সরমার দৃষ্টি দেখে। এ কি? [illegible]

কি মহিমময়ী দৃষ্টি! একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুকের অনেকখানি ব্যথা বেরিয়ে আসে।

সরমা তার আপন মনে কত কি বলে যায়। 'আর পল্টু মিন্টুর দুষ্টুমীতে বাড়ী, ঘর, গাছপালা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত। ফুল পাতা ছিঁড়ে, চারাগাছগুলো উপড়ে, কাগজ টুকরো করে, ধুলো কাদা মেখে—সারা দুপুর তচনচ করে বেরিয়েছে। সত্যি, সুমির এই তিনটি ক্ষুদে ডাকাত সামলাতে প্রাণান্ত।' এতগুলি কথা বলে সরমা, নিরঞ্জনের মুখে একটি প্রশান্ত অনির্বচনীয় হাসি দেখে তাকিয়ে রইলো। কি অপরিসীম বাৎসল্য হাসিতে; কিছুক্ষণ আগে যে আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছিলো হৃদয়, নিজের অক্ষমতার ব্যথায় তা ব্যাথাতুর হয়ে উঠছে। সরমার খুশীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য নিরঞ্জন বললে 'তাহলে দুপুরটি তোমার খুব হৈ চৈ করে কেটেছে।' 'তা বলতে পারো।'

আসন্ন সন্ধ্যা সিমলা পাহাড়ের চূড়ায় নেমে আসছে মন্থরগতিতে। তার মোহময় কুহকে নরনারীর আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ঘনিষ্ঠ হয়ে এল নিরঞ্জন, বলল—'সরমা যাবে বেড়াতে?' সরমা তার সুগোল বাহু তুলে, ভেঙ্গেপড়া খোঁপাটি জড়াতে জড়াতে বলল 'মন্দ কি, চল।' আবার সরমার বুকে যেন সেই বাস্তবের কঠিন পাথরখানি চেপে বসেছে। সবটুকু আলো বন্ধ হয়ে গেছে। ক্ষণিকের জন্যও যদি একটু সরাতে পারে তবে মন্দ কি।

প্রচুর ঠাণ্ডা। যথোচিত শীতবস্ত্রে নিজেদের আচ্ছাদিত করে নেয়। তবুও মাঝে মাঝে কাঁপন ধরে। নিরঞ্জনের প্রশস্ত হাতের মুঠোয় সরমার হাতখানি ভীরু পাখীর মত কাঁপে। এক সময় সরমা 'ওরে বাব্বাঃ!' বলে নিরঞ্জনকে প্রায় জড়িয়ে ধরে। 'কি হলো?' ভীত স্ত্রীকে বাহুতে বেষ্টন করে নিরঞ্জন বলল 'দেখছ না এগুলোকে?' 'আরে এ তো কচু গাছ! হাঃ হাঃ হাসি নিস্তব্ধ পাহাড়ের শিরা উপশিরায় ঝঙ্কার তোলে। অপ্রস্তুত সরমা। 'হাসছো যে বড়? হাতে লাগলে তুমিও শিউরে উঠতে। ঠিক যেন বিষধর কেউটে সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ডাঁটাগুলো দেখেছ? [illegible]

যেন পথিককে ভয় দেখানোর জন্য। ভগবানের এই কুহকজাল মানুষ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।' নিরঞ্জন সরমার হাতে চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বলল 'অবশ্য পথিক যদি তোমার মত সাহসী হয়।' 'মোটেই নয়' বলে সরমা স্বামীর হাতের থেকে নিজের হাতখানা মুক্ত করে নিয়ে, পায়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। লম্বা পদক্ষেপে নিরঞ্জন এগিয়ে গিয়ে সরমার হাতখানা ধরে বলল 'ইস্, সবতাতেই রাগ!' 'না, এবারে বাড়ী চল আর ভাল লাগছে না।

পরের দিন ঘটলো এক বিস্ময়কর ঘটনা। এইমাত্র নিরঞ্জন অফিসে বেরিয়ে গেল। সরমা টুকিটাকি কাজ সেড়ে বসলো উলের বোনাটা নিয়ে। বারটা একটার আগে খায় না সরমা তাই অনেক সময় আছে। আয়া মুন্নি, পাচক প্রেমলাল নিজেদের ঘরে বিশ্রাম করতে গেল।

সিমলার সেপ্টেম্বর মাস শীত—যথেষ্ট। নিঝুম বাড়ীটায় কোন সাড়াশব্দ নেই। দূরের কোন পেটা ঘড়িতে যখন বারটা বাজলো, তাই শুনে আয়া এবং পাচক প্রেমলাল মাইজীকে খানা দেওয়ার জন্য ডাইনিং রুমে ঢুকে একটু থমকে দাঁড়ালো। সমস্ত ঘরখানা ছোট বড় ধুলো পায়ের দাগে ভর্তি। ভৎর্সনা প্রেমলালের দৃষ্টিতে। 'তুম্ কামরা পুছা নেই, আয়া?' 'পুছা তো।' 'তব?' অঙ্গুলী সংকেতে দাগগুলো দেখায় প্রেমলাল। কিন্তু মুন্নির কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় প্রেমলাল অবিশ্বাস করতে পারে না। নিশ্চিন্ত গলায় বলল 'দুসরা কৈ আয়া হোগা।'

ওদের কণ্ঠস্বরে সরমা এসে বলল 'কি হয়েছে?' আয়া বিনীত স্বরে বলল 'মাজী আপকো পাশ কৈ লোক আয়া?' 'নেহি তো।' সরমার দৃষ্টি মেঝেতে আকর্ষণ করে বলল 'দেখিয়ে।' সরমা একটু অবাক হলো। একটি ছোট ছেলের জুতোর ছাপ আছে এবং পিছনে কোন বয়স্ক লোকের পদচিহ্ন। মনে হয় যেন ছুটোছুটি করেছে দু'জনে। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল 'তোমার কাছে কোন আয়া বাচ্চা নিয়ে এসেছিলো?' 'নেহি জী।' 'নিশ্চয়ই। তোমাকে দেখতে না পেয়ে ঘুরে ফিরে চলে গেছে।' আয়া আপন মনে বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে রান্না ঘরে চলে গেল।

সরমা খেয়ে উঠে, লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়ে একখানা নভেলে মনোনিবেশ করলো।

শৈলপুরীর দিনগুলি কেটে যাচ্ছে নানা ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। ছুটির দিনগুলি কাটে সরমাদের নানা দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করে। কোন দিন যায় সুউচ্চ গিরি চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরে—কোনদিন বা কামনাদেবী, কিম্বা অন্য কোন স্থানে। কামনাদেবীকে জানায় মনের গোপন অভিলাষ দুরু দুরু বক্ষে। 'মা শুধু একটি সন্তান। হোক তা ছেলে কি মেয়ে। এ প্রার্থনা কামনাদেবীর অন্তর স্পর্শ করল কি না তা কারুর জানা নেই। অন্তিম মুহূর্তে মানুষ জানায় 'মা আমাকে বাঁচিয়ে তোল। কিন্তু পরমুহূর্তেই হরিধ্বনিতে পাড়ার লোকের চোখ হয় সিক্ত। মার পাষাণ হৃদয়ে অন্তিমযাত্রীর সে আকুল প্রার্থনা প্রতিহত হয়ে তার নিজের সঙ্গেই চলে যায়।

আজ দুদিন হলো হিমেল হাওয়া দিচ্ছে, নেহাৎ দরকার ছাড়া বাইরে বের হচ্ছে না কেউ। সরমা আগুনের চিমনীর সম্মুখে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিন্তু মন বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই তো মুন্নি কতদিন হলো আসছে না। আর আসবেই বা কি করে, যা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আমিও তো যেতে পারছি না একদিন। দিল্লী যাওয়ার দিন তো নিকট হয়ে এল। ভারি বিশ্রী লাগে বাড়ী বসে থাকতে। নিরঞ্জনের কাজের চাপ, আসতে সেই রাত। সত্যিই সুরমার পক্ষে দিনগুলি বিরক্তিকর। নির্জন সিমলা পাহাড়, শীতে যেন বোবা হয়ে যায়। পথিকের চলাফেরা একান্ত বিরল। অল্পায়ু রোদ বারটার পর স্তিমিত হয়ে আসে। পরিমিত হয় বন্ধু সমাগম। তুষারাবৃত জ্যাকো হিল উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে থাকে।

এমনি একটি শীতের সকালে, প্রাতরাশ পর্ব শেষ হলে নিরঞ্জন সরমাকে বলল 'আজ কিন্তু অফিস থেকে ফিরতে আমার রাত হবে, বুঝলে সরমা!' 'কেন?' 'একটা জরুরী মিটিং আছে।' 'তা যেন হলো, মিটিং শেষ হলেই চলে আসবে, আবার যেন গল্পে জমে যেও না। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখ, একা থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠছি। তুমি তো সেই সাত সকালে বেরিয়ে যাও—সমস্ত দিন একা। অসহ্য! দিল্লীতে একটা চাকুরে মেয়ের

জীবন আছে। এখানে যেন তুষারের তলায় সব চাপা পড়ে গেছে। ঝুমিটাও আসবে না, বাচ্চাগুলোকেও দেখতে পাচ্ছি না।' মুখখানা সরমার অব্যক্ত অভিমানে থমথমে। নিরঞ্জন নিঃশেষিত সিগারেট এ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'তুমি দেখো, শেষ হলেই আমি চলে আসবো।' 'দেরী কোরো না যেন—আমার একা একা ভীষণ ভয় লাগে।' 'একা? একা কোথায়? প্রেমলাল, আয়া আছে, একা কেন বোলছ? বরং আমাকে তোমার কাছে বসিয়ে রেখো।' 'সে আমার ভারী অস্বস্তি হয়। মুখের কাছে কেউ বসে থাকলে আমার খুব খারাপ লাগে। তাছাড়া আয়া তোমার যা ঘুম কাতুরে, সুযোগ পেলেই কম্বলের তলায় চলে যায়। যাক্ সে যা হয় হবে, তুমি সোজা মিটিং শেষ হলেই চলে আসবে।' 'আরে তা তো আসবো'ই। তবে এ দিল্লী নয় যে গাড়ীতে হুশ করে চলে এলাম। চড়াই উৎরাই করে আসতে কত সময় লাগে। তবে এখানে চোরের তেমন উৎপাত নেই। ভূত তো বিংশ শতাব্দীতে অচল। ভয়ের কি আছে?' 'বেশ তো ভয় নেই হলো?' রোষ প্রকাশ পায় সরমার কথায়। নিরঞ্জন হাসল। অফিস যাওয়ার সময় সরমা আবার স্মরণ করিয়ে দেয়। 'দেরী করো না যেন।' আচ্ছা পাগল তো! আচ্ছা, বলে নিরঞ্জন চলে যায় অফিসে।

অন্য দিনের মতই রুটিন বাঁধা কাজ চলতে থাকে। নিরঞ্জনকে বিদায় জানিয়ে সরমা বাড়ী ফিরে আসে। দিন এক সময় শেষ হয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। ধূসর গোধূলি অবলুপ্ত হয়ে যায় তিমির রাত্রির অন্ধকারে। নীরবতা নেমে আসে ধ্যানমগ্ন গিরিরাজের শিখর দেশে। নিঃশব্দতা ছিন্ন করে মাঝে মাঝে ঝিল্লিরব শোনা যায়।

কাজ শেষ করে আয়া এবং প্রেমলাল আউট-হাউসে তাদের ঘরে চলে গেল। সরমা সব দরজা জানালা বন্ধ করে চিমনীর কাছে বসে বই পড়তে লাগলো। গল্পটি যদিও খুবই চিত্তাকর্ষক কিন্তু অবচেতন মনে ভয় হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই মনোনিবেশ করা সম্ভব হচ্ছে না। বারবারই কব্জির ঘড়িটির দিকে নজর চলে যাচ্ছে। 'নাঃ, মোটে আটটা। কখন ফিরবে কে জানে। ঘে ভয়ের কি ই বা আছে। আয়া প্রেমলাল তো ডাকলেই আসবে। তার চেয়ে গল্পটাতে মন বসাতে চেষ্টা করি।'

হঠাৎ সরমা কান খাড়া করে সোজা হয়ে বসলো। কারা এসে যেন ঢুকলো মনে হচ্ছে! কি করে ঢুকবে, সবতো বন্ধ।

এ বোধ হয় বাইরের কোন শব্দ। ডাইনিং রুমে মনে হচ্ছে না!

—না, ও আমার মনের ভুল। নির্জন জায়গা দূরের শব্দও নিকটে মনে হয়। সরমা জোর করে মনকে বইতে বন্দী করে রাখতে চায়। কিন্তু আবার দুর্ দার শব্দ। নিশ্চয়ই কোন জানালা হাওয়ায় খুলে গেছে, আর বেড়াল ঢুকে পড়েছে। যাঃ—

এক একটি বেড়াল, ছোট খাট বাঘ। পাহাড়ি বেড়ালের চেয়ে আমাদের বাংলা দেশের বেড়াল অনেক সুন্দর। বেশ পুষতে ইচ্ছে হয়।

নাঃ, উঠিয়ে ছাড়লে। কাঁচের বাসনগুলো সব ভেঙ্গে ফেলবে।

আজকাল যা দাম হয়েছে, এসব জিনিষের! ঘর থেকে বেরিয়েই প্রশস্ত একটি টানা বারান্দা, তার ডান পাশেই যে প্রকাণ্ড বড় ঘর, সেটাই ড্রইং ডাইনিং কম্বাইণ্ড। বারান্দার আলো জ্যোৎস্নার মত ছড়িয়ে পড়েছে সে ঘরখানায়। অন্ধকারে বৃহৎ ঘরখানি অদূরস্থিত স্বল্প আলোতে কুহেলিকা-পূর্ণ মনে হয়।

সরমা শয়ন কক্ষের দরজা খুলে এগিয়ে যায়। 'এ কি! এরা কারা? এলোই বা কি করে?' একটি পাঁচ ছ বছরের ইংরাজ শিশু, আর তার পশ্চাতে ধাবমানা এক পার্বত্য রমণী। ছুটে পালাচ্ছে শিশুটি, রমণীটি পেছনে ছুটছে ধরতে। সমস্ত শক্তি কণ্ঠে কেন্দ্রীভূত করে, সরমা উত্তেজিত স্বরে বলল 'তুম্ কোন্ হায়?' রমণী ঘাড় ফেরায় সরমার দিকে। কি বীভৎস ও পৈশাচিক ব্যঞ্জনাময় এ মুখ! চোখের দৃষ্টিতে কি এক কুটিল চক্রান্তের অভিব্যক্তি। ক্রূর হাসি ঝুলে ওষ্ঠাধরে। সরমা সহ্য করতে পারে না এ দৃষ্টি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

পরের দিন সকাল। শয়ন কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নপথে

মুখে। নিকটেই নিরঞ্জন অপেক্ষা করছে সরমার জাগরণের।

সরমা তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে তাকালো। মুখের উপর ঝুঁকে প্রশ্ন করলো নিরঞ্জন 'কেমন আছ?' ম্লান হাসি সরমার ওষ্ঠে। 'ভাল।' সরমা উঠতে চেষ্টা করলে নিরঞ্জন বলে 'আহা, করছ কি, আবার মাথা ঘুরে যাবে।' 'না, পারবো।' নিরঞ্জন তবু ওকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বাথরুমে নিয়ে যায়। হাতে মুখে জল দেওয়ার পরে অনেকটা ক্লান্তি দূর হয়ে যায় সরমার। ডাইনিং রুমে ঢুকতেই গতরাত্রের ভয়াবহ স্মৃতি ওর সর্বাঙ্গ কম্পিত করে তোলে। সরমার পাংশু মুখ দেখে, নিরঞ্জন ভীত স্বরে বলল 'আবার শরীর খারাপ লাগছে?' সরমা একটু সামলে নিয়ে বলল 'না ভালই আছি।' একটু পরে নিরঞ্জন সরমার দিকে তাকিয়ে বলল 'আচ্ছা, কাল ওরকম অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন? কি হয়েছিলো বলতো? আমি এসে ডাকাডাকি, কিছুতেই দরজা খুলছ না। তারপরে প্রেমলাল কত চেষ্টা করলো খুলতে কিছুতেই পারলো না। অবশেষে একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে চাড দিয়ে খিলটা ভেঙ্গে ফেললাম। ঘরে ঢুকে তো চক্ষুস্থির! খাওয়ার টেবিলের কাছে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে; সারা ঘর ধুলো পায়ের ছাপে ভর্তি। আয়া পায়ের দাগগুলি দেখে বলল, —'দোসরা রোজভি এ লোক আয়া'।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'কে?' 'পাতা নেহিজী।'

তোমাকে তো অনেক করে মাথায় জল হাওয়া দিয়ে জ্ঞান করিয়ে খাটে এনে শুইয়ে দিলাম, কিন্তু আতঙ্কে কি যেন তখনও বকছিলে। ডাক্তার ডাকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এতো দিল্লী নয়—এ সিমলা—নেহাৎ জরুরী কেস ছাড়া রাত্রে ডাক্তার পাওয়া যায় না। প্রতীক্ষা করে রইলাম, সকাল হওয়ার আশায়।

সকালে তোমার চোখে স্বাভাবিক দৃষ্টি দেখে, আমি যেন নবজীবন ফিরে পেলাম।' এই পর্যন্ত বলে, নিরঞ্জন সরমাকে আবার প্রশ্ন করে—'কি হয়েছিল বল তো? অবশ্য বলতে যদি তোমার কোন কষ্ট না হয়। মাথা ঘুরে গিয়েছিল কি!' সরমা মৃদু গলায় বলল 'না।' নিরঞ্জনের অনুরোধে, সরমা গতরাত্রির রোমাঞ্চকর ঘটনা আনুপূর্বিক বলল। সব শুনে হেসে নিরঞ্জন বলল—'এ ভূত তোমার অবচেতন মনের ভয়ের অভিব্যক্তি। ভূত এত সহজে দেখা দেয় না। তায় আবার ইংলিশ এবং নেটিভ মিশ্রণ।' হাত নেড়ে উপহাস তরল কণ্ঠে বলল, 'বড় জোর প্ল্যানচেটের মাধ্যমে লিখে দু'চারটে প্রশ্নের উত্তর দেয়। তবে এটাও থিয়সফিষ্টদের মত। বিজ্ঞানের যুগে জীবনের নবতর চাহিদা জুগিয়েই শেষ নেই—ছায়া বা ভূতএর পেছনে ছোটার ইচ্ছা বা এনার্জি কোথায়? বলে জন্মান্তরবাদের ভিত্তিই টলটলায়মান—তারপরে আবার ভূত!

ছোঃ, এটা একটা কথা হলো! তুমি আজকাল বড় সেন্টিমেন্টাল হয়ে পরেছ। কাল্পনিক ভয় সকাল থেকেই পোষণ করছিলে মনে। হয়তো ছুটো বেড়ালই কোন প্রকারে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আলো ছায়ায় তুমি ঐরকম দেখেছ।' মনের তলদেশে একটি দীর্ঘশ্বাস গোপনে মিলিয়ে গেল নিরঞ্জনের। বন্ধ্যা স্ত্রীর ব্যথায় মন ব্যথিত হলো। মুখে বলল—'ছাখ সরমা, ঐ এক চিন্তা ছাড়া কি তোমার আর অন্য কিছু চিন্তা করার নেই? তুমি তো একা নও—এরকম অনেক আছে।' স্বগতোক্তি করে, রাতদিন ছেলে ছেলে।' সরমার গলার থেকে যেন আওয়াজ বের হয় না-এমনি মৃদু এবং কোমল করে বলল 'কিন্তু পায়ের ছাপ' 'সে অবশ্য তোমার বক্তব্যের একটা জোরালো পয়েন্ট। তবে আমার মনে হয়, তোমার আয়া এবং প্রেমলালেরই পদচিহ্ন।' বিমর্ষ-হাসি সরমার মুখে। 'কি জানি, ঐ দুধ ধাড়ি প্রেমলালের ঐটুকু পদচিহ্ন!' —'তবে আমার কাছে কোন বাচ্চা এসেছিল। খুঁজে না পেয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল।'

'প্লিজ সরমা—মন থেকে ও চিন্তা একে-বারে মুছে ফেল।'

উদাস সুরে সরমা বলল 'তবে কি নিজের চোখ আমাকে ভয় দেখালে!' চাটুকু, একচুমুকে শেষ করে নিরঞ্জন এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ ঝেরে ফেলে বলল 'যাক-গে,—আর না এলেই-বাঁচি!'

সরমা 'কিন্তু—' 'না—না আর কিন্তু নয়। তুমি রেডি হয়ে থেকো, অফিস থেকে এসে সিনেমা কিম্বা শুমিদের ওখানে যাবো।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। নিরঞ্জনের 'বস' মিষ্টার এ, কে, সেন নিরঞ্জনের মুখে বিংশশতাব্দীর অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে, সরমার জন্যে দুজীক

দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নিরঞ্জন ঘণ্টা খানিক আগেই অফিস থেকে এসে পড়ে। সম্মানিত অতিথিদের আপ্যায়নে যাতে কোন ত্রুটি না হয়।

সব শুনে সরমা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলো। প্রেমলালকে ডেকে স্যাণ্ডউইচ এবং চপ বানাতে বলল। সন্দেশ এবং মালপোয়া ঘরেই আছে। কিছু ডালমুট আয়াকে নিয়ে আসতে বলল। রুটি এবং কেক নিয়ে আসবে এখনি চাপরাসী। এটা আগামী কালের সকালের ব্রেকফাষ্টের জন্য। তার থেকে কেক কিছু অতিথিদের দেবে মনে করলো। ব্যাস, অল্প সময়ের নোটিশে আয়োজন নেহাৎ মন্দ নয়। সব কিছু বুঝিয়ে বলে, সরমা প্রসাধনের জন্য চলে গেল। কোন্ শাড়িটা পড়বে, তাই নিয়ে মনের সঙ্গে বোঝাপরা করতে বেশ সময় নিল। তারপরে ক্লান্ত হয়ে বলল 'চোখ বুঁজে প্রথমে যে শাড়িখানা তুলবো, সেটাই পড়বো। মেরুন রং এর শাড়িখানা চোখ খুলে দেখে মুচকী হেসে বলল 'মন্দ কি।' তারপরে আর বেশী সময় লাগলো না। মিসেস সেনের সঙ্গে সরমার এই প্রথম দেখা হবে। তিনি বাপের কাছে বেনারস গিয়েছিলেন। দু'তিনদিন হলো ফিরেছেন। শিক্ষিতা এবং আধুনিকা বলে, সিমলা পাহাড়ে তার খ্যাতি আছে।

ঠিক পাঁচটায় ওরা এলেন। নিরঞ্জন এবং সরমা এগিয়ে গিয়ে তাদের বিসিভ করলো। 'আসুন—আসুন—' নিরঞ্জনের কণ্ঠ আবেগে ভারী। মিসেস সেন, তার হাইহিল জুতোর খুট খুট ধ্বনি তরঙ্গ তুলে এসে বসলেন ড্রইং রুমে। সুসজ্জিত ঘর বলাই বাহুল্য। আধুনিক প্রয়োজনে যেখানে যে জিনিষটি রাখলে ঘরের শোভা এবং গৃহস্বামীর মান বাড়ে, তার কোন ত্রুটি নেই। মিষ্টার সেন তার ভারী দেহ, মূল্যবান নরম সোফায় ডুবিয়ে দিয়ে বললেন 'আঃ, বাঁচলুম। স্থূল দেহ যে মানুষের এমন শত্রু হতে পারে, তা আমার মত কে বুঝেছে! মশাই, ছেলে বয়সে বড় রোগা ছিলুম, মোটা হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা— তখন কি জানতুম এই দেহই পথে বসাবে?'

মৃদু হাসি ঘরের সব ক'টি লোকের মুখে। কিন্তু বক্তা স্বয়ং নিজের রসিকতায়, প্রাণ খুলে হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন। একথা সে-কথার পরে মিসেস সেন বললেন প্রশ্ন।—কিন্তু সরমার মুখ লজ্জায় আরক্ত হলো। যেন ভূত দেখাটা একটা মস্ত অপরাধ। বিশেষ আধুনিকাদের পক্ষে। ভূত থাকবে ঠাকুমার ঝুলিতে, অশিক্ষিতদের মনে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় এবং শিক্ষায় আধুনিক ভাবাপন্ন নর-নারীর মনেও যদি ভূত প্রভাব বিস্তার করে, তবে তা যেমন লজ্জার, তেমন ক্ষমার আযোগ্য। এই সকল প্রেজুডিস ছিল, দু'শো বছর আগের মানুষের। না-না সরমা একি দেখলো! দু'টি শব্দের মধ্যে যে তার এতদিনকার শিক্ষা সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ঘরখানা যেন গোপন লজ্জায় অভিভূত হয়ে রইলো।

সরমা সমস্ত সঙ্কোচ দৃঢ় হস্তে সরিয়ে দিয়ে, বলল 'হ্যাঁ।' বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো—যেন কোন কঠিন এবং সত্য-ভাষণ এইমাত্র সরমার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হলো।

মিসেস সেন ক্ষণকাল ওর দীপ্ত মুখের প্রতি তাকিয়ে থেকে বললেন 'বলুন, কি দেখেছেন—আমার খুব কৌতুহল হচ্ছে।'

আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় স্বরে সরমা বলল 'আমি যা দেখেছি, তা আমি সত্য বলেই মনে করি। দৃষ্টিভ্রম বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। সেই পার্ব্বত্য রমণীর মুখের কাঠিন্য এবং ক্রুর উন্মাদদৃষ্টি, আমাকে এখনও ভয়ে বিহ্বল করে দেয়।' মিসেস সেনের মুখে অনুকম্পার হাসি। 'আমার কি মনে হয় জানেন? এত বড় বাড়ী এবং সিমলা শৈলের ভয়াবহ নির্জনতাই আপনার ভূত দেখার উপাদান যোগাচ্ছে। আপনি বরং দুপুর বেলা আমার বাড়ী আসুন। বেশী দূর নয় তো আমাদের বাড়ী।' তারপরে বিষয়ান্তরে গল্পের প্রসঙ্গ প্রবাহিত হয়। 'সন্দেশ, মালপো সবই আপনার তৈরী, নয় মিসেস দত্ত?' 'তা না হলে কি প্রেমলাল করেছে মনে কর—তা হলে এমনি স্বাদ হয়।' বলে মিষ্টার সেন হাসতে লাগলেন। সরমা গোটাকতক সন্দেশ এবং মালপো সেন সাহেবের প্লেটে তুলে দেয়। 'আরে করছেন কি? মেদবহুল দেহটি কি শেষকালে বাড়ী নিয়ে যেতে পারবো।'

আবার সেই প্রাণ খোলা হাসি। মুখটিপে হেসে সরমা বলল 'বেশী কোথায় আপনি খান।' মিসেস সেন আরো দুটো চপ নিলেন, সঙ্গে সন্দেশ। সরমা অনেক বলল,

ওঁকে,' বলে স্বামীর দিকে অঙ্গুলী দেখান। 'তা তুমি যা-ই বল, অশোক সেন মিষ্টি টেবিলে রেখে উঠে গেছে—এ অপবাদ, আমার তো মনে হয় ভারতবর্ষে কেউ দিতে পারবে না। আর গোটা কতক সন্দেশ চালান করুন এদিকে মিসেস দত্ত।' এবারে মিসেস সেন সত্যিই শঙ্ক হলেন। এই না তুমি বলছিলে আর খেলে দেহ নিয়ে বাড়ী যেতে পারবে না!' '—তা না পারলাম—এখানেই না হয়' বলে অসমাপ্ত কথা রেখে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

নিরঞ্জন ব্যগ্রতা প্রকাশ করে বলল 'না, সার আপনি খান। খাওয়ার ব্যাপারে অন্যের পরামর্শ নেওয়া ঠিক নয়।'

যখন গুরু ভোজনে সকলেরই বাক্য সীমিত হয়ে এসেছে, তখন মিসেস সেন প্রস্তাব করলো 'পরশু রোববার, চলুন আমরা সিনেমা দেখে আসি। তিনটের থেকে ছ'টা, কোন অসুবিধা হবে না। অনেকদিন পরে জুলিয়াস সিজার এসেছে, ভালই লাগবে।' খুশীর সঙ্গেই এ প্রস্তাব গৃহীত হলো। কথা প্রসঙ্গে মিসেস সেন বললেন—'আপনি বি, এ, পাশ একজন মহিলা হয়ে, নিজেকে এমন কর্ম্ম জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন কেন? স্বামীর সেবা যত্ন করেও তো আপনার যথেষ্ট সময় থাকে। সেটা ব্যয় করুন আপনি সমাজ কল্যাণ কোন প্রচেষ্টায় সাহায্য করে। আজ যে মনের অনেক খানি আপনি শূন্য মনে করেন, তাকে পূর্ণ করুন ভারতের শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য' নৈতিক উন্নতির মান উচ্চতর করার সহায়তায়। নারীর মধ্যে যে মাতৃশক্তি আছে, তা ব্যপিত হোক সমাজের সকল স্তরে।' এত বড় শক্তি ঔদাসীন্যে নষ্ট হতে দেবেন না মিসেস দত্ত! মিসেস সেনের গলা কেঁপে উঠে ভাবের প্রাবল্যে।

সরমা সিক্ত চোখে হাত বাড়িয়ে দেয় 'আপনি আমাকে সাহায্য করুন, মিসেস সেন?' সরমার ব্যাকুল হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় এই প্রার্থনা। মিসেস সেন সস্নেহে সরমার হাত ধরে রাখেন নিজের হাতে। স্মিতহাস্যে বললেন 'বেশ তো কালই দুপুরে আসুন আমার বাড়ী। তখন আলোচনা করে ঠিক করা যাবে। দিল্লীর মহিলা কল্যাণ সমিতির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার খুবই হৃদ্যতা আছে। তার সঙ্গে চিঠির মাধ্যমেই আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তার আগে আসুন আমাদের সিমলার মহিলা সমিতিতে একদিন।' সরমার থেকে মিসেস সেন, বয়সে অনেক বড়। বড় বোনের অধিকারে বললেন 'জীবনটাকে এত সহজে ব্যর্থ হতে দিও না বোন। জীবনের লক্ষ্য সুদূর প্রসারী—তার জানার তাই শেষ নেই। নব প্রভাতের সঙ্গে সে নবীন হয়ে উঠে। তাই তার জরা নেই। সে মৃত্যু হীন। একটি জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে অগ্রসর করে দেয় পরবর্তী জীবনে। নিরঞ্জন কথাগুলো শুনছিল মন দিয়ে। মিসেস্ সেন একটু থামতে বলল 'আপনার বক্তব্য হলো, এ জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে নব জীবনের প্রথম পদক্ষেপ সুরু হবে, তাই নয়?'

'ঠিক ধরেছেন মিষ্টার দত্ত। এ সঞ্চয়ের যেমন শেষ নেই, জীবনেরও শেষ নেই। তাই বলছি সরমা, জীবন এত সকীর্ণ করে দেখ না। উদার আকাশে প্রসারিত কর তোমার দৃষ্টি—ব্যথা ভুলে যাবে।' সরমা নত হয়ে মিসেস্ সেনকে প্রণাম করে, সজল দৃষ্টি মেলে দিল বাইরে। মিসেস্ সেন আবার বললেন 'তাই বলছি-মৃত্যুর ওপারের রহস্য নিয়ে বৃথা সময়ক্ষেপ কোরো না। যদি থেকেই থাকে কিছু, থাক না—সে চিন্তা কেন আমার জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। জীবন এবং মৃত্যু এতো একই বস্তুর দুটো দিক। একটিকে বাদ দিয়ে, আর একটির তো কোন মূল্য নেই।' সরমার স্বর সংশয়িত। 'তবু যে রহস্য আমরা সঠিক আজও উদ্ঘাটন করতে পারি নি, তার আভাস ইঙ্গিত আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে বৈকি। গত রাত্রের বিভীষিকাকে কিছুতেই উত্তপ্ত চিন্তার ফল বলতে পারব না। সেই ভয়ঙ্করীর তীব্র দৃষ্টি আমি সহ্য করতে না পেরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখনও সে দৃষ্টি প্রতি নিয়ত আমাকে অনুসরণ করছে।' মিষ্টার সেন চুরুটটি অ্যাসট্রেতে ঠুকে মুখের ছাইটুকু ফেলে দিয়ে, আক্ষেপ সূচক শব্দ করে বললেন। এ ভারী পরিতাপের বিষয় দত্ত। আপনি বরং এ বাড়ীটা ছেড়ে দিন। 'মোটে আর সাতদিন বাকী আছে দিল্লী যেতে, এত শর্ট নোটিশে কে আমাকে বাড়ী দেবে বলুন?'

মিষ্টার সেন তার কেশবিরল মস্তকটি নেড়ে একথার যৌক্তিকতা সমর্থন করেন। তারপরে যেন বিশেষ আবিষ্কারের মত বললেন 'এক কাজ করলে হয় না?—বরং

এই ক'দিন মিসেস দত্তের বোনকে এনে রাখুন।' যেন কঠিন সমস্যার সমাধান অতি সহজে হয়ে গেল, এমনি নিশ্চিন্ত তার মুখের অবস্থা। সরমা সহজ গলায় বলল 'তা, হয় না। তার ছেলে দুটির স্কুল ঐ পাড়ায়।' 'তবে বরং আপনি গিয়ে—মিষ্টার সেনের বক্তব্যের মাঝখানেই সরমা হেসে বলল 'স্থান অভাব। খুব ছোট বাড়ী।' নিরঞ্জন হাই লে দেহটিকে উঁচু করে বলল 'অতএব অবশিষ্ট দিন ক'টা এখানেই থাকতে হবে।'

সহাস্যে মিসেস্ সেন বললেন 'কিছুর দরকার নেই। দুপুরবেলা আমাদের বাড়ীতে থাকবে—সন্ধ্যাবেলা তো মিষ্টার দত্ত এসেই যাবেন। কেমন ঠিক হলো না সরমা?' 'ভয়ে না হোক দরকারে আমি আপনার কাছে নিশ্চয়ই যাব। আপনার সহায়তায় একদিন আমি উজ্জ্বল সম্ভাবনা-ময় জীবনের সন্ধান পাব।'

নিরঞ্জন কৃত্রিম চিন্তাকুল দৃষ্টিতে মিসেস সেনকে বলল 'এ-আপনি করলেন কি বলুন তো? দিব্যি আদরে যত্নে পালিত হচ্ছিলাম তার দফা তো গয়া হয়ে যাবে। আজ মালপো, কাল সরভাজা বেশ চলছিল, এখন সরমা যদি আপনার প্ররোচনায় মানব কল্যাণ ব্রতে ব্রতী হয়, তবে আমার মত পেটুকের কি দশা হবে ভেবে দেখেছেন কি?' নিরঞ্জনের মুখের অবস্থা দেখে সকলেই হেসে উঠলো। মিষ্টার সেন, স্ত্রীকে বললেন, 'এবারে ওঠা যাক।' আলোচনাটির সূত্রপাত প্রেতযোনি নিয়ে কিন্তু, শেষ হলো জীবনের জয়গানে। নিরঞ্জন বলল 'সবার উপরে জীবন সত্য, তাহার উপরে নাই।' সকলেই হাসি দিয়ে এ সত্যতা স্বীকার করল। সেন সাহেব এবং মিসেস্ সেন চলে গেলেন কিন্তু, রেখে গেলেন একটি মিলন সন্ধ্যার মধুর স্মৃতি। সরমা খুশী গলায় বলল 'সময়টা ভারী আনন্দে কাটলো।'

পরের দিনটি কি একটা পরব উপলক্ষে ছুটি।

দুপুর বেলায় নরেন আর সুমিতা বাচ্চাদের নিয়ে সরমা-দের বাড়ী বেড়াতে এল। শিশু তিনটি কার আগে কে মাসীকে ধরতে পারে, এই সংকল্প নিয়ে ছুটে এল। সরমা পল্টু-মিন্টুর গালটিপে আদর করে, রিনিকে কোলে তুলে নিল। রিনির পথশ্রমে এবং খুশীর উত্তেজনায় রাঙ্গা গাল চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দিল সরমা। নরেন কৌতুক হাস্যে ভ্রূটা একটু কুঁচকে সংক্ষেপ উত্তর সরমার, 'ভালই।'

সুমিতা একটু ব্যঙ্গ করেই বলল 'যত সব,·· আবার ভূত দেখতে গেলি কেন? 'দেখা দিলে আমি কি করতে পারি বল?' 'ভূত না—ছাতি! ওসব তোর মনের সৃষ্টি। রাত দিন ভাবিস, তাই ঐ রকম দেখেছিস।' উচ্ছ্বসিত হয়ে নিরঞ্জন বলল 'শ্যালিকা ছাড়া কি এমন মতের মিল অন্য কারুর সঙ্গে হতে পাবে? বুঝলে সুমিতা, ঠিক ঐ কথাটি-ই আমি সরমাকে বলেছি।—কিন্তু সরমার জোরালো প্রমাণ পদচিহ্ন, দাও তো ভাই এর একটা উচিতমত উত্তর।'

সরমা হঠাৎ রেগে যায়। কোন দরকার নেই। বাপু! ভূত দেখে যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছি।'

এমত অবস্থায় গল্পের মোর ঘুরিয়ে না দিতে পারলে বড়ই লজ্জার কথা।

নরেন অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, 'ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি দিদি, এ সময় এক কাপ ধূমায়িত চা পেলে'—কথার মাঝখানে থামিয়ে লজ্জিত সুরে সরমা বলে 'নিশ্চয়ই এস ভাই, আরো আগে আমার একথা ভাবা উচিত ছিল।' চা এবং সঙ্গে অনেক কিছু এল কিন্তু কথা যেন হারিয়ে গেছে। নিরঞ্জন অতিথিদের খুশী করার জন্য এটা খাও, সেটা খাও বলে ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু স্রোতোহীন নদীর মতই আসরটি স্তিমিত মনে হলো।

চা খাওয়া শেষ হতে সরমা বলল, 'ভাই নরেন, তোমরা গল্প কর, আমি বাচ্চাদের নিয়ে ঐ আপেল গাছের তলায় একটু খেলা করছি।' প্রচ্ছন্ন এক নতুন অনুভূতির অব্যক্ত ব্যঞ্জনা সরমার আচরণে। শিশু তিনটিকে নিয়ে চলে যায়। নরেন সুমিতা এবং নিরঞ্জন এ ব্যাপারে একটু অভিভূত হয়ে পড়ে। অবশ্য ক্ষণকাল। নিরঞ্জন তার স্বভাবসিদ্ধ আনন্দে মাতিয়ে তোলে ওদের।

বেয়ারাকে আরেক দফা চায়ের অর্ডার হয়।

আর সরমা—? সেও মেতে উঠে, তিনটি শিশুকে নিয়ে খেলার আনন্দে। এমন কি মৃত্যুর যবনিকার অন্তরাল হতে ইংরাজ শিশুটিও সরমার মনের পর্দায় খেলা করে। এ সরমা যেন অন্য একজন। যাকে আমরা নিরঞ্জনের গৃহিণীরূপে দেখি, এতো সে নয়! বাৎসল্যে

অনেকক্ষণ ছুটোছুটির পরে পন্টু বলল 'মাসী আমার খিদে পেয়ে গেছে।' রিনি অর্ধস্ফুট কথায় বলল 'আমারও মাসী।'

'—তবে রে দুষ্টু, একটু আগে খেয়ে আবার খিদে?'

কৃত্রিম রোষে সরমা ভয় দেখায়। কিন্তু শিশুর চোখে তা ধরা পড়তে বিলম্ব হয় না। সকৌতুকে তিনটি বালক মাসীকে অস্থির করে তোলে স্নেহের অত্যাচারে।—'আয়' বলে সরমা এগিয়ে যায়। আবার আরেক দফা খাবারের আয়োজন হচ্ছে দেখে সুমি বিস্মিত স্বরে বলল 'আবার কার জন্যে এসব সাজাচ্ছ দিদি? একথার উত্তর দেওয়া যেন নিষ্প্রয়োজন।

"আয়রে পন্টু, মিন্টু, রিনি।" সুমিতা এবং নরেন অবাক হয়ে বলল "এই একটু আগে না ওরা এক পেট খেয়ে গেছে—আবার কেন? কিন্তু ততক্ষণে ক্ষুদে পেটুক তিনটি খাবারের ডিস কোলের কাছে টেনে নিয়েছে। উপস্থিত সকলেই বুঝলো প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। বোন এবং ভগ্নিপতির দিকে ফিরে সরমা, স্নেহপূর্ণস্বরে বলল "কি খেলাটাই খেলেছে—পেটের সব হজম হয়ে গেছে। এত ছুটোছুটি করছিল যে আমারই শেষকালে ভয় হচ্ছিল পড়ে-টরে একটা না কাণ্ড করে। তোর মেয়েও কম নয় সুমি।' মুখে একটু মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ে সরমার। "বড় হলে পুরুষের সঙ্গে সম অধিকার নিয়ে যে দস্তুরমত লড়াই করবে—তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তাই ছুটি যা করছে তাই ওর করা চাই।' এ যেন নতুন এক মজার কথা, সরমা তেমনি করে হাসতে থাকে।—আর নিরঞ্জন, নরেন এবং সুমি এই বন্ধ্যা নারীর হাসির আড়ালে, এক বঞ্চিতা নারীর আক্ষেপ শুনতে পায়। সূক্ষ্ম একখানি ব্যথার জাল যেন ওদের হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলিকে ঢেকে ফেলে।

—'হলো তো—, এসো তোয়ালে দিয়ে মুখ পুছিয়ে দেই।'

—'আচ্ছা দিদি, এ তো আয়াও পারে—তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছ?'

সুমিতার এ প্রশ্নের জবাবে সরমা বলে 'যা—বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলিস কেন?—যা শান্ত তোর ছেলে মেয়ে, আয়া খোরাই পারবে?' সুমিতা শুনে একটু ম্লান হাসে। যাওয়ার সময় সুমি বারবার বলে যায় 'দিল্লী যাওয়ার আগের দিন কিন্তু, দিদি, তুমি এবং জামাইবাবু আমাদের ওখানে থাবে।'

রিনিকে কোলে নিয়ে সরমা অনেক দূর এগিয়ে গেল, ওদের সঙ্গে।

নরেন বলল 'অনেকটা তো এসে গেলেন দিদি, ওকে নাবিয়ে দিন' ফিরতে আবার কষ্ট হবে তো আপনাদের।' 'কিছু না—নরেন, তোমার ঐ আনন্দের টুকরোগুলি পেলে কোন ক্লান্তিই ক্লান্ত করতে পারে না। একথা বলে নিরঞ্জন হাঃ হাঃ হাসিতে, পাহাড়ের বুক কাঁপিয়ে তুললো। নরেন এবং সুমিতা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছেলেদের হাত ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো।

রবিবারদিন মিষ্টার এবং মিসেস সেনের সনির্বন্ধ অনুরোধে সিনেমায় গেল নিরঞ্জন এবং সরমা। ফেরার পথে ছাড়লেন না মিসেস্ সেন, ওদের ধরে নিয়ে গেলেন, তাঁদের বাড়ীতে। সেখানে চায়ের পেয়ালায় তর্কের এবং হাসির তুফান উঠলো। ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল।

সোমবার অফিস্ যাওয়ার স্যুট পড়তে পড়তে নিরঞ্জন বলল 'আর কি, সিমলা ভ্রমণ তো শেষ হয়ে এল।' সুর হলো উদাস। কিন্তু সরমার কথা উল্টো। 'শেষ হলেই বাঁচি আর ভাল লাগছে না। যাই বল, দিল্লীর কাছে সিমলা! এক মাসে দিল্লীর বিরহে সরমা বেশ অস্বস্তি অনুভব করছে। ঝি চাকররাও নাকি সিমলার ঐ হিমগিরির মত নীরব। দিল্লীর রাজপথে ছড়িয়ে থাকে কত বৈচিত্র্য। প্রাণচঞ্চল রাজধানীর হাতছানি সরমাকে উন্মনা করে। তাই যাবার দিন প্রত্যাসন্ন জেনে খুশীই হলো। অফিস যাওয়ার সময় সরমা নিরঞ্জনের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এগিয়ে যায়—আজও তার অন্যথা হলো না। গেট খুলে নিরঞ্জন বেরিয়ে, পিছন ফিরে সপ্রেম দৃষ্টি হেনে বলল 'চলি।' সরমার দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করলো, যতদূর দেখা যায়। নিরঞ্জন চোখের আড়াল হয়ে গেলেই সরমার ভারী ফাঁক ফাঁকা লাগে। মনটা যেন কোথায় চলে যায়। ঠিকানাহীন কোন সুদূরে যে পাড়ি জমায়, সরমা তার নাগাল পায় না।

শোয়ার ঘরে ঢুকে আনমনা ভাবে এটা সেটা সে ছাতে লাগল। হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল কাপড়ের আলমারীর পেছনের দেয়ালে। ওখানে একটা ছোট্ট দেয়াল আলমারী

না কি? ধুলো এবং মাকড়সার জালে ঢেকে ফেলেছে। সহসা নজরেই পরে না। এতদিন সরমাদেরও পরে নি। কৌতুহল ঠেলে নিয়ে যায় সরমাকে আলমারীটির কাছে। কাপড়ের আলমারীটা একটু সরিয়ে, পায়ের আঙুলে ভড় দিয়ে ছোট্ট দেয়াল আলমারীটি টান দিয়ে খুলে ফেলে। খুলে ফেলতেই ধুলো এবং রুদ্ধ হাওয়া নাকে মুখে উড়ে আসে। আঁচল দিয়ে নাক ঢেকে ফেলে। 'ইশ্, কি ধুলো! কতদিন যেন বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু একখানা খাম ছাড়া কিছুই নেই দেখছি!' এই কথা বলে, সরমা খামখানা হাতে নিয়ে এ ধারে চলে আসে। অদূরবর্তী চেয়ারে বসে পড়ে, খামখানা উল্টে পাল্টে দেখে। —'নাঃ, আঁটা দিয়ে বেশ ভাল করে আটকানো।'

উপরে কারুর নাম না দেখে, কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে খুলে ফেলে।—আর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, একখানা চিঠি এবং একশত টাকার একখানা নোট। সরমার হাত খানা বিস্ময়ে কাঁপতে থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত হয়। খুলে ফেলে চিঠিখানা। ইংরাজীতে লেখা। বাংলায় তা এইরকম দাঁড়ায়:

শ্রদ্ধেয় মহোদয় বা মহোদয়া;

আমি একজন ইংরাজ মহিলা। আমার স্বামী ভারতীয় সেনাবিভাগে এক জন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে, যখন আমাদের স্বদেশে যাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন আমার আয়া পার্ব্বতী সে খবর জানতে পেরে মর্ম্মাহত হয়ে পড়ে। কারণ, সে আমার পাঁচ বছরের শিশু পুত্র মাইকেল হেনরীকে জন্মের থেকে এ পর্য্যন্ত মাতৃ স্নেহে পালন করেছে—তাকে ছেড়ে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। পার্ব্বতী অত্যন্ত কুরূপা থাকায়, বিয়ের পরেই স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছিলো। তার অন্তরের মাতৃস্নেহ নিঃশেষ করে সে হেনরীকে দিয়ে ছিলো। সন্তান লাভে বঞ্চিতা নারীর অন্তরের ব্যথা আমার হৃদয় স্পর্শ করতো। আমাদের যাওয়ার কথা যখন সে শুনলো, তখন অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল। অনেক সময় অন্য-মনস্কতার জন্য আমাদের ডাক সে শুনতেই পেত না। আমরা ওর মনের অবস্থা উপলব্ধি করে ক্ষমা করতাম। স্বদেশে যাওয়ার দিন যখন আমাদের সন্নিকট হয়ে এল যথারীতি হেনরী আয়ার কাছে রইলো।

পান, ভোজন, নৃত্যগীত শেষ করে আমাদের বাড়ী আসতেই বেয়ারা ছুটে এলো কিন্তু আয়া এল না। আমি বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আয়া কোথায়? সে ম্রিয়মাণ হয়ে বলল আপনারা যাওয়ার একটু পর থেকে আয়া এবং হেনরীবাবাকে দেখতে পাচ্ছিনা। আমি উচ্চ গলায় বললাম, আমার ঘর দেখেছো? দেখেছি মেমসাব, তা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ধাক্কা দিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই খুলছে না। আমার মায়ের মন অগণিত আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে যায়। সংশয়াকুল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাতে, তিনি বললেন চল দেখে আসি।

গিয়ে সত্যিই অনেক ডাকাডাকি ধাক্কা ধাক্কি কিন্তু, কেউ দরজা খুললনা। তখন আমার স্বামী রেগে দরজার উপর লাথি মারতে অপলকা দরজা ভেঙ্গে যায়। উদ্বেগ ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে পাই, মাটিতে হেনরীকে বুকে জড়িয়ে পার্বতী গভীর নিদ্রায় অচেতন। রাগে সর্বশরীর জ্বালা করে উঠলো।—ওর পায়ে আমি পা দিয়ে ঠ্যালা দিলাম—সমস্ত শরীর আমার ভয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কণ্ঠ হলো নীরব। চোখে ফুটে উঠলো ভয়ঙ্কর তীব্র এক জিজ্ঞাসা—এ-কি?

স্বামী আমার অবস্থা দেখে নীচু হয়ে পার্বতীকে স্পর্শ করে চীৎকার করে উঠলেন—মৃত্যু—মৃত্যু!

আমাদের তারপরের অবস্থা চিঠিতে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবো না কারণ তা ব্যক্ত করা যায় না।

পুলিশে খবর চলে গেল। ময়না তদন্তের রিপোর্টে জানা গেল, অত্যন্ত উত্তেজক কোন বিষের সাহায্য উভয়ের মৃত্যু হয়েছে। আমার এই ব্যথার কথা জানিয়ে, অন্য কাউকে ব্যথিত করতাম না—যদি না বাধ্য হতাম কোন বিশেষ কারণে। আমার এই চিঠি যদি কোন হিন্দুর হাতে পড়ে, তবে তিনি যদি দয়া করে, তাঁদের হিন্দুমতে গয়ায় গিয়ে আমার হতভাগ্য পুত্র মাইকেল হেনরী এবং আয়া পার্বতীর মুক্তির উদ্দেশে পিণ্ড দান করেন, তবে আমি চির ঋণে তার কাছে আবদ্ধ থাকবো। আমার ধর্ম্মে প্রেত আত্মার মুক্তির এরকম কোন বিধান নেই।—তাই আপনাকে অনুরোধ করতে বাধ্য হলাম।

তাদের আমি প্রায়ই দেখতে পেতাম। এই পৃথিবীর বন্ধন থেকে তাদের মুক্তি দিতে আপনাদের ধর্ম্মই সমর্থ হবে। এক শত টাকার নোট খানা দিয়ে তাদের পারলৌকিক কাজ করবেন। ইতি—

হতভাগিনী হেনরী মাতা

বিস্ময় বিমূঢ় সরমা খোলা চিঠি খানা কোলে ফেলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ক্ষণকাল তার মন চিন্তা করবার শক্তি হারিয়ে ফেলল। তার পরে অন্ধকারের অন্তরাল হতে বেরিয়ে এলো সেই ভয়ঙ্করী নারী। কি তীব্র তার মাতৃত্বের ক্ষুধা! মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে সরমা তাকিয়ে রইল। হঠাৎ শরীরটা ভীষণ কেঁপে উঠল। অনুভব করলো সরমা, ঐ পার্বত্য রমণীর ধমনীতে যে ক্ষুধিত রক্ত ধারা সঞ্চরমাণ—আপন শিরা উপশিরায়ও তাই প্রবাহিত। পার্বতীর রূপের অভাব সরমার চোখে লুপ্ত হয়ে যায়।

'কে বলে ঐ মমতাময়ী অপরাধিনী? আজ ওর মধ্যে আমি যে, মাতৃমূর্ত্তির দর্শন পেলাম, তাকে প্রণাম করি।'

সন্তান নারীর যে কি বস্তু তা যে না পেয়েছে সেই কেবল জানে। ক্ষুধিত মানুষ যেমন আহার সংগ্রহের কোন পন্থাকেই অন্যায় মনে করে না—ঠিক তেমনিই মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা নারী তার মাতৃস্নেহ দিতে কোন বঞ্চিত শিশুকে, ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্য বিচার করে না। আর স্নেহ-মন্দাকিনীর গতি দুর্ব্বার। সমাজ ভগবান সকলকে উপেক্ষা করে তার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গর্ভে ধারণ না করার মাশুল তাকে অনেক দিতে হবে। তার ইহকাল, তার পরকাল সবই ধরে দিতে হবে।

সরমা ভাবে, যাওয়ার আগে যদি একবার ঐ পার্বতীকে দেখতে পেতাম, তবে বলে যেতাম, তোমার ব্যথার ব্যথী, আমিও। আজ তুমি আমার কাছে ভয়ের নও—আমারই একটা অংশ। বেয়ারায় তাকে সম্বিত ফিরে পায় সরমা।

দুপুরটা কাটে ছটফট করে সরমার। কখন আসবে নিরঞ্জন। সন্ধ্যার অল্প আগে নিরঞ্জন অফিস থেকে আসে।

নিরঞ্জনের হাতে চিঠিখানা দিয়ে সরমা হুহু করে কেঁদে উঠে। এতক্ষণের রুদ্ধ চোখের জল ঝড়তে থাকে। বিস্ময়ে নির্নিমেষ চক্ষে; ক্রন্দনের বেগ একটু প্রশমিত হলে রুদ্ধ কণ্ঠে সরমা বলল আমার ব্যথার ভার যতই অসহনীয় হোক তবু নিষ্ঠুর বিধাতা যেন এই মেয়েটিকে শাস্তি দেন। একথাই তাকে বলবো। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চিঠিটার প্রতি তাকিয়ে রইলো। অভিমান যেন সরমার বিধাতার উপরে। নারীর যা-একান্ত প্রাপ্য, তা থেকে কেন বঞ্চিত করলেন। অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল 'না,—না তোমাকে আমি ক্ষমা করবোনা।' চিঠি খানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে নিরঞ্জন। ভাবে আর তো একে দৃষ্টিভ্রম বলা যায় না। 'সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল সরমা, আর তো তোমার ব্যথাকে অলীক কল্পনা মাত্র বলে উড়িয়ে দিতে পারিনা।'

গয়া গিয়ে মাইকেল হেনরী এবং পার্বতীর মুক্তির জন্য শ্রীবিষ্ণুচরণে পিণ্ড দিয়ে এই বাসনাই জানাবো—'হে দয়াল, তুমি আর কোন বন্ধ্যা-নারী সৃষ্টি করো না।'

একথা বলে কম্পিত হস্ত যুক্ত করে নিরঞ্জন ঊর্দ্ধে প্রণাম জানালো।

সাধনা ও সিদ্ধি

শ্রীজ্ঞান

গত সংখ্যায় কর্ণেল সি, কে, নাইডুর সম্বন্ধে লেখাটি পড়ে 'কিশোর জগৎ'-এর কয়েকজন কিশোর পাঠক খেলাধুলা সম্বন্ধে আরও কিছু লেখার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। সেজন্য এ সংখ্যাতেও খেলার সম্বন্ধে কিছু লিখছি। হয়ত তোমাদের ভাল লাগতে পারে।

কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা প্রায় সকলেই খেলা-ধুলা ভালবাসে। স্কুল-কলেজের খেলার মাঠে, বা পার্কে যেখানে খেলার জায়গা আছে, সেখানে সকলেই খেলা-ধুলা করে থাক। ছোট বেলায় এই যে খেলার নেশা এটা খুবই স্বাভাবিক। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নেশা অনেকেরই কেটে যায়। তখন তারা অন্য নানা রকম আমোদের দিকে বা আনন্দের সন্ধানে ছোটে। কেউ বই পড়াতে মগ্ন হয়ে পড়ে, কেউ সিনেমা-থিয়েটারের ভক্ত হয়ে পড়ে, আবার কেউ বা কাজের নেশায় আত্মমগ্ন হয়ে যায়। কিন্তু যাদের মধ্যে খেলোয়াড়ী ভাব থাকে অর্থাৎ যারা জাত-খেলোয়াড় সেরকম ছেলে বা মেয়েরা বড় হলেও বা অন্য নানা রকম অসুবিধা থাকলেও খেলা-ধুলাকে ছাড়তে পারে না। এবং তাদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতের কৃতী খেলোয়াড় তৈরী হয়। আজকের যে ছেলেটিকে এক হাতে বই ও অন্য হাতে হকি ষ্টিক নিয়ে স্কুলে যেতে দেখা যাচ্ছে, আর ফুরসৎ পেলেই যে ষ্টিক নিয়ে মাঠে মাঠে ছুটে বেড়াচ্ছে কে বলতে পারে তার মধ্যেই লুকিয়ে নেই ভবিষ্যতের ধ্যানচাঁদ! যে কিশোর আজ অলিতে-গলিতে ক্যাম্বিস্ বল নিয়ে একাগ্র মনে খেলে চলেছে তার মধ্যে থেকেই হয়ত একদিন জন্ম নেবে শিবদাস-বিজয়দাস বা গোষ্ঠ পাল! যে তরুণ আজ পার্কে বা বাড়ীর অঙ্গনে ভাঙা ব্যাট বা ছেড়া বল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাগ্র সাধনা করে চলেছে, হয়ত সেই উত্তরকালে নাইডু, নিসার, মার্চেন্ট, মান্তাক, অমর নাথের মতন বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড় হয়ে উঠবে! সত্যই তা'তে ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য একাগ্র সাধনা থাকলে শীর্ষস্থানে ওঠা অসম্ভব নয়। এই একাগ্র সাধনা করতে হলে ধৈর্যের সঙ্গে practice বা অভ্যাস করে যেতে হবে। হতাশ হলে হবে না—মনে অদম্য আশা রাখতে হবে যে আমি বড় খেলোয়াড় হবই। নেতিয়ে পড়লে চলবে না—শরীরকে সুস্থ-সবল রাখতে হবে, কারণ শারীরিক পটুত্বই খেলোয়াড়ের প্রধান সম্বল।

যে কোনও খেলাই তোমরা খেল না কেন, শুধু দেখবে কোন্ খেলাটির প্রতি তোমার আকর্ষণ বেশী। দেখবে সেই খেলাটি তোমার ধাতে সইবে কি না, অর্থাৎ তোমার শরীর তার উপযোগী কি না। যদি তা হয় তাহলে সেই খেলাটির সাধনায় একাগ্রভাবে লেগে পড়—যত্ন সহকারে ধৈর্য্য ও সাহস নিয়ে প্রাক্‌টীস্ করে চল। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তির বা কোনও শিক্ষকের (coach) পরামর্শ নিতে পারলে ভাল হয়।

মনে রেখ রামানাথন কৃষ্ণন একদিনে তৈরী হয় নি। মিলখা সিং ছুটতে আরম্ভ করেই দৌড়বীর হন নি। মিহির সেন সাঁতার শিখেই সপ্তসিন্ধু জয় করতে পারেন নি। এঁদের সকলের সিদ্ধির পিছনে রয়েছে একাগ্র ও একান্ত সাধনা। তোমরাও সেই সাধনায় লেগে পড়—সিদ্ধি লাভ হবেই।

ছুটির ঘণ্টায়

চিত্রগুপ্ত

বিজ্ঞানের রহস্যময়-লীলার ফলে, বিভিন্ন রাসায়নিক-উপাদানের সংমিশ্রণ-প্রক্রিয়ায় বিচিত্র উপায়ে নানান্ ধরণের যে সব রঙবেরঙের আলোর আভা সৃষ্টি করা যায়, এবারেও তোমাদের তেমনি ধরণের আরেকটি আজব-মজার নতুন কারসাজির

খেলা-দেখানোর জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, সেগুলি জোগাড় করাও এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। কাজেই নিতান্ত-ঘরোয়া অল্প-দামের টুকিটাকি দু'চারটি সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় আর খেলা-দেখানোর সহজ-সরল কয়েকটি কলা-কৌশল রপ্ত করে তোমরা অনায়াসেই ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে আজব-মজার এই নতুন কাং'স'জি দেখিয়ে তাঁদের রীতিমত তাক লাগিয়ে দিতে পরো।

এ খেলাটি দেখানোর জন্য দরকার—অন্ততঃপক্ষে, পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা এক টুকরো 'ব্লটিং-পেপার' (a piece of Blotting-paper about 5 or 6 inches long), এক বাক্স দেশলাই, এক পেয়ালা 'তার্পিন-তেল' (a cap of Turpentine Oil) এবং এক পেয়ালা তরল 'ক্লোরিন' (a cap of Chlorine)। এগুলি জোগাড় করা সহজ। কারণ, 'ব্লটিং-পেপার' আর দেশলাই—এ সব তো তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই মিলবে। বাকী উপকরণ দুটি—অর্থাৎ, 'তার্পিন-তেল' আর 'ক্লোরিন'—বাজারে যে কোন বড় ডাক্তার খানায় বা রঙের দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে।

এ সব সামগ্রী সংগ্রহ হবার পর, খেলার কসরতী দেখানোর পালা। আসরে দর্শকদের সামনে খেলা দেখানোর সময়—গোড়াতেই সাজ-সরঞ্জামগুলিকে বেশ ছুটু-পরিপাটি ছাঁদে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে সবা'কে স্পষ্ট ভাষা'য় জানিয়ে দাও যে—দেশলাই-কাঠি না জেলেই বিজ্ঞানের যাদু-মন্ত্রবলে বিচিত্র এক অভিনব-উপায়ে নিমেষের মধ্যেই আজব-মজার আলোর আভা ফুটিয়ে তুলবে এবারে।

এই আভাসটুকু দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু করো—খেলার কসরতীর আসল কাজ। অর্থাৎ, গোড়াতেই 'ব্লটিং-পেপারটিকে' হাউই-বাজীর পলিতার মতো ছাঁদে লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ (fold) করে দেশলাই-বাক্সের খোলে ভরে নাও। তারপর সদ্য-ভাঁজ-করা সেই 'ব্লটিং-পেপারের' পলিতা-আঁটা দেশলাই-বাক্সটিকে 'তার্পিন-তেলের' পেয়ালাতে চুবিয়ে বেশ 'তৈলাক্ত' করেই, সেটিকে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালা থেকে তুলে ক্ষণকাল বাতাসে মেলে ধরে কাগজ ও বাক্সের গায়ে-লেগে-থাকা বাড়তি-তেলটুকু আগাগোড়া সুষ্ঠুভাবে শুকিয়ে নাও। এবারে ঐ তৈলাক্ত কাগজ-ভরা দেশলাই-বাক্সটিকে পুনরায় চুবিয়ে দাও তরল-'ক্লোরিন' ভর্তি দ্বিতীয় পেয়ালাটিতে।

তৈলাক্ত কাগজ ও বাক্সটিকে এভাবে তরল-'ক্লোরিনের' পেয়ালাতে চুবিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আসরের দর্শকেরা সবাই বিস্ময়-স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চোখের সুমুখেই দেখতে পাবেন—'ব্লটিং-পেপার' ভরা দেশলাই-বাক্সটি নিমেষের মধ্যেই আগুনের শিখায় দপ্ করে জ্বলে উঠেছে এবং ক্রমেই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের এই আজব-রহস্যময় বিচিত্র-মজার কারসাজি দেখে আসরের দর্শকেরা যে সবাই রীতিমত অবাক হয়ে যাবেন—সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। অঙ্কের হেঁয়ালী :

৪০ থেকে ৫০ এর মধ্যে এমন একটি সংখ্যার নাম করো—যাকে চারভাগ করলে (যেমন—১৩'কে চারভাগ করছি ১+২+৪+৬=১৩), সেই প্রথম ভাগের অঙ্ককে ২ দিয়ে যদি গুণ করো, দ্বিতীয় ভাগে যদি ২ যোগ করো, তৃতীয় ভাগ থেকে যদি ২ বিয়োগ করো এবং চতুর্থ ভাগকে যদি ২ দিয়ে ভাগ করো তো চারটিরই উত্তর হবে সমান। বলো তো—সংখ্যাটি কি এবং কেমনভাবে চারভাগে সাজা'না যাবে ? বৈকুণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। তোমার হাতে একটি চৌকোণা রুমাল সঁপে দিয়ে কেউ যদি তোমাকে বলে যে—চার থেকে এক বাদ দিলে পাঁচ হয় কেমন করে—তার চাক্ষুষ পরিচয় দাও তো বাপু...তাহলে তুমি কি উপায়ে সে হদিশ জানাবে, বলো তো ? রচনা : শকুন্তলা দেবশর্ম্মা (কলিকাতা)

গত মাসের ধাঁধা ও হেঁয়ালির উত্তর :

১। বেলা—শ্যামের বৌ, ইলা—জ্যোতির্ম্ময়ের বৌ এবং বিনয় হলো লীলার স্বামী।

২। তমাল

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

প্রসূন, নীরদ, বরদাকান্ত ও হৈমন্তী রায়চৌধুরী (কালনা), মৃদুলা, পার্থ, বিনয়েন্দ্র ও অজয়েন্দ্র কুমার (মুর্শিদাবাদ), হাঁস, শৈলেন, দ্বিজেন্দ্র, ফণীন্দ্র ও রথীন্দ্র সেন রায় (কলিকাতা), বাল্মীকি, তুহিনা, অতসী, মানকুমারী ও ভোটকু বসু (গয়া), টুটু, লতু, ইভা, আভা ও নোটন বক্সী (কলিকাতা), প্রসাদ, বাসন্তি, চিরঞ্জীব ও শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী), টোটো, ছোটকু, লালতা, শোভনা, রাগিণী ও মৃণালিনী বরাট (রাণীগঞ্জ), লক্ষ্মী, সত্যেন্দ্র, জয়ন্তী, সুকান্ত, অনন্ত, হেমন্ত ও কুমুদিনী বসুমল্লিক (পাটনা), পল্টু, জেল্টু, লাট্টু, টুনী, ময়না, বুলবুলি ও মণিমোহন সিংহ (জলপাইগুড়ি), কমলেশ, অনিমেষ, নিখিলেশ ও ব্রজাঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায় বারাসত)।

সাহিত্য ঃ সত্য-শিব-সুন্দর

এবার "নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন"-এর তেতাল্লিশতম বার্ষিক অধিবেশন অন্ধ্র প্রদেশের হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হল। অন্যান্যবারের মতন এবারের অনুষ্ঠানও সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমন্বয়ে সার্থক হয়ে উঠেছিল। অনেক বক্তাই তাঁদের বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁদের সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশের ভাষণ বিশেষ করে মনকে নাড়া দেয়। আজকের সাহিত্যিক ও পাঠককে লক্ষ্য করে সুচিন্তিত ও জ্ঞানগর্ভ যে ভাষণ শ্রীদাশ দিয়েছেন তা সত্যই প্রণিধান-যোগ্য। এখানে শ্রীদাশের বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি পাঠকদের চিন্তার খোরাক জোগ বে বলে।

দেবেশ বাবু তাঁর বক্তৃতার শেষের দিকে বলেছেন: "...সাহিত্যিকের লেখনীতে প্রকাশিত হোক সুন্দরের লীলা অভিরাম। যা জীবনকে করবে সুষ্ঠু আর মনকে বলিষ্ঠ। মনকে দেবে মদিরা নয়, মাধুরী।

আজকের সাহিত্যিক আমি তখন জবাব দেব যে নীতিবাগীশ বা বিশুদ্ধ সাহিত্যের স্থান বর্তমান যুগে সংকীর্ণ। পাঠকের মধ্যেই আমি চরিত্র ও ঘটনার সন্ধান করেছি। তাদের জীবন যদি পঙ্কিল, সমাজ যদি সমস্যাসংকুল হয়ে থাকে তাদের বাইরে আমি কোথায় অবাস্তব সাহিত্য রচনা করতে যাব? তাদের হৃদয়ের বিচরণ আর দেহের অনুশীলন যদি অনুমোদিত পথে না ঘটে থাকে তার জন্য ত আমি দায়ী নই। এ যুগে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র তমসা-তীরের তপোবন নয়; তামসী রাত্রির মন-বিশ্লেষণ।

সাহিত্যিক আমি বলি, আমি নিজেই ত জীবনের সৃষ্টি। পাঠকের চাহিদা ও সমাজের আবহাওয়া ধরা পড়ে আমার লেখনীতে। আমি ত তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নই।

সামাজিক মানুষ ও পাঠক হিসাবে তখনো আমার একটি প্রশ্ন থাকে। পাশ্চাত্য জগতে দেখেছি যে তরুণের দল যেন গত বিশ্বযুদ্ধের বানভাসি শ্যাওলা। 'টেডিবয়' যুদ্ধোত্তর জগতে একটি নির্মম সত্য। একটি লষ্ট জেনারেশন। একটা 'সুজিং' হার মেনে-যাওয়া সভ্যতার চিহ্ন। ওরা যে গান গায়, যে নাচ নাচে, যে বই পড়ে, যে কবিতা আওড়ায় তা পাশ্চাত্য জগতে চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। এবং এদেশেও। সমাজতত্ত্ববিদ্ বলেন যে ওরা আমাদের তীরভূমিতে নির্বাসিত; আমাদের সমাজের বাইরে নিবাসী। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেন, ওরা আমাদের সভ্যতার পক্ষে সাবধানের লাল সংকেত।

প্রচলিত সমাজের বিরোধী তারা জীবনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা একটা নতুন সভ্যতা বা সভ্যতাহীনতার অগ্রদূত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনা ও নেশাগ্রস্ত অবচেতনা তাদের অনেকের কাছে কাম্য। বিধিবদ্ধ সংসার ও পরিণতবয়স্ক পিতামাতার গৃহ তাদের টেনে রাখতে পারে না।

টেডিবয়, বা বীটনিক বা হিপি তরুণতরুণীর মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে একটি পলাতকা মেয়ের গানে: "সে যে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়।"

জীবনের সব-কিছু নব মূল্যায়নের অগ্রদূত লেখক তখন বলবেন: "কিন্তু এরা ত সহজ জীবনের পক্ষপাতী। মুমূর্ষু কল্পিত সমাজে তারা নবযৌবনের জোয়ার আনছে। এমন কি আনকে ধ্যান ও ঐশ্বরিক সন্ধানের দিকেও মন দিচ্ছে। এদের লেখকরা অশ্লীলতা সত্ত্বেও সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ত সহজ ভাব এনে দিচ্ছে। রক এণ্ড রোল থেকে বীটল সব শ্রেণীর সঙ্গীতই মাতাল তরঙ্গে সারা পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। তোমরা উৎকণ্ঠিত হতে পার, কিন্তু তারা মিঠে ষ্ট্রবেরীর বাগিচায় নিশ্চয়তার আশ্বাস পাচ্ছে।

"কেউকেটা হওয়া সহজ নয়,
আমার তাতে যায় আসে না কিছু

আমার সেথ চলে এস, কারণ
যাচ্ছি আমি আমের বাগিচায়
কিছুই ত সত্য নয়।"

আতঙ্কিত হয়ে পাঠক আমি তখন বলি যে, দোহাই আপনার। চিরকালের এই স্ট্রবেরী-ফিল্ডস আমাদের তরুণদেরও দুর্বার ভাবে আকর্ষণ করছে। কিন্তু ওদের ও আমাদের মধ্যের তফাৎটা বিবেচনা করুন। একদল হচ্ছে সম্পদের স্বচ্ছলতার ফুল। আর এরা অভাবের আশাহীনতার ফল। ওদের প্রাণোচ্ছলতাই ওদের বাঁচিয়ে রাখবে। আর রক্তহীন দুর্বলতা এদের অপচয় অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেবে। তা ছাড়া ওপারের সমাজ ও রাষ্ট্র ওদের আত্মঘাতী হতে দেবে না। সহনশীলতা ও সহানুভূতি দিয়ে নিজেদের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেবে। এ পারের উদাসীন সমাজ ও বিত্তহীন ব্যবস্থা নির্লিপ্ত-ভাবে নোঙরহীন নৌকাগুলিকে ঘূর্ণির অতলে ডুব যেতে দেখবে।

সে জন্যই এদেশে সাহিত্যিকের দায়িত্ব খুব বেশী। বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুবশক্তির অপচয় খুব বেড়ে গেছে। এক কালে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য আমরা ভাঙনের গান গেয়েছিলাম। আজ ভাঙতে ভাঙতে আমরা প্লাবনের পারে এসে দাঁড়িয়েছি। এখন গড়তে হবে নতুন বাঁধ, নতুন জল-প্রণালী যা জীবনের জমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে তুলবে। সেইখানে আমরা আজ নব-ভগীরথের আবাহন করছি। আমাদের নিবীর্য নিপীড়িত জীবনে প্রয়োজন হচ্ছে বিশাল ক্ষমতা, মমতার সঙ্গে যাকে ব্যবহার করতে হবে। এবং সাহিত্যিকই তা করতে পারেন।

প্রাচীনকালে সাহিত্যিককে বলা হত কবি, দ্রষ্টা, seer। তিনি দিতেন সুরলোকের রস, ইহলোকের সুরা নয়। হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেট যেখানে আকাশের মেঘে প্রাণের রূপচ্ছায়া দেখছিলেন, পালোনিয়াস সেখানে শুধু বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখছিলেন। কবির মাথা মেঘলোকে বিরাজ করে। তিনি তাই আবহবার্তাবিদের চেয়ে বড়ো। তিনি মনের আবহাওয়া তৈরী করেন, পরিবর্তন করেন। তাঁর কাছে আছে সেই কষ্টিপাথর যা দিয়ে মানুষের অমরত্ব যাচাই করা চলে। সেই সাহিত্যিককে আজ করজোড়ে এই সাহিত্য-সম্মেলন নিবেদন করবে, হে দ্রষ্টা, তুমি স্রষ্টা হও। আমাদের নিষ্পিষ্ট নিপীড়িত জীবন-মন্থনে যা উঠছে তাকে এখন তুমি অমৃত করে দাও।

পাঠকের এই অন্তর আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে আমার মত সামান্য সাহিত্যিকও তখন স্মরণ করবে যে গ্রীক পুরাণের প্রমিথিউসের মত সাহিত্যিকও মানুষের সৃজনী-শক্তির প্রতীক। যার সৃষ্টিক্ষমতা আছে তিনিই ঐশীশক্তি-সম্পন্ন। সেই ক্ষমতার বলে তিনি সংকুচিত সমাজ ও সংরক্ষণশীল মন, সংকটময় পরিস্থিতি ও সংশয়ময় চিত্ত-ব্যবস্থার উর্ধ্বে উঠে যাবেন। সিংহাবলোকন হবে তার দৃষ্টি, অমরতার অভিলাষী হবে তার সৃষ্টি। ক্ষণিকের পাঠক যদি তাকে না মানে, চিরকালের পাঠক তাকে জানবে নিশ্চয়ই।"

আজকের সাহিত্যিকদের দেবেশ বাবুর এই ভাষণের দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি, আর অনুরোধ করি তাঁদের সৃজনধর্মী লেখনীকে সংযত, সংহত করে সৃষ্টি করতে সুষ্ঠু সাহিত্য, সুন্দর সাহিত্য যা সত্য, শিব ও সুন্দর হয়ে উঠে চিরন্তন রূপ নেবে—কালজয়ী হয়ে জাগরূক থাকবে শুধু এ দিনের নয়, আগামী দিনের পাঠকের মনেও।

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩/১/১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।